

সচিত্র
মাসিক বসুমতী

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
২৩শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫১ | ২য় সংখ্যা

কর্ম্মরহস্য

ভগবৎকৃপার প্রত্যেক প্রাণীই কর্ম্ম-শক্তিরূপ একটি পরম সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই জন্য জন্মাবধি কিছু না কিছু কর্ম্ম করিতেই থাকে, কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুও আত্মরক্ষার উপযোগী স্তন্যপানাদি করিতে থাকে, যত অধিক বয়স হয় ততই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলে, ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম। তন্মধ্যে পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতিগুলি নিজের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম করে না, সেই জন্য প্রয়োজন পূর্ণ হইলে আর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য খাদ্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে আর খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করে না, সন্তানের জন্য যথাকালে স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত হয়, নতুবা নহে; পীড়িত হইয়া পড়িলে আর আহার করে না, তাহারা স্বভাবতঃই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়।

মানুষের প্রকৃতি কিন্তু সেরূপ নয়, মানুষ কেবল অত্যাবশ্যক কার্য্য করিয়াই নিবৃত্ত হয় না—হইতে পারে না, সে কেবল আত্মরক্ষার উপযোগী কার্য্য করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না—সে আরও চায়, এত চায় যে, সে চাওয়ার আর শেষ হয় না, যত পায় ততই চায়, ক্রমে তাহা প্রবল লোভে পরিণত হয়, লোভে পরিণত হইলে সে লোভ সম্বরণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে। দেখা যায়, যে অত্যন্ত নিঃস্ব সে মাত্র এক শত টাকার কামনা করে—কোন প্রকারে এক শত টাকা পাইলেই সে কৃতার্থ হয়, যদি ভিক্ষাদির দ্বারা এক শত টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহা হইতে সহস্র টাকা অর্জ্জন করিবার জন্য আশান্বিত হয়, এবং সেজন্য একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় পাতিয়া বসে, তাহা হইতে সহস্র টাকা অর্জ্জিত হইলে লক্ষ টাকার লোভ আসিয়া পড়ে, তখন তাহার জন্য ব্যবসায়ের আরও বিস্তার-সাধন করে, সেই ব্যবসায় হইতে লক্ষ টাকা অর্জ্জিত হইলে কোটি টাকা লাভের লোভে দেশে-বিদেশে নানা স্থানে ব্যবসায়ের বিস্তার করে। এই ভাবে লোভের সীমা করিতে না পারিয়া মানুষ প্রমত্তের মত লোভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিতে থাকে, যাবজ্জীবন ধাবিত হইয়াও তাহার নিবৃত্তি হয় না, এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

> নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা শৈবপদং শিবো হরিপদং লোভাবধিং কো গতঃ।

অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি শত টাকার কামনা করে, যাহার শত টাকা আছে, সে সহস্র টাকা কামনা করে, যাহার সহস্র টাকা আছে, সে লক্ষ টাকার কামনা করে, যাহার লক্ষ টাকা আছে সে রাজা হইবার বাসনা করে, রাজা সম্রাট্ হইবার বাসনা করে, সম্রাট্ দেবরাজ ইন্দ্র হইবার বাসনা করে, ইন্দ্র ব্রহ্মা হইবার বাসনা করেন, ব্রহ্মা শিবের অধিকার লাভ করিবার বাসনা করেন, শিব বিষ্ণুর অধিকার লাভ করিবার বাসনা করেন। বিষ্ণুপদ ব্রহ্মলোক, তাহা অনন্ত, তাহার আর সীমা নাই, সুতরাং লোভেরও সীমা নাই; অতএব কেহই লোভের সীমায় পৌঁছিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ লোভ সংযত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু লোভপরতন্ত্র মানুষ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া থাকে, এবং যাবজ্জীবন বহুবিধ কর্ম্ম করিয়াই চলে, ক্রমে তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি এমনই উদ্দাম ভাবে চলে যে, তাহার কোন শৃঙ্খলাই থাকে না। নিজের স্বার্থে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভদ্রতা অভদ্রতা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যায়।

দেখুন, সম্প্রতি এই দেশের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর যে নিদারুণ বিভীষিকাময় তাণ্ডব নৃত্য চলিয়া গেল, তাহার স্মরণ হইলে "বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে" শরীর কাঁপিয়া উঠে, রোমাঞ্চিত হয়, তখন লক্ষ লক্ষ নিরন্ন লোক বুভুক্ষার তাড়নায় অতি নিষ্ঠুর ভাবে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল, শত শত

পরিবার জগৎ হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, ইহা দেখিয়াও কিন্তু একদল ব্যবসায়ী অর্থের লোভে মুগ্ধ হইয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত করিতে লাগিল, ক্ষুধার্ত্ত নরনারী শিশু সন্তানগুলিকে বক্ষে লইয়া 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া পথে পথে আর্ত্তনাদ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, প্রত্যহ বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিত, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও কিন্তু ব্যবসায়ীদের পাষাণ হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। আর এই নিদারুণ অবস্থাতেও কলিকাতার থিয়েটার ও বায়স্কোপের প্রাসাদগুলি ধনীদের উৎসাহপূর্ণ উৎসবে সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত, কোন দিনই তাহার কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই বরং তাহাদের দ্রুতগামী মোটরের প্রচণ্ড আঘাতে কত দুঃস্থ হতভাগ্য নিষ্পেষিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

এই ত সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা, মানুষ যদি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু মাত্র ব্যবহার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত, তাহা হইলে জগতে অভাব অভিযোগ চৌর্য্য দস্যুতা দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি কোন অশান্তিই থাকিত না, এবং মধ্যে মধ্যে ভীষণ অমঙ্গলকর বিশ্ববিত্রাসক ঘোরতর সংগ্রামেরও আবির্ভাব হইত না, মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে শান্তিময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখী হইত। অতএব মানুষের উদ্দাম মনোবৃত্তিই জগতের অকল্যাণকর উৎপাত সমূহের হেতু; এ বিষয়ে মানুষ হিংস্রক পশুপক্ষী অপেক্ষাও অত্যন্ত জঘন্য। মানুষ যদি নিজের বল বুদ্ধি প্রতিভা উৎসাহ ও উদ্যম প্রভৃতিকে শাস্ত্র অনুসারে সুসংযত করিয়া আত্মহিতকর ও লোকহিতকর কার্য্যে ব্যবহার করিত, তাহা হইলে জগৎ নিরুপদ্রব ও শান্তিময় হইত। এ বিষয়ে ক্রমে আমরা আলোচনা করিব। এই ভয়াবহ উপদ্রবরাশি হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা মানুষকেই স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কারণ, মানুষই নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার উপযুক্ত বিচারশক্তি লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অন্য কোন প্রাণীর তাহা নাই; তাহারা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মস্রোতেই পরিচালিত হয় এবং এই জন্যই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। তাই মহাকবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন 'সবার উপরে মানুষ ভাই' অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষই শ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি জগতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এ জন্য চিন্তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শুনিতে পাই, উৎসাহ উদ্যম ও কর্ম্মশক্তিতে ইউরোপখণ্ডই এখন জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তত্রত্য বহু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নানাবিধ পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন, এ জন্য সেখানে ন্যাসনালিজম্ বলশেভিজম্ কমিউনিজম সোসালিজম নাৎসীবাদ প্রভৃতি বহু ইজমেরই সৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সেগুলি ইউরোপখণ্ডে প্রচণ্ড যমের মূর্ত্তিতেই পরিণত হইতেছে। শুনিতে পাই, স্বনামধন্য বিখ্যাত বীর হিটলার বলশেভিজম ধ্বংস করিবার জন্যই না কি রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাশিয়ার কি গুরুতর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত আমেরিকার উইলকির পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং বলশেভিকদের মধ্যেও অত্যন্ত মতবৈষম্য থাকায় যুদ্ধের পূর্ব্বে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রায়ই গুরুতর বিদ্রোহের কথা শোনা যাইত। তাহারই ফলে রাশিয়ার এক জন শ্রেষ্ঠ সন্তান কর্ম্মবীর ট্রট্স্কি জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হন, এবং বিদেশে আততায়ীর হস্তে নৃশংস ভাবে নিহত হন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সাধারণ মানুষের কল্পিত কোন নীতিই সর্ব্বজনীন কল্যাণপ্রদ হয় না, সেই জন্য পরস্পরের স্বার্থে আঘাত পড়ায় জগতে গুরুতর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তাহার কারণ, সাধারণ মানুষের চারি প্রকার দোষ থাকে—ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা (প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা) ও করণাপটব, এই সকল দোষে দুষ্ট হওয়ায় মানুষের প্রতিভা-কল্পিত কোন নীতিই নির্দ্দোষ হয় না, বিশেষতঃ এখনকার মানুষ প্রায়ই স্বার্থপর হয়, সেই জন্য নিজের সমাজের বা জাতির স্বার্থের দিকেই অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কাজেই নিরপেক্ষ ভাবে জগতের কল্যাণচিন্তা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; প্রায়ই স্বার্থের মোহে নিজেদের সুযোগ সুবিধারই ব্যবস্থা করিয়া লয় এবং দুর্ব্বল জাতিগুলির প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার করিয়া থাকে, তাহার ফলে দুর্ব্বল জাতির অন্তরে প্রধূমিত বিদ্বেষবহ্নি কালে বিশ্বগ্রাসী ভীষণ দাবানলে পরিণত হয়, তখন জগতের প্রাণ দারুণ অশান্তিতে নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

এই ভাবে কিছু কাল ধরিয়া পৃথিবীতে কতকগুলি ধূর্ত্ত লোকেরই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলিতেছে, তাহারা ধর্ম্মহীন নীতিহীন ও কাপট্যপূর্ণ কতকগুলি নিয়মকানুনের প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার দ্বারা আপাততঃ লোকের চক্ষু আবরণ করিয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিরই সম্পূর্ণ সুযোগ করিয়া লয়। সুতরাং তাহাদের প্রবর্ত্তিত কোন কর্ম্ম-পদ্ধতিই জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না; যে নীতি ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কখনই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না।

সে জন্য চাই নিঃস্বার্থ নিষ্কপট সত্যনিষ্ঠ নিষ্পক্ষপাত ধর্ম্মপরায়ণ লোকহিতৈষী ও ত্যাগী মনীষী মানুষ, যিনি কেবল বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তাতেই অবহিত থাকিবেন। সে জন্য চাই সংযম তপস্যা ধর্ম্মনিষ্ঠা শাস্ত্র-বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি। এই সকল গুণ থাকিলে ভগবৎকৃপায় মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। আমরা দেখিতে পাই, ভারতের আর্য্য ঋষিগণ সকল প্রকার সদ্গুণেই ভূষিত থাকিতেন, এই জন্য সমগ্র মানবজাতি, এমন কি সম্রাট্ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের পদানত থাকিতেন। মহাভারতে দেখিতে পাই, মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখনই কোন গুরুতর সমস্যায় পড়িতেন, তখনই বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রতি মীমাংসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, এবং তাঁহারা প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া যে পবিত্র নীতির উপদেশ করিতেন, পাণ্ডবগণ শ্রদ্ধা-সহকারে অবনতশীর্ষে তাহাই গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিতেন। এই ভাবেই দ্রৌপদী-বিবাহ প্রভৃতি গুরুতর সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া লইয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সম্প্রতি যদিও সেই সকল মহামানবের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব নহে, তথাপি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র ও সদাচার প্রভৃতি এখনও জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। হিতাকাঙ্ক্ষী মানব অকপটে সেইগুলিকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয় কল্যাণলাভ করিয়া ধন্য হইবে। এই জন্য হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রীয় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র নীতি অনুসারেই ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। যদিও ক্ষত্রিয়দের নৈতিক দুর্ব্বলতা ধর্ম্মহীনতা ও কাপুরুষতা বশতঃ ভারতবর্ষ বহু কাল হইতেই পরাধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,

তথা ক জাতির আচার-ব্যবহারগুলি শাস্ত্রীয় নীতির
দ্বারা র এখনও হিন্দুজাতি জাতীয়তা হইতে বিচ্যুত
হইয়া

শাস্ত্রকারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটি বাক্যই অত্যন্ত সত্য। কারণ, তাঁহারা সাধনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যোগজ প্রত্যক্ষের দ্বারা লৌকিক অলৌকিক স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত তত্ত্বই নখ-দর্পণের মত নিপুণ ভাবে অবগত হইতেন। তাই তাঁহারা কেবল ঐহিক সুখের দিকেই অবহিত না হইয়া পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যই অত্যন্ত অবহিত থাকিতেন। কারণ, এ জীবনের কয়টিমাত্র দিনের জন্য দুঃখমিশ্রিত ক্ষণিক সুখ লাভই পরম কাম্য হইতে পারে না, যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র না থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুখেরই প্রবাহ চলিতে থাকে এবং কোন কালেই তাহার বিচ্ছেদ না হয়, এইরূপ পরম সুখ-প্রাপ্তিই মানবের একমাত্র কাম্য, অতএব তাহাই পরম পুরুষার্থ। ইহা বুঝিয়া আর্য্য-ঋষিগণ সেই পরম সুখের দিকেই জনগণকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার সুব্যবস্থাও করিয়াছেন। অতএব যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সকল দিকেই সম্পূর্ণ কল্যাণ লাভ করা যায়, তাহার জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মের খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে, অর্থাৎ এমন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা অধর্ম্ম না হইয়া ধর্ম্মই হইবে, এরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে শাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারেই তাহা করিতে হইবে। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে তাহা অধর্ম্মেই পরিণত হয়, সেই জন্য ঋষিগণ আমাদের সমুদায় কর্ম্মকেই শাস্ত্রের পবিত্র নীতিরূপ সুদৃঢ় কর্ম্ম দ্বারা সংযত করিয়া দিয়াছেন। মানুষের সমগ্র জীবনটিই কর্ম্মময়, কর্ম্ম ছাড়িয়া মানুষ থাকিতে পারে না। অতএব সেই কর্ম্মকে এমন ভাবে সুসংস্কৃত করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিশুদ্ধ কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হইতে না পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য।

বাঙালীর সাহস

প্রায় শুনতে পাই, অমুক জাতের লোক খুব সাহসী, অমুক জাতের লোক ভয়ানক ভীরু; পাঞ্জাবীরা খুব সাহসী, বাঙালীরা ভীরু ইত্যাদি। এ সব উক্তিতে আমাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সাহস এবং ভীরুতা একটা জাতিগত এবং মজ্জাগত ব্যাপার; জাতির এই বৈশিষ্ট্যকে দূর করা যায় না। সুতরাং যারা ভীরু, তাদের চিরকালই ভীরু থাকতে হবে, আর যারা সাহসী, তারা চিরকাল সাহসীই থাকবে। কাজেই যারা সাহসী বলে খ্যাত, তাদের ইতিহাস তাদের সাহসিকতার কাহিনী দিয়ে রচিত হবে, আর যারা ভীরু বলে কুখ্যাত, তাদের ইতিহাস রচিত হবে তাদের ভীরুতাকে ভিত্তি করে।

আমার মনে হয়, অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণার মত এ-ধারণাটিকেও ভ্রান্তির পর্য্যায়ে ফেলা উচিত। মেয়েদের সাহসের অভাবের জন্য সব দেশেই একটা দুর্নাম আছে, বাঙালী মেয়েদের তো কথাই নেই! এখন একটি বাঙালী মেয়ের সাহসিকতার কথা বলি। এই মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে এখন হচ্ছেন এক জন প্রবীণা—আমার আত্মীয়া। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য।

আমার এই আত্মীয়ার গ্রামে এক বার একটি চিতা বাঘ এসেছিল। "বাঘ এসেছে" "বাঘ এসেছে" চারিদিকে এই কলরব উঠলো। কেউ বন্দুক, কেউ কাটারী, কেউ লাঠি নিয়ে বাঘের সন্ধানে বেরুলো।

বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল শেষে আমার সেই আত্মীয়ার গৃহে। খড়ের ঘর তাঁদের। আত্মীয়া তাঁর এক-বছর বয়সের শিশুটিকে মেঝেয় শুইয়ে রান্না-বান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। বাঘ কখন এসে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে আর ঘুমন্ত শিশুটির কাছে গিয়ে বসেছে, তিনি জানেন না। গ্রামের লোক-জন দরজার কাছে জমায়েৎ হয়েছে দেখে বাঘ হতভম্ব হয়ে চুপ করে বসে আছে।

এ দিকে গ্রামের লোকেরা কি করবে, কিছু ঠিক করতে পারছে না। বাঘকে গুলী করলে শিশুটি নিশ্চয় মারা পড়বে। অথচ শিশুটিকে বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করে আনে, এমন সাহস কারও হচ্ছে না!

ব্যাপার জানতে পেরে আত্মীয়া ঘরের দরজার কাছে এলেন। দেখলেন, তাঁর আদরের দুলাল বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর তার শিয়রে বসে আছে এক ভীষণ চিতা বাঘ। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সঙ্কল্প স্থির করে ফেললেন। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না দেখিয়ে সোজা তিনি চলে গেলেন ঘরের ভিতরে—তাঁর শিশুর বিছানার কাছে। তার পর বেশ স্থির ভাবে শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে সোজা তিনি বাইরে চলে এলেন আর দরজা বন্ধ করে শিকল আটকে দিলেন। তার পর শিশুকে এক জন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে তিনি মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই অবসরে বাঘ ঘরের চাল আর দেওয়ালের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাই দিয়ে পালিয়ে গেল।

পাঠক এক বার ভেবে দেখুন। বাঙালী ভীরু বলে তার দুর্নাম তো আছেই, তাছাড়া বাঙালী কুলমহিলা যে সাহসিকতার আদর্শ নন, তাও আমরা স্বীকার করি; অথচ আমার এই আত্মীয়া যে সাহস দেখিয়েছিলেন তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়! এর কারণ কি?

আমার আত্মীয়া তাঁর শিশু সন্তানটিকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন বলেই নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে বাঘের মুখ থেকে সন্তানকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

গুর্খারা দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধারূপে বিশ্বময় খ্যাতি অর্জ্জন করেছে; আর মাড়ওয়ারীরা যে ভীরু, সে কথা সকলেই বলেন। অথচ সময়-সময় ভীরু মাড়ওয়ারী যে দুর্দ্ধর্ষ গুর্খার সম্মুখীন হতে পরাঙ্মুখ হয় না, তার একটি দৃষ্টান্ত দিই।

স্কুলে আমার সঙ্গে একটি মাড়ওয়ারী ছেলে পড়তো। বয়স তার চৌদ্দ কিম্বা পনেরো বছর। শিলং পাহাড়ের কথা বলছি। সেখানে একদল গুর্খা রেজিমেণ্ট থাকতো। আমার মাড়ওয়ারী ক্লাস-ফ্রেণ্ডের বাবা গুর্খাদের লাইনে কাজ করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ খবর এল, গুর্খা সেপাইরা তাঁকে আক্রমণ করে জখম করেছে। আমার মাড়ওয়ারী বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে ছুটলো গুর্খা

সেপাইদের হাত থেকে তার বাবাকে উদ্ধার করতে। সহরময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। পুলিশের লোকেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বন্ধুর পিতাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। মাড়ওয়ারী বালকের এতখানি সাহস এলো কোথা থেকে?

ভীরু কৃপণ যে অনেক সময় ধন-রক্ষার জন্য তার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, তার দৃষ্টান্তও আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সেই কৃপণ কোন গুণ্ডাকে দেখলে সম্ভ্রমে সালাম করতে করতে দূরে সরে যাবে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে-জিনিষটাকে মানুষ ভালোবাসে তার জন্য বিপদকে বরণ করতে কিম্বা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সে কখনও কাতর হয় না। সুতরাং মানুষকে কোন বিষয়ে সাহসী করে তুলতে হলে তার মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে ভালোবাসা সঞ্চারিত করা দরকার। বাঙালীর মনে যদি জাপানীদের মত দেশপ্রেম জাগে, কিম্বা প্রাচীন আরবদের মত ধর্ম্মপ্রেম জাগে, কিম্বা আধুনিক রাশিয়ানদের মত সমাজতন্ত্র-প্রেম জাগে, তা হলে এই সব ব্যাপারে ঐ সব জাতি সমূহের মতই বাঙালী দুর্দ্ধর্ষ এবং অসম-সাহসিক হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বাঙালীকে যদি দেশের ব্যাপারে অসম-সাহসিক করতে চান, তাহলে তার প্রাণে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করুন।

শরীরের দিক্ থেকে আধুনিক বাঙালী যে ইংরেজ, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতির তুলনায় দুর্ব্বল, সে কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না। তবে এ দুর্ব্বলতাও বাঙালীত্বের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। শ্যামাকান্ত, গোবর প্রভৃতি পাহালওয়ানদের কথা সকলেই শুনেছেন। যে কোন ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে যান, দেখতে পাবেন, যে সব বাঙালী শরীরের চর্চ্চা করেন, শক্তি-সামর্থ্যের দিক্ থেকে তাঁরা কোন দেশের লোকের চেয়ে হীন নন্। যদি স্বাস্থ্যের চর্চ্চা আর শক্তির অনুশীলন দেশব্যাপী হতে থাকে, তাহলে অতি অল্প কালের মধ্যেই বাঙালী এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে!

বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানের স্বাস্থ্য ভালো নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থান ম্যালেরিয়া রোগে জর্জ্জরিত। কিন্তু তার প্রতিকার বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজে করা যেতে পারে। বাঙালীর খাদ্যও হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও বলকারক নয়। তার প্রতিকারও সহজ এবং সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে। মোটের উপর এ কথা বেশ জোর করেই বলা যেতে পারে যে, বাঙালীকে একটা সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ এবং শক্তিমান্ জাতিতে পরিণত করার একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অভাব। তাছাড়া আর কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নাই। সমস্যা যখন জীবন-মরণের, তখন কি আমরা এই ইচ্ছা-শক্তিটুকুর উদ্বোধন করতে পারবো না?

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ, (কেণ্টাব) বার-এট-ল

যোগসিদ্ধি

ভূমিকা

পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় লালিত ও শিক্ষিত আমরা আজ-কাল বড় বেশি র‍্যাশনাল ও বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছি। আমরা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করে, শাণিত যুক্তির কষ্টিপাথরে না কষে না যাচাই করে কিছুই আর মানতে রাজী নই। চিন্তা বা বিচার করি না করি, অন্ততঃ বস্তুতান্ত্রিকতার যুক্তি আউড়ে না মানাটাই হয়েছে মডার্ণিটি বা আধুনিকতার লক্ষণ। সত্যকার খাঁটি র‍্যাশনাল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন তবু ভাল! সে-মন অন্ততঃ নিজের কাছে খাঁটি; তার গভীর চিন্তাশক্তি আছে, সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের সামর্থ্য আছে, তলিয়ে বোঝবার—সত্য আবিষ্কার করবার একটা বৈধ ধারা আছে। সে-মন না যাচিয়ে, না বাজিয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে অনুসন্ধান না করে কোন বস্তু বা তত্ত্বকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে না; সে খাঁটি বৈজ্ঞানিক মন আসলে সংশয়বাদী বা agnostic, নাস্তিকতাকে বলা চলে না। সে অকপটে স্বীকার করে, "ভগবান বা পরমার্থ কি তা' আমি জানি না, আমার বিশ্লেষণ ও বিচারের প্রণালীতে তার অস্তিত্বের পক্ষে কোন যুক্তিই আমি পাই না।"

সচরাচর বুদ্ধিজীবী আধুনিক বাঙ্গালী কিন্তু এ জাতীয় খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক নয়; গভীর চিন্তার সামর্থ্য বা ধৈর্য্য তার নাই। নো-গড হচ্ছে তার ফ্যাসন, মডার্ণ বা আধুনিক হবার হাস্যকর দুশ্চেষ্টা মাত্র। রাশিয়ার সাম্যবাদ থেকে ভারতের পরমার্থতত্ত্ব অবধি কোন গভীর বস্তুই সে তলিয়ে বোঝে না, দশ জন বড় মানুষের দেখাদেখি সে করে পাশ্চাত্ত্যের ঐ বস্তুতান্ত্রিকতার, জড়বাদের এবং সোভিয়েটি-জমের ভাণ বা অনুকরণ। এক জন কার্ল মার্ক্স বা ফ্রয়েডের মত মহাপণ্ডিতে যা শোভা পায়, এই সব নকলনবীশ সফরীদের পক্ষে তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশেও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মহাজ্ঞানী চার্ব্বাক জন্মেছেন এবং অনীশ্বরবাদ প্রচার করে গেছেন; সে জন্য জ্ঞানান্বেষী ভারত তাঁকে অশ্রদ্ধা করে নাই, মহাপণ্ডিত বলে তাঁকে ঋষি-পদ দিয়েছিল; বেদবাদী শঙ্কর ও বেদবিরোধী বুদ্ধ এ দেশে সমান আদরে পূজিত। খাঁটি জিনিষের দাম অনেক।

ভগবান ও সৃষ্টিতত্ত্ব মানুষের কাছে চিরদিনই এক অজানা দুজ্ঞেয় বস্তু। ভূতে বিশ্বাস ও ভগবানে বিশ্বাস—এক হিসাবে অন্ধ বিশ্বাসেরই পর্য্যায়ভুক্ত ব্যাপার। লোক-মুখে শুনে পুঁথিতে শাস্ত্রে পড়ে মানুষ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, আর করে লোক-ভয়ে, লোকলজ্জায়, দশের কাছে নাস্তিক অপবাদের ও লাঞ্ছনার হাত এড়াতে, ধার্ম্মিক সেজে সংসারে সচল থাকবার দায়ে। এ রকম লোক-দেখানো বিশ্বাসের চেয়ে নাস্তিক্যবুদ্ধি হচ্ছে খাঁটি মতবাদ, তার মধ্যে অন্ততঃ কাপট্য নাই। পরকাল বা ভগবান আছে কি নাই, তা' প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কেউ জানে না। তবু কিন্তু অনাদি কাল থেকে ভগবদ্-বিশ্বাস মানুষের মন-প্রাণ জুড়ে অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। এ বিশ্বাসের কিছু লোক-দেখানো দায়ে ঠেকা হতে পারে, কিন্তু সবটুকু নয়। দুজ্ঞেয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান এবং অনুরাগ আমরা

আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে খুঁজে পাই। এই সৃষ্টিরহস্তের পারে, মায়ার পর্দার অন্তরালে উঁকি মেরে দেখার দুরন্ত লোভ মানুষের অন্তরে মরেও মরে না। যার মধ্যে কিছু পদার্থ ও মনুষ্যত্ব আছে, সে আহার-নিদ্রা-মৈথুনরূপ স্থূল দেহধর্ম্মেই শুধু তুষ্ট থাকতে পারে না; তার অন্তরে সতত ধিকি-ধিকি জ্বলে ভূমার ও তুরীয়ের ক্ষুধা "নাহল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্", এই হচ্ছে মহত্তের লক্ষণ। চার্ব্বাক মুনিও গভীর চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন, জড়বাদের তিনিই আদি-পিতা; বহু চিন্তা ও বিতর্কের পর শাস্ত্র হিসাবে তিনি অনীশ্বরবাদ স্থাপন করে গেছেন।

শুধু দুর্জ্ঞেয়ের রহস্যই মানুষকে টানে না, পূর্ণতা বা চরম পরাকাষ্ঠার দিকেও আছে মহৎ মনের দুরন্ত লোভ। এই উন্নতির পরাকাষ্ঠার আকর্ষণ থেকে জন্মেছে সকল আদর্শবাদ, কলা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই। জীবনে দুঃখ অভাব জরা মরণ আধি-ব্যাধিকে এড়াতে মানুষের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। সুখপতঙ্গ মানুষ চায় নিছক সুখ, নিরঙ্কুশ শ্রীবৃদ্ধি, অপর্য্যাপ্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ। এইখানেই উন্নতিকামী বলে প্রগতিশীল বলে মানুষ পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে-মানুষে এই পূর্ণত্বের ক্ষুধা ভূমার টান যত কম, সেই মানুষের আধার তত ক্ষুদ্র, তার প্রকৃতি তত তামসিক ও অকর্ম্মণ্য; শুধু দেহের তাগিদ, স্থূল মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন নিয়েই যার কারবার, তাতেই যার তৃপ্তি ও সুখ, সে ততই পশুত্বের স্তর ঘেঁষে আছে; তার সত্তার হয়তো চার-আনা পশুযোনি ছাড়িয়ে মানবী স্তরে উঠেছে, বাকি বারো আনা আছে অন্ধ অবচেতনার স্তরে ডুবে—মানবতার দিকচক্রবালের নীচে।

তা' হলেও আমাদের এই সহজ ভোগময় জীবনও বাজে নয়, নিরর্থক নয়। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে ও ক্রমোন্নতিতে এরও আছে বৃহৎ স্থান, অপরিহার্য্য প্রয়োজন। মুকুল থেকে ফুলে, ফুল থেকে ফলে, ফল থেকে বীজে হয় উদ্ভিদের ক্রম-পরিণতি, তা' বলে কি মুকুল বা ফুল ভুল? অরূপের এইরূপ আশ্চর্য্য রূপ-গ্রহণ কি পরিহাস না নিরর্থক? জীবনের মহাকাব্য যে জ্ঞানী ধীর চিত্তে সংস্কারমুক্ত বিচারশীল মনে পাঠ করেছেন, তিনিই জানেন এই লীলায়িত প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ পরিপূর্ণতা, এর গূঢ় হেতু ও অন্তর্নিহিত রহস্য; এর একটি বর্ণও বৃথা অর্থহীন নয়।

সহজে ও সুলভে মানুষের তৃপ্তি নাই। সে স্বভাবতঃই খোঁজে দুর্লভকে, দুর্গমকে, অপরিচিত অজানা রহস্যের গূঢ়তাকে, দুষ্প্রাপ্যের সাধনা ও সিদ্ধিকে। এই রহস্যানুগ বৃত্তিই জন্ম দিয়েছে আধুনিক পরমাশ্চর্য্য জড়-বিজ্ঞানের, গভীর অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের—পরমার্থের। দুষ্প্রাপ্যের সন্ধানে যাত্রা করেই ক্রমশঃ বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে বেড়ে চলেছে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র, আনন্দের পুঁজি, শক্তির ভাণ্ডার। এই দুর্জ্ঞেয় ও দুর্লভের টানে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে মানুষকে [illegible] থেকে মানবত্বে, মানবত্ব থেকে মহা-মানবত্বে বা দেবত্বে। এমনি করেই মানুষ উঠছে আপনার গণ্ডী ছাড়িয়ে নিজেরই নিগূঢ় মহিমা ও পূর্ণত্বের তুঙ্গ শিখরে। জীবনই হচ্ছে সেই বিকাশ, সেই ক্রমপ্রস্ফুটন, সেই উর্দ্ধগতির ধারা।

মানুষের এই আত্মানুশীলনই আবার যোগ। প্রাণ-ভয়ে ভীত একটি ছোট্ট মাছ এসে ধ্যানমগ্ন ঋষির কাছে চাইলো আশ্রয়; ঋষি তাকে তুলে রাখলো তার কমণ্ডলুর জলে। তার পরের দিন দেখা গেল সেই মৎস্য-শিশু আয়তনে বেড়ে ক্ষুদ্র কমণ্ডলুটি ছাপিয়ে উঠেছে। তখন ঋষি তাকে নিয়ে ছেড়ে দিল জলাধারে বা চৌবাচ্চায়। বাড়তে বাড়তে মাছ সে পাত্র ভরে ছাপিয়ে উঠতে তাকে রাখা হলো পুষ্করিণীতে। পুষ্করিণী ভরে সাগর ছাপিয়ে যখন মাছ চাইলো ঋষির কাছে আশ্রয়, তখন হতবুদ্ধি ঋষি বুঝলো, এই মাছ কি পরম অনির্ব্বচনীয় বস্তু! মানুষেরও ক্রমোন্নতির ইতিহাস ঠিক এই রকম, অন্তরে-বাহিরে, উর্দ্ধে-নিম্নে তার অলক্ষ্য সত্তা আছে বিশ্বভুবন জুড়ে। তার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের শেষ কোথায়!

এই ক্রমোন্নতির গোড়ার দিকটা মূঢ় অচেতন; শেষের দিকে সেই গতি ও ক্রম-পরিণতি হয় ক্রমশঃ জাগ্রত, চেতন self conscious; ক্রম-সঙ্কুচিত হয়ে, অবগুণ্ঠিত হয়ে সেই সম্বিৎ হয়েছিল জড়; ক্রমশঃ বিকাশের ধারায় জড় থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে বুদ্ধিজীবী মানুষে সেই অবগুণ্ঠিত শক্তি ফুটে চলেছে কুণ্ডলিত মহানাগের মত মুকুলিত শতদল পদ্মের মত—আপন সম্বৃত মহিমাকে, শক্তি ও আনন্দকে, জ্ঞান ও দৃষ্টিকে মেলে মেলে, বিস্তৃত করে করে। অজ্ঞানকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, Hcoded Gnosis—জ্ঞানের চেতনায় কুণ্ডলিত মহানাগ, রাহুকবলিত চন্দ্র। আপন মায়ায় আপনাকেই ঢেকে শিব হয়েছে জীব; সংস্কারের বা ক্ষুদ্র জীব-ধারণার গ্রন্থি খুলে খুলে আবার সেই জীবই হবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শিব।

তরঙ্গটি সাগরে জেগে উচ্ছসিত বিকসিত হতে হতে সেই সাগরের বুকেই ভেঙ্গে হচ্ছে একাকার। অহঙ্কার এই তরঙ্গ। সে জেগেছে—দুলে উঠেছে চিৎসাগরেই, আছে এবং লীলায়িত হচ্ছে সেই সাগরকে ছুঁয়েই, তারই বক্ষে একাঙ্গ থেকে। এইটুকু পুনরাবিষ্কারের চেষ্টাকেই যোগ-সাধনা বলে। এই বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের, অরূপের সহিত রূপের নিত্য মিলনকে, ছায়ার কায়ানুগতাকে বুঝে প্রত্যক্ষ দেখে ও পেয়ে তাতে স্থিত হয়ে হয় যোগসিদ্ধি। অবুঝ জড়বুদ্ধি মানুষকে একটি সান্ত্বনার অবলম্বন দেবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের, পূজা পার্ব্বণের বহিরঙ্গ পরিচ্ছদের। স্থূলদর্শী মানুষ তারই নাম দিয়েছে ধর্ম্ম; তার সঙ্গে মনগড়া বিধি-নিষেধের ও নীতিবাক্যের অনুশাসন জুড়ে তাকে ভুল করেছে পরম পুরুষার্থ বলে। যোগ বা পরাধর্ম্ম কিন্তু আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ ধর্ম্মের বা নৈতিক অনুশাসনের সমষ্টি আদৌ নয়। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম সত্যের সোপান, যোগ তার সিংহদ্বার।

মানুষ তার সমাজকে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন ও ভোগসুখকে নিজের ছন্নছাড়া উন্মার্গগামী অতি-লালসা থেকে নির্বিঘ্ন ও নিরঙ্কুশ রাখবার জন্য সৃষ্টি করেছে নীতিধর্ম্মের! এই নীতির অনুশাসন মেনে চললে সামাজিক জীবনে আসে সুন্দর শৃঙ্খলা, সজ্ঘবদ্ধ সংযমে ও পরিমিত ভোগে বেড়ে চলে জাতির ও সমাজের স্বাস্থ্য ও ঐহিক কল্যাণ। তার লোলুপ হিংস্র অধোচেতনায় পশু ও পিশাচকে মুখোস পরিয়ে দমনে রেখে মানুষ তার জীবনকে গুছিয়ে নেয়, সেই শৃঙ্খলার পথে সংযত বিহারের পথে সে তখন অনায়াসে চলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিমুখে। আর বৃহৎকে, তার অন্তরের ভূমা ও, অখণ্ডকে —দেশকালের অতীত মন-বুদ্ধির অগম্য তত্ত্বকে গোড়ায় ধারণা করতে পারবে না বলেই সাধারণ অজ্ঞ জড়বুদ্ধি মানুষকে দেওয়া হয়েছে মন্দির, বিগ্রহ, তীর্থ ও অনুষ্ঠান। দেবতায় ভয়-ভক্তিতে স্বর্গবাসের ও পুণ্যসঞ্চয়ের প্রলোভনে মানুষ চলে একটা সুশ্রী স্বচ্ছন্দ

সংযত জীবনের ছন্দে। আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ এইটুকু ধর্ম্মের বড লাভ। তা-ছাড়া রূপের পিছনেই আছে অকূল অসীম অরূপ, ধ্বনির অন্তরেই আছে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড নীরবতা, ক্ষুদ্র রসের পিছনেই আছে অখণ্ড অথৈ রস-সিন্ধু—আনন্দ-জলধি। তাই ভালো করে রূপকে ধরতে পারলেই নামের অন্তরে ডুব দিতে পারলেই অরূপে ও অনামীতে পৌঁছানো যায়। তাই আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ ধর্ম্ম ও পরমার্থ ধর্ম্মের সোপান ; এ পথও হেয় বা উপেক্ষার নয়। স্থূলকে ধরেই সূক্ষ্মের ও কারণের অভিমুখে যাওয়া সহজ—"রূপ সেথা অরূপের দুয়ার খুলে দেয়।"

যোগধর্ম্ম কি? "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি নিগূঢ় গুহাহিত বস্তু। সে দুর্লভ আত্মতত্ত্বকে "ন তপসা ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—কঠিন তপস্যা বা তীক্ষ্ণ মেধা বা বহু শাস্ত্রাধ্যয়নেও পাওয়া যায় না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুষ্প্রাপ্য তত্ত্ব বলেই যোগপথ দুর্গম ও বিঘ্নসঙ্কুল ; তাই যোগধর্ম্ম বলে ভুল করে স্থূলদর্শী মানুষ কত কিছু বস্তুকে ধরে আর ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় সারাটা জীবন ঘুরে মরে ; এ দুর্লভ পরম ধন লাভ করা তাদের ভাগ্যে হয়তো একেবারেই ঘটে ওঠে না। অন্তরে খাঁটি ত্যাগ নাই, বাহিরে গৈরিক রুদ্রাক্ষ সম্বল, অন্তরে এক কণা সূক্ষ্মানুভূতি নাই অথচ বাহিরে জটাজুট বাঘছালধারী, অন্তরে পরম পবিত্র পাবন তত্ত্বের জ্ঞান নাই অথচ বাহিরে পট্টবস্ত্রধারী চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ মুহুর্ম্মুহু মন্ত্র-শ্লোক-উচ্চারণকারী। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ বহু তথাকথিত সাধু ব্রাহ্মণ ধাম্মিককে সংসারে বিচরণ ও লোকরঞ্জন করতে দেখি। আবার এদের কেন্দ্র করে হাজার হাজার শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষ তত্ত্বানুরাগের বশে এমন দুর্লভ মানবজন্মটা বৃথা চেলাগিরি করে কাটিয়ে দিচ্ছে—"অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।" তত্ত্বান্বেষী হয়ে ভগবানকে সৃষ্টির মূল রহস্য ও উপাদানকে যদি নাই বুঝলাম ও লাভ করলাম তা' হ'লে চেলাগিরী ও গুরুগিরী দুই-ই ব্যর্থ। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠা মীরা দেবী তাঁর অনুপম ভজনে বলে গেছেন, "দুধ খেয়ে থাকলেই যদি হরিকে পাওয়া যেতো তা' হলে সংসারে বহু গোবৎস ও শিশু আছে ; নারী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকলেই যদি হরিলাভ হতো, তা'হলে জগতে বহু হিজড়া নপুংসক আছে, অহিংস তৃণাহারী হয়েই যদি ভগবৎলাভ হতো তা' হলে পৃথিবীতে বহু ছাগল পাঁঠা আছে।" প্রেম ব্যতিরেকে নন্দকিশোরকে পাওয়া যায় না। সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও আত্মদানেই সে পরম সম্পদ্ লাভ ঘটে। অহিংসা সত্য আস্তেয় আদি আত্মশুদ্ধিকর উপায়কে এবং বহিরঙ্গ কঠিন ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে কঠিন সংস্কারে আঁকড়ে ধরে তারই ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে বহু অমূল্য জীবন এই সত্যানুসন্ধানের পথে কেটে গেছে ; সত্য মেলে নাই।

যাঁরা প্রথম এই দুরূহ পথে তত্ত্বলাভের আশায় যাত্রা সুরু করেছেন, তাঁদেরই জন্য ছত্রিশ বৎসরের সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে এই যোগসিদ্ধি বইখানি লেখা। আমি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যোগসিদ্ধ গুরুর দেখা পাই, তাঁর স্পর্শে অপক্ব মলিন আধারে আমার প্রথম সূক্ষ্মানুভূতি আরম্ভ হয় ; এই তত্ত্বস্ফুরণকেই বলে সাধন-দীক্ষা। তার পর নানা বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে ভোগের দুর্দ্দমনীয় টান কাটিয়ে এই চৌষট্টি বছর বয়সে পরমার্থ-পথে সাক্ষাৎ দর্শন ও অনুভূতির মাঝে যেটুকু এগিয়েছি তাকে পরমধামের সিংহদ্বার মাত্র বলবো। সে অখণ্ড মুক্তির আনন্দ-রাজ্যে পূর্ণপ্রবেশ ও পাকা ভিত্তি লাভ ঘটে নাই। এ পথের বাধা-বিঘ্ন, প্রকৃত সাধক ও গুরুর লক্ষণ, সাধনা ও দীক্ষা, আচার বিচার, পথের বৈচিত্র্য, মুক্তি ও সিদ্ধি সম্বন্ধে এই "যোগসিদ্ধি" থেকে পথ চলার জ্ঞান ও কিঞ্চিৎ পাথেয় সঞ্চয় করতে পারবেন, তা' হ'লে ঝুটা গুরুর হাতে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকবে কম, নিজেকে পরখ করে নেবার এবং ঠিক পথে সজ্ঞানে এগিয়ে যাবার সামর্থ্য বাড়বে। গীতায় বলছে,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি কৌন্তেয় কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

"হাজার হাজার মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কেহ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্নবান হয় এবং এমন হাজার হাজার চেষ্টারত সাধকের মধ্যে কচিৎ কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানে।" ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম এই পথের সশঙ্ক অনভিজ্ঞ যাত্রীগুলির হাতে আমি তুলে দিলাম একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ, যাতে তাঁরা পথ দেখে চলতে সমর্থ হন!

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

লাভোয়াসার

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে, ২৬শে অগষ্ট তারিখে পারী সহরের এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তশালী পরিবারে লাভোয়াসার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এক জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন এবং পুত্রের শিক্ষার দিকে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। ইহার ফলে পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি ও গবেষণার মধ্যে এক সতেজ সত্যের প্রভাব বিদ্যমান দেখি। তাঁহার গবেষণার ভিত্তি ছিল সত্য ও নিষ্ঠার উপর।

পিতার ইচ্ছায় তিনি প্রথমে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলেন ; পরে তাহা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানে বিশেষতঃ রসায়নে তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ দেখা দিল।

লাভোয়াসারের গবেষণা সম্বন্ধে লিখিতে গেলে সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। লাভোয়াসার সম্বন্ধে ("History of Chemical Theory" (১৮৬৯) নামক পুস্তকে বুর্টস্ লিখিয়াছেন—"Chemistry is a French Science. (La chimie est Une Science francaise). It has been founded by Lavoisier of immortal memory." অর্থাৎ রসায়ন ফরাসী বিজ্ঞান। অমর লাভোয়াসার কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত হইয়াছে।' এ-কথা অত্যুক্তি নয়। তাঁহাকেই বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

লাভোয়াসারের গবেষণার প্রথম বিষয় ছিল "প্লাষ্টার অব্ প্যারী" (Plaster of Paris) সম্বন্ধে। ইহা হইতে পাথরের মূর্ত্তি প্রভৃতির ছাপ তৈয়ারী হইয়া থাকে। জিপ্‌সাম্ (Gypsum) নামে ক্যাল্‌সিয়াম্ ধাতুর একটি আকরকে (Ore) ১২০° সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস্ তৈয়ারী করিতে হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঞ্চ একাডেমী অফ্ সায়েন্স নামে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই বিষয়টি প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "প্রতিভার শত মুখ। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সমুজ্জ্বল করে।" লাভোয়াসারের প্রতিভায় ফরাসী জাতি নানা বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী লা প্লাস (La Place)-এর সাহচর্য্যে সর্ব্বপ্রথম ক্যালোরিমিটার যন্ত্র—যাহা দ্বারা কোন দ্রব্যের তাপের পরিমাণ জানা যায়—সৃষ্টি করেন।

Orleanais সভার সভারূপে তিনি দেশে ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সুরেন্স ও করের আইন (Tax-law) প্রভৃতির নানা সুবিধা ও ইহাদের ব্যবহারের প্রচার ও প্রচলন করেন।

কৃষি গঠনমূলক সভার পরিচালনা-কালে তিনি ফরাসী দেশের কৃষি-ব্যবসায়ের বহু উন্নতি-সাধন এবং আলু-বিটপালং প্রভৃতির চাষের প্রবর্ত্তন করেন।

আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যে সমস্ত ওজন [যথা গ্রাম (Gram) ও মাপ যথা মিটার (metre)] ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার নিরিখ (standard) ফরাসীদেশস্থ Severes সহরের "International Bureau of weights and measures"-এর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ওজন ও মাপের নিরিখ লাভোয়াসারের অনুমোদিত পন্থায় প্রবর্ত্তিত এবং তিনিই এই নিরিখের রচয়িতা।

লাভোয়াসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান "Law of conservation of matter"—অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন বস্তুর ক্ষয় নাই। কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় বস্তু বা জড় অবিনশ্বর থাকে। তদানীন্তন কালে এ-বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করিতেন,—কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের সম্মুখে তিনি পরীক্ষা করিয়া ইহা অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন।

সে কালে তাপকে বৈজ্ঞানিকেরাও বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন; এবং ইহার ওজন আছে, ইহাই ছিল সকলের ধারণা। লাভোয়াসার একটি বন্ধ কাচ-কূপীতে (Flask) টিন গরম করিয়া দেখাইলেন যে, তাহার ওজনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। তিনি প্রচার করিলেন যে, তাপ বাস্তব পদার্থ বটে, তবে তাহার ওজন নাই (imponderable matter)। লাভোয়াসারের এই ধারণা উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাপকে বর্ত্তমান যুগে এক-প্রকার শক্তি (energy) বলা হয়।

রাসায়নিক গবেষণায় তুলাদণ্ডের প্রয়োজনীতা তিনিই প্রথম প্রচার করেন।

"Phlogiston theory" অগ্রাহ্য করিয়া লাভোয়াসার বলেন যে, যখন দাহন-ক্রিয়া ঘটে, তখন অম্লজানের সাহায্যেই তাহা ঘটিয়া থাকে। Phlogiston বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই, ইহা কল্পনা মাত্র। রাসায়নিক ক্রিয়ায় অম্লজানের কার্য্যকারিতাও তিনি প্রথম প্রচার করেন।

দাহন-ক্রিয়ার সহিত সকলের পরিচয় আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কি, কেহই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বেকার (Becher) ষোড়শ শতাব্দীতে "Phlogiston theory" দ্বারা দাহন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে, যখন কোন জিনিষ ভস্ম করা হয়, তখন সেই জিনিষ হইতে অগ্নিশিখারূপে "Phlogiston" নির্গত হয়। যে ভস্ম থাকে, তাহার ওজন হইবে —সে জিনিষের ওজন হইতে Phlogistonএর ওজন বাদ দিলে যা' বাকী থাকে, তাই। অর্থাৎ সেই জিনিষ ও ভস্মের ওজনের প্রভেদই Phlogistonএর ওজন। এই মতে, যে-জিনিষ সহজে জ্বলিয়া যায় এবং যাহার ভস্মাবশেষ খুব কম থাকে (যথা, তেল, কাঠ),—সে সব জিনিষের মধ্যে অনেক বেশী Phlogiston থাকে; আর যে-সব জিনিষ খুব বিলম্বে জ্বলিয়া থাকে ও যার অনেক বেশী ভস্মাবশেষ থাকে, তাহাতে "Phlogiston"এর পরিমাণ অল্প। এই মতে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু গোল বাধিল যখন দেখা গেল, অনেক জিনিষ (বিশেষতঃ ধাতু) ভস্ম করিলে ভস্মের ওজন বাড়িয়া যায়। বেকারের মতে, কোনো জিনিষ ভস্ম করিলে সে-ভস্মের ওজন সব সময়েই কম হইবে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ধাতুর গবেষণা-কালে প্রিষ্টলি পারদ-ভস্ম অর্থাৎ মারকিউরিক অক্‌সাইড হইতে উন্নতোদর পরকলার (double-convex lens) সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি ফোকাস্ করিয়া উত্তাপ উৎপাদনপূর্ব্বক পারদ ও একটি গ্যাস পাইলেন। সেই গ্যাসটির তিনি নাম দিলেন Dephlogisticated air (Phlogiston-হীন বায়ু)। তিনি একটি মোমবাতি লইয়া দেখিলেন যে, ঐ গ্যাসের সংস্পর্শে বাতির শিখা আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এই আবিষ্কারটি "Phlogiston theory"র সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, যখন মোম-বাতির শিখা উক্ত গ্যাসে উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়াছে, তখন মোমবাতি হইতে নির্গত "Phlogiston" সহজে ঐ গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং ঐ বায়ুতে Phlogiston ছিল না এবং সেই জন্যই ইহাকে Dephlogisticated air বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু পারদভস্ম হইল "Phlogiston"-হীন পদার্থ; কি উপায়ে ইহা "Phlogiston"এর সাহায্য ব্যতিরেকে পারদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—প্রিষ্টলি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

দুইটি বিষয়ে এই আবিষ্কারটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ "Dephlogisticated air" বা অক্সিজেনের (Oxygen) আবিষ্কার; দ্বিতীয়তঃ পারদভস্ম হইতে পারদের উদ্ভাবন।

এই ব্যাপার দেখিয়া লাভোয়াসার চিন্তা করিলেন যে, যখন কোন কোন জিনিষ ভস্ম করিলে তাহার ওজন বাড়ে, তখন বাতাসে সংশ্লিষ্ট কোনো জিনিষের সহিত নিশ্চয়ই ইহা মিশিয়া থাকিবে। তিনি একটা বন্ধ কাচপাত্রে পারদ রাখিয়া তাহার ওজন এবং তাহাতে উত্তাপ দান করিলেন। কিছু কাল পরে পারদ একটা লাল গুঁড়ায়—অর্থাৎ মারকিউরিক্ অক্‌সাইডে (Mercuric Oxide) পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরিবর্ত্তন শেষ হইলে তিনি আবার ওজন লইলেন। ওজন লইয়া দেখিলেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তখন তিনি ঐ কাচপাত্রে ছিদ্র করিলেন; ছিদ্র করিবামাত্র খানিকটা বাতাস হুস্ করিয়া কাচপাত্রে প্রবেশ করিল। ওজন করিয়া দেখিলেন,

যে, কাচপাত্রটির ওজন বাড়িয়াছে। তাহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে, পাত্রের মধ্যস্থিত খানিকটা বাতাস পারদের সহিত মিলিত হইয়া এই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইয়াছে। ঐ কাচপাত্রটি আরও উত্তপ্ত করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহা হইতে একটি গ্যাস নির্গত হইতেছে; সে-গ্যাসের সহিত প্রিষ্টলি-আবিষ্কৃত গ্যাসের সাদৃশ্য আছে। তিনি ইহার নাম দিলেন "অম্লজান" (Oxygen)। এই গ্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া পরে দেখিলেন যে, এ গ্যাস বাতাসেও বিদ্যমান আছে; পরে অনেক পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, এই গ্যাস ভিন্ন দাহন-ক্রিয়া হইতে পারে না; এবং কোন জিনিষ যে বাতাসে জ্বলিয়া থাকে, তাহার কারণ বাতাসে "অক্সিজেন" আছে, তাই। এই ভাবে লাভোয়াসার দাহন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিজেকে অম্লজানের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং প্রিষ্টলির যশ অপহরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রিষ্টলিকেই আমরা অম্লজানের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া থাকি।

বস্তুকে লাভোয়াসার এমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন যে, সে শ্রেণী-বিভাগকে বর্ত্তমান যুগের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদের গোড়া-পত্তন বলা যাইতে পারে। এ শ্রেণীবিভাগ নির্ভুল। শুধু ক্লোরিন্ গ্যাসকে যে তিনি যৌগিক পদার্থ বলিয়াছিলেন, পরে তাহা মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। তা ছাড়া মৌলিক পদার্থের নামকরণ তাঁহারই অনুমোদিত ও প্রচলিত রীতিতে হইয়া থাকে।

লাভোয়াসারের বিজ্ঞান-চর্চ্চা শুধু রসায়ন-শাস্ত্রেই কেন্দ্রীভূত ছিল না,—শরীর-তত্ত্বেও তাঁহার অনেক অমূল্য দান ও গবেষণা আছে। বস্তুতঃ, তাঁহাকেই শরীর-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

লাভোয়াসার প্রথমে খাদ্য-পরিপুষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। যদিও পরবর্ত্তী কালে তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে —তথাপি এ বিষয়ে তিনিই কর্ণধার। তিনি প্রচার করিলেন যে, প্রাণীর জীবনী-শক্তি অম্লজান দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ফুস্-ফুসে বাতাস প্রবেশ করিয়া কার্ব্বন ডায়োক্সাইড্ ও জল সৃষ্ট করে এবং এই রাসায়নিক ক্রিয়াই শরীরে উত্তাপ রক্ষা করে। তিনি মানুষের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস লইয়া গবেষণা করেন। এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নিশ্বাসের সময় কতটা গ্যাস সেবন করে এবং প্রশ্বাসের সময়ে কতটাই বা ত্যাগ করে—তাহার ওজন করেন। তিনি বলেন, কার্ব্বনের সহিত শতকরা ৮১ ভাগ অক্সিজেন মিলিত হইয়া কার্ব্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে এবং বাকি ১৯ ভাগ অক্সিজেন শরীরস্থ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলের সৃষ্টি করে। এইরূপে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য-পরিপুষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি বলেন—*

(১) এক জন মানুষ ২৬° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে প্রতি ঘণ্টায় ১২০০ Pouces de France অক্সিজেন গ্রহণ করে। আর যখন উত্তাপ কম থাকে, তখন বেশী অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ব্যায়ামের সময় ইহার প্রায় তিন গুণ অর্থাৎ ৪০০০ Pouces প্রতি ঘণ্টায় অক্সিজেন প্রয়োজন হয়।

(২) খাদ্য-পরিপাকের সময় প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০—১৯০০ Pouces de France অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

লাভোয়াসারের অনেক খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা আচার্য্যের সহিত গবেষণায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। তথাপি এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, মাদাম লাভোয়াসারও তাঁহাকে নানা দিক্ হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। লাভোয়াসারের যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের চিত্রাঙ্কন তিনিই করিয়া দিতেন! কখনও বা গবেষণাগারে গিয়া শ্রুতিলিখন লইতেন এবং গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করিতেন। এসব ছাড়া তাঁহার যশে ও ভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া যখন তাঁহার সহকর্ম্মীরা রাজ-দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করিত, তখন লাভোয়াসার বিচলিত এবং বিমর্ষ হইয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেন। সেই সময় এই সাধ্বী রমণী তাঁহার বিক্ষোভ দূর করিয়া নূতনতর কার্য্যে ও গবেষণায় তাঁহাকে অনুপ্রেরিত করিতেন। যদিও কোন বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনী মাদাম লাভোয়াসারকে কোন দিন স্মরণ করিবে না, তবু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভোয়াসারের গবেষণায় তিনি ছিলেন শক্তির উৎস।

লাভোয়াসার যে সময়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পে স্বীয় একাগ্রতা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বদেশহিতৈষিতার দ্বারা জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে ফরাসী দেশবাসীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির প্ররোচনায় এক অতীব শোচনীয় ও পাশবিক প্রবৃত্তির উদ্দাম লীলা জাগিল। দেশবাসীদের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির মিথ্যা অভিযোগ ক্রমশঃ প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তার পর সকলে এক দিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে, তখন তাহারা বিবেচনা করিয়া কাজ করে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। প্রতিহিংসাপিপাসু বিদ্রোহী নায়কেরা উন্মত্ত জনগণের সম্মুখে তাঁহাকে দেশ-শত্রু বলিয়া মস্তকচ্যুত করিয়া হত্যা করিল (১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ)। Lagrange আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে-মস্তকের স্থান অধিকার করিতে হয়তো এক শতাব্দী লাগিবে, তাহাকে শেষ করিতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে নাই!

যদিও বিংশ শতাব্দীতে কোন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের প্রাণদণ্ড হয় নাই সত্য, তথাপি সময় সময় রাজনীতিজ্ঞদের নিকট তাঁহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হন না। ইহার ফলে মনীষী আইন্স্-টাইন, শ্রোয়ডিংগার ও ফ্রয়েডকে নাৎসীবাদী জার্ম্মাণী হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। এক দিন যেমন ফরাসীরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া এবং প্রজাতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনো প্রয়োজন নাই (La Republique n´a pas des savants) বলিয়া বহু নিরীহ দেশবাসীর হত্যাসাধন করিয়াছিল, ইহারা তেমনি আজ "New Order" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া কু-কীর্ত্তি ঢাকিতে চায়!

শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্র (এম্-এস্-সি)

* Science and Culture vol ix No 7, Page 275। শ্রদ্ধেয় ডক্টর এন-আর-ধর মহাশয়ের লেখা হইতে ঐ চিহ্নিত অংশ আংশিক ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

স্রোত বহে যায়

(উপন্যাস)

২৩

কলেরা! নাম শুনিলে প্রাণ উড়িয়া যায়!

যে করিয়া সরস্বতী আসিয়া এ-বাড়ীতে পা দিল···বুকের মধ্যে যেন বৈশাখী বাজ হাঁকিতেছিল! সঙ্গে ছিল কদম; তার সঙ্গে একটিও কথা নাই! কেবলি মনে হইতেছিল, যদি গিয়া দেখি···

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে চিন্তার জাল-বোনার আর অন্ত ছিল না। ভাবিতেছিল, যদি না বাঁচে, এ-জন্মের মতো ও বাঁচিয়া যাইবে! কি সুখে বৌয়ের বাঁচা! তপস্যা করিয়া মেয়ে-জন্মে যা-কিছু পাইবার, সকলই পাইয়াছিল! সব পাইয়াও বিন্দুমতীর মতো দুঃখ কোন্ মেয়ে পায়! মনে পড়িতেছিল রামায়ণের সীতাদেবীর কথা···

মেঝেয় একখানা মাদুর বিছাইয়া তার উপর বিন্দুমতী পড়িয়া আছেন ···দু'চোখ মুদ্রিত! মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে! সরস্বতী আসিয়া বিন্দুমতীর বিছানার পাশে একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে কপালে হাত রাখিল···ঠাণ্ডা যেন বরফ! কিন্তু প্রাণটা আছে!

সরস্বতী ডাকিল—বৌ···

বিন্দুমতী চোখ মেলিয়া চাহিলেন···ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

বিন্দুমতীর মুখে মলিন হাসি···বলিলেন—খপর পেয়েছিলি না কি?

—হ্যাঁ। রাখাল গিয়ে খপর দিলে।

—বাঁদর! কে ওকে যেতে বলেছিল, জানি না! ওখানে অত বড় যজ্ঞি!

বিন্দুমতীর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সরস্বতী বলিলেন—কথা কয়ো না···ঘুমোও। ডাক্তার নিয়ে সুশীল এখনি আসছে!

—ভয় নেই। এর মধ্যে যাবো, এমন ভাগ্য সত্যি করিনি রে! বিন্দুমতী আবার চক্ষু মুদিলেন।

সরস্বতী চাহিল কদমের পানে। দরজায় কাঠ হইয়া কদম দাঁড়াইয়া আছে। সরস্বতী বলিল—তুই আর এ সব ছুঁসনি, মা। আমি আছি···ডাক্তার নিয়ে সুশীলও আসছে···তুই বরং যা, খোকা ও-ঘরে আছে, ঘুমোচ্ছে, তুই গিয়ে তার কাছে থাক্ মা!

কদম বলিল—কেমন দেখছো পিসিমা?

—এ-রোগের কথা কিছুই বলা যায় না মা। তবে যতখানি ভয় হয়েছিল···তেমন নয় হয়তো!

বিন্দুমতী আবার চোখ চাহিলেন···বলিলেন—কিছু নয় রে! সারাদিন উপোস করে আছি···বিকেল থেকে কেমন গা বমি-বমি করে বমি আরম্ভ হলো···সেই সঙ্গে পাঁচ-সাত বার ভেদ।

সরস্বতী বলিল—আগে লোক পাঠালে না কেন বৌ?

বিন্দুমতী বলিল,—ভাবলুম, অম্বল। যেমন আমার হয় চিরদিন, জানিস তো। শেষের বার ঘরে আসতে পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম···রাখাল এসে তুলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

সরস্বতী বলিল—তার পর?

বিন্দুমতী বলিল—তার পর আরো একবার গিয়েছিলুম। চাল-ধোওয়া জলের মতো···

সরস্বতী বলিল—থাক্, কথা কয়ো না। চুপ করে শুয়ে থাকো দিকিনি।

সুশীল আসিল। সঙ্গে ডাক্তার বঙ্কু বাবু। দেখিয়া বঙ্কু বাবু বলিলেন—বোধ হয় ভয়ের তেমন নয়! অম্বলের রোগ আছে ওঁর, তার উপর উপবাস···তারি দরুণ···

সুশীল বলিল—তাহলেও আপনাদের এখন যে সব ব্যবস্থা হয়েছে···স্যালাইন-ইনজেক্সন?

বঙ্কু বাবু বলিলেন—কম্পাউণ্ডারকে বলে এসেছি···সমস্ত সরঞ্জাম-পত্তর নিয়ে এখনি সে আসছে। সে এলেই···

সুশীল বলিল—রাত্রে আপনাকে আর ছাড়বো না ডাক্তার বাবু। যতক্ষণ না সুরাহা হয়, বুঝলেন?

বঙ্কু বাবু বলিলেন—নিশ্চয়।

ভয়ের তেমন কিছু নাই বলিয়া বঙ্কু বাবু আশ্বাস দিলেও শেষ-রাত্রে অসুখ বাঁকা পথ ধরিল।···কম্পাউণ্ডার উপস্থিত ছিল। বঙ্কু বাবু দিলেন স্যালাইন-ইনজেকশন; এবং মৃত্যুর সঙ্গে বেশ খানিকটা সংগ্রাম চলিল।

সকালে আটটা-বেলায় মাখন গাঙ্গুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরস্বতীকে বলিলেন—কি খপর সরো?

সরস্বতী দ্বারের সামনে আসিল···মৃদু কণ্ঠে বলিল—ডাক্তার বাবু কি বললেন?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—ডাক্তার যাই বলুক, তুই কেমন দেখছিস্?

সরস্বতী বলিল—আমরা খুব সময়ে এসেছিলুম দাদা। শেষরাত্রে বেশ বাড়াবাড়ি গেছে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—হুঁ···

সরস্বতী বলিল—ডাক্তার বাবু বলছেন, এখনো কিছু বলা যায় না। তবে আশা নেই, তা নয়!

—কথা কইছেন?

—কয়েছিল আমি যখন এসেছিলুম, আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল। বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে···বিয়ে হয়ে গেছে কি না? আমিই কথা কইতে দিইনি।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—হুঁ···

মাখন গাঙ্গুলি আসিয়া দাঁড়াইলেন বিন্দুমতীর ঘরে···বিছানার সামনে।

মাদুর ফেলিয়া দিয়া সরস্বতী তোষক টানিয়া ভালো করিয়া বিছানা পাতিয়া দিয়াছে; সেই বিছানায় দেহ যেন পাত হইয়া পড়িয়া আছে!

সরস্বতীর মনে একটা লোভ দুর্বার হইয়া উঠিল। বিন্দুমতীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া সরস্বতী ডাকিল,—বৌ···

চোখ বুজিয়াই বিন্দুমতী সাড়া দিলেন—উঁ!

সরস্বতী বলিল—দাদা এসেছেন···তোমাকে দেখতে।

বিন্দুমতী বলিলেন—হুঁ।

চোখ বুজিয়াই রহিল; মেলিয়া চাহিতে পারিলেন না।

সরস্বতী চাহিল মাখন গাঙ্গুলির পানে···বলিল,—জ্ঞান আছে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—হুঁ···

মাখন গাঙ্গুলির ললাটে চিন্তার রেখা! দেখিয়া সরস্বতীও একটু খুশী হইল। দাদাকে সে জানে···অত্যন্ত চাপা মানুষ! এই যে বিন্দুমতী সব ত্যাগ করিয়া এখানে পড়িয়া আছে চীরধারিণী বৈরাগিনীর মতো······মুখের কথায় নিষেধ না করিলেও এ-ব্যথা দাদার বুকে কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে! ইহা লইয়া দাদার সঙ্গে বহুবার কথা হইয়াছে। দাদাকে বুঝাইয়া অনেক কিছু বলিয়াছে···দাদা সে-সব কথার কোন উত্তর দেন নাই··· গম্ভীর হইয়া সরস্বতীর সব কথা শুনিয়াছেন। সরস্বতী দেখিয়াছে, তার কথা শুনিতে শুনিতে দাদার মুখ হইয়াছে গম্ভীর··· দৃষ্টি গভীর উদাস! মেনির বিবাহের আগের দিনেও সরস্বতী বলিয়াছিল, বৌকে তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো দাদা···সে আসবে না?···শিবহীন যজ্ঞ হয় কখনো! দাদা মাখন গাঙ্গুলি স্থির অবিচল হইয়া সে-কথা শুনিয়াছেন—জবাব দেন নাই! শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়াছেন···সুগভীর নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া দাদা চলিয়া গিয়াছেন নিঃশব্দে বাহির-বাড়ীতে!···

ডাক্তার বঙ্কু বাবুর সঙ্গে মাখন গাঙ্গুলি কথা কহিলেন।

বঙ্কু বাবু বলিলেন,—রোগ তাই···তবে একেবারে এসিয়া-টাইপ নয়। আসল ব্যাপার, উপবাস গেছে···শুধু একটু জল খেয়েছিলেন, শুনলুম, সন্ধ্যার আগে···সধবা মানুষ···নির্জ্জলা উপবাসী থাকতে নেই বলে'। খুব সময়ে আমরা মোদ্দা এসেছিলুম। ওদিককার বিয়ের গোলে মেতে থাকলে যদি সময়ে খপর না পেতুম, তাহলে কি হতো, বলা যায় না।

মাখন গাঙ্গুলি নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া এ কথা শুনিলেন।

সুশীল বলিল—এখনো খুব সাবধান থাকতে হবে। এর রি-এ্যাকশন···

বঙ্কু বাবু বলিলেন—আমি এইখানেই আছি—যতক্ষণ না আরাম হন, নড়বো না!

সুশীল বলিল—আপনি বাড়ী যান মামা বাবু···ওদিকে ব্যাপার সামান্য নয়। আপনার মাথায় পাহাড়ের ভার।

মাখন গাঙ্গুলি আর কোনো কথা কহিলেন না···নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে বঙ্কু বাবু চাহিলেন সুশীলের পানে, বলিলেন—ওঁকে খপর দিলে কে?

সুশীল বলিল—আমি শুধু বলে এসেছিলুম মামীমার খুব অসুখ, শুনলুম···মাকে নিয়ে, ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসি যাচ্ছি! যদি আমাদের খোঁজ পড়ে, তাই বলে এসেছিলুম।

—বাড়ীতে আর কেউ জানে?

সুশীল বলিল—তা আমি বলতে পারি না। আমি নিজে আর-কাকেও এ-কথা বলিনি। তাছাড়া কাকেই বা বলবো? কে এসে কি বা করবে, বলুন?

বঙ্কু বাবু নিঃশব্দে শুনিলেন—কোনো জবাব দিলেন না। তিনি এখানে অনেক দিন আসিয়াছেন। এ বাড়ীর ইতিবৃত্ত লোকের মুখে শুনিয়াছেন। শুনিয়া অবধি আশ্চর্য্য হইয়া আছেন! এখানকার কথা মনে হইলে কেবলি মনে হইয়াছে, আশ্চর্য্য! কি রকম মানুষ মাখন বাবু! একটা তুচ্ছ সেণ্টিমেণ্ট লইয়া পত্নীকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত-মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন! আর তাঁর স্ত্রী! তাঁকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, এমন করিয়া নির্ব্বিচারে মার্টারডম্ ভোগ করিতেছেন···কেমন মানুষ তিনি! তার চেয়ে আরো আশ্চর্য্য হইতেন যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছাঁটিয়া দিয়াছে!

ভাবিয়া কূল-কিনারা মিলিত না। আলিসের সঙ্গে কথায় কথায় এখানকার কথা উঠিত। আলিসের মুখে বিন্দুমতীর কথা শুনিতেন—সেকাল-একালের সব সংস্কার ছাপাইয়া মন শ্রদ্ধায় না ভরিত, এমন নয়! এ-কালেও মানুষ এমন করিয়া নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে পারে···স্নেহ-মমতার বশে! সেই সঙ্গে এ-কথাও কাঁটার মতো মনে বিঁধিত যে, হিন্দু-ঘরের স্ত্রী স্বামীর জন্য এতখানি ত্যাগ করে, অথচ স্বামী সে-ত্যাগের মর্ম্মও বোঝে না! এ-ত্যাগে স্বামী কিসের জন্য এমন অবিচলিত থাকে।

আলিস বলিত—কোন্‌টা বড় কর্ত্তব্য, তার বিচার এক মাপ-কাঠিতে কোনো দিন কষা চলে না, ডাক্তার বাবু।

নিশ্বাস ফেলিয়া বঙ্কু বাবু বলিলেন—তাই দেখছি। কোনো বিষয়ে আমরা যে হুম্ করে মন্তব্য পাশ করি না বুঝে, তার চেয়ে মূঢ়তা আর নেই।

২৪

বেলা প্রায় বারোটা···এখানকার খবর একটু ভালো। বিন্দুমতী মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

বঙ্কু বাবু বলিলেন,—হোপফুল। ষ্টিল···

সুশীল বলিল—আপনাকে ছাড়বো না ডাক্তার বাবু।

বঙ্কু বাবু বলিলেন,—না, না···আমি যাবো, এমন কথা বলিনি।

ও-ঘরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। কদম তাকে লইয়া সেই যে পড়িয়া আছে, নড়ে নাই!

সুশীলের খেয়াল হইল। সুশীল গিয়া ঘরের বাহির হইতে বলিল—কি হলো ওর? কাঁদছেন কেন?

কদম বলিল,—উঠে বেরিয়ে যাবেন···আমি যেতে দেবো না, তাই! একটুখানি গণ্ডীতেই বা থাকে কাঁহাতক!

সুশীল বলিল—সত্যি। সকালে ওকে নিয়ে খানিকটা ঘুরে এলে পারতে। আমারো খেয়াল ছিল না! তাইতো! তোমাকেও এ ঘরে বন্দী করে রেখেছি!···কাল রাত্রে বোধ হয় একটুও ঘুমোওনি! চোখে-মুখে কালির দাগ দেখছি!

সুশীলের পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া কদম তার কথা শুনিতেছিল; চোখ-মুখে কালি-পড়ার দাগ লক্ষ্য করিয়াছে সুশীল, এ-কথাটা শুনিয়া লজ্জায় মুখ নামাইল। এমন করিয়া কেহ তার পানে কোনো দিন তাকায় নাই···না মা-বাপ, না স্বামী! একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীল বলিল,—তোমাকে একটু ছুটি দিতে হবে। চান্ করবে তো?···ভালো কথা, মুখে কিছু দাওনি নিশ্চয় কাল রাত থেকে!

কদম কোনো জবাব দিল না···নত শিরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকার হাতে একটা কাঠের ঘোড়া···ঘোড়াটা লইয়া হেট-হেট করিয়া সে মেঝেয় ঠুকিতেছিল।

সুশীল বলিল,—বাড়ীতে এই অসুখ···এ-অসুখে কারো খাদি

পেটে থাকা উচিত নয়! খোকাকে আমি চৌকি দিচ্ছি। তুমি একবার এখান থেকে ওঠো। মামীমার এখানে আমি চায়ের সরঞ্জাম জোগাড় করে রেখেছি! যাও কদম, লক্ষীটি, তুমি চা তৈরী করো। তোমার জন্যই শুধু নয়! তিন পেয়ালা চা তৈরী করো···এক পেয়ালা আমার জন্য, এক পেয়ালা ডাক্তার বাবুর, আর তৃতীয় পেয়ালা তোমার জন্য! বুঝলে?

এ-কথায় কদম কোনো জবাব দিল না। নিজের খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতে তার কেমন লজ্জা হইতেছিল।

সুশীল বলিল—কথাটা মনের মতো হলো না বুঝি?

কদম চোখ তুলিয়া সুশীলের পানে চাহিল। কম্পিত সলজ্জ দৃষ্টি···মুখে কথা নাই!

সুশীল বলিল—তার আগে রাখালকে বরং আমি বলি, একটু আগুনের ব্যবস্থা করতে।

কদম এবার উঠিল, বলিল—না, না···আমি যাচ্ছি। শুকনো নারকোল পাতা আছে, আমি জানি। তাই জেলে জল গরম করে এখনি চা তৈরী করে দিচ্ছি।

হাসিয়া সুশীল বলিল—এই তো জাষ্ট লাইক্ এ গুড্ গার্ল।··· এই জন্যই···জানো, স্কচ-কবি ওয়াল্টার স্কট মেয়েদের বলে গেছেন, এঞ্জেল···অর্থাৎ দেবী! এ মিনিষ্টারিং এঞ্জেল দাউ!

কদম আর দাঁড়াইল না। খুশী-মনে ছুটিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। সেখানে এক-কোণে একরাশ নারিকেল পাতা ডাঁই হইয়া আছে···

ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল সুশীল খোকার প্রহরা-কাজে।

ঘরের মধ্যে বিন্দুমতী একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন, সরস্বতীকে বলিলেন—কটা বেজেছে রে?

সরস্বতী বলিল—বারোটা বাজবে।

—তুই যা ভাই সরো, সেখানে আবার হাঙ্গাম আছে তো—কুশণ্ডিকার কাজ।

সরস্বতী বলিল—সে-ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছি। আমাকে তো ও সব ছুঁতে নেই···শুধু দাঁড়িয়ে দেখা, গোলমাল না করে ফেলে!

বিন্দুমতী বলিলেন—একবার গিয়ে দেখে আয়। থাকতে বলছি না···থাকতে তুই পারবি না! শুধু একবার দেখে আসা, শুভ কাজে গণ্ডগোল না করে বসে! আমি তো একটু ভালোই বোধ করছি।

সরস্বতী কোনো জবাব দিল না।

বিন্দুমতী বলিলেন—তোদের ভয় হলেও কিন্তু আমার হয়নি। আমার প্রাণ যাবার নয়!

কথার শেষে ছোট একটা নিশ্বাস!

সরস্বতী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিন্দুমতী বলিলেন—ডাক্তার বাবু বাড়ী যাননি?

সরস্বতী বলিল,—না:

—বেলা বারোটা বাজে, বলছিস! খাওয়া-দাওয়া?

সরস্বতী বলিল—এক-এক জন করে' যাবে। সে-ব্যবস্থা করবো'খন। তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো দিকিনি।

বিন্দুমতী আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তার পর বলিলেন,—জ্ঞান তো যায়নি···সমানে রয়েছে। সব শুনছি···সব বুঝছি।··· কোনো দিন যা মনে হয়নি···অসুখে বিছানায় পড়ে শুধু সেই কথাই মনে জেগেছে···মায়া কাটিয়েছি ভেবেছিলুম, কিন্তু মায়া কাটে না রে। বারে-বারে কেবলি মনে হয়েছে, কার জন্য আমাকে এমন ঠেলে ফেলেছে সকলে যে এমন দিনেও একবার আমার কথা কেউ ভাবলো না! কি মহাপাতক আমি করেছি···

অশ্রুর বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল···দু'চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল ঠেলিয়া।

স্নেহ-ভরে আঁচলে সরস্বতী সে জল মুছাইয়া দিল। বলিল—ও দুঃখ তো মনে-জ্ঞানে সঙ্গে করে এনেছো বৌ! এখন আর নতুন ভাবে দুঃখ করে কোনো ফল আছে? অন্যায় তোমার। বিনাদোষে নিজের সংসার ছেড়ে যে চলে এসেছো···কার উপর অভিমান? যেখানে অভিমানের মান থাকে, অভিমান সেইখানেই সাজে।

বিন্দুমতী বলিলেন,—জানি ভাই···তবু মানুষের মন! তোমার দাদা এসেছিলেন···নিয়ম রক্ষা করে গেলেন! হয়তো ভেবেছিলেন, জন্মের মতো যদি চলে যাই, শেষ-কর্ত্তব্যটুকু তাই করতে এসেছিলেন! মাথায় একটু সিঁদূর লেপে দিতে, নয় একটু পায়ের ধূলো···

মস্ত একটা নিশ্বাসের বাতাসে কথার শেষটুকু কোথায় ভাসিয়া গেল। দু'চোখে দর-দর ধারে জল আসিয়া পড়িল।

সরস্বতী সে-জল মুছাইয়া দিল, বলিল—দেখে-শুনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে বৌ, সত্যি। দাদা এতে দুঃখ পাচ্ছেন খুবই, জানি···কিন্তু সব জেনেও যদি এ দুঃখ মনে পোষেন, উপায় কি! কার জন্য তিনি এত বড় নিষ্ঠুরের কাজ করলেন, জানি না। এত বলি, চুপ করে থাকেন। যদি কিছু বলতেন, ভাবতুম যে হ্যাঁ, অকারণ এ-দুঃখ তিনি ডেকে আনেননি!

বিন্দুমতী বলিলেন—যে-সন্তানকে পেটে ধরেছি, বিনা-দোষে তাকে ত্যাগ করবো মা হয়ে···পাঁচ জনে তাকে দোষী ভাবছে বলে আমি বিচার করে দেখবো না একবার? যারা তাকে অপরাধী বলছে, তারা যে ভুল করছে, এ আমি বুঝেছি বলেই যা সত্য, তাকেই আমি গ্রহণ করেছি। তাদের ভুল এক দিন ভাঙবে আমি জানি, কিন্তু সেদিনকার মুখ চেয়ে আমি থাকতে পারিনি। তার কারণ, আমি মা···মা হলেও অবুঝ মা আমি নই!···

বিন্দুমতীর তাগিদে সরস্বতী গিয়াছে ও-বাড়ীতে···নিয়ম-কৃত্যটুকু সারিয়াই ফিরিয়া আসিবে। তার পর কদমের পালা। কিন্তু খোকা থাকিবে কার কাছে? সুশীল রোগীর ঘরে ছোঁয়া-লেপা করিয়াছে।

সুশীল বলিল—ডাক্তার বাবু যান্, চট্ করে আপনি স্নানাহার সেরে আসুন। কাজের বাড়ীতে আজ আর খাওয়া হবে না আপনার! রাত জেগেছেন···তার উপর এত বড় দায়িত্বের দুশ্চিন্তা···

বঙ্ক বাবু বলিলেন—বেশ, উনি এখন ঘুমোচ্ছেন···ভালো বলেই মনে হচ্ছে। আমি তাহলে বরং ঘুরেই আসি।

বিন্দুমতী ঘুমাইতেছেন। সুশীল বসিয়া আছে বিন্দুমতীর ঘরের বাহিরে বারান্দায় ঠিক দ্বারের সামনে। কদম ও-ঘরে খোকাকে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে।

সুশীল বলিল—এবার তোমার পালা কদম, তুমি যাবে।

ঘরের ভিতর হইতে কদম বলিল,—না, আপনি যাবেন!

সুশীল বলিল—না। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আগে যাবে।

কদম বলিল—বা রে, তা কখনো হয়! আমি মেয়ে-মানুষ—আমাকে বুঝি আপনার আগে খেতে আছে? মেয়ে-মানুষ খাবে পুরুষ-মানুষদের খাওয়া-দাওয়া চুকলে, তার পর।

সুশীল হাসিল। হাসিয়া বলিল—পাপ হবে না হলে···না? তুমি আবার আমাদের বিধান-দাতা ভটচাষ্যি-মশায়ের বৌ! তোমার শাস্ত্রে বিধান যাই লেখা থাকুক, আমি তা মানবো না কিন্তু, চিকিৎসা-শাস্ত্র আছে···সে-শাস্ত্র বলে, আগে ছোট-বয়সীরা খাবে!

ঘরের মধ্য হইতে কদম জবাব দিল—হুঁ, তাই বৈ কি! আমার বয়ে গেছে আপনার শাস্তর মানতে!

সুশীল বলিল—কিন্তু আমি শুধু পুরুষ-মানুষ আর বয়সে বড়, তা নয়! আমি আবার ব্রাহ্মণ। তিন দিক্ দিয়েই আমি হলুম আদেশ-কর্ত্তা।

কদম হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময়ে আলিস আসিয়া দেখা দিল। কদমের উচ্চ হাসির শব্দ শুনিয়া বলিল—কিসের হাসি হচ্ছে?

—আপনি এসেছেন। বাঃ! বলিয়া সুশীল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর হাসিয়া বলিল—আমাদের দু'জনে তর্ক হচ্ছিল। কার কথা বড়, এই তর্ক। মানে, কার আদেশ শিরোধার্য্য করে' চলা উচিত?

আলিস বলিল—এখানকার খবর একটু আগে আমি শুনলুম। বোর্ডিংয়ে দু'টি ছেলের জ্বর। ডাক্তার বাবুর সন্ধান নিচ্ছিলুম···তাতেই শুনলুম, তিনি এখানে। তার পর খবর নিতে আসছিলুম। পথে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। এখন একটু ভালো আছেন, শুনলুম।

সুশীল বলিল—হ্যাঁ। ঘুমোচ্ছেন।···তার পর কদমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তোমাকেই যেতে হলো তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ ইনি যখন এসেছেন।

কদম বলিল—আর আপনি?

সুশীল বলিল—আমার প্রতিনিধি হলেন ডাক্তার বাবু। তিনি এলে আমি যাবো!

—বটেই তো!

—না না কদম, সকলে মিলে দেরী করে তো কোনো লাভ হবে না। এক-এক জন করে গিয়ে ও-পালা চুকিয়ে আসাই উচিত। তার পর রাত্রে যদি আবার অসুখ বাড়ে?

কদম প্রতিবাদ তুলিল—না, না। আপনি মন্দ ভাবছেন কেন? আমার মন বলছে, ভালো থাকবেন!

সুশীল বলিল—ভালো থাকলেই ভালো।

কদমকে উঠিতে হইল। খোকা ঘুমাইয়াছে।

সুশীল বলিল আলিসকে—আপনি রোগীর ঘরে আর ঢুকবেন না ···খোকাকে যদি দেখতে হয়। কদম গেল, স্নানাহার সেরে আসবে।

বেলা দু'টো বাজিয়া গিয়াছে।

সুশীল বসিয়া আলিসের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। বিন্দুমতী জাগিয়া আছেন; সে-গল্পের মধ্যে তিনিও দু'-একটা কথা কহিতেছেন, এমন সময় হাউ-হাউ করিয়া ক্ষেত্তরের বৌ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল···সঙ্গে তার সাত-আট বছর বয়সের ছেলে।

সুশীল চমকিয়া উঠিল। কহিল—ব্যাপার কি ক্ষেত্তরের বৌ?

ছেলেটাকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া তার সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া ক্ষেত্তরের বৌ বলিল,—দেখেছো দাদা বাবু, ছেলেটাকে কি করে মেরেছে, একবার দেখেছো গা?

সুশীল দেখিল ছেলেটার সর্ব্বাঙ্গে ফুলা-ছড়ার দাগ···দু'-এক জায়গায় রক্ত পড়িয়া কালো চাপ জমিয়া আছে।

বলিল—কে মারলে?

ক্ষেত্তরের বৌ হুঙ্কার তুলিয়া বলিল—কে আবার! তোমাদের মন্দিরে পুজো করে···গলায় পৈতে ঝুলছে ঐ···ওদিকে আবার কৈবত্তর ভাত না হলে যার রোচে না···ঐ কেলে বামুনটা!

সুশীল বলিল—শিবকেষ্ট?

—হ্যাঁ।

ক্ষেত্তরের বৌয়ের দু'চোখে রাজ্যের বিরক্তি।

—কেন মারলে?

—কেন, শুনবে?···তার পর কণ্ঠ মৃদু করিয়া ক্ষেত্তরের বৌ যে-কথা বলিল, তার মর্ম্ম,—বাড়ী হইতে ক্ষেত্তরের বৌ আসিয়াছিল বড় কাঁসি লইয়া···পাতের এঁটো কাঁটা কুড়াইয়া ছিল···একখানা কলাপাতা চাপা দিয়া ছেলেটা সেই কাঁসিতে করিয়া সেগুলা লইয়া যাইতেছিল। ছেলের হাতে কাঁসি···ছেলেমানুষ···ভারী কাঁসি দু'হাতে করিয়া বহিতেছিল···বাতাস লাগিয়া ঢাকা কলা-পাতাখানা উড়িয়া গিয়া বুঝি ঐ বামুনের পায়ে পড়িয়াছিল! বামুনও বাড়ী যাইতেছিল তার সেই কৈবর্ত্ত-গৃহিণীর জন্য ঝুড়িতে করিয়া একরাশ লুচি আর সন্দেশ গজা বেঁধে লইয়া। বাগদীর ছোঁয়া পাতা পায়ে পড়িতেই জ্বলিয়া একেবারে খাক্! বোসেদের রোয়াকে হাতের ঝোড়া রাখিয়া মার-মূর্ত্তিতে আসিয়া ছেলেটাকে একেবারে···

রাগে ক্ষেত্তরের বৌয়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

সুশীলেরও রাগ হইল। কিন্তু সে-রাগ চাপিয়া সুশীল বলিল—তার খাবারগুলো নষ্ট হলো তো?

—নষ্ট হবেক কেনে! ছেলেটাকে মেরে ঝোড়া নিয়ে চলে গেল! বলতে বলতে গেল, গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবেক।

এ-কথা শুনিয়া এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সুশীলের হাসি পাইল।

ক্ষেত্তরের বৌ দম্ লইয়া বলিতে লাগিল—এই যে ভশচাষ্যি-ঠাকুরের বৌ! এঁকে জিজ্ঞেস করো না দাদা বাবু, ইনিও আসছিলেন পথে। স্বচক্ষে দেখেছেন গো।

ভশচাষ্যি-ঠাকুরের বৌ মানে, কদম।

কদম আসিয়া ইতিমধ্যে সেখানে দাঁড়াইয়াছে।

কদমকে দেখিয়া সুশীল বলিল—সত্যি মেরেছে শিবকেষ্ট?

—হ্যাঁ।

সুশীল বলিল ক্ষেত্তরের বৌকে—আচ্ছা, তুই চ···আমি তোকে খাবার দেবো ফের। ভালো খাবার···বুঝলি!

কথাটা ক্ষেত্তরের বৌয়ের কাণে গেলেও সে তার আক্রোশের রেশটুকু ছাড়িল না। গজ-গজ করিতে লাগিল—পৈতের জোরে ধরাকে সরা দেখছে! তবু যদি না কৈবত্তর ভাত খেতো···আ মর্!

কদম বলিল সুশীলকে—আমি চান করে দু'টি খেয়ে এসেছি। তার উপর আমি আর এখন একলা নই। উনিও আছেন। এবার আপনি যান্ তো, চট্ চান করে গিয়ে খেয়ে আসুন। [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কবিরাজীর কারসাজি

এক

রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তীর ভাগ্য। বেচারা জ্ঞাতি-বন্ধুদের প্রবৃত্তি-গত উদারতায় সর্ব্বহারা হইয়া বয়স্থা কন্তার যথাসময়ে বিবাহ দিতে পারে নাই বহু চেষ্টা করিয়াও। কন্তা কনকলতা শুধু সুন্দরী নয়—ডাকের সুন্দরী, তাহার উপর গৃহকর্ম্মনিপুণা! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সে দরিদ্র-কন্তা, নিঃসম্বল নিরুপায় রাজীবলোচন! পত্নী সারদাসুন্দরী প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করে নীরব ভাষায়। সে প্রিভি-কাউন্সিল উপরের দিকে।

এমন করিয়াই তাহাদের দিন যায়। পরের উপর রাগ ফলাইবার সুযোগ সুবিধা না পাইয়া রাজীবলোচন ও সারদাসুন্দরীর কোপ পড়ে কন্তার উপর। কনকলতা প্রার্থনা করে—ঠাকুর, বাবা-মাকে শান্তি দাও!

সংসারে অশান্তি বাড়িয়াছে প্রিয়জনগণের অযাচিত দরদে। মেয়েটার ভাগ্য মন্দ, কি আর করা যেতে পারে।

যাহাদের কন্তা নানা ফন্দীতে বিবাহ-সাগর পার হইয়া "আইবুড়ো" নাম খণ্ডন করিয়াছে, তাহারা এবং তাহাদের দুহিতৃগণও অবসর পাইয়া কথার মারপ্যাচে রাজীবলোচনের পরিবারে আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করিল। পরহিতব্রতী রাজীবলোচন উপকার করিয়াছিল যাহাদের, সর্ব্বহারা হইয়াছিল যাহাদের অনুকম্পায়, তাহারাই উঠিয়া পড়িয়া লাগিল রাজীবলোচনকে সকল প্রকারে ধ্বংস করিতে। রাজীবের অপরাধ—মন্দটাকে ভাল বলিতে পারে না কিছুতেই। সারদাসুন্দরীরও সেই রোগ—সম্ভবতঃ স্বামীর ছোঁয়াচে। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তাহারা উঁচু মাথা নত করে নাই কাহারও কাছে, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। হিংস্র-প্রকৃতির লোক এবং আবু-হোসেনের মত হঠাৎ বাদসা-বনা মানুষগুলা সে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে নাই কোনো রকমে। তাহারা চায়, যে কোনো প্রকারে বেচারা রাজীবলোচনের উচ্ছেদ।

দুই

শ্রীজীব পল্লী-যুবক। কলিকাতায় একবার আসিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার আবহাওয়া তাহার সহ্য হয় নাই কোনো মতেই। রাতে মশা, দিনে মাছির উপদ্রব তাহাকে কলিকাতা ছাড়াইয়াছিল মাস তিন-চারের অভিজ্ঞতায়।

শ্রীজীবের পিতামহ শ্রীজীবকে দাওয়ানী কাযে তালিম দিবার জন্ত আনাইয়াছিলেন কলিকাতায়। পিতামহ স্বয়ং দাওয়ান ছিলেন সে-কালের একটি বড় জমীদারি ষ্টেটে। শ্রীজীব ছিল প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী। তাহার উপর ছিল তাহার বিদ্যা—সংস্কৃত ও ফারসীতে তাহার ব্যুৎপত্তি ভালই ছিল। বৃদ্ধ দাওয়ান অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীজীবের দ্বারা দাওয়ানী কায ভালই চলিবে—এই বিশ্বাসে, জমীদার তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালা-পাগাড় প্রকৃতির শ্রীজীব নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিল; কোনো অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশেই সে কর্ণপাত করিল না। পল্লী-প্রীতিতে সে সুন্দরের পূজারী হইয়াছিল। সহুরে বাতাস তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেই সে বাড়ী ফিরিবার জন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

কথাটা কিন্তু দাঁড়াইল অন্তরূপ। স্বগ্রামবাসী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী দাওয়ানের কাণে তুলিয়া দিল—খোকাবাবু যে কলিকাতায় থাকিতে চায় না—তাহার কারণ হরেকৃষ্ণ ঘোষালের বিবাহযোগ্যা কন্তা। কথাটা কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা। ঘোষাল-কন্তাকে শ্রীজীব ভালবাসিত সহোদরার মত। চক্রবর্ত্তী-ঘোষালের মধ্যে মনোমালিন্ত থাকায় সুবিধাবাদী চক্রবর্ত্তী নিরপরাধ শ্রীজীবকে কোপ মারিয়া হরেকৃষ্ণ ঘোষালের উপর প্রতিশোধ লইল। শ্যামসুন্দর দাওয়ানের কৃপা-চিহ্নিত—জমীদারি সেরেস্তায় কায করে। স্তাবকতায় সে অদ্বিতীয়। স্তাবকতা করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়া সে বাহাদুরী লইল। প্রথম উদ্দেশ্য—পৌত্রের অবাধ্যতায় অসন্তুষ্ট দাওয়ান—মনিবের মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া জল উঁচু-নীচু বলার মামুলী ছন্দে তাঁহার তুষ্টিসাধন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—পল্লী-সমাজের কূটনীতিতে ঘোষাল-পরিবারকে লোক-চক্ষে হেয় ও হীন করা। দুইটি উদ্দেশ্যই তাহার সাধিত হইল উদ্দেশ্য-সাধনের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া।

দাওয়ান হরগোবিন্দ ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। দাওয়ানী কাযটা তিনি অবশ্য ভালই বুঝিতেন ও ভালই করিতেন। কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁহার বেশ সূক্ষ্ম ছিল না। অবিশ্বাস্ত জিনিষও তিনি বিশ্বাস করিতেন। সে সময়ে তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি লোপ পাইত অত্যদ্ভুত খেয়ালের প্রভাবে ও উপদ্রবে।

হরগোবিন্দ শ্যামসুন্দরকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ হে চকোত্তি, তুমি ও-সব খবর পেলে কোথা থেকে, আর কেমন ক'রে বল ত? খবরটা সত্যি বটে ত?

শ্যামসুন্দর মুখ-চোখ এক রকম করিয়া বলে—আজ্ঞে খবর পাওয়া কি? ওদের ও-ভাবটা যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি স্বয়ং অনুসন্ধান ক'রেও দেখতে পারেন।

—জান্‌তে যদি, এত দিন বল নাই কেন?

—আজ্ঞে, ভয়ে।

—সে না-হয় বুঝলাম্ চোখ্-কান্ বুজে। কিন্তু আজ ও দুঃসংবাদটা দিলে কোন্ সাহসে?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—রাখো তোমার আজ্ঞে-আজ্ঞে। যা জিগ্‌গেস করি, তা'র সরাসরি উত্তর দাও।

—আজ্ঞে হাঁ, দিই। কিন্তু খোকাবাবু জান্‌তে পারলে আমায় আস্ত রাখবে না।

—তুমি মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ না ত? সাবধান, তা'হলে চাকরী যাবে।

—আজ্ঞে না, আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া আমি যে মিথ্যা বলি নাই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই আগুন আর জল। আগুন আর জল না হ'লে যেমন ষ্টীম্ হয় না, তেম্‌নি ঘৃতকুম্ভতুল্যা নারী, আর তপ্ত অঙ্গারের সমান পুরুষ মেশামেশি করলেই একটা অঘটন ঘটে। ঘোষালের মেয়ে আর খোকাবাবুর মিল্‌মিশ, নীতিবাক্য উল্‌টে দিতে পারে না তো? আপনি কি বলেন, ধর্ম্মাবতার?

তুলনার ভঙ্গীটা হরগোবিন্দের ভালই লাগিল। তিনি ভাবিলেন, চকোত্তির কথাটা অযৌক্তিক নয়। খোকা যখন ঘোষাল-বাড়ীতে

অতটা অবাধ মেলা-মেশা করে, তখন উহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু গোল আছে! কিসের সাত-পুরুষের কুটুম্ তারা যে, খোকা তাদের বাড়ী ক'রে ফেলেছে আপনার! আচ্ছা, রহো, তোমার রোগের দাওয়াই দিচ্ছি আমি।

ধর্ম্মাবতারকে ভাবিতে দেখিয়া শ্যামসুন্দর তাহার মন্তব্যের টীকা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—আমি বল্‌তে চাচ্ছিলাম ধর্ম্মাবতার, দোষটা খোকাবাবুর একার নয়। ঘোষাল-বাড়ীই দোষ করেছে পোনের আনা তিন কড়া। কেন না—

ধমক দিয়া হরগোবিন্দ বলিলেন—রাখো তোমার কেন না। অপরাধ তোমারও কিছু অল্প নয়। সব জেনে-শুনে বুড়ো মিন্‌ষে খোকা হ'য়ে বসেছিলে এত দিন! খবরটা কাণেও তোলোনি আমার! কেন, কিছু কমিশন পেতে না কি? অপদার্থ কোথাকার!

আতঙ্কে হাত যোড় করিয়া বেতসপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে শ্যামসুন্দর সজল নয়নে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—ধর্ম্মাবতার, আমি নির্দ্দোষ, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। না-বলাটা অপরাধ হয়েছে অবশ্য। কিন্তু সে অপরাধ ক'রে ফেলেছি অনিচ্ছায়। বড়-ঘরের কথা চট ক'রে মুখ দিয়ে বার করার সাহস আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর হয়নি।

—বচনবাগীশ হ'য়েই কর্ম্মস্থলে বিজয়ী বীর হ'য়ে আছ তুমি চিরটা দিন! যাক্, এখন একটা কায করতে পারবে?

শ্যামসুন্দরের দেহের কম্পন এক লহমায় বন্ধ হইয়া গেল। সোৎসাহে সে বলিল—আদেশ করুন ধর্ম্মাবতার।

—চট্ ক'রে একটা ভাল পাত্রী যোগাড় করতে পার? তার পর শ্রীজীব কেমন জীব, বুঝে নিই আমি, আর বুঝিয়ে দিই, ঘোষালকে। বাঘের ঘরে ঘোগের উপদ্রব বটে!

আনন্দজ্ঞাপক নানা অঙ্গভঙ্গীতে শ্যামসুন্দর বলিল—খুব পারি ধর্ম্মাবতার। পাত্রী প্রস্তুত। ভিন্ গাঁয়ে চল্‌বে?

—খুব চল্‌বে। সেইটেই আমি চাই।

—যে আজ্ঞে, এই সপ্তাহের মধ্যে বিবাহ দেওয়াব।

—হুঁ—বিধাতাপুরুষ আর কি!

হরেকৃষ্ণ ঘোষালের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া পল্লীর জনকয়েক যুবক পল্লী-সমিতি-গঠনের আলোচনা করিতেছিল। শ্রীজীব প্রধান উদ্যোগী। তাহারই প্রস্তাবে হরেকৃষ্ণ ঘোষালকে হবু-সমিতির সভাপতি মনোনীত করার আলোচনা। যুবকবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও সে বিষয়ে অনুকূল মত ছিল না, তবে শ্রীজীবের প্রস্তাব বলিয়া অনিচ্ছায় তাহাদের তাহা মানিয়া লওয়া।

ঘোষালের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও বাড়ী পাকা—দ্বিতল। শ্রীজীব দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রোয়াক্-বৈঠকখানায় উপবিষ্ট বন্ধুদের সম্বোধন করিয়া বলিল—"ঘোষাল মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ কর্‌তে রাজী হয়েছেন হে! সমিতির কায-চালানোর জন্য তিনি কিছু ব্যয়ও করবেন। আর খাটা-খাটুনি ত আছেই।

দেবকী আসিয়া দাঁড়াইল সেই সময়ে শ্রীজীবের পাশে। কি-যেন-কি একটা বলিতে যাইতেছিল শ্রীজীবের বলা শেষ হইলে। কিন্তু বলি-বলি করিয়া বলা তাহার আর হইল না; নীচের দিকে চাহিল। সম্মিলিত যুবকবৃন্দের মুখে-চোখে ছিল কেমন-যেন একটা বিশ্রী হাসি। সেই হাসি দেখিয়াই দেবকীর কথা জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। শ্রীজীবের বন্ধুগণ চোখের ভাষা-সম্পদে রং ফলাইয়া মুখের ভাষায় বলিয়া গেল—শ্রীজীব শিব হ'ল ব'লে ঘোষাল-মন্দিরে।

শ্রীজীবের চিন্তা ছিল পল্লী-সমিতি-গঠন সম্বন্ধে। বন্ধুদের মন্তব্য তাহার কাণে পৌঁছায় নাই। মন্তব্য শুনিয়াই দেবকী অদৃশ্য হইল শ্রীজীবের পাশ হইতে। শ্রীজীবের দৃষ্টি ছিল রঙ্গ-ভরে চলমান বন্ধুগণের উপর। ঘাড় ফিরাইয়া যখন সে দেবকীকে বন্ধুদের অসভ্যতার কথা বলিতে গেল, তখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শ্রীজীব তাহার সন্ধানে ছুটিল তাহাকে কিছু বলিবার ছিল বলিয়া।

তাল-তমাল-বেণু-বিল্ব-পনস প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত গ্রাম্য-পথ বাহিয়া চলিতে চলিতে বন্ধুবর্গের আলোচনার বিষয় হইল শ্রীজীব ও দেবকী। এক জন বলে—লক্ষ্য কর্‌লে হে শ্রীজীব-দেবকীর ব্যাপার? ওরা দ্বিতলের বারান্দায় অমন ক'রে দাঁড়ালই বা কেন, আর এক জন সরে যেতে আর এক জন তা'র পিছনে ছুটলই বা কেন?

আর এক জন বলে—ও-সব লীলা বুঝা গেছে অনেক দিন। তবে সব বুঝেও আমার মুখ ফুটোন অভ্যাস নাই, তাই চুপ ক'রে থাকি।

তৃতীয় যুবকের কথা—এই সব কারণেই বোধ হয় ঘোষাল বাহাদুরকে পল্লী-সমিতির সভাপতি ক'রে দেওয়া হ'ল আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। শ্রীজীব বন্ধু বলেই এমনটি করিয়ে নিলে আমাদের দিয়ে। কাযটা কিন্তু ভারী অন্যায় হ'ল। ঘোষালের চেয়ে অনেক ভাল লোক ছিলেন পল্লীতে, যাঁদের দ্বারা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত হতে পার্‌ত আর তাতে পদের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হত শত গুণ।

চতুর্থ যুবকের অভিমত—ব্যাপারটা অত দূর গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন, সেইটেই ভেবে ঠিক্ পাওয়া যাচ্ছে না। বলি, যদি এমনটা স্থির হ'য়ে থাকে যে, ঘোষাল-কন্যা হবে শ্রীজীবের ঘরণী, সেটাই বা দোষের হবে কি? এর জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হবার ত কারণ দেখা যাচ্ছে না।

এই আলোচনার মধ্যে আসিয়া পড়িল এক সঙ্গীতমুখর পথিক। পথাতিক্রম করিতেছিল সে গানের সুরে আকাশ-বাতাস ঝঙ্কৃত করিয়া।

যুবকদের মধ্যে এক জন কহিল—বাঃ, বেশ গাও ত তুমি। এ গান শিখ্‌লে কোথা?

পথিকের উত্তর—বয়সের বেশী মুরুব্বী হ'তে চাইলে যে দোষ হয়, সেই দোষ তোমার ঘটেছে বৎস। আমার বয়স অনেক বেশী তোমার চেয়ে। বয়সের সম্মান দাওনি যখন, তখন বুঝতে হবে, অনড্বান তুমি। তবু একটা কথা বলে রাখি। থট্-রীডিং আমার ব্যবসা। আর ফিজিয়োনমি খানিক আয়ত্ত করেছি। মাথার পোকা নড়্‌লেই ঘুরে বেড়াই গান গেয়ে!

আর এক জন যুবক রসিকতা করিয়া বলিল—মহাশয় তাহলে পাগলা-গারদ থেকে সম্প্রতি ছুটী পেয়েছেন।

—হুঁ, কতকটা তাই বটে। বেড্‌ল্যাম্ থেকে ছুটী নিয়ে প্যাণ্ডি-মোনিয়ামে তোমাদের মত সয়তানগুলোকে চাব্‌কে সায়েস্তা করবার জন্যই আমার শুভাগমন! তোমরা হয়ত জান না, শ্রীজীবের পিতৃবন্ধু

আমি। পিতৃহীন শ্রীজীবকে সর্বদা দেখেছি চোখে-চোখে। সে কথা এ পর্য্যন্ত জান্‌তে দিইনি কাকেও। শাদা কাপড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি আমি! সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ শ্রীজীবের হয়েছে। ঘোষাল-কন্যার কথা নিয়ে যে ভাবে শ্রীজীব সম্বন্ধে তার পশ্চাতে তোমরা আলোচনা করছ, তাতে শ্রীজীবের চেয়ে ঘোষাল-কন্যার ক্ষতি হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা। কারণ, শ্রীজীব ঐ মেয়েটিকে দেখে সহোদরার মত, আর মেয়েটিও শ্রীজীবকে ভাবে অগ্রজের তুল্য। এ সব তত্ত্ব জান্‌বার আমার অবকাশ ঘটেছে।

আর একটি অকাল-পক্ক যুবক স্মিতবদনে পথিককে বলিল—গল্পের প্লটটা মন্দ নয়। কিন্তু ক্যানাবেশ ইণ্ডিকার প্রভাব গল্পটায় বড্ড বেশী। সাধু-সন্ন্যাসী আপনি, ও-রকমটা হওয়া স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই মশায়, একেবারে অকাল-জলদোদয়ের মত সঙ্গীত-গগনে উদিত হ'য়ে আমাদের এত উপদেশ দেবার কি প্রয়োজন ছিল, বলুন ত? চালাকী পেয়েছেন বটে! চোখ রাঙ্গিয়ে গুরুবিকুগিরি চালাতে এসেছেন! আমরাও ধান দিয়ে লেখা-পড়া শিখিনি!

—তাই বটে হে, তাই বটে! অভিসন্ধি আমার অত্যন্ত গূঢ়। আমি তোমাদের দ্বারা শ্রীজীবকে বলাতে চাচ্ছিলাম, বিবাহ এখন কোনো মতে সে না করে! কিন্তু তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, ভুলের পথেই চলেছ তোমরা নিয়তির বশে। আমিও ভুল করলাম ভুলটাকে সংশোধন করব ভেবে। দরকার ছিল না যা গুপ্ত, তা ব্যক্ত করবার। উচিত হয় নাই আত্মপ্রকাশ করা। যাই হোক্, শ্রীজীবকে জানিও তোমরা, তার পিতৃদেবের অসময়ের বন্ধু ক্লেয়ার ভয়েনী বিদায় বলে গেছে—জীব, জীব, চিরং জীব। তার সঙ্গে দেখা করা নিষেধ আমার, গূঢ় কারণে। প্রার্থনা করব অভিশপ্তের মুক্তির জন্য।

চার

সে দিনকার পথের পাঁচালীর কাহিনীটা লোকমুখে প্রচারিত হইল নানা ভাবে, নানা ছন্দে। ফলে দেশের মাটীতে পা দিতে না দিতেই রাজীবলোচন রায়ের কন্যা কনকলতার সহিত শ্রীজীবের বিবাহ স্থির হইয়া গেল—ঘটকালি করিল শ্যামসুন্দর। শ্রীজীব পিতামহের এমন কড়া ধমক্ খাইয়াছিল যে, কোনো বিষয়েই সে আর কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিল না। বাড়ীর অন্যান্য সকলেরও শ্রীজীবের অবস্থা। হরগোবিন্দর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। ক্রোধবশে সে ব্যক্তিত্বের মাত্রা হইয়াছে দ্বিগুণ।

মেঠো-পথ, জলাভূমি, আল ভাঙ্গিয়া একখানা পাল্কী চলিয়াছে—লাল চেলী-পরা শ্রীজীব সে পাল্কীর আরোহী। দুই জন ভোজপুরীয়া পাল্কীর দুই পাশে লাঠি কাঁধে করিয়া ছুটিতেছিল আরোহীর দেহরক্ষিরূপে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

পাল্কীর আরোহী পাল্‌কী-বাহকদের উদ্দেশে বলিল—একটু জিরিয়ে নে তোরা।

পাল্‌কী হইতে নামিতে গিয়া শ্রীজীব নামিতে পারিল না, তাহার বেশ জ্বর।

বন্ধু-বরযাত্রীর দল বলিল—প্রেম-জ্বর।

শ্রীজীবের হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইতে গিয়া এক জন বন্ধু তাহার গাত্রের তাপ অনুভব করিল। জ্বর সত্যই বটে!

বন্ধুর দল প্রমাদ গণিল। প্রমাদ—জ্বর-গায়ে বন্ধুর বিবাহ বন্ধ হইবার সম্ভাবনায়, কৌতুক ও আনন্দ ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়। শ্রীজীবকে সত্যই তাহারা ভালবাসে। বিবাহ করিয়া শ্রীজীব সংসারী হইলে তাহারা পরম সুখী হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে বিবাহে বাধা পড়িলে সকল পক্ষেরই আনন্দে ব্যাঘাত জন্মিবে—প্রমাদ সেই সূত্রে।

অপরিচিত স্থান—অসহায় অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বরযাত্রীর দল বেশ একটু গোলে পড়িল। পাল্কী-বাহক ও দেহরক্ষী ভোজপুরীয়াদ্বয়ও বর ও বরযাত্রীদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া ভয়ের ছোঁয়াচে কিছু ভয় পাইল। তাহাদের ভয় মনিবের। মনিব হরগোবিন্দ বরকে কতকটা তাহাদের জিম্মায় দিয়া আগু বাড়িয়া কন্যাপক্ষের বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন। কোনোরূপ অঘটন ঘটিলে মনিবের কাছে তাহাদের আর রক্ষা নাই। হরগোবিন্দ ভারী রাশভারী লোক। তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয় ছোট-বড় সকলকেই! রাশের এমনই গুণ—এমনই প্রভাব!

বুদ্ধি করিয়া একটা মস্ত বড় কায করিল কিন্তু এক জন ভোজপুরীয়া। আসিবার সময় সে লক্ষ্য করিয়াছিল, যে স্থানে তাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহার অদূরে একটি "দবাখানা" আছে। সেই "দবাখানায়" রোগীকে লইয়া যাইবার জন্য সে প্রস্তাব করিল। প্রস্তাবটি ব্যস্ততার সহিত গৃহীত হইল। বর, বরযাত্রী ও পাল্কী চলিল "দবাখানায়।"

পাঁচ

"চক্রদত্ত" কেতাবখানা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে লইয়া রোগীর বন্ধু করালীকে কণ্ঠাভরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—রোগী ত তুমি নও গো! রোগী কৈ?

—আজ্ঞে, ঐ পাল্কীর মধ্যে! ঐখানে গিয়েই রোগীকে দেখে আসতে হবে। বেচারা বিবাহ কর্‌তে-যাবার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

রোগীর রোগ-লক্ষণ ও নাড়ী দেখিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহা করালী ও রোগীর অন্যান্য বন্ধুবর্গকে একান্তে ডাকিয়া যথাযথ বলিলেন। কণ্ঠাভরণের কথা—রোগ অসাধ্য। তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সেই রাত্রেই রোগ চরমে উঠিবে এবং জ্বরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রাণত্যাগ ঘটিবে! এক উপায়ে রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহা এক প্রকার অসম্ভব। তবে জগদম্বার কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হয়।

কণ্ঠাভরণের কথা শুনিয়া বন্ধুর দল মুখ টিপিয়া হাসিল। রোগীর কাছে সে বক্তব্য প্রকাশ করিলে দারুণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া শ্রোতারা সে বিষয়ে আর কোনো আলোচনাই করিল না। ইঙ্গিতের চাহনিতে সকলের বলাবলি হইয়া গেল—কবিরাজ শুধু মূর্খ নয়, একটা আস্ত বলদ।

অনতিদূরে কর্ত্তার পালকী আসিতেছে দেখিয়া বরের পালকীও বাহকদের স্কন্ধে উঠিল।

দৃষ্টির বাহিরে পাল্কী দুইখানা চলিয়া গেলে কণ্ঠাভরণ উপর দিকে চাহিয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করিতে লাগিল—বড় বিপদ সম্মুখে, রোগীকে রক্ষা কোরো ঠাকুর।

ছয়

রাজীবলোচন রায় একটি-মাত্র কন্যা কনকলতাকে অবিবাহিতা রাখিয়াই লোকান্তরে গমন করিয়াছিল। তাহার বিধবা মাতা সারদাসুন্দরী নিকট-কুটুম্ব শ্যামসুন্দরের সহায়তায় কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রকাণ্ড সুযোগ পাইল। বিবাহ-বাসরে ধুমধাম

বিশেষ কিছু নাই। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন হরগোবিন্দ—বরপক্ষ। কনকলতা কনকলতারই তুল্য,—পৌত্রবধূ-রূপে তাহাকে ঘরে আনা পরম লাভ, এই বিবেচনা করিয়াই হরগোবিন্দ শ্যামসুন্দরের প্রস্তাবে এক কথায় যে শুধু রাজী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, হরেকৃষ্ণ ঘোষালের নাসিকায় ঝামা ঘসিয়া দিবার প্রবল ইচ্ছা সে রাজীনামার পশ্চাতে ছিল। হরগোবিন্দের আরও একটা অভিসন্ধি—শ্রীজীবকে রীতিমত জব্দ করা। পরস্পরের অবাধ প্রেম-নিবেদনের উপর হরগোবিন্দের ভারী ক্রোধ।

বিবাহ-সভায় বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে রঙ্গ-কৌতুক, বাক্-বিতণ্ডা প্রাচীন প্রথায় চা-পাত্রে তুমুল ঝড়ের মত যখন ভীষণ ভাবে চলিতেছিল, তখন শ্রীজীব অসুস্থতা-নিবন্ধন নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ক্রন্দন-চীৎকার করিয়া সকলকে সে জানাইয়া দেয়—রোগ-কাতরকে বিয়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা কর হৃদয়বান্! কিন্তু লজ্জায় ও দাদামহাশয়ের ভয়ে সে কায সে করিতে পারিতেছিল না কোনো মতে।

বিবাহের পর মামুলী বাসর। বর টলিতে টলিতে বাসরে চলিয়া গেল। যত রাত্রি হইতে লাগিল ততই জ্বর বাড়িয়া চলিল,—সেই সঙ্গে প্রলাপ।

হরগোবিন্দ প্রমাদ গণিলেন। বৈদ্য-চিকিৎসক কোথায় পাওয়া যায়, সেই রাত্রিতে সেই সুপ্ত গ্রামে। কণ্ঠাভরণ কবিরাজের নাম করিল কয়েক জন। কিন্তু তিনি ত থাকেন ভিন্ন গ্রামে—অনেক দূরে। তাঁহাকে সেই রাত্রিতে আনিতেই বা যায় কে, আর তিনিই বা ডাকামাত্রই সেই গভীর নিশায়, অন্ধকারে নানা বিপদের মাঝখান দিয়া আসিতে রাজী হইবেন কেন? রাজী হইলেও যান-বাহন কোথায়? যান-বাহনের যোগাড় হইলেও কবিরাজ আসিতে আসিতেই রোগীর প্রাণত্যাগ ঘটিবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

জন চারেক লোক ও আলো সঙ্গে লইয়া কণ্ঠাভরণ কবিরাজের বাড়ী অভিমুখে তিনি রওনা হইলেন।

রোগীর কাছে রহিল মাত্র রোগীর শাশুড়ী। আমোদ করিবার জন্য যাহারা বাসর জাগিতে আসিয়াছিল, বরের সেই অবস্থা দেখিয়া তাহারা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন ও যে কয় জন কুটুম্বিনী বাড়ীতে ছিল, তাহারাও গৃহান্তরে ক'নেকে লইয়া গিয়া সান্ত্বনা ও সাহস দিতেছিল। রোগীর গৃহে রোগীর শাশুড়ী একাই রোগ-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছে।

ভীষণ জ্বর—গায়ে হাত দেওয়া যায় না। রোগী কেবল জল-জল করিতেছে। সেই সঙ্গে ক্ষুধার জ্বালাও ভয়ঙ্কর। অদ্ভুত রোগ, এত জ্বরেও আহারের জন্য রোগীর ভীষণ আবদার। বহির্ব্বাটীতে পুরুষদের কাছে পরামর্শ লইবার জন্য সারদাসুন্দরী রোগী জামাতাকে একা ফেলিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল। রোগী সেই অবসরে রোগশয্যা হইতে টলিতে টলিতে উঠিয়া যেখানে জলের পাত্র আছে, সেইখানে উপস্থিত হইল। জল-কলসের নিকটেই একটা চুবড়ীতে ছিল কিছু খই ও কাঁটালী কলা। রোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া এক ঘটা জল পান করিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখে, জামাতা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। ভীষণ ঘাম। গা মুছাইয়া দিবার পর বুঝা গেল—শরীর বরফ শীতল—জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। এত জ্বরের পর সহসা জ্বরত্যাগে যে প্রাণত্যাগ হয়, এ তত্ত্ব অনেকেরই জানা। সারদাসুন্দরী সেই জানায় ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বাহিরের লোক তখন আসিল ভিতরে যাহারা আসিল, তাহারা দেখিল—রোগী শান্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। সে নিদ্রাকে সকলেই মহানিদ্রা বলিয়া স্থির করিল।

কণ্ঠাভরণ কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া হরগোবিন্দ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রাচীর গগনে উষার আলোক ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। শুকতারা তখনও জ্বল-জ্বল করিতেছে।

রোগীর দিকে চাহিয়াই কবিরাজ বলিলেন—রোগের কোনো লক্ষণই ত রোগীর মুখে দেখা যায় না। নীরোগই ত মনে হয়।

হরগোবিন্দ ও অন্যান্য অনেকেই ভাবিলেন—কবিরাজটি আনাড়ী, গো-বৈদ্য। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ যখন বলিলেন—নাড়ীতে রোগের লক্ষণ পাওয়া যায় না, তোমরা ঝুটমুট্ আমাকে এই রাত্রে কষ্ট দিয়ে আন্‌লে।—তখন অতি দুঃখেও অনেকের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কবিরাজ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনিও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—রোগী কি খেয়েছে, বলুন ত?

এক জন বিদ্রূপ করিয়া বলিল—খাবে আবার কি, কলা খেয়ে বসে আছে।

—হুঁ। আর?

আর-এর উত্তর কেহই দিল না তাচ্ছিল্যভবে। কিন্তু ঘরের একটা কোণে খই ছড়ান ও কলার খোসা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—ঠিক্ হয়েছে, শুধু কলা খায়নি, তার সঙ্গে কলার টুক্‌নী ছিল খই। ক্ষুধার খুব জোর দেখ্‌ছি। যা-যা হবে, তা' আমি পূর্ব্বভাগে ব'লেই দিয়েছিলাম।

শ্রীজীবের এক জন বন্ধু বলিল—"আপনি যে বলেছিলেন, কবিরাজ মহাশয়, রোগী বাঁচ্‌বে না কোনো মতেই, ওর বিয়েটা না করাই ভাল।

—ব'লেছিলাম বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা খুব বড় "কিন্তু" রেখেছিলাম্ যে, সে কথাটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

—সে কিন্তুটা কি কিন্তু, তা' আমরা বুঝ্‌তে পারি নাই। বলেছিলেন বটে, সে কথা স্মরণ হচ্ছে।

—কিন্তুটায় ছিল সাপের বিষের কথা। মাত্রাটা সুযোগমত দিতে পার্‌লে মরা মানুষও ফিরে আসে, ধড়ে এতটুকু প্রাণ থাক্‌লে ত কথাই নেই। টাট্‌কা বিষ যোগাড় কর্‌তে পারা যাবে না ভেবেই আমার ঐ 'কিন্তু' প্রয়োগের ব্যবস্থা!

তাহার পর কবিরাজ মহাশয়ের কথায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল—রম্ভাটা কোন্ কদলীবৃক্ষের। প্রশ্নোত্তরের ফলে যখন কদলী-বৃক্ষটি আবিষ্কৃত হইল, তখন কণ্ঠাভরণের আদেশ—খোঁড়ো ঐ গাছের তলা।

আদেশ কৌতুক-রঙ্গে পালিত হইলে দেখা গেল—বৃক্ষ-মূলে যুগ্ম চক্রধর কুণ্ডলী পাকাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছে। মানুষের কলরবে ধ্যান ভঙ্গ হইতেই তাহারা যখন ফোঁস করিয়া উঠিল, তখন আরম্ভ হইল কণ্ঠাভরণের নৃত্য, উল্লম্ফন ও আনন্দোৎফুল্ল চীৎকার তাঁহার বাণী—"জয় সত্যের জয়, জয় আয়ুর্ব্বেদের জয়, জয় বৈদ্য-শাস্ত্রের জয়, জয় নবদম্পতীর জয়, জয় বিষধরের জয় যাঁ'র চৌট্ট গাছে ও ফলে বিষ চারিয়ে বিষামৃতে বাঁচিয়ে দি মৃত্যু-পথের পথিককে।"

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[illegible]দাস কবিরাজ গোস্বামী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনেকে মনে করেন [illegible]রোত্তম ও শ্যামানন্দ ঠাকুরের সহিত [illegible]ছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ তাঁ[illegible] পুথি পূর্ব্বোক্ত "বিবর্ত্তবিলাস" বলে[illegible]রিতা-মৃত গ্রন্থ গৌড়দেশে পাঠাইতে অ[illegible]মীর শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের নিকট চা[illegible] তাহা গোপনে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। [illegible] প্রমাণ কোনওরূপে প্রমাণসহ বলিয়া ম[illegible]।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীল কবি[illegible] বৈষ্ণবগণের আগ্রহেই রচনা করিয়াছিলেন। [illegible]লেন যে, শ্রীল মদনমোহন বা মদনগোপাল দেবের [illegible]ই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। [illegible] সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী এবং—

"কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই।
যাদবাচার্য্য গোস্বামী শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী।
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা আর অন্য মুখে নাই।
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্য দাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস।
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ।
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন।
মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তাঁ সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে।
দর্শন করিয়া কৈলু চরণ-বন্দন।
গোসাঞি দাস পূজারী করেন চরণ সেবন।
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল।
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞি দাস আনি মালা মোর গলে দিল।
আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন।
সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৮ম

চরিতামৃত লেখা লইয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল, আর শ্রীবৃন্দাবনের তাৎকালিক নেতা বৈষ্ণবগণের আশ্রয় ও অবলম্বন শ্রীজীব তাহা জানিতেও পারিলেন না, অথবা তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিবার বিষয়ে মত না থাকিলে, তিনি তাঁহার অনুগত কৃষ্ণদাসকে গ্রন্থ লিখিতে নিষেধ করিতেও পারিলেন না, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিত হইলেও শ্রীজীব যখন উহা যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন তখন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীজীবের গুরু ও অভিভাবকের তুল্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীবের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী জীবিত ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতি শ্রীজীবের এইরূপ ব্যবহারের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য? সুতরাং অন্য সম্প্রদায়ী "বিবর্ত্তবিলাসের" এই উপাখ্যান এবং তন্মূলে লিখিত ৺জগদীশ্বর গুপ্তের ও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যালের কথা কোনওরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বস্তুতঃ ১৫৫৭ শকের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে উড়িষ্যা হইতে শ্রীরাধিকামূর্ত্তি আনিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের ও শ্রীমদনমোহনদেবের বামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইহারও অনেক দিন পরে শ্রীল-গোপীনাথের বামে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তম-বিলাসে আছে যে, শ্রীল গোপীনাথদেব শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গেলে তাঁহাকে তাঁহার বামে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্নাদেশ করেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী নয়ন ভাস্করের দ্বারা শ্রীরাধিকামূর্ত্তি গঠন করিয়া উহা শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া গিয়া গোপীনাথের বামে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীজাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন ও প্রত্যাগমন— সুপ্রসিদ্ধ খেতুরীর উৎসবের পরের কথা। অতএব শ্রীল রাধিকা সহ শ্রীগোপীনাথকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থারম্ভে প্রণাম করায় যদি ধরিয়া লইতে হয়, শ্রীল গোপীনাথ বিগ্রহের বামে শ্রীরাধিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়াছিল, তবে "১৫০৩" শকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়াছিল এবং রচিত হইবার পরে ঐ গ্রন্থ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল ও বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বির কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এ অভিমত আদৌ গ্রাহ্য হইতে পারে না। অথচ প্রেমবিলাসের গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল নিত্যানন্দ দাস তাঁহার প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরী গ্রন্থচুরির সংবাদ যখন শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিল, তখন শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে বাসপরায়ণ শ্রীল দাস-গোস্বামী শোকে অভিভূত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝম্ফ প্রদান করেন। যখন তাঁহাকে শ্রীকুণ্ড হইতে উঠান হইল, তখন তিনি বৃদ্ধ দাস-গোস্বামীর ক্রোড়দেশে মস্তক রক্ষা করিয়া—

"মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ।"

প্রেমবিলাস, ১৩

বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-চুরির পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বিরকে শিষ্য করিয়া দেশে অর্থাৎ যাজিগ্রামে গমন করেন। তাহার কিছু দিন পরেই তিনি বিবাহ করেন! উহারই কিয়ৎকাল পরে খেতুরীর উৎসব হয়। খেতুরীর উৎসবের পরেই জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন— ইহা ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর স্থানে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষাৎ হয়। ঐ স্থানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীজীবের 'গোপালবিরুদাবলীর' প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের একাদশ তরঙ্গে দেখা যায় যে, শ্রীল জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গেলে শ্রীদাস গোস্বামী দুর্ব্বল শরীরে আসিতে না পারিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে প্রেরণ করিয়া ক্রটি স্বীকার করেন। ইহার পর শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শনে গমন করিয়া দাস গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে কবিরাজ গোস্বামীও দাস গোস্বামীর নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা শ্রীবৃন্দাবন গমনের কালেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজকে আলিঙ্গন করিতেছেন ইহা দেখা যায়। ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দ কবিরাজকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নমস্কার গোবিন্দ কবিরাজকে জ্ঞাপন করিতেছেন। অতএব ঐ সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের এই সকল গুরুতর প্রমাণের নিকট প্রেমবিলাসের প্রমাণ কিছুতেই প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদুনন্দনের কর্ণানন্দ গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য না হইলেও এই সমস্ত কথা খণ্ডিত হইয়াছে।

আর কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব যদি রাধাকুণ্ডেই হইত, তবে তাঁহার সমাধিও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে না থাকিয়া তাহা রাধাকুণ্ডেই থাকিত। কবিরাজ গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন, তখনই তিনি এত বৃদ্ধ যে, লিখিতে তাঁহার হাত কাঁপিত। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যে বর্ণনা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হইয়া যায়। যথা—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়।
এই অন্ত্যলীলাসার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণধন।
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইঁহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য়

মধ্যলীলা লিখিতেই তাঁহার সন্দেহ হয় যে, তিনি গ্রন্থশেষ করিয়া যাইতে পারিবেন কি না, এই জন্য তিনি কিঞ্চিৎ ক্রম-ভঙ্গ করিয়াই শেষলীলার বর্ণনীয় একান্ত প্রয়োজনীয় কোন কোনও লীলা মধ্য লীলায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবৎকৃপায় তিনি শ্রীচরিতামৃ… ঐ সকল ব্যাপার বিস্তারিত করিবার মত সামর্থ্য ও আয়ু… করিয়াছিলেন।

ফলতঃ দাস গোস্বামীর তিরোভাবের পরেও তিনি অতি … কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে … শ্রীচৈতন্যদেব পরমস্নেহভরে দাস গোস্বামীকে সেবা করিবার … যে গোবর্দ্ধন শিলা দান করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্দাস গোস্বামী আজী… প্রেমভরে তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভা… পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে এই সেবা … করিয়া যান—এ কথা বহরমপুর হইতে মুদ্রিত নরোত্তমবিলা… পরিশিষ্টে "গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়" শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। … শিলার সেবার ভার কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার তিরোভাবের পূ… মুকুন্দ কবিরাজকে দিয়া যান। মুকুন্দ কবিরাজ পরবর্ত্তী কালে … সেবা নরোত্তমদাস ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর রাধাকু… বাসনিরতা বিধবা দৌহিত্রী, "রাধাকুণ্ডের ঠাকুরাণী" বলিয়া প্রসি… শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীকে দিয়া যান। শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া … ঐ সেবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য পরমস্নে… ভাজন সুপণ্ডিত ও রসিক ভক্ত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রব… হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ শিলা এখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর … অবস্থানস্থল শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোকুলানন্দের মন্দিরে বি… করিতেছেন।

যত দূর জানিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শ্রীল নিত্যানন্দের স্বপ্নাদে… কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পরেই তিনি শ্রী… গোস্বামীর কৃপাদেশে "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" মহাকাব্য রচনা করে… উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত অধিকারী বিবেচিত না হই… শ্রীরূপ গোস্বামী কখনও কবিরাজ গোস্বামীর উপর এই ভার প্রা… করিতেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাতঃকাল হই… মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত লীলার স্মরণ-সূচক যে ১১টি শ্লোক রচনা কর… তাহা অবলম্বন করিয়াই অষ্টকালীন স্মরণ-মননের জন্য বিস্তৃত ভ… লীলাবর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। অদ্যাপিও … গ্রন্থ অষ্টকালীন স্মরণ-মননের জন্য আদর্শগ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃ… এই মহাকাব্যখানি ত্রয়োবিংশ সর্গে সমাপ্ত। সুবিখ্যাত মহাম… পাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম … গ্রন্থের "সদানন্দ-বিধায়িনী" নামে টীকা ১৭০১ শকে রচনা করে… গ্রন্থখানি যে অলঙ্কারগ্রন্থোক্ত মহাকাব্যলক্ষণে ভূষিত, ইহা টীক… প্রারম্ভে প্রতিপন্ন করিয়া পরে তিনি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচ… অগ্রসর হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায়, কাব্যে, অলঙ্কারে ও রসশা… কবিরাজ গোস্বামীর কি প্রকার অধিকার ছিল, তাহা এই গ্রন্থখা… পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বোধ হয়, এই গ্রন্থ-রচনার ফ… শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের মধ্যে তিনি "কবিরাজ" আখ্যায় বিভূ… হন। উত্তরকালে এই গ্রন্থেরই আদর্শে মহামহোপাধ্যায় শ্রী… বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থ বিরচন করে… এই দুই গ্রন্থই সাধন-ভজন-পরায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বৈষ্ণ… অবলম্বনীয়। যাঁহাদের এই দুইখানি গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিবার … সংস্কৃতজ্ঞান নাই, তাঁহারা স্ব স্ব গুরুপ্রণালী অনুসারে নিজ পরিবারো… "গুটকা" বা "গুটিকা" গ্রন্থানুসারে অষ্টকালীন লীলার ধ্যান ক…

থাকেন। এই গুটিকা গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীল গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণদাস বাবাজীর গুটিকাগ্রন্থ বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুকের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একখানি চমৎকার টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির নাম "সারঙ্গরঙ্গদা"। ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার সুমধুর রসবৈচিত্র্যে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে' কি প্রকারে সিদ্ধদেহের স্মরণানুযায়িনী লীলা বর্ণিত হইয়াছে টীকাটিতে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। ফলতঃ, এই টীকাটিতেও কবিরাজ গোস্বামীর যশঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপের রাগানুগা ভজনপদ্ধতিই আদর্শ ভজনপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের টীকা রচনা করিয়া এই রাগানুগা ভজনপদ্ধতিরই বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। এই জন্য তিনি রাগানুগা ভজনপদ্ধতির আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা, বৈষ্ণবমতে বেদান্ত-সিদ্ধান্তের সার এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, অন্য কুত্রাপি তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় যেমন শ্রীভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা, হিন্দী ভাষায় যেমন মহাত্মা তুলসীদাসের রামায়ণ, বঙ্গ ভাষায় তেমনই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ইহা সত্যই একখানি যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লীলা, সিদ্ধান্ত, দার্শনিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের জনপ্রিয়তা ও কবিরাজ গোস্বামীর নামের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া, আউল, বাউল, সহজিয়া ও অন্যান্য গুপ্তভাবে তন্ত্রমতের সাধক বৈষ্ণবগণ কবিরাজ গোস্বামীর নামে নানা জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এইরূপ বহু গ্রন্থের নাম ও সন্ধান জানি, কিন্তু পড়িয়া দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছি যে, তাহার একখানিও কবিরাজ গোস্বামীর রচিত নহে। অতএব ইঁহার নামের দোহাই দিয়া এ দেশের অপসম্প্রদায়ী বা তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল হইতেছে বা অমঙ্গল হইতেছে, তাহা সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাবের পর অতিবৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহারই গুরুর আদর্শে সাড়ে সাত প্রহর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে ব্যাপৃত থাকিয়া দিন যাপন করিতেন। শ্রীরূপ-সনাতন ও দাস গোস্বামীর বিরহে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা ও শ্রীল গোবর্দ্ধনশিলার সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কার্য্য ছিল না। ক্রমে এ কার্য্যের ভারও তাঁহার মুকুন্দ কবিরাজ-প্রমুখ শিষ্যগণের উপর ন্যস্ত হইল। অবশেষে তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইলে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দিরে আনয়ন করেন। এই স্থানেই সম্ভবতঃ ১৫২০ শকাব্দে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে —তাঁহার গুরুদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব-তিথিতে নিত্যলীলায় সমাগত হন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরেই শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রকে রাখিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরের চত্বরে একটি গৃহে—যেখানে পূর্ব্ব হইতেই ভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি বর্ত্তমান ছিল—সেই সুপবিত্র স্থানে কবিরাজ গোস্বামীর সমাধির ব্যবস্থা করেন। অদ্যাপিও সেই স্থানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

কক্ষচ্যুত

অবশেষে চাকরী একটা মিললো। কণ্ডাকটারী···! তা হোক, তবু চাকরী তো বটে। পথে পথে চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর মাঝখানে এ যেন আকস্মিক ঘটনা, আসন্ন অনাহারের চিন্তাক্লিষ্ট দিনগুলির মাঝখানে পরম আনন্দমুহূর্ত্ত। ক'দিন, ক'রাত্রি ধরে জাগরণে নিদ্রায় যে দুঃস্বপ্ন দেখে আসছি তার অন্ততঃ পরিসমাপ্তি ঘটলো। অনাহারের চিন্তা, পথের উপরে পড়ে মরবার ভীতি আর আত্মহত্যার সঙ্কল্পে টেনে নিয়ে যাবার অবকাশ পাবে না। তবু যেন কেমন একটা সঙ্কোচ, কিসের বাধা···! এ কি সহজাত সংস্কার না শিক্ষাভিমান?

রাতের আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠেছে। এমন অনেক রাত্রিকে মনে হয়েছে জ্যোৎস্না-কণ্টকিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ কবি হবার সখ হলো। মনে এলো বিস্মৃত দিনের কাব্য আর তার সঙ্গে বিগত দিনের স্মৃতি। চলচ্চিত্রের ছবির মত মনের রূপালী পর্দ্দায় তারা ভেসে উঠে ভীড় জমালো আকস্মিক—তার অনেকখানিই মধুর স্বপ্ন, অবাস্তব কল্পনায় ভরা, তবুও সেই অবাস্তবই ছিলো সে দিনের সম্বল। এই কল্পনা-বিলাসের মাঝখানে আজ নূতন করে অনুভব করলাম এমন মধুর বেদনা যা' এর আগে ছিলো আমার অনুভূতির বাইরে।

প্রেম, প্রীতি, মনের সব কোমল বৃত্তিই মরেছে তিলে তিলে! দেশোদ্ধারের স্বপ্ন, কবি হবার সখ, হাততালির লোভের হয়েছে অপমৃত্যু—যেমন করে আরও হাজার হাজার বাঙালীর ছেলে হয় আদর্শ-ভ্রষ্ট, অন্নচিন্তায় কক্ষচ্যুত উল্কার মতো লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিকে! প্রথম জীবনে যে লিখলো কবিতা, শেষ জীবনে সে হয়তো হলো তরল আলতার ফেরিওয়ালা—যে করতে গেলো দেশোদ্ধার তাকে খুলতে হলো গ্রাজুয়েট পাদুকালয়—সোভিয়েট রাশিয়া যাকে স্বপ্ন দেখালো সে পিষতে বসলো কলম। এই হ'চ্ছে যখন শেষ পরিণতি তখন দুঃখ করবার কি আছে? তবু শুকনো ফুলের মতো অতীতের স্মৃতির সৌরভ যেন মরেও মরে না। হতে পারে এ শুধু নিছক ভাবপ্রবণতা, তবুও একে অস্বীকার করা যায় না।

সারা রাত্রি কাটলো অনিদ্রায়। মাঝে মাঝে কি একটা করুণ ক্রন্দনের শব্দ কাণে বাজছিলো, চমকে উঠছিলাম। হয়তো পথের উপর পড়ে কোনও বুভুক্ষু ধুঁকছে আর অপেক্ষা করছে মৃত্যুর—যে তার জীবনে টেনে দেবে কালো যবনিকা; কালো তবু মধুর, ভয়াবহ তবু সুন্দর। মৃত্যু ওর কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ—সমাপ্তি;

নয়, বিশ্রাম। ও কি অভিশাপ দিচ্ছে বিধাতাকে, মানুষকে আর ওর অদৃষ্টকে? নিষ্করুণ বিধাতার বেদী, মানুষের জীবনের বনিয়াদ কি কেঁপে উঠছে না লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুর মৃত্যু-আতুর দীর্ঘশ্বাসে?……

তবুও আজ আর তেমন করে বৃদ্ধ বিধাতাকে অভিশাপ দিতে পারছি না—রুদ্ধ রোষে, নিষ্ফল আক্রোশে ধনীর প্রাসাদের দিকে চেয়ে মনে জাগছে না কোন জিঘাংসা বৃত্তি। বরং বার বার মাথাটা নুয়ে পড়ছে অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশে। এই রকম এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কখন যে বার কয়েক হাত যোড় করে প্রণামও করে বসেছি খেয়াল ছিল না। বেকার-জীবনের পরিসমাপ্তি আমার সব গ্লানি যেন ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

* * * *

সূর্য্যোদয় থেকে গভীর রাত্রি…। সহরতলীর মসৃণ পথে গাড়ীর চাকা গড়িয়ে চলে বিরামহীন গতিতে। যাত্রীর ভীড়ে, বিচিত্র কলরবে মুখর হয়ে ওঠে দিনগুলি। মাছের দর, রাজনীতি, বড়বাবু, বড়সাহেব থেকে মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্থান সব কিছুরই সন্ধান মেলে। ছেলের জ্বর, ম্যালেরিয়া, দেশের দুর্দ্দিন সব কিছুই কাণে ভেসে আসে। খণ্ড খণ্ড জনতার টুকরো টুকরো আলাপ-আলোচনা—ভাবের আদান-প্রদান—এরই মাঝে হঠাৎ গাড়ী যায় থেমে। কেউ নেমে পড়ে যাত্রা শেষে, কারো যাত্রা হয় সুরু। এ যেন জীবন-নাট্যের একখানা ছিন্ন পাতা, নূতন আগন্তুকের আগমনের উল্লাসে, পুরাতনের মহাপ্রস্থানে অবিরাম-গতি অবিচলিত পৃথিবীর মতো—কারো অশ্রু বা হাসিতে স্তব্ধ হবার নয়। এরই মাঝে হিসাবের অঙ্ক কষে চলি—অচল, মেকী চালাবার প্রচেষ্টাকে অতি সতর্কতায় প্রহত করতে হয় প্রতি মুহূর্ত্তে। এই কর্ম্মচাঞ্চল্য মন্দ লাগে না।

সকালবেলা যাঁরা যান অতি উৎসাহে অফিসে, কলেজে, স্কুলে, বেচা-কেনার হাট-বাজারে, সন্ধ্যায় অবসাদ-ভরা দেহে গৃহমুখী তাদের দেখে মনটা হতাশায় ভরে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে সচকিত করে তোলে প্রমোদপিয়াসীর দল। কেউ দল বেঁধে চলে সিনেমায়, কেউ বা সান্ধ্য ভ্রমণে—মুখে-চোখে খুসীর আমেজ, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর। মাঝে মাঝে কোন সুরভিসারের সুগন্ধ, সুবেশ তরুণ-তরুণী—জীবনটাকে যারা হাল্কা হাওয়ার পাখায় ভর দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

রাত্রিটা আমার নিজস্ব—আমিই তার বিধাতা। বিছানায় পড়ে পড়ে জেগে স্বপ্ন দেখি। রাত্রি আসে কখন জানবার সুযোগ ঘটে না, কিন্তু সূর্য্যোদয়টা প্রতিদিনই দেখতে পাই—বেকার-জীবনে যেটা ছিলো একান্ত দুর্লভ ঘটনা। আজও অন্ততঃ কিছুক্ষণ—কয়েক ঘণ্টা হলেও আমি স্বাধীন। রাত্রির অবকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়, আমারও একটা স্বাধীন সত্তা আছে। পরদিনের প্রভাত পর্য্যন্ত আমার খেয়ালখুসী মতো যা' ইচ্ছা করতে পারি, কেউ তাতে বাধা দেবে না—বিরাম মুহূর্ত্তে আমি কারো দাস নই, আমি আমার সম্রাট্। আমাকে নিয়ে যা' খুসী তাই করতে—এমন কি আগেকার দিনের মতো কবিতা লিখতেও পারি, কিন্তু কবিতা……! আজ ভাবলেও হাসি আসে, চাঁদের দিকে চেয়ে, গোলাপের দিকে চেয়ে নারীর দেহ-মনের স্তুতি……নিছক পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে! কবিরা সত্যিকারের পদ্মভুক্ই যদি হতো! কিন্তু ক্ষুধা, বড় বাস্তব।

* * *

আবার কেমন একটা বিসদৃশ, খাপছাড়া মনে হচ্ছে নিজেকে। কিছুতেই বর্ত্তমানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। নূতনত্বের মোহ ধীরে ধীরে কেটে গেছে, একঘেয়ে নীরস কর্ম্মস্রোতের মাঝে আর টিকে থাকবার সামর্থ্য যেন আমার নেই। পথের দু'ধারে সার সার অট্টালিকা আমাকে ব্যঙ্গ করে হাসছে, কুটীর করছে অবহেলা। এমন করে অভিশপ্ত আমাকে কে করলে, ঈশ্বর না অদৃষ্ট……?

সে দিন একান্ত আকস্মিক ভাবে সাক্ষাৎ হ'য়ে গেলো পুরাতন এক বন্ধুর সঙ্গে—বিচিত্র পরিস্থিতিতে। সে যাত্রী আর আমি কণ্ডাক্টার! বহু দিন পরে সাক্ষাতের একটা উচ্ছ্বাস, আলাপের একটা উদগ্র আগ্রহ মনে জাগলো। কিন্তু সেটা নিবে যেতেও বেশীক্ষণ লাগলো না। মনে মনে কেমন একটা লজ্জা অনুভব করলাম। বন্ধুটি চলেছেন তাঁর এক বান্ধবীকে নিয়ে—হয়তো সিনেমায়, না হয় মার্কেটিংএ। নিজের পরিচ্ছদটার দিকে চাইতেই সঙ্কোচের চেয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা হয়ে উঠলো প্রবল। সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালাম! টিকেট স্যার।

বন্ধুটি যে আমার এত বড় অভিনেতা, এর আগে আমার জানা ছিলো না। মাত্র এক মুহূর্ত্ত—তার চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়, তার পরই সে নিঃসঙ্কোচে এমন অপরিচিতের অভিনয় করলো, তাতে—আমি যদি রঙ্গালয়ের দর্শক হতাম আর সে দাঁড়াতো পাদপীঠে, হাত-তালি না দিয়ে পারতাম না। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে পয়সা কটা নিয়ে টিকেট দিয়ে চলে এলাম। তার দিকে চাইবার শক্তিও আর আমার ছিলো না। এর চেয়ে বেকার-জীবন যে ছিলো অনেক ভালো—বন্ধুদের কাছে পেয়েছি সহানুভূতি, আত্মীয়ের কাছে অনুকম্পা। আজ আমি কক্ষচ্যুত হয়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি!

কিন্তু যেখানে নেমে এসেছি সেখানেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কি? আমার বর্ত্তমান পরিবেষ্টনের মাঝখানে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিঃশেষ করবার সামর্থ্য আমার কোথায়? সারাদিনের কাজের শেষে আর সকলে যখন দল বেঁধে হল্লা করে, আলাপ-আলোচনায়, নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে, তখন নিজেকে একাকিত্বে ডুবিয়ে রেখে এসেছি এত দিন। আবাল্য শিক্ষার মোহ আমায় শিখিয়েছে—ও সব কুৎসিত ইতরতা, অভদ্রতা। জামা-কাপড়ের নীচে অনাহারজীর্ণ দেহে যে এতখানি ভদ্রতার টনটনে জ্ঞান লুকিয়ে ছিলো আজ তা বিশ্লেষণ করে প্রথম বুঝলাম।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমায় ত্যাগ করেছে বর্ত্তমান বৃত্তির প্রতি নিদারুণ ঘৃণায়—আর এরা আমাকে সরিয়ে রাখতে চায় ভদ্রলোক বলে। চমৎকার! স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ—নরকেরও তাই। কে আমায় বাঁচাবে—অদৃষ্ট, মানুষ না ঈশ্বর?

আবার যেন আত্মহত্যার প্রবৃত্তিটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে—অনাহারের ভয়ে নয়, নিজের উপর নিদারুণ ঘৃণায়।

* * *

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, কোন্ এক জ্যোতির্ব্বিদ্ না-কি আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলতে চলতে কূয়ার মধ্যে পড়ে

গিছিলেন। আমারও হয়েছে তাই, কণ্ডাকটারের আবার এত ভাবালুতা কেন ?

ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম একটি মেয়েকে। জীর্ণ শতছিন্ন কাপড়ে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে কোলে একটি রুগ্ন শিশু নিয়ে চলেছে সহরের দিকে। নিত্য নিয়মিত সময়ে এসে বাসে ওঠে, কোন দিন ব্যতিক্রম নেই। বোধ হয়, কোন হাসপাতাল কিম্বা দাতব্য-খানাই তার গন্তব্যস্থান। দু'-এক দিন ফেরার সময় হাতে ঔষধের শিশি দেখে অন্ততঃ আমার সেই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়েছিলো। মাঝে মাঝে মনে হতো, বেচারা কত কষ্টেই না বাসভাড়ার পয়সা ক'টা সংগ্রহ করে, এক দিকে তার শিশুর জীবন আর এক দিকে হয়তো নিজের অনাহার। মায়ের কাছে শিশুর জীবনটাই বড় হয়ে ওঠে, সেখানে আর কোন প্রশ্নই স্থান পায় না। ফলে যে পয়সায় তার নিজের একবেলার আহার কিম্বা শিশুর সাদা বার্লিতে এককোঁটা দুধ পড়তে পারতো, তাই গিয়ে জমা হয় এমন এক জায়গায়—যেখানে প্রাচুর্য্য উপছে পড়ছে।

কিন্তু আমি······? আমি কি করতে পারি ? আজ যে আমার সত্তা এমন এক জনের দ্বারে বিক্রীত, যেখানে মমতার কোন স্থান নেই, আমিও যে শোষণযন্ত্রের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আজ তো আমি বেকার নই। দু কোঁটা চোখের জল ফেলবার স্বাধীনতাও আজ বোধ হয় আমার নেই।

সকাল থেকে অসহ্য গুমোটের পর বৃষ্টি নেমেছিলো অজস্র ধারায়। বর্ষণটা যেমন আকস্মিক, ভীড়টাও সেই পরিমাণে অতিরিক্ত হ'য়ে উঠেছিলো। বাসের পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি বোধ হয় মনের আনন্দেই দুর্বোধ্য ভাষায় গান জুড়ে দিয়েছিলো, গাড়ীর গতিও সেই পরিমাণে হয়ে উঠেছিলো দুর্ব্বার। মাঝে মাঝে ষ্টপেজ, গাড়ী অকস্মাৎই একটা প্রচণ্ড দোলা দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে থেমে যায়, কিন্তু যাত্রীদের যেন আজ আর নামবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

সেই মেয়েটিকে দেখলাম, বুকে তার তেমনি ভাবে জড়িয়ে-ধরা শিশুটি—যেন ভীড়ের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। বহু কষ্টে টিকেট সংগ্রহ করতে করতে তার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। মেয়েটি কি বলতে চাইলো ; কিন্তু কুণ্ঠায় তার স্বর ফুটলো না—ঠোঁট দু'টি বার-কয়েক কেঁপে উঠলো মাত্র। আর একবার অভ্যাস মত উচ্চারণ করলাম, টিকেট।

মেয়েটির চোখ দু'টি এবার জলে ভরে উঠলো। বললে—আজ আর পয়সা নেই ; দয়া করে যেতে দাও বাবা। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন।

পিছন থেকে চেকারের রুক্ষ স্বর শুনতে পেলাম, পয়সা নেই তো গাড়ীতে ওঠার সখ কেন ? যাও নেমে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ, গাড়ী থেমে গেলো। মেয়েটি আর এক-বার অনুনয় করলো রোগা ছেলে, এই বৃষ্টিতে······। কিন্তু চেকারের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে সে তার কথা শেষ করতে পারলো না, ধীরে ধীরে নেমে পড়লো। বৃষ্টির ধারা তখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এ পাশে ও পাশে শুধু ফাঁকা মাঠ, এতটুকু আশ্রয় পাবার স্থান নেই! বাইরের দিকে চাইবার সাহস হলো না, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো।

এক জন প্রৌঢ় ব্যাপারটি এতক্ষণ বেশ উপভোগ করছিলেন, গাড়ী চলতে শুরু করতেই মন্তব্য করলেন, যতো সব······! ও পাশ থেকে কার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—আহা, বেচারা!

পরমুহূর্ত্তেই আবার চললো মিউনিসিপ্যালিটির শ্রাদ্ধ। রাস্তার কাদা, ইলিশের দর, ভগবানের অবিচার, ছাতার দুষ্প্রাপ্যতার নরম-গরম সমালোচনা। কোণ থেকে এক রসিক ছোকরা আবৃত্তি করলেন—"তমালতালীবনরাজিনীলা, আভাতি বেলা লবণাম্বু-রাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"

মনটা যেন কেমন বিমিয়ে উঠলো ; কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুকটা ভরে গেলো, নিজেই বুঝতে পারলাম না।

* * *

হল্টেজে গাড়ী পৌঁছালো, যাত্রিশূন্য, একেবারে খালি। আবার এখনই যাত্রা শুরু হবে, আসবে নূতন নূতন যাত্রী। আকাশের দিকে চাইলাম, বর্ষণক্ষান্তির কোন চিহ্নই সেখানে নেই। দুর্য্যোগের ভয়ে পথগুলো জনমানবহীন, মাঝে মাঝে দু'-একখানা মোটরে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিলাম, হুইস্‌ল্ পড়লো—আসন্ন যাত্রার আভাস।

একে একে উর্দ্দী-তকমা ছেড়ে ফেললাম। বিস্মিত ষ্টার্টার এসে প্রশ্ন করলো : পোষাক খুলছো যে ! গাড়ী ষ্টার্ট নেবার সময় হয়ে গেছে।

কোন কথা না বলে নেমে পড়লাম পথে। শ্রাবণের ধারা যেন আমার মাথায় দেবতার আশীর্ব্বাদ। মনের মাঝে এক বিচিত্র অনুভূতি, অপূর্ব্ব আনন্দ। আবার সেই বেকার-জীবন, সেই পথ। তবু কি তৃপ্তি, কি আনন্দ !

পৃথিবীর আর কোন দুঃখই আমায় ভয় দেখাতে পারবে না, মনুষ্যত্বের গলা টিপে তিলে তিলে পারবে না হত্যা করতে। আজ আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

অন্ধ

শুধু যারা, চক্ষে নাহি দেখে তারা অন্ধ নয় ;
সত্য যাহা নিত্যকার কাজে
অনাবৃত, ধরণীর মাঝে
চির অবিকৃত,
কাল্পনিক তথ্য দিয়া হয়নি স্বীকৃত,
সেই সত্যে সরল সহজে
যারা নাহি বোঝে
পাণ্ডিত্যের করে অভিমান
সে কখনো নহে চক্ষুষ্মান্।

শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবীচৌধুরাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

গ্রন্থের চরিত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি—দেবীচৌধুরাণী (বধূ প্রফুল্ল নয়) ও ভবানী পাঠক বঙ্কিমের ভাবাদর্শ মাত্র, কিন্তু অন্য চরিত্রগুলি স্বভাবসঙ্গত। প্রফুল্ল-চরিত্রে আমরা তেজস্বিতা গোড়া হইতেই দেখিতে পাই। মা চাল চাহিয়া আনিতে বলিতেছেন—প্রফুল্ল ভিক্ষা চাহিয়া আনিতে রাজী নয়—সে বরং উপবাস করিতে রাজী—অনশনে মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত নয়। লাঞ্ছনা ও প্রত্যাখ্যানের ভয় আছে জানিয়াও স্বামি-গৃহে যাইবার প্রস্তাব প্রফুল্লই করিল। যে মাধুর্য্য তাহার মায়ের চরিত্রে ছিল না—প্রফুল্ল-চরিত্রে তাহা ছিল। বঙ্কিম তাহা পাশাপাশি দেখাইয়াছেন। প্রফুল্ল শাশুড়ীকে বলিল—মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করে? আমি তোমার সন্তান নই?

প্রফুল্ল কুন্দ নয়, তাহার চরিত্রে তেজস্বিতার সহিত মাধুর্য্যের সমন্বয় হইয়াছিল। সে তাই এক কথায় শাশুড়ীর মন গলাইল। কিন্তু এই তেজস্বিতারও একটা সীমা আছে। সে শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া আবেদন করিতে পারিল না। এ ক্ষেত্রে তাহার নারীসুলভ লজ্জা বাধা দিল। সে তেজস্বিনী হইতে পারে—প্রগলভা হইতে পারে না। সে চাহিয়াছিল পতিগৃহে দাসীবৃত্তি—বধূর মর্য্যাদাও সে চায় নাই! নিরাশ্রয়া সে, আশ্রয় পাইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। জীবনধারণের জন্য দু'টি অন্ন চাই—সতীধর্ম্মরক্ষার জন্য একটু আশ্রয় চাই। নিষ্ঠুর শ্বশুর তাহাও তাহাকে দিল না। সদয়হৃদয় বঙ্কিম তাহাকে রাণীগিরি দিয়াছিলেন—পিতার চেয়েও অধিক দরদ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল পতিগৃহের আশ্রয়টিকে এক দিনের জন্যও ভুলে নাই। সাহিত্যের প্রজাপতির দেওয়া রাণীগিরি ছাড়িয়া সে নারীত্বের প্রজাপতির দেওয়া গৃহকোণটিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পণরক্ষা ও নারীজীবন চরিতার্থ করিল। কেবল কি আশ্রয়টুকু ও দু'-মুঠা অন্নের জন্য সে এবার ফিরিল?

সে প্রেমের স্পর্শও লাভ করিয়াছিল—প্রফুল্ল এক রাত্রির জন্য ব্রজেশ্বরকে পাইয়াছিল। প্রফুল্ল বিতাড়িত হইল, কিন্তু সে অদৃষ্টকেই দায়ী করিল। হরবল্লভের উপর সে কোন রোষ পোষণ করিল বলিয়া মনে হয় না। রোষ পোষণ করাই উচিত ছিল—তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রফুল্ল বুদ্ধিমতী; সে ভাবিল, হরবল্লভেরই বা দোষ কি? সে কালের সমাজ-শাসনে ইহাই ত স্বাভাবিক। হরবল্লভও তো সমাজেরই আজ্ঞাবহ মাত্র।

ব্রজেশ্বর যেরূপ পিতৃভক্ত—তাহাতে স্বামীর পিতার প্রতি রোষ পোষণ করিলেও চলিবে না। ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রফুল্লর রোষ পোষণ করা ত চলিতেই পারে না। শ্বশুর বলিলেন—'তাড়াইয়া দাও—চুরি ডাকাতি করিয়া খাক্‌গে।' ব্রজেশ্বর পিতার আদেশ পাইয়াও প্রফুল্লকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া অঙ্গুরী উপহার দিল—খোরপোষের ব্যবস্থা করিব বলিয়া ভরসাও দিল। অক্ষম পরাধীন স্বামী ইহার বেশী কি করিবে? ব্রজেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার অচলাই থাকিল—এই শ্রদ্ধাটুকুই তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। এইটুকুই ছিল তাহার জীবনপথের পাথেয়। প্রফুল্ল বনবাসিনী হইল, কিন্তু চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই।

তার পর যে জগতে সে বিহার করিল, তাহাতে স্বামী ও সাংসারকে ভুলাইবার আয়োজন অল্প ছিল না। নিষ্কাম ধর্ম্ম ও সতীধর্ম্ম, সন্ন্যাস ও সংসার দুইএর মধ্যে তাহার জীবনে দারুণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। কিন্তু পতিপ্রেম কিছুতেই পরাহত হয় নাই।

নিশিকে প্রফুল্ল বলিয়াছিল—"কখনও স্বামী দেখ নাই তাই বলিতেছ। স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল—একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত।

ভবানী ঠাকুরের একটা মস্ত বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত। ঠাকুর এ কথাটি আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল করিত।

যাহা হউক, নিষ্কাম কর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রফুল্লকে ডাকাতের অধিনায়িকা সাজিতে হইল। ইহাতে চির-নিগৃহীতা প্রফুল্লের অত্যাচারী সমাজের উপর প্রতিশোধ লওয়ার বাসনা কি প্রচ্ছন্ন ছিল না? নারীজন-সুলভ সহজ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য যাহা সে হারাইয়াছিল, বলোপচয়ের দ্বারা তাহা অধিকার করিবার ইচ্ছা কি সে বাসনার সহিত জড়িত ছিল না?

যে দেবীচৌধুরাণীর নামে উত্তরবঙ্গ কাঁপিত—ব্রজেশ্বর বজরায় আসার পর সে দেবীচৌধুরাণী আর থাকিল না—কাঙ্গালিনী প্রফুল্লই তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল। তাহার নিষ্কাম কর্ম্মের দৃঢ়চিত্ততা কোথায় গেল?

ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। নিশি বলিল—"এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা এখন?"

পঞ্চাশ হাজার টাকা হরবল্লভকে সমর্পণ করিয়া প্রফুল্ল প্রতিহিংসা গ্রহণ করিল। তার পর ব্রজেশ্বর বজরায় ফিরিয়া আসিলে প্রফুল্ল যে কথা তাহাকে বলিল—তাহাই প্রফুল্লের চরম কথা—"তুমি আমার দেবতা, আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম; শিখিতে পারি নাই। তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।"

ইহাও গীতা ছাড়া নয়। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। হিন্দুনারীর স্বধর্ম্ম ইহাই—প্রফুল্ল পরধর্ম্ম আচরণ করিতে গিয়াছিল। প্রফুল্ল একটা পরিমূর্ত্ত ভাবাদর্শ হইবার আগে রক্তমাংসের মানবী—হিন্দু নারীই ছিল। বঙ্কিম দেবীচৌধুরাণীর মধ্যে প্রফুল্লকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে দস্যুরাণী দেবীচৌধুরাণীর মধ্যে বাঙ্গালী ঘরের প্রফুল্ল উঁকি দিয়াছে। বঙ্কিম পুরুষের আদর্শে নারীকে গড়িয়া তুলিবার Experimentএর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—নারীর নারীত্বকে একেবারে ধ্বংস করা যায় না। নারীজনোচিত কোমলতা, সহৃদয়তা, শালীনতা, লজ্জাশীলতা ও দুর্ব্বলতা তাই দেবীচৌধুরাণীর মধ্যে থাকিয়া গিয়াছিল।

দেবীচৌধুরাণী শেষ করিয়া স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে—ইহা

আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা, না আদর্শবাদের বৈফল্য প্রদর্শন ? আমাদের মনে হয়—আনন্দমঠেও যাহা, দেবীচৌধুরাণীতেও তাহাই দেখানো হইয়াছে। অবাস্তব আদর্শবাদের বৈফল্য দেখানোই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। সধবা নারীর পক্ষে পুরুষগণের অভিনেত্রী ব্রহ্মচারিণী দেবী-চৌধুরাণীর আদর্শ ভ্রান্ত পথ। তাই কুলবধূ গৃহিণীর আদর্শের শেষ পর্য্যন্ত জয় দেখানো হইয়াছে—দেবী তাহার বজরা ত্যাগ করিয়া যে গৃহ হইতে সে এক দিন বহিষ্কৃতা হইয়াছিল—সেই গৃহে গৃহিণী-জীবন ফিরিয়া পাইয়াই তাহার জীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই গৃহিণীর যে আদর্শ তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; ঘরে ঘরে বাংলা দেশে সে আদর্শ-গৃহিণী বহু কাল হইতে বিরাজ করিতেছে। যাহাই হউক, বঙ্কিম যে আদর্শের একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন—সে আদর্শও একেবারে অবাস্তব নয়। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলেও দেহ-মন-চরিত্রকে অনুশীলনের দ্বারা সুগঠিত করিতে হয়—বঙ্কিম এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণী হইবার সুযোগ সুবিধা ত কাহারও ঘটে না এবং তাহার জন্য এত ঘটা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। উহা একটা বিপরীত আদর্শের বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই নয়। বঙ্কিম ঐরূপ আদর্শের বৈফল্যই দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে এই শ্রেণীর আদর্শগুলি বঙ্কিমের স্বপ্ন ও চিন্তার এক একটা রূপ। এইগুলি স্বতঃই বঙ্কিমের হৃদয়ের গাঢ় প্রীতি লাভ করিয়াছিল—এইগুলির অনিবার্য্য পরিণতি কি, তাহা তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন—তবু এইগুলির প্রতি তাঁহার মমতা কম ছিল না। মমতা কম ছিল না বলিয়াই এই আদর্শগুলিকে প্রাণের দরদ দিয়া উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন এবং ইহাদের অনিবার্য্য পরিণতি দেখাইতে গিয়া তাঁহার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে। সাহিত্যে ইহার ফল ভালই হইয়াছে—এই বেদনা যে কাব্যরসের পুষ্টি দান করিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব।

তাঁহার পরমপ্রিয় আদর্শকে বিদায় দিতে বেদনার সঙ্গে তাঁহার অভিমানও কম হয় নাই। অভিমানে তিনি দেবীচৌধুরাণীকে দিয়া বাসন মাজাইয়া লইয়াছেন। সত্যই হরবল্লভের সম্পন্ন সংসারে প্রফুল্লের বাসন মাজিবার কথা নয়। ইহা শুধু বঙ্কিমের অভিমানের অভিব্যক্তি মাত্র।

বঙ্কিম আদর্শকে ভালবাসিতেন—তাই বলিয়া তিনি গোঁড়া-আদর্শবাদী ছিলেন না। আদর্শবাদের পরিণাম তিনি জানিতেন। আদর্শকে বর্ণাঢ্য করিয়া উপস্থাপিত করার জন্য তাঁহাকে লোকে আদর্শবাদী বলিয়া থাকে। লৌকিক জীবনে ব্যর্থ জানিয়াও আপনার স্বপ্নাদর্শগুলিকে বাণীরূপ দান করিতে তিনি কখনো হৃদয়ের কার্পণ্য দেখান নাই।

আনন্দমঠে পুরুষের পক্ষ হইতে অবাস্তব আদর্শবাদের বৈফল্যের কথা আছে—দেবীচৌধুরাণীতে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষ হইতে একই কথা বলা হইয়াছে। পুরুষের পক্ষ হইতে ভবানী পাঠকের মানসিক পরিণতি। নারীর পক্ষ হইতে দেবীচৌধুরাণীর কথা। পুরুষের জীবনের আদর্শ ও নারীর জীবনের আদর্শ এক নয়। নারী পুরুষের আদর্শ অনুসরণ করিতে গেলে তাহার নারীত্ব নষ্ট হয়। নারীর নারীত্বই যদি গেল—তবে তাহার থাকিল কি ?' বিধাতা যে ভাবে নারীকে গড়িয়াছেন তাহাতে তাহার মাতৃত্বেই তাহার সার্থকতা—প্রভুত্বে নয়, সৃষ্টিতেই তাহার সার্থকতা, ধ্বংসবৃত্তিতে নয়। এই ভাবে আদর্শবাদের আর একটি শাখা এই গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে।

অবাস্তব আদর্শের অনুসরণ এক প্রকার যোগসাধনের মত। বহু জীবন ইহার ফলে ব্যর্থ হয়—আবার বহু জীবন আদর্শের চরিতার্থতা লাভ না করিলেও একেবারে কিছু লাভ করে না, তাহা নয়। উহা চরিত্রগঠনে সহায়তা করে এবং তাহার কোন কোন অঙ্গ বাস্তব জীবনে সুফলপ্রসূ হয়। দেবী-চৌধুরাণীর জীবনে বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন—প্রফুল্ল যে সপত্নীদের নিজেরই বিভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করিয়া অম্লানবদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বামিসোহাগের অংশ দিতে পারিল, বঙ্কিম বলিয়াছেন—তাহা গীতার নিষ্কামধর্ম্মচর্চ্চারই ফল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকিলেও যথেষ্ট হইতে পারে, অত বড় আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। বঙ্কিম দেখাইতে চাহিয়াছেন, শুধু বুদ্ধিতে কুলায় না। সূর্য্যমুখী বুদ্ধিমতী কম ছিল না। বঙ্কিমের বক্তব্য, সূর্য্যমুখী ছিল আমিত্বে ভরা। তাই অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। এই আমিত্বের ধ্বংস বুদ্ধির দ্বারা হয় না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র সাধনা চাই।

ব্রজেশ্বর—আদর্শ পিতৃভক্ত পুত্র। জমিদারের পুত্র—কাজেই নিজে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে না—করিবার কথাও নয়। সেকালে জমিদার-পুত্রের বা ধনী লোকের সন্তানদের এ যোগ্যতা থাকিত না—উপার্জ্জনক্ষম হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহারা তাহাও মনে করিত না। কাজেই ব্রজেশ্বর একেবারে পিতার সম্পূর্ণ অধীন। পিতৃ-আজ্ঞা সর্ব্বক্ষেত্রেই শিরোধার্য্য। তবু ব্রজেশ্বর একেবারে অমানুষ নয়। পত্নীপ্রেম ও পিতৃভক্তি দুইএর মধ্যে তাহার জীবনে দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল। সে ঝাঁটা মারিয়া প্রফুল্লকে দূর করিতে পারে নাই। এক রাত্রি তাহাকে শয্যায় স্থান দিয়াছিল —ইহা তাহার পক্ষে কম সাহসের পরিচয় নয়। জমিদারপুত্র হইয়াও সে নিঃসম্বল। অঙ্গুরী ছাড়া তাহার কিছু পুঁজি ছিল না। তাহাই সে প্রফুল্লকে দিয়াছিল। সে প্রফুল্লকে বলিয়াছিল—যাহাতে আমি দু'পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টাই করিব। যেমন করিয়া পারি তোমার ভরণপোষণ করিব। তার পর একদিন ব্রজেশ্বর ঘোড়ায় চড়িয়া প্রফুল্লের পিত্রালয়ে গিয়াছিল—তখন প্রফুল্ল পাল্কী চড়িয়া জমিদারের কাছারিতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রফুল্লর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ব্রজেশ্বর বড়ই কাতর হইয়াছিল—এ সংবাদটা আমরা পাই।

তাহার সাহস বিক্রম কিছুই ছিল না তাহা নয়—কিন্তু দেবীর বজরায় আসার পর ব্রজেশ্বর নারীগণের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বীরপুরুষদেরও এ দশা হইতে পারে। হরবল্লভ অসময়ে উপকারিণী দেবীচৌধুরাণী তথা ব্রজেশ্বরের পত্নীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিল—ব্রজেশ্বর তাহা শুনিয়াছিল। ইহাতে পিতার প্রতি অভক্তি জন্মিতে পারিত—কিন্তু ব্রজেশ্বর স্মরণ করিল—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

নিশি ব্রজেশ্বরের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল,—'নূতন বিবাহিত বলিয়া প্রফুল্লকে নিজের বাড়ীতে চালাও।'

ব্রজেশ্বর বলিল—বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে ? বাপের চোখে ধূলো দিয়ে মিছে কথা বহাল রাখিয়া আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব ?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল, ব্রজেশ্বর-পুরুষ

বটে! পুরুষ আমরাও বলিতাম—যদি বাপের অনুমতি লইয়া ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীকে চুম্বন করিত।

মোট কথা, ব্রজেশ্বর অন্ন বস্ত্র ও সাংসারিক জীবনে পিতার অধীন একটি নিরুপায় যুবক মাত্র। তাহার ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষ বিশেষ কিছু নাই।

এখন কথা হইতে পারে, ব্রজেশ্বরের কি করিবার ছিল? সে পিতার অধীন, নিজের বলিতে তাহার কিছু নাই, সে আরও দুটি বিবাহ করিয়াছিল—সে স্বভাবতঃই পিতৃভক্ত—পিতৃদ্রোহী হইবার কথা সে ভাবিতেও পারিত না। সাগর-বৌএর কৌশলে এক রাত্রির জন্ম প্রফুল্লের সহিত মিলন হইয়াছিল—সে সময়ে তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কিছু উন্মেষ হইয়াছিল—সে অঙ্গুরী দিয়াছিল—এক দিন পরে প্রফুল্লর খোঁজে শাশুড়ীর গৃহেও গিয়াছিল। কিন্তু প্রফুল্ল যাহাতে নিরাশ্রয় অবস্থায় না থাকে, সে ও তাহার শাশুড়ী যাহাতে অন্নাভাবে দুঃখ না পায়—তাহার কি ব্যবস্থা সে করিয়াছিল? সেটুকু করিবারও সামর্থ্য যাহার নাই—তাহার জীবনের কি স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে? পুস্তকের পরবর্ত্তী অংশে তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়াই রাখা হইয়াছে। অবশ্য তাহার হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্রজেশ্বর যেন সাংখ্যের পুরুষ। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবী-চৌধুরাণীরূপা প্রকৃতি যেন সক্রিয়া।

ব্রজেশ্বর একটি সেকালের পিতৃভক্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন যুবক—ইহা ছাড়া তাহার সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। এই চরিত্রের জন্যই কি বঙ্কিম বাবু দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থখানি পিতৃনামে উৎসর্গ করিয়াছেন?

দেবী-চৌধুরাণীর সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে সব থেকে জীবন্ত সাগরবৌ। ...র সংসার যখন দেশে ঘরে ঘরে না হউক, অতি সাধারণ ছিল তখন সপত্নী-কণ্টক লইয়া সকল নারীই জীবনটাকে ক্ষতবিক্ষত করিত না। যাহার যেমন প্রকৃতি, সে সেই ভাবেই চলিত। সপত্নীর সহিত সপত্নীর বনিবার কথা নয়—কেবল অহর্নিশ দ্বন্দ্ব ঘটিবার কথা! ইহাই সাহিত্যেও একটা Convention হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্কিম এ Convention ভাঙ্গিয়াছেন। যে নারীর জীবনীশক্তির আতিশয্য Excess of vitality অসাধারণ, যাহার চরিত্র প্রফুল্লতায় গড়া, সে সাপত্ন্যের বিষে জ্বলিয়া মরিতে যাইবে কেন? তাহার সাপত্ন্যও একটা আমোদের বস্তু।

সাগরবৌ বড়লোকের আদরের মেয়ে—সে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ প্রফুল্লতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে—তাহার প্রকৃতি সদাপ্রফুল্ল। সে যে বয়সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে সে বয়সে বালসুলভ চাপল্য দূর হয় না—জীবনীশক্তির হ্রাস হয় না—কথায় কথায় স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয় না; স্বামী লইয়া ঝগড়াঝাঁটির বয়সও তাহার নয়। স্বামিসুখের লোভ অপেক্ষা আমোদের লোভ তাহার তখন ঢের বেশি। Sense of humour তাহার অতি প্রখর। সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া সব থেকে আমোদের বস্তু পাইল সপত্নী নয়নতারাকে। তাহার রূপ, তাহার আকৃতি, তাহার প্রকৃতির মধ্যে সে প্রচুর আমোদের উপকরণ পাইল। ঝগড়া করিতে সাগর জানে না, কিন্তু ঝগড়া বাধাইতে ভালবাসে। নয়ানবৌ হিংসার জ্বালায় জ্বলিয়া মরে—একটুতে রাগিয়া যায়—তাহার হিংসানলে ইন্ধন যোগাইয়া সে আমোদ পায়—তাহাকে রাগাইয়া তাহার গালি খাইয়া সে মজা পায়। তবে সাগর অনেকটা নিশ্চিন্তও ছিল—নয়ানবৌএর দেহ-মনের শ্রীহীনতাই তাহাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছিল। সে জানিত, স্বামী নয়ানবৌকে ভয় করিবে,—কিন্তু ভালবাসিবে তাহাকেই।

প্রফুল্লর প্রথম আবির্ভাবে সাগরবৌ প্রথমটা একটু চমকাইয়া গিয়াছিল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ সদানন্দময় চাপল্য ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। সে যে প্রফুল্লর সঙ্গে স্বামীর মিলন ঘটাইয়া দিল, তাহা তাহার একটা নূতন আমোদ, সাগরের বধূজীবনের একটি চিত্র।

...সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল।

...ব্রজেশ্বর সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঝাঁপটায় বেড়া মুখ, তার উপরে ঘোমটা—ঘোমটার ভিতর হইতে পদ্মপলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে...সাগর স্বামীকে একটা কুলুপ ও চাবি দেখাইল—সাগর বাহির হইতে কবাট টানিয়া দিয়া শিকল লাগাইয়া কুলুপের চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া 'কি কর সাগর' 'কি কর সাগর' বলিয়া চেঁচাইল।

সাগরবৌয়ের চরিত্রটি এই চিত্রে চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। তার পর সাগরকে কুপিতা ফণিনীর রূপে তাহার বাপের বাড়ীতে দেখি—অবোধ বালিকা প্রফুল্লর মত স্বামিমর্য্যাদা বুঝিত না, একটা বেফাঁস কথা স্বামীকে বলিয়া ফেলিল। তার পর যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইল। ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রফুল্ল আসিয়া সাগরকে তাহার সহৃদয়তার ঋণ পরিশোধ করিল।

দেবীর বজরায় সাগরকে দেখি, সে দিব্য অভিনয় করিতেছে এবং আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছে। ব্যাপারটা হয়ত খুব সুরুচিসঙ্গত নয়, কিন্তু সাগরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার বেশ সামঞ্জস্য আছে এবং আর্টের দিক্ হইতে কিছুমাত্র অশোভন হয় নাই। সাগরের চরিত্রের সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয়—প্রফুল্লর চরিত্রের সঙ্গে হয় না। প্রফুল্লর সাহায্যে সাগরের প্রতিজ্ঞা পূরণটা ঘটিল। প্রফুল্ল কি করিয়া এইরূপ রসচাপল্য ও প্রগলভ লীলার সহায়তা করিল, তাহাই ভাবিবার কথা।

তার পর প্রফুল্ল সাগরবৌএর সঙ্গে সংসার করিতে আসিল। সাগর এখন স্বামী চিনিয়াছে—প্রফুল্লও সাগরের উপাস্যা হইয়া উঠিয়াছে। সাগর-চরিত্রের জীবনীশক্তিও কমিয়া আসিয়াছে। তাহা আসুক, সাগর মরে মরুক, কুলুপ-চাবি হাতে দুষ্ট হাসিভরা সাগরের ঘোমটা-ঘেরা অর্দ্ধচন্দ্র মুখখানি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে।

সাগরবৌ এক রাত্রির জন্য প্রফুল্লকে স্বামিসুখের আস্বাদ দান করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সাগরের সেই লীলাটুকুই ত জয়ী হইল। ভবানী পাঠক রঙ্গরাজও জয়ী হইল না, দেবীচৌধুরাণীও জয়ী হইল না, হরবল্লভও নয়, ব্রজেশ্বর ত নয়ই—জয় হইল সাগরবৌএরই; তাহার অর্থই হইতেছে—শিল্পী বঙ্কিমই তাত্ত্বিক বঙ্কিমকে এই গ্রন্থে শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছেন।

নয়ানবৌও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চরিত্র। সপত্নীবিদ্বেষ সাধারণ নারীর যেমন হওয়া স্বাভাবিক—তাহার তাহাই ছিল। সে আর কিছু না পারুক অপ্রীতিকর আচরণের দ্বারা,—দৈহিক লাবণ্যের অভাবের দ্বারা ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে প্রফুল্লকে কায়েম করিয়া দিয়াছিল—নয়ানবৌএর সঙ্গে তুলনা করিয়াই প্রফুল্লর মর্য্যাদা-মহিমা ব্রজেশ্বর বুঝিতে

শিখিয়াছিল। নয়ানবৌ প্রখরা মুখরা—কিন্তু শ্বশুর-তন্ত্র শাসনে অবশ্য যতটা সম্ভব ততটাই।

অন্যের মধ্যে প্রফুল্লর মায়ের চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। দুঃখিনী বিধবা, সংসারের সর্ব্ব সুখে বঞ্চিতা, অনেক সময় একটু মুখরাই হয়। প্রফুল্লর মা একটু মুখরাই ছিল এবং ধীর বুদ্ধির অভাবও তাহার ছিল। প্রতিবাসীরা লুচিমোণ্ডা না পাইয়া রাগ করিল। তাহাদিগকে চটাইয়া দুঃখিনী বিধবা গ্রামে বাস করিবে কি করিয়া তাহা সে ভাবিল না—তাহারা যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে তাহাও ভাবিল না। কোথায় তাহাদের হাতে-পায়ে ধরিবার কথা, তাহা না করিয়া সে তাহাদিগকে উল্টা গালি দিয়া বসিল। বুদ্ধির অভাবেই এই তেজস্বিনী মহিলা বড় দুঃখ পাইল।

কন্যাকে লইয়া সে গেল বেহাইএর বাড়ী। কোথায় কাঁদা-কাটা করিবে—তাহা না করিয়া বেহানকে সে দু'কথা খুব কড়া কড়া শুনাইয়া দিয়া রাগিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রফুল্লর দুর্গতির জন্য তাহার রসনা অনেকটা দায়ী। পল্লীগ্রামে এইরূপ নারীর মৃত্যু যে ভাবে হয়—সেই ভাবেই তাহার মৃত্যুও হইল।

হরবল্লভ সেকালের জমিদার ও গৃহকর্ত্তার প্রতীক। পাকা Patriarch. বড় লাঠিয়াল পুষিত—প্রজার কাছে দ্বিতীয় কৃতান্তস্বরূপ, কিন্তু ইজারাদারের কাছে একেবারে বলির ছাগলের মত। পারিবারিক মণ্ডলে একচ্ছত্রাধিপতি—তাহার উপর কোন কথা কহিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। প্রবীণ গৃহিণীর অনুরোধ উপরোধও টিকিত না, একমাত্র পুত্র হইলেও ব্রজেশ্বর নতমস্তকে সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। যে পত্নীকে নিভৃতে ভালবাসে, হরবল্লভের আদেশে ব্রজেশ্বর তাহাকেও তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইল।

হরবল্লভ নিজে একটিই বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু খেয়াল মত ছেলের একাধিক বিবাহ দিয়াছিল। ব্রজেশ্বর পিতৃভক্ত পুত্র—যখনই তিনি আদেশ করিয়াছেন তখনই সে টোপর পরিয়াছে।

নারীজাতির প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। সে কালের আদর্শে সে নারীদিগকে জীবন্ত সম্পত্তিই মনে করিত। হরবল্লভ হৃদয়হীন ব্যক্তি ছিল—পুত্রবধূকে সে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু সে কি করিয়া দু'মুঠা খাইতে পাইবে তাহার কথা ভাবিলও না—বলিল, "চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বল!" গ্রামের লোকে একটা কলঙ্ক রটাইয়া দিল—অমনি বিচার না করিয়া, সন্ধান না লইয়া, ছেলের মনোভাব না বুঝিয়া, অনায়াসে সে পুত্রবধূকে পথে দূর করিয়া দিল।

যে বিপদের সময় রক্ষা করিল, কয়েদ হইতে বাঁচাইল—তাহাকেই ধরাইয়া দিবার জন্য সে রঙ্গপুরে ছুটিল! ব্রজেশ্বরের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, সে প্রথমে ডাকাতের টাকা লইতে চাহে নাই—যখন লওয়া হইল তখন সে শোধ দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হরবল্লভ ধমক দিয়া ব্রজেশ্বরকে নিরস্ত করিল এবং ছেলের সঙ্গেও প্রতারণা করিল!

প্রফুল্লর যদি পিতা থাকিত—তাহা হইলে হরবল্লভের প্রতি পোষিত বঙ্কিমের রোষ তাহাকেই আশ্রয় করিত—অভাবে সে রোষ সাগরের পিতাকে আশ্রয় করিয়াছে। আর হরবল্লভের দর্পচূর্ণ করিয়াছেন বঙ্কিম যোগাযোগের সাহায্যে। এই যোগাযোগ তাহার নিজেরই কৃতকর্ম্মের ফল। বঙ্কিম দেবীরাণীকে এ বিষয়ে মুক্ত করিয়াছেন, দেবীরাণীর চরিত্রের মহান্ আদর্শরক্ষার জন্যই তাহার দ্বারা হরবল্লভের কোন দণ্ডবিধান করান নাই কিন্তু তাহার দণ্ডের প্রয়োজন—নতুবা গ্রন্থের ন্যায়নিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না—সে জন্য হরবল্লভের দ্বারাই তাহার আত্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্কিমের নিজস্ব রোষ প্রকাশিত হইয়াছে—দিবা ও নিশার মুখ দিয়া।

হরবল্লভ যদি সদাশয়, উদার-চিত্ত ও সুবিবেচক লোক হইত—তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির মূল্য অনেক কমিয়া যাইত। তাহা ছাড়া উপন্যাসের প্লটটিই দাঁড়াইত না। বহুবল্লভ ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভকে দুর্দ্দান্ত, ধূর্ত্ত ও কঠোর প্রকৃতির লোকরূপে চিত্রিত করার সার্থকতা যথেষ্টই আছে।

হরবল্লভের গৃহিণী সেকালের বহুপরিজন-বেষ্টিত পরিবারের গৃহকর্ত্রীত্বেই উপযুক্ত। সে প্রফুল্লর মায়ের তেজালো কথাগুলো সহ্য করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু প্রফুল্লর রূপে গুণে ও কথার মধুরতায় সে বিগলিত হইয়াছিল। সে প্রফুল্লকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তার পর প্রফুল্ল যখন ফিরিয়া আসিল—সে নিজের বুদ্ধিবলে সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া লইল। বঙ্কিম এই গিন্নীর নিজেই সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছে। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?" কৃষ্ণকান্তের উইলে এই গিন্নীপনার অভাবে কি অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি পরে বলিয়াছেন।

সমগ্র উপন্যাসখানিতে একটি জিনিস বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু। যে সকল প্রসঙ্গে বা যে সকল ঘটনার বিবৃতিতে রস জমাইবার সুবিধা নাই, বঙ্কিম সেগুলিকে অতি অল্প কথায় দ্রুততালে সারিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের Realistic উপন্যাসের পদ্ধতিতে সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি করেন নাই—যে সকল প্রসঙ্গ ও চিত্র রসসৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল—সেইগুলিতেই তিনি অধিক সময় ও অভিনিবেশ বিনিয়োগ করিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণীর ভিতরকার কঙ্কালটা তত্ত্বমূলকই বটে—কোথাও যে কঙ্কালের কোন-না-কোন অংশ মেদমাংস ঠেলিয়া প্রকট হইয়া উঠে নাই, তাহাও নয়। কিন্তু রসসৃষ্টির দিকেই বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। ফলে, দেবীচৌধুরাণীর বহু অংশই রসময়—কোথাও যে একেবারে রসাভাস হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। এক পুস্তকে নানা রসের সমবায় হইলে এক রস হইতে অন্য রসে প্রয়াণের সময় একটু আধটু রসাভাস ঘটিতে পারে।

দেবীচৌধুরাণীর যে সকল চিত্র ও প্রসঙ্গের সঙ্গে কোন তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই—সেগুলি হাস্যরসিকতা, বক্রোক্তি, চটুলতা, ও স্বাভাবিক রসস্ফূর্ত্তির বর্ণচ্ছটায় চমৎকার। মূল উপাখ্যানের স্ফুরণে যদি কোথাও অঙ্গহানি থাকে, পরিবেশের রসশ্রী তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। জল-জঙ্গলের আবেষ্টনীর মধ্যে গৃহসংসারের চিত্রটি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম বাবু গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—"দেবি, তুমি বল, আমি নূতন নহি। আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি—তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম।"

বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন—দেবীচৌধুরাণী মূর্ত্তিমতী গীতার বাণী। এই বাণী ভারতে যুগে যুগে প্রচারিত হইয়াছে—ভারত এই বাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল—তাই আবার সেই বাণীর কথা তিনি মনে পড়াইয়া দিলেন। সেই বাণীকে তিনি দেবীচৌধুরাণীর

রূপে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইলেন। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন—গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মবাদই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম প্রতিপালন সংসারের বাহিরে,—কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে সম্ভব নয়। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট নয়—এই ধর্ম্ম কর্ম্মজীবনে অভিব্যক্ত করিতে হইবে। সংসারের বাহিরে সন্ন্যাস জীবনে ইহা চরিতার্থতা লাভ করে না। উহা শুদ্ধ জ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীও এই সংসারেই সম্ভব। কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত উদাসীন ও সর্ব্বদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিতে হইলে ধর্ম্ম সন্ন্যাসে নয় কর্ম্মজীবনের মধ্যেই, গার্হস্থ্যজীবনের মধ্যেই আত্মাভিব্যক্তি সাধন করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন—"কঠিন কর্ম্ম এই সংসার ধর্ম্ম—ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" এই কঠিন ধর্ম্ম—কঠিন যোগসাধনকে এড়াইয়া যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে—তাহারা আদর্শ নয়। তাহাদের ধর্ম্ম অপূর্ণাঙ্গ। তাই তিনি দেবীকে আবার সংসারে ফিরাইয়াছেন। দেবীর ধর্ম্মসাধনকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেখাইবার জন্য আদর্শ গৃহিণীরূপে তাহাকে তুচ্ছতম গৃহধর্ম্মের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

বিনা সাধনায় এই নিষ্কাম কর্ম্মবোধ জন্মিতে পারে না। এই সাধনা বা অনুশীলন সংসারের মধ্যে থাকিয়া সম্ভব কি না বঙ্কিম তাহা বলেন নাই। দেবীচৌধুরাণীর যে সাধনার ইতিহাস তিনি দিয়াছেন—তাহাতে মনে হয়—তাহা সংসারে থাকিয়া সম্ভব নয়। ইহার জন্য আশ্রম চাই—ইহার জন্য গুরু চাই—ইহার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী চাই।—এমন কি, আশ্রম-জীবনেও শুধু যোগক্ষেত্র নয়, প্রয়োগক্ষেত্রও চাই।

বলা বাহুল্য, ইহা ভারতীয় আদর্শসম্মত! এই ভারতে পিতা কিশোর পুত্রকে বলিতেন—"বৎস, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ফিরিয়া এস।" কিশোর পুত্র আশ্রমে আশ্রমে বিচরণ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া গৃহজীবনে প্রবেশ করিত। ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য-জীবনেই আহৃত ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ করিত। সন্ন্যাসের সহিত গার্হস্থ্যজীবনের, ত্যাগের সহিত ভোগের, ব্রহ্মচর্য্যের সহিত কর্ম্ম-জীবনের এই সামঞ্জস্য প্রাচীন ভারতের আদর্শ; বঙ্কিম সেই পুরাতন কথাই দেবীর সাধনা ও সাধনার প্রয়োগের দ্বারা বলিয়াছেন। এ বাণী নূতন নয়, কিন্তু এ দেশ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, বঙ্কিম তাহাই দেবীচৌধুরাণীর চরিত্রের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে আবার শুনাইয়াছেন।

শ্রীকালিদাস রায়

পাট-চাষ ও পাট-শিল্পের সঙ্কট

পাট বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি গরিষ্ঠ অবলম্বন। অর্থকরী ফশল হিসাবে পাট বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পাটের চাহিদা ও মূল্যের উন্নতি-অবনতির সহিত বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চক্র আবর্ত্তিত হয়। খাদ্যশস্যের ফশল বাঙ্গালার কৃষকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব পূরণ করিবার পক্ষেও উপযুক্ত নহে। পাটের ফশল ভাল হইলে এবং তাহার চাহিদা ও মূল্যে মন্দা না ঘটিলেই বাঙ্গালার কৃষকের স্বল্পকাল-স্থায়ী স্বচ্ছলতা ঘটে। এই পাটের সহজ-লভ্য উচ্চ মূল্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া, বাঙ্গালার কৃষক অত্যাবশ্যক জীবন-ধারণের উপযোগী খাদ্য-শস্যের চাষের সঙ্কোচ করিয়া পাটের চাষের অযথা বিস্তৃতি-সাধন পূর্ব্বক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মূল্য-মন্দা ঘটিয়াছে। ফলে, কৃষকের আয়ের সঙ্কীর্ণতার সহিত খাদ্যশস্যের অভাব ও তদনুষঙ্গিক মূল্য-বৃদ্ধি হেতু তাহার দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। কয়েক বৎসরে অবস্থা এমন সঙ্কটজনক হইয়া আসিতেছিল যে, বাঙ্গালা সরকারকে প্রথমে উপদেশ-মূলক এবং পরে বাধ্যতা-মূলক পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ সুফল ফলে নাই। তাহার কারণ, পরাধীন দেশে কৃষকের স্বার্থ গৌণ; পরদেশী-পরিচালিত পাট-শিল্পের স্বার্থই মুখ্য।

প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারি প্রদেশের পাট-চাষ-ক্ষেত্রের একটি আনুমানিক অগ্রিম আয়তন-পরিমাণের পূর্ব্বাভাস (Forecast) প্রকাশিত হয়। সে পূর্ব্বাভাস প্রায়শঃই নির্ভরযোগ্য হয় না। সম্প্রতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রকাশিত শেষ (Final) সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, এ বৎসর পাট-চাষ-ক্ষেত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ একরে। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় ৬ লক্ষ একর কম এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ হইবে ৫৫ লক্ষ গাঁইট, অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ১৫ লক্ষ গাঁইট কম। ব্যবসায়ী মহলের বিশ্বাস, উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্ব-বৎসরের উদ্বৃত্তের আনুমানিক পরিমাণ ৪৪ লক্ষ গাঁইট, সুতরাং এ বৎসরে মোট প্রাপনীয় পাটের পরিমাণ ৯৯ লক্ষ গাঁইট। গত বৎসর মোট প্রাপনীয় পাটের পরিমাণ ছিল ১১৪ লক্ষ গাঁইট। ৯৯ লক্ষ গাঁইট পাট অবশ্য আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার কম হইলে মুস্কিল ঘটিবে।

চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক হইলেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য-হ্রাস ঘটে। ফলে, বর্ত্তমান বর্ষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইবা মাত্রই পাটের মূল্য অধোগতি লাভ করিয়াছিল। এ বৎসর ফশলের অবস্থা ভাল। সুতরাং উৎপাদন পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অধিকতর হইবে এবং উৎপাদন অধিক হইলে মূল্য হ্রাস পাইবে; এই আশায় পাট-কলওয়ালারা কম পরিমাণে কাঁচা পাট কিনিতেছিল। ফলে, পাট মরশুমের প্রারম্ভেই এই মূল্য-হ্রাস কৃষকের মনে স্বভাবতঃই এই আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের পরিশ্রম-লব্ধ পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইবে না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হক্ মন্ত্রিত্বের আমোলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাট-চাষ ক্ষেত্রের আয়তন তৎপূর্ব্ব বৎসরের আয়তনের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ কমাইয়া এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু পাট-শিল্পে দৃঢ়-স্বার্থসম্পন্ন

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় মন্ত্রিমণ্ডলী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অর্দ্ধেকের অধিক চাষ কমাইতে সম্মত হয়েন নাই। প্রধান মন্ত্রী তখন আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, অধিকতর পরিমাণে পাট-উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ফল খাদ্য-শস্য-উৎপাদনের সঙ্কোচ নহে। এ কথা যে যথার্থ নহে, তাহা আমরা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে উপলব্ধি করিয়াছি। যাহা হউক, যুদ্ধ-পরিচালনে চটের থলিয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এই নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালা সরকারকে পাটের চাষ অর্দ্ধেকের অধিক কমাইতে নিষেধ করেন। তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদি চাহিদার স্বল্পতা হেতু পাটের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাঁহারা আর্থিক সাহায্য দান করিবেন। সুতরাং প্রাদেশিক সরকারকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পাটের পরিস্থিতিতে এখন বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। পাথুরিয়া কয়লার অভাব, এবং সামরিক প্রয়োজনে সরকার কর্ত্তৃক চট-কলের বাড়ীগুলি অধিকারের ফলে পাট-শিল্প পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় পাট-কল-সভার (Indian Jute Mills Association) একটি উপ-সমিতি অধিকৃত কলগুলির নিমিত্ত সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত খেসারৎ, তাঁত-পরিচালন ঘণ্টা-সমষ্টির উপযুক্ত ব্যবহার (Proper utilisation of loom hours) এবং প্রাপনীয় পাথুরিয়া কয়লার সুশৃঙ্খল যোগান, এই তিনটি সমস্যার সমাধানে মনোযোগী হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, সমিতি এমন কোন উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইবেন, যাহার ফলে পাট-শিল্পের পঙ্গুত্বের অবসান ঘটিবে। যুদ্ধের পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্ত্তনের ফলে যখন সমুদ্র-সঙ্কট কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া মাল-চালানী জাহাজের চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা সুকর হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই পাট-শিল্পের খর্ব্বতা শোচনীয়; বিশেষতঃ যখন পাট-প্রস্তুত চট-থলে প্রভৃতির চাহিদা এখনও আমরা সম্পূর্ণ মিটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিতে আমাদিগকে গত বৎসরের ঘটনা-পারম্পর্য্যের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পাট-শিল্পের অবস্থা অতি সমৃদ্ধিজনক ছিল; কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ধীরে ধীরে ইহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ঐ বৎসরের প্রারম্ভে সমুদ্রপথে মাল-চালানী জাহাজের গতাগতির সুবিধাহেতু যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণে চট ক্রয় করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে স্বদেশে যে সর্ব্বোচ্চ দর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাড়াতাড়ি মাল ক্রয় করিয়া চালান দিবার প্রয়োজন হয়। ফলে এখানকার বাজারে প্রচুর পরিমাণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাজারের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের পাট-সরবরাহ উপদেষ্টার (Adviser on Jute Supplies) শরণাপন্ন হয়েন। সরকারী উপদেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীত মাল পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত দরের মেয়াদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছায়, তাহার ব্যবস্থা-কল্পে তাঁহাদের আবশ্যকীয় মালের যাহা তখনও প্রস্তুত হইতে বাকী ছিল, সেই অংশ বিভিন্ন কলওয়ালাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া কল-পরিচালনার কার্য্যকালও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল; কারণ, তখন কয়লার অনটন ঘটে নাই। কিন্তু মে মাসে এই পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় অধিকতর পরিমাণে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৭০ কোটি চট যোগান দিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করিবার কড়ারে চুক্তিকৃত মাল প্রস্তুত করিবার ভার সমস্ত কল-গুলির মধ্যে বাঁটিয়া দিবার অসুবিধা বিস্তর। তথাপি ভারত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই মালের ক্রেতাকে খুসী করিবার নিমিত্ত বাজার-চলিত দর অপেক্ষা কম দরে এই চুক্তি অঙ্গীকার করা হয়। কাঁচা মালের তদানীন্তন ক্রয়-মূল্যের অনুপাতে যুক্তরাষ্ট্র-প্রদত্ত দর বিশেষ লাভজনক ছিল না।

এই সময়ে সরকারের মূল্যস্ফীতি নিবারণ-নীতি অনুযায়ী মূল্য-শাসনের প্রস্তাব চলিতেছিল। সরকারের অভিপ্রায় পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া ভারতীয় পাটকল-সভা কাঁচা পাট কিনিবার সর্ব্বোচ্চ দরের একটি সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। বাজার-প্রচলিত দর তখন যুক্তরাষ্ট্রকে যে দরে মাল যোগান দেওয়া হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল। পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য এই বাজার-প্রচলিত উচ্চ-হারে নির্দ্ধারিত হয়। স্বভাবতঃই এই ব্যাপার লইয়া তখন বিশেষ আন্দোলন ঘটিয়াছিল। কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে হারে মাল বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাতে লাভ ছিল অতি স্বল্প। পাটনির্ম্মিত দ্রব্যাদির পরে যে মূল্য-মান নির্দ্ধারিত হয়, তাহার তুলনায় লাভের পরিমাণ শতকরা বিশ অংশেরও কম ছিল। নির্দ্ধারিত মূল্য-মান ছিল সর্ব্বোচ্চ; সুতরাং বাজার-প্রচলিত মূল্যের ঊর্দ্ধ ও অধোমুখী পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

গত বৎসরের (১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ) শেষ ভাগে পাট শিল্পে যথার্থই আতঙ্ক জাগিয়াছিল যে, বর্ত্তমান বর্ষে কাঁচা পাটের স্বল্পতা ঘটিবে। আতঙ্কের প্রধান কারণ ছিল বোধ হয় এই যে, খাদ্যশস্যের অভাব-হেতু খাদ্যশস্য-উৎপাদনের প্রতি অধিকতর মনোযোগের ফলে, পাটের উৎপাদন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত চাহিদার উপ-যুক্ত পরিমাণে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালা সরকার একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। পাটের মূল্য তখন যেরূপ কম ছিল, তাহাতে, কৃষকের পক্ষে পাটের চাষ একটুও লোভনীয় ছিল না। পক্ষান্তরে খাদ্যশস্য উৎপাদনার্থ কৃষকগণকে উৎসাহান্বিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল: উভয়কূল রক্ষা করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। পাটের চাষ অযথা কমাইবার বিপদ যেমন মারাত্মক ছিল, পাটের উচ্ছৃঙ্খল উৎপাদনও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই নিমিত্ত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নয়া দিল্লীতে পাট-ব্যবসায়ে ও পাট-শিল্পে নিযুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত বাঙ্গালা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসে। তাহাতে স্থির হয় যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পাট-চাষের যে পরিমাণ ছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ চাষ হইবে। তবে বাঙ্গালা সরকার বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যে, সেই অর্দ্ধেকের যেন কোন অংশে কম চাষ না হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তদ্বিনিময়ে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী উভয় মরশুমে উৎপন্ন পাটের উদ্বৃত্ত অংশ অন্যূন ১৫৲ টাকা মণ হিসাবে ক্রয় করিবেন। ইতি-মধ্যে ভারতীয় পাটকল-সভা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য-মানক্রম (Price Schedule) নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহাই বলবৎ থাকিবে এবং সরকার সেই মূল্যে পাট ক্রয় ও দখল

করিতে পারিবেন।' এই বৈঠকে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, পাটকল সভা উৎপন্ন দ্রব্যের (Manufactured goods) যে মূল্যমান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, সামান্য অদল বদল করিয়া তাহাই বহাল থাকিবে। এই উভয় মূল্যমানক্রমকে আইনে পর্য্যবসিত করা হইবে এবং পাটের মূল্যমান ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

সরকার কর্ত্তৃক আইনের বলে মূল্যমান-নির্দ্ধারণ কৃষক ও শিল্পী কাহারও পক্ষে মনঃপূত হইতে পারে না; কিন্তু ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় উপায় ছিল না; এবং আমরা আশা করিতে পারি যে, এই ব্যবস্থা কৃষক ও শিল্পী উভয় পক্ষেরই কল্যাণজনক হইবে। ভারতীয় পাট-কল-সভার গত বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ ডবলিউ, এ, এম, ওয়াকার বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় সভ্যদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সরকার পাটের নিম্নতম মূল্য ১৫৲ টাকায় নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদের শতকরা ৯০ জনের "স্বপ্ন" সফল করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, পাটের নিম্নতম মূল্য মণ প্রতি ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া,—বিশেষতঃ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য,—সরকার বিপজ্জনক ভাবে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাট-শিল্পের উন্নতির উপর বাঙ্গালা প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যে কতকটা নির্ভরশীল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে যথাসম্ভব কম-মূল্যে বিক্রয় করিতে না পারিলে পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ-জাতীয় শণ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে পাট-শিল্পকে রক্ষা করা দুরূহ, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু শিল্পের পক্ষে কাঁচা-মালের যে মূল্য লাভজনক, প্রাথমিক উৎপাদকের পক্ষে তাহা কখনই সন্তোষজনক হইতে পারে না। কৃষক তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পাইলে অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে পারে না। শিল্পের উন্নতিতে যে সম্প্রদায়ের উন্নতি, কৃষক হইতে তাহারা বহু দূরে ও বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। প্রাথমিক-উৎপাদক কৃষকের কথা দূরে থাকুক, যে শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত পাকা মাল উৎপন্ন হয় না, শিল্পের উন্নতিতে তাহাদেরই বা উদরান্ন ব্যতীত কতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা হইয়া থাকে? যুদ্ধের পরে পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী শণ প্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্যাদির প্রসার-প্রতিপত্তি যে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে ভয়ও মিঃ ওয়াকার দেখাইতে কৃপণতা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে; মিঃ ওয়াকার আরও শাসাইয়াছেন যে, যদি এই বিধি-বিধানের ফলে চোরা-বাজারের (Black market) উচ্ছেদ-সাধন না ঘটে, তাহা হইলে সরকার পাট এবং পাটপ্রস্তুত দ্রব্যাদি তলপ-দখল (Riquisition) করিবেন। মিঃ ওয়াকারও ইহাতে সম্মত হইবেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মিঃ ওয়াকার ভারতীয় পাটকল-সভার সভাপতি ব্যতীত সরকারের পাট-সংক্রান্ত উপদেষ্টাও বটেন।

চোরা-বাজারের উচ্ছেদ-সাধন সকলেরই একান্ত অভিপ্রেত; কিন্তু কাঁচা-পাটের দর সম্পর্কে একটু রহস্য আছে। কৃষকরা যাহাতে পাটের উপযুক্ত মূল্য পায় এবং তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব বিদূরিত হয়,—এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিক সরকার তাঁহার কর্ত্তব্য আংশিক ভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। ফসল-নিয়ন্ত্রণ, উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য-নির্দ্ধারণ এবং মূল্য নিম্নতম-মান অপেক্ষা নিম্নগামী হইলে নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল খরিদ করা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব আছে। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ব্যতীত এই অধ্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কারণ, কাঁচা-মালের নিয়মিত যোগান ও নির্দ্ধারিত মূল্য-মান ব্যতীত, শিল্প নিশ্চিন্ত ভাবে পাকা মাল উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে পারে না। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ হয় প্রচুর পরিমাণে সাগরপারে। অধুনা যুদ্ধপরিচালনার্থ মিত্রশক্তিগণের প্রচুর পরিমাণে পাটনির্ম্মিত চট ও থলিয়ার প্রয়োজন। শান্তিকালেও বৈদেশিক বাণিজ্য-শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। সুতরাং, এই পাট-শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ প্রচুর! অধিকন্তু, পাট-শিল্প যে সম্প্রদায়ের আয়ত্তাধীন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের উপর তাহাদের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং শিল্পের প্রগতির নিমিত্ত কাঁচা-মালের মূল্যকে যথা-সম্ভব কম রাখিবার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার, পাট-শিল্প অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় এবং প্রাদেশিক সরকার, এই তিন প্রবল শক্তির সংঘর্ষে প্রাথমিক উৎপাদক কৃষকের স্বার্থসংরক্ষণ সুদুষ্কর। পাটের নির্দ্ধারিত মূল্য যে কৃষকের অনুকূল হইয়াছে, তাহাও নিশ্চিত নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের কৃষককুল শিক্ষিত ও শক্তিসম্পন্ন নহে, নতুবা নির্দ্ধারিত মূল্য-মানের স্বল্পতায় বিক্ষুব্ধ হইয়া তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পাট-চাষের সঙ্কোচ ও খাদ্যশস্য আবাদের প্রসার সাধন করিত।

যাহা হউক, এ দেশে কাঁচা মালের উৎপাদকদিগের নিকট হইতে কোন শিল্পেরই আঘাত আসে না; আঘাত আসে অন্যত্র হইতে। বর্ত্তমানে পাটশিল্পের দুইটি প্রচণ্ড আঘাত আসিয়াছে,—প্রথম পাথুরিয়া কয়লার অভাবে এবং দ্বিতীয়, সামরিক প্রয়োজনে সরকার কর্ত্তৃক পাটকলগুলির তলপ-দখলে। গত বৎসরের শেষার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিলের ব্যাপার ছিল,—পাথুরিয়া কয়লার অভাব। রেলপথে মালগাড়ীর অভাবই ছিল প্রথমে প্রচণ্ড অসুবিধা। তার পর জুলাই মাসে প্রবল বন্যার প্রভাবে স্থানে-স্থানে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া কয়লা চলাচলের আরও অসুবিধা ঘটে। অন্যান্য যুদ্ধশিল্পের তুলনায় পাটশিল্প অবশ্য রেলপথে মালগাড়ী পাইবার উচ্চ সুবিধা পায় নাই। যাহা হউক, মাল চলাচলের সাধারণ উন্নতির ও রেলরাস্তা মেরামতের ফলে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল, কিন্তু কয়লার আমদানী ও সরবরাহ পাট-শিল্পের প্রয়োজনের উপযুক্ত হয় নাই। সরকার কয়লা-বণ্টনের সপ্তাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও মাত্র চারি সপ্তাহ পূরা মাত্রায় কয়লা পাওয়া যাইত এবং অন্যান্য সপ্তাহে শতকরা ৫০ হইতে বড় জোর ৮০ অংশমাত্র পাওয়া যাইত। কয়লা বিতরণ কর্ম্মচারীর (Coal Distribution Officer) নিকট পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারে তার করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। যুদ্ধ-পরিচালনাকর্ম্মে পাট-শিল্পের যথাসাধ্য সহযোগিতার আন্তরিকতা বিবেচনা করিয়া পাট-শিল্পে কয়লা যোগাইবার যোগ্যতর ব্যবস্থা করা সরকারের অতীব কর্ত্তব্য ছিল। বলা বাহুল্য যে, পাট-শিল্প সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়া কয়লার ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়াছিল।

তথাপি পাট-শিল্পে কয়লা সরবরাহের যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে, বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সরকার কয়লাক্ষেত্রের সমস্ত উত্তোলিত কয়লার ভার গ্রহণ করিয়া, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বক সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে পাট-শিল্পের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। সরকার সম্প্রতি বিলাত হইতে এক জন কয়লা-আমীন (Coal Commissioner) আমদানী করিয়াছেন এবং কয়লা-শিল্প ও কারবারে-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি কয়লা-শাসন-মণ্ডলী (Coal Control Board) গঠন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সরকারের উচ্চবিঘোষিত কয়লা-শাসন-পরিকল্পনা (Coal Control Scheme) সত্ত্বেও পাট-শিল্পে কয়লার তীব্র অভাবের কিছু মাত্র প্রশমন ঘটে নাই। কল-পরিচালনা কার্য্যকালের (Working hours) সঙ্কোচ এবং বাধ্যতামূলক ভাবে এক সপ্তাহ কল-পরিচালনা বন্ধ রাখিয়াও পাট-শিল্পে কয়লার অভাব-অনটন ঘুচে নাই। সম্প্রতি কয়েকটি কল কয়লার অভাবে মাসে এক সপ্তাহের অধিক কার্য্য করিতে পারে নাই। যে সকল কল বাষ্পে-পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য করে, তাহাদের অসুবিধাই সমধিক। বর্ত্তমান সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কল চালাইতে পারা যায় ; কিন্তু কয়লার অভাব এখনও এত তীব্র যে, ৩৬ ঘণ্টা কাজ চালাইবার উপযুক্ত ইন্ধন নাই। বাণিজ্য-সচিব সম্প্রতি কলিকাতার বণিক সভাগুলিকে ভরসা দিয়াছেন যে, বৎসরের শেষ ভাগে নিয়মিত এবং পরিমিত ভাবে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নত হইবে। কিন্তু এখনও তাহা ঘটে নাই ; সুতরাং শিল্পের অবস্থা কিরূপ, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

গত জুলাই মাসের শেষে পাট-কলগুলির গুদামে পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ১৭৮,৪৯২ টনে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের পরে পাকা মালের মজুত জমা কখনও এত কমে দাঁড়ায় নাই। গত জুন মাসে পাকা মালের হ্রাস-পরিমাণ ২৫,০০০ টন এবং জুলাই মাসের হ্রাস-পরিমাণ ১৬,১৪৩ টন। এই অঙ্ক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রপ্তানীর জন্য সমুদ্রপথে মাল-চালানী জাহাজের চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক উন্নত হইয়াছে। গত দুই মাসের উৎপাদন সমষ্টি অবনতি সূচনা করিবে। এদিকে চট, থলে প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাকা মালের মজুত জমা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। আমরা এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে, ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বণিজ-পণ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্ব-বৎসরের রপ্তানী-মূল্য ৩০½ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানী-মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৪১½ কোটি টাকা। পূর্ব্বে এই শীর্ষস্থান অধিকার করিত কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি। পক্ষান্তরে, ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে কাঁচা পাটের রপ্তানী আরও কমিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৮'৩২ কোটি টাকায় !

পাট-শিল্পের দ্বিতীয় মারাত্মক মুস্কিল, সামরিক প্রয়োজনে পাট-কলগুলির তলপ-দখল। গত কয়েক মাসে এই তলপ-দখলের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। যে পর্য্যন্ত এই তলপ-দখল গুদাম-ঘরে ও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহে নিবদ্ধ ছিল, তত দিন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এমন কি, প্রথম প্রথম কলওয়ালারা বিনা ভাড়ায় এইরূপ স্থানের দখল দিয়াছিলেন। কিন্তু গত খৃষ্টাব্দের শেষে একটি একটি করিয়া আটটি কলের দখল সরকারকে হাসিমুখে ছাড়িয়া দিতে হয়। কলওয়ালারা তখন মনে করিয়াছিল যে, এইখানেই সরকারী দাবীর অবসান ঘটিবে। কিন্তু সে আশা বিফল হইয়াছে। সম্প্রতি আরও দুইটি কল সরকার তলপ-দখল করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পাট-শিল্প দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ, এবং আর্থিক ও ব্যবহারিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত শিল্পে বিশেষ কোন বিপ্লব না ঘটাইয়া, পাট-কল-সভা সরকারের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই সহনশীলতাই তাহাদের অসুবিধার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্প্রতি সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন,—তাহার বিশদ অর্থ, শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত দৃঢ় শাসন পরিচালন (Rationalisation) এবং ক্ষতিপূরণ বন্দোবস্ত। যুক্তিসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত দৃঢ় পরিচালনের অর্থ এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে শ্রমিকদিগের নির্দ্ধারিত কার্য্যকালের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে (Multiple Shifts) পর্য্যায়ক্রমে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখা। পাট-শিল্প পরিচালন কারবারগুলির যে সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে একাধিক কল আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কিয়দংশে সম্ভবপর হইলেও সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। একই প্রতিষ্ঠানের শাসনাধীন কলগুলি বহু ক্ষেত্রে একই স্থানে অবস্থিত নহে। সুতরাং এক স্থানের কলের শ্রমিকদিগের ভিন্ন স্থানে যাইয়া ঘর-সংসার পাতাইয়া কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান সর্ব্বত্র সহজলভ্য নহে। সুতরাং এক স্থানের তলপ-দখলকৃত কলের সাজ-সরঞ্জাম, তাঁত ও শ্রমিকদিগকে অন্যত্র লইয়া যাইয়া একের ক্ষতি অন্যের দ্বারা সম্পূরিত হওয়া দুর্ঘট। কাগজে-কলমে অর্দ্ধেক স্থানে বহু দলে বিভক্ত শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কল চালাইয়া স্বাভাবিক সম্পূর্ণ উৎপাদন-সমষ্টি রক্ষা করা সম্ভবপর মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নহে। পাট-কল-সভার সভাপতি এ বিষয়ে সরকারকে যথেষ্ট সতর্ক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শতকরা ২৫ অংশ বর্জ্জন করিয়া, বাকী ৭৫ অংশে ১০০ অংশের তুল্য উৎপাদন যথেষ্ট শ্রম সাধ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে শতকরা ৫০ অংশ কল-বাড়ী সরকার তলপ-দখল করিয়াছেন। তদতিরিক্ত চাপ দিলে সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, তলপ-দখল পীড়নের আকার ধারণ করিবে। কিন্তু যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত কোন প্রচেষ্টাকে কিছুমাত্র খর্ব্ব করা সম্ভব নহে। সুতরাং পাটকল-সভার এক উপ-সমিতির সহিত সরকারপক্ষের তলপ-দখল, ক্ষতিপূরণ ও কয়লার নিয়মিত সরবরাহ, এই তিন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। সকলেই আশা করিতেছেন যে, উভয় পক্ষের পরিকল্পিত বন্দোবস্ত অচিরে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করিবে।

অনেকগুলি পাটকল তলপ-দখল করা সত্ত্বেও সরকারের আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন যেন প্রতি মাসে এক লক্ষ টনের ন্যূন না হয়। নতুবা সরকারই এমন একটি কল পরিচালনার যুক্তিসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত দৃঢ় সমৃদ্ধ কার্য্যপ্রণালী (Rationalisation) প্রবর্ত্তিত করিবেন, যাহা শিল্পের আদৌ অনুকূল না হইতে পারে। সুতরাং সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া পাটকল সভার কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া একটি কার্য্যপ্রণালী

নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি সমষ্টিগত কেন্দ্রী (Cantral) ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরকারের তলপ-দখলকৃত কলগুলির নিমিত্ত প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অর্থ এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে। এই ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত অর্থে যথার্থ ক্ষতিপূরণ হইবে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, এই ক্ষতিপূরণ অর্থ ব্যতীত যে সকল কল এখন আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহারা তাঁত প্রতি প্রত্যেক ঘণ্টা কার্য্যের নিমিত্ত একটি কর (Cess) দিবে। এই অর্থসমষ্টি হইতে তলপ-দখলকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কলগুলিকে তাহাদের ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইবে। কয়লার অভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত কলগুলিও এই ক্ষতিপূরণ অর্থ পাইবে। তবে সকলকেই যথাসাধ্য মিতব্যয়িতার সহিত উৎপাদনের শীর্ষ-সীমা রক্ষা করিতে হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী গত্যন্তরবিহীন হইয়া যে সকল কল এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের তাঁত প্রতি যে কার্য্যকরী ঘণ্টাগুলি (Loom-hours) এখন তাহারা ব্যবহারে লাগাইতে পারিতেছে না, সুসময়ে সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা সেগুলি প্রতি-সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার অধিককাল কার্য্য করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে। তবে বর্ত্তমানে কয়লার অভাবে, অথবা তলপ-দখলের ফলে যে সকল কল তাঁত চালাইতে পারিতেছে না, তাহারা তাহাদের তাঁত ও শ্রমিকদিগকে বাষ্প কিংবা তড়িৎশক্তি পরিচালিত সংপ্তি কলগুলিতে হস্তান্তরিত করিতে পারিবে এবং তাহার নিমিত্ত ভাড়া পাইবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাট-শিল্পের বিপদ ঘনীভূত হইয়াছে এমন সময়ে, যখন সমুদ্রপথে মাল-চলাচলের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং সমুদ্রপারে পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির প্রচুর প্রয়োজন রহিয়াছে। তলপ-দখলের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী এবং তজ্জনিত অসুবিধাও সদা-সশঙ্কিত অবস্থা এবং কয়লা সরবরাহের অনিশ্চয়তা ও অনুপযুক্ততা হেতু কলওয়ালারা ভরসা করিয়া পাকা মাল বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারিতেছে না এবং যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মালও কিনিতে পারিতেছে না। ফলে, পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য দৃঢ় আছে, কিন্তু পাটের দর কমিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে তিন মাস চাষ-আবাদের নিমিত্ত কয়লা-ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস হেতু উত্তোলন কম হইবে; সুতরাং কয়লা সরবরাহের অনিশ্চয়তা ও অনুপযুক্ততা প্রশমিত হওয়া সম্ভবপর নহে। চাষ ও শিল্প উভয়েরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পাট-শিল্পের কৃতিত্ব অসাধারণ। গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পাট-শিল্প যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজনই মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল। গত বর্ষে উৎপাদন সমষ্টি হইয়াছিল ১০,১২,৭১১ টন। পূর্ব্ব-বৎসরের উদ্বৃত্ত মজুত মাল লইয়া গত বর্ষে বিক্রীত হইয়াছিল ১০,৪৩,৬৬৮ টন এবং বর্ষ-শেষে উদ্বৃত্ত মজুত ছিল ২,২১,৩০৪ টন। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে সামরিক প্রয়োজনে সরকার পাটনির্ম্মিত দ্রব্যাদি খরিদ করিয়াছেন ৫৪'৬৭ কোটি টাকার। তলপ-দখল ও কয়লা সরবরাহের অপ্রতুলতা হেতু শিল্পের পঙ্গুত্ব না ঘটিলে উৎপাদন ও বিক্রয় উভয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানের সমস্যাই এখন সমধিক প্রবল। ভবিষ্যৎও শঙ্কাপ্রদ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকর্ম্মী

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে একটা হরিজন-বিদ্যালয় আর তার সঙ্গে ছোট খাটো একটা সর্ব্বজনীন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা অনেক দিন হতেই ছিল, কিন্তু সুযোগ, সময় ও অর্থাভাবে সেটা কার্য্যে পরিণত হচ্ছিল না। 'যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি'—কথাটা আমার ভাগ্যে এক দিন সত্য সত্যই ফলে গেল। গাঁয়েরই দু'-একটা ছেলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। প্রথমে আরম্ভ হ'ল একটা অবৈতনিক সর্ব্বজনীন নৈশ বিদ্যালয়—গ্রামের গরীব-দুঃখী বাগ্দি, বাউরী, হাড়ি, ডোমের ছেলেরা সন্ধ্যা হলেই সেখানে হাজির হতো। পূর্ণোদ্যমে কাজও আরম্ভ হলো—কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে অন্যান্য কাজ পিছিয়ে পড়ছিল। এই সময়ে কংগ্রেসের দলাদলি আরম্ভ হ'ল—দক্ষিণ ও বামপন্থীর মতভেদ। আমাকেও গ্রামের কংগ্রেস কমিটীকে জেলা কংগ্রেসের অনুরোধে চালাইতে হইল। স্থায়ী সভ্য সংগ্রহের জন্য তারা তাগিদ দিলেন—সেই জন্য স্বেচ্ছাসেবকভুক্ত হ'য়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে পারে, এমনি কতকগুলি কর্ম্মীর সন্ধানে মন দিলাম। কিন্তু এই 'ভলেণ্টীয়ারে'র আমল যেন সাধারণে আর বরদাস্ত করিতে পারে না—তার প্রমাণও এক দিন পেলাম।

সদ্য সংগৃহীত জন কতক ভলেণ্টীয়ার সহ একদিন ট্রেণে যাচ্ছি—ট্রেণটিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না—কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইলাম। গোটা কামরার লোকগুলো যেন আমাদের পানে কটু মট্ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

দূরের বেঞ্চির এক কোণে একটা লোক ঝিমুচ্ছিল।

আমাদের পানে চেয়ে সে বল্লে—"এ গাড়ীতে ভলেণ্টীয়ার কেন বাবা? আরও তো ঢের গাড়ী আছে! সুরেন বাঁড়ুয্যে কি ভলেণ্টীয়ারের ছিষ্টি করে গেল, ওদের জ্বালায় দেশটা জ্বলে গেল!"

নিকটেই এক জন লোক বসে ছিল—সে বল্লে, "কেন বাবা, তোমার কি ক্ষতিটা করলে ওরা?"

অমনি আগেকার লোকটি বল্লে—"দেখুন না মশাই—'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম'—এই বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে—দেবতা সাক্ষী ক'রে যাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লে গ্রহণ করলাম—সেই ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে ক'রে গঙ্গার ঘাটে স্নান ক'রতে যাবো অমনি ভলেণ্টীয়ার এসে বাধা দিল—'তফাৎ যাও'—মেয়েদের আলাদা ঘাট। তাই বলছি, মৃত্যুর পরও ওদের হাত হ'তে নিস্তার নেই!" লোকটির কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো—এক ভদ্রলোক বল্লেন, "তা হ'লে তো আপনাকে ভারী জব্দ ক'রেছিল ভলেণ্টীয়ারে—সেই জন্যই বুঝি ওদের উপর আপনার এত জাতক্রোধ?"

এই সময়ে অন্য এক জন লোক বলে উঠলো—"আরে মশাই, শুধু

কি তাই—গান্ধীর ওই চেলাগুলোই তো দেশের এই দুর্দ্দশার কারণ। বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমল, বেশ সুখেই কেটে গেল—আমাদের আমলে এলো গান্ধী আর তার কংগ্রেস—অমনি হ'তে লাগলো জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য—বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশের দারুণ দুর্দ্দশা—!" এ সবের জন্ত একমাত্র দায়ী যে কংগ্রেস—তা আজ সবাই বুঝতে পেরেছে—তাই ভলেণ্টীয়ারের নামে লোকের আতঙ্ক হয়—গান্ধী আমাদের ভাল কিছুই করতে পারেনি—কিন্তু মন্দ করেছে ঢের।"

গাড়ীশুদ্ধ লোক এই কথা সমর্থন করে—এই নিয়ে নানা রকম আলোচনা করতে লাগলো। শুধু একটি সুদর্শন যুবক এই আলোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো দেখে সবাই চুপ করে গেল। যুবকটি বল্লে—"চিরকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে হাত-পা বেঁধে নিজের ঘরে, অন্ধকারময় কারাগৃহে পচে মরছেন—সেই কারাগৃহ থেকে বাইরের আলোতে যাতে জগতের সমক্ষে মুখ দেখাতে পারেন—তার জন্যে যারা আপনাদের হ'য়ে নির্য্যাতন ভোগ ক'রছেন—ভোগ-বিলাস বর্জ্জন করে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে—নিঃস্বার্থ ভাবে কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন। তারা হ'ল দেশের শত্রু! এই ধারণা নিয়ে আপনারা অপ্রিয় আলোচনা ক'রছেন। কাদের স্বার্থের জন্য দেশের এই সব বরেণ্য মহাপুরুষগণ নিজেদের সুখ, ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন করেছেন—এ কথাও কি আপনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে?"

দেখতে দেখতে আরোহীদের মধ্যে এই বাকবিতণ্ডা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যুবক নিজের বসবার স্থানটিতে আমাকে একরকম জোর করে বসিয়ে দিলে—কথায় কথায় তার সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়ে গেল। সে বল্লে, "এই সমস্ত দেশবাসীর মনের মধ্যে যে সব সন্দেহের বীজ লুকানো আছে—সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। নিরক্ষর দেশবাসীর মনের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে। গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—কংগ্রেস কি এবং তার উদ্দেশ্য কি? নইলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত—আন্দোলন ব্যর্থ—উদ্দেশ্য পণ্ড।

আমার উদ্দেশ্য সে অন্তরের সহিত অনুমোদন করলো এবং আমার অনুরোধে কিছু দিন আমার আন্দোলনকে সাহায্য ক'রতে রাজী হ'ল। তার মত এক জন উৎসাহী সহকর্ম্মী পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

এর পর থেকে আমার হরিজন-বিদ্যালয় ও আশ্রমের ভার তার উপর ন্যস্ত ক'রে আমি গণ-আন্দোলনে যোগ দিলাম। আমার সহকর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবকগণ সহ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহে মন দিল। সেই সঙ্গে তুলার চাষের উপকারিতা—চরকা প্রচারের উদ্দেশ্য—নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি জনহিতকর বিষয় সম্বন্ধে সকলকে বুঝাতে লাগলো। এই মহৎ কার্য্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—তাহাও জানাতে ভুললো না!

কংগ্রেস ও আমার নামাঙ্কিত ছাপা কাগজের জোরে—প্রচুর অর্থের সমাগম হতে লাগলো—আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হ'তে চললো। আমার সুযোগ্য সহকর্ম্মীর প্রশংসায় দেশ ভরে গেল। দেশের নেতাদের যারা স্বার্থপর সুবিধাবাদী বলে নিন্দা করতো, তারাও উচ্চকণ্ঠে আমার কার্য্যের প্রশংসা ক'রতে লাগলো। ক্রমে সমগ্র জেলার মধ্যে আমার আন্দোলন—আমার কার্য্য—আমার আশ্রম,—শীর্ষস্থানীয় হ'য়ে উঠলো।

সরকার এই সময়ে কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করলেন। যথাসময়ে পুলিস আমাকেও গ্রেপ্তার করলো। সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উত্তেজিত করার অপরাধে আমার দীর্ঘ কাল কারাবাসের আদেশ হল।

আমার সুযোগ্য সহকর্ম্মী—আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করলো—আমি নিশ্চিন্ত মনে কারাবরণ করলাম।

তার পর কারাগৃহ হ'তে বাইরে এসে শুনলাম, আমার সৃষ্ট আন্দোলন তো বহু পূর্ব্বেই থেমে গেছে—সঙ্গে সঙ্গে গেছে আমার আশ্রম ও আমার বিদ্যালয়। সর্ব্বোপরি আমার সুনামে কলঙ্ক লেপন ক'রে—উৎসাহী—বিশ্বাসী—কর্ম্মঠ—সহকর্ম্মী, আমার সঞ্চিত সমুদায় অর্থরাশি সহ নিরুদ্দেশ হ'য়েছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সরকার

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ধনীর বিলাস-স্বর্গে সাহিত্যের মন্দাকিনী ধারা
একদা বহিতেছিল, দুখ-লভ্য ছিল স্নান-পান,
কারো ত' লাগেনি প্রাণে; দরিদ্রের অবান্ধব তারা
বহুমূল্য বিনিময়ে আজও দেয় অকিঞ্চিৎ দান।

সতীশ সতীশ-সম আত্ম-ভোলা টুটাইল বাঁধ,
বর্ষার প্লাবন সম দিকে দিকে শত স্রোতে ধায়;
রসিক পাঠক ধন্য, সৃষ্টি ধন্য, স্রষ্টা পূর্ণসাধ,
নভে যে মেলিল শাখা মূল তার গেল মৃত্তিকায়।

প্রগতিতে মিলাইলে সনাতনী জীবনের ধারা,
ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ রাখি' জাতীয়তা নিত্য পে'ল মান
তোমার প্রয়াস-পুণ্যে; মহতেরা যবে বুদ্ধি-হারা,
চলেছ' সরল পথে ভীতিহীন নিবেদিত-প্রাণ।

নামের-কাঙাল দেশে এত দিয়ে চাহিলে না খ্যাতি,
মহাশোকে মহামৌনী, আধুনিক! প্রাচীনের জ্ঞাতি।

শ্রীগোপাললাল দে

মহামুনি-ভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

ংশ-বিভাগানুসারে এই নাট্যমণ্ডপ 'আপনাদিগের দ্বারা রক্ষণীয়'।

অতঃপর মণ্ডপের রক্ষণে চন্দ্রমা বিনিযুক্ত হইলেন ॥৮৩

আর দিক্‌সমূহে লোকপালগণ ও বিদিক্‌গুলিতেও মারুতগণ, 'পথ্য-ভূমিতে মিত্র ও অম্বরে বরুণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ॥৮৪

বেদিকারক্ষণে বহ্নি, ভাণ্ডে সর্ব্বদেবতা, আর চারিটি বর্ণ ই স্তম্ভ-ূহে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৮৫

আর আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, স্তম্ভান্তর-সমূহে অবস্থিত ছিলেন। ধারণী-সমূহে ভূতগণ ও শালা-সমূহে অপ্সরোবৃন্দ স্থিত ছিলেন ॥৮৬

সকল ভবনে যক্ষিণীগণ, মহীপৃষ্ঠে মহোদধি; দ্বারশালা-নিযুক্ত দুইজন—কৃতান্ত ও কাল ।৮৭

দ্বারপাত্র-সমূহে মহাবল নাগমুখ্যদ্বয় স্থাপিত হইয়াছিলেন; দেহলীতে যমদণ্ড ও উহার উপর শূল স্থিত ছিল ॥৮৮

৮৩। অংশভাগৈঃ (মূল)—অংশ—মণ্ডপের অংশ-সমূহ। ভাগ-ভাজন, অধিষ্ঠান-স্থান। মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে বিবিধ দেবতার ঃ সকল অধিষ্ঠান-স্থান, তত্তৎ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্ন দবগণ কর্ত্তৃক নাট্যমণ্ডপের রক্ষা-বিধান কর্ত্তব্য—ইহাই অভিপ্রায় অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১)। অংশ ভাগগুলি পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিনিযুক্তস্তু চন্দ্রমাঃ (বরোদা); নিযুক্তো রজনীকরঃ (কাশী)। জনীকর—চন্দ্র। চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কয়েকটি মণ্ডপের বভিন্ন ভাগ-রক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আর সমগ্র মণ্ডপের ধিষ্ঠাতৃরূপে সৌম্য-প্রকৃতি সোম স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৮৪। বিদিক্ষ্বপি চ মারুতাঃ (মূল)—ঊনপঞ্চাশ বায়ু পশ্চিমোত্তর (বায়ু) কোণের অধিপতি। কিন্তু 'বিদিক্ষু' (বিদিক্‌সমূহে)—এই বহুবচন-প্রয়োগে বুঝা যায় যে, বায়ুকোণ ব্যতীত অন্য তিন কোণেরও (ঈশান, অগ্নি, নৈঋ্ত) রক্ষাভার বায়ুগণের উপর অর্পিত হইয়াছিল। অপি চ—বিদিক্‌সমূহেও—'চ' (ও) পদটির প্রয়োগে বুঝা যায়—বিদিক্ সকল ব্যতীত দিক্‌সমূহেও বায়ুর রক্ষাধিকার ছিল। সকল দিক্ ও বিদিকে বায়ুর রক্ষাধিকার থাকাই স্বাভাবিক; কারণ, বায়ু প্রাণস্বরূপ ও ঘর্ম্মদোষ-বারক বলিয়া অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয়। অতএব, কি দিক্—কি বিদিক্—সর্ব্বত্রই বায়ু-প্রবাহ চলার প্রয়োজন। কাহারও কাহারও মতে—রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে গবাক্ষ করণীয়—ইহাই ইহাতে সূচিত হইতেছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১)।

মিত্রঃ—মিত্র-শব্দ 'আদিত্য' অর্থ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ, আর সহকর্মী বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। এস্থলে আদিত্য, সূর্য্য ইত্যাদি শব্দের পরিবর্ত্তে মিত্র-শব্দটির ব্যবহার দর্শনে এটুকু বুঝা যায় যে—আদিত্য অর্থে মিত্র-শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও উহার অন্তর্গূঢ় ক্লীবলিঙ্গের শক্তিটুকু এস্থলেও ঈষৎ অব্যক্তভাবে সূচিত হইতেছে। এ কারণে নেপথ্য-গৃহে নর্ত্তক পুরুষ হইলেও লজ্জা-পরিহার-হেতু নপুংসক-ভাবের আচরণ করেন—ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১)। মিত্র—সূর্য্য উজ্জ্বলতার দ্যোতক। ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে—নেপথ্য-গৃহে আহার্য্যাভিনয়ের উপযোগী বেশ-ভূষা-রত্নাদি উজ্জ্বল হইবে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১)। নিক্ষিপ্তো বরুণোঽম্বরে (বরোদা)—বরুণেশ্বরঃ (কাশী)।

৮৫। বেদিকা রঙ্গবেদিকা; তথায় তীক্ষ্ণ (বহ্নি) অধিষ্ঠাতা। ভাণ্ড—সোপকরণ ত্রিপুষ্কর (ঢক্কাজাতীয় বাদ্য) (orchestra)।

দিবৌকসঃ (মূল)—দেবগণ; অভিনব-মতে—মেঘগণ—মন্দ্র-গম্ভীর শব্দ-সিদ্ধির নিমিত্ত। এইরূপ সর্ব্বত্র যথাযোগ্য দেবতার সন্নিবেশ বুঝিতে হইবে। 'দেবগণ' এইরূপ সাধারণ শব্দ থাকিলেই নির্ব্বিশেষে সকল দেবতা বুঝিতে হইবে—এমন কোন নিয়ম নাই। যে দেবতা বা যে যে দেবতা রক্ষণীয় স্থানের সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত, কেবল সেই সেই দেবতারই গ্রহণ করিতে হইবে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১-৩২)!

বর্ণ—বর্ণাধিষ্ঠাতা দেবতা-বিশেষগণ।

৮৬। স্তম্ভান্তরেষু (মূল)—অভিনবভারতী একটু অস্পষ্ট—"বর্ণস্তম্ভচতুষ্টয়াদিবিভাগেষু নান্যেষু স্তম্ভেষ্বিত্যর্থঃ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২)। অভিনবের উক্তির আক্ষরিক অর্থ সম্ভবতঃ এইরূপ—বর্ণ স্তম্ভ-চতুষ্টয়ের মধ্যেই ইহারাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন—অন্য স্তম্ভে নহে। কিন্তু এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি বুঝা যায় না—সম্ভবতঃ, এস্থলে অভিনব-ভারতীর পাঠ বিকৃত (?)।

ধারণীষু (বরোদা), ধরণীষু (কাশী)। ধারণী পাঠই সঙ্গত মনে হয়। ধারণী অর্থে রেখা বা পঙ্‌ক্তি। অর্থ বিশেষ স্পষ্ট নহে।

শালাসু (মূল)—শালা অর্থে গৃহ। এস্থলেও অভিনব-ভারতীর পাঠ দুর্ব্বোধ্য—সম্ভবতঃ বিকৃত—"স্তম্ভদ্বয়মষ্টবেশ্মানি গবাক্ষনেপথ্য-গৃহদ্বিতীয়ভূমিনিসন্নিবেশাদিতি" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২)। 'অষ্ট বেশ্মানি' হইলে—'শালাসু' এই বহুবচনান্ত পাঠের সহিত মিলে। মনে হয়, এরূপ অর্থ হইতে পারে—দ্বিতীয়-ভূমি-স্থিত নেপথ্যগৃহে স্তম্ভদ্বয় ও অষ্ট প্রকোষ্ঠ (বেশ্ম) সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

প্রথম ভূমি—রঙ্গমঞ্চটি. দ্বিতীয়ভূমি—নেপথ্যগৃহ—রঙ্গপীঠ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ। স্তম্ভ-নেপথ্য-রঙ্গপীঠাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

৮৭। সর্ব্ববেশ্মসু (মূল)—'শালা' কোন্‌গুলি, 'বেশ্ম' কোন্‌গুলি—তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষান্তর করিবার সময়ে যতদূর সম্ভব এগুলির পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। "মহোদধির্মহী পৃষ্ঠে যক্ষিণ্যঃ সর্ব্বপর্ব্বসু" (পাঠান্তর)।

দ্বারশালানিযুক্তস্তু কৃতান্তঃ কাল এব চ" (কাশী)। কৃতান্ত—যম। কাল আর কৃতান্ত উভয়ই যমের নাম। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে যম ও কালের মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে (রসাধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কাল দেব—সম্ভবতঃ ইনি মহাকাল।

৮৮। নাগমুখ্যৌ (মূল)—অনন্ত ও গুলিক। গুলিক নাগের পরিচয় অজ্ঞাত।

দ্বারপাত্রেষু—কবাটগুলিতে। বহু দ্বার বলিয়া বহুবচন। দেহলী—দ্বারের অধস্তন কাষ্ঠ—চৌকাঠ। তস্যোপরি (মূল)—দ্বারের উপর। অতএব, তাৎপর্য্য এই যে—'উৎসঙ্গ'-নামক দ্বারের ঊর্দ্ধকাষ্ঠে ত্রিশূল স্থাপিত হইয়াছিল। শূলং চোপরি সংস্থিতম্ (কাশী)।

আর দ্বারপাল (রূপে) স্থিত ছিলেন উভয়ে—নিয়তি ও মৃত্যু ; ও রঙ্গপীঠের পার্শ্বে স্বয়ং মহেন্দ্র অবস্থিত ছিলেন ।৮৯

মত্তবারণীতে দৈত্যনাশিনী বিদ্যুৎ স্থাপিত হইয়াছিল ; মত্তবারণীর স্তম্ভগুলিতে পরিপালনের নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছিলেন— ।৯০

মহাবল ভূত—যক্ষ—পিশাচ ও গুহ্যকগণ ।

[অমিততেজাঃ সুরেন্দ্র-কর্ত্তৃক (স্থাপিত হইয়াছিলেন—৯০ শ্লোকের উক্ত ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ) যক্ষ-ভূত-পিশাচগণ ও ভগবান্ বীরভদ্র আর গুহ্যকগণ ।]

আর জর্জ্জরে দৈত্য-নাশক বজ্র বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ।৯১

উহার পর্ব্বসমূহে অমিততেজাঃ সুরশ্রেষ্ঠগণ বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ; শিরঃ-পর্ব্বে ব্রহ্মা আস্থিত ছিলেন ও দ্বিতীয় (পর্ব্বে) শঙ্কর— ।৯২

আর তৃতীয়ে স্থিত ছিলেন বিষ্ণু ও চতুর্থে স্কন্দ ; ও পঞ্চমে মহানাগগণ—শেষ-বাসুকি-তক্ষক ।৯৩

---

৮৯ । নিয়তিঃ (বরোদা) ; নির্ঋতিঃ (পাঠান্তর) । পার্শ্বে চ রঙ্গপীঠস্য মহেন্দ্রঃ স্থিতবান্ স্বয়ম্ (বরোদা) ; রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু স্বয়ং শক্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (পাঠান্তর) ।

কৃতান্ত, কাল, মৃত্যু—নাট্যশাস্ত্রের মতে তিন জন বিভিন্ন দেবতা ।

রঙ্গপীঠ-পার্শ্বে মহেন্দ্র স্থিত ছিলেন—ইহা হইতে বুঝা যায়—পীঠপার্শ্বই রাজাদির অবস্থানের স্থান । 'পার্শ্বে চ'—'চ' (ও) পদ হইতে বুঝা যায়—ইন্দ্র রঙ্গপীঠপার্শ্বেও ছিলেন, আবার নিজ দিকে (পূর্ব্বদিকে) অংশতঃ অবস্থিত ছিলেন । (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২) ।

৯০ । পরিপালনে (বরোদা) ; পরিরক্ষণে (পাঠান্তর)

এ স্থলেও অভিনব স্তম্ভ-সমূহ' বলিতে স্তম্ভ-চতুষ্টয়—এই অর্থ করিয়াছেন—"স্তম্ভেষপি চতুর্ষু যথাক্রমং তদ্ভূতাদয়স্তে চ নাট্যতত্ত্ববিদোঽতএব বিঘ্নৈঃ সহ যেন যেন মিলিতা ইতি দ্রষ্টব্যম্ । এতেন সিদ্ধি-বিঘাতকা ভেদাখ্যেনাপ্যুপায়েন দুর্ব্বলীকর্ত্তব্যা ইতি সূচিতম্" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২-৩৩)

তাৎপর্য্য—ভূতাদি ও নাট্যতত্ত্ববিদ্গণ যে যে বিঘ্নের সহিত যখন যে রূপে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্তম্ভ-চতুষ্টয়ে স্থাপিত হইয়াছিলেন । অর্থাৎ—বিঘ্নগণের মধ্য হইতেও যখন যখন যাঁহাকে ভাঙ্গাইয়া আনিতে পারা যাইতেছিল, তখনই তখনই তাঁহাকে দেবপক্ষের সহিত মিলাইয়া লইয়া স্তম্ভে স্থান দেওয়া হইতেছিল । ইহা হইতে সূচিত হয় যে—সিদ্ধি-বিঘাতকগণকেও ভেদ-নামক উপায়-প্রয়োগে দুর্ব্বল করা উচিত ।

৯০ ও ৯১ নং শ্লোকের মধ্যবর্ত্তী ব্রাকেট-মধ্যস্থ শ্লোকটি শ্লোক-সংখ্যা ব্যতীত ব্রাকেট-বদ্ধ অবস্থাতেই বরোদা-সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে । এ কারণে বোধ হয় উহা প্রক্ষিপ্ত (?) ।

৯২ । তৎপর্ব্বসু (বরোদা) ; সন্ধৌ সন্ধৌ (পাঠান্তর) পর্ব্ব—গাঁট । পরে জর্জ্জরের বর্ণনার অনুবাদকালে চিত্র-দ্বারা ইহা বুঝান যাইবে ।

শিরঃপর্ব্বাস্থিতো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে শঙ্করস্তথা (বরোদা) ; শিরো রক্ষন্ স্থিতো ব্রহ্মা হরঃ পর্ব্বণ্যনন্তরে (পাঠান্তর) ।

৯৩ । তৃতীয়ে চ স্থিতো বিষ্ণুঃ (বরোদা) ; তৃতীয়ে ভগবান্ বিষ্ণুঃ (কাশী) ।

এইরূপে বিঘ্ন-বিনাশার্থ জর্জ্জরে সুরগণ স্থাপিত হইয়াছিলেন । আর রঙ্গপীঠের মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।৯৪

আর যাগার্থ রঙ্গমধ্যে পুষ্পমোক্ষণ করা হইয়া থাকে ।

আর পাতালবাসী যে সকল যক্ষ-গুহ্যক-পন্নগ— ।৯৫

রঙ্গপীঠের অধোভোগ-রক্ষণে তাহারা নিযুক্ত হইয়াছিল ।

আর নায়কের রক্ষা করিয়া থাকেন ইন্দ্র ও নায়িকাকে (রক্ষা করেন) সরস্বতী ।৯৬

আর বিদূষককে ওঙ্কার ও অবশিষ্ট প্রকৃতিগণকে হর (রক্ষা করিতে লাগিলেন) ।

'এই যে সকল দেবতা এ স্থলে রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন— ।৯৭

'ইঁহারাই (তত্তৎ অংশ-ভাগের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন'—ইহা তিনি বলিয়াছিলেন ।

এই অবসরে সকল দেবতা-কর্ত্তৃক পিতামহ উক্ত হইয়াছিলেন— ।৯৮

'আপনি এখন এই বিঘ্নগণকে সাম-বাক্য-দ্বারা স্থাপিত করুন ।

প্রথমে সাম-প্রয়োগ কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়তঃ দানই— ।৯৯

---

৯৪ । স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতঃ—বাস্তমধ্যে সর্ব্বদা সন্নিহিত ছিলেন ; ইহাতে কবির সন্নিধান সূচিত হইতেছে ।

৯৫ । ইষ্ট্যর্থং (বরোদা)—'ইষ্টি' অর্থে যাগ । ব্রহ্মা যখন রঙ্গমঞ্চের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন মঞ্চমধ্যে পুষ্পবর্ষণ-দ্বারা তাঁহার পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে—ইহাকেই ইষ্টি বলা হইয়াছে । পাঠান্তর—ইত্যর্থং (কাশী)—এই হেতু ; প্রীত্যর্থম্- (ব্রহ্মার) প্রীতির উদ্দেশ্যে ।

৯৬ । রঙ্গপীঠস্য অধস্তাৎ—পাছে রঙ্গপীঠের নিম্নে সুড়ঙ্গ-খননাদি-দ্বারা বিঘ্নোৎপাদন করে ; এই কারণে রঙ্গপীঠের অধোদেশেও রক্ষার ব্যবস্থা (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩) ।

প্রধান পাত্রগুলিরও রক্ষার পৃথক্ ব্যবস্থা যে কর্ত্তব্য, তাহা নায়ক-নায়িকা-বিদূষকাদির রক্ষা-বিধান-দ্বারা সূচিত হইতেছে ।

৯৭ । বিদূষক—হাস্য ও শৃঙ্গার রসের পোষক । ইহা হইতেই দশরূপক প্রয়োগ সূচিত হইতেছে ; কারণ, সকল প্রকার রূপকে (যথা সমবকারাদিতে) বিদূষকের স্থান নাই ।

হর—বহুমূর্ত্তিধরগণের প্রথম—'বহুমূর্ত্তিপ্রথমত্বাৎ'—(অঃ ভাঃ পৃঃ ৩৩) । হর—নানা-মূর্ত্তিধারিগণের অগ্রণী ; তাই তিনি অবশিষ্ট সকল পাত্রের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন । প্রকৃতি—পাত্র ।

৯৮ । এতাস্ত্বেবাধিদৈবানি—অধিদৈব—অধিপতি দেব ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

দেব-লোকের নাট্যগৃহের বিভিন্ন অংশ-ভাগের রক্ষার্থে যে যে দেবতা প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে সেই সেই ভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তাঁহারাই পরিগণিত হইতে থাকিবেন—ইহাই ব্রহ্মার উক্তির অভিপ্রায় ।

তিনি—ব্রহ্মা ।

দুর্জ্জন অশক্ত হইলে পরপক্ষ প্রযুক্ত সামবাক্য মানিয়া লয় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪) । শত্রুকে বশীভূত করিতে চারিটি নীতি-শাস্ত্রোক্ত উপায় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

ক্রমটি ৯৯ ও ১০০ শ্লোকে দেখান হইয়াছে—১ সাম (মিষ্ট-বাক্য-প্রয়োগ—দুর্ব্বল শত্রু ইহাতেই বশে আসে), ২ দান (ঘুষ দেওয়া—কিছু টাকাকড়ি ইত্যাদি দিয়া শত্রুকে বশীভূত করা যায়), ৩ ভেদ

আর উহাদিগের উভয়ের পরে ভেদ, ও অতঃপর দণ্ড প্রযুক্ত হইয়া থাকে।'

দেবগণের বচন শুনিয়া ব্রহ্মা বিঘ্নগণকে বলিয়াছিলেন—॥১০০

'কি হেতু আপনারা নাট্যের বিনাশার্থে সমুত্থিত হইয়াছেন'?।

ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া অতঃপর দৈত্য ও বিঘ্নগণ সহ বিরূপাক্ষ সামপূর্ণ এই বাক্য বলিয়াছিলেন—

'এই যে নাট্যবেদ সুরেচ্ছায় ভগবৎ-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—॥১০১-১০২

ইহা সুরগণের নিমিত্ত আমাদিগের অপমানকর—আপনা কর্তৃক (ইহা) কৃত হইয়াছে।

হে লোক-পিতামহ! আপনা-কর্তৃক ইহা এইরূপ করা উচিত হয় নাই ॥১০৩

যেমন দেবগণ তেমনই দৈত্যগণ—তোমা হইতেই সকলে বিনির্গত হইয়াছে।'

বিঘ্নগণের বচন শুনিয়া ব্রহ্মা (এই) বাক্য বলিয়াছিলেন—॥১০৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(শত্রুর দলে ভাঙ্গন ধরাইয়া শত্রুদলের কোন কোন লোককে স্বপক্ষে আনয়ন-দ্বারাও শত্রু বশ করা যায়) ও ৪ দণ্ড (আঘাত প্রদান)।

১০০। ততঃ—তাহার পর, প্রথম তিনটি উপায় (সাম-দান-ভেদ) প্রতিহত হইলে পর।

দৈত্যগণের অভিপ্রায় কি জানিতে পারিলে তাঁহাদিগের আপত্তির কারণের প্রতি-সমাধান করা যাইবে—এই ভাবিয়া ব্রহ্মা দৈত্যগণকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন (অ: ভা:, পৃ: ৩৪))।

১০১। "ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষো ব্রবীদিদম্। দৈত্যৈর্বিঘ্নগণৈঃ সার্দ্ধং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ।"—বরোদার মূলের পাঠ। এ পাঠটির যোজনা ভাল হয় না। পক্ষান্তরে—এই পাঠান্তরটি ভাল "তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং বিরূপাক্ষো ব্রবীত্ততঃ—" ইত্যাদি। এই পাঠান্তর অনুযায়ী ভাষান্তর প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, এরূপ পাঠান্তরও সঙ্গত—"ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা বিরোপাক্ষোঽব্রবীদ্বচঃ, দৈত্যৈর্বিঘ্নগণৈঃ সার্দ্ধং সামপূর্ব্বমিদং ততঃ।"

ভগবৎ-কর্তৃক—এ ক্ষেত্রে—ভগবান্—ব্রহ্মা।

১০২। সুরেচ্ছয়া—দেবগণের ইচ্ছাবশে।

১০৩। সুরার্থম্—দেবগণের অভ্যুদয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুইবার এই দুইটি শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য—ব্রহ্মা দেবগণের প্ররোচনায় দেবতাদিগের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ দৈত্যগণকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নাট্য-প্রচার করিয়াছিলেন—এইরূপ ধারণা দৈত্য ও বিঘ্নগণের জন্মিয়াছিল।

প্রত্যাদেশঃ (মূল)—খলীকার (অ: ভা:, পৃ: ৬৪)—অপমান

আপনা-কর্তৃক—যাঁহা-দ্বারা দৈত্যগণের এই অপমান হওয়া মোটেই উচিত ছিল না; কারণ, তিনি যে লোক-পিতামহ—দেবগণ ও দৈত্যগণ—উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহা হইতে উদ্ভূত; অতএব উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত। এইরূপ অবস্থায় দেবগণের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ দৈত্যগণের অযথা অপমান প্রদর্শন কর নাট্যের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নাই—ইহাই বিরূপাক্ষ-প্রমুখ দৈত্য ও বিঘ্নগণের আক্ষেপ-সূচক অভিপ্রায়।

দুঃস্বপ্ন

(গল্প)

দীর্ঘকাল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি তার আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করে ওঠবার মত শক্তি পেয়েছি। কিন্তু সে শক্তি পেলেও অনিশ্চিত মৃত্যু···তার যে কুহেলি-স্পর্শ—সাহিত্যিকরা যাকে বলেন 'মৃত্যুর রূপ', তার প্রভাব আজও সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি। কাল সারা রাত অসহ্য গরম ছিল বলে প্রথম রাত্রে কিছুতে ঘুমোতে পারিনি। সুধা মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করেছে। মাথায় সেবা-নিপুণ হাত বুলিয়ে তার দুর্ব্বল স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে কখন উঠে গিয়েছে, জানতে পারিনি। ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুযায়ী পিসিমার বাড়ীতে সে ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গেছে। সেখানে তাঁর প্রথম নাতিটির অন্নপ্রাশন···সুধা প্রথমে যেতেই চায়নি। অক্ষম দুর্ব্বল স্বামীকে ফেলে রেখে সেই উৎসব-মুখর বাড়ীতে সারা দিন তার কি উৎকণ্ঠায় কাটবে, সেই কথা জানিয়ে সে নানা-ওজর-আপত্তি তুলেছিল এবং রীতিমত বেঁকেই বসেছিল। কিন্তু অনেক বুঝিয়ে তাকে এক-রকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাঠানো হয়েছে। কারণ, পিসিমার এই প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে সুধা না গেলে তাঁদের ব্যথার সীমা থাকবে না! উপস্থিত সুস্থতা অর্জ্জন করেছি যখন, তখন দু'-এক দিন ঝি-চাকরের ওপর নির্ভর করে থাকলে কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই, এ-কথা আর সকলে মানলেও সুধা মানতে রাজী নয়।

···সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বাইরের খোলা বারান্দায় এসে বসেছি। ক'দিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর বাস্তব রূপ মনে কেমন নির্লিপ্ততার ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে। চিরদিনের চেনা এই পৃথিবী, তার আলো-বাতাস···সব-কিছুই যেন জানা-অজানার বাইরে থেকে কোন্ দূরাগত সমগ্র লোকের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। যাবার আগে সুধা তার স্বামীর প্রয়োজনীয় এবং সারাদিনের প্রতিটি খুঁটিনাটী জিনিষ ঘরে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে গেছে। এমন কি, তার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ভৃত্যবর্গ গোকুলকে অবধি দেখছি আমি ওঠবার আগেই দরজার গোড়ায় মোতায়েন হয়ে বসে থাকতে। গ্রীষ্মের রোদ সামনের অশথ-গাছের পাতায় চিক-চিক করছে। গোকুল

এসে সামনের বেতের টেবিলটার ওপর ঠক্ করে দুধের পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে বল্লে—"মা বলে গেছেন ঐ যে বড়ী-ওষুধ আছে, দুধের সঙ্গে তাই দুটো খেয়ে নেবেন! কাল রাতে আপনার নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগেছে"···সুধার হুকুম-জারীর কারণ বুঝতে বেশী দেরী হলো না। কাল রাত্রে অসহ্য গরম বোধ হওয়াতে শিয়রের জানালা খুলে রেখেছিলাম, তাই তার এই সাবধানতা! বড়ী দুটো গলাধঃকরণ করে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুই তোর মার সঙ্গে গেলি না কেন? সারাদিন খোকাকে নিয়ে হয়তো অসুবিধা হবে তার!"

গোকুল বেশ জ্ঞান-গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—"আপনি এই রোগা মানুষ! সারাদিন এটা-ওটা দেয়া আছে। এ-সব ফেলে কি যাওয়া চলে, বাবু?"

বললাম—"আমি তো ভাল আছি রে! তোর গেলেই ভালো হতো। যে দুরন্ত ছেলে, পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড না বাধায়!"

নির্লিপ্ত স্বরে গোকুল উত্তর দিল—"তার জন্য ভাবতে হবেনি বাবু! পিসিমা বলে গেছেন, কাজের বাড়ীতে কি আর দেখবার লোকের অভাব হবে?"

চুপ করে বসে রইলাম। বুঝলাম, যে-ব্যাপারে সুধার হাত আছে, সেখানে আমার মাথা ঘামানো মিথ্যা। আমি ফুল ভালোবাসি বলে সে যাবার আগে আধফোটা ফুলগুলি তুলে এনে সযত্নে ভিজা কাপড়ে জড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছে, সময়ে ফুটবে বলে। আমার কাজে তার কোন-কিছুরই ভুল হয় না। অনেকে বলেন, বয়স্থা মেয়ে ঘরে আনলে স্বামীর সুখে-দুঃখে বেশীর ভাগ মেয়ের আন্তরিকতার কিছু অভাব থাকে। কিন্তু সুধাকে দেখলে তাঁদের সে ধারণা বদলাবে। স্বাভাবিক মনের বিপরীত অবস্থায় তাকে বিবাহ করলেও একান্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে স্বামীকে কেন যে এত ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছে, তার উত্তর সে-ই শুধু দিতে পারে। তাই তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এবং সেই জন্যই বোধ করি, পরিচিত-মহলে 'স্ত্রৈণ' বলে বদনাম রটেছে। তা রটুক!

গোকুলকে বিদায় দিয়ে আজকের খবরের কাগজখানি খুলে বসলাম। নির্জ্জন গৃহ। সুধা কাছে নেই বলেই তার অনুপস্থিতি বেশী করে অনুভব করছি। সকাল বেলাকার কর্ম্মরতা সুধার প্রত্যেকটি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দীর্ঘ ঋজু দেহ—স্নান-সমাপনান্তে লাল-পাড় শাড়ীর ওপর এলায়িত চুলের প্রান্তদেশ গিঁট-বাঁধা হয়ে পিঠের ওপর দুলছে। তার প্রতিদিনের কাজ—এই সময়ে সামনে বসে বঁটি পেতে তরকারী কোটা—নিঃশব্দ গতিতে তার হাতের কাজ অগ্রসর হচ্ছে···হাতের চুড়ীতে ঝিনিঝিনি শব্দের মৃদু ঝঙ্কারটুকুও যেন শুনতে পাচ্ছি!

* * * *

অনেকক্ষণ বাদে ঘুমোবার নিরবচ্ছিন্ন অবসর মিলেছে।

অন্ন-পথ্যের পর থেকে সুধার তাড়নায় কোন দিন দুটি চোখের পাতা এক করবার সুযোগ ঘটেনি! খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে ভাবছি যে, এই দুপুর বেলাটা শুধু ঘুমিয়েই কাটাবো! মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের মত গোকুল এসে দাঁড়ালো। হাতের ছোট গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললো—"এই ওষুধটা আপনারে খাবার পর খেতে বলে গেছেন।"

তার অন্য হাতে ডিবায় কিছু সুপারী মশলা! বললাম—"তুই দেখছি তোর বৌমার চেয়ে এ বিষয়ে ওস্তাদ হয়ে পড়েছিস। হ্যাঁ রে, বৌমা এসে বুঝি তোকে কিছু বকশিস্ দেবে?" আমার কথায় বোধ করি তার আত্মসম্মানে ঘা লাগলো। আমার নেবার অপেক্ষা না রেখেই ঠক্ করে ওষুধের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটু কপাল কুঁচকে নিজের মনে বকতে লাগলো···"হি· গোকুলকে তাই ঠাওরেছ কি না। সে এমন লোক নয় যে সবেতেই পয়সা কবলাবে! তবু এনাদের মন পাই না!" ···গোকুলের অন্তর্নিহিত দুঃখটুকু অনুভব করে হেসে বললাম—"না রে, না! এবারে তুই আমার যা সেবা করেছিস, দেখিস না, তোর মা তোকে এইবার দেশে পাঠিয়ে দেবে! ছেলের কাছে বসে বসে খাবি। তোর টাকার ব্যবস্থা তোর মা'ই করে দেবে। কতই বা তোর খরচ! খুব আরামে দিন কাটাবি!"

গোকুল আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু তাচ্ছিল্য-ভরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ···পরের মাথাটি খেয়ে পরের ওপর ভর করে বসবো! শে·· এদিক-ওদিক দুদিক যাক! যখন নড়ে বসবার ক্ষ্যামতা থাকবে না, তখন ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ব্যাটার দোরে দাঁড়াতে বলেন না কি? কাজ নেই আমার আরামে!" তার-পর একটু থেমে বললো—"·নি, চট্ করে ওষুধটা খেয়ে নিন! অনেক দেরী হয়ে গেছে।" বলে ·· থেকে বেরিয়ে গেল।

গোকুল আমার পিতৃ-পিতামহের আমলের লোক না হলেও আমার কাছে অনেক দিন আছে। যদিও মনিব সম্বন্ধে এরূপ উক্তির অধিকার তাকে কেউ দেয়নি, তা হলেও তার নির্ম্মল স্বভাবের জন্য অনেক সময় বাইরের বন্ধু-মহলে এর জন্য আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে মনে হলেও কখনও তার কথায় প্রতিবাদ করিনি।

যখন এ সংসারে সুধা আসেনি, তখনও যেমন তাকে রূঢ় কিছু বলার মূলে অন্তরে ক্ষীণ একটু দুর্ব্বলতা ছিল, আজও তেমনি স্বামীর সে দুর্ব্বলতায় আঘাত দেবার মত মেয়ে যে সুধা নয়, তার কিছু পরিচয় আগেই দিয়েছি। তাই সেও তাকে বিশ্বাসভাজন সুহৃদের মত গ্রহণ করেছে। যাই হোক, গোকুলের আনীত ওষুধ আর মশলা দুটি মুখে ফেলে দরজাটি ভেজিয়ে পরিত্যক্ত বিছানায় এসে শুলাম। এক রকম ধরে নিলাম যে, গোকুল তার মনিবের অবশ্য-কর্ত্তব্য কাজগুলি সেরে গেছে বলে বড় শীঘ্র আর এখন ফিরবে না। হয়তো মিনিট কুড়ি এমন ভাবে কেটেছে—দু'চোখে স্বপ্নময়ী নিদ্রার স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করে বড় সুখে বড় সন্তর্পণে তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছি, হঠাৎ ভেজানো দরজা সশব্দে খুলে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে গোকুল একটু থমকে দাঁড়ালো। এহেন সময়ে গোকুলের উপস্থিতি মনে ভারী বিরক্তিকর ঠেকলো। চোখের ওপর থেকে ঢাকা হাতটি অল্প সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি?"

একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল—"আজ্ঞে···মা আপনাকে দুপুরে ঘুমোতে মানা করে গেছেন! অসুস্থ শরীরে শেষে জ্বর এসে পড়তে পারে!"

গোকুলের কথায় আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো। কপাল

থেকে হাত সরিয়ে তীব্র স্বরে উত্তর দিলাম—"কি করবো বলতে পারিস? ঘুমোব না···বই পড়ব না, বেরুবো না···কি পেয়েছিস আমাকে?"

গোকুল আহত ভাবে জিভ কেটে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ-সূচক স্বরে বলল—"ই হি, তা নয়—তা নয়···বই পড়তে মানা নেই। তবে তাতে যদি মাথা ধরে? বলেন আমি নয় হেথা বসি···"

সহ্যের একটা সীমা আছে! ওর সংস্পর্শে এসে এই নিদ্রার ব্যাঘাত-জনিত অবসাদ ও মুছিয়ে দিতে পারে—এই ওর ধারণা? বললাম—"এখানে বসে কি করবি হতভাগা? তুই তোর নিজের কাজে যা দেখি। আমি ঘুমোবো।"

ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে গোকুল মাথা চুলকোতে লাগলো। সে যে তার মনিবের একটা কিছু সুব্যবস্থা না করে এখান থেকে নড়তে রাজী নয়, তার এহেন ব্যবহারে তা বোঝা গেল। তবু তার উপস্থিতি এক-রকম অগ্রাহ্য করেই চোখে হাত ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। যত রাগ···বর্ষিত হলো সুধার ওপর! সে জানে গোকুলের স্বভাব! আদর যে এমন পীড়নে পৌঁছুতে পারে—সময়-সময় তার সামনেও গোকুলের এহেন স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং তা সত্ত্বেও সব জেনে গোকুলের হাতে এমন করে আমাকে সে সমর্পণ করে গেছে!

মিনিট দু'য়েক চুপ করে থেকে গোকুল বললো—"কই, দ্যান দেখি চাবিটা! দু'-একখানা বই না হয় এনে দি!" বলে সে খাটের সামনে এসে হাত পাতলো।

আমি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডাকলাম—"গোকুল!"

আমার কথায় মোটেই দমে না গিয়ে সে বলল—"মিছে কেন রাগ করেন বাবু! মা আমায় যা করতে বলেছেন, তাই করতেছি।" ···বুঝলাম, মনিবের অপেক্ষা মনিবপত্নীর কর্তৃত্ব ভৃত্য-রত্নটির ওপর বেশী। কোন উত্তর না দিয়ে বালিশের নীচ থেকে চাবিটা ছুড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। ঘুমের দফা শেষ···চেয়ারে এসে বসলাম। নিরক্ষর গোকুল আর আমার জন্ম কি বই বেছে আনবে? যে সব বই আছে, সব আমার পড়া!

ওদিকে দুপুরের রোদ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে চলেছে। মাটী থেকে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে গোকুল চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই খান-কয়েক বই হাতে নিয়ে ঢুকলো। প্রথম দৃষ্টিতে ঠিক বুঝতে না পারলেও গোকুল যখন বইগুলো জমিয়ে রেখে চলে গেল, পুরানো ধূলিমলিন বইগুলি চিনতে বেশী দেরী হলো না। রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি' 'খেয়া' 'মানসী' প্রভৃতির সঙ্গে সত্যেন দত্তর খান-কয়েক কবিতার বই রয়েছে। মনে মনে গোকুলের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। উপস্থিত ক'বছর যে বইয়ের আলমারী ব্যবহৃত হচ্ছে, তার চাবি সুধার কাছে থাকায়, গোকুল আমার পুরানো বইয়ের আলমারী থেকে এই বইগুলি এনে হাজির করেছে! এই নিঃসঙ্গ অবসরে বইগুলি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে, সন্দেহ নেই! এর প্রত্যেকটি বইয়ের সঙ্গে এক-একটি বিশেষ ইতিহাস জড়িত!···ছাত্রজীবনে নিঃসম্পর্কীয়া রাণু যে-দিন প্রথম প্রেয়সী ও পত্নীরূপে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, চোখের সামনে সেদিনকার ছবিটি ভেসে উঠলো। মাত্র তিনটি বছর তার উপস্থিতিতে চঞ্চল জীবন এক কোমল পুষ্প-ডোরে যেন বাঁধা পড়েছিল! সীমাহীন পৃথিবী একান্ত আপন হয়ে ধরা দিয়েছিল। তিনটি বছর এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু মানুষের সাধারণ জীবনে প্রতিটি দিন—বছরের এই তিন-শ-পঁয়ষট্টি দিন সঞ্চয়ের মত অনেক কিছুই দিয়ে যায়। তখন জীবন ছিল কল্পনার ডোরে বাঁধা এবং কাব্য ছিল জীবনের প্রাণ-বস্তু! বাজারে যে কোন নূতন পছন্দমত কবিতা-পুস্তক বার হলেই কিনে সেখানি রাণুকে উপহার দেওয়া যেন অবশ্য-কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কত দিন, কত রাত্রি বইগুলি পড়ে সংসারের বেদনা এবং আঘাত ভুলেছি। কিন্তু আজ এর মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন যে কিছুমাত্র নেই—সে কি রাণুর বিরহে? পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে বোধ করি মানব-মনের ধারাও খানিকটা বদলে যায়। তাই 'কাব্য' করবার বয়সও জীবনে সব সময়ে থাকে না। 'চয়নিকা'-খানা তুলে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উলটোতে লাগলাম। এটি রাণুর রোগশয্যায় কেনা। নতুন চকচকে মলাটখানিতে পোকায় অসংখ্য ছিদ্র করে দিয়েছে। রাণুর জীবনের মেয়াদ যত ফুরিয়ে আসছিল, বেঁচে ওঠবার জন্ম ততই তার কি সে ব্যাকুল আগ্রহ! প্রত্যেক নারীর মত তার আশঙ্কার মূলে ছিল—"হ্যাঁ গা···তুমি আবার বিয়ে করবে?···আচ্ছা, কি রকম মনে হয়, বলো ত? এক জন সম্পূর্ণ অচেনা অজানা মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসবে আমার জায়গায়! আমার সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না, তবু সে আমার গড়া সংসারে কর্ত্রী হয়ে বসবে···হ্যাঁ গা, বলো না!"

তখন তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। বিপত্নীক বহু প্রেমিকের একাগ্র প্রেমের নিদর্শন দেখিয়ে নিজেকে তাদের সমধর্মী বলে জানিয়েছিলাম। মনে হয়, সাধারণের চাইতে রাণুর উপর প্রেম কি আমার স্বতন্ত্র ছিল? আমার ব্যাকুলতা দেখে রাণু তার দিন শেষ হয়ে আসছে জেনেও প্রতিদিন সান্ত্বনা দেছে—

> মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে।
> আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
> সব বাসনা যাবে আমার থেমে
> মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে।

চয়নিকার 'ফাঁকি' কবিতাটি ছিল তার অন্তর্নিহিত ভাবের পূর্ণ বিকাশ। ক'খানা পাতা উলটে দেখলাম—একমুঠো শুষ্ক বিবর্ণ ফার্ণ আজও এখানে রয়েছে! কিন্তু এই ঝরা পাতাগুলি যার স্মৃতি বয়ে আনলো, তার কিছু স্মৃতিচিহ্ন কি আমি মনের পাতায় রেখেছি?

রাণুর মৃত্যু—সাধারণের বিচারে তার স্বামীর বুকে তীব্র ভাবে বেজেছিল বলেই আমার বাবা-মা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণ-মন নিয়োজিত করে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিয়েছিলেন—যার ফলে পেয়েছি সুধাকে। সুধা এসে তার হতভাগ্য স্বামীর এই দুর্নীতির ওপর অন্যায় আসক্তি লক্ষ্য করে প্রেমে করুণায় আমার সারা মন তার দিকে আকৃষ্ট করেছে। রাত্রের নিভৃত অলস-গুঞ্জনে, দ্বিপ্রহরের নিরালা অবসরে দূরতম দেশের মৃদু বংশীধ্বনি শুনি বটে, কিন্তু তাতে রাণুর আভাস কৈ? তার নাগাল কোন দিনই পাইনি! আমার প্রথম বিবাহিত জীবনের নানা বেশের আলোক-চিত্রগুলি যে একে একে স্থানচ্যুত হয়ে ভাঁড়ারঘরের সিন্দুকের পিছনে ঠাঁই পেয়েছে, তা আমি জানি। সে-জায়গায় আজ সুধার আর তার সন্ততিবর্গের এবং

পরলোকগত পিতামাতার ছবিগুলি শোভা পাচ্ছে। কোন দিন এতটুকু প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনি, পাছে সুধা কিছু মনে করে!

আজ এই নির্জ্জন দুপুরে দীর্ঘ সাত বছর পরে ক্লান্ত চোখের সামনে মনে হলো…যেন রাণু এসে দাঁড়িয়েছে! রোগে পাণ্ডুর মৃত্যু-মলিন দুটি চোখে নির্ব্বাক্ অশ্রুর অস্ফুট আবেদন! মৃত্যুর ক'ঘণ্টা পূর্ব্বে তার বাক্‌শক্তি লোপ পায়। তার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুধু এক আবেদন তার ছিল—আমায় তুমি ভুলবে না তো?… তাকে তখন আশ্বাস দিয়েও কথা রাখতে পারিনি বলেই কি এখন তার দু'চোখে নির্বাক্ বিস্ময়? আয়ত চোখ দুটি তুলে চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে যেন ভর্ৎসনার সুরে বললে—"এই তুমি? ছি!"

আঃ! কত দিন…কত দিন পরে রাণুকে দেখলাম…একেবারে সামনে! তার মৃত্যুর পর কত দিন একা-একা নির্জ্জন ছাদে, বারান্দায়, ঘরে বসে একাগ্র ভাবে তাকে আহ্বান করেছি…কিন্তু একটি নিমেষের জন্য সে ধরা দেয়নি আজকার মত। দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধান কাটিয়ে আজ যখন রাণু এসে সামনে দাড়ালো, মনে হলো, মাঝের এই ক'টি বছর যেন জীবনের পটভূমি থেকে মুছে গেছে। চিরদিনের অভিমানিনী সে—অতি তুচ্ছ প্রাত্যহিক জীবনের কোন সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিমান-ভরে এসে দাঁড়িয়েছে!…আমি তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই একটু পিছনে সরে গিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে সে বললো। "ছি!…তুমি এমন ঠক!" রুদ্ধকণ্ঠ ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লো—হাত বাড়িয়ে আবার তাকে ধরতে গেলাম। ম্লান মুখে সে জবাব দিল—"না! আমি যাই। দেখতে এসেছিলাম মনে আছে কি না।"—বলে সে লঘু পদবিক্ষেপে যেতে উদ্যত হলো। দুই বাহু প্রসারিত করে বললাম—"যেয়ো না রাণু—শোনো!"—সারা শরীরে অসহ্য অবসাদ নেমে এসেছে। উঠে অনুসরণ করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েছি। নিমেষে সে মিলিয়ে গেল।

এ কি নিষ্ঠুর পরাজয়! জীবনে প্রথম পরাজিত হয়েছিলাম নিয়তির কাছে—যখন নিজের শরীরের শোণিত-বিন্দুটি দান করেও রাণুকে নিয়তির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম! আজ হলো দ্বিতীয় পরাজয়। যাকে বলতে, যাকে শোনাতে এত কথা জমে আছে, এত কাছে পেয়েও তাকে কোন কিছু বলতে বা কাছে ধরে রাখতে পারলাম না!

অসহায় ভাবে টেবিলের ওপর মাথা রাখলাম। সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো। সেই কি একবারই মহা-মুহূর্ত্তের আবির্ভাব? যার জন্য এত আকুলতা, যাকে কোন দিন পাবো না ভেবে এই নিরুদ্ধ আবেগ আমার মনে—তাকেই যেন আবার পেলাম অযাচিত ভাবে! রাণু যেন সন্তর্পণে ফিরে এসে পিছনে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত রেখে সস্নেহ অনুযোগ করলো—"তুমি কাঁদছ! অমন করে কেঁদো না গো…আমার বড় মন কেমন করে!" মাথা তুলতে সাহস হলো না…পাছে চোখোচোখি হলে আবার সে চলে যায়! সেই অবস্থায় তার দু'খানি হাত সামনে টেনে এনে তাতে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ফেললাম।

"আচ্ছা গোকুল, তুমি কি বলো ত? খুব মানুষকে পাহারাদারীতে রেখে গেছি বাবুর! এই দুর্ব্বল শরীরে সারা দুপুর এই চেয়ারে বসে কাটিয়েছেন!…তুমি কি বিছানাটা ঠিক করে বাবুকে শুতে বলতে পারোনি?"…

তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাইতেই দেখি, সামনে সুধা! রাণু-ভ্রমে তাকে কাছে টেনে এনেছি। সুধার যেন ব্যস্ততার সীমা নেই।… সদ্য-নিদ্রোত্থিত গোকুলের উপস্থিতি একরূপ অগ্রাহ্য করেই আঁচল দিয়ে সস্নেহে আমার ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে সুধা স্বগতোক্তি করলো—"জানি…যে মানুষ! কেউ কি তা বোঝে? যাবো না সাধে বলেছিলাম?…এই রোগা শরীরে এত অত্যাচার সহ্য হলে এখন বাঁচি।"…

সুধার সেবা-নিপুণ হাত দুটি জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে মনে হলো। ব্যগ্র-ব্যাকুল আগ্রহে তার হাত দুটি চেপে ধরলাম। সুধা শুধাল—"কি হয়েছে, বলো ত? দুঃস্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?…পাখাখানা নিয়ে এসো গোকুল!…" তার পর আমার দিকে চেয়ে বলল—"বিছানায় শোবে চল! আমি বাতাস করছি!"

মনে হলো, যেন সুদীর্ঘ কত যুগের পর আবার এই মাটীর বুকে পা দিয়েছি! সুধা ছাড়া কে আমায় বাঁচাবে? দুঃস্বপ্নের মত রাণু যদিও অস্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এসেছিল, তার অন্তর্ধানের সঙ্গেই সব শেষ হয়েছে!

শ্রীমতী নমিতা দত্ত

প্রতীক্ষা

তিমির-ঘন রাতি
মুছিয়া গেছে পথের রেখা, নিবিয়া গেছে বাতি।
গগনে আজি নাহিকো তারা, সজল মেঘে হয়েছে হারা—
বাদল-বায়ু উতলা হয়ে দুয়ারে কর হানে,
কাঁদিয়া জাগি একেলা বসি আঁধার বাতায়নে!

গোধূলি-বেলা যারে
দেখেছি যেতে বাজারে বাঁশী পরাণ চাহে তারে!
পথিক কত নয়ন'পরে এ পথ দিয়া ফিরিল ঘরে
সে শুধু গেল আনত মুখে একেলা আনমনে—
চকিতে তারে যেমনি দেখা জাগিল সাড়া মনে!

আমার হিয়া-তলে,
কি যেন ব্যথা রাখিয়া গেল—কি কথা গেল বলে!
ক্ষণিক যেন করুণ হেসে,
ডাকিল মোরে আঁখির ভাষে,
আমারে বুঝি চাহিল নিতে করিয়া চির-সাথী!

তখন ছিল আকাশে আলো দুয়ারে ছিল রাতি!
চকিতে দেখা চকিত-ক্ষণে
গভীর হয়ে বাজিছে মনে—
কোথায় গেল? চাহিয়া দেখি তিমির-ঘন রাতি!

শ্রীমতী নলিনী দেবী।

ভারতীয় ধর্ম্মে ইস্‌লামের প্রভাব

হজরত মহম্মদের তিরোভাবের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরবীয় মুসলমানগণের উপদ্রব আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিন্ধুদেশে খলিফার আধিপত্য স্থাপন ইহার পরিণতি। বাণিজ্য-উপলক্ষেই ভারতের সহিত মুসলমানদের পরিচয় হইয়াছিল এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সম্মিলনই সিন্ধু-বিজয়ের কারণ। কিন্তু সিন্ধু-বিজয়ের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের বসতি-স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মালাবার উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান-উপনিবেশ স্থাপিত হয়। মহীশূরের ইতিহাস-রচয়িতা কর্ণেল উইল্‌ক্‌স্‌ বলিয়াছেন যে, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোঙ্কন প্রদেশে এবং কুমারিকা অন্তরীপের পূর্ব্বদিকে ইরাক হইতে আগত মুসলমানেরা বসতি-স্থাপন করিয়াছিল।

নবাগত মুসলমানেরা ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মালাবারের অন্তর্গত কোদুঙ্গালুরের রাজা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশে বিভিন্ন স্থানে একাদশটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কালিকটের জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু-রাজগণ বহু দিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলে মুসলমানদের বসতি-স্থাপন আরম্ভ হয়। কালক্রমে এই অঞ্চলের বাণিজ্য তাহাদের হস্তগত হয়। মোটের উপর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলাউদ্দীন খল্‌জীর অভিযানের বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা মুসলমানদের সহিত এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিল।

উত্তরাপথে মুসলমান-রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস পাঠকগণের সুপরিচিত। মুসলমান-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সাধুসন্তেরাও ভারতবর্ষে আসিতেন। খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী, সৈয়দ জলালউদ্দীন বোখারী প্রভৃতি বিখ্যাত সাধুর নাম অনেকেই জানেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে বহু সাধুর নাম উল্লিখিত আছে। যাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, কালের দুর্ব্বার স্রোত যাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিয়াছে, এমন সাধুও অনেক ছিলেন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে ইস্‌লামের প্রচার কেবলমাত্র অসির সাহায্যে হয় নাই, ইস্‌লামের নূতন আদর্শ এবং মুসলমান সাধুদের আধ্যাত্মিক শক্তি বহু হিন্দুকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইস্‌লামের প্রচারের কারণ আলোচনা করিব না; যে বিপুল জনসমষ্টি বাহ্যতঃ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবধারা কোরাণের মন্ত্রে প্রভাবিত হইয়াছিল কি না, তাহাই আমাদের প্রশ্ন।

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণব সন্তগণ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। হিন্দুদের মতে এই ভক্তিধর্ম্ম গীতা, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মতবাদের স্বাভাবিক পরিণতি। ভক্তিধর্ম্মের সহিত একেশ্বরবাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এখানেও বৈদিক ধর্ম্মের সহিত ভক্তিধর্ম্মের মূলগত পার্থক্য নাই, কারণ, বৈদিক ঋষিগণই একেশ্বরবাদ প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজের ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতি স্থানচ্যুত হয় নাই। ইহাও প্রাচীন রীতির অনুসরণ মাত্র—বৌদ্ধ ও জৈন-মতের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্ম্ম বৈদিক-ধর্ম্ম-বিরোধী নহে, বরঞ্চ বৈদিক ধর্ম্মেরই স্থানকাল-পাত্রোপযোগী পরিণতি মাত্র; শৈব ও বৈষ্ণব সন্তগণ প্রাচীন ভাবধারা নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্য ও সাধনার মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হন নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকেরা ভক্তিধর্ম্মে বৈদেশিক প্রভাবের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন (১) এবং কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকও(২) তাঁহাদের মত সমর্থন করেন। পাশ্চাত্য লেখকেরা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেন, খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবই ভক্তিধর্ম্মের বিবর্ত্তনের মূল কারণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই মতের আলোচনা করিব না। অপর দলের মতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাবেই দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত কোন সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক(৩) বলিয়াছেন, যে অঞ্চলে এবং যে যুগে মুসলমানেরা আসিল, সেই অঞ্চলে এবং সেই যুগে শঙ্কর, রামানন্দ ও বাসব ধর্ম্মপ্রচার করিলেন; অতএব এই দুইটি ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইরূপ যুক্তি বোধ হয় কোন নৈয়ায়িক মানিয়া লইবেন না। জনৈক ভারতীয় লেখক(৪) বলিয়াছেন, হিন্দুরা যে মুসলমানদের নিকট ঋণী ছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইবে না; কারণ, তাঁহারা কখনও সুস্পষ্ট ভাবে পরস্ব আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের গৌরব খর্ব্ব করিতেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এইরূপ পরোক্ষ অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত দুর্ব্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। শঙ্কর ও রামানুজ আজীবন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বৈদিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনায় বেদ-বহির্ভূত ভাব বা আচারের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ যে বাইবেল বা কোরাণের শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত বা রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা সুদৃঢ় প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় না।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় না কি বিশেষ ভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। লিঙ্গায়ৎগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিত না। ঈশ্বরকে বলা হইত 'অল্লম'। কোন কোন লেখকের মতে এই শব্দটি আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন। লিঙ্গায়ৎ মতে গুরু দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ এবং সুফীগণ গুরুবাদে বিশ্বাসী। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় গুরুবাদের জন্যও ইস্‌লামের নিকট ঋণী হইতে পারে, কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গৃহ্যসূত্রে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১) নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য—Coldwell—Comparative Grammar of the Dravidian Languages; Hopkins—India Old and New; Barth—Religions of India; Logan—Malabar; Indian Antiquary. vol. III.

(২) R.G Bhendarkar, Vaishnavism and Saivism; Tarachánd, Influence of Islam on Indians Culture.

(৩) Barth—Religions of India.

(৪) Tarachand—Influence of Islam on Indian Culture.

মোটের উপর আমার মনে হয় যে, লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে ইস্লামের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও ইহা মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় শৈব উপাসনার পরিণতি মাত্র। লিঙ্গপূজার সহিত ইস্লামের কোন সম্বন্ধ নাই। লিঙ্গায়ৎগণের মূলমন্ত্র "নমঃ শিবায়।" ইহাও ইস্লামের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। লিঙ্গায়ৎ মতের প্রধান প্রচারক বাসব দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্যাণের রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জৈন-বিরোধী ছিলেন। ইস্লামের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, এ-কথা মনে করিবার কোন ঐতিহাসিক কারণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকগণের জীবনে ও কার্য্যে ইস্লামের প্রভাব অধিকতর সুস্পষ্ট। এক হিসাবে দেখিতে গেলে রামানন্দই ইঁহাদের পথপ্রদর্শক। রামানন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় অদ্যাপি সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার সময়ে উত্তর-ভারতের সর্বত্র মুসলমান-অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। শিখ ধর্মের ইতিহাসলেখক ম্যাকলিফ বলেন যে, রামানন্দ বারাণসীতে সুপণ্ডিত মুসলমান সাধুদের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। রামানন্দও ভক্তিধর্মের প্রচারক; কেবলমাত্র তিনি বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে রামকে দেবতার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারে তিনি কালোপযোগী উদারতা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমান ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে ধর্মবিপ্লবের প্রবর্ত্তকরূপে গণ্য করা যায় না। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; পবিত্র প্রয়াগে ও কাশীধামে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; হিন্দুশাস্ত্রে—বিশেষতঃ বেদান্তে—তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার ধর্মজীবনের প্রেরণা আসিয়াছিল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম হইতে। মুক্তিলাভের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ইস্লামের শিক্ষা আংশিক ভাবেও গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

রামানন্দের মতবাদের বিশুদ্ধ হিন্দু রূপ আমরা পাই তুলসীদাসের রামায়ণে; আর ইস্লামের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত রূপ পাই কবীরের দোঁহাবলীতে। প্রকৃতপক্ষে কবীরই হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে ইস্লামের প্রথম প্রচারক। তিনি বলিয়াছেন, "কাশীতে আমার আত্মোপলব্ধি হয় এবং রামানন্দ আমাকে জাগ্রত করেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি কয়েক জন মুসলমান পীরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। কবীরের কোন কোন দোঁহার ভাব ও ভাষা সুফীদের কবিতার ভাব ও ভাষা দ্বারা অনুপ্রাণিত। অথচ তিনি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে বৈষ্ণবী ভক্তির সুস্পষ্ট অনুসরণ করিয়াছেন। কবীরের ঈশ্বর যেন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী গোপীদের মত ভক্ত সাংসারিক সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইবে, ইহাই কবীরের কাম্য। অনেকেই বলেন যে, কবীর হিন্দু ও মুসলমানকে এক-ধর্মপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন (৫)। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কবীর মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। আজীবন সাধনার ফলে তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মুক্তিপিপাসুকে বিতরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক মিলনের পথ প্রদর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্র বা মুসলমানশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন নাই। গুরুর উপদেশ তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু যে চরম সত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বোপার্জ্জিত। এই সত্য উদারহৃদয় প্রেমিক সাধকের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মন আকর্ষণ করিয়াছিল।

শিখধর্মের উপর ইস্লামের প্রভাব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলেন যে, নানক হজরত মহম্মদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইস্লামের বাণী দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মমত বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল (৬)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নানক কোন কোন বিষয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মূলতঃ হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহার জীবিতকালে শিখধর্ম্ম একান্ত ভাবেই হিন্দুধর্মের অনুগামী ছিল (৭)। শিখ লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ নানককে বিপ্লবীরূপে বর্ণনা করেন এবং শিখধর্ম্ম বরাবরই হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত, এইরূপ মত প্রকাশ করেন (৮)। এই সকল বিভিন্ন মত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নাই। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। নানক ঈশ্বরের নাম-গানই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। এখানে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইস্লামে নাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, নানক জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইস্লামের সহিত এখানে শিখধর্ম্মের প্রবল পার্থক্য। তৃতীয়তঃ, নানক মুসলমানকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেও জাতিভেদ মানিতেন। এই বিষয়ে তিনি রামানন্দের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। নানকের মৃত্যুর পর নানা কারণে শিখধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং মুসলমানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে হয়তো শিখেরা কোন কোন বিষয়ে ইস্লামের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, নানক হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য এক নবধর্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কোন কোন লেখক বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মেও ইস্লামের প্রত্যক্ষ প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ ডক্টর তারাচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলেন যে, বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী মুসলমান ছিলেন (৯)। সম্ভবতঃ গোস্বামিদ্বয়ের মুসলমানী উপাধি (দবীর খাস ও সাকর মল্লিক) এই বিচক্ষণ ঐতিহাসিককে

(৫) "···Kabir was the first to come forward boldly to proclaim a religion of the centre, a middle path···Akbar's Din-i-Ilahi was 'not an isolated freak of an autocrat···but an inevitable result of the forces which were deeply surging in India's breast, and finding expression in the teachings of men like Kabir."—Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture, p. 165.

(৬) Tarachand—Influence of Islam on Indian Culture.

(৭) I. Banerjee—Evolution of the Khalsa, vol.I.

(৮) "হাম হিন্দু নহীন" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৯) Influence of Islam on Indian Culture.

বিপথে চালিত করিয়াছে'। যাহা হউক, চৈতন্যদেব ইস্‌লাম হইতে ভক্তিধর্ম্মের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতই বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলাধার! যবন হরিদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইস্‌লামের প্রভাব সূচিত হয় না। রামানন্দের মুসলমান শিষ্য ছিল, এ-কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রণেতা রূপ ও সনাতন গোস্বামী হিন্দু শাস্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশেই প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহারা কবীর ও নানকের ন্যায় কথ্যভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, নবদ্বীপের রীতি-অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর মহাগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও সর্ব্বাংশেই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবে অনুপ্রাণিত। বৈষ্ণবদর্শনের আলোচনা করিয়া কেহ অদ্যাপি ইস্‌লামের প্রভাব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

মহারাষ্ট্রীয় সাধুদের সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল ভীমা নদীর তীরবর্ত্তী পণ্‌ঢরপুরে অবস্থিত বিঠোবার মন্দির। বিঠোবার ভক্তেরা হিন্দুধর্ম্মের একটি উদার রূপ গ্রহণ করিয়া পরোক্ষভাবে সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। নামদেব জাতিভেদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বহু সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া ভক্তিধর্ম্মের পতাকাতলে সকল জাতিকে সম্মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে কয়েক জন মুসলমান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া সেই নূতন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনার ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। মহারাষ্ট্রে মুসলমানেরাই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত, হিন্দুরা ইস্‌লামের প্রতি আকৃষ্ট হইত না। সেখ মহম্মদের শিষ্যেরা রমজানে ও একাদশীতে উপবাস করিত এবং মক্কা ও পণ্‌ঢরপুর উভয় স্থানকেই পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য করিত। তুকারামও নামদেবের ন্যায় ভক্তিমার্গের অনুগামী ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের হস্তে তাঁহাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনি জাতিভেদ প্রভৃতি সনাতন প্রথা মানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের আকৃতি নাই, নাম নাই, বাসস্থান নাই। আমরা যেখানে যাই, সেখানেই তিনি উপস্থিত আছেন।" তুকারামের অভঙ্গ অনেকাংশে কবীরের দোঁহার মত, অতি সহজ ভাষায় গ্রথিত এবং ভক্তিরসে আপ্লুত। এই ভক্তিরসের প্রকৃত উৎস প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম, ইস্‌লাম নহে।

ইস্‌লাম নানা দিকে হিন্দু জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান রাজত্ব-কালে হিন্দুরা মুসলমানী আদব-কায়দা শিখিয়াছিল, মুসলমানী পোষাক গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানী ভাষা বর্ত্তমান যুগের ইংরেজীর মতই আত্মসাৎ করিয়াছিল। ইস্‌লামের প্রভাবে হিন্দুর স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প নবরূপ ধারণ করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া সত্যপীরের পূজা আবিষ্কার করিল, পীরের দরগা হিন্দুর এবং বটবৃক্ষ মুসলমানের ভক্তির কেন্দ্র হইল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অন্তর-লোকে ইস্‌লাম প্রবেশ করিতে পারিল না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু সাধুসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে; তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মকে কালোপযোগী নবরূপে সজ্জিত করিয়াছে, কিন্তু ভয়াবহ পরধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের মিশ্রণে দুষ্পাচ্য খিচুড়ী প্রস্তুত করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম নিজের মূল রূপটি বিসর্জ্জন না দিয়াও নিত্য নব মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, এই পরম সত্যটিই ইতিহাসে প্রমাণিত দেখি।

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কঠিনা

সেথায় তরী ভিড়িয়েছিলাম ভুলে
শাখায় ঘেরা বকুল-তলার ঘাটে,
যেথায় তুমি আকুল এলোচুলে
নাইতে এলে নবীন জীবন-নাটে।

উদাস দু'টি দিঠির অকরুণা
কঠিন হয়ে বিঁধলো আমার মনে—
উতল-হাওয়া জামের বনে বনে
মর্ম্মরিয়া বইলো অকারণে।

ছায়া-শ্যামল আমের শাখা হতে
কোকিল ঘন ডাকলো আকুল-সুরে
নদীর ঘাটে নবীন জীবন-নাটে
কঠিন তুমি রইলে শুধু দূরে।

নাইকো ত্রুটি বসন সুশাসনে—
পত্রছায়ে ফোটা ফুলের মত
যৌবনেরে মঞ্জু কুঞ্জবনে
রাখ্‌লে ঢেকে কঠোর পীনোন্নত।

সেই ঘাটে আজ ভিড়িয়েছি মোর তরী—
যেথায় তব দেহের সুবাস-মাখা—
একলা ঘাটে নিয়ো কলস ভরি—
অশোকগুচ্ছ দোলার রঙীন-শাখা।

আবার তুমি নাইতে এসো ঘাটে,
কোকিল হের' মুখর বনে বনে,
নাই বা ধরা দিলে জীবন-নাটে,
মনের কথা রইবে মনে মনে।

বিজন-ঘাটে নাই বা হলো কথা,
মনের সাথে মনের পরিচয়,
কঠিন পীন বুকের মুখরতা
সকল ব্যথা করবে মধুময়।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, বার-এট্-ল)

পাশাপাশি

অসিতের ছুটী ফুরাইতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। ঐ ব্যাপারের পর এখানে যে আর এক দণ্ড তার থাকা উচিত নয়, এ কথা মন তার বার-বার বলিয়াছে, তবু চলিয়া যাইতে বাধিয়াছে। এতখানি পরাজয়ের বোঝা বহিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা এখানে থাকার চেয়েও যে কম লজ্জাকর, তা সে ভুলিতে পারে নাই। মনকে বুঝাইয়াছে, কেনই বা যাইবে! এ তো তার নিজের মামার বাড়ী। এ-বাড়ীতে কৃষ্ণার যে দাবী, তার চেয়েও ঢের বেশী দাবী তার নিজের। অথচ আজ মনে হয়, এ-বাড়ীতে কৃষ্ণাই যেন সব, কৃষ্ণার সংস্পর্শেই যেন তার নিজের যা-কিছু অধিকার।

কৃষ্ণা তার মামীমার দূর-সম্পর্কের ভাইঝি, এখানে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিয়াছে। মামীমা আজ যদিও বাঁচিয়া নাই, তবু বড়লোক মামার স্নেহের অধিকারে, এবং তাঁর বড় মেয়ে কেতকীর অন্তরঙ্গতার আকর্ষণে সে এ-বাড়ীর অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়া আছে। আসলে যদিও কিছুই তার নাই, তবু সব আছে, এবং যেন রীতিমত বেশীমাত্রাতেই আছে। হতাশ প্রণয়ের অভিমান লইয়া অসিত কত দিন আপনার মনে এই মেয়েটির সঙ্গে তুলনা করিয়াছে একটা নামহীন অজ্ঞাত বনলতার—যে একটা মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া নিজের জীবনী সঞ্চয় করে, অথচ শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাদ দিয়া মহীরুহটির বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

সুন্দরী তাহাকে বলা চলে না, কিন্তু সে অভাবটুকু সে এমন ভাবে পূরণ করিয়াছে তাহার অহঙ্কার দিয়া যে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কাহারো এতটুকু নাই। কেতকী তার চেয়ে অনেক রূপসী, অথচ আসলে সে যেন ওর কাছে নগণ্য! কেতকীর মধ্যে যে চাঞ্চল্য, যে চটুলতা আছে, কৃষ্ণার মধ্যে তার কিছুই নাই। সে স্বভাবতঃ কথা বলে কম, মুখে কদাচিৎ অহঙ্কারের কথা উচ্চারণ করে, অথচ মনে-মনে সে যে কত গর্ব্বিতা, তা আর কেহ না বুঝুক, অসিত বুঝিয়াছে! কিন্তু সব বুঝিয়াও এই মেয়েটির প্রতি তার মনের কম্পাস বহু দিন ধরিয়াই উন্মুখ হইয়া আছে। কেন যে, তা কে বলিবে? সংসারে সকল জিনিষের কৈফিয়ৎ সব সময় খুঁজিয়া মেলে না, এও বুঝি তাই। কত দিন তার মনে হইয়াছে, ঐ যে ওর অব্যক্ত দাম্ভিকতা, ঐটুকুই ওর বৈশিষ্ট্য! বাঙালীর ঘরে ক'জন মেয়ের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

আজ কিন্তু ওর ঐ অহঙ্কারের জন্যই অসিত প্রত্যাখ্যানের অপমান গায়ে মাখিয়া এখান হইতে সহসা বিদায় লইতে পারে নাই। তাই ঠিক করিয়াছে, কষ্ট যতই হোক্, ছুটীর বাকী ক'টা দিন এইখানেই কাটাইয়া যাইতে হইবে। কৃষ্ণাকে সে বুঝাইতে চায়, এটুকু আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তার আছে।

অথচ বাড়ীতেও সে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। কোন-না-কোন খেয়াল লইয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনো মাছ-ধরার সরঞ্জাম লইয়া যেখানে হোক্ মাছ ধরিতে যায়, কখনো বন্দুক লইয়া শিকার করিতে যায়, কখনো বা সম্পূর্ণ একা তার টু-সীটার মোটরখানা লইয়া অনির্দ্দেশ্য অভিযানে বাহির হইয়া পড়ে।

কেতকী বলে,—তোমার রকম কি বলোতো ছোড়্দা! 'বাড়ীতে তোমার টিকি দেখতে পাওয়া যায় না! থাকো কোথায়? বাবা আজ ভারী রাগ করছিলেন কিন্তু।

অসিত হাসিয়া বলিল,—কি বলছিলেন বলতো?

—বলবেন আর কি! শুধু রাগ করছিলেন!

—ও!

ওপাশে বসিয়া কৃষ্ণা শুধু মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। সে-হাসি অসিতের দৃষ্টি এড়াইল না—অতি-বিজ্ঞের গাম্ভীর্য্য-মাখা হাসি। অসিতের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল। কথার চেয়েও ধারালো তার এই নিঃশব্দ হাসি! কি অর্থ আছে ঐ হাসির? অসিত তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এবং সে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তারই জন্য এই হাসি?

কেতকী বলিল,—কৃষ্ণা কি বলে জানো ছোড়্দা?

অসিত যেন একটুখানি চমকিয়া উঠিল। জবাব দিল,—কি?

কৃষ্ণার মুখে-চোখে আবার তেমনি চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

কেতকী বলিল,—ও বলে, অসিত বাবু এখনো একেবারে ছেলেমানুষ।

অসিত হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহার মনের ভিতরে অনেকখানি উষ্ণতা সঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিল,—জগতে ছেলেমানুষ হয়ে থাকতে পারা আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে মনে করি। নিজের অহঙ্কারে নিজেকে একটা কেষ্টবিষ্টু মনে করায় বাহাদুরি কিছুই নেই।

ইঙ্গিতটা কেতকী বুঝিল না। কৃষ্ণা হাসিয়াই জবাব দিল,—অহঙ্কার না-থাকাটাকেই কি আপনি সরলতা বলেন অসিত বাবু?

—মাপ্ করবেন। আমি ও-সব কোনো-কিছু মনে করে ও-কথা বলিনি।

কৃষ্ণা হাসিয়া চুপ করিয়া গেল। অসিতও কাজের অজুহাতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

সেদিনের সে-ঘটনাটা আজ আবার নূতন করিয়া অসিতের মনে জাগিতেছে।

কয়েক দিন ধরিয়া এমনি একটা সুযোগের সন্ধানেই সে ফিরিতেছিল। সুযোগও মিলিয়াছিল সেদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। মামাবাবু ছেলেমেয়েদের লইয়া সিনেমায় গিয়াছিলেন, শরীরটা ভালো না থাকায় কৃষ্ণা সঙ্গে যায় নাই। তেতলায় তার নিজের ঘরে শুইয়া কৃষ্ণা একখানা বই পড়িতেছিল। অসিত তার ঘরে ঢুকিয়া এলোমেলো এ-কথা সে-কথা পাড়িয়া যখন আদৌ জমাইতে পারিতেছিল না, কৃষ্ণা তখন নিজেই একটা আলোচনার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা অসিত বাবু, আপনারা, মানে, পুরুষরা যুগ-যুগ ধরে আমাদের গায়ে এমনি করে 'দুর্ব্বল জাতি' বলে একটা ছাপ মেরে রেখেছেন কেন বলতে পারেন? Softer··· fairer···এই সব বিশেষণগুলো শুনে কাণ পচে গেল যে! মেয়েরা দুর্ব্বল কিসে বুঝিয়ে দিতে পারেন? আমাদের কথা না-হয় ছেড়ে দিন্, আজকাল জগতের মেয়েরা কত ব্যাপারই না করচে বলুন তো। শুনেচেন, এই সেদিন কলকাতায় যে-বোমা পড়েছিল, তারও পাইলট্ ছিল মেয়েরা!

অসিত জবাব দিয়াছিল,—বোমা ফেলাটা মেয়েদের পক্ষে একটা আদর্শ বলে আমি মনে করি না কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিয়াছিল,—আদর্শ যদি না-ই হয়, তাহলে মেয়ে বা পুরুষ কোনো মানুষের পক্ষেই তা নয়। এখানে মেয়ে আর পুরুষের মাঝে কোনো গণ্ডী টানার পক্ষপাতী আমি নই অসিত বাবু!

এই ভাবে আলোচনা সুরু হইয়া শেষ পর্য্যন্ত কেমন করিয়া যে অসিত সেদিন ঐ মেয়েটির কাছে নিজের মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহার পারম্পর্য্য আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু তার জবাবে কৃষ্ণার সে কি উচ্ছ্বসিত হাসি! নারীসুলভ এতটুকু লজ্জার বালাই নাই, যেন কতখানি হাস্যকর কথা বেচারা বলিয়া ফেলিয়াছে, এমনি একটা ভাব তার মুখে-চোখে, তার অহেতুক হাসির উচ্ছ্বাসে।

সকুণ্ঠ বিরক্তির সহিত অসিত বলিয়াছিল,—কি যে এমন অন্যায় কথা বলেচি আমি, তা তো বুঝতে পারচি নে। এই আশাটিকে আমি শুধু আজ নয়, অনেক দিন ধরে' মনে-মনে লালন করে' এসেছি কৃষ্ণা।

তেমনি হাসিতে-হাসিতেই কৃষ্ণা জবাব দিয়াছিল,—আপনি এত ছেলেমানুষ, তা আমি জানতুম না অসিত বাবু! এত দিন ধরে' এ ছেলেমানুষীকে মনে পুষে না' রেখে অনেক আগেই আপনার আমাকে বলে' ফেলা উচিত ছিল, তাহলে আমি আপনাকে আগেই নিশ্চিন্ত করে' দিতে পারতুম।

সেদিনের সেই সর্ব্বনাশা হাসির গ্লানি অসিত কোনো দিন ভুলিতে পারে নাই, জীবনে হয়তো পারিবে না কোনো দিন। নিজের মনে বারম্বার এই প্রশ্নই সে করিয়াছিল সেদিন, কোথায় চলিয়াছে আজিকার ঐ আধুনিকার দল? নিজেদের এক-একটি বড়-গোছের সিনিক্ গড়িয়া তোলার জন্য ইহাদের এই একাগ্র সাধনার অর্থ কি?

শিকারে যাইবার সরঞ্জাম লইয়া অসিত সেদিন বাহিরে যাইতেছিল, মাঝখানে হঠাৎ কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণা বলিল,—একটা কথা আছে অসিত বাবু, যদি কিছু না মনে করেন।

অসিত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

—কি, বলো?

—কোথায় যাবেন শিকারে?

—বনে।

—শিকার যে লোকারণ্যের মধ্যে হয় না, এটুকু আমার অজানা নেই! কিন্তু, একটা কথা রাখবেন?

—কি, বল।

—শিকার-করা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। ভারী সখ আমার মনে। আজ আমি আপনার সঙ্গে শিকার দেখতে যাবো।

—তুমি যাবে? আমার সঙ্গে? আর কে যাবে?

—কৈ, আর কেউ তো কেউ আমাকে যাবার কথা বলেনি। আমায় একা নিয়ে যেতে আপনার আপত্তি আছে বুঝি?

—না, না, ঠিক তা নয়। তবে কেতকীও যদি যেতো, তাহলে তোমার কোনো কষ্ট হোতো না।

—কষ্ট হয়তো হোতো না। কিন্তু যে-জন্যে যাওয়া, আসলে সেইটেই হোতো না। বনে বেড়ানো হোতো, শিকার দেখা হতো না। আমি শিকার দেখতে চাই।

একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া অসিত জবাব দিল,—তা বেশ তো, চলো। পরে আবার একটুখানি থামিয়া বলিল,—কিন্তু আমার সঙ্গে, মানে, একলা আমার সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি নেই?

হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল,—ওই জন্যেই তো বলি, আপনি আসলে এখনো ছেলেমানুষ! একটু দাঁড়ান্। আমি তৈরী হয়ে আসি।

মিনিট দশেক পরেই কৃষ্ণা আবার দেখা দিল। খুব হাল্কা জরদা-রঙের একখানি শাড়ী তার পরণে। প্রসাধনে বা পোষাকে এতটুকু আড়ম্বর নাই। হাসিয়া বলিল,—কেতকী যেতে চাইছিল, কিন্তু আমি যেতে দিলুম না। তাতে দুষ্টু মেয়ে কি বললে, জানেন?

—কি?

—বললে, 'আমি গেলে নিশ্চয় তোমাদের অসুবিধে হবে?' আমি সোজা জবাব দিলুম, 'হবেই তো!'

বলিতে বলিতে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে আগেই মোটরের দরজা খুলিয়া ভিতরে উঠিয়া বসিল। অসিত তার পাশে বসিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিল। পিছনের সীটে তার ছোক্‌রা চাকরটা বসিল।

রাস্তায় কাহারো মুখে একটা কথা নাই। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটর ছুটিয়াছে। অসিতের মস্তিষ্কের ভিতর কত-কি যে কথা বোধ করি তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে!

হঠাৎ কৃষ্ণার আজিকার এ-খেয়ালের অর্থ কি? সে কি চায়? শিকারের ব্যাপারটা ক্রমশঃ তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া যবনিকার অন্তরালে সরিয়া যাইতেছিল। সবচেয়ে যেটা বড় হইয়া তার সারা দেহে বিজলী-সঞ্চার করিতেছিল, সে তাহাদের আজিকার এই উল্কাগতিতে ছুটিয়া চলা। যদি এ-যাত্রার কোন দিন শেষ না থাকিত, এম্‌নি উদ্দাম গতিতে অনির্দ্দেশ্য পথে সে শুধু ছুটিতে পাইত পাশে এই মেয়েটিকে লইয়া!

এক সময় কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল,—সামনে তো ঐ একটা গভীর বন। ঐখানেই যাবো বুঝি আমরা?

হঠাৎ ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া অসিত বলিল,—হাঁ।

মোটরের গতি মন্দ হইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অসিত মোটর থামাইয়া নিজে নামিল এবং একখানি হাত কৃষ্ণার দিকে বাড়াইয়া দিল। কৃষ্ণা তার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল।

—এ বনে বাঘ আছে না কি অসিত বাবু?—প্রশ্ন করিল কৃষ্ণা।

অসিত জবাব দিল,—থাকেই যদি, তোমার ভয় করছে না কি?

—একেবারেই না।

—কিন্তু বাঘ এখানে নেই। বাঘ শিকার কখনো করিনি, করার কল্পনাও নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, যদি সত্যিই এখানে বাঘ থাকতো!

—বুঝেচি, তাহলে আমার নির্ভীকতার পরীক্ষা হয়ে যেতো, এই কথাই তো বলতে চান? কিন্তু আমাকে সে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবার মত সাহস যে আমার সঙ্গীটির নেই, সেই না হচ্ছে মুস্কিল!

দুই জনে বনের ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিল। পিছনে-পিছনে চাকরটা চলিয়াছে। চওড়া রাস্তা ক্রমশঃ সরু বন-পথের ভিতর মিলাইয়া গিয়াছে। হেমন্তের অপরাহ্ণ। চারি দিকের গাছপালায় সূর্য্যের উত্তাপ নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। চমৎকার একটা ঠাণ্ডা আবহাওয়া সারা দেহে লাগিতেছে এবং বুঝি বা মনেও। বাতাস

বহিতেছে কি না বোঝাই যায় না, শুধু বড় বড় গাছের মাথায়-মাথায় একটুখানি ঝির-ঝির শব্দ বাতাসের মৃদু গুঞ্জরণের আভাস দিতেছে।

কৃষ্ণা বলিল,—বাঘ তো নেই-ই, পাখীই বা আপনার কই ?

অসিত হাসিয়া বলিল,—তোমার শিকার দেখবার সখ মেটাতে পাখীরা বুঝি জটলা করে' বসে' থাক্‌বে এখানে, ভেবে রেখেচ ? এখানে শুনেচি অনেক বন-মুরগী পাওয়া যায়।

উৎফুল্লের স্বরে কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল,—বন-মুরগী ! কখখনো আমি দেখিনি। চমৎকার তো ! মারতে পারবেন আপনি ?

—হয়তো পারবো। কেন, তুমি পারবে না ?

—আমি ? বা-রে, আমি কখনো বন্দুকই ধরিনি যে ! নিজে যদি শিকার করতে পারবো, তবে আর আপনার সঙ্গে এলুম কেন ?

অসিত বলিল,—আজ শিকারে-আসা তোমার সার্থক হতো, যদি তোমারও কাঁধের ওপর দোলানো থাক্‌তো এমনি একটা বন্দুক !

আবার সুরু হয় নিঃশব্দে আগাইয়া চলা। বুনো তুলসীর তীব্র গন্ধের সঙ্গে শেফালির ঘন সুগন্ধ মিশিয়া অরণ্যের অন্তরের স্পর্শ আনিয়া দিতেছে। পায়ের তলায় শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-শব্দ যেন সেই গভীর নিস্তব্ধতার ক্ষুব্ধ বাণী প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিতেছে।

কৃষ্ণা বলিল,—ভারী চমৎকার লাগচে, না ?

—কি চমৎকার ?

—এই বনের মধ্যে দিয়ে এমনি করে' এগিয়ে-চলা ! জীবনের একঘেয়েমীর মাঝখানে এ-রকম যে একটা দিক্‌ আছে, তা কি কোনো দিন মনে হয়েছে ! ও-গাছটা কি বলুন্‌ তো ?

—সোঁদাল। আর ওপাশের ওটা শিরীষ। সোঁদালের ফুল কখনো দেখোনি বুঝি ? চমৎকার থোকো-থোকো ফুল, যেন পাকা-সোনার রঙ দিয়ে তৈরী !

—আর শিরীষ ?

—সেও চমৎকার ! ঠিক যেন ঝুমকো ফুলের মতো। বনের মেয়েদের ঐ-সব ফুলই তো হচ্চে অলঙ্কার ! চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঐ সব গাছের ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

—তা, আমাদের সেই সময় এলেই তো বেশ হতো !

—কিন্তু আমরা তো ফুল দেখ্‌তে আসিনি, এসেছি শিকার কর্‌তে।

—তা সত্যি। কিন্তু একটাও যে পাখী নেই ! বন-মুরগীগুলোই বা কোথায় লুকালো বলুন্‌ তো !

এক জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা চারি দিকে তার সন্ধানী-দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে লাগিল, কোথাও একটা পাখী দেখা যায় কি না।

হঠাৎ বনানীর অন্তর স্পন্দিত করিয়া একটা শব্দ শোনা গেল। কৃষ্ণা চমকিয়া উঠিল।

—কি ওটা বলুন্‌ তো ?

—বন-ঘুঘুর ডাক। কিন্তু পাখীটাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না !

কৃষ্ণা সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—বন্দুকটা ছুড়ুন্‌ না !

অসিত হাসিয়া বলিল,—শব্দভেদী বাণ ? আচ্ছা পাগল তো, অথচ তোমার কাছে আমি হলুম ছেলেমানুষ !

কৃষ্ণা অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল। কয়েক-পা অগাইয়া গিয়াই হঠাৎ সে থমকিয়া পিছাইয়া আসিল।

—শীগ্‌গির, বন্দুক নিন্‌—চট্ করে'। ঐ দেখুন।

অসিত হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—এমনি কর্‌লে যেন পাখী বসে' থাক্‌বে নিজে থেকে গুলীটা বুক পেতে নেবার জন্যে !

কয়েক হাত সামনে যে পাখীটি মাটীতে বসিয়া পুচ্ছ নাড়িতেছিল, সে ততক্ষণে উড়িয়া গেল। কৃষ্ণার আক্ষেপের সীমা রহিল না।

—তাই তো ! সত্যি আমিই উড়িয়ে দিলুম, না ? ছি-ছি, কি যে কর্‌লুম ! বলিতে বলিতে সত্য সত্যই সে তার কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। অসিত মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বড় একটা কামরাঙা গাছের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা বাঁকা রৌদ্ররেখা কৃষ্ণার গায়ে আসিয়া পড়িয়া তার জরদা-রঙের শাড়ীতে স্বর্ণচাঁপার রঙ ধরাইয়া দিয়াছিল। কবরীর বন্ধনমুক্ত কয়েকটি উড়ো চুলের উপর সেই রৌদ্ররেখা চিক্‌চিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল এবং আক্ষেপের উত্তেজনায় মুখের অনেকটুক্‌ অংশ একটা ক্ষীণ রক্তাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অসিত কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

চকিতের মধ্যে কত কথাই যে অসিতের মনে ঝড়ের মত তোল-পাড় করিয়া উঠিল ! ইচ্ছা হইতেছিল, হাতের বন্দুক ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে শুধু অমনি নির্নিমেষ মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে এই মেয়েটির পানে। এই নিস্তব্ধ বনানীর সমস্ত অব্যক্ত অলৌকিক মাধুর্য্য ইহাকে আজ কি অপরূপ করিয়া তার চোখের সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে !

কৃষ্ণা বিরক্তির সুরে বলিল, —না, আসলে আপনি শিকারীই নন্‌। সত্যিকারের শিকারীর সাম্‌নে শিকার আপনি এসে ধরা দেয়। আর আপনি সারা বন ঘুরে ছোট্ট একটা পাখীও যোগাড় করতে পারলেন না।

—সে দোষ বুঝি আমার ? আসলে আজকে আমরা ঠিক শিকারের আবহাওয়া নিয়ে আসিনি কৃষ্ণা !

—মানে ?

—আজ তোমাকে দেখে সমস্ত বন স্তব্ধ হয়ে গেছে, কোথাও একটা প্রাণীর সাড়া নেই। মনে হচ্ছে, বনের পশু-পাখী গাছ-পালা সকলে আজ নিঃশব্দ বিস্ময়ে শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে আছে ! এই আবহাওয়ার মধ্যে বন্দুক-হাতে শিকার করার মতো এত বড় অবাস্তব ব্যাপার আর কিছুই নেই। এখানে দাঁড়িয়ে ন্যুট হামসুনের সেই কথাটা আজ বার-বার মনে হচ্ছে আমার।

—কি কথা, বলুন তো ?

—হয়তো বনের এমনি মাধুর্য্য দেখেই হামসুন এক দিন উদার আবেগভরে বলেছিলেন, 'এখানকার এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে বসে আমার জীবনের পরম শত্রুর জুতোর ফিতে পর্য্যন্ত আমি বেঁধে দিতে পারি।'

কৃষ্ণা খিল-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—আপনারও নিশ্চয় ঐ রকম অসম্ভব আজগুবি কথা মনে জাগচে ! ভাগ্যিস্‌, পরম-শত্রু-স্থানীয় আপনার কেউ নেই এখানে ! থাকলে কি-যে করতেন ! আমি আর যা-ই হই, আপনার শত্রুর পর্য্যায়ে নিশ্চয় আমাকে ফেলেন্‌নি !

বলিয়া আবার একটা হাসির হিল্লোলে বনভূমি ঝঙ্কৃত করিয়া দিল ; তার পর বলিল,—সাধে বলি, আপনার ভেতরটা এখনো কাঁচা

ছেলেমানুষীতে ভরা। শিকার করতে এসে কাঁধে বন্দুক নিয়ে মানুষের যে কবিত্বের বাতিক চাপে, তা এই প্রথম দেখলুম।...ও-সব সস্তা সেণ্টিমেণ্টালিজম্ ছাড়ুন্ দেখি! শিকার করা আজ মোদ্দা চাই-ই!

অসিত বলিল,—শিকার না-পেলেও? আমার কি মনে হচ্ছে জানো? আজ যদি আমার মতো তোমার হাতেও অস্ত্র থাকতো, তাহলে উপযুক্ত শিকারের অভাবে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে হয়তো আমাকেই তোমার শিকারের লক্ষ্যবিদ্ধ করে নিতে। মানুষের রক্তের মধ্যে এমনি একটা হিংস্রতার বীজ আছে!

হাল্কা হাসিতে কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণা বলিল,—হোক্ হিংস্রতা! তবু শিকার আজ পেতেই হবে। চলুন, আরো এগিয়ে যাই। এখানটা তবু অনেক ফাঁকা। সামনে মনে হচ্ছে এর চেয়ে নিবিড় বন। দেখছেন না, কেমন অন্ধকার! ঐ অন্ধকারের মধ্যে কত-কি যে লুকিয়ে আছে, কে জানে!

তাহারা আরও আগাইয়া চলিল। সত্যই এ স্থানটা আরও নিবিড়। ছোট বড় নানা রকমের গাছ প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও একটুকু সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ অসম্ভব। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, নিবিড়, অন্ধকার।

কৃষ্ণা উৎফুল্ল স্বরে বলিল,—একেই তো ঠিক বন বলা চলে অসিত বাবু। এখানে যদি আপনায় শিকার না-মেলে তো আর কোথাও মিলবে না।

—কিন্তু, কৈ, কিছু দেখতে পাচ্ছো কি?

—নিশ্চয় পাবো। আপনি আসুন দেখি আমার সঙ্গে-সঙ্গে। বলিয়া সে সেই নিবিড় বনস্থলীর অন্তর ভেদ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইল। অসিত আর একটু আসিয়াই তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। তাহার শাড়ীর উড়ন্ত আঁচলটুকু একটা ঘন ঝোপের আড়াল দিয়া অকস্মাৎ কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আরো খানিক অগ্রসর হইয়া অসিত হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। এক অজানা আশঙ্কায় সে বিপন্ন হইয়া উঠিল। কৃষ্ণা কোন্ দিকে গেল? সে যদি এখন তাহার সন্ধানে সম্পূর্ণ ভুল দিকে গিয়া পড়ে? নির্ব্বাক্ চাকরটা ঠিক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসিত তাহাকে দক্ষিণে যাইতে বলিয়া নিজে বাম দিকে অগ্রসর হইল। এবং খানিকটা আসিয়া ডাকিল,—কৃষ্ণা?

সে-ডাক কৃষ্ণার কাণে গেল, কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। তার সন্ধানী দৃষ্টি গাছের প্রত্যেক ফাঁকে-ফাঁকে, শাখায়-প্রশাখায়, পত্রাচ্ছাদনে হতাশ হইয়া ফিরিতেছিল। ভাবিতেছিল, আশ্চর্য্য, এই নিবিড় বনানী আজ জীবশূন্য হইয়া পড়িল না কি? অথচ তাহার অন্তরের ভিতর কি-যে অহেতুক হিংস্রতা জাগিয়া ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। যেন আজ এই হিংস্রতার রসদ না পাইলে তার জীবনে একটা অপূরণীয় শূন্যতা চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইবে।

উপর্য্যুপরি কয়েকটা ডাক দিবার পর অসিত দেখিল, কৃষ্ণা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। অসিত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে?

—সব মাটী করলেন আপনি! একসঙ্গে এক-ঝাঁক পাখী, আপনি চীৎকার করে' সব উড়িয়ে দিলেন।

অসিত বলিল,—তাই না কি? তা হোক্, চলো, আজ বাড়ী ফিরি।

—সে কি! ব্যর্থ হয়ে ফিরবো, বলেন কি? যে-কোনো শিকার একটা চাই-ই অসিত বাবু। এই সামান্য কাজে যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়, তাহলে সংসারে কোন্ কাজটা আমার বা আপনার দ্বারা হবে?

—সত্যিই কিছু হবে না হয়তো। আমি বুঝেছি, হবেই না। নাহলে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। কৃষ্ণা তার একখানা হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল।

—চুপ। চুপ। ঐ দেখুন।

সামনে খানিক দূরে গাছপালার আড়ালে মাঝারি-গোছের একটা দীঘি। দীঘির জলের প্রায় সবটুকুই পদ্মপাতায় ও অন্যান্য জলজ লতায় ঢাকিয়া গিয়াছে, এবং সেই সবুজ আস্তরণের মাঝে-মাঝে রঙ-বেরঙের কতকগুলো ফুল মাথা তুলিয়া আছে।

অসিত বলিল,—ভারী চমৎকার তো!

—কি চমৎকার?

—ঐ ফুলগুলো! এই বনের মাঝখানে—

—ও হরি! আপনাকে আমি ফুল দেখতে বললুম বুঝি? ঐ দেখুন,—ঐ ওপারে যেখানটায় হেলে-পড়া তালগাছটা জল থেকে মাথা তুলেচে, ঠিক ওর থেকে ক'হাত দূরে জলের ওপরে কি বেড়াচ্চে বলুন তো?

—তাই তো, একটা হাঁস না? হাঁ, হাঁসই তো মনে হচ্চে!

বলিতে বলিতে অসিত বন্দুক তুলিল। এবং পরমুহূর্ত্তেই নিস্তব্ধ বনানীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া সুতীব্র শব্দতরঙ্গ ছুটিল। বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা। সহসা কি-যে ঘটিল, কিছুই সে বুঝিল না।

অসিত সানন্দে বলিয়া উঠিল,—দেখেচো কৃষ্ণা, ঐ দেখো, হাঁসটা জলের ওপর কাৎ হয়ে পড়েচে। তার দু'খানা পাখা কি রকম পদ্মপাতার ওপর ছড়িয়ে পড়েচে!

—গুলী লেগেচে বুঝি?

—অব্যর্থ।...ওরে ভিখে!

চাকরটা তখন তার ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসিত বলিল,—তুলে আনতে পারবি তো?

—হুম্—বলিয়া ভিখে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুকুরের পাড়ে পাড়ে ওপারের সেই বাঁকা তালগাছটার দিকে ছুটিল।

পাখীটা তখনো ছট্‌ফট্ করিতেছে। তার ডানা-নাড়ার শব্দ এপারে পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণা নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া। রুদ্ধ নিশ্বাসে হঠাৎ বলিল,—ভিখুকে জলে নামতে বললেন কেন? পদ্মপাতায় পা আটকে ডুবে যায় যদি?

অসিত একবার বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। হাসিয়া বলিল,—পাগল! ছাখো না, এখনি ও ওটাকে তুলে নিয়ে এলো বলে।

মিনিট কয়েক পরেই ভিখে পাখীটাকে লইয়া হাজির হইল। মস্ত বড় একটা পাঁশুটে রঙের বুনো-হাঁস। তার বড়-বড় পা-দুটোকে ভিখে মুঠো করিয়া ধরিয়াছে এবং তার লম্বা গলাটা মাটীর দিকে ঝুলিতেছে।

কৃষ্ণা বলিল,—দেখি, দেখি, মরে' গেছে বুঝি?

অসিত হাসিয়া বলিল,—এখনো বেঁচে থাকবে ভেবেচো না কি তুমি?

কৃষ্ণা ততক্ষণে ভিথের কাছ হইতে হাঁসটাকে লইয়া নিজের দুই হাতে শোয়াইয়া ধরিয়াছে। অসিতের মুখের পানে তাকাইয়া একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল,—চমৎকার দেখ্‌তে, না? দেখুন না, যেমন রঙ, তেমনি নরম পালকগুলি! এ রকম সুন্দর হাঁস আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

অসিত বলিল,—তাহলে শিকার সার্থক হয়েছে তো?

কৃষ্ণা বলিল,—নিশ্চয়!···আচ্ছা, কই, একটুও রক্ত নেই তো? গুলীটা কোন্‌খানে লাগ্‌লো বলুন তো?

বলিয়া সে পাখীর বুকের মখমলের মত পালকগুলি সরাইয়া সরাইয়া তার ক্ষতস্থান সন্ধান করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

—বা-রে, ভারি আশ্চর্য্যি তো। কোথায় গুলী লাগ্‌লো, তা তো বোঝা যাচ্ছে না!

অসিতও পালকের নীচে হাত চালাইয়া দেখিল, কিন্তু ক্ষতস্থান কোথায়, ধরিতে পারিল না।

কৃষ্ণা শুষ্কমুখে বলিল,—গুলীটা তাহলে লাগ্‌লো না না কি? গুলী না-লেগেই ও মরে' গেল?

অসিত বলিল,—আশ্চর্য্য কি?

—আশ্চর্য্য নয় বল্‌চেন?

—একেবারেই না। গুলী গা ঘেঁষে গেলেও ওকে মরতে হবে। আঘাতটি যে ঠিক কোথায় লেগেচে, তা আমরা চোখ দিয়ে ধর্‌তে পার্‌বো না, অথচ ওই গুলীতেই যে ও মরেচে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই।

পলকহীন দৃষ্টিতে কৃষ্ণা পাখীটার দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—দোষটা কিন্তু আসলে আমারই অসিত বাবু! আমি খুঁজে না বার কর্‌লে বেচারা মর্‌তো না!

অসিত বলিল,—তোমার দোষ? আশ্চর্য্য! ওকে না পেলে আমাদের আজ্‌কের শিকারই ব্যর্থ হয়ে যেতো যে কৃষ্ণা!

হঠাৎ একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কৃষ্ণা বলিল,—নাঃ, সব দোষ আমারই অসিত বাবু! আপনার কোনো দোষ ছিল না! আমি যদি আপনাকে না দেখাতুম—ছি-ছি, কত বড় অন্যায়ই না কর্‌লুম! কেন যে শিকারে আস্‌বার এই সৃষ্টিছাড়া খেয়াল আজ আমাকে পেয়ে বস্‌লো!

অসিত হাসিয়া বলিল,—এ দুর্ব্বলতার কোনো মানে নেই কৃষ্ণা! আজকের শিকারে-আসা তোমার কাছে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার সারা জীবনের মাঝখানে এই দিনটি আমার চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। আজ তুমি সঙ্গে না-এলে আমাকে ব্যর্থ হয়ে ফির্‌তে হতো। চলো, বাড়ী ফিরি।

গাড়ীতে উঠিয়া কৃষ্ণা মরা হাঁসটাকে কোলে করিয়া বসিল। বলিল,—এটা আমায় দেবেন্‌ অসিত বাবু?

—কি কর্‌বে নিয়ে?

—আপনিই বা কি কর্‌বেন?

অসিত হাসিয়া জবাব দিল,—দেখ্‌তে ও যত চমৎকার, তার চেয়েও চমৎকার হবে যখন ওর সুসিদ্ধ নরম মাংসটুকু—

কৃষ্ণা শিহরিয়া উঠিল।

—কি-যে বলেন আপনি! এত বড় নিষ্ঠুর আপনি, আমি তা জান্‌তুম না অসিত বাবু!

—নিষ্ঠুর? অসিত জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল! তার পর ধীরে-ধীরে বলিল,—মেয়েদের নিষ্ঠুরতার নজীর তুমি চাও না কি কৃষ্ণা? যারা ঘুমন্ত নগরীর নিরীহ নর-নারীর বুকে বোমা ফেলে-যাওয়ার গর্ব্ব করে, তুমি তো তাদেরই এক জন! নিষ্ঠুরতায় পুরুষকে তোমরা হার মানিয়েচ।

কৃষ্ণা নির্ব্বাক্‌ হইয়া খানিকক্ষণ হাঁসটার নরম পিঠের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। তার পর আস্তে-আস্তে বলিল,—সে তো আমি স্বীকার করচি যে, এর জীবনের জন্য আমিই দায়ী। আপনার গুলীতে ও মরেনি অসিতবাবু, মরেচে আমার নিষ্ঠুরতার আঘাতে। আমার নিষ্ঠুরতায় ঐ সুন্দর বনানী আজ আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল, এ-কথা তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারচি।

কৃষ্ণার মুখের পানে দৃষ্টি রাখিয়া অসিত নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিল। এ-মেয়েটিকে সে যেন ইহার আগে কোনো দিন দেখে নাই! জীবনের যে-ঘটনাটা তার কাছে একান্ত তুচ্ছ, তাহারই পরিবেশের মধ্য দিয়া এ যেন আজ সব দিক্‌ দিয়া অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিল তাহার চোখে।

ধীরে-ধীরে সে বলিল,—সংসারে এমনিই হয় কৃষ্ণা! যে আঘাত করে, সে ক্ষতের সন্ধান পায় না, অথচ সেই অনির্দ্দেশ ব্যথার স্থানটা—

কৃষ্ণা একবার বিদ্যুৎ-দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া অসিতের মুখের পানে চাহিল. এবং মুহূর্ত্ত-পরেই ধীরে-ধীরে চোখ নামাইয়া লইল! তার মনে হইল, আজ সময় বুঝিয়া অসিতও তাহাকে তাহার আঘাতের প্রতিঘাত করিতেছে। তার দুই চোখ জ্বালা করিয়া আসিল। নিজেকে এতখানি অসহায়, জীবনে তার কোন দিন মনে হয় নাই।

মোটর তীরবেগে ছুটিয়াছিল।

সাম্‌নের সুদূরপ্রসারী পথের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া এবং দুই-হাতে ষ্টিয়ারিং-এর চাকা ধরিয়া অসিত ডাকিল,—কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা সাড়া দিল না।

ঠিক তেম্‌নি ভাবে—কৃষ্ণার দিকে না-ফিরিয়াই অসিত আবার বলিল,—আজকের এই শিকারটা আমি তোমাকেই দিলুম কৃষ্ণা আমার স্মৃতিচিহ্ন করে'। যদি কোনো দিন মানুষের অন্তরের গোপন ক্ষতস্থানটুকু তোমার ব্যাকুল সন্ধানী দৃষ্টিকে এম্‌নি করেই আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে বুঝবো, এই নিরীহ পাখীর জীবন-দান ব্যর্থ হয়নি।

কৃষ্ণার মুখে কোন জবাব নাই। শুধু একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে চকিত হইয়া অসিত দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, হাঁসের মাথাটিকে বুকে চাপিয়া কৃষ্ণা স্তব্ধ হইয়া আছে এবং দৃষ্টি তার সাম্‌নের অনন্ত শূন্যের উপর দিয়া কোথায় গিয়া মিশিয়াছে, কে জানে!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

আমাদের দারিদ্র্য

কবি ও ধর্মপ্রবর্ত্তকের মুখে আমরা দারিদ্র্যের স্তুতি শুনি। কবি নজরুল বলিয়াছেন,—

'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান!'

খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগুরু যীশু অর্থসেবীদের জন্ত স্বর্গদ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গৌরবময় প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল—ঐশ্বর্য্যত্যাগ। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্ মহাত্মা গান্ধীর মুখেও আমরা সে দিন শুনিলাম,—Enjoy thy wealth by renouncing it.

দারিদ্র্যের দার্শনিক তত্ত্ব হয়ত খুব গভীর। কিন্তু কবি ও ধর্ম্মপ্রচারকের বাণী অর্থনীতিকের কাছে হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। যখন দেখি, ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক অর্থের অভাবে পশুর চেয়েও হীন ভাবে বাস করিতেছে, তখন তাঁহাদের কথা—তা সে যত শ্রুতিমধুরই হউক—আমাদের কাছে অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। সারা দেশ জুড়িয়া দুর্ভিক্ষের মৃত্যুময় রূপ দেখিয়া আমরা দারিদ্র্যকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য প্রবচনে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীর মাথা-পিছু আয় নির্ণয় করিবার বহু প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার জন্ত নিখুঁত হিসাব সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে আমাদের মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৬২্ টাকা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত তুলনামূলক তালিকা হইতে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের গভীরতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

দেশ	বৎসর	মাথা-পিছু আয়, পাউণ্ড-হিসাবে
বৃটিশ ভারত	১৯৩১	৫
যুক্তরাজ্য	১৯৩১	৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৯২৪	৬৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৯৩১	৮৯
ফ্রান্স	১৯২৮	৪১
ডেনমার্ক	১৯২৭	৫৫
জার্ম্মাণী	১৯২৫	৩৯
ইটালী	১৯২৭	২৪
ইজিপ্ট	১৯২৮	২১
জাপান	১৯২৫	১৪
বুলগেরিয়া	১৯৩১	৯
রাশিয়া	১৯২৫	১০

ভারতবাসীর গ্রীষ্মদেশোচিত সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার প্রণালীর কথা তুলিয়া কেহ কেহ সমস্যাটাকে লঘু করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু সাইমন-কমিশন বলিয়াছেন, সে-কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের মাথা-পিছু আয়ের তুলনামূলক ছবিটি ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়!

এই দারিদ্র্যের ফলে ভারতবর্ষের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। মাসিক পাঁচ টাকা আয়ে এক জন লোকের দু'বেলা আদর্শ খাদ্যের (balanced diet) ব্যবস্থা হইতে পারে না। এক জন ভারতবাসী যদি তাহার সমস্ত অর্জ্জিত অর্থ শুধু খাদ্যের খাতে ব্যয় করে, তাহা হইলেও সে মাত্র ৬০০ ক্যালরি খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। অথচ প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের গড়পড়তা পরিমাণ ৩৬০০ ক্যালরি। পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতির কথা উঠিতেই পারে না।

এই স্থানে একটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের জাতীয় আয়ের (National Income) প্রতি এক শত টাকা যদি প্রতি এক শত লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক জন ধনী এবং ভূম্যধিকারী পাইবে ৩৩্ টাকা; ৩৩্ টাকা পাইবে ৩৩ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; এবং অবশিষ্ট ৩৪্ টাকা পাইবে ৬৬ জন শ্রমিক। ইহা হইতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যায়। অথচ পৃথিবীর প্রথম দশ জন অর্থবান্ ব্যক্তির মধ্যে তিন জনের স্থান এই ভারতবর্ষেই—ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। অন্নহীন, গৃহহীন, পরিধেয়হীন অবস্থায় ভারতবাসী দিনযাপন করিতেছে। শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হয় যে, ভারতবর্ষের প্রতি চার জন শিশুর মধ্যে এক জন এক বৎসরের মধ্যেই জীবনলীলা সংবরণ করে।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠিবে, ভারতবাসীর এতখানি দারিদ্র্যের কারণ কি? ভারতবর্ষের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের কথা সর্ব্বজনবিদিত। অথচ তাহার অধিবাসীরা এত দরিদ্র কেন? 'A poor people in a rich country'—শোনায় ধাঁধার মত!

মোটামুটি ভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই দেশ জুড়িয়া এই যে নিরক্ষরতা—সেইটাই চোখে পড়ে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণী শিক্ষার আলোক পায় নাই। মান্ধাতার আমলে যে প্রথায় কৃষিকার্য্য হইত, আজ বিজ্ঞানের আলোকদীপ্ত বিংশ শতাব্দীর মানুষ হইয়াও তাহারা সেই প্রথায় কৃষিকার্য্য করিতেছে। অসহায় গ্রাম্য শিল্পীরা যন্ত্রের শুভাগমনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারে নাই। দেশে যে নামমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে কেরাণী প্রস্তুত করা। শিল্পে এবং ব্যবসায়ে শিক্ষা দিবার জন্ত অতি অল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রধানতম অসুবিধা হইতেছে মূলধনের অপ্রতুলতা। জন-সাধারণের অর্থ-সঞ্চয়ের দিকে প্রবণতা বেশী। অর্থ হাতে আসিলে কৃষকপত্নী গহনার জন্ত বায়না ধরে! কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল এ-বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের আর একটি প্রধান হেতু—অতি-প্রজতা (over-population)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা দশ কোটি ছিল; কিন্তু আজ সেখানে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ যে-হারে লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, সে-হারে জাতীয় আয় বাড়ে নাই। সুতরাং জন-সাধারণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।

ভারতবাসীর এই বর্ত্তমান ভয়াল দারিদ্র্য সত্ত্বেও যদি বুঝা যায় যে, তাহার অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে, তাহা হইলে কতকটা আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে অর্থনীতিকদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাই। এক দল বলেন,—দেশের আর্থিক অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সচ্ছলতাই সূচিত হয়। ভারতের

জনসাধারণ আজ অধিক কাপড়, অধিক লবণ, অধিক চিনি, অধিক তাম্রকূট ব্যবহার করিতেছে। তাহার বাসগৃহ তাহার পৈত্রিক বাসগৃহ হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত। মৃত্তিকা-পাত্র পরিহার করিয়া সে আজ ধাতুপাত্র ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু বেসরকারী দল এই বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, সাধারণ ভারতবাসীর খাদ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। তাহাদের খাদ্যে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে; অথচ অন্য কোন দ্রব্য সে-স্থান পূরণ করে নাই। সহরের নেত্রঝলসী প্রাসাদ দেখিয়া দেশের বাসগৃহের উন্নতি হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। কিন্তু এ বিতর্কের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে মনে হয়, ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অতি-মন্থর গতিতে হইতেছে; হইলেও তাহা আশাপ্রদ নহে।

কি করিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের হাত হইতে ভারতবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-সম্বন্ধে উপসংহারে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এত বড় একটা বিরাট সমস্যার আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। বর্ত্তমান যুগে রাশিয়া প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশগুলির কথা আলোচনা করিলে ভারতবর্ষে অর্থনীতিবিষয়ক পরিকল্পনার (economic planning) উপযোগিতার কথা মনে হয়। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ কেইন্সের কথায় অবাধ নীতির (Laissez-faire) দিন চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রকে এখন দেশের অর্থনীতি-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে ষোল-আনা সোশ্যালিজম্ প্রবর্ত্তন করা দরকার কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি দিক্‌কে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা আছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে নানা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতকগুলি নূতন সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। এ জন্য যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি-বিষয়ক পরিকল্পনার (Post-war economic reconstruction) প্রয়োজন। স্যর পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস প্রভৃতি আট জন অর্থনীতিবিদ্ ব্যবসায়ী ভারতের জাতীয় আয় দ্বিগুণিত করিবার জন্য যে পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, সকল দিক্ দিয়াই তাহা সময়োচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নানা বিষয়ক পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। এই সকল পরিকল্পনা যাহাতে বাস্তবে পরিণত হয়, তাহার জন্য দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ও সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু সকল সমস্যার গোড়ার কথা হইতেছে, দেশবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন—সর্ব্বপ্রথমে তাহার সমাধান করিতে হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র পাল

শিল্পীর খেদ

স্থায়ী, সুন্দর, তেমনি আবার কাজের
সৃষ্ট বস্তু—নিখিল রাজাধিরাজের।
রবি-শশী—দুটি আলো বই কিছু নয়,
গড়েছেন কবি তাই কি মহিমাময়!
ও কি উজ্জ্বল! লোক-লোচনের প্রিয়
অস্ত-উদয় কি অনির্ব্বচনীয়!
বিরাট তবু কি কমনীয় করে গড়া,
অচিন্ত্যনীয় রহস্য দিয়ে ভরা।
নীলাম্বুধি তো জলের বিশাল ঢব,
তাতেই নিয়ত শত নেত্রোৎসব।
ভীম-কান্ত ও রূপের নাহিক ওর,
অতল—অতুল—কলকল্লোলে ভোর।
ও কি বিচিত্র, তরঙ্গ-ভঙ্গ,
জোয়ার-ভাঁটার নব নব রঙ্গ।
ও কি সুবিশাল, ও কি দুর্জ্জয় দাপ,
সর্ব্ব-অঙ্গে অসীমত্বের ছাপ!
পর্ব্বত ও তো বিধির গড়ানো ঢিপ
দিবা ও নিশারে বসায়ে পরায় টিপ।
শিলার টুলেই কত বড় কারিকুরি,
রাজে আরণ্য প্রাচুর্য্য বুক জুড়ি'।
কস্তুরীবাসে কুসুমের পরিমলে
আনন্দময় করিয়াছে কত ছলে।
ওখানেতে যেন মিলে শিল্পীর খোঁজ—
বুলাইয়া তুলি দিয়াছে সুধার পোঁচ।
বনস্পতি কি? ও তো জীবন্ত সাজি
জোগায় নিয়ত পাতা-ফুল-ফল-রাজি।
নিবিড় শ্যামল সম্পদ-ভারে নত,
কি অজস্রতা—চলেছে সেবাব্রত।
বৃহৎ মহৎ যুগ-যুগান্ত স্থায়ী
রূপের এবং রসের সীমা যে নাহি।
প্রতি পত্রটি শিল্পীর হাতে আঁকা
অক্ষর সব সুন্দর হাত পাকা।
আমরাও সেই শিল্পীরে অনুসরি
আসলের অনুকরণে নকল গড়ি।
আমরা যা গড়ি—থেকে যায়, তাহা তাই—
বড়ত্বে তার একেবারে দাবী নাই!
হয় না, নয় সে ক্রমবর্দ্ধনশীল
অমৃতের ছিটা নাহি তাহে এক তিল।
বিচিত্রতায় ভরা নয় তার প্রাণ—
যেটা শিল্পীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান!
নক্‌সা আঁকিয়া আমরা ত লাগি কাজে
কাজ তাঁর চলে নক্‌সা লুকানো আছে।
অনুসরি তাঁরে আগাইয়া যাই যত
চাঁদ ও চকোরে ব্যবধান বাড়ে তত।
পথেই প্রতিভা শক্তি ফুরায়ে যায়,
সুরশিল্পীর নাগাল নাহি যে পায়।
ভাবি সেথা পাবো অমৃতের সন্ধান
গিয়া দেখি সেই আগেকার ব্যবধান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাচ-কাহিনী

একটা চলিত কথা আছে, কাচের ঘরে বাস করিয়া কাহারো গায়ে ঢিল ছুড়িতে নাই! এ-কথার অর্থ, যাদের গায়ে ঢিল ছুড়িবে, তারা ঢিল ছুড়িলে তোমার কাচের ঘর ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে!

এখন কিন্তু এ-কথা অচল! বিজ্ঞানের দৌলতে কাচ আজ কঠিন হইয়াছে, অভঙ্গুর হইয়াছে—লোহা-ইস্পাতের মতই অভঙ্গুর। এমন কাচ আজ তৈয়ারী হইতেছে যে-কাচের গায়ে লোহার ডাণ্ডা মারিলেও কাচের গায়ে এতটুকু চিড় খাইবে না! শুধু আঘাত নয়—প্রচণ্ড তাপে এবং দারুণ শৈত্যেও কাচ আজ ফাটে না, ভাঙ্গে না!

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা আজ কাচ তৈয়ারী করিতেছেন—তিনশো রকম বিভিন্ন রীতিতে। কাচ তৈয়ারী করিবার প্রেশক্রুপশন-সংখ্যা আজ ত্রিশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। তার উপর যে-কাচের মধ্য



কাচ-পাত্রাদির জন্ম কাঠের ছাঁচ তৈয়ারী

দিয়া আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সঞ্চারিত করা হইতেছে, সে-কাচ এত যত্নে তৈয়ারী হইতেছে যে, তার টন-প্রমাণ উপাদানে যদি এক ছিটা বালির দানা কম্ বা বেশী মিশানো হয়, তাহা হইলে সে-কাচ বাতিল হইবে!

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির কাচ দিয়া দু'-রকম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। একটি রশ্মিতে বায়ুমণ্ডল হইতে ওজোন-বাষ্প সংগৃহীত হয়—অপর রশ্মি রোগ-বীজাণু বাছিয়া টানিয়া তাহার বিলোপ সাধন করে। হাসপাতালে এ কাচ লাগে সংক্রামক ওয়ার্ড হইতে অপর ওয়ার্ডগুলির আচ্ছাদনী-(blanket)-হিসাবে। এ কাচের দৌলতে ব্যাঙ্ক-বিশেষজ্ঞেরা জাল-চেক ধরেন;—আর্ট-গ্যালারি করে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বলিয়া যে সব চিত্র পাওয়া যায়, সে সব চিত্র নকল, না আসল, তাহার বিচার-কার্য্য। তাছাড়া অস্ত্রোপচারে, দন্ত-চিকিৎসার অস্ত্রশস্ত্রাদি-নির্মাণে এবং অত্যন্ত গরম দেশে যে-ট্রেণ চলে, সেই ট্রেণের কামরার জানালায় ব্যবহারের জন্ম এ-কাচের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

আজ যে সব রঙীন কাচ দেখিতেছি, সে সব কাচ রঙ করিতে মার্কিন ব্যবসায়ীরা প্রায় তিনশো রকমের রঙ তৈয়ারী করেন। এক কথায় কাচের রচনা-রীতি আজ রীতিমত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ কাচকে আজ কত কাজে লাগানো হইতেছে, শুনিলে বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না! সেণ্ট্রিফুগাল পাম্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির প্লেট, কাপড়ের মিলের রোলার-গাইড, ফৌজের আসবাবপত্র, স্পাইরাল স্প্রিং, ষ্টোভ, মায় ফনোগ্রাফের রেকর্ড পর্য্যন্ত আজ এই কাচে তৈয়ারী হইতেছে।

কাচকে এত কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে মানুষকে সাধনা



কাচকে যেমন খুশী যেদিকে খুশী নোয়ানো যায়

এবং অধ্যবসায় স্বীকার করিতে হইয়াছে অসাধারণ রকম। কাচে ফুটা করিয়া কাচকে অটুট রাখিতে বহু গবেষণা-অনুশীলনের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাচকে সর্ব্ববিধ টেম্পারেচার সহিবার উপযোগী করিয়া গড়া হইতেছে। রেলোয়ে-সিগনাল-ল্যাম্পের কাচ এমন মজবুত যে, প্রলয়-ঝড়েও সে কাচ ভাঙ্গিতে জানে না! দারুণ গ্রীষ্মে বা প্রচণ্ড ঝড়ে, হিমজর্জ্জর শীতে রেলোয়ে-ল্যাম্পের কাচ যে আজ অটুট থাকে, তাহা শুধু বৈজ্ঞানিকদের সাধন-সাফল্যের গুণে।

ব্যাটারির জন্ম যে সব 'জার' ব্যবহৃত হয়, সেগুলির কাচ যেমন মজবুত, তেমনি অভঙ্গুর হইয়াছে। কাচের রন্ধন-পাত্রাদি এমন হইয়াছে যে, জ্বলন্ত উনানের উপর এ সব পাত্র বসাইয়া অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করুন, পাত্র ফাটিবে না, ভাঙ্গিবে না।

তার উপর দু'খানি স্বতন্ত্র কাচকে পূর্ব্বে জোড়া যাইত না—

কাচকে 'ওয়েল্ড' করা যাইত না; এখন কাচকে ওয়েল্ড করা সম্ভব হইয়াছে। ওয়েল্ড করার ফলে কাচ দিয়া আজ রকমারি বাতিদান, ফুলদানী ও পানপাত্রাদি তৈয়ারী হইতেছে। তৈয়ারী করিবার সময় কাচকে প্রচণ্ড অগ্নিতাপে ফেলা হইতেছে—এত তাপেও কাচ গলিয়া যায় না, ভাঙ্গিয়া যায় না। অগ্নিতাপ হইতে তুলিয়া এ সব কাচের পাত্রকে তখনি আবার বরফে ফেলিয়া শীতল করা হয়—তাহাতেও কাচের দেহ অটুট অক্ষত থাকে! জমাট দুধের কারখানায়, ফল ও পানীয়াদির কারখানায় আজ ইস্পাতের পাইপের পরিবর্তে কাচের পাইপ ব্যবহার করা হইতেছে। থার্মো ফ্লাস্ক তৈয়ারী করিতে কাচকে লইয়া আগুনে ও বরফে দস্তুরমত স্নান করানো হইতেছে বলিলে



প্লেট-গ্লাস—১৫ ফুট লম্বা ১০ ফুট চওড়া আধ-ইঞ্চি পুরু

অত্যুক্তি হইবে না। বিজ্ঞানের কৌশলে আগুনে ও বরফে আজ কাচ এতটুকু জখম হইতেছে না!

আদি যুগে বিশিষ্ট বালুকার স্তূপে বিচিত্র টেম্পারেচারে কাচ মিলিয়াছিল। সে নৈসর্গিক কাচের নাম ছিল অবসিডিয়ান্। আদি যুগের নর-নারী প্রকৃতি-দত্ত এই অবসিডিয়ানে বর্শার মুখ, লাঙ্গলের ফলা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিত। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতি অবসিডিয়ানে তৈয়ারী করিত ছুরির ফলা—তাহাতে ধার ছিল ঠিক ক্ষুরের মত!

তার পর মধ্য যুগের মানুষ সিসিকা-জাতীয় কাচ তৈয়ারী করিতে শিখিল। এ কাচ কিন্তু অধিক তাপ বা শীত সহিতে পারিত না।

তার পর বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভে কাচকে ইচ্ছানুরূপ মাপে কাটিয়া পালিশ করিয়া মানুষ তাহাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-গঠনোপযোগী করিয়া তুলিল। এ যুগের সাধনায় কাচকে অনুমাত্রিক মিহি করিয়া তার ওজন যখন এক আউন্সের ত্রিংশ-সহস্রতম অংশে ভাগ করিতে পারা গেল, তখন মনে হইয়াছিল, কাচ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ ব্যবস্থা বুঝি চূড়ান্ত!

কিন্তু মানুষের বাসনা সীমায় আবদ্ধ থাকিতে জানে না। লক্ষপতি যেমন ক্রোড়পতি হইতে চায়, কাচ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন এবং কল্পনাও তেমনি বাড়িয়া চলিল। বিজ্ঞানও মানুষের দৃষ্টিকে মুক্ত এবং সুদূর-প্রসারী করিয়া তুলিল। সে-দৃষ্টির সামনে বহু সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ অনলস অধ্যবসায়ে সে-সব সম্ভাবনাকে সফল করিবার জন্য উদ্যোগ নিবৃত্তি রাখিল না। প্রয়োজনও নানা দিকে অনুভূত হইতেছিল। Necessity is the mother of



ফুঁয়ের জোরে কাচের টিউব—এ-কালে বিশেষ ক্ষেত্রে এ রীতি এখনো সচল

inventions—এ নীতি মানিয়া প্রয়োজন মিটাইতে বৈজ্ঞানিকের দল কাচকে লইয়া অসাধ্য-সাধন-ব্রতে মাতিয়া রহিলেন! এক দিকে যেমন অণু-পরিমিত কাচের প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনি মাউণ্ট পালোমারে টেলিসকোপ-ডিস্কের জন্য অতিকায় কাচের প্রয়োজন হইল। সে জন্য যে-কাচের ডিস্ক তৈয়ারী হইল, তার ওজন বিশ টন এবং সে ডিস্কের ব্যাস ১৭ ফুট! এ ডিস্ক তৈয়ারী করিতে পুরা একটি বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

তার পর পৃথিবীতে আজ কাচের কারখানার আর অন্ত নাই! কাচের নল তৈয়ারী করিতে যে অজস্র বুদ্বুদ ওঠে, সেগুলিকে কায়েমি ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক বহু অধ্যবসায় করিলেন। এবং সে সব বুদ্বুদ ধরিয়া জড়ো করিয়া 'মৌচাক-রূপী' কাচও নির্মিত হইল। কার্বনের সঙ্গে জাল দিয়া কাচের এই বুদ্বুদগুলিকে মানুষ অখণ্ড আকারে গড়িয়া তুলিতেছে। এই অখণ্ড কাচ আজ

রেফ্রিজারেটর, লাইফ-বেল্ট. এবং ফৌজদের জন্ম খাদ্যবাহী জাহাজে নানা কাজে লাগিতেছে। এই বুদ্‌বুদ-কাচ আগুনে ফাটে না বা গলে না; এবং এ কাচের তৈয়ারী পাত্রে জল বা কোনোরূপ কীটাদিও প্রবেশ করিতে পারে না। এ কাচের নাম কার্বনেটেড গ্লাস। এ কাচ ছিপির মতো ভাসে এবং এ-কাচকে এ-দিক ও-দিক



ফুৎকারে কাচের নল (সে-কালে)

ফোঁড়া যায়, কাটা যায়। এ কাচে ইন্‌সুলেশন বা নন্-কনডাক্‌টরের কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়।

কাচ হইতে আজ মিহি-সূতা—রেশমের মত মিহি ও কোমল—বাহির করা হইতেছে। এ সূতাকে রবারের মত নোয়ানো যায়, বাঁকানো যায়; দড়ির মত এ সূতায় বুনানির ও সেলাইয়ের কাজ চলে:

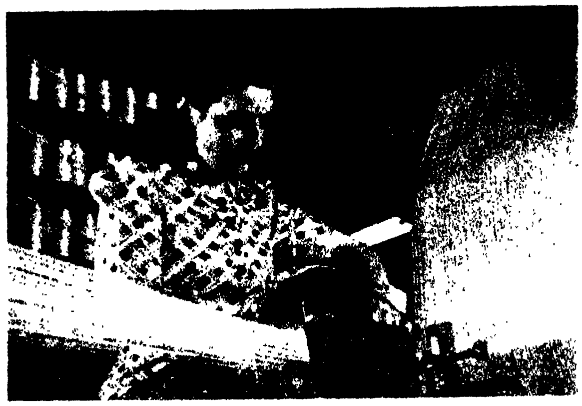


বুদ্‌বুদী-কাচের জমাট খণ্ড—এ কাচ কাঠের মত কাটা চলে

বাণ্ডিল করিয়া এ সূতা গুটাইয়া রাখা হয়! সে-গুটি দেখিতে হয় কাচের মার্বেলের মত। এক একটি বাণ্ডিলে সূতা থাকে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ।

কাচের এই মিহি সূতা মাথার কেশের চেয়েও পনেরো-গুণ মিহি অথচ ইস্পাতের তারের চেয়ে অনেক-বেশী মজবুত। আট-সের ওজনের সূতায় বোধ হয় আমাদের ধরিত্রী-মাতার কোমরটিকে চারি-দিক দিয়া ঘেরা যায়!

এই সূতালি কাচ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে লাগে। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে এরোপ্লেনের পেট্রোল-ট্যাঙ্ককে এ সূতায় জড়াইয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তার ফলে, দারুণ হিমেও পেট্রোল জমিয়া যায় না। সাবমেরিণের ব্যাটারি, যুদ্ধ-জাহাজের রেডিয়ো ও কনট্রোল এবং আর্মার্ড কার ও ট্যাঙ্কের ব্যাটারিকে এই কাচের মিহি সূতায় জড়াইয়া



কাচের সূতার মিহি জালি

ঢাকিয়া রাখা হয়; তার ফলে সেগুলি শত বিপাকেও অক্ষত অটুট থাকে। কারখানার দেওয়ালে এ সূতার পর্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়াল-গুলিকে শব্দ-প্রতিষেধক (Sound-proof) করা হইতেছে।

কাচকে আজ যেমন খুশী এই যে নানা ছাঁদে গড়া হইতেছে—এ গড়নের জন্ম স্বতন্ত্র ছাঁচ আছে। ছাঁচে যেমন তামা পিতল প্রভৃতি

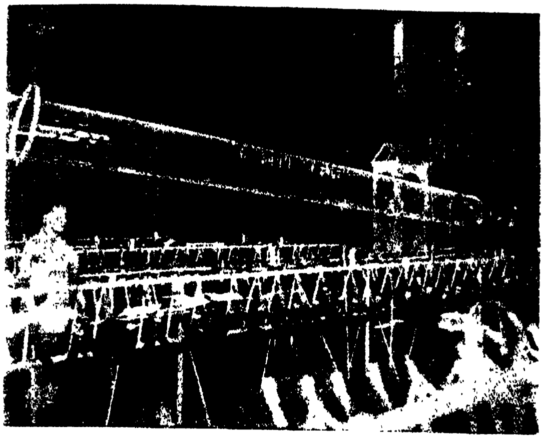


কাচের তৈয়ারী নানা রঙের ফুল পাতা

ঢালিয়া তামার পিতলের নানা জিনিষ তৈয়ারী হয়, তেমনি [illegible] ছাঁচে ফেলিয়া সে ছাঁচে কাচ গলাইয়া জ্বলন্ত উনানে বা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া শিশি বোতল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; এবং কাচকে সরার মত concave, convex করিয়া গড়িয়া তোলাও আজ সম্ভব হইয়াছে।

আলোর প্রয়োজন-মাফিক মাত্রা বুঝিয়া কাচে কত জাতের বাল্‌ব তৈয়ারী হইতেছে, তার আর সংখ্যা নাই! ঘর-বাড়ী, সিনেমা

হল প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য যে-সব কাচের বাল্‌ব তৈয়ারী হয়, সে সবের সঙ্গে পথ-ঘাট, অফিস-কারখানা প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য কাচে কতখানি প্রভেদ। এই বিভিন্ন জাতের মিহি ও মোটা, স্বচ্ছ বা ঘষা কাচ তৈয়ারী করিতে বিভিন্ন জাতের বালুকা-উপাদান ব্যবহার করা হয়।



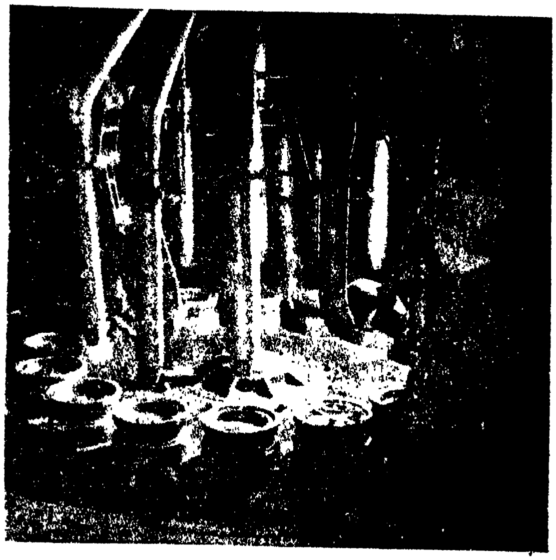
সাশির জন্য কাচের শীটিং তৈয়ারী

নরম থাকিতে থাকিতে গলিত কাচে ফুৎকার দিয়া শ্রমিকের দল পূর্ব্বে চুণী-গ্লাস, শিশি-বোতল, আতরের শিশি তৈয়ারী করিত; এখন মুখের ফুৎকারের পরিবর্ত্তে এয়ার-লাইন যন্ত্র-সাহায্যে এ কাজের পরিসর ও বৈচিত্র্য যেমন বহু গুণ বাড়িয়াছে, তেমনি কাচের নানা পাত্রাদি তৈয়ারীর কাজ বহু গুণে সহজ এবং সুন্দর হইতেছে।



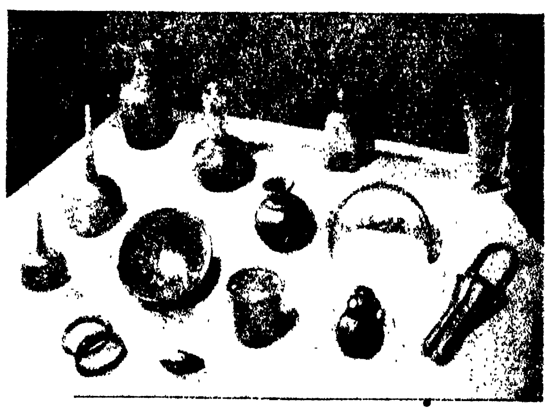
স্যাণ্ডউইচ-কাচ তৈয়ারী

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে ফিকা-সবুজ রঙের কাচের একটি সিলিণ্ডার সংরক্ষিত আছে; সেটি মেশোপটামিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। বয়স পাঁচ হাজার বৎসর। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে সে-কাচ মেশোপটামিয়া-অঞ্চলে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইত, তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে! অতি প্রাচীন যুগে মিশরে কাচের যে সব কুঁজা, কলসী, ফুলদানি, পানপাত্রাদি ব্যবহৃত হইত, সে সবের কিছু নিদর্শন টলেডোর আর্ট মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এ-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল খৃষ্ট-জন্মের বারো শত বৎসর পূর্ব্বে। কুম্ভকারের দল যে ভাবে মাটী দিয়া নানা রকম পাত্র তৈয়ারী করে, ঠিক তেমনি ভাবেই শিল্পীরা কাচ দিয়া এ-সব সামগ্রী নির্ম্মাণ করিত। সিরিয়ার মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে কাচের তৈয়ারী বহু প্রাচীন পাত্র পাওয়া গিয়াছে—তার মধ্যে আছে মলম লাগাইবার উপযোগী কাচের



পাইরেক্স-কাচের অভঙ্গুর পাত্র-নির্ম্মাণ

স্প্যাচুলা (spatula) পর্য্যন্ত। প্রাচীন রোমের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা 'ভ্যানিটি কেস্' ব্যবহার করিতেন। সে সব কেসের মধ্যে কাচের ছোট ছোট শিশি থাকিত। রূপ-টানের কৌটা, কাজলের শিশি—এগুলি কাচ দিয়া তৈয়ারী হইত এবং সে-কাচ কত না বর্ণের!



কাচের তৈয়ারী শিশি-বোতল-সুর্ম্মাদানি প্রভৃতি (প্রাচীন রোমের)

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বেও বহু মন্দিরে ব্যবহৃত হইত কাচের তৈয়ারী ঝাড় বাতিদান। তার কতক পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া, নানা রঙের বেলোয়ারি কাচও যে অতি প্রাচীন কালে বিদ্যমান ছিল, তাহার বহু নিদর্শন মিলিয়াছে। সারাসেন্‌-যুগে কাচ-শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কাচের তৈয়ারী বহু কালের পুরাতন আতরদানি, গোলাবপাশ, বাতিদান ফ্রান্সে পাওয়া গিয়াছে—সেগুলি রঙীন

এনামেল অথবা সোনার পাতে মোড়া! প্রাচীন দামাস্কাসে কাচ-শিল্প সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

তার পর মধ্য যুগে কাচ-শিল্প সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে ভিনিসিয়ান্ কাচের আবির্ভাবে! মুরানো দ্বীপে সশস্ত্র প্রহরী-



বৈদ্যুতিক তাপ-যন্ত্রে ফেলিয়া থার্ম্মোমিটারের টিউবে ডিগ্রীর রেখাঙ্কন

রক্ষিত প্রাচীর-বেষ্টিত কারখানায় ভিনিসিয়ান কাচ নির্ম্মিত হইত। কি করিয়া এ কাচ তৈয়ারী হয়, পাছে কেহ সে-পদ্ধতি জানিতে পারে, সেই জন্যই এতখানি সতর্কতা ছিল। এক জন শিল্পী বহু

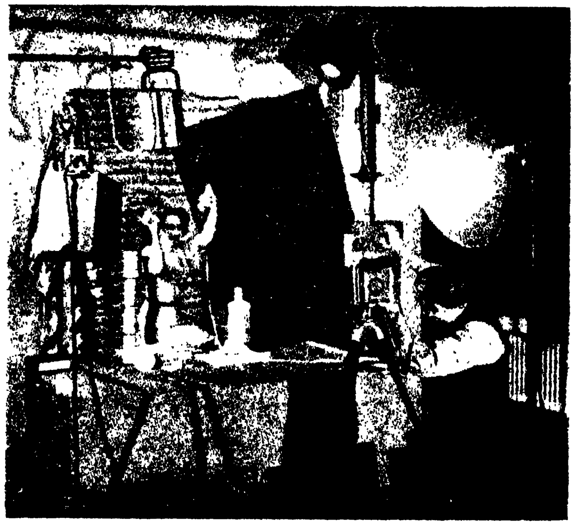


কাচ-নির্ম্মাণে বিবিধ উপকরণ মিশানো

অর্থ উৎকোচ লইয়া এ রহস্য বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়; সে জন্য পারিসের তোরণ-মুখে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

এ যুগে কাচ-শিল্প লইয়া বৈজ্ঞানিক সাধনার সূত্রপাত হয় মার্কিন যুক্তরাজ্যে। সুদক্ষ আট জন স্পানিশ ও ডাচ কাচশিল্পী লইয়া জেমস্ টাউনে কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কারখানার তৈয়ারী কাচের রকমারি সাইজের তবলকী এক-কালে বিদেশের বাজারে বহু সমাদর লাভ করে।

এক জন জার্ম্মাণ ভাগ্যান্বেষী—কাশপার উইষ্টার—আসিয়া ফিলাডেলফিয়ায় কারখানা খুলিয়া পিতলের বোতাম গড়িয়া বেশ ব্যবসা জমাইয়া ছিল। এই উইষ্টার পরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম হইতে চার জন সুদক্ষ কাচ-শিল্পী আনাইয়া কাচের কারখানা খোলে নিউজার্শির উইষ্টারবার্গ সহরে। এ কারখানা আজ বিরাট বিপুল কলেবরে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন এ কারখানায় পিতলের বোতামের পরিবর্ত্তে কাচের রকমারি বোতাম তৈয়ারী হইতেছে।



কাচের সুতার গুটি

এখন এ কারখানা হইতে রকমারি কাচের বোতাম বছরে চালান যায় কত, জানেন? দশ হাজার কোটি। এ কারখানায় আজ ত্রিশ জাতের কাচ তৈয়ারী হইতেছে!

বিচিত্র রঙ্গিন কাচ-নির্ম্মাণে সবচেয়ে দক্ষতা দেখাইয়াছেন হেনরি উইলিয়াম ষ্টীজেল। ষ্টীজেল ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ কোয়েকার। আজ যে আমরা এই নানা রঙের কাচ দেখিতেছি, কাচের এ বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে এই ষ্টীজেলের সাধনায়! রঙীন কাচ-নির্ম্মাণে ষ্টীজেল সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। দেনার দায়ে উত্তমর্ণদের পীড়নে তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ষ্টীজেলের মৃত্যুর পর জেমিং জার্ভিস এ বিষয়ে সাধনা সুরু করেন; কিন্তু সে সাধনায় তিনি তেমন উৎসাহ পান নাই। তাঁর কারখানায় কাজ করিত এক ছুতার; সেই ছুতার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিল, যে-যন্ত্রের কল্যাণে নানা রঙের কাচ তৈয়ারীর কাজ সহজ ও অনায়াস হইয়াছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কাচ-শিল্পে যুগান্তরের সূচনা ঘটে। প্রথমে গড়া হইল বোতল। দুধের বোতল, প্রসাধনী-বোতল, সুরার বোতল, নানা পানীয়ের বোতল—এ-সবের কাচে কত বৈচিত্র্যই না সম্পাদিত হইয়াছে!

কাচের নানা সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্ত যে সব যন্ত্র নিম্মিত হইয়াছে, সে-সব যন্ত্র যেন মাথাওয়ালা মানুষের মত কাজ করিতেছে! ছাঁচ হইতে যন্ত্রের অঙ্গুলি বোতলগুলিকে তুলিতেছে—সে-সব বোতল যন্ত্রযোগে চলিয়াছে বিভিন্ন কম্পার্টমেণ্টে মাপা গতিতে,



এ-যন্ত্রে থার্ম্মোমিটারের কাচের টিউব গড়া হয়—লম্বে ১৫০ ফুট

মাপা টেম্পারেচারের মধ্য দিয়া—এবং ওদিকে আবার যন্ত্রমুখে বাহির হইতেছে সুছাঁদে সর্ব্ব-সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ হইয়া ছোট-বড় মাঝারি নানা



থার্ম্মোমিটার-টিউবে পারা ভরিয়া শীল আঁটা হইতেছে

আকারের বোতল! এই রীতিতেই বোতলের কাচ অজস্র পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে।

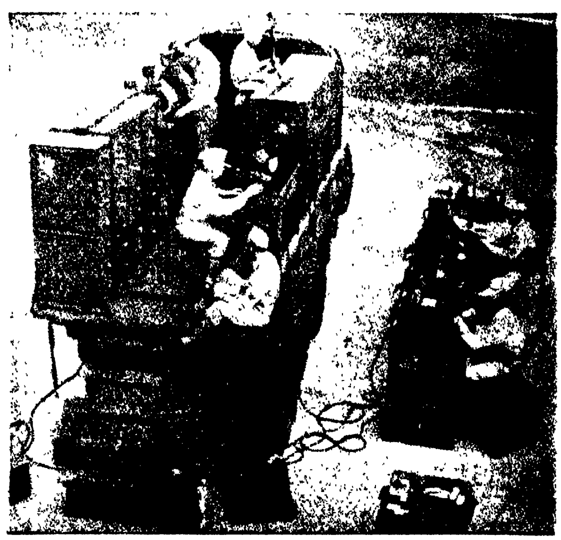
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোতল-নির্ম্মাণের প্রথম নিখুঁৎ যন্ত্র তৈয়ারী করেন জন্ ওয়েলস। সে যন্ত্র আজ সম্পূর্ণ নিখুঁৎ হইয়াছে—হাজার বিভিন্ন অংশ বা পার্ট-সংযোগে। রবার-টায়ারের নাম করিতে যেমন গুডইয়ারের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে জাগে, তেমনি পাশ্চাত্য জগতে কাচের নাম করিতে ওয়েলসের নাম সকলের মনে উদয় হয়! বোতল



বৌশ্-লম্ব লেন্স তৈয়ারী

এবং বিজলী-বাতির বাল্‌বে কাচের কীর্ত্তি আজ সত্যই কল্পনাতীত উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে।

তার পর থার্ম্মিটার যন্ত্র! বিজলী-বাতি আসলে বিচিত্র গড়নের বোতলের মধ্যে আঁত-মিহি কয়েক-গাছি তারের সমষ্টি ভিন্ন আর



এ যুদ্ধে ফৌজের সঙ্গে চলে লেন্সবাহী গাড়ী। গাড়ীতে থাকে চোখের নানা যন্ত্র; ৩৬০০০ লেন্স ও হাজার হাজার চশমার ফ্রেম্

কিছুই নয়! এ-বোতলটির কাচ টাঙ্গষ্টেনে-রচিত; তারকে অক্সিজেনের সংস্পর্শ হইতে নিরাপদ রাখা চাই; অক্সিজেন গায়ে লাগিলেই তারটুকু জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবে। টাঙ্গষ্টেন্ সে-বিষয়ে মস্ত সহায়।

শক্তিমান যন্ত্রে এক ঘণ্টায় আজ হাজার হাজার বিজলী-বাতির বাল্‌ব তৈয়ারী হইতেছে। মানুষের হাতে একটি বাল্‌ব গড়িতে হইলে কত সময় লাগিত! এত সহজে তৈয়ারী হয় বলিয়াই এ সব বাল্‌বের দাম এত শস্তা!

একটি থার্ম্মোমিটার তৈয়ারী করিতে পূর্ব্বে কি অসাধ্য সাধনই না করিতে হইত! এখন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দৌলতে মাপ-জোপ করিয়া ঘণ্টায় পাঁচশো-সাতশো সংখ্যায় থার্ম্মোমিটার তৈয়ারী হইতেছে। যন্ত্র হইতে তুলিয়া মানুষকে শুধু বৈদ্যুতিক bathএ ফেলিয়া ডিগ্রীর সংখ্যা দেখিয়া দিতে হয়—তাছাড়া বাকী সব কাজ হয় যন্ত্র-মারফৎ।

মার্কিনী কারখানায় দুধের বোতল তৈয়ারী হইতেছে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়। এই দুধের বোতল তৈয়ারী করিতে বালি, সোডা-ভস্ম, বেলে পাথর, মাটী প্রভৃতি উপকরণের প্রয়োজন। পূর্ব্বেকার দুধের বোতলের পরমায়ুর চেয়ে এখনকার বোতলের পরমায়ু তিন গুণ দীর্ঘ হইয়াছে। পূর্ব্বেকার বোতল ছিল ভারী, এখন বোতল হাল্কা হইয়াছে।

জল খাইবার গ্লাস আজ—(যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বেকার কথা) কত বিচিত্র গড়নের বিভিন্ন ছাঁদেরই তৈয়ারী হইতেছে! এবং এ সব গ্লাসের দামও কত শস্তা!

মোটরের উইণ্ড্‌স্ক্রীনের জন্য যে কাচ লাগে, তাহা আজ নূতন রীতিতে তৈয়ারী হইতেছে। এ কাচকে বলে স্যাণ্ডউইচ গ্লাস! ধাক্কা লাগিলে, বা ঘা লাগিলে এ কাচ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও এ-কাচের চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলি খশিয়া ছিটকাইয়া কাহারো গায়ে পড়ে না; শত সহস্র ভাগে ফাটিয়া গেলেও অখণ্ড ভাবে ফ্রেমের গায়ে-গায়ে আঁটিয়া থাকে—তাহাতে মোটর-যাত্রীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হইবার শঙ্কা ঘুচিয়াছে! তাছাড়া এমন কাচও তৈয়ারী হইতেছে, যে-কাচ মুগুরের ঘা খাইলেও ভাঙ্গিবে না। মুগুরের ঘায়ে মানুষের মাথার খুলি ফাটে তো এ-কাচ ফাটিবে না।

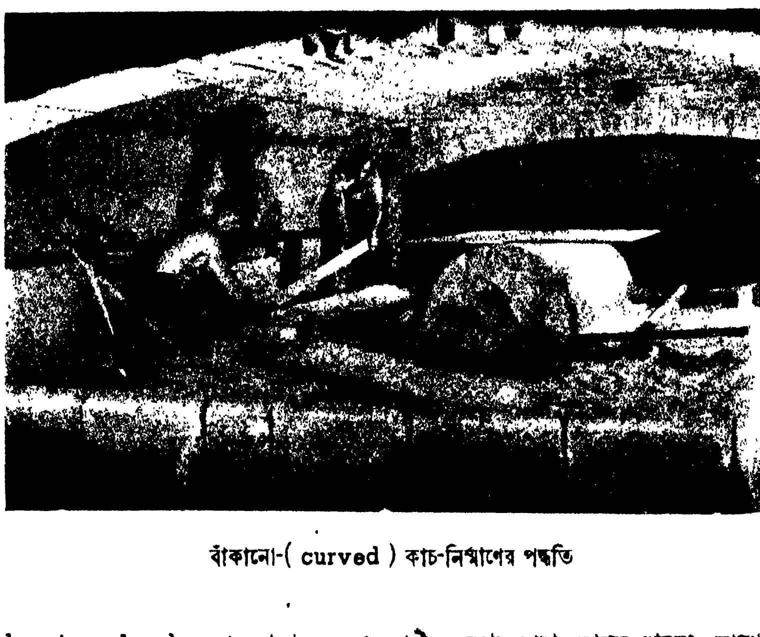


কাচের রেশমী-সুতা—বলগুলি সুতার বাণ্ডিল

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ,—ইহাদের কাচ আজ কতখানি শক্তিশালী, কতখানি নিখুঁৎ হইয়াছে! চশমার কাচ মানুষের জ্ঞান-সংস্কৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন—eyepiece of man's culture.

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে চশমার উপযোগী সর্ব্বজাতীয় কাচ আসিত জার্ম্মাণী হইতে; এখন আমেরিকা এ ব্যাপারে সকলের অগ্রণী।

চশমার কাচ তৈয়ারী করিতে প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হয় কেমন ভাবে আলো পাওয়া প্রয়োজন। কি রকমে, কতখানি তির্য্যক্-রেখায়—কাচকে তেমনি ভাবে আলো বহিয়া আনিবার উপযোগী করিয়া গড়া চাই। নহিলে দৃষ্টি-হীনের দৃষ্টি খুলিবে না। (Prime purpose of all optical glass is to bend light the way you want it). আমরা যে-আলো পাই, সে-আলো আসে খুব স্বচ্ছ হাল্কা বায়ুস্তর ভেদ করিয়া। এই বায়ু হইল আলোর মিডিয়াম্। বায়ু-মিডিয়াম মারফৎ আমরা আলো পাই।



বাঁকানো-(curved) কাচ-নির্ম্মাণের পদ্ধতি

কাচ বাতাসের চেয়ে ভারী, সুতরাং চশমার কাচের মারফৎ আলো আসিবে বাঁকা বা তির্য্যক্ রেখায়। কাচ-মিডিয়াম পুরু (denser)

কাচে আলো পড়িবামাত্র আলোর গতিরেখা বাঁকিয়া যায়। কি ভাবে কতখানি বাঁকিবে ভালো করিয়া বুঝিয়া তবে চশমার কাচ তৈয়ারী করিতে হয়। তার পর রঙীন কাচ। রঙ হিসাবে আবার আলোর গতির তির্য্যক্ রেখাতে পার্থক্য ঘটে। সেই পার্থক্য বিচার করিয়া তবে চশমায় ব্যবহারোপযোগী রঙীন কাচ তৈয়ারী করিতে হইবে।

এদিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, আধুনিক স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ, কাচ-বিজ্ঞান-শিল্পীর চরম কীর্ত্তি! এই স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ আজ এমন নিখুঁৎ হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা শুধু গ্রহ-নক্ষত্রের বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই সম্ভব হয় নাই; সূর্য্যগ্রহে যে 'হেলিয়াম' আছে, তারও দর্শন মিলিয়াছে এই স্পেক্‌ট্রোগ্রাফের দৌলতে। তার উপর ডিটেক্‌টিভ্-পুলিশ আজ এই স্পেক্‌ট্রোগ্রাফের সাহায্যে বড় বড় অপরাধের কিনারা-নির্ণয়ে সমর্থ হইতেছে।



সদ্য-গড়া ফুলদানী-গ্লাস-বাতিদান ঠাণ্ডা করা হইতেছে

এই কাচকে বাঁকাইয়া শিল্পীরা আজ এমন তৈয়ারী করিয়াছেন যে, কাচের তৈয়ারী লেন্সে একটি ক্ষুদ্র কীটকে যেমন আমরা দেখি হাতীর মত প্রকাণ্ড, তেমনি আবার অতিকায় হাতীকে দেখি অতি-ক্ষুদ্র পিপীলিকার মত! অথচ এই ছোট-বড় দেখায় কীট বা হাতীর আকারে এতটুকু বিপর্য্যয় বিসদৃশতা ঘটে না! সম্প্রতি যে বৌশ্-লম্ব লেন্স তৈয়ারী হইতেছে, সে লেন্সে এক ইঞ্চির দ্বিসহস্রতম ভাগের ছোট ছবি সিনেমার পর্দ্দায় দেখায় জীবন্ত আকারের মত। বৌশ্-লম্ব কাচের পাত্র তৈয়ারী করিতে সময় লাগে প্রায় আট মাস:



চোখ এবং ইলেকট্রিসিটি বাঁচাইতে ইনকাণ্ডেসেণ্ট বাল্‌বের কাচ-নির্ম্মাণ রীতি

এ কাচ তৈয়ারীর জন্য উপকরণ লাগে কায়োলিন, কাদার তাল এবং পোড়া মাটী। লোহা এবং গন্ধকের বিন্দুবাষ্প বাহাতে না এগুলির সঙ্গে মিশিয়া থাকে, সে জন্য ছাঁকনি-যোগে পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়! এ-সব পাত্র তৈয়ারী করিতে ফারেনহাইট্-তাপ লাগে ২৬০০ ডিগ্রী। তার পর নানা প্রক্রিয়ায় পাত্রগুলিকে ঠাণ্ডা করা হয়। এক-একটি পাত্র ঠাণ্ডা করিতে সময় লাগে তিন দিন।

চশমার কাচে একটু যে সবুজ-রঙের আভা পাওয়া যায়, তার কারণ কাচে লোহা আছে। এই লোহার পরিমাণ অবশ্য খুব সামান্য—·০১১২। তাছাড়া চশমার কাচে আছে বালি, চুণ, সোডা; কখনো বা প্রয়োজনবোধে চশমার কাচ তৈয়ারী করিতে সীসা, বেরিয়াম, জিঙ্ক, জির্কোনিয়াম, এণ্টিমণি এবং আরো কয়েকটি ধাতুচূর্ণ একত্র মিশাইতে হয়! বৌশ্-লম্বের কারখানায় প্রায় পঞ্চাশ রকম চশমার কাচ তৈয়ারী হয় এবং এ-কাচ চশমা ছাড়া আরো ৪০০০ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

বিলাসিনীরা যেমন গালে রুজ্ মাখিয়া মুখশ্রী বৰ্দ্ধন করেন, চশমার কাচকেও তেমনি রুজ্ মাখাইতে হয়। বাইফোকাল লেন্স তৈয়ারী করিতে ৬২ রকম প্রক্রিয়া সাধনের প্রয়োজন; ২৬টি যন্ত্রে ৬২ জন লোকের হাত ঘুরিয়া তবে এ লেন্সের সৃষ্টি!

প্রায় ২৬৩৩৬ জাতের চশমার কাচ তৈয়ারী হইতেছে! আমাদের আঙুলের ছাপ যেমন স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন—এক জনের আঙুলের ছাপের (thumb-prints) সঙ্গে আর-এক জনের আঙুলের ছাপ যেমন মেলে না, চোখ সম্বন্ধেও তাই! অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের চোখের গড়ন বিভিন্ন—এক জনের চশমা অপরের চোখে ফিট্ করে না—করিতে পারে না! তথাপি এ দেশে আমরা অপরের চশমা যে ব্যবহার করি, তাহা গোঁজা-মিলের সামিল। তাহাতে চোখের

অনিষ্ট ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা এ সত্য আবিষ্কার করিয়া Precision-যন্ত্র সাহায্যে আজ এত বিভিন্ন রকমের লেন্স তৈয়ারী করিতেছেন!

এরোপ্লেনের মরশুমে চোখের আরো বহু খুঁৎ ধরা পড়িতেছে। যাঁরা প্লেন ও মোটর-গাড়ী চালনা করেন, তাঁদের চোখ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য আইকোনোমীটার যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। এ যন্ত্রসাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বহু অভিনব তত্ত্ব জানা গিয়াছে; জানার ফলে 'দৃষ্টি-গণিত'(mathematics of optics) রচিত হইয়াছে।

কাচ-শিল্পের এতখানি উৎকর্ষ যদি সংসাধিত না হইত, তাহা হইলে মানুষের আজিকার এ-জীবন স্বপ্নবৎ অলীক থাকিত! প্লেন চলিত না; রেডিয়ো বাজিত না; বাতিঘর প্রভৃতি মুছিয়া যাইত; শূন্যপথের মানচিত্র-পরিকল্পনাও কাহারো মনে জাগিত না! রেলোয়ে ট্রেনের গতি থাকিত বন্ধ; ক্যামেরা স্বপ্নলোকে বিরাজ করিত; জাহাজ বন্দরে পৌঁছিতে পারিত না এবং শত্রু-বিধ্বংসী কামান হইত লক্ষ্যহারা!

কাচ এ যুগে কতখানি সহায় হইয়াছে! যুদ্ধের পর যখন শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তখন কাচের কল্যাণে আমাদের জীবন হইবে রমণীয়, কমনীয় এবং সুবিচিত্র।

পূর্ণচ্ছেদ

[বড় গল্প]

১

দামোদরের পরপারে বিলাসপুর গ্রাম। আষাঢ় মাসের অন্ধকার রাত। শান্ত পল্লীর পথে পথে সে অন্ধকার যেন আরও জমাট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর অভিমানী আষাঢ় বিরহী বক্ষের বেদনায় বিধুর। যে কোন মুহূর্তে সে যেন করতে চায় তার বিরহী বন্ধুর স্মৃতির তর্পণ বাদল-অশ্রুপাতে। ক্রমে ক্রমে দু'-এক ফোঁটা পড়তে সুরু করেছে। কিন্তু এতেও সে তৃপ্ত হবে না, এখনি সে তার প্রাণের আবেগ অবিরাম জলধারায় ঢেলে দেবে সন্তপ্ত ধরণীর তৃষিত বক্ষে! আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ তার ক্ষীণ আলোয় অন্ধকারের সেই অকলস্পর্শী তীব্রতা যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এমনি এক দুর্যোগের রাতে—আলো-ছায়ার এই অভিনয়ের মাঝে দু'টি যুবক গ্রামকে পশ্চাতে ফেলে দামোদরের দিকে চলেছে সতর্ক পাদক্ষেপে। আগেকার যুবকটি বেশ নির্ভীক্। মনে হয়, কোন রকম বিপদকেই সে যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না! কাজেই চলায় তার কোন জড়তা নেই। পিছনকার যুবকটির কিন্তু পা যেন চলে না। কত সাবধানে, কত সন্তর্পণে চারি দিকে লক্ষ্য রেখে ভয়ে ভয়ে সে চলেছে। গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলে বুঝতে পারা যাবে যে, সে কাঁপছে।

এই ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আগের যুবকটি পিছনকার যুবকটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—"ভয় নেই, গ্রাম আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি; ঐ দেখুন, দামোদরের মাঝিদের নৌকোর আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটু গেলেই খেয়া।"

কথা অসমাপ্ত রাখতে হলো। হঠাৎ দমকা বৃষ্টিতে দু'জনেই বিব্রত হয়ে উঠলো।

—"একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে আসুন। দামোদর পার হয়ে ফের দু'মাইল হাঁটতে হবে—তবে ষ্টেশন। ভোর পাঁচটায় কলকাতার ট্রেন। যে আপনাদের দেশ, গাড়ী তো মিলবে না, বাধ্য হয়ে কষ্ট একটু করতেই হবে।—আর দেখুন, নার্ভাস্ হলে কিন্তু—"

—"কিন্তু এই দুর্যোগে মাঝিরা নৌকো খুলবে কি?"

—"সে যা হয় হবে!"

খেয়া-ঘাটের পারে এসে একখানা নৌকোর কাছে গিয়ে তারা দেখলো, মাঝি নৌকোর মধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

প্রথম যুবকটি সঙ্গীকে উদ্দেশ করে' বললো—"নৌকোর মধ্যে উঠে বসুন। অনর্থক ভিজে কোন লাভ নেই। আপনি কষ্ট করে' আর কিছুক্ষণ মাথার গান্ধী-ক্যাপটা রাখুন।"

লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যুবকটি খদ্দরটি-পরিহিত; মাথায় খদ্দরের টুপি পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় যুবকটির পোষাক দেখলে মনে হয়, যেন চেয়ে এনে পরা; কারণ, গায়ের পাঞ্জাবীটা মোটেই ফিট্ করেনি। সদ্য-ধোয়া পদ্মের মত মুখখানি তার কত মায়া, কত যে মমতায় ভরা! দেখলেই সমস্ত মন করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে।

—"যদিও স্যুটকেসে কাপড় আছে, তবু কষ্ট আমাদের করতেই হবে। মাঝিকে ডেকে তো সাড়া পাওয়া গেল না। দুর্যোগও নেমেছে খুব।"—গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রথম যুবকটি আপন-মনেই বলে উঠলো।

এদিকে এক সেকেণ্ড সময়ের অপব্যয়কেও তারা বড় বেশী বিড়ম্বনা বলে' মনে করছে। সম্ভব হলে যেন সাঁতরেও পার হবার জন্য প্রস্তুত মাঝিকে ডেকে ডেকে অনর্থক সময় নষ্ট না করে' তারা নৌকো খুলে দিল। অল্পক্ষণ পরেই মাঝির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চীৎকার করে উঠলো—"কে? কে নৌকো খুললো?"

প্রথম যুবকটি ব্যস্ত হয়ে বললো—"বাপু, অকারণ চীৎকার করো না। পারে আমাদের যেতেই হবে, আর দেরী করলে চলবে না; তুমি যা' চাও তাই দেবো, দয়া করে আমাদের পার করে দাও। আর বেশী চেঁচামেচি করলে তোমাকেই ঝুপ করে জলে ফেলে দেবো।"

মাঝি অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। তার পর সে ভয়ে ভয়ে ধরা-গলায় বললো—"এই দুর্যোগ মাথায় করে' নৌকো ছাড়া কি ঠিক হবে বাবু!"

অধীর ভাবে যুবকটি উত্তর দিলো—"কোন ভয় নেই মাঝি। বরং তোমাকে দু'টো টাকা বক্শিস্ করছি এখনি। নাও, ধরো।"

মাঝি আর বাক্যব্যয় না করে' নিপুণ হাতে নৌকার হাল ধরে বসলো—আর নৌকাও ঢেউয়ের ওপর দুলাৎ দুলাৎ শব্দ করে' তীর বেগে ছুটে চললো।

অনেক দুঃখে, আশা-নিরাশার মাঝ দিয়ে অবশেষে তারা ষ্টেশনে এসে পৌছল। সেখানে তারা কাপ দুই করে চা খেয়ে দেহ-মনের দুর্নিবার অবসাদকে ঠেলে ফেল্‌তে চাইলো। ট্রেনের তখনো আধ ঘণ্টা বাকী। প্রথম যুবকটি ইত্যবসরে একখানা 'তার' করে এসেছে—একটা বার্থ রিজার্ভ করার জন্ম।

গাড়ী এলো একটু লেট্ করে। তারা জানতো যে আজ-কাল লেট্ করে। তারা জানতো যে আজ-কাল লেট করা গাড়ীর ধর্ম। তাই এই সময়টুকুর মধ্যে তারা বেশ তৈরী হয়েই ছিল। গাড়ীতে উঠে প্রথম যুবকটি বললো,—"আপনাকে না জানিয়েই আমি একটা কামরা রিজার্ভ করেছি। এতে আপনার হয়তো একটু আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু যে-অবস্থায় আমরা পড়েছি, তাতে আপনার আপত্তিই চলবে না এ বিষয়ে। আর আমাদের শরীরেরও যে অবস্থা, তাতে পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।"

ধীরে ধীরে দ্বিতীয় যুবকটির মুখে-চোখে ফুটে উঠলো নারী-সুলভ লজ্জার রক্ত আভা। ঈষৎ কটাক্ষে সেটা লক্ষ্য করে প্রথম যুবকটি অন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলে উঠ্‌লো—"নিন, এইবার বাথরুমে গিয়ে বেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি ও-দিকের সিট্‌টায় একটু বিশ্রামের চেষ্টা করি।"

কিছুক্ষণ পরে বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এলো যুবকের পরিবর্তে এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী। সন্ধ্যার মতো ধীর স্নিগ্ধ সে—তাই বুঝি নাম তার সন্ধ্যা। সন্ধ্যা সলজ্জ হাসি হেসে বললো—"আচ্ছা সরোজ বাবু, আপনার সেই সাথীটির কি দুর্দ্দশা হলো, দেখুন তো!"

সরোজ একটু হেসে উত্তর দিল,—"কিন্তু যাই বলুন, আমার পোষাকে কিন্তু আপনাকে মোটেই বেমানান হয়নি। কি ভাবছেন? আর কোন ভয় নেই।"

সন্ধ্যা ধীর মৃদু কণ্ঠে বললো—"আমার জন্তে আপনি কত কষ্ট করছেন। কাল থেকে আপনার একটুও বিশ্রাম নেই।"

সরোজ উত্তর দিল,—"কষ্ট আবার কি? পুরুষ-মানুষ যত বিপদের সঙ্গে লড়াই করে, ততই তাদের শক্তি বাড়ে। এখনও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। ঠিক জায়গায় আপনাকে দিতে পারলে তবে আমার স্বস্তি।"

হাওড়া থেকে তারা একখানা ট্যাক্সি করে সোজা গেল আমহার্ষ্ট লেডিজ্ বোর্ডিংয়ে। সেখানকার লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সরোজ একশো টাকার তিনখানি নোট তাঁর হাতে দিয়ে বললো—"আপনার বোর্ডিংয়ের চার্জ্জ আর স্কুলের মাহিনা এর কাছ থেকে নেবেন। আর বিছানা-পত্র আপনি দয়া করে দরোয়ানকে দিয়ে আনিয়ে নেবেন। এছাড়াও অন্ত জিনিষ যা' কিছু আপনি দরকার মনে করেন, তাও আনিয়ে দেবেন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি না, তাই পাশ করবার সুবিধা হয়নি।"

মেট্রন গার্জ্জেনের নাম-ঠিকানা জান্‌তে চাইলে সরোজ নিজের নাম না দিয়ে বন্ধু যতীশের নাম আর ঠিকানা দিয়ে বললো—"আমি এখানে থাকি না। সপ্তাহে দু'দিন ছুটীতে আসি। প্রয়োজন মত আপনি আমার বন্ধু যতীশ সেনকে খবর দিতে পারেন। আর দেখুন, গান-বাজনা উনি যা শিখতে চান, দয়া করে তারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে দেবেন।"

পরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—"বিকেলে আসবো। আপনার দরকারী জিনিষ-পত্র আর কাপড়-চোপড়ের জন্ম আপনাকে মার্কেটে নিয়ে যাবো। কিছু টাকা রেখে দিন। আচ্ছা, আসি, নমস্কার।"

বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে সরোজ তার বন্ধু যতীশ সেনের বাড়ী এসে তাকে আর তার স্ত্রী ললিতাকে আদ্যোপান্ত সকল কথাই জানালো। ললিতা আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে—কিন্তু আধুনিকা নয়। সব কথা শুনে উৎসাহের সহিত ললিতা বললো—"আপনি সন্ধ্যার সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন ঠাকুরপো। আমার বোন নেই, সে জন্ম ভারী কষ্ট পাই। আপনার বন্ধু তো নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। যাই হোক্, তবু আপনার দয়ায় শনি-রবিবারের সাথী জুটলো আমার।"

সরোজ এতক্ষণে পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লো—"যদিও তোমার ভরসা বরাবর করেছিলাম, তবু এতখানি যে আশ্বাস পাবো বউদি, সে-কথা ভাবিনি।"

সে বেলাটা ললিতার ওখানেই আতিথ্য গ্রহণ করলো সরোজ। বৈকালে যতীশ আর ললিতাকে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অবশেষে রাস্তা থেকেই বিদায় নিয়ে সম্পূর্ণ অন্তমনস্ক ভাবে একখানা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বস্‌লো।

এলগিন্ রোডের ওপর সরোজদের মস্ত বড় বাড়ী। বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকে যখন ট্যাক্সি এসে ঢুকলো, তখন দরোয়ান উজ্জ্বল সিং আর পুরানো চাকর বিশু ছুটে এলো। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই সরোজ প্রথমে দেখলো, সাম্‌নে তার দাদুকে। দাদুকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন,—"এইমাত্র এলে! জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে আমার ঘরে এসো, কথা আছে।"

—"কি কথা দাদু?"—সরোজ উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

—"বিশেষ কিছু নয়। তোমার বিরুদ্ধে নালিশ আছে।"

সরোজ দেখলো, দাদুর মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট পরিস্ফুট। তাই সে আরো উৎসুক হয়ে উঠ্‌লো সব কথা এখনি জানবার জন্ম। জিজ্ঞাসা করলো—"আমার বিরুদ্ধে নালিশ! কে করলো দাদু? কি নালিশ?"

দাদু তার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—"তোমার পিসিমা বিমলা আমাকে তার করেছেন, তুমি না কি তাঁর ভাগ্নী সন্ধ্যাকে নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছো? অথচ তুমি নিজে তার করলে বর্দ্ধমান থেকে, যতীশের ভাইপোর অন্নপ্রাশনে তুমি আজ ওখানে ছিলে! ব্যাপার কি বলতো?"

সরোজ বিস্ময়ের ভাণ করে বললো—"এ তো বড় অদ্ভুত কথা দাদু! আমার দ্বারা কখনো এ কাজ সম্ভব! আপনার কি এই বিশ্বাস দাদু? হতে পারে পিসিমার এ একটা চাল—মোচড় দিয়ে কিছু আদায় করতে চান। আর সন্ধ্যা যাবেই বা কোথায়! পিসিমার যে রকম অত্যাচার! নিশ্চয় সে পিসিমার ভয়ে নির্ব্বিবাদে স্যুইসাইড করেছে। হয়তো বা পিসিমা এই মারাত্মক ত্রুটি আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন। এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হবে!"

দাদু অন্তমনস্ক ভাবে বললেন—"হুঁ! আচ্ছা যাও, তুমি বিশ্রাম করোগে।"

সরোজকান্তি ও সলিলকান্তি দুই ভাইকে রেখে পিতা জানকীনারায়ণ অনেক দিন আগে মারা যান। মাতামহের সম্পত্তি

বাধা দিয়ে সরোজ বলেছিল—"আজও তুমি আমাদের পর মনে কর অঞ্জলি! শুধু দয়া আর ঋণের কথা তুলে নিজে কষ্ট পাও, আমাদেরও কষ্ট দাও। না—না—ও টিচারি করা তোমার কোন মতেই হতে পারে না।"

ললিতা শুধু হেসে বলে—"বুঝছেন না ঠাকুরপো, ও সংসারী হতে চায়।"

অঞ্জলি বলে—"দিদি যেন কি!"

যাই হোক, সরোজের অনেক অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত অঞ্জলি বলে,—"আচ্ছা, যদি পড়তেই হয়, তবে মেডিকেল কলেজে পড়বো—ডাক্তারি শিখে যদি দেশের দশ জনের উপকার করতে পারি! তা ছাড়া শান্তা, রেণু—সকলে ওখানেই ভর্ত্তি হচ্ছে।"

মেডিকেল কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে অঞ্জলি ভর্ত্তি হলো। সে ভালবাসে সাবলীল গ্রাম্যজীবন। মাতৃভূমিতে যে ভাবে সে বেড়ে উঠেছিল—সেই তার সত্যকার পরিচয়। সে চায় কলিকাতার জন-কলরবের মধ্যে যেন আত্মবিস্মৃত না হয়। মা'র শেষ কথা তার মনে পড়ে! মা বলেছিলেন—"সন্ধ্যা, সুখে দুঃখে ভগবানে বিশ্বাস রেখো। যে অবস্থায় যখন যে ভাবে থাকবে, সেই অবস্থাতেই খাপ খাইয়ে নিজেকে চালাবার চেষ্টা রাখবে। দুনিয়ায় মানুষের কত আসে, কত যায়। অকারণ তার হিসাব-নিকাশ করতে যেয়ো না—তাতে দুঃখই পাবে, শান্তি কোন দিন আসবে না। মা, বাবা কারো চিরস্থায়ী নয়। তোমার পিছনে সাম্‌নে কেউ নেই যদিও জানি, তোমার সামনে বিরাট অন্ধকার, তবু সেই অন্ধকার ভেদ করে' তোমায় আলোর সন্ধান করতে হবে,—তবেই তুমি পাবে তোমার নিজের সত্যকার পরিচয়।"

অঞ্জলি চায় সত্যকার মানুষ হতে। রূপকথার গল্প মনে পড়ে তার—সোনার কাঠি জীয়ন-কাঠিতে মৃত রাজকন্যার জীবন লাভ। মানস-চক্ষে দেখতে পায় সে প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি শৌর্য্যবান্ সুন্দর সুপুরুষ নররূপী দেবতা। তার পর সেই দেবতা যখন বিরাট দৈত্যকে হত্যা করে রাজকুমারীকে আন্‌লো আলোর দেশে—যেখানে ভয়-ভাবনা নেই। সেখানে মৃত্যুর মত অবসাদ নিয়ে আর তাকে পড়ে' থাকতে হবে না—তখন তার কি অপার আনন্দই হয়েছিল।

অঞ্জলি মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করলো, যেন সে নিজেই সেই রূপকথার রাজকন্যা। বিলাসপুর থেকে সে যে কোনো দিন পরিত্রাণ পাবে, এ কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্য মনের মধ্যে স্থান পায়নি তার। অন্ধকারেই তাকে চিরকাল পচে' মরতে হতো, যদি সাম্‌নে না আসতো তার জাগ্রত দেবতা!

কর্ম্মক্লান্ত দিনের অবসন্নতা নিয়ে সে যখন শুতে যেতো, তখন একাগ্র চিত্তে দু'টি হাত তুলে ভগবানের চরণে সে প্রণাম জানাতো—"প্রভু, তোমার ওপর যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারি। আমি যেন কোন দিন আমার স্বকৃত কর্ম্মফলের জন্য তোমাতে বিশ্বাস না হারাই।" কখনো বা ভাবতো—কে বলে ভগবান্ নেই! তার সামান্য আহ্বানেই তো ভগবান্ দু'হাত দিয়ে তার সকল দুঃখ-দৈন্যের বোঝা সরিয়ে দিয়ে তাকে এনে দিয়েছেন আনন্দের রাজ্যে! তাই আজ তার সারা অন্তর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ,—আজ আর তার চাইবার কিছুই নেই!

সরোজকে সে বিশ্বাস করে—সরোজ তাকে নব জীবন দান করেছে। তার যত দুঃখ, সে তার বলিষ্ঠ দু'টি হাত দিয়ে সরিয়ে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। মহাপাপ থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল সেই,—সে তো মহাপুরুষ। তবে কি সে সরোজকে ভালবাসে? মনের নিভৃত কন্দরে এই যে দিনের পর দিন পূজার অর্ঘ্য সে রচনা করে' চলেছে—এ-কি তারই পূর্ব্বাভাস? না, সে এতটা আশা করে না। দেবতাকে কি মানুষ স্বামীর অধিকার দিতে পারে? এ কি অনধিকার-চর্চ্চা! এ কি তার দুরাশা! অঞ্জলির হাসি পায়,—কি স্বার্থপর সে! আশার যেন সীমা নেই! মানুষ যত পায়, আশা তার ততই বাড়ে।

আজ প্রায় পাঁচ-ছ' দিন হলো সরোজ কি দরকারে এলাহাবাদে গেছে। পুণ্যলোভাতুরা মা এ সুযোগ মোটেই ছাড়তে চাননি। ললিতাও ধরে বস্‌লো, সে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সম্মিলন দেখতে যাবে, কোন আপত্তিই সে শুনবে না। কাজেই এক রকম বাধ্য হয়ে মাকে আর ললিতাকে নিয়ে সরোজকে যেতে হয়েছে—দিন পনের পরে ফিরবে।

সে-দিন শনিবার। হস্‌পিট্যালে বড় একটা অপারেশন কেস্ আছে, এক বৃদ্ধার টিউমার অপারেশন করা হবে। ডাক্তার দাশ আসবেন অপারেশন করতে,—সারা হস্‌পিট্যালে তোড়-জোড় পড়ে গেছে। অঞ্জলি বড় আন্‌মনা হয়ে ঢুকলো অপারেশন-রুমে। সারা সপ্তাহের মধ্যে এই দিনটির প্রতীক্ষা করে থাকে সে, ললিতাদির ওখানে যাবে বলে'।

ঘরে ঢুকে অঞ্জলি দেখে, চারি দিকেই যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। নার্সদের মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। হেড নার্স মিস্ রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব তদারক করে বেড়াচ্ছেন। গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে' অঞ্জলির কানে এলো শুধু ছুরি-কাঁচির রিন্-ঝিন্ শব্দ।

অপারেশন-টেবিলে রোগিণীকে শোয়ানো হয়েছে। মিস্ রায় ডাকলেন,—"অঞ্জলি, তুমি ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা ধরতে পারবে?"

অঞ্জলি সপ্রতিভ ভাবে পারবো বলে অগ্রসর হলেও বুকের স্পন্দন তার অনেক বেড়ে গেছে। হস্‌পিট্যালে মানুষের প্রাণে আতঙ্কের খেলা, জীবন-মরণের অভিনয়, এই তার প্রথম দেখা। ডাক্তার দাশ যখন রবারের ড্রেস পরে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন,—তখন অঞ্জলির মনের সাহস আরও কমে এলো। ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে সে দেখতে পেলো মৃত্যুর বিভীষিকা! তার পর ধীরে ধীরে কখন যে সে জ্ঞান হারালো, তার কিছুই জানলো না।

কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে অনুভব করলো, তার কপালে কা'র স্নেহমধুর স্পর্শ! ধীরে ধীরে অঞ্জলি চেয়ে দেখে, তার শয্যাপার্শ্বে বসে তার প্রিয় বন্ধু শান্তা—চোখে তার রাজ্যের উদ্বেগ,—আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার সহকর্ম্মিণীরা। অঞ্জলিকে ভাল না বেসে কেউ পারেনি। কি যে আকর্ষণ ছিল এই মেয়েটির, তা' সে নিজেও কোন দিন বোঝেনি! যৌবন রূপে গন্ধে গোলাপের মতই তার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। আর তাছাড়া তার অটুট অধ্যবসায়, আর অসামান্য প্রতিভার গুণে সে ছিল সকলের সমাদরের পাত্রী।

অঞ্জলির জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলো শান্তা,—"কেমন আছিস্ ভাই? বড্ড ভয় লেগেছিল কি তোর? তুই ভারী নার্ভাস্। এস্, বোস খুবই যত্ন নিয়েছিলেন তোর।"

অঞ্জলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে।

শান্তা বলে উঠলো—"কে, চিনতে পারলি না! ফিফ্‌থ ইয়ার থেকে এবার এগ্‌জামিন দেবেন। গুড্ বয় যাকে বলিস্ তুই। তিনি তোর ওপর আন্তরিকতা খুবই দেখালেন, দেখলাম।"—এই বলেই পরিহাস করে শান্তা তাকে একটা ছোট চিম্‌টি কাটলো।

অঞ্জলি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলে উঠলো—"যাঃ, ভারী দুষ্ট হচ্ছিস্ তুই, শান্তা।"

—"তা হবে। এই যে, আসুন। আপনার পেসেণ্ট বেশ ভালোই আছে এখন।"

একটি সুন্দর সুপুরুষ যুবক ঘরে ঢুকে শান্তাকে উদ্দেশ করে বললো—"নমস্কার। কতক্ষণ জ্ঞান হয়েছে?"

—"এই অল্পক্ষণ আগে। দেখুন না আপনি একবার পাল্‌স্‌টা।"

কলেজে আসার পর থেকে এই যুবকটিকে কত বারই দেখেছে অঞ্জলি। প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে—সে যেন তার কত দিনের পরিচিত, কত যেন আপনার! এই কলরব-মুখরিত প্রেতপুরীর মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে সে যেন একান্ত বিশ্বাসে তার ওপর নির্ভর করে আসছে। আতঙ্কের মধ্যে নির্ভয় হয় সে এই মানুষটিকে দেখলে। তাই তার নিজের অলক্ষ্যে অন্তরের কোন নিভৃত গোপন স্থান থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে আসে এস, বোসের সুখ্যাতি।

বন্ধুদের কাছে বন্ধুরা পরিহাস করে অনেক—বেচারী অঞ্জলি নীরবে শোনে। উপায় কি! আর বন্ধুদেরই বা দোষ কি! তার মতো সুন্দরী তরুণী যদি তারই সমকক্ষ কোন সুশিক্ষিত সুদর্শন যুবকের প্রতি সামান্য অনুরক্ত হয়, তবে তার নিজের অন্তরেই তো লজ্জা পাবার কথা।

—"দেখি আপনার হাতখানা"—আগন্তুক যুবকটি অঞ্জলির পাল্‌স্ দেখতে লাগলো। তার পর একটু পরে গম্ভীর মুখে শান্তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—"এঁর তো জ্বর এসেছে দেখছি। এঁকে ওঁর বাড়ীতে পাঠাতে পারলেই বোধ হয় ভাল হতো।"

শান্তা পরিপূর্ণ উদ্বেগে বলে উঠলো—"কিন্তু ওর বাড়ীর কেউ তো এখানে নেই, সবাই বাইরে গেছেন। কি হবে তা'হলে মিষ্টার বোস্?"

—"তাতে বিশেষ চিন্তিত হবারই বা কি থাকতে পারে? বেশ তো, এখানেই থাকুন। আমরা তো আছি।"

তার পর অঞ্জলির সে কি ভীষণ জ্বর, আর সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভুল বকুনি।

এই ভাবে প্রায় এক পক্ষকাল জ্বরভোগের পর অবস্থা ক্রমে ভালোর দিকে এলো। এই পনেরো দিন শান্তা আর সলিল বোস অঞ্জলিকে নিয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে বললে চলে। কি ভাবে যে তাদের এ ক'টা দিন কেটেছে, তা তারাই জানে!

সলিল এক একবার মনে ভাবে—তার এত বাড়াবাড়ি কেন? ষ্টুডেণ্টরা সব ঠাট্টা করে কত, কিন্তু সে উপায়হীন! এই মেয়েটিকে সত্য সে ভালোবাসে, তাই তাকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়োজন যে তারই বেশী।

সলিল জানে না কি জাতের মেয়ে সে, এবং কি তার পরিচয়। তা'ছাড়া বড় কথা, সে কোন দিন তার এই নীরব ভালবাসার প্রতিদান পাবে কি না! সলিল যদি অঞ্জলিকে মনে মনে ভালোবেসেই তৃপ্তি পায়, তবে তা'তেই বা দোষ কি? সে তো অঞ্জলিকে জানাতে চায় না তার প্রাণের উন্মাদনা। তার এই উচ্ছল-গভীর ভালোবাসা যদি নিজের মাঝেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তবে প্রকাশের কি প্রয়োজন! ভাব যেখানে যত গভীর, ভাষা সেখানে ততই মূক!

সলিল ভাবে, এই মেডিক্যাল কলেজে তা'র তো মেয়াদ আর চার মাস। ফাইন্যাল একজামিনের সময় আসন্ন। কিন্তু তার পর? তার পর তার মনের একটি কোণে স্মৃতিস্বরূপ এই মেয়েটির ছবি যদি আঁকা থাকে, ক্ষতি কি?

না—ভুলতে সে কোন দিনই পারবে না। দুরাশাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না, তবে নিজেকে ছলনাও সে কোন দিন করবে না। পরিচয়হীন মেয়েটিকে কি দুর্নিবার আকর্ষণে ভালোবেসে নিজেকে রিক্ত করে দিল সে! নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়াতে কি এত তৃপ্তি!

ভালোবাসার আকর্ষণ ঠিক যেন চুম্বকের মতো। তাই সে-দিন যখন অপারেশন-রুমে অঞ্জলি অজ্ঞান হয়ে পড়লো, তখন আর তা'র লজ্জা করবার মতো ধৈর্য্য ছিল না। সকলের আগেই সে অঞ্জলির যত্ন নিয়েছিল— অবশ্য তার বন্ধু শান্তা ও রেণুকে মাঝে রেখে। তার পর কি ভীষণ টেম্পারেচার উঠেছিল! অঞ্জলির বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। সলিল অবশ্য এত দিন পূর্ণ স্বাধীন ছিল,—মা, দাদা বাড়ী নেই। কাল তার পেয়েছে, এখনও দশ দিন বাকী দাদার বাড়ী আসতে।

সলিল মনে ভাবে—মেয়েটিরও ভাগ্যে এখানে কেউ নেই! তাই তো সে নিবিড় ভাবে দরদ দিয়ে অঞ্জলির একান্ত পাশে বসবার সুযোগ পেয়েছিল। মন অবশ্য সায় দেয় নাই। সলিল কিন্তু উপায় না দেখেই বাধ্য হয়েছিল—না হলে বাঁচানো যেতো না।

এক-এক বার সলিল মনে ভাবে—এতে ওর লাভ কি! কত ছাত্র, কত ছাত্রী—কে কার খবর রাখে! এই মেয়েটি মাত্র ভর্ত্তি হয়েছে দুই মাস। অযাচিত এত উপকার—মেয়েটি ভালো হয়ে না জানি তাকে কত হীনই ভাববে; কিন্তু প্রায় একটানা বারো দিন পরে যে দিন জ্বর ছেড়ে গেলে অঞ্জলি তার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে পাশের লোককে দেখতে চাইলো—সে-দিন তো সে দেখেছিল তারই মুখের ওপর উৎকণ্ঠিত সজল দু'টি চোখ কতক্ষণে সে চাইবে শুধু সেই প্রতীক্ষাই করছিল। অঞ্জলিও কি ভেবে তার ক্ষীণ হাত দু'টি একান্ত নির্ভরতার সহিত সলিলের হাতের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজেছিল সে দিন।

সলিল বুঝলো, প্রেম তার ব্যর্থ হবে না, প্রতিদান সে পাবেই। ভালোবাসার জিনিষকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়, মর্য্যাদা দিয়ে তবে আপন করে নিতে হয়। সে চায় না চোরের মতো পরাজয়কে জয় করতে। ভালোবাসার মর্য্যাদা সে বোঝে—তাই চায় না অঞ্জলিকে অসম্মান করতে।

অঞ্জলির বাড়ীতে শান্তা খবর দিয়েছিল, কিন্তু কেউ না থাকায় উত্তর পায়নি! অঞ্জলি এখন বেশ সুস্থ হয়েছে তার বন্ধুদের, বিশেষ করে সলিলের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী লিলি দেবী

বিজ্ঞান-জগৎ

তুষার-দমন

শীতের সময় কিম্বা শীতের দেশে খুব উচ্চ শূন্যপথে প্লেনের পক্ষে নিরাপদ বিচরণ সম্ভব ছিল না ; প্লেনের পাখনায় বরফ জমিয়া পাখনা অচল হইত ! এই বিপত্তি-মোচনকল্পে মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর লুইশ মারিক প্লেনের পাখনায় রবারের পাত আঁটিয়া বরফ-জমার দায়ে



পাখনায় ঐ কালো দাগ—রবার বিদ্যুৎপ্রবাহকে তপ্ত রাখে

সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রবারের পাত কাটিয়া সেই পাতকে নানা রাসায়নিক দ্রাবকে তিনি ডুবাইতেছেন ; দ্রাবকের গুণে এ রবার পাখনায় আঁটিয়া দিলে পাখনার গায়ে আর বরফ জমিতে পারে না ! বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাপ সঞ্চারিত হইবা মাত্র সে-তাপ রবারে সঞ্চিত থাকে ; তাপ থাকার ফলে আর্দ্র বাষ্প বরফ হইয়া জমে না। এ ব্যবস্থায় দারুণ শীতেও প্লেনের পক্ষে শূন্য-বিচরণের বাধা ঘুচিয়াছে।

জল-জীপ

এই যে ফৌজবাহী জীপ-গাড়ী আজ আমরা পথে-ঘাটে হাজার-হাজার দেখিতেছি—এ-সব জীপের যন্ত্রাদিতে যেমন জটিলতা নাই, তেমনি

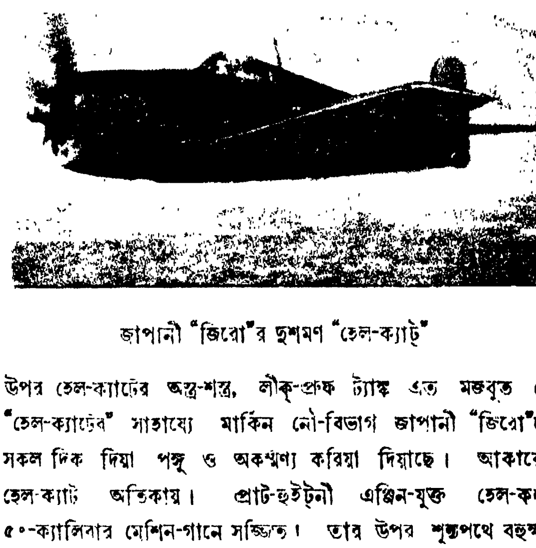


জল-জীপ—সঙ্গে ট্রেলার আঁটা

গতিও বেশ দ্রুত। এই জীপকে আজ ডাঙ্গা-পথের উপর ছাড়া জল-পথেও বহু কর্ত্তব্য করিতে হইতেছে। তার মধ্যে বড় কর্ত্তব্য,—পিছনে ট্রেলার জুড়িয়া সেই ট্রেলারের বুকে সিকি-টন ওজনের মাল-পত্র পার করা। জল-পথবাহী এই জীপকে ও তার ট্রেলারের অঙ্গকে করা হইয়াছে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলপ্রতিষেধক (ওয়াটার-প্রুফ)। জল-জীপের মাথায় একটি 'এগ্‌জষ্ট'-পাইপ লাগানো আছে—সেটি দেখিতে ঠিক পেরিস্কোপের মত।

শেয়ানে-শেয়ানে

পার্ল বন্দরে জাপানী সেনার বিজয়-লাভে প্রধান সহায় ছিল "জিরো" প্লেন। জাপানী নৌ-সেনা বিভাগে "জিরো" প্লেনের ব্যবহার ছিল একচেটিয়া। "জিরোর" গতিও ছিল খুব ঊর্দ্ধমুখী এবং ক্ষিপ্র। তার সঙ্গে লড়িবার মত সামর্থ্য মিত্রপক্ষীয় নৌ-প্লেনের ছিল না। সম্প্রতি মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা "হেল-ক্যাট" নামে এক-জাতের প্লেন তৈয়ারী করিয়াছেন। "হেল-ক্যাটের" গতি দুর্দ্ধর্ষ এবং অমোঘ। এ প্লেনের গতি খুব ক্ষিপ্র এবং বহু ঊর্দ্ধপথেও অব্যাহত! তার



জাপানী "জিরো"র দুশমণ "হেল-ক্যাট্"

উপর হেল-ক্যাটের অস্ত্র-শস্ত্র, লীক্-প্রুফ ট্যাঙ্ক এত মজবুত যে, "হেল-ক্যাটের" সাহায্যে মার্কিন নৌ-বিভাগ জাপানী "জিরো"কে সকল দিক দিয়া পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে। আকারেও হেল-ক্যাট অতিকায়। প্রাট-হুইট্‌নী এঞ্জিন-যুক্ত হেল-ক্যাট ৫০-ক্যালিবার মেশিন-গানে সজ্জিত। তার উপর শূন্যপথে বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে তার সামর্থ্যও অসাধারণ। পিপার মত আকার বলিয়া এ প্লেনের পাইলটের দৃষ্টি হয় বহুদূর-গামী। পাখনা দু'টি যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে মোড়া যায়।

কোথায় জল রাখি ?

যুদ্ধের সময় সেনারা যদি দলভ্রষ্ট হইয়া আঘাটায় বা মরু-প্রান্তরে গিয়া পড়ে, পানীয় জলের অভাবে তখন তাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা দায় হয়। না খাইয়াও যদি বা দিন কাটে, পিপাসায় জল না পাইলে প্রাণ রাখা যায় না। এ দায় কি করিয়া ঘুচানো যায়, তাহা লইয়া বহু গবেষণায় মার্কিন বিমান-বাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ মেজর জর্জ্জ হোলট্ অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষের দেহ হইল পানীয় জল-রক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বা আধার। মেক্সিকো উপসাগরে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তিনি সফল-মনোরথ হইয়াছেন।

রবারের ছোট ছোট ভেলা তৈয়ারী করিয়া সেই ভেলায় তিনি সাগরের লোণা জল ভরিয়া দিয়াছিলেন। ভেলা তৈয়ারী করিয়াছিলেন,—সাত জন লোক ধরে এমনি আকারের। এই ভেলায় জল ভরিয়া পাঁচ জন লোককে তিনি সুদীর্ঘ কাল রাখিয়াছিলেন; কাহারো পিপাসা লাগে নাই। তিনি বলেন, লোণা জলে ভিজানো কাপড়-চোপড় পরাইয়া



এ ভেলায় পিপাসা নাই!

ভেলায় ভরা লোণা জলে যদি কাহাকেও বসাইয়া রাখা হয়,—(ভেলার উপর থাকিবে টার্পলিনের আচ্ছাদন—রৌদ্র-তাপে জল না শুকায় এই জন্য) তাহা হইলে যতক্ষণ সে এমনি বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ তার পিপাসা-বোধ হইবে না।

আহতের ভার

হাতে ধরিয়া বা মাথায় তুলিয়া ভার-বহনে বড় শীঘ্র ক্লান্তি ধরে এবং ক্লান্তি-হেতু ভার বহিবার সামর্থ্যও লোপ পায়। পিঠে করিয়া ভার

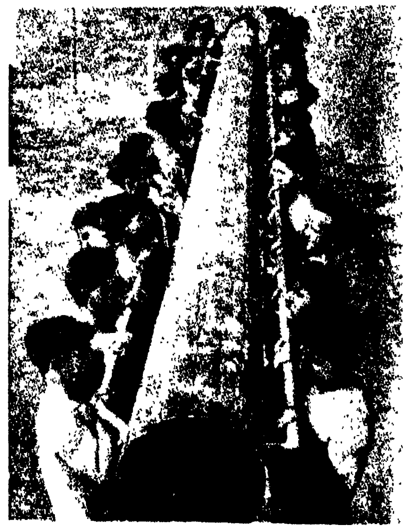


পৃষ্ঠে আহতের ভার

বহিলে শ্রান্তি হয় কম—এবং ভার বহিয়া আমরা বহু দীর্ঘ পথ চলিতে পারি। এ জন্য যুদ্ধে কেহ আহত হইলে তাকে হাল্কা কাঠের ফ্রেমে তুলিয়া সেই ফ্রেম ষ্ট্রাপের সাহায্যে পিঠে বাঁধিয়া আহতকে বহিবার ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধা হইতেছে। ষ্ট্রেচারে তুলিয়া আহতকে বহিবার জন্য দু'জন লোকের প্রয়োজন ;-এ রীতিতে ও-কাজ এক জন লোকেই স্বচ্ছন্দে করিতে পারে।

পেশী-সাধনা

মার্কিন নৌ-বিভাগে যে-সব লোক লওয়া হয়, তাদের শিক্ষার প্রকরণে বেশ বিশেষত্ব আছে। শিক্ষাকালে দলকে-দল ছাত্র-ফৌজকে জল হইতে আঠারো মণ ওজনের একটি বৃক্ষকাণ্ড তুলিয়া ধরিতে হয়।



রড ধরিয়া কাণ্ড তোলা

বৃক্ষকাণ্ড ধরিবার জন্য অবশ্য তার গায়ে লোহার রড আঁটা থাকে। এক-এক দিকে বারো জন করিয়া ছাত্র দাঁড়ায়—দাঁড়াইয়া গুরুর নির্দেশ-মতন সকলে সেই রড ধরিয়া এই কাণ্ড তোলা-নামা করিয়া ব্যায়াম করে। এ ব্যায়ামে সকলের পেশী হয় অসুরের পেশীর মত সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী।

বাতির মাত্রা-নির্দ্দেশ

ঠিক মাপ করিয়া যদি বাতি জ্বালাইতে চান, তাহা হইলে এক কাজ করুন। বাতির গায়ে পেন্সিলের দাগ দিন (নীচের ছবি দেখুন)



বাতির গায়ে দাগ দিয়া ছুরির ব্লেডে চাঁছা

তার পর ধারালো ছোট ছুরির ব্লেড, তাতাইয়া বাতির গায়ের ঐ দাগ ধরিয়া ইচ্ছামত বাতির পলিতা কাটিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখুন। ইহার

ফলে পলিতা জ্বলিয়া ঠিক ঐ চিহ্নিত জায়গায় শেষ হইবার পর আপনা হইতেই বাতিটি নিবিয়া যাইবে।

স্বচ্ছ লেটার-বক্স

য়ুরোপে-আমেরিকায় এখন কাচের লেটার-বক্স তৈয়ারী হইতেছে; কাঠের লেটার-বক্স বাতিল হইতেছে। কাচের আবরণের মধ্যে চিঠি-পত্র



কাচের লেটার-বক্স

থাকিলে জলে ভিজিবার যেমন কোন ভয় নাই, তেমনি চিঠি আসিয়াছে কি-না, জানিবার জন্য লেটার-বক্স হাতড়াইবার প্রয়োজন ঘটে না। মোটা কাচের মাথায় কাঠের ফ্রেম আঁটিয়া এই লেটার-বক্স তৈয়ারী করা কঠিন নয়।

রণ-সজ্জা

যাত্রা-থিয়েটারে রাজা ও সেনাপতি-সেনানীদের কত রকমই না রণসজ্জা দেখিতে পাই! এ-সব যুদ্ধ হয় ভূমিতলে—এখনকার যুদ্ধ বেশীর ভাগই হইতেছে শূন্যপথে। শূন্যপথে রথ চালাইয়া পৌরাণিক যুগে যে-সব বীর যুদ্ধ করিতেন, তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল, তার পরিচয় ইতিহাসে লেখা দেখি না! যুদ্ধের পোষাক যদি ভারী হয় তাহা হইলে অস্ত্র চালাইবার সামর্থ্য থাকিবে না। অবস্থা হইবে সেই 'এক-হাতমে ঢাল, ঔর-হাঁতমে তলোয়ার—লড়েগা ক্যায়সে' গল্পের বীরের মত! কাজেই যুদ্ধের পোষাক এমন হওয়া চাই, যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জন্য না আবদ্ধ বা আড়ষ্ট থাকে! তাছাড়া এ-যুগে শূন্যপথে যুদ্ধ করিতে হইলে এমন পোষাক চাই, যাহাতে দেহ গরম থাকে, শীতে না অবশ হয়! এখনকার ফৌজের পোষাক যতই জবড়জং দেখাক, সে-পোষাক তৈয়ারী হইতেছে হালকা কাপড়ে। সে-পোষাকে তাপ সঞ্চারিত রাখা হয় সর্ব্বাঙ্গে মিহি তার-যোগে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইয়া; পায়ের জুতাও ট্রাউজারের সঙ্গে এমন



বিমান-বীরের পোষাক

ভাবে 'প্লাগ' করা থাকে যে, কোথাও এতটুকু ফাঁক দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পা সিঁটকাইবার আশঙ্কা নাই!

শিক্ষায় কাণামাছি

বমারের খোলে শতাধিক যন্ত্রসঙ্কেতাদি আছে! যে-পাইলট বমার চালায়, তাহাকে শুধু স্পর্শ করিয়া এ সব যন্ত্রসঙ্কেত নির্দ্দেশ করিতে হয়। এ জন্য শিক্ষা-কালে তার চোখে কাপড় বাঁধিয়া শুধু



চোখে রুমাল বাঁধিয়া শিক্ষা

হাত দিয়া স্পর্শের দ্বারা সঙ্কেত-যন্ত্রাদির সঙ্গে পরিচয়-সাধন ও চালন-কৌশল শিখিতে হয়! শিক্ষায় খুব রপ্ত হইলে তবেই মেলে বমারে পাইলটের কাজ। এ শিক্ষার গুণে যুদ্ধের বিপর্য্যয় ঘন-ঘটায় যন্ত্রাদির সঠিক পরিচালনায় ভুল-চুক করার আশঙ্কা থাকে না।

ছোটদের আসর

ক্ষুরের মান

(পাউস্‌টফ্‌স্কির লেখা সোভিয়েট্)

তখন সবে ভোর হয়েছে। লাল পল্টনের দু'জন লোক মেজরের কাছে নিয়ে এলো এক বৃদ্ধকে। বার্দ্ধক্যে তার পিঠ গেছে বেঁকে নুয়ে। লোকটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লাল ফৌজের লোক মেজরের টেবিলের উপরে রাখলো একটি ছাড়পত্র, একখানি ক্ষুর আর দাড়ি কামাবার (শেভিং) একটি ব্রাশ। রেগে বললে—বৃদ্ধের কাছে এগুলি মাত্র পাওয়া গেছে। আবো বললে, একটা কূয়ার ধারে ছিল খানা—সেই খানার মধ্যে বৃদ্ধকে তারা পেয়েছে।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধকে—তোমার নাম ? জাত ? পেশা ?

বৃদ্ধ বললে, তার নাম আবেতিস্ আকোয়াভ। জাতে সে আর্ম্মাণী ; পেশায় নাপিত।

তার পর মেজরের প্রশ্নে বৃদ্ধ বললো তার কাহিনী।

বললো, জার্ম্মাণরা সহরে ঢোকবার আগে সহর ছেড়ে সে পালাতে পারেনি ; মিউনিসিপাল অফিসের একটা ঘুঁজি-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল এক জন ইহুদী-প্রতিবেশীর দু'টি ছেলে। ছেলে দু'টির বাপ নেই—থাকবার মধ্যে শুধু বিধবা মা। মা-বেচারি আগের দিন বেরিয়েছিল ছেলেদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে—আর বাড়ী ফেরেনি। নিশ্চয় সে এয়ার-রেডে মারা গেছে। ছেলে দু'টি অনাথ। কাজেই···

সেই ঘুঁজি-ঘরে ছেলে দু'টিকে নিয়ে বৃদ্ধ ছিল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। না কারো মুখে পড়েছে অন্নজল, না ছিল কারো চোখে এক ফোঁটা ঘুম। দ্বিতীয় দিন রাত্রে ছোট ছেলেটি খিদের জ্বালায় আর আতঙ্কে কান্না সুরু করে দিলে! সে কি কান্না! তাকে থামানো দায়! আকোয়াভের কাছে বোতলে ছিল খানিকটা জল—ছেলেটিকে সেই জল খেতে দিল। জল খেয়ে ছেলের কান্না তবে থামে।

তার পরের দিন। তখন বেলা হয়েছে—এক জন নাৎসী কর্পোরাল, আর তার সঙ্গে দু'জন সেপাই এসে হাজির সেই ঘুঁজি-ঘরে। তিন জনকে হিড়-হিড় করে টেনে তারা নিয়ে গিয়ে হাজির করলো জার্ম্মাণ লেফটেনাণ্ট ফ্রিয়েড্‌রিচ্ কোলবার্জের কাছে। এক দাঁতের ডাক্তারের পোড়ো বাড়ীতে লেফটেনাণ্ট খুলেছিল তার ঘাঁটী। বাড়ীর সার্শিগুলো গোলা গুলীতে গুঁড়িয়ে সাফ হয়ে গেছে—দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় ফাটল। সেই ফাটল আর খোলা জানলা দিয়ে শীতের বাতাস আসছিল হু-হু করে···হাত-পা তাতে ঝনঝনিয়ে উঠছিল! খানিকটা আগুন জ্বেলে সেই আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে লেফটেনাণ্ট আগুন পোহাচ্ছিল!

ফৌজদারদের দিকে চেয়ে লেফটেনাণ্ট বললে—এরা কারা ?

তারা বললে—মিউনিসিপাল অফিস-বাড়ীর একটা অন্ধকার ঘুঁজি-ঘরে তিন জনে লুকিয়ে ছিল হুজুর। আগের রাতে কান্না শুনেছিলুম। আজ দিনের বেলায় গিয়ে পাকড়েছি। ছেলে দু'টো হলো ইহুদীর বাচ্ছা···আর বুড়োটা মনে হচ্ছে আর্ম্মাণী।

এ কথায় লেফটেনাণ্ট মারলো বৃদ্ধের গায়ে ভারী জুতোর ঠোক্কর—বৃদ্ধ পড়ে গেল। লেফটেনাণ্ট বললে—প্রমাণ দিতে পারিস্ যে তুই আর্ম্মাণী ?

বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না।

লেফটেনাণ্ট তাকে আবার একটা লাথি মারলো···মেরে সেপাইদের বললে—ওদিককার খালি কামরায় বন্ধ করে রাখো। পরে বিহিত করবো।

সন্ধ্যার সময় লেফটনাণ্ট এলো তাদের কারা-কক্ষে—মদ খেয়ে নেশায় একেবারে চুর হয়ে। তার সঙ্গে সেই দু'জন সেপাই আর একটা ভোঁদা-মোটা এয়ার-ম্যান। তাদের সকলের বগলে এক-গাদা করে বড় বোতল! ভড়কা-মদের বোতল।

ছেলে দু'টোকে ধরে টেবিলের উপর বসিয়ে লেফটেনাণ্ট একটা বড় বোতল খুললো ; খুলে সঙ্গীদের পানে চেয়ে বললো—কিছু খায়নি, না ? খাওয়াও বেটাদের পেট ভরে এই মদ।

বৃদ্ধের পানে চেয়ে বললে—তোকে তো বলে মদ দিচ্ছি না, বুড়ো! শুনছি, তুই নাপিত! আমার দাড়ি কামিয়ে দিবি···ক'দিন কামানো হয়নি! বুঝলি···দাড়ি কামিয়ে সাফ হয়ে কাল তোদের সহর দেখতে বেরুবো! হাঃ হাঃ হাঃ!

এ কথা বলে ছোট ছেলেটিকে জোর করে ধরে হাঁ করিয়ে তার মুখে দিল বোতল উপুড় করে মদ ঢেলে। বাচ্ছা ছেলে···দম আটকে যায় আর কি! নিরুপায়ে ককিয়ে সে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু তাতে কি! এ কান্নায় তাদের আমোদ গেলো বেড়ে! রোখ উঠলো চড়ে!

ছোট ছেলেটাকে শুইয়ে ফেলে তার মুখে দিল মদ ঢেলে—গাছের গোড়ায় মানুষ যেমন বালতি উপুড় করে জল ঢালে, তেমনই ভঙ্গী। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়লো! টৈ-টুম্বুর করে তাকে মদ গেলালো—তার পর দিল ছেড়ে। যেমন ছাড়া, ছেলেটি ঝলকে-ঝলকে বমি করতে লাগলো। কি যাতনা! তার পর বেচারী নীল হয়ে নেতিয়ে পড়লো মেঝের উপরে। উল্লাসে তারা হো-হো করে হেসে উঠলো।

তার পর বড়টির পালা! তাকে ধরবামাত্র চীৎকার করে কেঁদে সে ছিটকে সরে গেল তাদের কবল থেকে। তার পর টেবিলের নীচে সেঁধিয়ে হামা দিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে কি চেষ্টাই না করলো! নাৎসীর দল তাকে ধরে তার দু'চোখের পাতা টেনে ধরে চোখে দিল ঢেলে সেই বোতলের মদ! যাতনায় বেচারী উল্টে-পাল্টে পড়তে লাগলো। মদের জ্বালায় দু'চোখ অন্ধ—চোখে কিছু দেখতে পায় না! চোখ বুজে সে চললো পাগলের মতো দরজার দিকে! চোখ বন্ধ··· দেখতে পায় না! দরজায় মাথা ঠুকে সেই যে পড়লো—তাতেই তার সব শেষ।

বৃদ্ধ আর্ম্মাণী বললে—ছেলে দু'টো আমার চোখের উপর এমনি করে প্রাণ দিল, হুজুর! তাদের মূর্ত্তি দেখে মনে হতে লাগলো যেন বাজ পড়ে বিদ্যুতের ঝলকানিতে মরে গেছে—দেহ যেন পোড়া কাঠের মতো কালো!

মেজর বললেন,—তার পর ?

বৃদ্ধ বলতে লাগলো—এর শেষটুকু শুনবেন, হুজুর ? নাৎসীদের তখন কি অট্টহাসি ! খুব কষে ক'জনে বসে মদ খেতে লাগলো··· বোতলগুলো খালি করে ফেললো।

তার পর লেফটেনান্ট বললে—ওরে বেটা বুড়ো, কামিয়ে দে। ঘরে টেবিলের উপর লোহার একটা বাতিদান ছিল···তাতে জ্বলছিল বাতি।

বৃদ্ধ বললে,—আমি তার দাড়িতে বেশ করে সাবান ঘষতে লাগলুম। লেফটেনান্টের সঙ্গীগুলো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল—লেফটেনান্ট নেশার ঘোরে ছিল নিস্পন্দ ! তার পর লেফটেনান্টের গালে ব্রাস বুলিয়ে সাবান ঘষতে ঘষতে দিলুম তার দুই চোখের মধ্যে সাবান-মাখা ব্রাস গুঁজে—বেশ জোরে। তার পর সেই গোঁচার সঙ্গে সঙ্গেই লোহার বাতিদানটা তুলে নিয়ে জোরসে মারলুম ঘা।

মেজর বললেন—সে মরে গেল মার খেয়ে ?

—তার রগে দাঁইসে ঘা ! তখনি ঘুরে পড়ে গেল চেয়ার থেকে। ঐ পড়াতেই তার ইহলীলা শেষ ! তার পর আমি কোন মতে বেরিয়ে এলুম। পথে খানার ধারে পড়েছিলুম। আপনাদের লাল পল্টনের লোক আমাকে দেখতে পায়—দেখে আপনার কাছে এনেছে।

ক্ষুরখানা হাতে নিয়ে মেজর দেখলেন, তার পর কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বললে—বুঝেছি হুজুর, কি ভাবছেন ! ভাবছেন, ক্ষুর ছিল হাতে, তার গলায় কেন এ ক্ষুর বসিয়ে দিলুম না ?

মেজর বললেন—সত্যি—কেন তা দাওনি ?

মৃদু হাস্যে বৃদ্ধ বললে—দিইনি তার কারণ, এ ক্ষুর আমাকে আজ দশ বছর ধরে অন্নজল জুগিয়েছে, হুজুর। দশ বছর এই ক্ষুরকে সম্বল করে বেঁচে আছি হুজুর ! আমায় যে অন্নবস্ত্র দেছে, তার লাঞ্ছনা করবো ঐ পশুর গলায় বসিয়ে ! তাই হুজুর, এ ক্ষুরের অপমান করতে হাত ওঠেনি !

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

কুকুর-বাহিনী

কুকুরের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, কুকুরের শক্তি ও প্রভু-পরায়ণতার অনেক কথা তোমাদের বলিয়াছি। এবারে বলিব, এ-যুদ্ধে শিক্ষা দিয়া মার্কিণ জাত কুকুরকে কতখানি সহায় গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারি আশ্চর্য্য কাহিনী।

মার্কিণ জাত কুকুরকে শিখাইতেছে—শত্রু-নিপাত এবং মার্কিণ সেনাদের রক্ষার কাজ। এজন্য সেখানকার সমর-বিভাগ কুকুরদের শিক্ষা দিবার জন্য এক প্রকাণ্ড সহর গড়িয়া তুলিয়াছে। সহরের নাম কুকুর-সহর (Dog-town)। এ সহরে সুদক্ষ শিক্ষকরা নানা জাতের কুকুরকে নানা রকম সামরিক কাজ শিখাইতেছেন।

প্রথমে মুক্ত ক্ষেত্রে বহু কুকুর রাখিয়া তাদের সামনে কামান-বন্দুক ছুড়িয়া কুকুরদের কামান-বন্দুকের শব্দ সহিয়া অচঞ্চল থাকিতে শিখানো হয় ; তার পর জাতি-বিচার করিয়া কুকুরদের বিভিন্ন ডিউটি-পালনে সুদক্ষ করিয়া তোলা হয়।

কুকুরদের মধ্যে কোনো জাতের কুকুর করে গুলী-বারুদ, মেশিন্‌-গানের অংশসমূহ, টেলিফোনসেট্‌, খাদ্য-পানীয় যথাস্থানে পৌঁছানোর কাজ ; কোনো কুকুর করে বার্ত্তাবহ দূতের কাজ। কুকুর-দূতের কলারের সঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ ধাতুর একটি করিয়া পাত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়—এই পাত্রের মধ্যে ম্যাপ, সাঙ্কেতিক অক্ষর, জরুরি আদেশ-নির্দ্দেশ অথবা অতিরিক্ত রশদপত্র প্রয়োজন হইলে তাহা চাহিয়া



কুকুর-শিক্ষা-নিকেতন (ডগ্‌ টাউন্‌)

চিঠিপত্র লিখিয়া সেই চিঠি ভরিয়া দেওয়া হয়। কুকুর-দূত সে সব লইয়া যথাস্থানে গিয়া আদেশ-পালনে এতটুকু বিলম্ব করে না। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতের কুকুররাই দূতের কাজে সব চেয়ে নিপুণ।



বর্ম্মাবৃত শিক্ষক—আক্রমণ-রীতি শিখানো

তার পর আছে রেড ক্রশ কুকুর-বাহিনী। এ কুকুরদের ডিউটি রণক্ষেত্র ঘুরিয়া আহত সেনাদের সন্ধান লওয়া,—সন্ধান মিলিবামাত্র এ-কুকুর ফিরিয়া আসে ক্যাম্পে এবং ক্যাম্প হইতে ষ্ট্রেচার-বাহীদের লইয়া আহতদের উদ্ধার-সাধনে সহায়তা করে।

পুলিশ-কুকুরবাহিনীর কাজ, সমুদ্রকূলে বিচরণ করিয়া পাহারাদারী করা। সমুদ্রকূলে বিচরণ করিতে কড়ি বা শাঁখ-শামুকের খোসায় কুকুরের পা পাছে ছড়িয়া কাটিয়া যায়, এজন্য এ সব কুকুরের পায়ে ছোট ছোট বুট জুতা পরাইয়া দেওয়া হয়—চার পায়ে চারটি করিয়া

জুতা। বহু স্থলে মনসা কাঁটার ঘা বাঁচাইতে এ সব কুকুরের জন্ম চামড়ার জুতারও ব্যবস্থা আছে।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর রিফ-যুদ্ধে স্পানিশ জাত গিয়া মুশলিম-বাহিনীর সঙ্গে সমর-নিপুণ কুকুরবাহিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল; তার পর হইতে য়ুরোপে সামরিক নানা কাজে কুকুরদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। এ ব্যবস্থা সবচেয়ে পাকা ছিল জার্মাণীতে।



—"এই গন্ধ চিনে রাখো বৎস!"

এবার এ যুদ্ধ সুরু হইলে বেলজিয়ানরা কুকুরবাহিনী দিয়া মেশিন-গান বহাইয়া ছিল। ফ্রান্সের কুকুর-বাহিনীও সে-সময় সমর-বিভাগকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল! সব দিক্ দিয়া কুকুরকে সামরিক নানা কাজে নিপুণ করিয়া তুলিতে আমেরিকার ব্যবস্থাই আজ সবচেয়ে নিখুঁৎ এবং উৎকৃষ্ট।



কুকুর-দূতের গলার কলারে ভরিয়া চিঠিপত্র পাঠানো

চিকিৎসা-বিভাগেও কুকুরের কাজ আজ সামান্ত নয়। ঔষধপত্র বহিতে, রণক্ষেত্র হইতে আহতদের আনিয়া য়্যাম্বুলান্সে তুলিতে কুকুররা যে পটুতা দেখাইতেছে, তার ফলে বহু সেনা অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিতেছে।

সন্ধানের কাজে অনেক সময় কাঁটা-তারের বেড়ার ফাঁক দিয়া চলিতে হয়—শিক্ষার গুণে কুকুর-বাহিনী এমন সাবধানে সে কাঁটার ফাঁক দিয়া যাতায়াত করে যে, গা এতটুকু ছড়ে না বা ছিঁড়িয়া কাটিয়া যায় না।

ঝড়ে-জলে বা অন্ধকার রাত্রে পাহারাদার কুকুরের সাহায্য না পাইলে শান্ত্রী বা রক্ষিবর্গের পক্ষে সঠিক ভাবে কর্ত্তব্য-সাধনে আজ সামর্থ্য থাকিত না।

মানুষের চেয়ে কুকুরের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অনেক বেশী প্রখর। সে জন্ম মানুষ যেখানে ভয় বা বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস পায় না, কুকুর সেখানে সে আভাস জানিতে পারে,—জানিবামাত্র কর্ত্তব্য-পালনে কোনো বাধা কোন বিঘ্নই সে গ্রাহ্য করে না!

শত্রুকে কি করিয়া আক্রমণ করিবে, সে-কৌশল শিখাইবার সময় শিক্ষককে খুব বেশী সতর্ক থাকিতে হয়। এ শিক্ষা দিবার সময় চর্ম্মাবরণাদিতে শিক্ষক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন; নহিলে আক্রমণ ও প্রতিরোধের তাগবাগ শিখাইতে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের নখর ও দশনাঘাতে গুরু-রকম জখম হইবার আশঙ্কা সুনিশ্চিত। শিক্ষার সময় কুকুর ভুলচুক করিলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না; সে সময় শাস্তি দিলে কুকুরের ভুল-শুধ্রানো অসম্ভব।

যে-সব কুকুরকে সমর-বিভাগে গ্রহণ করা হয়, তাদের কাণে কায়েমি ভাবে মার্কা দিয়া সব বিভিন্ন নাম-করণ হয়। প্রত্যেকটি



আহতের সন্ধান

কুকুরের বগলশে তার নাম লেখা থাকে। এই নাম তাকে শিখানো হয়। কুকুর নিজের নাম জানে—জানিয়া ঠিক মানুষের মতই নাম ডাকিবামাত্র তখনি সে-ডাকে সাড়া দেয়। সমর-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীরা বলেন—কুকুর-বাহিনী ঠিক মানুষের মতই এ যুদ্ধে আমাদের শক্তিমান করিয়াছে—মানুষের মতই সাহায্য করিতেছে। কুকুরকে এ যুদ্ধে বন্ধুভাবে সহায় না পাইলে বিজয়-লাভ সম্বন্ধে আমাদের এত আশা থাকিত না! বহু ক্ষেত্রে পরাজয়ের লাঞ্ছনা কাটাইয়া আমরা যে বিজয়-লাভে সমর্থ হইয়াছি, তাহা শুধু এই কুকুর-বাহিনীর গুণে।

ডায়েরি লেখা

তোমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা ডায়েরি পড়েছো? "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি"? তার পর তাঁর "জীবনস্মৃতি"? "ছিন্নপত্র" প্রভৃতি?

তিনি ছোট বয়স থেকেই ডায়েরি লিখতেন। এ-অভ্যাসটি খুব ভালো। ডায়েরির পাতায় মনের অকপট কথা যদি প্রত্যহ লিখে যেতে পারো, প্রত্যেকটি চিন্তা—প্রাত্যহিক জীবনে কার সঙ্গে তুমি

কেমন আচরণ করলে—অপরেই বা কে তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করলো—তাহলে তাতে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করবে, মানব-চরিত্রে এবং নিজের চরিত্রে যে-জ্ঞান,—তার তুলনা নেই! সে-অভিজ্ঞতার ফলে জীবনে লক্ষ্য খুঁজে পাবে—নিজেকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারবে!

তবে ডায়েরিতে মিথ্যা কথা লিখো না। অন্যায় যদি করে থাকো, সে-অন্যায় অকপটে ডায়েরির পাতায় লিখে রাখবে। অপরের সঙ্গে কাপট্য বা ধাপ্পা চললেও নিজের সঙ্গে তা চলে না। চালালে দুর্ভাগ্যই শুধু সঞ্চয় করবে। অন্যায় কিছু করলে সে-অন্যায় নিজের কাছে স্বীকার করায় চরিত্রের দোষ-দুর্ব্বলতা সারে। ধরো, তোমার বন্ধু আছে গোপাল। তার কোনো ব্যবহারে আজ তুমি মনে ব্যথা পেলে—সে-ব্যথার কথা ডায়েরিতে তুমি লিখে রাখলে। তার পর হয়তো ক'দিন বা ক'মাস পরে গোপালের ব্যবহারে পেলে আনন্দ; তখন সে-আনন্দের কথা লিখতে বসে তার দেওয়া সেই আঘাতের বিবরণ খুলে পড়ো। পাশাপাশি দু'দিনের দু'টি লেখা পড়লে বুঝতে পারবে, কারো উপর একটি দিনের ব্যবহারে বদ ধারণা মনে পোষণ করা উচিত নয়।

ডায়েরি লেখায় আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে, কৌতুক আছে! আজ ডায়েরিতে যে-কথা লিখছো—এক বছর পরে সে লেখা পড়ো। হারানো স্মৃতির সৌরভে মন বিমুগ্ধ হবে।

ডায়েরি লেখার অভ্যাসে নিজের উপর বিশ্বাস জন্মাবে, সম্ভ্রমবোধ জাগবে। তার উপর চিন্তাশক্তি প্রখর হবে—বুঝে কাজ করতে পারবে! কঠিন সমস্যার উদয় হলে দ্বিধা-সংস্কারের ভারে বিপন্ন হতে হবে না—সহজে সমাধান মিলবে।

নিজেকে ডায়েরির পাতায় অকপটে প্রকাশ করা চাই। এই অকপট প্রকাশ অভ্যাস হলে জগতে কাকেও ভয় করে চলতে হবে না—সত্যাচরণে নিষ্ঠা জাগবে আপনা থেকে; এবং নিজের দোষ ত্রুটি নিজে বুঝতে শিখে সে-সব এড়িয়ে চলে 'বড়' হতে পারবে!

দুর্দ্দিনের ভাইফোঁটা

কাল-সম এলো মহাসংগ্রাম জগৎ জুড়িয়া অস্ত্রের ঝন-ঝন,
অট্ট হাসিয়া পঞ্চাশ সাল ভেঙ্গে দিয়ে গেল সংসার-মধুবন।
দেশে নাই চাল, হাতে নাই টাকা, দীনের খাদ্য দিন দিন হলো ক্ষয়,
ক্ষুদ্র আয়েতে একটিও দিন বাঁচিবার লাগি' কারো নাহি সঞ্চয়।
এক বেলা খেয়ে কেটেছিল দিন, ক্রমে প্রতি ঘর শূন্য হইল যে গো,
ক্ষুধায় কাঁদিয়া ভগিনীরা তবু ডাকে ভাইয়ে আজ—
ভাই-ফোঁটা নিবি কে গো?

পেটে নাই ভাত, দেহ কঙ্কাল, লাখো ভাই-বোন মোরা আজি ফুটপাথে,
নিরুপায় ভাই বাপ ছেলে স্বামী নগ্না জননী কাঁদিছে রিক্ত হাতে।
কে কারে রাখিবে? সবে নিরুপায়! মর্ত্যে মোদের বাঁচাইতে কেহ নাই!
আত্মসুখীরা লুকায়েছে মুখ, ধনিকেরা মূক, কাঁদিছে দুঃখী ভাই।
বিজয়ার শেষে বুক ফেটে যায়, এলো কার্ত্তিক দুর্ব্বল হাত যে গো,
মরণের মুখে তবু আজি সাধ ভাইফোঁটা দিতে—
ভাইফোঁটা নিবি কে গো?

বন্যায় সব গিয়াছে ভাসিয়া, ভিক্ষার লাগি নগরে এসেছি মোরা,
বন্ধ দুয়ার—কে-বা দেয় ভাত? দ্বারে দ্বারে হায়, বিফল হলো যে ঘোরা।
কত নাগরিক আজ নিরুপায়, বুক ফেটে যায়, বাহির হয়েছে পথে,
তাহাদের নারী-স্তনে দুধ নাই—অভাগা শিশুরা বেঁচে আছে কোন মতে।
অনাহারে কাঁপে গোটা দেহখান তবু তাহাদের কত সাধ প্রাণে যে গো,
মরণের মুখে দাঁড়াইয়া ডাকে—আয় দুখী ভাই,
ভাইফোঁটা নিবি কে গো?

গায়ে লেগে আছে ঘুসঘুসে জ্বর, ফুসফুসে ব্যথা, খক-খক করে কাশি,
ছেলে মেয়ে স্বামী শ্বশুর ভাসুর আজ সাত দিন সাত রাত উপবাসী।
কত না ভগিনী মরা-ছেলে বুকে পাগলের মতো রাস্তায় বসে' কাঁদে,
ফুটপাথে ওই মৃত ভাইদের শবদেহ হায়, ডোমগুলো এসে বাঁধে।
এ-সব দেখেও বুকে ব্যথা বয়ে ঐ ভাইদের লাগি প্রাণ কাঁদে যে গো,
তাহাদের স্নেহ দিতে কেহ নাই, তাই ডাকি আয়,
ভাইফোঁটা নিবি কে গো?

আমাদেরি পাশে কাদের ছেলেরা গাছের তলায় ডুকরিয়া কেঁদে সারা,
তাহাদের সব বোনগুলি হায় মরেছে ক'দিন, অসহায় আজি তারা।
বিলাসী ধনীর প্রাসাদের তলে ভাইফোঁটা লাগি' আনন্দ-মধু ঝরে,
তারি রব শুনে' ফুটপাথে ওই ভাইগুলি হায়, মুখ-চাওয়া চাওয়ি করে!
ওরে বোনহীন অসহায় ভাই, কাছে আয় তোরা আমরা রয়েছি যে গো,
আজো মরি নাই, দুঃখিনী মোদেরে দিদি বলে ডাক্ এসে—
ভাইফোঁটা নে গো!

পেটে ক্ষুধা চেপে' দুর্ব্বল দেহ, ঘুম নাই চোখে, শেষ রাতে আজ মোরা—
ঘাসের শিশির তুলিয়া রেখেছি আয় সবে' আয়—
ফোঁটা নিবি ভাই তোরা।
ধনীদের গেহ ভ'রে গেছে আজ ভাইফোঁটা লাগি' শঙ্খ ও হুলুরবে,
রাস্তায় এসে দাঁড়ায়েছি বলে' মোরা ভাইবোন ফোঁটা কি দিব না তবে?
নাহি চন্দন, আছে আঁখিজল—ক্ষুধায় পিষিয়া সুধা আনিয়াছি যে গো,
নিবে আসে আলো, শেষ ফোঁটা আজ দিয়ে যাই আয়—
ভাইফোঁটা নিবি কে গো?

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আরব সাগরের রসিকতা—

"চন্দ্রহাস"

আরব দেশের হাস্যরসের সহিত পরিচয় নাই ; কিন্তু এক বার আরব সাগরের রসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

অনেক দিন ধরিয়া আরব সাগরের তীরে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিনও সমুদ্র-স্নান হয় নাই। বন্ধুরা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। গৃহিণীর আধুনিকা বান্ধবীরাও যে ভাবে কথা কহিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রুতিমধুর লাগিতেছিল না—"এত দিন বম্বে'তে আছেন, সী-বেদিং করেননি? ভয় করে বুঝি? তা করবারই কথা!—যারা আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি, তাদের ভয় করবে বৈ কি!"

এক দিন গৃহিণী বলিলেন,—"ওগো, সমুদ্রে স্নান না করলে আর তো মান থাকে না। চলো এক দিন।"

আমি বলিলাম,—"বেশ তো, চলো। কিন্তু বেদিং কষ্ট্যুম কিন্‌তে হবে যে।"

গৃহিণী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"ওই বেহায়া পোষাক পরে আমি নাইবো? কেটে ফেললেও না।"

"কিন্তু—"

গৃহিণী কিন্তু সতেজে ঐ বিলাতী বর্ব্বরতা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, পদ্মায় স্নান করিয়াছেন—সমুদ্রে তাঁহার ভয় কি? তিনি বাঙালীর কুলবধূ, নিজের চিরাভ্যস্ত সাজ-পোষাকেই স্নান করিবেন। যে যা খুশী বলুক।

ভালোই হইল। বেদিং কষ্ট্যুমের আজকাল দাম কম নয়। একটা দম্‌কা খরচ বাঁচিয়া গেল।

সমুদ্র আমার বাড়ী হইতে পোয়াটাক মাইল দূরে। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার বীচে বেড়াইতে গিয়াছি; স্থানটা দেখাশুনা আছে। বেশ নির্জ্জন স্থান; তবে সকালে-সন্ধ্যায় স্নানার্থীর ভিড় হয়। আমরা পরামর্শ করিয়া পরদিন ঠিক দুপুরবেলা বাহির হইলাম। এই সময়টায় ভিড় থাকে না। সমুদ্রের সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা একটু নিভৃতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন জানিতাম না যে, সে দিন ঠিক দুপুরবেলাই জোয়ার আসিবার সময়।

বীচে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দিঙ্‌মণ্ডল পর্য্যন্ত সমুদ্র যেন মাতাল হইয়া টলমল করিতেছে! বড়-বড় ঢেউ বেলাভূমিকে আক্রমণ করিতেছে, বালুর উপর শুভ্র ফেনের একটা সীমা-রেখা আঁকিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বীচে কেহ নাই। এপাশে ওপাশে অনেক দূরে জলের মধ্যে দু'-একটা মুণ্ড উঠিতেছে নামিতেছে দেখিলাম। বীচের পিছনে নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে একসারি ছোট ছোট কেবিন; যাহারা নিয়মিত সমুদ্র-স্নান করিতে চায়, তাহারা ঐ কেবিন ভাড়া লয়।

এক শ্বেতাঙ্গী যুবতী শিষ দিতে দিতে একটি কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গোলাপী রঙের বেদিং কষ্ট্যুম, মাথায় রবারের টুপী, কোমরে একটি বড় টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো। আমাদের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া নৃত্যচঞ্চল চরণে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

গৃহিণী চাপা গর্জ্জনে বলিলেন,—"মরণ নেই বেহায়া ছুঁড়ির! খবরদার বল্‌ছি, ওদিকে তাকাবে না!"

হেঁটমুণ্ডে জলের দিকে চলিলাম। গৃহিণী শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়াইয়া লইলেন। ভাগ্যক্রমে আমি হাফ্-প্যাণ্ট পরিয়া আসিয়াছিলাম।

জলের কিনারা পর্য্যন্ত আসিয়া গৃহিণী কিন্তু আর অগ্রসর হইতে চান না। আমারও সুবিধা বোধ হইতেছিল না! কিন্তু এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওদিকে শ্বেতাঙ্গী তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! ঢেউয়ের নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে—যেন গোলাপী রংয়ের একটি মৎস্য-নারী!

গৃহিণীকে বলিলাম,—"এসো, ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে কি সী-বেদিং হয়!"

জলের পানে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"ঢেউগুলো বড্ড বড় বড়!"

"তা হোক না—সমুদ্রের ঢেউ বড়ই হয়। ঐ দ্যাখো না, ও মেয়েটা কেমন ঢেউ খাচ্ছে।"

"আবার ওদিকে তাকাচ্ছ?"

"না না, ও অনেক দূরে আছে। এখান থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না।—এসো।"

হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলে লইয়া গেলাম। বেশী নয়, হাঁটু-জল পর্য্যন্ত গিয়াছি কি বিভ্রাট বাধিয়া গেল! প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহিণী পড়িয়া গেলেন; ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঢেউ ফিরিয়া গেলে তিনি হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আর একটা ঢেউ আসিয়া আবার তাঁহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন; "ওগো আমাকে ধরো—আমি যে খালি পড়ে যাচ্ছি! কোথায় গেলে তুমি—আমাকে ফেলে পালালে!"

তাঁহাকে ধরিবার মত অবস্থা আমার ছিল না। প্রথম গোটা-দুই ঢেউ অতি কষ্টে সামলাইয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৃতীয় ঢেউটা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ঢেউয়ের তলায় গড়াইতে গড়াইতে আমি প্রায় ডাঙায় গিয়া উঠিলাম। দু'-এক ঢোক লোণা জলও পেটে গিয়াছিল। কোন মতে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি, গৃহিণী তখনও এক হাঁটু-জলে আছাড় খাইতেছেন। ঢেউগুলা এত দ্রুত-পরম্পরায় আসিতেছে যে, তিনি পলাইয়া আসিতে পারিতেছেন না! তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনর্গল চীৎকার নিঃসৃত হইতেছে—"ওগো,

কেমন মানুষ তুমি! আমাকে ফেলে পালালে! আমার যে কাপড় খুলে যাচ্ছে—"

শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া দেখি, জলের মধ্যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে। সত্যই গৃহিণী বিবসনা হইতেছেন! ঢেউগুলা দুঃশাসনের মত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বসন ধরিয়া টানিতেছে। আঁচল শিথিল হইয়া গেল! আর একটা ঢেউ—তিনি প্রাণপণে শাড়ীর প্রান্ত আঁকড়াইয়া আছেন। আর একটা ঢেউ—বাস্! নারীর লজ্জা নিবারণকারী শ্রীমধুসূদন বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন না; দুঃশাসন-রূপী আরব সাগর গৃহিণীর শাড়ী কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মরিয়া হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম। অনেক নাকানি চোবানি খাইয়া শেষ পর্য্যন্ত গৃহিণীকে একান্ত নিরাবরণ অবস্থায় ডাঙায় টানিয়া তুলিলাম। তিনি নেহাৎ জলী নন—কিন্তু থাক্!

চারি দিক্ ফাঁকা, কোথাও এতটুকু আড়াল আবডাল নাই। উপরন্তু, ভোজবাজির মত ঠিক এই সময় কোথা হইতে কতকগুলা লোক জুটিয়া গেল! তাহারা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে নিজেদের ভাষায় (সম্ভবতঃ আরবী) মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-কালে পঞ্চপাণ্ডবের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে তাকাইলাম—হে মধুসূদন, তুমি কত দূরে!

হঠাৎ দেখি, দূর হইতে শ্বেতাঙ্গী মেয়েটা ছুটিয়া আসিতেছে! খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে তাহার বড় তোয়ালেখানা গৃহিণীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।.........

সে দিন তোয়ালে-পরিহিতা গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কি করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে প্রশ্ন করিয়া পাঠক-পাঠিকা আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে মনে চোখ বুজিয়া থাকেন!

সোনার বাংলা

সোনার বাংলা মোর!
এ কথা কি শুধু কবি-কল্পনা, মিথ্যা স্বপন-ঘোর?
এ কথার মূলে সত্য কি আছে, ভাবিয়া না পাই ধ্যানে,
সোনার বাংলা কথাটাই শুধু শুনি মোরা দুই কাণে!
কবে কোথা হেথা পাওয়া যেত সোনা—কেহ কি বলিতে পারে?
সোনার বদলে ভরা দেখি দেশ শুধু কর্দ্দমভারে!
বাংলার ধান সকলের মুখে অন্ন জোগাতে নারে,—
বছর-বছর ভাসে সারা দেশ বন্যা-প্লাবন-ধারে।
তটিনী যাহার বুকে বহে দেখি লবণ-জলের ধারা,
কূপ-সরসীর সলিলে শুধুই রোগের বীজাণু ভরা;
শৈবালে আর শঙ্কে পূরিত পুরানো তড়াগ যার,
বিষভরা পূতি-বাষ্পের রাশি উদ্গারে অনিবার;
গ্রামগুলি যার জঙ্গলে ভরা, মঙ্গল-তান তুলি
মশকবৃন্দ বন্দনা গায় "জয় ম্যালেরিয়া" বলি—
বিসূচিকা যেথা তোলে বারো মাস মরণের কলরোল,
ঘরে ঘরে যেথা শিশুর মরণ—খালি মায়েদের কোল!
স্বাস্থ্য ও আয়ু হরে যার বায়ু, জীবনের তরে হায়,
ছুটে যেতে হয় গিরি-পর্ব্বতে, সাগরের কিনারায়,—
সোনার বাংলা তাহারে সকলে বলে যদি কেন তবে
কাণা ছেলেটির পদ্মলোচন নামটি—কেন না হবে?
আজিও বুকেতে যার
অন্ধ বিমূঢ় কুসংস্কার, শত দৈন্যের ভার;
গোজাতি যেথায় মরে অপালনে, তাহার আহার নাই—
অথচ তাহারে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করা চাই!
ফুল-চন্দনে বাণীর চরণে অঞ্জলি মোরা দানি,
বিনা-অর্চ্চনে ওই ইয়োরোপ হয় বিজ্ঞান-জ্ঞানী;
লক্ষ্মীরে পূজি শঙ্খ বাজাই, ভাবি হবো মোরা ধনী,
শ্রমগুণে লভে মার্কিণ যত স্বর্ণ-হীরক-খনি;
শিক্ষা লভিয়া মানুষ যেথানে দাসখতে লেখে নাম,
কায়িক শ্রমের গলা চেপে মারে, নাহি মেলে তার দাম;
ঘৃণা-ভরে যেথা ব্যবসার শিরে করে গো দণ্ডাঘাত,
ঘরে বসে-বসে করে দিন-রাত পরের মুণ্ড-পাত,
আলস-হিংসা একতা-হীনতা মজ্জায় যেথা মেশে—
জোর করে হায়, সোনার বাংলা বলিতে হবে সে দেশে?
থাকুক্ এ সব ক্লেদ,—
বাঙালীর কাছে সোনার বাংলা, নাহি তায় মত-ভেদ।
সেই বাংলার অঙ্গনে মিশে যত সঙ্গীর সনে
বাল্যে বাঙালী ধূলি-মাখা দেহে খেলেছে ফুল্ল মনে,
ছায়াঘন ওই আম্রকানন ক্লান্তি হরেছে যার,
পল্লীর হাট ধূ-ধূ করা মাঠ মনে পড়ে বার-বার—
যাহার তটিনী কুলু-কুলুধ্বনি তোলে যবে মৃদু তান,—
শুনিতে সে পায় মা'র কণ্ঠের ঘুম-পাড়ানিয়া গান!
অঙ্গন-তলে তুলসীর মূলে সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে
চোখে যেন তার শতেক তারার পরশ বুলায় পলে।
এই বাংলার আঙিনায় পিতা রেখেছেন তাঁর দেহ,
এর কুটীরের মাটীতে মিশায়ে আছে জননীর স্নেহ,
পিতামহ তার ইহার মাটীতে প্রতিমা গড়িয়া কত—
শত উৎসবে মিলিয়া মিশিয়া ছিলেন পূজায় রত।
এই বাংলার গঙ্গা-যমুনা ইচ্ছামতীর জলে
খুঁজিলে তাঁদের অস্থিচূর্ণ এখনো হয়তো মেলে!
হীনতা-দীনতা-জড়তায় ভরা হোক্ সে বাংলা নিজে—
বাঙ্গালীর কাছে রবে চিরদিন সোনার বাংলা সে যে!
দোষ থাক রাশি রাশি—
সোনার বাংলা আমাদের সে যে, তারে
মোরা ভালোবাসি।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ)

দেহের ছাঁদ

নারী-প্রসঙ্গে মহাকবি ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন,—'ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ'! অর্থাৎ গৃহে নয়নামৃত-রূপিণী লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন! নয়নের অমৃত-রূপিণী বলিতে আমরা বুঝি, যাঁহাকে দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয়—নয়নে পল্লব পড়ে না! কেমন নারীকে দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ হয়? এ-কথার উত্তর খুঁজিতে যদি আমরা বিশ্বের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিব, বেণীর ভাগ কবির মত—সুগঠনা নারীই নয়নের আনন্দরূপিণী! রঙের জৌলুশে যদি নয়ন মুগ্ধ হইত, তাহা হইলে ব্রুম-রুজ-পাউডার মাখিয়া সকল নারীই নয়নামৃতরূপিণী হইতেন! কিন্তু রঙ-মাখা কোনো নারীই বিশ্বের চোখে নয়নামৃত-রূপিণী বলিয়া সার্টিফিকেট পান নাই তো! সাঁওতালদের মসীপন কালো রঙের মেয়ের নিটোল গড়ন দেখিয়া সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—দেখিবার মত মূর্ত্তি বটে! দেহের গঠন দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়! দেহের সুকুমার গঠন বা ছাঁদ সত্যই দেখিবার বস্তু। নারীর লাবণ্য-সুষমা শ্রী বিরাজ করে অঙ্গের সমঞ্জস ছাঁদে বা গঠনে!

এই দেহ-ছাঁদ গড়িবার উপযোগী বিবিধ ব্যায়াম-প্রণালীর কথা আমরা বহু বার আলোচনা করিয়াছি। সে-সব প্রণালী যদি কাহারো কাছে কঠিন বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তবে আজ কয়েকটি সহজ ব্যায়াম-বিধির কথা বলি।

আজ যে ব্যায়াম-বিধির কথা বলিব, তাহাকে বলে কলা-বিধি। নৃত্য-কলার সঙ্গে আজিকার এ ব্যায়াম-বিধির খানিকটা মিল আছে। এ বিধিতে দেহখানি সত্যই কলা-সঙ্গত সুকুমার ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে। এ ব্যায়াম চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স হইতে অনুষ্ঠান করা উচিত। যাঁদের বয়স হইয়াছে,—দেহ বেটপ ছাঁদে বেমানান হইয়াছে, এ ব্যায়াম-বিধি-পালনে তাঁরাও দেহের বেমানান বেটপ ছাঁদ চাছিয়া-ছুলিয়া তনুশ্রীকে সুন্দর-সুঠাম করিয়া তুলিতে পারিবেন।



১। ডান পা তুলিয়া



২। বাঁ পায়ে ভর দিয়া



৩। বাঁ পা সামনের দিকে

১। এ বিধির প্রথমে—সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। তার পর ১ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান্ পা তুলিয়া বাঁ হাত কোমরের কাছে আনিয়া ডান হাত প্রসারিত করিয়া দিন। তার পর এমনি ভাবে অবস্থান করিয়া মৃদু নৃত্যছন্দে ক'পাক ঘুরুন্—ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে ঘুরিবেন। তার পর বাঁ পা তুলিয়া ডান হাত কোমরের কাছে আনিয়া বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া বাঁ দিকে ঘুরিতে হইবে ক'পাক। এ ব্যায়াম করুন পাঁচ মিনিট।

২। এবার ২ নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ডান পা পিছন-দিকে তুলিয়া প্রসারিত করিয়া, দুই হাত সামনের দিকে তুলিয়া ঘুরিতে হইবে; তার পর আবার ডান পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাঁ পা পিছন-দিকে তুলিয়া প্রসারিত করিয়া দুই হাত সামনের দিকে তুলিয়া ঘোরা। এ ব্যায়াম করিতে হইবে ক্রমপর্য্যায়ে চার-পাঁচ মিনিট।

৩। এবার ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পা সামনের দিকে, ডান পা পিছন-দিকে প্রসারিত করিয়া দু' হাত ছবির মত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া বেশ দ্রুত তালে অর্দ্ধ-চক্রাকারে নৃত্যছন্দে ঘোরা—প্রায় পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়াম কতকটা আমাদের দেশের সেকেলে সেই 'আনি-বানি-জানিনি'—খেলার মত।

৪। এবার ডান হাঁটু মুড়িয়া তার উপর ভর দিয়া অবস্থান—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। তার পর ধীরে ধীরে দুই হাত এক বার পিছন-দিকে পরক্ষণে সামনের দিকে প্রসারিত করিতে থাকুন প্রায় দু'-তিন মিনিট ধরিয়া। তার পর বাঁ হাঁটুতে ভর করিয়া ডান পা প্রসারিত করিয়া এমনি ভাবে দুই হাত সামনে-পিছনে প্রসারিত করা—প্রায় দু'-তিন মিনিট ধরিয়া।

৫। এবার দুই পা ফাঁক করিয়া অবস্থান—তার পর ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে দেহের উর্দ্ধভাগ নোয়াইয়া একবার ডান হাত উর্দ্ধে তুলিয়া বাঁ হাত বাঁ পায়ের কাছ পর্য্যন্ত আনা; পরের বারে বাঁ হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ডান হাত ডান পায়ের কাছ পর্য্যন্ত আনা। এ ব্যায়াম বেশ দ্রুত-তালে করিবেন অন্ততঃ তিন মিনিট।

৬। সোজা সিধা দাঁড়ান; তার পর ৬নং ছবির মত দুই হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া একবার ডান হাঁটু বাঁকাইয়া বাঁ পা প্রসারিত করিয়া বাঁ হাঁটুতে ভর দিয়া অবস্থান; পরক্ষণে বাঁ হাঁটু বাঁকাইয়া ডান পা প্রসারিত করিয়া ডান হাঁটুতে ভর দিয়া অবস্থান। এ ব্যায়ামও করিতে হইবে দ্রুততালে চার-পাঁচ মিনিট।



৪। ডান হাঁটু মুড়িয়া



৫। দেহের উর্দ্ধভাগ নোয়াইয়া



৬। দুই হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া

সুগৃহিণী

শাস্ত্রে বলেছে—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে!' কথাটি খুব খাঁটী। কারো বাড়ী গেলে ঘরের সাজসজ্জা-পরিপাটা শৃঙ্খলা প্রভৃতি দেখলে মানুষ সুখ্যাতি করেন গৃহিণীর; কর্ত্তার নয়। কারণ, কর্ত্তার দল পয়সা রোজগার প্রভৃতি কাজে এত বেশী নিমগ্ন থাকেন যে, তাঁদের পক্ষে ঘরের সাজ-পরিপাট্যের ব্যবস্থা সম্ভব হয় না!

বহু ধনীর বাড়ী গিয়ে দেখেছি, দামী আসবাব-পত্র আছে, কিন্তু সে সব এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে, তা দৃষ্টি-কটু ঠেকে! গৃহিণীদের ঔদাস্য-অবহেলা আর আলস্য বশতঃ বাড়ী-ঘরে পারিপাট্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে! পারিপাট্য-সাধনের জন্য দামী আসবাবপত্র বা দাস-দাসীর প্রয়োজন নেই! বহু কুটীর দেখেছি বেশ তকতকে নিকোনো; ঘটা-বাটি জলচৌকি তক্তা-পোষ পরিষ্কার এবং পরিপাটি করে রাখা; পিলসুজটি পর্য্যন্ত ঘষামাজা এবং যোগ্য স্থানে রাখা আছে! তেমনি আবার ধনীর প্রাসাদে দেখেছি, দামী আসবাবপত্রের কি লাঞ্ছনাই না হচ্ছে! এর জন্য দায়ী অলস-উদাস গৃহিণীরা।

পারিপাট্য-সাধনে মানুষের রুচি থাকা চাই, স্বীকার করি। রুচি থাকলেও অনেকের এদিকে লক্ষ্য নেই। তার কারণ, পারিপাট্য-সাধনের মেহনৎটুকু করতে তাঁদের বাধে। আলনায় শাড়ী-সেমিজ আছে কুণ্ডলী পাকানো হয়ে। কেন এমন হবে? শাড়ী ছেড়ে আলনায় রাখবার সময় সেখানি কুঁচিয়ে বা ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে কি-বা পরিশ্রম! সেমিজ-সায়া-ব্লাউশ এলোমেলো ঘাড়া-ঘাড়ি ভাবে না রেখে ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখতে গতর ক্ষয় হয় না! তবে কেন এ-কাজে এমন অবহেলা? নিজেদের চোখে বিশ্রী ঠেকে না?

সিনেমা দেখে কিম্বা নিমন্ত্রণাদি সেরে বাড়ী ফিরে একটু ক্লান্তি বোধ হয়, স্বীকার করি। সেজন্য অনেকে সিনেমা বা নিমন্ত্রণ সেরে এসে শাড়ী-ব্লাউশ ছেড়ে যা-তা করে রাখেন। আমরা বলি, ক্লান্তি তো হয়েছেই, তার উপর আর একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ঐ শাড়ী-ব্লাউশ গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতে কতই বা বেশী কষ্ট! অথচ গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখলে শাড়ী ভালো থাকে—ঘাঁটাঘাঁটিতে নষ্ট হয় না!

অনেক বাড়ীতে দেখেছি—ধনীর দাসদাসীওয়ালা বাড়ীতে—কখন বেলা বারোটায় হয়তো খাওয়া-দাওয়া চুকেছে—খাবার-ঘরে এঁটো বাসন পড়ে ব্যাড়-ব্যাড় করছে। চাকর-বাকর খেয়ে-দেয়ে ঘুমোয়; তার পর কলে জল এলে এঁটো বাসন কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজে, বুঝি। কিন্তু চাকর-বাকররা এগুলি কলতলায় রেখে ঘুমোতে যেতে পারে তো! ঘরের মধ্যে এঁটো বাসন পড়ে থাকলে মাছি ভন্‌ভন্ করবে। এটুকু না হলেই নয়?

খাওয়া-দাওয়া চোকবামাত্র এঁটো বাসন-কোশন মেজে তুলে সাজিয়ে রাখা উচিত। তাতে বাড়ী-ঘর নোংরা হয় না; মাছির উৎপাত বন্ধ থাকে—কাজেই রোগের ভয়ও থাকে কম!

এঁটো বাসন-কোশন কলতলায় ফেলে রাখা উচিত নয়! কাক-চিলে এঁটো কাঁটা ছড়িয়ে সৃষ্টি রসাতল করবে! এ-সব ছোটখাট ব্যাপার, অথচ এ-সবে অবহেলা অত্যন্ত বেশী।

তার পর সোফা-কৌচ টেবিল-আয়না-ছবি—এ-সব প্রত্যহ ঝাড়া চাই। না হলে ধূলা জমে এমন হয়ে থাকে যে, তাতে হাত দিলে হাত নোংরা হয়। ঘরের কোণে যে ঝুল জমে—মাকড়সা জাল পাতে—কেন তা হবে? মাসের মধ্যে একটি দিন অন্ততঃ রুটিন মেনে কষ্ট করে ঘরের ঝুল ঝাড়াতে হবে! না হলে ঝুল জমে জমে ঘরের শ্রী হবে কদর্য্য। তার উপর ঐ নোংরা ঝুলের দরুণ মশা-মাছির উৎপাত ঘটবে—তা থেকে অসুখ-বিসুখ হওয়া বিচিত্র নয়!

নোংরা ঘরে মা-লক্ষ্মী পদার্পণ করেন না—এ-কথার অর্থ খুব সহজ! অর্থাৎ ঘর-দ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন ভালো থাকবে। মনের স্বাস্থ্য অযথা পীড়িত হবে না। সে জন্য সকলেই থাকবেন মনের সুখে—আরামে। আমাদের এ কথা সত্য কি না, একবার পরখ করে দেখলেই সুগৃহিণীরা তা বুঝতে পারবেন।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

গত মাসে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক দিকে যেমন চীনের মনোভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে মিত্রপক্ষের আক্রমণ বৃদ্ধির ফলে নতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাচ্যখণ্ডে—

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপে সৈন্য নামাইতে যেমন সমর্থ হইয়াছে (৩রা কার্ত্তিক), তেমনই মার্কিণ-বিমান ফরমোজা দ্বীপে প্রায় সপ্তাহ-কাল ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। ফরমোজার যুদ্ধে জাপানের প্রায় ১ শত বিমান ধ্বংস হইয়াছে। ইহা ছাড়া সিঙ্গাপুর, বালিক পাপেন (বোর্ণিও), সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, হংকং, কৌলুন প্রভৃতি জাপ-অধিকৃত স্থানের উপর আমেরিকার বিমানকে যুগপৎ আক্রমণ করিতে দেখিয়া মনে হইতেছে, এডমিরাল নিমিজ, জেনারল ম্যাক আর্থার ও জেনারল ষ্টিলওয়েল এক-মত হইয়া একই রণপরিকল্পনা-অনুসারে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কায করিতেছেন। জাপানীরা ফিলিপাইন হইতে যে নৌবহর সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, তাহারা তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী রক্ষাগণ্ডীর মধ্যেই থাকিতে চায়। জাপানের নৌবহর-শক্তি পৃথিবীতে তৃতীয়-স্থানীয়। এই নৌবহর যেন আপন গৃহপার্শ্বস্থ সমুদ্রে থাকিয়া চরম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ফরমোজার যুদ্ধেও এই নৌবহর বাহির করা হয় নাই। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জাপ নৌবহরের ক্ষতির হিসাব এই—

জাহাজ নষ্ট—১১০৬
সম্ভবতঃ নষ্ট—৫৩০
জাহাজ ক্ষতি—১৩৭১

মাত্র সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের ১৪ শত বিমান নষ্ট হইলেও মার্কিণ নৌসেনাপতি এডমিরাল নিমিজ মনে করেন যে, জাপানের এখনও নূতন বিমান নির্ম্মাণের শক্তি আছে, তবে উপযুক্ত বৈমানিক তৈয়ারীর শক্তি বোধ হয় তাহার হইবে না।

জাপান কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে আপনার পরাজয় যেন অনিবার্য্য মনে করিতেছে। জাপ এডমিরাল Ryozo Nakanura 'প্যাসিফিক' পত্রে লিখিয়াছে—"The loss of Indoesia is inevitable and that to allow the Allies to gain a foothold on Sumatra would hasten the fall of the East Indies"—ইন্দো-এশিয়া যে জাপানের করচ্যুত হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মিত্রপক্ষ সুমাত্রায় পদার্পণ করিতে পারিলেই পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পতনে আর বিলম্ব হইবে না। মিত্রপক্ষকে বোর্ণিও ও সুমাত্রার তৈলকেন্দ্রগুলিকে মাত্র নয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানে এবং বঙ্গোপসাগরে প্রায়শঃ জাপ-জাহাজগুলিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নূতন পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভারত-সীমান্তে—

ভারতীয় সীমান্তে যুদ্ধের পরিবর্ত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। গত মাসে টিড্ডিম ও বুথিডংএর নামই বারম্বার শুনা গিয়াছে। চীন-পাহাড়ে জাপানীরা প্রবল প্রতিরোধ করিলেও টিড্ডিম তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই। আরাকান এখনও জাপ-মুক্ত হয় নাই।

চীনে এ চক্রান্ত কাহার?—

চীন হইতে আমেরিকায় ফিরিয়া মিঃ ব্রুক এটকিনসন (৩১শে অক্টোবর) 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Inside China, it represents a political triumph of a moribund anti-democratic regime that is more concerned with maintaining its political supremacy than driving out the Japanese." চীনের অভ্যন্তরে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি জাপানের

সহিত মিটমাট করিবার জন্য ব্যস্ত। কেবল কমুনিষ্টরাই জাপানের সহিত লড়াই করিতে চায়।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি চীনের নিকট প্রস্তাব করেন যে, জেনারেল ষ্টিলওয়েলের পূর্ণ অধিনায়কত্বে চীনা সৈন্যবাহিনী পরিচালিত হউক। মার্শাল চিয়াং কাইশেক ইহাতে বাধা দেন ও দাবী করেন, আমেরিকা ঋণ ও ইজারা সর্ত্তে যে সকল সমর-সম্ভার চীনে লইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হউক। চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, আমেরিকা কমুনিষ্টদিগের সহিত মিতালী করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে না। জেনারেল ষ্টিলওয়েল চীনে জাপানীদিগের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু মার্শাল চিয়াং কাইশেক এরূপ আশা পোষণ করেন যে, তাঁহাকে জাপানের সহিত যুদ্ধই হয়ত করিতে হইবে না।

চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে মার্শাল চিয়াং যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে মিত্রপক্ষের কোন উল্লেখ নাই। তিনি মিত্রপক্ষের নিকট সাহায্য লাভের জন্য আবেদনও করেন নাই। চুংকিং সরকারের অভিযোগ যে, চীনকে আমেরিকা পর্য্যাপ্ত সাহায্য করে নাই ("pitifully inadequate")।

১৬ই আশ্বিন চীনা জাতীয় পরিষদ বলেন—"American supplies to China from Pearl Harbour to the present time would not be sufficient to sustain a single British or American division in combat for a week."—পার্ল হারবারের যুদ্ধের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চীনকে আমেরিকা যে রসদ পাঠাইয়াছে, তাহা দ্বারা একটি বৃটিশ বা মার্কিণ ডিভিসন সৈন্য ১ সপ্তাহও যুদ্ধ চালাইতে পারে না।

চীন, আমেরিকা ও ইংরেজে বিচ্ছেদ ?—

চীনা রণ-নায়কত্ব হইতে জেনারেল ষ্টিলওয়েল অপসারিত হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজ, চীনা ও মার্কিণ সৈন্য একই রণাঙ্গনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আর যুদ্ধ করিবে না। এখন হইতে এই ত্রিশক্তি পৃথক্ পৃথক্ রণাঙ্গনে আপন আপন সৈন্য ও অস্ত্রবল লইয়া জাপানের সহিত লড়িবে। ইংরেজরা যে আমেরিকানদের সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে, ইহাতে মার্কিণ নৌ ও সামরিক মহল যেন সম্মত নয়। তাহারা বলিতে চায় যে—মার্কিণ-নেতৃত্বে যখন মিত্রপক্ষ রণাঙ্গনে সাফল্য লাভ করিতেছে, তখন এই মার্কিণ-নেতৃত্বে অরুচি হইলে অবস্থা বড়ই মন্দ হইবে। আমেরিকা দাবী করে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মাত্র মার্কিণ-যুদ্ধ !

জাপ-সাফল্যে উৎকণ্ঠা—

অনেকে মনে করিতেছেন যে, সমুদ্রের দিক্ হইতে জাপ-অধিকৃত চীনকে আক্রমণ করিবার জন্য জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে এক মার্কিণ সৈন্যদলের অধিনায়ক-পদ প্রদান করা হইবে। মার্শাল চিয়াং কাইশেক চীনা জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করেন (২৪শে আশ্বিন), তাহাতে আভাস দেন যে—"Fighting will be difficult along the sea-coast and railways"—সমুদ্রোপকূল ও রেলওয়ে অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা সুকঠিন হইবে। এ সময় দক্ষিণ-চীন জাপসৈন্য প্রায় সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। হুনান-কোয়াংশি রেলপথ এখ বিপন্ন, জাপান সমুদ্রতটবর্ত্তী ফু-কিন প্রদেশের রাজধানী ফুচা আক্রমণ করিয়াছে। জাপান আশঙ্কা করে যে, ফু-কিনে মিত্রপক্ষে সৈন্য অবতরণ করিবে। তিন দিন পরের সংবাদ, জাপান ফুচা (৫ই অক্টোবর) দখল করে এবং কোয়াংশি প্রদেশের উইপিং সহ প্রবেশ করে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপা এডমিরাল নিমিজ স্বীকার করেন যে, পূর্ব্ব-চীনে জাপানের এই অগ্রগা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। জাপসৈন্য এই ভাবে সাফল্য লাভ করি ঐ অঞ্চলে মার্কিণ সমর-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি বলেন—জাপা নূতন যে মতলব করিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের ঘাঁটি সংগ্রহ ক কঠিন হইবে, তবে যথেষ্ট জাহাজ পাইলে আমাদের ঘাঁটি জোগা করিতে কষ্ট হইবে না। "I feel we must make landing on the China cóast to secure land bases larg engouh and close enough to the Japanese Empir in order to deploy the huge air forces we sha have at our disposal."

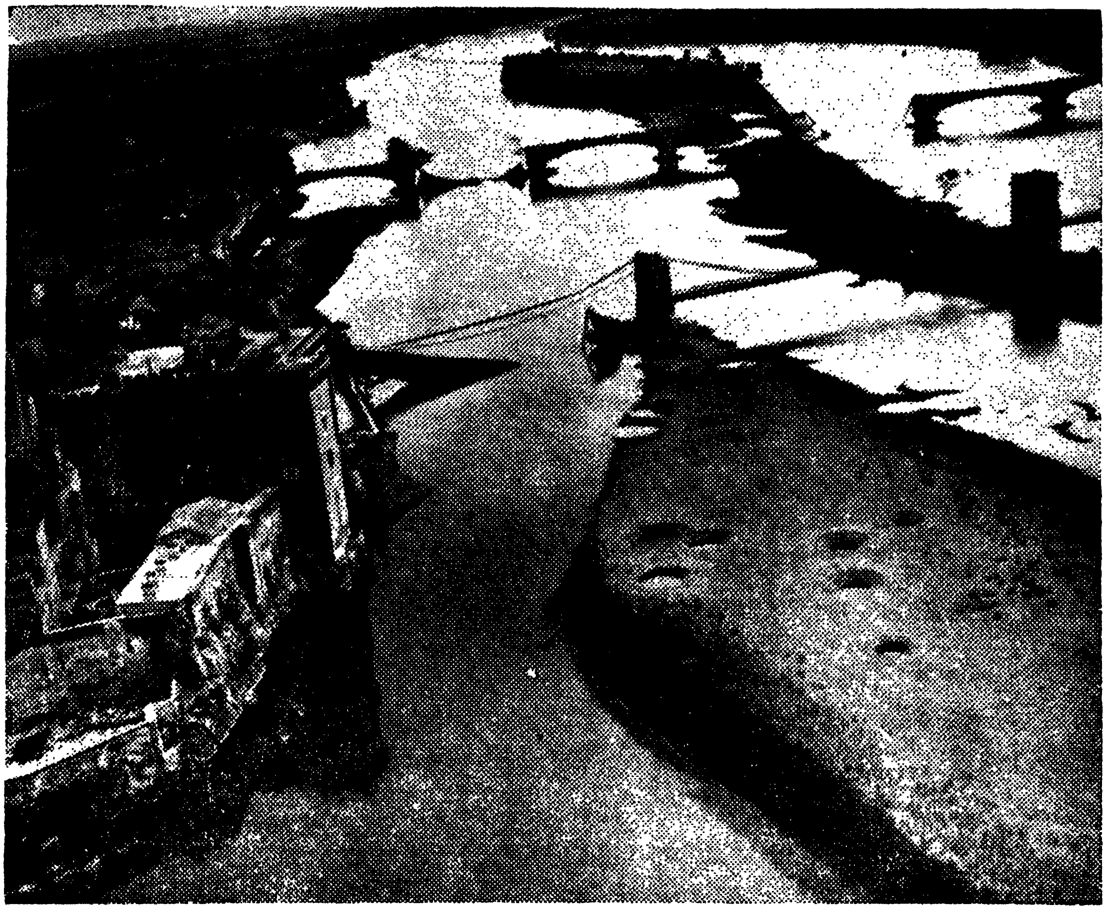
জাপান সম্বন্ধে বৃটেনে মিষ্টার চার্চ্চিল পর্য্যন্ত একটু উদ্বি হইয়াছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশনে (৩১শে অক্টোবর জানাইয়াছেন—নাৎসী-শক্তি খর্ব্ব হইবার পরেও অনিশ্চিত কা জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। মরিয়া ও বর্ব্বর প্রকৃতির জা যে সহসা আত্মসমর্পণ করিবে বা তাহাদের দেশে সহসা কোন রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটিবে, এরূপ আশায় নিশ্চিন্ত থা চলে না। জাপ-সমস্যার কথা সামরিক সর্ব্ব দিক্ দিয়া বিচার করি এরূপ আশা করা সমীচীন হইবে না যে, হিটলার ধ্বংসের ১৮ মাসে অপেক্ষা কম সময়ে জাপানের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা হইবে।

ফ্রান্স কি করিবে ?

১৮শে আশ্বিন জেনারল ডি-গল এক বেতার বক্তৃতায় বলেন-যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তির প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গ যে প্রকারে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, তাহাতে অনেক ফরাসী বিস্মিত হইবেন যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, আমাদের উৎপন্ন সম্পদাদি পুনর্গঠনের জ মিত্রশক্তিবর্গ দ্রুত সাহায্য করিবেন, তাঁহারা আত্মপ্রতারণা করিতে ছেন। যুদ্ধরত জাতিবর্গের প্রথম স্বার্থ আপন আপন যুদ্ধের খর জোগান, এই ব্যয়ভার ফ্রান্সের উপরেও চাপান হইয়াছে। এ সকল জা প্রথমে আপন আপন স্বার্থের প্রতি সচেতন হইয়া নিজস্ব নীতি অনুবর্ত্তন করিবে। আরও এক কথা, এ যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শত্রু বিষম পরাজিত হইলেও ব্রেডা হইতে বেলফো পর্য্যন্ত স্থানে তাহারা আপনাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইটালীতে প্রবল বাধা দিতেছে, পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক দেশগুলি মরণ-পণ যুদ্ধ করিতেছে এবং স্বদেশেও তাহারা শেষ পর্য্যন্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

জেনারল ডি-গল ইহাও বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ-হস্তে ৩ ল ফরাসী নিহত এবং ৩০ লক্ষ বন্দীকে ফ্রান্স হইতে অন্যত্র প্রেরণ ক হইয়াছে।

৩১শে আশ্বিনের রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বর্ত্তমান ফ্রান্সে মনোভাব সম্বন্ধে যে সংবাদ বণ্টন করিয়াছেন, তাহাতে ডি-গলে



দক্ষিণ-ফ্রান্সে রোন-নদীর উপরস্থিত সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া মিত্রপক্ষের বৈমানিকগণ জার্ম্মাণদিগের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে

মনোভাব প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ফ্রান্সের কতকগুলি লোক না কি জার্ম্মাণ-বিরোধী পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমেরিকা, বৃটেন ও রুশিয়া যে পরামর্শ করিতেছে, ফ্রান্সকে তাহাতে যোগ দিতে দেওয়া হইতেছে না। অথচ সন্ধি হইলে জার্ম্মাণীর যে অবস্থা হইবে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতি তাহার উপরে ভর রাখিয়া নির্ণীত করিতে হইবে। জার্ম্মাণীকে দুর্ব্বল করিয়া ফ্রান্সকে পুনরায় শক্তিশালী করিবার সুযোগ যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপন স্বার্থে ফ্রান্স বৃটেন, রুশিয়া, আমেরিকার সহিত অধিকতর মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু মিত্রপক্ষ জার্ম্মাণীকে দুর্ব্বল করিয়া ফ্রান্সকে সবল করিবার নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া ফরাসীরা এখনও নিঃসংশয় নয়।

পশ্চিম রণাঙ্গনে :—

ইহা সত্য যে, ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদল ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়াছে, ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল শত্রু-মুক্ত করিয়াছে, জার্ম্মাণদিগকে বেলজিয়ম হইতে এবং হল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে; কিন্তু জার্ম্মাণরা তাহাদের স্বদেশসীমান্তে ফিরিয়া প্রবল প্রতিরোধ করিতেছে।

আয়াচেনের (জার্ম্মাণসীমান্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী) ধ্বংসস্তূপ দখল করিতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের প্রায় ১ মাস সময় লাগিয়াছে। ন্যানসির উত্তর-পশ্চিমে জার্ম্মাণরা এখনও প্রবল প্রতিরোধ করিতেছে। এন্টওয়ার্পের উত্তর-পূর্ব্বেও তাহারা বাধা দিতেছে। ১৫ই আশ্বিন মিত্রপক্ষ ক্যালে দখল করিয়া ডোভারে মহা উৎসব করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট হইতে এই তারিখ পর্য্যন্ত এখান হইতে জার্ম্মাণীর অতিকায় কামান ২৩ শত শেল নিক্ষেপ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের তটস্থিত বৃটেনের বন্দরগুলিতে ত্রাস সঞ্চার করে। এই ত্রাস-মুক্ত হইয়া ইংরেজরা উৎসব করিলেও জার্ম্মাণীর ভি-১ বোমা ও রকেট বোমার আক্রমণ হইতে তাহারা এখন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ১৫ই জুন (১৯৪৪) হইতে বৃটেন এই উড়ন্ত বোমার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, তাহার উপর ঐরাবত আকারের নাৎসী "ভি-২" রকেট বোমা ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া পড়িতেছে। এই বোমার আড়াই শত মাইল পাল্লার মধ্যে বার্ম্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, হাল প্রভৃতি স্থান পড়ে। ক্ষতির কথা জানিয়া শত্রু উল্লসিত হইবে মনে করিয়া ইংরেজরা নূতন বোমা আক্রমণের ফলাফল প্রকাশ করিতেছে না।



ভূমধ্যসাগরের মিত্রপক্ষের বিমান-ঘাঁটিতে সোভিয়েট ও মার্কিণ বিমান-নায়কগণ রুশিয়ায় নূতন মার্কিণ বিমান-ঘাঁটি স্থাপিত হইবার পর মার্কিণ ও রুশবৈমানিকগণ পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করিতেছে।

জার্ম্মাণী বাধা দিতেছে ঃ—

ডি-গলের ন্যায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিলও স্বীকার করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী পুনরায় প্রবল বাধা দিতেছে। ফলে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি মন্দীভূত হইয়াছে। ইটালী, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে ইংরেজ ও ক্যানাডিয়ান সৈন্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে ("in Italy and Holland and Belgium very heavy losses have been sustained)। প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় জার্ম্মাণরা তাহাদের "ষ্টর্ম ট্রূপ" নিয়োগ করিতেছে। মার্কিণ প্রধান সেনাপতি স্বীকার করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ এই দলের খুব বেশী সৈন্যকে বন্দী করিতে পারে নাই।

২৪শে আশ্বিন এই মর্ম্মে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, মিত্রপক্ষ খোদ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করে। এই দিনই জার্ম্মাণ বেতারে হিটলার তাঁহার দেশের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন— "ঘৃণ্য শত্রুরা যে অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে, তাহাতে স্বদেশ বিপন্ন। এই বিপদে আত্মদানের অত্যুগ্র সঙ্কল্পের প্রশংসনীয় উদাহরণ তোমরা দেখাইয়াছ, সর্ব্বরণাঙ্গনে ও স্বগৃহে তরুণগণ যাহা করিয়াছে, তাহা তাহাদেরই উপযুক্ত।...আমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্ত শত্রুর নির্ম্মম পরিকল্পনার কথা আমাদের অবিদিত নাই। এ জন্ত অধিকতর অকুণ্ঠ সংকল্পে আমাদিগকে এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে।"

জার্ম্মাণীর গৃহভেদের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল— পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে বারম্বার পরাজয় ও জনক্ষয়ের ফলে জার্ম্মাণদের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু "পিতৃভূমি" দুই দিক্ হইতে বিপন্ন দেখিয়া তাহারা যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বাঞ্চলে রুশ-অভিযান—

য়ুরোপের পূর্ব্ব দিকে বিজয়ী সোভিয়েট বাহিনী বাল্টিকতটে পৌছিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, জার্ম্মাণরা তাহাতে প্রবল বাধা প্রদান না করিলে এত দিন বার্লিনে লাল পতাকা উড়িত। বর্ত্তমানে এক দিকে যেমন রুশ সৈন্ত লিথুয়ানিয়ার ১২০ মাইল রণাঙ্গন হইতে পূর্ব্ব-প্রুশিয়া দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে, অন্য দিকে তেমনি ওয়ারশর উত্তরে আক্রমণ করিতেছে এবং ডানজিগে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছে। উত্তরে জার্ম্মাণদের শক্তিশালী নৌঘাঁটি পেটসামো রুশরা দখল করিয়াছে (২১শে আশ্বিন)। ১৫ই আশ্বিন রুশসৈন্ত একসঙ্গে যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গারীর ট্রান্সিলভেনিয়া প্রদেশে প্রবেশ করে। ৩রা কার্ত্তিক তাহারা বেলগ্রেড দখল করিতে সমর্থ হইলেও

জার্ম্মাণ-হাঙ্গেরীয় ব্যূহভেদ করিয়া এখন পর্য্যন্ত তাহারা বুদাপেস্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

দক্ষিণাঞ্চলে—গ্রীস রাহুমুক্ত—

য়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলেও জার্ম্মাণী প্রবল প্রতিরোধ করিলেও মিত্রপক্ষের ভেদ ও রণনীতি ব্যর্থ করিতে পারিতেছে না। সাড়ে ৩ বৎসর নির্ব্বাসিত থাকিয়া (গ্রীসের পরাজয় এপ্রিল, ১৯৪১) ২৭শে আশ্বিন এথেন্স জয়ের পর গ্রীক সরকার রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রীস জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত। এলবেনিয়ায় মিত্রপক্ষ সারান্দে বন্দর দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইটালীতে মিত্রসৈন্য পো-তটে উপনীত হইয়াছে। মস্কো ও বৃটিশ বেতার-কেন্দ্র অষ্ট্রীয়াবাসীকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার পরামর্শ দিয়া বলিয়াছে—"All German administration officers in Austria must get bullets through their hearts"—এ প্রচারের ফলাফল জানা যায় নাই।

চাহিতেছে। কিন্তু শান্তির সময়েও তাহার ক্যাসপিয়ান তৈলখনি হইতে যথেষ্ট তৈল বাহিরে প্রেরণ করিবার সুবিধা ছিল। বর্ত্তমানে পারস্যের তৈল লইবার কি গূঢ় অভিসন্ধি তাহার আছে, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে না। পারস্যের তৈলের বন্দোবস্ত য়্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর ছিল, বর্ত্তমানে কি রুশিয়াও আমেরিকা-ইংরেজকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতে চায়?

মিশরে ওয়াফদ দলের মন্ত্রিমণ্ডলকে রাজা ফারুক পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। মিশরের স্বাধীনতা-সূর্য্য জগলুল পাশার স্থলাভিষিক্ত নাহাস পাশার সহিত যুক্ত-আরব-সমস্যা লইয়া মিশর-রাজের মতভেদ হইয়াছিল, ইহাই প্রকাশিত সংবাদ। মাত্র মিশর নহে, ট্রান্সজর্ডেনিয়ার মন্ত্রিসভারও পতন হইয়াছে। এই স্থানে কিছু দিন পূর্ব্বে অজ্ঞাত দেশের কতকগুলি লোক প্যারাসুটে অবতরণ করে। সিরিয়ার মন্ত্রিসভারও পতন হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের ইহুদী-বিপ্লবীরা লর্ড ময়েনকে হত্যা করিয়াছে। এই সকল বিচ্ছিন্ন রাজ-



প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট



রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলের মিঃ ডিউইর ভবন—দ্বারদেশে মিঃ ডিউই, তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র

এই সকল পরাজয়ের সুযোগে সংবাদ-প্রচার-প্রতিষ্ঠানগুলি সংবাদ দিয়াছেন, হিটলার এইবার বার্চেৎসগাদেনে আপনার কোষ্ঠী বিচার করিতে গিয়াছেন।

পূর্ব্ব-এশিয়ার সংবাদ—

পারস্য দেশের কেরোসিন ও পেট্রলের জন্য রুশিয়া ও আমেরিকা আগ্রহ দেখাইতেছে। পারস্য সরকারের নিকট রুশ সরকার উত্তর-পারস্যের এবং আমেরিকা পারস্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের তৈলখনির বন্দোবস্ত চাহিয়াছে। পারস্য সরকার বলিয়াছেন যে, এ সকল খনি হইতে যথোপযুক্ত ভাবে তৈল নিষ্কাশণের ব্যাপক কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার মত ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য যখন তাঁহাদের নাই, তখন এ সকল বৈদেশিক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন। রুশিয়া না কি যুদ্ধের পর তৈল রপ্তানী করিবার উদ্দেশ্যে এই সুযোগ

নৈতিক পরিবর্ত্তন ও প্রচেষ্টার মূলে কোন্ গূঢ় রহস্য আছে, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা এখন সম্ভবপর নয়।

মিঃ রুজভেল্টের পুনর্নির্ব্বাচন :—

মিষ্টার রুজভেল্ট পুনরায় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন রিপাবলিকান দলের মিঃ ডিউই। এই নির্ব্বাচনে মিত্রপক্ষের শক্তিবর্গ উল্লসিত হইয়াছেন। মিঃ রুজভেল্টের নির্ব্বাচিত নীতি ও পদ্ধতিতে বর্ত্তমানে আমেরিকা বৃটেন ও চীনকে যে ভাবে সাহায্য করিতেছে, যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় য়ুরোপ ও এশিয়ায় আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহার পরাজয়ের ফলে হয়ত সমস্তই ব্যর্থ বা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত। মিঃ ডিউইও মিঃ রুজভেল্টের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীতারানাথ রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শারদীয়া পূজা

এত দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগের মধ্যেও আমরা বাঙ্গালী জননীর পূজার্চ্চনা ভুলি নাই। অন্ন-বস্ত্রের এত অভাব, তবু এবারও হাসিমুখে মায়ের পূজায় অর্ঘ্য সাজাইয়াছি। দুর্গতি-নাশিনী জননী যে আমাদের দুর্গতি মোচন করিবেন, আমাদের এ



বিজয়া

বিশ্বাস কোনো দিন ঘুচিবার নয়। বিজয়া-দশমীর দিনে সকলে মিলিয়া সেই নদীর তীরে গিয়া মায়ের পায়ে নিবেদন জানাইয়াছি—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে!

নাগপুর হাইকোর্টের হাল

শ্রীযুত গোকুলচাঁদকে (বেতুল, মধ্যপ্রদেশ) মধ্য-প্রাদেশিক সরকার ভারতরক্ষা-বিধি-অনুসারে আটক করেন। হাইকোর্টে শ্রীযুত গোকুলচাঁদ আবেদন করিয়া বলেন যে, তিনি কোন প্রকারে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্ন-সঙ্কুল করেন নাই। আটক-বন্দী পরিষদ-সদস্য শেঠ দীপচাঁদ গোখ্রির ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি—ইহাই তাঁহার অপরাধ। ৭ই কার্ত্তিক তারিখে নাগপুর হাইকোর্ট সরকারকে আটক-আদেশ আদালতে দাখিল করিতে বলেন। সরকার তাহা দাখিল করেন নাই। তবে বেতুলের ডেপুটী কমিশনার হাইকোর্টকে একখানি পত্র দিয়া বলেন যে, নাগপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে। বিচারপতি এই আচরণের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—ডেপুটী কমিশনারের এই প্রকার উত্তর, এ প্রদেশে যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া বিচারপতি শ্রীযুত গোকুলচাঁদকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ইহাতে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, শ্রীযুত গোকুলচাঁদকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় গ্রেফ্‌তার করেন।

ইহারই মাত্র ১২ দিন পূর্ব্বে এই হাইকোর্টে অনুরূপ এক ব্যাপার ঘটে। নাগপুর সেন্ট্রাল জেলের আটক-বন্দী মিঃ বি, এন সাওজির রিভিশান-আবেদন হাইকোর্টের আদেশানুযায়ী হাইকোর্টে আনিতে অসম্মত হওয়ার জন্য কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারলের বিরুদ্ধে আদালত-অবমাননার অভিযোগ গঠন করা হয়। কৈফিয়ৎ-স্বরূপ ইন্‌স্পেক্টর জেনারল বলেন, যখন এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন, তখন এই আটক-বন্দীর পুনর্ব্বিচারের আবেদন হাইকোর্টে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই! হাইকোর্টের বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে, "We regret to notice a lamentable tendency of late of attempts by executive officers to set themselves above the High Court."

এই হাইকোর্টই আর-একটি মামলায় এডভোকেট জেনারলকে বলেন যে, বন্দীকে (জনৈক আটক-বন্দী) তাহার উকীলের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হউক। উত্তরে সরকার বলেন, বন্দীকে এ জন্য জিলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

এ সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, হাইকোর্ট যেন তামাসার রঙ্গপীঠ হইয়া পড়িয়াছে! হাইকোর্টের সহিতই যদি এরূপ আচরণ চলে, তাহা হইলে ভারতের বিচারপ্রার্থী জন-সাধারণের ন্যায্য অধিকার কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারত-কুৎসা

মিষ্টার বিভারলি নিকলস্ শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিক এবং তিনি ক'খানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। সম্প্রতি "ভার্ডিক্ট অন্ ইণ্ডিয়া" (Verdict on India) নামে তাঁহার একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এক বৎসর এ দেশে সরকারী ছায়ার আশ্রয়ে ঘোরাফেরা করিয়া এবং এ দেশের দানাপানী খাইয়াই ভারত সম্বন্ধে বিচক্ষণ বনিয়া গিয়া ছাপিয়াছেন—

"ভারতে অস্পৃশ্যদের যে-সব শত্রু আছে, তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীর চেয়ে বড় শত্রু আর নাই।"

তাঁহার মতে ভারতে ছয়টি মাত্র উৎকৃষ্ট-মগজওয়ালা মানুষ আছে—তাহার মধ্যে ডাঃ আম্বেদকার সেই সব মগজওয়ালাদের এক জন!

হিন্দুধর্ম্মের নিন্দায় বইখানি একেবারে ভরপুর। এক জায়গায় মন্তব্য—"তরুণ ভারত কারখানায় যাইতে চায়, কিন্তু নেতারা তাহাদিগকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।"

"সত্যের প্রতি গান্ধীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। লোকটি অতি দাম্ভিক, ক্ষুদ্রচেতা ও অত্যন্ত পরমত-অসহিষ্ণু। তাহার প্রভাব স্তিমিত। তাঁহার অহিংসার অপর নাম উগ্র দম্ভ। আমেরিকার দিকে এক-চোখ রাখিয়া গান্ধী সর্ব্বদাই কথা বলেন।"

মিষ্টার জিন্না, পাকিস্থান ও মুসলমানদের প্রশংসায় বিভারলি একেবারে 'ক্লেভারলি'। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—এই স্বপ্ন-সাম্রাজ্য (পাকিস্থান) এক দিন গগন হইতে নামিয়া আসিয়া বিশ্ব-মানচিত্রের উপর সরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে।

কংগ্রেস সম্বন্ধে মন্তব্য—"বর্ত্তমান জগতে নির্জ্জলা ফ্যাসিজ্‌মের চূড়ান্ত উদাহরণ।"

ইংলণ্ডের সংবাদপত্র-মহল পর্য্যন্ত বইখানির নিন্দা করিয়াছেন। 'ডেলি মেল' লিখিয়াছেন—"এই বইয়ের তুলনায় মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' অনেক-বেশী যুক্তিপূর্ণ ও মৃদু।"

—

জওহরলালের জন্ম-দিবস

ইংরেজ-বন্দী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ৫৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইংলণ্ডের বড় বড় শ্রমিক-নেতা বড় বড় বাণী প্রেরণ করিয়া বিক্ষুব্ধ ভারতকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ ফেনর ব্রকওয়ে বলিয়াছেন—পণ্ডিত নেহরুকে যাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগের চেয়ে এই নেতা সামর্থ্যে ও ব্যক্তিত্বে অনেক বড়। জওহরলালের তুলনায় মিঃ আমেরী বামন! ডাঃ হেরল্ড লাস্কী বলিয়াছেন—স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী না হইয়া পণ্ডিতজী আজ কারাগারে, ইহাতেই বৃটিশ-শাসন-তন্ত্রের ব্যর্থতা প্রমাণিত।

এ সকল মিঠা বুলি ভারত কম শুনে নাই। কিন্তু এ সকল কথায় আশঙ্কা যত অধিক, আন্তরিকতা তত অধিক নহে। ভারতের সম্বন্ধে পরলোকগত মিঃ ম্যাকডোনাল্ড-জাতীয় অনেকে অনেক মিষ্ট কথা বলিতেন! কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা দেখি, পণ্ডিত জওহরলালের পরম মিত্রস্থানীয় সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌ পর্য্যন্ত সময় হইলে বৃটিশ স্বার্থেরই সন্ধান করিয়া চার্চ্চিল-আমেরীর সংস্করণ হইয়া দাঁড়ায়!

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত-বিদ্বেষ

নাটালে এক নূতন অর্ডিন্যান্স (The anti-Indian residential Property Regulation Draft Ordinance) আইনে পরিণত করিবার জন্ম ক্ষিপ্র প্রয়াস চলিতেছে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে (১) ভারতবাসীদের জন্ম নিষিদ্ধ অঞ্চলের বাহিরেও ভারতবাসীর পক্ষে ভূ-সম্পত্তি গ্রহণের অতি সামান্ম মাত্র অধিকার থাকিবে। (২) এই অর্ডিন্যান্স মাত্র ডারবান নহে, সমগ্র প্রদেশে প্রয়োগ করা হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা য়ুনিয়ন পার্লামেন্টে যখন 'পেগিং আইন' পাশ হয় (এই বিধি-অনুসারে ভারতবাসীদের জন্ম একটি পৃথক্ অঞ্চল ঠিক করিয়া দেওয়া হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, এই অঞ্চলের মধ্যেই ভারতবাসীকে থাকিতে হইবে; এবং এই অঞ্চলের বাহিরে কোন ভারতবাসী ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না), তখন প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় এ-বিধিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, ইহাতে কেপটাউন-চুক্তির খেলাপ হইতেছে। ইহার পর নাটাল কংগ্রেসের কয়েক জন নেতা আপনাদের ব্যক্তিগত সামান্ম সম্পত্তি রক্ষার লোভে প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত প্রেটোরিয়া-চুক্তি করেন। সে চুক্তি অনুসারে নাটাল-প্রবাসী দুই লক্ষ ভারতবাসীর ভাগ্য নাটাল প্রাদেশিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ এবং ভারতবাসীকে য়ুনিয়নের প্রজাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহুদী, গ্রীক, সিরিয়াবাসী, এমন কি, জার্ম্মাণরাও য়ুনিয়নের পূর্ণ প্রজাধিকার পায়, কিন্তু বৃটিশ প্রজা হইলেও ভারতবাসীকে প্যারেয়া করিয়া রাখা হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানীরা এখানে এ অধিকার পাইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মিত্র বলিয়া বর্ত্তমানে চীনাদিগের সম্বন্ধেও বিশেষ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর যুদ্ধপ্রচেষ্টার গাল-ভরা সুখ্যাতি করিলেও ন্যায্য অধিকার প্রদানের বেলা ভারতবাসীকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিতেছে যে, ভারত বৃটেনের সেবাদাসী মাত্র; এই দাসীর জন্ম বৃটেনের সহিত সমান অধিকার-প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সহিত ইংরেজ কলহ করিতে পারে না।

—

ভারতের প্রতিশোধ-ব্যবস্থা

দক্ষিণ-আফ্রিকা য়ুনিয়নের এই আচরণের ফলে ভারত সরকার ভারতে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীদিগের সম্বন্ধে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। এই মর্ম্মে ভারতীয় কেন্দ্রী পরিষদের অধিবেশনে (২০শে কার্ত্তিক) ডাঃ খারের প্রস্তাব সর্ব্ব দলের সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এবং মসলেম লীগ-দলের সহকারী নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁন দাবী করেন যে, অর্থনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়, ভারতীয় হাই কমিশনারকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলা হউক এবং রেসিপ্রসিটি-বিধির এরূপ ভাবে সংশোধন করা হউক, যাহাতে ভারত-রক্ষার সামরিক কার্য্যে দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন শ্বেতাঙ্গ যেন নিযুক্ত হইতে না পারে। ডাঃ খারে কংগ্রেস ও মসলেম লীগকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রী পরিষদে রেসিপ্রসিটি-আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু পেগিং-বিধি সম্বন্ধে ভারত সরকার আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া এই আইন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভারত সরকারের নব মনোভাবে বিচলিত হইয়া 'নাটাল মার্কারী' পত্র ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন—রেসিপ্রসিটি-বিধি প্রয়োগ করিলে অপ্রিয় অবস্থার উদ্ভব হইবে, দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীরা বেপরোয়া ভাবে তাহার প্রতিশোধ লইবে।

ভারতবাসীর উপর অত্যাচার চিরদিনই হইতেছে। অত্যাচারের প্রতিবাদ হইলে পুনরায় অত্যাচারের ভয় দেখাইবার নীতি শ্বেতাঙ্গদের মজ্জাগত ধর্ম্ম। হয়ত ভারত সরকারের এই প্রতিশোধ-ব্যবস্থায় আশু কোন ফল হইবে না; পরাধীন জাতির রোষ সর্ব্বদাই নিষ্ফল হইয়া থাকে। তবু ডাঃ খারে আশা রাখেন যে, ভারত যে আইনতঃ সর্ব্ব প্রচেষ্টায় জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহাতে শ্বেতাঙ্গরা লজ্জা পাইবে। লজ্জাহীনদিগকে লজ্জা দিবার জন্ম ডাঃ খারে বলিয়াছেন—উহারা না কি আমাদের অছি হইবার দাবী করে! কিন্তু যেখানে আমরা অপমানিত ও প্রহৃত হইতেছি, সেখানে অছিরা উদাসীন থাকে

কি প্রকারে? প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতি কালে আমরা স্বাধীন হইতে পারি, এই ভয়ে উহারা উদাসীন থাকিবে?

ইংরেজের শাশ্বত শাসন-চরিত্র

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পুরস্কার-বণ্টন-সভায় (১৬ই কার্ত্তিক) ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহ তাঁহার কনভোকেশন বক্তৃতায় ইংরেজের শাশ্বত শাসন-চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া শত বৎসর পূর্ব্বে কানাডার প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে লর্ড ডারহামের ডেসপ্যাচ হইতে নিম্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"I seems to have been the considered policy of the British Government to govern its colonies by means of division, and to break them down as much as possible into petty isolated communities, incapable of combination and possessing no sufficient strength for individual resistance to the Empire."

ভারতরক্ষা-বিধির অপপ্রয়োগ

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তার করিবার পর আমেদাবাদের মিলগুলিতে হরতাল ঘটাইবার চেষ্টার জন্ম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবাসুদেব কেশবলাল ভট্টকে আটক করেন। শ্রীবাসুদেব আমেদাবাদ সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা করেন, এই অভিযোগে তাঁহাকে ভারতরক্ষা-বিধির ২৬ ধারা অনুসারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; কিন্তু দায়রা জজ এ দণ্ড বাতিল করিয়া বলিয়াছেন যে, ফেডারাল কোর্ট ও বোম্বাই হাই-কোর্টের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ভারতরক্ষা-বিধির ২৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ আইন-সঙ্গত করিতে হইলে যাহার বিরুদ্ধে এই বিধি প্রয়োগ করা হইবে, তাহাকে প্রথমে আহ্বান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা প্রয়োজন।

"সত্যার্থপ্রকাশ"

সিন্ধুর সরকার আর্য্য-সমাজীদের পবিত্র গ্রন্থ "সত্যার্থপ্রকাশের" ১৪শ অধ্যায় ভারতরক্ষা-বিধি প্রয়োগে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত। চার বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহার উরদু অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে বহু কলরব উঠিয়াছিল; কিন্তু, সে কলরব থামিয়া যায়। মসলেম লীগের প্রভাবে সিন্ধু-সরকার এইবার মনে করিয়াছেন, সত্যার্থ-প্রকাশের ১৪শ অধ্যায় প্রচারিত থাকিলে ভারতকে আর বৃটিশ-রাজের কবলে রাখা সম্ভব হইবে না। ভারতরক্ষা-আইনের ৪১ বিধির এই অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভাই পরমানন্দ কেন্দ্রী-পরিষদে যখন প্রস্তাব উত্থাপন করেন (২১শে কার্ত্তিক), তখন মসলেম লীগের সদস্যগণ সিন্ধু-সরকারের কাজের সমর্থন করেন এবং মসলেম লীগের সহিত এক-সান্নিধ্যে খানা খাইবার লোভে তথাকথিত কংগ্রেসপন্থী সদস্যগণ বেমালুম সরিয়া পড়েন; ফলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। আলোচনা-কালে শ্রীযুত আনন্দমোহন দাস বলেন,—বাইবেলেও "স্ক্রাইব্‌স্ ও ফ্যারিসিজ"দের বিরুদ্ধে আক্রমণ আছে; কোরাণেও বিধর্ম্মীদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে, সার সৈয়দ আমেদ খাঁন কোরাণের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন; এ সকল গ্রন্থ ত ভারত-রক্ষার বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই! সার বিঠল চন্দ্রাবরকর বলেন,—ভারত সরকারের যদি ইহাই ধারণা হইয়া থাকে যে, ভারতের সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আপত্তিকর, তাঁহারা কমিটী গড়িয়া গ্রন্থগুলি আপনাদের অকলঙ্ক নীতিবোধের মাপ-কাঠিতে মাপিয়া দেখুন না। ভারতরক্ষা-বিধি ধর্ম্ম-ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা জানা প্রয়োজন। "সত্যার্থপ্রকাশে" এমন কোন বিষয় আছে কি, যাহা ইংরেজের শত্রুকে সাহায্য করিতে পারে? ইহাতে এমন কোন আপত্তিকর বিবরণ বা গুপ্ত ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি, যাহা গত ৭৭ বৎসর অবাধে প্রচারিত থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহার প্রচারে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিক প্রলয়, অন্ততঃ-পক্ষে গোলামীর তকমাবাহী সিন্ধু প্রাদেশিক নোকরতন্ত্রের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য হইবে?

ডক্টর শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

গত ২২শে আশ্বিন তারিখে নয়াদিল্লীতে অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্মেলনের এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। সে অধিবেশনের সভাপতিরূপে ডক্টর শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক প্রমাণসহকারে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—যুগে যুগে হিন্দুগণ সমগ্র ভারত-ভূমিকে এক এবং অখণ্ড মাতৃভূমিরূপে নিজেদের রক্তে গড়িয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু কখনও ভারত-ভূমিকে 'হিন্দুস্থান' আখ্যা দেন নাই; সে আখ্যা দিয়াছে ভারতের প্রতিবেশী ইরাণী এবং পারসিকেরা। তিনি আরও বলিয়াছেন,—ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে আজ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অস্থায়ী। কৃত্রিমতা হইতে এ সমস্যার উদ্ভব। এক দল লোকের আন্দোলনেই শুধু এ-সমস্যার অস্তিত্ব। এই সাময়িক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িবার যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি ভারতভূমিকে কতকগুলি খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত করিলে শুধু কলহ সৃষ্টি করা হইবে। আগা খাঁ-পরিচালিত এক দল লোক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টোকে ধরিয়া মুসলমানদের দাবী প্রথমে স্বীকার করাইয়া লন। তার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনের পরলোকগত সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি সে-কাজকে হীন সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও এ কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে, সে কালে মুসলমানগণ আপনা হইতে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবী করেন নাই; এক জন প্রখ্যাতনামা রাজপুরুষের প্ররোচনাতেই শুধু এ দাবী উত্থাপিত হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন,—এ কালের বৃটিশ-শাসনের মূল নীতিই হইল, ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া ভারত-শাসন। পাকিস্থান-প্রস্তাব যে ভারতবর্ষের সকল মুসলমানরা সমর্থন করেন না, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ডক্টর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—রাজাজী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাকিস্থান হইলে মাতৃভূমির ঐক্য এবং একাঙ্গীভূত

রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হইবে। সম্পূর্ণ এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতি, বা এক সামাজিক আচার-রীতি লইয়া কোন রাষ্ট্র গঠনের উদাহরণ ইতিহাসে নাই। তিনি বলেন, ভাষা এবং কৃষ্টির দিক



ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

দিয়া প্রদেশগুলির বিভাগ প্রয়োজন; সেই সঙ্গে বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণটিতে ভাবালুতার চেয়ে ঐতিহাসিকতা ও যুক্তির সমাবেশ বিশেষ করিয়া অনুধাবন-যোগ্য।

সরকারের খাদ্য-নীতি

ভারত সরকারের খাদ্য-সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া কেন্দ্রী পরিষদে (২৩শে কার্ত্তিক) প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—যে সকল অঞ্চলে খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে উৎপন্ন—সেখান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুর্গত অঞ্চলসমূহে সে খাদ্যের সুবণ্টন-ব্যবস্থার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যাহা সংগ্রহ ও বণ্টন করা হইয়াছে, তাহাও যথাসময়ে হয় নাই। খাদ্যের যে মূল্য, তাহা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রদান করিবার শক্তি নাই, সংগ্রহ ও বণ্টনে দুর্নীতি নিবারণের জন্য সরকার যে প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর ও নিষ্ফল। দরিদ্রতম ক্রেতাদিগের কষ্টলাঘবের জন্য সরকার কোন অর্থসাহায্য না করাতেও খাদ্যশস্যের উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়ের কষ্টের আর সীমা নাই।

প্রস্তাবটি প্রকৃত পক্ষে সরকারের অকর্ম্মণ্যতা ও ব্যর্থতা প্রমাণিত করিয়াছে। কেন্দ্রী পরিষদের বিতর্ক-কালে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে জন-সাধারণের পূর্ণ আস্থা সম্বন্ধে কোন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে খাদ্য-সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থার যথাযথরূপ উন্নতি হইতে পারে না। কংগ্রেস-দলের নেতা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই বলেন, সরকার এমন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, যাহার ফলে জনসাধারণ বুভুক্ষার কবলগত হইতেছে। বুভুক্ষাই বিপ্লবের পরম মিত্র। কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-সদস্য বলিয়াছিলেন যে, এ প্রস্তাব গৃহীত হইলে সরকারের অনুপযুক্ততাই প্রমাণ করা হইবে। তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবু পদত্যাগ করিবার সৎসাহস সরকারের হয় নাই।

বাঙ্গালার সরকার পদত্যাগ করিবেন?

অথচ বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী তাঁহার বেতার বক্তৃতায় এই অবস্থা ও দুর্নীতির কোন জবাব দেওয়া দূরের কথা, বাঙ্গালার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কৃতিত্বের কথাই উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য যে যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়া আসিয়া স্থির রহিয়াছে, তাহাতে এই বিশ্বাসই হয় যে, বাঙ্গালা ক্রমেই দুর্দ্দিন কাটাইয়া উঠিতেছে। কেন্দ্রী পরিষদে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় খাদ্যশস্যের অপচয় সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে এবং যে দুর্নীতি সম্বন্ধে নিন্দা-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে লজ্জিত হইয়া বাঙ্গালার সরকারের পদত্যাগ করিবার সৎসাহস আছে কি?

বাঙ্গালার বিরুদ্ধে কেন্দ্রী পরিষদে প্রত্যক্ষ অভিযোগগুলির মধ্যে আছে—

১। সরকারী মজুতখানায় প্রায় এক হাজার মণ আটা ও ময়দা পড়িয়া আছে। সরকার এ সকল দ্রব্য খাদ্য ব্যতীত অন্যরূপে বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন।

২। খুলনা রেলওয়ে কলোনিতে ও শিবপুরে অজস্র খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। (বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অভিযোগ—হাজিগঞ্জ গডনাইল ও শীতললক্ষ্যার সরকারী গুদামে প্রায় ৮০ হাজার মণ গম, আটা, চাউল ও ছোলা পচিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের রেশন দোকানগুলিতে ঐ সকল খাদ্যের নমুনা পাওয়া যাইতেছে)

৩। কেন্দ্রী পরিষদে উড়িষ্যার সদস্য মিঃ জে, এস, গুপ্তের অভিযোগ যে, বাঙ্গালায় ৪০ হাজার টন নষ্ট গম বিক্রীত হইয়াছে এবং ১৮ হাজার টন মানুষের খাদ্যের অযোগ্য শুষ্ক আলু নষ্ট হইয়াছে।

৪। ভারতরক্ষা বিধি বলে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে রেশনিং খাদ্য-দ্রব্য পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয় নাই।

বাঙ্গালার অবস্থা

কেন্দ্রী পরিষদের বিতর্ক-কালে বাঙ্গালার সদস্যগণ বাঙ্গালার অবস্থার কথা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেন। জানান হয়, বাঙ্গালায় এখনও লোক দলে-দলে না খাইয়া মরিতেছে। প্রভেদ মাত্র এই যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারী পড়িত আর মরিত; আর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে লোক তিলে-তিলে মরিতেছে। তাহার উপর বাঙ্গালায় অসংখ্য মার্কিণ-সৈন্য অবস্থান করিতেছে বলিয়া খাদ্যের অভাব যেমন হইতেছে, দরিদ্র সাধারণের পক্ষে তাহা তেমনই অক্রেয়ও হইতেছে। এই সৈন্যদলের এজেন্টরা যে-কোন মূল্যে বাজার হইতে তরিতরকারী কিনিয়া লইতেছে। বাঙ্গালার মফঃস্বল অঞ্চলগুলির অবস্থা বাক্ত

করিতে গিয়া শ্রীমতী রেণুকা রায় বলিয়াছেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের ভিটা-মাটী ছিল, আজ তাহারা গৃহহীন। উহাদের দারা-সুত মাতা-ভগিনী আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন।

শিশুদিগের একমাত্র খাদ্য দুগ্ধের জন্য বৃটিশ সরকার ভারতের তুলনায় মুষ্টিমেয় ইংরেজ শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও সুলভে দুগ্ধ দানের জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করেন, আর এ দেশে দুগ্ধের অভাবে শিশুরা না খাইয়া মরিতেছে। যাহারা বাঁচিতেছে, তাহাদের অপুষ্ট দেহই ভবিষ্যৎ আরও সৃষ্টি করিবে! শ্রীমতী রেণুকা গো-বধ সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছেন।

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পরিষদকে জানান যে, গত বৎসর না খাইতে পাইয়াই বাঙ্গলার ১৩ লক্ষ নরনারীর অকাল-মৃত্যু হইয়াছিল। বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসীর হিসাবে এখনও পৌনে ৩ লক্ষ লোক সরকারী সাহায্য পাইতেছে। আরও কত লোক যে অনাহার-ক্লেশ নীরবে সহ্য করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অপুষ্টি ও অনাহারের নিত্য-সঙ্গী ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার শতকরা ৪০ জনকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, জনসাধারণকে সুপুষ্টি-প্রদানের সুব্যবস্থা না হইলে ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধান অসম্ভব।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গী ম্যালেরিয়া

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া আজ মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাশ বাঙ্গালার হৃদয়হীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বার মৃত্যু-সংখ্যা ৭ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন গৃহ ম্যালেরিয়া-শূন্য নয়! কোন কোন পরিবারে সকলেই শয্যাশায়ী তৃষ্ণায় জল দিবার লোক নাই—কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে, এই সহরের চারটি ওয়ার্ডের ১ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত (শতকরা ৬৫ জন)। সরকার উদাসীন। কুইনাইনাদি ঔষধ ঔষধ সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত ভাবে বিতরণ করা হইতেছে না। এ জন্য দায়ী কে? যাহারা শোণিত-বিন্দু দিয়া সরকার, সরকারী কর্ম্মচারী ও সচিববর্গের উদরের পরিধি বৰ্দ্ধিত করিতেছে, তাহাদের অনাহার ও মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? বাঙ্গালার সচিবরা বলিতেছেন—খোদা! আমরা বলি—সেই সকল নিকৃষ্ট জীব—যাহারা মসনদ পাইয়া মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে!

গান্ধী-জিন্না আলোচনা

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-সমাধানের জন্য গত ২৪শে ভাদ্র হইতে ১৩ই আশ্বিন পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর সহিত মসলেম লীগের সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার কথাবার্ত্তা ও পত্র-বিনিময় হয়। এই মত-বিনিময়ে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি। লীগের সহিত কংগ্রেসের মিলন ঘটাইবার জন্য শ্রীযুত রাজাগোপালাচারির নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গত মার্চ্চে গান্ধীজী গ্রহণ করিতে সম্মত হন—

(১) স্বাধীন ভারতের শাসন-বিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সর্ত্তে মসলেম লীগও ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া মধ্য সামরিক এক অস্থায়ী সরকার-গঠনে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

(২) যুদ্ধ শেষ হইলে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব-ভারতের—যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা সর্ব্ব সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক—জিলা-গুলির বাঁটোয়ারার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। যে সকল অঞ্চল এই ভাবে পৃথক্ করা হইবে, সে সকল অঞ্চলে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভোটাধিকার বা অন্য কোন প্রকারে বাস্তবিক কার্য্যকরী ভোটাধিকার অনুসারে সকল অধিবাসীর ভোট গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ রাজ্য গঠনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে। অধিকাংশের ভোট যদি হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে হয়, সীমান্তবর্ত্তী জিলাগুলির কোন না কোন রাষ্ট্রে যোগদানের ইচ্ছায় আপত্তি না করিয়া অধিকাংশ সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

(৩) গণমত গ্রহণ আয়োজনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষই আপন আপন মত প্রচার করিতে পারিবেন।

(৪) পৃথক্ রাষ্ট্র গঠিত হইলে দেশরক্ষা, বাণিজ্য ও যানবাহন এবং অন্যান্য মুখ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত চুক্তি করিবার প্রয়োজন হইবে।

(৫) এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে জনসংখ্যা আদান-প্রদান বা গমনাগমন জনগণের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন হইবে।

(৬) বৃটেন যদি ভারত শাসনে পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভারত-বাসীর উপর প্রদান করে, মাত্র তাহা হইলেই এ সকল সর্ত্ত উভয় পক্ষ মানিয়া লইবেন।

মহাত্মা গান্ধী লীগের প্রকৃত মনোভাব ভারতবাসীর নিকট প্রকট করিবার জন্য অনেক সুবিধা দানের প্রস্তাব মিষ্টার জিন্নার নিকট করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না সম্মত হন নাই। তিনি গণমত গ্রহণে অসম্মত। কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ভিন্ন গান্ধীজীর প্রস্তাবের কোন মূল্য তিনি দিতে চাহেন নাই। মিঃ জিন্না চাহেন, পাকিস্থানরূপে নূতন এক রাষ্ট্র (সম্ভবতঃ ভারতের দুই সীমান্তে দুইটি প্রাচীর রাষ্ট্র), যাহার সহিত অবশিষ্ট ভারতের কোন বিষয়ে এমন কি, দেশরক্ষার ব্যাপারেও কোন সম্পর্ক থাকিবে না। গান্ধীজী মসলেম লীগের লাহোর প্রস্তাবের চুলচেরা বিচার করিয়া ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নিকট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মিঃ জিন্না তথা মসলেম লীগ মাত্র স্বাধীন ভারতের একটি কণ্টক. একটি 'আলষ্টার' হইয়া থাকিতে চাহেন না, তাহারা অপর সম্প্রদায়কে স্বদলে টানিয়া তাহাদের জন্যও পৃথক্ রাষ্ট্র স্থাপনের যুক্তি দিতে চায়। মিষ্টার জিন্না দক্ষিণ-ভারতের মিঃ ই, ভি, রামস্বামী নাইকারকে এক পত্রে লিখেন—মাদ্রাজের শতকরা ৯০ জন অব্রাহ্মণ। এই অব্রাহ্মণ-গণ ইচ্ছা করিলে 'দ্রাবিড়স্থানের' প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের অব্রাহ্মণেরা আমার সমর্থন পাইবে। গান্ধী-জিন্না আলোচনার পরও ভারতের মুসলমানগণ স্পষ্টতঃ ভেদপন্থী ও কূটবুদ্ধি মিঃ জিন্নার তল্পীবাহক হইয়া আপনাদের অর্থনীতিক অস্তিত্ব ও ভৌগোলিক জাতীয়তা পরিহার করিবে কি?

নোবেল পুরস্কার

এবার (১৯৪৪) রসায়ন-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ষ্টকহলমের অধ্যাপক মিষ্টার জর্জ্জ ফন্ হেভেসি; পদার্থ-বিদ্যায় পুরস্কার পাইয়াছেন নিউ-ইয়র্ক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিষ্টার রোবি।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল হাসপাতাল

সঙ্গীত-সম্মিলনীর বিশিষ্টা ছাত্রী 'গীতশ্রী' নন্দরাণী দেবীর স্মৃতিকল্পে তাঁহার স্বামী শ্রীযুত বিজয়কুমার মৈত্র মহাশয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



গীতশ্রী নন্দরাণী দেবী

মেমোরিয়াল হাসপাতালে সম্প্রতি এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পরলোকবাসিনী পত্নীর পুণ্যস্মৃতি-কল্পে রোগীর সেবায় এ-দান প্রাচ্য-বৈশিষ্ট্যে একান্ত কাম্য এবং অনুকরণের যোগ্য।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

ঘরের টাকা খরচ করিয়া রেশনের যা-তা খাদ্য-অখাদ্য খাইয়াও কলিকাতার অধিবাসীরা কোনো মতে বাঁচিয়া থাকিবার আশা যদি বা রাখিত, কোথা হইতে "স্পেশাল টাইপের" লরি আসিয়া গুঁতা মারিয়া যে আমাদের আহত-নিহত করিবে, বেপরোয়া ভাবে—ইহার কি প্রতিকার আছে! এই সব "স্পেশাল টাইপ" লরি-ওয়ালাদের চোখ কেমন, জানি না! পথের রাহী লোককে কি 'মানুষে'র বদলে তাঁরা পোকা-মাকড় বলিয়া ভুল করেন! তাছাড়া আজ পর্য্যন্ত এমন বেপরোয়া কোনো লরি-চালককে মানুষ ঘায়েল করার জন্ম আদালতে দাঁড় করানো হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই! পথের যে আইন-কানুন, এ-সব "স্পেশাল টাইপে"র জন্ম বুঝি সে-সব আইন খাটে না?

পরলোকে গণনাথ সেন

১ ২৫শে অক্টোবর তারিখে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ ন এম-এ, এল-এম-এস, সরস্বতী মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৫ই অক্টোবর তারিখে মার্টিন কোম্পানির সহকারী এঞ্জিনীয়ার এবং চীফ এষ্টিমেটর প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬৯ বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের ভ্রাতা এটর্ণি ৺মহেন্দ্রনাথের পুত্র। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে বি-এ পাশ করিয়া তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন; পরে সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া পী-ডব্লু-ডীতে কিছু কাল কাজ করিয়াছিলেন। তার পর বহু এঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মে কাজ করিয়া মার্টিন কোম্পানিতে যোগদান করেন। বেলুড়-মঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কাউন্সিল চেম্বার্স, নূতন কাষ্টম্স্ হাউস, বাসন্তী এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন্ মিলস্, হংকং ব্যাঙ্ক, ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি গৃহগুলির ডিজাইন এবং এষ্টিমেট সম্পাদন—তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি।



প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'বসুমতীর' সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এক জন সহৃদয় বন্ধু এবং বিশিষ্ট কর্ম্মীকে হারাইলাম। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



জাতির স্বাস্থ্য গঠন কার্য্যে

"সময় মত কাজ শেষ.... শুধু হরলিক্সের জন্যই সম্ভব হয়েছিলো।"

একজন ইঞ্জিনিয়ার, কিছুদিন আগে, এক খুব জরুরী দেশ রক্ষার কাজ করতে করতে হঠাৎ ভয়ানক জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, অথচ দরকার তখন তাঁকেই সবচেয়ে বেশী। ভাগ্যক্রমে এক ডাক্তার তাঁকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার জন্য হরলিক্স খেতে দেন...ফলে দিন কয়েকের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার একেবারে সুস্থ হয়ে সময় মত কাজ শেষ করেন।

আজ এই যুদ্ধের সময়ে হরলিক্স কি ভাবে কাজ দিচ্ছে, আরো বহু সত্য ঘটনার মধ্যে উপরের ঘটনাটি একটি। হরলিক্সে সবরকম পুষ্টি খুব সুপাচ্যরূপে থাকার জন্য দুর্ব্বল পাকস্থলীর ওপর এতটুকুও চাপ না দিয়ে এই খাদ্য ক্ষয়প্রাপ্ত স্নায়ু ও টিস্যুগুলোকে আবার সজীব করে তোলে এবং নতুন উদ্যম ও শক্তি ফিরিয়ে দিয়ে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করে তোলে।



হ র লি ক্ স

আজ দুষ্প্রাপ্য। যে সল্প পরিমাণ পাওয়া যায় তা' রোগী ও শিশুদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং অপচয় বন্ধ করুন—অত্যন্ত প্রয়োজন না থাকলে কিনবেন না।



H. 4480



অগ্রহায়ণ, ১৩৫১] উন্মনা [শিল্পী—মিষ্টার টমাস

সচিত্র
মাসিক বসুমতী
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
২৩শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ | ২য় সংখ্যা

যোগসিদ্ধি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনে যোগের স্থান

যোগ-সাধনার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু ভ্রান্ত ধারণা [illegible]ছে ; সেই সব একপেশো স্থূল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এই সহজ সরল অনাড়ম্বর ঋজু সত্যমুখী পথটি হয়ে উঠেছে কঠিন, জটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল। ভ্রান্ত স্থূলদৃষ্টি মানুষ ভাবে, চক্ষু মুদে আসনে বসে কঠিন কঠিন ক্রিয়া অভ্যাসকেই যোগ বলে ! তাঁদের ধারণায় ভস্ম-চন্দন গৈরিক-রুদ্রাক্ষ দণ্ড-কমণ্ডলু জটাজূটই পরম যোগীর লক্ষণ ! আত্মনিগ্রহই পরম পুরুষার্থ ! তাই দিনান্তে যে একটি মাত্র আমলকী ভক্ষণ করে থাকে, যে বাত্যাহারী বা কণ্টকশয্যায় শয়ন করে দিন যাপন করে, যে শবাসনস্থ শ্মশানচারী বনবাসী, সেই সব লোকই প্রকৃত যোগী। উপায় ও পথকে বাহ্য আড়ম্বরের লক্ষ্য ভেবে ভুল করে মানুষ যোগসাধনার সম্বন্ধে এই ভাবে নানা আজগুবি ধারণা মনে পোষণ করছে।

প্রকৃতপক্ষে যোগ কি ? জীবনই যোগ—এই মন-প্রাণ-দেহ জুড়ে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির ক্রম-প্রকাশ ও রূপায়ণই যোগ। কারণ, এই দেহে মনে-প্রাণে গোটা জীবনটা জুড়ে আমার অন্তরের দেবতা—আমার নিগূঢ়-বিরাট অখণ্ড আমি ক্রমশঃ ফুটছে, জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে রূপ নিচ্ছে ; ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় জীব-চৈতন্য ফুটে চলেছে রূপ থেকে রূপান্তরে, আংশিক বিকাশ থেকে পূর্ণতর ও পূর্ণতম বিকাশে। অরূপের, অখণ্ডের, ভূমার ও বিপুলের এই রূপায়ণই যোগ। তাই শাস্ত্র বলছে—"আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জান ; নিজের প্রকৃত বৃহৎ ষড়ৈশ্বর্য্যময় শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ স্বরূপকে উপলব্ধি করে তা'তেই ক্রমে স্থিত হওয়ার সাধনাকে বলে যোগ।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই সাধনা কখন্ প্রথম আরম্ভ হয়েছে ?—যে দিন দেশ-কালের মাঝে প্রথম এই জীব-চৈতন্য রূপ নিয়েছে, দেহ ধারণ করেছে। অরূপ এই চিন্ময় বস্তুর স্বভাব ও স্বধর্ম্মই হচ্ছে রূপময় গন্ধ স্পর্শ শব্দময় রসময় হয়ে নিজের অন্তর্গূঢ় শক্তি জ্ঞান আনন্দকে প্রকাশ করা। আমাদের জীবন হচ্ছে সেই প্রকাশের ধারা ; জীবনকে না জানলে যোগকে জানা যায় না। কারণ, জীবন হচ্ছে যোগ-সাধনারই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া। সে ক্রিয়া, সে বিকাশ (unfolding) চলেছে প্রথমে অজ্ঞানে, তার পর সজ্ঞানে। সমুদ্রের দুর্ব্বার টান রয়েছে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর শিরায় শিরায়, তরঙ্গে তরঙ্গে। সেই টানই তাকে ঝরণা থেকে উপনদীতে, উপনদী থেকে নদী ও নদে পরিণত করে ক্রমশঃ নিয়ে চলে সাগর-সঙ্গমে। সাগরের কাছে এসে তবে এ টান হয়ে ওঠে প্রবল, স্ফুটতর ও একমুখী, তখনই বোঝা যায়, এ কোন্ মহামিলনের টান ও আকর্ষণ ! এই উপমার ঐ সিন্ধু কিন্তু নির্ঝর থেকে থাকে দূরে, নির্ঝর থেকে থাকে বিযুক্ত ও পর হয়ে ; আমাদের অন্তরের ভূমা কিন্তু অন্তরেই বসে বাহিরে ফোটে রূপের ছন্দে, নিজেরই স্বভাবস্থ স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানে, শক্তিতে, আনন্দে, মহিমায়, পূর্ণত্বে।

আমরা এই বৃহৎ সমগ্র দৃষ্টি থেকে যোগকে দেখি বা বুঝি না ; ভগবৎ-লাভ, মুক্তি বা আত্মস্বরূপানুভূতিকে লক্ষ্য করে তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকেই আমরা যোগ বলে জানি এবং সাধারণ ভোগ-ত্যাগমূলক সাংসারিক জীবনকে ঐ কৃচ্ছ্রসাধনার ও আত্মসংযমের পরিপন্থী বলে ধরে নিই। ঐ দণ্ড-কমণ্ডলু গৈরিক-রুদ্রাক্ষ, ঐ আত্মসংযম ও ত্যাগের সাধনা ও যম-নিয়ম-আসন আদি অষ্টাঙ্গ যোগ প্রণালীর অনুষ্ঠান বা তান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হচ্ছে একান্তই বাহ্য—একটা অবস্থার কথা। এই ভোগময় জীবনই নিজের ক্রম-পরিণতিতে আমাদের নিয়ে চলে ত্যাগ-মোক্ষের পথে ঊর্দ্ধের পরতত্ত্বের সন্ধানে। যম নিয়ম আসন প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম সমাধি—এই আটটি প্রক্রিয়া-জনিত অভ্যাস আমরা পাকে-প্রকারে নানা কাজে-কর্ম্মে স্বতঃই অভ্যাস করে চলি, এ ধারণা সাধারণ স্থূল-বুদ্ধি মানুষের নাই। তারা ভাবে, কেবল কৃচ্ছ্রাচারী যোগীই অজিনাসনে বসে বিরুদ্ধ মনে ঐ সব আত্মনিগ্রহাত্মক ক্রিয়া করে

থাকেন। মানুষ মাত্রেই কিন্তু কি অজ্ঞানে আর কি সজ্ঞানে তার শৈশবের খেলা ঘরে, কৈশোরের অধ্যয়নে, যৌবনের অর্থোপার্জ্জনের রঙিন নেশায় পাগল ভোগ-সুখে, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের গভীর জ্ঞানান্বেষণে বা যশ ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির কামনায় প্রচুর একাগ্রতা, আত্মসংযম, সহ্যশক্তি ও ত্যাগ-সামর্থ্য আহরণ করে চলে। প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য, স্ত্রী তার স্বামীর ঐকান্তিক সেবায়, মাতাপিতা তাদের সন্তানের কল্যাণে যে অমানুষিক ত্যাগ, আত্মদান ও একাগ্র সাধনার পরিচয় দেন, তা' কয় জন তথাকথিত কর্ম্মত্যাগী গুহাবাসী তার অজ্ঞাত ধ্যেয় বস্তুর জন্য করেন? সংসার ও ভোগ-সুখের সন্ধানকে উপলক্ষ করেই চলেছে সারা জীবন জুড়ে এই আত্মোপলব্ধির পালা। এই সাধনার কেবল কতকটা হয় সংসারে আর বাকিটা হয় নির্জ্জনে অজিনাসনে ভোগ-বিরতির মাঝে। এই জন্যই বলেছি, জীবনই যোগ। সে হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই প্রচ্ছন্ন যোগী।

গল্পে আছে, কোন শক্তিধর কৃচ্ছ্রসাধক বৃক্ষতলে বসে আছেন, এমন সময় এক বক তাঁর উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। সাধক ক্রুদ্ধ নেত্রে উপর দিকে চাইতেই বেচারা বক ভস্ম হয়ে গেল। নিজের শক্তি দেখে অহঙ্কারে আত্মপ্রসাদে পুলকিত সাধক এসে দাঁড়ালো গৃহস্থের দ্বারে "ভিক্ষাং দেহি" বলে। গৃহিণী স্বামি-সেবায় নিমগ্ন থাকায় বিলম্বে ভিক্ষা দিতে এলেন, ক্রুদ্ধ তাপস বার-বার রোষ-কষায়িত লোচনে তার দিকে চাইলেন। সে সতী নারী কিন্তু বকের মত ভস্মে পরিণত হলেন না, উপরন্তু হেসে বল্লেন, "ঠাকুর, আমি বক নই; আপনি ভিক্ষা নিন।" এ ক্ষেত্রে ঐকান্তিক স্বামি-প্রেমই সমাহিত যোগীর লভ্য সিদ্ধি ও সর্ব্বজ্ঞতা দিয়েছে ঐ সতী নারীকে। জীবনই যে যোগ, তার প্রমাণ এই গল্প।

সমগ্র সংসার এবং জীবন জুড়ে চলেছে কোন এক সুদূর—বুঝি বা অদূর পরম বিকাশের জন্য অবিরাম অনুশীলন ও সাধনা! প্রকৃতির তাড়নায় আপন স্বভাবের বেগে মানুষ ক্রমাগত তার মন প্রাণ দেহের অসিতে দিচ্ছে শাণ; তার কর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান ও সামর্থ্যের পুঁজি চলেছে বাড়িয়ে, তার চেতনা ও অভিজ্ঞতার পরিধি ও সীমা করে নিয়ে যাচ্ছে বিপুল থেকে বিপুলতর—ক্রম-প্রসারিত। এই জন্যই ঋষি বলেছেন, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"।—যোগ হচ্ছে কর্ম্মেরই কৌশল।

তথাকথিত বৈরাগ্যলিপ্সু মানুষের এক-তরফা বিচারে এ জীবন চিরদিনই ধিক্কৃত হয়ে এসেছে—অসার বলে, পাপ বলে, বন্ধনের হেতু বলে। এক শ্রেণীর উৎকট ইহ-বিমুখের কাছে মন প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বঞ্চিত অতৃপ্ত উপবাসী রাখাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরম-পুরুষার্থ। মানুষের নিত্য সহচর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য আদি সহজাত বৃত্তিকে ষড়্‌রিপু বলে কামিনী ও কাঞ্চনকে নরকের দ্বার বলে এক জাতীয় ত্যাগপন্থীরা করেছেন সস্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ। এই একপেশো খণ্ড দৃষ্টি কিন্তু মানুষকে প্রকৃত পুরুষার্থ ও সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ কল্যাণের দিকে আজও খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে তো পারেই নি, অধিকন্তু, বহু নীতিবাগীশ কাষ্ঠতাপস মানুষ তার ঐ ধিক্কৃত জীবনের হাতেই হয়েছে পদে পদে পরাস্ত ও বিড়ম্বিত; জীবনকে সাধনা থেকে পৃথক্ করে হেয় দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ইহার্থ ও পরমার্থ দুই-ই গেছে গুলিয়ে; মন প্রাণ দেহ—যা সাধনার ও বিকাশেরই ক্ষেত্র, তাই অতিমাত্রায় নিগ্রহের বশে হয়ে গেছে পঙ্গু অথবা রয়ে গেছে অপরিণত। গীতা এই জন্যই সাধনার্থীকে বলছে—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি
ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য
জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

"হে অর্জ্জুন, অতিভোজীর যোগ নাই, অত্যল্পভোজীরও যোগ নাই, অতিশয় নিদ্রাবিলাসী বা অতিশয় নিদ্রাবিমুখ—উভয়ের পক্ষে যোগ-সাধনা সমান কঠিন।"

যুক্তাহারবিহারস্য
যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য
যোগো ভবতি দুঃখহা॥

যে ব্যক্তি পরিমিত আহার ও পরিমিত বিহার বা ভোগ করে, যে পরিমিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা করে অর্থাৎ অতিমাত্রায় অলস হয়ে যেম থাকে না, তেমনি গুরুতর পরিশ্রমও করে না, নিদ্রায় ও জাগরণে যে পরিমিতাচারী, যোগ তারই জীবনে ফলপ্রদ ও শান্তিদায়ক হয়।

এখানে শাস্ত্রকার (শ্রীভগবান্) স্পষ্ট বাক্যে কার্য্যত্যাগ ও অতি ভোগের নিন্দা করছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতে ত্যাগকামুক ও ভোগকামু উভয়েই সমান ভ্রান্ত, প্রকৃত জীবনের ছন্দ থেকে ভ্রষ্ট, অতএ যোগ-সাধনার অনুপযুক্ত। সত্ত্ব রজঃ ও তম তিন গুণই (চোর, সত্যের সিংহদ্বার পার হবার অধিকার তাদের নেই, ঠাকু রামকৃষ্ণের এ কথার প্রমাণ এইখানে। কথামৃতের পাঠক ভু যায়, তিনি যেমন কামকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগের উপদেশ সত্যমু মানুষকে দিয়ে গেছেন, তেমনি সংসারকে বলে গেছেন সাধনার শ্রে ক্ষেত্র নারীকে দেখে ভগবতী জ্ঞানে তিনি হতেন সমাধি-মগ্ন।

জীবের এই দেহ-ধারণ মহাশক্তি বা প্রকৃতির একটা পরিহা নয়, ছন্দ-পতন নয়, আকস্মিক বা নিরর্থক নয়। সৃষ্টির অবিরা রূপায়ণের পিছনের ছন্দ ও রহস্য যে না উদ্ঘাটন করে বুঝে তার সত্যানুসন্ধানই বৃথা। বৈদিক যুগের উপনিষদ্‌কার পূর্ণদ্ হিন্দু-জীবনের এই পরম রহস্য জানতেন; তখনও হিন্দুর পরমা ইহবিমুখ হয় নাই; ভারতের জাতীয় জীবনে তখনও একটি পরিপ্ ছন্দ ও সামঞ্জস্য ছিল, জাগ্রত তত্ত্বারূঢ় হিন্দুর তাই তখনও রাষ্ট্র ছি দেশ ছিল, শিল্প-কলায় নৈপুণ্য ছিল, বীর্য্য ও মনুষ্যত্ব ছিল, তা তাদের ছিল—"ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব"। ধর্ম্মের নামে এ প্রকার জীবন-ভীত ত্যাগ-ক্লীবের দল তখনও এ হতভাগ্য দে গজায়নি, মানুষের জীবনের স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের স্বর্ণসূত্র তখন ছিন্ন হয়নি—তপ-উজ্জ্বল বৌদ্ধযুগ এবং জ্ঞানোজ্জ্বল শাঙ্কর যুগে বিকৃতির ফলে যা পরে ঘটেছিল এবং সেই বিকৃতিরই উত্তরাধিকা আমাদের এ-কূল ও-কূল দুই-ই গেছে ক্ষুইয়ে।

শাস্ত্র থেকে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধার করে তখনকার জী সংস্কারমুক্ত হিন্দুর এই পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিপন্ন করা যায়। এ সত্যটি কিন্তু ভাল করে না বুঝলে যোগের সহজ জীবনানুগ পথ ধ যায় না, ভগবানকে খুঁজতে ভুলে মানুষ নিজকে নৈতিক জী ধোপদোস্ত পুণ্যবিলাসী কৃচ্ছ্রসাধক করে তোলবার চেষ্টায় পরমোৎসা

লেগে যায়, তত্ত্ব খোঁজা আর তার অদৃষ্টে ঘটে ওঠে না। লালসা মাত্রেই মন্দ ও বন্ধন, ত্যাগের বা ভোগের—সুকৃতির বা দুষ্কৃতির আসক্তি সমান নিন্দনীয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা আসলে দুই-ই অবস্থা-বিশেষে বন্ধন বা limitation ; তা' মানুষের মুক্তির পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তোমার দেহ-মন-প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্ষুধাকে তুমি যে দিন পাপ লেবেল দেবে এবং তাদের গতি দেখে আঁৎকে উঠবে, এক হিসাবে সেই দিন থেকেই তুমি যোগপথভ্রষ্ট। এক জন ভূত নামিয়ে বড় বিপন্ন হয়েছিল, কারণ, সদা-সর্ব্বদা কাজ না পেলে কেজো ভূত তার ঘাড় মট্‌কাতে চাইত! অতি দুঃসাধ্য কাজও ভূত এক নিমেষে সম্পন্ন করে ফেলে, তার পর উগ্রমূর্ত্তিতে আবার উপস্থিত হয় অন্য কাজের জন্য। তখন কোন সুবুদ্ধির উপদেশে সেই বিপন্ন মানুষ ভূতকে দিত একগাছি বাঁকা কেশ সোজা করবার কাজে লাগিয়ে, ভূত কেশগাছিকে যতই টেনে সোজা করে, ছাড়া পাবামাত্র স্বভাব-বাঁকা চুল আবার কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে যায়; তখনই সেই বিপন্ন ব্যক্তি পেল ভূতের হাত থেকে ত্রাণ। এই বাঁকা চুলের মতই ত্রিভঙ্গ তোমার প্রকৃতি. মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ একে বলে গেছেন, কুত্তাকা দুম্—কুকুরের বাঁকা লেজ! একে সোজা করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। শুচিবায়ু-রোগগ্রস্ত মানুষ যেমন যতই হাত-মুখ ধোয়, ততই তুচ্ছ কারণে আবার অশুচি হ'লো ধারণায় বার-বার ধুতে ধুতে হাত-পা সর্ব্বাঙ্গ তোলে হাজিয়ে ও পচিয়ে, অশুচি-জ্ঞান তার কিছুতেই ঘুচতে চায় না, নীতিবায়ুগ্রস্তও তেমনি নৈতিক শুচিবায়ু-রোগে রুগ্ন; তার সারা জীবন কাটে জড়পিণ্ড দেহের ও স্বভাব-চঞ্চল মন-প্রাণের কাল্পনিক শুচিতার ব্যর্থ সন্ধানে। "মন চঙ্গা তো কাঠৌতি গঙ্গা"—মন যার শুদ্ধ, সে কাঠের বাটিতে গঙ্গা পায়। মন যার শুদ্ধ, তার কাছে জগৎ শুদ্ধ। গীতায় ভগবান বলছেন, "আমি কাউকে পুণ্য দিই নাই, পাপও দিই নাই; কর্ম্ম ও তার ফল-রূপ সংযোগেরও সৃষ্টি করি নাই; স্বভাবই আপনি রচেছে।" মানব-বুদ্ধির ব্যাবহারিক জগতেই ভাল-মন্দ আছে, অখণ্ডের ঘরে নাই; কারণ সে হচ্ছে পরম সম ও দ্বন্দ্বাতীত আনন্দ-ঘন ধাম। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত বলে গেছেন—

শুচি অশুচিরে নিয়ে দিব্য ঘরে যবে শুবি
তবে শ্যামা মারে পাবি,
* * * *
যবে দুই সতীনে পীরিত হবে
তবে শ্যামা মারে পাবি।

যতক্ষণ মানুষের মন কু স্ব, হিত বিপরীত, রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সকল সংস্কার-মুক্ত হয়ে প্রশান্ত ও সমাহিত না হয়, তত দিন জন্ম-মৃত্যু আধিব্যাধিময় ভবযাতনা থেকে মানুষের মুক্তি নাই, এই কথাই কমলাকান্তের গানের ইঙ্গিত। দিব্য ঘর অর্থে এখানে পরমার্থ-জ্ঞানে (Divine consciousnass) অবস্থিতিই বোঝাচ্ছে। উপনিষদের বহু শ্লোক এই ভাবের কথাই বলছে, যথা "যে শুধু অবিদ্যার উপাসনা করে, সে গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে; যে শুধু বিদ্যার উপাসনা করে, সেও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে" ইত্যাদি।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।

নিছক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতরা এই সব পরম সাম্যসূচক শ্লোকের যে ব্যাখ্যাই করুন না, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার যার কিঞ্চিৎও হয়েছে, সে জানে উপনিষদের প্রকৃত গূঢ় অর্থ। জীবনে ত্যাগেরও মূল্য আছে, ভোগেরও মূল্য আছে; সেই একই মহাশক্তির চিৎবিনাশই চলেছে এই গোটা জীবনটি জুড়ে, তাই আমি তথাকথিত ষড়্‌রিপুকে ষড়্‌সখা বলি। এরা মানুষের চির-সহচর থেকে ভোগ-জীবনে মানুষের বৃত্তিগুলির উন্মেষের সহায়তা করে। বাংলাদেশের তন্ত্র এ কথা জানতো, তাই জীবনের বিকৃতিকেও যোগ-সাধনার উপকরণ করে নিতে পেরেছিল এই দুঃসাহসী পূর্ণদৃষ্টি বীর সাধকের দল। রামপ্রসাদও জানতেন, সর্ব্ব অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ চলছে সেই পরম জ্যোতিয় ও পরাগতির দিকে এগিয়ে। তাই তিনি গেয়েছেন,—

"আমি উজিয়ে যাব উজান টানে
ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।"

সমতা ও দ্বন্দ্বরাহিত্যের পথই সহজ পথ। কারণ, যে ঠাকুরের তুমি সাধক, সে যেমন শান্ত ও দ্বন্দ্বাতীত, তাইতো সে সর্ব্ব-রসের রসময় ঠাকুর, নিখিল, ভাবের খনি যুগপৎ সে সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বময়—ত্যাগ ও ভোগের মহা-সমন্বয়-ভূমি। তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দেখা পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ, শিব-অশিব তাঁরই অখণ্ডে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ছন্দে মহাসিন্ধুর বুকে তরঙ্গ-ভঙ্গের মত জাগছে ও লয় পাচ্ছে, এই সব কিছুকে বুকে করেই তিনি চিরমুক্ত! আমরা দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যই তো ক্ষুদ্র হয়ে গেছি, তাই একটুতেই পিষে যাই, ভেঙ্গে পড়ি, তাই তাঁর সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য আমাদের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়,—এক গণ্ডূষ জলই যে পিঁপড়ের পক্ষে ডুবে মরবার সাগর!

মনে রাখতে হবে যে, যোগপথ সত্য অনুসন্ধানের পথ, নৈতিক ভালমানুষীর পথ নয়; শুধু নৈতিক ঝাড়ুদার ও পথে চলতে পারে না। এখানে বিল্বমঙ্গল ও ধ্রুব শুকদেব সকলেই তাঁদের স্বভাবগত ভিন্ন ভিন্ন পথে অমৃত লাভ করে দেবতা হন। জীবনকে তাই ভয় পাবে না, জীবনকে শুদ্ধ করবার ভার নিজের হাতে নেবে না। যাঁর দেওয়া এ জীবন, সেই মহাশক্তির উপর সে গুরুভার দিয়ে তুমি নিজে নিশ্চিন্ত হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "সাধা লোকের পা বেতালে পড়ে না" পরমার্থ-জ্যোতিতে দীপ্ত জীবনে বসন্ত-সঞ্চারিত রসের মত শুদ্ধি আপনি জাগে, শুদ্ধিকে খুঁজতে হয় না, তিল তিল করে গড়তে হয় না। পাপভীত মানুষ হচ্ছে বড়ই দীনাত্মা, ভীরু যেমন সহস্র বার মরে, তেমনি মন-প্রাণ-দেহের তথাকথিত শুচিতায় কামুকের পতন ঘটে প্রতিমুহূর্ত্তে। ক্রমাগত নিরোধের ফলে repression-এ তার জীবনগতি রুদ্ধ হয়ে অবরুদ্ধ জলের মত দূষিত হয়ে যায়। সে জীবন বলিষ্ঠ পূর্ণায়ত হয় না, ক্রমশঃ শীর্ণ পঙ্গু (maimed) হয়ে পড়ে। এ-কথার কিছু অর্থ এ নয় যে, অবাধ ভোগ বা অসংস্কৃতি নিম্ন প্রকৃতির অসঙ্কোচ অনুগামিতা ত্যাগের বা নৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনার চেয়ে ভাল। কোনটারই অতিশয় ভাল নয়। যে প্রকৃতিতে তার বিকাশের জন্য যতটুকু ত্যাগ বা ভোগ কল্যাণকর, তার পক্ষে ততটুকুই ভাল; তার অতিরিক্ত করতে গেলে আত্ম-বিকাশের অন্তরায় ঘটে।

মানুষ স্বভাবতঃই মোহমুগ্ধ জীব, ভাল-মন্দ সব-কিছুই তাকে সহজে পেয়ে বসে, তাকে মৌখিক উপদেশ দিতে যাওয়া তাই

বিড়ম্বনা বিশেষ। তার মাথায় ত্যাগের মাহাত্ম্য একবার ঢুকলে মাত্রা ছাড়াতে ছাড়াতে সে ক্রমশঃ আত্মনিগ্রহের উল্লাসে উন্মাদ গতিতে ছুটতে থাকে। আবার যদি তাকে বোঝাতে যাও গীতার সেই গভীর সমতার বাণী—"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈবং শুকৃতং বিভুঃ"—তা হলে সে বেপরোয়া হয়ে অতিভোগের চৌঘুড়ি চালিয়ে উদ্দাম বেগে আত্মক্ষয়ের পথে ছুটবে।

যোগসিদ্ধির এই প্রথম পরিচ্ছেদের বক্তব্য সংক্ষেপে সুতরাং এই দাঁড়াচ্ছে যে, জীবনই যোগ; যোগ-সাধনা জীবন থেকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি ছাড়া বা বিপরীত কিছুই নয়। মানুষের অস্ফুট সহজ জীবন বিকসিত হতে হতে ক্রমশঃ স্ফুট যোগ-সাধনায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বুদ্ধি মন প্রাণ ও দেহ এই চার ধামের সত্তা বা পুরুষ ও তার শক্তিগুলিকে চিনে নিয়ে তাদের শুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারলেই জীবন আপনি শতদলের মত ফুটতে থাকে, তার অনুপম সুসমঞ্জস সুষমায় ও পূর্ণতায়। যেখানে আপনাকে ও আপন বৃত্তিগুলিকে চিনে নেয়ার ব্যতিক্রম ঘটছে, সেখানে বুঝতে হবে, সে-মানুষের জাগবার সময় হয় নাই, যোগ-সাধনার শুভ মুহূর্ত্ত আসে নাই, এখনও তার কীট-জীবনই চলছে; তার পর ক্রমশঃ জীবনের ঠেলায় তার গুটি রচনার প্রেরণা স্বতঃই জাগবে, তখন সমাধিতে থেকে গুটির মাঝে নবদেহ লাভ করে গুটি কেটে আকাশে ডানা মেলবার তার আসবে পালা।

যোগ-সাধনা কি, কোন্ পথে তার আশু চরিতার্থতা আসতে পারে বলে দেবার আগে চাই যোগানুকূল মন। ভ্রান্ত ধারণাগুলির আগে করতে হবে নিরসন, নাহলে অভ্যস্ত ভুলেরই হবে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি। হিন্দুর ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র বহু দিনের জিনিষ, যুগযুগান্ত ধরে আর্য্যপুত্ররা এ পথে করেছেন গতি-বিধি। এত দিনে তাই অনেক ভ্রান্তি, সংস্কার ও পুরাতন মিলে অচলায়তন হয়ে পথকে করেছে কণ্টকাকীর্ণ। সহজ হয়ে গেছে জটিল, সুগম হয়ে পড়েছে দুর্গম ও দুর্ব্বোধ্য; লক্ষ্য হয়ে গেছে ঝাপ্‌সা ও অস্পষ্ট। উপকরণ গ্রাস করে বসেছে উদ্দেশ্যকে, সাধ্য গেছে হারিয়ে। এই সব এড়িয়ে সবল ঋজু দৃষ্টি নিয়ে সহজকে আবার অনাড়ম্বর হয়ে ধরতে হবে, নিছক সত্যানুসন্ধানকেই করতে হবে লক্ষ্য। আবার যোগ-সাধনায় এই অতি-সহজ পথটি নির্দ্দেশ করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ পথ যে কত খাঁটি, তা পরখ করে বাজিয়ে নিলেই চলবে। এ পথ সকল যোগ-পথেরই অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

অগ্রহায়ণ

অবন্তী সান্যাল

ভীরু আশা আর বোবাকান্নার অশ্রু-জল
বুনেছি মাটিতে; সোনাফসল
প্রাণকল্লোলে আকাশে তুলেছে হাজারো হাসি।
মৃত স্বপ্নেরা হয়েছে বাসি;
রঙসে এলানো মাটির মমতা গেয়েছে গান—
কাঁচা সোনা ধান—শুধুই ধান।

জানি চিরকাল ভয়-সঙ্কুল এ বালুচর—
ভালবাসা পেয়ে, ভালবাসা দিয়ে পরস্পর
বারে বারে তবু লিখেছি নাম;
হিসাব রাখি না কত বা পেয়েছি কত দিলাম।
বহু ভয়ে, বহু বিজয়ে তাই ত বেঁধেছি ঘর।
তবু ঝড় এল ভয়ঙ্কর।

অগ্নি-লক্ষ্যে তাকাল' কখন চৈত্রমাস—
সোনার ফসলে সর্ব্বনাশ।
ভীরুস্বপ্নের মৃত্যুতে তাই ললাট হানি,
দুনিয়ার হালচালের খবর আমি কি জানি!
মমতার মোহে তবুও করেছি যে সঞ্চয়
জানি আজ শুধু ভাগ্যের দোষে আমার নয়।

বিচারের টানে সহরে এলাম অনিচ্ছায়
উপোসী রক্ত অন্ন চায়।
বলি বার বার সেই যে আমার অশ্রু-জল
ফলালো মাটিতে সোনাফসল—
যতটুকু হোক দাও আজ হব খুসী তাতেই।
অন্ন নেই—অন্ন নেই
ফিসফিস সুরে কথা বলে যত ইট-পাথর
মেলেনি অন্ন সে জনারণ্য নিরুত্তর।
দুনিয়ার হালচালের খবর আমি কি জানি।
ভীরুস্বপ্নের মৃত্যুতে শুধু ললাটই হানি।
অবশেষে তাই কঙ্কালে গাঁথা সড়ক ধ'রে
এলাম আবার মমতা কঠিন মাটির ক্রোড়ে।
শ্রাবণে কখন অগোচরে বুঝি নেমেছে ঢল
সহবেদনার অশ্রু-জল।
আশ্বিন গেল, গেছে কার্ত্তিক, পৌষ আসে
সবুজ ধানের ঊর্দ্ধে সোনালী রৌদ্র হাসে।
ভাঙ্গা ঘর জোড়াতালি দিয়ে তাই আবার গড়ি
সঞ্চয় চাই—জীবন-খেয়ার ন্যায্য কড়ি
শ্মশান-মাটিতে চাপা পড়ে গেছে সর্ব্বনাশ।
এবারও আসে কি চৈত্রমাস?

রাত্রির তপস্যা

(উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভূপেন্দ্র সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশের ছাত্র। সে কবিতা লেখে, কলেজ-ম্যাগাজিনে গরম-গরম প্রবন্ধ দেয়, ছাত্র-ফেডারেশান লইয়া মাতামাতি করে, বিজয়লালের কবিতা রাত জাগিয়া মুখস্থ করে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লাফাইতে থাকে এবং জওহরলালজীকে দেখিবার জন্য তিন ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বরভোগ করে। অর্থাৎ এক কথায় সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে যাহা করা স্বাভাবিক তাহাই করে। এবং কেহ যদি তাহাকে এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয় ত চটিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

বন্ধু-বান্ধবদের উপর ভূপেনের অবজ্ঞার সীমা নাই। পৃথিবীতে এত আহাম্মক লোক আছে—আশ্চর্য্য! এই নির্ব্বোধ লোকগুলির সঙ্গেই তাহাকে দিন-রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটাইতে হয়, সে জন্য তাহার পরিতাপের সীমা থাকে না, অথচ সে এই নির্ব্বোধ লোকগুলির কাছেই নিজের অদ্ভুত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া যে অপরিসীম আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ইহাও সত্য কথা। বাবাকে সে একটু করুণার চোখে দেখে। তিনি দরিদ্র এবং সেই হেতু অত্যন্ত নির্ব্বোধ, সন্দেহ নাই; তবে তাঁহার সামান্য উপার্জ্জন দিয়াই তিনি প্রাণপণে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন, এই প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট মনে করিয়া ভূপেন তাঁহাকে মার্জ্জনা করে। নিজে একটা ট্যুইশনি করিয়া নিজের সাবান, স্নো, শ্লিপার প্রভৃতির খরচা সংগ্রহ করে, আর তাহার একান্ত মূল্যবান্ সময়ের অনেকখানি এই ভাবে নষ্ট হয় মনে করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে।

প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্রদের মতই ভূপেনের বিশ্বাস যে, তাহার চিন্তা ও জীবন-যাত্রায় সে অসাধারণ! এবং প্রায় সমস্ত আধুনিক বাঙালী ছাত্রদের মতই সে শেলী ও বার্ণার্ড শ'র অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণের ফল। প্রেমকে বলে সে লিভারের অসুখ, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বলে সেণ্টিমেণ্টাল রাবিশ, অথচ শরৎচন্দ্রের চমকপ্রদ প্রেমের কাহিনী পড়িয়া রাত্রে তাহার ঘুম হয় না এবং কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতাংশ উদ্ধার করে। রোমাণ্টিক চিন্তায় ও কল্পনায় প্রায় দিন-রাতই ডুবিয়া থাকে, যদিচ মুখে আওড়ায় বার্ণার্ড শ'!

খালি একটা ব্যাপারে তাহার কিছু অসাধারণত্ব সত্যই ছিল। তাহার স্কুল ও কলেজের অন্যান্য বন্ধুরা ইতিমধ্যেই মেয়েদের প্রেমে পড়িয়াছে, পড়িতেছে কিম্বা সম্প্রতি ক্লান্ত হইয়া ও-বস্তুটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে—এই কথাটা সে নিত্য শোনে, কিন্তু তাহার নিজের এখনও সে সুযোগ ঘটে নাই। স্কুলে পড়িতে পড়িতেই যাহারা প্রণয়ের হাতে-খড়ি সুরু করিয়াছে, অপদার্থ-জ্ঞানে তাহাদের সে যেমন একটু ঘৃণা করে, তেমনি যে সব ছেলে সম্প্রতি প্রেমে পড়িবার অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ প্রত্যহই শোনাইতে থাকে, তাহাদের একটু হিংসা না করিয়াও পারে না! কারণ, যদিও মুখে সে বলে যে কোন মেয়ের সঙ্গেই আধ ঘণ্টার বেশী আলাপ করা যায় না, সুতরাং প্রেমে পড়াটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যাপার, আসলে কিন্তু তরুণী মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ তাহার হয় নাই, এ জন্য সে একটু দুঃখিতই।

দারিদ্র্যের জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সহিত বহু দিন হইতেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর ঠিক সেই কারণেই বন্ধু-বান্ধবদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুতরাং তরুণীদের সহিত তাহার যা-কিছু পরিচয়, তাহা শুধু বন্ধুবান্ধবদের মুখে ও আধুনিক উপন্যাসে।

টাকার প্রয়োজন যেমন তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি টাকা উপার্জ্জনের জন্য যাহারা ভূতের মত খাটে, ভূপেন্দ্র তাহাদেরই ঘৃণা করে সকলের চেয়ে বেশী। প্রায়ই সে বন্ধুবান্ধবদের বলে, 'silly goat'এর মত দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়ানোই কি মনুষ্য-জীবনের একান্ত সার্থকতা? তার কি আর কোন কাজ নেই?' অথচ ছেলে পড়ানোর টাকাটা এক দিন পাইতে দেরী হইলেই যে কি 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতি'র মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়, তাহা ভূপেনের মত কে আর অনুভব করে?

আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের নায়কের চরিত্রটা মোটামুটি ইহাই। এ-হেন ভূপেনের জীবনে সে দিন যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল সেই কথাটা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা সুরু করিব।

তিন দিন পর-পর ছুটি গিয়াছে, আজ চতুর্থ ও শেষ দিন। ঘণ্টা তিনেক দিবা-নিদ্রা দিয়া উঠিয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভূপেন সহসা অনুভব করিল যে তাহার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ নাই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুভব করি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে sudden realisation যে আমাদের পরিচিত বহু লোক থাকিলেও বন্ধুর সংখ্যা খুব কম! এবং সেই বিশেষ বন্ধু, নাটকীয় ভাষায় যাহাকে 'আত্মার আত্মীয়' বলে, তাহার প্রয়োজন মানুষের এক-একটা মুহূর্ত্তে বড় বেশী হইয়া পড়ে।

ভূপেনেরও সে দিন সেই অবস্থা। তাহার অনুরক্ত সহপাঠীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু মনে মনে তাহাদের চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কেহ কোন দিন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আজ সে বোধ করি প্রথম বুঝিতে পারিল যে, অন্তরঙ্গ কাহাকেও তাহার দরকার! বিশেষ প্রয়োজন! সুরেশ বেশ হাসাইতে পারে, কিন্তু বড় বেশী রকমের ভাসা ভাসা; নিখিলের সঙ্গ আধ ঘণ্টার বেশী সহ্য করা যায় না, বঙ্কিম পড়াশুনা ঢের করিয়াছে, গল্প বলিতেও জানে, কিন্তু বিপদ হইতেছে এই যে, সে উত্তম-পুরুষ-সংক্রান্ত গল্প ছাড়া একটি কথাও বলে না এবং যত কিছু কথা বলা সে একচেটে করিতে চায়। একমাত্র বিশু, বিশুর সহিত এই সময়টা কাটানো চলিত, কারণ, তাহার সবচেয়ে বড় গুণ, সে কথা বলে কম—কিন্তু, দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত তাহার কথাই মনে পড়িল, বিশু দেশে গিয়াছে। অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্ত্তে যাহার কাছে যাওয়া যায়, এমন একটিও বন্ধু-বান্ধব তাহার নাই।

কিন্তু 'এমন দিনে' ঘরে থাকাও অসহ্য, সুতরাং জামাটা গায়ে চড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়া ছাড়া উপায় নাই। ভূপেনও

বাহির হইয়া পড়িল। সিমলার সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়াই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কিন্তু সে দিন সে পথও যেন জনহীন বলিয়া বোধ হইল। ভালো লাগিল না। তখন সে স্থির করিল, একা হাঁটিতে হাঁটিতে ইডেন গার্ডেনেই যাইবে।···

চলিতে চলিতে তাহার ভালোই লাগিল। আকাশটা মেঘলা করিয়া আছে বলিয়া গরম সে একটু বেশী, তবু সবটা জড়াইয়া মোটের উপর ঘরের চেয়ে অনেক ভালো। বৌবাজার পার হইয়া উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে বেশ জোরে জোরে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই এক সময়ে ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু এতক্ষণ, বোধ করি উৎসাহের আতিশয্যেই, আকাশের দিকে সে একবারও চাহিয়া দেখে নাই, এখন হঠাৎ গড়ের মাঠের রাস্তায় পড়িতেই বড় বড় জলের ফোঁটা নামিতে সুরু করিল। তখন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, যে-কোন আশ্রয়ে পৌঁছিতে গেলেও অন্ততঃ দশ-পনের মিনিট পথ হাঁটিতে হইবে! এধারে জলও বেশ জোরে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন মাঠের পথ ধরিলেও চৌরঙ্গী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভিজিয়া যাইবে। সুতরাং আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া একটা বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় লইল এবং নিজেকে 'নির্ব্বোধ' 'ইডিয়ট' বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া যে সে আরও কত আহাম্মকি করিল তাহা বোঝা গেল আর একটু পরেই! বৃষ্টির বেগ ত কমিলই না, বরং ক্রমশঃ তাহা মুষলধারায় পরিণত হইল। গাছের পত্রাচ্ছাদনে সে-জল বাধা মানিল না, দেখিতে দেখিতে জামা-কাপড় ভিজিয়া আড়া কাকের মত অবস্থা দাঁড়াইল তাহার। অথচ তখন সেটুকু আশ্রয়ও ছাড়া চলে না— জলের এমনি বেগ!

আরও মিনিট-দশেক এই ভাবে কাটিবার পর যখন ব্যাপারটা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় পিছন হইতে সহসা একখানা প্রকাণ্ড গাড়ী হুস্ করিয়া আসিয়া ঠিক তাহারই সামনে সশব্দে ব্রেক কষিল! ভূপেন বিস্মিত হইল! মোটর-ধারী কোন লোকের সহিত তাহার পরিচয় নাই, থাকিবার কথাও নয়। সে অবাক্ হইয়া গাড়ীটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় একটা কাচের গবাক্ষ একটু নামিয়া গেল এবং বছর দশ-এগারোর একটি ফুটফুটে মেয়ে মুখ বাড়াইয়া কহিল,—ও মশাই, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আসুন আসুন—গাড়ীর মধ্যে এসে উঠুন।

ভূপেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি আবার কহিল,—চলে আসুন না চট্ করে! আমি শুদ্ধ ভিজে গেলুম যে। কি জ্বালা!

ভূপেনের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই, তবু সে কহিল, —কিন্তু আমি যে ভীষণ ভিজে গেছি খুকী, গাড়ীতে উঠ্‌লে গাড়ীময় জল হয়ে যাবে।

সে জবাব দিল,—তা হোক্, আমাদের চামড়ার গদি, কিছু হবে না। চলে আসুন।

সে দুয়ারটা ফাঁক করিয়া ধরিল। অগত্যা ভূপেন গাছতলা ছাড়িয়া কোন মতে গিয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটিও দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া জানলার কাচ তুলিয়া দিল।

গাড়ী ততক্ষণে চলিতে সুরু করিয়াছে। ভূপেন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও মাথা মুছিতে মুছিতে একবার গাড়ীর মধ্যে চোখ বুলাইয়া লইল। সেই মেয়েটি ছাড়া গাড়ীতে আর কোন আরোহী নাই, থাকিবার মধ্যে আছে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শোফেয়ার। মস্ত বড় গাড়ী এবং শোফেয়ারের উর্দ্দি মালিকের ধনাঢ্যতার পরিচয় দেয়—যদিচ মেয়েটির বেশভূষা নিতান্তই সাধারণ, সাদা আদ্দির ফ্রক ও হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি। না আছে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য, গায়ে রেশমের বাহার!

জামা হইতে জল গড়াইয়া চামড়ার গদীর খাঁজে ততক্ষণে পুকুর সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ভূপেন সে দিকে একবার কুণ্ঠিত ভাবে চাহিল, কিন্তু কি করা কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিল না। মেয়েটি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া জলের দিকে চাহিয়া কহিল,—জামাটা খুলে বসুন না, নাহলে আপনার অসুখ করতে পারে। যা জল, বাবা!

জামাটা খুলিতে বোধ হয় ভূপেনের লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়া জামা খুলিয়া সামনের চক্‌চকে লোহার আনলায় ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বসিতে তাহার হুঁশ হইল যে, গাড়ী কোথায় যাইতেছে তাহা জানা দরকার এবং সে নিজেও কোথায় যাইতে চায় তাহাও জানানো দরকার। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—তোমরা এখন কোন দিকে যাবে খুকী?

খুকী তাহার ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল, কহিল, আমার নাম সন্ধ্যা। তবে খুকী বলে আমায় দাদু ডাকেন।··· আমরা এখন বাড়ী যাচ্ছি।

ভূপেন প্রশ্ন করিল,—কোথায় বাড়ী তোমাদের?

—এই যে, চোরবাগানে। ঐখানেই আমরা নাব্‌ব। আপনি ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে, ওখান থেকে চা খেয়ে তার পর বাড়ী যাবেন, কেমন?

এইটুকু মেয়ের এতখানি সৌজন্যে ভূপেন বিস্মিত হইল। কিন্তু কহিল,—না, আর জামা-কাপড় ছাড়বার দরকার হবে না, আমার বাড়ী ঐ কাছেই। আমি সিমলেয় থাকি! চোরবাগান থেকে আর কতটুকু! চট্ ক'রে চলে যাব এখন।

সন্ধ্যা তাহার নিবিড় অথচ খাটো চুলের গুচ্ছ দুলাইয়া কহিল, পাগল না কি! এত ভিজে কাপড় পরে থাকলে আপনার অসুখ করবে যে! সে আপনি কিছু ভাববেন না, আমি দাদুর একটা ফর্সা কাপড় আর একটা গেঞ্জি দিয়ে দেবো'খন, তার পর বাড়ী চলে যাবেন, তার পর সময় মত এক দিন ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ভূপেনের কৌতুক বোধ হইল। সে কহিল,—দাদুর কাপড় দিয়ে দেবে, দাদু যদি রাগ করেন?

—ইস্!

সন্ধ্যা করুণার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কহিল, দাদুর বাড়ীর গিন্নীই ত আমি। দাদুর ক'খানা কাপড়-জামা, দাদু কি কিছু খবর রাখে না কি? যা করি সবই ত আমি। সগর্ব্বে সে আর একবার মাথাটা দুলাইল।

গাড়ী ততক্ষণে চোরবাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই বিরাট একটা বাড়ীর ফটকের মধ্য দিয়া গাড়ী-বারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিল।

সাবেক কালের বাড়ী। এখন কিছু হয়ত মলিন, কিন্তু অন্যান্য সাবেকী বাড়ীর মত হতশ্রী নয়। বাড়ীওয়ালার ঐশ্বর্য্য যে শুধু এখন বাড়ীর ইট ক'খানাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই, চাহিলেই তাহা বুঝা যায়।

গাড়ী থামিতেই এক দারোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সেলামটা গ্রহণ করিল; তাহার পর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল,—আসুন, আসুন, চট্ করে নেমে আসুন।

কিন্তু বাড়ী ও দারোয়ানের পোষাক দেখিবার পর ভূপেনের সেখানে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, বিশেষতঃ সেই অবস্থায়। সে নামিল বটে, কিন্তু জামাটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল,—থাক্—এটুকু আমি হেঁটে চলে যাই। জল ত কমে এসেছে।

সন্ধ্যা কিন্তু তাহার কথায় কান দিল না। কহিল,—কিচ্ছু জল কমেনি। আপনি আসুন ভেতরে, তার পর দেখা যাবে।

অগত্যা ভূপেনকে ভিতরে আসিতে হইল। লজ্জায় তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কোন মতে ঘাড় গুঁজিয়া সে সন্ধ্যার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, চারি দিকে ভৃত্যের দল কৌতূহলী হয়ত বা পরিহাসের দৃষ্টি মেলিয়াই চাহিয়া আছে।

একটা দালান পার হইয়া ভিতরের একটা ঘরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যা হুকুমের স্বরে কহিল,—এইখানে দাঁড়ান লক্ষ্মী ছেলের মত—আমি কাপড়-জামা নিয়ে আসছি।

সে চলিয়া গেল।

ভূপেন অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া ঘরের চারি দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মাঝারি সাইজের ঘর, একপাশে দেওয়ালের দিকে দুটি-দুই আলমারীতে কতকগুলা আইনের বই এবং বাঁধানো মাসিক পত্র পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে। মধ্যে একটা টেবিল, তাহাতে ছেঁড়াখোঁড়া কতকগুলা বই-খাতা ছড়ানো এবং খান-দুই চেয়ার। আর কোন সরঞ্জামই নজরে পড়ে না। বোধ হয়, এই ঘরে বসিয়াই মেয়েটি লেখাপড়া করে।

মিনিট-খানেক পরেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানা ধোপদোস্ত কাপড়, একটা তোয়ালে, আর ধোয়া গেঞ্জি। কাপড়-জামাগুলা হাতে দিয়া কহিল, নিন্, পরে ফেলুন। ইস্—কি ভেজাই ভিজেছেন!

সত্যই ভূপেনের তখন কষ্ট হইতেছিল। বহু ক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিবার ফলে শীত করিতেছিল রীতিমত। সে আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলো ছাড়িয়া ফেলিল এবং তোয়ালে দিয়া ভিজা মাথাটা মুছিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল।

নিজেই সে ভিজা কাপড়-জামাগুলা তুলিয়া লইতেছিল, বাধা দিয়া সন্ধ্যা কহিল,—ও থাক। ও আমি কাচিয়ে কাগজ জড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক করে। আপনি এখন চলুন ও ঘরে, চা আনতে বলেছি। তাহার পাকা গৃহিণীর মত চাল-চলন দেখিয়া ভূপেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল, আবার চা-ও খাওয়াবে!... চলো, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দাদু কোথায়? তোমার বাবা-মা?

তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা জবাব দিল,—বাবা-মা আমার কেউ নেই। ভাই-বোনও নেই—শুধু আমি আর দাদু। কথাটা সে বেশ সহজ ভাবেই কহিল, কিন্তু ভূপেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অপ্রস্তুতও হইল। তাড়াতাড়ি কহিল,—তোমার দাদু বাড়ী আছেন ত?

—না, তিনি এখনও আদালতে। আমাদের যে গাড়ী পৌঁছে দিলে, সেই গাড়ীই গেছে তাঁকে আনতে।

এবার তাহারা যে ঘরটিতে আসিল সেটি বৈঠকখানাই। মহার্ঘ্য আসবাব-পত্র এবং কৌচ-কেদারায় পরিপূর্ণ। একটা গদী-আঁটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সন্ধ্যা নিজে একটা 'সেটী'তে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—আপনি কি করেন?

প্রশ্নটা ঐটুকু মেয়ের মুখে একেবারেই মানায় না। কিন্তু তবু তাহার প্রশ্ন করিবার ভঙ্গীতে এমন সারল্য ছিল যে, ভূপেন বিরক্তি বোধ করিল না, বরং প্রসন্ন মুখেই জবাব দিল,—কলেজে পড়ি।

—আর কি করেন?

—আর?

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, আর ছেলে পড়াই।

এতক্ষণে বোধ হয় সন্ধ্যার একটু সম্ভ্রম বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ তাহার ডাগর চোখ দু'টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কি পড়ান তাদের?

—সব। অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, আরও কত কি!

—ও!

ইহার পর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে চা আসিয়া পৌঁছিল। একটা ডিসে দু'টি সন্দেশ, দু'খানি নিমকি এবং সুন্দর একটি কাপে এক-কাপ চা।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল,—তুমি চা খাবে না?

সন্ধ্যা জবাব দিল,—দাদু না খেলে আমি খাই না। আপনি খান।

ভূপেন কহিল,—কিন্তু সে যে বড় খারাপ দেখাবে খুকী!

সন্ধ্যা মাথা দুলাইয়া কহিল,—কিছু খারাপ দেখাবে না। আপনি ভিজে এসেছেন ভীষণ, আমি ত আর ভিজিনি।

অগত্যা ভূপেন খাবারের ডিসে মন দিল। খাবার শেষ করিয়া চায়ে সবে চুমুক দিয়াছে, এমন সময় সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, একটা কাজ করবেন?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি কাজ?

—আপনি আমাকে পড়াবেন? পড়ান না!

ভূপেন সহসা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। কহিল—কেন, যিনি তোমাকে পড়াচ্ছেন, তাঁর কি হলো?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল,—তিনি দিন-পনেরোর ওপর হলো দেশে চলে গেছেন। সেখানকার ইস্কুলে তিনি কাজ পেয়েছেন, তাই আর ফিরবেন না!

তবু ভূপেন কোন জবাব দিতে পারিল না! এমন প্রস্তাবে কি-ই বা জবাব দেওয়া যায়! সে নীরবে চা পান করিতে লাগিল। সন্ধ্যা কিন্তু তাহার মৌনভাবকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইল। খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—তাহলে ঐ কথাই রইলো, কাল থেকে আপনি, কেমন? বা, এই বেশ হলো!

ভূপেন হাসিয়া কহিল,—তুমি ত দিব্যি সব ঠিক করে ফেললে, কিন্তু তোমার দাদু যদি রাজী না হন?

সন্ধ্যা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—আপনি বড় বোকা মাষ্টার মশাই। আমি পড়ব, দাদু রাজী হবেন না কেন?··· আচ্ছা, বেশ, ঐ ত দাদু এসে গেছেন, ওঁকে এখনই জিগ্যেস্ করছি।

সত্যই গাড়ী তখন ফটক পার হইতেছে। এক প্রিয়দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাহেবী পোষাক পরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সরাসরি তাহাদের ঘরেই প্রবেশ করিলেন। টুপিটা চাকরের হাতে দিয়া সহাস্য বদনে প্রশ্ন করিলেন,—গিন্নী কখন এলে গো?

সন্ধ্যা জবাব দিল,—আমাকে পৌঁছেই গাড়ী গিয়েছিল তোমাকে আনতে।

সন্ধ্যার দাদুর নাম মোহিত রায়। মোহিত বাবুর এতক্ষণে চোখ পড়িল ভূপেনের দিকে। তিনি লজ্জিত-জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ভূপেন ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু সন্ধ্যা বেশ সপ্রতিভ জবাব দিল,—উনি আমার নতুন মাষ্টার মশাই।

—নতুন মাষ্টার মশাই? বিস্মিত হইয়া মোহিত বাবু প্রশ্ন করিলেন।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ। আজ যখন পিসিমার ওখান থেকে ফিরলুম, দেখি, উনি গড়ের মাঠের এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। সঙ্গে করে তাই এনেছি, কাল থেকে উনিই আমাকে পড়াবেন। সে সব কথা ঠিক করে ফেলেছি।

ইহার উত্তরে কিছু তিরস্কারই ভূপেন আশা করিয়াছিল, কিন্তু মোহিত বাবু একটু হাসিলেন। কহিলেন,—ঠিক করে ফেলেছ, একেবারে? বেশ ত!

তাহার পর একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—তোমার নামটি কি বাবা?

ভূপেন এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়িল! সে মোহিত বাবুর প্রশ্নের উত্তরে নাম-ধাম-পেশা সবই খুলিয়া বলিল! সব শুনিয়া মোহিত বাবু কহিলেন,—তুমি সত্যিই ওকে পড়াতে পারবে বাবা?

ভূপেন মাথা নীচু করিয়া জবাব দিল,—আপনি যদি আদেশ করেন ত চেষ্টা করি।

মোহিত বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন,—না, না, আদেশ করার কথাই নয়। আমার ও গিন্নী আবার এক-রকমের মানুষ। মাষ্টার ওঁর সহজে পছন্দ হয় না, পছন্দ না হলে পড়তে চান না একটি বর্ণও। অথচ যাকে ভালো লাগে তাঁর কাছে একেবারে ভেরি গুড্ গার্ল!···তুমি যদি পারো ত আমি বেঁচে যাই। ক'দিন ধরেই ভাবছি যে আবার কে আসবে!

ভূপেন কহিল,—কোন্ ক্লাসে পড়ে ও?

—উঁহু, ক্লাসে-টাসে নয়। ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। মেয়েদের ইস্কুলে লেখাপড়া যা শেখানো হয়, তা আমি জানি। মেয়ে-মাষ্টারণীও ঠিক সেই কারণে আমি রাখি না। দু'-এক জনকে চেষ্টা ক'রে দেখেছি—লেখা-পড়া ওরা কিছু জানে না। আর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে সব মেয়ে ইস্কুলে যায় তাদেরও ত দেখি —ইস্কুলে গিয়ে শেখে শুধু নানারকম করে প্রসাধন করতে, সুর করে কথা বলতে, কতগুলো মুদ্রাদোষ অভ্যাস করে এবং—থাক, তুমি ছেলেমানুষ!

ভূপেন একটু হাসিল শুধু।

—তোমার ও হাসি আমি জানি বাবা, অর্থাৎ আমার এটা বাড়াবাড়ি, এই ত? তাহোক্—আমি সেকেলে মানুষ, আমার মত অত সহজে বদলায় না। ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। বাড়ীতেই পড়ে। তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড একটা ঠিক আছে বৈ কি! বোধ হয় ক্লাস সিক্স্-এর মত হবে। এখনও আলজেব্রায় হাত দেয়নি।

ভূপেন কহিল, আচ্ছা, সে আমি দেখে নেবো এখন।

তাহার পরের কথাটা সে লজ্জায় উত্থাপন করিতে পারিল না। তাহার এই অল্প-বয়সের অভিজ্ঞতাতেই এটা জানিতে পারিয়াছিল যে যাহারা 'বড়লোক' নয় শুধু ধনী, তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া না লইলে পরে ঠকিতে হয়। কিন্তু মোহিত বাবুকে ঠিক কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা উচিত, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

মোহিত বাবু নিজেই কিন্তু কথাটা পাড়িলেন। সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—গিন্নি, একটু ওঘরে যাও ত।···হ্যাঁ বাবা, কাজের কথাটা বলে নিই। সকালে বিকেলে যখন খুশী তুমি পড়িও, সময়ের হিসেবও আমি নেবো না। দরকার মতো দু'ঘণ্টাও পড়াবে আবার উভয় পক্ষের সুবিধা মতো দশ মিনিট পড়িয়েও চলে যেতে পারো—দু'দিন কামাই করলেও কিছু বলব না। কারণ, আমি জানি এটা বাজারের কেনা-বেচা নয়, কাঁটায় কাঁটায় তৌল করতে গেলে ঠকতে হয়। বিশেষ আমি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে মাষ্টারদের বেতনের কথাটা তুলতেই চাই না, তাতে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হতে পারে। ···কিন্তু একটা কথা, আমি ইস্কুলে দিইনি কি কারণে তা ত শুনলে, আমি চাই ওকে সত্যিকারের লেখাপড়া শেখাতে। ওরও জ্ঞান-পিপাসা আছে খুব, তা আমি জানি। ওকে বাইরের বই পড়াতে চাই, তোমাকেও পড়ে তৈরী হতে হবে। দরকার হলে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে যাবে, অসুবিধা হয় বই কিন্‌বে, আমি দাম দেবো। কিন্তু ও যেন সব প্রশ্নের জবাব পায়। তুমিই ওর জন্য গল্পের বই বেছে দেবে—লিষ্ট ক'রে সরকারকে দেবে, সে কিনে আনবে। এতে রাজী আছো ত?

ভূপেন ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল,—তাতে আর আপত্তির কি আছে বলুন? পড়ার ইচ্ছা জানবার ইচ্ছা আমারও কম নয়। তবে—

—'তবে'র ব্যবস্থা করব বই কি বাবা।···আগের মাষ্টার মশাইকে আমি ত্রিশ টাকা দিতুম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দিতেও আপত্তি নেই। তুমি খুশী হয়ে আমাকে খুশী করবে, এই আমি চাই।

ত্রিশ টাকা! ভূপেনের মনে পড়িল বর্ত্তমান ট্যুইশনিটির কথা, দু'ঘণ্টা পড়াইয়া আট টাকা পায় মোটে। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট। বেশ, কাল থেকেই আমি আসব তবে সন্ধ্যের সময়?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময়ই ভালো।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিত বাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ডাক দিলেন,—গিন্নি, কোথায় গো? তোমার মাষ্টার মশাই বাড়ী যাচ্ছেন যে।

সন্ধ্যা কাছেই কোথায় ছিল, সে একটা খবরের কাগজের পুলিন্দা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

—এই নিন্ আপনার ভিজে কাপড় জামা।

মোহিত বাবু কহিলেন,—তাহ'লে উনি কাল থেকেই আসবেন। বুঝলে, তৈরি থেকো। এখন ওঁকে প্রণাম করো। উনিই তোমার মাষ্টার মশাই হলেন।

ভূপেন বিব্রত হইয়া কোন বাধা দিবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া একেবারে পায়ের ধূলা লইল।

মোহিত বাবু ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, না, না, বাবা! আমি এখানে অন্ত কোন সামাজিক নিয়ম মানি না। গুরু আর ছাত্রের সম্পর্ক যতটা সম্ভব শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভালো, তাতে শুধু যে ছাত্রের ভালো হয়, তাই নয়, গুরুকেও সতর্ক থাকতে হয়। ফল পাওয়া যায় ভালো।

ভূপেন তাঁহাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

২

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। ঘটনাটা যদি কোন বন্ধুকে আগাগোড়া শোনানো যায়, তাহা হইলে সে রীতিমত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিবে হয়ত—অবশ্য মেয়েটির বয়স বাদ দিয়া বলিলে। নাটকীয় রোমান্সের কিছুই বাকী নাই, শুধু ঐ একটা বড় রকমের ফাঁক, নায়িকা নিতান্ত বালিকা! রোমান্সের সাধ তাহার মনে ইদানীং দেখা দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সাধ লইয়া ভগবান যে এমন পরিহাস করিবেন, তা কে জানিত!

তা হোক্—তবু ত্রিশ টাকা অনেক টাকা। বহু দিনের সখ একটা টেবিল-ল্যাম্পের। প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই কেনা যাইতে পারে। খান-দুই ভালো চেয়ারেরও বড় অভাব! সব চেয়ে বড় অভাব যেটা, একটা স্বতন্ত্র ঘরের। সকলে মিলিয়া দু'খানা ঘরের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিলে আর যাহাই হউক, পড়া হয় না। বাড়ীওয়ালাকে বলিয়া বর্ত্তমান ভাড়ার উপর গোটা চার-পাঁচ টাকা বাড়াইলে হয়ত তিন তলার টালির ঘরটা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়—নীচেকার কোন গোলমাল সেখানে পৌঁছায় না।

পুরাতন ট্যুইশনিটা অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু এখন নয়। ভূপেন্দ্র টাকা-কড়ির ব্যাপারে যতই ঔদাসীন্ত দেখাক, অভাবের সংসারে কতকগুলা সাধারণ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। এ ট্যুইশনিটি টেঁকে কি না তাহার ঠিক কি? এখন বলিয়া কহিয়া দিন-দশেকের ছুটী লইলেই চলিবে। দিন-দশেকের মধ্যে আর মোহিত বাবুদের চেনা যাইবে না? নিশ্চয় যাইবে। তখন হয় মোহিত বাবু, নয় পুরানো মক্কেল—যাহাকে হউক জবাব দিলেই চলিবে।

কিন্তু আজও ট্যুইশনি আছে। আজিকার দিনটা অন্ততঃ সারিয়া আসা দরকার, নহিলে অভদ্রতা হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলি বোনের হাতে দিয়া চা তৈরী করিতে বলিল। দু'টি অনূঢ়া বোন তাহার, কিন্তু তার জন্ত ভূপেনের দুঃখ ছিল না। বোন থাকায় অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও কম নাই। অহরহ হুকুম করা যায়, এবং তাহারাও কলেজী-দাদার ফরমাশ খাটাকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।

বোন শান্তি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—এ কাপড়-জামা কোথা থেকে এল আবার?

—ও আমার এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বদলে এসেছি; কাল ফেরৎ দিলেই চলবে। ভূপেন সংক্ষেপে জবাব দিল। তাহার বাবাকে সে চেনে, বেশী মাহিনার ট্যুইশনির সংবাদ কাণে গেলে আর রক্ষা থাকিবে না, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার-খরচের জন্ত কিছু দাবী করিয়া বসিবেন। এম্‌নিতেই বলেন, মাসে মাসে আটটা করে টাকা পাস্, কি করিস্? কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম সবই ত আমি দিই, তোর এত কিসের খরচ?···

ভূপেন খাবার ও চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার দেরী নাই। বাগবাজারে তাঁহাদের ওখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সাড়ে সাতটা বাজিয়া যাইবে—বাড়ী ফিরিতে দশটা। কোন মতে জামাটা কাঁধে গলাইতে গলাইতে সে দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

সদরের কাছে নীচের তলার ভাড়াটে অবিনাশ বাবুর সহিত দেখা। রোগা, একহারা চেহারা, পান-দোক্তার কষ দুই চোয়ালে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে; ফলে দাঁত ও মুখ-গহ্বর সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ। সে দিকে চাহিলে যেন ভয় করে—হাতে একটা আধ-খাওয়া বিড়ি এবং ময়লা হাফ-সার্ট। যখনই দেখা হয়, এই চেহারাই ভূপেনের নজরে পড়ে। আজও তাহার অন্তথা হইল না, পাকা উচ্ছের বীচির মত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন,—কি বাবাজী, দেশলাইটা দেবে একবার?

ভূপেনের কাছে তিনি পূর্ব্বেও বার-কয়েক এ চেষ্টা করিয়াছেন। সে অসহিষ্ণু ভাবে কহিল,—আপনাকে আর কতবার এ জবাব দেব, কাকা-বাবু, যে আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না।

মুখে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া অবিনাশ কহিলেন,—কি রকম যে কলেজে পড়ো, বুঝি না। কলেজের ছেলে সিগারেট খায় না, এ শুনিনি কখনও। আমরাও এককালে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলুম হে, তখন সিগারেট খেলে মাথা ঘুরত, তবু জোর করে খেতুম, নইলে অন্ত ছেলেরা ঠাট্টা করত। যাক্ বাবা, **Better late than never** ওটা ধরে ফেলো—আমাদের একটু সুবিধে হয়।

রাগে ভূপেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে জবাব দিল,—ধরতে ত বলছেন, শেষে আপনার মতো অবস্থা হবে ত, এর-ওর কাছে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে! খরচা দেবে কে?

—আহা বাবাজী, তোমরা খালি মাথা-গরম করতেই পারো, সুবিধে গুলো ভেবে দেখো না। ঐ তোমাদের দোষ। বলি তবে ট্যুইশনি করো কি করতে? যেখানে যাবে আগে ছাত্রটিকে ঐ নেশা ধরিয়ে দেবে। ব্যস্, তার পর আর কোন গোলমাল নেই! সে ব্যাটা বাপের পকেট মেরে দামী সিগারেট কিনবে আর তুমি তার মাথায় হাত বুলোবে। ও ভারী সুবিধে। আমিও ত ট্যুইশনি করেছি ঢের, যেখানে যেতুম, আগে ঐ নেশাটি ধরিয়ে দিতুম। ওতে কোন পাপ নেই বাবাজী। ধরবেই ত, দু'দিন আগে আর দু'দিন পিছে—

তাঁহার নির্লজ্জতায় ভূপেন নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। বয়স্ক লোক, ইহার পর জবাব দিতে গেলে মারামারি করিতে হয়। সে এক-রকম তাঁহাকে ধাক্কা দিয়াই সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু পথে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাগুলি মনে করিয়া তাহার মন বিষাক্ত হইয়া রহিল।

তাহার পুরাতন ছাত্রদের বাড়ী বাগবাজারের একটা গলির ভিতরে। ছোট বাড়ী। একটি মাত্র বাহিরের ঘর, তাহারই মাঝে একটা মোটা চটের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দু'ভাগ করা হইয়াছে, এক দিকে কর্ত্তা সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া তাস খেলিতে বসেন, আর এক দিকে ছেলেরা পড়ে। ফল হয় এই যে, তাঁহাদের পাশবিক চীৎকারে ছেলেরা পড়ায় মন দিতে পারে না, বার বার অন্তমনস্ক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়েই রসনাকে ভদ্র ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না, খেলায় হারিবার মাথায় এমন সব কথা বাহির

হইতে থাকে সে, কোন মতেই শিক্ষক-ছাত্র একত্র বসিয়া শোনা যায় না। আগে আগে ভূপেন এ সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্ত্তা বলিয়াছেন, তা বাপু, নিজের বাড়ী থাকতে কি ফুটপাথে বসে তাস খেলব? তা ছাড়া এ-ত তাসখেলা, কোন বদ-খেয়ালী ত করি না। তাস ত বাপ-ছেলেতে বসে খেলা যায়।

আর এক দিন বলিয়াছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি, অমনি মাষ্টারদের ওপর নজর রাখাও হয়। মাষ্টারদের তো জানি, ফাঁকি দিতে পেলে আর কিছু চান না। দু' ঘণ্টা পড়ানো—তা-ও যেন বাঘ মনে হয় তাঁদের কাছে।

ভূপেন আর কিছু বলিবার চেষ্টা করে নাই। পড়ানো বলিতে ইঁহারা ঘণ্টাটাই বোঝেন। তাস-খেলায় যতই উন্মত্ত থাকুন না কেন, প্রতিদিন ভূপেন বাড়ী ফেরার সময় ঘড়ির দিকে, চাহিয়া দেখে যে দুই ঘণ্টা পূরা হইল কি-না।

সে দিনও সে যখন গেল, তখন তাঁহাদের তাসের আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। ভূপেনকে দেখিয়া একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিলেন, —কি মাষ্টার, এত দেরী যে? আমি ভাবলুম, আজ আর এলেই না। এই ভীম, ওরে ভীমে—মাষ্টার মশাই এসেছেন যে! হারামজাদা নাম্ না নীচে, তাড়াতাড়ি।

ভূপেন কোন কথা না বলিয়া পর্দ্দার ওপারে গিয়া পড়াইতে বসিল। এ ট্যুইশনি ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়। দু'টি ছেলে, একটি একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, আর একটির ক্লাস ফাইভ। ছোটটি বরং ভাল কিন্তু বড়টি যেমন নির্ব্বোধ তেম্নি ফাঁকিবাজ; আর তেমনি অসভ্য। কোন মতে দুটি ঘণ্টা কাটাইতে প্রত্যহ ভূপেনের প্রাণান্ত হয়।

আজও অঙ্ক কষিতে কষিতে বড়টি মুখ তুলিয়া কহিল,—স্যার, চণ্ডীদাস ছবি দেখেছেন? খুব না কি ভাল হয়েছে?

ভূপেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—আবার বায়স্কোপের কথা! এক দিন বারণ করে দিয়েছি না?

ছাত্র হি-হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল,—আপনি ত দেখেছেন স্যার, বলুন না কেমন হয়েছে! ···দেখব আমি নিশ্চয়ই, বাবা পয়সা না দেয়, মায়ের কাছ থেকে আদায় করবো···হি হি!

সজোরে তাহার কাণটা মলিয়া দিয়া ভূপেন কহিল,—অঙ্কে মন দাও, বাঁদর কোথাকার।

এবারে সে ক্রুদ্ধ হইল, ঘাড় হেঁট করিয়া আঁক কষিবার ভাণ করিতে করিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল,—উনি দেখতে পারেন, বাবা নিজে তিন বার দেখতে পারেন, আর আমি বললেই বাঁদর হলুম! দেখবই আমি!

ভূপেন ছোটটির দিকে মনোযোগ দিল। সে একটা লজেঞ্জেস্ মুখে পূরিয়া নামতা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভূপেন কহিল, —ও কি হচ্ছে? ওটা হয় ফেলে দাও, নয় গিলে ফেলো। লজেঞ্জস্ মুখে পূরে পড়া হয় না। সে লজেঞ্জেস্টা কড়মড় করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—দাদা আজ দুপুরবেলা আপনাকে কি বলছিল, জানেন, স্যার? বলে দিই দাদা?

দাদা সহসা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া তাহাকে ঘা-কতক চড়াইয়া দিল,—ইষ্টুপিড কমনেকার! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

ছোটটি কাঁদিল না। সে শিক্ষাই নাই তাহার। সে মুখ-চোখের চেহারা ভীষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পাগলের মত দাদার ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কীল-চড়-ঘুষি বর্ষণ করিতে লাগিল। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! টেবিলটা উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম, ছাড়াইতে গিয়া ভূপেনের উপরও দুই-এক ঘা পড়িল।

অবশেষে যখন উভয় পক্ষই শান্ত হইল, তখন ছোটটির ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বড়টির জামা গিয়াছে ছিঁড়িয়া! সে বসিয়া বসিয়া গজরাইতে লাগিল,—দেখে নেব তোমাকে, শুয়ার কোথাকার! চামড়া কেটে তাতে নুণ ছিটিয়ে দেব। শুয়ার! শুয়ার!!

ছোটটি মুখের রক্ত জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া শুধু জবাব দিল,—যা! যা!

ইহাও প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। অথচ পর্দ্দার ওপারে তাস-খেলার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। এক দিন ভূপেন নালিশ করিতে গিয়াছিল, কোন ফল হয় নাই; কর্ত্তা বরং অপ্রসন্ন মুখে কহিয়াছিলেন, —তুমি থাকতে ওরা মারামারি করে কেন? শাসন করতে পারো না? সেই জন্যই ত তোমাকে এক গাদা টাকা খরচ ক'রে রাখা।

আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে ভূপেন আসল কথাটা পাড়িল, বলিল, দ্যাখো, আমি বোধ হয় দিন আটেক-দশ আসতে পারবো না।

ছেলেটির মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল,—বাবাকে বলেছেন? না বলব? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল, কহিল,—বাবা কি অত দিন ছাড়বে ভেবেছেন আপনাকে? হুঃ!

—কিন্তু ছাড়তেই হবে আমাকে। আমার বিশেষ কাজ আছে। আমি আসতে পারবো না।

—অন্য মাষ্টার দেখবে তাহলে। বাবা যা, লেখাপড়াটা যদি আমাদের গিলিয়ে দিতে পারতো ত ভাল হ'তো।

দেখা গেল ছেলেটি এধারে যতই নির্ব্বোধ হউক, বাবাকে ভালই চেনে। পড়ানো শেষ করিয়া ভূপেন গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি কহিলেন,—আট-দশ দিন? সে কি! আমার ছেলেরা এমনিই কিছু করে না তার ওপর আট-দশ দিন কামাই করলে আবার ক-খ থেকে সুরু করাতে হবে।···সে আমি পারব না—

শান্ত দৃঢ় স্বরে ভূপেন কহিল, কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসতে পারব না।

ঠিক সেই সুরেই কর্ত্তা জবাব দিলেন,—তাহলে আমাকে অন্য মাষ্টার দেখতে হবে। ছেলেদের ত আমি উচ্ছন্নয় দিতে পারি না।

রাগে ভূপেনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—বেশ, তাহলে তাই দেখবেন। আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন।

—এখন টাকা? ক্ষেপেছ না কি? মাসের শেষে তুমি হঠাৎ চাকরী ছেড়ে দেবে ব'লে আমি তোমার জন্য টাকা নিয়ে বসে থাকব, তা ত আর হয় না। সেই মাস্‌কাবারে চুকিয়ে নিয়ে যেও। এমনই ত নোটিসের জন্য পনেরো দিনের টাকা কাটা উচিত।

ভূপেনের একবার মনে হইল বলে যে, টাকাটা আপনিই রেখে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণে নিজের সহস্র প্রয়োজনের কথা মনে পড়িতে সে ক্রোধ দমন করিল। বলিল—তাই হবে।

কোনমতে একটা শুষ্ক নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। পর্দ্দার ওপার হইতে তখন তাহার ছাত্রদের একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা যাইতেছিল। অন্ততঃ তিনটা দিনের জন্য তাহারা নিশ্চিন্ত! (ক্রমশঃ)

সরস্বতী জয় তোমার

(মন্বন্তর বৎসরে)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কাল রাত হতে জমিয়াছে মেঘ, গুরু-গর্জ্জন ধ্বনি,
থমকি থমকি বিদ্যুৎদীপ ঝলকে ঝলকে জ্বলে—
মেঘের আঁধার চিরিয়া চিরিয়া প্রলয়ের আগমনী
বাজিয়া উঠিল বজ্র-আলোকে—শ্বেতভুজা শতদলে
হংসের গ্রীবা চাপিয়া সহসা ভৈরবীরূপ ধরি—
তিমির-মথন মূর্ত্তি ধরিয়া এলেন কি এলোকেশে ?
পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তার রূপ এ কি প্রলয়ঙ্করী,
দিগম্বরী নাচিছেন মাতা সহসা অট্টহেসে !
বিনয়-বসন বুকে নাই মার—বীণা সে দামামা হ'ল—
তন্ত্রের মতে মায়ের পূজায় বসেছে সাধক যত,
অমাবস্যার শবাসন হতে অনেক মানুষ ম'ল,
মারণ-সিদ্ধি লভিয়া সকল জ্ঞান-সাধনার ব্রত।

পূজা-মণ্ডপ ঝড়ের দাপটে উড়িল ওই,
বৃষ্টিধারায় ধুয়ে গেল মার রাঙ্গা চরণ ;
ল্যাবরেটারিতে পুড়ে ছাই হ'ল পাঠ্য বই,
খেলাঘর ভাঙে প্রিয় কন্যার, হের মরণ !
বাপে ও বেটিতে এ কি বোঝাপড়া তুলনাহীন,
নূতন যুগের নূতন খবর পাই কি মোরা ?
এ মূঢ় দেশের যুগান্তরের শুধিতে ঋণ
জ্ঞান-বিজ্ঞান যুদ্ধে মেতেছে বিশ্বজোড়া।
আমরা করেছি আয়োজন যত হ'ল বিফল,
পূজার কুসুম ধূলায়-কাদায় হইল ম্লান—
সিক্ত শীতেতে হি হি করে কাঁপে ভক্তদল—
নূতন দেবীর বন্দনা বাঁধো নূতন গান।

আলোক হ'লে মা অন্ধকার—
সরস্বতী, জয় তোমার।
হে মোহ-নাশন বোমার মোহ
এনেছে সমরে এ সমারোহ,
তোমার বীণায় মরণ-সুর
জীবনের মায়া করিছে দূর,
বৃথা কেন বহি এ মহা ভার—
সরস্বতী, জয় তোমার।

হংস তোমার বোমারু বিমান উড়িছে নভে—
বীণাখানি তব বোমা হইয়াছে জান কি কবে ?
হে ভারতী, হের ভারত জুড়ে
মরণের বীজ বেড়ায় উড়ে,
তোমার পূজায় বাড়িছে ধাঁধা
যত দিন যায় পড়ি যে বাঁধা—
বন্ধ হতেছে মুক্ত দ্বার।
সরস্বতী জয় তোমার॥

স্রোত বহে যায়

(উপন্যাস) শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৫

সুশীল যখন এ-বাড়ীতে আসিল, বেলা তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে! এ-বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার সমারোহ এখনো চোকে নাই। ক্ষেত্তরের বৌ আর ছেলেটিও তার সঙ্গে আসিয়াছে।

সদরে নহবৎখানা। নহবৎওয়ালারা প্রাণপণে বাজনার কশরতি দেখাইতেছে। কুটুম-বাড়ীর লোকজনের যদি ভালো লাগে, মোটা রকমের বখশিস কোন্ না মিলিবে! বনিয়াদী ঘরের হাত খুব দরাজ। যে-সময়কার কথা বলিতেছি, সে-সময়ে লোকে ঋণ করিয়াও বনিয়াদী-নামের মর্য্যাদা রাখিত। এই সব বাজনদার এবং দীন-দুঃখীদের তারা মানুষ বলিয়া মনে করিত; তাদের কথা ভুলিয়া নিজেদের বিলাস-ভূষণকেই সর্ব্বস্ব করিয়া তোলে নাই।

সদরে ঢুকিতে বিরাটেশ্বরের সঙ্গে দেখা। একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন। পাশে প্রকাণ্ড গড়গড়া। গড়গড়ার মাথায় বড়-কলিকায় তাওয়া-দার তামাক। তামাকের খোশ্‌বুতে বাতাস পরিপূর্ণ। বিরাটেশ্বর বসিয়া নহবতের আলাপ শুনিতেছিলেন।

সুশীলকে দেখিয়া কহিলেন—বেয়ান-ঠাকুরুণের খুব অসুখ, শুনলুম। এখন তিনি কেমন আছেন?

সুশীল বলিল—ভালোই দেখে আসছি।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—বেয়াই-মশায়ের কাছে একটু আগে এ-কথা শুনলুম। উনি খুবই উদ্বিগ্ন। বাড়ীতে যজ্ঞির কাজ···

সুশীল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব রক্ষা হয়েছে!

বিরাটেশ্বর বলিলেন—আর কিছু মানি আর না মানি বাপু, মেয়েরা যে পয়-অপয় কথাটা বলে, ও-কথা উড়িয়ে দিতে পারিনি আজো। বেয়ান-ঠাকরুণের পয়েই সকল দিক্ রক্ষা পেয়েছে। বেয়াই-মশায় তাঁর কথাই বলছিলেন···অনেক কথা!

কথার শেষে বিরাটেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুশীল বলিল—আপনাদের দেখতে পারিনি! ঢের ত্রুটি হয়েছে। মামা বাবু আমার উপরই দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন!

হাসিয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—দেখাশুনা কি আর করবে, বাপু? ঐ সব সাবেকী চাল···ও আমার ভালো লাগে না। কুটুম্বিতা হলো যেখানে, সেখানে ছলছুতো ধরে মান-মর্য্যাদার আস্ফালন তোলা—কোনো কালে আমার বরদাস্ত হয় না। ইতরুমি! আরে বাপু, মানুষকে মানুষ কত মান্য করবে? মান্য যার-যার নিজের কাছে। তুমি আমায় ঠিক সময়ে খেতে দিলে না, আমার স্নানের জন্য তেল-গামছা এগিয়ে দিলে না, অমনি আমার অপমান হলো বলে' আমি উঠবো কোঁশ করে'! কুটুম্ব হলে তাহলে তো বাবা সাপে-মানুষে তফাৎ থাকে না! কি বলো? হাঃ হাঃ! ঐ জন্যই অনেকের সঙ্গে আমার বনে না··· আমাকে সকলে বলে; আমি একটা ফাতুশ! বলে, ম্লেচ্ছ!

সুশীল হাসিয়া বলিল—অতি-মানের অহঙ্কারেই আমাদের সর্ব্বনাশ হতে বসেছে!

বিরাটেশ্বর বলিলেন—তোমার স্নানাহার হয়নি এখনো! কাল সারা দিন এখানে পরিশ্রম গেছে···তার পর রাত্রে শুনলুম, বেয়ান-ঠাকরুণকে নিয়ে রাত্রি জাগা···দুশ্চিন্তা! যাও বাবা, নেয়ে-খেয়ে এসো! তোমার মামা বাবুর কাছে তোমার কথা শুনেছি। বলছিলেন, হীরের টুকরো ছেলে!

সুশীল লজ্জা অনুভব করিল। সলজ্জ হাসি-মুখে বলিল—কুশণ্ডিকা চুকলো কখন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—ঘড়ি ধরে সময় দেখিনি, তবে হয়ে গেছে। বরকর্ত্তা এখন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দান-সামগ্রী বুঝে নিচ্ছেন! আমার ছেলে নেই, থাকলে বিনা-পণে তার বিয়ে দিতুম! দেবেশদাকে তাই বলছিলুম, ছেলের বিয়েয় এদের কাছ থেকে এই যে···খাট-পালঙ অবধি আদায় ক'চ্চো, তোমার বাড়ীতে খাট-পালঙ্ নেই? তা যদি না থাকে, আর খাট-পালঙ কেনা যদি তোমার সামর্থ্যে না কুলোয়, কনের বাপের ঘাড় ভেঙ্গে খাট-পালঙ আদায় করে নিয়ে যাবে, আর সেই খাট-পালঙে তোমার বাড়ীর বৌ···তাঁর হবে ফুলশয্যা? একে ভিক্ষা বলবো, না, লুঠ বলবো, জানি না। মোদ্দা এ খাট-পালঙ আদায় করতে লজ্জা হওয়া উচিত। আমার তেমন অবস্থা হলে পুত্র-পুত্রবধূকে আমি মাদুরে শুইয়ে ফুলশয্যার আচার পালন করতুম, তবু ভিক্ষা বা লুঠ করে ও-জিনিষ ঘরে নিয়ে যেতুম না!···কিন্তু না বাবা, যাও··· বেলা চারটে বাজে···নেয়ে-খেয়ে নাও গে।

সুশীল বলিল—বর বেরুবার সময় স্থির হয়েছে কখন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—সে ঐ ভটচাযি-মশায়রা জানেন। ওঁদের যখন সুবিধা হবে···মানে, বোচ্‌কা বাঁধা যখন শেষ হবে, তখন পাঁজি খুলে বলবেন, মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত···বর-কনে তুলুন! হুঁঃ···কিন্তু না, তুমি যাও, নেয়ে-খেয়ে নাও। যাবার সময় আমরা হুলস্থুল বাধিয়ে যাবো। যাকে বলে, বর বিদায়···তার উপর আমরা বর-পক্ষ! উঠতে-বসতে নড়তে-চড়তে খালি নেবো সেলাম আর সেলামী—দুই!···

চমৎকার মানুষটি! বাঃ! সুশীলের ভালো লাগিল। প্রথম বারে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, জমিদার-মানুষ···তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া শুধু সুরা-পান, বাইজীর গান শোনা আর ইয়ার-প্রতিপালন,—ইহাই জানেন! কিন্তু না, তা নয়···এতখানি মন আছে! এবং সে-মনে এ-সব কথা লইয়া নাড়াচাড়া করেন!

সুশীল বলিল,—আচ্ছা, আমি তাহলে চট্ করে নাওয়া-খাওয়া সেরেনি।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, যাও। তাছাড়া তোমার আবার ওদিকে কর্ত্তব্য আছে···রোগী দেখা!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সুশীল ঢুকিল বাড়ীর মধ্যে। ক্ষেত্তরের বৌয়ের পানে চাহিয়া বলিল—তুই আয় আমার সঙ্গে···পূজোর দালানের সিঁড়ির নীচে বসবি, আয়···কারো ছোঁয়া লাগবে না! তোকে খাবার-দাবার দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ!···

ক্ষেত্তরের বৌ আর ছেলেকে ঠাকুর-দালানের বড় সিঁড়ির নীচে বসাইয়া সুশীল গেল ভাঁড়ারে। সেখানে যেন রাজসূয়-যজ্ঞের ব্যাপার! বড় বড় পাত্রে জিনিষপত্র টল-টল করিতেছে! লোকজনের যেমন

চাঞ্চল্য, তেমনি চীৎকার! সুশীল একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত জিনিষ···কত ফেলাছড়া যাইতেছে! আর ঐ সব দীন-দুঃখী···এক মুঠার কাঙাল···ওদের পানে কেহ চাহিয়া দেখে না! করুণ নয়নে দীন প্রার্থনা জানাইয়া উহারা যদি হাত পাতে, অমনি রুদ্ররোষে হুঙ্কার তোলে! মনে হইল, এই অপচয়, তার সঙ্গে মানুষকে অবহেলা-অবজ্ঞার এতখানি পাপ···ইহার শাস্তি কেহ রুখিতে পারিবে? চকিতের চিন্তা! তার পরেই এক জন বামুনকে ডাকিল—ঠাকুর···

বামুন তার পানে চাহিল।

সুশীল কহিল—তুমি কি করছো?

বামুন বলিল—আজ্ঞে, অন্দরের দালানে প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে-ছেলে খেতে বসেছেন···তাঁদের দেওয়া-থোওয়া।

সুশীল বলিল বেশ, দু'মিনিট সে-কাজে কামাই হলে কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি এক কাজ করো···ঐ খালি চ্যাঙারিখানা নাও··· ওতে তোলো ভাত লুচি আর সব রকম তরকারী। মাটার গেলাসে করে দই নাও···সব রকম মিষ্টি নাও। বুঝলে! পাঁচ জনের মতো খোরাক! নিয়ে শীগগির করে' এসো আমার সঙ্গে!

সুশীলকে ঠাকুর চেনে এবং জানে। কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনি সে-আদেশ পালন করিল।

ঠাকুরের হাতে চ্যাঙারি-ভরা খাবার···ঠাকুরকে লইয়া সুশীল আসিল সদরের উঠানে। আসিয়া দেখে, শিবকৃষ্ণ! খালি গা, একখানা নামাবলী ফেরতা করিয়া গলায় জড়ানো···খাওয়া-দাওয়ার পর উদরটি বেশ ঠেলিয়া উঠিয়াছে···নাভির নীচে কাপড়ের কষি···হাতে একটা খেলো হুঁকো···একখানা হাত প্রসারিত করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। লক্ষ্য ক্ষেত্তরের বৌ আর ছেলে!

শিবকৃষ্ণ হাঁকিতেছিল,—এই উঠোনে খাবার-দাবার নিয়ে বামুনরা যাওয়া-আসা করছে, আর ছোটলোক দুলে-বাগ্দী···তোরা এখানে! একটা হাঙ্গামা না বাধিয়ে ছাড়বিনে, দেখছি। যা, যা, যা এখান থেকে!

দেখিয়া সুশীল বুঝিল, বাচ্ছা-ছেলেটাকে মারিয়াও সেই কলাপাতার আক্রোশ মিটে নাই! এখনো তার জের।

আগাইয়া আসিয়া সুশীল কহিল—কি হয়েছে ঠাকুর? ওদের ওপর অমন রুখে উঠছো কেন? ওরা সত্যি শেয়াল কুকুর নয়!

শিবকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিল। স্বর তখনি নামিল। নম্র এবং বিনীত ভাবে কহিল,—এই ছাখো না বাবা, বলছি, সব খাওয়া-দাওয়া চুকলে তখন আসিস্, পাতের যা-কিছু জড়ো করা থাকবে, ডেকে তোদেরি তখন তা দেবো। তা এটুকু তর সইছে না!

সুশীল বলিল—না। পাতের এঁটো-কাটাই বা ওরা খাবে কেন? বড় বাড়ীর কাজ···সবাই যদি চর্ব্ব চোষ্য খেতে পায়, ওরা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন, বলতে পারেন?

শিবকৃষ্ণ কথা কহিল না! আশেপাশে যারা ছিল, তারা চাহিয়া আছে! অগত্যা শিবকৃষ্ণ বলিল—চিরকালের যা বিধি···

সুশীল বলিল—সে-বিধি যদি আপনার বেলায় না মানা হয়ে থাকে, এদের বেলাতেই তা মানা হবে কেন, বলতে পারেন? সে বিধি যদি আজ থাকতো, তাহলে আপনাকেও তো সকলে ঠ্যালা করে রাখতো!

শিবকৃষ্ণর বুকের উপরে যেন কে হাতুড়ি ঠুকিল! সে ভারী ভয় করে একালের এই মুখফোঁড় ছেলেটিকে! কাহাকেও কেয়ার করিয়া কথা বলে না! নিজের মামা মাখন গাঙ্গুলিকেও বাগে পাইলে ছাড়িয়া কথা কয় না! হায় রে, সে কি জানিত, সুশীল এখানে আছে! জানিলে এ-দিক মাড়াইত না। বাড়ীতে নিস্তারবে খাবার-দাবার দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। তার মানে, বর-বিদায়ের সময় শিব-মন্দিরের নাম করিয়া কোন্ না মোটা কিছু দক্ষিণা আদায় হইবে···সেই আশায়!

শিবকৃষ্ণ সুশীলের কথার জবাব দিতে পারিল না···খেলো হুঁকার ফুটায় মুখ দিয়া তাগতে ফুঁ পাড়িল।

সুশীল বলিল—আমি ওদের ডেকে এনেছি খাবার দিতে আপনার পায়ে ওদের ছোঁয়া কলাপাতা উড়ে পড়েছিল বলে ঐ এক রত্তি ছেলেটাকে মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দেছেন একেবারে! ভাবচেন এর বিচার হবে না! গলায় পৈতে দিয়ে বামুন বলে পরিচয় দিতে চান···আচার-ব্যবহার তো দেখি, কশাইয়ের মতো!

সুশীলের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে! সে-আঁচ গায়ে ফোটে; শিবকৃষ্ণ নিঃশব্দে এক-পা এক-পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

দেখিয়া ক্ষেত্তরের বৌ সাহস পাইয়া বলিল,—বেশ হয়েছে! যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল! বামনার মুখে আর রা সরে না! আ মর্!

সুশীল চাহিল ক্ষেত্তরের বৌয়ের পানে, বলিল—ও কি হচ্ছে ক্ষেতুর বৌ! বামুন-মানুষকে অপমান করছিস্! নরকের ভয় নেই! গলায় কাপড় দিয়ে মাপ চা এখনি!

২৬

বর বিদায় হইয়া গেল বেলা পাঁচটায়। পাঁচটায় ত্রয়োদশী পড়িয়াছে··· নক্ষত্রামৃত যোগ!

বর-কন্যা বিদায় হইয়া গেলে দাদাকে একান্তে ডাকিয়া সরস্বতী বলিল—ইচ্ছা ছিল, জামাই নিয়ে বৌকে একবার দেখিয়ে আসবো। মেনিরও উচিত, মাকে প্রণাম করা। কিন্তু অমন অসুখ···ভয় হলো!

মাখন গাঙ্গুলি নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া এ-কথা শুনিলেন, কোনো জবাব দিলেন না!

সুশীল বলিল—বিরাট বাবু মানুষটি চমৎকার! আমার সঙ্গে বাগানে গিয়েছিলেন···মামীমার খবর নিলেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলেন। বললেন, সেরে উঠুন বেয়ান, আপনি জাতে ঠ্যালা হয়ে আছেন—আমিও জাত মানি না। এসে আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাবো এক দিন।

সরস্বতী হাসিল···মলিন মৃদু হাসি।

মাখন গাঙ্গুলি দাঁড়াইয়া এ-কথাও শুনিলেন, এবারও কোনো জবাব দিলেন না।

সরস্বতী বলিল—আমি আর ক'দিন বা আছি!···আমার কথা শোনো দাদা, তুমি হলে সমাজপতি···জোর-গলায় তুমি বলো··· নিজের স্ত্রী···তাকে যে ত্যাগ করবো, কি তার দোষ? বিলেতে কে না যাচ্ছে! তা ছাড়া বিলেতে যে গিয়েছিল, সে আজ নেই! এই কথা বলে বৌকে জোর করে ঘরে নিয়ে এসো। তোমার বয়স হয়েছে···তোমাকেই বা দেখবে কে? তাছাড়া বৌয়ের উপর এ কত-বড় অবিচার, ভাবো

দিকিনি ? লোকে বলে, রামচন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন সীতাদেবীকে ! শুনে আমার হাসি পায় ৷ কিসে আর কিসে ! রামচন্দ্র ছিলেন দেবতা। দেবতার যা সাজে, মানুষের তা সাজতে পারে না। ঐ যে ভগীরথ··· গঙ্গা এনেছিলেন বংশের মঙ্গলের জন্য ! আনুক তো দিকিনি গঙ্গা এ যুগে, কে পারে···কত বড় ধর্মিষ্ঠি ! মানুষের মনটার দিকে মানুষ যদি না চাইবে তো কে চাইবে, বলো তো ? একে বাঁদরামি ছাড়া আর কিছু বলে না।

মাখন গাঙ্গুলি একটা বড় নিশ্বাস ফেলিলেন···তার পর ধীর পায়ে বাহিরের দিকে গেলেন।

সুশীল বলিল—তুমি ছেড়ো না মা···বার-বার বলো ! ওঁর মনে বেশ দ্বিধা জেগেছে। এই ঠিক সুযোগ ! তা ছাড়া ছেলেগুলো কি হচ্ছে, দেখছো তো ? বিনয়টা লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দেছে। ওর দেখাদেখি ছোট বিমানও সেই রকম তৈরী হচ্ছে। মামা বাবুর সে-দিকে লক্ষ্যও নেই। মামীমা থাকলে এমন হতে পারতো ওরা ?

সরস্বতী বলিল—হুঁ। সবই দেখছি। পাড়া-গাঁ ! বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হলে কি মানুষ এত দূর পারে !

সুশীল বলিল,—কিন্তু বাইরেকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। পাড়া-গাঁই কি তাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, ভাবো ? এ-কথা মামা বাবুর মতো মানুষ একবার ভেবে দেখবেন না ? দেবেশ বাবুর ভগ্নীপতি ঐ বিরাট বাবু আমাকে সেই কথাই বলছিলেন। বলছিলেন, পশ্চিমে গিয়ে যারা বাস করছে, তারা নানা দিক দিয়ে ফরোয়ার্ড ; এ সব সংস্কার অনেকখানি কাটাতে পেরেছে। সহরেও ভাঙ্গন ধরেছে। গ্রামেই শুধু মানুষ মানুষের দাম না বুঝে কতকগুলো পুরোনো আচারের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে এখনো !

সরস্বতী বলিল—ও-সব কথা থাক। এখানকার কাজ ভালোয় ভালোয় এখন চুকলো···বৌয়ের কাছ থেকে কখন আমি সেই এসেছি ! আমার মন আর মানছে না রে। আমি বাগানে চললুম।

সুশীল বলিল—যাও। এদিককার দেখাশুনা সেরে আমিও এখনি যাবো।

সরস্বতী বলিল—তোমার মামা বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে যেয়ো বাবা। কাল ফুলশয্যা পাঠাতে হবে। তোমার ওপরেই ওঁর ভরসা !

ফুলশয্যা পাঠানোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইতে রাত্রি ন'টা বাজিয়া গেল।

সুশীল বলিল—এবার আমি উঠি মামা বাবু। সেখানে আমি গেলে তবে ডাক্তার বাবুর ছুটী মিলবে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—চ, আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুরোহিত প্রভৃতির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—আমাকে এখন আর তোমাদের দরকার হবে আজ ?

সকলে জানাইল, না।

সুশীলের সঙ্গে মাখন গাঙ্গুলিও বাহির হইয়া গেলেন।

বঙ্ক বাবু এখনো আছেন। বারান্দায় বসিয়া কদমের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন।

সুশীল আসিয়া প্রশ্ন করিল—খপর ভালো তো ?

বঙ্ক বাবু জবাব দিলেন ; বলিলেন—ভালো।

—আপনাকে তাহলে আজ রাত্রে আর কষ্ট দেবো না।

বঙ্ক বাবু বলিলেন—কষ্ট নয়। তবে আমার আর দরকার হবে বলে' মনে হয় না।

সুশীল বলিল—আজ রাত্রের মতো আপনার ছুটি ! যদি দরকার হয়, ডেকে আনবো।

বঙ্ক বাবু বলিলেন—নিশ্চয়।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—আমার একটা কথা আছে, ডাক্তার বাবু···

বঙ্ক বাবু সসম্ভ্রমে বলিলেন—আদেশ···বলুন।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বড় বিপদে আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন —এ-ঋণ শোধ দেবার নয় !···তবু এ হলো আপনার পেশা··· কাজেই পেশার দিকে আপনার না লোকশান হয়, সে সম্বন্ধে আমার যা কর্ত্তব্য, যথাসাধ্য পালন করবো···তাতে আপনার আপত্তি চলবে না।

হাসিয়া সুশীল বলিল—সে আপত্তি করলে আমরা তা শুনবো কেন ?

মৃদু হাসিয়া বঙ্ক বাবু মাথা নত করিয়া রহিলেন ; কোনো জবাব দিলেন না।···

সরস্বতী বলিল—তোমার সঙ্গে কথা আছে, দাদা।

মাখন গাঙ্গুলি গিয়া ঘরে বসিলেন।

বিন্দুমতী বলিলেন—জামাই তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—পছন্দ তো আগে থেকেই হয়েছিল ! তোমার মত নিয়েই পছন্দ করেছিলুম !

বিন্দুমতী বলিলেন—ভগবান্ ওদের দীর্ঘজীবী করুন···সুখী করুন !

তার পর অনেক কথা হইল। সরস্বতী বলিতে লাগিল বিরাট্ আয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ···মাখন গাঙ্গুলি বসিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বাহিরে সুশীল আর কদম···

সুশীল বলিল কদমকে—তুমিও আজ বাড়ী যাও কদম।···কাল থেকে তোমার খুবই কষ্ট চলেছে। আজ বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম ···তার পর কাল সকালে বরং আবার এসো !

কদমের মুখ মলিন হইল···মন বিরস। সুশীলের পানে চাহিয়া সাগ্রহে তার কথা শুনিতেছিল ; এ-কথায় মুখ নামাইল।

সুশীল বলিল—কথাটা মনঃপূত হলো না, বুঝি ? না কদম, আজ বাড়ী যাওয়া উচিত। দরকার বোধ করলে তুমি যেতে চাইলেও তোমাকে আমরা যেতে দিতুম না। কাল তো কোনো আপত্তি করিনি···আদর করে ডেকে এনেছিলুম···আপনার জন ভেবে।

কথাটায় কদমের বুক যেন জুড়াইয়া গেল ! তবু সে মাথা তুলিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

সুশীল বলিল—ভটচায্যি-মশাই মুখে কিছু না বললেও মনে হয়তো একটু···মানে, হয়তো ভাবতে পারেন, যজমান বলে বড় বেশী জুলুম করছি তাঁর উপর !

কদম এবার চাহিল সুশীলের পানে—চোখে করুণ আবেদন! তার পর কোনো মতে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলিল—কিছু বলেছেন ?

সুশীল বলিল—না, না···আমার এমনি মনে হচ্ছিল।···তা, রাত্রে খাওয়া-দাওয়াও আছে তো?

মৃদু কণ্ঠে কদম বলিল,—এ-বেলায় খাবো না। খিদে নেই।

—না খাও, তোমার একটু ঘুমোনো দরকার। খোকা শুয়েছে তো···ওর ঝী আছে। ঝী আজ দেখবে। তাছাড়া আমিও খোকার কাছে থাকছি তো রাত্রে···ঐ ঘরে।

কদম বলিল,—কাল থেকে আপনার মেহনৎও বড় কম যাচ্ছে না। দুশ্চিন্তা···তার উপর বিয়ে-বাড়ীর কাজ।

হাসিয়া সুশীল বলিল,—আমরা পুরুষ-মানুষ···দরকার হলে গাছ কেটে কাঠ বয়ে আনতে হয়···তার তুলনায় এ-কাজ কিছুই নয়।

এ-কথায় কদম হাসিল, বলিল,—মেয়েদেরও ছোট ভাববেন না। জল তোলার কাজ মেয়েরাই করে। আবার সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ···পুরুষ-মানুষে করে না, আমরাই করি।

সুশীল বলিল,—তুমি কি বলতে চাও···খোলশা করে' বলো।

কদম বলিল,—আমি আজ এইখানেই থাকবো। আমার কোনো কষ্ট হবে না।···বাড়ী গেলে ঘুমোতে পারবো না···সত্যি। জ্যাঠাইমার জন্ম মন থেকে ভাবনা যাবে না তো!···

সুশীল ভাবিল, হুঁ, মামীমাকে কদম ভালোবাসে, মামীমার জন্ম তার মনে দুশ্চিন্তা···খুবই স্বাভাবিক!···কিন্তু ওদিকে ভট্টাচায্যি মশায়! স্বামী! তাঁকে দেখা কদমের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য।

কদম ভাবিতেছিল, বাড়ী! সেখানে তার কি সুখ!···মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে···ভাগ্যকে ঠেলিয়া দিতে পারে না···তাই কোনো মতে দিন কাটিয়া যায়! নহিলে মনের দিক্ দিয়া কি সে পাইয়াছে? অনেক-কিছুর স্বপ্ন দেখিত। বিবাহ হইবে···বিবাহের পর স্বামী··· স্বামীর আদর···স্বামীর মনে মন মিলিয়া এক হইয়া যাইবে! নিজের মন দিয়া, সে যেমন বুঝিবে স্বামীর মন, স্বামীও তেমনি···

মনে পড়িল, সদ্য-পড়া চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কথা। সেই যে চন্দ্রশেখর বলিয়াছিল, আমার পুঁথি পাড়িয়া পুঁথি তুলিয়া···আমার জন্ম রান্নাবান্না করিয়া আমার সংসারে জল বহিয়া শৈবলিনীর কি সুখ!···

একটা নিশ্বাস অতি-কষ্টে দমন করিল। মন বলিল, চন্দ্রশেখর তবু শৈবলিনীর কথা ভাবিয়াছিল। শৈবলিনীর সুখ-দুঃখের চিন্তায় বইয়ের চন্দ্রশেখরের মনে দোলা লাগিয়াছিল! কিন্তু তার চন্দ্রশেখর?

সরস্বতী আসিল, বলিল,—কি হচ্ছে তোদের?

সুশীল বলিল,—কদমকে আজ রাত্রে আমি বাড়ী যেতে বলছি মা, ···কাল থেকে ও-বেচারীর ধকল যা চলেছে···আজ বাড়ীতে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করা চাই! তার পর কাল সকালে আবার না হয় আসবে। মামীমা ভালোই আছেন, এবং ভালোই থাকবেন।

কদম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আব্দারের সুরে বলিল,—দেখুন না পিসিমা, ওঁর জুলুম! আমার এতটুকু কষ্ট হয়নি। তাছাড়া এখানেও তো আমি রাত জাগবো না, ঘুমোবো।

কদমের কথায় দরদ দেখিয়া সরস্বতী খুশী হইল, হাসিয়া বলিল,— না মা, আজ বরং বাড়ী যাও। ভটচায্যি-মশায়েরও খুব বেশী রকম পরিশ্রম গেছে···মাথা ধরে আছে, বলছিলেন!···কাল বিয়ে দেওয়া ···আজ কুশণ্ডিকা···ব্রাহ্মণ-মানুষ···বয়সও হয়েছে। এই সন্ধ্যার আগে তাঁকে কোনো মতে খাইয়ে আমি এসেছি। তাঁকে দেখাশুনা করা দরকার।···তুই তাই কর্, মা কদম, আজ বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়্, কাল সকালেই আবার আসিস্। ভটচায্যি-মশাইকে বলিস্, পিসিমা আসতে বলে দেছে! স্বামী! স্বামীর মতামত নিতে হবে বৈ কি! আমি ব্যবস্থা করে এসেছি, ও-বাড়ী থেকে তোর ওখানে সকলকার খাবার যাবে। সেখানেও সব আজ একটু জিরুবার জন্ম আকুল!···

কদম এ-কথায় প্রতিবাদ তুলিতে যাইতেছিল, পারিল না।

সুশীল বলিয়া উঠিল,—স্পীক্-টি-নট্! মার কথা! মাতৃ-আদেশ! চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তার পর নির্ঝঞ্ঝাটে আমরা আজ সকাল-সকাল শুয়ে পড়বো।

হাসিয়া কদম বলিল,—ও! আমাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন! তাই তাড়া দিচ্ছেন! আমি কিন্তু কাঁটা হয়ে আপনার ঘর জোড়া করে থাকতুম না! এই বারান্দায় আঁচল পেতেই শুতুম···তাতে আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হতো না।

সুশীল বলিল—অতখানি মহত্ব তোমায় দেখাতে দেবো কেন? পুরুষের চেয়ে তুমি হবে বড়···বটে! আমার পৌরুষ তাতে চুরমার হয়ে যাবে না?

সরস্বতী হাসিল। হাসিয়া বলিল—নে বাপু, তোদের ঝগড়া রাখ্! ওকে পৌঁছে দিতে চাস্, এখনি দে। ভটচায্যি-মশাই নিজে হয়তো নিতে আসতে পারেন। তাঁকে বলে এসেছি, আমি গিয়েই কদমকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো!

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—ওঠো কদম, আর নয়। ঘুমে আমার চোখ ঢুলছে। আর দেরী করলে পথেই হয়তো ঘুমের ঘোরে দপাশ্ করে পড়ে মূর্চ্ছা যাবো!

কদমকে গৃহে ফিরিতে হইল। সুশীল চলিল সঙ্গে। পথে কোনো কথা নয়···দু'জনে নিঃশব্দে চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিতে কেশব-ঠাকুরের কণ্ঠ শুনা গেল···সেই সঙ্গে পুত্র যুগলের কণ্ঠও! দু'জনে বেশ জোর কলহ চলিয়াছে!

সে-কলহের মধ্যে কদমকে লইয়া সুশীলের প্রবেশ।

সুশীল বলিল,—ব্যাপার কি ঠাকুর-মশাই?

কেশব ঠাকুর যেন খুঁটির জোর পাইলেন! বলিলেন,—এই যে বাবা, তুমি! দ্যাখো না ছেলের কাণ্ড! ও-বাড়ী থেকে এসে দেখি, যুগল কাঠের সিন্দুকের তালা ভেঙ্গেছে। একটা আংটি ওর চাই! বলে, টাকার দরকার! হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেছে! শেষে আমাকে ঠেলে বাক্স খুলে আংটি নিলে!

সুশীল চাহিল যুগলের পানে। আলো জ্বলিতেছিল···সে-আলোয় দেখিল, যুগলের দুই ঠোঁট পাণ খাইয়া লাল, যেন পাকা তেলাকুচা! মাথার চুল চার-আনা বারো-আনা ছাঁদে ছাঁটা···গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি···পাঞ্জাবির হাতা দু'টো প্রায় দশ হাত লম্বা! আর দু'চোখে যেন দু'টো আগুনের গোলা ঘুরিতেছে!

সুশীল ডাকিল,—যুগল···

যুগল বলিল,—এর আবার যুগল কি? আমার স্পষ্ট কথা, বড় হয়েছি—এটা-ওটা খরচ আছে তো! বাবা একটি পয়সা দেবে না, কাজেই এ ছাড়া উপায়? বলিয়া সে এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

কদম যেন পাথর! কেশব-ঠাকুর বলিলেন,—দিন-দিন যা হচ্ছে, আমার ভয় হয় সুশীল, আমার অবর্ত্তমানে···

একটা নিশ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। নিশ্বাস ফেলিয়া কেশব-ঠাকুর আবার বলিল,—অবর্ত্তমানে কেন! আমি বেঁচে থাকতেই ও যে কি না করবে, ভাবলে আমার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে!

সুশীলের মনে পড়িল, মায়ের মুখে শুনিয়াছে, ও-বাড়ীর থিয়েটারের দিন কদমের সম্বল একখানিমাত্র দামী বেনারসী শাড়ী—কদমকে বকিয়া ঠেলিয়া জোর করিয়া—সেই শাড়ী লইয়া গিয়াছিল এই যুগল থিয়েটারে ফিমেল সাজিবে বলিয়া।···চুনিয়াকে সরা দেখিয়া বেড়াইতেছে! এত প্রতাপ ও কোথা হইতে পাইল? তাছাড়া কেশব ঠাকুর যে কথা বলিলেন, তাঁর অবর্ত্তমানে ··

কথাটা তুচ্ছ করিবার নয়। ও-কথার সঙ্গে কদমের ভাগ্য বিজড়িত আছে বৈ কি!

সুশীল চাহিল কদমের পানে···কদম তার পানে চাহিয়া আছে··· দু'চোখে ভীতা হরিণীর দৃষ্টি!

বলিল—আপনার উপর নিত্য এমন জুলুম করে না কি?

কেশব ঠাকুর বলিলেন—মোটে মানে না বাবা। আর জুলুম? আমি সত্য বলছি, কি মিথ্যা বলছি, তুমি বরং এই কদমকে জিজ্ঞাসা করো!

[ক্রমশঃ।

আদি কবি

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

আজি আমি অন্তেবাসী বদ্ধাঞ্জলি সশ্রদ্ধ অন্তরে
আসিয়াছি আশ্রমে তোমার,
তোমার নিখিল জুড়ি যে বিরাট গ্রন্থ লেখা হয়
সেথা মোরে দাও অধিকার!
তোমার বিশাল বিশ্বে তৃণে-তৃণে পল্লবে-পল্লবে
রচিতেছ যে মহা-কবিতা,
আমারে দীক্ষিত করো সুমহান্ সেই ছন্দে তব
, হৃদাকাশে উদুক্ সবিতা!

ধ্যানমৌন হে মহর্ষি, নভাঙ্গন ঘেরিয়া তোমার
কুতূহলী আসে শিষ্যদল,
চিররাত্রি জাগরূক অনিমেষ অবহিত তারা—
তবু নাহি পায় তব তল!
এ কি ঘন রহস্যেতে আপনারে অবলুপ্ত করি
বিরচিছ মহামৌন বাণী!
চির আলো-অন্ধকারে ঝঙ্কারিত হয় চির-যুগ
অপরূপ তব তন্ত্রীখানি!

চিত্তে মোর নৃত্য করে অন্তহীন অভিনব আশা
প্রকাশিতে স্বরূপ তোমার,
আশা আছে, ভাষা নাহি! সাধ আছে, সাধ্য কোথা মোর,
অর্থ বুঝি তোমার লিখার?
দাও, দাও, খুলে দাও নিজ-করে ওই যবনিকা
রাখিয়ো না ঘন অন্ধকারে,
কৃপা করি অনাবৃত করো তব অক্ষয় ভাণ্ডার
এই ভিক্ষা মাগি তব দ্বারে।

আদি কবি মহাকবি মনে জাগে অভিলাষ প্রভু,
মোর এই মানব-ভাষায়
লাগে যদি ক্ষণ-তরে অপার্থিব ও-সুরের রেশ
তুচ্ছ করি কাঁদা ও হাসায়!
সৃষ্টির প্রভাত হতে উদেছিল মানব-হৃদয়ে
যে গভীর অশেষ জিজ্ঞাসা,
তোমার ভুবন ব্যাপি লিখে যাও উত্তর তাহার
পড়িব তা' জানা নাই ভাষা!

তুচ্ছ করি সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু আসি লক্ষ বার
জন্মান্তরে যদি কোন দিন,
অজ্ঞান তমিস্রপুঞ্জ ছিন্ন করি' অন্তরে আমার
বাজে তব আলোকের বীণ,
পারি যদি ভাষা দিতে, সৃষ্টিকাব্য যদি ওঠে ফুটে
মোর কাব্যে ওগো মহাকবি,
অমৃতের সরোবরে হৃদি-পদ্ম উঠি বিকসিয়া
তব পদে লুটায় হে রবি!

যদি পারি রেখে যেতে মৃত্যুহীন জীবনের গান
বিরচিয়া অভিনব গীতা,
মোর প্রতি কোন দিন যদি করে কৃপা-দৃষ্টিপাত
বিশ্বলক্ষ্মী অনবগুণ্ঠিতা—
ধন্য মানি এ-জীবন, বেদনারে মনে নাহি গণি
যদি কভু পূরে মন-সাধ,
কৃতাঞ্জলি কম্প্র বক্ষ আসিয়াছি চরণে তোমার—
লভিব কি দৃষ্টির প্রসাদ?

ছন্দা

[গল্প]

শ্রীহলারাণী মুখোপাধ্যায়

১

ছন্দা আর অম্বর দু'খানি যেন জীবন্ত ছবি! এমন মিল দেখা যায় না! অম্বর যেন উপল-সমাকীর্ণ গিরি-পথ, আর ছন্দা যেন নবীন অরুণে সদ্য-জাগরিতা ঝরণা! কিছু না ভাবিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া ঐ গিরি-পথে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! এক জনের বয়স একুশ, আর এক জনের ষোল।

ছন্দা যখন গান ধরে, অম্বর আসিয়া তাহার সুরের বিকৃত অনুকরণ করে। কৃত্রিম কোপে ছন্দা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলে ঘর মুখরিত হইয়া ওঠে দু'জনের হাস্যরোলে। ছন্দা হয়তো নিভৃতে বসিয়া একমনে মাকে চিঠি লিখিতেছে, অম্বর চুপি-চুপি পিছনে আসিয়া এমন কাতুকুতু দিলে যে, হাসিতে হাসিতে বেচারীর নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো! কাগজ ছিঁড়িয়া, কলম ভাঙ্গিয়া, দোয়াত উল্টাইয়া গৃহ-তল নিমেষে রণস্থল হইয়া ওঠে।

বাড়ীর পিছনে মস্ত বাগান। দু'জনের অনেকখানি অবসর এই বাগানে অতিবাহিত হয়। দু'জনে বকুলতলায় বসে—গন্ধভরা ছোট-ছোট ফুলগুলি ঝরিয়া গায়ে পড়ে—অম্বর বলে, আমাদের গায়ে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। হাসিয়া ছন্দা উত্তর দেয়, ইস্, আমরা দেবতা না কি? তাহার কণ্ঠে বাহু সংলগ্ন করিয়া কাণে-কাণে অম্বর বলে, দেবতাই তো। কিসে জানো?—প্রেমে!

দু'জনে দু'জনের পানে কখনও অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকে, কখনও লুকোচুরি খেলে, কখনও দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা করে। দিনগুলা কাটিতেছে সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়া। কিন্তু এক দিন এ হাসিখেলার অবসান হইল।

অম্বরকে ডাকিয়া অম্বরের পিতা যোগেশ বাবু কহিলেন,—আসছে সপ্তাহে তোমায় সিলোন যেতে হবে, তার জন্ম প্রস্তুত হও।

সংবাদটা বজ্রাঘাতের মত তরুণ-তরুণীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। কিন্তু প্রাণে সেই একই রাগিণী ঝঙ্কৃত, বুকে একই আবেগ! ছন্দা পরামর্শ দিল, একবার মাকে বলে দ্যাখো না, হয়তো বাবাকে বোলে তিনি যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন।

অম্বর ছুটিল মায়ের কাছে। সেখানেও বিধি বাম! ধরা-গলায় মাথা নাড়িয়া মা বলিলেন,—অনেক বলেছি বাবা, ফল হয়নি। উনি বলেন, উন্নতি হবে কত—যাকে বলে, মানুষের মত মানুষ! কাজটা শিখতে পারলে, আর শিখতে মোটে বছর চারেক সময় লাগে—একবারে খুব মোটা মাইনে নিয়ে ফিরে আসবে। তার পর দ্রুত উন্নতি।

অম্বর ফিরিল নিরাশা-ভরে। মনে মনে বলিল, টাকা! টাকা! টাকা! টাকায় কি হইবে? চাইনে আমি বড়লোক হইতে।

রাত্রি গভীর। ছন্দা আর অম্বর তখনও বাগানে। অম্বরের পানে চাহিয়া আছে ছন্দা—সজল চোখ। অম্বর ফ্লুট বাজাইতেছিল। অতৃপ্ত সুর চলিয়াছে অসীমে যেন কোন্ জীব-জগতের বাহিরে!

কতক্ষণ পরে বাঁশী থামিল। অম্বর চাহিল ছন্দার পানে। বলিল,—ও কি, তুমি কাঁদছ?

অম্বর ছন্দার চোখের জল মুছাইয়া দিল। ছন্দা বলিল—সিলোন অনেক দূরে—না?

—হ্যাঁ। অনেকে বলেন, ঐটেই ছিল লঙ্কা-দ্বীপ, ত্রেতাযুগে রাবণের রাজ্য।

ছন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মানস-নয়নে অভিনব দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। সেই উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অশোক-কানন—সে-কাননে রামপ্রিয়া বন্দিনী সীতা এবং আম্রবৃক্ষে বসিয়া বার্ত্তাবাহী হনুমান রামের অঙ্গুরী প্রদান করিতেছে! অম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছো?

নিশ্বাস ফেলিয়া ছন্দা কহিল,—ভাবছি আমি যদি সীতা হতুম!

অম্বর তাহার গাল টিপিয়া আদর করিয়া কহিল,—আর জন্ম-দুঃখিনী সীতা হয়ে কাজ নেই! চিরদিন আমার আদরিণী ছন্দাই তুমি থাকো। বিরহ যত তীব্র হোক্, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, শেষে আবার মিলন—চির-মিলন!

২

অম্বর চলিয়া গিয়াছে। বিদায়কালের বাক্য-স্মৃতি ছন্দার বুকের খাঁজে-খাঁজে রাখিয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদ দু'চার দিন আকুল করিয়া তুলিলেও শেষে সেই স্মৃতি লইয়াই সে মালা গাঁথে। বকুল গাছের তলাটি তাহার তীর্থ! সময় পাইলেই সেখানে গিয়া বসে। মাথায় টুপটাপ করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়ে। মনে জাগে অম্বরের কথা—'দেবতাই তো। কেমন কোরে, জানো?—প্রেমে।' চোখ জলে ভরিয়া আসে।

এক দিন যোগেশ বাবুকে ধরিল,—বাবা, বকুলগাছের তলাটা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিন না।

তাঁর প্রতিবাদের বিপক্ষে বধূর আবদার জয় লাভ করে। অবিলম্বে বকুল-তলা মনোজ্ঞ প্রস্তরে শোভিত হইল।

দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ চার বৎসরও কাটিয়া গেল। অম্বরের ফিরিবার সময় হইয়াছে। ছন্দা চন্দের মত লীলা-চঞ্চল। যৌবনের প্রারম্ভে যাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, যাহার প্রতীক্ষায় রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়াছে অকূল চিন্তায়, অনিদ্রায়, আবার সে তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিতেছে! আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না-বিকশিত রজনীতে, স্বচ্ছ পুষ্পময় শরৎ-প্রাতে, মধুর ঝঙ্কারে সে তাহার হৃদয় বিমুগ্ধ করিবে।

ফিরিয়া আসিল অম্বর। ছাব্বিশ বছরের অটুট স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবক। পরণে কোট-প্যাণ্ট, চোখে সোনার চশমা। ছন্দা লজ্জা-বিজড়িত সঙ্কোচে এক-পলক চাহিয়াই রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা ছুটিয়া কোথাও গিয়া লুকায়!

সকলের সহিত আলাপ ও প্রণামাদির পর অম্বর নিজের ঘরে আসিল। ছন্দাকে জড়সড় দেখিয়া হাস্যমুখে কহিল,—কি, চিনতে পারছো না? পরিচয় দিতে হবে?

ছন্দার মুখ পাণ্ডুর। মনে হইল, এ লোকটির সঙ্গে যেন নূতন করিয়া পরিচয় করিতে হইবে।

দুপুরবেলা আহারের পর অম্বর বাহির হইয়া গেল। এখন আর সে কলেজের তরুণ ছাত্র নয়, দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত দস্তুরমত এক-জন বড় অফিসার। ছন্দা বিবর্ণ মুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। হাতে রূপার একটা সুদৃশ্য কৌটা। ক্ষণে-ক্ষণে মনে জাগিতেছে

অম্বরের অভিনন্দন-বাণী—তুমি মাথায় ভয়ঙ্কর লম্বা হয়েছ, রং একটু ময়লা হয়ে গেছে! তার উপর রীতিমত গম্ভীর গিন্নী একেবারে!

কিন্তু অম্বর একবার দেখিল না, তাহার নিজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কতখানি! দেখিল না, নিষ্মল শতদল নিষ্ঠুর পদ-পীড়নে ব্যথায় কতখানি আতুর! ধীর ভাবে ছন্দা কৌটা খুলিয়া দু'ছড়া বকুলমালা বাহির করিয়া একবার ঘ্রাণ লইল। তাহার পর সাশ্রুনয়নে টুকরা টুকরা করিয়া সে দু'টা ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

৩

সে অট্টালিকার আজ নূতন শ্রী। গেরাজে মোটর-কার। রাজ-সরকারের অরণ্য-বিভাগের বড় অফিসারের যেমন চালচলন মানায়, কোথাও তাহার এতটুকু ত্রুটি নাই। আহূত অনাহূত বন্ধুবান্ধবে গৃহ সর্ব্বদা সরগরম। তাহাদের আদর-আপ্যায়নে ছন্দাকেও যোগ দিতে হয়, অন্ততঃ শিষ্টাচারের খাতিরে। অম্বরের নারী-বন্ধুর দলটিও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। কারণ, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমভাবে মিশিতে না পারিলে সামাজিক হওয়া যায় না।

সে দিন বাড়ীতে পার্টি। উৎসব শেষ হইতে রাত্রি বারোটা বাজিল। ছন্দা সামাজিক সাজসজ্জা ছাড়িয়া সাধারণ বেশে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, স্বামী তখনও অনুপস্থিত। তাহাকে এখানে-সেখানে খুঁজিতে খুঁজিতে বারান্দায় আসিয়া দেখে, ইজিচেয়ারে শুইয়া অম্বর সিগারেট্ টানিতেছে। ছন্দা কহিল,—এখনও বাইরে শুয়ে আছো যে?

—তুমি এত রাত্তিরে ওপরে এলে! হাঁা, এবার চলো। এখানে শুয়ে চাঁদের আলো দেখছিলুম।

—চাঁদের আলো খুব ভালো লাগে!

অম্বর হাসিয়া রহস্যভরে কহিল,—লাগে।

—আচ্ছা, তুমি ফুল ভালবাসো?

—ফুল কে না ভালবাসে?

—তবে চলো না, একটু বকুল-তলায় গিয়ে বসি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অম্বর কহিল,—কোথায়?

—বকুলতলায়। আমাদের সেই বাগানে।

বিরক্তিভরে অম্বর কহিল,—রাত একটার সময় বাগানে বকুল-তলায়! মাথা খারাপ হয়েছে?

ছন্দা নত-মুখে মলিন ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অম্বর কহিল,—মিষ্টার বোসের বোন হেনাকে তোমার কেমন লাগলো?

ছন্দা নীরবে মাথা হেলাইল। অম্বর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—চমৎকার মেয়ে। আমি কি ওর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেছি?

ছন্দা তেমনি নীরব নিস্পন্দ! অম্বর বলিতে লাগিল,—অত বড় একটা ধনীর মেয়ে, কিন্তু দেখলে বা মিশলে বোঝবার জো নেই। কি অমায়িক সরল! আমাদের সমাজে এমনি মেয়েই দরকার।

হঠাৎ অম্বর আবিষ্কার করিল, ছন্দা কিছুই শুনিতেছে না। তখন বিরক্তি-ভরে সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কহিল,—তোমার কি হয়েছে? সর্ব্বদা বিমর্ষ দেখি কেন? ক্রমশঃ যেন একটা প্রহেলিকার মত হয়ে দাঁড়াচ্ছো তুমি!

অম্বর উঠিয়া ঘরে শুইতে গেল। ছন্দা বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল নিস্পন্দ···যেন পাথরের মূর্ত্তি!

৪

অম্বর ক'দিন বাড়ী নাই, বাহিরে গিয়াছে কাজে। বৈকালে বাথরুম হইতে বাহির হইয়াই ছন্দা বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী কি-কাজে সে দিকে আসিয়া ছন্দাকে এমন অসময়ে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,—এমন সময়ে শুয়ে!

গৃহিণী নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—এ কি! জ্বর হয়েছে যে! হঠাৎ জ্বর হলো কেন? তাও বলি মা, যা-ঠাণ্ডা লাগাও।

তিনি চলিয়া গেলেন। ছন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে চোখ মেলিতেই ছন্দা দেখিল, শাশুড়ী পাশে বসিয়া। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া শাশুড়ী কহিলেন,—কেমন আছো, বৌমা?

—এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে মা!

তার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—আমায় এক-সাজি বকুলফুল আনিয়ে দেবেন, মা?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, পাগলী! এখন বকুল ফুল নিয়ে কি হবে মা?

ছন্দা হাসিল—ভারী মধুর হাসি। কহিল,—একটু দরকার আছে।

পরিচারিকা হিমু এক-সাজি ফুল আনিয়া দিল।

৫

আট দিন কাটিয়া গেছে। ছন্দার সেই জ্বর বাঁকা-পথে ভারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-কাজে অম্বর গিয়াছিল, তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইল। বড় বড় ডাক্তাররা চিকিৎসা করিতেছেন। রোগ সাংঘাতিক, এ বিষয়ে সকলে এক-মত। শুশ্রূষায় পাছে ত্রুটি হয়, এজন্য দু'জন নার্শ বাহাল হইয়াছে। অম্বর ছুটি লইয়া রোগিণীর তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত।

সেদিন রাত্রে সহসা ছন্দা চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ বেশ স্বচ্ছ। মাথা ঘুরাইয়া সকলের পানে তাকাইয়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। নার্শ জিজ্ঞাসা করিল,—কিছু বলবেন?

ছন্দা বেশ স্পষ্ট ভাবে কহিল,—উনি?

অম্বর মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—এই যে আমি। কি বলবে, বলো।

ছন্দার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে সে কহিল,—আমায় একবার বাগানে নিয়ে যাবে?

অম্বর সবিস্ময়ে কহিল,—বাগানে?

ছন্দা কহিল,—হাঁা, সেই বকুলতলায়।

অম্বর কহিল,—কি বলছ ছন্দা! সেখানে যেতে পারবে কেন এখন?

ছন্দা কহিল,—পারবো। আমার তীর্থ। যা আমি হারিয়েছি, আর কি পাবো? তা ঐ বাগান বুকে করে রেখেছে। আমায় নিয়ে চলো।

বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় মুহূর্ত্তে কি যে হইয়া গেল! ডাক্তার ছুটিয়া আসিলেন—ঔষধ দিলেন। কিন্তু সব ব্যর্থ করিয়া ছন্দার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অভিমানিনী ছন্দা অভিমান-ভরে ইহলোক হইতে বিদায় লইল।

জীবনে এক দিনও তাহার মনের ব্যথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে বা

আচরণে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অকালে নীরবে বিদায় লইয়া জানাইয়া গেল, সে যাহা চাহিয়াছিল, সংসার তাহাকে তাহা দিতে পারে নাই! তাই ছন্দের মতই ছন্দা কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

অম্বর এখন একা। সে জানিত না, একা থাকার দুঃখ কতখানি! জানিত না, বিচ্ছেদ কত তীব্র হইতে পারে! ছন্দা যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন সে বুকের কতখানি জুড়িয়া ছিল, অম্বর তাহা বোঝে নাই। তাহার প্রথম উপার্জ্জনের অর্থরাশি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা যৌবনের মানসী প্রিয়াকে চাপা দিয়াছিল।

সেদিন সে টুরে যাইবে। জিনিষ-পত্র গুছাইতে গুছাইতে একখানা খাতা বাহির হইয়া পড়িল। খাতার মলাট সুদৃশ্য। আগ্রহে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে খাটের উপর বসিল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা—প্রিয়তমেষু।

তাহার পরই টকটকে একটা গোলাপ আঁকা। ছন্দা এত সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত!

গোলাপের ছবি। তাহার নীচে লেখা আছে—

বিরহ মোর অশ্রু-রূপে দিলাম গোলাপ তোরে,
মিনতি মোর শিশির সম রাখিস্ হৃদয় ভোরে!
হেরি তোরে বন্ধু যবে মুগ্ধ হয়ে বক্ষে লবে
মোর বেদনার বার্ত্তা জানাস্, বলিস্—চেনো মোরে?

অশ্রুবাষ্পে চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। খাতার পর-পৃষ্ঠাতেই বাহির হইল আঠা দিয়া আঁটা একখানা ফটো—বাগানে অম্বরের কোলে মাথা রাখিয়া ছন্দা শুইয়া আছে। ফটোর তলায় লেখা—

তুমি আর আমি এসেছি ধরায়
রচিতে অলকানন্দা!
মন্থন করি স্বরগের প্রেম
এনেছে তোমার ছন্দা।

খাতাখানা বুকে চাপিয়া অম্বর বিবর্ণ মুখে বসিয়া রহিল। ঘরের দেওয়ালে ছবি দু'খানার ফ্রেমে ঝোলানো শুষ্ক বকুলের মালা দু'টি বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতে লাগিল—নাই! নাই! সে আজ নাই।

গীতা-প্রসঙ্গ

শ্রীরমেশচন্দ্র বাগচি (বি-এল)

ভাদ্র মাসের বসুমতীতে এম্ আলি নেওয়াজ চৌধুরী বি, এ, মহোদয়ের লিখিত 'গীতায় ভগবান' শীর্ষক-প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। শিক্ষিত সুধী মুসলমান গীতোক্ত ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমতা উপলব্ধি করিয়া গীতোক্ত উপদেশ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা।

গীতা হিন্দু ধর্ম্মের প্রস্থানত্রয় মধ্যে অন্যতম! ইহা মোক্ষ-শাস্ত্র। হিন্দুর অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় গীতার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। অন্ততঃ হিন্দুর ইহাই ধারণা। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "তদিদং গীতা-শাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং"—এই গীতা-শাস্ত্র সমস্ত বেদার্থসার সংগ্রহভূত দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থ।

চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কয়েক জায়গায় আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে তাঁহার ব্যক্ত মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণের অন্যতম উপায়।

উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই চৌধুরী সাহেব লিখিয়াছেন, "দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন"। কিন্তু দেহ ও আত্মা প্রকৃতই কি এক ও অভিন্ন?

"ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ"
(শিবসংহিতা ২।৩৭)

প্রকল্পিত দেহের সর্ব্বত্রই জীবাত্মা বাস করেন। জীবাত্মার অনুভূতি দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান. ইহা সত্য। মনে করুন, গৃহের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, গৃহের সব জায়গাটুকু পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আলোক এবং আলোকিত গৃহ এক এবং অভিন্ন? দেহ ও আত্মার একত্ব ও অভিন্নত্ব হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অতি অসম্ভব কথা। ইহা পূর্ণ দেহাত্মবাদ, এবং এই ভ্রান্তবাদের খণ্ডনের জন্যই বলিতে গেলে গীতার অবতারণা। এই গীতা-শাস্ত্রের "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্। যাহাদের দেহের জন্য শোক করা অনুচিত, অর্জ্জুন সেই দেহের মমতায় শোকগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত বাক্য গীতাশাস্ত্রের বীজ অর্থাৎ শাস্ত্রারম্ভক বাক্য।

গীতায় ভগবানকে জানিতে হইলে প্রথমেই এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। গীতার নিম্নলিখিত একটি শ্লোকের দ্বারাই এ বিষয়ে ভগবানের উপদেশ সম্যক্‌রূপে জানা যাইবে।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" ২।২০

আত্মা অজ, অমর—ইনি উৎপন্ন হইয়া কখনও বিদ্যমান থাকিবেন না। ইনি নিত্য, শাশ্বত পুরাণ (পুরাতন হইলেও সর্ব্বদা নূতন; পরিণাম-শূন্য)। অতএব ষড়্‌বিধ ভাব-বিকারশূন্য; এবং শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং দেহ ও আত্মার একত্ব ও অভিন্নত্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং তাহা অসম্ভব। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত অতি-সাধারণ ও সহজ কথা।

লেখক মহোদয়ের দ্বিতীয় কথা—"জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, তাঁহাতে-আমাতে কোন প্রভেদ নাই, সোঽহং। তিনি আমি এক"। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের একটি প্রধান কথা এবং ইহা লইয়াই হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সম্প্রদায়-গত বিভিন্ন বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক নিশ্বাসে আমি ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, এ কথা বলা সাধারণ লোকের পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত নয়। তুমি, আমি, পঞ্চকোষাবদ্ধ অজ্ঞ অনীশ অণুপরিমাণ, জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেলিত ও সদা-পরিক্লিষ্ট জীব; নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত প্রপঞ্চাতীত, জ্ঞানস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প

ঈশ্বরের সহিত তুমি আমি কোন প্রকারেই এক ও অভিন্ন নয়। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের কথা। কিন্তু বহুজন্ম-ব্যাপী কৃত উপযুক্ত তপস্যার দ্বারা পঞ্চকোষ বিমুক্ত জীব যখন স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞান (consciousness)-এর সহিত আত্মস্বরূপ পূর্ণজ্ঞানের একত্বানুভূতি লাভ করিবে, তৎ-পদার্থ বিশুদ্ধ করিয়া যখন জীব তাহা তৎপদার্থের সহিত মিলাইতে পারিবে, সেই অবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ হইবে। জীবের উক্ত অবস্থার জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা; নতুবা জীব জীব, এবং শিব শিব।

লেখকের মতে জীবের ইচ্ছার কোন মূল্য নাই। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত নয়। জীবত্বে যখন ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান, তখন জীবের ইচ্ছারও বিশেষ মূল্য আছে; নতুবা জীবের ব্রহ্মত্বে স্বরূপাবির্ভাব (evolution) মিথ্যা হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরের ত্রিশক্তি "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" সৎ, চিৎ, আনন্দ। জীবাত্মায় ক্রিয়াজ্ঞানও ইচ্ছারূপে প্রতিভাত হয়—এবং এই ত্রিশক্তিই প্রকৃতির উপাধিতে প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞান-শক্তি সত্ত্বরূপে, ক্রিয়া শক্তি রজরূপে, এবং ইচ্ছা-শক্তি তমরূপে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের ন্যায় জীবাত্মারও এই ত্রিশক্তি স্বাভাবিক এবং উপাধির ত্রিগুণও স্বাভাবিক। সুতরাং জীবের ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির কখনও লোপ হয় না। এই শক্তিই জীবের ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র সম্বল। ইহার বিশেষ মূল্য ও সার্থকতা আছে। গীতায় ভগবান উপদেশ দিতেছেন, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ (৬।৫) জীবের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি না থাকিলে এই উপদেশ মিথ্যা হইয়া যায়। জীবের ইচ্ছার মূল্য না থাকিলে কর্ম্মবাদ থাকে না। ঈশ্বরে বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষ আসিয়া পড়ে। বেদান্ত-দর্শনে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি—" ২।১।৩৩

অর্থাৎ বিষম সৃষ্টি-সংহারাদি নিমিত্ত ব্রহ্মের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রকাশিত হয় না। কারণ, ইহা জীবের কর্ম্ম সাপেক্ষ। শ্রুতি বলিতেছেন:—পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপী ভবতি (বৃ ৪ অ ৪ ব্রাঃ)। জগতে কোন বিশেষ সৃষ্টি (Special creation) নাই। কোন বিশেষ অনুগ্রহের (Special favour) পাত্র কেহ হইতে পারে না। স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের অধীন সকলেই; সুতরাং জীবের ইচ্ছারও বিশেষ মূল্য আছে। জীবের স্ব-স্বরূপাবির্ভাবের (evolution) সম্বন্ধে তাহার ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি এবং তাহার কৃত কর্ম্মই একমাত্র কারণ।

এক্ষণে কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে লেখক মহোদয়ের মতের আলোচনা করিব।

সংসারে জীব-সাধারণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর জীব প্রবৃত্তি-মার্গে বিচরণ করিতেছেন। ইহারা প্রকৃতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া (descending into matter) ক্রমশঃ মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হইবার পর ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সবেমাত্র সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহলোকের কর্ম্মলব্ধ সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ ইহাদের কর্ম্ম-বহুল জীবনের আদর্শ। প্রকৃতির সর্ব্বনিম্ন ক্ষেত্রে ইহাদের জ্ঞান সক্রিয় হইলেও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম লোকের অবস্থা ও জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাদের কোন অনুভূতি নাই। ইহারা কর্ম্মসঙ্গী; অকালে প্রকৃত সময় আগত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের বুদ্ধিভেদ ঘটাইয়া কর্ম্মত্যাগ-প্রবৃত্তি জাগানো কর্ত্তব্য নয়। তাই গীতা বলিতেছেন:—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্" ৩।২৬

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর। কারণ, প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মই জগতের স্থিতির কারণ।

অপর শ্রেণীর জীব নিবৃত্তি-মার্গের অধিকারী। ইহাদের সংখ্যা অল্প। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা বিবেক-দর্শনাভ্যস্ত হইয়া এক্ষণে ইঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আধিরোহণের পন্থে (ascent into spirit by the path of return) চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই সকল পুণ্যাত্মাগণই গীতাশাস্ত্রের অধিকারী। তাই অ্যানি বেশান্ত তাঁহার Hints to the Study of Gita গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"All the instructions of Gita are for the consciousness on that path (of return). They are useless and inappropriate, nay, harmful for a on the path of forthgoing." P. 63, 64.

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলিতেছেন—অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো...বিহিতঃ স চ—ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ—নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ যাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও যদি ফলাভিসন্ধি বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তবে কালে তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারেন। আচার্য্যগণের ইহাই মত। লেখক মহোদয় গীতার—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।" ৫।২

এই শ্লোকটি তুলিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া লিখিতেছেন, "ভোগলালসার মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে পাওয়ার সাধনই শ্রেষ্ঠ।" বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবিও তাই বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" "সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ভগবানকে পাওয়ার বাসনা ও মুক্তি-লাভের ইচ্ছা কোন মতেই শ্রেয়ঃ নয়। সাম্য ভাবে থাকিয়া ইহলোককে স্বর্গ মনে করিয়া পরব্রহ্মের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দেওয়াই জীবনের সার্থকতা। ইহাই গীতার মর্ম্ম ও বাণী।"

হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন আচার্য্যগণ অনধিকারীকে মোক্ষ-ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন না। কি কি গুণসম্পন্ন হইয়া বেদান্তবাক্য-শ্রবণে অধিকার জন্মায়, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার ব্যভিচারে এতাদৃশ বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে। লেখক মহোদয়ের মতে ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া ভগবানকে পাইবার যদি কোন সাধনা থাকে, তাহা অতি নিকৃষ্ট সাধনা। বৈরাগ্য-সাধনে যদি মুক্তির কোন

উপায় থাকে থাকুক, তাহাতে লেখকের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ইহা নিকৃষ্ট পথ। ইহলোকের সর্ব্বপ্রকার মায়িক বন্ধনে জড়িত থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকার কামনার দাসত্ব করিয়া যদি ভগবানকে পাওয়ার বা মুক্তি-লাভের কোন উপায় থাকে ভালই নতুবা ভগবান ও মুক্তি দূরে থাকুক; কামনার বন্ধনই শ্রেয়ঃ। লেখক মহোদয় পরব্রহ্মের যে শ্রীপাদপদ্মের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিবেনই—ইহাই না কি তাঁহার মতে গীতার ধর্ম্ম ও বাণী।

এই সকল উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তথাপি কিছু আলোচনা করিব।

উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান ৪র্থ অধ্যায়ের শেষে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ এবং "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" এই বাক্যের দ্বারা কর্ম্ম-যোগের প্রশং[illegible] স্বভাবতঃই অর্জ্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, ভগবান কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগ—কোন্ পথ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন যে, কর্ম্ম-সংন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির হেতু; কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় মন্দাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। বেদান্তবেদ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই প্রশস্ত, এ কথা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই। অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয় নাই, যাঁহারা বন্ধুবধাদির নিমিত্ত শোক ও মোহগ্রস্ত হইয়া আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য করিতে পরাঙ্মুখ, এইরূপ ব্যক্তিগণকে দেহাত্মবিবেক-জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা তাঁহাদের সংশয় ছিন্ন করিতে উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগের অধিকার সম্পাদন হেতু কর্ম্মযোগই প্রশস্ত, ইহাই উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ভগবান এই কথাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—

"সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥"

হে মহাবাহো, অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সংন্যাস প্রাপ্তুং দুঃখং (দুঃখহেতু অশক্যমিত্যর্থঃ) (চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাধা অসম্ভবাৎ) যোগযুক্তস্তু মুনিঃ (সন্ন্যাসী ভূত্বা) ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (সাক্ষাৎ করোতি) (অতঃ চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাৎ বিশিষ্যতে ইতি সিদ্ধম্) শ্রীধর স্বামিপাদ। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ না করিয়া কর্ম্মসংন্যাস-লাভের আশা দুরাশা মাত্র; ভগবান ইহা পরিষ্কার ভাবেই বলিতেছেন এবং এই জন্যই উক্ত শ্লোকে যে "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" বলা হইয়াছে, তাহা অর্জ্জুনের ন্যায় মন্দাধিকারীর পক্ষে। উক্ত শ্লোকে ভগবান কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগকে হেয় এবং কর্ম্মযোগকে উপাদেয় বলেন নাই। বরং ৬ষ্ঠ শ্লোকে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ যে উচ্চাধিকারীর পক্ষে আশ্রয়ণীয়, ইহাই বলিয়াছেন। কাম-সাধন ও লালসা-তৃপ্তির জন্য বিষয়-ভোগ মুক্তির সোপান বলিয়া ভগবান কখনই বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং লেখক মহোদয় উক্ত শ্লোকের যে অর্থ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত কদর্থ! ভোগ-লালসার মধ্যে যাঁহারা হাবুডুবু খাইতে ভালবাসেন, বৈরাগ্য যাঁহাদের ভীতি আনয়ন করে, সকল প্রকার মায়িক বন্ধন ছিন্ন করিতে যাঁহারা কাতর, ইহলোকই যাঁহাদের স্বর্গ, যাঁহারা কামময়, নিজ নিজ আশা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই যাঁহাদের জীবন নিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইলে যাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না, দেখা যাইতেছে, ভগবান তাঁহাদিগকে কোন আশ্বাসই দিতেছেন না।

দ্বিতীয় কথা কর্ম্মযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে। কর্ম্মযোগ ভোগলালসার বিলাস নয়। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছেন, যাঁহারা লেখকের মতে ইহলোককেই স্বর্গ মনে করেন, তাঁহারা ইহলোক-সর্ব্বস্ব হইয়া তাঁহাদের কামনার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিতে থাকুন; তাঁহাদের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে কোন শাস্ত্রই উপদেশ দেয় নাই; ভগবানও সেরূপ উপদেশ দেন নাই। বরং তিনি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৭ম—৯ম শ্লোক দেখুন। কর্ম্মযোগীকে বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। তিনি সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম করিয়াও মনে অনুভব করিবেন, "নৈব কিঞ্চিৎ করোমি"। কর্ম্মযোগী হইতে ইচ্ছা করার অর্থ প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ শক্তিত্রয় ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছারূপে জীবাত্মায় বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিত্রয়ের বিকাশ উচ্চ ও নিম্নগ্রাম-ভেদে দুই প্রকারে হইয়া থাকে। জীবাত্মা যখন প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছেন, ইচ্ছা-শক্তি তখন কামরূপে, জ্ঞানশক্তি দ্বৈতজ্ঞানরূপে এবং ক্রিয়াশক্তি ভোগ্যবস্তুর সাধনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পথে চলিতে চলিতে যখন জীবের সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত বিরক্ত মন আর বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকিতে চায় না, তখন সে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া নিবৃত্তির পথে চলিতে আরম্ভ করে। তখন সাধনা-বলে তাহার কাম ভক্তিতে, দ্বৈত ও বিভিন্নজ্ঞান অদ্বৈত জ্ঞানে (সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়-মীক্ষতে" ১৮।২০) এবং ভোগসাধন জন্য কর্ম্ম যজ্ঞে পরিণত হয় (গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে"—৪।২৩)। পুনরায় ভগবান কর্ম্মযোগীর লক্ষণ বলিতেছেন "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ; কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতা"; "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ" ইহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।" তবেই দেখা যাইতেছে, লেখক যাহাকে বলিতে চাহিতেছেন, "ভোগ-লালসার মধ্যে থাকিয়া কর্ম্মসাধন—এরূপ কর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে নিত্যই অনুষ্ঠান করিতেছে; কিন্তু তাহার অর্থ কর্ম্মযোগ নয় এবং তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়কও নয়।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, ভগবানই ত সমস্ত কর্ম্ম করাইতেছেন; সুতরাং কামোপভোগ ভগবৎপ্রাপ্তির পরিপন্থী হইবে কেন? ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভগবান বলিতেছেন—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

গীতা ৫।১৪, ১৫

ভগবান কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব স্বজন করেন না। কর্ম্মফল-সংযোগও তাঁহার দ্বারা হয় না। সমস্ত কর্ম্মই স্বভাবের অর্থাৎ প্রকৃতি এবং তাহার বিকারাত্মক জীবের উপাধি দ্বারা কৃত হইতেছে। ভগবান বা জীবের আত্মা (Light of the Logos ভর্গঃ) কখনও জীবের বন্ধকারক প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। জীবের পাপ বা পুণ্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত জ্ঞান উপাধিকৃত অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীব মোহগ্রস্ত হয়। উপাধির সহিত তাদাত্ম্যভাব যাবৎ না ছিন্ন হইবে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত "বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা" হওয়া সম্ভব নয়। অর্জ্জুন এই সাম্যযোগের উপায় ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"। যাবৎকাল বিষয়-সংস্পর্শ জনিত চিত্তের বৃত্তি (Transformations) নিরোধ না হইবে, তাবৎকাল চিত্তের এই সাম্যভাব অর্থাৎ লয়-বিক্ষেপ-শূন্য অবস্থা আয়ত্ত হয় নাই! পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে চিত্তের এই অবস্থা সম্ভব। পাতঞ্জল-দর্শনও বলিতেছেন, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ" চিত্তের এই লয়-বিক্ষেপশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগের কাল। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে তৎপরে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠার সময় আসিবে।

সাধক রামপ্রসাদের "চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসি" এই পদের মর্ম্ম বিশ্বকবির কবিতায় ধ্বনিত হইতেছে। বৈষ্ণবগণও জগৎকে ভগবানের লীলাভূমি মনে করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি অপেক্ষা জগতে পুনঃ পুনঃ আসিয়া ভগবানের লীলায় সহকারিতা ও সেবা করিয়া রসস্বরূপ শ্রীভগবানের লীলামৃত আস্বাদ করা বহু ভাগ্য মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবকে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে প্রথমতঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। প্রতি ঘটে, বিশ্বের প্রতি অণুতে এক ব্রহ্ম-সত্তা বিরাজ করিতেছে, এই প্রত্যক্ষানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎকে ব্রহ্মের প্রকৃত লীলাভূমি বলিয়া সত্যদর্শন লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কি উপায়ে এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ ৪৯—৫৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সাধক বিগতস্পৃহ ও সর্ব্বত্র অনাসক্তচিত্ত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিবেন। তৎপরে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া শব্দাদি বিষয় ও রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিক্তসেবী হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করত নিত্য ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও শান্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হন। ব্রহ্মভূত হইলে

> "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"॥
> গীতা ১৮।৫৪, ৫৫

ব্রহ্মভূত হইলে সাধকের সর্ব্বত্র সমদর্শন হইবে। ব্রহ্মভূত হইবার এই একমাত্র লক্ষণ। কারণ, এই বৈচিত্র্য-পূর্ণ জগতের সমস্ত একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান। তিনি একমাত্র সত্য পদার্থ। অবশিষ্ট পরিদৃশ্যমান ত্রিবিধ জগৎ মায়া-বিজৃম্ভিত (illusion) মাত্র। সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই পরা-ভক্তি লাভের যোগ্য হন। সেই পরাভক্তির দ্বারা সাধক তখন তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারেন, ভগবানের স্বরূপ কি, তখনই তিনি ভগবানের লীলামৃত পানের অধিকারী হন। তখনই চিনি খাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধককে প্রথমতঃ চিনি হইয়া চিনি খাইতে হইবে। ইহা লৌকিক জ্ঞানে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইলেও অতি সত্য কথা। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা উক্ত হইয়াছে

> ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ৪।৪।৬

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তর্কের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না অথবা কাম সাধনা বা লালসার বিলাস ও বিক্ষেপ এই সাধনার কোন অঙ্গ নয়। গীতায় ভগবান মুক্তির কোন সুবিধা-জনক সহজ পথ (Royal road) আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া যদি কাহারও ধারণা হইয়া থাকে, তবে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করিব। এই সাধনার রহস্য অতি নিগূঢ়। ইহার বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ।

প্রতীক্ষা

শ্রীমতী বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিপূর্ণ সাজি লয়ে, নিত্য বয়ে
আনি আমি পূজা-উপচার,
মুছিয়া পূজার ঘর, বেদী'পর
যতনে সাজাই ফুলহার।
ধূপ দীপ জ্বালি দিয়া, মোর হিয়া
জাগে নিতি তব প্রতীক্ষায়,
ব্যর্থতার গ্লানি বহি, নিত্য সহি
চিত্ত কাঁদে তোমার আশায়।
নৈবেদ্য-থালিকাখানি, রোজ আনি,
রাখি ধীরে সে বেদিকাতলে,
কি জানি, যদি বা এসে, অবশেষে,
আমারে ছলিয়া যাও চলে!

তব পূজা অনুষ্ঠানে, মোর প্রাণে
রাখিব না কভু কিছু বাকি,
আমার আপন হিয়া, প্রেম দিয়া,
তোমা লাগি নিত্য ভরে রাখি।
আপনি আসিয়া যবে, তুলি লবে
যত্নে গাঁথা মালিকা দুর্লভ,
সেদিন আসিবে কবে, ধন্য হবে
প্রতীক্ষিত ধূপের সৌরভ।
আমার এ পূজা-ঘর, অকাতর,
দিবা-নিশি আগুলিয়া থাকি—
আসিবে দেবতা মোর, ঘুমঘোর
ঘুচাইবে—মুছাইবে আঁখি।

৪

সলিল সে দিন হাসপাতালে এসে আগে গেল মেয়েদের ওয়ার্ডে। প্রথমে সেখানে শান্তার সঙ্গে দেখা। শান্তা বললো—"খানিক আগে অঞ্জুকে তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে গেছে। ডাক্তার মিত্র সার্টিফিকেট দিলেন।"

সলিল যেন নিজেকে একান্ত একা মনে করলো! এত বড় হাসপাতালে আর যেন কোন 'চার্ম' নেই, তারও যেন সব প্রয়োজন এক নিমেষে ফুরিয়ে গেছে। পর-মুহূর্ত্তেই মনের এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা সরিয়ে ফেলে সহাস্যে বলে উঠলো—"যাক্, ভালোই হলো। এত দিনে এক-রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কি বলেন? আত্মীয়-স্বজনের মাধ্য গিয়ে পড়লেন, এবার তিনি বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন'খন। তাঁর পক্ষেও এখন নিজের লোকেরই প্রয়োজন বেশী।"

ললিতাদের বাড়ী গিয়ে সরোজ যা দেখলো, তা'তে মনের সমস্ত আশা তার নিবে এলো! এবং বাইরে যাওয়ার জন্যও নিজে লজ্জিত বড় হলো না। অঞ্জলিকে আগে যে দেখেছে, আজ দেখলে চিন্‌তে তার কষ্ট হবে। চৈত্র মাসের শুষ্ক-নদীর মতো শীর্ণ হয়ে গেছে তার ভরাট দেহ, বিছানার এক-পাশে নির্জীবের মতো পড়ে আছে! অতি সন্তর্পণে অঞ্জলির কপালে নিজের ডান হাতখানি রেখে ধীর মৃদু-কণ্ঠে সরোজ বললো—"সন্ধ্যা, তুমি তো আমাদের এলাহাবাদের ঠিকানা জান্‌তে, তবে কেন খবর পাঠাওনি?"

আজ কত দিন পরে পুরানো সন্ধ্যা-নামে অঞ্জলিকে এই সম্ভাষণ! অঞ্জলির মনের পটে অর্দ্ধবিস্মৃত অতীত দিনের ছবিগুলো একে-একে ফুটে উঠ্‌তে লাগলো। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গলো সরোজের কথায়:—"কি হয়ে গেছ তুমি সন্ধ্যা! জানি, তোমার কোন কথাই আমাকে জানাতে চাও না। বোধ হয়, ভেবেছিলে, তোমার অসুখের খবরে আমার কি বা দরকার! না?"

অঞ্জলি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি তো কিছুই জান্‌তে পারিনি,—অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম যে। যদি মরে যেতাম, আপনার পায়ের ধূলো পর্য্যন্ত আমার মাথায় পড়তো না। আপনার কাছে যে আমি কত ঋণী!"—সরোজের অলক্ষ্যে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো।

তার পর প্রত্যহ কুশল-প্রশ্ন, নমস্কারের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সলিল ও অঞ্জলির ঘনিষ্ঠতা অনেকটা জমে এলো। এরা দু'টিতে পরস্পর যখন আলাপ করে, তখন শান্তা ও রেণুর চোখে-চোখে কৌতুক খেলে যায়!

সলিল বলে অঞ্জলিকে—"আপনার মুখে যে আবার হাসি দেখবো, এ আমার কোন দিনই মনে হয়নি! এর জন্য ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই।"

অঞ্জলি সলজ্জ কণ্ঠে বলে:—"আপনি আমার জন্য কত কষ্ট করেছেন!"

বাধা দিয়ে সলিল বলে—"না, না। ও কথা আপনি বলবেন না। মানুষ যদি মানুষের অসুখে-বিসুখে না দেখবে, তাহলে তার কিসের মনুষ্যত্ব?"

অঞ্জলি কিন্তু তা'র মনের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিশেষ ভীত হলো। মনের মধ্যে অলক্ষ্যে কোথায় যে বিপ্লব বেধেছে তা'র, আজ তা টের পেলো। সলিলের সঙ্গ সে চায়, সলিলকে সে ভালোবাসে।

কিন্তু সরোজ! না, না সরোজ দেবতা, সে দুর্লভ! তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারে সে, ভালোবাস্‌তে পারে না।

সে দিন কলেজের ছুটীর পর হোষ্টেলে এসেই অঞ্জলি তা'র ক্লান্ত দেহ অলস ভাবে বিছানায় ছড়িয়ে দিল। ললিতাদি'র কাছে ক'দিন যায়নি, তা'দের কোন খবরও পায়নি। ইচ্ছা করলে এখন অবশ্য যেতে পারে, কাল বেলা দশটা'র মধ্যে হাজির হলেই চল্‌বে। কিন্তু তবু কি জানি, এ-সময়টুকু আর অপব্যয় করতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। কি আশা—কি একটা আকাঙ্ক্ষা তাকে উতলা করে তোলে! যারা তা'কে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করে' দিল, যারা তার জন্য অহেতুক কত কি কর্‌লো, তাদের উপর মনের এই অবস্থায় সে বড় লজ্জিত হলো।

বিছানা ছেড়ে অঞ্জলি উঠে পড়লো। পরে প্যাডটা টেনে এনে মৈত্রীদি'কে একখানা চিঠি লিখলো—"আমি বাড়ী যাচ্ছি। কাল দশটার মধ্যে পৌঁছুবো। বিশেষ দরকার।"

চিঠিখানা একটা কভারে পূরে নাম-ঠিকানা লিখে দোয়াত চাপা দিয়ে রেখে বাথরুমে গেল। সেখান থেকে গা ধুয়ে এসে চুল বাঁধলো, তার পর পছন্দসই একখানা হাল্কা নীল রংয়ের শাড়ী পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশ করে দেখে নিয়ে জুতো পরে যেই বেরুবে, অমনি সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলো সলিলকে।

সহাস্যে সলিল জিজ্ঞেস করলো—"এই যে, সেজেগুজে যাচ্ছেন কোথায়? সত্যি, চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে।"

লজ্জায় অঞ্জলির গাল দু'টো গোলাপের মত লাল হয়ে উঠলো। নীচের দিকে চেয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল—"বাড়ী।"

—"বিশেষ দরকার আছে?"

—"না, এম্‌নি যাচ্ছি। অনেক দিন দিদির খবর পাইনি, তাই।"

—"তবে আর এক থাক, অন্য দিন যাবেন—অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। আমি গাড়ী এনেছি,—চলুন না খানিক বাইরের হাওয়া খাওয়া যাক্। দেখুন, আপত্তি নেই তো?"

অঞ্জলি একটু ভেবে নিয়ে ঈষৎ কাঁপা গলায় বললো—"না, আপত্তি আর কি! চলুন।" একটু আগে সে যে-সংকল্প করেছিল, পর-মুহূর্ত্তে তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

খোলা গাড়ীতে পাশাপাশি বসে' দু'জনে—মন আনন্দে বিহ্বল। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে সীমাহীন যাত্রার নেশায় বিভোর! দু'জনেই নির্ব্বাক্। মন-প্রাণ তাদের কি এক অপরূপ ভাবের উন্মাদনায় ভেসে গেছে, কে জানে!

অঞ্জলি নিজের অজ্ঞাতে এক-মনে সলিলকে দেখছিল। হঠাৎ অঞ্জলিকে লক্ষ্য করে' সলিল বলে উঠলো—"কি দেখ্‌ছেন? ভাব্‌ছেন একটা মিস্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে কি ঝক্‌মারিই করেছি, না?"

অঞ্জলি ভীষণ অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে বললো—"না, না, আপনি বড্ড ঘেমেছেন—তাই বলবো ভাবছি, এবার না হয় ফেরা যাক্।"

—"ও! তাই ভাবছেন? কিন্তু আমরা অনেক দূর এসেছি—কলকাতা ছাড়িয়ে।"

অঞ্জলি সত্যিই এবার মনে মনে একটু ভীত হলো—এতখানি দুঃসাহস তার ভালো হয়নি। মন সুখী হলেও লোকতঃ এ অন্যায়! তা' ছাড়া এর পরিণাম কোথায়, অঞ্জলি তা' জানে না। তাই সে ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলো—"আজ না হয় এই পর্য্যন্তই থাক্, সলিল বাবু!"

সলিল যেন বুঝতে পারলো অঞ্জলির মনের ভাব! তাই অল্প একটু হেসে বললো—"কোন ভয় নেই আপনার। ঠিক সাতটার মধ্যেই আপনাকে পৌঁছে দেবো। আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো ‥‥‥, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।"

শেষের দিকে "তুমি," বিশেষ করে তার নাম ধরে' সম্বোধন— ‥‥‥ সারা দেহে এক অপূর্ব্ব পুলকের তরঙ্গ তুলে দিল! এ যে তার বুভুক্ষিত হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা! ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে অঞ্জলি বললো—"আপনাকে যদি বিশ্বাস না করবো, তা' হলে আপনার সঙ্গে আসবো কেন?"

গাড়ী থেকে নেমে তারা বসলো এক গাছের তলায়। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ গাছের উপর থেকে কতকগুলো পাখী ডানা ঝটপট্ করতে করতে উড়ে গেল। কাছেই বোধ হয় কোথাও কাঠমল্লিকার গাছ, ফুলের সৌরভ তা জানিয়ে দিল। অঞ্জলি কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠলো সলিলের মৃদু স্পর্শে। সলিল ধীরে ধীরে সরে এলো অঞ্জলির কাছে, তার পর অতি-সন্তর্পণে পরিপূর্ণ আবেগ-ভরে অঞ্জলির একখান হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো—"আমায় তুমি ভয় করো না অঞ্জলি। তোমার কোন অসম্মান আমি করবো না। বলো তো তুমি, আমার মনের কথা কি তুমি কিছু জানো না?···জীবনের পথে আমার সাথী হবে তুমি?···"

অঞ্জলির বুকের মধ্যে যেন ঝড় উঠলো! এ কি স্বপ্ন! অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে শান্ত সহজ কণ্ঠে অঞ্জলি উত্তর দিল—"জানি, কিন্তু আপনি জানেন না,···আমি ···। শুধু অমঙ্গলকেই আমি জানি! আলো দেখলে আমার ভয় হয়, এখনি ও-আলোটুকু আমার স্পর্শে নিবে যাবে! তাই—"

বাষ্পভারে অঞ্জলির কথা রুদ্ধ হলো—জলে দু'চোখ ঝাপ্সা—অঞ্জলি আনমনে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো। সলিল অবিচল দৃষ্টিতে অঞ্জলির পানে চেয়ে রইলো—অঞ্জলিকে আর কিছু বলতে পারলো না সে! বুকের মধ্যে পুলকের স্পর্শ! মনে হলো, যেটুকু অঞ্জলি বলেছে,—তার বেশী কথার আর এখন প্রয়োজন নেই! ঐ কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরের গোপন কথা।

৫

এর পর ছ'টি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেছে। সলিল সসম্মানে পাশ করে' বেরিয়ে এসেছে। সলিল ও অঞ্জলি দু'জনেই কত সুখের নীড় রচনা করে আর অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের কত ছবিই দু'জনে আঁকে। অঞ্জলি সময়ে সময়ে বলে,—"এত আশা, এত আনন্দ—যদি বিষাদে পরিণত হয়, তখন পারবে তো ত্যাগের মহত্ত্ব দেখাতে?" সলিল হেসে বলে—"সে শক্তি তোমার কাছ থেকেই সঞ্চয় করছি, অঞ্জলি। তুমিই তো বলেছ, তোমরা শক্তির অংশ।"

দু'জনে কত কথা হয়। অঞ্জলি তার অতীত জীবনের কাহিনী অকপটে বলে যায় সলিলকে, আর সে রুদ্ধ নিশ্বাসে শোনে। লাঞ্ছনার সমস্ত গ্লানি যে এক-মুহূর্ত্তে মুছে দিয়ে তার সামনে পৃথিবীর সুষমা-ভাণ্ডার খুলে দেয়, জীবনকুঞ্জে তার এনে দেছে ফুলের শোভা-মাধুরী আর পাখীর গান, সেই নীরব পুরুষটির উদ্দেশে দু'হাত তুলে অঞ্জলি প্রণাম করলো—সলিলের অন্তরও সেই অচেনা অদেখা মানুষটির উপর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

হঠাৎ সংশয়ভরা মনে সলিল প্রশ্ন করলো অঞ্জলিকে—"আচ্ছা অঞ্জু, আমরা আবার ভুল-পথে যাচ্ছি না তো? ধরো—তোমার সেই দেবতা, তিনি যদি তোমার উপর কোন আশা রাখেন?"

অঞ্জলি ভীতা হরিণীর মত চমকে উঠে বললো—"না—না, ও কথা বলো না। তিনি ত্রাণকর্ত্তা—আমার নব জীবনে প্রভাতের আলো। তিনি দেবতা—তাঁর স্থান বহু উর্দ্ধে। আমার মতো আশ্রিতাকে তিনি হয়তো দয়া করতে পারেন, কিন্তু—" কথা শেষ করবার সাহস হলো না অঞ্জলির।

অঞ্জলির দিকে চেয়ে সলিল বললো—"ভাবছি, তিনি দেবতাই হোন, আর মানুষই হোন, যেটা সত্য, যেটা স্বাভাবিক—মেনে চলতে হবে বৈ কি।"

তুফানে পড়লে মানুষ যেমন আকুল প্রাণে আশা করে, যদি কূল পাই, তেমনি অসহায় ভাবে অঞ্জলি চাইলো সলিলের মুখের দিকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—"আমার এত সাধের সাজানো খেলা-ঘর একটা দমকা বাতাসে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, এ আমি কি করে সহ্য করবো?"

ললিতা সরোজের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লো, অঞ্জলির মনের ভাবান্তরও তার সতর্ক লক্ষ্য এড়ায়নি।

এক দিন ললিতা সরোজকে বললো—"ঠাকুরপো, অঞ্জলির মত নি—আর কেন? বড় হয়েছে, পড়তে হয়, বিয়ের পরেই পড়বে!"

সরোজ বাধা দেয়।"—না, বউদি, ওকে জিজ্ঞাসা করো না; তুমি জানো না, ও আমায় কত ভক্তি করে। আমার ইচ্ছা জানলে অবশ্য ওর কোন আপত্তি হবে না—কারণ, ওর আশ্রয়, নির্ভর সবই আমি। কিন্তু, যদি মনে কর, ও আমায় ভালোবাসে না, আমি যে রকমটি চাই, ওর মন যদি নিজে থেকে তাতে সায় না দেয়—তা হলে? যে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছিল, আমিই যাকে সঞ্জীবিত করেছি, তাকে কোন্ প্রাণে আবার নিজের হাতেই ছিন্ন করবো বউদি? তার চেয়ে আমি অপেক্ষা করবো—যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে প্রতিদান পাই, ভালো, নাহলে এ-জীবনে আর কাকেও এনে জড়িয়ে তাকে আর দুঃখের ভাগী করবো না।"

সে দিন খাওয়া-দাওয়ার পর একখানা বই আনতে সলিল ঢুকলো সরোজের ঘরে। কতকটা লক্ষ্যহীন ভাবে এ-বই ও-বই নাড়া-চাড়া করতে করতে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর ঝুপ করে কি একটা পড়লো। তুলে দেখে—একটা আলবাম, আর তার মধ্যে ওটা—ওটা কি? কা'র ছবি। সে মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হলেও বুঝি সলিল অতটা চমকে উঠতো না। শরীরের সমস্ত ধমনীর রক্ত তার বুকে গিয়ে জমেছে—আর সেখানকার প্রতিটি স্পন্দন সে শুনতে পাচ্ছে।

হাতখানা অসহনীয় তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠলো! তখনো তার হাতে হাস্যময়ী তরুণী অঞ্জলির ফটো, নীচে লেখা—"সন্ধ্যা"। সলিলের মাথায় কে যেন সজোরে আঘাত করলো—ভগবান্ এ কি করলে! যাকে কেন্দ্র করে নাটকের এই অভিনয়, আজ সে-ই হবে দর্শক! উজ্জ্বল আলোয় ফটোখানা তুলে ধরলো—হাঁ, সেই! ভুল নয়। এ যে সলিলের কত বাঞ্ছিত! এখানে কি ভুল হয়? ফটোখানা উল্‌টে দেখে, আট বছর আগেকার তারিখ। তোলা হয়েছে বিলাসপুরে। চকিতে তার মনের উপর থেকে একখানা পর্দ্দা সরে গেল, আর স্মৃতি মেলে ধরলো সেখানে অতীত দিনের এক অসমাপ্ত অধ্যায়। হাঁ, ঠিক তাই। পিসিমার বাড়ী বিলাসপুর, তাঁর ভগিনীর নাম সন্ধ্যা। তার পর পিসিমার সেই চিঠি—সন্ধ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না—একে একে সবই মনে পড়লো তার।

অঞ্জলিও তার কাছে কিছু লুকোয়নি তবে। সে শুধু বলেছিল, বর্দ্ধমানের এক গ্রামে তাদের বাড়ী। সরোজের নামের পরিবর্ত্তে এক মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করেছিল, কিন্তু সেও তো কম বোকামি করেনি! তার গ্রামের নাম, ভদ্রলোকের কি নাম, কোথায় তিনি থাকেন! সে কেন জিজ্ঞাসা করেনি? অঞ্জলি সে সব স্পষ্ট করে বলেনি! এ কি ষড়যন্ত্র তাকে নিয়ে।

আহত অভিমানে ক্রুদ্ধ বাঘের মতো নিষ্ফল আক্রোশে সলিলের সমগ্র অন্তর জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো—শুধু চোখ দু'টোতে ফুটে উঠলো, আত্ম-মর্য্যাদার ভাস্বর দীপ্তি! সলিলের জীবনে সব চেয়ে বড় আঘাত এই প্রথম। বন-হরিণের মতো চপল আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল মন! দুঃখের সঙ্গে কোলাকুলি আজও করেনি। অতি শৈশবে বাবা মারা যান—তার পর থেকেই সে মার স্নেহে, দাদার অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রীতির আবেষ্টনীর মধ্যে সোহাগে আদরে বেড়ে উঠেছে। যে সুন্দরী পৃথিবী তার কাছে ছিল শুধু ফলে ফুলে সুষমায় ভরা, আজ এক মুহূর্ত্তে তার মধ্যে দেখলো সে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, মিথ্যা ছায়া, অতৃপ্তির হাহাকার!

ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দে সলিল চমকে উঠলো। রাত এগারোটা। দাদার আসবার সময় হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দোরটা সজোরে বন্ধ করে দিল, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। সে যেন তার সব চেয়ে প্রিয়জনকে এইমাত্র শ্মশানে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এসেছে—সর্ব্বহারার দুঃখ বুকে নিয়ে!

৬

—"তোর মুখ অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন রে শেলি? শরীর ভালো আছে তো?"—সলিলের কপালে হাত রেখে মা তার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। সলিলের মন তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

সে বললে,—"না মা, কোন অসুখ হয়নি তো আমার। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। তাই বোধ হয়, এ রকম মনে হচ্ছে। যা তো ভজুয়া, এই খামখানা আগে পোষ্ট করে দিয়ে আয়। আজই যেন যায়—খুব জরুরী চিঠি।" এই বলে ভজুয়ার হাতে একখানা খামে মোড়া চিঠি দিয়ে সলিল মুখ-হাত ধুয়ে নিল। তার পর শরতের সোনালি রোদের মতো টলটলে এক-কাপ চা আর তার রোজকার বরাদ্দমতো খান-চারেক অমৃতি জিলিপি এনে মা হাজির করলেন। দু'খানা জিলিপি খেয়েই সলিল বললো—"আর খাবো না মা, ভালো লাগছে না।"

মা হেসে বললেন—"এ যে দেখ্‌ছি বেড়ালের মাছে অরুচি! তা'হলে সত্যি তোর শরীর ভালো নেই শেলি।"—বলেই সলিলের জন্য খানিকটা উৎকণ্ঠিত হলেন।

সলিল স্যুট্ পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে প্রথমেই যতীশদা'র বাড়ী গেল। ললিতা তখন বামুন ঠাকুরকে কুটনো কুটে দিচ্ছিল, হঠাৎ সাম্‌নে অচেনা লোক দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেই সলিল বললো—"বৌদি, আমি সলিল, সরোজের ভাই। যতীশদা' কোথায়?"

যতীশ বাথরুমে শেভ্ করছিল, অচেনা গলা শুনে বেরিয়ে এলো—"হ্যালো, সলিল ডাক্তার!" ললিতাকে লজ্জাবনতমুখী দেখে বললো—"আরে, ও শেলি সাহেব। এ দিকে ওঁর বড় একটা আগমন হয় না, তাই গৃহকর্ত্রী লজ্জায় জড়সড়ো। তার পর, কি মনে করে? এই কালী, একটা চেয়ার এনে দে—মান্যবর অতিথি!"

ললিতা এতক্ষণে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললো,—"আসুন ঠাকুরপো, আমার আর দোষ কি, বলুন? সেই কত দিন আগে শুধু একবার দেখেছি।"

সলিল জোর করে মুখে হাসি টেনে বললো—"না বৌদি, দোষ আমারই, স্বীকার করছি।"

যতীশ সলিলকে বললো—"তুমি বসো, আমি বাকী কাজটুকু সেরে আসি।" এই বলেই যতীশ বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ললিতার সঙ্গে সলিলের অনেক কথা হলো। একে একে গত রাত্রের কথা, ফটো, সবই বলে গেল সলিল। ললিতা বললো—"হ্যাঁ ভাই, মুস্কিল তো ঐখানে। সরোজ ঠাকুরপোর মনের একান্ত জিদ্, সন্ধ্যাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। অথচ সন্ধ্যাকে বলতে দেবে না—পাছে সন্ধ্যা কিছু মনে ভাবে। সন্ধ্যার এ দিকে কোন খেয়ালই নেই। বললে ও কিছুতেই অমত করবে না—সেই জন্যই বেশি বিপদ্।"

সলিল রুদ্ধ নিশ্বাসে সব শুনলো, তার পর বললো—"বৌদি, আমার মতে মেয়েটিকে আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

—"বেশ তো, বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবো ওকে?"

—"অবশ্য আজ নয়। কাল একটু আভাস দেবেন, তার পর দাদাকে দিয়েও একবার বলাবেন।"

—"কিন্তু আপনার দাদা কি রাজি হবেন?"

—"আপনি একটু আভাস দিলেই বুঝতে পারবেন। আর তা' ছাড়া দাদার সুখের জন্যও যেমন করে হোক ওর মনের কথা আমাদের জান্‌তে হবে। নাহলে দাদা যদি সংসারী না হন তো বড় দুঃখের কথা।"

ললিতা খানিকক্ষণ মৌন হয়ে ভেবে নিল, তার পর মৃদু স্বরে বললো—"কিন্তু মনে করুন, অঞ্জলির যদি সত্যই মত না থাকে? এ তো আর ওষুধ গেলানো নয়!"

সলিল গম্ভীর স্বরে বললো—"সন্ধ্যার সম্বন্ধে এ আপনার নিছক স্নেহের পরিচয়!"

ললিতা বললো—"জানেন, আমি অনেক আগেই সরোজ ঠাকুরপোকে বলেছিলাম, অত দূর থেকে প্রাণের ভাষা অন্তর্য্যামীকে জানালে তো চলবে না, ওকেও জান্‌বার অবকাশ দিন—সে শুধু আপনার দয়ার পাত্রী বা আশ্রিতা নয়। এখন বুঝতে পারছি,

আমারই হয়েছে বিড়ম্বনা। ওঁর কাছেও যে পরামর্শ নেবো, সে উপায় নেই। রোমান্সে পড়লে কি করতে হয়, সে কথা ওঁর ডায়েরীতে না কি লেখা নেই!"

কথা শুনে সলিল হাসলো, তার পর বললো—আপনাকেই এ ভার নিতে হবে বৌদি।"

—"দেখি, কি করতে পারি। তবে অঞ্জলির মনের ধারা আজ-কাল যেন কেমন-কেমন মনে হয় আমার। সর্ব্বদা আনমনা—ভালো করে হাসে না, কথা বলে না—কি রকম যেন!" ললিতা উদাস ভাবে বাইরের দিকে তাকালো।

—"আজকের মতো তাহলে উঠি বৌদি।"

—"না, না, সে কি কথা! কত দিন বাদে আসা, একটু মিষ্টি-মুখ করতে হবে বৈ কি!"

হাত জোড় করে সলিল বললো—"না বৌদি, আজকের মতো ক্ষমা করতে হবে। পেটে আমার এক ফোঁটা জলও গলবে না আজ।"

সলিলের চোখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হলো ললিতা। দরদী কণ্ঠে বললো—"তবে থাক্ ঠাকুরপো! আপনার কথা ভুলবো না, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।"

ললিতাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সলিল দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললো—যে দিকে দু'চোখ যায়। আজ নিজের হাতে সে তার অদৃষ্টের পথ রুদ্ধ করে দিল। মন-প্রাণ তার কি এক অব্যক্ত বেদনায় কেঁদে উঠে বললো—বন্ধু আমার, বিদায়! আজ আমার কিছু রইলো না, শুধু তোমারই প্রেমের জয়-টীকা ললাটে এঁকে আমি চলবো দুর্গম মরু-কান্তার অতিক্রম করে।

৭

তার পর নিঃশব্দে সরোজকে আত্মসমর্পণ করলো অঞ্জলি। ললিতা সরোজের মাকে সব খুলে বললো, মাও সানন্দে অনুমতি দিলেন। দাদু বললেন—"শালা আগেই রুক্মিণী-হরণ করে রেখেছিল!"

বিয়ে খুব ধূমধামেই হলো। পিসিমা তাঁর মেয়ে পারুলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যার উপর ব্যবহারের কথা মনে করে সত্যই আজ বড় লজ্জিত, অনুতপ্ত স্বরে তিনি বললেন—"আমার ভাইপো যে আমার অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সে জন্য আমি আজ খুব খুশী! সন্ধ্যা আজ আমার রাজরাণী।"

পারুল সন্ধ্যাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সে ভাবে, মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো এত যার সুখ-ঐশ্বর্য্য, সে কি তাদের সেই অনাদৃতা অবহেলার পাত্রী সন্ধ্যা!

ফুলশয্যা ও বৌ-ভাত একই দিনে। কত লোক এলো, কত গেল—তার সীমা-সংখ্যা নেই। ললিতা আজ তৃপ্তির সঙ্গে সাজিয়েছে সন্ধ্যাকে, যেখানে যা দিলে মানায়। ভালো একখানা লাইট-গ্রীণ রঙের বেনারসীতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। শান্তা, রেণু, সুজাতা—আরও অনেক বন্ধু এসেছে: শান্তা ও রেণু কিন্তু এ আনন্দে যোগ দিতে পারছে না মোটেই। তারা জানে, তাদের অঞ্জলিদি'র সর্ব্বস্বান্ত হলো—প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে সমারোহের এ বিরাট আয়োজন কেন?

বাইরের লোকজন একে একে সব চলে গেছে। কেবল দাদু, সতীশ, ললিতা আর মা আছেন সন্ধ্যার কাছে। ললিতা হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো—"দেখুন মাসিমা, সন্ধ্যার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে নূতন গহনার ঘেঁষ লেগে।"

এমন সময় সরোজ ঢুকলো ঘরে, সঙ্গে সলিল। সন্ধ্যা ঘাড় হেঁট করে বসেছিল, কথার সুরে তার চমক ভাঙ্গলো। সরোজ বললো—শুনছো মা, শেলি কি বলে!"

—"কি রে শেলি?" মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—"আমি পুনায় দরখাস্ত করেছিলাম মা, কাজের জন্য। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছি। পনেরো তারিখে জয়েন করতে হবে।"

সন্ধ্যার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো। এ কি! তার কি এখনি হার্টফেল করবে!

সলিল এসে দাঁড়ালো সন্ধ্যার কাছে। "দেখি, মুখ তোলো"—এই বলে' সে দু'খানি বই তার হাতে দিল। একখানা "সতীধর্ম্ম," আর একখানা "সাবিত্রী"। মা বললেন—"একখানা মহাভারত এনে দিলে আরও ভালো করতিস শেলি।"

সলিল বুঝলো সন্ধ্যার বড় কষ্ট হচ্ছে! মাকে উদ্দেশ করে সে বললো—"মা আমার ট্রেণ একটায়, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমায় বেরুতে হবে।"

মা বললেন—"দিন-রাত্তির তোর দৌরাত্ম্য আমার ভালো লাগে না শেলি।"

—"না মা, সত্যি বণ্ড সই করে দিয়েছি।"

—"কিন্তু কোন্ দুঃখে তুই নাম দিলি? কিসের অভাব তোর? আর তোকে ছেড়ে আমিই বা কি করে থাকবো বাবা?" মা'র চোখ সজল হয়ে উঠলো।

সরোজ বললো—"আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কে তোমাকে দরখাস্ত করতে বললে? আমি যে এদিকে শোভাবাজারে মেয়ে দেখে এসেছি, সামনের বিশ তারিখে পাকা দেখা, আর তুমি এর মধ্যে ওস্তাদি করে চাকরি নিলে!"

দাদু পাথরের মতো নিশ্চল, মায়ের চোখে জল। মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কবে তুই ফিরে আসবি?"

সলিল উত্তর করলো—"যেখানেই থাকি না কেন মা, বছরে একবার করে অন্ততঃ তোমার শান্তির নীড়ে এসে জীবনকে শান্ত করবো, তোমার কোলে এসে শোবো।"

মা বললেন—"তবে বিয়ে করে যা না কেন! অনুরাধা ভারী চমৎকার মেয়ে,—রূপে-গুণে এমন দেখা যায় না! তোর পছন্দ হবে।"

সলিল বললো—"না মা, যদি ঐ উৎপাত করো, তাহলে আর কোন দিন আমায় দেখতে পাবে না। এই তো বৌ পেলে, একে নিয়ে খুশী হও—এর মধ্যেই আমাদের পাবে। ও মাতৃহারা মেয়ে, স্নেহের কাঙাল। তোমার স্নেহে ওর সকল দুঃখ, সকল দৈন্যের যেন অবসান হয়। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ঘরের টানে আমায় আর বাঁধবার চেষ্টা করো না।"

মার মন কিছুতে স্থির হয় না। জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ রে, তোর কোন ভয় নেই তো?"

সলিল মৃদু হেসে বললো—"হাজার হাজার লোক মারা পড়ছে, তাতে যদি কোন দিন দুঃখ না পেয়ে থাকো, তাহলে আমার একটা জীবনের জন্য আর কতটুকু দুঃখ পাবে মা?"

মা নীরব। জানেন, তাঁর খেয়ালী ছেলেটিকে সংকল্পচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নয়। তবু একবার বললেন—"এখন বড় হয়েছিস, নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরাই বুঝিস্। তবে একান্তই যদি যাস্, আমাকেও সঙ্গে নে।"

সলিল উত্তর দিল—"সে তো নেবোই, তবে আরও কিছু দিন বাদে।" পরে সন্ধ্যার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—"ও বেচারি এলো আমাদের বাড়ীতে, ওর সংসার ওকে ভালো করে আগে বুঝিয়ে দাও, তার পর থাকবো তুমি আর আমি। এখন তবে আসি মা। ট্রেণের সময় হলো।"

সলিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। কারো মুখে কথা নেই, নড়বার শক্তি নেই। সন্ধ্যাও নিশ্চল পাথরের মতো বসে; চোখে তার এক ফোঁটা জলও অবশিষ্ট নেই!

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

১

বঙ্গদেশ কত কালের প্রাচীন এবং ঋগ্বেদে বা মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে বঙ্গদেশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কি না—আমরা এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। মধ্যযুগে বৌদ্ধ-প্রভাব ও মুসলমান-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মশাস্ত্র কি প্রকারে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এ প্রবন্ধে তাহাই সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বদ্ধমূল হওয়ার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, পাহাড়পুরেও হিন্দুগণের উপাস্য দেবদেবীর যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বা সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পালরাজবংশের গোপাল প্রবল হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইবার চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে দ্বারবঙ্গ ও মিথিলাও পঞ্চগৌড়ের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। গোপালের পর মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজ্যকালে পালরাজবংশের বিশেষ অভ্যুদয় হয়। পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ না করিলেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই সময়ে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রশ্রেণীর বহু জাতির বহু ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলে এ কথাও বলিতে হয় যে, পালরাজগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। হিন্দুর দেবমন্দিরে ও পূজা-মহোৎসবেও তাঁহারা অর্থ-সম্পত্তি দান করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তবে বঙ্গদেশের কায়স্থ, গন্ধবণিক্, সুবর্ণ-বণিক্ ও বৈদ্যগণের অনেকেই এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের ন্যায় সুশাসক ন্যায়পরায়ণ রাজার শাসনকালে বঙ্গদেশের সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। তথাপি রাজা যখন স্বয়ং বৌদ্ধ, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই যে হিন্দুধর্ম্মের আচার-ব্যবহার সঙ্কুচিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এ কথা বঙ্গদেশের ঐ সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী রাজা দেবপাল এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা প্রথম মহীপালের ও নবপালের সময়ে রাজ্যের শাসননীতি এই ভাবেই পরিচালিত হইতেছিল। ফলে বঙ্গদেশের কায়স্থ, বণিক্, বৈদ্য-প্রমুখ সমস্ত জাতিই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিল। কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটি প্রবল সম্প্রদায় তখনও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বৌদ্ধগণ আচারে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান না মানিলেও দায়াধিকার বা অন্যান্য ব্যবহার বিভাগে তাঁহাদিগকেও হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে চলিতে হইত এবং এই জন্যই তৎকালে দায়াধিকার বা ব্যবহার বিষয়ে বৌদ্ধগণের জন্য কোনও স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরন্তু, তাৎকালিক অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ পণ্ডিত চাক্ষুদাসের ব্যাকরণের ও ব্যাকরণের সূত্রের কারিকাপ্রণয়নের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সময়ে বৌদ্ধ কায়স্থ ও বৈদ্য পণ্ডিতগণের বিরচিত অনেক আয়ুর্ব্বেদ ও কাব্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লোপ পাওয়ায় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়ায় ঐ সকল বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থাদি লোপ পাইয়াছে।

পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় বিগ্রহপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১০৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে সুশাসনের অভাবে ও রাজার অত্যাচারের জন্য বঙ্গদেশে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৈবর্ত্ত-গণনায়ক দিব্বোক ও ভীম হিন্দু ছিলেন বলিয়া কোনও আপত্তি হয় নাই। আমরা এ কালে সুসভ্য ইংরেজরাজের রাজত্বে যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, সে কালের বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ বৌদ্ধশাসিত বঙ্গদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্পর্কে সেরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের একান্ত অভাবই দেখিতে পাওয়া যাইত। সে কালে ধর্ম্মকে বৈষয়িক স্বার্থের ক্ষেত্রে আমদানি করার কৌশল বাঙ্গালী অবগত ছিল না। এই জন্য বঙ্গদেশের ও বিহারের হিন্দু, বৌদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলেই মহারাজা রামপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিল। রামপাল ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজ রামপাল যেমন হিন্দু-মন্দিরে তেমনি বৌদ্ধ-বিহারে অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তিনি কোনও দিনই গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার পুত্র কুমারপালের ও মদনপালের রাজত্বকাল সুদীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ না হইলেও, তাঁহারাও পিতার ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মকে এক ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ উভয়েই তাঁহাদের রাজসভায় উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ, ঐ সময়ের বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রগতিশীল বাঙ্গালী হিন্দুর অবলম্বনীয় হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইত।

বঙ্গদেশে রামপালের রাজত্বকালেই হিন্দু জমিদার হিসাবে

সেনবংশের সামন্তসেন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্শ্বেই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে বালক, জিকন, ধনঞ্জয় ও শ্রীকরের নাম বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। বোধ হয়, তৎকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় স্মৃতি-নিবন্ধ না থাকিলেও পদ্ধতি-গ্রন্থের কোনও অভাব কোনও দিনই অনুভূত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন-প্রমুখ স্মৃতি-নিবন্ধকারগণ তাঁহাদের সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রাচীন স্মৃতিকার হিসাবে বালক, জিকন, ধনঞ্জয় ও শ্রীকরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে ঐ সময়ে মীমাংসাকারেরও অভাব ছিল না, এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যে বিশেষ প্রভাব ছিল, গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট ভাষ্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালরাজাদের রাজত্বের অবসানে যখন সেনরাজগণ বঙ্গদেশের রাজা হইলেন, তখন বাঙ্গালা দেশের সমাজে একটি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহান্ সত্য যাঁহাদের হৃদয়ে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা এমন ভাবে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন যে, বিরোধ বা বিপ্লবের কোনও নিদারুণ অভিব্যক্তি ব্যতীত বঙ্গদেশের হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুর বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনা সমস্ত বৌদ্ধসমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। পশুপতি ও কালেশির পদ্ধতিগ্রন্থও যাহা করিতে পারে নাই, ভবদেব ভট্টের অভূতপূর্ব্ব মনীষা তাহাই করিতে সমর্থ হইল। তিনি নব ভাবে নবীন মূর্ত্তিতে গঠিত হিন্দুসমাজের মধ্যে বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক ও নবশাখদিগকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র মর্য্যাদা-সূচক সমাজ-ব্যবস্থার বিধান দান করিলেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশের সমাজ-ব্যবস্থা সত্যই অভিনব আকার ধারণ করিল। বঙ্গদেশে উপবীতধারী ও উপবীত-হীন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মাত্র এই দুইটি প্রধান ভাগে সমগ্র হিন্দু জাতি বিভক্ত হইল। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক্ ও নবশাখ—যাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ-বিপ্লবে সমস্ত হিন্দু-সদাচার ত্যাগ না করিলেও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বেচ্ছায় শূদ্র হইলেন, কিন্তু ইঁহারা মাত্র উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন—অন্য নববিধ বৈদিক সংস্কার তাঁহাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকিল। তন্ত্রোক্ত দীক্ষায় তাঁহারা বৈদিক সাধনার সার ভাগই প্রাপ্ত হইলেন। এই যে অভিনব শূদ্র—বেদে, পুরাণে বা প্রাচীন স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, বঙ্গদেশ সেই অভিনব শূদ্রে পূর্ণ হইল! ইঁহারা বেদমন্ত্র শ্রবণের অধিকারী এবং সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করাইবার অধিকারী, যজুর্ব্বেদ ইঁহাদের বেদ হইল। মনূক্ত শূদ্রের সহিত ইঁহাদের উন্নত চরিত্রের ও সামাজিক মর্য্যাদার সামঞ্জস্য সাধিত হইল না বলিয়া পরাশর ঋষি ও পরবর্ত্তী কালের মহামনীষী রঘুনন্দন ইঁহাদিগকে সচ্ছূদ্র আখ্যায় অভিহিত করিলেন। যাঁহারা মনূক্ত শূদ্র, তাঁহাদের পৌরোহিত্যের জন্য বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণের পূর্ণ মর্য্যাদা পান নাই, সেই সকল বর্ণ-ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থা হইল। বাঙ্গালা দেশের এই অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মহারাজ বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট হারলতা ও পিতৃদয়িতা-প্রমুখ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলেন। সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের কুলক্রমাগত সদাচারকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ইহার পরে আবির্ভূত হইলেন ব্রাহ্মণ-কুল-ধুরন্ধর মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। ইনি কোনও মহারাজার বা রাজার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত না হইয়াও দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব গ্রন্থ প্রচার করিলেন—তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গের হিন্দুসমাজ বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীর সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আসিয়া আজিও উন্নতশীর্ষে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান!

মহাত্মা রঘুনন্দন বঙ্গদেশের সমাজের উপর যে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই তাঁহার প্রাণশক্তিপূর্ণ প্রতিভার অপূর্ব্ব ফল। তিনি যদি এই সময়ে বঙ্গদেশে আবির্ভূত না হইতেন, তবে অধঃপতিত বাঙ্গালা দেশের যে কত দূর অধঃপতন হইত, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে যে প্রকারে গো-দান ও তাহার মূল্যস্বরূপ কার্ষাপণ দান করিয়া তিনি জটিল প্রায়শ্চিত্ত-বিধিকে সহজ ও দেশকালপাত্রোচিত করিয়াছেন, তাঁহার শ্রাদ্ধতত্ত্বে তিনি মনূক্ত শ্রাদ্ধকার্য্যে নিমন্ত্রণযোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে শাস্ত্রোক্ত দর্ভময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। নিত্য-নৈমিত্তিক সদাচার রক্ষার জন্য আহ্নিকতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্ব-প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে যে ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার কুশাগ্রধী প্রতিভার ও অসামান্য দেশভক্তির পরিচায়ক। আমরা বারান্তরে তাঁহার কার্য্যের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালায় সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলিতে গেলে আরও দুইটি ব্যবস্থার উল্লেখ না করিলে চলে না। প্রথম, মহারাজ বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য ব্যবস্থা ও দেবীবর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মেলবন্ধন। আর যাহাই হউক, নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা-ভূমি বঙ্গদেশের সুসন্তানগণ বুদ্ধিতে হীন ছিলেন, এ কথা কোনও দিন কেহই বলিতে পারিবেন না। হয় ত কৌলীন্য প্রথায় ও মেলবন্ধন প্রথায় অনেক দোষ বর্ত্তমানে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু যখন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তখন এই দুইটি প্রথা হিন্দু সমাজের কল্যাণ-বিধান করিয়াছিল এবং হিন্দু সমাজকে অচিরে ম্লেচ্ছগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সহিত কনোজাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মিশ্রণ সম্বন্ধেও আমরা এ প্রবন্ধে কোনও আলোচনা করিলাম না।

বিধাতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কোনও জাতিই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আজ য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ-মোহে ও পরাধীনতার প্রবল নিষ্পেষণে জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গুর হইয়া পড়িতে পারে—কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এই বিপদ্ অনিবার্য্য বলিয়াই শ্রীভগবদা-শীর্ব্বাদে বঙ্গদেশে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের, মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ও তান্ত্রিক কুলচূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের আবির্ভাব এক শতাব্দীর মধ্যেই ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের আবির্ভাবের ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছিল—বাঙ্গালায় সভ্যতার ধারা যে অনাবিল পবিত্র প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক-গণের তাহা বাঙ্গালী জাতিকে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। ভবিষ্যতে বাঙ্গালার এই সম্পূর্ণ সামাজিক ইতিহাস যিনি রচনা

করিবেন, তাঁহাকে জীবনব্যাপী সাধনায় বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার অরণ্যে, বাঙ্গালার ধ্বংসস্তূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর পর্ণকুটীরে, বাঙ্গালার আকাশে ও বাতাসে, বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির ও উপজাতির আচারে, ব্যবহারে ও সমাজ-ব্যবস্থায় যে ইতিহাসের উপাদান লুক্কায়িত হইয়া আছে—আত্মনিবেদিত প্রাণে ভক্তিবিগলিত চিত্তে সমদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারশক্তির নির্দ্দেশে তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

প্রতারিত

শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিচ্ছেদ হইয়া গেল! স্যাণ্ডাল-পরিহিত চরণে হুঁচট খাইলে যেমন বৃদ্ধাঙ্গুলির চামড়াবেষ্টনী আসল অবলম্বন অর্থাৎ সোল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, বিমান-আক্রমণের ভয়ে মেসের সঙ্গে একাত্ম ভাবে বিজড়িত উৎকল পাচকের সঙ্গে যেমন সকলের ছাড়াছাড়ি হয়, অথবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপূর্ব্বেই মাথার খুলির সঙ্গে কুঞ্চিত কেশের সম্পর্ক যেমন ঘুচিয়া যায়, হয়ত সেইরূপই বিচ্ছেদ হইল—ইতি আর অশেষের মধ্যে!

কিন্তু এ-বিচ্ছেদ কেন হইল?

প্রেমটা পুরানো হইয়া গিয়াছিল? না, কোন ভয় জন্মিয়াছিল? না প্রাণবস্ত কোন বস্তুর অভাব ঘটিয়াছিল? জানা যায় নাই! শেষে অশেষের সেই সিঙাড়ার মত নাকওয়ালা বন্ধু জয়দেব আসিয়া জানাইল যে, ইতির সরকারী চাকুরে পিতা বদলী হইয়াছেন।

হয়ত অশেষের সঙ্গে দু'-এক দিন ইতির কথা-কাটাকাটি বা ঐ জাতীয় কিছু ঘটিত, কারণ, ব্রীজের আড্ডায় অশেষকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক দেখিতাম! তার ফলে পার্টনার যে হইত, সে ভাবিত কোন্ অজানিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

এই আশু বিচ্ছেদের সংবাদটা সে দিন ভগ্নদূত জয়দেবই আসিয়া আমাদের জানাইয়া দিল। কাজেই খেলায় অশেষের আকর্ষণ regularly irregular দেখিয়া তাহাকে আমরা ক্ষমা করিলাম!

দুই বৎসরে উভয়ের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নাবালক ও নাবালিকাদের দ্বারা চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, জয়দেবের সহযোগে দু'জনের নানা বিষয়ে আলাপও হইয়াছে; পরিশেষে পরস্পর বিবাহিত হইতে না পারিলে লেকে ডুবিয়া মরা, অন্ততঃ পক্ষে মোটরে চড়িয়া উধাও হইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা—এমন সময় ইতির বাবা প্রায় সব-কিছুর ইতি করিয়া বদলীর আদেশ পাইলেন।

বিচ্ছেদের আনুসঙ্গিক কান্নাকাটি, প্রতিজ্ঞার রিভিসন ও প্রতিদিন চিঠি দিয়া খোঁজ করিবার প্রতিশ্রুতিও উভয় পক্ষে হইয়া গেল! "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে"···পড়া ছিল। চিঠিগুলি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হইবে, হঠাৎ কেহ না ধরিয়া ফেলে! দু'দিন ধরিয়া তাহারো মক্শো হইল।

তার পর কোন অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে অশেষ রহিয়া গেল কলিকাতায় এবং ইতির বাবা গেলেন দূরে কোন্ সহরে ছেলেমেয়ে, বাক্স-প্যাটরা, হৈ-হাঙ্গামাসহ।

* * *

দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেছে। অশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলার (কদলীর নহে) মাষ্টার; তকমা এবং মামার জোরে চাকরী পাইয়া কলিকাতা ছাড়িয়াছে। ইতির বাবা ইহার মধ্যে আবার বদলী হইয়াছেন।

প্রথম প্রথম ডাক-পিয়ন পাশের বাড়ীতে চিঠি দিয়া লেফ্‌ট্ টার্ণ করিলেই অশেষের হার্টের গতি কেমন যেন থামিয়া যাইত! চিঠি আসিত। প্রত্যুত্তরে অশেষ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিত। ক্রমে সপ্তাহে একখানি, তার পর মাসে একখানি—এই ভাবে চিঠির সংখ্যা কমিয়া আসিল। কিছু কালের মধ্যেই লেকের জলে ডুবিয়া মরায় অভিনবত্ব নাই বা সুবিধামত মোটর পাওয়া যায় না, এমনি অর্থাৎ যে কারণেই হউক, ক্রমপরিবর্ত্তনশীল কাল সব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া দিল!

অশেষ সংসারী হইয়াছে। বিশেষ নরক হইতে সবেমাত্র এক বৎসর হইল ত্রাণ পাইয়াছে। বদলীর চাকরী—নানা জায়গায় ঘুরিতে হয়। মাসে বার-দুই সিনেমা না দেখিলে তার চলে না। কিন্তু স্ত্রীকে লইয়া একসঙ্গে বসিয়া দেখা—সাহেবিয়ানা বলিয়া তার কেমন গা-ছম্‌ছম্ করে।

চাকরীস্থলে কোন্ এক সিনেমা-হলে ছবি দেখিতেছে। দোতলায় স্ত্রী বিপাশা আর আদুরে ছেলে।

ঘটনার পর ঘটনা তাক্ লাগাইতেছে। মাতার মৃত্যু-দৃশ্যে বিদেশ-প্রত্যাগত ছেলের উচ্ছ্বাস দু' মিনিট মাত্র চলিয়াছে, অভিভূত দর্শকবৃন্দ অন্তরে এবং কেহ কেহ বাহিরেই কাঁদিয়া আকুল, এমন সময় দোতলা হইতে ছেলের ক্রন্দন। আর যায় কোথা? 'বাড়ীতে রেখে আসতে পারেন না'? 'বাইরে নিয়ে যান', 'নুন দিয়ে' ·········ইত্যাদি ভদ্র-অভদ্র চীৎকার সিনেমা-পর্দ্দার প্রান্ত হইতে হলের শেষ-ভাগের অর্দ্ধেক অধিকৃত দর্শকবৃন্দের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

অশেষের আর সহ্য হইল না। একমাত্র ছেলের বিষয় লইয়া তাহার মাতাকে এই অযাচিত উপদেশ আর টিট্‌কারী! ছুটিয়া সে বাহিরে আসিল।

মেয়ে-গেটের ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "ওপরে যে ছেলেটি কাঁদছে, তার মাকে গিয়ে বলো, খোকাকে নিয়ে নেমে আসতে, বাবু ডাকছেন।"

ছেলে কোলে করিয়া মা নামিয়া আসিল।

"এ কি! অশেষদা! তুমি? চিনতে পারছ না? আমি ইতি। ···উনি নীচে বসে আছেন···আলাপ হয়নি বুঝি? এটি আমার ছেলে···যা দুরন্ত···ওঃ! এসো না এক দিন···এক দিন কেন, আজই সিনেমার পরে আমাদের বাড়ীতে। আচ্ছা থাক্, আজ আর এত রাত্রে গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু এক দিন এসো···উনি এখানে চাকরী পেয়ে এসেছেন"। ঠিকানা বলিয়া দিল।

শেষে "পরের স্ত্রীকে এমন ভাবে ডাকতে নেই···বুঝলেন ?" দিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া গেল।

*   *   *

সে দিন অফিস হইতে ফিরিয়া বসিয়া আছি। চাকর আসিয়া । করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া একখানা চিঠি দিল। পরিচিত ক্ষর।

ভাই হিমুদা

···সে দিন সিনেমায় হঠাৎ ইতির সঙ্গে দেখা! ইত্তরের াত ভেঙেচে গেল, খোঁজও করল না, আমি কি করি, কোথায় থাকি। নিজের একরাশ পরিচয় দিয়ে পর্দার আকর্ষণে ছুটে গেল।

ভালবাসার অর্থ কিছু বোঝে না, এমন মেয়ের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে না কি ?···

প্রতারিত অশেষ"

*   *   *

বুঝিলাম, অশেষ আর ইতির সিনেমা দেখার গল্প সিভাড়ানেকো জয়দেব ইতিপূর্ব্বে যা জানাইয়াছিল, তার সঙ্গে অশেষের চিঠির বেশ মিল আছে।

দিল্লীর পারোয়ারী সুলতান খুসরো খাঁ

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

যে সকল ব্যক্তি অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, খুসরো খাঁ পারোয়ারী তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার কাহিনীতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। খুসরো খাঁ ১৩২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া আসিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতির সমুচিত জ্ঞানের অভাব-বশতঃ দুর্ব্বলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ন একবার ম্যাটারনিকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি ষড়যন্ত্রকে রাজনীতি মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।" খুসরো খাঁয়ের সম্বন্ধে এ কথা আরও ভালো করিয়া বলা চলে। প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগের ভারতে রাজ্য অধিকার করা তত কষ্টসাধ্য ছিল না, যত কঠিন ছিল অধিকৃত রাজ্য নিজের আয়ত্তাধীনে রাখা। কৌশল, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস-ঘাতকতা, হত্যা প্রভৃতি তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত ছিল এবং খুসরো খাঁয়ের ক্ষমতা-লাভের কাহিনীতে আমরা এই সব প্রক্রিয়া দেখিতে পাই।

এই কাহিনীর একটা দিক্ বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খুসরো খাঁয়ের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া অতিশয় মর্ম্মবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; সত্য ও মিথ্যা প্রয়োগে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার দোষে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। খুসরো খাঁ যে হীনজন্মা ছিলেন, কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না, কিন্তু সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন ব্যক্তির জন্ম-বৃত্তান্তের প্রতি কটাক্ষপাত করা শরীয়তের আইনে অন্যায়। তিনি যে কতকগুলি পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কেহই তাহা অবিদিত নয়, কিন্তু যেরূপ নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে ঐতিহাসিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সঠিক কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়, যখন দেখা যায়, আলাউদ্দিন খিলিজির অকৃতজ্ঞতা এবং কুতুবুদ্দিন মুবারকের লজ্জাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মূর্খতা ঐ সব ঐতিহাসিককে এতটুকু বিচলিত, ক্ষুব্ধ করে নাই!

খুসরো খাঁ ছিলেন গুজরাটী। আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্ব-কালে মালব অবরোধের সময়ে তিনি মুসলমান-হস্তে পতিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং মালিক শাদী নামক এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রভৃত ক্ষমতাশালী ওমরাহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। বারানী তাঁহাকে 'বারাও বাচ্চা' বলিয়াছেন। 'বারাওন্' শব্দের অর্থ ঝাড়ুদার। কিনকেড এবং প্যারাস্নিস্ এই অর্থ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে মেথর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'পারোয়ারী' শব্দের অভিধানগত অর্থ বুঝায়, যাহারা ভিত্তিগাত্রহীন গৃহে বাস করে। সুতরাং তাহারা যে অস্পৃশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফেরিস্তা-অনুবাদক ব্রিগ্‌স্এর মতে 'পারোয়ারী' অর্থে বুঝায় অস্পৃশ্য হিন্দু; যে সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ করে এবং এত অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয় যে, নগরের মধ্যে তাহাকে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হয় না। 'পারোয়ার' শব্দটিকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'পরমার' পাঠ করিয়াছেন। 'পর-মার' অর্থে পক্ষীহন্তা বুঝায়; তবে এই উপজীবিকা পূর্ব্বোক্ত উপজীবিকা হইতে উৎকৃষ্টতর নয়।

দিল্লীর সুলতানদের রাজত্ব কালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিলে ধূমকেতুর মত খুসরো খাঁয়ের অভ্যুদয়ের কারণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়া অগৌরবে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে দাসবংশের পতন এবং রাজদণ্ড ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ প্রবীণ যোদ্ধা মালিক ফিরোজের হস্তগত হয়। মালিক ফিরোজ ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীন খিলিজি নামে পরিচিত। মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া এই বৃদ্ধ সুলতান তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক অতি নৃশংস ভাবে নিহত হন। খুল্লতাত-বংশের সমস্ত চিহ্ন পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত করিয়া আলাউদ্দিন খিলিজি সুদৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন। তাঁহার ন্যায় যোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষ ও তেজস্বী সুলতান ভারতের ইতিহাসে বিরল। রাজত্বের শেষভাগে এই "লৌহ ও রক্তের" মানুষটির স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে তাঁহার স্ত্রী ও পরিণত-বয়স্ক পুত্রেরা যখন তাঁহার অসুস্থতার সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ প্রদর্শন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অবহেলা করেন, সুলতানকে তখন বাধ্য হইয়া একমাত্র হিতৈষী বন্ধু হিসাবে মালিক কাফুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিতে হইল। নিজের পরিবারবর্গের প্রতি সুলতানের পূর্ব্ব হইতেই বিরক্তি ছিল; এখন এই সুযোগে গুজরাটী মালিক কাফুর সেই বিরক্তিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। মুমূর্ষু সুলতান নিজের বেগমকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পরিণত-বয়স্ক তিন পুত্র,—

খিজির খাঁ, শাদী খাঁ এবং মুবারক খাঁকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। সুতরাং সুলতান দেহত্যাগ করিলে মালিক কাফুর পাঁচ বৎসর বয়স্ক শাহাবুদ্দিন ওমরের নামে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। খিজির খাঁ এবং শাদী খাঁকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মালিক কাফুরের প্রকৃতি অতি ক্রূর এবং ব্যবহার খুব নীচ ছিল। সেই জন্য মুবারকের কোন অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং প্রাসাদের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। মালিক কাফুরের মৃত্যুর পরে মুবারক সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

এই মুবারক শাহের রাজত্ব-কালেই খুসরো খাঁ অতি শীঘ্র উচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। গুজরাট প্রদেশ এই সময়ে নূতন সম্রাটকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল এবং সে জন্য সাম্রাজ্যে তখন এমন লোকের প্রয়োজন ছিল, যে সেই প্রদেশের রাজনৈতিক এবং স্থানীয় পরিস্থিতির বিষয়ে সম্যক্ জানে। প্রথমে আলি উলমুল্ক মুলতানী সেখানকার উৎপাত-দমনে প্রেরিত হইলেন। তার পর গেলেন সুলতানের শ্বশুর জাফর খাঁ। খুসরো খাঁয়ের মাতামহবংশীয় আত্মীয় হিসামুদ্দিন জাফর খাঁয়ের বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করে। ফলে জাফর খাঁকে ফিরাইয়া আনিয়া অপমানিত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অতঃপর হিসামুদ্দিন গুজরাটে প্রেরিত হইলে খুসরো খাঁ দিল্লীতে তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। মালিক কাফুর ও মালিক শাদীর সময়কার সুশিক্ষিত সৈন্যদল তাঁহার অধীনে আসিল এবং তিনি রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই খুসরো খাঁকে মালাবার অভিযানে প্রধান সেনাপতিরূপে প্রেরণ করা হয়। সেখানে যুদ্ধ-জয়ের মধ্যে মালাবারে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনার বাসনা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে, আলাউদ্দিন খিলিজির সময়কার প্রবীণ যোদ্ধারা খুসরো খাঁয়ের অধীনে কাজ করা অপমানজনক মনে করিয়া তাঁহার পতনের উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা কাহিনী রচনা করিয়া সম্রাটের গোচরীভূত করে। মালিক তালে শা, মালিক তৈমুর ও মালিক তুল আফগানের প্রেরিত সংবাদে খুসরো খাঁকে ফিরাইয়া আনা হয়; কিন্তু সম্রাট-সমক্ষে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হওয়ায় ঘটনা বিপরীত আকার ধারণ করে এবং আবেদনকারীরা সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত হয়।

যাহারা খুসরো খাঁয়ের উচ্চ ক্ষমতা-লাভে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন স্পষ্ট বুঝিল যে, সম্রাটের নিকটে তাঁহার প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধে সত্য অথবা মিথ্যা সংবাদ জানাইলে তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতির আশঙ্কা অধিক। কয়েক জন ওমরাহ সুলতানের চরিত্রহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মনে মনে বিদ্রোহ ভাব পোষণ করিত। এখন স্বেচ্ছায় তাহারা খুসরো খাঁয়ের পক্ষ লইল। কারণ, তাহারা আশা করিয়াছিল যে, অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া খুসরো খাঁ এক দিন সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। সুলতান এই সময়ে লাম্পট্যে ও বহু পাপকার্য্যে অবাধে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিত্য-সহচর ছিলেন খুসরো খাঁ। তিনি সুযোগ পাইয়া নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। সুলতান সানন্দে অনুমতি দিলেন।

অতঃপর খুসরো খাঁ সুলতান-সমীপে নিবেদন করিলেন যে, রাজাদেশে তাঁহাকে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাসাদে অবস্থান করিতে হয়, কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের হস্তে তিনি প্রাণের আশঙ্কা করেন; সুতরাং তিনি প্রাসাদে প্রবেশের সময় তাঁহার সৈন্যগণকে প্রাসাদের সিংহ-দরজা পর্য্যন্ত আনিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ, তাহা হইলে ফিরিবার পথে তাহারা তাঁহার শরীর-রক্ষি-রূপে সঙ্গে থাকিতে পারে; এখন ইহা সুলতানের অনুমতি-সাপেক্ষ। সুলতান ইহাতে দোষের কিছু দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

খুসরো খাঁয়ের ষড়যন্ত্র এখন নির্ম্মম ও নির্দ্দয়রূপে প্রকাশ পাইল। সুলতানের এক শিক্ষক কাজি জিয়াউদ্দিন ওরফে কাজি খাঁ 'ভকিল-এ-দ্বার' অর্থাৎ প্রাসাদের দ্বার-রক্ষক ছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীর গোপন পরামর্শের কথা সুলতানকে জানাইলেন। কিন্তু মূর্খ মুবারক প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা না করিয়া খুসরো খাঁয়ের নিকটে কাজি-দত্ত সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিলেন। চক্রান্তকারী খুসরোর চোখে জল দেখা দিল এবং সুলতানের নিকটে সান্ত্বনা পাইয়া সাশ্রু নয়নে তিনি নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার ধারণা, সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তাঁহাকে এক দিন বধ্যভূমিতে প্রাণ হারাইতে হইবে! তাঁহার সৌভাগ্যে ইহাদের হিংসা, অথচ ইহাদিগকে তিনি নিজের প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করেন! প্রিয়পাত্রের প্রতি সুলতানের বিশ্বাস অটুট রহিয়া গেল। কিন্তু খুসরো খাঁ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর কালবিলম্ব করা সমীচীন হইবে না। যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা দ্বিধাহীন দৃঢ়তার সহিত অচিরে সম্পন্ন করা প্রয়োজন, নহিলে নিজের বিপদ।

এই ঘটনার পরের রাত্রে সুলতানের প্রাসাদে এক চূড়ান্ত নৃশংসতার অভিনয় হইল। পারোয়ারিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কাজি খাঁকে হত্যা করিল; তার পর করিল প্রাসাদ-রক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়া সুলতানের বাসগৃহে প্রবেশ। সুলতান পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু খুসরো খাঁ চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া রাখেন, যতক্ষণ না পারোয়ারীরা আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। রাজ-পরিবারের পুরুষদিগকে হত্যা এবং রমণীগণকে পারোয়ারীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সুলতান-বংশের কাহাকেও জীবিত রাখা হয় নাই।

এ-কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না যে, এই কাহিনী হৃদয়-বিদারক হইলেও মধ্য-ভারতের ইতিহাসে নূতন নয়। খুসরো খাঁয়ের অকৃতজ্ঞতা সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজির অকৃতজ্ঞতার চেয়ে অধিকতর হীন ছিল না; তাঁহার নৈতিক চরিত্র সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারকের নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল, এ-কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই! মধ্য-যুগের ভারতে পতিত রাজবংশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং এরূপ পাপে খুসরো খাঁ একাই পাপী নন। খুসরো খাঁয়ের পক্ষে রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করা মোটেই কঠিন হইল না। কারণ,

যে সমস্ত ওমরাহ ইহাতে বাধা দিতে পারিত, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত, অথবা প্রচুর উপহারে চুপ করাইয়া দেওয়া হইল।

চারি মাস স্থায়ী খুসরো খাঁয়ের রাজত্ব-কাল পাপানুষ্ঠানের ইতিহাস। অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি হিন্দু রাজত্বের পুনরুত্থান ও ইসলামের পরিবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বারানী বলেন, ইসলামকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত, গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল এবং মসজিদে কোরাণের উপরে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল; মুসলমানদিগকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল এবং রাজ্যের উচ্চ পদগুলি কেবল হিন্দুরাই পাইত। 'অপবিত্র পারোয়ারী' গুজরাট হইতে বহু পারোয়ারী আনিয়া নিজের চতুষ্পার্শ্বে সন্নিবেশিত এবং কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন ওমরাহদিগকে ধনদৌলত বিতরণ করিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি হিন্দুজাতিকে স্বপক্ষে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে উচ্চ পদাদিও দিয়াছিলেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ পারোয়ারী সুলতানের পাপ-কার্য্যের সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার কার্য্য অগৌরবের কারণ হইলেও তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের কার্য্যের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। তবে তাঁহার একটা দোষ ক্ষমার অযোগ্য! সে-দোষ—তিনি ভারতবাসী ছিলেন! তুর্কীর পদবিত্তশালী ব্যক্তিবর্গকে তিনি বুদ্ধিমত্তায় পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য বিবেকহীন হইতে তিনি তাঁহাদের মত দ্বিধা বোধ করেন না! ষড়যন্ত্রে তাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না; এবং ক্ষমতা-লাভের প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁহাদিগের সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক জন ভারতীয়ের পদানত হইয়া থাকিবার অপমানে তাঁহাদের তুর্কী-রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল এবং এই ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের হস্তে যত প্রকার অস্ত্র ছিল, তাহা প্রয়োগ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, কি করিয়া তাঁহাদের স্বজাতীয়দিগকে উত্তেজিত করা যায়। তাঁহারা তাঁহার হীন জন্মের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। যদিও জানিতেন যে, ইহা আরবের পয়গম্বরের প্রচারিত সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের বিরোধী। তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করেন যে, তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাম-ভাব জাগরিত করিবার জন্য মুসলমান রমণীদের সতীত্ব নাশ করিয়াছেন! দেবল রাণীর অপমানের কাহিনীর কোন ভিত্তি নাই। ইহা তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত। কারণ, আমীর খুসরো বলেন যে, কুতুবুদ্দিনের আদেশে স্বীয় পতি খিজির খাঁয়ের সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। মসজিদ অপবিত্র করা, অথবা সে স্থানে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার কথা আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। হিন্দুধর্ম্মে খুসরো খাঁয়ের পুনরায় দীক্ষিত হইবার কথা নিতান্ত অযৌক্তিক। খুসরো খাঁয়ের ইহা অজ্ঞাত ছিল না যে, হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইলে তাঁহাকে আবার অস্পৃশ্য হইয়া থাকিতে হইবে। বহু চেষ্টা করিয়াও খুসরো খাঁ তাঁহাদিগকে বশে আনিতে পারেন নাই, কারণ, ভারতীয় ও অভারতীয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য আছে, এ পথে তাহা প্রধান অন্তরায়।

কাহিনীর শেষাংশ অতি সংক্ষেপ। দিল্লীর যে সব আমীর ওমরাহ খুসরো খাঁয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে তিনি ফকরুদ্দিন জোনা খাঁয়ের (পরে যিনি সুলতান মুহম্মদ তুগলক নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন) দিক হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। খুসরো খাঁ তাঁহাকে শত্রুপক্ষের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেন! কারণ, তাঁহার পিতা গাজী মালিক ছিলেন এক জন প্রবীণ যোদ্ধা এবং তাঁহার অধীনে ছিল সাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য-দল। মুহম্মদ তুগলক কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনস্থ থাকিবার ছল করেন। তাহার ফলে খুসরো খাঁ ক্রমে অসাবধান হন। এই সুযোগে মুহম্মদ তুগলক তাঁহার পিতার সহিত যোগ দিলেন। প্রায় সকলেই পারোয়ারীর উপর অসন্তুষ্ট, এ কথা জানিতে পারিয়া গাজী মালিক সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আসিলেন এবং ১৩২০ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন খুসরো শাহের অন্ত হইল। খুসরোর পতন কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহের পতনের মত নয়, কারণ, তিনি বীরের মত তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সৈন্যগণকে অগ্রিম ছয় মাসের বেতন দিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে জন-মত এত প্রবল ছিল যে, সেই স্রোতে তাঁহার সৈন্যদল ভাসিয়া গেল এবং তিনি বন্দী ও নিহত হইলেন।

বাইশ বছর

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

বাইশ বছরে যে লতিকাটিরে ধরিয়াছিলাম বুকে,
ঝড়ে উড়ে গেল ঠেকাতে পারিনি তাহা;
তিরিশ বছরে সেই স্মৃতি আজও বারে বারে পড়ে মনে,
তারই দাগ বুকে আজও মিলাল না আহা!

আজও তার পরে এত দিন ধ'রে কত ঝড় এল গেল,
পৃথিবী ঘুরিল সূর্য্যের চারি ধারে;
দিন গেল আর রাত হল শেষে দিনে দিনে মাস গেল,
বরষে বরষ ঘুরে এল বারে বারে।

কত যে লতিকা জড়ায়ে ধরিল ছিঁড়ে গেল তার পরে,
সব কথা আর রাখিতে পারিনে মনে;
বাইশ বছরে তবু যে লতাটি বুকটি জুড়িয়াছিল,
আজও তার স্মৃতি জেগে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

চাচা ভাজতে

শ্রীজনরঞ্জন রায়

চাচা—চাচা···চাচাজী···ও হালদার চাচাজী !

বৃদ্ধ ছুতার হরিচরণ হালদার নিজের তৈয়ারি এক ঝুড়ি খড়ম মাথায় লইয়া হন্-হন্ করিয়া হাটে চলিয়াছে। বর্ষার জন্য হাটে বাহির হইতে দেরী হইয়াছে···আবার পিছন হইতে ডাকে কে?

চার ডাকের পর হরিচরণ দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দেখে, পাঁচু সর্দ্দার মণ দুই ওজনের চালের বস্তা কাঁধে লইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। সে ডাকিতেছিল।

কাছে আসিয়া পাঁচু বলিল—কাল আমার মেয়ের বিয়ে চাচা, ···জিয়াকৎ দিতে আপনার বাড়ী গিয়ে শুনমু আপনি হাটে বেরিয়ে গেছ।

এক-মুখ হাসিয়া হরিচরণ বলিল—সোনার বিয়ে ? কোথায় রে ?

পাঁচু উত্তর দিল—গোঁসাইচরের ওমোর মোড়লের মেজ ছ্যালের সঙ্গে।

শুনিয়া হরিচরণ একটু শিহরিয়া উঠিল।

দেখিয়া পাঁচু বলিল—চাচার কি জ্বর লেগেছে ?···তা লাগতে পারে ! বর্ষণ তো ছাড়ছে না।

তাহার পর আপন-মনেই বলিতে লাগিল—আধ মণ খাসির গোস্ত জোগাড় হবে না চালগুলো বেচে ? আর আছে গোটা দশেক টাকা···তাতে রূপোর পৈঁচে হবে কেমন কোরে ?···আপনি তা জামিন হয়ে কিনে দাও চাচাজী। কাপড় কেনা আর হোলো না···তাতেও কোন্ কুড়ি টাকা না লাগতো !

হাটে পৌঁছিতে যে অল্পটুকু পথ বাকি ছিল, হরিচরণ মৌন হইয়া চলিল। হাটে মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া সে বলিল—দ্যাখ, চাল বেচেই আমার কাছে আসিস্···তা ও ক'টাকার কাপড়ের জন্যেও ঘোষাল মাড়োয়ারীর দোকানে আমি জামিন হবো···সোনা দিদির বিয়ে।

স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে পাঁচুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আল্লা পাক্ !

সুখ-দুঃখের কোনো উত্তেজনা হইলেই পাঁচুর মুখ দিয়া এ-কথা বাহির হয়।

রাত্রে ঘরে ফিরিয়াই হরিচরণ গ্রামের সব হিন্দুর কাছে খবর পাঠাইল। দশ ঘর মালো, আট ঘর ছুতার, কামারদের পাঁচ ঘর, নাপিত এক ঘর···মায় বাউলদের আখড়াতেও লোক গেল। রাত্রেই পরামর্শ করিতে হইবে। সবই বদলাইয়া গিয়াছে··· আরও যে কি হয়, কে জানে ? গ্রামের এই উনিশ ঘর মুসলমান ভাইদের সঙ্গে কতই-না সদ্ভাব ছিল ! কিন্তু এ সব হইল কি ? হালদারদের পাওনা টাকা তারা সবাই ডুবাইয়া দিতে বসিয়াছে। কেবল সর্দ্দাররা এখনো ঠিক আছে। তার মূলে পাঁচু। আর গ্রামে যে এত দিন পাকিস্থানের বক্তৃতা দিতে কেহ আসিতে সাহস করে নাই, তার মূলেও পাঁচু। পাঁচু করিত ধর্ম্ম-ভয়···আর লোকে করিত পাঁচুর লাঠির ভয়। সেই পাঁচু এবার চালে পড়িল ! সেই গোঁসাইচরের মোল্লাদেরই চালে পড়িল···তাদের বাড়ীতেই মেয়ের বিবাহ দিতে চলিয়াছে ! তারা সব গ্রামে গিয়াছে···শুধু এই গ্রামে আসে নাই পাঁচুর ভয়ে। কিন্তু এখন তাদের রুখিবে কে ?

হালদারদের কাঠের কারখানায় রাত্রি তিন প্রহর পর্য্যন্ত গ্রামের হিন্দুরা দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাইতেছে। বৃদ্ধের দল হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। যুবকদল হরিচরণের সঙ্গে নিবিষ্ট হইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। কেবল বাউলরা তুরিতানন্দে উচ্চরবে বীর অবধূতের জয় দিয়া কলিকার পর কলিকা চাপনা করিতেছে।

পরের দিন। বেলা প্রায় বারোটা। দূরে শুনা যাইতেছে আল্লা'ল্লা ধ্বনি। হরিচরণের কাঠের কারখানায় সকলেরই হাত যেন বন্ধ হইয়া গেল। হরিচরণ বলিল—কি···তোমাদের সব হলো কি ? আমি এই বাহাত্তর বছরের বুড়ো···আমার তো বুক একটুও টলছে না ! হরিচরণ গরুর গাড়ীর চাকা গড়িতেছিল। সত্যই সমান তালে তার হাতুড়ির শব্দ শুনা যাইতেছে—ঠকাঠক্।

দেখা গেল, হরিচরণের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাঁচু তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। বলিতে বলিতে যাইতেছে—চাচাজী, আপনার তরে খাজা-মুড়কি আর কাঁচা দুধ দিয়ে গেনু···আমাদের বাড়ীর জিয়াকতে আর কি দিমু ?

হরিচরণ বাটালি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—তবে তাই ঠিক পাঁচু ?

পাঁচু শুধু বলিল—আইল্লা পাক্ !

হরিচরণ মুখ তুলিয়া চাহিল। চাচা-ভাজতের মধ্যে কি কথা হইল, অন্যে কিছু বুঝিতে পারিল না। হরিচরণ যেন অপত্যস্নেহে বিগলিত হইয়া পাঁচুর দিকে চাহিয়া আছে। চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ণ যুবক···নিটোল দেহ···শান্ত স্বভাব।···তার বগলে সাড়ে তিন হাত লম্বা পাকা বাঁশের লাঠিটা সর্ব্বদাই আছে। হরিচরণদের কাঠের কারখানায় সে এক জন ভালো গড়নদার···গরুর গাড়ীর এক জোড়া চাকা সে দু'দিনে তৈয়ারী করিতে পারে !

নিকটে শুনা গেল, বৃহৎ জনতার আল্লা'ল্লা রব। এইবার গোঁসাইচর হইতে পাঁচুর বাড়ীতে বরযাত্রীর দল আসিয়া পৌঁছিল।

পাঁচুর মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভূরিভোজনের পর মজলিশ বসিয়াছে। সে-মজলিশে খানিকটা মুরুব্বিয়ানা ভাবে গোঁসাইচরের মৌলভি ছাহেব বলিল—এই মহরমের দিন এখানে আবার মজলিস কোরবেন, আপনারা প্রতিজ্ঞা নিলেন তো ?

সুদৃঢ় কণ্ঠে পাঁচু জবাব দিল—না, না। বারে-বারে বলছি, ছ'মাস না গেলে আবার মজলিস হবে না। তার একটা প্রধান কারণ, আপনাদের খাতির করার সাধ্য নেই আমার ছ'মাস না গেলে।··· মজলিস হবে চৈত্র মাসের শেষে ফাতেহাইয়াজে···আমি আপনাদের ডেকে নিয়ে আসবো।

মৌলভি বলিল—এতটা গোস্তাকি !···আমার কথায় জবাব ?

মৌলভির ইঙ্গিতে বরযাত্রীর দল তড়িৎবেগে উঠিয়া পড়িল। পাত্র তার টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। মেয়েকে লইয়া ডুলিতে চড়ানো হইল। একটা সেলাম পর্য্যন্ত বিনিময় হইল না।

যাইতে যাইতে ভঙ্গী করিয়া মৌলভি বলিল—তবে ছ'মাস পরে ফতেহাইয়াজের সময় মেয়েকে আনতে যাবেন···হিঃ হিঃ হিঃ !

পাঁচুর অন্দর হইতে চাপা গলায় স্ত্রী-কণ্ঠের কান্নার সুর ভাসিয়া আসিল—বিয়ের মেয়ে ছ'মাস কেমন কোরে থাকবে গো !

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পাঁচু বলিল—আইল্লা পাক্ ! বলিয়া সে কাত্তিকের ভিজা মাটিতে এত জোরে তার হাতের লাঠি ঠুকিল যে, সেটা আধ হাত বসিয়া গেল !

ইহার পর সাত দিনও যায় নাই। হালদারদের বাড়ীর দক্ষিণে পতিত ডাঙ্গাটা সাফ করা হইয়াছে। ভূতের ডাঙ্গা বলিয়া কত কাল হইতে ইহা পড়িয়া আছে, কে জানে ? শেয়ালকাঁটা, ভ্যাওড়া, বিছুটি,

আরো কত সব অখ্যাত গাছের ঘন জঙ্গলে ভরা এ জায়গাটায় দেশের বুনো শুয়াররা আড্ডা জমাইয়াছিল। প্রথম যেদিন আখড়া খোলা হইল, সে দিন পাঁচু বলিল—হরিচরণকে ঠিক বলেছো আপনি চাচাজী, আমি একলা···তাই সহ্য কোরতেই হবে ছ'মাস। ছ'মাস পরে এরা দাঁড়াবে আমার পাশে।···তখন এ-গ্রামে মাথা নাড়া দিতে আসে এমন মর্দ্দানাকে খোদা পয়দা করেনি!···ভাই সব, ছ'মাস পরে তোমাদের লাঠির জোর এমন হবে যে আমায় তোমরা রুখবে। আপসোষ, আমার জাত্-ভাইদের তিন-চার জন ছাড়া কেউ তোমাদের দলে এলো না! না আসুক। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক তোমাদের তারিফ কোরতে আসবার পথ পাবে না এক দিন।···কবে, জানো? যেদিন ছ'মাস পরে গোঁসাইচরের মোড়লরা এসে তোমাদের সেলাম দেবে, সেই দিন।

হরিচরণ বলিল—সে তোমার হাত-যশ।

পাঁচু বলিল—আপনি তো সবই জানো···বাইশ বছর বয়সে আমায় হরিরামপুর রাজবাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায় আপনাদেরই কারখানা থেকে। সেখানেও আমরা পঞ্চাশ জনের বেশি ছিলাম না। আজ তো এখানেও প্রায় পঞ্চাশ জন আছি। পশ্চিমা পালোয়ান আমাদের সেখানে কসরৎ শেখাতো। ছ'মাস না যেতেই আমাদের দাঙ্গা কোরতে লাগিয়ে দিলে। দশ মাইল বিশ মাইল দূরে চর-দখল···বিল-দখল···পরের জিনিষ দখল আর মারপিট্! যেন আমরা ভাড়াটে গুণ্ডা!···কাজে ঘেন্না হলো!···সেই যে লেঠেলি ছেড়েছি, আজও আর সে কাজে যাইনি।···তবু মনে হয়, বিশ বছর আগে যা শিখেছি, ভুলে যাইনি সব···তোমাদের কিছু শেখাতে পারবো।

ফতেহাইয়াজ্দাহম্ আসিল। সেদিন সকালেই তার বাড়ীতে মজলিশের জেয়াফৎ দিতে পাঁচু গোঁসাইচরে গেল।

পাঁচুর সঙ্গে আসিতেছে তার মেয়ে-জামাই, বেয়াইয়ের ছেলেরা, গোঁসাইচরের মুসলমান সমাজের কয়েক জন লোক। মৌলভি-ছায়েব যেন বিজয়গর্ব্বে আগে আগে চলিয়াছেন লাঠি হাতে যুবক দলকে লইয়া···নিশান উড়াইয়া···কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে। মাঝে মাঝে আল্লা'ল্লা ধ্বনি হইতেছে।

গ্রামের ভিতর খানিকটা ঢুকিয়া মৌলভি-ছায়েব রূঢ় স্বরে বলিল—কৈ, আমাদের খাতির-পছান করবার কোনো বন্দোবস্তই তো নেই! বাটীরচক্ গ্রামের লোকগুলো সবই কি বেতমিজ?

একটা চিক্কুর শুনা গেল···সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরিয়া ফেলিল একটা লাঠিয়ালের দল।···বিশ-বাইশ হাত দূর হইতে একটি ছোকরা লাঠিতে ভর দিয়া লাফাইয়া আসিয়া পড়িল সম্মুখে। পাঁচুকে সেলাম দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—ওস্তাদ হুকুম?

সেলাম দিয়া পাঁচু কি যেন ইঙ্গিত করিল। ছোকরাটি আবার লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইয়া তার দলের মধ্যে গিয়া পড়িল।

মৌলভি জিজ্ঞাসা করিল—এরা?

পাঁচু বলিল—গত ছ'মাস থেকে আমার সাকরেদ্। দু'-তিন জন ছাড়া সবাই হিন্দু—এই গ্রামের ছেলে।

ভ্রূকুটি করিয়া মৌলভি বলিল—মতলব কি এদের?

পাঁচু জবাব দিল—আপনাদের খাতির-পছান কোরতে এসেছে। এরা সব গ্রামের মান রাখতে জোট বেঁধেছে—আর যেন কেউ এই গ্রামের বিয়ের মেয়েকে ছ'মাস আটকে রাখতে না পারে—এরা তা দেখবে। গ্রামের মধ্যে কোনো কলি কজিয়া আসতে দেবে না এরা, তার জন্য জান কবুল করেছে।

পিছন হইতে হরিচরণ আসিয়া বলিল—কৈ পাঁচু, জামাই কৈ? সোনা দিদি কৈ? নিয়ে এসো সবাইকে ঘরে।

পাঁচুর বেয়াইয়ের বড় ছেলে দবীরুদ্দীন কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। তার ভাইয়ের বিবাহের সময় সে দেশে আসে নাই। ভাইয়ের শ্বশুর-বাড়ীতে সে এই প্রথম আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে?

পাঁচু বলিল—ইনি চাচাজী···হরিচরণ হালদার···গ্রামের প্রধান মুরুব্বী।

দবীরুদ্দীন বলিল—ছেলাম হালদার মশাই···ছেলাম আপনাকে ছাহেব।···হিম্মৎ না থাকলে মিল হয় না! জান্ কবুল না কোরলে মান থাকে না! আপনাদের মতো লোক যেখানে আছে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানে মিল হবেই হবে···তবে ঐ দু'টো কথা মনে রাখতে হবে। আর ভাই সব···দেশের খবরদারী কোরতে যারা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদেরও ছেলাম দিচ্ছি।···আপনাদের মতো সবাই যদি কোমর বাঁধতে পারে, তবে শুধু এই ছোট জায়গাটাতেই নয়···সারা হিন্দুস্থানের রাস টেনে ধরতে পারি আমরা।···আবার সবাইকে আমি ছেলাম জানাচ্ছি।

আনন্দের আতিশয্যে পাঁচু জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল—আইল্লা পাক্!

কেন সুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ

তুমি প্রিয়া মোরে সুন্দর কহ,
সুন্দর আমি কেন তা' কহি—
জানো তো পবন সুরভিত নিতি
কুসুম-সুরভি বক্ষে বহি'।
বিকচ কুসুম তুমি সখি মোর,
পরশ-আতুর পুলক বিভোর
দিবস-রজনী বেয়াকুল হিয়া
ও তনু-বিলাসে মত্ত রহি'

সুন্দর আমি!—কেন সুন্দর
তোমারে সজনি কহি তা আজি—
জানো তো ভৃঙ্গ হয় মনোহর
কমল-বুকের পরাগে সাজি।
সেই মত তব প্রেমের পরাগে
সারা দেহে মোর মধুরতা জাগে,
ওঠে বিকশিয়া অজানা হরষে
নিতি নব নব সুষমারাজি।
কেন সুন্দর কহি তা আজি।

পিকিঙ মানুষের খাবার

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা মানুষ, কাজেই কয়েক লক্ষ বছর আগে এই মানুষ-জাতটা কি রকম ছিল, সে কি খেতো, কেমন ভাবে চালাতো তার জীবনযাত্রা, তার সমাজ ছিল কি রকম, এ সব জানতে আমাদের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এক-টুকরো পোড়া সিগারেট, আঙুলের ছাপ, পায়ের দাগ,—ঘটনা-স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে গোয়েন্দা পুলিশ যেমন খুনী আসামীর নাড়ী নক্ষত্র জানতে পারে, অনেকটা সেই ভাবে শিলীভূত (ফসিলাইজড্) মাথার খুলি, কয়েক টুকরো হাড়, পায়ের দাগ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা করতে পারেন প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তু, গাছ-পালা, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। আজ পর্য্যন্ত সব চেয়ে আদিম মানুষের তিনটি মাত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রাণিবিদ্‌রা জানতে পেরেছেন। প্রথম গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব ধরা পড়ে জাভায়; অপর দু'টি গোষ্ঠীর মানুষের অস্থি-দেহাবশেষ যথাক্রমে উত্তর-চীনে পিকিঙের কাছাকাছি জায়গায় আর ইংলণ্ডের পিল্টডাউনে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

জাভা-গোষ্ঠীর মানুষ পাঁচ লক্ষ বছর, পিকিঙ-গোষ্ঠীর মানুষ দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর আর পিল্টডাউন-গোষ্ঠীর মানুষ দু'লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে জন্মেছিল—বিদায় নিয়েছে তার কয়েক হাজার বছর পরেই। আরও পুরাতন গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব প্রাণিবিদের পক্ষে আবিষ্কার করা মোটেই বিচিত্র নয়, কাজেই মানুষের আবির্ভাব কত দিন আগে, তা ঠিক করে বলা শক্ত।

শিলীভূত দেহাবশেষ থেকে প্রাচীন মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা হলেও সে কি খেতো বা কি ভাবে জীবন যাপন করতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অনুমান করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই! অবশ্য জানা যেতো যদি আমাদের লক্ষ বছর আগেকার পূর্ব্বপুরুষরা তাদের মাসকাবারী খরচের ফর্দ্দ বা মুদির হিসেব গুহার গায়ে খুদে যেতেন। তবে আধুনিক কালের বড় জাতের গরিলাদের খাদ্য বৃত্তির তুলনায় অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আদিম মানুষরা জান্তব এবং উদ্ভিদ্ দু'রকম খাবারই খেতো। এ রকম সর্ব্বভোজী খাদ্যের (omnivorous diet) প্রমাণ তাদের শিলীভূত দাঁত থেকেও পাওয়া যায়। কারণ, দাঁতগুলির গড়ন দেখে মনে হয়, সেগুলি জান্তব ও উদ্ভিদ বহু প্রকার খাদ্য চিবিয়ে খাবার মত করেই তৈরী।

অনুমানের কথা গেল। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্তও আদিম মানুষের আহার্য্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জাভা-মানুষ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাভায় আবিষ্কৃত হয়েছে; আবিষ্কারের সময় পাওয়া গিয়েছিল মাথার খুলির একটি অংশ আর মেরুদণ্ডের কয়েকটি টুকরো। এ ছাড়া এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা থেকে তার খাদ্যবৃত্তি (feeding-habit) বুঝা যায়! পিল্টডাউন মানুষের দেহাবশেষও ছিল অসম্পূর্ণ; দাঁত ছাড়া খাদ্য ও খাদ্য বৃত্তি অনুমানের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

চীনের তৎকাল জিওলজিক্যাল সার্ভের সদস্যেরা মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ ডেভিডসন ব্ল্যাকের তত্ত্বাবধানে পিকিঙের কাছাকাছি জায়গায় মাটীর বুক থেকে খুঁড়ে বার করেছেন আদিম মানুষের মাথার কয়েকটি খুলি আর অসংখ্য দাঁত। এই নূতন-জানা গোষ্ঠীর মানুষদের বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন "পিকিঙ মানুষ"। পিকিঙ মানুষই এসিয়ার সব চেয়ে আদিম অধিবাসী। দেহাবশেষের সঙ্গে পাথরের হাতিয়ার (implements), চুলী, অভুক্ত খাদ্যের অংশও গুহাবাসী পিকিঙ মানুষের বাসস্থানে পাওয়া গেছে। এইখানেই সর্ব্বপ্রথম মিলেছে আদিম মানুষের ভোজ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কয়েক কোটি বছর আগে কোন এক অখ্যাত অগভীর সমুদ্রের নীচে ধীরে ধীরে জমেছিল চুণা-পাথরের স্তর। পৃথিবীর পিঠে যখন পরিবর্ত্তন ঘটলো, সেখানে তখন মাথা তুললো এক-সার পাহাড়; পাহাড়ের মাথায় চড়ে চুণা-পাথরের স্তরটি উঠলো আকাশ-পানে, বেরিয়ে এলো খোলা হাওয়ায়। পিকিঙের কাছাকাছি আধুনিক পশ্চিম পর্ব্বতমালা হলো এই নবজাত পাহাড়ের সার। কালে-কালে পাহাড়ের মাথায় চড়া চুণে-পাথরের স্তরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, হয়েছে প্রচুর ধারা-বর্ষণ। মাটীর তলায় জলের দ্রাবক (ডিসলভিং) শক্তি ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাথর ক্ষইয়ে তৈরী করেছে বড় বড় গুহা। বিভিন্ন সময়ে গুহাগুলিতে বসবাস করতো,—আশ্রয় নিত মহাচীনের আদিম মানুষের দল, হায়েনা প্রভৃতি গুহাবাসী জন্তুরা। এই ভাবে কয়েক যুগ কাটবার পর পশ্চিম পর্ব্বতমালার গুহাগুলিতে ভাঙ্গন ধরলো—গুহার ছাত থেকে, দেওয়ালের গা থেকে পাথরের চাই খসে পড়ে আংশিক ভাবে গুহাগুলিকে বুজিয়ে দিলে। মাটীর অনুস্রাবী (পারকোলেটিং) জলে থেকে চুণজ পদার্থ (calcaresus) থিতিয়ে জমিয়ে দিলে, জুড়ে দিলে পাথরের চাইগুলিকে। জমাট-বাঁধা পাথরের নীচে লোক-লোচনের অন্তরালে পড়ে রইল গুহাবাসীদের দেহাবশেষ; আর এই ভাবে জমাট-বাঁধা চুণজ পাথরের স্তরকে নূতন কালের বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়েছে ব্রেকিয়া (Breccia)!

তার পর এগিয়ে চললো কাল, এগিয়ে চললো বিচিত্র প্রকাশ-ধারায় নিরবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ। ব্রেকিয়ার স্তূপ পাহাড়ের গুহায় রইলো অখ্যাত অজ্ঞাত। ক্রমে আমরা জন্ম নিলাম—চলতি যুগের মানুষরা। পথ-ঘাট বাড়ী ঘর তৈয়ারী করতে চুণের দরকার পড়তে চীনা শ্রমিকের দল এলো পশ্চিম পর্ব্বতে চুণে-পাথরের স্তর খুঁড়তে। চুণে-পাথর খোঁড়বার সময় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-পড়া ব্রেকিয়ার স্তূপ তাদের নজরে এলো বটে, কিন্তু খাদ-মেশানো বলে শ্রমিকেরা ব্রেকিয়া স্পর্শ করলো না। ব্রেকিয়ার টুকরোগুলি যেমন ছিল, তেমনিই পড়ে রইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সুইডিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আণ্ডারসন (J. G. Anderson) ব্রেকিয়ার টুকরোগুলিকে পরখ করে তার মধ্য থেকে গণ্ডার, বাইসন ও অন্যান্য এমন প্রাণীর শিলীভূত অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কার করলেন, যারা বহু কাল আগেই উত্তর-চীনের বুক থেকে লোপ পেয়েছে, যাদের ছায়া মাত্র আজকাল উত্তর-চীনে দেখতে পাওয়া যায় না! বিজ্ঞানীর দল তথ্যের সন্ধানে জড় হলেন, সুরু হলো হাড়-বহা (born-bearing) ব্রেকিয়া স্তূপের খোঁড়াখুঁড়ি। তার ফলে জানা গেল এসিয়ার আদিম মানুষের জীবনের এক অজানা অধ্যায়।

পিকিঙের প্রায় ত্রিশ মাইল পশ্চিমে পশ্চিম-পর্ব্বতমালার পার্ব্বত্য সহর চোকোতিয়েনে (Choukoutein) পিকিঙ মানুষের কবর প্রথম দেখা যায়। চোকোতিয়েন কয়লা ও চুণে-পাথর সরবরাহের প্রধান স্থানীয় কেন্দ্র। এই দু'টি গুরুভার মাল বহনের জন্য কয়েক বছর আগে এখানে রেল-পথ খোলা হয়েছিল; পরে জাপানী লড়াই সুরু হলে রেল-পথটি তুলে নিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। রেলের বদলে এখন এশিয়ার দু' কুঁজওলা দুয়ে-পড়া

... দল ক্লান্ত চরণে মন্থর গতিতে হেলে-দুলে মাল বয়। চোকোতিয়েনের উপরের পাহাড়ে যে গুহাতে সব চেয়ে বেশী জীবাশ্ম (ফসিল) পাওয়া গিয়েছিল, তার পাশে মহাচীনের ন্যাশন্যাল জিওলজিক্যাল সার্ভে তাঁদের পরখশালা তৈরী করেছেন। পরখশালাটিতে গবেষক কর্ম্মিবৃন্দের বসবাসেরও বন্দোবস্ত আছে।

প্রাণিবিদ্‌দিগের ধারণা, অতীতে একাধিক প্রবেশ-পথ দিয়ে মানুষ ও জন্তুরা গুহাটির মধ্যে যাতায়াত করতো; তার পর এই প্রবেশ-পথগুলির একটি পথ ছাড়া বাকী পথগুলি হয় ধ্বংস হয়েছে না হয় বুজে গেছে! তাঁদের মতে ভবিষ্যতে খোঁড়াখুড়ির ফলে লুপ্ত পথগুলির পুনরাবিষ্কারে নূতন তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে। বর্ত্তমানে চুণে-পাথরের স্বাভাবিক খাড়ি-পথ দিয়ে গুহার মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাত নীচে নামলে গুহার আসল মেঝেতে এশিয়ার আদিম মানুষের বাসস্থানে পৌঁছুনো যায়। এখানে ব্রেকিয়ার স্তূপের বহু ফুট নীচে থেকে খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে অনেকগুলি আদিম মানুষের মাথার খুলি। খুলির গড়ন দেখে বোঝা যায়, এ গোষ্ঠীর মানুষ একেবারেই নির্ব্বোধ ছিল না! তখনকার দিনের অন্যান্য জন্তুদের চেয়েও তাদের অনেক বেশী মানসিক উন্নতি ঘটেছিল। আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এই গোষ্ঠীর মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে 'পিকিঙ মানুষ' (Peking man, Sinanthropus pekingensus)। মাথার খুলির সঙ্গে কতকগুলি হাতিয়ার, ছুরির ফলার মত ফলাও পাওয়া গেছে। স্ফটিক পাথরকে ঘষে মেজে কেটে কুঁদে ফলাগুলিকে পিকিঙ মানুষ তৈয়ারী করেছিল। এগুলিতে লেগে আছে তার অপটু হাতের ছাপ। ফলা থেকেই তার কর্ম্মপটুতার (technical skill) প্রমাণ পাওয়া যায়। পিকিঙ মানুষ আগুন জ্বালতেও পারতো; কারণ, তার গুহার দেওয়ালের কাছে কয়েক হাত উঁচু জড়ো করা ছাই পাওয়া গেছে। এটা পিকিঙ মানুষের গৃহিণীর অলসতার চিহ্ন কি না, কে জানে!

ছাইয়ের স্তূপের মধ্যেও কতগুলি দরকারী সামগ্রীর আবিষ্কার হয়েছে। স্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে আধপোড়া কাঠের কতকগুলি টুকরো আর প্রচুর ঝলসানো হাড়। আধপোড়া কাঠের টুকরোগুলিকে পরখ করে দেখা গেছে, তাদের সঙ্গে ঠাণ্ডা ও শুকনো আবহাওয়া-দেশের, উত্তর চীনের আধুনিক গাছপালার কাঠের কোনও তফাৎ নেই। পশ্চিম পর্ব্বতমালায় ও তার কাছাকাছি সমতল ভূমিতে ঘোড়া, বাইসন, গণ্ডার ও অন্যান্য যে সব জন্তু চরে বেড়াতো,—এখন যাদের কোন চিহ্ন বা জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে উত্তর-চীনে দেখতে পাওয়া যায় না, সেই সব জন্তুর বাছাই-করা দেহ-খণ্ডের রান্না-করা অবশেষ হলো এই সমস্ত ঝলসানো হাড়।

পিকিঙ মানুষ যে সব জন্তু খেতো তাদের অস্তিত্ব দেখে মনে হয়, তখনকার দিনে দেশটির অধিকাংশই ছিল সমতল ভূমি, আর এখনকার দিনে আধ-শুকনো (Semi arid) আবহাওয়া-দেশে যে সব গাছপালা জন্মায়, সেইগুলিই এখানে নদীর ধারে ধারে জন্মাত। পিকিঙ মানুষ থাকতো গুহায়, আগুন জ্বেলে তাত পোয়াত কিম্বা রান্না করত। যদি আমরা ধরে নিই, তখনকার দিনে উত্তর-চীনের আবহাওয়া কতকটা শুকনো থাকলেও তার উষ্ণতা ছিল ভয়ানক কম, ঠাণ্ডা ছিল অত্যন্ত বেশী, তাহলে তার গুহায় বাস করা আর আগুন জ্বালার কারণ বোঝা যায়। ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে চলেছে হিম-যুগ (Ice-age); তাদের মাটী তখন বরফের পুরু স্তরে আবৃত। উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ার জলহাওয়া অনেকটা শুকনো ছিল বলে সে বেঁচে গিয়েছিল হিম সরিতের (Glacier) হাত থেকে।

গুহার মেঝের প্রায় তেরো হাত উঁচুতে অনেকগুলি স্ফটিকের হাতিয়ার হাড়ের টুকরোর সঙ্গে ব্রেকিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে বাদামের অসংখ্য ভাঙ্গা খোলার কয়েক ইঞ্চি পুরু স্তর। খোলাগুলির দু'পিঠের দাগ পরখ করে দেখা গেছে তারা চেরী ফলের সমগোত্রীয় এক-জাত বাদামের খোলা। এ জাতের বাদামের গাছকে আমাদের দেশে ভাল কথায় চিকন (Chicon Roxlg), চলতি কথায় চেকন গাছ বলে; ইংলণ্ডে একে বলা হয় সুগার বেরী বা মধু-জাম। আমেরিকায় এর নাম হ্যাকবেরী (Hackberry celtis)। চিকন গাছ জাম গাছের মত মাঝামাঝি-রকমের উঁচু। এর পাতার চেহারা অনেকটা পাটের পাতার মত এক পিঠ খসখসে, ধারগুলো খাঁজ-কাটা। ফুলের রঙ সবুজ, তারা ফোটে থোকায় থোকায়: আকারে খুব ছোট, বছরের প্রায় সব সময়েই ফোটে। চিকন বাদাম দেখতে মটরশুঁটির মত গোল হলেও আকারে তার চেয়ে অনেক ছোট। চিকন গাছ উত্তর-আমেরিকায় ও এশিয়ার জঙ্গলে জন্মায়। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাংলায় এবং নেপালেও দেখা যায়। এর প্রাচুর্য্য ঘটে আধ-শুকনো আবহাওয়ার দেশে, সমতল ভূমিতে নদীর ধারে ধারে। গুহার মধ্যে প্রচুর চিকন বাদাম এলো কি করে, ভাঙলো কি করে, তা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। জলের স্রোতে এরা গুহার মধ্যে আসেনি! কারণ, গুহার কাছাকাছি কোন নদী বা তার চিহ্নও নেই! চারি দিক-বন্ধ গুহার মধ্যে হাওয়ায় উড়ে আসাও অসম্ভব। গুহার মধ্যে রৌদ্রের অভাবে গাছগুলি জন্মাতে পারে না। কাজেই নির্ভরযোগ্য অনুমান হ'ল—বাদামগুলি গুহার বাইরে থেকে আদিম মানুষ বা অন্য কোন জন্তু প্রচুর পরিমাণে বয়ে এনেছে আর খাবার সময় ভেঙ্গে ফেলেছে খোলাগুলিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাদামগুলির বাহক কে? মানুষ? না জন্তু?

খোবানীর মত চিকন বাদামের গোলা ঢাকা থাকে নরম শাঁসে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে পাখী ও ইঁদুরের প্রিয় ভোজ হলো এই বাদাম। সেখানে মাংস কিম্বা রুটিকে সুগন্ধি করবার জন্যও চিকন বাদাম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বাদামকে খুব ভাল করে পিষে তার রসটুকু ছেঁকে নিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় রান্না করা খাবারের সঙ্গে—খোলা দেওয়া হয় ফেলে। অনেকে বাদাম-শুদ্ধ খোলাটি ফেলে শাঁস খায়, অনেকে চিবিয়ে খায় শাঁস-শুদ্ধ-বাদাম ফেলে শুধু খোলাটি। পিকিঙ মানুষ যদি রান্না করা খাবারকে সুগন্ধি করবার জন্য চিকন বাদাম ব্যবহার করে থাকে, তাহলে তার গুহার মধ্যে বাদামের খোলার অস্তিত্বের রহস্য যায় পরিষ্কার হয়ে। কিন্তু চোকোতিয়েনের গুহার মধ্যে ইঁদুরের শিলীভূত কঙ্কালও পাওয়া গেছে, তাই বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জাগলো যে, ইঁদুর মহাপ্রভুরাই গুহার মধ্যে জড়ো করেছে চিকন বাদাম। এ কাজ পিকিঙ মানুষের নয়। ইঁদুরবিদ্‌দের ডাক পড়লো। তাঁরা বল্লেন, তাঁদের ধারণা, ইঁদুররা বাদাম খাবার জন্য খোলার এক দিকেই কুরে কুরে একটু গর্ত্ত করবে, সমস্ত খোলাটা টুকরো-টুকরো করবে না। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরখশালায় খাঁচায়

বন্দী-করা নানা জাতের ইঁদুরদের খেতে দেওয়া হলো রোদে শুকনো-করা চিকন বাদাম। ইঁদুররা বাদাম ছুঁলো না—হয় তাদের ক্ষিদে ছিল না, নয় অচেনা জিনিষ বলে ভয়ে খেলো না। এর পর ডাক পড়লো খাঁচায় পোরা বাঁদরদের। তারা এই শুকনো বাদাম শাঁস-শুদ্ধ খোসা-শুদ্ধ কড়মড় করে চিবিয়ে গিলে ফেললো মহানন্দে। বাঁদরদের বাদাম খাইয়ে বিজ্ঞানীদের কোন লাভ হলো না; কারণ, হিম যুগে উত্তর-চীনে বাঁদরের অস্তিত্বও ছিল না। কাজেই চিকন বাদামের খোসাগুলি পিকিঙ মানুষের প্রাত্যহিক ভোজের পরিত্যক্ত অংশ, এ কথা ধরে নিলে নিতান্ত অসঙ্গত হবে না! উপরন্তু হিম-যুগে উত্তর-চীনে ফল ও বাদাম দুর্লভ হয়ে পড়ায় পিকিঙ মানুষ তার বাসস্থানের কাছাকাছি ঝোপঝাড় থেকে সংগ্রহ করে আনতো। বেটে রান্না করতো এই সব বাদাম, এও ধরে নেওয়া চলতে পারে।

তার মাথার খুলির মাপ থেকে জানা যায়, পিকিঙ মানুষ কথা বলতেও পারতো, অজ্ঞাত ভাষায় মুখরিত হয়ে কাটতো তার নানা রঙের দিনগুলি! বর্তমানে সে-ভাষা মিলিয়ে গেছে লক্ষ বছরের কাল-স্রোতে। আদিম মানুষ তার খাদ্যবৃত্তির কথা নিজে লিখে যাবার আগেই মহা-কাল গিরিগুহার শিলাস্তূপে রেখেছেন তার চিহ্ন, কিছুই যায়নি হারিয়ে।*

* 'সায়ান্টিফিক্ আমেরিকানে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের রাজপথ ও রেলপথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষি, শিল্প ও বৃত্তি-ব্যবসায়ের সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, প্রত্যেক প্রদেশাভ্যন্তরে এবং প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে দীর্ঘ ঋজু রাজপথ ও সুবিস্তৃত রেলপথ। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত পণ্য ও পরিচর্য্যার আদান-প্রদান সুকর ও সহজসাধ্য হয় না। খাদ্যশস্য ও বণিজ পণ্যের উৎপাদন সর্ব্বত্র সমান নয়। সুতরাং যেখানে যে জিনিষ অধিক উৎপন্ন হয়, সে স্থান হইতে সেই দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া যেখানে তাহার অপ্রাচুর্য্য ঘটে, সেই সব জায়গার অভাব-অনটন দূর করিতে হয়। শান্তির সময় জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ও মাল-চলাচলের যেমন অবশ্য প্রয়োজন, যুদ্ধকালে সামরিক সুযোগ সুবিধাকল্পে পথ-ঘাট, সেতু ও রেলপথের প্রয়োজন তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সমর বিভাগের লোক। বড়লাটরূপে ভারতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভারতের জঙ্গীলাটরূপে সংরক্ষণ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাত এবং বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞতার ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তারূপে ভারতে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাদের দেশে পথ-ঘাটের স্বল্পতার প্রতি তীব্র লক্ষ্য করিয়া যাতায়াত ও মাল-চলাচলের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির আশু প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক প্রগতি, এই উভয়ের নিমিত্ত যানবাহনের সুযোগ-সুবিধার সমান প্রয়োজন। এই নিমিত্ত বড়লাটরূপে তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য অভিভাষণে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তুলনায় তাঁহার সংগঠন-সমুন্নয়ন পরিকল্পনায় যান-বাহনের সুযোগ-সুবিধাকে তিনি প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়াছেন।

লর্ড ওয়াভেলের যুদ্ধোত্তর-পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের প্রয়োজন ৪,০০,০০০ মাইল পথ; এবং ইহার অর্দ্ধেক হইবে সর্ব্বঋতুসহ; নতুবা ভারতের অন্যূন ৭,০০,০০০ গ্রামকে সুপরিকল্পনা-সম্মত সর্ব্ববিধ যান-পরিচালনোপযোগী রাজবর্ত্মের সহিত যাত্রী ও মাল-চলাচলের সংযোগসূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। এই পথ-ঘাট ও সেতু সংস্থাপন করিতে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারতে পাকা পথের মোট পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ মাইল। কিছু দিন পূর্ব্বে নয়া দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগের নায়কদের (Chief Engineers) এক বৈঠক বসিয়াছিল; ভারতের বর্ত্তমান রাজপথের পরিমাণ পাঁচ গুণ বাড়াইবার জন্য তাঁহারা একটি বর্ত্মমণ্ডলী (Road Board) স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, জাতীয় কতকগুলি বড় বড় সরকারী পথকে (National highways) কাঠামো (Frame work) করিয়া তাহার সহিত প্রাদেশিক রাজপথ ও বিভিন্ন জেলা এবং গ্রামের সরকারী পথগুলিকে যথাক্রমে সংযুক্ত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত ও মাল-চলাচল যাহাতে হয়, তাহার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি বর্ত্ম-আইনের (Highway Act) পক্ষপাতী। বর্ত্ম-মণ্ডলীকেও তাঁহারা উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী করিতে চান। বোম্বাই-এর শিল্পপতিগণ-বিরচিত পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনায় যাত্রী ও মাল-চলাচলের নিমিত্ত পথঘাটের পরিমাণ আরও অধিক। তাঁহারা ২,৪১৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের সমগ্র সরকারী পথের দৈর্ঘ্য ৬,০০,০০০ মাইলে পরিণত করিতে অভিলাষী। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতির শিল্প-কারিকরী উপসমিতিও (Technical Sub Committee) কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পথ-ঘাট সম্পর্কে একটি বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগের নায়কদিগের পরিকল্পনা দুই ভাগে বিভক্ত। নিখিল ভারতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বর্ত্ম-বিস্তারের একটি দূরদর্শী কল্পনা (Long term plan) প্রথম; এবং দ্বিতীয়, বর্ত্তমানে যুদ্ধঘটিত সমস্যা সমাধানের উপায়। শেষোক্ত পরিকল্পনায় বর্ত্তমান যুদ্ধের গুরু প্রয়োজনে বহুল পরিমাণে প্রবর্দ্ধিত যান-বাহন চলাচলের ফলে পথ-ঘাটের যে অসীম ক্ষয় ও ক্ষতি ঘটিতেছে, তাহার পূরণ ব্যবস্থা; মাল-মশলা ও যন্ত্রপাতির স্বল্পতার আশু প্রতিকার এবং যুদ্ধ-বিমুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও যন্ত্রপাতির পূর্ত্তকর্ম্মে নিয়োগের ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পথগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, জাতীয় সরকারী পথ এবং যে সকল স্থান প্রাদেশিক সরকারগুলির অধিকারে নয়, অথচ যাহার উন্নতি সাধন হয় নাই, এরূপ স্থলের সহিত সংযুক্ত পথ। দ্বিতীয়, প্রাদেশিক অথবা দেশীয় রাজ্যান্তর্গত পথ সমূহ; তৃতীয়, জেলা-মহকুমার অভ্যন্তরস্থ পথ এবং চতুর্থ, পল্লীপথ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জাতীয় সরকারী পথ এবং অনুন্নত অঞ্চলের

সহিত সংযুক্ত পথগুলি হইবে; কাঠামো যাহার অভ্যন্তরে সমগ্র দেশের সুশৃঙ্খলিত বর্ত্মজাল বিস্তার লাভ করিবে। এইগুলির নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরস্থ এবং জেলা-মহকুমা এবং গ্রামের রাস্তাগুলি তৈয়ারী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির বর্ত্ম-বিভাগের। এই প্রধান পূর্ত্ত-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বিবৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের রাস্তার শ্রেণী-বিভাগ এবং মান নির্ণয় করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে সকল খুঁটিনাটি রুচিকর হইবে না। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী কঠিন ত্বক-বিশিষ্ট (hurd crust) পথের একুন দৈর্ঘ্য হইবে ১,৪৭,০০০ মাইল এবং মেটে পথের পরিমাণ হইবে ২,৫৩,০০০ মাইল। বর্ত্তমানে ভারতের পাকা পথগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৭১,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ১,৬৩,০০০ মাইল। প্রস্তাবিত নূতন পথগুলি তৈয়ারী হইলে সর্ব্বশ্রেণীর পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণে (Maintenance) ব্যয় পড়িবে ১৬ কোটি টাকা। পূর্ত্ত কর্ম্মচারিগণের বৈঠক বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে বর্ত্তমান মাসের মধ্যে তাহাদের পরিকল্পনার স্থূল নক্সা কিংবা সঙ্কল্পের আনুমানিক হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হয়ত সেগুলি দাখিল হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত যানবাহন পরিচালন সংক্রান্ত (Transport) উপসমিতির অভিপ্রায়, একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংযুক্ত যানবাহন-পরিচালন নীতি। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশগুলি একাভিসন্ধি হইয়া যানবাহনের সর্ব্বত্র সুপরিচালনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সম্মতি ও সহযোগিতা-সাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিবেন। ভারতের অনতি বিস্তৃত রেলপথের মধ্যে অনেক ফাঁক্ (Gaps) আছে। এই ফাঁক্গুলি যুক্ত করিতে প্রয়োজন, উত্তম রাজপথের প্রসার এবং যানবাহনের সুচলাচল। যানবাহনের মধ্যে অবশ্য হাওয়া-গাড়ী প্রধান। হাওয়া গাড়ীতে যাত্রী ও মাল-পরিবহনের সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটিলে পল্লী অঞ্চলে যাতায়াতের ও তথাকার উৎপন্ন পণ্যের স্থানান্তর-করণের সৌকর্য্যের ফলে কৃষি, শিল্প ও বৃত্তি ব্যবসায়ের উন্নতি হেতু পল্লী অঞ্চলের লোকের আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে। পল্লীর উন্নতিতে সমগ্র দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। মাল-চলাচল ও যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার অভাবে বহু পল্লী-কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যাদি ঐ সকল পণ্যে অভাবগ্রস্ত স্থানে চালান দেওয়া যায় না। সুতরাং স্বস্থানে চাহিদার সঙ্কোচ হেতু প্রাথমিক উৎপাদকেরা তাহাদের অশেষ পরিশ্রম-লব্ধ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। ফলে তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয় না। উপযুক্ত রাস্তা দ্বারা যে কোন প্রকার যানের সাহায্যে রেলপথের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইলে তাহারা চাহিদা অনুযায়ী কৃষি অথবা শিল্পজাত দ্রব্যাদি যোগাইয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে। পল্লীর উন্নতিতে যেমন সমগ্র দেশের উন্নতি, কৃষকের উন্নতিতে তেমনি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও উন্নতি; সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত যান-বাহন-উপসমিতি সুপারিশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের অবসানের নিমিত্ত আমাদের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, এখন হইতেই আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার হাওয়া-গাড়ীর চলাচলের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সুবিধামত সর্ত্তে হাওয়া গাড়ী যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং রাস্তা-ঘাটের উন্নতি ও প্রসার সাধন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার মোটর গাড়ী দ্বারা যাতায়াত ও মাল-চলাচলের সুবন্দোবস্তের উত্তম সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু তাহার যোগ্য উদ্যম কোথা?

পূর্ব্বে রেল কোম্পানীগুলির ধারণা ছিল যে, উত্তম উত্তম রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া মোটর গাড়ীতে যাতায়াত ও মাল-চলাচলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিলে তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি ঘটিবে। কিন্তু এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। ভারতবর্ষ এরূপ বিস্তৃত দেশ যে, ইহাকে সর্ব্বত্র লৌহ-নিগড়ে সংযুক্ত করা অতি দুঃসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু রাস্তা-ঘাটের উন্নতি ও প্রসার দ্বারা মোটর গাড়ীতে যাতায়াত ও মাল-চলাচলের বন্দোবস্ত তত দুষ্কর নহে, পরন্তু সহজসাধ্য। রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া রেলপথের সহিত মোটর-পথের সহযোগশীল সংযোগ স্থাপন করিলে উভয় অনুষ্ঠানের উন্নতি ঘটিবে। উভয় পথের মধ্যে মাত্র দুই-এক স্থানে প্রতিযোগিতা সম্ভব, কিন্তু সহযোগিতা সর্ব্বত্রই সম্ভব, এবং প্রতিযোগিতা যদি ঈর্ষা কিংবা অনিষ্ট-মূলক না হয়, তাহা হইলে কল্যাণদায়ক। যাহা হউক, এখন প্রায় সমস্ত রেলপথই সরকারী পরিচালনাধীন। সুতরাং স্বার্থান্বেষী কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথের প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাত্রিবাহী মোটর অনুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন গরিষ্ঠ অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া প্রধান প্রধান ব্যবসা-মার্গে যান-বাহন পরিচালন করিলে এবং লঘিষ্ঠ মার্গগুলিতে সুশাসিত একাধিপত্য সংস্থাপিত করিলে অসূয়া কিংবা অনিষ্টমূলক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে। যাত্রিবাহী মোটর-অনুষ্ঠানের সংখ্যা ও পরিসরও যথাসম্ভব আয়ত্তাধীনগত করিতে পারা যায়; এবং রেল ও মোটর পরিচালন-কর্ত্তৃপক্ষের সম্মিলিত ক্রমে রেল ও মোটর উভয় পথের ভাড়া ও মাশুল যথাসম্ভব নিম্নতম করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপসমিতি সুপারিশ করিয়াছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব উভয়ের যুক্তি-সম্মত উন্নতি ও প্রসার সংসাধনার্থ বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন। উপসমিতির ইচ্ছা যে, প্রত্যেক প্রদেশে এক জন অনন্যকর্ম্মা (whole-time) যান বাহন পরিচালন আমীন (Transport Commissioner) নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এই কর্ম্মচারী প্রত্যেক প্রদেশস্থ যানবাহন পরিচালন সংসদের সভাপতি হইবেন এবং যাত্রী ও মাল-পরিবহন বিশেষরূপে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। উপসমিতির আর একটি সুপারিশ এই যে, যানবাহন-পরিচালন সৌকর্য্যার্থ কেন্দ্রে একটি বিশিষ্ট "বাজেট" প্রস্তুত হইবে এবং প্রদেশগুলি সকলেই তাহার সাহায্যে তাহাদের আয়কে সমষ্টিগত ভাবে (Pooling of revenues) এবং মৌলিক ব্যয়কে রাজপথ ও রেলপথের উপর সমঞ্জস ভাবে খরচ (Balancing of capital expenditine on both road and rail) করিতে পারিবে।

উপসমিতিও একটি ভারতীয় বর্ত্ম-মণ্ডলীর (Indian Road Board) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কার্য হইবে জটিল ও কুটিল সমস্যার সমাধান; বর্ত্ম-পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ-আয়োজন; বিভিন্ন যাত্রী ও

মাল-পরিবহন অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্ঘবদ্ধ সমাসজ্ঞন (Co-ordination); রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সংস্থাপন। ফলে রাজপথে ও রেলপথে যাত্রী ও মাল-পরিবহনের উন্নতি সাধন এবং উভয়ের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরিবহন-কার্য্য পরিচালনের চরম দায়িত্ব থাকিবে এই মণ্ডলীর।

বোম্বাইএর শিল্পপতিগণের পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের রাজপথগুলির বর্ত্তমান একুন দৈর্ঘ্য ৩০০,০০০ মাইল। ইহার মধ্যে ৭৪,০০০ মাইল পাকা এবং ২২৬,০০০ মাইল কাঁচা। পনর বৎসরের মধ্যে এই সমষ্টিকে তাঁহারা দ্বিগুণ করিতে চাহেন, প্রধানতঃ গ্রাম্য ও মহকুমা এবং জেলার অভ্যন্তরস্থ রাস্তাঘাটের বিস্তার দ্বারা। শিল্পপতিগণের অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রামগুলিকে এমন ভাবে প্রধান প্রধান ব্যবসায়-মার্গের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে এক সহস্র কিংবা ততোধিক বাসিন্দা সমন্বিত গ্রামগুলি সরকারী পথ হইতে এক মাইল কিংবা দেড় মাইলের অধিকতর দূরবর্ত্তী না হয়। এইরূপ রাস্তা-ঘাটের উন্নতির সহিত গো ও মহিষ যানেরও উন্নতি করিতে হইবে। কারণ, পল্লী অঞ্চলে গো ও মহিষযানই হইতেছে, যাত্রী ও মাল পরিবহনের প্রধান উপায়; এবং ইহাদের উপকারিতা ও উপযোগিতা সহজে বিনষ্ট হইবে না।

শিল্পপতিগণ গো ও মহিষযানগুলির চক্রগুলিকে বায়ুপূর্ণ রবারের বেড় (pneumatic tyre) দিয়া মজবুত করিতে বলেন। তাহাতে রাস্তাঘাট ও গাড়ীগুলির মেরামত খরচা কম পড়িবে। গ্রামাঞ্চলে যান-বাহনের চলাচল তত অধিক নহে; সুতরাং পল্লী অঞ্চলের রাস্তাগুলিকে সাধারণ ভাবে পাকা করিলেই চলিবে। বায়ুপূর্ণ অর্থাৎ ফাঁপা বেড় দিয়া চাকাগুলিকে খাটাইলে এইরূপ রাস্তার পক্ষে তাহারা উপযোগী হইবে। সাধারণতঃ ১৮ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইলে, মাইল প্রতি ১০,০০০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এই হিসাব অনুযায়ী আরও ৩০০,০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিতে ৩০০ কোটি টাকার প্রয়োজন; এবং ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পড়িবে ৩৫ কোটি টাকা। ভারতবর্ষকে যথোপযুক্ত রাস্তা-ঘাটের সুযোগ বিদ্যমানের সুবিধা দিতে হইলে এই অতিরিক্ত ৩০০,০০০ মাইল রাস্তা ব্যতীত ২২৬,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তাকেও পাকা করিতে হইবে। এই রাস্তাগুলিকে পাকা করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে মাইল প্রতি ৫০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে; অর্থাৎ মোটের উপর ১১৩ কোটি টাকা খরচ হইবে। যদি তাহাদিগকে ভাল করিয়া পাকা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বর্ত্তমান রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও কমিয়া যাইবে। সুতরাং শিল্পপতিগণের মতলব অনুযায়ী রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করিতে ৩০০+১১৩+৩৫=৪৪৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

এই সকল পরিকল্পনা ও সুপারিশ এখনও কেন্দ্রীয় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতির বিবেচনাধীন। সরকারের চরম পরিকল্পনা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা এখন অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভার (Council of State) নায়ক ডাক ও বিমান বিভাগের মন্ত্রী স্যার মহম্মদ ওসমান একটি সাংবাদিকের বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আর্থিক কিংবা অন্য কোন প্রকার অসুবিধার নিমিত্ত সরকার এই ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুড়ি বৎসরের মধ্যে ৪০০,০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে পশ্চাদপদ হইবেন না। যুদ্ধোত্তর ভারতে যথোপযুক্ত রাস্তাঘাট এবং বিবিধ প্রকার যান-বাহনে যাত্রী ও মাল পরিবহনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত; উত্তম, সুলভ এবং প্রচুর রাস্তা-ঘাট ও যান-বাহন ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় উন্নতির নিমিত্ত অবশ্য প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান পূর্ত্ত-কর্ম্মচারিগণের পরিকল্পনা অবশ্য বিরাট, কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আর্থিক কিংবা অন্য কোন অসুবিধায় সন্ত্রস্ত না হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। এ আশ্বস্তি শ্রুতিসুখকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুদ্ধান্তে সরকারের মতিগতি কোন্ পথে ধাবিত হইবে, তাহা বিধাতা পুরুষই জানেন। ভারতে জাতির স্বার্থ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

স্যার মহম্মদ ওসমান এই ঘোষণা প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের শিল্পপতিগণের পরিবহন (Transport) পরিকল্পনার উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার রচয়িতাগণের অন্যতম স্যার আর্দেশির দালাল সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদে স্থান পাইয়াছেন। তিনি এখন সংগঠন-সমুন্নয়ন (Planning and Development) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড বেন্থাল। উভয়েই অবশ্য যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতির সদস্য। ভারতের কল্যাণকল্পে উভয়েরই উদ্দেশ্য এক হওয়া উচিত; তথাপি শাসন পরিষদের ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ অনিবার্য্য।

পরিবহনকার্য্যে রাজপথ ও রেলপথের ন্যায় জলপথের ও ব্যোমপথেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। বোম্বাইএর শিল্পপতিগণের পরিকল্পনায় এ সকল পথের পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থাও আছে। আমরা এ প্রবন্ধে মাত্র স্থলপথের আলোচনা করিব। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের রেলপথের একুন দৈর্ঘ্য ছিল ৪১,০০০ মাইল এবং ইহাতে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৪৮ কোটি টাকা। ভারতের আয়তন ১৫,৮০,০০০ বর্গ-মাইল। আয়তনের অনুপাতে ভারতের রেলপথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। রুশিয়া ব্যতীত য়ুরোপের আয়তন ১৬,৬০,০০০ বর্গ-মাইল, এবং তাহার রেললাইনের বিস্তার ১,১০,০০০ মাইল। রেলপথের ন্যায় বৃটিশ-ভারতে রাজপথেরও পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রতি এক শত বর্গ মাইলে ৩৫ মাইল। কিন্তু আমেরিকায় প্রতি এক শত বর্গ মাইলে রাজপথ ১০০ মাইল এবং যুক্তরাজ্যে প্রতি এক শত মাইলে ২০০ মাইল। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর নিমিত্ত অষ্ট্রেলিয়ায় রাজপথের পরিসর ৭,১০০; কানাডায় ৫,৪০০; যুক্তরাষ্ট্রে ২,৫০০; জাপানে ৮৫০; যুক্তরাজ্যে ৩১৩ এবং জার্ম্মাণীতে ২৬০ মাইল। ভারতে প্রতি লক্ষ অধিবাসীর নিমিত্ত রাজপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৭২ মাইল! রাজপথের তুলনায় ভারতবর্ষে রেলপথের প্রতি সরকারের মনোযোগ ছিল অধিক। পরন্তু, সহর অঞ্চলের তুলনায় পল্লী অঞ্চলে রেলপথ অপেক্ষা রাজপথেরই প্রয়োজন অধিক। এই নিমিত্ত শিল্পপতিগণ তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় রাজপথকে আরও ৩০০,০০০ মাইল বিস্তৃত এবং রেলপথকে আরও ২১,০০০ মাইল দীর্ঘতর করিবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজপথকে শতকরা ১০০ অংশ এবং বর্ত্তমান রেলপথকে শতকরা ৫০ অংশ বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী! ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের মূলধন ও একুন রেলপথের অনুপাতে আরও ২১,০০০ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত করিতে মৌলিক ব্যয়

(Capital cost) লাগিবে ৪৩৪ কোটি টাকা। শতকরা ২ অংশ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পড়িবে বার্ষিক ৯ কোটি টাকা। অন্য একটি বে-সরকারী (People's plan) পরিকল্পনার প্রস্তাব আরও অধিক—৬,৭০,০০০ মাইল রাজপথ।

রেলপথ সম্বন্ধে সরকারের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি, গত আগষ্ট মাসে নয়া দিল্লীতে পূর্ত্তবিদ্যাবিদ্‌দিগের আলোচনা সভার (Institute of Engineers) বার্ষিক অধিবেশনে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র মহাশয়ের অভিভাষণে। আগামী সাত বৎসরে ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০০ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত করা হইবে। এই মৌলিক পরিকল্পনা (Basic plan) তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম, পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Rehabilitation), অর্থাৎ কারখানার যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রীগাড়ী, রেলের রাস্তা ও পাটি এবং তাহাদের সাজসজ্জার মেরামত ও পুনঃ সংস্থাপন (Replacement) ; এবং সমগ্র ভারতের জাতীয় রাজপথ ও প্রাদেশিক রাস্তাঘাট পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে খাপ খায় এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া অথবা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে যে সকল শাখা রেলপথ, সেগুলির (Dismantled branch lines) পুনঃ সংস্থাপন। দ্বিতীয়, কর্ম্ম-পরিচালনা ব্যবস্থা এবং কর্ম্মচারিবৃন্দের উৎকর্ষ সাধন (Improvment in organisation and presonnel), অর্থাৎ মাল, পুলিন্দা ও যাত্রী পরিবহন প্রথার উন্নতি সাধন। যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখিয়া নূতন মাশুল-প্রকরণের ক্রমোন্নতি; রেলগাড়ীতে বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস, এবং রেল-কর্ম্মচারীদিগের কল্যাণ ও কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারী-কল্যাণ সাধন বিধি-ব্যবস্থার উন্নতি। তৃতীয়, রেলগাড়ীতে ও গাড়ী থামিবার ঘাটিতে-ঘাঁটিতে (Railway stations) তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধার উন্নততর ব্যবস্থা; এঞ্জিন গাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন; স্থলপথে ও বিমান-মার্গে পরিবহনের নিমিত্ত রেলগাড়ী পরিচালক কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মপরিসর বৃদ্ধি (Extension of activities to other tranaport services); যুদ্ধবিমুক্ত সৈনিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের রেলপথ-পরিচালন-বিভাগ কর্ম্মে নিয়োগ এবং বর্ত্তমানে যে সকল অঞ্চলে রেল-রাস্তা নাই সেই সকল স্থানে নূতন-নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ ও রেলগাড়ী পরিচালনের এবং রেলরাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক ব্যবস্থা। উক্ত সভায় উপস্থিত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথে যে দুই প্রকার পরিসরের রেলরাস্তা আছে, অর্থাৎ Broad gauge (চওড়া) এবং Metre gauge (সরু) তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কারণ, তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া একই প্রকারের পরিসর-যুক্ত রাস্তা প্রবর্ত্তিত করিলে, অন্যান্য প্রকার পরিবহন অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা ব্যাহত হইতে পারে।

তৃতীয়-শ্রেণী রেলযাত্রীর অসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী সর্ব্বজন-বিদিত, অথচ তাহারাই রেল-পরিচালনা আয় ব্যয়ের গরিষ্ঠ অংশ সরবরাহ করে। যুদ্ধান্তে তাহাদের যাতায়াতের ও পরিবহনের সুব্যবস্থা হইলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জনসাধারণ যথার্থই আরাম ও আনন্দলাভ করিবে। কিন্তু গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে কোন কল্পনাই কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি এ-দেশে এঞ্জিন-গাড়ী মালগাড়ী ও যাত্রি-গাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধে সামরিক ও অ-সামরিক উভয় প্রয়োজনেই রেলপথ ও রেলগাড়ীর সাহায্যে সৈন্য-সামন্ত, রসদ-পোষাক এবং যুদ্ধোপকরণ সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিবহন করিয়া রেলকর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর অপ্রতিহত গতায়াত রক্ষা করিয়াও ভারতপ্রবাসী সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদিগকে অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও দুর্ভিক্ষ-মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিত। ভারত সরকার সম্প্রতি যুদ্ধের অভিঘাতে, পাঁচ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, ভারতে সর্ব্বপ্রকার রেলগাড়ী প্রস্তুত করিবার আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু এখনও বিলাতী কারখানাগুলির স্বার্থের হানি ঘটিবার ভয়ে কুণ্ঠিত। বৎসরে ২৩০খানি এঞ্জিন তাঁহারা ক্রয় করিবেন এবং পনর বৎসর এই ক্রয় নীতি চলিবে। কাঁচড়াপাড়ার কারখানা ৮০খানি যোগাইবে; একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ১০০খানি সরবরাহ করিবে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি সরকারী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই প্রতিষ্ঠান বাকী ৫০খানির কিয়দংশ যোগান দিবে। অবশিষ্টগুলি বিলাত হইতে আমদানী করা হইবে। সমস্ত গাড়ীগুলিই যে সাগরপার হইতে আমদানী করা হইবে না, ইহাই আমাদের বর্ত্তমানে একমাত্র সান্ত্বনা।

এঞ্জিনগাড়ী, মালগাড়ী ও যাত্রিগাড়ী সরকারী তত্ত্বাবধানে সরকারী কারখানায় প্রস্তুত হইলে উত্তম হয়। কিন্তু সরকারী কারখানায় যাহা উৎপাদন করা বর্ত্তমানে অসম্ভব, সেগুলি বিলাত হইতে আমদানী না করিয়া কোন কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কার্য্যে অধিকার দিয়া ব্রতী করিলে ক্ষতি কি ?

সম্প্রতি বোম্বাই-বরোদা ও সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের প্রধান কর্ম্মচারী (General manager) ঘোষণা করিয়াছেন যে, এঞ্জিন নির্ম্মাণের নিমিত্ত রেল-কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের কয়েকটি রেল-কারখানাকে শীঘ্রই এই কার্য্যের উপযোগী করিবেন। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, অচিরে নিকট এবং দূরবর্ত্তী প্রাচ্যের (Near and Far East) নিমিত্ত এঞ্জিন-গাড়ী তৈয়ারী করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে। আশার কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভারতে বৎসরে ২২খানি মাত্র এঞ্জিন-গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতীয় রেলপথের উপর যে কি প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে, তাহার একটু ইঙ্গিত দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রেলপথে যাত্রী ও মাল-চলাচলের পরিমাণ (Volume of traffic) ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে চওড়া পথে (Broad gauge) ১৮,৬২০ মিলিয়ন টন মাইল হইতে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৪,০৮৫ মিলিয়ন টন মাইলে উন্নীত হয় এবং সরুপথে (Metre gauge) ৩,১৬৫. মিলিয়ন টন মাইল হইতে ৩,৫৫০ মিলিয়ন টন মাইলে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। উভয় রেলপথে বোঝাই-কৃত মালগাড়ীর সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে অবশ্য এই

সংখ্যার হ্রাস ঘটে। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধানতঃ সামরিক ব্যবহারের বৃদ্ধি হেতু অ-সামরিক প্রয়োজনে অবনতি ঘটে। সামরিক প্রয়োজনের পরিসরেরও একটু ইঙ্গিত আমরা এখানে দিব। ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথগুলি ৮০০০ সামরিক স্পেশাল ট্রেণ পরিচালন করে। এই যাতায়াতে তাহারা ৫৪,০০,০০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করে। গত আর্থিক বৎসরের শেষ হইতে এ পর্য্যন্ত এই সামরিক স্পেশাল ট্রেণগুলি প্রতি মাসে অর্দ্ধ মিলিয়নেরও অধিক ট্রেণ মাইল গতায়াত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে-পরিমাণে সামরিক প্রয়োজন বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে অ-সামরিক প্রয়োজন খর্ব্ব হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে যানবাহন-মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সাগরপার হইতে এঞ্জিনের আমদানীর ফলে এ বৎসর যাত্রী ও মাল-পরিবহনে রেলপথের তৎপরতা বাড়িবে। তাহার কোন নিদর্শনই এখনও প্রকট নহে। সম্প্রতি উত্তর-আমেরিকা হইতে অনেকগুলি অধিকতর শক্তিশালী এঞ্জিন আসিয়াছে।

মোটের উপর রাজপথ ও রেলপথের দ্রুত ও দৃঢ় বিস্তার ব্যতীত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি ও জাতীয় জনসাধারণের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, সভা-সমিতিতে আলোচনার অন্ত নাই! কিন্তু তৎপরতার লক্ষণ তাদৃশ প্রকট নহে।

ছোট মাষ্টার

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ

আকাশের সূর্য্য ক্রমশ পশ্চিমে হেলিতেছিল।

বালিন্দর ইউ, পি স্কুলের ছুটী হইয়া গেল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছড়াহুড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সকলের পিছনে ফ্রক-পরা ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে তাহার সমবয়স্কা সঙ্গিনীর সহিত কি একটা মতলব আঁটিতে আঁটিতে ধীর পদে হাঁটিতেছিল।

স্কুল-কম্পাউণ্ডের এক দিকে পাশাপাশি কয়েকটা মাটির ঘরে স্কুলের দু'-তিন জন শিক্ষক বাস করেন। সে জায়গাটা অতিক্রম করিবার সময় ভারতী সহসা সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল,—এই, ছোট মাষ্টারের কাছে যাবি? চ' না!

ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লীলা কহিল,—আচ্ছা, চ'। সেই ভালো। সন্ধ্যার আগে রায়েদের বাগান থেকে চুপি চুপি পেড়ে আনলেই হবে। কি বলিস্‌—এঁ্যা!

—আচ্ছা।

মাটীর ঘরগুলাকে দূর হইতে গোয়াল মনে হইলে আশ্চর্য্যের কিছু নাই! মাঝের ঘরটি ছোট মাষ্টারের। ঘরে ছোট একটি জানালা আছে; কিন্তু সে দিকে যেটুকু আলো প্রবেশ করে, ঘরের অন্ধকার ঘুচিবার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। একটা দড়ির খাটিয়ায় চশমা-চোখে এক কিশোর শুইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল।

—ছোট মাস্‌সাই!

—তোমরা বুঝি! এসো, এসো! এসো লীলা!

উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। লীলার সহিত ছোট মাষ্টারের তেমন ভাব নাই। সে বই-বগলে সঙ্কুচিত হইয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী অতি পরিচিতের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া হাতের বই-শ্লেটগুলা ওদিককার একটা নড়বড়ে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া শুষ্ক-কপাট জানালার চটটা ভালো করিয়া গুটাইয়া দিল।

কিশোর হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। ভারতী কহিল, —ছোট মাস্‌সাই!

—কি!

—আপনার কি হয়েচে? আজ ইস্কুলে গেলেন না যে?

—কিছু নয়। এমনি একটু জ্বর।

ভারতী তাহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। ঐটুকু মেয়ে ইহারই মধ্যে গৃহিণীপনার অঙ্গভঙ্গিগুলা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরের কপালে ও মাথায় ছোট ছোট হাত দু'খানা বারকয়েক বুলাইয়া গম্ভীর মুখে কহিল,—হুঁ! জ্বরই তো। বেশ জ্বর। জ্বর হবে না? যে রাত করে আপনি খান! বলিয়া সহসা সঙ্গিনীর দিকে চোখ ফিরাইয়া বলিল,—বোস রে লীলা। তুই তো আচ্ছা!

কিশোর হাসিয়া কহিল,—কাল যাবো'খন। তোমাদের পড়াশুনো হয়েছিল তো?

ভারতী সহসা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিশোরের হাতখানা সজোরে নাড়িয়া লীলাকে দেখাইয়া কহিল,—জানেন ছোট মাস্‌সাই, লীলা আজকে 'সংস্কার' বানান পারেনি তাই বড় মাষ্টার ওকে বকলেন, একেবারে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিলে। ছি ছি।

লীলা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। কিশোর কহিল,—আচ্ছা দাঁড়াও, তোমার হাসি বার করচি। কাল তোমাকেও ওমনি দাঁড় করিয়ে দেবো। আর লীলা, তুমিও হাসবে তাই দেখে। বুঝেছ?

দিন-শেষের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রায়েদের বাগানে কি এক অজ্ঞাত বস্তুর আকর্ষণে দুই সখী চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতী আরও কিছুক্ষণ কিশোরের বিছানায় বসিয়া এক সময় বই-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আজ যাচ্ছি মাস্‌সাই।

—আচ্ছা।

—রাত্তিরে কি খাবেন!—সাবু তো?

—হ্যাঁ।

ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ভারতী কিশোরের নিকটে সরিয়া আসিল। কহিল,—মাকে করে দিতে বলবো—কেমন, এঁ্যা? বিধু দিয়ে যাবে এখন।

কিশোর প্রতিবাদ করিল না। দ্বারের বাহিরে দুই জনে কি পরামর্শ করিল। ভারতী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি কহিল,—ছোট মাস্‌সাই!

—কি!

—চুপ—আস্তে পেয়ারা খাবেন?

—কোথায় পাবো?

—রায়েদের বাগানে। চুপি চুপি পেড়ে আনবো—কেউ দেখতে পাবে না। খাবেন তো?

কিশোর কহিল,—আমি না তোমার মাষ্টার মশাই! সে দিন কি পড়লে? 'না বলিয়া কাহারও জিনিষ লইলে'—তাকে কি বলে?

ভারতীর মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল,—তবে আর কি হবে। আমরা যাচ্ছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা শোনো ·· নিয়ে যেও—বেশী না কিন্তু।

ভারতী বিস্মিত মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মস্তক-হেলনে সম্মতি জানাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

বছর দুই পূর্ব্বে কিশোর এক দিন অসহায় অবস্থায় যখন বালিন্দর গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল, ভারতীই সে সময়ে তাহাকে প্রথম আবিষ্কার করে। বাঁড়ুয্যেদের বহুস্থ্যপূত বাগানে শিশু কাল হইতে ভারতীর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডুরে শাড়ীর আঁচলে ভরিয়া সে দিন সে কি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল, আসিবার পথে পূজামণ্ডপে এক জন অপরিচিত নিদ্রিত ছেলেকে দেখিয়া সে কৌতুক সম্বরণ করিতে পারে নাই—শঙ্কিত পায়ে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছেলেটি গত দুই দিন হইতে অভুক্ত ছিল, আঁচলের ফল-মূল ভারতী তাহাকে খাইতে দিল। খামখেয়ালী নানা প্রশ্নে তাহাকে আরও কিছুক্ষণ বিরক্ত করিয়া অবশেষে ভারতী তাহাকে একেবারে মায়ের কাছে টানিয়া আনিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে ভারতীর বাবা এক-কালে মোড়লী করিয়া গিয়াছেন—ভারতীর প্রৌঢ় জাঠতুতো দাদা এখন তাঁহার স্থানে বসিয়াছেন। কিশোর মাটিক পাশ করিয়াছিল—ভারতীর মা তাহাকে বলিয়া কহিয়া ছেলেটাকে স্কুলের কাজে লাগাইয়া দেন। সেই হইতে ছোট মাষ্টারের পদে সে বহাল হইয়া এইখানে রহিয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া আরও দু'-চার বছর কাটিল। ভারতী এখন ফ্রক ছাড়িয়া রঙীন শাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, মাথার টানা বিনুনি ঘুচাইয়া খোঁপা বাঁধিয়া স্কুলে আসে। ইউ, পি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে সে এবার প্রোমোশন পাইয়াছে। আগের চেয়ে এখন তাহার আচরণ অনেকটা সংযত হইলেও কিশোরের কাছে তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহাদের শ্রেণীতে কিশোর পড়ায় না—কিন্তু এ জন্য তাহাদের আলাপে বাধা পড়ে নাই। ভারতী কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল, স্কুলের অন্য সব ছাত্র ছাত্রীর চেয়ে এই তরুণ মাষ্টারটির উপর তাহার দাবীর মাত্রা একটু বেশী। শৈশব হইতেই তাহারা এমনি—তাই কাহারও চোখে ইহা বিসদৃশ মনে হয় নাই।

কয়েক দিন হইতে স্কুল-প্রাঙ্গণে ভারতীর দেখা মিলিতেছে না। ভারতীর ভাইপো সাত বছরের বাবলু স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে কিশোরের কাছে পড়ে। এক দিন ছুটীর পর কিশোর তাহাকে ঘরে আনিয়া লজেন্স চকোলেট দিয়া আপ্যায়িত করিয়া এক সময় কহিল,—হাঁ রে বাবলু, তোর পিসিমার কি হয়েছে রে?

—কিছু হয়নি তো মাস্‌সাই!

—ইস্কুলে আসে না যে!

হাতের চকোলেটটা চুষিতে চুষিতে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বাবলু কহিল,—পিসিমা আর আসবে না মাস্‌সাই।

কিশোর বিশ্বাস করিল না। কহিল,—কেন রে? যাঃ, তুই জানিস না।

বাবলু চোখ বড় করিয়া কহিল,—হ্যাঁ মাস্‌সাই। দিদ্‌মা বলছিল। বলিয়া কিশোরের সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল,—আর একটা দি—ন!

কিশোর হাসিয়া তাহার পকেটে আরো কয়েকটা লজেন্স গুঁজিয়া দিল। বাবলু মৃদু সাবধানী কণ্ঠে কহিল,—আমি কাল পড়ছিলুম—দিদ্‌মা বাবাকে বলছিল।

—কি বলছিল রে?

—বলছিলো, পিসিমা আর আসবে না। বড় হয়ে গেছে কি না—তাই বলছিল, ও এবার বাড়ীতে পড়বে! আমি যাই মাস্‌সাই—ওরা খেলচে।

কিশোর আর একবার তাহাকে কোলের কাছে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কহিল,—আচ্ছা যা। রোজ আসবি, বুঝলি; লজেন্স দেব।

—আচ্ছা। বলিয়া বাবলু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিশোর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ স্কুলের ছুটি হইয়াছে। দীর্ঘশীর্ষ গাছগুলার আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের আলো পৃথিবী রাঙা করিয়া একটু একটু করিয়া নিভিয়া আসিতেছিল। স্কুলের ময়দানে ছেলেদের উচ্চ বাক্‌বিতণ্ডা শান্ত হইয়া তাহাদের খেলা সুরু হইয়াছে।

বৈকালিক ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হেডমাষ্টার মশাই কিশোরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—কই হে, যাবে না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চলুন। বলিয়া কিশোর সেই বেশেই বাহির হইয়া আসিল।

গ্রামের শেষে পোড়ো ময়দানের পায়ে-চলা সরু পথে দুই জনে হাঁটিতেছিল। দেখিলে মনে হয় না যে উভয়েই এঁরা শিক্ষক। প্রাচীন মাষ্টারের পিছনে কিশোরকে অনুগত ছাত্র বলিয়াই ভ্রম হইবার কথা। হেডমাষ্টার কথায় কথায় কহিলেন,—শুনেচ হে, ভারতীকে ওরা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।

কিশোর জবাব দিল না। বাবলুর কয়েকটা কথায় আজ সহসা তাহার মনে হইল, ভারতী সত্যই বড় হইয়াছে কেবল তাহার চোখে এত দিন সেটা ধরা পড়ে নাই। পল্লী-অঞ্চলের তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে—বড় হইবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। এবার কোন্ দিন শঙ্খ ও উলুধ্বনি শুনিলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া অগ্রগামী হেডমাষ্টার বলিতে লাগিলেন,—মেয়েটা বেশ ভালো ছিল হে! ভেবেছিলাম, ওকে দিয়েই এবার স্কুলে একটা বৃত্তি পাইয়ে দেব। বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে চলিবার পর কহিলেন,—লীলার ওপর আমার ভরসা নেই, বুঝেছ! ছেলেগুলো তো সব হাঁদা—মেয়েগুলোর ব্রেণ বেশ সার্প। দেখি, ওকে একটু মেজে ঘষে।

কয়েক দিন পরে বাবলু আসিয়া কহিল,—মাস্‌সাই, দিদ্‌মা আপনাকে যেতে বলেচে।

কিশোরের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। গলার স্বরও বেশ সহজ হইল না। কহিল,—আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় যাবো—বলিস্।

ভারতীর মা অভয়ার এক কালে রূপ ছিল। এখন সে রূপে প্রসন্নতার দীপ্তি আসিয়া তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চা তৈরী করিতেছিলেন, কিশোরকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন। এ কথা সে কথার পর এক সময় কহিলেন,—বোধ হয় শুনেচ বাবা, ভারতীকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হলো।

কিশোর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে জানে।

—হ্যাঁ। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, বয়স হয়েচে। ঐ ঢের—কি বলো বাবা! এইবার এখন ভালোয়-ভালোয় সুপাত্রে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্দি হই।

কিশোর চুপ করিয়া রহিল। অভয়া হাসিয়া কহিলেন,—তা বলে তোমাকে আমি ছাড়বো না বাবা।

কিশোর শুষ্ক মুখ তুলিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন,—ও যত দিন থাকে, তুমি রোজ দু'বেলা পড়াতে এসো বাবা। কেমন, আসবে তো!

ঘাড় নাড়িয়া কিশোর কহিল—আচ্ছা।

দু'বেলা না আসিলেও কিশোর সন্ধ্যার সময় এক বেলা করিয়া ভারতীকে পড়াইয়া যাইত। লোকের মুখে নিজের বয়সের কথা শুনিয়া ভারতী এবার বোধ করি একটু সচেতন হইয়াছে। কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া সে এখন কথা বলে। তাহার উচ্চহাসি বড় একটা শুনা যায় না—কিশোরের গায়ে ঠেলা মারিয়া কথা বলার অভ্যাস তাহার একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এ ভাবে কিশোরের আর ভালো লাগিল না।

কয়েক মাসের পর এক দিন সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আসিল, সে আর ভারতীকে পড়াইতে পারিবে না। কথাটা শুনিয়া প্রথমে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বয়স্থা কুমারী মেয়ে বলিয়া এ পক্ষে কথাটা বেশী ঘাঁটাঘাঁটি হইল না। অভয়া তাহাকে আড়ালে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিশোর কি বলিয়াছিল, সে কথা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আসিবার আগে অভয়া কিশোরকে বার-বার বলিয়াছেন, সে যেন মাঝে মাঝে এ বাড়ী আসিতে ভুলিয়া না যায়।

কিন্তু কিশোর আর যায় নাই।

আসিবার আগের দিন ভারতী পড়িবার মাঝে সহসা মুখ তুলিয়া পূর্ব্বের সুরে ডাকিল,—ছোট মাস্‌সাই!

কিশোর মুখ তুলিল। ভারতীর মুখে কি একটা সম্ভাবনার ছোঁয়া লাগিয়াছে! পরিপুষ্ট কপোলের উপর গোলাপী রেখার প্রতি এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া কহিল,—কেন?

—আপনি আর পড়াতে আসবেন না?

—না।

তাহার শঙ্কিত চোখ ছোট হইয়া আসিল। কহিল,—কেন, আমি কি দোষ করেচি শুনি?

কিশোর শুষ্ক কণ্ঠে হাসিল। কহিল,—দোষ আবার কি! মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া শিখিনি. তুমি এবার বড় মাষ্টারের কাছে পড়বে।

ভারতী সহসা বইগুলা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—হ্যাঁ, মুখ্যু, না ছাই! আপনার আসবার ইচ্ছে নেই, তাই বললেই তো হয়। বলিয়া সে আর দাঁড়ায় নাই।

সে দিন গ্রামের কাঁচা পথে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো খেলা করিতেছিল। অদূরে বৃক্ষশীর্ষে সঙ্গিনীর প্রতি নিশাচর পাখীর ব্যাকুল ইঙ্গিত বার-বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিতেছিল। কিশোর অন্যমনে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিল এবং তাহার খাবার তেমনই ঢাকা পড়িয়া রহিল; আর শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারে নাই।

আরও দুই বৎসর কাটিয়াছে। গ্রামের পাল-পার্ব্বণ পূজা-আর্চ্চা ও যাত্রা-থিয়েটারের উপলক্ষ ছাড়া কিশোর ভারতীকে আর বড় একটা দেখিতে পায় না। ভারতীর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে,—এ কথা বাবলু তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ঘর বর অপছন্দ হইবার কারণেই বোধ করি সেটা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। এ গ্রামে আসিবার পর কিশোর এক দিনের জন্য বাহিরে কোথাও যায় নাই। বৎসরের দুইটা লম্বা ছুটীও সে বরাবর এইখানে কাটাইয়াছে। গ্রামের লোকেরা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিত,—আহা, বেচারার তিন কুলে কেউ নাই গো!

কলিকাতার কোন্ একটা 'অপেরা' পূজার আগে এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িল। অন্য বারের মত এবার গ্রামের দল না হইয়া তাহাদেরই গান হইবার কথা। এ জন্য গ্রামখানা এক পক্ষ আগে হইতে প্রতীক্ষিত দিনের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিশোরের তৃষিত অন্তর এই সব উপলক্ষগুলার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত, কিন্তু বাহিরে কোন দিন সে কিছু প্রকাশ করে নাই।

মেয়ে-মহলের তদারক করিবার সময় বার-কয়েক ভারতীর সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল,—কিন্তু প্রতিবারই ভারতী চোখ ঘুরাইয়া লইয়াছে। সে রাত্রে কিশোর অন্যমনস্ক হইয়া সারা রাত গোলমাল থামাইয়া শ্রোতাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যাত্রার এই জমাটি আসর এবং সমবেত জনতার উপস্থিতি তাহার দু'চোখের উদাস দৃষ্টি হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

* * *

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া সে দিন ছুটী হইয়া গেল।

বাবলু কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া চুপি চুপি কিশোরকে জানাইয়া গিয়াছে, কলিকাতার কোন ধনিগৃহে তাহার পিসিমার আজ বিবাহ।

বারোটার পরেই স্কুল-প্রাঙ্গণ আজ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সময় স্কুলের আর দুই জন শিক্ষক তল্পীতল্পা গুটাইয়া রওনা হইয়াছেন। গ্রামের শেষে ফাঁকা স্কুলঘরের একটি ক্ষুদ্র কুটীরে সারাটা দুপুর কিশোর একাকী কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে! সকালে ভারতীর দাদা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, অভয়াও বিশেষ করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কিশোরের এখনও যাওয়া হয় নাই।

সকাল হইতে ভারতীর বিবাহের বাজনা বাজিতেছে। বিছানায় শুইয়া প্রভাতের সে বাঁশীর সুরে কিশোরের মন এ-রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সারা দিন তাহার অন্তর কেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। মনের মাঝে কি এক অশান্তির কাঁটা প্রতিনিয়ত তাহাকে সকল কর্ম্মে বিমুখ করিয়া রাখিল! সারা দুপুর সে দড়ির খাটিয়ায় পড়িয়া জানালার বাহিরে বৃদ্ধ তেঁতুল গাছটার পাতা গণিয়া কাটাইয়াছে।

এমন তাহার মাঝে মাঝে হয়। মনটা যেন কি এক অনাবিষ্কৃত বস্তুর অভাবে সহসা কারণহীন অশান্তিতে কাঁদিয়া মরে—অথচ কি সে জিনিষ, কেন এমন হয়, কিশোর আজও বুঝিয়া উঠে নাই। তাহাদের গ্রামে ছোটবেলায় অনেক মেয়ের বিবাহে তাহার মন এমনি উদাস হইয়া যাইত—কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা বোধ করি তাহাদের হইতে কিছু স্বতন্ত্র।

ভারতীর মুখখানা তাহার মনে পড়িল। অনেক দিন তাহাকে নিকটে সামনাসামনি দেখে নাই। এখন সে কিরূপ হইয়াছে, বিবাহের দিনে লজ্জা তাহার মুখখানিকে কেমন রাঙাইয়া দিয়াছে, কোন্ রঙের কোন্ শাড়ীটি পরিয়া এখন সে কি করিতেছে, এ সব আজগুবি চিন্তার অসম্ভব প্রয়াসে কিশোর কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার কিছুই ভালো লাগিল না।

সহসা মনে হইল, এ সময় একবার ভারতীর দেখা পাইলে বেশ হইত। আর কিছু না—শুধু একবার তাহাকে নিকটে দেখিয়া সাধারণ দু'-চারিটা কথা বলিলেও যেন সে তৃপ্তি পাইত! এক সময় সে তাহার পুরাতন বাক্স হইতে খানকতক বই বাছিয়া রাখিল। ফিতার অভাবে কাপড়ের লাল পাড় দিয়া সেগুলা বাঁধিল; একখানা সাদা কাগজে কি লিখিয়া সেটা উপরে রাখিয়া স্থির করিল,—অভয়ার মারফৎ এক সময়ে সে এগুলা তাহাকে দিয়া আসিবে।

কিশোরের আজ ভালো করিয়া খাওয়া হয় নাই। গ্রামের যে ব্রাহ্মণটি মাষ্টারদের রান্না করিত, তাঁহাদের খাওয়াইয়া সে আজ সকাল সকাল বিদায় হইয়াছে। কিশোরের আহার্য্য ঢাকা দেওয়া ছিল। কিন্তু অসময়ে সে আর মুখে তোলা গেল না।

এমনি করিয়া দুপুর অতিক্রান্ত হইয়া বেলা গড়াইয়া আসিল। বিজন প্রান্তরে লম্বমান বৃক্ষচ্ছায়ার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় সে অনুভব করিল, এখানে আর থাকিতে পারিবে না। বহু দিন কোথাও যাওয়া হয় নাই, এই জন্যই বোধ হয় মনটা এমন চাপিয়া বসিয়াছে। বহু দিন পরে আবার তাহার মনে কোন্ এক স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর কথা জাগিয়া তাহার প্রবাসী তৃষ্ণার্ত্ত অন্তরকে নিরন্তর সে-দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৈকালের দিকে এক সময় সে ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং মাঠে মাঠে খানিক বেড়াইয়া ফিরিবার পথে পিয়ারী বাগ্দীর গরুর গাড়ীখানা ভাড়া করিয়া আসিল।

স্কুল-গৃহ হইতে ভারতীদের পুরানো আমলের ত্রিতল বাড়ীটা গ্রামের শাখাবিরল গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাইত। সন্ধ্যার পরে তাহাদের ছাদে উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং রাত্রির অন্ধকার বহু মানুষের আনন্দ-কাকলীতে, বাদ্যে ও গানে মুখর হইয়া উঠিল।

কিশোর অন্ধকার দাওয়ায় সন্ধ্যা হইতে বহু রাত পর্য্যন্ত সে দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! এত লোকের মাঝে তাহার অনুপস্থিতি বোধ করি কেহই লক্ষ্য করে নাই; কিশোর উদ্গ্রীব নয়নে গ্রামের অন্ধকার পথের দিকে চাহিয়া ছিল; মাঝে মাঝে পথে আলো দেখিলেই আশায় অধীর হইতে লাগিল,—কিন্তু কেহই আসিল না। এমনি করিয়া রাত্রি বাড়িয়া চলিল।

মিলন-রাগিণীর ব্যাকুল সুরের শেষ মূর্চ্ছনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু আগে চুপ করিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই লগ্ন ছিল। অল্প রাত্রের মধ্যেই সমস্ত সমাধা হইয়া অত বড় বাড়ীটার মধ্যে এখন মাত্র দুই চারিটি মানুষের কণ্ঠস্বর জাগিয়া আছে।

মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ-প্রায়। ঘরের মধ্যে ম্লান আলোকের সম্মু[খে] সেই বইগুলা লইয়া কিশোর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সেগুলা আ[র] দেওয়া হইল না। পিছনের দিকে বাহিরে পিয়ারী তাহার গা[ড়ী] হাজির করিয়াছে। কিশোরের ভাঙ্গা স্যুটকেশ ও গুটানো বিছানা[টা] সে এই একটু আগে লইয়া গিয়াছে। রিক্ত ঘরখানায় শুধু সে চু[প] করিয়া বসিয়াছিল।

কিশোর আর একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণপক্ষে শেষ প্রহরের চাঁদ উঠিতে আর বিলম্ব নাই। সারা গ্রামখানা সম[স্ত] দিনব্যাপী অবিশ্রান্ত কলরবের পর একেবারে নিঝুম হইয়া গিয়াছে অন্ধকারের বুকে প্রেতাত্মার মত ঐ বৃহৎ বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তাহা[র] মনে হইল, ইহারই এক সুসজ্জিত কক্ষে কোন্ এক অজ্ঞাত রূপবা[ন] যুবকের বাহু আলিঙ্গনে ভারতী হয়তো অগাধ শান্তিতে নিদ্রিতা একটা নিশ্বাস সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না! আর[ও] কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল—বাহিরে পিয়ারী[র] বাঁধাছাঁদা তখনও শেষ হয় নাই।

আলো নিবাইয়া কিশোর অন্ধকার ঘরে খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল পিয়ারীর হইলেই সে বাহির হইয়া আসিবে!

পিছনে মাথার দিককার জানালাটা একবার নড়িয়া উঠিতে [সে] ফিরিয়া চাহিল। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। কহিল,—কে?

অন্তরাল হইতে কে বলিল,—ছোট মাস্টার!

কিশোর চমকিয়া উঠিল।—কে? ভারতী?

—হ্যাঁ। এখানে একবারটি আসুন তো!

পিছনের দিকে ভারতী জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিশো[র] কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমনটা সে আশা করে নাই। তা[ই] অতি অপ্রত্যাশিতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার বুক কাঁপি[তে] লাগিল, গলা শুকাইয়া আসিল। কহিল,—এত রাত্রে তুমি কেম[ন] করে এলে ভারতী?

ভারতী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিশোর চশমা খুলিয়া চো[খ] দুইটা ভালো করিয়া মুছিল। কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইতেছি[ল] না, এমনি সময়ে এ ভাবে ভারতী এখানে আসিতে পারে! কৃষ্ণপক্ষে[র] অধিক রাত্রের চাঁদ এইবার উঠি-উঠি করিতেছিল। তাহার অস্প[ষ্ট] আলোয় কিশোর দেখিল, ভারতী অনেকখানি দীর্ঘ হইয়াছে। অঙ্গে নূতন শাড়ীটায় সে যেন আবাল্যের খোলস ছাড়িয়া সহসা নূত[ন] দিনে নূতন বেশে রূপান্তরিত হইয়াছে! কহিল,—একা এসেচ?

—হ্যাঁ।

শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে কিশোর কহিল,—আচ্ছা সাহস তো! এ[ত] রাত্রে এমন করে কি একলা আসতে হয়!

কিন্তু এত কথার সময় ছিল না। স্কুল-প্রাঙ্গণ হইতে পিয়ারী চীৎকার করিয়া ডাকিল—ম্যাষ্টোর মুশায়…

ঘরের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া কিশোর জবাব দিল,—যাই পেয়ারী। তোর হয়ে গেল না কি রে?

সে ভাবিল, মাষ্টার ঘরে আছে। কহিল—গরুকে দু'টো ছানি দিই, আপনি এসো ততক্ষণ।

কিশোর ভারতীর দিকে চাহিল। তাহার অঙ্গে চাঞ্চল্য নাই। বহু দিন পরে আজ এই নির্জ্জন স্তব্ধ গ্রামের প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশের নীচে উভয়ে পাশাপাশি আসিয়াছে। এখনই এ মায়া মিলাইবে মনে করিয়া কিশোরের সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। অমূল্য কয়েকটি মুহূর্ত্ত! কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না। তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আর এক বার পূর্ব্বের ভারতীকে কিশোর খুঁজিতে চাহিল—কিন্তু সে মিলাইয়া গিয়াছে! ভারতী ডাকিল,—মাষ্টার মশাই!

—কি?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া সে কহিল,—আপনি যাবেন ভেবেছিলাম। গেলেন না, তাই—

—কি তাই, ভারতী?

—তাই যাবার আগে একবার প্রণাম করতে এলাম।

—ও। আচ্ছা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।

অল্প পরেই সে বাঁধা বইগুলো আনিয়া ভারতীর হাতে দিল। কহিল,—শুভদিনে তোমাকে দিলাম ভারতী। তুমি পোড়ো।

ভারতী কম্পিত হস্তে সেগুলো লইয়া কিশোরের দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দেখা গেল না—অদূরের আলোয় চশমার কাচ দুইটা একবার চকচক্ করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তেই লেখা কাগজখানার উপর সে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিশোর কহিল,—চাঁদের আলোয় তো পড়া যাবে না ভারতী। বাড়ীতে গিয়ে পোড়ো।

সে কথার জবাব না দিয়া ভারতী ডাকিল,—মাষ্টার মশাই!

—কি ভারতী!

—ও-সব কি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই?

কি ভাবিয়া কিশোর কহিল,—বাড়ী যাচ্ছি। তুমি তো জানো, বহু দিন যাইনি।

—আপনার বাড়ীর কথা কই শুনিনি তো। আপনি তো কোন দিন আমায় বলেননি! ভারতীর কণ্ঠস্বর এবার অনেক মৃদু হইয়া আসিল।

শুষ্ক হাসিয়া কিশোর কহিল,—জন্ম যখন নিয়েছি,—বাড়ী থাকবে বৈ কি ভারতী! কিন্তু এবার তুমি যাও—রাত হয়েছে। কেউ যদি দেখে ফেলে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে।

ভারতী জবাব দিল না। কিশোর কহিল,—যাও, এমন করে আসা তোমার উচিত হয়নি।

ভারতী কহিল,—আপনি আবার আসবেন?

কিশোর ভাবিয়া কহিল,—ঠিক বলতে পারচি না। দেখি।

পিয়ারীর কণ্ঠ শুনা গেল,—কই, আসুন বাবু, ভোর হয়ে গিছে যে।

—যাই বাবা, দাঁড়া। দেখি, আর কিছু পড়ে রইল না কি। বলিয়া ভারতীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কিশোর কহিল, —আর সময় নেই ভারতী, আমি এবার যাই। তুমি বড় দেরীতে এলে। থাক্‌গে—তুমি যাও এবার, রাত শেষ হয়ে এল।

ভারতী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার জন্য ফিরিতেই সহসা কিশোর তাহার পিছনে আসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—ভারতী!

ভারতী দাঁড়াইল, কিন্তু ফিরিল না। কিশোর হোঁচট খাইয়া যেন সামলাইয়া লইল। নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল,—এত রাত্রে একা গিয়ে কাজ নেই। চলো, এটুকু তোমায় এগিয়ে দি। বলিয়া তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহার পিছনে পিছনে স্কুলের পথে আসিয়া পড়িল। পিয়ারী অনতিদূরে লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া বসিয়াছিল, তাহাকে কহিল,—তুই ততক্ষণ আস্তে আস্তে এগো রে। সেক্রেটারী মশাইকে আমি চট করে স্কুলের চাবিটা দিয়ে আসি। তুই চ, ওই মোড়ে তোকে আমি ধরবো।

গ্রামের ধূলি-সমাচ্ছন্ন পথে ভারতীর পিছনে পিছনে কিশোর নামিয়া আসিল। স্তব্ধ স্কুল-গৃহ পড়িয়া রহিল, সম্মুখের ম্লান জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট পথের আভাস যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া সঙ্কেত করিল! ভারতী একটাও কথা বলিল না—যেন অতি ক্লান্ত পদক্ষেপে সে দুর্ব্বলের মত পথ চলিতেছে! হেমন্তের মধ্যে শেষরাত্রির শির্‌শিরে ঠাণ্ডা বাতাস অল্প অল্প বহিতে শুরু করিয়াছে। রাস্তার পাশে ডোবার উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশঝাড়টায় ভাঙ্গা চাঁদের আলো পড়িয়া সে জায়গাটা যেন অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার মোড়ে আসিয়া কিশোর কহিল,—এবার তুমি যাও ভারতী।

ভারতী আসিল, একবার একটু ইতস্ততঃ করিল বোধ হয়,—কিন্তু পরক্ষণেই সে অলস পদে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিশোর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল,—অল্প পরেই গ্রামের পথে সে ম্লান আলোয় মিলিয়া গেল,—আর দেখা গেল না।

পীড়িত চক্ষু ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কিশোর দেখিল, নিকটের তারাগুলাকে নিষ্প্রভ করিয়া চাঁদ গাছের আড়াল ছাড়িয়া মাথার উপর উঁকি দিতেছে। শির্‌শিরে বাতাসের কোন ব্যতিক্রম নাই। চারি দিকে নিদ্রামগ্ন প্রকৃতিও অচঞ্চল! অসীম শূন্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, কয়েক মুহূর্ত্ত একটা মোহ-স্বপ্নের মধ্যে কাটাইয়া এইমাত্র তাহার ঘুম ভাঙ্গিল।

পিছনে গাড়ী লইয়া পিয়ারী আসিয়া পড়িল। কহিল,—কই গেলেননি যে?

—না। ভাবলাম, আর দরকার নেই। হ্যাঁ, কত রাত হল বল্ দেখি? গাড়ীটা ধরাতে পারবি তো রে?

বলদের ল্যাজ মলিয়া পিয়ারী কহিল,—খুব পারবো বাবু, আপনি উঠে এসো।

কিশোর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। স্কুলগৃহ পিছনের বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে রহিয়া গেল।

যাওয়া আসা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অফিসে যাওয়ার কালে মনে হয়,
জীবন হয় না আজই শেষ?
আমারি কপালে লেখা যত কী
খিঁচুনী ক্ষতি ও গ্লানি ক্লেশ!

বাড়ীতে আসার কালে ভুলি সব—
তখন কোথায় যায় শোচনা!
এমনি মায়ার সেথা কলরব—
আঁধারও সেথায় লাগে জ্যোছনা!

প্রথম অধ্যায়

৬

মূল :—'হে দৈত্যগণ! তোমাদিগের শোকের (দৈন্যের বা ক্রোধের) (কোন) প্রয়োজন নাই। হে অনঘগণ! বিষাদ ত্যাগ কর'।

আপনাদিগের ও দেবতাদিগের শুভাশুভ-বিকল্পক—॥১০৫॥

কর্ম্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্যবেদ মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।

সঙ্কেত :—১০৫। অভিনব বলিয়াছেন যে, দৈত্যগণের পক্ষে এইরূপ মন্যুর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা উচিত নহে—ইহা রজ্জুতে মিথ্যাজ্ঞান-দ্বারা আরোপিত সর্প হইতে উৎপন্ন ভয়ের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র-জনিত। মন্যু—ক্রোধ ও দৈন্য—এস্থলে উভয় অর্থই যুগপৎ প্রযোজ্য।

দৈত্যগণের অশুভকারিতা লোকপ্রসিদ্ধ—অতএব তাহারা পরাজিত হউক, আর দেবগণের পক্ষে উহার অন্যথা (অর্থাৎ জয়) হউক—ইহাই নাট্যের মুখ্য তাৎপর্য্য নহে (১)। অর্থাৎ দৈত্যগণ অশুভকারী বলিয়াই তাহাদের পরাজয় নাট্যে প্রদর্শনীয়। আর দেবগণ তদ্বিপরীত (অর্থাৎ শুভকারী) বলিয়া তাঁহাদিগের জয় নাট্যে প্রদর্শন করিতে. হইবে—এইরূপ কোন নিগূঢ় পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান নাট্য-রচনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ, যদি তাহা হইত, তাহা হইলেও না হয় দৈত্যগণের মন্যু উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা হইলে নাট্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, শুভকারী শুভফল ভোগ করে ও অশুভকারী অশুভফল ভোগ করে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম—আর ইহাই নাট্যে প্রদর্শনীয় তাৎপর্য্য। এ কারণে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে—নাট্যমধ্যে দেবতা বা দৈত্য—যে কোন সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে অযথা পক্ষপাত অথবা বিপক্ষে অযথা বিদ্বেষ নাই। অতএব দৈত্যগণেরও ধর্ম্মাদির প্রতি যে সৎপ্রবৃত্তি কখন কখন দেখা যায়, তাহা তাঁহাদিগের শুভকর্ম্মেরই বিপাক (পরিণাম-ফল) বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভবতাং দেবতানাং তু শুভাশুভ-বিকল্পক—পাঠান্তর—ভবতাং দেবতানাং চ··· (কাশী)—এই পাঠটিই ভাল বলিয়া উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ভবতাং—আপনাদিগের। শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধে তোমরা বিষাদ ত্যাগ কর—বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—আপনাদিগের ও দেবগণের—। 'তোমরা' ও 'আপনাদিগের'—আপাততঃ একটু অসঙ্গত হইলেও যখন ভাবা যায় যে, ব্রহ্মা দৈত্যগণকে সামবাক্য-প্রয়োগে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন আর এ অসঙ্গতি দোষের বলিয়া মনে হয় না। এই অংশটুকুর অন্বয় হইবে—"আপনাদিগের শুভাশুভবিকল্পক ও দেবগণের শুভাশুভ-বিকল্পক"।

ভবতাং—আপনাদিগের—দৈত্যগণের প্রতি এ সম্বোধন। দেখা যাইতেছে যে, নাট্যবেদ দৈত্যগণেরও শুভকল্পক—আবার অশুভকল্পক ত বটেই। পক্ষান্তরে, ইহা (নাট্যবেদ) দেবগণের যেমন শুভকল্পক তেমনই অশুভকল্পকও নিশ্চয়ই।

প্রথমেই 'ভবতাং' (আপনাদিগের) বলিয়া দৈত্যগণের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদিগেরও সহিত শুভের সম্বন্ধ স্থাপন করায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মার কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত নাই; কারণ, তাঁহার সৃষ্ট নাট্যবেদ যেমন দৈত্যগণের শুভবিধায়ক, তেমনই দেবগণেরও অশুভ-বিধায়ক হইতে পারে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)।

শুভাশুভবিকল্পক—শুভ ধর্ম্ম; অশুভ অধর্ম্ম। শুভ বা ধর্ম্মের ফল সুখ ও অশুভ বা অধর্ম্মের ফল দুঃখ। নাট্যবেদ সুখদুঃখফলক শুভাশুভ (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম) বিভিন্নরূপে কল্পিত করে; অর্থাৎ নাট্যবেদে বিচিত্র ভাবে শুভ ও অশুভের স্বরূপ ও উহাদিগের সুখ ও দুঃখ ফল প্রদর্শিত হইয়া থাকে ("শুভমশুভঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং সুখদুঃখফলত্বেন বিভেদেন কল্পয়ত্যধ্যবসায়য়তি নাট্যবেদঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)।

১০৬। কর্ম্মভাবান্বয়াপেক্ষী···পেক্ষো (কাশী)। কর্ম্ম—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধর্ম্ম—দান, গঙ্গাদিতীর্থে স্নান ইত্যাদি। অধর্ম্ম—হিংসা, চৌর্য্য ইত্যাদি। ভাব—আশয়, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি (স্বার্থতা, পরার্থতা ইত্যাদি)। অন্বয়—বংশ, অভিজন (উচ্চবংশে জন্মের গৌরব)—যথা আর্য্যাবর্ত্ত নিবাস, ব্রাহ্মণবংশ ইত্যাদি। কর্ম্ম ভাব অন্বয়—এই তিনকে যাহা সহকারিরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ—কর্ম্ম-অভিপ্রায়-বংশগৌরব-সাপেক্ষ এই নাট্যবেদ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও মনে করা উচিত হইবে না যে, নাট্যবেদে কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল-সম্বন্ধই উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ—এই দেশে এই কালে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া যে ব্যক্তি শুভ (ধর্ম্ম) বা অশুভ (অধর্ম্ম) অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনি এইরূপ ফলভোগী হন—এরূপ উপদেশ নাট্যবেদে প্রদত্ত হয় না—উহা ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিষয়ভূত (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)। নাট্যবেদে যদি কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তবে তাহা উক্ত প্রকারে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হয় না—গৌণভাবে—অবান্তররূপে সূচিত হইয়া থাকে মাত্র—ইহাই অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য।

মূল :—ইহাতে একান্তভাবে আপনাদিগের ও দেবতাগণের অনুভাবন নাই। ১০৬।

নাট্য এই সমগ্র ত্রৈলোক্যের ভাবানুকীর্ত্তন।

সঙ্কেত :—এখন দৈত্যগণের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যদি নাট্যে কর্ম্ম-ফলের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান নাট্য-প্রয়োগের অবসরে দৈত্যগণের পিছনেই বা লাগা হইল কেন ("ননু চৈবমপাস্মৎপৃষ্ঠে কিমেতদ্ যোজিতম্")? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—কৈ না, দৈত্যগণের পশ্চাতে কেহ ত লাগে নাই। দৈত্য ও দেবগণ বাস্তবতঃ যে ভাবে স্বস্থ অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই ভাবেই থাকুন, নাট্য তাঁহাদিগের কাহারও পশ্চাতে লাগিবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয় নাই (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৬)।

ইহাতে—নাট্যবেদে; একান্তভাবে দেবাসুরগণের অনুভাবন নাই—কোন প্রকারেই দেবাসুরগণ নাট্যবেদে অনুভাবিত হন না ("নৈব তেঽনুভাব্যন্তে কেনচিৎ প্রকারেণ")।

অনুভাবন—অনু অর্থে পশ্চাৎ; ভাবন অর্থে—উৎপাদন। ভূ ণিচ্‌, ল্যুট বা অনট্‌; ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা উৎপত্তি। অনুভাবন অর্থে একটি আদর্শ দর্শনানন্তর তদনুরূপ আর একটির সৃষ্টি বা অনুকরণ। এক কথায় অনুভাবন—অনুকরণাত্মিকা সৃষ্টি। নাট্যে

১ অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৫, পঙ্‌ক্তি ৫-৬—পাঠ অশুদ্ধ—কোনরূপ আক্ষরিক অর্থবোধ হয় না—বরং পাদটীকায় যে পাঠান্তর আছে—উহার কথঞ্চিৎ অর্থবোধ হইতে পারে।

কি দেবতা—কি দৈত্য—কোন সম্প্রদায়েরই অবিকল অনুকরণ নাই। কেন নাই—সে সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত অতি গভীর ও সুবিস্তৃত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। উহা বর্ত্তমানে অনুবাদের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর হইলেও অতি সংক্ষেপে উহার সার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। নাট্যে গ্রথিত দেবাসুর-চরিত ও যথার্থ দেবাসুর-গণের চরিত—এতদুভয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক ঐক্য নাই—যমজাত সন্তান-দ্বয়ের ন্যায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও নাই—শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় নাট্যোক্ত চরিতে জীবিত চরিতের ভ্রমও হয় না, নাট্যোক্ত চরিত জীবিতের চিত্র বা প্রতিকৃতি নহে, নাট্যোক্ত চরিত ইন্দ্রজালের ন্যায় তৎকালীন সৃষ্টি নয়;—এই প্রকারে অভিনব অনেক দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে—নাট্য জীবনের হুবহু নকল বা অনুকরণ নহে। কারণ, পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তৎ তৎ স্থলে দ্রষ্টা উদাসীন থাকেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, নাট্যের প্রাণ রসাস্বাদন। যদি কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়টি বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আর কবি যদি উহার চতুঃসীমার বাহিরে বিচরণের সুযোগ না পান, তাহা হইলে যথার্থ কাব্যেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব, যথার্থ রসপোষ-কর দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করিতে হইলে ব্যাবহারিক জগতে দৃশ্যমান চরিত্র বা বস্তুর হুবহু নকল (অনুভাবন) করা চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে, নাট্য অখিল ত্রিভুবনের ভাবানুকীর্ত্তন-স্বরূপ (অ: ভা:, পৃ: ৩৬)। দেবানাং চানুভাবনম্ (বরোদা); দেবানাং চাত্র ভাবনম্ (কাশী)।

এই প্রসঙ্গেও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যে বিরাট ও সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

ভাবানুকীর্ত্তন—ভাবসমূহের অনুকীর্ত্তন। অভিনব বলিয়াছেন—অনুব্যবসায়াত্মক কীর্ত্তনই নাট্য—উহা অনুকরণাত্মক নহে (তস্মাদনুব্যবসায়াত্মকং কীর্ত্তনং···নাট্যং নত্বনুকরণরূপম্"—অ: ভা: পৃ: ৩৮)। অনুব্যবসায়—ইহা নৈয়ায়িকের পারিভাষিক 'অনুব্যবসায়' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন (২)। অনু—পশ্চাৎ; ব্যবসায়—দৃঢ়চেষ্টা, অনুষ্ঠান, effort, performance, অনুব্যবসায়—অভিনব রূপদান, নবরূপে প্রকাশন—reproduction, representation, reconstruction reorientation, (যথা, মানবমূর্ত্তি দেখিয়া তৈলচিত্রাঙ্কন)। অনুকরণ—হুবহু নকল (যথা আলোকচিত্র দ্বারা জীবিতের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ)। অনুব্যবসায়ে শিল্পীর কিছু মৌলিকতার কৃতিত্ব থাকে—সে মৌলিকতার প্রকাশ রসসৃষ্টি ও রস-পরিপোষে। আর অনুকরণের মধ্যে এ কৃতিত্বের অভাব থাকে—প্রকাশ পায় কেবল যান্ত্রিক গতানুগতিকতা। নাট্য জীবনের অনুব্যবসায়, আর চলচ্চিত্র উহার অনুকরণ-মাত্র।

মূল:—কোন স্থলে ধর্ম্ম, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও অর্থ, কোথাও শম ।১০৭।

কোথাও হাস্য, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও কাম, কোথাও বধ।

সঙ্কেত:—তাহা হইলে তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে এই যে—ত্রৈলোক্যের যে সকল ভাব, নাট্য তাহাদিগেরই অনুকীর্ত্তন। এখন একটি আশঙ্কা—এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র দৃশ্যকাব্যে—এমন কি একটিমাত্র অঙ্কেই সকল ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ ত তাহা দৃষ্ট হয় না; কেন?—এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ মূলে বলা হইয়াছে—যদিও ত্রৈলোক্যের সকল ভাবের অনুকীর্ত্তনস্বরূপ নাট্য, তথাপি যে কোন নাট্য রচনার যে কোন অঙ্কেই সকল ভাবের একত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, কোথাও (ক্বচিৎ) ধর্ম্ম, কোথাও বা ক্রীড়া ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ—যে কোন একখানি দৃশ্যকাব্যে বা যে কোন দৃশ্যকাব্যের যে কোন একটি অঙ্কেই একত্র সর্ব্বভাব-সন্নিবেশ দেখা যায় না। দৃশ্যকাব্য-ভেদে ও উহাদিগের অঙ্ক-ভেদে বিভিন্ন ভাব-সমাবেশ হইয়া থাকে—কোন নাট্যরচনায় বা কোন দৃশ্যকাব্যের কোন অঙ্কে কোন বিশিষ্ট ভাবের স্ফুরণ দৃষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—এই ভাবগুলি কি কি? তাহার উত্তরদান-প্রসঙ্গে মূলে বলা হইয়াছে—ভাবগুলির কথা ১০৭ ও ১০৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্ম, ক্রীড়া, অর্থ, শম, হাস্য, যুদ্ধ, কাম, বধ। কিন্তু ধর্ম্ম-ক্রীড়াদি ত ভাব বলিয়া অন্যত্র কুত্রাপি পরিগণিত হয় নাই। মহর্ষি ভরত নাট্য-শাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ভাবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ভাব বলিতে বুঝায়—স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব, সাত্ত্বিক ভাব ইত্যাদি (৩)। ধর্ম্ম-ক্রীড়াদি এই সকল ভাবের কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহে। এ কারণে অভিনব বলিয়াছেন যে—এই স্থলে যে ধর্ম্ম-ক্রীড়াদি শব্দের ভাব-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে শব্দগুলি যথাযোগ্যভাবে স্বোচিত স্থায়ি-ব্যভিচারিভাবাদির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব, ধর্ম্ম ও অর্থ শব্দ—উৎসাহাদি ভাবের সূচক, ক্রীড়া—বিস্ময়াদির, শম—নির্ব্বেদাদির, হাস্য—হাসাদির, যুদ্ধ—রৌদ্রাদির, কাম—রত্যাদির ও বধ—ক্রোধ ভয়-জুগুপ্সা-শোকাদির সূচনা করিতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। আদি-পদের দ্বারা স্বোচিত বিভাব-অনুভাব ব্যভিচারি-সাত্ত্বিক-ভাবাদির সূচনা। যথা, কাম বলিতে বুঝাইতেছে—রতি স্থায়িভাব ও তদনুকূল বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সাত্ত্বিক ভাবসমূহ (অ: ভা:, পৃ: ৩৯)।

ক্বচিৎ ধর্ম্ম: (বরোদা)—পাঠান্তর—ক্বচিদ্ধর্ম্ম:, ক্বচিদ্দন্দ্ব: (কাশী)।

ক্বচিৎ—কোথাও, কোনও স্থলে—দশ-রূপকের অন্যতম কোন রূপকে। রূপক বলিলে বুঝায়, দৃশ্যকাব্য বা নাট্যরচনা। নাট্যশাস্ত্র মতে রূপক দশবিধ—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও ব্যায়োগ (৪)। এই দশবিধ রূপকের মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর রূপকে কোন একটি বিশিষ্ট ভাব (ও রস) প্রধান। অতএব ক্বচিৎ—কোথাও বলিলে বুঝায়

২ বিষয় যে প্রত্যক্ষ—তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার নাম অনুব্যবসায়; যথা—ঘট-প্রত্যক্ষানন্তর—'আমি ঘট জানি'—এবম্প্রকার মানস জ্ঞান, ন্যায়-শাস্ত্রে 'অনুব্যবসায়' নামে কথিত হয়।

(৩) ভাবাধ্যায়ের পরিচয় মাসিক বসুমতীর পাঠকবর্গের পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত। অগ্রহায়ণ ১৩৫০ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ পর্য্যন্ত নাট্যশাস্ত্রের ভাবাধ্যায়ের ধারাবাহিক ভাষান্তর মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিভাবানুভাবাদির বিবরণ সেই প্রবন্ধগুলিতে দ্রষ্টব্য।

(৪) নাটক-প্রকরণাদি দশরূপকের বিস্তৃত লক্ষণাদি দিয়া অর্থবা অনুবাদাংশ ভারগ্রস্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কাশী সং নাট্য-শাস্ত্রের বিংশ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে উক্ত অধ্যায়ের ভাষান্তর প্রদত্ত হইবে।

কোনও এক বিশিষ্ট শ্রেণীর রূপকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নাটক-শ্রেণীর রূপকে বা দৃশ্যকাব্যে সাধারণতঃ ধর্ম্ম (উৎসাহাদি) প্রধান আবার প্রকরণ জাতীয় রূপকে অর্থই প্রধান। পক্ষান্তরে, ভাণ-শ্রেণীর রূপকে ক্রীড়া প্রধান। আবার 'ক্বচিৎ' বলিলে ইহাও বুঝাইতে পারে যে—কোন বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত রূপকের অন্তর্গত কোনও একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থে; দৃষ্টান্ত—নাটক-শ্রেণীর রূপকগুলির মধ্যেও কোন একখানি নাটকে হয় ত ধর্ম্ম প্রধান (যথা—'ছলিতরাম' নাটকে রামের অশ্বমেধ-যাগ-বিবরণ)। আবার কোন আর একখানি নাটকে বা ক্রীড়া প্রধান (যথা—স্বপ্নবাসবদত্তায়)। এইরূপ একই জাতীয় রূপকের বিভিন্ন দৃষ্টান্তে বিভিন্ন ভাবের প্রাধান্য দেখান যাইতে পারে। পুনশ্চ 'ক্বচিৎ' বলিলে ইহাও বুঝাইতে পারে—কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর রূপকের অন্তর্গত কোন একটি বিশিষ্ট গ্রন্থের কোন এক বিশিষ্ট অঙ্কে বা অঙ্কাংশে; যথা—অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দ্বিতীয় অঙ্কের সেই স্থলে ধর্ম্মের প্রাধান্য, যথায় দুষ্মন্ত বলিতেছেন—এমনও ত সম্ভব যে এই কন্যা কুলপতি কণ্বের অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাতা হইতে পারেন। এইরূপে দৃশ্যকাব্য শ্রেণী-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থবিশেষের অংশ-বিশেষে ধর্ম্ম, আবার অপর কোন এক অংশে ক্রীড়া, অন্য এক দেশে কাম ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবের সূচনা এই হেতু অসম্ভব নহে। (অ: ভা:, পৃ: ৩৯)।

• [দ্রষ্টব্য :—বরোদা-সংস্করণে—"নৈকান্ততোঽত্র ভবতাং দেবানাং চানুভাবনম্" শ্লোকটির সংখ্যা ১০৬; উহার পর "ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া ইত্যাদি শ্লোকটিও ১০৬ বলিয়া ছাপা হইয়াছে। উহার পর "কচিদ্ধাস্যং···কামঃ কামোপসেবিনাম্" ইত্যাদি শ্লোকটির সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১০৯। এগুলি স্পষ্টতঃই ছাপার ভুল। অনুবাদে সংখ্যাগুলি ঠিক করিয়া দেওয়া হইল।]

মূল:—ধর্ম্মে প্রবৃত্তগণের ধর্ম্ম, কামসেবিগণের কাম ॥১০৮॥

দুর্ব্বিনীতগণের নিগ্রহ, বিনীতগণের দমক্রিয়া; ক্লীবগণের ধৃষ্টতা-জনন, শূরাভিমানিগণের উৎসাহ ॥১০৯॥

অবুধগণের বিবোধ, বিদ্বদ্বর্গেরও বৈদুষ্য, ঈশ্বরগণের বিলাস ও দুঃখার্দ্দিত জনের স্থৈর্য্য ॥১১০॥

অর্থোপজীবিগণের অর্থ, উদ্বিগ্ন-চিত্তগণের ধৃতি (উক্ত হইয়াছে)।

সঙ্কেত :—এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—নাট্যে অবস্থা-দেশ-কাল প্রভৃতি বিশেষানুসারে যথোচিত ভাবানুকীর্ত্তন মাত্র কর্ত্তব্য—রাম-রাবণাদির চরিত্রাশ্রয় করার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ—নাট্যে কেবল এই কথাগুলি বলিলেই চলে যে—এইরূপ অবস্থা-ভেদে—এই প্রকার দেশ-ভেদে—এইরূপ কাল-ভেদে ও এইরূপ প্রকৃতি-ভেদে এই এই বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবের সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। উক্ত প্রকার নির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষরূপে সরল ভাষায় দিলেই যখন চলিতে পারে, তখন সেই সরল পথ অনুসরণের পরিবর্ত্তে নাট্যে রাম-রাবণাদি নায়ক প্রতিনায়ক ইত্যাদির চরিত্র-চিত্রণ-পূর্ব্বক পরোক্ষভাবে ধর্ম্মাদিভাবের উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? রাম-রাবণাদির চরিত্র বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক নাট্যদর্শকগণ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই ত উপনীত হন যে—রামের মত হইতে হয়, রাবণের মত নহে। অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়া থাকে—ইহাই নাটকের মূল শিক্ষা। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, রসের উদ্বোধ—ইত্যাদি নানা জটিল ব্যাপারের মধ্য দিয়া এই ভাবটির পরোক্ষ সূচনা না করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত ভাবটির প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ত সকল ঘোর-প্যাঁচের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে নাট্যে সেই সরল পথ অনুসৃত হয় না কেন?—

ইহার উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে—লোকবৃত্তানুসারে (অর্থাৎ লোকে যেমন যেমন ঘটে, তদনুরূপ) প্রয়োগ-করণই নাট্য। ব্রহ্মা এই কথাই দৈত্যগণকে বলিতেছেন, যেহেতু, লোকবৃত্তানুযায়ী প্রয়োগরূপ নাট্যের সৃষ্টি আমি করিয়াছি, অতএব যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত (যথা—শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি) তাঁহাদিগেরই চরিত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে নাট্যে ধর্ম্ম-ভাব উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ abstract গুণগুলি মাত্র নাট্যে নির্দ্দিষ্ট বা বিবৃত হয় নাই—পক্ষান্তরে; concrete চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই abstract ভাবগুলির প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার কারণ, নাট্য-জীবনের জীবন্ত অনুকীর্ত্তন—গতানুগতিক বা যান্ত্রিক অনুকরণ মাত্র নহে—অথবা নিছক হিতোপদেশও নহে [অ: ভা:, পৃ: ৪০]।

ধর্ম্ম, কাম, নিগ্রহ, দম ক্রিয়া, ধার্ষ্ট্যজনন, উৎসাহ, বিবোধ, বৈদুষ্য, বিলাস, স্থৈর্য্য, অর্থ, ধৃতি ইত্যাদি ভাবগুলি—কর্ত্তৃপদ; ক্রিয়া—উক্ত হইয়াছে—উহ্য। এইরূপে অভিনব অন্বয় করিয়াছেন।

১০৮। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম-শব্দ-দ্বারা সূচিত ভাবসমূহ—উৎসাহাদি। কাম—রত্যাদি ভাব।

১০৯। নিগ্রহ—বধ। বিনীত—জিতেন্দ্রিয়। অভিনব বলিতেছেন—বিনয় ইন্দ্রিয়জয়ের পর্য্যায়। ভগবান্ মনুও ঐরূপ অর্থ—করিয়াছেন। দমক্রিয়া—অভিনব 'শম' ও 'দম' দুই প্রকার পাঠই ধরিয়াছেন। শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। দম—বাহ্যেন্দ্রিয় দশটির সংযম। দমক্রিয়া—দমের ক্রিয়া অর্থাৎ যোজনা। বিনীত-গণের দমক্রিয়া—জিতেন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়, সংযমে চিত্তযোজনা—এইরূপ অন্বয়। ক্লীবগণের ধৃষ্টতাজনক—(মূল—ধার্ষ্ট্যজননং—ধার্ষ্ট্যকরণং—কাশীর পাঠ)—অভিনব বলিতেছেন, এ স্থলে বিভাবের উক্তিদ্বারা হাস-স্থায়িভাবের সূচনা করা হইয়াছে। ধার্ষ্ট্যজননং—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস—ধার্ষ্ট্য হইতে জনন (অর্থাৎ জন্ম) যাহার—যে হাস-স্থায়িভাবের।

১১০। অবুধ—অপণ্ডিত, মূর্খ, নির্ব্বোধ।

বিবোধ—ণিজন্ত পদ—বোধ বা ব্যুৎপত্তি জন্মাইয়া দেওয়া—বিবোধন—এইরূপ অর্থ। যাহারা অপণ্ডিত বলিয়া লোকে অপরিজ্ঞাত, তাহাদিগের নানা রূপ উপায়-উপদেশ-দ্বারা বুদ্ধি (বোধ) জন্মাইয়া দেওয়া।

বৈদুষ্য—পাঠান্তর বৈদগ্ধ্য। যাঁহারা স্বয়ং বিদ্বান্, তাঁহাদিগের আবার বৈদুষ্য জন্মান যায় কি প্রকারে? উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—বিদ্বান্ যাঁহারা, তাঁহারাও উপায়-জ্ঞানের অভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অতএব, ভীষ্মাদির ন্যায় বিদ্বদ্বৃন্দেরও উপায়-শিক্ষা দেয় এই নাট্য। আবার হয়ত কোন একটা বিষয় বিদ্বানের জানা আছে, কিন্তু তাৎকালিক বিস্মৃতির ফলে তিনি কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে নাট্য তাঁহার স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া দেয়। ফলে তিনি নাট্যদর্শন-কালে পূর্ব্বপরিজ্ঞাত অথচ সাময়িক বিস্মৃত অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান-পূর্ব্বক নিজ পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিতে পারেন—"বিদুষাং ভীষ্মাদীনামুপায়ব্যুৎপাদনেন বৈদুষ্যম্। অনেন স্মৃতিমতিপ্রভৃতীনাং নিরূপণম্" (অ: ভা: পৃ: ৪০)।

বিলাস—ক্রীড়া। ঈশ্বর—প্রভু-স্থানীয় ব্যক্তি। স্থৈর্য্য—দৃঢ় অধ্যবসায়-রূপ উৎসাহ। পাঠান্তর—ধৈর্য্য। দুঃখার্দ্দিত—দুঃখপীড়িত দুঃখার্ত্ত বলিয়া লোকে যে ব্যক্তি পরিজ্ঞাত, তাহার সম্বন্ধে দৃঢ় অধ্যবসায় বা উৎসাহের উদ্রেক-করণ।

১১১। ধৃতি—ধৈর্য্য। পাঠান্তর—বৃত্তি (কাশী)।

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর

বৃদ্ধ সৈনিক

(নিকোলে টিকনফের লেখা সোভিয়েট গল্প)

বয়সে খুব বৃদ্ধ—দু' চোখে ঝাপসা দেখে! সব যেন কেমন ... ছায়ায় ঢাকা।

খোলা জানলাগুলোর সামনে সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, বৃদ্ধ এসে তাদের পাশে দাঁড়ালো। বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। তখন সকলকে ডেকে বৃদ্ধ বললে,—ওখানে কি হচ্ছে? কি তোমরা দেখছো? আমাকে বলো তো!

এক জন বললে,—ওখানে অনেক দূরে সহরের বুক থেকে উঠছে শুধু ঘন ধোঁয়া। সাদা ধোঁয়া! যেন রাশ-রাশ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে! অস্ত-সূর্য্যের লাল আলো পড়েছে সে ধোঁয়ার গায়ে—তাতে দেখাচ্ছে যেন গোলাপী পাড় বোনা! ধোঁয়ার রঙ এবারে দেখছি নীল! এত উঁচুতে ধোঁয়া উঠছে, মনে হচ্ছে, ধোঁয়া গিয়ে যেন আকাশ ছোঁবে!

বৃদ্ধ বললে—কিসের আগুন ও? জার্ম্মানরা সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে?

—হাঁ।

এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফট কামানগুলো এখনো গর্জ্জন করছে তবে থেকে থেকে—যেন ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে! বৃদ্ধ এক দিন কত গভীর রাত্রি ধরে ম্যাপ খুলে সেই ম্যাপের উপর দু' চোখের সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকতো! চোখে ঘুম নেই…মুখে অন্ন নেই…সেই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত!

বৃদ্ধ ছিল মিলিটারী শিক্ষালয়ে। ভূগোল পড়াতো। তাছাড়া কত কি আবিষ্কার করেছে। রাশীকৃত ম্যাপ নিয়ে ছিল বৃদ্ধের যা কিছু কাজ…দেশের কোথায় কি…কটা পাহাড়…কোন্ পাহাড়ের গা ফাটিয়ে কোন্ নদী-নালা ঝরে পড়ছে…সে নদী কোন্ পথ ধরে কোন কোন গ্রাম-নগর ছুঁয়ে কোন্ মাটিকে উর্ব্বর করে বয়ে চলেছে…কোথায় বন, কোথায় কোন্ গ্রাম…এ সব খবর বৃদ্ধের নখদর্পণে। নক্সায় চোখ মেলে বৃদ্ধ দেখতো কালির এই অসংখ্য লেখা-জোখার অন্তরালে সবুজ ফশলে ভরা দেশমাতৃকার শ্যামল অঞ্চল—দেশের বুকে সাহসী বীর লক্ষ লক্ষ সন্তান! সকলের মিলিত সাধনায় মাতৃভুমি ঐশ্বর্য্য-সম্পদে কি রকম বিভূষিত হয়ে উঠছে! বৃদ্ধ দেখতো, ম্যাপের চেহারা বছরে-বছরে বদলে চলেছে! এখন?

লেনিনগ্রাড আর তার আশ-পাশের ম্যাপ দেখতে দেখতে বৃদ্ধের ললাট কুঞ্চিত হয়…চোখের সামনে যেন কালো পর্দ্দা নেমে আসে!

পুশকিন্ পার্কের চারি ধারের পথ জুড়ে জার্ম্মানরা কুচ-কাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। ওদের শেল-বর্ষণে গাটশিনার প্রাসাদ কেঁপে কেঁপে উঠছে—পিটারহলের হয়েছে পতন—মেশিন গানের হুঙ্কার-রব এখন কোলপিনো থেকে শোনা যায়!

বৃদ্ধ বলে উঠলো—না, না! এ অসম্ভব! এ হতে পারে না। জার্ম্মানরা ঢুকবে লেনিনগ্রাডে…যে-লেনিনগ্রাড কখনো শত্রুর সামনে মাথা নোয়ায়নি! না, বিশ্বাস হয় না! এ আমার চিন্তার অতীত। লেনিনগ্রাড কখনো বেদখল হয়নি…কখনো না। আমাদের জন্যই কি লাঞ্ছনার যত কালি জমা ছিল!

লেপখানা ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে উন্মাদের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো।…

—তাছাড়া নিজেকে সঁপে দেবে কার হাতে? জার্ম্মানদের? ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া…বুনো পশু…দানব…রক্তপিপাসু জল্লাদ—ওদের হাতে? নারী আর শিশুদের হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপে না! সব দুর্বৃত্ত ফাশিস্ত…না…না! বৃদ্ধের মনে যেন বাজ ডাকছে! বৃদ্ধ বলতে লাগলো,—জার্ম্মান সেনাপতিগুলো তো পুতুল! নিজেদের দেশ ও-হাতে শাসন করতে পারে—তা বলে যুদ্ধ? যুদ্ধের ওরা জানে কি!

পায়চারির বিরাম নেই…তার পর আবার বললো—যুদ্ধ করতে ওরা জানে…যাকে বলে সত্যিকারের যুদ্ধ? ওরা জুয়াড়ি,…ওরা চুরি করতে জানে…ডাকাতি করতে জানে। ডাকাত! এবার কিন্তু ও-চালে কিছু করতে পারবে না। আমরা অন্ধ নই! মূর্খ নই! ভয় কাকে বলে, রাশিয়ান-জাত তা জানে না। আমাদের সঙ্গে ধাপ্পা চলবে না।…লেনিনগ্রাড তোমরা পাবে না বাপু!

শ্রান্ত পায়ে বৃদ্ধ এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো…কিন্তু চোখে ঘুম নেই! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে! বুকের মধ্যেও আগুন! সর্ব্বাঙ্গ আগুনের তাতে যেন ঝলশে রয়েছে! সহরের চার দিক্ জুড়ে যুদ্ধ চলেছে…এ-চিন্তা চকীর আগুনের মতো তার মাথায় ঘুরছে!…

চোখ বুজে বৃদ্ধ ভাবতে লাগলো—আগেকার দিনের কথা। যুদ্ধের আগেকার কথা! চারি দিকে কি স্নিগ্ধ শান্তি! বাইশ বছর আগে! সে তখন তরুণ অফিসার…সহরের বুকে পল্লীর বুকে স্নেহ-প্রেমে রচা সব শান্তি-নীড়…নির্বিঘ্ন নিরাপদ আশ্রয়-ভূমি! আজ শত্রুর হিংসার আগুনে সে সব পুড়ে হয়তো ছাই হয়ে গেছে! শত্রুর ট্যাঙ্ক সে-ছাইয়ের উপর দিয়ে তার হিংস্র গতিকে করেছে অবাধ…মুক্ত! যদি তাই হয়ে থাকে?

বৃদ্ধ নিজের দুই হাত প্রসারিত করলো…মুষ্টিবদ্ধ করলো! পেশীতে এখনো শক্তি আছে! জার্ম্মানরা দলে কত? জিজ্ঞাসা করবে না কি, কোথায় ঐ সব জার্ম্মানগুলো? কিন্তু না, মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনে জার্ম্মানরা আসবে কি? অসম্ভব!

সাইরেন বাজলো। আকাশ-বাতাস সে-শব্দে কেঁপে উঠলো। বৃদ্ধ সে-শব্দ শুনে নিরাপদ শেলটারে গেল না! বোমায় সারা বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে! জানলা-দরজাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদ তুলছে। শেলের অসংখ্য টুক্‌রো ছাদের উপরে পড়ছে—যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে! বাড়ীখানা দুলছে যেন দেশলাই-ক্যাঠির তৈরী খেলা-ঘরের মতো! বৃদ্ধ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আক্রোশ-ভরে

বিড়বিড় করে বলছে—পালা, পালা, ওরে শকুনের দল···বুঝছিস্ না, তোদের মাথা এখনি গুঁড়িয়ে যাবে।

যুদ্ধ সমানে চলেছে। লেনিনগ্রাডের বাইরের প্রাচীর ঘেঁষে শত্রুদের ছাউনি।

শীত এসেছে। দুরন্ত শীত। ঘরে-বাইরে যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মিষ্-কালো অন্ধকার। উনুনের মধ্যে ক'খানা ভিজে কাঠ—তাতে কতটুকু বা তাপ মেলে! দিনের পর দিন ধরে এমনি চলেছে···বৃদ্ধের হাড়-পাঁজরাগুলো বার্দ্ধক্যে ক্রমে যেন অবশ শিথিল হয়ে আসছে! একখানা র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ পড়ে আছে তার শয্যায়! নিজের সমস্ত জীবনটুকু চোখের সামনে ভেসে চলেছে নৌকার মতো অলস মন্থর গতিতে!···

জীবন-ভোর কি পরিশ্রমই না সে করেছে! জীবনে কতখানি বৈচিত্র্য ছিল! আজ যে এত দুঃখ দৈন্য দুশ্চিন্তা···এ-সব না থাকলে এখনো কত কাল সুস্থ সবল দেহে বৃদ্ধ কত কাজ না করতো! বার্দ্ধক্যে হাত-পা অবশ হয়েছে! এমন অবশ যে, উনুনের ঐ জ্বালানি কাঠ-ক'খানা চ্যালাতে পারে না। লজ্জা হয়, সামান্য ক'খানা ঐ জ্বালানি কাঠ···নিজের হাতে কাটতে গেলে বৃদ্ধের দু'হাত ক্লান্তিতে ভরে' ভারী হয়ে ওঠে···কাঁধ থেকে হাতের কব্জী পর্য্যন্ত ঝনঝনিয়ে অবশ হয়!

মনে জাগলো এই সমৃদ্ধ, গরিমাময় নগরের কথা। এই লেনিনগ্রাড! তার ঘরের জানলা থেকে দেখা যায় নগরের বিচিত্র সমৃদ্ধি···এর অপূর্ব্ব সম্পদ! আজ এই লেনিনগ্রাড যুদ্ধে বিপন্ন! অথচ সে দুর্ব্বল! ভাগ্যের এ কি নির্ম্মম পরিহাস!

কাছাকাছি কোথায় বোমা ফাটছে···অবিরাম। সে শব্দে দেহ-মন জর্জ্জরিত!

ভাবালুতায় বৃদ্ধের মন যখন আচ্ছন্ন হয়, তখনি সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে সোনার ছোট ঘড়ীটি বার করে নাড়ে-চাড়ে। এ ঘড়িটি পেয়েছে তার সামরিক ভূগোল-শিক্ষকতার পটুতার জন্য। আজ মনের পটে ফুটে উঠতে লাগলো ছবির মতো···বুদ্ধিমান্ তরুণ ছাত্রদের ঠোঁটে জেগে-ওঠা হাসি! ছাত্রদের মধ্যে ক'জন আজ এ যুদ্ধে ফৌজের অধিনায়ক হয়েছে! মনে পড়লো নিজের তরুণ বয়সের কথা। ঘোড়ায় চড়ে ককেশাসের দুর্গম শির উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে নদ-নদী পার হয়ে···বিঘ্ন-বিপত্তির সব বাধা চূর্ণ করে'···দমকা হাওয়ার মতো···তেমনি দুর্জ্জয় বেগে। সে কত কালের কথা···

দেহ এখন দুর্ব্বল···ঝোলের চামচখানা মুখে তুলতে হাত কাঁপে! মেয়ে তাকে খাইয়ে দেয়। খাওয়াবার সময় মেয়ে তাকে বলে যুদ্ধের খবর!

শুনে বৃদ্ধের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। সখেদে বৃদ্ধ বলে ওঠে,—রাশিয়ানরা খালি পিছু হঠছে?···ব্যথা যেন পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে বুকের উপরে চেপে বসে।

প্রতিবেশীরা বলে,—বুড়ো আর বেশী দিন নয়। বোধ হয়, এই শীতেই···

সে দিন ভোরে মেয়ে শুনলো বৃদ্ধের ঘরের মধ্যে অদ্ভুত রকমের শব্দ। ভিতর থেকে ঘরের দরজা ভেজানো। দরজার কাছে এসে কাণ পেতে মেয়ে দাঁড়ালো। শব্দটা···যেন করাত দিয়ে ঘরের মধ্যে কে কাঠ চ্যালা করছে, এমনি! তার পর হাতুড়ি ঠোকার শব্দ! তার পর গান! হাঁ, ঘরের মধ্যে কে গান গাইছে! তাই বটে! গানের ভাষা ঠিক বোঝা গেল না! বাণী আছে কি নেই, কে জানে! শুধু সুরটুকু।

মেয়ে ভাবলো, বাবা? কিন্তু বসিয়ে দিলে বাবা তবে বসতে পারে! র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে অসহায়ের মতো বিছানায় পড়ে থাকে।

মেয়ে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে খুললো। খুলতেই দেখে, ঘরের জানলা খোলা···আর বৃদ্ধ বাপ করাত হাতে একখানা কাঠ চ্যালাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে সুরের নির্ঝর বয়ে চলেছে! মেয়ে দেখলো, বাবার দু'চোখে সে-ঘোলাটে ভাব আর নেই। আশ্চর্য্য! দু'চোখে তারুণ্যের দীপ্তি!

মেয়ে এগিয়ে এলো বাপের কাছে, বললে—কি করছো বাবা করাত নিয়ে? না, না, দাও! মাথা ঘুরে শেষে একটা কাণ্ড করবে!

বৃদ্ধ চাইলো মেয়ের পানে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো,—ওরে না, না, না। আমার আর এতটুকু দুর্ব্বলতা নেই। আজ সকালে রেডিয়োয় খবর শুনেছিস্?

মেয়ে বললো—না। কি খবর?

কাঠখানা পা দিয়ে ঠেলে বৃদ্ধ বললো,—সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এ খবর কারো জানতে বাকী নেই···তুই শুধু জানিস্ না! মস্কোতে জার্ম্মানরা বেজায় প্রহার খেয়ে ধুলো হয়ে গেছে! হতভাগা ডাকাতের দল! যুদ্ধের ওরা কি জানে? ওরা জানে শুধু ডাকাতি আর লুটপাট। ওদের একেবারে ঝেঁটিয়ে বার করে দেছে রাশিয়ানরা! বুঝলি? মস্কোর সীমানায় যদি এই, তাহলে লেনিনগ্রাডের সীমানায় পা বাড়ালে কি আর ওদের চিহ্ন থাকবে? হাঃ হাঃ হাঃ! এ সময় কি কুঁড়ের মতো বিছানায় পড়ে থাকা যায় রে? তুই পারিস্ মা এ খবর শুনে পড়ে থাকতে?

পশু-পক্ষী বন্ধু

যন্ত্রযুগে মানুষ আজ যুদ্ধবিগ্রহের কাজে যন্ত্রপাতিকে একান্ত সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিলেও অবোলা ইতর পশু-পক্ষীর সাহায্য ত্যাগ করিতে

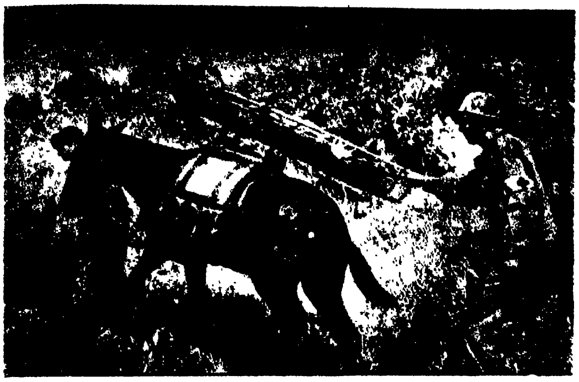


রসদবাহী উট—ভারতে

পারে নাই। মানুষের সুখে-দুঃখে কুকুর যে নানা গুণে বহু মানুষ বন্ধুর চেয়েও হিতকারী, তার বহু পরিচয় তোমাদের দিয়াছি। কুকুর ছাড়া আরো কত পশু-পক্ষী আজ এ যুদ্ধে মানুষের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে

সাহায্য করিতেছে, তাহাকে শক্তিমান্ করিয়াছে, আজ তাহার একটু পরিচয় দিব।

রামায়ণ-মহাভারতে আমরা পড়িয়াছি, 'গজ-বাজি' ছিল রণক্ষেত্রে মানুষের মস্ত বড় সহায়! ঐতিহাসিক যুগের 'চৈতক' জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে! প্রসিদ্ধ বীর হানিবল যে-যুদ্ধে রোমানদের পরাভূত করিয়াছিলেন, সে-যুদ্ধে গাড়ী ঘোড়া ও বলদ ছিল



অশ্বতরের পিঠে আহত—নিউ গিনি

তার প্রধান সহায়। তার পর পৃথিবীতে বহু জাতি কত যুদ্ধ করিয়া গিয়াছে—সে-সব যুদ্ধে ঘোড়া হাতী কুকুর ছাড়া তারা সহায় পাইয়াছিল অশ্বতর, পায়রা এবং উটকে! যুদ্ধজয়ের জন্য কামান বন্দুক তলোয়ার বা প্লেন ও যুদ্ধ-জাহাজের কাছে মানুষ যে-পরিমাণে



কুকুর-বাহিনী স্লেডে মেশিন-গান বহিতেছে

ঋণী—হাতী, ঘোড়া, পায়রা, উট এবং অশ্বতরের কাছেও তেমনি তার ঋণ অল্প নয়!

এ-যুদ্ধে যে-সব কুকুর মানুষের সহায়তা করিতেছে, বুদ্ধি-কৌশলে বা সাহসে তাদের নাম বড় বড় সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত! কালিনিন-সীমান্তে রাশিয়ার রণকুশলী এক দল কুকুর নাৎসী ট্যাঙ্ক-সমূহের সামনে গিয়া বোমা রাখিয়া আসিয়াছিল। তাদের রক্ষিত সেই সব বোমার আঘাতে নাৎসীর গতি রুদ্ধ এবং রাশিয়া বিজয়-লাভে সমর্থ হয়!

চীনা যুদ্ধে জাপান প্রায় তিন লক্ষ ঘোড়া নামাইয়াছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিরাট্ প্যাসিফিক অভিযানে জাপানের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর হাজারের উপর। বিচক্ষণ সমরাধ্যক্ষেরা বলেন, ঝড়ে জলে অন্ধকারে, পঙ্কিল বা পাহাড়ী পথে অস্ত্রশস্ত্র ও সর্ব্ববিধ রশদ-বহনে ঘোড়ার শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা নাই! ফিলিপাইন্‌সে এবং ইতালীর পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে দুর্গমতা-হেতু মোটর-ট্রাক চলিতে পারে নাই। সে দুর্গম পথে ঘোড়াই ছিল একমাত্র বাহন। ফৌজ বহিয়া রশদপত্র বহিয়া ঘোড়া এ যুদ্ধে বিরাট্ ভাবেই মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিয়াছিল। রাশিয়ার কশাক্ অশ্বারোহী ফৌজ আজও শক্তি-সামর্থ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। নদী-নালা পার হইতে খানা-ডোবা বা পাহাড় টপকাইতে তাদের ঘোড়ার আর জুড়ি নাই!

অশ্বতরের মত পরিশ্রমী জীবও আর নাই! পাহাড়-পথ ধরিয়া—তা সে পথ যত দুর্গমই হোক, কামান-বন্দুকের মোট বহিয়া অশ্বতর চলিতে পারে মাইলের পর মাইল অবিরাম অনায়াস গতিতে; সমতল পথে তো কথাই নাই!



পায়রা-দূতের মারফৎ খবর পাঠানো

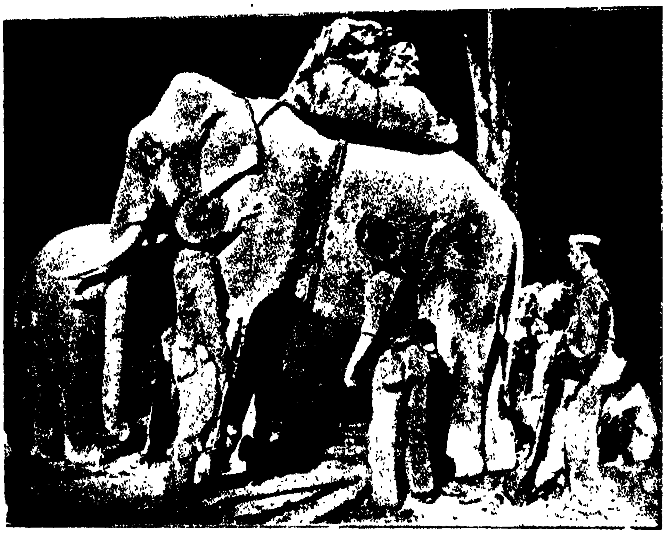
ইতালী-অভিযানে মার্কিন-বাহিনী পাহাড়-পথে রসদপত্র পাঠাইবার জন্য ট্রাক্ ছাড়িয়া অশ্বতর-বাহিনীর ব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে অভীষ্ট লাভ করিতে পারিয়াছে। মার্কিন অশ্বতর-বাহিনীতে মেহি টামেল নামে একটি অশ্বতর আছে। পথে এক জন জার্ম্মান সেনাকে দেখিয়া শত্রু বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাকে সে পায়ের চাট মারিয়া জখম করিতে ছাড়ে নাই। পরে জার্ম্মান-হস্তে মেহি টামেল আহত হয়। মেহি টামেল এখনো বাঁচিয়া মার্কিন গভর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছে।

পারাবত-বাহিনীর কৃতিত্বের কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেনাধ্যক্ষ লর্ড মণ্টবাটেনের অধীনে বহু পারাবত আছে। শিক্ষায় তারা এমন হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া বার্ত্তা বহন করে।

হাতী এবং উটের সাহযোগিতায় এ যুদ্ধে মানুষ বহু শক্তি লাভ করিয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মারোডে রেলপথ ধ্বংস হইলে হাতীর সাহায্যে সে-পথ অত্যল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠিত করা হইয়াছিল। হাতীকে দিয়া এ যুদ্ধে ক্রেন, বুলডোজারের কাজ করানো হইতেছে;

পথে বিপথে—সর্ব্বত্র হাতীকে দিয়া লোহার রেল, কাঠের গুঁড়ি প্রভৃতি বহানো হইতেছে। হাতী ভিন্ন দুর্গম বনপ্রদেশ অতিক্রম করা আর কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না—না মোটর-ট্রাকের, না মানুষের।

মরুর বালুকা-বক্ষে উটের সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ বিমান-ক্ষেত্র রচনা করা হইতেছে। সেখানে পেট্রোল টায়ার প্রভৃতি মিলিবে না,



হাতীর পিঠে ফৌজের লগেজ—ভারতে

কাজেই উটই একমাত্র সহায় ও বন্ধু! উত্তর আফ্রিকা, ব্রহ্ম, ভারত, চীন ও দক্ষিণ-রাশিয়া—এ কয় প্রদেশের বালুকাময় ক্ষেত্রে উটকে দিয়া অস্ত্রশস্ত্র বহানো হইতেছে।

এই সব ইতর পশুর সাহায্য না পাইলে মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির সামর্থ্য যে বহু ক্ষেত্রে পঙ্গু থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৌরুষ

পরবশ্যতার মত দুর্ভাগ্য আর নেই! লেখাপড়া করার জন্য বই খাতা পেন্সিল চাই—সেই খাতা বেঁধে দেবে অপরে—নিজে পেন্সিলটা কেটে নিতে পারবো না—এতে কতখানি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, বলো তো! এই পরবশ্যতার জন্য দায়ী মা-বাপের অত্যধিক আদর, নয় নিজেদের আলস্য-ঔদাস্য।

অনেক মা-বাপ এমন যে, ছোট বয়সে ছেলেমেয়েদের সব কাজের ভার—যেখানে পয়সার জোর আছে, সেখানে চাপিয়ে দেন দাসী-চাকরের উপর; আর যেখানে দাসদাসী রাখবার মত অর্থ-সামর্থ্য নেই, সেখানে নিজেরা ছেলেমেয়েদের কাজ করে দেন। এর ফলে ছেলে-মেয়েরা অলস হয়, কাজকর্ম্মে অপদার্থ হয়ে ওঠে!

বিশ-বাইশ বছরের অনেক কিশোরকে দেখেছি, ফাউণ্টেন পেনে কালি ভরতে পারে না! লিখতে লিখতে পেনের কালি যেই নিঃশেষ হলো, অমনি ডাক পড়লো মায়ের, নয় ছোট ভাইবোনদের, নয় চাকরের—এসে কালি ভরে দিয়ে যাও! দু'হাত দূরে জলের কুঁজো-গেলাস থাকলেও এরা নিজেরা জলটুকু গড়িয়ে নিতে পারে না—আর এক জন লোক এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে হাতে তুলে দেবে জলের গ্লাস!

এমনি ভাবে অপরের উপর নির্ভর করে চলার ফলে মানুষ অপদার্থ হয়—পরে কোনো কাজে নিজেদের উপর এরা নির্ভর রাখতে পারে না! সে জন্য জীবন-সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য্য হয়!

ছোট বয়স থেকে এ অভ্যাস ত্যাগ করে চলবে। খুব এক জন কৃতী ভদ্রলোকের গৃহে দেখেছি—ইনি বিদ্যায়-বুদ্ধিতে এবং ব্যবসায়-কৃতিত্বেও বড়—পয়সা-কড়িও প্রচুর উপার্জ্জন করেন—এঁর গৃহে দেখেছি, ভদ্রলোকের ব্যবস্থা—ছেলে-মেয়েরা স্নান করবার সময় নিজেদের হাতে সাবান-জলে গেঞ্জি কাচবে, কাপড় কাচবে; তার পর সেই কাচা কাপড়-গেঞ্জি শুকোতে দিয়ে তবে খেতে যাবে! খাবার সময় নিজেরা ঠাঁই করে নেবে, জল গড়িয়ে নেবে; তার পর ঠাকুর দিয়ে যাবে পাতে ভাত তরকারী! পড়াশুনার ব্যাপারে বাড়ীতে মাষ্টার মশাই আছেন—ছেলেমেয়েরা ডিক্‌স্‌নারি দেখে শক্ত কথার মানে লেখে—মাষ্টার মশাই পড়া বলে দেন, বুঝিয়ে দেন! জুতা ব্রাশ—তাও ছেলেরা করে নিজের হাতে! ভদ্রলোকের এক আত্মীয় বলেছিলেন,—আপনার সব বাড়াবাড়ি! এতটা না করলেও পারেন! এ কথার উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন,—মানুষের কখন কি অবস্থা হয়, কে জানে! সে জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে! না হলে দুঃখ-কষ্টে পড়লে অপদার্থতার ফলে দুঃখ আরো বেশী হবে!

এ কথা খুব সত্য! তাছাড়া নিজের হাতে যে কাজই করো না কেন, তার আনন্দ আলাদা রকমের। নিজের হাতে কাজ করতে কাজে উৎসাহ মেলে প্রচুর, বুদ্ধিও নানা দিকে বিকশিত হয়।

বাড়ীতে ইলেকট্রিকের তার ফিউজ হলো—কোথায় কখন মিস্ত্রী পাবো—পাবো কি না,—সে সম্বন্ধে অন্ধকারে দুর্ভাবনায় সারা হয়ে কি লাভ? নিজে থেকে হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যাস থাকলে এ কাজটুকু নিজেরাই তো চট্ করে সেরে নিতে পারি। একটি গল্প আছে,—শত্রু এসেছে শুনে কোন্ বাদশা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেন নি। খানসামা কাছে ছিল না বলে জুতো পায়ে পরিয়ে দেবে কে? সেই জন্য! ফলে বাদশা স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য তো হারালেনই, উপরন্তু শত্রুর হাতে বন্দী হলেন!

গল্প হলেও এর মধ্যে যে নীতি-কথা রয়েছে, তার দাম যদি বুঝতে পারো, এবং বুঝে তেমনি ভাবে চলতে পারো, তাহলে জীবনে কোনো কাজে কোনো দিন হঠবার ভয় থাকবে না! কে আমার জামার বোতাম টেঁকে দেবে বলে যদি ঠিক সময়ে কাজে বেরুতে না পারো, তাহলে তোমার পরাজয় কোনো কালে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

তা ছাড়া নিজেদেরও লজ্জা হয় না? এক গেলাস জল যদি নিজে না গড়িয়ে নিতে পারো, তাহলে জীবনে কোন্ কাজে তুমি কৃতিত্ব লাভ করবে? ঠেকো দিয়ে মানুষকে খাড়া রাখা যায় না।

যে-লোক কোনো কাজে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তার শক্তি-সামর্থ্য নিশ্চয় জয়যুক্ত হবে। বাধা-বিপত্তি শুধু সেই লোকই অতিক্রম করতে পারবে, যার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস আছে! কোনো বিপদে সে কখনো দমবে না। এই শক্তিকে বলে পৌরুষ। এই পৌরুষ মানুষকে সাধনায় লাভ করতে হয়।



বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ

ফ্রান্সে মিত্র-শক্তির পক্ষে বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ-লাভ—এ মহাযুদ্ধে বিরাট্ কীর্ত্তি! এ প্রসাদ-লাভের অন্তরালে যে সাধন-ভজন



জল ভাঙ্গিয়া মিত্র-বাহিনী তীরে চলিয়াছে

চলিয়াছিল, তাহার বিপুলতা উপন্যাসের গল্পের চেয়েও অভিনব! জল স্থল এবং ব্যোম-পথ ব্যাপিয়া এ আয়োজন চলিয়াছিল সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া; এবং এ-আয়োজনে লোকজন অস্ত্রশস্ত্র রশদ-



ডাকে চড়িয়া হাফ-ট্রাকে চড়িয়া মিত্র-বাহিনীর গতি

সরঞ্জামের পরিমাণ যেমন বিরাট্ ছিল, তেমনি বিপুল ছিল এ অভিযানের জন্য নক্সা বা ম্যাপ-রচনার সমারোহ! এই অভিযানের জন্য নক্সা বা ম্যাপ আঁকা হইয়াছিল এক কোটি পঁচিশ লক্ষের উপর! তার উপর চার হাজার সংখ্যক জাহাজ লক্ষ লক্ষ ফৌজকে ইংলিশ-চ্যানেল পার করিয়া ফ্রান্সের কূলে নামাইয়া দিয়াছিল। এই সব জাহাজের সঙ্গে গিয়াছিল পাহারাদারের মত বারোখানি বিরাট্ রণতরী এবং সহস্রাধিক বিমানপোত। প্যারাশুট এবং বিমান-বাহিনীতে নর্ম্মাণ্ডির আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল! ফৌজকে তীরে নামাইবার পূর্ব্বে মিত্রপক্ষের বিমানপোতগুলি হইতে ১১০০০ এগারো হাজার টন বোমা এবং নৌ-সেনাদের কামান হইতে অজস্র গোলা বর্ষণ করা হয়। নাৎসী তোপ লক্ষ্য করিয়া যে-পরিমাণ গোলা আর শেল বর্ষিত হইয়াছিল, তার হিসাব দাঁড়ায় গড়ে দশ মিনিটে প্রায় ৩০০ গোলা এবং ২০০ শেল! নর্ম্মাণ্ডির উপকূলেই হিটলার গড়িয়াছিল তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর—



নাৎসী-সেনার আত্মসমর্পণ

ওয়েষ্ট ওয়াল বা পশ্চিম প্রাচীর। এই প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লইয়া হিটলার বহু ভাবে দম্ভ প্রচার করিয়াছিল। মিত্রশক্তির দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে নাৎসী-প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং মার্কিন ফৌজ জল ভাঙ্গিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া সশস্ত্র গিয়া তীরে উঠিয়া আক্রমণকে প্রচণ্ডতর করিয়া তোলে—ডাক্, হাফ্-ট্রাক এবং বিধিদত্ত চরণযুগলের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করিয়া মার্কিন ফৌজ যে ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়াছে, যুদ্ধের ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই! মিত্রশক্তির গতির বেগে বহু জার্ম্মাণ সেনা অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া পরাজয় মানিয়া আত্মসমর্পণ করে।

—

জাহাজের আসন

বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী হইবার পর তাহাদের জলে ভাসানোর ব্যাপারে বেশ ভারী রকমের আয়োজন করিতে হয়। সে আয়োজনে দীর্ঘ সময় এবং বহু লোকজনের প্রয়োজন ঘটে। যুদ্ধ-বিগ্রহের এ ঘনঘটায় সময়ের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে—দু'-চার মিনিটের উপর শুধু মানুষের নয়, জাতির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে! সে জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহু কারখানায় জাহাজকে নির্ম্মাণ-কালে সিধা খাড়া রাখিবার জন্য অতিকায় পিঁড়ি বা আসন তৈয়ারী করিয়াছেন; সেই পিঁড়িতে জাহাজকে চড়াইয়া তবে তার নির্ম্মাণ সংসাধিত হয়।

নির্ম্মাণ শেষ হইবামাত্র মোটা তারে বাঁধিয়া পিঁড়ি-শুদ্ধ জাহাজকে জলের বুকে নামানো হয়। জাহাজ জলে নামিলে তারের প্যাঁচ খুলিবামাত্র পিঁড়িখানি দু'ভাগে দু'দিকে সরিয়া যায়; এবং পিঁড়ি বা

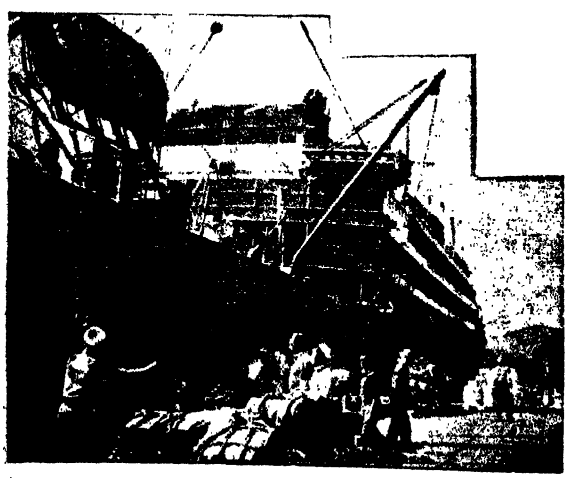


জাহাজের পিঁড়ি

আসন ছাড়িয়া জাহাজ তখন জলের বুকে তার জীবন-লীলা সুরু করে।

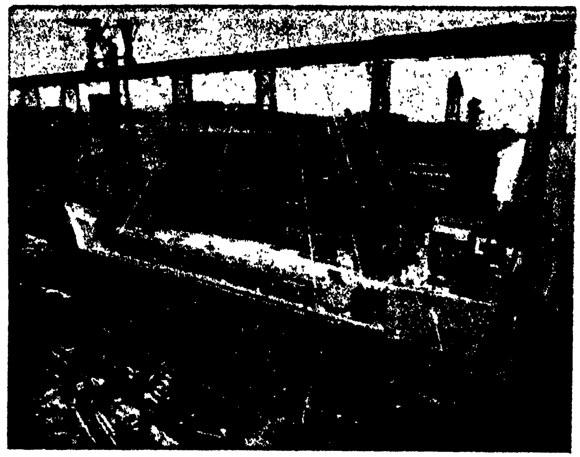
যমদ্বার

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন-শক্তি যে সমর-ঘাঁটী খুলিয়াছে, সান্‌ফ্রানসিশকো-উপসাগরকে সে-ঘাঁটীর ফটক বলিলে অত্যুক্তি



সান্‌ফ্রানসিশকোয় মাল তোলা

হইবে না। প্রতীচ্য সাগর-সীমান্ত, প্রতীচ্য প্রতিরোধ-ঘাঁটী এবং চতুর্থ বিমান-বাহিনীর মূল আস্তানা এই সান্‌ফ্রানসিশকোয়।



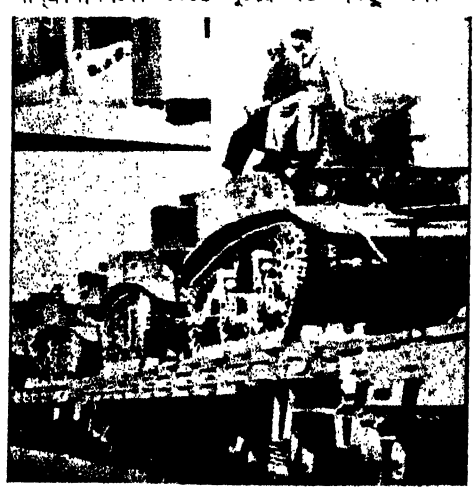
মেয়ার দ্বীপে ভাসা ক্রেন্

শত্রুর আক্রমণ-রোধ-কল্পে সান্‌ফ্রানসিশকোকে চারি দিক্ দিয়া এমন ভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছে যে, বিপক্ষ-পক্ষের একটি



নৌ-কামানীদের শিক্ষা

মক্ষিকার পক্ষেও এ তল্লাটে প্রবেশ আজ রীতিমত দুষ্কর! এই সান্‌ফ্রানসিশকো হইতে যুদ্ধের যত কিছু রশদ বড় বড়



ট্রেণে চড়িয়া লড়ায়ে-ট্যাঙ্ক চলিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে

মাল-জাহাজে তুলিয়া দেশ-দেশান্তরে নিত্য চালান যাইতেছে। সান্‌ফ্রানসিশকো-উপসাগরের বুকে যে মেয়ার দ্বীপ, সেই দ্বীপের

ফৌজ-ডকে অতিকায় ক্রেন আছে—মার্জ্জারী যেমন মার্জ্জার-শিশুকে ধরিয়া তোলে, সেই ক্রেনে বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজকে তেমনি ভাবে তুলিয়া সাগরের অথৈ জলের বুকে চকিতে নামাইয়া দেওয়া হয়; এবং এই উপসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া নৌ-কামানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুক লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ-কৌশল শিক্ষা করে। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সান্‌ফ্রানসিশকো বিরাট্ রণ-কারখানায় পরিণত হইয়াছে। বোমা ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সকল দ্রব্যই এখানকার বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে—বিরাট্ ট্রাকে চড়িয়া শত শত লড়ায়ে-ট্যাঙ্ক চলিয়াছে বিশাল রেল-পথ বহিয়া প্রশান্ত মহা-সাগরের যুদ্ধ-ঘাঁটাতে।

গৃহিণীর সুবিধা

যুদ্ধের আহ্বানে আমেরিকার নব-নারীদের মধ্যে অনেকেই আজ গৃহ ছাড়িয়া বাহিরকে আশ্রয় করিয়াছেন। যে সব রমণী গৃহে থাকিয়া গৃহ-কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, দু'টি বড় কর্ত্তব্যে তাঁদের মনোযোগ এতটুকু শিথিল করিবার উপায় নাই! ছেলেমেয়েদের লইয়া একটু

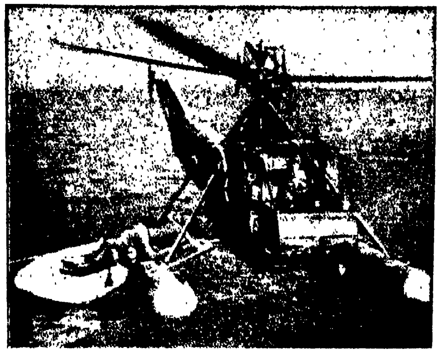


ঠ্যালা-গাড়ীতে ছেলেমেয়ে ও মাল বহা

বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই—নহিলে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা দায় হইবে; সেই সঙ্গে চাই হাট-বাজার করা। এ দু'টি কাজ যাহাতে একসঙ্গে সুনির্ব্বাহিত হয়, সে জন্ত ছেলেমেয়েদের ঠ্যালা-গাড়ীর সঙ্গে কাঠের বাক্স আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। গাড়ীগুলি আকারে ছোট; বাজারের মধ্যে গলি-পথে এ গাড়ী অনায়াসে চালানো যায়। কাজেই বাজারে কেনাকাটা করিবার সময় পথের উপর গাড়ীতে ছেলেমেয়েদের রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন ঘটে না; ছেলেমেয়েদের তদারকির সঙ্গে কেনাকাটার কাজও অনায়াসে চলে। গাড়ীগুলির ওজন আট সের অথচ গাড়ীর সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্সে প্রায় চার মণ ওজনের জিনিষ ধরে। এই ওজনের মালপত্র বহিতে মেয়েদের কষ্ট হয় না।

হেলিকপ্টারের নূতন শক্তি

'হেলিকপ্‌টার'-প্লেনের সঙ্গে সম্প্রতি "পোনটুন" জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তার ফলে জলের বুক হইতে বিপন্ন নব-নারী বা জাহাজ ও রসদপত্র উদ্ধার করিতে তার সামর্থ্য হইয়াছে অসাধারণ রকম।



হেলিকপ্‌টার জলে নামিয়াছে

এই উদ্ধার-কার্য্যের ভার কোষ্ট-গার্ডদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বিপন্ন নর-নারী জলে পড়িয়াছে দেখিবামাত্র হেলিকপ্‌টার লইয়া কোষ্ট-গার্ডরা তাহাকে জলে নামায়—নামাইয়া হেলিকপ্‌টারে আঁটা ষ্ট্রেচার-বাস্কেট ভাসাইয়া জল-নিপতিতকে বাস্কেটে তুলিয়া হেলিকপ্‌টারে আনয়ন করে। জল হইতে মালপত্র তুলিয়া এমনি ভাবেই তাহার উদ্ধার-সাধন হয়। কোষ্ট-গার্ডরা এখন হেলিকপ্‌টারে চড়িয়া সাগরের পাহারাদারী করিতেছে।

লোহার বর্ম্মে জাপানী সেনা

কাসলিন দ্বীপে মার্কিন ফৌজ সম্প্রতি জাপানী সেনাদের কয়েকটি লৌহ-বর্ম্ম হস্তগত করিয়াছে। এগুলি সেই আর্থার-রাজের নাইটদের



জাপানী সেনার বর্ম্মাবরণ

অঙ্গাবরণের অনুরূপ। আপাদমস্তক এই লৌহাবরণে ঢাকিয়া জাপানী সেনারা বেয়নেট-যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করে! এ বর্ম্মাবরণের কল্যাণে অঙ্গের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগিবার আশঙ্কা নাই

ত্রিমূর্তি

[রোমাঞ্চকর উপন্যাস]

শ্রীফাল্গুনি রায়

প্রথম অধ্যায়

বন্ধুবর রামানুজ বসুকে অবাক্ করে দেব ভেবে বিনা খবরে ষ্টেশন থেকে একেবারে তার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। চাকরদের গাড়ী থেকে মাল-পত্তর নামাতে বলে সোজা দোতলায় তার ঘরে উঠে গেলুম। পড়বার ঘরে রামানুজ চেয়ারে বসে রেলওয়ে টাইম-টেবিল দেখছিল। পদশব্দে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে অনাহূত বিনা এত্তেলার অতিথির জন্য বিরক্ত-মুখে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে লাফিয়ে উঠে একেবারে জড়িয়ে ধরে বললে—"কি ব্যাপার? ফাল্গুনি! হঠাৎ! এমন সময়? কেমন আছ? বাড়ীর সব ভাল তো? কবে এলে? কোথায় উঠেছ?"

আমি হেসে নিজেকে তার বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে বললুম—"আমি দশানন নই যে, একসঙ্গে তোমার অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেব। একে একে বলছি শোন। আগে বসি। সোজা ষ্টেশন থেকে আসছি। কিছু দিন তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব। অনেক দিন পাটনায় থেকে কলকাতার জন্য বিশেষ করে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম। বাড়ীর খবর সব ভাল। তবে আমি আপাততঃ শ্রান্ত।"

ভৃত্যকে ডেকে আমার জন্য চা আনতে হুকুম করে রামানুজ হেসে বললে—"যত দিন থাকতে ইচ্ছে হয় থাক, তবে একলা থাকতে হবে। আমার দুর্ভাগ্য—তোমার সাহচর্য্যলাভে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। চারিধারে একবার নজর কর।"

এতক্ষণ বন্ধুসম্ভাষণে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, ঘরের কোন দিকে নজর দেবার সময় পাইনি। এখন দেখলুম, সুটকেশ বেডিং ইত্যাদি ঘরের এক কোণে লেবেলযুক্ত অবস্থায় সাজানো রয়েছে। অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন করলুম—"যাচ্ছ?"

উত্তর এল—"হ্যাঁ।"

—"কোথায়?"

—"বম্বে।"

—"বম্বে! বল কি! কবে যাচ্ছ?"

—"আজই। বম্বে মেলে। বার্থ রিজার্ভ করা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম—"ভেবেছিলুম, একসঙ্গে একটু হৈ-চৈ করা যাবে—"

বাধা দিয়ে রামানুজ বললে—"আমারই কি এখন যেতে মন চাইছে, কিন্তু কি করব? কথা দিয়ে ফেলেছি!"

ভৃত্য চা দিয়ে গেল। রামানুজ বললে—"কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা যাবে, কি বল?"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললুম—"অগত্যা! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো। হঠাৎ বম্বে যাচ্ছ কেন?"

রামানুজ বললে—"সবটা খুলে বলি শোন। ভারতবর্ষে এখন সব চেয়ে বড়লোক কে জান? গায়েকওয়াড়, নিজামের চেয়েও বড়লোক।"

—"কে?"

—"শ্যামল দাস।"

—"শ্যামল দাস! মানে শ্যামল মিলসের শ্যামল দাস?"

হেসে রামানুজ উত্তর দিলে—হ্যাঁ। কোটিপতি বললেও কিছু বলা হল না। ভারতবর্ষের শতকরা আশীটা কাপড়ের কল তার নিজস্ব কিংবা সেই সব চেয়ে বেশী শেয়ারের মালিক। তার এক জন সেক্রেটারী আমার কাছে এসেছিল। কি এক গণ্ডগোলের জন্য তারা আমার পরামর্শ চায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপারটার হদিস করতে হবে। আমি প্রথমে যেতে রাজী হইনি। বললুম, সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললে এইখানে বসেই পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু সেক্রেটারিপুঙ্গব কিছুই বলতে পারলে না। শুধু এক কথা, ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজ করে বার করতে হবে। আমি হয় তো রাজী হতুম না, কিন্তু যা ফী দিতে চাইলে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সমস্ত জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারব। ভাবলুম, কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে সেই অর্থে তোমার জমীদারীর কাছে একটা বাড়ী কিনে দুই বন্ধুতে একত্রে থাকা যাবে! রাজী হলুম।"

আমি বললুম—"বেশ তো, এক কাজ কর না। দু'-এক দিন পরে যেও। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারব। বম্বেটা বেড়িয়েও আসা যাবে।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে রামানুজ বললে—"তা হয় না বন্ধু! রামানুজের কথার নড়চড় নেই। কোন একটা অসম্ভব রকম ঘটনা, অথবা জীবন-মৃত্যু নিয়ে টানাটানি—"

নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলুম—"তার তো কোন লক্ষণ দেখছি না। হঠাৎ যে রবাহূত এক অতিথি এসে এখন এই শেষ মুহূর্ত্তে বলবে—'বাঁচাও জীবন-মৃত্যু সমস্যা—এমন তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না।"

ঠাট্টার ছলে কথাটা বলেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে দু'জনেই চমকে উঠলুম।

প্রশ্ন করলুম—"কি?"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—"অনাহূত অতিথির পদশব্দ। শোবার ঘর থেকে আসছে বলে মনে হয়।"

বিস্মিত হয়ে বললুম—"তোমার শোবার ঘরে! কে?"

—"জানি না। অনাহূতেরা খবর দিয়ে আসে না।" হয় তো আমাকে শ্লেষ করল। পাল্টা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় শোবার ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি! পাগলের মত উস্কো-খুস্কো চেহারা। জামা-কাপড়ে ধূলা-কাদা মাখা। চোখ কোটরগত, মুখ শুকনো, গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। সেকেণ্ড খানেকের জন্য আমাদের দিকে চেয়ে হঠাৎ টলে পড়ে গেল। রামানুজ তাড়াতাড়ি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ী দেখতে দেখতে আমাকে বললে—"জল।"

কুঁজো-গেলাস বেডিংএর পাশেই রাখা ছিল। কিছুক্ষণ মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে আগন্তুক ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। আমাতে রামানুজে ধরাধরি করে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলুম। মুখে চামচে করে একটু একটু জল খাইয়ে দিতে কিছুক্ষণ পরে শূন্যদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"রামানুজ বসু, ২৫, এভিনিউ টেরাস।"

রামানুজ তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে—"আমার নামই রামানুজ বসু। বলুন, কি বলবার আছে।"

আগন্তুক রামানুজের কথা হয় শুনতে না হয় বুঝতে পারল না। মেশিনের মত এক কথাই ক্রমাগত বলে যেতে লাগল—"রামানুজ বসু, ২৫, এভিনিউ টেরাস।"

রামানুজ অনেক রকমে আগন্তুককে অন্য কথা কওয়াবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। কখন চুপ করে থাকে,

আবার কখনও সেই একই কথা ক্রমাগত বলে চলে। রামানুজ বললে—"ফাল্গুনি, একবার অসিতকে টেলিফোন কর। এখুনি আসতে বল। ভেরী আর্জেন্ট।"

ডাক্তার অসিতবরণ চৌধুরী আমাদের বন্ধু-লোক। মোড়েই তার প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বাপের অগাধ টাকা। তা ছাড়া নিজের প্রাক্‌টিসও ভাল। সৌভাগ্য বশতঃ বাড়ীতেই তখন ছিল। সবে ফিরেছে। খবর পেতেই বললে—"আসছি।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ওপরে এসে বললে—"ব্যাপার কি বল তো? এই মরণাপন্ন লোকটিই বা কে?"

রামানুজ যত অল্পে সম্ভব ব্যাপারটা গুছিয়ে বললে। রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে অসিত বললে—"ব্যাপারটা রীতিমত ঘোরালো।"

বললুম—"ব্রেন-ফিবার। কি বল?"

আমার দিকে চেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হেসে অসিত উত্তর দিলে—"ব্রেন-ফিবার না ছাই। তোমাদের যত সব বুজরুকি। ব্রেন-ফিবার আবার কি? নাটকে নভেলে ফিল্মে কথায় কথায় নায়কের ব্রেন-ফিবার হয়। ভুল বকে। ডাক্তাররা চোখ কপালে তোলে। নায়িকা এসে অক্লান্ত সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। নায়ক-নায়িকার দ্বন্দ্ব, অভিমান শেষ হয়ে যায়। ডাক্তার বলে—'মা, তোমার জন্যই রোগী প্রাণ ফিরে পেল।' মিলন হয়ে গেল। ফিনিস।"

—"তবে ব্যাপারটা কি?" রামানুজ প্রশ্ন করলে।

—"ঠিক বলতে পারছি না"—অসিত উত্তর দিলে। "মনে হচ্ছে, কোন একটা আইডিয়া মাথার মধ্যে এমন ভাবে বসে আছে যে অন্য কোন চিন্তা অথবা কথা সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না। অনেকটা অবসেশনের মত। আচ্ছা, ওর হাতে কাগজ-পেনসিল দিয়ে দেখ তো কি করে।"

আগন্তুককে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসালুম। রামানুজ তার হাতে একটা পেনসিল ও রাইটিং প্যাড দিলে। সে কিছুক্ষণ পেনসিল হাতে চুপ-চাপ বসে রইল। তার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি লিখতে আরম্ভ করল। আমরা একদৃষ্টে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলুম, যদি কোন কথা লেখে। কিন্তু নিরাশ হতে হল! সে কেবলই একটি সংখ্যা লিখতে লাগল—৩৩৩৩। তিনগুলি ক্রমেই বৃহদাকার হতে হতে গোটা পাতা ভরা একটি তিন লিখে হাত থেকে প্যাড-পেনসিল ফেলে দিয়ে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলুম। মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না।

অসিত বললে—"আমি এখন চললুম। সেই সকালে বেরিয়েছি। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই তোমরা ডেকে পাঠালে। এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি। সন্ধ্যার দিকে একবার আসব। কেসটা খুবই ইন্টারেষ্টিং। এর দিকে একটু নজর রেখ।"

আমি অসিতকে রামানুজের বম্বে যাবার ব্যাপারটা জানিয়ে বললুম—"আমি মনে করছি, রামানুজকে হাওড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।"

অসিত বললে—"তাতে কি? লোকটার পালাবার কোন ভয় নেই। কারণ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। হয়তো এখন দিবারাত্রি-ব্যাপী এক লম্বা ঘুম দিতে পারে! চাকরকে একটু নজর রাখতে বলে দিও। আর আমি সন্ধ্যার দিকে তো একবার আসছিই।"

অসিত চলে গেল। রামানুজ বাকী জিনিস-পত্তর গুছোতে গুছোতে বললে—"সময় বহিয়া যায়। আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে। ফাল্গুনি, তোমায় একটা ইন্টারেষ্টিং কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি! রহস্য-ঘন সমস্যা। অনাহূত অতিথির আগমন। কে? কি? কেন?"

হেসে বললুম—"বেশ শোনাচ্ছে। যেন উপন্যাস। অবশ্য মেটিরিয়ালের একান্ত অভাব। শুধু কতকগুলো তিন। নামকরণ করা যাবে—'ত্রিমূর্ত্তি'! কি বল?"

রামানুজ কিছু বলবার সময় পেল না। রোগী হঠাৎ শয্যায় উঠে বসল, যেন বৈদ্যুতিক শক পেয়েছে। তার পর দম-দেওয়া গ্রামফোনের মত গড় গড় করে বলে চলল—"ত্রিমূর্ত্তি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ত্রিমূর্ত্তির মাথা। বিষ্ণু বাঁচিয়ে রাখে—দেহ। আর মহেশ্বর ধ্বংস করে—ত্রিমূর্ত্তির হাত-পা। ব্রহ্মা ত্রিমূর্ত্তির বুদ্ধিবল, বিষ্ণু অর্থবল আর মহেশ্বর বাহুবল।"

যেমন অকস্মাৎ কথা আরম্ভ হয়েছিল, তেমনই অকস্মাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। রোগী ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখে-চোখে ভীতিব্যঞ্জক ভাব।

রামানুজ গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বললে—"ঠিকই ভেবেছিলুম। কথাটা মিথ্যা নয়।"

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলুম—"কি?"

—"এখন বলবার সময় নেই। বললেও বুঝতে পারবে না! আমি নিজেই এখনও কিছু বুঝতে পারিনি! সবই ভাসা ভাসা টুকরো টুকরো খবর। আর দেরী করলে ট্রেণ ধরতে পারবো না। যদিও যাবার ইচ্ছা মোটেই নেই। কিন্তু নিরুপায়। কথা দিয়ে বিনা কারণে কথার খেলাপ করতে চাই না। চল ফাল্গুনি, যাওয়া যাক।"

দু'জনে মোটরে উঠলুম। ইচ্ছা ছিল রামানুজকে কিছু প্রশ্ন করি, কিন্তু দেখলুম, সে গম্ভীর মুখে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ষ্টেশনে নেমে প্লাটফর্ম টিকিট কিনে উভয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। বম্বে মেল প্লাটফরমেই দাঁড়িয়েছিল। ট্রেণ ছাড়বার মিনিট দু'য়েক বাকী। হঠাৎ রামানুজ বলে উঠল—"ফাল্গুনি, নেমে পড়। একটা কুলি ডাক। উঃ, আমি কি বেকুব। এই সহজ কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। ছিঃ ছিঃ।"

অবাক্ হয়ে গেলুম। কিছুই বুঝতে পারলুম না। সবই হেঁয়ালী। লোকটা ক্ষেপে গেল না কি। কিন্তু রামানুজের ওপর আমার বিশ্বাস অগাধ। বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলুম। ওদিকে ট্রেণ ছেড়ে দিল।

আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য মোটর অপেক্ষা করছিল। উভয়ে উঠে বসলুম। রামানুজ ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মত বসে রইল। আমি আর কৌতূহল চেপে থাকতে পারলুম না। একটু রেগেই বললুম—"ব্যাপারটা কি খুলে বললে একটু বাধিত হব।"

রামানুজ আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে—"বন্ধুবর, এতক্ষণ পরে যেন আলোক দেখতে পাচ্ছি।"

বিরক্ত হয়ে বললুম—"হয়তো পাচ্ছ, কিন্তু আমি যে তিমিরে ছিলুম, সেই তিমিরেই আছি।"

রামানুজ বললে—"আমিও এতক্ষণ তিমিরেই ছিলুম। ট্রেণে

বসে হঠাৎ ভালোক দেখতে পেলুম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। আমাকে কলকাতা থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র।"

—"অ্যাঁ, বল কি ?"

—"হ্যাঁ এবং অতি চতুর ভাবে। তারা আমাকে ভয় করে।"

—"কারা ?"

—"ত্রিমূর্ত্তি। পরেশ আরও জোরে চালাও। যত জোরে পার। ঠিক সময়ে বাড়ী পৌঁছুতে পারলে বাঁচি।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"হঠাৎ এ কথা কেন ?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"রুগ্ন অতিথির জন্য বিলক্ষণ ভীত হয়ে পড়েছি।"

—"কেন ? প্রাণের ভয় আছে ?"

—"হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, বাড়ী পৌঁছে তাকে জীবিত দেখতে পাব না।"

দরজায় গাড়ী দাঁড়াতেই রামানুজ লাফিয়ে নেমে পড়ল। আমিও দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করলুম। বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই রামানুজের খাস ভৃত্য সদাশিবের সঙ্গে দেখা। অবাক্ হয়ে সে প্রশ্ন করলে—"ফিরে এলেন ?"

গম্ভীর ভাবে রামানুজ বললে—"হ্যাঁ, ট্রেণ ফেল করেছি, আমার অবর্ত্তমানে কেউ এসেছিল ?"

সদাশিব উত্তর দিলে—"আজ্ঞে না। কেউ আসেনি।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রামানুজ তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠে গেল। আমিও পিছু পিছু গেলুম। দ্রুতপদে গিয়ে শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলেই রামানুজ থমকে দাঁড়াল। "ফাল্গুনি, যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই হয়েছে।"

ব্যগ্র ভাবে জিগ্যেস্ করলুম—"কি ?"

—"মরে গেছে।"

এতক্ষণে দু'জনেই ঘরে ঢুকেছি। রামানুজ গায়ে হাত দিয়ে, নাড়ী দেখে, নাকের কাছে আর্শী রেখে পরীক্ষা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"মরে গেছে। তবু একবার অসিতকে খবর দাও।" তার কথার ভঙ্গীতে একটা ভয়ানক রকম নিরাশা।

আমি তাড়াতাড়ি অসিতের কাছে গেলুম। বাড়ীতেই ছিল। বলা মাত্রই আমার সঙ্গে চলে এল। রোগীকে পরীক্ষা করে বললে—"ডেড্। সেই সকালের লোকটা না ?"

রামানুজ উত্তর দিল—"হ্যাঁ। মৃত্যুর কারণ বলতে পার ?"

অসিত ডাক্তারোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে—"বলা শক্ত। দম বন্ধ হওয়ার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার ঘরে তো গ্যাস নেই।"

—"না। ইলেক্ট্রিক।"

ঘরের চারি ধারে দেখে অসিত বললে—"কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এইবার তোমাদের কাজ। পুলিশে একটা খবর দিও। আচ্ছা, চলি, আমার কিছু করবার নেই।"

অসিত চলে গেল। রামানুজ পুলিশ ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সেনকে আসবার জন্য টেলিফোন করে দিলে। এমন সময় রামানুজের ভৃত্য সদাশিব এসে ঘরে ঢুকল। প্রভুর খাটে একটি মৃতদেহ শায়িত দেখে চমকে উঠল। ভীত স্বরে প্রশ্ন করলে—"লোকটা মরে গেছে ?"

রামানুজ বললে—"হ্যাঁ। আমাদের অবর্ত্তমানে কেউ আসেনি ? ঠিক তো ?"

সদাশিব উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। হলফ করে বলতে পারি। আমি সমস্ত ক্ষণ ফাল্গুনি বাবুর জন্যে সদর দরজায় বসে ছিলুম। কেউ এলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম। তবে এখন এক জন লোক এসেছে। নীচে দাঁড়িয়ে আছে।"

—"কে ?"—রামানুজ প্রশ্ন করলে।

—"আজ্ঞে তা জানি না। নাম বলেনি। বললে, উন্মাদ-আশ্রম থেকে এসেছে।"

রামানুজ বললে—"আচ্ছা, তাকে এইখানেই নিয়ে এস।"

সদাশিব চলে গেল। রামানুজ মৃতদেহ চাদরে আবৃত করে চাপা স্বরে বললে—"দীপঙ্কর না আসা অবধি মৃতদেহ একলা ফেলে অন্যত্র যাওয়া চলবে না। এর ভেতর কোন রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক মৃত্যু—হয়তো হত্যা!"

ততক্ষণে এক মোটা সোটা, ভকমা আঁটা ব্যক্তিকে নিয়ে সদাশিব হাজির হয়েছে। আমাদের নমস্কার করে সে বললে—"আজ্ঞে আমি উন্মাদ আশ্রম থেকে আসছি। আজ ভোরে হাসপাতাল থেকে এক জন পাগল পালিয়েছে। সন্ধান নিয়ে নিয়ে জানতে পারলুম, এই বাড়ীতে ঢুকেছিল।"

রামানুজ উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, ঢুকেছিল বটে!"

ব্যস্ত হয়ে লোকটা জিগ্যেস করলে—"মানে? আবার পালিয়েছে? কি বিপদ!"

গম্ভীর স্বরে রামানুজ জবাব দিলে—"পালায়নি, মারা গেছে।"

বিস্মিত হয়ে লোকটি বললে—"মারা গেছে? বলেন কি?"

রামানুজ বললে—"হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক হ'ল মারা গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি নিশ্বাস ফেলে লোকটি বললে—"যাক, ভালই হ'ল। লোকটা শান্তি পেল। আমরাও বাঁচলুম।"

—"কেন? খুব ভায়লেন্ট ছিল?"—রামানুজ প্রশ্ন করলে।

—"আজ্ঞে না। অতি শান্ত ছিল। একেবারে গুম হয়ে থাকত। নাইতে চাইত না, খেতে চাইত না, কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলত না। কিন্তু এক এক সময় যেন ক্ষেপে উঠত। ত্রিমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি বলে চীৎকার করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব আবোল তাবোল বকত।"

রামানুজ জিগ্যেস্ করলে—"আচ্ছা, হাসপাতালে কত দিন থেকে ছিল বলতে পারেন?"

—"তা, বছর দু'য়েকের ওপর হবে।"

—"আপনাদের কি কখনও মনে হয়নি যে লোকটা পাগল নাও হতে পারে। হয়তো প্রকৃতিস্থই ছিল।"

একটু হেসে লোকটি বললে—"যদি পাগলই না হবে তবে পাগলা গারদে কি করতে থাকবে।"

লজিক অকাট্য। এর পর আর কিছু বলা চলে না। রামানুজ চুপ করে গেল। হয়তো বলবার মত কিছু খুঁজে পেল না।

লোকটাই বললে—"একবার দেখলে চিনতে পারতুম—"

রামানুজ "নিশ্চয়ই" বলে মৃতদেহের মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলে। দেখেই লোকটি বলে উঠল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই পালিয়ে ছিল। আচ্ছা, আমি হাসপাতালে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাই। কর্ত্তাদের এক জনের আসা দরকার। পুলিশেও খবর দিতে হবে। নমস্কার।"

লোকটা চলে গেল। রামানুজ চিন্তিত ভাবে বসে রইল। আমিও অগত্যা চুপ করে রইলুম।

একটু পরেই ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সেন এসে উপস্থিত হ'ল। দীপঙ্কর লোকটি মোটা-সোটা, দিব্য নাদুস-নুদুস। বুদ্ধি একটু মোটা হলেও সাধারণ পুলিশ-পুঙ্গবদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। রুটীন ছাড়া এক পা চলব না এ রকম গোঁড়ামী নেই। পুলিশ-মহলে বিলক্ষণ সুনাম আছে। দু'-চারটে অতি আশ্চর্য্য কেস এমন চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি করেছে যে, সরকার থেকে পুলিশ-মেডেল পেয়েছে। যদিও তার পিছনে বুদ্ধি ছিল রামানুজের, কিন্তু সে কথা জনসাধারণ জানে না। রামানুজও সে জন্ত কোন বাহাদুরি চায়নি। আমাদের সঙ্গে দীপঙ্করের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য। প্রায়ই সময় অসময়ে রামানুজের কাছে আসে এবং এমন দু'-চার ঘণ্টা গল্প করে কাটায়।

সোজা দোতলায় চলে এসে দীপঙ্কর বললে—"আবার কি খবর? ফাল্গুনিকেও দেখছি। বলি ব্যাপার কি? রামানুজ, তোমার না বম্বে যাবার কথা ছিল, কি হল?"

রামানুজ বললে—"ট্রেণ ফেল করেছি।"

দীপঙ্কর হেসে বললে—"ঐ তো তোমাদের দোষ। কোন রুটীন মানবে না, ডিসিপ্লিন থাকবে কোখেকে? তার পর এই অসময়ে অধীনকে স্মরণ করবার কারণ কি? কিছু সরেস খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে না কি?"

রামানুজের বাড়ী এলে সে কখনও দীপঙ্করকে না খাইয়ে ছাড়ে না। দীপঙ্কর খেতে ভালবাসে।

রামানুজ গম্ভীর হয়ে বললে—"ব্যাপারটা মুখরোচক নয়। একটি লোককে দেখাব। চিনতে পারবে?"

শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে রামানুজ মৃতদেহের মুখের আবরণ খুললে। দীপঙ্কর চমকে উঠে বললে—"অ্যাঁ—এ যে মরে গেছে।"

রামানুজ বললে—"হ্যাঁ, একে আগে কখনও দেখেছ?"

ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে দীপঙ্কর জবাব দিলে—"যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে—কিন্তু নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। দাঁড়াও দেখি—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এ যে আমাদের কুলদারঞ্জন। কিন্তু কি আশ্চয্য! এখানে কি করে এল?"

—"কুলদারঞ্জন? চিনতে পারলুম না তো।"

—"গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করত। ঢাকায় থাকত। কলকাতায় বিশেষ আসত না। আমার সঙ্গে খুব আলাপ না থাকলেও মুখ চেনা ছিল। বছর দু'য়েক আগে পঞ্জাবে একটা কাজে গিছল। সাবোটেজের তদন্তে। তার পর তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। এখানকার পুলিশরাও কোন সন্ধান দিতে পারেনি। আমরা ভেবেছিলুম, গুণ্ডারা খুন করে ওর লাশ গুম করে ফেলেছে।"

আগন্তুকের সম্বন্ধে আমরা যতটুক জানতুম, রামানুজ সব দীপঙ্করকে খুলে বললে। লাশ নিয়ে যাবার এবং তদন্তের ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিয়ে দীপঙ্কর চলে গেল। খাবার কথা বেচারার মনেই রইল না।

কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করতে করতে যেন আপন মনেই রামানুজ বলতে লাগল—"সবই ঠিক মিলছে, কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু —এটা যেন কিছুতেই মেলাতে পারছি না।"

আমি বললুম—"যদি অন্ত কিছু হয়, পোষ্ট-মর্টমে ধরা পড়বে। কিন্তু অসিত তো বললে, দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।"

যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে এমন ভাবে লাফিয়ে এসে রামানুজ বললে—"ঠিক কথা—দম বন্ধ হয়ে মরেছে। কিন্তু আপনা হতেই মারা যায়নি, মেরে ফেলা হয়েছে! এতক্ষণ এ কথা ভাবিনি। মনে আছে, যাবার সময় ঘরের মাত্র একটি জানলা বন্ধ ছিল, এখন দু'টো জানলা বন্ধ।"

—"তাই তো! এটা এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিনি।"

রামানুজ বলে চলল—"সদাশিব ওপরে আসেনি। এলে লোকটা যে মরে গেছে তা জানতে পারত। এই লোকটা এতই দুর্ব্বল ছিল যে উঠে বসতে পারত না। অতএব সে জানলা বন্ধ করেনি। তবে নিশ্চয়ই আর কেউ ঘরে ঢুকেছিল এবং যে ঢুকেছিল সেই এর মুখে বালিশ চেপে ধরে দম বন্ধ করে হত্যা করেছে। উঃ, কি গর্দ্দভ আমি, এই সহজ কথা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।"

আবার বিড় বিড় করতে করতে রামানুজ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। গভীর চিন্তামগ্ন, কোন দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ বলে উঠল—"ফাল্গুনি, ঠিক হয়েছে। আমরা স্রেফ বেকুব বনে গেছি। উন্মাদ আশ্রমের টেলিফোন নম্বরটা দেখ তো।"

নম্বর দেখে দিলুম। রামানুজ ফোন করলে—"দেখুন, আপনাদের ওখান থেকে আজ সকালে কোন পাগল পালিয়েছে কি?" ওদিক্-কার কথার উত্তরে রামানুজ বললে—"আমি কে জেনে আপনাদের কোন লাভ হবে না। বিরক্ত করলুম, মাফ করবেন, ধন্তবাদ!"

রিসিভার নামিয়ে রেখে বললে—"বুঝলে ফাল্গুনি, হাসপাতাল থেকে বললে কেউ পালায়নি।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"তার মানে?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"মানে অতি সহজ। কুলদারঞ্জন কোন দিনই মেণ্টাল হাসপাতালে ছিল না। কারণ, ও পাগল ছিল না।"

—"তবে যে হাসপাতালের লোক এসেছিল—"

বাধা দিয়ে রামানুজ বললে—"সে হাসপাতালের লোক নয়।"

—"তবে সে কে?"

—"তা জানতে পারলে তো—অ্যাঁ, এ কি?"

—"কি হল?"

—"আমি তো কোন জিনিষ ছড়িয়ে রাখি না। টেবিলে সিগারেট এল কোত্থেকে? তোমার?"

—"না, আমার নয়।"

হঠাৎ রামানুজ যেন অনেকক্ষণ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শেষে আলোকের সন্ধান পেয়েছে এমন ভাবে চীৎকার করে উঠল—"তিনটে সিগারেট—তিনটে!"

—"তিনটে—তাতে হয়েছে কি?"

—"বুঝতে পারছো না। তিনটে! ত্রিমূর্ত্তির—তিন নম্বর। মানে মহেশ্বর। ধ্বংসের অবতার।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কিছুক্ষণের জন্ত আমার মুখ দিয়ে কথা বার হল না। অবশেষে ক্ষীণ স্বরে বললুম—"যদি মহেশ্বর হত্যা করে থাকে, তবে সে আবার এল কেন?"

রামানুজ চিন্তিত ভাবে বললে—"ঠিক বলতে পারছি না। বোধ হয়, দেখতে এল লোকটা সত্যই মরেছে কি না?"

—"কিন্তু কাজটা খুবই বোকার মত হয়নি কি? ধর, আমরা ওকে চিনে ফেললুম।"

রামানুজ সাগ্রহে বললে—"কি ছাই চিনলে শুনি। লোকটাকে দেখে আমরা হাসপাতালের কর্মচারী মনে করলুম, কিন্তু সে মোটেই তা নয়। অতএব ছদ্মবেশ, এবং এমন নিখুঁত যে আমাদের মনে কোন সন্দেহই জাগল না। তার যে রূপ আমরা দেখেছি সেটা আসল রূপ নয়। তার আসল চেহারা যে কি, তা আমরা জানি না। আবার দেখলে চিনতেও পারব না।"

অস্ফুট স্বরে বললুম—"তুমি কি বলতে চাও, আবার দেখা হবে।"

দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে রামানুজ বললে—"হবে ফাল্গুনি, নিশ্চয়ই হবে। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমার বিরুদ্ধে। কুলদারঞ্জনকে তারাই আটক রেখেছিল। কোন মতে সে আমায় খবর দিতে পালিয়ে এসেছিল। কতটা বলতে পেরেছে তা হয়তো তারা এখনও জানে না! তবে নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে যে আমরা কিছু জানতে পেরেছি। অতএব আজ থেকে মৃত্যুদূত আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করবে। এ জীবন-মরণ যুদ্ধ। হয় আমরা, না হয় তারা—এক পক্ষের জীবন অবসান না হলে এ যুদ্ধের শেষ নেই।

—

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুলদারঞ্জনের রহস্যজনক হত্যার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে এক দিন রামানুজ বললে—"চল ফাল্গুনি, তোমায় এক জনদের বাড়ী বেড়িয়ে আনি।"

—"কোথায়? কাদের বাড়ী?"—জিগ্যেস করলুম, কিন্তু রামানুজ কোন উত্তরই দিলে না! ওর স্বভাবই ঐ রকম। ঠিক যতটুকু যখন বলবার ইচ্ছা হয় বলে। প্রশ্ন করে ওর কাছ থেকে কিছু বার করার উপায় নেই।

লোকাল ট্রেণে চেপে বেলুড়ে গিয়ে হাজির হলুম। পথে যেতে যেতে রামানুজ বললে—"যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর কাছে। পঞ্জাবে বহু দিন ছিলেন—সেখানকার রিটায়ার্ড প্রেস-অফিসার। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।"

—"কই, তাঁর কথা তো কখনও শুনিনি। ভদ্রলোকের কি নাম?"

—"নাম বললে চিনতে পারবে না। তবে যাঁর বাড়ী যাচ্ছ তাঁর নাম জেনে রাখা ভাল। নাম—"জয়েশচন্দ্র লাহিড়ী। সরকারী কাজে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাহিড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। বেলুড়মঠের অনতিদূরে গঙ্গার ধারে দিব্য একখানি বাগান-বাড়ী। ভদ্রলোক বাড়ীতেই ছিলেন। খবর দিতেই এলেন। নমস্কার, পরিচয়, কুশলাদি সংবাদ আদান-প্রদানের পর জয়েশ বাবু রামানুজকে জিগেস করলেন—"তার পর, কি মনে করে আসা হ'ল—আপনার তো আজকাল খুব নাম আর প্রতিপত্তি। বিনা কাজে যে এসেছেন, এ কথা তো বিশ্বাস করতে পারছি না।"

একটু লজ্জিত ভাবে রামানুজ বললেন—"অভিযোগ করবার কারণ রয়েছে বৈ কি! কিন্তু সত্যই ভয়ানক ব্যস্ত ছিলুম বলে আসতে পারিনি। আপনি ঠিক ধরেছেন। আজ একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি।"

কুলদারঞ্জনের আকস্মিক আবির্ভাব ও মৃত্যুর কথা সবিশেষ বর্ণনা করে রামানুজ জিগেস করলে—"আপনি তো পঞ্জাব অঞ্চলে বহু দিন ছিলেন। তা ছাড়া অনেক স্থানে ঘুরেছেন। ত্রিমূর্ত্তির ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে হেঁয়ালীর মত ঠেকছে। সবই যেন রূপকথার মত অবিশ্বাস্য। কিন্তু লোকটা যে মরেছে এটা তো নিছক সত্য এবং হত্যা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আপনি যদি কিছু জানেন—'

জয়েশচন্দ্র বললেন—"পরিষ্কার কিছু না জানলেও ত্রিমূর্ত্তির সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষো শুনিছি। সরকারকে জানিয়ে ছিলুম, কিন্তু তাঁরা আমার কথা বিশ্বাস করেননি। উৎকট কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ত্রিমূর্ত্তির অস্তিত্ব আপনার আমার অস্তিত্বের মতই সত্য। পঞ্জাবের এক ব্যক্তি এই ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা অর্থাৎ মাথা মানে বুদ্ধিবল। তারই পরিচালনায় এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে। শুনেছি, সে কি এক অতি উগ্র বিষ আবিষ্কার করছে যার কয়েক ফোঁটায় এক বিঘা জমির শস্য ধ্বংস হয়ে একবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভারতব্যাপী খাদ্যের অভাব, ফলে খাদ্য দুর্ম্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য অবশেষে দুর্ভিক্ষ। সামাজিক শৃঙ্খলার অবসান, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব। এক কথায় ভারতবর্ষের, ভারতবাসীর মৃত্যু।"

আমি অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনছিলুম। প্রশ্ন করলুম—"স্বার্থ?"

জয়েশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"স্বার্থ নিশ্চয়ই কিছু আছে, তবে সেটা আমার ঠিক জানা নেই। ভারতবর্ষে এখন যা কিছু গণ্ডগোল, ধর্ম্মঘট, মারপিট ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে, প্রায় সবেরই পেছনে আছে সেই ব্রহ্মা আর তার কূটবুদ্ধি।"

আমি একটু হেসে বললুম—"কল্পনাটা একটু—"

বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে রামানুজ বললে—"প্রত্যেক কাজের পিছনেই কল্পনা শক্তি থাকে, তবে কোন্‌টা লজিক্যাল আর কোন্‌টা নয়, সেইটা জানা দরকার। পুতুল-নাচ যে দেখেনি তাকে সুতো টেনে পুতুল নাচান যায় বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না। আপনার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করছি জয়েশ বাবু। এখন অবধি প্রমাণ পেয়েছি দু'টো। প্রথম আমাকে কলকাতা থেকে সরাবার প্রচেষ্টা যেটা সৌভাগ্যক্রমে বিফল হয়েছে, আর দ্বিতীয় কুলদারঞ্জনের হত্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ঠিক সময়ে বুঝতে এবং বাধা দিতে পারিনি। আচ্ছা, ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে ক'জন লোক জানে?"

জয়েশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"তা বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, দু'-চার-জনের বেশী জানে না। তবে যারাই জানে তাদেরই প্রাণের আর কোন মূল্য নেই।"

—"কেউ তাদের বাধা দেবার অথবা গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশের চেষ্টা করেনি?"—রামানুজ জিগেস করলে।

জয়েশ বাবু জবাব দিলেন—"করেছে। অন্তত দু'জনকে আমি জানি, কিন্তু তারা আর ইহজগতে নেই। এক জন তাদের সম্বন্ধে লিখছিল, সর্পাঘাতে তার অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আর এক জন টেলিফোন করতে গিয়ে হার্টফেল করেছে। আমার মনে হয়, কেউ তাকে জোর করে উগ্র বিষ শুঁকিয়ে হত্যা করেছিল। তৃতীয় ব্যক্তির কথা আপনারাই বললেন। তার নাম কুলদারঞ্জন। তাকেও যে

হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আপনাদের সে কিছু জানাবার চেষ্টা করেছিল।"

রামানুজ প্রশ্ন করলে—"তাদের সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু জানেন এমন কোন লোক আপনার সন্ধানে আছে কি?"

জয়েশচন্দ্র বললেন—"আমার এক বন্ধু বারাসতে থাকেন। পঞ্জাবে ছিলেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তিনি হয়তো কিছু জানলেও জানতে পারেন। আজই তাঁর কাছে যাবার কথা আছে। একটা চিঠি লিখেছেন, দেখাচ্ছি।" জয়েশচন্দ্র উঠে গিয়ে চিঠি নিয়ে এলেন।—"এই দেখুন।"

আমরা পড়লুম—

"জয়েশ বাবু,

বিশেষ দরকারে সাক্ষাৎ চাইছি। আমি যেতে চাই না, কারণ আছে। আপনি পত্র পাবা মাত্রই আসবেন। সাক্ষাতে সকল কথা বলব।

বিনীত

ত্রিপুরাপদ বাগচী"

রামানুজ উত্তেজিত হয়ে বললে—"চলুন, এই মুহূর্ত্তে যাওয়া যাক। বিলম্বে বাগচী মহাশয়ের বিপদ হতে পারে।"

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। এই সামান্য চিঠির মধ্যে এমন কি আছে, যে জন্য রামানুজ উত্তেজিত হতে পারে। জয়েশ বাবুও বোধ হয় আমার মতই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রশ্ন করলেন—"এই নিরীহ চিঠির মধ্যে কি দেখলেন?"

রামানুজ ব্যস্ত ভাবে বললে—"অনেক কিছু। হয়তো সবই কল্পনা কিন্তু সত্যও তো হতে পারে। দেখছেন না, 'ত্রি'কথাটা মোটা করে লেখা। অতএব ওটার নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে আর সেই অর্থ হল 'ত্রি' অর্থাৎ ত্রিমূর্ত্তি। অতএব আর দেরী করা উচিত নয়।"

জয়েশ বাবু বিস্ফারিত লোচনে রামানুজের দিকে চেয়ে বললেন—"কথাটা যেন সত্য বলেই মনে হচ্ছে, যদিও শোনাচ্ছে রূপকথার মত। চলুন, আর দেরী নয়।"

বারাসতে ত্রিপুরা বাবুর বাড়ী পৌছতে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েকের ওপর লাগল। গিয়েই দেখি, বাড়ীর বাহিরে এক জন কনষ্টেবল দাঁড়িয়ে। জয়েশচন্দ্র বাড়ীর ভেতর ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় সে বাধা দিল—"কার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

জয়েশচন্দ্র পুলিশ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এই বাধা এবং প্রশ্নে অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললেন—"কার সঙ্গে মানে? বাড়ীর মালিকের সঙ্গে। ত্রিপুরা বাবুর সঙ্গে।"

কনষ্টেবল কটমট করে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"ত্রিপুরা বাবু! জানেন না, আজ সকালে তিনি খুন হয়েছেন?"

আমরা চমকে উঠলুম। চোখের সামনে ভূত দেখলেও মানুষ বোধ করি এমন ভাবে চমকায় না। কারুর মুখে কথা নেই। প্রথমে রামানুজই কথা কইলে। বললে—"যিনি চার্জ্জে আছেন তাঁকে গিয়ে খবর দাও, রামানুজ বসু দেখা করতে চান। ক্যালকাটা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অফিসার দীপঙ্কর সেনের কাছ থেকে আসছি।"

একটু পরেই আমরা ভেতরে যাবার অনুমতি পেলুম। স্থানীয় ইন্সপেক্টার খুব খাতির করলেন এবং খুনের ব্যাপারে যা যা জানতে পেরেছেন সবই রামানুজকে খুলে বললেন।

—"আজ সকালেই ত্রিপুরা বাবুকে কেউ খুন করেছে। আমাদের সন্দেহ, এ কাজ তাঁর চাকরের। লোকটা নতুন। তার কোঁচার খুঁটে তিনশ' টাকার নোট পাওয়া গেছে। ঘরের রক্তমাখা পদচিহ্ন—তার পায়ের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কাপড়ে-জামায় একটু আধটু রক্তের দাগও আছে'।"

রামানুজ বললে—"মৃতদেহটা দেখতে পারি কি?"

ইন্সপেক্টর বললেন—"নিশ্চয়ই। আপনাকে দেখাতে কোন আপত্তি নেই। আপনাকে কে না চেনে বলুন। তার ওপর আপনি দীপঙ্কর বাবুর বন্ধু।"

মৃতদেহ দেখলুম। মনে হল যেন খুব ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে গলার নালি কেটে ফেলা হয়েছে।"

ইন্সপেক্টর বললেন—"দেখছেন, ক্ষুর দিয়ে গলার নালি কেটেছে! নিশ্চয়ই ত্রিপুরা বাবু চুপ করে বসে কণ্ঠনালি কাটতে দেননি। তার মানে, আগে তাঁর মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে তবে এই কাজ করা হয়েছে। এই দেখুন, মাথায় আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।"

রামানুজ বললে—"আপনি খুব বিচক্ষণ ভাবে সব জিনিষই লক্ষ্য করেছেন দেখছি।"

প্রশংসায় গলে গিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন—"আরে, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য। এই চাকরটাই খুনী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কি বলেন?"

রামানুজ বললে—"একবার চাকরটার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? দু'-একটা কথা জিগ্যেস করতুম।"

ইন্সপেক্টর 'বিলক্ষণ' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই শৃঙ্খলিত ভৃত্যকে নিয়ে হাজির হলেন। রামানুজ ভৃত্যকে অতি সাধারণ দু'-চারটে কথা জিগ্যেস করলে। খুনের সম্বন্ধে কোন কথাই হ'ল না। তার পর ইন্সপেক্টরকে বললে—"ধন্যবাদ, আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। এবার একে পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

ভৃত্য চলে গেলে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—"রামানুজ বাবু, আপনি ওকে খুনের সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করলেন না তো?"

রামানুজ মৃদু হেসে বললে—"পরে করব। একবার বাড়ীটা ঘুরে দেখতে পারি কি?"

ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই পারেন। আমিও সঙ্গে আসব?"

রামানুজ বললে—"না, আমি একলাই ঘুরে বেড়াতে চাই। অজানা লোক বাড়ীতে ঢুকলে তার কি রকম মনোভাব হয় তাই দেখব।" রামানুজ চলে গেল।

ইন্সপেক্টর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"রামানুজ বাবু একটু ভাবপ্রবণ। পুলিশের কাজে ভাবের স্থান নেই, সেখানে চাই কেবল সত্য ও প্রমাণ!"

আমরা রামানুজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অনেক রকম কথাবার্ত্তাই কইলুম। ইন্সপেক্টর আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন যে চরণদাসই খুনী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমস্ত প্রমাণই তার অপরাধের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে রামানুজ এসে উপস্থিত। হাতে কাটা-মাছের ঝুড়ি। এসেই বললে—"ফাল্গুনি, দেখছ টাটকা মাছ।"

আমরা সকলেই অবাক্ হয়ে গেলুম। রামানুজ ক্ষেপে গে

না কি! ক্ষীণস্বরে বললুম—"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বই কি! টাটকা মাছ। তাতে কি হয়েছে?"

—"কি হয়েছে মানে? অনেক কিছু হয়েছে।" রামানুজ উত্তর দিলে। তার পর ইন্সপেক্টরকে বললে—আর একবার চাকরটাকে ডাকতে পারেন।"

চরণদাসকে আবার উপস্থিত করা হ'ল। রামানুজ প্রশ্ন করলে—"যখন ত্রিপুরা বাবুকে হত্যা করা হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

—"আজ্ঞে, বাজারে।"

—"কি কি আনলে?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি বিরক্ত হলুম। লক্ষ্য করলুম, ইন্সপেক্টরের মুখে শ্লেষের হাসি!

চাকর উত্তর দিলে—"আলু, বেগুন, শাক, কুমড়ো, কচু, পটল, লেবু।"

রামানুজ জিগ্যেস করলে—"মাছ এনেছিলে?"

—"আজ্ঞে না। সোমবারে বাবু নিরামিষ খান!"

—"আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পার।"

চরণদাস চলে যাচ্ছিল, এমন সময় রামানুজ হঠাৎ তাকে ডেকে বললে—"তুমি যখন টাকা চুরি করলে তার আগেই ত্রিপুরা বাবু মরে গিছলেন—কেমন?"

চরণদাস ভীত ভাবে রামানুজের দিকে চেয়ে বললে—"আজ্ঞে।"

—"ঘরে ছু'বার ঢুকেছিলে। প্রথম বার বাজার করে এসে, দ্বিতীয় বার চুরি করতে। নয় কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

—"বাজার করে এসে দেখলে তোমার মনিব খুন হয়েছেন। কিন্তু তুমি তখন কাউকে খবর দাওনি। কেন? চুরি করবার জন্য? ঠিক তো?"

চরণদাস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রামানুজ প্রশ্ন করলে—"তুমি এখানে নিজে আসনি, এক জন লোক পাঠিয়েছিল—তাই নয়?"

চরণ বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক জন লোক আমাকে ঠিকানা দিয়ে বললেন, এই বাড়ীর চাকর চলে গেছে। তুমি যাও, চাকরী পাবে। চাকরী পেলুমও। সে প্রায় মাস তিন আগেকার কথা। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?"

—"সেই লোকটা কি রকম দেখতে বলতে পার?"

—"আজ্ঞে, এক জন বুড়ো ভদ্রলোক। শাদা চুল, দাড়ী-গোঁফ। চোখ খারাপ ছিল, নীল চশমা পরে ছিলেন। তাঁর আমি জানি না। আর কোন দিন তাঁকে দেখিওনি।"

—"আচ্ছা। এখন যেতে পার।"

ছু'জন কনষ্টেবল চরণদাসকে নিয়ে চলে গেল। সে যেতেই ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলে—"আপনি কি তবে বলতে চান, চাকরটা খুন করেনি? সে দোষী নয়?"

রামানুজ হেসে বললে—"চুরি করেছে বটে, কিন্তু খুন সে করেনি। খুনী এক জন বাইরের লোক।"

—"বাইরের লোক? কি বলছেন আপনি? আমি এসেই সকলকে প্রশ্ন করেছি। পাড়ার কয়েকটি ছেলে বাড়ীর সামনে খেলছিল। তারা বললে, কেউ আসেনি।"

—"সে এসেছিল অদৃশ্য হয়ে।"

হো হো করে খুব খানিকটা হেসে ইন্সপেক্টর বললেন—"এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আপনি ঠাট্টা করচেন!"

গম্ভীর ভাবে রামানুজ বললে—"জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি, সেখানে ঠাট্টা করা আমার স্বভাব নয়।"

আহত স্বরে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—"তবে দিনের আলোয় একটা জলজ্যান্ত মানুষ অদৃশ্য হয়ে কি করে বাড়ীর ভেতর ঢুকল।"

হেসে রামানুজ উত্তর দিলে—"অতি সহজে। আচ্ছা, আপনার বাড়ী কি দোতলা।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ক'টা সিঁড়ি বলতে পারেন?"

ইন্সপেক্টর একটু ভেবে বললেন—"না, ঠিক মনে নেই। গুণে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

রামানুজ সহাস্যে বললেন—"অতি দৃশ্য জিনিষ অদৃশ্য। কারণ, সে দিকে আমরা মন দিই না, লক্ষ্য করি না। এক জন মৎস্য-বিক্রেতা মাছ নিয়ে রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছে। কেউ লক্ষ্য করল না, অতএব দেখতেও পেল না। ত্রিপুরা বাবুর বাড়ীতে মাছ বিক্রী করতে এল—বিক্রী করে চলে গেল—সকলের চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে। যাওয়া-আসার ফাঁকে ত্রিপুরা বাবুর গলার ওপর দিয়ে ক্ষুর বুলিয়ে দিলে! মৎস্য বিক্রেতার গায়ে দু'-চার ফোঁটা রক্ত লেগে থাকলে লোকে বিস্মিত হয় না, সুতরাং লক্ষ্যও করে না।"

—"তবে সেই মাছওয়ালার সন্ধান করতে হয়?"

—"কিন্তু তাকে তো আর দেখতে পাবেন না। এক দিন চরণদাস দেখেছিল—তু'মাস আগে, বুড়োর বেশে। কেউ তাকে চেনে না—সন্ধান করবেন কি করে? আচ্ছা, চরণদাস কত টাকা চুরি করেছে?"

—"তিনশ'। এক একশো টাকার তিন খানা নোট।"

উত্তেজিত ভাবে রামানুজ বললে—"ঠিক হয়েছে। তিনখানা নোট। তিন নম্বর। খুনীর সন্ধান পাওয়া শক্ত। তবে চরণদাস যে খুন করেনি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আচ্ছা, নমস্কার।"

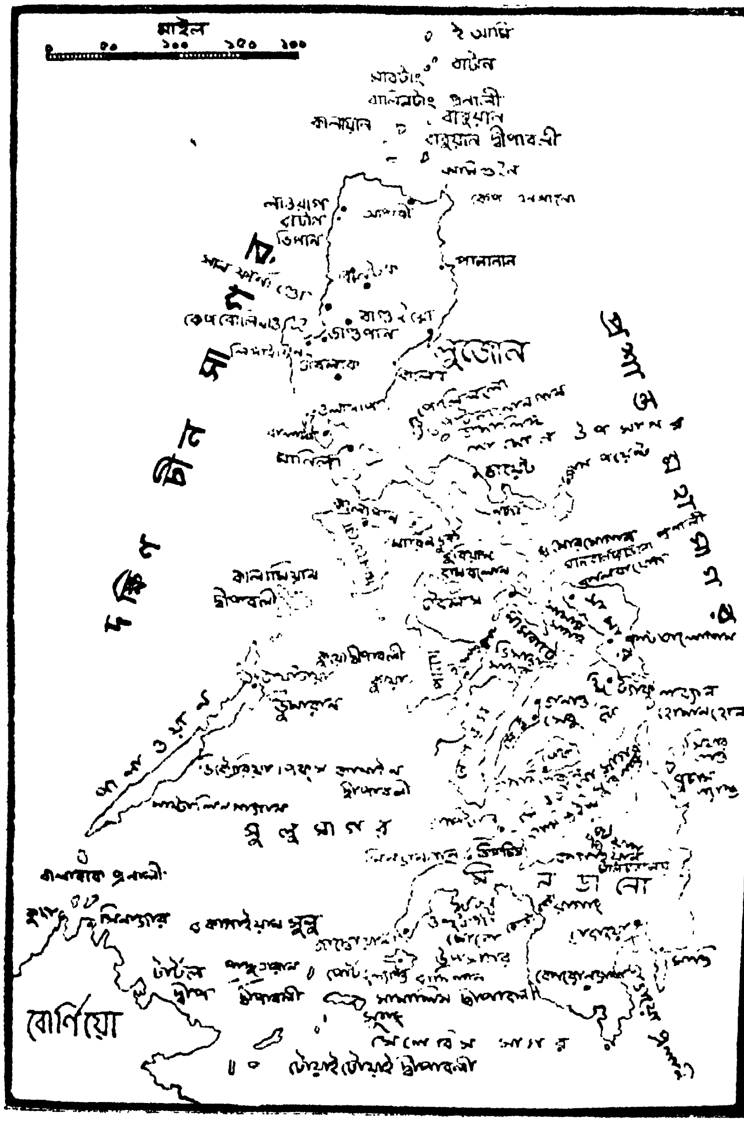
আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে রামানুজ বললে—"এও সেই ত্রিমূর্ত্তির কাজ। তিন নম্বর—মহেশ্বর, ধ্বংসের অবতার। হয়তো ত্রিপুরা বাবু তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতেন। কোন রকমে ওরা জানতে পেরেছিল যে, জয়েশ বাবু ওঁর বন্ধু আর জয়েশ বাবুর সঙ্গে আমারও আলাপ আছে। হয়তো এও জেনেছিল যে, জয়েশ বাবুকে দেখা করবার জন্য ত্রিপুরা বাবু চিঠি লিখেছেন। তাই আমরা এসে পৌঁছবার আগেই—উঃ, কি চালাক এরা! কতখানি বুদ্ধি এদের এবং কি অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরি! আশ্চর্য্য! এই নিয়ে দু'-দু'বার আমার পরাজয় হ'ল। তবে এক জন নিরীহ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়েছে এই আমার সান্ত্বনা। চরণদাস খুনী নয়। তারা পুলিশকে ঠকাতে পেরেছিল কিন্তু আমায় পারেনি।"

বাকী পথটা তিন জনেই গুম হয়ে বসে রইলুম। কারো মুখে কথা নেই।

[ক্রমশঃ।

ফিলিপাইনস্

এ যুদ্ধে বহু দুঃখ-দুর্গতি অভাব-অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিলেও সেই যে কবি গাহিয়া গিয়াছেন,—"দূরকে নিকট করিলে"—সে-কথা ভাবিয়া মনে আনন্দ জাগে! ছেলেবেলায় জিওগ্রাফিতে কত-না নদ-নদী গিরি-বন দেশ-মহাদেশের নাম মুখস্থ করিয়াছি—ম্যাপের গায়ে তাদের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এগ্জামিনে নম্বরও পাইয়াছি—তার পর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সে সব দেশ-মহাদেশ নদ-নদীর



ফিলিপাইনস্

কোথায় কোন্‌টা, সে-কথা আর মনে ভাবি নাই! মনে ভাবিবার প্রয়োজনও হয় নাই!

যে সব দেশ-মহাদেশ সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শক্তি-সামর্থ্যে আর-সবগুলাকে চাপিয়া ঠেলিয়া মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়াছে, সেগুলার কথাই শুধু মনের উপরে নানা দিক্ দিয়া ভাসিয়া ওঠে! পৃথিবীর বুকে বাকী যা-কিছু দেশ-মহাদেশ পাহাড়-নদী—সে-সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! তাদের কথা মনে আনিবার প্রয়োজনও এত দিন অনুভূত হয় নাই।

কিন্তু যুদ্ধের দুন্দুভি-নাদে আজ সেই সব ভুলিয়া-যাওয়া কত দেশ, কত দ্বীপ, নদ-নদী, সাগরের নামগুলা আসিয়া শুধু আমাদের শ্রুতি স্পর্শ করা নয়—বুকেও বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে! এমনি দেশ-দ্বীপাদির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপরকার ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিলিপাইনস্ এখন জাপানের অধিকারে। ছোট-বড় ৭০৮৩টি দ্বীপ লইয়া ফিলিপাইনসের সৃষ্টি। প্রাচ্য সমর-ঘাঁটীর দিক্ দিয়া ফিলিপাইনসের গুরুত্বের সীমা নাই! এই ফিলিপাইনসের একাংশে সম্প্রতি মার্কিন ফৌজ গিয়া নামিয়াছে এবং দক্ষিণ চীন-সাগরে জাপানী নৌ-বাহিনীর সঙ্গে মার্কিন নৌ-বাহিনীর দারুণ সজ্ঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে। সে সঙ্কটে জাপানের বহু ক্ষতিও সংসাধিত হইয়াছে। জাপানের হাত হইতে ফিলিপাইনসের একটি একটি করিয়া দ্বীপ ছিনাইয়া লওয়াই আমেরিকার উদ্দেশ্য। আমেরিকা তাহাতে সফল-মনোরথ হইলে জাপানের সাগর-শক্তি ক্ষুণ্ণ এবং ব্রহ্ম ও মলয়ের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্র হইবে বিচ্ছিন্ন।

এই ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জ ছিল আমেরিকার অধিকারে। শাসন করিলেও আমেরিকা ফিলিপাইনসের অধিবাসীদের জাতিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় কখনো উদাসীন ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইনস্‌কে আমেরিকা শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে তা নয়—দ্বীপগুলিকে অধিবাসীদের হাতে প্রত্যর্পণ করিবে! ফিলিপাইনস্ দ্বীপগুলি সম্পদে সমৃদ্ধ; ম্যালেরিয়া-বিষে ভরা বা জঙ্গলে ঘেরা নয়। এখানে প্রচুর খনিজ তৈল, রবার এবং কুইনিন্ মেলে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার এক দারুণ সংগ্রাম হয়। সে যুদ্ধের সন্ধি-সর্ত্তে মূল্য দিয়া স্পেনের কাছ হইতে আমেরিকা এই দ্বীপগুলি কিনিয়া তার শাসন-পালনের ভার গ্রহণ করে।

ফিলিপাইনসের আয়তন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারি শত বর্গ-মাইল; অর্থাৎ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে ফিলিপাইনস্ আকারে সামান্য ছোট! এখানকার লোক-সংখ্যা দু' বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক কোটি ষাট লক্ষ। নাতিশীতোষ্ণ জল-বায়ুর গুণে বাসের পক্ষে

ফিলিপাইনস্ দ্বীপগুলি সুখময়। দ্বীপগুলি শ্যামল উর্ব্বর। সাগর-বক্ষ হইতে এ সব দ্বীপের দৃশ্য অপূর্ব্ব রমণীয়।

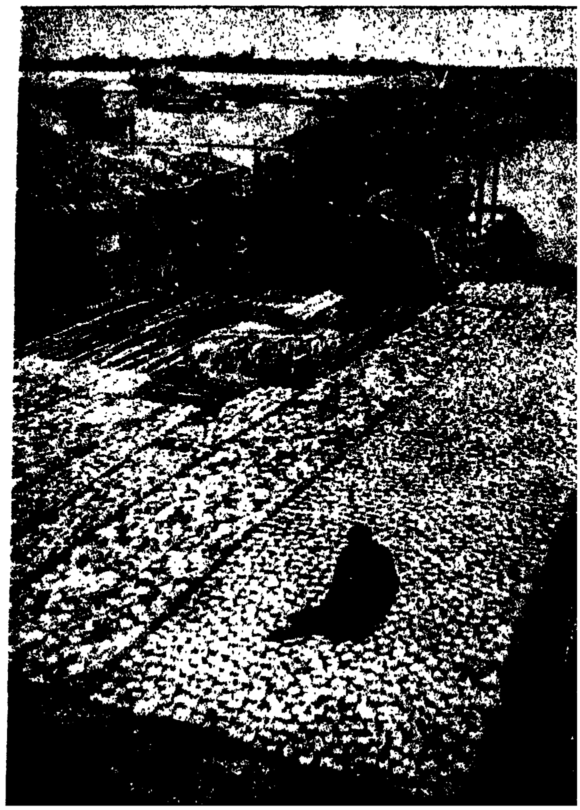
পশ্চিমে এবং উত্তরে চীন সাগর—বায়ু-বিক্ষোভে নিত্য তরঙ্গময়। এ তরঙ্গে কত জাহাজ কত নৌকা ধ্বংস হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! সাগরের তালীবনাচ্ছন্ন কূলে বহু জাহাজের জীর্ণাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ফিলিপাইনসের সর্ব্বোত্তর কোণে ইয়াসি দ্বীপ। ইয়াসির ৮৮ মাইল দূরে জাপান-অধিকৃত তাইহুয়ান দ্বীপ (সাবেক ফরমোশা)। ইয়াসির পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈ অতল জলরাশি ৭০০০ মাইল ব্যাপিয়া মত্ত উত্তাল স্রোতে

ফিলিপাইনসের সব চেয়ে বড় দ্বীপ লুজন। লুজন সর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। লুজনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নিভৃত নিরাপদ এ উপসাগরের কূলে মানিলা সহর। এই সহর ছিল এখানকার প্রাচী রাজধানী।

লুজন বেশ সমৃদ্ধ দ্বীপ। রেলোয়ে এবং প্রশস্ত রাজপথ সূত্রে মানিলার সঙ্গে লুজনের সমস্ত গ্রাম-নগরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইয়াছে তা ছাড়া, জলপথে ষ্টীমার এবং শূন্যপথে বিমানপোত-যোগে মানিলার সঙ্গে ফিলিপাইনসের অপর জনবহুল দ্বীপগুলির সম্পর্ক আজ যেমন অন্তরঙ্গ, তেমনি নিত্যকার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।



সান্ ফেলিপে দুর্গ

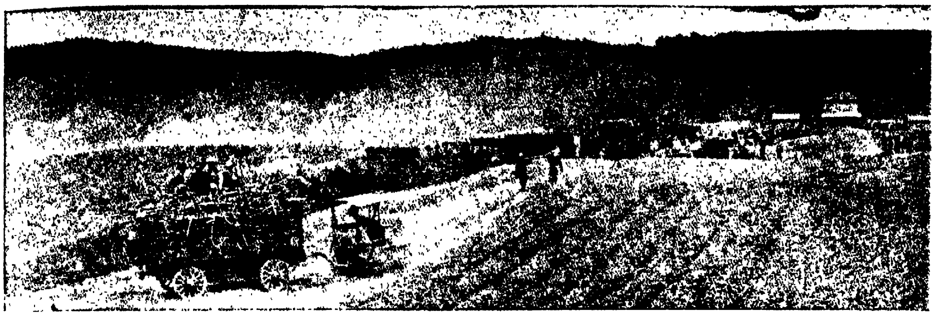


শুঁটকি মাছের ঘাঁটী—সিতাঙ্কাই

বহিয়া চলিয়াছে। এদিকে ফিলিপাইনসের বুকে তার প্রধান সহর মানিলা; আর ওদিকে ৭০০০ মাইল-ব্যাপী প্রবাহের পারে সানফ্রান্সিশকো। ফিলিপাইনসের দক্ষিণে শুভ্রোজ্জ্বল সেলিবিশ্ সাগর। সেলিবিশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ব্বর দস্যু অধিকৃত বোর্ণিয়ো। বোর্ণিয়োর একটা দিক্ যেন সাগরের বুকের উপরে বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে ফিলিপাইন্‌স্‌কে স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। এই জায়গায় বোর্ণিয়ো আর ফিলিপাইনসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এগারো মাইল।

ফিলিপাইনসের ৭০৮৩টি দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি যেমন বড়, তেমনি কয়েকটি ক্ষুদ্রকায়; ৪৩৪২টি দ্বীপ আবার এত ক্ষুদ্র যে সে সব দ্বীপের কোনো নাম নাই, সেখানে লোকের বসতিও নাই।

লুজনের উত্তর-পশ্চিমে আপারি দ্বীপ। এইখানেই জাপানীরা প্রথম আসিয়া নামিয়াছিল। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানিলা। যে উপসাগরের কূলে মানিলা অবস্থিত, সেটি করেগিডর দ্বীপের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত। সেখানে নামা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই জাপানীরা প্রথমে আসিয়া আপারিতে নামে; নামিয়া কূলাবস্থিত ভাইগান, লিঙ্গেয়ান সাগর, লেগাসপাই ও ডাভাওয়ের অভিমুখে অভিযান পরিচালিত করে। নিঃশব্দে শূন্য হইতে মানিলায় আসা সহজ। আপারি হইতে মানিলা পর্য্যন্ত পথ স্বল্প-পরিসর এবং পর্ব্বতময়। এ পথে শত্রুর গতিবেগ সহজে রোধ করা চলে। এ জন্য মানিলা লক্ষ্য হইলেও জাপানীরা মানিলায় আসিয়া নামিতে পারে নাই।



আখের ক্ষেত—ফিলিপাইন্‌স্ হইতে বছরে চিনি চালান যায় দশ লক্ষ টন!

লুজনের উত্তরে কাগাইয়ান্ উপত্যকায় তামাকের প্রচুর ক্ষেত-খামার আছে। সেখানে তামাকের চাষ হয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। পাহাড়ের ঢালু দেহ ঘন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের কোলে বণ্টক। বণ্টকে যে "মাথা-কাটা" (head-hunters) ইগরট্-জাতির বাস. তারা করে ধানের চাষ। এ-জাতি এখনো মানুষ হইয়া ওঠে নাই।



কাঠ বোঝাই—পোর্ট হলাণ্ড—মিন্‌ডানাও

সুবিধা পাইলে এখনো শৌর্য্যের আস্ফালন করিতে মানুষের মাথা কাটিতে ছাড়ে না।

লুজনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে লোহার বেশ সমৃদ্ধ খনি আছে। বহু কাল হইতে ক্রেতা-হিসাবে সেগুলির মালিকানী-স্বত্ব ভোগ করিতেছে জাপান।

মানিলার উত্তরে ১৩০ মাইল দূরে বাগুইয়ো। গ্রীষ্মকালে এই বাগুইয়োতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। মানিলা হইতে বাগুইয়ো পর্য্যন্ত সারা পথ পর্ব্বতময়। মার্কিন জাতি পাহাড় কাটিয়া এখানে চমৎকার রেল-পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ-পথে ট্রেণ চলে, সে-ট্রেণের কামরাগুলিকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে শীতল রাখিবার ব্যবস্থা একেবারে কায়েমি আছে। এ পথের নিসর্গ-দৃশ্য অতুলনীয়। মানিলা হইতে বাগুইয়ো পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্লেন চলে। প্লেনে যাত্রীর ভিড় মন্দ হয় না। প্লেনে এ পথটুকু অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে।

বাগুইয়ো এখন বেশ সমৃদ্ধ সহর। অথচ সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে বাগুইয়ো ছিল নগণ্য একখানি গণ্ডগ্রাম—ইগরট-জাতির বাসভূমি। তারা বাস করিত মাটীর জীর্ণ কুটীরে। তার পর এখানে সোনার খনির সন্ধান মেলে এবং গ্রামের হয় সংস্কার। এখন বাগুইয়োতে ২৫০০০ লোকের বাস। পথ-ঘাট আছে, থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে। অফিস, বাজার এবং অসংখ্য হোটেল আছে। মানিলার অধিবাসীরা এখানে গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের বহু আমেরিকান অফিসারও কর্ম্ম-জীবনাবসানে বাগুইয়োয় আস্তানা বাঁধিয়াছেন।

পাদরী উর্সেষ্টার ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এখানকার আদিম বর্ব্বর অধিবাসীদের আমূল বিবরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। কয় বৎসরের গবেষণায় তিনি তাহাদের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সে গ্রন্থ সমগ্র সভ্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তার পর উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফ্‌ট্ যখন ফিলিপাইন্‌সের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগিতায় উর্সেষ্টার বাগুইয়োর বহু সংস্কার সাধন করেন। টাফ্‌টের পর গবর্ণর-জেনারেল ফরবেসের আন্তরিক চেষ্টায় মার্কিন জাতির সঙ্গে আদিম অধিবাসী ফিলিপাইনো জাতির সম্পর্ক সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। বাগুইয়োর মাথা-কাটার দল এখন স্বর্ণখনির দাম বুঝিয়াছে, সভ্য হইয়াছে। বাগুইয়োর এক

সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে শুধু সোনার দৌলতে। এখানকার নদী-নির্ঝ-রের জলে অজস্র স্বর্ণরেণু। কত কাল হইতে জলে এ স্বর্ণ-রেণু ভাসিয়া চলিয়াছে, তার নির্দ্দেশ মিলে নাই।



মালবাহী বোট ও শীপ্লেন—কাভাইট

প্রাচীন কালে মোরো বোম্বেটের দল লুজনের উপকূল-প্রদেশে আসিয়া লুঠপাট করিত। সোনা, ফশল এবং নারী—ইহাই ছিল তাদের লুঠের লক্ষ্য। মানিলার দক্ষিণে জোশি পাঙ্গানিবানে (সাবেক মামবুলাও) এক ধনশালিনী রমণী বাস করিতেন; তাঁর নাম ছিল ডানাপানে। বোম্বেটের দল তাঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গেলে তিনি স্পেনের রাণীর কাছে দুর্দ্দশা জানাইয়া মোরো বোম্বেটের হাত হইতে রক্ষার আবেদন জানাইয়াছিলেন। আবেদন-পত্রের সঙ্গে রাণীকে তিনি উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন সোনার তৈরী নিরেট একটি মুর্গী এবং সে-মুর্গীর সঙ্গে নিরেট সোনার সাত-আটটি ডিম! কথিত আছে, উপঢৌকন পাইয়া রাণী খুশী-মনে বোম্বেটে-দলনের ব্যবস্থা করিয়া বাগু-ইয়োকে নিরঙ্কুশ করেন। কথাটা গল্প বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু জোশি পাঙ্গানিবানের স্বর্ণখনিগুলির অদূরে প্রাচীন দুর্গের জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল আজো বিদ্যমান দেখা যায়!



শণ,—ডাভাওয়ের গুদাম—মিন্‌ডানাও

ফিলিপাইন্‌সে বছরে এখন যে-পরিমাণ সোনা মেলে, তার আনুমানিক মূল্য হইবে চার কোটি ডলার। অর্থাৎ মার্কিনের স্বর্ণভূমি কালিফোর্ণিয়ায় যে-সোনা পাওয়া যায়, তারই অনুরূপ।

আয়তন-হিসাবে লুজনের পরেই উল্লেখযোগ্য মিনডানাও দ্বীপ। এ দ্বীপের আয়তন ৩৭০০০ বর্গ-মাইল। এ দ্বীপটি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এ দ্বীপের প্রধান দু'টি সহর জামবোয়াঙ্গা এবং ডাভাও।

জামবোয়াঙ্গায় মার্কিন ফৌজের মস্ত ব্যারাক আছে। দ্বীপটি তালীবন-সমৃদ্ধ। বানরের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত বেশী। এই মিনডানাও দ্বীপে মোরো বোম্বেটেদের সঙ্গে মার্কিন ফৌজের ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। মোরোরা প্রাচীন মুর-জাতির বংশ-সম্ভূত। ধর্ম্মে তারা মুসলমান। মোরো জাতির খৃষ্টান-বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে এক জন খৃষ্টান মারিলে বেহেস্তের পথ হইবে মুক্ত—এমনি ছিল বিশ্বাস। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পানিশ জাতির সহিত মোরো জাতির সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল পার্শিং এই মোরো জাতিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। এখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া দস্যুতা ছাড়িয়া মোরোরা এখানকার পুলিশ-বিভাগে কনষ্টেবলের পদ গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া মোরো জাতির কাছে লাঞ্ছনা-অপমানের চরম বলিয়া বিবেচিত হয়। যুদ্ধে মরিলে শত্রুরা তাদের শূকরের সঙ্গে এক-খাতে মাটি চাপা দিবে—ইহাই লাঞ্ছনা-অপমানের কারণ। খৃষ্টান ফৌজের দল তাদের এ দুর্ব্বলতার দৌলতে সহজেই তাদের বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাণিজ্যের দিক্ দিয়া মিনডানাওয়ের গুরুত্ব আছে। এখানে অজস্র

শণ জন্মায়। এই শণে যে দড়ি-কাছি তৈয়ারী হয়, তার মত মজবুত দড়ি আর হয় না। সকল কাজে মজবুত যে সব কাছি দড়ির ব্যবহার আজ প্রচলিত দেখি, সে সব এই মানিলার শণের।

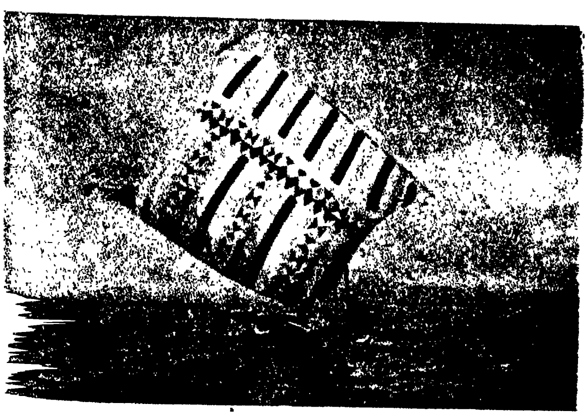
এ ব্যবসায়কে একচেটিয়া রাখিবার জন্ম ক'বৎসর পূর্ব্বে ফিলিপাইনো-গবর্ণমেণ্ট কোনো রকমে শণের বীজ বিদেশে চালান না যায়, আইন রচিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছে। তবু চোরাই রীতিতে এ বীজ



চড়াই পথে—বাগুইয়ো-বণ্টক

বোর্ণিয়ো, ডাচ-ইণ্ডিজ এবং পানামায় চালান হইতেছে। তাহা হইলেও পৃথিবীর কাছি দড়ির বেশীর ভাগ এই ফিলিপাইন্‌সের আমদানি।

ডাভাওয়ে যে সব জাপানী আস্তানা পাতিয়াছে, তারা এখানে মাউণ্ট আলোর ছায়াতলে শণের চাষ করে। এখানে শণের চাষে প্রায় আঠারো হাজার জাপানী দিন-গুজরান করিতেছে। যুদ্ধের



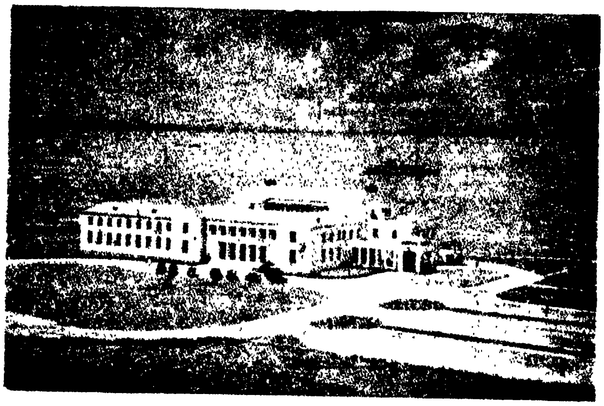
মোরোদের পাল-তোলা নৌকা

পূর্ব্বে ডাভাওয়তে জাপানী সদাগরী-জাহাজে করিয়া জাপান হইতে বিবিধ জাপানী পণ্য আসিত এবং ফিরতি-জাহাজে এখানকার শণ, নারিকেল তৈল, শুষ্ক মাছ প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে জাপানে চালান যাইত।

এখানে বাড়ী-ঘর, পার্ক, স্কুল, মন্দির, চাষের ক্ষেত, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সুরা—সব এখন জাপানী। পথ-ঘাট চমৎকার।

শণের ক্ষেতের মালিক সব জাপানী; কিন্তু ক্ষেতে কাজ করে ফিলিপাইনো স্ত্রী-পুরুষ। জার্ম্মাণ যন্ত্রে শণ আছড়ানো হয়; তার পর ফিলিপাইনো রমণীরা সে সব নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইতে দেয়।

লুজন এবং সেবু দ্বীপে বহু লোকের বাস। মিনডানাও সমৃদ্ধ হইলেও সেখানে জনসংখ্যা অল্প। বসতি যাহাতে বাড়ে, সে জন্ম জমির ব্যবস্থা-কল্পে গবর্ণমেণ্ট নানা সুবিধা-দানে মুক্ত-হস্ত। জমির খাজনা



সমুদ্র-তীরে আমেরিকান্ হাই-কমিশনারের গৃহ

সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধিও সাধারণের পক্ষে লোভনীয়; এবং সেই সহজ বিধির ফলে বসতি বাড়িতেছে; মিনডানাও ক্রমে জনবহুল হইতেছে।

মিনডানাওয়ের অধিবাসীদের শতকরা ২৫ জন মোরো। জন্মগত অধিকারে এখানকার জমিতে আজো তারা দাবী জানায়; কিন্তু



লেশের কাজে ফিলিপাইনো রমণী। অনূঢ়াদের বেণী—
বিবাহিতাদের মাথায় খোঁপা

সে দাবী আইন-কানুন মানিবে কেন? এ জন্ম খৃষ্টানদের উপর তাদের অন্তর্গূঢ় আক্রোশ-বিদ্বেষের সীমা নাই!

সারা ফিলিপাইন্‌সে এই মহাযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে চীনা অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১১৭৫০০; জাপানী ২৯০০০; ফিলিপাইনোর সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ। ফিলিপাইন্‌সে সর্ব্বসমেত ৮৭টি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। জাপানীদের প্রতি ফিলিপাইনোদের মনোভাব

মার্কিন আমলের পূর্ব্বে ফিলিপাইনোরা নিরক্ষর ছিল না—স্কুলের সংখ্যা ছিল খুব অল্প। মার্কিন আসিয়া পাড়ায় পাড়ায় স্কুল খুলিয়াছে এবং আমেরিকা হইতে ভালো শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

মার্কিন জাতি আসিবার পূর্ব্বে এখানকার সরকারী ভাষা ছিল স্প্যানিশ। এখন কোনো ফিলিপাইনোর স্প্যানিশ ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হইলে স্বতন্ত্র গৃহ-শিক্ষক রাখিতে হয়। ইংরেজীই এখন সাধারণ চলতি ভাষা হইয়াছে। দেশী ভাষারও প্রচলন আছে—সে শুধু পল্লী-অঞ্চলে। দেশী ভাষায় দেশী ফিল্ম তৈয়ারী হইতেছে। দেশী ভাষার নাম তাগালগ ভাষা। তাগালগ ছাড়া বিশায়ান, ইগরোট এবং মোরো ভাষার প্রচলন এখনো আছে।

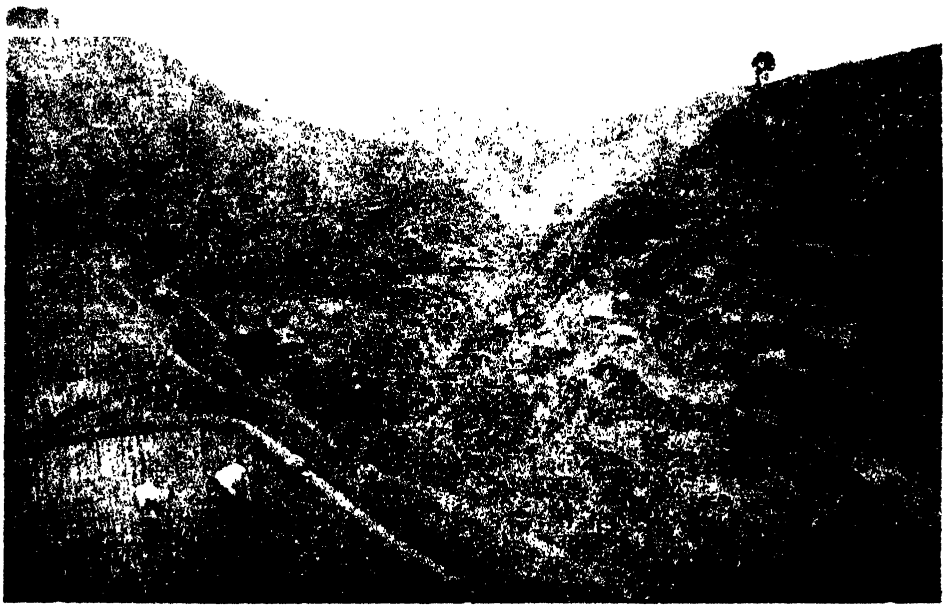
প্রধান সংবাদ ও মাসিক-পত্রাদি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষা শিখিতে ফিলিপাইনো স্ত্রী-পুরুষের আগ্রহের সীমা নাই। সরকারী আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয় অধিবাসীদের শিক্ষা-কার্য্যে। মেয়েদের স্কুলে রন্ধন, সেলাই, সংসার-পরিচালনা এবং সন্তান-পালন বেশ ভালো করিয়া শিখানো হয়। ফিলিপাইনসে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ১২০৮৩; ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশো বিরানব্বই।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে মানিলায় সান্তো টমাস বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন এ দ্বীপপুঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আটটি। প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে মানিলায়—অপরগুলি মানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন—শাখা।

স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিলেও ফিলিপাইনোরা বিলাসী হয় নাই। তারা কায়িক পরিশ্রমের মূল্য বোঝে। তারা বলে, আমেরিকানরা আসিয়া বিনামূল্যে বিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথম-প্রথম বিদ্যা শিখিয়া আমরা কেরাণীগিরি পাইয়া কৃতার্থ হইতাম। নামের পিছনে ডিগ্রী আঁটিয়া ভাবিতাম, জগতে পরমার্থ লাভ করিয়াছি ইহাতেই আমরা কিছুকাল আত্মহারা ছিলাম।

তার পর ভুল ভাঙ্গিল বেকার-সমস্যা দেখা দিতে। তখন বুঝিলাম, ডিগ্রীতে খাদ্য জোটে না, অর্থ হয় না। দেশে উকিল ডাক্তার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এত উকিল যে, মক্কেল ও মকর্দ্দমার সংখ্যা তার তুলনায় কম! ডাক্তার বহু। কিন্তু প্রত্যেকে রোগী পায় না। তখন সাধারণ লোকে চাষবাস করিত এবং গতর খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর চেয়ে কায়িক শ্রমের সম্মান অনেক বেশী।

ফিলিপাইনোরা ব্যায়াম সম্বন্ধে খুব সচেতন, স্বাস্থ্য বিধি-পালনে সজাগ। এ জন্য রুগ্ন দুর্ব্বল ক্ষীণ-দেহী ফিলিপাইনো বড় একটা চোখে পড়ে না। স্ত্রী-পুরুষ—উভয়ের দেহ বেশ বলিষ্ঠ। কর্ম্মপটুতায় ফিলিপাইনো জাতির খ্যাতি আজ বিশ্ববিশ্রুত।



পাহাড়ের বুকে থাকে-থাকে চাষের ক্ষেত

ফিলিপাইনসে কোনো সংক্রামক ব্যাধি আসর জাঁকাইতে পারে না। প্লেগ কলেরা বসন্ত এককালে মারাত্মক ছিল; কিন্তু মার্কিন বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় দেশের লোক পানীয় জলকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে। জলা-জঙ্গল সাফ করিয়া রোগের আড়ৎ তুলিয়া দেশে পাতিয়াছে কৃষি-লক্ষ্মীর আসন। তার ফলে কলেরা প্লেগ প্রভৃতি সরিয়া পড়িবার পথ পায় নাই।

ব্যবসার ফাঁদে মার্কিন জাতি এখানকার লোকের ধন-সম্পত্তি সাগর-পারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে নাই; সে জন্য দ্বীপগুলি নিজস্ব সম্পদ ঘরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। তার ফলে অভাব-দুঃখ ভুলিয়া দেশের লোক পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

দেহ-সাধনা

সুছন্দে বাঁধা সুঠাম দেহে নারীকে যে শুধু সুকুমার-সুন্দর দেখায়, তা নয়, দেহের স্বাস্থ্যও তাহাতে চমৎকার থাকে। রূপ-যৌবন বা লালিত্যের নির্ভর স্বাস্থ্যে! স্বাস্থ্য খারাপ হইলে রূপসীর রূপ মলিন এবং দেহের ছাঁদ বিপর্য্যয়-বিকৃতির ভারে বিনষ্ট হয়। মেদের প্রাচুর্য্য রূপ-লালিত্যের যম। আলস্যে দেহে মেদ জমে এবং তাহারি ফলে দেহ হয় স্থুল, বর্ত্তুল—যোড়শীকে দেখায় প্রৌঢ়ার মত!

দেহ যাঁর সুকুমার সুঠাম ছন্দে বাঁধা, তাঁর যৌবন থাকে অটুট; বয়স বাড়িলেও লালিত্য আর মাধুরী ঝরিয়া যায় না। তাঁর সন্তান-সন্ততিও হয় কান্তিমান, সুস্থ; তাহাদের দেহ খর্ব্ব বা বিসদৃশ-দীর্ঘ হইতে পারে না। এ জন্য সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিব, সুছন্দ বাঁধা দেহ শুধু রূপশ্রী-বিকাশের জন্যই ঈপ্সিত নয়—বংশের কল্যাণে তাহার প্রয়োজনীয়তার সীমা নাই।

দেহ-গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ কয়েকটি ব্যায়াম-রীতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের দেশে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লী-অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে যে-সব খেলাধূলার প্রচলন ছিল, সেগুলির সঙ্গে এ ব্যায়াম-প্রণালীর সাদৃশ্য আছে! আজ সে-রাম নাই—সে-অযোধ্যাও তাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিলীয়মান হইয়াছে! পাশ্চাত্য আচার-রীতির আঘাতে পল্লীর ভালো যা-কিছু, তাও আমরা বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছি! কিন্তু সে-দুঃখের কথায় লাভ নাই! তাই সে কথা রাখিয়া দেহ-সাধনার উপযোগী বিশেষ ব্যায়াম-রীতির কথা বলি।



১। ডান পায়ের আঙুলে ভর দিয়া



২। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত

১। এ বিধির প্রথমটিকে 'নৃত্য'-বিধি বলা চলে। সিধা খাড়া দাঁড়ান,—তার পর ডান পায়ের আঙুলে ভর দিয়া বাঁ হাঁটু দুমড়াইয়া বাঁ পা তুলুন; এবং দুই হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া ১নং ছবির নৃত্য-ভঙ্গীতে বিচরণ করিতে হইবে। এই ব্যায়ামের সময় একবার ডান পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া বাঁ পা মুড়িয়া—তার পর বাঁ পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া ডান হাঁটু মুড়িয়া বিচরণ! পাঁচ মিনিট কাল এমনি কীর্ত্তনের নাচের ভঙ্গীতে ঘুরিতে হইবে!

২। এবার বাঁ পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া ২নং ছবির মত ডান পা প্রসারিত করিয়া বাঁ হাত সামনের দিকে এবং ডান হাত পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া ঐ ছবির নাচের ভঙ্গীতে বিচরণ। দুই পায়ে ক্রম-পর্য্যায়ে এ ব্যায়াম করা চাই। অর্থাৎ যখন ডান পায়ের আঙুলে ভর রাখিবেন, তখন বাঁ পা তুলিতে হইবে এবং বাঁ আঙুলে ভর দিবার সময় ডান পা তোলা।

৩। এবার বুকে ভর রাখিয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন। পিছন-দিক দিয়া দুই হাত দুই পা ধরিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে সামনে-পিছনে দোল খাইতে হইবে। নৌকা যেমন দোলে, তেমনি ভাবে দুলিবেন। ছেলেমেয়েদের খেলার রকিং-ঘোড়া যেমন দোলানো হয়, তেমনি ভাবে দুলিতে হইবে—প্রায় পাঁচ মিনিট।

৪। এবার ৪নং ছবির মত পা তুলিয়া দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গীতে তোলা চাই। এক পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া আর এক পায়ের হাঁটু মুড়িয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত অমনি ছবির ভঙ্গীতে তুলিতে হইবে—পা নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে হাত নামাইতে হইবে। এ ব্যায়াম বেশ দ্রুত তালে কর[া] চাই চার-পাঁচ মিনিট।

৫। দু'খানি চেয়ারের পিঠে দুই হাতের অবলম্বন রাখিয়া দুই পা তুলিবেন (৫নং ছবি দেখুন)। তার পর যেমন করিয়া বাইসিক্‌ল্ চালানো হয়, তেমনি ভাবে একবার ডান পা তুলিয়া পরক্ষণে বাঁ পা তুলিয়া ক্রম পরিচালনা। এ ব্যায়াম কর[া] চাই পাঁচ মিনিট।



৩। নৌকা যেমন দোলে

এ ব্যায়ামে বুক-পেটের পেশী সবল সুদৃঢ় থাকিবে, সেখা[নে] কোনো কালে মেদ জমিবে না।

৬। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মেঝেয় দুই হাত এবং জঘ[ন] দেশের উপর দেহের ভর রাখিয়া দুই পা তুলিয়া চক্রাকারে ঘোরা[…]

এ ব্যায়ামে কোনো কালে মোটা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না—বুক, পিঠ ও কোমর হইবে সুকুমার।

শিশু-পালন

মায়ের প্রাণ সন্তানের প্রাণে। শিশুর জন্ম হইলে সেই শিশুকে লইয়া নাড়াচাড়া করা, তাকে ঘুম পাড়ানো, নাওয়ানো-খাওয়ানো—জীবনে এর চেয়ে বড় কাজ মায়ের আর নেই! মায়ের এই ধৈর্য্য, এই মমতা আছে বলেই মানুষের বংশ-ধারা কোন্ সেই আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত অবিরাম বয়ে আসছে।

ছেলেমেয়ে যদি ভালো থাকে, তবেই মায়ের মনে আনন্দ আর শান্তি! তাদের একটু অসুখে মায়ের প্রাণ যেন উড়ে যায়! অবোলা শিশু—কি তার কষ্ট কোথায় কষ্ট—মুখ ফুটে বলতে পারে না! কাজেই শিশুর অস্বাচ্ছন্দ্য হলে মায়ের ভুবন অন্ধকারে ভরে যায়!



৪। দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গীতে





৫। দু'খানি চেয়ারের পিঠে

৬। দুই হাত এবং জঘন-দেশে ভর

শিশু-বয়সে তাদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য-রক্ষা কেমন করে হয়, কিসে তারা সুস্থ দেহে বেঁচে থাকবে, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বহু পরীক্ষায় যে-তথ্য আবিষ্কার করেছেন,—বাঙলার মায়েদের কাছে আজ তাই বলছি। তাঁরা বলেছেন—শিশুকে খাইয়ে মায়ের মনে দ্বিধার সীমা থাকে না—ঠিক খাওয়ানো হলো তো? বেশী হলো, না, কম হলো, এই দ্বিধা! এ সম্বন্ধে দ্বিধার কিন্তু প্রয়োজন নেই। কম কিম্বা বেশী খাওয়ানো হলে শিশুদের ভাব-ভঙ্গীতে বৈলক্ষণ্য দেখা যাবে—সেই বৈলক্ষণ্য হলো এর মাপকাঠি।

শিশু বড় হয়ে যখন বুঝতে শেখে, তখন অপরের সামনে তার খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে এতটুকু আলোচনা করবেন না। সে আলোচনা শুনলে শিশুর মনে ধারণা জন্মাবে যে, তার খাওয়াটা হলো একটা মস্ত ব্যাপার; এবং এ ধারণা মনে জাগলে শিশুর আব্দার-বায়নার আর অন্ত থাকবে না।

নিজে খেতে শিখলে তাকে আর খাইয়ে দেবেন না। ফেলে ছড়িয়ে যেটুকু সে খায়, খাবে। ধর-পাকড় করে তার বেশী শিশুকে খাওয়াবেন না।

একই রকমের খাবার শিশুকে নিত্য খাওয়ান উচিত নয়। অবশ্য শিশু যখন একটু বুঝদার হবে, তখনকার কথা বলছি। খাওয়ায় বৈচিত্র্য না রাখলে খাওয়ায় তার রুচি থাকবে না। তবে যত বিচিত্র খাবারই দিন, সে-খাবার তার পক্ষে যেন পুষ্টিকর হয় এবং শিশু যেন অনায়াসে তা পরিপাক করতে পারে।

বড়রা যা খাবে, শিশুকেও তার সব যেন খেতে দেবেন না! চা কফি মশলাদার তরী-তরকারী বা গুরুপাক ভোজ্য—শিশু-বয়সে দেওয়া উচিত নয়। দিলে তার পরিপাক-শক্তি কমে যাবে, লিভারে দোষ ঘটবে। দিনে অনেক বারে একটু-একটু করে খাওয়া ভালো; এক-বারে একরাশ খেতে দেওয়া অনুচিত। ছেলের ভালো ঘুম হয়নি কিম্বা তার মেজাজ যদি দেখেন খারাপ, তাহলে খাওয়ার জন্য তখন পীড়াপীড়ি করবেন না। ছেলে রাগ করেছে, ভয় পেয়েছে কিম্বা খুব বিরক্ত হয়েছে—এমন অবস্থাতেও তাকে খেতে দেবেন না। তাকে শান্ত প্রসন্ন করে খাবার দেবেন। ছেলে খায় না, তার জন্য যদি ধমক-চমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তাকে খাওয়াতে যান, তাহলে তার দেহটিকে করবেন মাটী! তাতে অস্বাস্থ্য ঘটে।

বাড়ীতে যদি দু'টি ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে তাদের একটিকে করবেন আদর, আর-একটিকে দেবেন ধমক—এমন কাজ কদাচ যেন না হয়। একাধিক শিশুকে একসঙ্গে যদি খেতে বসান, এক জন হয়তো দুধ খাবে না, তাকে দিলেন বার্লি,—আর তার সামনেই সুস্থ ছেলেটিকে দিলেন ভাত-তরকারী—এতে মহা অনর্থ ঘটে। এতে অসুস্থ ছেলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না।

মায়ের নিজের খেয়াল-খুশীতে ছেলেমেয়েকে যেন খাওয়ানো না হয়। আহারে তাদের রুচি না থাকলে খাওয়াবেন না।

খেতে বসে ছেলে যদি কোনো খাবার খেতে না চায়, তার ঘাড় ধরে তাকে তা গেলাবেন না—তার জন্য তাকে ধমক দেবেন না। নিজের পেট বুঝে সে খাবে। জোর-জবরদস্তিতে বা শাসনের গুঁতোয় যা খাবে, সেটুকু তার পেটে গিয়ে বিষের কাজ করবে।



ক্রিকেট

এম,ডি,ডি,

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলার এ বৎসরের পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত গত বৎসরের বিজয়ী হিন্দু-দল গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হওয়ায় মুসলিম-দল এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে।

ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা অতি পুরাতন অনুষ্ঠান। সম্প্রতি কয়েক বৎসর সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে পড়ায় এই বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনার অন্ত নাই। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মতে এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির পথে কোনরূপেই অন্তরায় নহে। নিখিল ভারতের বিভিন্ন খেলোয়াড় পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের চরম অনুশীলনের সুবিধা করিয়া দেয়।

এ বৎসর যথারীতি ১৫ই নভেম্বর হইতে বোম্বাই ব্র্যাবোর্ণ ষ্ট্যাডিয়ামে এই খেলার উদ্বোধন হয় ও ২৮শে নভেম্বর শেষ দিনের খেলায় মুসলিম-দল হিন্দু-দলকে পরাজিত করিয়া এ বৎসরের বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হয়।

খেলার পূর্ব্বে বিভিন্ন দল গঠন এক প্রকার সমস্যা হইয়া উঠে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু তরুণ ও উদীয়মান ক্রিকেটক্রীড়াবিদের অভ্যুদয়ে নির্ব্বাচকগণের পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে শ্রেষ্ঠ দল গঠন বিশেষ কঠিন হইয়া পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত গঠিত দলগুলির মধ্যে হিন্দুদলটিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও সকলেই আশা করিয়াছিল যে, মার্চ্চেণ্টের মত শক্তিমান্ ব্যাটসম্যানের অধিনায়কত্বে এবারও জয়গৌরব তাহারা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বিভিন্ন বিশিষ্ট ও নামজাদা বিলাতী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত ইউরোপীয় দলের পার্শিগণের নিকট প্রথম খেলায় পরাজয় এই প্রতিযোগিতায় প্রথম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিলাতী খেলোয়াড় হার্ডষ্টাফের অধিনায়কত্বে কম্পটন, জাজ্ ও ওয়ার্থের ন্যায় বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সহায়তা সত্ত্বেও তাহারা পার্শিগণের নিকট পরাজিত হয়।

ইউরোপীয়—১ম ইনিংস—৩০০ রাণ (হার্ডষ্টাফ ১৫০)
২য় ইনিংস—১৮৫ রাণ (দু'জন আউট হইয়া)
পার্শী—১ম ইনিংস—৪৭১ রাণ (আর এস্ মোদী ২১৫)

উভয় পক্ষে বোলিংয়ে যথাক্রমে—খোট্, তারাপোর ও ডোত্রীক্যারী কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় খেলায় মুসলিম-দল অবশিষ্ট দলকে পরাস্ত করিয়া গত বৎসরের পরাজয়ের প্রতিশোধ লয়। বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কদ্বয় মুস্তাক আলী ও ভি এস হাজারী উভয়েই বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট পক্ষে সিংহলী খেলোয়াড় সদাশিবম্ ও মুসলিম পক্ষে গজালী ও গুল মহম্মদ-শতাধিক রাণ গ্রহণে সমর্থ হয়।

অবশিষ্ট—১ম ইনিংস—৩০৮ রাণ (সদাশিবম্ ১০১)
২য় ইনিংস—৬৬ রাণ (৬ জন আউট হইয়া)

মুসলিম—১ম ইনিংস—৩৭৮ রাণ (৭ জন আউট হইয়া)
(গুল মহম্মদ ১০৬, গজালী ১০৮ আউট না হইয়া)

মুসলিম পক্ষে আমীর এলাহী ও বালুক বোলিংএ পারদর্শিতা দেখান।

হিন্দু ও পার্শীদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইন্যালে পার্শীদের অনায়াসে পরাজিত করিয়া হিন্দু-দল শেষ খেলায় মুসলিম-দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। নিজস্ব দুই শতাধিক রাণ করিয়া মার্চ্চেণ্ট মানকড়ের সহযোগিতায় স্বীয় পক্ষের জয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়। ১ম ইনিংসে ১৬৬ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া ও মাত্র ১০০ মিনিট অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পার্শীদিগকে 'ফলোঅনের' গ্লানি হইতে অব্যাহতি দিয়া মার্চ্চেণ্ট খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেয়।

হিন্দু—১ম ইনিংস—৪৭৪ রাণ (৫ জন আউট হইয়া)
(মানকড় ১২৮, মার্চ্চেণ্ট আউট না হইয়া ২২১)
২য় ইনিংস—৬৬ রাণ (৩ জন আউট হইয়া)
পার্শী—১ম ইনিংস—৩০৮ রাণ (কুপার আউট না হইয়া ৫৮)

হিন্দুদল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়ায় খেলায় জয়লাভ করেন।

হিন্দু বোলারগণের মধ্যে এস, ব্যানার্জ্জী ও সি, এস, নাইডু যথাক্রমে চারটি করিয়া উইকেট দখল করেন।

চরম মীমাংসার খেলায় মুসলিম বোলারগণের চাতুর্য্য ও হিন্দু ব্যাটস্‌ম্যানদের ত্রুটিপূর্ণ খেলার ফলে মুসলিম-দল বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ সময়ে খেলায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবং সময় ও রাণের মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়িয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত ইব্রাহিমের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও আমির ইলাহী ও বালুকের দ্রুত রাণ-সংগ্রহের ফলে মুসলিম-দল জয়ী হয়। হিন্দুপক্ষে সিন্ধু প্রদেশের নবীন খেলোয়াড় কিষেণচাদ আউট না হইয়া ১১৮ রাণ করে।

হিন্দু—১ম ইনিংস—২০৩ রাণ (কিষেণচাদ ৭২)
২য় ইনিংস—৩১৫ রাণ (কিষেণচাদ ১১৮ আউট না হইয়া)
মুসলিম—১ম ইনিংস—২২১ রাণ
২য় ইনিংস—২১৮ রাণ (ইব্রাহিম আউট না হইয়া ১৩৭)

আমীর এলাহী ও সি, এস, নাইডু ১ম ইনিংসে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেন ও যথাক্রমে ৭৬ ও ৯৩ রাণ দিয়া ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করেন।

বিভিন্ন দলে যাঁহারা খেলিয়াছেন

ইউরোপীয় :—হার্ডষ্টাফ (অধিনায়ক), কম্পটন, হচকিন্স, সিম্পসন, ক্র্যানমার, ফেয়ারবেয়ার্ণ, জাজ্, হওয়ার্থ, ক্যারলক, ব্ল্যাকমুর ও ডোত্রীক্যারী।

পার্শী :—পালিয়া (অধিনায়ক), মেহেরোমজী, প্যাটেল, সাথা, তারাপোর, কোলা, মোদী, কুপার, ড্যাভিসেট, খাম্বাটা ও উম্রিগাম।

হিন্দু :—মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), মানকড়, সোহনী, সর্ব্বাপে, রঙ্গনেকার, কিষেণচাদ, সি, এস, নাইডু, এস, ব্যানার্জী, ফাদকার, হিন্দেলকার ও অধিকারী।

অবশিষ্ট :—ভি, এস, হাজারী (অধিনায়ক), ডায়াস, কদম, ডিসুজা, সদাশিবম্, জয়বিক্রম, ফ্র্যাঙ্ক, ভালেরাও, রোচ, ফার্ণাণ্ডেজ, ও বিবেক হাজারী।

মুসলিম :—মুস্তাক আলী (অধিনায়ক), ইব্রাহিম, হাফিজ, গুল মহম্মদ, সৈয়দ আমেদ, গজালী, আমীর ইলাহী, ই, এস, মাকা, আনোয়ার হোসেন, বালুক ও এনায়েৎ খাঁ।

পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় যাঁহারা দুই শতাধিক রাণ করিয়াছেন :—

১৯২৪—হোসী (ইউরোপীয়)—২০০ রাণ

১৯৩৭—অমরনাথ (হিন্দু)—২৪১ রাণ

১৯৪১—মার্চেণ্ট (হিন্দু)—২৪৩ রাণ

১৯৪৩—হাজারী (অবশিষ্ট)—২৪৮ রাণ

১৯৪৩—মার্চেণ্ট (হিন্দু)—২৫০ রাণ (আউট না হইয়া)

১৯৪৩—হাজারী (অবশিষ্ট)—৩০৯ রাণ

১৯৪৪—মোদী (পার্শী)—২১৫ রাণ

১৯৪৪—মার্চেণ্ট (হিন্দু)—২২১ রাণ (আউট না হইয়া)

বিজয়ী-তালিকা

* ১৯৩৭—মুসলিম ; ১৯৩৮—মুসলিম ; ১৯৩৯—হিন্দু ;

* ১৯৪০—মুসলিম ; ১৯৪১—হিন্দু ; ১৯৪২—খেলা হয় নাই ; ১৯৪৩—হিন্দু ।

* চিহ্নিত বৎসরে হিন্দু-দল যোগদান করে নাই ।

বোম্বাইএ প্রদর্শনী ক্রিকেট

ভারতীয় রেডক্রসের সাহায্যকল্পে বোম্বাই ব্র্যাবোর্ণ ষ্টাডিয়ামে বিগত ১লা ডিসেম্বর হইতে চার দিন-ব্যাপী এক বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সার্ভিস ক্লাব প্রথম ইনিংস ও ৩৫ রাণে পরাজিত হইয়াছে।

বিজিত দলের খ্যাতনামা ও প্রবীণ ভারতীয় ক্রিকেটবীর কর্ণেল সি, কে, নাইডুর নেতৃত্বে হার্ডষ্টাফ, কম্পটন্, সিম্পসন, হচকিন্স, ক্র্যানমার, ডোব্রীক্যারী, জাক্, বাটলার ও কোরাল যোগদান করেন। ইঁহারা সকলেই বিলাতী ক্রিকেট মহলে সুপরিচিত। হার্ডষ্টাফ ও কম্পটনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি আছে। নিপুণ ও কুশলী ভারতীয় খেলোয়াড় মুস্তাক আলী এই পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেন। পেণ্টাঙ্গুলার বিজয়ী মুসলিম দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলীর চমকপ্রদ ও অনবদ্য ব্যাটিং-চাতুর্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সি, কে, নাইডু নিজস্ব অবদান ১১ রাণের মধ্যে বিভিন্ন মারের কৌশল দেখাইয়া অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহারা প্রথম ইনিংসে মোট ৩৪২ রাণ করিতে সমর্থ হন। মুস্তাক আলী (১০) ও নাইডুর (১১) রাণ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বাছাই করা উদীয়মান ও বিখ্যাত খেলোয়াড়গণের সমন্বয়ে গঠিত ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া দলে খেলেন :—

মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), হাজারী, সি, এস, নাইডু, এস, ব্যানার্জী, আমীর এলাহী, মানকড়, আর, এস, মোদী, সর্ব্বাপে, সোহনী, গুল মহম্মদ ও মাকা।

প্রথম ইনিংসের খেলায় মোট চার জন আউট হইয়া ৬১৫ রাণ করার পর অধিনায়ক মার্চেণ্ট ইনিংস ঘোষণা করিয়া দেন। তন্মধ্যে মানকড় (৬৫) সোহনী (৮২) হাজারী ও মার্চেণ্টের দুই শতাধিক রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ উইকেটে হাজারীর সহযোগিতায় ভারতীয় ক্রিকেটে সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৩৬২ রাণ করিয়া মার্চেণ্ট নিজস্ব ২০১ রাণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সার্ভিসদল সর্ব্বসমেত ২৩৮ রাণ করিলে ক্রিকেট ক্লাব বিজয়ী হয়।

সিম্পসন্ ও কম্পটন্ যথাক্রমে ৫০ ও ১২০ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ক্রিকেট ক্লাব পক্ষে প্রথম দফার খেলায়, এস, ব্যানার্জী বিপর্য্যয়ের অবতারণা করিয়া চারটি ভাল উইকেট লাভ করেন। সি, এস, নাইডু ও আমীর এলাহী প্রথম ইনিংসে তিনটি করিয়া ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে তিনটি ও পাঁচটি উইকেট দখল করিয়া বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

ব্যাডমিণ্টন

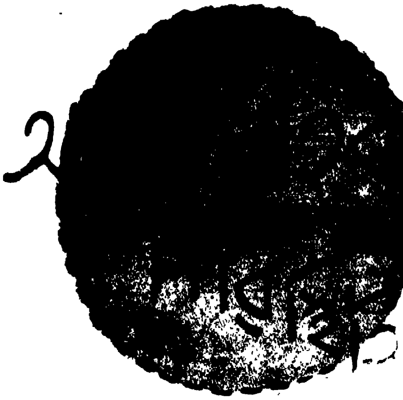
বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন-পরিচালিত বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। বাঙ্গালার উদীয়মান খেলোয়াড় শ্রীযুত সুনীল বসু সিঙ্গলস্, ডাবলস্ ও মিক্সড্ ডাবলস্, তিনটি বিভাগে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত বসুর সিঙ্গলসের খেলা দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হন। তাঁহার অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ন ভি, এ, ম্যাডগাভকারকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে ভি, এ, ম্যাডগাভকারকে বিভিন্ন জুনিয়র প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন; কিন্তু বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের কোন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় মিঃ ম্যাডগাভকারকে ইতিপূর্ব্বে পরাজিত করিতে পারেন নাই। শ্রীযুত বসু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বোম্বইএর পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় স্বীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সুযোগ, সুবিধা ও চেষ্টা থাকিলে ইনি ব্যাডমিণ্টন খেলায় বাঙ্গালার সুনাম বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর সাফল্যমণ্ডিত হউক।

যতীন্দ্র-প্রশস্তি

"বনফুল"

যাহাদের প্রতিভার শিখা
উদ্ভাসিল যুগে যুগে জীবনের পথ,
যাহাদের টীকা
বাস্তবের ক্ষুদ্রতারে করিল মহৎ,
মায়া-মরীচিকা
ভ্রান্ত করিল না কভু যাহাদের মানস-মৃগরে,
হাতে লয়ে স্বপন-বর্ত্তিকা
অতিক্রমি অন্ধকার
উত্তরিল যুগে যুগে যারা
জ্যোতিষ্মান্ মহিমা-শিখরে,
তুমি তাহাদের এক জন,
তোমার লাগিয়া নহে ধন-মান-খ্যাতির গর্জ্জন,
তুমি কবি, পূর্ণ-মনস্কাম
দূর হতে সসম্ভ্রমে জানাইনু তোমারে প্রণাম।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত।



শ্রীতারানাথ রায়

রুশিয়া ও জাপান :—

কুইবেকের এংলো-স্যাক্সন বৈঠকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার শলা-পরামর্শ হয়। মার্কিণ নৌবাহিনী দর্প করিয়া বলে যে, তাহারা একাই প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের যুদ্ধ শেষ করিবে। মিঃ চার্চ্চিল যেন তাহাতে শঙ্কিত হইয়াই বলেন—এই সুকার্য্যের অংশ বৃটেনকেও দিতে হইবে। রুশিয়া কিন্তু এ দিকে আগ্রহ দেখায় নাই। স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর রুশিয়া কি জাপ-দর্প চূর্ণ করিতে সাহায্য করিবে না? বৃটেন ও আমেরিকা কি রুশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিবে না? মনে হয়, রুশিয়া জাপানকে ক্ষুব্ধ করিবে না। এক দিকে য়ুরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রে সোভিয়েট-প্রভাব-বৃদ্ধি এবং জার্ম্মাণ যুদ্ধে রুশ-কৃতিত্ব, অন্য দিকে এশিয়ার জাপ-শক্তি বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি রুশিয়া ও জাপানকে ঘিরিয়া ক্রমে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

প্রাচ্যে আক্রমণ পরিকল্পনা :—

কুইবেক বৈঠকে এংলো-স্যাক্সন নেতৃদ্বয় সম্ভবতঃ এই উভয় সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জাপান সম্বন্ধে বৈঠকে স্থির হয়—

১। এডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনের পরিচালনায় ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে হইবে।

২। জেনারল ম্যাক আর্থারের পরিচালনায় ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিতে হইবে।

৩। এডমিরাল নিমিজের পরিচালনায় জাপদিগকে স্বগৃহে আক্রমণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে কিউরাইলস দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

জার্ম্মাণী কত দিন বাধা দিবে?

জার্ম্মাণীর প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ জানা না গেলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্ব দিক্ হইতে জার্ম্মাণী ফাঁদে পড়িয়াছে। পশ্চিম সীমান্তে সিগফ্রিড লাইনের দক্ষিণতম দিকে ফরাসী সৈন্যগণ বেলফোর্ট গ্যাপ দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এ দিক্‌টা খুব নিরাপদ নয়। এ দিকে সিগফ্রিড লাইন অতিক্রম করিলেই ব্লাক ফরেষ্টের দুর্গম গিরি-বনানী। গত মহাযুদ্ধেও এই অঞ্চলে বিশেষ কোন যুদ্ধ হয় নাই। মনে হইতেছে, ফরাসীরা এ স্থান হইতে ঘুরিয়া উত্তর দিকে ষ্ট্রাসবুর্জের দিকে অগ্রসর হইবে এবং মেৎজ দখলের পর মার্কিণ সৈন্যগণ দক্ষিণে ফিরিয়া ষ্ট্রাসবুর্জে আসিয়া ফরাসী সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। বর্ত্তমানে মার্কিণ সৈন্য সার ব্রুকেনের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা যে প্রবল বাধা দিতেছে এবং মিত্রপক্ষকে যে প্রতি গজ স্থানের জন্য প্রবল সংগ্রাম করিতে হইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছে। নেপোলিয়ানের পর পশ্চিম-জার্ম্মাণীর উপর ইহাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ সামরিক বিশৃঙ্খলা না ঘটিলে মিত্রপক্ষের ঝটিকাগতি জার্ম্মাণরা হয়ত রুদ্ধ করিতে পারিত। এই বিশৃঙ্খলার জন্য মিত্রপক্ষ এক সপ্তাহে প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্য, প্রায় ১০ লক্ষ টন রসদ ও প্রায় ১ লক্ষ যান ফ্রান্সের উপকূলে নামাইতে সমর্থ হয়। যদি জার্ম্মাণী সর্ব্ব দিক্ হইতে আক্রান্ত না হইত, তাহা হইলে হয়ত এই বিপর্য্যয়ে সে বিপন্ন না-ও হইত।

পোলাণ্ডের সীমান্ত হইতে ডানিয়ুব নদের তট পর্য্যন্ত, বুলগেরিয়া হইতে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী এখনও প্রবল বাধা দিতেছে। বুদাপেস্ত সহর আজ পর্য্যন্ত অধিকৃত হয় নাই। ইটালী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখনও তাহারা মিত্রপক্ষের প্রবল আক্রমণকে বাধা দিতেছে। জার্ম্মাণীর এই একক প্রতিরোধ-শক্তি এংলো-স্যাক্সন ও রুশ-প্রহার সহ্য করিতে পারিবে কি না এখনও কেহ বলিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্ব-সীমান্তে জার্ম্মাণীকে গ্রাস করিবার জন্য রুশিয়া প্রায় ৪০ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রবলতম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পশ্চিমে মিত্রপক্ষের আশানুরূপ সাফল্যের ইঙ্গিত পাইলেই লালফৌজ নির্ম্মম আক্রমণ চালাইবে, আশা করা যায়। কিন্তু রুশিয়া এখন পর্য্যন্ত সমগ্র পোলাণ্ড গ্রাস করিতে পারে নাই, চেকোশ্লোভা-কিয়ার সীমান্ত সবে মাত্র অতিক্রম করিলেও বল্কান শত্রু-মুক্ত করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণীর পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় রণক্ষেত্রেই আরম্ভের আক্রমণ-উগ্রতা যেন হ্রাস পাইয়াছে। অনেকে মনে করেন, জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরে হয়ত পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে, এ জন্য জার্ম্মাণরা সমবেত চেষ্টায় বাধা দান করিতে সক্ষম হইতেছে।

পরাজিত জার্ম্মাণী কি করিতে পারে :—

কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকলের' রাজনীতিক সংবাদ-দাতা মিঃ ই পি মণ্টগোমেরী অনুমান করেন, এংলো-স্যাক্সনগণের আক্রমণ হইতে "পিতৃভূমিকে" রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণরা কূর্ম্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, চোরাগোপ্তা সংগ্রাম চালাইয়া যুদ্ধ দীর্ঘ-কাল স্থায়ী করিতে পারে। মিত্রপক্ষের টহলদারী সৈন্যকে অলক্ষিতে ইহারা আক্রমণ করিবে, শাসন-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, সমরনায়কগণ রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। হিটলার ও তাঁহার অনুরক্ত নাৎসিগণ, বিশেষতঃ হিমলার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে গুপ্ত প্রতিরোধের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। মিত্রপক্ষের সামরিক কর্ত্তৃত্বের অধীনে কোন জার্ম্মাণই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিবে না। "কুইসলিং" (বা মীরজাফর) শব্দের নাৎসী প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হইয়া কানে কানে উহার প্রচার হইবে। এই "কুইসলিং" দুই-এক জন নির্ম্মম ও বর্ব্বরোচিত ভাবে নিহত হইলে, প্রত্যেক জার্ম্মাণ তাহার অর্থ কি, তাহা উপলব্ধি করিবে।

য়ুরোপে নূতন পরিস্থিতি—

ইতোমধ্যে য়ুরোপে যে নূতন রাজনীতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, রুশিয়া তাহা যেন বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে। রুশিয়া না হউক, সোভিয়েট মতবাদকে ঘিরিয়াই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ বর্ত্তমান সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির যে মূলসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একদা ধনিকতন্ত্র-বিদ্বেষী রুশ সমাজতন্ত্রীরা বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদীদের ধনিকতন্ত্র মানিয়া লইয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রগুলি এই—

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতি ও ব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, সকল রাষ্ট্রের সহিত রুশিয়া শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিবে।

(২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম সম-মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা এবং ধনতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া রুশিয়া সকল রাষ্ট্রের সহিত অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সহযোগিতা করিবে।

(৩) পরস্পরের রাষ্ট্র আক্রমণ নিবারণের জন্য রুশিয়া অপর যে কোন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবে।

(৪) অপর জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব প্রসার রুশিয়া সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশিয়া হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) ফ্যাসিস্ত পররাষ্ট্রলোভীদিগের সহিত সংগ্রামের জন্য রুশিয়া মুমুক্ষু জাতি সমূহের ঐক্য সুদৃঢ় করিবে।

জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত অঞ্চলগুলি বর্ত্তমানে আর সাম্রাজ্যবাদী তথা ধনতান্ত্রিক পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিতে রাজি হইতে না চাহিলেও প্রধানতঃ বৃটেন এ সকল জাতিকে আপনার নিয়ন্ত্রিত নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে চাহিতেছে।

রুশিয়া কি চায় ঃ—

শুনা যাইতেছে, অধিকৃত জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাব-সীমান্ত সম্বন্ধে রুশিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুশিয়া চায়—(১) পরাজিত জার্ম্মাণীর যন্ত্রপাতি এবং (২) রুশিয়ার যে সকল অঞ্চল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছে, সে সকল অঞ্চল পুনর্গঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট জার্ম্মাণ জোয়ান। এংলো-স্যাক্সনরা এ সন্দেহও করিতেছে যে, রুশিয়া এ সকল জার্ম্মাণ তরুণকে কম্যুনিষ্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জার্ম্মাণীকেও ধনসাম্যবাদী করিবে।

'নিউইয়র্ক টাইমসের' কূটনীতিক সংবাদ-বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের ফলে য়ুরোপের সর্ব্বত্র সোশ্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ) প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। রাই-এর ইন্টার ন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্সের মার্কিণ প্রতিনিধিগণ বলিতেছেন, বৃটেন দৃশ্যতঃ ধনতান্ত্রিক হইলেও সে আজ ঋণ-প্রপীড়িত, বৃটেনের বাণিজ্য-সম্পদ নষ্ট। যুদ্ধকালে বৃটেনকে অনেক সম্পদ বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে দীর্ঘকাল সুনিয়ন্ত্রিত সমবায় প্রচেষ্টা ব্যতীত বৃটেন আর দাঁড়াইতে পারিবে না।

য়ুরোপে ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া বর্ত্তমানে আর কিছুই নাই। নাৎসী সরকার স্কোডার কারখানা আপনাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। জনৈক চেক রাজপুরুষ বলিয়াছেন, অতঃপর এই কারখানা এবং উত্তরাঞ্চলের বড় বড় কয়লা-খনিগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চালাইতে হইবে। এরূপ অবস্থা ফ্রান্স এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ-অধিকৃত দেশেরও।

গ্রীসে বিদ্রোহ—

গ্রীস জার্ম্মাণীর দ্বারা অধিকৃত হইবার পর, দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অভ্যন্তর হইতে দেশভক্ত বিভিন্ন দল গঠিত হয়। (১) গুপ্ত সরকার (PEEA), (২) কম্যুনিষ্ট (EAM), গ্রীক ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্ট, (৩) কম্যুনিষ্টদিগের পরিচালিত বৃহত্তম গেরিলা বাহিনী, লিবারেশন ফ্রণ্ট মিলিশিয়া ELAS. (৪) সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক দল—জর্জ্জ পাপানদ্রু এই দলের নেতা; গত এপ্রিলে ইনি গ্রীস হইতে পলায়ন করিয়া কায়রোতে গমন করেন। (৫) (মিশরে) নির্ব্বাসিত গ্রীক সরকার—রাজপন্থী দল এবং (৬) রিপাবলিকান দল—গ্রীসের অন্যান্য মুমুক্ষু দলের মধ্যে বৃহত্তম। গত মে মাসে গুপ্ত সরকারের প্রধান সচিব জর্জ্জ পাপানদ্রু সকল দলের ২৫ জন প্রতিনিধির এক বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, সকল দলের প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত এক সরকার ও সর্ব্বদলের সৈনিককে লইয়া গঠিত এক অখণ্ড জাতীয় প্রতিরোধ সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইবে।

সর্ব্বদলের এই চুক্তি মসনদচ্যুত গ্রীকরাজ জর্জ্জের সিংহাসন রক্ষার জন্য ইংরেজদিগের সাময়িক কূটনীতিক সাফল্য বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিলেন।—"Agreement was a temporary victory for British policy aimed at saving the throne for London's friend. exiled king George II."

কম্যুনিষ্ট দলকে মন্ত্রিসভায় ৫টি আসন দেওয়া হয়। কিন্তু এই দল ৬টি মুখ্য পদ দাবী করে। এই দাবী অগ্রাহ্য হইলে EAM দল প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু পরে বোধ হয় কৌশলস্বরূপ সম্মিলিত সরকারে যোগদান করিতে সম্মত হয়। রুশ মিশন ও মার্শাল টিটোর দলের সহিত এই কম্যুনিষ্ট দলের বিশেষ যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয়।

গত অক্টোবরের মাঝামাঝি গ্রীক সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্ব্বদলে ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। রাজপন্থী, রিপাবলিকান ও সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক দলের প্রভাবে গেরিলা দল ভাঙ্গিতে আদেশ দেওয়া হইলে গেরিলা দল বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। ফলে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে রীতিমত ঘরোয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে।

অনেকে বলিতেছেন, কম্যুনিষ্টদিগকে হতমান করিবার জন্যই ৩রা ডিসেম্বর বহু সহস্র EAM বিক্ষোভকারী নিরস্ত্র তরুণ-তরুণীর উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। ("It is possible that the Communist…are being deliberately brought into disrepute so that citizens tired of violence will rally to the king and the Government"—The Statesman). গ্রীসে ইংরেজ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, যত দিন পর্য্যন্ত বিধিসঙ্গত সৈন্যবল দ্বারা গ্রীকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং নূতন নির্ব্বাচন না হয়, তত দিন ইংরেজরা গ্রীসের বর্ত্তমান সরকারকে সমর্থন করিবে।

গ্রীসের বর্ত্তমান সরকার রাজতন্ত্রী। ভূতপূর্ব্ব গ্রীক সামরিক কর্ম্মচারীরা এই রাজতন্ত্রীদলের সমর্থক। কম্যুনিষ্ট লিবারাল ফ্রণ্ট

মিলিশিয়ার সহিত এই সামরিক কর্ম্মচারীদিগের প্রবল সংঘর্ষ—রীতিমত যুদ্ধই চলে। ইংরেজ সৈন্ত গেরিলা দলকে নিরস্ত্র করিতেছে এবং গ্রীক পুলিশ-কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করিতেছে। ELAS দল অভিযোগ করে যে, গ্রীক সরকার ফ্যাসিষ্ট হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে ("they accused the Government of preparing for Fascism, of threatening the liberties of the people, of turning toward reaction".) গ্রীক ন্তাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সেক্রেটারী জেনারল নিৎসস পার্টশালাইডিস ঘোষণা করিয়াছেন, "Henceforth Premier Papandreou is an outlaw. The people will fight for their liberty without counting their sacrifice."

চরমপন্থীরা ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। মনে হইতেছে, বুলগেরিয়ান, ইটালীয় ও রুমানীয় কতিপয় চরমপন্থী গ্রীক চরমপন্থীদিগকে সাহায্য করিতেছে। চরমপন্থীরা প্রধান মন্ত্রীকে ফাশিস্ত-পন্থী আখ্যা দিয়া বলিয়াছে যে, এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকদিগকে শাস্তি দিতেছে না, সরকারী চাকরীতে দেশদ্রোহীদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং শত্রুর সংগঠিত সুবৃহৎ সৈন্তদল রক্ষা করিতেছে। অপর দিকে মিত্রপক্ষের তরফ হইতে জেনারল সার হেনরী মেইটল্যাণ্ড উইলসন ইংরেজদিগের কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, জার্ম্মাণরা এখনও যখন এথেন্স হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তখন মিত্রপক্ষের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলিকে বিপন্ন করা চলে না। গ্রীসে যে সকল চরমপন্থীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত জার্ম্মাণ ও বুলগেরীয় সৈন্তও আছে।

ইটালীতেও অসন্তোষ—

গ্রীসের মতন ইটালীতেও রাজতন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট ও গণতন্ত্রবাদী তরুণগণ আন্দোলন চালাইতেছে। যে দিন এথেন্সে গুলী চলে, সেই দিনই রোমে (৩রা ডিসেম্বর) কম্যুনিষ্ট ও অপর গণতন্ত্রবাদিগণের সহিত রাজতন্ত্রীদিগের দাঙ্গা হয়। দলে দলে রিপাবলিকান তরুণরা যে যে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহা লইয়া রাজতন্ত্রবাদী দলপতিদিগকে আক্রমণ করে।

গ্রীসের মতন ইটালীতেও নূতন সরকার গঠনের ব্যাপার লইয়া ইংরেজদিগকে অপ্রিয় মন্তব্য শুনিতে হইতেছে। ইটালীর কোন কোন স্থানে চরমপন্থী দল মনে করিতেছেন যে, ইটালীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বৃটেনেরই গ্রহণোপযুক্ত সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার সুযোগ না দিয়া, বৃটেন এক ক্রীড়নক সরকার গঠন করিবে। সিনর বোনোমি বর্ত্তমানে ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র, ইংরেজের সমর্থনে তিনি ইটালীর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। কাউন্ট কার্লো স্ফোর্জাকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ দিতে ইংরেজদের বিশেষতঃ বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেনের আপত্তি।

বেলজিয়মে অশান্তি—

বেলজিয়মেও যে সকল রাজনৈতিক দল অভ্যন্তর হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্ত সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতিরোধ-কৃতিত্বের জন্ত কম্যুনিষ্টদল অধিক সুবিধার দাবী করে। প্রধান-মন্ত্রী মঁসিয়ে পিয়েরলট কটাক্ষ করিয়া বলেন—"there exist in the country political groups which claim a monopoly of merit of resistance and patriotism and want to exploit it for political aims"—এই দাবী অস্বীকার করিবার জন্ত দুই জন কম্যুনিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিরোধ-বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মঁসিয়ে ডিমানি পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক বিচক্ষণগণ এই পদত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছেন। ইটালী ও গ্রীসের মতন বেলজিয়মেও সভা-সমিতি নিষেধ করা হয়, এবং গুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি এই নিষেধ আদেশ অমান্ত করে। চরমপন্থীরা মঁসিয়ে ডিমানিকে প্রধান-মন্ত্রী করিতে চায়।

মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি বৃটেনের এই নূতন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' স্পষ্ট বলিয়াছেন—মিঃ চার্চিলই গ্রীস, ইটালী ও বেলজিয়মে বৃটিশ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং তাঁহার সমর্থক মিঃ ইডেন তাই কমন্স সভায় তীব্র ভাবে কাউণ্ট স্ফোর্জ্জাকে আক্রমণ করেন।

পোলাণ্ডে উত্তেজনা—

রুশবিদ্বেষী মঁসিয়ে মিকো লাজিক (পোল কৃষাণ দলের নেতা) লণ্ডনে পোলাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রিপদ ত্যাগ করায় বৃটেন দুঃখিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে টমাশ আর কিজেউস্কী লণ্ডনে পোল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কিন্তু রুশ-অধিকৃত পোলণ্ডের অধিবাসীরা (লুবলিন পোলগণ) দাবী করিতেছেন যে, পোলিশ কমিটী অফ্ ন্তাশনাল লিবারেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া শত্রুকবলমুক্ত পোলাণ্ডে অস্থায়ী এক সর্ব্বদল-গঠিত সরকার গঠন করা কর্ত্তব্য। ৩রা ডিসেম্বর রুশ সরকারী সংবাদপত্র 'প্রাভদা' পত্র স্পষ্ট জানাইয়াছেন—"the formation of the Arciszewski (৩০শে নভেম্বর গঠিত) Cabinet in London does not solve either the Government crisis or the crisis of the Polish reactionary invigris."

পোলাণ্ডে নূতন মন্ত্রিসভার নিন্দা করিয়া সাংবাদিক-বিচক্ষণগণ বলিতেছেন, এই মন্ত্রিসভায় এমন অনেক মন্ত্রী আছেন, যাঁহারা ইহুদী-বিদ্বেষী, যাঁহারা নাৎসী-সমাজতান্ত্রিক নীতির সমর্থক।

বল্কান ধূমায়িত—

যুগোশ্লাভিয়ায় কিন্তু গ্রীস, ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানের ন্তায় বিক্ষোভ হয় নাই। কম্যুনিষ্ট মার্শাল টিটোর নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে বা সে নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ সমর্থ নয়। চরমপন্থী টিটো আশা করিতেছেন যে, কোন রাজনৈতিক দল যেন চরমপন্থী দেশত্রাতাদিগের কার্য্য পণ্ড করিয়া ধনতান্ত্রিকদিগের সাম্রাজ্যবাদী চক্রপ্রবর্ত্তনে সহায় না হন।

রুমানিয়ায়ও জেনাঃ রাডেস্কুর নেতৃত্বে রুশপন্থী নূতন সরকার স্থাপিত হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়াও বলিতেছে, সে আর পোলাণ্ডের ন্তায় ভুল করিবে না; সে রুশিয়ার সহিত সর্ব্বদা মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবে।

চীনেও কম্যুনিষ্টরা অসন্তুষ্ট—

চীনেও কম্যুনিষ্টদিগের সহিত ধনতন্ত্রবাদী মার্শাল চিয়াং কাইশেক প্রয়োজনকালে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিলেও বর্ত্তমানে আর সহযোগিতা করিতে চাহিতেছেন না। কম্যুনিষ্ট দল চীনে গণতান্ত্রিক সর্ব্বদল-সমর্থিত সরকার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল। চিয়াং কাইশেক সে-প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন

য়ুরোপে জার্ম্মাণীর যে কূটনৈতিক অবস্থা, এসিয়ার চীনের অবস্থা তাহারই অনুরূপ। যে জার্ম্মাণীর উপর প্রভুত্ব করিবে সে-ই সমগ্র য়ুরোপের উপর প্রভুত্ব করিবে। চীন সম্বন্ধেও একই কথা। যে চীনের উপর প্রভুত্ব করিবে, সে-ই সমগ্র এসিয়ার উপর প্রভুত্ব করিবে। মার্কিণ সাংবাদিকরা চীনের ব্যাপার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলিতেছেন—"If the Chinese Communist State within-a-state should ever dominate China the combination of a Communist China's 450,000,000 people and Communist Russia's 190,000,000 people might by sheer numbers and economic resources dominate the world."—চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এ চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনের উপর যদি প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহা হইলে চীনের ৪৫ কোটি নর-নারী এবং কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার ১৯ কোটি নর-নারী মাত্র জনসংখ্যার প্রাবল্য ও অর্থনৈতিক সম্পদের বলে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইবে।

কম্যুনিষ্ট-বিরোধী চিয়াং কাইশেক চীনা কম্যুনিষ্টদিগের দাবী মানিতে অসম্মত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা চায়—

(১) অবিলম্বে চীনা জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করা হউক। চুংকিং সরকার বলিতেছে, যুদ্ধকালে উহা অসম্ভব;

(২) কম্যুনিষ্টদলের সৈন্য-সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭০ হাজার, চিয়াং কাইশেক উহা হ্রাস করিয়া দেড় লক্ষ করিতে পারিবেন না।

জাপাতঙ্ক—

চীনে জাপান যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সকলেই শঙ্কিত হইয়াছে। চুংকিং ও কুনমিং বিপন্ন। তাহারা আর ৭০ মাইল অগ্রসর হইলে চীন-ব্রহ্ম পথে মিত্রপক্ষের সকল যোগাযোগ পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার তাহারা যদি কুইচাও প্রদেশ দখল করিয়া ফেলে, তবে তথা হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সুকঠিন হইবে।

জাপান কিউলিন পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করায় চীন তথা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির কি ক্ষতি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মার্কিণ সাংবাদিকদিগের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"Here in this campaign the Japanese have combined a whole sheaf of objectives—a supply rout safe from submarines; destruction of China's best troops, a political blow at Chungking which will rock the regime to its foundations. But these are secondary considerations. What they wanted most of all was to get us: to get the nest of planes that had accounted for more than half a million tons of Japanese shipping, had killed Japs by the thousands."

চীনের এই অবস্থার ফলে—

(১) চুংকিং সরকার চীনের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের চাউল ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(২) ইন্দোচীনে জাপানের স্থলপথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

(৩) যে সকল ঘাঁটী হইতে চীনস্থিত মার্কিণ বিমানবহর জাপ-জাহাজগুলি ও বন্দরগুলির উপর হানা দিত এবং অতি ক্লান্ত চীনা সৈন্যদিগকে সাহায্য করিত, সে সকল ঘাঁটী হইতে আমেরিকা বঞ্চিত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষীয়গণ বলিতেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে মার্কিণ নৌ ও বিমান-বিক্রমের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া জাপ রণনায়কগণ এশিয়ায় বিভিন্ন দুর্ভেদ্য ঘাঁটী স্থাপন করিয়া আপাততঃ পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির সহিত কোন না কোন প্রকারের আপোষ করিয়া ফেলিতে চায়।

জাপানকে স্বরাষ্ট্রে প্রহার করিবার চেষ্টা যে এংলো-স্যাক্সন শক্তিবর্গ না করিতেছে, তাহা নহে। খোদ জাপানের উপর মার্কিণ বিমান গত মাসে একাধিক বার আক্রমণ করিয়াছে। এবং মিত্রপক্ষ অনুমান করিয়াছে যে, জাপ রাজধানী টোকিও এবং ইয়োকোহামার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ সামরিক তথ্য প্রচার বিভাগ বলিয়াছেন (২৬শে নভেম্বর), জাপান পূর্ব্ব হইতেই এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত—"What are civilian defence activites in London today have long been standard civic responsibilities in Tokyo and other Japanese metropolitan areas. Tokyo can withstand bombing similar to that visited upon Cologne or Berlin and can remain operative."

জাপানের সামরিক শক্তির হিসাব-নিকাশ—

মার্কিণ সহকারী সমর-সচিব মিঃ রবার্ট প্যাটার্সন 'Colliers Weekly' পত্রে লিখিয়াছেন—জাপানের নৌশক্তি এখনও আপদ-স্বরূপ, জাপ বিমান বাহিনীর শক্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদের সৈন্যশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। এ সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, জার্ম্মাণীর পরাজয় হইয়া গেলেও, জাপানকে অনায়াসে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। তিনি হিসাব দিয়াছেন যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জাপান প্রতি মাসে ১২ শত বিমান নির্ম্মাণ করিতেছিল, এখন তদপেক্ষা প্রতি মাসে শতকরা ২৫টি অধিক বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। জাপানের বর্ত্তমান সৈন্যবল ৪০ লক্ষ। ইহা ছাড়া ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক ১০ লক্ষ লোককে এখনও যুদ্ধ করিতে আহ্বান করা হয় নাই। জেনারল ষ্টিলওয়েলের স্থানে নিযুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের সহকারী প্রধান সেনাপতি মার্কিণ লেফ্‌টন্যাণ্ট জেনারেল রেমণ্ড এ হুইলার সাংবাদিকদের এক বৈঠকে মত প্রকাশ করেন (২৩শে নভেম্বর) যে, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপ লাফাইয়া লাফাইয়া জয় করিয়া বেড়াইলেই জাপান পরাজিত হইবে না, জাপানকে পরাজিত করিতে হইলে চীনে ঘাঁটী সংগ্রহ করিতেই হইবে ("Japan would not be defeated by island-hopping. We must get a lodgement in China.")

ভারত-পথ নিরাপদের চেষ্টা—

ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যপন্থীদের অপরিহার্য্য সম্পদ, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ও যুদ্ধান্তে। বৃটেন হইতে ভূমধ্যসাগর দিয়া ভারতে আগমনের সহজ পথ বৃটেন নিরাপদ করিতে চায়। টিউনিস দখলের ফলে তাহার জিব্রাল্টারের দ্বার নিরাপদ হইয়াছে, উত্তর-আফ্রিকা হইতে জার্ম্মাণ-ইটালীয় প্রভাব উচ্ছেদ করিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তট

নিরাপদ হইয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী ও গ্রীসে মিত্রপক্ষের তাঁবেদার না হৌক সমর্থক সরকার স্থাপন করিয়া এক্ষণে বৃটেন উত্তর তট নিরাপদ করিতে চায়। এ স্থানে সোভিয়েট প্রভাবান্বিত চরমপন্থীরা বাধা দিতেছে। তুরস্ক ভূমধ্যসাগরীয় পূর্ব্ব দুই পথ—সুয়েজ ও বস্ফরাসে বৃটেনের সুবিধা করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল—এমন কি, যুদ্ধে যোগদান করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে। রুশিয়া আবার সুর ধরিয়াছে, বসফরাস ও ডার্ডানেলিসকে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বে রাখিতে হইবে। ভারত-পথের লোহিত-সাগরীয় দ্বার নিরাপদ করিবার জন্য উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় বৃটেন আপনার অধিকার যেমন সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তেমনি আরবী-রাষ্ট্রসংঘকে আপনার স্বার্থানুকূল করিবার জন্যও বৃটেন কম চেষ্টা করিতেছে না।

নিউ ইয়র্কের 'ডেলী মিরার' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট্ হাইলে সেলাসি গোপনে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইংরেজরা ইথিওপিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছে। 'ডেলী মিরার' পত্রের লেখক মিঃ ড পিয়ারসন অবগত হইয়াছেন যে, ইংরেজরা ওগাডেন ও হরার দখল করিয়াছে এবং এই স্থান দুইটি আপনাদের কবলগত করিতে চায়। 'রয়টারে'র কূটনীতিক সংবাদদাতা কিন্তু বলিয়াছেন যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে বৃটেন বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন অঞ্চল শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে আপন প্রতাপ বর্দ্ধিত করিবার জন্য বৃটেন সিসিলি দ্বীপকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। গত বৎসর মিত্রপক্ষ যখন সিসিলিতে পদার্পণ করে, তখন হইতে জমিদারশ্রেণী বৃটেনের সাহায্য লইতে চায়। ইহা মনে রাখিতে হইবে—"Sicily is the centre of gravity of the Mediterranean Empire". সিসিলিয়ানরা আজ মনে করিতেছে, বৃটিশসিংহের আওতায় ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য মন্দ হইবে না। ইংরেজরাও মনে করিতেছে—"Control of Sicily, for a nation which already has Gibraltar and Suez, would mean control of the eastern and western basins of the Mediterranean."

হিটলার সম্বন্ধে জনরব—

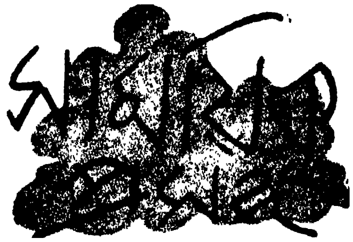
কিছু দিন হিটলারের আওয়াজ শুনা যাইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে গুজব-সম্রাট্গণ গুজব রটনা করিয়াছেন (বিলাতী 'Daly Mail' পত্র), হিটলারের কিছু হইয়াছে; হয় তিনি গুরুতর অসুস্থ, না হয় জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত। লণ্ডনে রাজনীতি লইয়া যাঁহারা নিয়তই মাথা ঘামান, তাঁহারা অমনি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, হিমলার হিটলারকে ছাড়াইয়া উঠিতেছেন এবং হিটলারের অসুস্থতার জন্য হিমলার জার্ম্মাণীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে 'রয়টার' সংবাদ বিতরণ করিয়াছেন যে, হিটলার বেশ সুস্থ আছেন।

ইহার পর জনরব রটে যে, হিটলার ও গোয়েরিং জাপসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাবমেরিণে চড়িয়া রুশিয়ার উত্তরে উত্তর-মেরু অঞ্চল দিয়া যাত্রা করিয়াছেন। ইহার পরই সংবাদপত্রগুলি অনুমান করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, জার্ম্মাণীতে "তিরপিজ" জাহাজ-ডুবির পর হইতেই জাপানের জার্ম্মাণীর উপর ঘৃণা জন্মিতেছে, তরাং জাপ-জার্ম্মাণ বিচ্ছেদ আসন্ন।

মুসলমান পাটচাষী ও মসলেম লীগ সচিবসঙ্ঘ

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গত ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা এক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, সরকার-নির্দ্দিষ্ট পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য উঠাইয়া দেওয়া হউক ও প্রতি বৎসর প্রদেশের প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যের অনুপাতে পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত হউক। প্রস্তাবটি ৫৩—২৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। বাণিজ্য-সচিব মিঃ কে, সাহাবুদ্দিন বলেন, পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের (যেমন চটের) যখন উচ্চতম মূল্য স্থির করা আছে, তখন পাটেরও ঐরূপ মূল্য স্থির করা দোষের হইতে পারে না। এই বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত এক-মত; কিন্তু চটের যে উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত পাটের অনুরূপ মূল্যের তুলনাই হয় না। ১০০ গজ চটের উচ্চতম মূল্য ২৮ টাকা ৮ আনা, আর পাটের বেলা করা হইয়াছে কলিকাতায় "জাত মধ্য" ১৭ টাকা মণ। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সেরের অধিক পাট লাগে না। উচ্চতম মূল্যের হিসাব ধরিলেও এই ৩৫ সের পাটের দাম পড়ে ১৪ টাকা ১৪ আনা। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে পাটকলের খরচ পড়ে ২ টাকা। আরও এক টাকা ধরিয়া দিলে দাঁড়ায় ৩ টাকা। তাহার উপর কলের ন্যায্য লাভ ১ টাকা ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ পড়তা পড়িতেছে ১৮ টাকা ১৪ আনা। এই জিনিস বিক্রীত হইতেছে ২৮ টাকা ৮ আনায়। অতএব প্রতি ৩৫ সের পাটে কলওয়ালারা অন্যায় ভাবে লাভ করিতেছে ৯ টাকা ১০ আনা। গত ফসলে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৫৪,১৩,২০৫ গাঁট অর্থাৎ ২,৭৪,৬৬,০২৫ মণ। হিসাবে দেখা যাইতেছে, সমগ্র ফসলে অন্যায় লাভের পরিমাণ ৩০,২১,২৬,২৭৫ টাকা অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকার উপর। এই টাকাটি কৃষকের ক্ষতি হইতেছে। পাটের উচ্চতম মূল্য বাঁধিতে হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে করিতে হইবে, কলওয়ালার সুবিধা করিয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যজর্জ্জরিত মূক কৃষকের স্বার্থ বলি দিয়া করিলে চলিবে না। উচ্চতম মূল্য ১৭ টাকায় বাঁধিয়া না দিলে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে যেমন হইয়াছিল, তেমনই পাটের দর অন্ততঃ ২৫ টাকা মণ ত হইতে পারিত বরং অনেক অধিক হইত। পাটের নিম্নতম মূল্য কলিকাতায় মণ-করা ১৫ টাকা রহিয়াছে, ইহা ২৮ টাকা হওয়া উচিত এবং ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত হিসাবে কলের খরচ ও লাভ পাওয়া যাইবে। গত ফসলের পূর্ব্ব ফসলে কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা! সে সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। পাট-চাষীর শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান। পাটকলের শতকরা প্রায় ৯০ অংশ ইংরেজের পরিচালনাধীন। মসলেম লীগ সচিবসঙ্ঘ অন্ততঃ অগণিত স্বধর্ম্মীর স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন এ আশা আমরা করিয়াছিলাম; কিন্তু ভারত শাসন আইনের প্রবর্ত্তন হইতে আজ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরে তাহা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, ব্যবসায়ের স্বাভাবিক নিয়মে যে দর উঠিবে, আইনের দ্বারা সচিবসঙ্ঘ সে পথও রোধ করিয়াছেন। পাট-চাষের জমীর পরিমাণ আগামী ফসলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সিকি হওয়া উচিত।



গেল কোথায় ?

ত দুই বৎসর ধরিয়া বন্যার ন্যায় বাঙ্গালা দেশে খরচের স্রোত হিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন খরচ কর, অতএব দার খরচ কর। কিন্তু এক দিন যে এই খরচের হিসাব-নিকাশের লব হইতে পারে, বঞ্চনা-নীতির স্থানীয় কর্ত্তাদের সে কথা মনে ছিল না। আজ অডিটর জেনারেল দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, প্রায় তিন কোটি টাকার হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। উহা সাসপেন্স একাউণ্টে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

হক সাহেবের নিকট হইতে যখন জোর করিয়া পদত্যাগ-পত্র আদায় করা হয়, তখন ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়ের আলোচনা হয়। তখন তিনি তাঁহার বিবৃতিতে বঞ্চনা-নীতির নিন্দা এবং অর্থব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণরের সঙ্গে পরামর্শ না করার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আজ অডিটর জেনারেলও বলিতেছেন, বঞ্চনা-নীতির খাতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার গরমিল রহিয়াছে। তদন্তের যে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাঁহার রিপোর্টও শোচনীয়। এ দিকে এই বে-হিসাবী খরচের দায়িত্ব পাবলিক একাউণ্টস কমিটী লইতে রাজী হইতেছেন না। কিন্তু খরচের জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহারা ত দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। তাঁহারা কি বলেন? এইরূপ ঘটনা নূতন নহে। ব্রহ্মদেশীয় শরণাগতদের জন্য অর্থব্যয় সম্পর্কেও অডিটর জেনারেল গরমিলের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

দুর্নীতি দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তদন্ত নাই, দণ্ড নাই, প্রতিকার নাই। সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার নিম্নেই সর্ব্বাধিক গরমিল আত্মগোপন করে। জনসাধারণের অর্থেই দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়। সুতরাং আমাদের জানিবার অধিকার আছে, এই গরমিলের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে? জনসাধারণের অর্থব্যয়ে উড়নচণ্ডীগিরি করা অনুচিত। ইহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে শাসনের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হইবে। কিন্তু আমাদের আবেদন কি কর্ত্তাদের টলাইতে পারিবে?

ভেল্কি

বাঙ্গালা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ কত ভেল্কিই জানে! হু হু করিয়া মাল খরিদ করিয়া গুদামজাত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু হজম করিতে পারিলেন না। তাই আবার গুদামজাত বহু বাজে মাল টেণ্ডারের সাহায্যে বাঙ্গালা দেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর কত মাল যে নর্দ্দমায় মাঠে ঘাটে গোপনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরানো ও পচা বস্তার টেণ্ডার চাই। এক লক্ষ মণ আস্ত ছোলার টেণ্ডার চাই। কিন্তু এই ছোলা যে *কি অবস্থায় আছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই।* নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বোচ্চ মূল্যের টেণ্ডার ছাড়া এ ছোলা ছাড়া হইবে না। ঠিক কথাই। যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে ত। কিন্তু এই বাজে খাদ্য যাহারা কিনিবে, তাহারা ত বাজারে তাহা বেচিবেই। ফলে বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষের পরও যে অর্দ্ধমৃত ব্যক্তিরা বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও মরিতে হইবে। সাবাস!

স্পষ্ট কথা

ভারত হইতে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি-দল বিলাত গিয়াছেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বলিয়াছেন যে, বিলাতের জনসাধারণ ভারতের কোন উল্লেখযোগ্য খবর রাখে না, সে সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। যাঁহারা খোঁজ-খবর রাখেন অর্থাৎ কর্ত্তারা, তাঁহাদের মতামতকে 'আন্তরিকতা-হীন কথা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের প্রকৃত উন্নতি একমাত্র দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেণ্টই সাধন করিতে পারে। বিদেশীরা পারে না, কারণ, সে সদিচ্ছা তাহাদের নাই। কর্ত্তারা একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ভোজ দিয়া, সম্মানিত করিয়া আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যকে শ্রদ্ধা করে। স্পষ্ট কথা বলিতে ভয় পায় না। এই প্রতিনিধিদল মিথ্যার রঙীন ফানুস ফাঁসাইয়া দিয়া ভারতের মর্ম্মান্তিক কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। ইহাতে দেশের প্রভূত উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্জাব মেল-দুর্ঘটনা

'ভ্রমণ কমাও' বিজ্ঞাপনে সরকার অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন, উপযুক্ত ফল পাওয়া যাইতেছে না। সফর আরও কমান প্রয়োজন। আজ ভারতবর্ষের জনসাধারণের যা অবস্থা, তাহাতে সখ করিয়া বেড়ান সম্ভব নয়। আর ট্রেণের অসুবিধা, ভিড়, গুঁতোগুঁতি কেহ সাধ করিয়া সহ্য করিতে যায় না। যাহারা ট্রেণে যায় তাহাদের উপায় নাই বলিয়াই যায়। সরকার বলিতেছেন, যাত্রিসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সত্য কথা, কিন্তু এই বাড়তী সংখ্যা ভারতবাসীদের নয়, নবাগত বিদেশীদের। তাহা ছাড়া গাড়ীর সংখ্যা যে অত্যন্ত কম, তাহাও তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

কিন্তু এইবার ফল ফলিবে। বিজ্ঞাপনে যাহা সম্ভব হয় নাই, দুর্ঘটনায় তাহা সম্ভব হইবে। পূর্ব্বেকার ভিটা-ট্রেণ-দুর্ঘটনায় যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, আবার নিকটে সম্প্রতি ডাউন পঞ্জাব মেল-দুর্ঘটনার অবস্থা তাহাই, হয়ত আরও শোচনীয়। ইঞ্জিন ও ছয়খানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, আর মৃত্যুসংখ্যা —সে কথা আর নাই বলিলাম! কোন দিন কেহ সত্যকারের মৃত্যুসংখ্যা জানিতে পারিবে না! করাচীর কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর চেয়ারম্যান মিষ্টার খেমচাঁদ নিহত হইয়াছেন। তদন্তে না কি জানা গিয়াছে, 'স্যাবোটেজ'এর জন্য এই দুর্ঘটনা। যাহাই হউক, এইবার ভ্রমণ কমিবে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। যাঁহারা স্যাবোটেজের জন্য দায়ী অথবা যাঁহাদের অসাবধানতা বশতঃ এই দুর্ঘটনা, তাঁহারা পুরস্কৃত হইবেন, না তিরস্কৃত হইবেন?

নিয়ন্ত্রণে গলদ

আমরা অপরাধ না করিয়াও অপরাধী। কর্ত্তাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও অনাচারের ফল আমাদেরই ভোগ করিতে হইতেছে। করদাতাদের অর্থে কত রকম নূতন আপিস হইয়াছে ও হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুষের লেন-দেনও বাড়িয়া চলিয়াছে!

সে-দিন কেন্দ্রীয় পরিষদে সার এডোয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন, ঘুষ ছাড়া রেল ভ্রমণে বার্থ রিজার্ভ করা যায় না। ঘুষ দেওয়া এবং লওয়া উভয়ই পাপ, এ জন্ম জনসাধারণ দায়ী; কারণ, তাহারা ঘুষ দেয়। কিন্তু ঘুষ কি আর সাধ করিয়া দেয়? বাধ্য হইয়া দিতে হয়। না দিলে টিকিট অথবা রিজার্ভেশন মেলে না। সখ করিয়া আজ-কাল কেহ ভ্রমণ করে না। এমন ব্যক্তি—যার না যাইয়া কোন উপায় নেই, অথচ ঘুষ না দিলে যাওয়া যায় না, তাদের জন্ম ঘুষ ছাড়া আর পথ নাই।

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিয়া যাহাদের মাল বিক্রয়ের ভার দিয়াছেন, তাহারা যদি চোরাবাজারী মনোবৃত্তি লইয়া নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক চায়, তখন কি উপায়? বাঁচিতে হইবে ত। খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, ঔষধ চাই। কিন্তু কোন দ্রব্যই নির্দ্ধারিত মূল্যে মেলে না। দোকানীরা পরিষ্কার বলিয়া দেয়, মাল নাই। তখন অনন্যোপায় হইয়া চড়া দামেই মাল খরিদ করিতে হয়। সখ করিয়া কেহ বেশী দাম দেয় না।

আমাদের মনে হয়, কণ্ট্রোলের সিষ্টেমেই কোথায় গলদ রহিয়া গিয়াছে। আইনের বিরাট্ ফাঁক না থাকিলে এ জিনিষ কি করিয়া সম্ভব হয়? কর্ত্তারা বুদ্ধির দোষে অসাধু লোককে সাধু মনে করার ফলে আমাদের প্রাণ যায়!

এ কি শুনি!

রক্ষণশীল চার্চ্চিল মন্ত্রিসভায় মিঃ আমেরীর সহকারীর পদ লাভ করিয়াছেন সমাজতন্ত্রবাদী আর্ল অফ লিষ্টওয়েল। কি করিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাকে দলে লইলেন তাহা বুঝা কঠিন। তাহার উপর নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে রকম ভালো ভালো কথা বলিয়া ফেলিলেন, ভয় হয়, শীঘ্রই আর্ল অফ লিষ্টওয়েল জেনারল হ্বিলওয়েলের পর্য্যায়ে গিয়া না পড়েন! মন্ত্রিসভা চিরকাল ভারতবর্ষকে ইংরেজদের কামধেনু হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। যত চাও দোহন কর। মুখে মিষ্ট কথা বলিয়াছেন, আমাদের অধীনে থাকিয়া যে স্বর্গসুখ ভারতবাসীরা ভোগ করিতেছে, কি করিয়া তাহাদের সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করি? আর্ল অব লিষ্টওয়েলের মত আজ সেই সভায় এক জন সমাজতন্ত্রবাদী কি করিয়া স্থান পাইলেন? তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ নিজের গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে। যদি সেই অধিকার হইতে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বৃটেনের দুর্নাম রটিবে।

এই রকম মারাত্মক কথাবার্ত্তা কি চার্চ্চিল-আমেরী কোম্পানী হজম করিতে পারিবে? লর্ড অব লিষ্টওয়েল তাঁহার কথাকে কত দূর কার্য্যকরী করিতে পারিবেন বলা শক্ত, কিন্তু তিনি যে আন্তরিক ভাবে ভারতবর্ষের দাবীকে মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বন্দি-সমস্যা

কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে অল্প কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাতেই আমরা অস্বস্তি ভোগ করিতেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং সদস্যেরা আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিবার সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, বহু দিন তাঁহারা সে সুবিধায় বঞ্চিত ছিলেন, সেই জন্মই সে সুবিধা তাঁহারা আর লইতে চাহেন না। কেন সুবিধা দেওয়া হয় নাই, তাহা বলা হয় নাই। বন্দীরা কেবল স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক কুশল সম্পর্কেই প্রশ্নাদি করিবার অনুমতি পায়। কিন্তু সরকার কংগ্রেস কমিটীর সদস্যদের প্রতি সেই শিষ্টাচারটুকু পর্য্যন্ত দেখাইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। শুনা যাইতেছে, যাঁহাদের সরকার বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা মুক্তি পাইবেন না। কিন্তু বিচার পাইবেন কি? আর কে বিপজ্জনক, তাহা সরকার কি করিয়া টেষ্ট করেন? যাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই সত্যকার বিনা সর্ত্তে মুক্তি পাইয়াছেন। বন্দীদের ভাতা সম্পর্কেও অন্যান্য বার হইতে অনেক বেশী কড়াকড়ি এবং কৃপণতা দেখা যাইতেছে।

সরকার কি চান? মৃত্যু ছাড়া কি মুক্তি মিলিবে না?

প্রশংসনীয় বটে!

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্স ব্যাঙ্কারদের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্য টাকা রোজগারের কারখানা নহে। * * * আমি প্রায়ই আমেরিকানদের বলিতে শুনি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যটা শোষণের দ্বারা সঞ্জীবিত—নিছক অস্ত্রবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট্ কারবার এবং যে অর্থ স্পর্শ করার নৈতিক অধিকার বৃটেনের নাই, সেই অর্থ আহরণ করিয়াই বৃটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়া আছে।"

দিব্য বক্তৃতা! আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে! কিন্তু আসল জিনিস—সত্য নাই। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে যাঁহারা জানেন—তাঁহারা এই বাণী শুনিয়া হয় কৌতুক বোধ করিবেন, না হয় মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে নৈতিক অধিকার (অথবা অনধিকার) বলে ভারত শাসন করিতেছেন, তাহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ প্রতি বৎসর ভারত হইতে হোম-চার্জ্জ বাবদ একটা মোটা টাকা ইংলণ্ডে যায়। তাহার উপর বহু বৃটিশ কোম্পানীকে ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দিয়া অর্থ আহরণে নির্ব্বিবাদে সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আর এই সাম্রাজ্য গড়িবার ব্যয় ভারতবর্ষকেই দিতে হইয়াছিল, বৃটেন দেয় নাই।

ভারতবাসীকে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িবার অনুমতি না দিয়া বৃটিশ-স্বার্থ বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতের কাঁচা মাল বৃটেনে লইয়া গিয়া 'ফিনিশড্ প্রোডাক্টস' আবার ভারতকেই বিক্রয় করিতেছে চতুর্গুণ মূল্যে। বৃটেনের যে ছেলেগুলির কিছু হয় না, বাপ-মা তাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা জানেন, টাকা লুঠিবার এমন সুবিধা অন্য কোথাও নাই। এবং এই দোহন ও শোষণে সরকার কোন আপত্তি করিবে না।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে কি বলিয়া অভিনন্দিত করিব? তিনি মিথ্যা কথা বলিবার যে অপূর্ব্ব নমুনা ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়!

গভর্ণরের বস্তী-ভ্রমণ

বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসি বাঙ্গালার প্রধান-সচিব ও কলিকাতার মেয়রের সহিত কলিকাতার বস্তী সমূহ প্রদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরিয়া তিনি বিবৃতি দিয়াছেন যে, মানুষ মানুষকে কিরূপে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্ম কাহারা দায়ী, তাহা তিনি জানিতে চাহেন না, কিন্তু ইহাদের উন্নতি-সাধন না করিলে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়, তাহা তিনি উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন গোলযোগ এই উন্নয়নের চেষ্টাকে যেন ব্যর্থ না করে।

কথাগুলি সত্য এবং মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু কে এই উন্নতি-সাধন করিবে? বিরাট্ অট্টালিকাবাসী বস্তীর মালিক কি কোন দিন সেই দিকে নজর দিয়াছেন? ভাড়া পাইলেই হইল। শুনা যায়, ব্যাঙ্কের চেয়ে না কি বস্তী হইতে বেশী 'রিটার্ণ' পাওয়া যায়। বাসিন্দা মরিল কি বাঁচিল, তাহাতে তাঁহাদের কি বা আসে যায়।

বস্তীর এই অবস্থার জন্ম কাহারা দায়ী, সে কথা মিষ্টার কেসি জানিতে চাহেন না, কিন্তু বস্তীর উন্নতির জন্ম কাহারা দায়ী হইবে, সে কথা জানিবার জন্ম আমরা উদগ্রীব।

ফুড কমিশনের রিপোর্ট

ফুড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তদন্তে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কমিশন রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গালা দেশে হয় ত খাদ্যের কিছু অভাব ছিল, কিন্তু সে অভাব দূর করা অসম্ভব ছিল না। চেষ্টা করিলে দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাইত। বাঙ্গালা সরকারের এবং সচিবসঙ্ঘের 'বাংলিং'এর ফলেই এই ভীষণ অবস্থা!

আমরা এই কথা বহু দিন বহু বার বলিয়াছি যে, এই দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট, কিন্তু জনসাধারণের কথা ত সরকার অথবা সচিবসঙ্ঘের কাণে উঠে না। গুজব, মিথ্যা, বাড়িয়ে বলা ইত্যাদি নানা ভাষার প্রয়োগে আমাদের উক্তিটির গুরুত্ব এবং সত্যতা তাঁহারা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বার! সরকারী রিপোর্টকে ত তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না?

যদি সরকার এই রিপোর্টে কোন গুরুত্ব আরোপ না করেন, তবে আমাদের প্রশ্ন, মিছামিছি এত টাকা খরচ করিয়া কমিশন নিযুক্ত করিবার সার্থকতা কোথায়? আর যদি এই রিপোর্টকে তাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের এই মর্ম্মন্তুদ অবস্থার জন্ম দায়ী, সরকার সেই অপরাধীদের জন্ম কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন?

নরেন্দ্র-মণ্ডলের বিক্ষোভ

নরেন্দ্র-মণ্ডল-সঙ্কট সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। অতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, এই গোলযোগের কারণ একটি 'ষ্ট্যাণ্ডিং-অর্ডার'। যে পত্রের দ্বারা এই আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী দ্বারা সাক্ষরিত। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, নরেন্দ্রগণ নরেন্দ্রমণ্ডলে অথবা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীতে তাঁহাদের অভাব অভিযোগ অথবা তদনুরূপ বিষয় সমূহের আলোচনা করিতে পারিবেন না। রাজন্যগণ রাজনৈতিক বিভাগের অধীনে। ফলে রাজন্যগণ স্থির করেন যে, রাজপ্রতিনিধিকে অথবা তাঁহার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সার ফ্রান্সিস উইলিকে না জানাইয়াই উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম—রাজপ্রতিনিধিরূপে লর্ড ওয়াভেলের নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ; দ্বিতীয়—দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসন-সংস্কার; তৃতীয়—ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন। তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-রাজ কর্ত্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বে যেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা হয়। সন্ধি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, রাজপ্রতিনিধি দুই পক্ষের মধ্যস্থ চুক্তির কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, যে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, রাজন্যদিগকে উহার সহিত আলোচনা চালাইবার অধিকার দেওয়া হউক।

এই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। উত্তরে নরেন্দ্রগণ রাজনৈতিক বিভাগের প্রভুত্বব্যঞ্জক একটি কড়া চিঠি পাইয়াছেন। ফলে এই সঙ্কটের উদ্ভব। পরে লর্ড ওয়াভেলকে এই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর মত জানানার ফলে একটা সম্মানজনক মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে! শেষ অবধি কি হইবে বলা কঠিন, তবে রাজন্যগণের এই সৎসাহস প্রশংসনীয়।

পরলোকে আবিরাবালা দেবী

বিখ্যাত ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ আবিরাবালা দেবী গত ৫ই অগ্রহায়ণ চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ছিলেন বাগবাজারনিবাসী স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আবিরা দেবী আদর্শ সতী সাধ্বী রমণী ছিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি শ্বশুর ও পিতৃকুলের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি কোন সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরলোকে শ্বেতাঙ্গিনী দেবী

গত ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার শ্বেতাঙ্গিনী দেবী মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুর "চাতরা কুটীরে" দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সুবিখ্যাত "লিষ্টার এণ্টিসেপ্‌টিক" নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও "চাতরা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ওয়ার্কস্"এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নী। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে অচিরে শান্তি দান করুন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক 'বসুমতী'

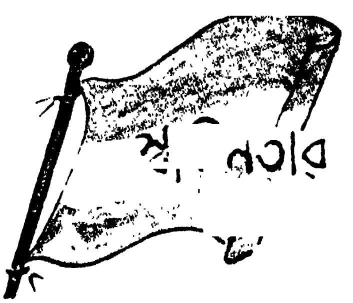


সিন্ধুকন্যা

সচিত্র
মাসিক বসুমতী



সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
২৩শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৫১ | ৩য় সংখ্যা



ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দুসম্প্রদায় আজ এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। যে প্রদেশেই আমাদের সংখ্যাল্পতা, সেই প্রদেশেই বিপদ সমধিক। প্রত্যেক প্রদেশেরই নানাবিধ স্বতন্ত্র সমস্যা আছে এবং তৎসমুদয়ের সমাধানের জন্য সকল প্রদেশকেই স্বাধীন ভাবে মনোযোগী হইতে হইবে; কিন্তু যে সমস্যা সংখ্যাল্প হিন্দু-প্রদেশমাত্রের পক্ষেই সমান সম্মিলিত প্রয়াস এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন তাহার সমাধান একরূপ অসম্ভব। হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা আবশ্যক। স্বার্থসন্ধী বিরোধীদলের অপচেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইলে সর্বাগ্রে হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে, জনমত সুগঠিত করিয়া স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দুর সমস্যা শুধু হিন্দুরই সমস্যা নয়, ভারতের সমস্যা, হিন্দুর স্বার্থের প্রতিকূলতাচরণ ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

রাজশক্তি হিন্দুর প্রতি বিমুখ। ভারতশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ অরক্ষিত হইয়া পড়িবে—এই সুচিন্তিত এবং সুকল্পিত ওজুহাতটিকে তাঁহারা নানা কৌশলে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের যে সৌহার্দ্য তাহার মধ্যে আন্তরিকতা কোথায়? হিন্দুসম্প্রদায় যেখানে সংখ্যালঘু, যেখানে তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার বিপর্যাস্ত, সেখানে তাঁহাদের হৃদয়-বিগলনের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না কেন?

ব্রিটিশের ভারতশাসন পদ্ধতির মধ্যে ভেদনীতিটাই প্রাধান্য পাইয়াছে। মুসলিম লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে যেখানেই শাসনভার পড়িয়াছে সেখানেই দুঃশাসনের স্বরূপ পরিস্ফুট। তাহার হাতে শুধু হিন্দু নয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরও লাঞ্ছনার সীমা নাই। দুর্যোধনের প্রশ্রয় পাইয়া দুঃশাসন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর একমাত্র অপরাধ—স্বদেশপ্রীতি। বিদেশী শাসনশক্তির লৌহশৃঙ্খল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া স্বনিয়ন্ত্রিত অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাহার কাম্য। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিন্দুর এই স্বাধীনতা-প্রিয়তাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন কেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব—কি হিন্দু, কি মোগল, কি পাঠান সকলেই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলি যদি শক্তিশালী হইয়া রাষ্ট্রেরই অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ মহাশক্তি-সম্পন্ন হইবে। সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজও সে কথা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই বিপরীত পথ ধরিয়াছেন। অখণ্ড ভারতবর্ষের শক্তিমত্তা তাঁহাদের বিভীষিকা-স্বরূপ, তাই খণ্ডনের দিকেই তাঁহাদের আনুকূল্য।

এক দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, অন্য দিকে তাঁহাদেরই প্রসাদপুষ্ট সংকীর্ণ স্বার্থলোলুপ আত্মঘাতী ভারত-ব্যবচ্ছেদকামী মুসলমান দলবিশেষ—ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে এই দুইটি হইল প্রধান অন্তরায়। আশ্বাসের বিষয় এই যে, এই সব বিরোধীদলের প্রতিরোধ প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু শত্রু যখন মিত্রের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, আশঙ্কা তখনই। আমাদের আপন সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বাহ্যতঃ বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত। তাঁহারা বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কাল্পনিক কল্যাণের নামে আত্মকলহের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। অবাস্তবের অলীক স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাঁহারা স্বদেশ এবং স্বজাতির সর্বনাশ আহ্বান করিয়া আনিতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অনুসরণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাপূর্বক ধর্মসমস্যা আনয়ন করিয়া জাতিকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া সাম্রাজ্যবাদের লৌহদণ্ডকে সচল ও সবল রাখিবার চেষ্টা

ভারত-শাসনপদ্ধতির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। পৃথিবীর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার উদ্বোধন হয় নাই। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। এক রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম বর্তমান থাকিবে। এক ধর্ম্মের প্রতি অন্যধর্মী সম্মান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। প্রত্যেকে আপন আপন মত অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার পাইবে—যে কোনো সভ্য দেশে ইহাই ত লোকে আশা করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজশাসন যেন হিন্দুর প্রতি মার-মূর্ত্তি ধরিয়াই আছে। কলে কৌশলে হিন্দুর কণ্ঠরোধ করিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চাপা দিবার জন্য তাহার চেষ্টার আর অন্ত নাই। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি ? হিন্দুর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অর্থই যে দেশের স্বার্থ ব্যাহত করা, ইহা জানিয়াও কি জনসাধারণ তাহার প্রতিকারের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে না ?

ভিক্ষোপজীবীর মত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভারতবর্ষ কাহারও দ্বারস্থ হইবে না, ভারতবর্ষ আজ মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবীতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকালের চেষ্টায় এটুকু উপলব্ধি করিয়াছে—স্বাধীনতা চাহিয়া পাওয়ার জিনিষ নহে, উহা কাড়িয়া লইতে হয়। ভারতবাসী দস্যুর ন্যায় পররাজ্যের উপর লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, সে কেবল আপন দেশে আপন ইচ্ছামত বিচরণ করিতে চায়। স্বদেশে থাকিয়া প্রবাসীর দুঃখ ভোগ করা তাহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দেশটাই যে আজ তাহার পক্ষে অনর্গল বন্দিশালা। তাহা হইতে সে মুক্তি চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে জগৎ কোন্ সম্পদ্ পাইয়াছে ? বস্তুভাবে এই সভ্যতা যতই দুর্ভর হউক না কেন, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো পথ কি সে প্রদর্শন করিয়াছে ? সাম্যের বাণী পশ্চিমের মুখে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সাম্যের সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম কি কখনও কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়াছে ? করিবে কি করিয়া ? পশ্চিমের সভ্যতা তো ঐক্যপন্থী নয়, বৈষম্যই তাহার মূলমন্ত্র। পশ্চিমের রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যই হইল আত্মশক্তি সম্প্রসারণ, অন্যশক্তি সংকোচন। তাই বৃহত্তর শক্তিসমূহ ক্ষুদ্রতর শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া স্ফীতোদর হইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। বিধাতা স্বয়ং তাঁহাদিগকে দীন-দরিদ্রের রক্ষাকর্ত্তা করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। তাঁহারা উচ্চ জাতি, নিম্নতর মনুষ্য জাতি তাঁহাদেরই অভিভাব্য—এই বিশ্বাস তাঁহাদের মন হইতে এখনও মুছিল না। পাশ্চাত্য জাতির এই অভিভাবকতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আজ সমগ্র জগতে মুখর হইয়াছে, তাহার উদ্ভব কেবল প্রাচ্যদেশেই নয়, পশ্চিমের নিপীড়িত মানব- সাধারণও তাহার অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

স্থায়ী শান্তি যতই কাম্য হউক, খাদ্য-খাদকের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। স্বয়ং বিবাদীই যখন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত, সেখানে বাদীর ভরসা কোথায় ? ব্রিটিশরাজ স্বচ্ছন্দ মনে ভারতবর্ষের হাতে স্বাধীনতা তুলিয়া দিবেন, ইহা কেহ কল্পনাও করিবে না। কিন্তু যুধ্যমান যাবতীয় বৃহৎ শক্তির আজ এ কথা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে যে, ভারতবর্ষ যত দিন না স্বাধীন হয়, তত দিন পর্য্যন্ত বিশ্ব-শান্তির আশা মরীচিকার মতই দুর্গম দূরত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কথা আজ কাল প্রায়ই শোনা যায়। বিভিন্ন মতবাদ, আদর্শ এবং চিন্তাধারার প্রতীক এই নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোককে এ দেশে পাঠানো হইতেছে। তাঁহারা পূর্বকল্পিত কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া ভারতে অর্থনৈতিক দুর্গতি ও দুরবস্থার জন্য যথানির্দিষ্ট অশ্রু এবং উপদেশ বর্ষণপূর্বক প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর চোখে ধূলি দিবার পক্ষে এই নীতি হয়তো কতকটা কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু ভারতের উন্নতির কোনো উপায় তো এই নীতির মধ্যে নিহিত নাই। এই নীতির মধ্যে কেন, কোথাও তাহা নাই। ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় স্বাধীনতা লাভ। ভারতবর্ষ যে দিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবে, অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সেদিন তাহার পক্ষে আর কঠিন থাকিবে না। কিন্তু আমাদের শাসকসম্প্রদায় শৃঙ্খলার নামে পদে পদে নূতন শৃঙ্খল যোজনার কৌশল ভাল ভাবেই জানেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র ঐক্যসাধনা। বিচিত্রের মধ্যে একের সন্ধান করাই তাহার লক্ষ্য। বিভিন্ন জাতির বহু বিচিত্র সভ্যতার বহুমুখী প্রবাহ আসিয়া এই ভারতের মহামানবের সমুদ্রসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। ঐক্যনীতির ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিপালিত ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সাহিত্যে ও শিল্পে, ধর্মে ও কর্মে, সমাজে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অপূর্ব সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের আদান-প্রদানের অবসরে কখনও যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, এমন কথা বলি না ; কিন্তু সে সংঘর্ষ স্থায়ী মিলন সাধনের অন্তরায় হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও মাঝে মাঝে সংঘাত লাগিয়াছে বই কি ! কিন্তু আজ তাহার যে বীভৎস মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে তেমনটি বোধ হয় কখনও দেখা যায় নাই। সাম্প্রদায়িকতার সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দুরতিক্রমণীয় অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে, রাজনীতির খাতিরেও তাহা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু আমার মত এই যে, দুরতিক্রমণীয় হইলেও এ বাধা অনতিক্রমণীয় নয়। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যদি জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্য সমান নাগরিক অধিকার দিতে সর্বান্তঃকরণে সম্মত হন তো সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্যবিধানের জন্য শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা দিতে হইবে, কোনো বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত থাকিলে তাহাদের শিক্ষাবিধান এবং অর্থনৈতিক সমুন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থা যে শুধু অনুন্নত সম্প্রদায়কেই উন্নীত করিবার জন্য আবশ্যক তাহা নহে, সমগ্র দেশের উন্নতির জন্যই ইহা আবশ্যক। জীবদেহের ন্যায় সমাজ-দেহেরও এক অঙ্গে ক্ষত হইলে সর্বাঙ্গেই বিষসঞ্চারের আশঙ্কা জন্মে। সর্ব অঙ্গের পরিপোষণ দ্বারাই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কাম্য, কিন্তু তাই বলিয়া সমাধানের নামে যদি কেহ সর্বনাশ আহ্বান করিয়া আনিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। স্বয়ংনির্বাচিত যে সব দেশনায়ক সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দূরীভূত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, তাঁহারা আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এখনও সাবধান না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বরাভয় সমগ্র দেশের পক্ষে অভিশাপ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। অসুর ভস্মলোচন শিবের কাছে বর পাইয়া

শিবের উপরেই তাহার লোচনদ্বয়ের শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শিব এবং অশিবের দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে। অশিবকে স্বীকার করিয়া লইলে শিবের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

সত্যকার হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবার জন্য দেশহিতৈষী সকল ব্যক্তিই প্রস্তুত আছেন, কিন্তু অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে সেই মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির অখণ্ডতা যাঁহাদের কাম্য নয়, ইহাকে বিভক্ত করিয়া ইহার কিয়দংশ লইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রচনা না করিলে এ দেশে বাস করা যাঁহাদের কাছে প্রত্যবায় বলিয়া গণ্য হইতেছে, যাঁহাদের রাষ্ট্ররচনা সত্যে পরিণত হইলে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী কোটি কোটি হিন্দুর স্বীয় স্বাজাত্য-মর্যাদা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে—তাঁহাদের সহিত কোনো প্রকার আপোস মীমাংসা সম্ভব নয়। ব্যবচ্ছেদের নীতিতে নহে, অখণ্ডতার আদর্শেই দেশের কল্যাণ। জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা ভিন্ন সে কল্যাণ সুদূরপরাহত। কেন্দ্রে শক্তিশালী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পপ্রসার, যানবাহন প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উপর ভারতের মঙ্গলামঙ্গল প্রধানতঃ নির্ভর করে, সে সকল বিষয় পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপরে প্রদেশসমূহ গঠিত হইবে। আপন আপন উন্নতির জন্য প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র চেষ্টার স্বাধীনতা থাকিলেও জাতি হিসাবে সমগ্র ভারতের সংহতি ও সমুন্নতির এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি অর্জন ও বৃদ্ধির পথে যাহাতে কেহ কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে, শাসন-পদ্ধতির মধ্যে তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

সুদূর অতীত কাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আসিয়া ভারতবর্ষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই। আর্য-অনার্য, মোগল-পাঠান, শক-হূন যে যখনই আসিয়াছে, ভারতের অবারিত সদাব্রতে সে তখনই সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছে। মানব জাতির এই মহামিলন-তীর্থক্ষেত্রের দ্বার আজও রুদ্ধ হয় নাই। বিজাতি বিধর্মী বলিয়া ভারত কাহাকেও ঘৃণা করে না, কিন্তু অন্যের ঘৃণা সহ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত নহে। পরকে আপন করিবার জন্য ভারত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আছে। পরদেশ হইতে আসিয়াও যে ভারতকে স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করে, ভারতবর্ষ তাহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত নহে। ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও যে সকল মুসলমান আপনাদিগকে ভারতের সন্তান বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, ভারত-মহাজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া ভারতের সুখদুঃখের সম্পদ্-বিপদের সমান অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে একটি গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর আনুকূল্যের আওতায় থাকিয়া তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যে সব ব্যক্তি বিপথে পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থের দোহাই দিয়া আশু লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা কল্যাণের নহে। সমগ্র জাতির স্বার্থকে বলি দিয়া যাঁহারা আত্মস্বার্থের দিকে অধিকতর মনোযোগী তাঁহারা জাতির শত্রু—এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে হইবে।

হিন্দুর মধ্যেও অনেক দোষ অনেক ত্রুটি আছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বহু দুর্গতি আমরা নিজের হাতেই সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি। আত্মীয় বলিয়াই যে তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্ধ থাকিব, এ কথা কখনও বলিব না। নিজের দোষ পরিহার না করিলে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করা নিষ্ফল। হিন্দুকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা এক মহান্ জাতির বংশধর। তাঁহাদের গৌরবময় ঐতিহ্য সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছে। বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হইয়াও তাহা উন্নতমস্তকে কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। তাহার বিনাশ নাই। আমরা সেই উজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়া উজ্জ্বলতর যুগোপযোগী ভবিষ্যৎ রচনা করিবার জন্য নির্ভয়ে অগ্রসর হইব।

ভারতবর্ষ মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মান দিয়াছে। একের উপর অন্যের প্রভুত্ব সে কখনও সহ্য করে নাই, মনুষ্যত্বের মর্যাদানাশকারী বলিয়া দাসত্বকে সে ঘৃণা করিয়াছে। দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসন আমাদের সেই মুক্তির উদগ্র বাসনাকে চাপা দিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু আশার নবারুণ কিরণসম্পাতে আজ নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত মেঘ অপসৃত।

আজ নবজাগরণের বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ আর নিদ্রিত রহিবে না। অপ্রতিহত বীর্যের দ্বারা, অপরাজেয় শৌর্যের দ্বারা ক্লৈব্যবিনাশী পৌরুষের দ্বারা সে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিয়া লইবে। মানুষের মধ্যে যে অসুর-মর্দিনী দেবী শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সে শক্তিমান্ হইবে।

কুরুক্ষেত্রে যে দেবতা মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ", তাঁহাকেই আমাদের অন্তরের আসনে আজ উপবিষ্ট দেখিতেছি। ভীরুতার পথে, নির্বিরোধ নিশ্চেষ্টতার পথে চলিলে যে নিশ্চিত মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হইবে, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। ত্যাগের মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া, অনলস তপস্যার মধ্য দিয়া সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে শক্তির সাধনা করিতে হইবে। ভাবের ললিত ক্রোড়ে উপবিষ্ট না থাকিয়া উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে হইবে। উপলব্ধি করিতে হইবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

স্বাধীনতার সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বারংবার নিষ্ফল হইলেও তাহা এক দিন সার্থকতায় সম্পূর্ণ হইবে। যে রুদ্রের দক্ষিণমুখ আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছে, তাঁহার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানাই :—

"করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেহ ও দেহী

মানুষের বিচিত্র এই আধার—এই দেহ-মন-প্রাণের সূক্ষ্ম অনুপম যন্ত্র, যাকে সম্বিৎ বা চেতনা "আমি" জ্ঞানে আঁকড়ে রয়েছে ও প্রায় এক চেতন পুরুষে (personality) পরিণত করেছে। যোগ সাধনার পথ ধরতে গেলে আগে বুঝতে হবে এই সম্বিৎ বা চেতনা আসলে কি বস্তু—যা' দেহ-মন-প্রাণময় এই যন্ত্রকে এমন করে "আমি"-জ্ঞানে আত্মসাৎ করে নিয়ে আনন্দ-সুখ-দুঃখ-আস্বাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। শুধু চৈতন্য-তত্ত্বই নয়, এই জটিল সূক্ষ্ম (delicate) যন্ত্রটিই বা কি এবং কোথা থেকে এ যন্ত্র বা সম্বিৎপাত্র এলো, কোন্ অনুপন তত্ত্বের ও শক্তির মাঝে এ আধের গজিয়ে উঠলো? এই প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধানই হলো যোগ-সাধনার সূত্র ও লক্ষ্য। ভগবান বলে যদি কিছু থাকে—তা' হলে তা' এই চৈতন্যতত্ত্ব থেকে পৃথক্ কিছু নয়; কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর ও অনুভবের বস্তু এই জগৎ-চরাচর তো এই সম্বিতেই ভাসছে, তারই মাঝে উদয় ও লয় হচ্ছে। সে মূল বস্তু বুদ্ধি-মনের অগোচর—আপাততঃ তা আমাদের নাগালের বাইরে; ভূতপ্রেতের মত তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুধু আমাদের শোনাই আছে, তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন জ্ঞানই আমাদের নাই। জগতের মূল তত্ত্ব বা উপাদানের কোন জ্ঞান আমাদের নাই। কারণ, আমরা সে বস্তু কখনও খুঁজে দেখিনি, তাকে বোঝবার কোন প্রয়াসই করিনি। যার মধ্যে এই তত্ত্বানুসন্ধান জেগেছে, সেই হচ্ছে মুমুক্ষু; তারই জন্য যোগ-সাধনা।

এখন কি করে কোন্ পথে এই খোঁজা আমরা আরম্ভ করবো? পল্লবগ্রাহী স্থূলবুদ্ধি আমরা যে শুধু শাখা ধরে ঝুলছি, এই জগৎ প্রপঞ্চরূপ ঘনপল্লবিত শাখা-প্রশাখার অন্তরালে সেই গোপন মূলকে অন্বেষণ করবো কোন্ বস্তুকে সূত্ররূপে ধরে? জগতে আমরা যা' কিছু দেখছি, অনুভব করছি, তার মধ্যে আমার এই আমিত্ব ও এই আধারের চেয়ে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত এবং এত কাছে আর কি বস্তু আছে? তাই এই সমস্যার সমাধান হয়তো খুব সহজেই মেলে যদি আমার "আমিত্ব"কে ধরে এই অনুসন্ধান আরম্ভ করি। প্রথম প্রথম এই খোঁজা এই পরিচয় আরম্ভ হবে অবশ্য মন-বুদ্ধিরই দ্বারা, তার পর জাগবে দীপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সাংখ্য-দর্শন বলছে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিয়ে এই জীব-জগৎ সৃষ্ট হয়েছে;—যথা পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত। এই ভাবে কেউ বলছেন জগতের উপাদান হচ্ছে পঁচিশটি; কেউ বলছেন বারোটি; কেউ বা বলছেন দশটি মাত্র উপাদানে এই জীব-জগৎ গড়ে উঠেছে। আসলে এ সব হচ্ছে বুদ্ধির ও তর্ক-বিচারের কচকচি; পুথিগত দর্শনশাস্ত্র পাঠে কিন্তু কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না, মন-বোঝানো একটা বিচার বা বিশ্লেষণ হয় মাত্র। এ রকম বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিজীবী (intellectual) মানুষের বুদ্ধিবিলাস-জনিত একটু তৃপ্তি হতে পারে, প্রত্যক্ষ পরমার্থ জ্ঞানের পথে মানুষ এক-পা এগোয় না।

এই বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব বা উপাদানের (ভগবান) কথা আপাততঃ ছেড়ে দিই। সে বস্তু তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলে চক্ষু-কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাহিরে; ইন্দ্রিয়ের চেয়েও সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধিরও তা' না কি অগোচর পদার্থ—"অবাঙ্‌মনসগোচর"। এই স্থূল জড় জগতের সূক্ষ্ম শক্তি যথা বিদ্যুৎ, ম্যাগনেটিজম্, ইথার, আকাশ, স্থূলের ও শক্তির কণা পরমাণ—atom ও electron এ সব কিছুই ভগবানের মত অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ, এদের কাউকেই আমরা সহজে ধরতে ছুঁতে পারি না; অথচ তারা জগৎ-চরাচর ব্যেপে রয়েছে। চোখে না দেখতে পেলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করতে পারলেও বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম (delicate) যন্ত্র-সাহায্যে তাদের ক্রিয়া ধরে তাদের অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি; কিন্তু স্বরূপতঃ তারা যে কি, তা' আমরা অনুমান করি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারি না। জড়-বিজ্ঞানের এত লাফালাফি ইলেকট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম, রেডিয়ম ইত্যাদির বাহ্য ক্রিয়া ও গুণ নিয়েই; তাদের আসল স্বরূপ সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞান অন্ধ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি বা energyর রাজ্য থেকে স্থূল জড়ে নেমে আমরা দেখতে পাই, সেখানে কতকগুলি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থকেই আমরা চিনি—শুধু নামে ও রূপেই—স্বরূপতঃ নয়। অগ্নি, জল, বায়ু, ধাতু—এরা সব আমাদের কাছে গোটা কতক নাম মাত্র, কোনোটা বা কেহ দৃশ্য পদার্থ। তারা কোথা থেকে এলো, কি মূল পদার্থের বা শক্তির তারা পরিণতি, এ খবর আমাদের জড় বিজ্ঞানের পুথিগত বিদ্যা দেয় নেয় না। একগাছি তুচ্ছ তৃণ কোন্ নিগূঢ় জীবনী-শক্তির বলে হরিত, পীত, রক্ত বর্ণ নিয়ে গজিয়ে ওঠে তার সঠিক তত্ত্ব আমাদের জানা নাই। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী—তিনেরই সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অসীম ও অটুট, অথচ এই তিনই অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট ও পরিস্ফুট চেতনা বলে জড়-বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনবুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে নিশ্চিত করে পাওয়া যে-সব বস্তুকে আমরা চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নি, সে সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের অভ্রান্ত নয়। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হলেই শুধু হলো না, কারণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা স্থূল বস্তু সম্বন্ধেও সব সময়ে আমাদের সঠিক খবর দেয় না, আপাত-প্রতীয়মান আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা তারাও অনেক সময় প্রতারিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যা প্রত্যক্ষ করে, বা বোধ করে, স্নায়ু তারই সংবাদ বয়ে মন-বুদ্ধির কাছে হাজির করে—তা' সে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বা শব্দ সত্যই হোক আর আপাত-প্রতীয়মান অলীকই হোক। রোগী প্রলাপের ঘোরে কত কি অলীক বিভীষিকা দেখে, ধ্যানে মনকে একটু স্থির করতে পারলেই বস্তু-নিরপেক্ষ কত না রূপ ও দৃশ্য চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে, পুষ্পাদি গন্ধ দ্রব্য ছাড়াও কত অপূর্ব্ব পুষ্পগন্ধ ধূপ-চন্দন-গন্ধ পাই। এ সবও তো চোখে দেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার। তা' বলে কি সব ক্ষেত্রে সেগুলি স্থূল জগতের সত্য? সুতরাং সত্য নির্দ্ধারণে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই সব চেয়ে বড় এবং অকাট্য প্রমাণ নয়। বস্তুর যেটুকু আমরা চোখে দেখি, স্পর্শে পাই, স্বাদে গন্ধে জানি, সেটুকু হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে অতি ভাসাভাসা বাহিরের পরিচয় মাত্র। আমাদের মন-বুদ্ধি সেইটুকু নিয়েই নাড়াচাড়া করে; বস্তুর আসল ও গভীরের পরিচয় সে জানে না। সুতরাং সৃষ্টির মূল তত্ত্ব বা ভগবানকে চোখে দেখিনি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইনি বলে সে-বস্তু নাই, এ কথা নিতান্ত-স্থূলবুদ্ধি অর্ব্বাচীনের কথা! তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এইটেই আসল কথা।

আমরা চেতন মানুষ হলেও এ জগৎ-সংসার আমাদের

আসলে সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গেছে! তার সঙ্গে আমাদের এমনি ভাসা-ভাসা বাহিরের পরিচয়! এমন কি, আমি নিজে স্বয়ং যে কি বস্তু, কোথা থেকে আমার উদয়, কিসে আমার পরিণতি, তার কিছুই আমি জানি না। অহং-জ্ঞানে দেহটাকে ধরে তন্ময় হয়ে জীব-চেতনা ঘুরছে ফিরছে জীবন কাটাচ্ছে,—তা' সে দেহ মানুষের সুদর্শন-তনুই হোক, পশুরই হোক, আর কীটপতঙ্গ-সরীসৃপের কদাকার শরীরই হোক! আর এই যে আমি-বোধে দেহকে আপন করে নেওয়া, এটিও হঠাৎ হয়নি, বহু বছরের চেষ্টায় ও অভ্যাসে ক্রমশঃ শিশু-চেতনা দেহকে বশে এনেছে, এর উপর পূর্ণ অধিকার বা **control** পেয়েছে। দু'হাতের দশ আঙ্গুলে সব কিছু ভালো করে ধরতে, গুছিয়ে কাজ করতে, দু'পায়ের ভরে পড়ে না গিয়ে ভার-সাম্য রেখে সুচারুরূপে চলতে, স্বচ্ছন্দে নৃত্য করতে, কণ্ঠ ও জিহ্বা ইত্যাদির দ্বারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করতে, কাণে শব্দ শুনে তার দূরত্ব পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করতে আমাদের দশ পনের বিশ বছর লেগে গেছে। জীব-চেতনা যে দেহ নয়, দেহ যে তার ব্যবহারের যন্ত্র, এই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবচেতনা শৈশবে সদ্যোজাত অবস্থায় সকল সংস্কারমুক্ত নির্ম্মল অবস্থায় এসে প্রথমে দেহকে আশ্রয় করে, তার পর বহু বৎসরের অভ্যাসে তবে সে দেহী হয়ে নাম-রূপের ফাঁদে ধরা পড়ে। যোগী অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে সজ্ঞানে আবার নাম-রূপের ফাঁশ্ খুলে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে তার নির্ম্মল অবস্থায় ফিরে যান; সজ্ঞানে আপন পরম অখণ্ড স্বরূপের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় করেন। ভুল-পথে অভ্যাসের বলে যে বন্ধন যে খণ্ডতা যে বিকৃতি এসেছিল, ঠিক পথে অভ্যাস-বশেই তার হয় বিলয় ও বিমুক্তি।

এই দেহাধ্যাস-জনিত জড়বুদ্ধি থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন; দেহ-মনের নাগপাশ ছাড়াতে কঠিন কঠিন ক্রিয়া ও অমানুষিক প্রয়াসের দরকার, এই রকম একটা ধারণা মানুষের গজিয়ে গেছে। এটা যে খুব সহজে চিরাভ্যস্ত পথে হতে পারে, আংশিক ভাবে জীব মাত্রেই যে এই নির্ম্মল বিদেহ অবস্থায় প্রায়ই গিয়ে অবস্থান করে, এটা আমরা জেনেও জানি না। এই দেহকে আমরা প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রায় ছেড়ে দিই, নিদ্রিত অবস্থায় আমরা ক্ষীণ **attenuated** সম্বিৎ দ্বারা দেহকে ছুঁয়ে থেকে স্বপ্ন বা সুষুপ্তির মাঝে অবস্থান্তরে চলে যাই; তখন অহং-জ্ঞান থেকে মুক্ত জড় দেহটা অচল নিষ্পন্দ ভাবে এই স্থুল জগতে পড়ে থাকে। এটি এক প্রকার সহজ চিরাভ্যস্ত যোগেরই ক্রিয়া। অনেক সময় মূর্চ্ছায়, ব্যাধিবিকারে, আকস্মিক আঘাতে, ঔষধ-প্রয়োগে বা সমাধিতে দেহ নিষ্পন্দ নিষ্প্রাণ শীতল মৃতবৎ হতে দেখা যায়। আবার সে মোহ মূর্চ্ছা বা সাময়িক মৃত্যুর কারণ ঘূচে গেলে নিদ্রোত্থিতের মত আমরা পরিত্যক্ত দেহকে কুড়িয়ে নিই, তুলে রাখি আত্মচেতনার মাঝে সাদরে নিতান্তই আপন করে। এই কুড়িয়ে নেওয়া এবং ফেলে দেওয়া—দু' কাজই আমরা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে করি, নিত্যনৈমিত্তিক চিরাভ্যস্ত ঘটনা বলে' এটাকে তলিয়ে বুঝি না।

তবেই দেখো, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক জীবমাত্রেই দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্ততঃ কিছু কালের জন্য দেহে আমিত্ব-বোধের পূর্ণ গ্রাস ত্যাগ করে বিদেহ অবস্থায় থাকে; তাতে পরিশ্রান্ত দেহ বিশ্রাম পায়, সারা দিনের অক্লান্ত কর্ম্ম ও চিন্তাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি সে কতকটা পূরণ করে নিতে পারে। দেহ তখন ধরা থাকে মনের অতীত জ্ঞানে **super-conscious** ছন্দে, "আমি-জ্ঞানে"র মোহে নয়। শুধু নিদ্রা নয়, দেহের প্রাণ মন স্নায়ুর বহু ক্রিয়াই আমর যোগময় অবস্থায় করে থাকি, **super-conscinos** জ্ঞানে; ে কার্য্যাদি সাধারণ অহং-জ্ঞানে করি না। আমাদের মন প্রাণ জটি দেহযন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক গতিকে অভিনিবেশ দিয়ে তলিয়ে দেখলে আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। দেহ ধারণ, দেহের পুষ্টির তার ক্ষয়পূরণ ও পুনর্গঠন, তার মল-শোধন ও রসরক্ত-চালনা অধিকাংশ কাজই আমাদের অহং বুদ্ধির বাইরে কোন এক মহাচেতনা স্বয়ংক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দে হয়ে চলেছে। সে সব কঠিন সূক্ষ্ম ও জটি কাজ শুধু যে আমরা আদৌ সজ্ঞানে বুঝে-সুঝে করি না, তা নয় অধিকন্তু তার কোন সংবাদই আমরা রাখি না। অহং-জ্ঞানে আমর জীবনের চার আনা কাজই চালাই, তার বারো আনা চলে নাহং-এ আমাদের হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, জঠর, মলাধার, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা পেটের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র, প্রত্যেকটি কোষের এই যে সুনিপুণ অভ্রান্ত যথাযথ গতি, এ-সব কি চলছে সজ্ঞানে, না অজ্ঞানে? অহং-জ্ঞানে বশে কখনই নয়; কারণ আমাদের বহির্মুখী ভাসাভাসা মন-বুদ্ধি এ সব জটিল পরস্পর অনুপূরক ক্রিয়ার কোন সন্ধানই রাখে না। জটি সূক্ষ্ম পরম আশ্চর্য্য এই দেহ-যন্ত্র! সামান্য ভুল ত্রুটি ব্যতিক্রম না করে নির্ভুল ও সঠিক ভাবে এতগুলি যন্ত্রের সহযোগিতা এত কাজ হচ্ছে কোন্ অব্যর্থ জ্ঞানে? এ অনুপম দেহ-যন্ত্র চলছে সুতরাং অহং-বোধে নয়, অজ্ঞানেও নয়, কারণ তা হলে মূঢ় এই যন্ত্রের **mechanical** চালনায় বহু ভুল ও ছন্দপতন ঘটতো এই পরমাশ্চর্য্য ক্রিয়া-ধারা চলছে বৃহতের ও ঊর্দ্ধের ধ্রুবজ্ঞানে, যে-জ্ঞা একেবারে অভ্রান্ত—স্বতঃস্ফূর্ত্ত যার ক্রিয়া। স্বয়ম্প্রভ সপ্রকাশ অপলক ে জ্ঞানের সম্পুটে জীব হয়ে তুমি আমি জন্মাচ্ছি, চলছি, বাল্য কৈশো যৌবন বার্দ্ধক্য দশায় পরিণত হচ্ছি, দেহ ত্যাগ করছি।

এই ভাবে স্থির ও গভীর অভিনিবেশে ধ্যানস্থ হয়ে বিচার কর সহজেই বোঝা যাবে যে,—চৈতন্য কি এক অপূর্ব্ব ভাস্বর পদার্থ যাে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন,—**self-contained self-deperminin** —স্বয়ম্ভু স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বয়ংক্রিয় বস্তু। মন-বুদ্ধি এই পরাজ্ঞান থেকে ধার করা আলো যে ধ্রুব জ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলছে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং" "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্" "যচ্চক্ষুংসি ন পশ্যতি যেন চক্ষুষা পশ্যতি" ইত্যাদি। তিনি সপ্রকাশ আছেন বলেই স কিছু প্রকাশিত, মন যাকে মনন করতে পারে না, যিনি মনকে মন করেন, চক্ষু যাঁকে দেখতে পায় না অথচ যিনি চক্ষের দ্বারা দেখেন।

এই চিন্মণির কোষ বা চৈতন্যাধার হচ্ছে আমাদের এই চেতনব দেহ; সে দেহও সুতরাং সামান্য নয়। সেই পরমাশ্চর্য্য স্বয়ম্ভু পদা আপন সত্তা থেকে একে দেশ-কালের মধ্যে গড়েছে, প্রতিভাসি করেছে; সেই চিন্মণির আধার দেহ তাই নিজেও চিন্ময়, জীবন্ত বোধময়। তাই এর আপাদ-মস্তকে জেগে রয়েছে। াড়া, কোষে কো এর আছে শক্তি ও রচনাকৌশল, নিজের ছন্দে ও আলোয় এ দে চলেছে আপন অন্তর্নিহিত গতিতে স্ব-স্বভাবেই—শৈশব থেকে বাল বাল্য থেকে কৈশোরে ও যৌবনে, যৌবন থেকে পরিপক্ক প্রৌঢ়ত্বে বার্দ্ধক্যে। এই অপূর্ব্ব প্রকাশ ও ক্রম-পরিণতির কোন্খানটা তুমি-আমি কর্ত্তা? ক্ষুদ্র সরিষার মত বীজ থেকে বিরাট বটবৃক্ষ যেমন তার অন্তরস্থ শক্তিতে স্বভাবে গজিয়ে ওঠে, মানুষের এই দে বৃক্ষের পরিণতিও তেমনি স্বয়ংক্রিয়। মূক শিবরূপী এই দেহকে চিন

পারলে ক্রমশঃ আত্মবস্তুকেও চেনা যায়, আবার স্থির শান্ত আসনে বসে ভাবতে ভাবতে মন-বুদ্ধির পারের পরাজ্ঞানে উপস্থিত হতে পারলে তারই স্থূল পরিণতি এই দেহ ও জড়-পদার্থকেও বোঝা যায়। কারণ সে পরম পদার্থ ও জড়ধর্মী দেহ এবং জগচ্চরাচর একই বস্তু। জড় কিছু শূন্য বা অভাব থেকে বা তার বিপরীত কিছু থেকে উৎপন্ন হয়নি ; অরূপের বুকে রূপ—অকাল নিরঞ্জনের বুকে কাল সুপ্ত ছিল বলেই তা' জেগেছে। যাকে কালের পদ্দায় ক্ষণস্থায়ী বলে মিথ্যা ঠাউরেছ, তা' স্বরূপতঃ মিথ্যা নয়, কারণ সত্য থেকে মিথ্যার উৎপত্তি যুক্তির কথা নয়। অনির্ব্বচনীয় পূর্ণ বস্তুকে মনই দেখছে সত্য ও মিথ্যারূপে। আসলে সব কিছুই আত্মার বিস্তার—অগাধ স্থির সিন্ধুর একাংশে তরঙ্গলীলার মত, মনের সম্পুটে মনোময় স্বপ্ন-রচনার মত, শিশুর আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলার মত একই অখণ্ড শক্তিজ্ঞান-আনন্দসিন্ধু নানা রূপে উলসিত বিলসিত হচ্ছে।

এই চিদ্‌বস্তুকে প্রথমে মনের যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে বুঝতে হয়। তার পর স্থির অপলক জ্ঞানদৃষ্টিতে জাগে এর সম্বন্ধে ধ্রুব প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমার আমিকে নিয়েই যোগ-সাধনার আরম্ভ, যাকে হাতের কাছে পাবে তাকে ধরেই স্থির প্রশান্তিতে ডুবে যাবে। স্থৈর্য্যই—সমতাই জ্ঞানের পথ। শান্ত সমর্পিত হলেই সব পাওয়া যায়, অস্থির ও অশান্ত হলে সব হারিয়ে যায়। নিদ্রার কৌশলই যোগস্থ ও অন্তর্মুখ হবার কৌশল ; নিদ্রার আগে যেমন আমরা সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে নিশ্চিন্ত হই এবং ঘুমের প্রতীক্ষা করি, তেমনি বাহিরের সব কিছু ফেলে দিয়ে প্রশান্ত মন নিয়ে যোগের প্রতীক্ষা করতে জানলে যৌগিক ক্রিয়াদি আপনি জাগে। ভক্ত এই কাজটি করে ভক্তি ও সমর্পণ দিয়ে। জিজ্ঞাসা করে "আমি কে ?" এই প্রশ্ন ধরে প্রশান্ত অপলক দৃষ্টিতে অন্তরের দিকে চেয়ে থেকে। এই সহজ চিরাভ্যস্ত ক্রিয়াকে যোগমুখী করার কৌশল ক্রমশঃ যোগসিদ্ধির পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে সুন্দর করে বিশদ করে ব্যাখ্যা করা হবে। শুধু নিদ্রাই নয়, জীবনের সকল ক্রিয়াই যোগজ ও যোগময়, যোগ সৃষ্টি-ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

গৌরব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমারে দেখেছি আমি ফুলে-ছাওয়া পথেতে,
জয়-মালা বিভূষিত নব জয়-রথেতে।
সজ্জিত তোরণে ও দীপাবলী আলোকে,
মণিদ্যুতি-বিম্বিত কিরীটের পালকে।
মর্ম্মর মূরতি ও মঞ্জিল স্তম্ভে
সৈন্যে ও সমারোহে ক্ষমতার দম্ভে।

কখনো দেখেছি রূঢ় শৃঙ্খল চরণে
পরণেতে কটিবাস নির্ভয় মরণে
লাঞ্ছনা-লাঞ্ছিত নয়নের জ্যোতিতে,
বিদ্যুৎ দলে যায় মন্থর গতিতে
ভকতের আঁখি-পাখী আসে সেথা ছুটিয়া
শত নৃপতির তাপ পড়ে ভূমে লুটিয়া।

দেখেছি তোমারে কভু ভিখারীর বেশে হে,
প্রেমধন বিলাইয়া ফের দেশে দেশে হে।
তোমারি ত এ জগৎ, হরিজন তুমি যে।
শান্তি-পিয়াসী ধরা পদতল চুমিছে—
তুমি চল তাপিতের আঁখিজল মুছাতে
স্বর্গ ও মরতের ব্যবধান ঘুচাতে।

তুমি চির চঞ্চল কোথা কোন্ ছলেতে
দাও গজমতি হার কবে কার গলেতে।
ভালবাসো অনাদর আঁস নাকো আদরে,
যে তোমারে দূরে রাখে তারে তুমি সাধ রে।
লুকাইয়া কাছে এসো—হাস মৃদু মধুরে।
দূরে থেকে কাছে এসো কাছে থেকে সুদূরে।

রাত্রির তপস্যা

(উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

৩

পরের দিন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়াই সে সন্ধ্যাদের বাড়ী গেল। সংবাদপত্র সে নিয়মিত পড়ে; সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে অনেক কিছুই বেশী জানা ছিল তাহার, তবু ভয়ে-ভয়েই পড়াইতে গেল। কাল মোহিত বাবুর কথা শুনিয়া বুঝিয়াছে, যে আর যাহাই হউক—ফাঁকি সেখানে চলিবে না। আর মোহিত বাবুকে তুষ্ট করা ছাড়া তখন আর কোন উপায়ও ছিল না, সামান্য আট টাকা মাহিনার টিউশনী, তাহাও ত গেল!

তাহার হাতে ছিল আগের দিনের কাপড়-গেঞ্জির পুলিন্দা। ভয়ে ভয়ে ফটক পার হইতেই দারোয়ান সেলাম করিয়া তাহার হাত হইতে পুলিন্দাটা চাহিয়া লইল, তাহার পর পথ দেখাইয়া সন্ধ্যার সেই পড়ার ঘরটিতে লইয়া গেল। আজ ঘরটিকে কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে। বই-খাতাগুলি টেবিলের একধারে গোছানো, দোয়াত-কলমেও নূতন কালি ও নিবের আভাস পাওয়া যাইতেছে—এক কথায় সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত। বইগুলি সে খুলিয়া দেখিল। মোহিত বাবু ঠিকই বলিয়াছিলেন, বইগুলি সবই ক্লাস সিক্স্-এর।

একটু পরে চাকর আসিয়া এক পেয়ালা চা ও এক-প্লেট খাবার দিয়া গেল—লুচী, আলুভাজা ও রসগোল্লা। এই সৌজন্য ভূপেন বিস্মিত হইল। তাহার গত দুই বৎসরের টিউশনীর অভিজ্ঞতায় এমনটি এক দিনও ঘটে নাই। সে চা খাইয়া আসিয়াছিল, তবু সুদৃশ্য কাপ ও সুগন্ধি চায়ের লোভ সামলাইতে পারিল না—দুই-এক চুমুক পান করিল।

এইবার আসিল সন্ধ্যা। আগের দিনের মতই সাদা একটি ফ্রক পরনে, কোথাও কোন আড়ম্বর নাই, প্রসাধনের চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না। আসিয়াই প্রশ্ন করিল,—কাল অত ভিজে আপনার অসুখ করেনি ত মাষ্টার মশাই? সর্দ্দি?

—না। বাড়ী গিয়েই আদা দিয়ে গরম চা এক কাপ খেয়ে ফেললুম, ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেল।

—তাহ'লেই ভালো। আমি ভাবলুম, নিশ্চয় আপনার অসুখ করবে। যা কাঁপছিলেন আপনি ঠাণ্ডায়।

ইহার পর পড়াশুনা শুরু হইল। একটু পরীক্ষা করিবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল, সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই। সন্ধ্যা রীতিমত দুনিয়ার খবর রাখে। ইহাতে যেমন তাহার পরিশ্রমের আশঙ্কা বাড়িল, তেমনি আর একটি তথ্য লক্ষ্য করিয়া খুশীও হইল। দেখিল, সন্ধ্যার পড়াশুনায় মনোযোগ আছে, তাহাকে বোঝানোও সহজ। এক কথা বার বার বলিতে হয় না, শ্রদ্ধা-সহকারে শোনে এবং বুঝিবার চেষ্টা করে। যেটুকু প্রশ্ন করে, তাহাতেও তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু অঙ্কে একটু কাঁচা, তাও এমন কিছু নয়।

শেষের দিকে মোহিত বাবু আসিয়া বসিলেন। পড়ানো শেষ হইলে সন্ধ্যা ভিতরে চলিয়া গেল। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, —কেমন দেখলে বাবা?

সোৎসাহে ভূপেন জবাব দিল,—খুব ভালো। এতটা আমি আশা করিনি। এমন ষ্টুডেন্টকে পড়িয়ে সুখ আছে।

মোহিত বাবু কহিলেন,—তোমার পড়ানোর পদ্ধতিটিও ভালো। আমি ও ঘর থেকে কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। বিশেষ ক'রে ডিকেন্সের ঐ গল্পটি শোনানোতে আমি ভারী খুশী হয়েছি এই তো চাই, পড়া বলতে শুধু নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়া কেন? গল্পও যে পড়া হতে পারে, আমাদের দেশের অনেকে তা জানে না। তোমার দেখছি সাহিত্যে বেশ অনুরাগ আছে। তোমার যদি দেরী হবার ভয় ন থাকে ত চলো, তোমাকে আমার লাইব্রেরী দেখিয়ে আনি।

দোতলার এক প্রকাণ্ড ঘরে মোহিত বাবুর লাইব্রেরী। গোটা তিন-চার আলমারীতে শুধু আইনে বই ঠাসা, বাকী সব কয়টি, অন্ততঃ বারোটার কম নয়, সাহিত্যে বই-ভর্ত্তি। ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস কিছুরই অভাব নাই। দামী অভিধান এবং অন্যান্য রেফারেন্স-বইও ক নাই! দেখিতে দেখিতে ভূপেনের চক্ষু লোলুপ হইয়া উঠিল তাহা লক্ষ্য করিয়া মোহিত বাবু বলিলেন,—আলমারীর চাবি খুকীর কাছেই থাকে। তোমার যখন যেটা পড়তে ইচ্ছে হবে, ওবে বলো, বার করে দেবে'খন।

সে-দিনের মত বিদায় লইয়া ভূপেন বাড়ী ফিরিল। তাহা মাথাটা অপরাহ্ণের দিক হইতেই একটু একটু ধরিয়াছিল, কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় অতটা গ্রাহ্য করে নাই। এখন পথে বাহির হইয়া সেই সামান্য যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া দেখা দিল। বাড়ী ফিরিয়া আর এক মিনিট দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না, একেবারে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। মা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন —কি হয়েছে রে?

—বড্ড মাথাটা ধরেছে মা।

মা গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া কহিলেন,—যা ভেবেছি, তাই। এ যে গা-ও দিব্যি গরম হয়েছে দেখছি। যা ভেজা, জ্বর হবার আ অপরাধ কি!

—আজকেই জ্বর হলো—তাই তো!

এইটাই ভূপেনের সর্ব্বপ্রথম চিন্তা। নূতন টুইশনী এ বহু দিনের বাঞ্ছিত টুইশনী—দ্বিতীয় দিনেই কামাই হইলে কি থাকিবে? সে সাধ্যমত সতর্ক হইল, কিন্তু তখন আর সতর্ক হইবা সময় ছিল না, জ্বর ক্রমে বাড়িতে লাগিল, একশ'-চারে উঠিল বাবা আসিয়া অভ্যাসমত বকাবকি সুরু করিলেন। এটা তাঁহা অভ্যাস। ছেলেমেয়েদের অসুখ করিলে তিনি খানিকটা বিলা এবং খানিকটা বকুনি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। খানিকটা শুনিয়া অসহ্য বো হইলে ভূপেনের মা তাঁহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। তাহা লই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাট বিবাদ বাধিল—খানিকটা চেঁচামেচি, তা পর আবার চুপচাপ।

এমনি প্রত্যহ হয়। ভূপেনের সে-দিকে কান ছিল না, মন নয়ই। সে শুধু ভাবিতেছিল মোহিত বাবুদের কথা। দুশ্চিন্তা মাথার যন্ত্রণা আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। এ-রোগটা তাহার ব কালের, এবং সেই জন্যই বোধ হয় কতকটা গা-সওয়া হইয়াছে অনেক দিন আগে বাবা একবার ডাক্তার দেখাইয়াছিলেন ডাক্তার বলিয়াছিল, পুষ্টিকর খাদ্য এবং ব্যায়াম প্রয়োজন। দুইট

কোনটাই অবশ্য হয় নাই, চিকিৎসার আর কোন চেষ্টাও সম্ভব ছিল না। তাহার জ্বর প্রায়ই হয়। জ্বর হইলে রাত্রিটা উপবাস দিয়া পরের দিন আবার যথারীতি স্নান আহার কলেজ ইত্যাদি চলে। আজও তাহার তেমনি আশা ছিল—কিন্তু ভগবান যেন ইচ্ছা করিয়াই বাদ সাধিলেন। পরের দিন সকালেও দেখা গেল, মাথার যন্ত্রণা বা জ্বর কোনটাই কমে নাই। সে-দিন ভালো ছেলের মত শুধু জল-সাগু খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, তবু অপরাহ্নে দেখা গেল জ্বর কমে নাই, মাথার যন্ত্রণাও তথৈব চ।

তাহার দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। উঠিবার মত অবস্থা নয়, অন্য দিন হইলে উঠিবার কল্পনাও করিতে পারিত না, কিন্তু আজ না উঠিলে চলে কি করিয়া? একেবারে দ্বিতীয় দিনে কামাই? কি তাঁহারা মনে করিবেন? এই সব কথা ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত উঠিয়া পড়িল। মা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন,—তোর মাথা খারাপ হলো না কি?

অগত্যা পারিশ্রমিকের অঙ্ক চাপিয়া নূতন টুইশনির কথা বলিতে হইল। পুরাতনটি গিয়াছে, কাল হইতে নূতন টুইশনি ধরিয়াছে—আজ সবে দ্বিতীয় দিন।

মা তবু বকাবকি করিতে লাগিলেন,—অসুখ-বিসুখ হলে মানুষ যায় কি করে! তোর যে দেখছি সাহেবের চাকরিরও বাড়া হলো!

ভূপেন সে-দিকে কান না দিয়া কতকটা মরিয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া বুঝিল, হাঁটা অসম্ভব। মাথা খাড়া রাখা যাইতেছে না, পা টলিতেছে। তখন বোধ হয় জ্বর একশ'-চার। অগত্যা একটা রিক্সা লইল এবং সন্ধ্যাদের বাড়ী পৌঁছিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অবস্থা চাকর-দারোয়ানদের গোপন করিয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

সে-দিনও আগের মত চা-জলখাবার আসিল। ভূপেন সাগ্রহে চা-টা টানিয়া লইল। সেই মুহূর্তে মনে হইতেছিল বুঝি অজ্ঞান হইয়া যাইবে।

একটু পরেই ঘরে ঢুকিল সন্ধ্যা। ভূপেন খাবারের থালা স্পর্শ না করিয়াই চা খাইতেছে দেখিয়া একটা কড়া রকমের ভর্ৎসনা করিতে গিয়া সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা থামিয়া গেল। স্ফীত থমথমে মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু—চাহিলে ভয় করে!

—এ কি মাষ্টার মশাই, আপনার জ্বর হয়েছে?

কাছে আসিয়া পাকা গৃহিণীর মত তাহার কপালে হাত দিয়া জ্বরটা অনুভব করিল, তাহার পর কহিল,—ইস, এ যে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে! আমি দাদুকে ডেকে আনছি।

ভূপেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—না, না সন্ধ্যা যেয়ো না। এ কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। যেয়ো না মিছি মিছি!

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! সন্ধ্যা তৎক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। মিনিট দুই পরে মোহিত বাবুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহিত বাবু তাহার ললাটে হাত দিয়া বলিলেন,—সত্যই তো, ভীষণ জ্বর দেখছি। তুমি এই জ্বর নিয়ে এলে কি করতে বাবা? কাজটা ভালো হয়নি। জ্বর অন্ততঃ তিন!

কোন উত্তর যেন ভূপেনের মাথায় আসিল না। আসল কথাটা কি করিয়াই বা বলা যায়! কিন্তু মোহিত বাবু নিজেই তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। বলিলেন,—এক দিন পরেই জ্বরের অজুহাত দিলে আমরা কি মনে করবো, এই কথা ভেবেছিলে, না? একেই বলে, ছেলেমানুষ। এখন যাও, আর এক মিনিট দেরী নয়। লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়োগে।

ভূপেন যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল! কোন মতে সে বলিয়া ফেলিল,—এ রকম আমার প্রায়ই হয়। অবশ্য এতটা হয় তো হয় না।

—কিন্তু আজ তো এতটা হয়েছে, আজ বেরুলে কি বলে? তুমি মনে সঙ্কোচ করো না, জ্বর একেবারে ভালো না হলে আসবার দরকার নেই। তুমি বরং বসো, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, বাড়ী গিয়ে সেটা খেয়ে ফেলো।

তিনি শুধু ঔষধই দিলেন না, নিজের গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। ভূপেন সঙ্কোচে ঘামিয়া উঠিতেছিল, বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কথা তিনি শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহার মোটরে চাপিয়া ভূপেন বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং টুইশনিটা যাইবার আশু কোন আশঙ্কা নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

ইহার পর হইতে সে যথানিয়মে পড়াইতে লাগিল। আগে পড়াইতে যাইবার নামে তাহার গায়ে জ্বর আসিত, এখন ইহা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির দিনগুলিই বরং বিশ্রী লাগে। বাস্তবিক পড়ানোয় যে এত আনন্দ তাহা আগে কল্পনার অতীত ছিল।

ইহার জন্য দায়ী অবশ্য তাহার ছাত্রীই। সন্ধ্যার এমন কিছু অসাধারণ মেধা নয়, কিন্তু প্রখর সহজবুদ্ধিতে সে-অভাবটুকু ঢাকিয়া গিয়াছে। তবু এইটাই বড় কথা নয়—পাঠে তাহার ঐকান্তিক মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দেখিয়াই ভূপেন খুশী হয় বেশী, তাহার কাজও সহজ এবং প্রীতিকর হইয়া ওঠে। সে যাহা বুঝায় তাহা সন্ধ্যা প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করে এবং একবার মাথায় গেলে সহজে ভোলে না। জ্ঞানপিপাসা তাহার অপরিসীম—ঐটুকু মেয়ের জানিবার মত এত কথা থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বর্ষণে সন্ধ্যা ভূপেনকে জর্জ্জরিত করে, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্তি বোধ করে না একটুও। কারণ, এ প্রশ্নের মধ্যে শিক্ষককে অপ্রতিভ করার চেষ্টা নাই; আছে শুধু জানিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ।

ভূপেন আগে হইতেই তাহার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবু সব সময়ে তাহার বিদ্যায় কুলাইয়া ওঠে না। অবশ্য এ জন্য অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহাদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে। ভূপেন বই দেখিয়া আসিয়া সেই সব প্রশ্নের জবাব দেয়। বই-এর অভাব আর নাই, মোহিত বাবুর লাইব্রেরীতে সমস্ত বই-ই সে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করে। শুধু তাহাই নয়, কোন্ বই সে পড়িতে চায় শুনিলেই তিনি সে বই কেনেন। ভূপেনের এক-আধখানা পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল, তিনি তাহাও কিনিয়া দিয়াছেন।

পড়াশুনার মধ্যে গল্পই চলে বেশী। ইতিহাস পড়াইতে বসিয়া ভূপেন সেই ছোট পাঠ্য পুস্তকখানি হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহার নিজের অনুরাগ ছিল খুব

বেশী, ইতিহাসের অনেক বই-ই সে পড়িয়াছে, সেই সব বই হইতে সে গল্প করে—পৃথিবীর নানা দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। এ দেশেরও যে সব ইতিহাস ছোট পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকে না তাহারও গল্প বলে সে। আর গল্প বলে সাহিত্যের। বড় বড় ইংরেজী বই-এর আখ্যানভাগ সে এক এক দিন বলিয়া যায় আর সন্ধ্যা মর্ম্মর মূর্ত্তির মত বসিয়া শোনে। এ বিষয়ে মোহিত বাবুরও উৎসাহ ছিল অসাধারণ, সময় পাইলে তিনিও মজলিসে আসিয়া বসেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। ভূপেন বেশ ভালো ভাবে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিল, যদিচ খুব নাম করিবার মত কিছু করিতে পারিল না। তাহার কারণ কতকটা মোহিত বাবুর লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটি তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেও পাশের পড়ায় কিছু ব্যাঘাত ঘটাইত। যাহা হউক—ভূপেন বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইল, মোহিত বাবুর পরামর্শ-মত ইংরেজীতে অনার্স লইল। মোহিত বাবু বলিলেন,—তোমার সাহিত্য যা পড়া আছে, অনার্স-এর জন্য বেশী খাটতে হবে না।

অনার্স লইয়া বি-এ পড়িবে, ভূপেনের বহু দিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন অবশেষে সার্থক হইল,—ভূপেন কিন্তু এ পড়ায় কোন সুখ পায় না। ছেলেবেলা হইতে সে কলেজে পড়ার দিন গুণিত, মনে হইত, তাহার চেয়ে গৌরব আর কিছু নাই! একখানি বই আর একখানি খাতা কিংবা শুধুই একখানি খাতা লইয়া যখন পাড়ার ছেলেরা কলেজে যাইত, তখন সে সসম্ভ্রম ঈর্ষায় চাহিয়া থাকিত আর হিসাব করিত তাহার স্কুলের পর্ব্ব শেষ হইবার আর দেরী কত। কিন্তু কলেজে উঠিয়া দেখিল, সেই স্কুল ঢের ভালো ছিল। শিক্ষকদের সহিত স্নেহের সম্পর্ক ছিল, বন্ধুদের সহিত ছিল প্রীতির বন্ধন। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তাহারা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, সে যে কলেজে ঢুকিল, সেখানে পড়িল সে একা।

এ যেন অরণ্য! অধ্যাপকরা এক-এক জন এক এক রকমের। কোন বাঙ্গালার অধ্যাপক হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যাংশ পড়াইতে পড়াইতে কাঁদিয়া ফেলেন, কেহ বা আসিয়াই সুরু করেন তাঁহাকে গালি দিতে। এক ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, যাদুবিদ্যার খেলা দেখান, অর্থপুস্তক লেখেন এবং মক্কেল পাইলে ওকালতী করিতেও ছোটেন। খান দুই উপন্যাস লিখিয়া অর্থব্যয় করিয়া ছাপিয়াছেনও, যদিচ সেগুলি বিক্রিয় হয় না। ফাঁক পাইলে ছাত্র-মহলে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেও ছাড়েন না। এক কথায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আর সবই করেন। আর এক অধ্যাপক ক্লাসে ছাত্রদের পড়াইবার সময়টুকু যে অপব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদের কাছেই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, এমন অধ্যাপকও আছেন, যিনি অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া এমন অশ্লীল রসিকতা করেন যে, বাহিরে তাহা ছাত্রদের পর্য্যন্ত কানে পৌঁছিয়া তাহাদের কান রাঙ্গাইয়া তোলে।

তবু যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়িত, তখন সান্ত্বনা ছিল যে ইঁহারা ছোটদেরই অধ্যাপক, বি-এ পড়িবার সময় ভালো অধ্যাপকদের কাছে এ দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠিয়া সে স্বপ্নও ভাঙ্গিল। নাম-করা অধ্যাপক দু'-এক জন পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁহারা এতই ব্যস্ত যে, না পাওয়া যায় তাঁহাদের সান্নিধ্য, না পাওয়া যায় কোন উপদেশ। যদিও তাঁহারা মাহিনা বেশী পান, তবু অর্থলোভ আর যায় না তাঁহাদের। পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া, নোট লিখিয়া, অসংখ্য টুইশনী করিয়া নিজেদের এমন জখম করিয়া রাখেন যে, ক্লাসে যখন আসেন তখন দেখা যায় তাঁহারা যেমন ক্লান্ত, তেমনই অন্যমনস্ক। কেহ কেহ সংবাদপত্রের আফিসে অবসর সময় সম্পাদনার কাজ করেন, কেহ আবার করেন ওকালতী। দু'-এক জনের ব্যবসাও আছে। যখন ভালো অধ্যাপক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তখনকার অভ্যাসটা মাত্র আছে হয়ত, মুখস্থ বলিবার মত বলিয়া যান, তাহার বেশী আর পৌঁছানো যায় না। যদি বা দু'-এক জন ছাত্রদের সঙ্গে একটু সহজ হইবার চেষ্টা করেন, ক্লাসে আসিয়া পড়ানো বন্ধ করিয়া তাঁহারা ধরেন রাজনীতির চর্চ্চা। ফলে অধ্যয়ন যে তপস্যা, তাহা ছাত্রেরাও ভুলিয়াছে, অধ্যাপকরাও ভুলিতে বসিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যে দুই-চারি জন যে ধারালো অধ্যাপক নাই, এমন নহে, কিন্তু ভূপেন তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারে না। তাছাড়া চারি পাশের আবহাওয়ায় তাঁহারাও এমন বিরক্ত যে, অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের আবরণে আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন উপায় থাকে না। তবু এই সব অধ্যাপকের কাছে প্রশ্ন করিয়া ভালো রকম উত্তর পাওয়া যায়, বাকী অধিকাংশ অধ্যাপকের দৌড় সেই বিশেষ পাঠ্যাংশের বিশেষ পাঠ্যপুস্তকটি পর্য্যন্ত। তাহার বাহিরে কোন প্রশ্ন করিতে গেলে হয় বিরক্ত হইয়া ধমক দেন, নয় কথাটা কোন মতে এড়াইয়া যান। যেটুকু পড়াইবার কথা, সেইটুকুই তৈরী করিয়া আসেন বা দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তাহা তৈরীই থাকে, সেটার অধিক কিছু পড়িবার সময় নাই, ইচ্ছাও নাই তাঁহাদের। নিজেদের বিষয়-বস্তুর বাহিরে তাঁহাদের জ্ঞান এমন সঙ্কীর্ণ যে, এক-এক দিন দৈবাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার এমন অধ্যাপকও আছেন, যাঁহারা সত্য-সত্যই দিন-রাত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর নাই, অথচ তাঁহারা একেবারেই পড়াইতে পারেন না। ছাত্ররা বিরক্ত হয়, গোলমাল করে, ক্লাসে সে বিষয়টাই মাটি হইতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যর্থতাকে ছাত্রদেরই দুর্বিনয় এবং দুর্ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাহাদের গালিও দেন।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্মিত হয় ভূপেন ছাত্রদের দেখিয়া। বাল্যকালে শিক্ষকদের কাছে এবং পরে মোহিত বাবুর কাছে সে বার-বার শুনিয়াছে, অধ্যয়ন ছাত্রদের কাছে তপস্যা। কিন্তু এ কি তপস্যা? ইহারা কলেজে আসে পড়াশুনা ছাড়া আর সব কিছুর জন্য। একটি কি দু'টি ছেলে ছাড়া আর কেহই বোধ হয় অধ্যয়নকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে নাই। প্রথম প্রথম ভূপেন কলেজে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। শিক্ষালয় নয়, এ যেন বাজার! এত হল্লা এত গোলমাল যে কোন শিক্ষায়তনে হইতে পারে, তাহা ছিল ভূপেনের স্বপ্নেরও অগোচর! প্রীতির সামান্য সূত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—আছে রেষারেষি ও দলাদলি। তাহারা ছাত্রসঙ্ঘ করে, সেখানেও দু'-তিনটি দল—ইনষ্টিট্যুটে যায় দলাদলি করিতে। ভোট-গ্রহণ ঝগড়া দলাদলি এমন কি মারামারিতে পৌঁছিতেও বাধা নাই। অতি সামান্য কারণেই কলেজে ধর্ম্মঘট হয়, কলেজেরই উঠানে দাঁড়াইয়া রাজনীতি সংক্রান্ত গরম-গরম বক্তৃতা চলে এবং সভা ভাঙ্গিলে চাঙ্গোয়ায় ভোজ কিংবা সিনেমায় যাইতে এতটুকু সঙ্কোচ থাকে না। অধ্যাপকরা নিজেদের সম্মান কোন মতে বাঁচাইয়া চুপ করিয়া থাকেন।

গোড়ার দিকে ভূপেন চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু শেষে এক সময় অসহ্য হইয়া উঠিল। দেখিত, তাহার যে সব বন্ধু পৃথিবীতে অচিরে সাম্যবাদ-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং নিপীড়িত নির্য্যাতিত, দরিদ্র, বুভুক্ষু ভারতবাসীর জন্য যাহাদের দুঃখ ও বিক্ষোভের সীমা নাই, তাহারাই গোঁফ-কামানো মুখে মেয়েদের মত প্রচুর স্নো ও পাউডার মাখিয়া সবচেয়ে পাৎলা আদ্দি কিংবা রেশমের জামা গায়ে দিয়া কলেজে আসে, মুহুর্মুহু বিলাতি সিগারেট খায়, চৌরঙ্গি-পাড়ার হোটেলে জলযোগ করে এবং এক-একখানা বাংলা ছবি তিন-চার বার দেখে। তাহাতেও ভূপেনের আপত্তি ছিল না! ইহাদের বক্তৃতায় যখন দেশপূজ্য নেতারা পর্য্যন্ত কুৎসিত ভাবে লাঞ্ছিত হইতেন, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। শ্রদ্ধা কথাটার সঙ্গেই যেন ইহাদের পরিচয় নাই! রাজনীতি করে করুক, কিন্তু নিজেরা কিছু ভাবে না, ভাবিবার চেষ্টাও করে না, তাহাতেই ভূপেনের আপত্তি। কতকগুলি বিদেশী বাঁধা বুলি আওড়ায় মাত্র। বক্তৃতা করে রুশীয় সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদের তর্জ্জমা পড়িয়া—বিপ্লবের বুলি আওড়ায় উদ্দ ভাষায়, শ্লোগানটা পর্য্যন্ত নিজেরা তৈয়ারী করিতে পারে না। প্রথম কলেজী-জীবনে সে-ও যে ইহাদেরই এক জন ছিল, ভাবিয়া ভূপেন আজ লজ্জা পায়।

মোহিত বাবুর সহিত এ বিষয়ে প্রায় তাহার আলোচনা হইত। ভূপেনের উত্তাপের পরিবর্ত্তে তিনি হাসিয়া বলিতেন,—ওদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা, ওদের জন্য দুঃখ করো। ওরা নিজেরাই জানে না যে ওদের বক্তব্য কি, ওরা কি চায়! এখন যেমন দেশের দুর্গতদের, শ্রমিকদের প্রপীড়িতদের দুঃখে গভীর উত্তেজনায় বক্তৃতা করে, বক্তৃতায় অশ্রুমোচন করার পরেই বিলাতী সিগারেট, বিলাতী স্নো, বিলাতী খানা ও বিলাতী সিনেমার মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে, তেমনি এক দিন ওদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই অনায়াসে পাশের বাড়ী বা কুটুম্বদের কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে, অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে পড়ে থাকে! তার পর সামান্য অর্থপ্রাপ্তির আশায় বা দৈহিক প্রয়োজনে নিঃশব্দে বাপ-মার বেছে-দেওয়া মেয়েকে বিবাহ করবে এবং যেখানে হোক একটা চাকরী যোগাড় ক'রে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। তখন আবার এরাই তখনকার দিনের তরুণদের কষে গালাগাল দেবে। এখনও এরা যেমন জানে না জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি ওদের প্রয়োজন, তখনও জানবে না। ওদের ওপর কি রাগ করতে আছে!

কিন্তু মোহিত বাবু যত সহজে কথাটা উড়াইয়া দিতেন ভূপেন তত সহজে উড়াইতে পারিত না। সে তর্ক করিতে যাইত, যুক্তি দিয়া তাহাদের ভুল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত কিন্তু ফল হইত বিপরীত। যে সব ছেলে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘন ঘন ষ্ট্রাইক ও মুহুর্মুহু বক্তৃতা করে, তাহারাই বিন্দুমাত্র প্রতিবাদে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে, অপর-পক্ষকে কিছুতেই কথা কহিতে দেয় না।

অথচ ইহার মধ্যে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তাহার সহপাঠীরা তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিতে পারিত না। তাহার কারণ, একমাত্র সে-ই ক্লাসে অধ্যাপকদের নানারূপ প্রশ্ন করিত, তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিত এবং তাঁহারা কোন প্রশ্ন করিলে এমন জবাব দিত, যাহাতে তাহার সত্যকারের লেখাপড়ার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রকাশ পাইত। ভালো ছেলে বলিয়া এই সামান্য সুনাম রটনাতেই তাহাকে দলে পাইবার জন্য সমস্ত দলের আগ্রহ ছিল প্রচুর।

অবশ্য তাহার এই ছাত্রজীবনের মধ্যে যে একেবারে কোথাও এতটুকু আলো ছিল না এমন নয়। কতকগুলি ছাত্র সব কলেজে সব ক্লাসেই থাকে, যাহারা সত্যই বিদ্যানুরাগ লইয়া আসে—তাহারা নিজেদের প্রচার করে না, খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হয়। ভূপেন এই শ্রেণীর ছাত্রদের সন্ধান পাইয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের সহিত লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়া সত্যই শিক্ষায় আগ্রহ ও অনুরাগ বাড়ে। ইহারাও রাজনীতির চর্চ্চা করে এবং দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে, রাজনীতি ইহারা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝে। তাছাড়া অধ্যাপকরাও ইহাদের ভাল করিয়া পড়াইতে চান, খোলাখুলি ভাবে, সহজ ভাবে মেশেন। এক কথায়, এই বিশেষ দলটির আওতায় আসিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

প্রথম দিকে এক দিন সে মোহিত বাবুর কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে—সামান্য বেশী খরচার জন্য কোন বড় কলেজে ভর্ত্তি হলুম না—এখন আফশোষ হচ্ছে।

উত্তরে মোহিত বাবু সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—সব কলেজেই ভালো অধ্যাপক আর ভালো ছাত্র আছেন বাবা, খুঁজে নিতে হয়।

সে কথার সত্যতা ভূপেন ক্রমে বুঝিতে পারিল।

এই সমস্ত তিক্ততার মধ্যে তাহার গভীর সান্ত্বনা ও শান্তি ছিল সন্ধ্যাদের বাড়ীতে। এ সময়টায় সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত তাহার এ টুইশনি শুধু অর্থের প্রয়োজনে নয়, আত্মার প্রয়োজনেও।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পড়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভূপেনকে ঠিক ক্লাসের পাঠ্য-তালিকা ধরিয়া পড়াইতে হয় নাই বলিয়া সে সহজে এক একটা স্তর পার হইয়া গিয়াছে। ভূপেন যখন ফোর্থ ইয়ারে, সন্ধ্যা তখন ম্যাট্রিকের পুঁথিতে হাত দিয়াছে। ভূপেন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিত,—তুমি যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছ সন্ধ্যা, তাতে কিছু দিনের মধ্যেই আমার চাকরীটি যাবে দেখছি।

সন্ধ্যা হাসিয়া জবাব দিত, আপনিও ছুটুন আমার আগে আগে। তা'হলে আমার গরজে আপনি এক দিন তবু বিদ্যাসাগর হতে পারবেন।

সন্ধ্যা কিছুতেই ভাবিতে পারিত না যে, ভূপেনের বিদ্যা-স্তরে সেও এক দিন পৌঁছাইতে পারিবে। তাহার কিশোর-মনে ভূপেনের স্থান এমনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন সে তর্জ্জমা ছাড়িয়া সোজাসুজি ইংরেজী বই-ই ধরিয়াছে ভূপেন তাহাকে সহজ অথচ কাহিনী-প্রধান বইগুলি বাছিয়া বাছিয়া দিত। প্রথমেই দিয়াছিল ডুমার কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রীষ্টো। এ বইটি গল্পাংশ সন্ধ্যা বার-দুইতিন ভূপেনের মুখে শুনিয়াছিল—গল্পটা তাহার এত ভালো লাগিয়াছিল। সে বইটি শেষ করিবার পর ডিকেন্সের অলিভার টুইষ্ট। এমনি করিয়া সন্ধ্যা লেখাপড়াতে যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল, সাহিত্যেও তেমনি পাইল ডবল প্রোমোশন। মোহিত বাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ছোট ছোট ইংরেজী বই কিনিয়া দিবার কিন্তু ভূপেন আপত্তি তুলিয়াছিল। মোহিত বাবু আর কিছু বলেন নাই।

ক্রমে ভূপেনের বি-এ পরীক্ষার সময় আসিল। মোহিত বাবু এক দিন ডাকিয়া বলিলেন,—বাবা ভূপেন, এবার তুমি কিছু দিন পড়ানো বন্ধ করো।

ভূপেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কেন ?

মোহিত বাবু জবাব দিলেন,—তোমার পরীক্ষার তো মোটে আর একুশ দিন বাকী। এখন অতটা ক'রে সময় নষ্ট করা কি উচিত? এই একটা মাস ও নিজে নিজেই পড়তে পারবে'খন !

ভূপেন কিন্তু সরবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, না, না, এতে আর আমার কতটুকু সময়ই বা যায়। তাছাড়া দিন-রাত বাড়ীতে বসে পড়া—সে আমার ধাতে সয় না। খানিকটা তো বেড়াতেই হতো—সেই সময়টা না হয় ওকে পড়াই।

মোহিত বাবু কহিলেন,—কিন্তু 'এমনি ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়ানো আর সেই সঙ্গে মস্তিষ্ক-চালনা করে বকা এক জিনিষ নয়।

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল,—না না, সন্ধ্যাকে পড়ানোই একটা রিক্রিয়েশন ! ওর সঙ্গে মোটে বকতে হয় না।

মোহিত বাবু হাসিয়া জবাব দিলেন,—তোমার যদি ক্ষতি না হয়, তুমি এসো—**so much the better.**

(ক্রমশঃ

পদকর্ত্তা লোচনদাস

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

লোচনদাস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের পদকর্ত্তার জীবনীর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথিলায় লোচনদাস বলিয়া এক জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তবে গবেষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রিয় কবি লোচনদাসকে বাঙ্গালা মায়ের কুটীর ছাড়িয়া রাজদরবারে আশ্রয়ের প্রার্থী হইতে হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোচনদাস বর্দ্ধমান জিলার নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম বা কুগ্রামে (কোগা) জন্মগ্রহণ করেন, লোচনদাস-কৃত চৈতন্য-মঙ্গলের শেষ খণ্ডের পরিশেষে আমরা গ্রন্থকর্ত্তা লোচনদাসের একটি বিশেষ পরিচয় পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৬ সংখ্যক পুথিতেও আমরা ইহার পরিচয় পাই, উহার পরই গ্রন্থের সমাপ্তি হইয়াছে, আবার দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" বলিয়াছেন—লোচন তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমরা লোচনদাসের জীবনী সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারি, তাহা সংক্ষেপে এই—বর্দ্ধমান জেলার নিকটবর্ত্তী কুগ্রামে পিতা কমলাকরের ঔরসে ও মাতা সদানন্দীর গর্ভে লোচন জন্মগ্রহণ করেন। কি মাতৃকুল কি পিতৃকুল, দুই কুলেরই লোচন একমাত্র নয়ন-মণি ছিলেন ; ছোট বেলায় আদর পাইয়া তিনি এইরূপ অবাধ্য হইয়া উঠেন যে, তাঁহাকে মারপিট করিয়া অক্ষর-পরিচয় করাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর নরহরি দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদেশে ও প্রসাদে লোচন "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস।
তার পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।—চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রবন্ধে আমরা পদকর্ত্তা লোচনদাস সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গলের" প্রামাণিকতা বা অপর বিষয় লইয়া গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিব না, তবে তাঁহার রচিত গ্রন্থখানির কয়েকটি বিষয় কেবলমাত্র আমাদের পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য উল্লেখ করিব। চৈতন্যমঙ্গল কবির একটু বেশী বয়সের রচনা। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা (১৪ বৎসর বয়সের)। পদকল্পতরুর সুযোগ্য সম্পাদক সতীশ বাবুর মতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং দীনেশ বাবুর মতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে লোচনদাস চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে তাঁহার গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেকে আবার ভণিতার পাঠ লইয়া নানা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভণিতার বহু স্থানে আমরা যেমন লোচন বা লোচন-দাস পাইতেছি, তেমনি আবার বহু স্থলে 'ত্রলোচন' বা "এ লোচন" দেখিতে পাইতেছি, কেহ কেহ ইহাকে ত্রিলোচন পাঠ করিয়াছেন। আমি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০৩ ও ৫০৭ সংখ্যক পুথিতে "হাসি কহে এ লোচনদাস" পাঠই বহু স্থলে দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থরক্ষক হরিদাস পালিত মহাশয়ও এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদক জগদ্বন্ধু বাবু বলেন—চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর সকলে ইঁহাকে সুলোচন বা লোচনা-নন্দ বলিতেন। জগদ্বন্ধু বাবু কোথা হইতে এই তথ্যটির সন্ধান পাইলেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অতএব আমরা এই কথা মানিয়া লইবার পক্ষে নহি। কাহারও নাম যে কেবলমাত্র 'লোচনদাস' থাকিতে পারে না, তাহাকে ভদ্রতা রক্ষার জন্য সু, পদ্ম, পলাশ, কমল প্রভৃতি উপশব্দের উৎপাত সহ্য করিতে হইবেই এমন কোন কথা থাকিতে পারে না। স্ত্রীকে একবার না জানিয়া মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবার অপরাধে লোচন আর তাহাকে স্ত্রীরূপে জীবনে গ্রহণ করেন নাই। এরূপ ধারণাও অমূলক বলিয়া বিবেচিত হয়, আবার এই আখ্যানও প্রচলিত যে, স্ত্রীকে লোচন যথেষ্ট ভালবাসিতেন, চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া লিখিতেছেন,—

'প্রাণের ভার্য্যে ! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা,
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাব গোরা-গুণ-গাথা।'

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল পুস্তকে আমরা সূত্রখণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—

প্রাণ ভার্য্যা নিবেদউ নিবেদউ নিজ কথা, ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু এই উক্তিগুলির কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না, চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া মঙ্গল-গ্রন্থের নিয়মানুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা করিতে করিতে অকস্মাৎ 'প্রাণের ভার্য্যা' বলিয়া স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জ্ঞাপন করিবার এবং পরের পংক্তিতে মহাভাগদের আশীর্ব্বাদ মাগিবার কোন কারণ নাই বা উহাতে তাঁহার মঙ্গলাচরণের সঙ্গতিও রক্ষিত হয় না। সন্দেহ দূরীকরণার্থে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক-খানি পুথিতে এই পংক্তি কয়টির সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও "প্রাণের ভার্য্যা' দেখিতে পাইলাম না, তবে ৫০৭ সংখ্যক পুথিতে

দেখিলাম—"আরে ভাই রে নিবেদ নিবেদ নিজ কথা"-----ইত্যাদি। আমার মনে হয়, লোচনদাস যে শুভক্ষণে গৌরগুণে বিমোহিত হইয়া নিজের সমস্ত কিছু মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং নিজে নদীয়া-নাগরী ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, সে দিন হইতে কেবল স্ত্রীকে কেন সমস্ত নদীয়া-নাগরীকেই সেই গোরাচাঁদের প্রণয়িনী-রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল সম্বন্ধে এইবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব. ইহাকে বৈষ্ণবরা চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের নিম্নে স্থান দিয়াছেন। ঐতিহাসিক মতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার প্রতিটি ছত্রে যে সরল ভক্ত-হৃদয়ের নির্মল অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। দিনপঞ্জী বা কড়চা হিসাবে বিচার করিলে চৈতন্য-মঙ্গল অপেক্ষা অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুর্লভ নয়. আবার বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অতুলনীয়, তবে যে দিক দিয়া বিচার করিলে লোচনদাস আমাদের প্রিয় হইয়া উঠেন—সেটি হইতেছে তাঁহার সরল, কোমল, পবিত্র ও প্রেমিক মনের রসাস্বাদনের অধিকার।

চৈতন্য-মঙ্গলে আমরা সূত্রখণ্ডে দেখিতে পাই, লোচনদাস সকলের বন্দনা লিখিবার সময় বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত রচনা হইবার পর লোচনদাস তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে আমরা আর লোচন-দাসের চৈতন্য-মঙ্গলের কোন উল্লেখ পাই না, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বৃন্দাবনদাসের ভাগবতের (চৈতন্য-মঙ্গল) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও যে ঐ সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহা আমরা কবিরাজ গোস্বামীর সম-সাময়িক লোকনাথ গোস্বামীর 'সীতাচরিত্র' হইতে জানিতে পারি। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল' কেন যে 'চৈতন্য-ভাগবত' আখ্যা প্রাপ্ত হইল, সে সম্বন্ধেও লোচনকে জড়িত করা হইয়াছে। উভয়ের (লোচনদাস ও বৃন্দাবনদাস) গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য-মঙ্গল' হইলে কলহের সৃষ্টি হইতে পারে, এই জন্য বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী নিজ পুত্রের গ্রন্থের নামকরণ করেন 'চৈতন্য-ভাগবত'।

পরবর্ত্তী যুগে আমরা নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে লোচন-দাসের চৈতন্য-মঙ্গলের কোন উল্লেখ পাই না, কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। লোচনদাসের সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্য-ভাগবতকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া চৈতন্যমঙ্গলকে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, লোচনদাস চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের কাহিনীগুলিতে চৈতন্যদেবের দেবলীলার আখ্যানভাগই অধিক, কিন্তু লোচনদাস যে ভাবে আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তী দেবলীলার আখ্যানগুলি যে সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে সর্ব্বতো-ভাবে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রুক্মিণী দেবীর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান কহিলেন—

ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥

* * *

ঘোষণা করহ শিব ব্রহ্মা আদি লোকে।
গৌর অবতার মোর হবে কলিযুগে॥

এই কাহিনীটি লোচনদাস সম্ভবতঃ জৈমিনিভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—

জৈমিনি-ভারতে নারদ উদ্ধব সম্বাদ।
শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ উন্মাদ॥
আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায়॥

দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, মানুষের মহিমাই যে প্রকৃত দেবত্ব লোচন দাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আমরা তাঁহার উক্তিকে যথাযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; কারণ, সন্ন্যাস-খণ্ডে শোক বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাশে প্রেমে বিভোর যে মানুষটিকে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহার অন্তরের মানবীয় কোমলতা, তাঁহার দেবত্বের ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোচনের গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া দীনেশ বাবু অপর এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুল পল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দীনেশ বাবুর এই উক্তিটিকেও আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। মুরারি গুপ্তের কড়চা, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি রোজ-নামচার যে সমস্ত গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনী লিখিত হইয়াছিল, উহাদের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুইখানিকেও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করা সঙ্গত হইবে না। লোচনদাস চৈতন্যদেবের নীরস ঘটনাগুলির যথাযথ আলেখ্য অঙ্কিত করিবার মানসেই যে গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। কৃষ্ণানুরাগে বিভোর, ব্রজনন্দনের প্রেমে আত্মবিহ্বল, জগতের পাপী-তাপীর অন্তরের জ্বালা দূর করিবার বাণী-প্রচারকের কোমল অন্তরের যে ছবিটি লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা কি শিক্ষিত, কি মূর্খ, সকলের হৃদয়ে অভিনব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, লোচনদাস তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার কবিমনের ভাবুকতা মিশাইয়া যুগাবতার মহাপ্রভুর জীবনের যে অংশটি আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা আমাদের সত্যই মুগ্ধ করিয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলের ভাষা অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে তাহার সাবলীল গতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কল্পনায় কৃষ্ণলীলার রূপটিকেই আশ্রয় করিয়া যে লোচনদাস তাহার প্রেমিক নাগরের চিত্রের রূপ দিয়াছেন তাহা আমাদের বিমোহিত না করিয়া পারে না। সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার প্রিয়তমকে কহিতেছেন—

তো লাগি জীবনধন রূপ নব যৌবন
বেশ বিলাস ভাবকলা।
তুমি যদি ছাড়ি যাবে কি কাজ ছার জীবে,
হিয়া জ্বলে যেন বিষ জ্বালা।

* * * *

ধিক মোর জাউ দেহে এক নিবেদিয়ে তোহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল চরণ তেন
পরশিতে ডর লাগে চিতে ॥

প্রবোধ দিবার ছলে প্রভু তখন অতি সাধারণ মানুষের মতন কহিতেছেন—

আমি তোকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব যায়া
এ কথা কে কহিল তোমাকে।
যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে
এখন না মর মিছা শোকে ॥
ইহা বলি গৌরহরি আশ্বাসে চুম্বন করি
নানা রস কৌতুক পাথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া ভুলিলা প্রকারে ॥

প্রামাণিকতা ও উচ্চাদশের দিক দিয়া বিচার করিলে যাহাই হউক না কেন, সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট লোচনের চৈতন্যমঙ্গল যে অতি প্রিয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে আর অধিক সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না, আমরা এখন পদকর্ত্তা বা ধামালী গানের প্রবর্ত্তক লোচনের বৈশিষ্ট্য কোথায় সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিব।

সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী পদাবলীতে যে রসটি অনুসৃত হইয়াছে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে সে রসটি ভিন্ন অপর তিনটি রসেরও বহু পদাবলী রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র মধুর রসেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে উহার সহিত সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্য রসও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। লোচনদাস অল্পসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ কতকগুলি পদ লিখিয়াছেন, যেগুলি পদাবলী-সাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এগুলিকে আমরা 'ধামালী' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। ধামালী শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবিরোধ রহিয়া গিয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলে আমরা দেখিতে পাই, 'দুরন্ত বা চতুর' এই অর্থে 'ধামাল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আমার ছাওয়াল বড়ই ধামাল
এ দোষ ক্ষমিবে আপনি।"

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ধামালী শব্দের অর্থ করিতে গিয়া 'ঢমালী' শব্দের সহিত তুলনা করিয়া "চতুরালি" এই অর্থ করিয়াছেন (ঢাঙ্গাতি—লম্পটতা)। পদকল্পতরুতে সতীশ বাবু "আনন্দে মাতামাতি" অর্থে ধামালী বা ঢামালী শব্দ ব্যবহৃত হয় এইরূপ লিখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেন—"ধামালী বা ঢামালী" শব্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইয়াছে—রসিকতা বা পরিহাস অর্থে, তাহার মধ্যে বোধ হয় একটু অশিষ্টতা বা অশ্লীলতার ইতিহাসও পাওয়া যায়। ধামালী নামক এক প্রকার তাল কীর্ত্তন গানে ব্যবহৃত হয়, বৈঠক ধামার শব্দের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, ধামালী শব্দের অর্থও বলা কঠিন।" যাহা হউক, বর্ত্তমানে ধামালী অর্থে অনেকে মনে করেন, অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট এক প্রকার গান, উহাতে কেবল আদি রসেরই স্বাদ পাওয়া যায় এবং বহু স্থানে শ্লীলতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রকারভেদে ধামালী গান দুই প্রকার—শুক্ল ধামালী ও কৃষ্ণ ধামালী। অনেকে বলেন, শুক্ল ধামালী কৃষ্ণ ধামালী অপেক্ষা অধিকতর দোষ-দুষ্ট, আবার প্রাচীন সাহিত্যের বহু বিশেষজ্ঞের মতে শুক্ল ধামালী কৃষ্ণ ধামালী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ আদর্শে এবং কল্পনার নির্ম্মলতায় পরিপূর্ণ। লোচনদাসকে আমরা ধামালী রচয়িতাদের পথপ্রদর্শকরূপে ধরিয়া লইতে পারি, ইহার পূর্ব্বে যে ধামমালী গান ছিল না এ কথা অবশ্য বলা চলে না, কিন্তু লোচনদাসের সময় হইতে ধামালী গানের প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ভাবে পড়িয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ হয় নাই। এখনও রংপুরে এক প্রকার ধামালী গান প্রচলিত আছে। লোচনদাস-রচিত যে সমস্ত ধামালী গৌরপদ-তরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই গৌর-গুণাত্মক। লোচনদাস নদীয়া-নাগরী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সমস্ত নদীয়াবাসীকে তিনি গোপীভাবে ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই ভাবে নিজেও অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্যই অপরূপ। উচ্চ-শিক্ষিত না হইলেও গুরুর কৃপায় তিনি যে সহৃদয়তা ও কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেনে, তাহা তাহার সরল ভাষায়, সহজ আন্তরিকতায় ও অনুরাগের প্রগাঢ়তায় পদগুলিতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই জাতীয় .পদগুলি পদাবলী-সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব অংশ হইয়া বিরাজ করিতেছে, মহাপ্রভুর নদীয়া-লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি গৌরাঙ্গদেবের কোমল করুণ যে দিকটি আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না। এই ধামালীগুলিতে লোচন যে ভাষার অবতারণা করিয়াছেন তাহা ঐ পদগুলির বিষয়বস্তুর সুউপযোগী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে সমস্ত ধামালী পদ লোচনদাস রচনা করিয়াছেন, উহাও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর নহে (সেগুলি লইয়া আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব)। লোচনদাসের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ধামালীগুলির রসাস্বাদনের সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাঁহার কিছু কিছু পদ উদ্ধৃত করিব। গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা করিতে গিয়া লোচন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ন্যায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই মাত্র দুই-একটি কথায় তিনি সর্ব্বসাধারণের মনে প্রেম-পাগল আত্মবিহ্বল মহাপুরুষের যে রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

নাচায় আঁখির কোণে সদাই সবার সনে
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
* * * *
সকল পূর্ণিমা চাঁদে বিকল হইয়া কান্দে
কর পদ পদুমের গন্ধে।

মাত্র এই দুইটি পংক্তিতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, স্বভাব-কবি লোচনের কবি-দৃষ্টি কেবলমাত্র মহাপ্রভুর বাহিরের অঙ্গরূপ দেখিয়াই ফিরিয়া আসে নাই, উহা তাঁহার অনুরাগে রঞ্জিত প্রেম-ব্যাকুল অন্তরের অন্তরস্থিত করুণ রূপটিও অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। লোচনের ধামালীর মধ্যে এমন কতকগুলি পদ রহিয়া

ঈয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে সাধারণ পদকর্ত্তা হইতে পৃথক করিয়া চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অমর পদকর্ত্তাদের সহিত একাসনে বসিবার অধিকারী করিয়া তুলে। বর্ণনার জাঁক-জমকে ও শব্দচয়নের আড়ম্বরে লোচনের কাব্যপ্রতিভা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সরল বর্ণনার ভিতর দিয়া মহাপ্রভুর প্রেম-হাস্যোজ্জ্বল, করুণার অশ্রুপ্লাবিত, স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত চিরহাস্যময় যে মুখখানি আমাদের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হইয়া উঠে তাহা আমাদের অন্তরকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়। লোচন যে তাঁহার জীবন দিয়া, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়া, একান্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পদাবলী আস্বাদনের পর তাহা আমরা আর অস্বীকার করিতে পারি না। লোচনের অন্তরের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা মহাপ্রভুর উন্নত জীবনের পরশমণির স্পর্শে আসিয়া তাহার লেখনীর মধ্য দিয়া যে অনুভূতিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার নিকট ভাষা ও ভাবের অশ্লীলতার আবরণ কি করিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইবে? মদনকে তিনি মোহিত করিয়াছেন, তাহার স্পর্শে আসিয়া ইন্দ্রিয়-লালসা আর কতক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে? সেই প্রেমনটরাজের নৃত্যের প্রতিটি পদবিক্ষেপে ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ভোগ-ঈপ্সিত ফণা আপনা হইতেই অবনমিত হইয়া গিয়াছে।

আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমার ভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে
মদনমোহন নটরাজে॥

মহাপ্রভু চলিয়াছেন, পরিধানে রাঙ্গা পট্টবস্ত্রের জোড়, পায়ে বাঁকমল, সোণার নূপুর মধুর বোল তুলিতেছে, মাথায় দীর্ঘ চাঁচর চুলে কুন্দ মালতীর মালা মণ্ডিত—তাহাতে চাঁপা ফুল গোজা, অঙ্গ সুরভি চন্দনে চর্চ্চিত, প্রশস্ত ললাটে ভুবন-মোহন ললাটিকা, সুবলিত বাহু দোলাইতে দোলাইতে নাগর চলিয়াছেন। পরিশেষে লোচনদাস নাগরী-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

এমন কেউ ব্যথিত থাকে
কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভর্য়া দেখি রূপখানি।
লোচনদাস বলে কেনে
নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি।

অনুরাগের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে লোচনের এই অনুভূতির স্থান যে কোথায়, তাহা অতি সাধারণ পাঠকেরও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যে কোন রসজ্ঞ সমালোচক অন্তর দিয়া বিচার করিলেও লোচনের এই রূপবর্ণনার পদগুলি যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, তাহা বলিতে পারিবেন না এবং আদিরসের প্রাধান্য পদগুলিকে শ্লীলতার গণ্ডি হইতে আদৌ বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন।

ইহা ব্যতীত সতীশ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে"ও আমরা ব্রজলীলার কতকগুলি (২২টি) বিভিন্ন ধরণের পদ পাইতেছি। ঐগুলির প্রথমে "শ্রীগৌরচন্দ্র নদীয়া-নাগরীর উক্তি" শীর্ষক যে পদটি পাইতেছি, তাহা ভাষার লালিত্যে ও কল্পনার মাধুর্য্যে এইরূপ—

ঢর ঢর কাঁচা সোণার বরণ
আউলাই পড়িছে গায়।
হেরি কুলবতী রসের পাথারে
সাঁতারে না পায় যায়।

এই পদ পাঠ করিতে গিয়া আমাদের ভক্তকবি গোবিন্দদাসের সেই প্রসিদ্ধ পদটি মনে পড়িয়া যায়—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরছা পায়।

এই বিশ্ববিমোহন রূপে কে না মোহিত হইবে? নদীয়ার স্ত্রী-পুরুষ এই ভাববিভোর পুরুষকে পরমপ্রিয়, প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহার অনুরাগে প্রাণমন রাঙাইয়া তুলিয়া নিজেকে নাগরীজ্ঞানে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইবে, ইহাতে আর আশ্চয্য কি?

"রূপ দেখিবারে হুড় পড়িয়াছে
নদীয়া নাগরীর ঘটা।
"নদীয়া নগর বধূ হেরি গোরা মুখ বিধু
ঝর ঝর নয়ন সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই॥"

গোরার অপরূপ মহিমায় এ সংসারের সকল বন্ধন, মনের সকল ধুলি-মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। এই ভাবটি আমাদের একান্ত ঘরোয়া কথায় রোজকার উপমা দিয়া লোচন বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদটি আমাদের বৃন্দাবনের প্রেম-পাগলিনী শ্রীমতীর কথাই বার বার স্মরণ করাইয়া দেয়। পদটি এত মধুর যে, উহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত না করিলে পাঠকের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটান হইবে বলিয়া মনে হয়।

আর শুন্যাছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলদি বরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা।
আঁখির জলে বুক ভাসিল ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥ ইত্যাদি

ইহা ব্যতীত গৌরাঙ্গের গুণবর্ণনা করিয়া লোচন যে সমস্ত পদরচনা করিয়াছেন, তাহার ভিতর তাঁহার অনুগত ভক্তহৃদয়ের একান্ত আত্ম-সমর্পণের সুরটি অতি মধুর ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্ত্তনের অধিদেবতাই এই ভবসিন্ধু পারাপারের একমাত্র কর্ণধার; তাঁহার

শরণাপন্ন হইলে তিনি কখনও অধম জনকেও পরিত্যাগ করেন না। এই পদগুলিতে লোচনের নিরহঙ্কার ও বিনয়-মধুর হৃদয়ের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হরির নামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দুই বাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥

অপর পদে পাইতেছি—

লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥

গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস সম্বন্ধেও আমরা লোচনের একটি মাত্র পদ পাইতেছি। কবিত্বের বা পাণ্ডিত্যের বিচারে ইহা অতি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইলেও সরলতা ও মর্ম্মের বেদনা স্পর্শে ইহা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর নদীয়া ত্যাগের কথা শুনিবামাত্রই সকলের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, কেবলমাত্র মনুষ্য-জগৎ বা জীবজগৎ পর্য্যন্ত নয়, প্রেমিক নাগরের বিরহে জড়জগতেও যে বেদনার অনুরণন জাগিল তাহা সকলের হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে,—

পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন সেহো শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে এ দাস লোচন গায়॥

রাধাভাবোন্মাদে নৃত্যপরায়ণ মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত রূপটি লোচন সহজ কথায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আবেশে 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া গৌরাঙ্গদেব নৃত্য করিতেছেন, কখনও প্রেমাবেশে ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়িতেছেন, কভু বা অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় সেই রাইরূপ দর্শন করিতেছেন, এই পদটির সহিত লোচন কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রভুর অবতারতত্ত্বের সুন্দর একটি সংযোগ রহিয়াছে—

পহু নাহি মেলে আঁখি কহে মোর কাঁহা সখী
কাঁহা পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন॥

নিত্যানন্দের প্রতি আমরা যে কেবল লোচনের অগাধ ভক্তিরই পরিচয় পাই তাহা নহে। এখানে আসিয়া লোচন তাঁর বিনয় বা ধৈর্য্যের বাঁধ রাখিতে পারেন নাই, ভক্তি এমনি অন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, নিতাই-বিদ্বেষী জনার তিনি মুখদর্শন করা ত দূরে থাকুক, তাহার মুখে আগুন জ্বালিয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে,
অনল জ্বালিয়া দিয়ে তার মাঝ মুখখানে॥

অন্যত্র—

অনল ভেজাই তার মাঝ মুখখানে॥

নিত্যানন্দের রূপ-বর্ণনা করিতে গিয়া লোচন কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে ভাষা তাহার অলঙ্কৃত না হইয়া পারে নাই। ভাবও মহান্ মহিমাময়কে প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে,—

শ্রীমুখ-মণ্ডল ধাম জিনি কত কোটী কাম
সেনা বিহি কিসে নিরমিল,
মথিয়া লাবণ্যসিন্ধু তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু
সুধা-সাচে মুখানি গড়িল॥
নবকুঞ্জ-দল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবি রহু প্রেম মকরন্দে।

নিত্যানন্দের অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লোচন পরিচিত মতবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—

পুরবে সে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিণী-নন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবন-পাবন হৈল নাম॥

ইহা ব্যতীত অপর দুই-এক জন গৌরভক্তবৃন্দেরও বন্দনা লোচনদাসের একটি পদে আমরা পাই।

লোচনের একটি পদে আমরা একটু অন্য ভাবের প্রকাশ পাইতেছি। পদটি পাঠ করিলেই যেন দেহতত্ত্বের বলিয়া মনে হয়। অতি ঘরোয়া কথায় অশান্ত হৃদয়ের সামনে একটি শান্তির পথের সন্ধান লোচন আমাদের দিয়াছেন। প্রাণমন একবার সর্ব্বতোভাবে সেই যুগাবতারের পায়ে নিবেদন করিতে না পারিলে এ সংসারের দৈনন্দিন জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না,—

প্রাণ ছম্ ছম্ করে আমার মন ছম্ ছম্ করে।
আধ কপালে মাথার বিষে রইতে নারি ঘরে।
লোচন বলে কাঁদছিস কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥

পদকল্পতরুতে আমরা লোচনদাসের নামে কতকগুলি "বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যার" পদ পাইতেছি। ১৩০৪ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক প্রবন্ধের পরিশেষে নগেন বাবু এইরূপ বলিয়াছেন—"পদগুলি জয়ানন্দের, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে লোচনদাসের কবিত্বখ্যাতি জয়ানন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলায়, ঐগুলি লোচনদাসের নামেই চলিয়া আসিতেছে।" পদগুলির ভাষাগত ও ভাবগত সরলতা ও চিন্তাধারার আন্তরিকতার প্রতি নজর করিলে আমাদের মনে হয়, এগুলির রচয়িতা আমাদের চৈতন্যমঙ্গলের কবি এবং গ্রাম্য ধামালী-রচয়িতা লোচনদাসই বটে। দীনেশ বাবুও এই পদগুলিকে লোচনদাসের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

চৈত্র মাসে চাতক ডাকিয়া যাইতেছে, কোকিল কুহু কুহু ডাকিতেছে, তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। বৈশাখে নানা পুষ্পপল্লবে ধরণী সুশোভিতা হইয়া উঠিয়াছে, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে চন্দন-অনুলিপ্ত, সরু পৈতা স্কন্ধোপরি রক্ষিত প্রাণবল্লভের কথা মনে হইতেছে। জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপে জলবিহীন মৎসের ন্যায় তাহার জীবন অসহ্য মনে হইতেছে, তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

—ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

এ দুঃখে কাহার হৃদয় না আর্দ্র হইয়া উঠে! পাষাণ-প্রতিমার বুকেও বুঝি প্রেম-চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে! এইরূপে লোচনদাস

বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন করিয়া বার মাসের যে করুণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরকে অত্যই উদ্বেলিত করিয়া তুলে, আমাদের মনে পড়িয়া যায় বিরহাশ্রুসিক্ত বিয়োগবিধুরা শ্রীমতীর কথা। সর্ব্বশেষে লোচন ভণিতায় বলিতেছেন—

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোর লহ নিজ আশ।
বিরহ-সাগর ডুবে এ লোচনদাস ॥

পাঠক পদগুলি পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখকে নিজের জীবনে উপলব্ধি না করিতে পারিলে লোচনদাস ঐরূপ অন্তরের দরদটুকু তাঁহার রচনায় ফুটাইতে পারিতেন না; রচনার জাঁকজমক প্রাণকে ব্যক্ত করিতে গিয়া দেহের অলঙ্কারেই মোহিত হইয়া ফিরিয়া আসিত।

চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষ শুনিয়া শঙ্কিত-হৃদয়া শচী দেবীর একটি করুণ বর্ণনা দিয়াছেন। শচী দেবী হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছেন, পুত্রবিহীন জীবন যাপন তাঁহার নিকট একেবারেই অসহ্য, এই আশঙ্কায় আবার দার-পরিগ্রহ করাইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বহারা জীবনের একমাত্র সন্তান—তাঁহার নয়নের একমাত্র হারামণি—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকে হারাইয়া জীবন ধারণ করিয়া কি করিবেন—

বিষ খাঞা মরিব তোমার বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনি এ কাণে ॥
আমায় মারিয়া পুত্র যাইবে বিদেশ।
আগুনি জ্বালিয়া তাহাতে করিব প্রবেশ ॥

কোমল মাতৃহৃদয়ের পুত্র-অদর্শন জনিত ব্যাকুলতা ও দুর্ভাবনায় পীড়িতা জননীর একটি সকরুণ চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পুত্রের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাতার অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা ও করুণার ধারা বিগলিত হইয়া বুঝি পাঠকের নয়নে অশ্রু জাগাইয়া তুলে।

কর্ম্মরহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য

শাস্ত্রে জাতিভেদ অনুসারে কর্ম্মভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সর্ব্বজনমান্য সুপ্রসিদ্ধ গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ অনুসারে কর্ম্মগুলিকে বিভাগ করা হইয়াছে, কোন্ কোন্ জাতির পক্ষে কি কি কর্ম্ম বিহিত তাহাও ভগবান্ই উপদেশ করিয়াছেন, এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিপালনের উপকার যে অত্যন্ত উত্তম ও মহান্, তাহাও তিনিই দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহা হইতে প্রাণিগণের কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইয়া থাকে, এবং যিনি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্বজাতীয় কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া লোক সিদ্ধিলাভ করে, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর উত্তম ফল হইতে পারে না সেই পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ করে। ইহার দ্বারা বলা হইল যে, আমরা যাহা কিছু করিতেছি আমাদের কর্ম্ম করিবার সমস্ত শক্তিই সেই পরমেশ্বর হইতেই আসিয়াছে, তাঁহার দেওয়া শক্তি লইয়াই আমরা কর্ম্ম করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া যাহাকে তাঁহার অপরিমিত শক্তির এক কণা দান করেন, তাহার দ্বারাই সে যাহা কিছু করিয়া থাকে, এবং তিনি যখন সেই শক্তিটুকু প্রত্যাহার করিয়া লন, তখন সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে—একটি কথা বলিবার পর্য্যন্ত অধিকার থাকে না। অতএব কর্ম্ম করিয়া গর্ব্ব দর্প বা অহঙ্কার করিবার মত আমাদের কিছুই নাই, যিনি উন্নত কর্ম্ম করিয়া প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সে জন্য জগতে বরণীয় হন, তিনি তাঁরই অনুগ্রহে এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন জানিবেন, এ জন্য তাঁহার সর্ব্বদাই সেই করুণাময় জগৎপিতাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভরে তাঁর দেওয়া শক্তিকে সর্ব্বদা তাঁর সেবাতেই অর্পণ করা উচিত। অবশ্য তাঁহাকে কেহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তথাপি তিনিই জগতের যাহা কিছু, তিনি ভিন্ন বিশ্বে কিছুই হইতে পারে না, পথের ধূলিকণাগুলি পর্য্যন্ত তিনি, বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় বস্তু সমস্তই তাঁরই মহিমা, তিনিই বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যাদি প্রাণীগুলিও তিনিই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ তাহা গীতায় বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"

অর্থাৎ এই জীবলোকে জীবরূপ সনাতন (নিত্য) বস্তুটি আমারই অংশ, নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ ভগবান্ দৃষ্টিগোচর না হইলেও জীবরূপী ভগবান্ মনুষ্যাদিরূপে সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, অতএব জীবরূপ ভগবান্কে অকপটে সেবা করিলে ফলতঃ তাঁহারই সেবা করা হইল। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

"হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবান্ আস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ হরি সমস্ত প্রাণীতেই বাস করিতেছেন, এই জন্য প্রাণীদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা আন্তরিকতার সহিত উত্তমরূপে সম্মানিত করিবে। অর্থাৎ এমন ভাবে জীবগণকে সেবা করিতে হইবে যে, সকলেই যেন তাহার দ্বারা নিজেকে সম্মানিত মনে করেন; অবহেলা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দর্পিত বা অহঙ্কৃত হইয়া দান করিলে সে দান যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহার দ্বারা লোক সাম্মনিত না হইয়া অপমানিত বা লজ্জিতই হইয়া থাকে। এই জন্য সেইরূপ দান বা যে কোন কর্ম্মকে ভগবান অসাধু কর্ম্ম বলিয়াছেন; কারণ, তাহা ইহলোকেও প্রশংসাজনক হয় না এবং

পরলোকেও মঙ্গলকর হয় না। * অতএব দাতাকে ভাবের বিশুদ্ধতা সহকারে দান করিতে হইবে, তিনি যেন মনে করেন, আমি যে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে পাইলাম ইহার দ্বারা আমি ধন্য, আমার অর্থ ধন্য, আমার হস্ত ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইলাম, আমি যে গ্রহীতাকে কৃতার্থ করিলাম, মনের কোণেও ওরূপ কল্পনা করা উচিত নহে তাহাতে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। অতএব গ্রহীতাকে মধুর ভাষায় সম্মানিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তিভরে দান করিতে হইবে। দানের পাত্র কি অপাত্র ইহা বিচার না করিয়া যে কোন জাতিকে যে কোন ব্যক্তিকে দান করিলেই পুণ্য হইবে।

তবে গঙ্গাতীর প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, গ্রহণ সংক্রান্তি প্রভৃতি পবিত্র সময়ে, সদাচারসম্পন্ন ধার্ম্মিক চরিত্রবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সংপাত্রে যদি দান করা হয়, তাহার ফল অনন্তই হইয়া থাকে, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"অনন্তং বেদপারগে।"

"সর্ব্বত্র গুণবৎ দানং শ্বপাকাদিস্বপি স্মৃতম্।
দেশে কালে বিধানেন পাত্রে দত্তং বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে এমন কি ম্লেচ্ছকে পর্য্যন্ত দান করিলে তাহা ফলপ্রদ হইবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পবিত্র স্থানে পবিত্র সময়ে ও সংপাত্রকে শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক দান করিলে তাহার ফল অত্যন্ত অধিকই হইবে। ভগবানও বলিয়াছেন—

"দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্"

অতএব নানা প্রকারে জ্ঞানীদিগের সেবা করিলে তাহার দ্বারা সকল আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মাই উপাসিত হন জানিবেন। এবং মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিশুদ্ধ ভাবে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহার দ্বারাও জনসেবা হইবে; কারণ, ঐ দ্রব্যগুলি যথাসময়ে না পাইলে কখনই সমাজ চলিতে পারে না। যদি ব্যবসায়িগণ একমত হইয়া এক দিন পণ্যদ্রব্যগুলির বিক্রয় বন্ধ করে, তবে লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে, অতএব ব্যবসায়িগণ খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াও সমাজরূপ ভগবানেরই সেবা করিতেছেন বুঝিতে হইবে। তবে সেই দ্রব্যগুলি বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং মূল্যও সঙ্গত হওয়া আবশ্যক, অবিশুদ্ধ দ্রব্য ও অন্যায় মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহাতে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্মই হইবে। এই জন্য ভগবান বলিলেন—'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' এখানে স্বকর্ম্ম বলিতে ব্রাহ্মণাদি জাতির শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকেই বুঝিতে হইবে। এই জন্য ভগবান্ ঐ প্রকরণে ব্রাহ্মণাদি জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলিই বুঝাইয়া দিয়াছেন। † অতএব উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যে কোন জাতি বা ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করিলে তাহার দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা হইবে না, শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম করিলে তবে তাহা ধর্ম্মে পরিণত হইয়া মঙ্গলকর হইবে, অন্যথা নহে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই করিতে হইবে। যেমন ধরুন, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হয়, এবং সেই দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে হইলে তাহার জন্য নিশ্চয় কৃষিকার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃষিকার্য্য ও গোদুগ্ধের জন্য গো-পালন করা অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য দেশে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সে জন্য বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়। অতএব এই সকল কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সমাজে বৈশ্য জাতির অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—'কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্'।

এইরূপ অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্যও বাণিজ্যের প্রয়োজন। বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হইলে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যালয় প্রয়োজন, আর কার্য্যালয়গুলিতে ম্যানেজার, অফিসার ও কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রমিক পর্য্যন্ত বহুবিধ কর্ম্মীর প্রয়োজন, অতএব ঐ সকল কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য শূদ্রজাতির প্রয়োজন, গভর্ণমেণ্ট অফিস ও বাণিজ্য অফিস প্রভৃতির কার্য্য পরিচালন করিতে কায়স্থ জাতি চিরদিনই প্রসিদ্ধ, তাঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিতই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন ও তাহার দ্বারা প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করেন, এবং অন্যান্য শূদ্রগণও রাজকার্য্য, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতির সাহায্য করিয়া সমাজরূপ ভগবানের সেবা করিবেন, ইহাকেই সমাজের পরিচর্য্যা বলা হয়। ভগবানও বলিয়াছেন—'পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।'

এখনও গভর্ণমেণ্ট আফিসে বা কোন বাণিজ্য-আফিসে কর্ম্মীর প্রয়োজন হইলে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া শত শত লোক প্রার্থী হইয়া থাকেন, দেখা যায়।

সমাজে বহু লোক একত্র বাস করিলে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি হইয়াই থাকে, অতএব সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসনের জন্য ক্ষত্রিয় জাতির প্রয়োজন। তাঁহারা যেমন শান্তি স্থাপন করিবেন সেইরূপ সমাজে কোথাও ধর্ম্মবিপ্লব বা জাতিবিপ্লব হইলে দৃঢ়হস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দমন করিবেন, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াও সেই যুদ্ধে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবেন। বৈদেশিক শত্রু হইতে রাষ্ট্ররক্ষার জন্য অকাতরে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, এবং যুদ্ধে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না, সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করিলে ক্ষত্রিয় জাতির মোক্ষ হয়। * বৌদ্ধগণের কুহকে পড়িয়া ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করার ফলেই ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। সমাজের সুব্যবস্থা রক্ষার ভারই ক্ষত্রিয় জাতির উপর অর্পিত ছিল, সেই ক্ষত্রিয় জাতি লুপ্ত হওয়ার জন্যই সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। যে জাতি নিজের জাতীয়তা রক্ষার জন্য আন্তরিক যত্নবান না হয় সে জাতি ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইউ এন সাং এ দেশে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন, এই বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক লোকই হিন্দু ছিল, এবং সেই সময় বঙ্গদেশে দশ হাজার বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল ও এক লক্ষ বৌদ্ধ

* "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং তু যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥"—গীতা

† "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"—গীতা

* "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাট্‌ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥"

প্রচারক বঙ্গদেশে সর্ব্বদা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিত। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, বৌদ্ধগণের রাজশক্তির প্রভাবে পড়িয়া বহু লোকই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত প্রভাকর আচার্য্য বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আর্য্য জাতিকে জীবিত রাখিবার জন্য মীমাংসাদর্শনের সাহায্যে প্রবল তর্কযুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই গুরুতর ধর্ম্মবিপ্লব জাতিবিপ্লব সমাজবিপ্লব ও কর্ম্মবিপ্লবের সময়ও যে অল্পসংখ্যক হিন্দুজাতি বজায় ছিল, তাহা মহাত্মা প্রভাকরের কৃপাতেই হইয়াছিল। সেই সময় বহু লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেদোক্ত বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ করায় ক্রমে তাহারা অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নানাবিধ অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ যদি নিজের জাতীয়তাকে অর্থাৎ জাতির উপযুক্ত কার্য্যকলাপকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করে, তবে তাহারা জীবিত থাকিলেও সে জাতি আর থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষত্রিয় জাতিই সামাজিক সমস্ত পরিস্থিতি রক্ষা করিবার অধিকারী, সেই ক্ষত্রিয় জাতির পতন হওয়ায় দেশের সকল দিকেই দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকার আবুল ফজলও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে জাতি যখন জমিদার হয়, সেই জাতিই তখন দেশ শাসন করে। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এখনকার মতই এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব দেখিয়াই সেই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মবিপ্লব ও জাতিবিপ্লব হইয়াছিল, তিনি কাহাকেও জাতিচ্যুত করেন নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় এ দেশে ব্রাহ্মণেরও অভাব হইয়াছিল, সেই জন্য প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি ৫ জন সদাচারসম্পন্ন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণই এখন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, এবং ঐ কায়স্থগণের বংশধরগণই রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হন। যাঁহারা রক্ষণশীল গোঁড়া হন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে জাতি ও জাতীয়তার সংরক্ষক, আর যাহারা উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সেবক হয়, তাহারাই জাতীয়তার ঘাতক। জাতীয়তা বিনষ্ট হইলেই জাতি বিনষ্ট হয়, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক কার্য্যকলাপই জাতীয়তা, এই জন্য ভগবান গীতাশাস্ত্রে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পুনঃপুনঃ দৃঢ় ভাবে উপদেশ করিয়াছেন—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'। ভগবানের সেই মহাবাণীকে অবজ্ঞা করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করার জন্যই ভগবদভিশাপে সমগ্র জাতি আজ চরম দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে—

'অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'

অর্থাৎ তুমি যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা শ্রবণ না কর তবে বিনষ্ট হইবে। যদি কখনো অধিকাংশ লোক শাস্ত্রবাক্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান হয় তাহা হইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে জাতির পুনরভ্যুত্থান হইবে, অন্যথা সহস্র চেষ্টাতেও কোন উপকারই হইবে না। অতএব সমাজ ও ধর্ম্মের সংরক্ষক ক্ষত্রিয় জাতির অভাবেই ভারতবর্ষ অধঃপতিত হইয়াছে জানিবেন।

ধর্ম্ম ভিন্ন কোন জাতিই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মানুষকে মানুষের মত থাকিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হয়। ধর্ম্ম ভিন্ন ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না। ধর্ম্মই মানুষের প্রাণে শান্তি দান করে, ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয় সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষ কখনই সংযত থাকিতে পারে না। রাজদণ্ডের ভয়ে লোকে বাহ্যিক কতকটা সাবধানে থাকিলেও অন্তর পবিত্র না হওয়ায় সামান্য লোভের বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, কোন লোক ২১ বার জেল খাটিয়াও পুনর্ব্বার চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ অর্থের লোভেই খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির মূল্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহারা অত্যন্ত অপবিত্র স্বাস্থ্যহানিকর ও বিষাক্ত দ্রব্য পর্য্যন্ত খাদ্যসামগ্রীতে মিশ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহার প্রতিরোধের জন্য রাজার আইন থাকিলেও এই সকল গুরুতর দোষের আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নাই। নৃপতিগণও পররাষ্ট্রলোভে মুগ্ধ হইয়া দারুণ অশান্তিকর অতি নিষ্ঠুর হন এবং নিরীহ প্রজাগণের পীড়ন করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক নানাবিধ কর আদায় করিয়া থাকেন। যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত এই সমস্ত গুরুতর অনর্থের মূল কারণই হইল ধর্ম্মহীনতা, মানুষ অধার্ম্মিক না হইলে কোন অন্যায় কার্য্যই করিতে পারে না। এই সকল অন্যায় কার্য্য হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ধর্ম্মের পবিত্র সংস্পর্শে আসিলে ধর্ম্মের অলৌকিক প্রভাবে লোকের হৃদয় পবিত্র হইবে, তখন আর তাহারা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। দেখা যায়, কোন লোক প্রথম জীবনে অধার্ম্মিকতা বশতঃ নানাবিধ অপকার্য্য করিলেও যদি সে ভাগ্যবশতঃ ধার্ম্মিক হয় তখন স্বভাবতঃই সমস্ত অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করে, চেষ্টা করিয়াও তাহাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায় না, অতএব মানুষকে প্রকৃত মানুষের মত হইতে হইলে পরম মঙ্গলকর ধর্ম্মের শরণাগত হইতে হইবে, ধর্ম্মই কৃপা করিয়া তাহাকে দেবতায় পরিণত করিয়া দিবেন। আর এই ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইলে অবশ্যই শাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া দেন, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করিলে তবে তাহা ধর্ম্ম হয়, পূজা জপ হোম তপস্যা দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হয়, যিনি এই সকল পবিত্র কর্ম্মে রত থাকেন, তিনি আর অধর্ম্ম করিতে পারেন না; অতএব মানুষকে যথাশক্তি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এই সকল কার্য্য করিতে হইলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের সর্ব্বত্র শাস্ত্র প্রচার করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলে ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এ দেশে আসিলে মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে রাঢ় দেশে এক একখানি নিষ্কর গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিয়া ব্রাহ্মণোচিত পূজা হোম জপ তপস্যা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্ম করিতেন, গ্রামে গ্রামে পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়া সমাজে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া সামাজিকগণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার চরিত্র সত্যনিষ্ঠা ত্যাগ ও ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি দেখিয়া স্বেচ্ছায় সকলে তাঁহাদিগকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণদের ঐকান্তিক প্রযত্নে

বৌদ্ধধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া লোক বেদোক্ত ধর্ম্মেই শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন ত্যাগী সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য হইয়া সমাজের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, এবং পৌরোহিত্য ও গুরুতা করিয়া লোকের ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবেন। যেমন শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়গণেরই রাজকার্য্যে অধিকার বলা হইয়াছে, বৈশ্যগণের বাণিজ্যাদিতে অধিকার বলা হইয়াছে, সেইরূপ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণেরই পৌরোহিত্য কার্য্যে অধিকার বলা হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই, "ব্রাহ্মণস্য হি যাজনং বিধীয়তে ন ক্ষত্রবৈশ্যয়োর্দ্বিজাত্যোঃ"—অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্য বিধান করা হইতেছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই দ্বিজাতির তাহা নাই। মীমাংসাশাস্ত্রের আর্ত্বিজ্যাধিকরণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে কেবল ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্য কর্ম্মে অধিকার আছে অন্য কোন জাতির তাহা নাই। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ।"
"ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনং চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, পূজা হোমাদি সৎকার্য্য, পৌরোহিত্য, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বিহিত, এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা, পৌরোহিত্য ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি কার্য্য নিবৃত্ত হইবে, বৈশ্যেরও ঐ তিনটি কর্ম্ম নিবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঐ তিনটি কর্ম্মে অধিকার নাই। মহাভারতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ ধৌম্যকে পুরোহিত স্থির করিয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ গর্গ আচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুল-পুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখে মগ্ন না হইয়া বহু কষ্টেও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বদা তপস্যায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাহার ফলে তিনি পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবেন। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥"

অতএব ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ কর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত থাকিলে সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে মোক্ষলাভ করিয়া ধন্য হইবেন, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"—অর্থাৎ নিজ নিজ জাতির কর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া থাকিলে লোকে মোক্ষলাভ করে। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

"বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥"

অর্থাৎ আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত স্বজাতীয় কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্ম যথাশক্তি করিয়া লোক মোক্ষলাভ করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে মন পবিত্র হইলে সেই বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। অতএব বুঝা গেল, মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসের অপেক্ষা নাই। বশিষ্ঠ অত্রি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও জনক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণ বিনা সন্ন্যাসে গৃহস্থ থাকিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তত্রাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥"

অর্থাৎ পাপক্ষয় হওয়ায় মানুষের আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। নির্ম্মল দর্পণের সদৃশ সেই চিত্তে তিনি আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

"সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো, বোঝো—তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে লিখো না।···এক কাজ ক'রো,—নিজের গ্রামের আর আশপাশের পরিচয়—গল্প হোক, কাহিনী হোক, যতটা পার সংগ্রহ ক'রে, লেখবার চেষ্টা ক'রো। আগে সেইটে ক'রো দিকি···দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না, বৃথা শ্রম হবে, নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না।··· ষ্টাইল? ষ্টাইল শেখাতে হয় না—যা নিজের হ'য়ে দেখা দেবে, তাই তোমার ষ্টাইল; অন্যের মত ক'রে লিখতে যেও না, তাতে দু-কূল যাবে,—আমাদের সাহেব হবার মত।···ভাল শোনাবে ব'লে বেশী বিশেষণ ব্যবহার ক'রো না, ঠিক বাছাই চাই, একটিই যথেষ্ট।"—বঙ্কিমচন্দ্র



(উপন্যাস)

শ্রীফাল্গুনি রায়

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরাপদের হত্যার পর কিছু দিন কেটে গেছে। বলা বাহুল্য, খুনের দায় থেকে চরণদাস অব্যাহতি পেল, কিন্তু চুরির জন্য দু'মাস জেল হ'ল। খুনীর কিন্তু কোন পাত্তাই মিলল না।

এক দিন রামানুজকে আমি বললুম—"তোমার কথা-মত ত্রিমূর্ত্তির অস্তিত্ব যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে এও স্বীকার করতে হবে যে, তিন নম্বর দু'-দু'বার আঘাত করলে। অথচ আমরা হেরে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি, এক-চুলও অগ্রসর হতে পারছি না।"

রামানুজ উত্তর দিলে—"অগ্রসর হচ্ছি বৈ কি। শত্রু-পক্ষ বুদ্ধিমান্। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, এত বুদ্ধিমান প্রতিদ্বন্দ্বী আগে কখনও পাইনি। বুদ্ধিমানের সঙ্গে যুদ্ধ অতি-সাবধানে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হয়। তার কার্য্য-প্রণালী সুস্থির ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে তার মনের পরিচয় পেতে হবে। আমরা তার কার্য্যপ্রণালী আর মনের পরিচয় কিছু-কিছু পেয়েছি, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, এইটুকুই আমাদের সুবিধা।"

এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দীপঙ্কর ঘরে ঢুকল। পরিচয় করিয়ে দিলে—"ইনি ধূর্জ্জটীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউ, পি, গোয়েন্দা বিভাগের এক জন কেষ্ট-বিষ্টু। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

পরিচয়-পর্ব্বাদি সাঙ্গ হবার পর চা খেতে খেতে দীপঙ্কর বললে—"এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। তোমার হয়তো মনে আছে রামানুজ, তুমি এক দিন আমায় বলেছিলে ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে তোমায় বলতে।"

রামানুজ ব্যগ্র ভাবে বললে—"হ্যাঁ, কিছু জানতে পেরেছ না কি?"

দীপঙ্কর জবাব দিল—"না, আমি পারিনি, তবে ধূর্জ্জটী বাবু জানেন। তাই আমি ওঁকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে এলুম।"

রামানুজ জিজ্ঞাসু নেত্রে ধূর্জ্জটী বাবুর দিকে চাইলে।

ধূর্জ্জটী বাবু বললেন—"বিশেষ কিছু জানি না। আমি একটা কাজে দিল্লী গেছলুম—সেখানে এক বন্ধুর মুখে ত্রিমূর্ত্তি-নামটা প্রথম শুনি। কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। আপনাকে ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে আমি কোন খবরই দিতে পারব না। একটা অদ্ভুত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইতে এসেছি, যদিও আমাদের বিশ্বাস, এখন আর করার কিছু নেই।"

রামানুজের চেহারা দেখেই বুঝলুম, সে বিলক্ষণ নিরাশ হয়েছে। তবু মুখে বললে—"বলুন, ব্যাপারটা কি?"

ধূর্জ্জটী বাবু বললেন—"ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো—যেন আরব্যোপন্যাসের গল্প। আমি এলাহাবাদে থাকি। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব এক জন নাম-করা কেমিষ্ট ডক্টর বিজয়লাল গুপ্ত এক রকম অদ্ভুত সার আবিষ্কার করেছেন। সেই সার-ব্যবহারে মাটী দশ গুণ উর্ব্বর হবে আর দু'টি উর্ব্বর সময়ের মধ্যে যে অনুর্ব্বর অবস্থা আসে সেটাও দূর হবে। এ-সম্বন্ধে দিল্লীর বিখ্যাত কেমিষ্ট স্যার মোহনচাঁদ অগ্রওয়ালের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান। সিসিল হোটেলে উঠেছিলেন। সন্ধ্যার সময় হোটেল থেকে বার হন, কিন্তু বাসায় আর ফেরেননি। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই তদন্তের জন্যই দিল্লী গিছলুম। আজ অবধি তাঁর কোন পাত্তা নেই।"

রামানুজ প্রশ্ন করলে—"কত দিনের কথা?"

ধূর্জ্জটী বাবু উত্তর দিলেন—"মাস দুই তো বটেই, বরং বেশী হবে তো কম নয়।"

রামানুজ বললে—"ব্যাপারটা সত্যই ঘোরালো বটে। আচ্ছা, এলাহাবাদে আপনারা খবর পেলেন কি করে?"

ধূর্জ্জটী বাবু জবাব দিলেন—"স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করবার পর সরকারী কৃষি বিদ্যালয়ে ডক্টর গুপ্তর একটি বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সে বক্তৃতা দেননি—কারণ অনুপস্থিতি। সেখান থেকে এলাহাবাদে খোঁজ করা হয় যদি হঠাৎ কোন কারণে ফিরে এসে থাকেন। মিসেস গুপ্ত জানালেন তিনি ফেরেননি। তিন-চার দিন পরে মিসেস গুপ্ত পুলিশে খবর দেন, তাঁর স্বামী এখনও ফিরছেন না কেন? এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনুরূপ অনুরোধ করা হয়। সন্ধান করতে আমি দিল্লী যাই, কিন্তু কোন হদিস পাইনি। বাড়ী ছেড়ে কোন খবর না দিয়ে ঘুরে বেড়াবার মত লোক তিনি নন। তাই আমাদের বিশ্বাস, কোন লোক তাঁর আবিষ্কারের গুপ্ত তথ্য জানবার জন্য তাঁকে হয় গুম করেছে আর না হয় জানতে না পেরে রেগে তাঁকে খুন করে ফেলেছে।"

রামানুজ কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করবার পর বললে—"ওঁর স্ত্রী—অর্থাৎ মিসেস গুপ্ত এখন কোথায়?"

ধূর্জ্জটী বাবু জানালেন, মিসেস গুপ্ত কলকাতায় তাঁর শ্বশুরের কাছে ফিরে এসেছেন। ডক্টর গুপ্তর বাবা এক জন রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান। দমদমায় বাড়ী। রামানুজকে ঠিকানা দিলেন। দীপঙ্কর প্রশ্ন করলে—"কি হে রামানুজ, কি-রকম বুঝছো?"

রামানুজ হেসে উত্তর দিলে—"এখনও বুঝিনি কিছু—শুধু শুনলুম, সময়-মত বোঝবার চেষ্টা করব।"

দীপঙ্কর ও ধূর্জ্জটী বাবু প্রস্থান করতেই রামানুজ বললে—"চল ফাল্গুনি, কলকাতার গোলমাল আর ভাল লাগছে না, একবার দমদম ঘুরে আসা যাক।"

আমি হেসে জবাব দিলুম—"শাক দিয়ে মাছ ঢাককার চেষ্টা কেন?"

দমদমায় মিষ্টার গুপ্তর বাড়ী খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বেয়ারাকে দিয়ে রামানুজ কার্ড পাঠালে। একটু পরেই মিষ্টার গুপ্ত নিজেই ড্রইং-রুমে এলেন। রামানুজ তাঁকে আসবার কারণ জানিয়ে বললে—"একবার মিসেস্ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

মিষ্টার গুপ্ত বললেন,—"তা করতে পারেন, কিন্তু কোনো ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'মাসের উপর কেটে গেছে। পুলিশ তো কোন সন্ধানই করতে পারলে না।"

রামানুজ বললে—"তা জানি, তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?"

"না, দোষের কিছু নেই। আচ্ছা, আমি বিজয়ের স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চাপা স্বরে বললুম—"আমাদের আগমনে ভদ্রলোক বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

রামানুজ উত্তর দিলে—"না হবার বিলক্ষণ কারণ রয়েছে পুলিশ কিছু করতে পারেনি, এ কথা ভুললে চলবে না।"

কিছুক্ষণ পরে মিসেস গুপ্ত ঘরে ঢুকলেন। নমস্কার করে বললেন—"বাবার মুখে সব শুনলুম। আপনার নাম শুনেছি। পুলিশ যখন কোন সন্ধান করতে পারল না, তখনই আপনাকে খবর দেবার কথা বলেছিলুম। কিন্তু—কিছু মনে করবেন না, বাবা বললেন যে, পুলিশ যখন কিছু পারলে না তখন সখের ডিটেক্‌টিভ আর কি এমন করবে।"

রামানুজ হেসে বললে—"মনে আর কি করব! আমি জানি, আমাদের ওপর জনসাধারণ বিশেষ আস্থা রাখে না। তবে আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য নই, এটুকু বিশ্বাস হয়ত আপনি করতে পারেন।"

অপ্রতিভ হয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন—"আপনার ওপর আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে কি না, তাই—"

বাধা দিয়ে রামানুজ বললে—"একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি! আপনি ডক্টর গুপ্তর কাছ থেকে শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?"

"তা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে চিঠিটা আছে। আনব?"

"যদি কিছু মনে না করেন—"

"না, না, মনে করব কেন? আনছি।" এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট দু'য়েক পরেই চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—"এই দেখুন, সিসিল হোটেল, দিল্লী। ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৪। চিঠিটা দেখবেন?

রামানুজ উত্তর দিলে—"না, দেখবার দরকার নেই। শুধু তারিখটা জানতে চাইছিলুম। আচ্ছা, ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে ডক্টর গুপ্ত কখনও কোন কথা আপনাকে বলেছিলেন?

"কৈ না। মনে পড়ছে না তো! ত্রিমূর্ত্তি কি?"

"কি, তা আমি নিজেই জানি না! আজ উঠি। এ রহস্যের সন্ধান দিল্লীতে, এখানে নয়। আচ্ছা, ডক্টর গুপ্তর শরীরে কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে যাতে তাঁকে চেনা যায়?"

মিসেস গুপ্ত উত্তর দিলেন—"হাঁ। বুকে জড়ুলের চিহ্ন আছে।"

নমস্কার করে রামানুজ উঠে দাঁড়াল। আমিও তার অনুকরণ এবং অনুসরণ করলুম।

পথে নেমেই প্রশ্ন করলুম—"যাবে?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, আজই। যেখান থেকে ডক্টর গুপ্ত অদৃশ্য হয়েছেন, সেইখানেই ছিন্নসূত্রের সন্ধান করতে হবে।"

"আমাকেও নিয়ে যাচ্ছ তো?"

হেসে রামানুজ বললে—"নিশ্চয়ই। অবশ্য, তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়।"

সেই দিন সন্ধ্যায়ই আমরা দিল্লী মেলে উঠে বসলুম। সেখানে পৌঁছে আমরাও যেখানে ডক্টর গুপ্ত উঠেছিলেন সেইখানে অর্থাৎ সিসিল হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। রামানুজ হোটেলের ম্যানেজার এবং চাকরদের দু'-চারটে প্রশ্ন করলো কিন্তু তাতে কিছু ফল হ'ল না। দু'মাস আগেকার ব্যাপার কেই বা মনে রাখে! বিশেষ হোটেলে—যেখানে দিন-রাত লোক আনা-গোনা করছে। তারা জানালে, ডক্টর গুপ্ত হঠাৎ উধাও হ'ননি। তিনি ১৪ই অক্টোবর রাত্রে এখানে এসে ওঠেন; ১৫ই সমস্ত দিন বাইরে-বাইরে কাটান—অবশ্য লাঞ্চ খাবার সময় একবার ফিরেছিলেন। তার পর রাত ন'টা নাগাদ ফেরেন—ডিনার খাননি। ভোর বেলা হোটেল ত্যাগ করেন, অবশ্য কেউ তাঁকে যেতে দেখেনি। বিছানা দেখে মনে হয়, তিনি নিজের ঘরে রাত্রিবাস করেছিলেন। হোটেলে এসেছিলেন একটি স্যুটকেশ, ছোট একটি বেডিং ও এটাচী-কেস নিয়ে। সকালে ঘরে এর কিছুই ছিল না।"

তার মানে তিনি মাল-পত্র নিয়েই হোটেল ত্যাগ করেছিলেন। এতে লক্ষ্য করবার মত কিছুই নেই। অনেকেই এমন করে থাকেন। দু'দিনের জন্য ঘর ভাড়া করে অনেক সময় দু'ঘণ্টা পরেই চলে গেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়।

সকালে নিজেদের ঘরে প্রাতরাশ খেতে খেতে রামানুজ জিগ্যেস্ করলে—"কিছু বুঝলে?"

উত্তর দিলুম—"এতে বোঝবার কি আছে? অতি সোজা কথা। পরের দিন ভোরবেলা উঠে ডক্টর গুপ্ত কোথাও বেরিয়ে যান আর ফেরেননি। অর্থাৎ সেদিন সকালে কেউ তাঁকে চুরি করে। এর মধ্যে ঘোর-প্যাঁচের কিছু নেই।"

রামানুজ বললে—"সরল মানুষ সরল ভাবেই সকল বিষয় চিন্তা করে। ডক্টর গুপ্ত কৃষি-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা না দিয়ে হঠাৎ লগেজ-পত্তর নিয়ে ভোর হতেই চলে গেলেন কেন? ভোরে এলাহাবাদে যাবার ট্রেণ কোথায়?"

"এমনও তো হতে পারে, হয়তো কোন [illegible] লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! হোটেল ত্যাগ করে তার বাড়ী যাচ্ছিলেন!"

"হ'ল না বন্ধু, হ'ল না। অত ভোরে উঠে কেউ বাসা বদল করে না। তাছাড়া তিনি যখন নিখোঁজ হলেন, তখন কোন পরিচিত ব্যক্তির কাছে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি পুলিশকে তা জানাতেন।"

"বেশ, স্বীকার করছি যে আমার কোন কথাই যুত-সই হচ্ছে না। এবার তোমার কি বক্তব্য, বল।"

রামানুজ হেসে বললে—"বলছি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। সবই অবশ্য কল্পনা। আমার মাথায় তিনটে আইডিয়া এসেছে। প্রথম—হয়তো সত্যকারের বিজয় গুপ্ত দিল্লী পর্য্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেননি, মাঝ পথেই কেউ তাঁকে গুম করেছে। বিজয় গুপ্ত সেজে দিল্লী এসেছিল অন্য লোক। দ্বিতীয়—হয়তো তিনি দিল্লীতে পৌঁছে সিসিল হোটেলে উঠেছিলেন; তার পর স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে কেউ তাঁকে সরিয়েছে। তৃতীয়—এবং এইটেই বোধ হয় ঠিক যে, স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পথে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন।"

আমি হেসে বললুম—"লজিক অকাট্য বটে। একটা নিখোঁজ লোক রাত্রে এসে খাটে দিব্য আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুল! ভারী মজার ব্যাপার তো।"

রামানুজ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে—"কিন্তু ডক্টর গুপ্তই যে হোটেলে ফিরে রাত্রে শুয়েছিলেন, তার কোন প্রমাণ আছে? রাত্রে কেউ তাঁকে ফিরতে দেখেনি। তিনি ডিনার খেতে নামেননি। ভোরে তিনি কখন চলে গেছেন, তাও কেউ জানতে পারেনি। শুধু জানা গেল, রাত্রে বিছানায় শোবার চিহ্ন রয়েছে। বিজয় বাবু ছাড়া অপর ব্যক্তিও তো শুতে পারে।"

বিস্মিত হয়ে বললুম—"তুমি বলতে চাও, বিজয় বাবু রাত্রে ফেরেননি? অন্য কোন লোক নিজেকে তাঁর নামে চালাবার চেষ্টা করেছে?"

"ঠিক তাই। সেই জন্যই নিজেকে হোটেলের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখবার জন্য এত সতর্কতা। কোন সাধারণ লোকের গতিবিধি ও-রকম হতে পারে না। যাই হোক, প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কথায় জোর দিতে চাই না। খাওয়া তো হ'ল, এখন চল, বেরুনো যাক্।"

"কোথায়?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"স্যর মোহনচাঁদ অগ্রওয়ালের বাড়ী।"

কিঙ্‌স্‌ওয়েতে স্যর মোহনচাঁদের বিরাট বাস-ভবন। সামনে প্রকাণ্ড বাগান, অজস্র রকমের ফুল, মখমলের মত লন। যেন রাজ অট্টালিকা! কার্ড দিতে একটি ছোকরা আমাদের ড্রইংরুমে বসিয়ে স্যর মোহনচাঁদকে খবর দিতে গেল এবং একটু পরেই গৃহস্বামী স্বয়ং এসে হাজির হলেন।

আমাদের বক্তব্য শুনে তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—"কিন্তু এ সম্বন্ধে তো পুলিশের কাছে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আশ্চর্য্যের বিষয়! ডক্টর গুপ্তর মত অমন প্রতিভাবান্ এক জন সায়েণ্টিষ্ট নিখোঁজ হলেন আর পুলিশ তার কোন হদিস করতে পারল না! শেমফুল। আমি আর আপনাদের বেশী কি সাহায্য করতে পারব বুঝতে পারছি না।"

রামানুজ বললে—"তারা যে প্রশ্ন করেছিল, হয়তো আমি সে ধরণের কোন কথা জিগ্যেস করব না। আমি শুধু জানতে চাই, আপনারা কি সম্বন্ধে কথাবার্তা করেছিলেন।"

অবাক্ হয়ে রামানুজের মুখের দিকে চেয়ে স্যর মোহনচাঁদ বললেন—"অদ্ভুত প্রশ্ন! তাঁর গবেষণার বিষয় ছাড়া আর কি কথা হবে?"

"ডক্টর গুপ্ত তাঁর থিওরি আপনাকে বোঝালেন?"

"হ্যাঁ। আমিও ঐ-লাইনেই কাজ করছি কি না। দু'জনে তাই নিয়ে একটু আলোচনা হল।"

"ডক্টর গুপ্তর থিওরি কি আপনি কার্য্যকরী হবে বলে বিশ্বাস করেন?"

"নিশ্চয়। আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের অনেক মিল আছে। দু'-এক জায়গায় একটু গরমিল ছিল। আমরা ঠিক করেছিলুম, দু'জনে এক-সঙ্গে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখব, কার ভুল। কিন্তু এ সব প্রশ্নের কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।"

"কোথায় বসে কথা হয়েছিল?"

"এইখানে।"

"আপনি একলা ছিলেন, না, অন্য কোন লোকও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল?"

"আমরা একলা ছিলুম। কেন?"

"অন্য কোন লোক শুনতে পাবে, সে সম্ভাবনা ছিল?"

"না। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।"

রামানুজ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"ধন্যবাদ স্যর মোহনচাঁদ, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলুম। ক্ষমা করবেন।"

স্মিত হাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "বিলক্ষণ। যদি কোন কাজে লাগে থাকি তো নিজেকে ধন্য মনে করব।"

স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখি, এক জন মহিলা ফটক দিয়ে ঢুকলেন এবং কোন দিকে না চেয়ে হন্-হন্ করে ভিতরে চলে গেলেন। সামান্য এক-ঝলক মাত্র দেখতে পেলুম। অপরূপ সুন্দরী!

পথে এসে রামানুজ প্রশ্ন করলে—"কিছু লক্ষ্য করলে?"

উত্তর দিলুম—"দেখলুম স্যর মোহনচাঁদকে। চমৎকার সৌম্য চেহারা, মুখে-চোখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি!"

বাধা দিয়ে রামানুজ বললে—"সে কথা জিগ্যেস্ করছি না। যে মেয়েটি এখনি বাড়ীর ভিতর গেল, তাকে দেখলে?"

"হাঁ, দেখলুম বই কি। চমৎকার দেখতে। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে অমন রং অল্পই দেখা যায়।"

রামানুজ হেসে বললে—"তোমাদের মানে লেখকদের দোষই ওই। মেয়েদের সৌন্দর্য্যই শুধু চোখে পড়ে। তার ভাবভঙ্গী—"

বললুম—"তাও লক্ষ্য করেছি বই কি! ভেরী স্মার্ট—"

"না, না, সে কথা বলছি না। স্মার্ট তো বটেই, কিন্তু যেন অতি বেশী স্মার্ট! যে কোন লোক বাড়ী ঢোকবার সময় যদি কোন নতুন অপরিচিত লোককে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে একবার তার দিকে চায়। কৌতূহল বলতে পার,—মানুষের স্বভাব। তা না করলে বুঝতে হবে, সে আমাদের এড়িয়ে যেতে চায়।"

হঠাৎ "সরে এস, সরে এস" বলে রামানুজ হিড়-হিড় করে আমার হাত ধরে টানলে। ঠিক পর-মুহূর্ত্তেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙ্গে আমাদের সামনে পড়ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রামানুজ বললে—"যাক, খুব সময়ে সাবধান হওয়া গেছে। বিলম্বে কি হ'ত, বুঝতে পারছ তো?"

"অ্যাকসিডেণ্ট।"

"দেখে তাই মনে হয়! কিন্তু আমার ধারণা, কেউ ইচ্ছা করেই পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের সরিয়ে ফেলবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছিল।"

"কথাটা যেন একটু কষ্ট-কল্পনার মত শোনাচ্ছে।"

"তা শোনাচ্ছে। আচ্ছা, একটু চিন্তা করা যাক্! ডক্টর গুপ্ত দিল্লীতে এসেছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে।"

প্রশ্ন করলুম—"কি করে জানলে? প্রমাণ?"

রামানুজ হেসে জবাব দিলে—"প্রমাণ পেয়েছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে, দমদমে মিসেস গুপ্ত আমাদের তাঁর স্বামীর চিঠি দেখিয়েছিলেন। হোটেলের খাতায় ডক্টর গুপ্তর দস্তখত দেখেছি। একই হাতের লেখা। অতএব প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হ'ল। তার পর তিনি স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এটাও ঠিক। কারণ, এক জন জাল লোক কেমিষ্ট্রীর জটিল তত্ত্ব নিয়ে তাঁকে কখনই ঠকাতে পারত না। তার পর ডক্টর গুপ্ত স্যর মোহনচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার হলেন! পথে যেতে যেতে হঠাৎ—ঠিক হয়েছে ফাল্গুনি, চল, আবার স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী যাওয়া যাক।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম—"আবার! কেন? স্যর মোহনচাঁদের যা কিছু বলবার ছিল, সবই তো বলেছেন।"

"স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না।"

"তবে?"

"সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

প্রথম বার যে-লোকটি দ্বার খুলেছিল এবারও সে এল। আমাদের চিনতে পেরে প্রশ্ন করলে—"কিছু ভুলে গেছেন বুঝি?"

রামানুজ জবাব দিলে—"না। আমরা বিদায় নেবার পরেই এক জন মহিলা এসেছিলেন। তিনি কে?"

"সাবিত্রী দেবী। তিনি স্যর মোহনচাঁদের টাইপিষ্ট।"

"তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দাঁড়ান, দেখছি।" বলে লোকটি চলে গেল এবং একটু পরেই এসে জানালে যে সাবিত্রী দেবী আবার বেরিয়ে গেছেন।

রামানুজ বললে—"না, তিনি বেরিয়ে যাননি। গেলে আমরা নিশ্চয় দেখতে পেতুম। আপনি তাঁকে একবার আমার কার্ড দিয়ে বলবেন, অত্যন্ত দরকারী কাজ, তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি, নাহলে দিল্লীর পুলিশ-কমিশনরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

লোকটি আবার ভিতরে চলে গেল। একটু পরে সাবিত্রী দেবী স্বয়ং এলেন এবং আমাদের নিয়ে গিয়ে ড্রইংরুমে বসালেন।

সাবিত্রী দেবী বললেন—"মিষ্টার বসু, আপনাকে যখন বাড়ী থেকে বেরোতে দেখলুম তখনই বুঝতে পেরেছি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে।"

রামানুজ বললে—"মিস ফেরিস—"

বাধা দিয়ে সাবিত্রী দেবী বললেন—"এখানে র‍্যাচেল ফেরিস নয়, সাবিত্রী দেবী। আপনার জন্য আমায় কলকাতা ত্যাগ করে আসতে হ'ল। এখানেও আপনি ধাওয়া করেছেন। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দেবেন না, এই আপনার উদ্দেশ্য?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"না, উদ্দেশ্যটা আর-একটু গুরুতর। আমি ডক্টর গুপ্তর সন্ধান চাই।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন—ডক্টর গুপ্ত! নামটা যেন শোনা-শোনা ঠেকছে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। তিনিই তো এক দিন স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তার পর কোথায় যে চলে গেছেন—"

বাধা দিয়ে কঠোর স্বরে রামানুজ বললে—"চলে যাননি, তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে। এবং কোথায়, তাও জানি। পাশের বাড়ীতে, যেখান থেকে আকস্মিক দুর্ঘটনার মত একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল। দুর্ঘটনা যে স্বেচ্ছাকৃত, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের আছে।"

সাবিত্রীর মুখ একেবারে শাদা কাগজের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে নিমেষে সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠেই বললে, "আপনি সবই জানেন, দেখছি। ডক্টর গুপ্ত ও-বাড়ীতে নেই। কোথায় আছেন, বলব না। তবে তাঁকে মুক্তি দিতে রাজী আছি। কিন্তু এক সর্ত্তে।"

"সর্ত্ত কি শুনি?"

"আমার স্বাধীনতায় যদি আপনি হস্তক্ষেপ না করেন, তবেই তিনি স্বাধীনতা লাভ করবেন, নচেৎ নয়।"

একটু চিন্তা করে রামানুজ বললে—"বেশ, এ সর্ত্তে আমি রাজী। আচ্ছা, ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?"

সাবিত্রীর মুখে-চোখে ভীতি-ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠোঁট যেন মড়ার মত নীল হয়ে গেল। রামানুজের কথার উত্তর না দিয়ে বললে—"একবার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?"

রামানুজ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়তে সে একটি নম্বর মেলালো। অটোমেটিক ডায়াল সিষ্টেম—নম্বর জানতে পারলুম না।

ফোনে বললে—"রামানুজ বসু এইখানে বসে। তিনি সব জানেন। হোটেল সিসিলে তাঁর ঘরেই ডক্টর গুপ্তকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর, আর সকলে সরে পড়।"

রিসিভার রেখে রামানুজ বললে—"তোমাকে আমাদের সঙ্গে হোটেলে যেতে হবে।"

সাবিত্রী হেসে বললে—"তা জানি।"

হোটেলে ফিরতেই ম্যানেজার বললেন—"মিষ্টার বসু, আপনার ঘরে একটি লোক এসেছে। অসুস্থ মনে হ'ল। সঙ্গে এক জন নার্শ এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। বললে, আপনি পাঠিয়েছেন।"

রামানুজ বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই পাঠিয়েছি।"

সাবিত্রী জিগ্যেস করলে—"আমি তবে যেতে পারি?"

রামানুজ বললে—"না, আগে ওপরে গিয়ে দেখি, ঠিক লোক কি না!"

আমরা দ্বিতলের ঘরে এলুম। এসে দেখি, এক জন লোক খাটের উপর শুয়ে আছে। চেহারা অতি শীর্ণ, যেন বহু দিনের রোগী। রামানুজ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি ডক্টর গুপ্ত?"

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রামানুজ বললে, "বেশ, যদি তাই হয় আপনার জামাটা একবার খুলুন। বুকে জড়ুলের চিহ্ন আছে কি না দেখতে চাই।"

বুক খুলতে দেখা গেল জড়ুলের চিহ্ন রয়েছে। নিশ্চিত হবার জন্য রামানুজ সেই চিহ্নের উপর আঙ্গুল ঘষে বললে—"হ্যাঁ, আপনিই যে ডক্টর গুপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাবিত্রী, ধন্যবাদ, তুমি এবার যেতে পার।"

সাবিত্রী চলে যাওয়ার পর রামানুজ ডক্টর গুপ্তকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে অনুরোধ করলে। ডক্টর গুপ্ত কিন্তু ভীত ভাবে বললেন—"বলতে পারব না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমাকে বাস করতে হবে। এ ক'দিন আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু তবু আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না।"

সেই দিনই তিনি এলাহাবাদ চলে গেলেন।

আমরা আরও দু'-চার দিন দিল্লীতে থাকব ঠিক করলুম।

সমস্ত দিন এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াই, দর্শনীয় স্থানগুলি দেখি রাত্রে হোটেলে ফিরে খোসগল্প করি। এক দিন রামানুজকে বললুম—এ-বার কলকাতা ফিরি, চল। এখানে বিশেষ কোন কাজ করছ বলে তো মনে হচ্ছে না।"

হেসে রামানুজ বললে—"আর কি করব, বল?"

"পুলিশে খবর দেবে।"

"খবর তো দেব কিন্তু তাদের বলব কি?"

"কেন, ত্রিমূর্ত্তির কথা!"

রামানুজ হেসে উত্তর দিলে—"আমাকে পাগল মনে করবে আর তাদের বলবই বা কি? আমি নিজেই এখনও ত্রিমূর্ত্তির সম্বন্ধে কিছু জানি না।"

"সাবিত্রী ওরফে মিস র‍্যাচেল ফেরিসকে আটক করতে পারলে হয়তো ওর মারফৎ কিছু হদিস মিলত।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামানুজ বললে—"হয়তো হদিস মিলত কিন্তু নিরুপায়। তাকে কথা দিয়েছি। জান তো, কথার নড়চড় আমি করি না।"

"মিস ফেরিসের ব্যাপারখানা বুঝতে পারলুম না।"

"কলকাতায় এক জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক খুন হয়েছিল।—মিস ফেরিস সেই খুনের মামলায় জড়িত ছিল। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু সে দোষী ছিল। প্রমাণও আমি পেয়েছিলুম। তবে সে প্রমাণ জোগাড় হয়েছিল মামলা শেষ হবার অনেক পরে।"

যখন আমাদের এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ঘরের দরজায় কে যেন আঘাত করলে এবং কোন উত্তর দেবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্যুট-পরা, ওভারকোট এবং মাফলারে দেহ আবৃত, মাথার টুপিটা প্রায় ভ্রূ-অবধি নামানো। এগিয়ে এসে নিম্ন স্বরে বললে—"কিছু মনে করবেন না। এ ভাবে প্রবেশ অশোভন কিন্তু কথাটা একটু জরুরী বলেই আসতে হল।"

আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে রামানুজ বললে—"দরকারী কথাটা কি, বলুন। আমরা শুনতে প্রস্তুত।"

"কথাটা দরকারী হলেও অতি সহজ। আপনি আমাদের ভয়ানক বিরক্ত করছেন।"

"আমাদের, মানে? কাদের?"

লোকটি কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে আমাদের সামনে খুলে ধরলে। দেখলুম, তাতে তিনটি সিগারেট রয়েছে। তখনই কেস বন্ধ করে পকেটে পুরে ফেললে।

রামানুজ বললে—"ও! তা আমাকে আপনার বন্ধুরা কি করতে বলেন?"

"আমাদের পরামর্শ যদি শোনেন, তবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই ভাল হয়।"

"পরামর্শটা খুবই ভাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমি রাজী না হই?'

কাঁধটা ঝাঁকুনী দিয়ে আগন্তুক বললে—"সে আপনার অভিরুচি। আপনার বুদ্ধির এবং সাহসের আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু আপনার এ হঠকারিতার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। মনে রাখবেন, মানুষ একবার মরে গেলে আর বাঁচে না।"

রামানুজ হেসে বললে—"তা জানি। আর এও ঠিক যে, মানুষ একবারের বেশী মরে না।"

আগন্তুক প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললে—"আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আশা করি, আপনিও আমার কথা মনে রাখবেন।"

আমি বলে উঠলুম—"লোকটা ভয় দেখিয়ে চলে যাবে?" তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

লোকটা ধীর ভাবে বললে—"কি করতে চান?"

আমি ঝাঁজালো কণ্ঠে উত্তর দিলুম—"পুলিশে খবর দেব।"

রামানুজ দ্বিধাপূর্ণ কণ্ঠে বললে—"বেশ, তাই করা যাক।"

রামানুজ যেই টেলিফোনে হাত দিয়েছে, অমনই লোকটা বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। আমার শরীরে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু লোকটাকে ধরে রাখতে পারলুম না। প্রায় আয়ত্ত করে এনেছিলুম, লোকটা নেতিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ আমি মুখ থুবড়ে ছিটকে গিয়ে পড়লুম। লোকটা চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া।

রামানুজের হাত থেকে টেলিফোন কেড়ে নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ফোন করলুম। "দেখুন, ওভারকোট স্যুট আর টুপি-পরা এক জন লোক এখনই নীচে যাচ্ছে। তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। পুলিশ তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। আটক করুন।"

কিছুক্ষণ পরেই দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলুম এবং ম্যানেজার স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই আমি প্রশ্ন করলুম—"লোকটাকে ধরেছেন?"

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—"আপনার বর্ণনার মত কোন লোককে দেখতে পেলুম না।"

"মানে, কোন লোককেই দেখতে পাননি?"

"এক জন লোককে দেখলুম বটে। কিন্তু তার টুপি, ওভারকোট ছিল না। হাতে একটা স্যুটকেশ ছিল। সে তো ইন্সিওরেন্সের দালাল। কিছুক্ষণ আগে আমাকে একটা পলিসি গছাবার চেষ্টা করছিল।"

এতক্ষণ রামানুজ চুপ করে একটা চেয়ারে বসেছিল। এইবার সে বললে—"ঠিক হয়েছে। লোকটা অতি বুদ্ধিমান। ক্যানভাসার সেজে প্রথমে নিজের পোজিশন ঠিক করে নিয়ে তবে এসেছে। স্যুটকেশটা তাই বিসদৃশ ঠেকেনি, কাজেই কেউ তা লক্ষ্য করেনি। ওভারকোট আর টুপি আসবার আর যাবার সময় স্যুটকেশের মধ্যেই ছিল।"

ম্যানেজার আমতা-আমতা করে বললেন—"কিন্তু আমি কি করে জানব, বলুন?"

আশ্বাস দিয়ে রামানুজ বললে—"না, না, আপনার কোন দোষ নেই।"

ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বিষণ্ণ ভাবে রামানুজকে বললুম—"দোষ আমারই। লোকটাকে হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারলুম না।"

রামানুজ হেসে বললে—"তোমার কোন দোষ নেই। ও একটা যুযুৎসুর প্যাঁচ।"

হঠাৎ দেখি, দরজার কাছে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। লাফিয়ে গিয়ে সেটাকে তুলে নিলুম। খুলে দেখি, তাতে লেখা আছে "সোমবার বিকেল তিনটে। জুম্মা মসজিদের পাশে। ১০, সাঁসল গলি।"

তলায় নাম লেখা নেই—শুধু একটি সংখ্যা আছে।

কাগজখানা রামানুজের হাতে দিয়ে বললুম—"পড়ে দেখ। সৌভাগ্য বলতে হবে। আজই তো সোমবার।'

রামানুজ কাগজটা পড়ে অস্ফুট স্বরে বললে—"ওঃ, তাই লোকটা এসেছিল। এবার বুঝতে পারছি।"

বিরক্ত হয়ে বললুম—"সব সময়েই কেবল চিন্তা! এর মধ্যে বোঝবার এবং ভাববার কি আছে?"

রামানুজ হেসে বললে—"বন্ধু, রাক্ষুসে গাছ দেখেছ? পাতাগুলো হাঁ করে থাকে। কোন পোকা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে গেলেই কাঁদার হাঁ আপনি বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পোকারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়। রামানুজ পোকা নয়। তাকে অত-সহজে আকৃষ্ট করা যায় না। এদের বুদ্ধি আছে স্বীকার করছি কিন্তু আমিও নিরেট নই।"

বিস্মিত ভাবে বললুম—"কি বলছ, তুমি? কিছু বুঝতে পারছি না।"

"প্রথম থেকেই আগন্তুকের আসবার কারণ খোঁজবার চেষ্টা করছিলুম। তারা সত্যই ভেবেছিল যে ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে? নিশ্চয় নয়। তবে কি করতে এসেছিল? তোমার সঙ্গে যে যুদ্ধটুকু হলো, তাতে সে বাধা দিল না কেন? ইচ্ছা করলে আগেই চলে যেতে পারত। কিন্তু যাই-যাই করে যেতে পারছিল না। কেন? কারণ, এই রকম একটা গণ্ডগোল-সৃষ্টি তার প্রয়োজন ছিল। তাই মারামারি। এবং সেই সুযোগে কাগজের টুকরোটা ফেলে দিয়ে গেল। মনে হবে যেন হঠাৎ পড়ে গেছে। এতে লেখা রয়েছে—"সোমবার বিকেল তিনটে। জুম্মা মসজিদের পাশে। ১০, সৌসল গলি।" যদি এই কাগজটার কোন মূল্য থাকত পড়া হয়ে গেলেই লোকটা পুড়িয়ে ফেলত। পকেটে করে এইখানে, শত্রুর ঘরে আনত' না। ফাল্গুনি, রামানুজকে এত সহজে ভোলানো যায় না।"

অস্ফুট স্বরে বললুম—"তাই তো! এতটা ভাবি নি।"

নিজের মনেই রামানুজ বললে—"কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না।"

"কি?"

"বেলা তিনটের সময় কেন? দিনের আলোয় তো আমাকে চুরি করতে পারবে না। তবে? একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তিনটে নাগাদ কিছু-একটা হবে। সে-সময় আমরা সৌসল গলির কাছ-বরাবর শত্রু-শিকারে ব্যস্ত থাকব। ঠিক হয়েছে ফাল্গুনি, আমাকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা!"

"কি করবে?"

"সমস্ত দিন ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব। তিনটের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে, এই আমার ধারণা।"

[ক্রমশঃ

হরিকেল রাজ্য

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

বিগত শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে "বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে হরিকেল রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ আজও এক-মত হইতে পারেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

একাধিক তাম্রশাসন ও বহু প্রাচীন গ্রন্থে হরিকেলের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক উ-হিং (Wu-hing) সিংহল হইতে জলপথে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আসিয়া পূর্ব্ব-ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তে সমুদ্রতটবর্ত্তী হরিকেল রাজ্যে উপনীত হন। (১) সমসাময়িক ইৎ-সিং (It-sing) বলেন, এখান হইতে নালন্দ ৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী। (২) তিনি সমতটেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সমতট ও হরিকেল অভিন্ন নহে। কান্তিদেবের তাম্রশাসন ৭০০-৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত। (৩) তাহাতে হরিকেল মণ্ডলের উল্লেখ আছে। নবম শতাব্দীতে রচিত রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে আছে—'জয় পূর্ব্বদিগঙ্গনা-ভুজঙ্গ চম্পা-চম্পককর্ণপুর লীলানির্জ্জিত রাঢ়াদেশ বিক্রমাক্রান্তকামরূপ হরিকেলো কেলিকারক অবমানিত কর্ণ-সুবর্ণ দান।' (৪) সুতরাং কামরূপ হরিকেল হইতে পৃথক্। ফুশের গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি প্রাচীন পুঁথির দুইখানি লেবেল উদ্ধৃত আছে। (৫) একখানি 'হরিকেল্লদেশে শিলোকনাথ' অপরখানি—'চন্দ্রদ্বীপে ভগবতী তারা'। সুতরাং হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ এক রাজ্য নহে। বিক্রমপুরাধিপ শ্রীচন্দ্রের রামপাল ও ধুল্লা তাম্রশাসনে দশম শতাব্দীতে প্রদত্ত। (৬) তাহাতে আছে—'আধারো হরিকেলরাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং যশ্চন্দ্রোপদে বভুব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ।' ইহাও হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের বিভিন্নত্ব প্রমাণিত করিতেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর গুর্জ্জরবাসী জৈন হেমচন্দ্র বলেন, 'বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ।' তখন বঙ্গ ও হরিকেল অভিন্ন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাসুদেব কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীর "কৃত্যসার" গ্রন্থে (৭) দুইটি শ্লোক আছে:—

'ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষোঽপতংস্তু যে।
অশ্রবো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি।
রুদ্রবামাক্ষিসম্ভূতঃ রুদ্রাক্ষং কামরূপকে।
দক্ষিণাক্ষাশ্রুসম্ভূতং হরিকেলোদ্ভবং বিদুঃ।'

সুতরাং কামরূপ যেমন ত্রিপুরার উত্তরে, হরিকেল তেমন দক্ষিণে। এই শ্লোক দুইটি কোন প্রাচীনতর পুঁথি হইতে উদ্ধৃত। পাশে লেখকের টীকা—"হরিকেলঃ শ্রীহট্টদেশঃ।" ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীহট্টবাসী যাদবানন্দ দাশের রূপচিন্তামণি গ্রন্থে (৮) আছে—শ্রীহট্টো হরিকেলিঃ স্যাচ্ছ্রীহট্টোঽপি ক্বচিত্তবেৎ।'

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ হইতে দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হরিকেল সমতট, কামরূপ ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক্ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ ও হরিকেল অভিন্ন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট এবং হরিকেল অভিন্ন।

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তের দেশসমূহের নাম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আছে। (৯) সে সময় সমতট, ডবাক ও কামরূপ প্রত্যন্ত দেশ। হরিকেল-সমতটের পূর্ব্ব দিকে বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম নাই। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চাং সমতটের বর্ণনা দিয়াছেন। এই রাজ্য তাম্রলিপ্ত বা বর্ত্তমান তমলুক হইতে ১৮০ মাইল পূর্ব্বে

১। Takakasu Pxivi, ডাঃ মজুমদারের প্রবন্ধ—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১, পৃঃ ৭১৫। ২। Ind. Hist. Quarterly xx No I, P 3. ৩। Mod. Rev.—1922 P 612. ৪। নির্ণয়-সাগর সং পৃঃ ১৩। ৫। oucher's Iconographie vol 1, P 200. ৬। N. G. Mazumder—Inscriptions of Bengal III p. 4, 165. ৭। D. U. Ms. No. 2141B. ৮। D. U. Ms. No. 1451. ৯। Corpus Insc. Indicarum.

অবস্থিত এবং ইহার পরিধি ৬০০ মাইল। তমলুক হইতে ১৮০ মাইল পূর্ব্বে, বর্ত্তমান নোয়াখালি জিলার পশ্চিম সীমা। উ-হিংয়ের বর্ণনানুযায়ী হরিকেল নালন্দ হইতে ৪০০ মাইল অর্থাৎ বর্ত্তমান নোয়াখালি জিলার পূর্ব্ব-প্রান্তে। সমতটের উত্তরে ডবাক এবং কামরূপ। (১০) ত্রিপুরার পর্ব্বতমালা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই প্রাচীন সমতট। উহার উত্তরে গারো, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়। তাহার উত্তরে কামরূপ ও ডবাক রাজ্য। গারো পাহাড় হইতে নোয়াখালির সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল হইবে। সুতরাং হরিকেল রাজ্য ব্রহ্মপুত্র হইতে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে—অর্থাৎ ত্রিপুরার পর্ব্বতমালার পশ্চিমে হইতে পারে না।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু সমতটের নাম নাই। চন্দ্ররাজ প্রথমে হরিকেল ও পরে চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিলেন (১১). মাঝে সমতট কি হইল এরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি বিক্রমপুর হইতে ভূমিদান করিতেছেন, প্রদত্ত ভূমিও ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়, কিন্তু কোথাও এই ভূভাগ জয়ের উল্লেখ নাই। শাসন-রচয়িতা চন্দ্ররাজের সমস্ত রাজ্যজয়ের কাহিনী না বলিয়া প্রথম হরিকেল জয় এবং শেষ চন্দ্রদ্বীপ জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। অনেক তাম্রশাসনেই দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত বিজয়-কাহিনী গীত না-ও হইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র 'বঙ্গাস্ত হরিকেলীয়াঃ' বলিয়াছেন। অনেকের মতে ইহা গ্রন্থকারের ভুল। কিন্তু বঙ্গরাজ্য হয়ত সে দিন হরিকেল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দচন্দ্রও 'বঙ্গাল নরপতি'। বঙ্গাল দেশ ও চন্দ্রদ্বীপ অভিন্ন। কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহার নামোৎকীর্ণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। 'রূপচিন্তামণি'র 'শ্রীহট্টো হরিকেলি' ঐরূপ হরিকেল রাজ্যের শ্রীহট্টভুক্তি বুঝাইতেছে। হরিকেল রাজ্য কখনও বঙ্গ, কখনও শ্রীহট্টের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অবস্থিত ছিল ত্রিপুরার পর্ব্বতমালার পূর্ব্ব দিকে এবং সমুদ্রতট পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত ছিল।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হরিকেল ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল হইতে অভিন্ন। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে 'স' বা 'শ' 'হ'তে রূপান্তরিত হয়, বিপরীত হইতে পারে না। শ্রীকাইল বা বরদাখাত পরগণা কুমিল্লার উত্তর-পশ্চিমে এবং ত্রিপুরার পর্ব্বতমালার পশ্চিমে। সুতরাং ইহা সমতটের অন্তর্গত। চন্দ্রগণ রোহিতাগিরিভুজাং বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত রোহিতাগিরি বর্ত্তমান লালমাই পাহাড়। ইহাও কুমিল্লার পশ্চিমে। এখানে একটি চন্দ্রবংশের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। (১২) তাহাদের রাজধানী ছিল কম্মান্ত নগর বা বড় কামতা। উহা সমতটের অন্তর্গত (১৩) লালমাইর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাট্টিকেরার রণমল্ল হরিকেল দেব নামক রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। (১৪) কান্তিদেবের তাম্রশাসনখানি কুমিল্লার দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী ইটাল্লা গ্রামে ছিল শুনা যায়। (১৫) শেষোক্ত দুইটি প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, এই দুই স্থান বোধ হয় এক সময় হরিকেলপতির অধীন ছিল। হরিকেলের চন্দ্রগণ এক সময় সমগ্র সমতট এমন কি চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার কিয়দংশ সময় সময় হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রকৃত হরিকেল রাজ্য বলিতে বর্ত্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলই হইবে।

১০। Bargaon Insc. of Mahabhuti Varman Ed. by Dr. N. K. Bhattasali in J. R. A. S. B.
১১। D. C. Bhattacharjee in I. H. Q. vol xx No 1.
১২। ভারেল্লা নর্ত্তেশ্বরলিপি। ১৩।১৪। Dr. N. K Bhattasali—A forgotten Kingdom of Eastern Bengal. ১৫। D. C. Bhattacharjee—Harikela and the Ruins at Mainamati I. H. Q. vol. x No 1 page 6.

আত্মনিবেদন

শ্রীপুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়

যবে জীবনের দীপশিখা হবে ক্ষীণ আর অবসন্ন,
আগুন নিভিবে রক্তে যখন অনুভূতি হবে ক্ষীণ
দুর্ব্বল হৃদি শিহরি' উঠিবে সত্ত্বাও গতিহীন,
তুমি কাছে এসো, নিকটে হাসিয়া আমারে করিয়ো ধন্য।

ইন্দ্রিয়-দ্বারে বেদনা-মলিন অবিশ্বাস্য দৈন্য,
ছড়ানো ধূলার মত বিভবে সময়ের পরিচয়
জীবনের শিখা দোদুল যখন উন্মাদ দোলনায়,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধন্য।

ভক্তি যখন মুক্তি লভিবে হীন-বিশ্বাস জন্য;
শেষ ফাগুনের মৌমাছি যারা গানে আর দংশনে
শেষ সুন্দর বাসা বেঁধে মরে—মানুষেরে হবে মনে,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধন্য।

সাঁঝের কিনারে অমর দিনের চিতা যবে অবসন্ন,
জ্বলিয়া উঠিবে গোধুলি বেলায় মরণের উৎসবে
পৃথিবীর পাপ নির্দে শি' আমি লীন হয়ে যাব যবে,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধন্য।

কয়েক জন নবীন সাহিত্যিক শরৎ-চন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

তিনি অর্দ্ধমুদিত নেত্রে গড়গড়ার নলে একটি দীর্ঘ টান দিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ টান দিলেন, সে পরিমাণ ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন নল রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—

"আজ কাল তোমাদের লেখায় 'প্রকৃতি' কথাটা খুব দেখতে পাই। পরমা প্রকৃতি এই করলেন; প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এই হল, ইত্যাদি। প্রকৃতি বলতে তোমরা কি বোঝো না তোমরাই জানো; বোধ হয় ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, তাই প্রকৃতি নাম দিয়ে একটি নতুন দেবতা তৈরি করে তার ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাও। ভগবানের চেয়ে ইনি এক-কাঠি বাড়া, কারণ, ভগবানের দয়া-মায়া আছে, ধর্মজ্ঞান আছে। তোমাদের এই প্রকৃতিকে দেখলে মনে হয়, ইনি একটি অতি আধুনিকা বিদুষী তরুণী—স্কুলে পড়েছেন এবং কুসংস্কারের কোনও ধার ধারেন না। মানুষের ভাগ্য ইনি নির্দ্দয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ মানুষের ধর্ম বা নীতির কোনও তোয়াক্কা রাখেন না।

এই অত্যন্ত চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটির তোমরা নাম দিয়েছ—প্রকৃতি। এঁকে আমি বিশ্বসংসারে অনেক সন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। একটা অন্ধ শক্তি আছে মানি, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি আক্কেল-বিবেচনা কিচ্ছু নেই। পাগলা হাতীর মত তার স্বভাব, সে খালি ভাঙতে জানে, অপচয় করতে জানে। তার কাজের মধ্যে কোনও নিয়ম আছে কি না কেউ জানে না; যদি থাকে তাও তোমাদের ঐ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত—অর্থাৎ নিয়ম আছে বটে কিন্তু তার কোন মানে হয় না।"

চাকর কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, শরৎচন্দ্র নলে মৃদু মৃদু টান দিলেন।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, তোমাদের প্রকৃতি আর্টিষ্ট নয়; কিম্বা তোমাদের মত আর্টিষ্ট। তার সামঞ্জস্য-জ্ঞান নেই, পূর্ব্বাপর জ্ঞান নেই, কোথায় গল্প আরম্ভ করতে হবে জানে না, কোথায় শেষ করতে হবে জানে না, নোংরামি করতে এতটুকু লজ্জা নেই, মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই—ছন্নছাড়া নীরস একঘেয়ে কাহিনী ক্রমাগত বলেই চলেছে। একই কথা হাজার বার বলেও ক্লান্তি নেই। আবার কখনও একটা কথা আরম্ভ হতে না হতে ঝপাং করে শেষ করে ফেলেছে। মূঢ়—বিবেকহীন—রসবুদ্ধিহীন—

একবার একটা গল্প বেশ জমিয়ে এনেছিল; ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভণ্ডুল করে ফেললে।

গল্পটা বলি শোনো। গৃহদাহ পড়েছ তো, কতকটা সেই ধরণের; তফাৎ এই যে, এ গল্পটা বলেছিল তোমাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ সত্য ঘটনা।

অসমাপ্ত



শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পানা পুকুরের তলায় যেমন পাঁক, আর ওপরে শ্যাওলা, সমাজেরও তাই। পাঁক কুশ্রী হোক, তবু সে ফসল ফলাতে পারে; শ্যাওলার কোনও গুণ নেই। নিষ্ফলতার লঘুত্ব নিয়ে এরা শুধু জলের ওপর ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এদের জীবনে তীব্রতার কিছুমাত্র অভাব নেই। বরঞ্চ কৃত্রিম উপায়ে এরা অনুভূতিকে এমন তীব্র করে তুলেছে, যে, পঙ্করংয়ের নেশাতেও এমন হয় না। সত্যিকার আনন্দ কাকে বলে তা এরা জানে না, তাই প্রবল উত্তেজনাকেই আনন্দ বলে ভুল করে; সত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই, তাই স্বেচ্ছাচারকেই এরা পরম সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

ভূমিকা শুনে তোমরা ভাবছ গল্পটা বুঝি ভারি লোমহর্ষণ গোছের একটা কিছু। মোটেই তা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে চিরন্তন ত্রিভুজ এও তাই—অর্থাৎ দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। সেই সুরেশ, মহিম আর অচলা।

কিন্তু এদের চরিত্র একেবারে আলাদা। এ গল্পের অচলাটি সুন্দরী কুহকময়ী হ্লাদিনী—হৃদয় বলে তাঁর কিছু ছিল কি না তা তোমাদের প্রকৃতি দেবীই বলতে পারেন। ছিল ভোগ করবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা আর ছিল ঠমক, মোহ, প্রগল্‌ভতা—পুরুষের মাথা খাওয়ার সমস্ত উপকরণই ছিল।

ওদিকে মহিম ছিল দুর্দ্দান্ত একরোখা গোঁয়ার; যুদ্ধের মরসুমে সে টাকা করেছিল প্রচুর—ধনকুবের বললেও চলে। আর সুরেশ ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ, ভয়ানক ক্ষুর্টে—কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে মধ্যবিত্ত। টাকার দিক্ দিয়ে মহিমের সঙ্গে যেমন তার তুলনা হত না, চেহারার দিক দিয়ে তেমনি তার সঙ্গে মহিমের তুলনা হত না। দু'জনে দু'জনকে হিংসে করত; বাইরে লৌকিক ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউলে।

এই তিন জনকে নিয়ে পানা-পুকুরের ওপর ত্রিভুজ রচনা হল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। কিছুদিন অচলা এদের দুজনকে খেলালে, তার পর ঠিক করে নিলে কাকে তার বেশী দরকার। সে কালে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজ-কালকার দিনে যদি কুবের আর কন্দর্প কোনও রাজকন্যের স্বয়ংবর-সভায় আসতেন, তাহলে কুবেরের গলাতেই মালা পড়ত, কন্দর্পকে তাঁর ধনুক গুটিয়ে পালাতে হত।

মহিমের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হল। সুরেশ বেশ হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে নিলে; কারণ সে বুঝেছিল, এ পরাজয় শেষ পরাজয় নয়, মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম চক্কর মাত্র। হয়তো সে অচলার চোখের চাউনি থেকে কোনও আভাস পেয়েছিল।

একটা কথা বলি। প্রেমিকেরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে, এমনি একটা ধারণা আছে—একেবারে মিথ্যে ধারণা। প্রেমিকেরা কিচ্ছু বোঝে না। স্ত্রীজাতির চোখের ভাষা বুঝতে পারে শুধু লম্পট।

বিয়ের পরে এক দিন মহিমের বাগানে চায়ের জলসা ছিল। জমজমাট জলসা, তার মাঝখানে সুরেশ বললে,—"মহিম, তুমি শুনে সুখী হবে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তবে নেহাৎ সিপাহী সেজে নয়; ঠিক করেছি পাইলট হয়ে যাব।"

একটু শ্লেষ করে মহিম বললে,—"তাই না কি! এ দুর্ম্মতি হল যে হঠাৎ?"

সুরেশ হেসে উত্তর দিলে,—"হঠাৎ আর কি, কিছু দিন থেকেই ভাবছি। এ যুদ্ধটাতো তোমার আমার মতন লোকের জন্যেই হয়েছে; অর্থাৎ আমার মত লোক যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর তোমার মত লোক টাকার পিরামিড তৈরি করবে।"

মহিমের মুখ গরম হয়ে উঠল, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারলে না; সে ভারী একরোখা লোক কিন্তু মিষ্টভাবে কথা কাটাকাটিতে পটু নয়।

আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ছিল; তার পানে অলস কটাক্ষপাত করে সুরেশ বললে,—"আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে কিন্তু প্লেন নেই। তোমার প্লেনটা ধার দাও না—যুদ্ধ ক'রে আসি। যদি ফিরি প্লেন ফেরৎ পাবে; আর যদি না ফিরি, তোমার এমন কিছু গায়ে লাগবে না। বরং নাম হবে।"

রাগে মহিম কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে রইল, তার পর কড়া একগুঁয়ে সুরে বলে উঠল—"তোমাকে প্লেন ধার দিতে পারি না, কারণ, আমি নিজেই যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি।"

বলা বাহুল্য, দু'মিনিট আগেও যুদ্ধে যাবার কল্পনা তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না।

মাস দু'য়ের মধ্যে মহিম সব ঠিক-ঠাক করে, এরোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধে চলে গেল। যাবার সময় উইল করে গেল, সে যদি না ফেরে অচলা তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সুরেশের কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হল না। বোধ করি, ধারে এরোপ্লেন পাওয়া গেল না বলেই তার যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেওয়া ঘটে উঠল না।

বর্ম্মার আকাশে তখন যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজছে; বেঁটে বীরেরা হু-হু করে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষেও গেল-গেল রব। যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প।

মহিম ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। তিন মাস কাটল। এ দিকে মহিমের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই উৎসব চলেছে; গান-বাজনা নাচ নৈশ-ভোজন। স্বামীর কথা ভেবে ভেবে অচলার মন ভেঙ্গে না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো! সে দিকে সুরেশ খুবই দৃষ্টি রাখে: সর্ব্বদাই সে অচলার সঙ্গে আছে। দুপুর রাত্রে যখন আর সব অতিথিরা চলে যায়, তখনও সুরেশ অচলাকে আগলে থাকে। যে দিন অতিথিদের শুভাগমন হয় না, সে দিন সুরেশ একাই অচলার চিত্ত-বিনোদন করে। ক্রমে লোকলজ্জার আড়াল-আবডালও আর কিছু থাকে না, তোমাদের প্রকৃতি দেবী ব্যাপারটাকে নিতান্ত নির্লজ্জ এবং শ্রীহীন করে তোলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিম নিয়মিত চিঠি পায়; বন্ধু-বান্ধবের চিঠি, অচলার চিঠি। বন্ধু-বান্ধবের চিঠিতে ক্রমে ক্রমে নানা রকম ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল। নিতান্ত ভালমানুষের মত তাঁরা অচলার জীবন-যাত্রার যে বর্ণনা লিখে পাঠান, তার ভিতর থেকে আসল বক্তব্যটা ফুটে ফুটে বেরোয়। মহিম গোঁয়ার বটে কিন্তু নির্ব্বোধ নয়, সে বুঝতে পারে। অচলার চিঠিতে মামুলি শুভাকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের বাঁধা গৎ ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না, তাও ক্রমশঃ এমন শিথিল হয়ে আসতে লাগল যে মনে হয়, ঐ মামুলি বাঁধি গৎ লিখতেও অচলার ক্লান্তিবোধ হয়। মহিমের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। মনে মনে গর্জ্জাতে লাগল।

সে ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হল না। যুদ্ধের অবস্থা সঙীন; এখন কেউ ছুটি পাবে না।

এই সময় মিত্রপক্ষের এক দল বিমান শত্রুর একটা ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান করল; মহিমকে যেতে হল সেই সঙ্গে। তুমুল আকাশ-যুদ্ধ হল। মিত্রপক্ষের কয়েকটা বিমান ফিরে এল, কিন্তু মহিম ফিরল না। তার জ্বলন্ত প্লেনখানা উল্কার মত যুদ্ধের আকাশে মিলিয়ে গেল।

মহিমের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলকাতায় পৌঁছুল, তখন পানা পুকুরের মাঝখানে ঢিল ফেলার মত বেশ একটা তরঙ্গ উঠল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অচলা কালো রঙের শোক-বেশ পরল কিছু দিনের জন্য; তার পর মহিমের উইল অনুসারে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার সম্পত্তির খাস মালিক হয়ে বসল। সুরেশ এত দিন একটা আলাদা বাড়ী রেখেছিল, এখন খোলাখুলি এসে মহিমের বাড়ীতে বাস করতে লাগল। যার টাকা আছে তাকে শাসন করে কে? দু'জনে মিলে এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যা দেখে বোধ করি 'ভেলু'রও লজ্জা হয়।

মহিম কিন্তু মরেনি। তার আহত প্লেনখানা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে এসে আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল। মহিমের চোট লেগেছিল বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। তার পর সে কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশী মাইল হাঁটা-পথ চলে শেষ পর্য্যন্ত রেলপথে কলকাতা এসে পৌঁছুল, তার বিশদ বর্ণনা করতে গেলে শিশু-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, সে কলকাতা ফিরে এল। সে যে মরেনি এ খবর সে মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাল না; তার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানল না।

কলকাতায় এসে সে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে ছদ্মনামে ঘর ভাড়া করে রইল।

সেই দিনই সে সংবাদপত্রে একটা খবর দেখল—মহিমের বিধবা রেজেষ্ট্রি অফিসে সুরেশকে বিয়ে করেছে; আজ রাত্রে তার বাড়ীতে এই উপলক্ষে ভোজ। সহরের গণ্যমান্য সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

মহিম ঠিক করল, আজ রাত্রে ভোজ যখন খুব জমে উঠবে, তখন সে গিয়ে দেখা দেবে।

ভেবে দেখো ব্যাপারটা। চরিত্রহীনা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস যেতে না যেতেই স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিয়ে করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্বামী চলেছে প্রতিশোধ নিতে। গল্প জমাট হয়ে একেবারে চরম ক্লাইমেক্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পর কি হল কও দেখি?

কিছুই হল না।

মহিম সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ীতে যাবার জন্য যেই রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি এক মিলিটারী লরি এসে তাকে চাপা দিলে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল, তার মুখখানা এমন ভাবে থেঁতো হয়ে গেল যে, তাকে সনাক্ত করবার আর কোনও উপায় রইল না।

ওদিকে অচলার বাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজ চলল। গণ্য-মান্য অতিথিরা আশী টাকা বোতলের মদ খেয়ে রাত্রি তিনটের সময় হর্ষধ্বনি করতে করতে বাড়ী ফিরলো। কত বড় একটা ড্রামা শেষ মুহূর্ত্তে এসে নষ্ট হয়ে গেল, তা তারা জানতেও পারলে না।

তাই বলছিলুম, তোমাদের প্রকৃতি সত্যিকার আর্টিষ্ট নয়। ক্লাইম্যাক্স বোঝে না, **poetic justice** জানে না—কেবল নোংরামি আর বাজে কথা নিয়ে তার কারবার। সত্যি কি না তোমরাই বল।"

শরৎচন্দ্র নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা বিলম্বিত টান দিলেন; কিন্তু কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় পুড়িয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ধোঁয়া বাহির হইল না!

মহামানবের রূপবিম্ব [প্রাচ্য ও প্রতীচ্য]

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা শুধু নয়, আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রাচীন বর্ব্বর প্রেরণা বার বার অতিমানব, বিশ্বমানব বা মহামানব কল্পনায় অগ্রসর হয়েছে। তাতে করে সারা বিশ্বে সভ্যতা ও শীলতাগত একটা অধ্যাত্ম পরীক্ষণ হয়েছে শুধু ধ্যানের চরম সীমান্ত সম্পর্কে নয়—রূপ রস গন্ধের নব নব বিশ্বসৃষ্টিতে—সমগ্র মানবের ইতিহাসে। এ ইতিহাস অতি বিস্ময়জনক এবং সকলেরই অধ্যয়নের একটি চরম অর্ঘ্য।

সকল ইতিহাসেই পিতার পিতৃত্ব, দলপতির প্রভুত্ব, নৃপতির দণ্ড বা গুরুর নির্দেশ জমাট হয়েছে একটি উচ্চতর শক্তির উৎস কল্পনায়। মানুষ কাকেও নিজের শীর্ষভাগে রেখে অগ্রসর হ'তে ইতস্ততঃ করেনি,—প্রভুত্ব সে চিরকাল মেনে এসেছে একটি দুর্ব্বোধ্য অধ্যাত্ম শাসনে এবং এই প্রভুত্বকে দেবত্বে রূপান্তরিত করে সে আশ্বস্ত হয়েছে। এর ভিতর কোথাও কোন অসংলগ্নতা সে খুঁজে পায়নি। রক্তমাংসের মানবকে দেবতার উচ্চ পাদপীঠে স্থাপন করা তার পক্ষে কোন হেয় কাজ হয়েছে, এ কথা সে চিন্তাই করেনি। মানুষ দেবতা নয়—কারণ, তাকে দেহ-সীমার ক্ষুদ্র নিগড়ে অহরহ আবদ্ধ থাকতে হয়। মানুষের এই বাস্তবতার কণ্টকশয্যা তাকে আকাশচারী দিব্যত্ব হ'তে বঞ্চিত করলেও এই বাধা ও শৃঙ্খলকে মানুষ ঊর্দ্ধমানব কল্পনায় বহু স্থলে অস্বীকার করে অগ্রসর হয়েছে।

সকল সভ্যতার এই সাধনা একটা সাধারণ মধ্য বিন্দুকে স্বীকার করায় সভ্যতার স্পষ্ট ও কৃতিত্ব বিচারের পক্ষে এই রূপসৃষ্টি একটি কষ্টি-পাথরের মত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ এ প্রসঙ্গে অসম্ভব নয় এবং অন্যান্য সভ্যতার চরম কৃত্যকেও এ ব্যাপারে তুলনার ক্ষেত্রে বিচার করা যেতে পারে।

এটা ঠিক দেবরচনার ক্ষেত্র নয়—দেবকল্পনা ও রচনা জমাট হয়েছে স্বর্গকল্পনা হ'তে—একটা উচ্চতর ঐশী জগৎ সম্পর্কে। মহামানব স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সেতুর মত—এ দু'টি বিপরীত জগৎ মহামানবের ভিতর ঐক্য লাভ করেছে, এ জন্য এই সৃষ্টির ইন্দ্রজাল চিরকাল মানব-সমাজকে আনন্দ দান করেছে।

গ্রীক সভ্যতা অতিমানব কল্পনার চরম সফলতায় আসতে পারেনি, এজন্য মানুষকে দেবতা না করে এই সভ্যতা দেবতাকে মানুষ করেছে। তারা স্বর্গের দেবতাকে পার্থিব আবেষ্টনে স্থাপন করেছে। দেবতারা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং আহতও হয়েছে। বস্তুতঃ, গ্রীক সভ্যতায় দেবতারা মানুষের পর্য্যায়ে ঢুকেছে। ঊর্দ্ধকে অধের ভিতর নামান হয়েছে। অধের পক্ষে ঊর্দ্ধে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এটা গ্রীক সভ্যতার পক্ষে গৌরবের কথা নয়। মানুষরা যে "অমৃতের সন্তান"—এ জ্ঞান গ্রীকদের ধারণাতীত ছিল। গ্রীকেরা ছিল প্রত্যক্ষতার ও সামীপ্যের অনুরাগী, যাকে জার্ম্মাণ ভাবুক Spengler বলেছেন—"a sense of the near"। দূরদিগন্ত ও অফুরন্ত অসীমের জ্ঞান গ্রীকদের মনঃপূত ছিল না। এ জন্য অসীমত্বের মুকুট ছেড়ে গ্রীক দেবতারা সীমার ক্রোড়ে স্থান পেয়েছিল। গ্রীকদের Hercules অতিমানব নয়—Socratesও নয়। দৈহিক বা মানসিক শক্তি সেখানে সীমার বজ্রাঘাতে বার বার নিজেদের অক্ষমতা নিজেদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার সীমার স্পর্দ্ধা কখনও অসীমকে সিংহাসনচ্যুত করেনি। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় হয়েও বিশ্বব্যাপী রূপের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হননি। সমগ্র জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপকে সারথ্যকৃত্যের সীমা কখনও কুজ্ঝটিকায় ঢাকেনি। সীমার ভিতর হতেও অতিমানব অসীমের হিল্লোলিত মুকুরে অফুরন্ত ভাবে বিম্বিত হয়েছে। অপর দিকে গ্রীক এপোলো কল্পিত হয়ে পড়লেন অধোজগতের মাংস-পেশীযুক্ত মানুষের মত সীমাবদ্ধ হস্তপদের নিগড়ে আবদ্ধ—কোন রকম অসীমত্বের কল্পনা গ্রীকের কল্পনা-মুকুরে বিম্বিত হল না। ঊর্দ্ধ্বজগতের দেবতা হয়ে পড়লেন অধোজগতের ভদ্রবেশী সুপুরুষ মাত্র। দেবতার এই মানবীয় মুখশ্রীতে তুরীয় জগতের কোন লীলাপ্রসঙ্গ দ্যোতিত হয়নি। এ জন্য রাসকিন (Ruskin) বলেছেন, গ্রীক দেবতার মুখে কোন ভাবপ্রসঙ্গই নেই—একটা শূন্যগর্ভ মাংসল শ্রী আছে মাত্র :—

"A Greek never expresses a personal character."

মিশরের সভ্যতা খুব প্রাচীন। জগতের এই প্রাচীন সভ্যতাকে বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সব চেয়ে দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে মৃত্যুপ্রসঙ্গ—মানুষের বিচিত্র জীবনপথে। এই সভ্যতা 'আত্মা' কল্পনা রচিল কতকটা পারস্য সভ্যতারই মত একটা উড়ন্ত বিহগের মত। তাদের বিশ্বাস হল, এই আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু হয়—আবার কিছু কাল পরে এই আত্মা ফিরে আসে এবং যদি অক্ষত ভাবে মৃতদেহ বা কোন হুবহু দেহপ্রতিমা পায় তবে তাকে আবার জীবন দান করতে পারে। এ জন্য আত্মা যাতে ফিরে এসে মৃতদেহকে উজ্জীবিত করতে পারে, এ রকম ব্যবস্থা করতে মৃতদেহ রক্ষা বা মমির রচনায় (mummy) ব্যবস্থা করে। পাছে মৃতদেহ নষ্ট হয়ে যায়, সে জন্য পাথরের "কামূর্ত্তি"ও রচিত মূর্ত্তি। এ সব একেবারে হুবহু মূর্ত্তি। এর ভিতর অতিমানবত্বের প্রশ্ন নেই, মৃত্যুর জটিলতা ভেদ করার উৎসাহই এ ক্ষেত্রে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। মানুষের অসীম জীবন বা অমৃতত্ব এ ক্ষেত্রে কল্পিত হয়নি।

অপর দিকে মিশর অতিমানবত্বের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ মুকুট দান করেছে নিজের নৃপতিকে। রাজরাজ খাফ্রান পিরামিড রচনা করেন জবরদস্ত শাসনে নয়, অত্যাচারের লৌহচাপে। এ রাজার সৈন্যসামন্তই ছিল না—মিশর তাত্ত্বিকদের গবেষণা হ'তে এ রকম অনুমান করতে হয়। শুধু নৃপতির স্নেহসর্ব্বস্ব পিতৃত্বই হাজার হাজার লোককে এই কার্য্যে প্রেরণা দেয়—জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি না সন্দেহ। এই অতিমানবের রচনা মিশর কি ভাবে সফল করে? খাফ্রানের মূর্ত্তিতে আছে পিতৃত্বের ঐশ্বর্য্য, মমতা ও আত্মপ্রতীতি। কঠিন সঙ্কল্প, দুর্লভ উদ্যম এবং এক মুগ্ধকর প্রশান্ত ঔদার্য্য এ মূর্ত্তির সমগ্র বেষ্টনীকে আচ্ছন্ন করে আছে। এ মূর্ত্তিকে মিশরী সভ্যতার প্রতিমা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সুস্পষ্ট হয় অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জীবনের যে স্বচ্ছ বিম্ব মানুষকে প্রভাতোরণের মত ঘিরে আছে, মিশরের ঐহিক চোখে তা পড়েনি। ঐহিকতার বিপুল আয়োজনে এই মানবমূর্ত্তি মণ্ডিত সন্দেহ নেই—কিন্তু মানুষের এটাই শেষ বা একমাত্র কথা নয়। মানুষ আর একটি জগতের সূক্ষ্মতম হিল্লোলেও অনুপ্রাণিত যা তাকে ভারতবর্ষে বলতে উৎসাহিত করেছে :—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঐহিকতার কঠিন নিগড় মানুষকে খর্ব্ব করে—প্রমিথিয়সের (Promethes) বিলোল কঠিন শৈলখণ্ডে আহত ও জীর্ণ হয়ে থাকাই তার শেষ অধিকার কল্পিত হয় এবং কখনও বা চক্রের মত ধূমায়িত জগতের উড়ন্ত ও চলন্ত বাস্তবতা হ'তে স্খলিত

যে দীর্ঘনিশ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তকে ফেনিল করাই হয়ে পড়ে চরম কৃত্য। ক্রানের মূর্ত্তিতে সীমা ও অসীমের কোন মিলন-রজ্জু নেই। এই ত্তির কল্পিত ব্যাপকতাও তাই শোনপক্ষীর মত আকাশচ্যুত হয়ে ক্ষ-কোটরে নিজের সমাপ্তি খোঁজে।

প্রতীচ্য সভ্যতার ইতিহাস যখন খৃষ্টীয় তত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হ'ল, তখন সে দেশে উঠল অভিনব সমস্যা। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রীক ও রোমক ঐহিকতা ও মাংসল বাস্তবতাকে বন্দনা করতে অস্বীকার করে। খৃষ্ট ধর্ম্ম জানালে "Spirit is life Flesh is death।" আবার এই ধর্ম্ম ঘোষণা



খৃষ্ট (য়ুরোপ)
শিল্পী—সার এডোয়ার্ড বার্ণেক্স জোন্স



আদম (য়ুরোপ)
শিল্পী—এপ ষ্টিন



বুদ্ধ (ভারত)

করলে "সমগ্র পৃথিবীও হারান ভাল তবু আত্মাকে বর্জ্জন অশ্রেয়ঃ।" এ রকম উর্দ্ধমুখী বাক্যবিন্যাস প্রতীচ্য সভ্যতার উপর আর একটি কল্পনার হিমাদ্রিকে প্রতিষ্ঠা করে যা কখনও সে দেশে ছিল না।

এই তত্ত্ব ক্রমশঃ একটা নূতন জগৎ বিম্বিত করার চেষ্টা করল অভিনব কলাকেলির ভিতর দিয়ে। খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব একটা দীপশিখার মত এই ঘটনায় সকলকে উৎসাহিত করলে। অদ্ধ মানবের প্রস্ফুট প্রতিমা রচনা করে খৃষ্টীয় তত্ত্বের একটা পর্য্যাপ্ত মুকুর সৃষ্টি করাই পূর্ব্ব-পশ্চিমের চরম সাধনা। শিল্পীরা নানা ভাবে মহামানব কল্পনায় অগ্রসর হ'ল।

ফলে কি দাঁড়াল ? ইউরোপীয় শীলতার চরম মনন ও অধ্যয়ন জগৎকে কি দান করল ? ইউরোপের ইতিহাসে তার দুরপণেয় তিলক আছে। রিনেশাঁয়ের বিখ্যাত শিল্পী রাফেল তাঁর Resurrection চিত্রে যীশুর যে চিত্র আঁকল তা হল একটা জমকাল নাট্যসুলভ আয়োজনের রূপক মাত্র। তা হয়ে পড়ল "Flesh is death"এর নমুনা, মাংসল-প্রাচুর্য্য ও ইন্দ্রিয়জ বহ্বারম্ভ মাত্র—তাতে সামান্য অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জক বা অসীমের নিবেদন নেই। মাইকেল এঞ্জলো 'The Last Judgment' চিত্রে খৃষ্টকে আঁকল একটা অতিরিক্ত মাংসপেশীযুক্ত পালোয়ানের মত। শারীরিক আড়ম্বরের সাহায্যে আত্মার বিরাটত্ব প্রতিপাদিত হয় না, অথচ কোন উপায়ে এই অতীন্দ্রিয়ের ওতপ্রোত সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, তার কোন উপায়ই এ সব রিনেশাঁয়ের শিল্পীরা খুঁজে পেল না। নূতন নূতন পরীক্ষা চলল এবং ছবি আঁকা সুরু হ'ল, কিন্তু খৃষ্টের বাইবেল-নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি কেউ আঁকতে সক্ষম হ'ল না—সেই রূপের ভাষা পশ্চিমের আবহাওয়ায় কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি। Georgiono ক্রশবাহী খৃষ্ট, বা অন্য শিল্পীর কাঁটার মুকুটে সজ্জিত কোথাও অসীমের কোন সীমান্তে উপস্থিত হ'তে সক্ষম হল না। এদের আংশিক সফলতা উর্দ্ধতার সত্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। মোজায়িকে বিষণ্ণ খৃষ্ট, বাইজেনটাইন (Byjantine) শীলতার জীর্ণ ও জরামণ্ডিত অবসন্নতার পথেই গেছে। রিনেশাঁয়ের ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য বিপরীত পথে গেছে মাত্র। নব্যতর শিল্পীরাও এ যুগে এ সাধনায় বার বার আত্মহারা হয়েছে ইউরোপে। শিল্পী Sir Edward Burnex Jones এ প্রসঙ্গে একবার বলেছেন :—The more I recall the efforts I have made to express the face of Christ the more discontented I am with them. I do not think there is one which can be looked upon as any thing but a failure. এই শিল্পী খৃষ্টকে সুদীর্ঘ কেশদাম-শোভিত, প্রাচ্য পরিচ্ছদপুষ্ট করেও অধ্যাত্ম-মাধুর্য্য-মণ্ডিত করতে পারেনি।

নব্যতর শিল্পীরা অন্য ক্ষেত্রেও এই মহামানব বা অতিমানব কল্পনার পথে অগ্রসর হয়েছে। রোদ্যাঁ (Rodin), ব্যালজাক (Balzac) মূর্ত্তিতে এক জমাট ব্যর্থতাকে প্রাণদান করেছে। একটি আড়ষ্ট আয়োজনের ভিতর দিয়ে অমৃতের সন্তানকে রূপান্বিত করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত এপষ্টিনের লিষ্টার গ্যালারীতে রক্ষিত আদমের মূর্ত্তিতে মহামানবের অভ্রষ্ট দেহগৌরব, ব্যাবহারিক ঋজুতা ও ইন্দ্রিয়-বিমুখ দার্ঢ্যকে শুধু উপাদানগত plastic ঐশ্বর্য্যে রূপদান করতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে তা হয়ে পড়েছে নব্য আর্টের নমুনামাত্র, অখণ্ড রসাত্মক বহুমুখী রূপাবর্ত্তমণ্ডিত অতিমানব নয়। এই ভাবে ব্যর্থতাই যেন বিশ্বরূপ ধারণ করেছে।

ভারতবর্ষে অতিমানবের রূপসাধনার মঞ্চে এসে সকলকে এ জন্যই



গোমতেশ্বর

রোমাঞ্চিত হতে হয়। কোথাও কোন পৌনঃপুনিক পরীক্ষণ বা বর্জ্জনের চঞ্চল ছায়া এখানে দেখা যায় না। এ দেশে বুদ্ধমূর্ত্তি কল্পনায় মাংসল ইন্দ্রিয়মুখিতা নেই, অপর দিকে ইন্দ্রিয়বিমুখ শুষ্ক বিষন্ন কঙ্কালিত কৌতূহলও নেই। সুপুষ্ট মাংসল দেহ অথচ আত্মসমাহিত, সংযত ও অন্তর্ম্মুখীন একাগ্রতা বুদ্ধমূর্ত্তিকে দান করেছে এক অপরূপ শ্রী, যাতে সীমা ও অসীমের যুগ্ম সমাবেশ হয়েছে। তেমনি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তিতে আমরা পাই ব্যাপক ইন্দ্রিয়মূঢ়কারী শ্রী মাত্র নয় এক দুর্লভ, দুর্বোধ্য, ও অফুরন্ত লীলাকদম্ব—সীমার বৃন্তে অসীমের প্রকাশের মত। এতে প্রমাণিত হয়, matter ও spirit-এর এই বিরুদ্ধ ব্যঞ্জনা ভারতের তত্ত্বেই পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। নৈকট্য ও দূরত্ব যে একই দৃষ্টির দু'টি দিক মাত্র, একান্ত ভাবে কোনটাই চরম সত্য নহে, এ কথা ভারতবর্ষই জানত—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে"

এই দু'টি বিপরীত দিকের সমাহার হয়েছে ভারতীয় শিল্পের অতিমানব কল্পনায়। এই সোনার হরিণের পেছনে সমগ্র জগৎ ঘুরেছে—কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও তাকে কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি।

সত্যি !

শ্রীশোভা বসু

কিছু দিন হইল কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি—অন্যত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া কলেজের বোর্ডিংএ থাকি। এখানে নিজেকে অত্যন্ত খাপছাড়া লাগিতেছিল—চলনে-বলনে অশনে-ভূষণে কোথাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ইহাই আমার মানসিক অস্থিরতার একমাত্র কারণ বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কারণ জুটিয়াছিল আর একটি—তিনি আমাদের বোর্ডিংএর সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং। আসিয়া অবধি তাঁহার মেজাজের তাল পাইতেছিলাম না। তিনি এক একদিন এমন এক-একটি মূর্ত্তি ধরিতেন যে, তুলনায় দশমহাবিদ্যার ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ম্লান হইয়া যায়।

তাঁহার এই মেজাজের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বহুবার মেয়েদের বৈঠক বসিয়াছে। সাইকলজি-অনার্সের মেয়েদের প্রায়ই তলব পড়িয়াছে, ইতিহাসের মেয়েরা কত ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে—প্রাক্তন ছাত্রীদের দ্বারা প্রচারিত তাঁহার পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করিয়া কত প্রমাণ খাড়া করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই।

যত দূর জানা যায়, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস এই পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে—পিতা রেঙ্গুন সহরের এক জন নামজাদা ব্যারিষ্টার ছিলেন। মাতুল-বংশ ধনী ও সম্ভ্রান্ত। কুরূপের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিলাত যাইবার খরচ দিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে জামাতা কেবল কৃতিত্বের সহিত বার-এট-ল হইয়াই ফেরেন নাই, বিলাতী আদব-কায়দায় ও নৃত্যগীতেও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই বেশ পসার জমিয়া উঠিল। বিদেশী-মহলেও নিজের আসন কায়েমী করিয়া লইতে দেরী হইল না। আজ চা'এ নিমন্ত্রণ, কাল ঘূর্ণিনাচে—হঠাৎ এক দিন দেশ হইতে তারযোগে কন্যাসহ শ্বশুরের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া তড়িৎবেগে বাস্তব জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। হৈমদির দূর-সম্পর্কীয় এক বোন তিন সত্যি দিয়া বলিয়াছেন—জামাতা বাবাজী না কি একেবারে বঙ্গজ স্ত্রীকে রাতে-দিনে মেম তৈরী করিবার জন্য সেলুনে লইয়া গিয়া 'ববছাঁট' দিতে চাহিয়াছিলেন, স্ত্রী না কি দুই পায়ে ধরিয়া এমন ক্রন্দন জুড়িয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে অবশেষে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। এই সকল কিংবদন্তী না কি রেঙ্গুন সহরের আবালবৃদ্ধ সকলেই জানে। স্ত্রী পাশ্চাত্ত্য ভাবে প্রণোদিত স্বামীর সহিত খাপ খাইতে না পারিয়া কেমন যেন বিমনা হইয়া থাকিতেন। শোনা যায়, শেষে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। দু'টি কন্যা জন্মিয়াছিল—প্রথমটি আমাদের হৈমন্তিকা দেবী, দ্বিতীয় কন্যা বিকলাঙ্গ।

হৈমদি বরাবর সাহেবদের স্কুলে-কলেজে পড়িয়া খাঁটি মেম বনিয়াছেন। বাংলা বলিতে পারিলেও লিখিতে পারেন না—ইহাই তাঁহার মস্ত গর্ব্বের কারণ। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সঙ্গেই সংসারের চাকা সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া মোড় ফিরিল। উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃধন সামান্য পাইলেও দু'টি জবর রকমের গুণ পাইলেন—বদ-রাগ ও স্বজাতি-বিদ্বেষ। ইহার সহিত মায়ের রূপটুকু মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল।

সুতরাং 'সোসাইটিতে' প্রবেশ-মুখেই পারিবারিক বিপর্য্যয়ের দরুণ চাকুরীর তল্লাস করিতেই এই চাকুরী মিলিয়া যায়। তিনি না কি এমন সব কাণ্ড-কীর্ত্তি করিয়াছেন, যাহা একমাত্র ঐতিহাসিক পুরুষেরই সম্ভব। এই সব কাহিনী বোর্ডিংএর কুড়ি বছরের পুরাতন মেট্রন মাসীমা আর রামী ও বামী দুই পুরাতন ঝি রাত্রে হৈমদির অগোচরে সালঙ্কারে বলিয়া থাকে। তাহাদের শ্রোতা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর

ছাত্রীরা। বামীকে না কি রাগিয়া একটা চড় মারিয়াছিলেন, সেই অবধি বামী অত্যন্ত চটিয়া আছে—সুযোগ পাইলেই বিষোদ্গীরণ করে। তাহার প্রচারকার্য্য দেখিলে স্বয়ং গোয়েবলস্ও তারিফ না করিয়া পারিতেন না।

বোর্ডিং-এ আসিয়াছি এক মাস, ইতিমধ্যেই হৈমদির অভ্যাসগুলি আমাদের একেবারে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ, এমন রুটিন-বাঁধা জীবন আর বড় একটা চোখে পড়ে না। আর এই বাঁধা জীবনের ঘোলা জলের পাঁকে কত জন যে হাবুডুবু খাইয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে! সাতটা বাজিয়াছে কি হাঁক শুনিলাম, "বামী চা আন।"

বামী চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া 'ট্রে' লইয়া ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে অগ্রসর হইবা মাত্র ধমক খাইয়া দ্বিগুণ ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল।

হৈমদি গর্জ্জাইয়া উঠিলেন, "তোমায় দিয়ে চলবে না! পথ দেখ—চা ঢেলে এ কি কাণ্ড করেছ? নুইসেন্স। যত সব বাঙ্গাল!"

কিন্তু বামীকেও সঙ্গদোষে পাইয়াছে—ইহা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দশটা বাজিতেই অফিসের পোষাক পরিয়া সমস্ত বোর্ডিংটা একবার টহল দিয়া মেয়েদের খাইবার ঘরে আসেন। সেদিন রবিবার—হৈমদি আসিয়া দ্রুত চোখ চালাইয়া দেখিলেন সব মেয়েরা আসিয়াছে কি না। ২নং টেবিলের তৃতীয় স্থানটি খালি পড়িয়া আছে।

"কে আসেনি?" রেণুকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেণুকা দোষ কাটাইবার জন্য জবাব দিল, "সম্ভবতঃ যারা আজ বাড়ী গেছে, ভুল ক'রে তাদের কারুর জায়গা করে ফেলেচে।"

এমন সময় স্বপনার কণ্ঠস্বর বাথ-রুম হইতে শুনা গেল। স্বপনা কল খুলিয়া গান ধরিয়াছে "ক্যায়সে ছিপোগে অব হুম্…"। হৈমদির শ্রবণে পশিবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার গলা শুনচি? নিশ্চয় স্বপনা। ও এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।" ভাতের সঙ্গে আরও কিছু বরাদ্দ হইল।

বিকাল পাঁচটার সময় রোজই দেখা যায় রং-বেরঙের শাড়ী পরিয়া সুদ রং-এর ক্লিপ আঁটিয়া দু'টি বিনুনী দুলাইয়া বারান্দার কোণে আরাম-কেদারায় বসিয়া মেয়েদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মেয়েদের বৃত্তাকারে বসিয়া গল্প করা পছন্দ করিতেন না। মেয়েরা প্রিন্সিপালের কাছে বলিয়া তাঁহার ক্ষমতা হরণের ষড়যন্ত্র করিতেছে এই আশঙ্কা করিয়া নানা রকমের সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

কর্ত্তৃত্ব-লোলুপ লোকেরা আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভালবাসে। নীলিমা এই দুর্ব্বলতা টের পাইয়া বিকালে দেখা হওয়া মাত্রই বলিল, "বাঃ ভারি খুলেচে তো এই ময়ূরকণ্ঠী রং-এর শাড়ীতে। আপনার রুচির প্রশংসা কোরতে হয়।" শুনিয়া হৈমদি দুই পাটি নকল দাঁত প্রকাশিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে কমপ্লিমেণ্ট আরও অনেকে দিয়েচে।"

নিজেকেও যে সময়ে সময়ে অবিশ্বাস করিতে হয়, আত্মবিশ্বাসী লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু এই নীলিমাই হৈমদির অনেক নামকরণ করিয়াছে। শাড়ীতে রং-এর প্রাচুর্য্য দেখিয়া নাম রাখিয়াছে 'পাতাবাহার'! পাউডার-ধূসরিত মুখ দেখিয়া 'হৈমন্তিকা' নাম বদলাইয়া কুজ্ঝটিকাময়ী নাম রাখিয়াছে—উল্কাদেবী, শ্মশানেশ্বরী আরও অনেক নাম!

সেদিন মেয়েদের দিকে দৃষ্টি ছিল না—যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন আর বারবার ঘড়ির দিকে দেখিতেছেন। পৌনে ছটার সময় গেট খোলার শব্দ হইল। দেখা গেল, হ্যাটকোট-পরিহিত এক বাঙ্গালী সাহেব প্রবেশ করিলেন। হৈমদি খুরতোলা জুতায় খট্-খট্ করিয়া আগাইয়া আসিবা মাত্র ভদ্রলোকটি সাহেবি কায়দায় করমর্দ্দন করিলেন, হৈমদি আঁচল দুলাইয়া তাঁহার সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

বাঙালী মেয়েরা 'কুড়িতে বুড়ী' এই কথা খাস বাঙলা দেশেই প্রয়োগ করা চলে। প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়েরা যে কুড়ির পরেও যৌবনকে জিয়াইয়া রাখিতে পারে তাহার অনেক নজির আছে—আর এই রকম ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের তো কথাই নাই!

এই নবাগন্তুককে লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। নীলিমা নূতন আবিষ্কারের আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল,—"ইউরেকা! ইনি নিশ্চয় হৈমদির ভাবী ভদ্রলোক। ওই সেদিনে কোন এক ফিরিঙ্গি মেয়ের বাড়ীতে জন্মবাসর করতে গিয়েছিলেন, সেখানে নিজের বিবাহ-বাসরের ব্যবস্থাও করে এসেচেন।" ললিতা, স্বপনা—"সত্যি রে, তাই হবে!" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিল।

মণিকা সাইকলজি-অনার্সের মেয়ে, প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দূর, আমার তাই বিশ্বাস হয় না। হৈমদির আর যে দোষই থাক, এ সব মেয়েলি ভাব নেই। আর এই চল্লিশ বয়সে কোর্টশিপ! তোদের যেমন বুদ্ধি! এ নিশ্চয় ওঁর কোন নিকট আত্মীয় হবেন।" যাহারা নীলিমার বেলায় ঘাড় নাড়িয়াছিল, তাহাদের অনেকেই আবার মণিকার কথায় ঘাড় দুলাইল।

নীলিমা এক দিন অনুনাসিকা স্বরে বলিয়া বসিল, "হৈমদির কি মজা—রোজ দাদার সঙ্গে বেড়াতে যান।"

লোকটির সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক, সে কথার উল্লেখ না করিয়া হৈমদি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গুণপনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"উনি বিলেতে দশ বছর ছিলেন। খাঁটী ইংরেজদের মত অনর্গল ইংরেজী বলতে পারেন, একেবারে 'পারফেক্ট জেণ্টলম্যান'।" নীলিমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিল।

পরদিন ক্লাশে ডরোথি এই বিষয়ে আলোকপাত করিয়া বলিল, "লোকটি সাহেবিয়ানা করিয়া সব খোয়াইয়াছে। বিলাতের মেম-সঙ্গিনী তাহার দেউলিয়া অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ঘাড় হইতে ভূতটা নামিয়াছে দেখিয়া সাহেবের না কি ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে—এখন হৈমদির বান্ধবীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে।"

হৈমদি সম্বন্ধে ধারণাটা যে একেবারেই অমূলক তাহা বুঝিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল—হইল না কেবল নীলিমা।

মণিকা বলিল, "কি রে? এত বড় আবিষ্কারটা মাঠে মারা গেল—নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর হল না।"

নীলিমা তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, "তাই বলে তোর থিওরিও ঠিক নয়। আমি একশ' বার বলব, হৈমদির বিয়েতে বেশ মত আছে—পাত্রের অভাব। গত বছরের বি, এ পরীক্ষার মেয়েরা যাবার সময় প্রণাম করতে গেলে হৈমদি বল্লেন—"ভাল বর আসুক। কোন বিয়ের নেমন্তন্ন বাদ দেন না—আর দেখেছিস্ সাজের জাঁক! মণিদির বিয়েতে দেখিস্নি কত জন সাজ দেখে ক'নে ব'লে ভুল ক'রে দেখতে এসে, চেহারা দেখে মুখ ফিরিয়ে গেছে? আর আমি লক্ষ্য করেছি যখনি নামজাদা লোকদের কথা ওঠে, তখন অবিবাহিত লোকদের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা উথ্‌লে ওঠে! এই দেখ্ না, বার্ণার্ড শ'র লেখা

লাগে না অথচ এডওয়ার্ড ব'লে এক জনের একাঙ্কিকা নাটিকা বার্নার্ড শ'কে না কি ছাড়িয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম লোকটি অবিবাহিত।"

কিন্তু এতগুলি যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া নীলিমা কাহাকেও আটকাইতে পারিল না—সকলে তাহাকে ধমকাইয়া থামাইয়া দিল।

ইহার পর কয়েক দিন বেশ নিরুদ্বেগে কাটিয়া গেল। শনিবার ছুটীর দিন। দুপুরে কেহ লনে বসিয়া রৌদ পোহাইতেছিল, কেহ বা বুকের উপর উপন্যাস খুলিয়া নিদ্রা দিতেছে। নীলিমাদের ক্লাশের মেয়েরা মৌন হইয়া অর্থশাস্ত্রের ব্যাঙ্কিং-এর অধ্যায়টি পড়িয়া শেষ করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল—এমন সময় মলিনা আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে খবর দিল, মনুয়ার মাকে পাওয়া যাইতেছে না। পাঠরতার দল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া সমস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। ইহাতে মনে করিবার কিছু নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষার রীতি ত্রেতাযুগেই ছিল—এখন কথা রাখিতে না পারাটা এমন কিছু দোষের নয়—মনুষ্যোচিত—To err is human. যেখানে যত চুক্তি হইয়াছে, তাহা সর্ত্তভঙ্গেরই চুক্তি। গানের ক্লাশে কাহারা যেন সেতারের কাণ মোচড়াইয়া সুরে-বেসুরে পর্দ্দা টানাটানি করিতেছে। হঠাৎ হৈমদির পৌরুষ কণ্ঠের হাঁক শুনিলাম—"রেণুকা, ঘণ্টা বাজাও।" অসময়ে ঘণ্টাধ্বনি! বিপদেরই সঙ্কেত! মুহূর্ত্তে সমস্ত বোর্ডিং চুপ হইয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া সব মেয়েরা 'হল-ঘরে' সমবেত হইল। বহু মহাপুরুষের পদরেণুতে পবিত্র এই 'হল ঘর'।

এমন অসময়ে ডাকিবার কি কারণ ঘটিতে পারে? হয়ত ৪নং রুমের ঘরের মগ ৫নং-এ অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, কিম্বা কেহ কাচের প্লেট ভাঙ্গিয়া দোষ স্বীকার করে নাই।

চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলাম, হৈমদি দুই হাত পিছনে দিয়া সামনে এক পা আগাইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠের অনুচরদের মধ্যে Saturn-এর মূর্ত্তিটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

হৈমদি বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শোনো মেয়েরা তোমাদের কয়েকটি দরকারী কথা বলছি, মন দিয়ে শুনবে। আমি চাই না তোমরা আজকালকার মেয়েদের মত হও। তোমরা কলেজের মেয়ে—এখন থেকে সংযত হয়ে ভদ্রভাবে চলবার চেষ্টা করবে।" বক্তব্য বিষয়গুলি কাগজে নোট করিয়া আনিয়াছিলেন। ভূমিকা শেষ করিয়া কাগজ দেখিয়া বলিলেন, "প্রথম নম্বর, আজ থেকে তোমাদের বিনুনী ঝুলিয়ে কলেজে যাওয়া বারণ হয়ে গেল—খোপা বেঁধে যেতে হবে।"

মিশনারী-স্কুলের টিচারদের মত বাঙ্গালী মেয়েদের চুল হৈমদিকেও শেষে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে!

কণিকা নীলিমার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ছাঁদে কবরী বাঁধব?"

কণিকার কথায় উল্লসিত হইয়া দুই বেণী দুলাইয়া বলিলেন, "যে তোমাদের খুশী।" খোঁপার বেলায় যে আইন বাঁধিয়া দিলেন না, তাহা দেখিয়া মেয়েরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

নীলিমা ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল, "কিন্তু নিজের বিনুনী?"

মণিকা হাসিয়া জবাব দিল, "জানিস্‌ তো, যৌবন একবারই আসে, কিন্তু মানুষের জীবনে শৈশবের না কি দু'বার আবির্ভাব হয়।"

আসল কথা, হৈমদি নিজেকে অবাঙ্গালী সমাজের এক জন মনে করেন। সে সমাজে ষাট বছরের বুড়ীরও লিপষ্টিক্‌মাখা এবং মাথা এবং চুল থাকিলে দুই বিনুনী বাঁধিবার রীতি আছে, কিন্তু বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এ সখ কেন?

"রবিবারে দেখা করবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেউ বারান্দায় দাঁড়াবে না।" বলা বাহুল্য, এই দিনটিতে মেয়েরা নিজেদের 'ভিজিটর' আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য বারান্দায় অকারণেও আনাগোনা করে।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "আমার আর কয়েকটা কথা জানবার আছে—মৃদুলা, তোমাকে মণিদা বলে যে লোকটি চিঠি লেখেন, সে তোমার কি রকম ভাই?"

এই শেষোক্ত প্রশ্নে অনেকের সম্মানবোধই হোঁচট খাইল।

মৃদুলা যথার্থই রাগিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "বাবাকে চিঠি লিখে সাত-পুরুষের বংশ-তালিকাটা আনিয়ে রাখলে তো এমন সব অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয় না।"

এমন কড়া জবাবের জন্য হৈমদি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না,—অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। কারণ, একুশ বছর ধরিয়া এই বোর্ডিংএ তাঁহার নিরঙ্কুশ শাসন অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কথাই সকলে শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ শুনাইতে সাহস পায় নাই। ঠোঁট দু'টি রাগে কাঁপিতে লাগিল, বেশী কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না, কেবল বলিলেন, "বেয়াড়া মেয়ে।"

কলেজে, বোর্ডিংএ এখন সর্ব্বত্রই নানা প্রকার "ইজম"এর চর্চ্চা হইয়া থাকে, আর মৃদুলা কমিউনিষ্ট পার্টীর এক জন পাণ্ডা—কত ভয়ঙ্কর বিপ্লব-কাহিনী গিলিতেছে রাত্রিদিন—এই সামান্য বাক্‌যুদ্ধে কিছুতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারে না।

মৃদুলা জেদের স্বরে বলিল, "বেয়াড়া শব্দটা ফিরিয়ে নিন, নাহলে প্রিন্সিপালের কাছে এই ঘটনা উত্থাপন করতে হবে আমাকে।"

প্রিন্সিপালের নাম শুনিয়া হৈমদি আমতা-আমতা করিতে লাগিলেন। ঝোপ বুঝিয়া মৃদুলাকে কোপ বসাইতে দেখিয়া মেয়েরা মনে মনে খুশী হইল।

হৈমদি মৃদুলাকে এড়াইয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মণিমালা, বেরিয়ে এসো।"

মণিমালা সদ্য গ্রাম হইতে আসিয়াছে—ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া অবনত মস্তকে তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল। হৈমদি মণিমালার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেণীমাধব ঘোষকে চেন?"

মুহূর্ত্তে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, অসহায়ের মত হৈমদির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর ঠোঁট ঈষৎ নড়িল কিন্তু কি বলিল বুঝা গেল না। হৈমদি শীকার পাইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "চেন না! মিথ্যা কথা। বিধবা মেয়ের সাহস দেখ।"

বিধবা! শুনিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিল। বিধবা কি অধবা বুঝিবার জো নাই বর্ত্তমান বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের দিনে। মেয়েটি কণ্ট্রোলের কালো সরু পাড়ের শাড়ী পরিত—কাহারো সহিত মিশিত না, মুখখানি সর্ব্বদাই মলিন। আমরা ইহাকে কেবল দারিদ্র্যের ছাপ বলিয়াই মনে করিতাম! এখন বুঝিলাম, হৃদয়ের কত বড় ক্ষতের যন্ত্রণা

ইহার সঙ্গে মিশিয়া এমন করুণ করিয়া তুলিয়াছে ! উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না মণিমালাকে নিতান্ত অসহায় পাইয়াই তিনি কৃতান্ত সাজিয়াছেন আর মৃদুলার ঝালও মণিমালার উপর মিটাইবেন। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল—ব্যাপারটা আগাগোড়া না বুঝিয়া কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না।

হৈমদি একটু থামিয়া সকলের দিকে চাহিয়া হুমকি দিয়া উঠিলেন, "আমার বোর্ডিং-এ থেকে এ সব চলবে না। তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করছি।"

এই ঘটনার পর হইতে বোর্ডিংএ আর গোলমাল শুনা গেল না। মণিমালাকে অনেক সাধিয়াও জলস্পর্শ করানো গেল না! দুই দিন পরে মণিমালার খুড়-শ্বশুর আসিয়া হাজির হইলেন। সামান্য জিনিষপত্র গুছাইতে বিলম্ব হইল না।—হৈমদিকে প্রণাম করিয়া বিষাদের পাষাণ মূর্ত্তিটি ধীরপদক্ষেপে শ্বশুরের অনুগমন করিল, একবারও পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল না! কেহ পিছু ডাকিয়া তাহার যাত্রার বাধা সৃষ্টি করিল না। মণিমালার ক্লাসের মেয়েরা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল।

……কিছু দিন পর বোর্ডিংএ আবার পূর্ব্বের জীবন ফিরিয়া আসিল। গ্রীষ্মের ছুটীর দু-এক দিন বাকী—পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—বোর্ডিংএর মেয়েরা বাক্স গুছাইতে ব্যস্ত, হঠাৎ নীলিমা খবর দিল, বেলাদি আসিয়াছে। বেলাদি গত বছর এই কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছে। খবর পাইয়া সবাই অমনি বাক্স-বিছানা যেমন ছিল তেমনি ফেলিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বেলাদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বেলাদি শারীরিক কুশল প্রভৃতি প্রাথমিক প্রশ্ন করিল, মেয়েরা যথাযথ উত্তর দিল।

বেলাদি নীলিমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে তোদের এখানে মণিমালা বলে ছিপ-ছিপে গড়নের একটি ফর্শা মেয়ে নতুন এসেছিল না? তাকে যে দেখছিনে!"

নীলিমা কি জবাব দিবে, ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে উত্তর করিল—"হাঁ, কেন, কি হয়েছে?"

নীলিমা ভাবিয়াছিল, বেলাদি ব্যাপারটা জানিয়াও না-জানার ভাণ করিতেছে—তাই নীলিমাও চাপিয়া গেল।

"একটা সু-খবর আছে, ওকে বলিস্‌নে যেন।" সকলকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "ওর, বুঝলি, খুব কষ্টের জীবন—যাকে বলে তিন-কুলে কেউ নেই—আছে কেবল দূর সম্পর্কের এক খুড়-শ্বশুর—লোকটার স্বভাবচরিত্র না কি একেবারে থার্ডক্লাশ। আমার ছোট কাকা ওর এক মামার কাছে শুনে ওকে দেখতে চাইলেন, আমি রোববার দিন 'ভিজিটর'দের ঘর থেকে ওকে দেখিয়ে দিলুম।"

নীলিমা বেলাদিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল, "বল তো, তোমার কাকার নাম কি? বেণীমাধব ঘোষ?"

বেলাদি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এ নাম জানলি কেমন ক'রে? এ কথা তো আর কেউ জানে না।"

নীলিমার মুখ দিয়া কোন জবাব বাহির হইল না—সকলেই মণিমালার পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। নীলিমা অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া কথার মোড় ফিরাইয়া দিল।

গ্রীষ্মের ছুটীর পর কলেজ খুলিয়াছে। ঢাকা মেলে শিয়ালদহ পৌঁছিয়াই ট্যাক্সি হাঁকাইয়া কলেজ-গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ড্রাইভার 'হর্ণ' বাজাইতে লাগিল। কিন্তু দরোয়ানের সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা ড্রাইভার নামিয়া গেটে সজোরে করাঘাত করিতে দরোয়ান ডান হাতে 'খৈনি' গালে ভরিতে ভরিতে বাঁ হাত দিয়া কোন প্রকারে গেটটা টানিয়া খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখি, সুমিত্রা তাহার এক-রাশ চুল পিঠে এলাইয়া রেলিংএর উপর বসিয়া দিব্যি পা দুলাইতেছে। কয়েক জন মেয়ে হল্লা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ কি? এঞ্জিনের সব অংশগুলি তো ঠিকই আছে, কেবল ধোঁয়েরই যেন অভাব বলিয়া বোধ হইল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই নীলিমা হাততালি দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "নতুন খবর। আগে হৈমদিকে প্রণাম করে আয়, পরে বলছি।"

হৈমদির দরজার সামনে আসিয়া দেখি, সে গাঢ় নীল রংএর পর্দ্দা নাই। উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া 'বাথ-রুমের' মগ-বালতি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল। হৈমদির নাম ধরিয়া বার কয়েক ডাকাডাকি করিতে ভিতর হইতে চাপা-সুরে সাড়া পাইলাম, "এসো।" ঢুকিয়া একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলাম। আসবাব-পত্র সব বদলাইয়া গিয়াছে—দেয়ালের সাহেব-মেমদের ছবিগুলি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে দেখি, কোণের দিকে তক্তাপোষের উপর এক শীর্ণকায়া মহিলা বসিয়া আছেন। প্রণাম করিব কি না ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় তিনিই প্রথম কথা কহিলেন, "আমি তোমাদের নূতন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।"

কোন প্রকারে প্রণাম সারিয়া বাহিরে আসিয়া নীলিমাকে প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপার কি বল তো?"

নীলিমা কাঁধে জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "কেমন? লাগল কি না আমার কথাটা শেষটায়? বড় যে তোমাদের হৈমদির চির-কৌমার্য্যে আস্থা ছিল? হৈমদি এখন সীমন্তিনী।"

অবাক হইয়া বলিলাম, "বলিস্ কি! ভীষ্মের পাণিগ্রহণও সম্ভব, কিন্তু হৈমদির এ ব্যাপার নৈব নৈব চ।"

তখন নীলিমা সবিস্তারে বলিল, করুণার অসুখের সময় যে 'ভিজিটর' করুণাকে দেখিতে প্রায় আসিতেন, তাঁহারই গলায় হৈমদি মাল্য দান করিয়াছেন। আরও অনেকে সাক্ষ্য দিল। সকলেই করুণার কাকার সহিত শেষের দিকে হৈমদিকে খুব মিশিতে দেখিয়াছে। করুণাও নীলিমাকে এ বিষয়ে আভাস দিয়াছিল—কিন্তু কথাটা অগ্রাহ্য হইবে আশঙ্কা করিয়া কাহাকেও জানায় নাই। নীলিমা হৈমদির এই পরিবর্ত্তন না কি তাঁহার বন্ধু 'মলি'র বিবাহের পর হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল।

তখনও নিজের কর্ণদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না প্রতিবাদ করিয়াই বলিলাম, "শেষটায় এই মাথায় বারোআনি টাক শুদ্ধ ধুতী-পাঞ্জাবী পরা বাঙ্গালী বাবু! ক্ষেপেছিস্ না কি?"

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাট-কোট পরা সাহেব এত শস্তা কি না! দেশী জিনিষেরই দাম বেড়েছে, আর বিলাতি মালের তো কথাই নেই!" এ ব্যাপার লইয়া একে অন্যের মুখ হইতে কথা কাড়াকাড়ি করিয়া এমন কোলাহল সুরু করিল যে মণিকার আগমন কাহারও চোখে পড়িল না।

মণিকা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "মাছের দাম কত?"

নীলিমা বলিল, "মাছের দাম যা-ই হোক, তোমার দাম ক'মেছে। থার্ড-ইয়ারেই সাইকলজির দু-এক পাতা গিলে বড় লম্বা লম্বা কথা হচ্ছিল। আমি তখনই বলেছিলাম, ওঁর জীবনে নিশ্চয় কোন রকমের অতৃপ্তি ছিল—আর এই মেজাজ তারই উৎকট প্রকাশ। কথা আছে, পুরুষের ভাগ্য আর নারীর চরিত্র!"

নীলিমাকে কথাটা বলিবার সুযোগ না দিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"হৈমদি'র বিয়ে হয়ে গেছে কণিকার কাকার সঙ্গে।"

হিটলার ষ্ট্যালিনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে শুনিয়া মণিকা হয়তো বিশ্বাস করিতে পারিত! কিন্তু এ কথা বিনা-প্রমাণে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই রাজী হইল না। অবিশ্বাসের সুরে সে বলিল, "সত্যি? যাঃ!"

শিশু-পালন

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

বিগ্রহ কথা বলেন না—তাঁর সেবা ধারাবাহিক নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা চলতে পারে কিন্তু যে মানব-শিশু দিন-দিন বৰ্দ্ধিত হতে থাকে এবং ক্রম-বিকাশমান জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে, তার সেবা ও পালনের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা, অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল সতর্কতা ও কুশল ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। জগতে মানুষ যে সকল জীব অপেক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি ও সৰ্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা তার বহু যুগ-যুগান্তব্যাপী অদম্য চেষ্টা, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফল। অনন্ত কোটি বৎসর সে চার পায়ে হেঁটেছিল মাথা তির্য্যক্ ভাবে রেখে। তার পর ক্রমে ক্রমে সে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াল,' পা দু'খানিকে খাটালো হাতের কাজে। মাথা উপর দিকে তোলার ফলে সে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা প্রভৃতি ভাল করে দেখতে ও বুঝতে পারলে। ক্রমে ক্রমে তার মস্তিষ্ক উৰ্ব্বর হতে উৰ্ব্বরতম হয়ে উঠল। জ্ঞানে সে শ্রেষ্ঠ হলো—সত্যকে চিনল। এ জগতে শ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যা পেল।

এই যে অনন্ত কাল ধরে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই—তার ফলে তার মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন হলো। এই শ্রেষ্ঠতা-সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। নহিলে—তার ফলে কোটি বৎসর পূর্ব্বকার এলোমেলো পশুবৃত্তিগুলো আবার একটু একটু করে মাথা চাড়া দেবে।

ঘেটু ফুল বনে ফোটে তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নেই। সে যত্ন চায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকৃষ্ট পংক্তিতে আনা মনোরম একটি গোলাপকে ফোটাতে হলে তার পিছনে দরকার বিরাট অভিজ্ঞতা ও যত্ন। এখানে ফুলটিকে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে দিতে প্রকৃতি পূর্ণ দায়িত্ব নেবে না।

শিশু কাছে আসবার পূর্ব্বেই মাতা-পিতার সন্তান পালনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

"Perhaps a very elementary course could be given to all girls and boys in schools on subjects such as hygiene in the home, the services available to encourage positive health and prevent infection, and the art of homecraft in relation to the childrens home."—Planters' Jaurnal (vol. xxxvi, No 6.)

আমাদের দেশে প্রথম-সন্তানসম্ভবা জননীকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁকে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ প্রভৃতি কতকগুলো লজ্জাদায়ক উৎসবের মধ্যে ফেলা হয়; সরাসরি ভাবে তাঁকে শিশু-পালন সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অথবা সে বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া হয় না—এমন কি, কালোপযোগী বলকারক আহারের ব্যবস্থা করা ঘটে ওঠে না অনেক ক্ষেত্রে। বাড়ীর যিনি কর্ত্রী, তিনি অশীতি বৎসর বয়সে শিশু-পালন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতাটুকু অৰ্জ্জন করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে নিজ কর্তৃত্বের জন্য সেটুকু নিজের মনেই সংরক্ষিত রাখেন।

শিশুর আগমনের পূর্ব্বে তার উষ্ণ-কোমল একাধিক শয্যা, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া-পূর্ণ গৃহ-নির্ব্বাচন, পরিচ্ছন্নতা এবং জনক-জননীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা স্থাপন অত্যাবশ্যক। তাঁরা স্রষ্টা হবেন, জনক-জননী হবেন, এ আনন্দে তাঁরা অন্তরে অন্তরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, কিন্তু অনেকটা লজ্জার খাতিরে, অভিজ্ঞতা এবং সুরুচির অভাবেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লাস কাৰ্য্যকালে কিংকৰ্ত্তব্য-বিমূঢ়তায় এসে পৰ্য্যবসিত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ধাত্রী তাঁর প্রাথমিক কাজগুলো নিষ্পন্ন করে নব-জননীকে একটু সুস্থ দেখে চলে গেলেন। এখন পড়ল গৃহ-কর্ত্রী ও জননীর উপর সমস্ত ভার। এতটুকু শিশু জন্মিয়াই কেঁদে ওঠে। প্রকৃতির কোলে এসেই প্রবল বায়ুর চাপে পড়ে সে। তার পাতলা ফিনফিনে চামড়া এবং নূতন শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রে প্রথমটা অত সইতে না পেরে সে কেঁদে ওঠে। এখন তার দেহের চাহিদা আরম্ভ হয়। এই সময় যথার্থ সতর্কতার অভাবে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার, কম্পন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

জননী তাঁর সদ্যোজাত শিশুকে যখন প্রথম ক্রোড়ে নেন, তখন তিনি কি এক অপূর্ব্ব স্পর্শ-সুখ অনুভব করেন! জগতে সকল স্পর্শানন্দ অপেক্ষা সন্তান-স্পর্শ-সুখ অভিনব-মনোরম। নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন—

"ভাগ্য আজি সেই সে মেয়ের
মা হল যে তোমার স্নেহের বরে
ভাগ্য আজি সেই সে ছেলের
বাপ হ'ল যে তোমায় আদর করে।"

প্রথম থেকেই দেখতে হবে, শিশুর কোমল ত্বকের ওপর সরাসরি ভাবে জননী বা অপরের হস্তস্পর্শ যথেচ্ছ ভাবে না হতে থাকে। গরম কাপড়, তুলার প্যাড, ফ্লানেল এই সবের উপর শুইয়ে তবে যেন এ-হাত ও-হাত করা হয়। কেন না, তার কচি ঘৰ্ম্ম-কূপ ও লোমকূপে সহজেই অবাঞ্ছিত জীবাণু সকল আশ্রয় নিতে পারে। শিশু অনেক পরিশ্রমের পর ভূমিষ্ঠ হয়েছে এইবার তার যথানুরূপ খাদ্যের প্রয়োজন।

শিশুকে প্রথম দু'-একদিন অনতি-আলো-বাতাসে গরম আচ্ছাদনে গৃহ-মধ্যে রাখাই বিধেয়। তবে যেন অন্ধকার ও বায়ুরুদ্ধ ঘরে না রাখা হয়; এবং অতি যত্নে ব্যতিব্যস্ত না করা হয়। তার এখন পরিমিত আলো-বাতাসে—দিবসে অন্ততঃ বাইশ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। কেন না, বাস্তবতঃ শিশুর এখন কোন পরিশ্রম না হলেও প্রকৃতির সাধারণ বিষয়বস্তুগুলো তার সদ্য বিকশিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে গ্রহণ করতে বিশেষ ক্লেশ চলেছে। তার ধমনী, শিরা ও কৈশিক প্রভৃতি রক্তবাহিকা নালীগুলোর কাজ এখন দ্রুততম হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিন থেকে তাকে উন্মুক্ত স্থানে ও রৌদ্রে পনের মিনিট থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর গায়ে প্রচুর তেল মাখিয়ে তাকে রৌদ্র-তপ্ত করা হয়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এ বিধি মন্দ নয়, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে শিশুকে এত বেশী সূর্য্য-তাপ লাগানো হয় যে, তখন থেকেই তাকে কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়, ফলে স্বাস্থ্যহানি না হলেও মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা হ্রাস পায়। অতি শীতে, রৌদ্রে, আর্দ্র বাতাসে অথবা শান্তিপূর্ণ প্রচুর নিদ্রার অভাবে শিশুকে বড় বেশী অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করতে হয় এবং যতই তাকে ক্লেশ ভোগ করতে হয়, ততই তার নার্ভ-তন্তুর (Nervous tissue) ওপর বেশী পীড়ন হয়, ফলে তার স্থূল বৃত্তিগুলো প্রবল হয়ে সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্ম বৃত্তিগুলোকে দুর্ব্বল করতে থাকে। দীন-দরিদ্র ঘরের শিশুদের প্রাণময়তার অভাব—এর এক দৃষ্টান্ত।

শিশু ক্রমে ক্ষুধার অভাব অনুভব ও প্রকাশ করতে শেখে, তার দর্শন ও শ্রবণ-শক্তি প্রয়োগ করে, হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে। এই যে তার ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমবিকাশমানের পথে চলেছে, এখন থেকেই তার আহার, আনন্দ বেড়ে ওঠবার অব্যক্ত উৎসাহের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দুগ্ধ, ক্যালসিয়মঘটিত শর্করা প্রভৃতি খাদ্যের ব্যবস্থা অনেক স্থলে হয় বটে, কিন্তু সুস্থ জননীর দেহ-দুগ্ধ অপেক্ষা শিশুর পক্ষে অপর কোন উৎকৃষ্টতম খাদ্য নাই। তবে জননী পীড়িতা হলে, মাতৃ-দুগ্ধের অভাব ঘটলে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য ব্যবস্থাই বিধেয়। তবে আহারে নিয়ম, সংযম ও পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বদা প্রয়োজন। বারে বেশী এবং পরিমাণে অল্প খাওয়ানোই বিধেয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ম ক্রম-পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ।

শিশু প্রথম দর্শন-বিন্যাসে বর্ণ-বিশ্লেষণ করতে পারে না। দৃষ্টির গভীরতা তখনও আসে না বলে উজ্জ্বল বর্ণগুলোই তার চোখে ধরা পড়ে। লাল রং তার ভালো লাগে। সাদা, কালো এ-সব রঙে তার স্ফূর্ত্তি হয় না। লাল রঙের ফুল-ফল, খেলনা তার চোখের সামনে রাখতে হয়। সেগুলো একটু নাড়া দিলে এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখবার আগ্রহ তার বাড়ে, অলস অবস্থায় সে একটা কাজ পায়। রস ও রূপ নিতে শিখে ক্রমে শব্দ চায়। হাততালি দিলে উৎকর্ণ হয়ে শোনে, আদর করলে ফিক্-ফিক্ করে হাসে, হাতে ঝুমঝুমি দিলে একটা নূতন অবলম্বন পেয়ে অসংযত ভাবে হাত দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, হাত-পা ছুঁড়তে, বুকখানা উঁচু করতে থাকে। এতে তার ব্যায়াম ও মনে নূতন নূতন আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়।

এখন দেখতে হবে, তার গাত্রাবরণ অথবা তার পোষাক যেন তার এই নূতন খেলার পথে বিঘ্ন না ঘটায়। আলগা ফাঁকা-ফাঁকা পোষাক দেওয়া উচিত। শিশু খেলুক, মনের আনন্দে হাত-পা ছুড়ুক, শব্দে ও বর্ণে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক, প্রকৃতির বিরাট দানকে সে একটু-একটু করে চিনুক, উপভোগ করুক্।

রাত্রে শিশু ও মাতার শয্যারচনা বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রধানতঃ শিশুর শয্যা মাতার শয্যা থেকে পৃথক্ থাকাই বিধেয়। একই মশারির মধ্যে পাশাপাশি শিশু ও জননীকে শুতে দিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। মাতার পরিত্যক্ত নিশ্বাস মশারির মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে শিশুকে ঐ বিষাক্ত নিশ্বাসের (carbon dioxide) কতকাংশ গ্রহণ করতে হয়। তবে যে-ক্ষেত্রে পৃথক শয্যা করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছ থেকে জননীর শোবার স্থান অন্ততঃ দেড় হাত দূরে এবং জননী যে স্তরে শোবেন তা থেকে শিশুকে অন্ততঃ পাঁচ-ছ' ইঞ্চি উঁচু বিছানায় শোয়ানো উচিত। এতে শিশু ও জননী উভয়েই বিভিন্ন স্তর থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া উভয়ে অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়ে শয়ন করলে শিশুর দেহে মাতৃদেহের উত্তাপ সারারাত্রি শোষিত হতে থাকে, তাতে শিশুদেহের বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। পশু-শাবকের মাতৃদেহ-তাপ প্রয়োজন হয় একটু বেশী; কিন্তু মানব-শিশুর পক্ষে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃতির নিয়মাধীনে শিশুর অবয়ব ও কার্য্যকলাপের দ্রুত পরিবর্ত্তন চলতে থাকে। তিন মাসের মধ্যে ভালো ভাবে উপুড় হতে, ছ' মাসের মধ্যে উঠে বসতে ও হামা টানতে শিখে নেয়। এই ছ' মাসের পর থেকে জননীর দায়িত্ব বাড়ে অনেক বেশী। শিশুর খাদ্য নির্ব্বাচন, খাদ্যের সময়-নিরূপণ, ব্যায়াম-শিক্ষা ও ক্রীড়া, আমোদ—এ সকল বিষয়ে এখন থেকে জননীকে উন্নততর ও পরিবর্ত্তনশীল পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

এখন থেকে আর উপর্য্যুপরি এবং অতিরিক্ত আহার করানো চলবে না। নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা অন্তর পরিমিত আহার বিধেয়। অতিরিক্ত আহারে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, পাকস্থলীতে প্রবল চাপ পড়ায় আহার্য্য পরিপাক হতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। এত দিন সে যে সব খাদ্য খেয়ে এসেছে, তার উপর এখন থেকে তাকে একটু একটু করে প্রটীন (Protein) ও ভিটামিন-জাতীয় খাদ্য এবং আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি স্বল্প কঠিন ফল দেওয়া যেতে পারে। দাঁত উঠলে দাঁতের ব্যবহারের জন্য তাকে আম, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি ফল কামড়ে খাবার জন্য দেওয়া চলে। আমাদের দেশে এই খাদ্য-তালিকা পরিবর্ত্তনের জন্য ছ'মাসে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্নপ্রাশনের উৎসবের সঙ্গেই শিশুর প্রতি ইতিকর্ত্তব্য শেষ করে ফেলা হয়—তার খাদ্যের ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল চাহিদার দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না।

শিশুকে এই বার একটু বেশী করে বাহিরমুখো করতে হবে। ঠেলা-গাড়ীতে অথবা তার অভাবে কোলে করে উন্মুক্ত বাতাসে, মাঠে, পার্কে ও রাস্তায় তাকে সকালে-বিকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য নিয়ে বেড়ান প্রয়োজন। ঐ সবুজ ঘাসে-ভরা বিস্তীর্ণ মাঠ, ঐ সুদূর প্রসারী পথ, আকাশের গা-বেয়ে ওঠা ঐ বড় বড় তাল নারিকেল গাছের শ্রেণী, ঐ উন্মুক্ত উদার আকাশ দেখতে ও উপভোগ করতে শিশু উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে! তুমি মা, তুমি বাবা, তোমরা আত্মীয়-স্বজন—তোমাদের ঐ নবাগত শিশুর অনন্ত কালের উদ্দাম

বাসনার পরিতৃপ্তি করাবে না? যে বিশ্ববীজ-সমষ্টি ও বিশ্ব-আত্মা থেকে তার উৎপত্তি, যে দিব্য-দৃষ্টি উপভোগ করবার জন্য জড়দেহে পূর্ণশক্তি নিয়ে তার আসা, তাকে তুমি সে-দাবী থেকে বঞ্চিত করো না। তাকে বাহিরে আনো, গাছ-পালা, মাঠ, পথ, বন, ফুল, ঐ ছুটে যাওয়া জন্তু, ঐ উড়ে যাওয়া পাখী দেখাও। ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে ঐ আকাশের চাঁদ, অনন্ত নক্ষত্র দেখতে উৎসাহ দাও। শিশু ঐ অনন্ত সৃষ্টি দেখতে দেখতে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক, অনুভব করতে শিখুক সে কত বড় হয়ে উঠছে, কি অভিনব বস্তু সব দেখছে। ঐ সব দেখাতে দেখাতে তার সঙ্গে তুমি কথা কও, ছড়া কাটো, অঙ্গভঙ্গি কর—তাতে সে বুঝবে তুমি তার বন্ধু, তার মনোবৃত্তি-আদান-প্রদানের সহায়ক। এমনি করতে করতে তার চিত্ত-বৃত্তি গঠিত হবে, উৎকর্ষের দিকে যাবে, আর সব জানবার, শেখবার এবং দেখবার জন্য শিশু ব্যগ্র হবে।

শিশুকে বাহিরে না আনলে পাঁচটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিরাট ক্ষেত্র না দেখালে জীবনের প্রথম দিনের উৎস-পথে সে বাধা পেয়ে পেয়ে ক্রমে অলস, অচঞ্চল ও কাতর হয়ে পড়ে। এই সব ছেলে যত বড় হয়ে ওঠে ততই বাড়ীর বাইরে কোন লোক বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলেই কান্না সুরু করে, সর্ব্বদা একটা অস্বস্তির ভাব দেখায় এবং তাদের মধ্যে প্রাণময়তার অভাব লক্ষ্য হয়।

আমাদের দেশে সচরাচর শিশুকে এক কোল থেকে অন্য কোলে নেওয়া হয়। এই সময় অনেক ক্ষেত্রে শিশুর দেহভার এবং যিনি লন' তাঁর আগ্রহ—এই দু'য়ে মিশে যে একটা মৃদু বেগের সৃষ্টি হয়, তাতে শিশুকে এক থেকে অন্যের দেহে পৌঁছুতে একটা আঘাত সহ্য করতে হয়। এ আঘাত অতি মৃদু হলেও দিনে এমনি ছ'-সাত বার সহ্য করতে করতে তার বুকের সাধারণ বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। সে জন্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে কোলে নেবার সময় অতি স্বল্প বেগ প্রয়োগ করে তবে নেওয়া উচিত।

সুস্থ শিশু এক বছরে দাঁড়াতে এবং তার দু'-এক মাস পরেই হাঁটতে শেখে। তার এই কর্ম্মক্ষমতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক উন্নতির দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। নানা উন্নততর খেলনা ও নানা ভাবে খেলায় ও আনন্দে তাকে নিযুক্ত রাখাই হলো এর উপায়। তবে তার খেলনা এবং তাকে কর্ম্মরত রাখার মধ্যে যেন একঘেয়ে ভাব না থাকে। এখন আর চুসীকাঠি, ঝুমঝুমি দিলে চলবে না—অথবা ফাঁকা আদর করে তার আগ্রহশূন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চলবে না। এখন সে অনেক চিনেছে, অনেক দেখেছে, বহু অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এখন লাল রঙটা তার তেমন ভালো লাগছে না। নিকেল-করা সিগারেট কেস্, টর্চ-লাইট, দম-দেওয়া গাড়ী, ছোট বল, ছড়ি, পশমের ও কড়ির পুতুল তার ভালো লাগে। তার সমবয়স্ক অথবা তার চেয়ে অল্প-বড় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হাত-পা ছুড়ে খেলা করতে তার ভালো লাগে। সে এখন দু'রকমে চলতে পারে—কখন দ্রুত হামা টেনে, কখনও বা টলতে-টলতে হেঁটে। একটা বাটি উপুড় করে লম্বা সিমেণ্টের মেঝেতে দিলে সে সেই বাটিটার উপর ভর দিয়ে দ্রুত হামা টেনে ছুটতে পারে। এতে তার দুঃসাহসিকতার অভ্যাস আসে। কিছু দূরে একটা লাল ফল, একটা ভালো পুতুল নিয়ে দাঁড়ালে সে টলতে-টলতে ওগুলোকে নিতে আসবে। তাতে তার ব্যায়াম হবে। তবে অতিরিক্ত হাঁটতে দিলে বিরক্তি আসবে—একঘেয়ে হয়ে যাবে। এখন তাকে কিছু কিছু ছুড়তে দেওয়া ভালো। একবার যদি সে একটা কাচের পুতুল মাটীর খেলনা ভাঙতে পায়, তার পর থেকে সে বলটা পুতুলটা ছুড়তে আরম্ভ করবে। পুতুলটা ভেঙ্গে গেল বলে অথবা তোমার ঠিক মনোমত খেলছে না বলে তাকে যেন ধমক দেওয়া, রাগ দেখানো, নিরুৎসাহ করা না হয়। কান্না থামানোর জন্য ভয় দেখিয়ে, জুজু, ভূত প্রভৃতির কথা বলে কোন ভয়সূচক অনভিপ্রেত অবয়বের কল্পনা তার মানসপটে ধরা উচিত নয়। শিশুকে ভয় দেখালে তার চিত্ত অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

শিশু যেখানে চাকর অথবা পরিচারিকার কোলে মানুষ হয়, সে ক্ষেত্রে জনক-জননীর ঐ সব দাস-দাসীর উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কেন না, অলক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে তারা শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার উপর উৎপীড়ন করে, যথোপযুক্ত যত্ন লয় না।

শিশুকে তার উৎস-মুখে অন্ততঃ দু'বছর পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কোনরূপ বাধা-নিষেধ দিতে নেই। সে চলুক, ছুটুক, ফেলুক, ভাঙুক, ভুল করুক, খুব দুষ্টু হোক্। দেশ-কাল ও অবস্থানুযায়ী সমুদ্রোপকূলে, পর্ব্বত-মূলে, নদী-বক্ষে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে গেলে তাতে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যায়। এতে শিশুর মন উদার ও সাহসিকতাপূর্ণ হয়।

ঐ যে ক্রমবর্দ্ধমান শিশু—ও আজ কিছুই জানে না—শুধু জানে চঞ্চলতা। কিন্তু ঐ চঞ্চলতার যে দিব্য পরিণতি হতে পারে, তা কে জানে? তুমি হয়ত সাধারণ পিতা কিম্বা মাতা, কিন্তু তোমার ঐ সোনার চাঁদ মহা দুষ্টু শিশু যে এক দিন বুদ্ধ, চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, আশুতোষ, প্রফুল্ল হবে না, তা কে বলতে পারে?

তোমার-আমার বোধ-শক্তি দিয়ে শিশুর ভুল-নির্ভুল পরিমাপ করা যায় না। আমরাও কত ভুল ক'রেছি—ভুল শিখেছি, ভুল শিখিয়েছি। ভুল করেই মানুষ সত্যকে চিনতে পারে। ভুল ও সত্যের তুলনা করতে গিয়ে কবি বলছেন—

"He has been hindered and delayed and decieved by angers and prophets by popes and priests. He has been betrayed by saints, misled by apostles and Christs, frightened by devils and ghosts, enslaved by chiefs and kings, robbed by alters and thrones. In the name of education his mind has been filled with mistakes, in the name of religion he has been taught humility and ignorance.

Let children have some daylight at home and do not commence at the cradle and shout—Don't—Don't—Stop !"—Col. Ingersol.

(Ingersols Lectures)

সমাধি মন্দির

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

...বদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ যেমন বৃন্দাবন, ...কদের তেমনি আগ্রা—এই ...মার বিশ্বাস। সেখানে হিন্দু, ...লমান, শিখ, খৃষ্টান, পারসীর ...য় কোন ভেদাভেদ নেই। সকল ...তির, সকল সম্প্রদায়ের যুবক ...ক। তাদের এক ধর্ম, এক ...ম! সে শুধু নিখিল বিশ্বের ...বন! ফুলে ফুলে বিছানো ...র পথ, রঙে রঙে ছাওয়া তার ...কাশ, গন্ধে বিহ্বল তার সমীরণ, কল্পনায় শিহরিত তার ...তিটি মুহূর্ত! তাই আগ্রার নাম শুনলে সহসা যুবকদের ...ন কেন যেন সকলের অজ্ঞাতে একবার মেতে ওঠে। মৌমাছির ...য়ের শব্দে যেমন ফুলের পাপড়ি কাঁপে, সুরের স্পন্দনে ...মন সেতারের তারে তারে মূর্চ্ছনা ওঠে—এ যেন সেই রকমের ...কটা শিহরণ, যা কেবল অনুভব করা যায়—কিন্তু ভাষায় ...কাশ করা যায় না। আগ্রা ত নয়, সে যে তাজমহলের দেশ। ...ম্রাট্ সাজাহানের দীর্ঘশ্বাসে ভরা রাজত্ব। বিরহ-বেদনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ...তিহাস। প্রেমকাব্যের বাস্তব রূপ। যুগ যুগ ধরে মানুষ কেবল ...কেঁদেছে—বিরহে প্রেমে, কিন্তু কখনো কি দেখেছে সে কান্না কেমন! ...কি সুন্দর, কি মধুর, কি সুশোভন তার মূর্ত্তি! দেশ-বিদেশে অনেক ...কাব্যগাথা রচিত হয়েছে এই বিরহ-প্রেমের কাহিনী নিয়ে, আর তারা ...অমর হয়ে আছে মানুষের বেদনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। কিন্তু সেই ...মহান্ বেদনাকে কি কেউ কখনো চাক্ষুষ করেছে? পৃথিবীর আর ...কোন দেশে কি তার কোন প্রমাণ আছে? তাই দেশ-বিদেশ ...থেকে লোক ছুটে আসে সেই প্রেম-কাব্যের বাস্তব রূপ দেখে চক্ষু ...সার্থক করতে!

শুধু যুবক-যুবতী নয়, আমি বহু প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অরসিক-...রসিককেও দেখেছি আগ্রার কথা বলতে গিয়ে যাদের চক্ষু স্বপ্নালস ...হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে আসে। কেউ আগ্রায় গিয়েছে শুনলে ...আমি আর স্থির থাকতে পারতুম না, ছুটে যেতুম শুধু তাকে চোখে ...দেখবার জন্যে। আমার কাছে তারাই ছিল যেন একটা পরম বিস্ময়ের ...বস্তু। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি না, এই স্থানটির সম্বন্ধে আমার ...মনে সব চেয়ে দুর্ব্বলতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পাড়ার ...লোক, কেউ আগ্রা দেখে এসেছে শুনলে আমি তার কাছে গিয়ে আগে ...জিজ্ঞেস্ করতুম, কেমন দেখতে সেই তাজমহল, কত বড়, কত সুন্দর? ...ছবিতে যেমন দেখি, বইয়ে যেমন পড়ি, ঠিক সেই রকম কি না? ...কেমন দেখতে সেই যমুনা, যার বুকের ওপর তাজমহলের প্রতিবিম্ব ...দিন-রাত নীরবে ঘুমায়? ছেলেবেলায় ইতিহাসে যত রকমের কাহিনী ...পড়েছি—সবগুলো একসঙ্গে তখন মনের দুয়ারে ভীড় ক'রে আসতো। ...তাদের মনে যেমন লেগেছে তারা তেমনি ভাবে উত্তর দিলেও আমার ...কিশোর-মনের কল্পনা বুঝি তাতে তৃপ্ত হতো না—আরো কিছু ...চাইতো, আরো কিছু প্রত্যাশা করতো। এমনি ক'রে যত দিন যেতে ...লাগল, আমার মনে আগ্রা সম্বন্ধে তত কৌতূহল বাড়তে লাগল।

অবশেষে এক দিন এলো সে সুযোগ। তখন আমার বয়স ...বাইশ কি তেইশ। আমার মনের কুঞ্জবনে সবে ফুল ধরেছে। ...আগ্রার টিকিট কেটে আমি ট্রেণে চাপলুম।

পরদিন টুণ্ডলা থেকে যখন গাড়ী বদল ক'রে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলুম, তখন আমার বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, বুঝি এখনি আমার সেই বহু প্রতীক্ষার ধন, সেই পরম প্রিয়ের দর্শন পাবো! কখন দেখবো তাজমহল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলুম।

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত যেন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়! দূর থেকে যেন সর্ব্বপ্রথম সে আমার চোখে পড়ে। আর সামান্য দূরে আগ্রা, মাত্র তিনটে ষ্টেশন।

গাড়ী যত ছুটে চলে, আমার চোখ তত ব্যাকুল হয়ে কা'কে খোঁজে? ধূ-ধূ করছে মাঠ দু'পাশে। পশ্চিমের তৃণলতাহীন বিশুষ্ক প্রান্তর যেন আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কোন্ দিকে তাজ, তা জানি না। কয়েকটি মাত্র যাত্রী আমার কামরায়। তারা বোধ হয় সকলেই স্থানীয় লোক। কারো মুখে তাই তাজ দেখবার কোন আগ্রহ লক্ষ্য করলুম না। যে যার নিজেদের কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত।

প্রথম শরতের নীল আকাশে তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্র স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল আমার, যেন আকাশ তার দীর্ঘ নীল নয়ন দু'টি বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে আছে এই পৃথিবীতে কা'কে দেখবার জন্যে।

গাড়ী চলেছে তেমনি গতিতে।

সহসা দূর চক্রবালে যেন সাদা মেঘের মত এক টুকরো দেখা গেল। গাড়ীর মধ্যে কে এক জন বলে উঠলো উর্দুতে, 'উয়ো তাজ'—ওই তাজমহল!

আমার চোখ যেন তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যিই সে তাজ দেখছে! সেই অমল-ধবল রজত-শুভ্র কান্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হলো, এ ত তাজমহল নয়—এ যে এক তন্বী, সুন্দরী, যুবতী, নীলওড়না তার গায়ে জড়ানো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কি ও তাজমহল নয়—ও মমতাজ। সমাধি-মন্দির ছেড়ে কি সে এখনো যায়নি কিংবা ও তারি আত্মার মর্ম্মর রূপ।

যমুনার পুল পেরিয়ে ট্রেণ এসে থামল আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে। নামলুম সেখানে। তাজমহলের কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছে যে যমুনা, তার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। যমুনার সে কলকল্লোল আর নেই, এক দিন সাজাহানের অশ্রুতে যার দু'কূল করতো ছল-ছল। এখন যমুনা যেন বৃদ্ধা পিতামহীর মত তার কঙ্কালসার দেহখানাকে নিয়ে তাজমহলের মুখের দিকে চেয়ে আছে আর তার লোলচর্ম্ম কোটরগত চক্ষুতে এখনো কিছু অশ্রু জমে রয়েছে।

যমুনার ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে তাজমহলে যাবার রাস্তা। তার দু'ধারে ঝাউবন আর উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি পাহাড়ের মত। এ রাস্তাটা বড় অদ্ভুত! যত এগিয়ে যাওয়া যায় তাজমহলের দিকে, তত আর তাকে দেখা যায় না—কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়—শেষে হঠাৎ ফটকের সামনে গেলে বিকশিত হ'য়ে ওঠে যেন পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে! সমগ্র ভাবে ...তে পাওয়ায় যেমন একটা চমক লাগে, তেমনি সহসা যেন বুকের মধ্যটা দুলে ওঠে যেন কিসের ব্যথায়!

যাই হোক, সেই রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে আমার মনে হতে লাগল, সম্রাট্ সাজাহান কি এই পথ দিয়ে যেতেন! তিনি কি আমার

মত বক্ষে এমন স্পন্দন অনুভব করতেন তাজকে দেখতে যাবার সময় ?

এমনি করে যেতে যেতে হঠাৎ একেবারে ফটকে ঢুকেই মন এবং মুখ দুইই স্তব্ধ হয়ে গেল। সামনে তাজমহল! নীরব নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ চারি দিকে! মধ্যাহ্নের তপ্তরৌদ্র যেন সচকিত!

আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার পা যেন নিশ্চল হয়ে গেল। সম্মুখে শ্বেতমর্মরখচিত যেন এক বিরাট প্রেমকাব্য ছন্দে মাধুর্যে রূপে রসে অনবদ্য কল্পনাতীত! কারুশিল্পের চরম নিদর্শন তাজমহল। লোক দেখছে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে। শুধু কি তার গঠন-বৈচিত্র্যে তারা মুগ্ধ! তারা কি ভাবছে, এমন নিখুঁত স্থাপত্যকলা পৃথিবীর আর কোথাও নেই? তারা কি সেই পাথরের অন্তরালে রয়েছে যে শিল্পীর চোখের জল তাকেও অনুভব করছে আমার মত ?

এমনি কত কি চিন্তা করতে করতে আমি ধীর-পদে ভিতরে প্রবেশ করলুম।

আগে বাইরে থেকে তাকে দেখলুম—যত রকমে দেখা সম্ভব। দূরে থেকে, কাছে থেকে, মাঝখান থেকে, কোণ থেকে ঘুরে ফিরে, দাঁড়িয়ে, বসে সর্বপ্রকারে; দিনের আলোয় তার বাহ্যিক রূপ দু'চক্ষু দিয়ে শুষে নিয়ে তার পর গেলুম ভিতরে।

ভিতরের অত্যাশ্চর্য্য রূপ দেখে শেষে একটা ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে আমি তার গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করলুম। এ যেন তাজমহলের অন্তঃকরণ। আলো-ছায়াময় একটি ঘর—সেখানে পাশাপাশি সাজাহান আর মমতাজের সমাধি, শ্বেতপাথরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত একটি প্রকাণ্ড জাফরী দিয়ে ঘেরা!

বাগান থেকে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করে পকেটে রেখেছিলুম। 'গাইড'টা সেইখানে নিয়ে গিয়ে কোন্‌টা কার সমাধি ব'লে একবার চেঁচিয়ে উঠলো তার ভাঙ্গা-ধরা গলায়—'আল্লা-হো-আকবর'!

সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল সেই হিমশীতল পাষাণের নীরব নিশ্চলতায়। আমি ফুলগুলো সেই সমাধি-স্তম্ভের ওপর ফেলে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে নীরবে অভিবাদন করলুম। আমার মন তখন বলে উঠলো, ধন্য তুমি সাজাহান, ধন্য তোমার প্রেম! কত নবাব, কত সম্রাট্‌, কত রাজা-উজীর এই পৃথিবীতে জন্মেছে কিন্তু পত্নীপ্রেমের এমন জ্বলন্ত উদাহরণ আর কে রেখে গেছে ?

সেই দিনই অপরাহ্নে আগ্রার দুর্গ দেখতে গেলুম। সাজাহানের কক্ষে গিয়ে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। যমুনার ওপারে তাজ আর এপারে এই দুর্গ। তবু দিন-রাত তাজমহল দেখে বুঝি সম্রাটের আশা মেটেনি, তাই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে যে অসংখ্য ফুল লতাপাতা চিত্রিত তার মধ্যে এমন ভাবে সব হীরা-মণি-মুক্তা তিনি বসিয়েছিলেন যে, ওপার থেকে তাজমহলের সম্পূর্ণ ছবিটি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে অহর্নিশ সাজাহানের চক্ষে বিরাজ করতো। ঘুরতে ফিরতে যখন যে দিকে তিনি চাইবেন যেন প্রিয়তমা পত্নীর সেই শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক স্মৃতি তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ সাজাহানের এই কক্ষের এক কোণে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম ওপারে তাজমহলের দিকে। কেবলি আমার মনে হতে লাগল, প্রেমের এমন অভিব্যক্তি জগতের আর কোথাও কি আছে ?

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার গেলুম তাজ দেখতে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কত রাত পর্য্যন্ত বসে রইলুম।

এর পর তাজকে কত রকমে দেখলুম তার ঠিক নেই। ঘোর অন্ধকারে দেখলুম, ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেখলুম, সন্ধ্যায় দেখলুম, অধিক রাত্রে দেখলুম—যত দেখি ততই যেন দেখা ফুরোয় না। এ যেন নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব বিস্ময়! সুন্দরী রমণীর মত তাকে যখন যে অবস্থায় দেখি যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখে দেখে আশা আর মেটে না। অক্ষয় সৌন্দর্য্য আর অমর প্রেমের সে মহামিলন।

পূর্ণিমার পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্নায় তাজ দেখবো, অনেক কালের বাসনা। কয়েক দিন পরে সে সুযোগ আসতে মন নৃত্য করে উঠলো। সন্ধ্যার দিকে দর্শকের ভিড় থাকে বেশী, তাই একটু বেশী রাত করে গেলুম। সেই বিশাল প্রাঙ্গণে অল্প দু-চারটি লোক আমার নজরে পড়লো। কেউ স্তব্ধ হ'য়ে তাজমহলের দিকে চেয়ে বসে আছে, কেউ নিঃশব্দে যেন ছায়ার মত পায়চারী করছে পাছে তাজমহলের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে সশঙ্কিত, কেউ বা তাজমহলের চত্বরে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

আমি ধীরে ধীরে বাগানের যে দিক্‌টা সব চেয়ে নির্জ্জন সেখানে গিয়ে বিলিতী ঝাউ গাছের তলার ছায়ায় অবগুণ্ঠিত একটি শ্বেত পাথরের বেঞ্চিতে বসলুম। সামনে তাজমহল। আশে-পাশে যতটা দেখা যায় তার মধ্যে অপর কোন লোক দেখতে না পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

সম্মুখে সেই তুষারধবল শ্বেত-মর্ম্মরের উপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের সৃষ্টি হয়েছিল আমি তার দিকে চেয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, এ তাজমহল যেন পৃথিবীর নয়, সে কল্পনার অতীত কোন এক মায়া-লোকের স্বপ্নমূর্ত্তি।

কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার পাশে একটা ভারী-পায়ের আওয়াজ শুনে আমার চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখি, আমার পাশে এক শান্ত্রী-পাহারা দাঁড়িয়ে আছে—লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় রঙীন পাগড়ি, সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান পোষাক আর কোমর থেকে ঝুলছে চকচকে খাপে মোড়া এক তলোয়ার।

এই সময় একটা মূর্ত্তিমান বেরসিককে সামনে দেখে সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো। কঠিন দৃষ্টিতে এক বার তার দিকে চাইতেই সে সরে গেল অন্য দিকে।

আবার আমি আমার ভাবরাজ্যে ডুবে গেলাম। কিন্তু একটু পরে দেখি, সেই লোকটি এসে একেবারে আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসেছে। আশে-পাশে আরো কয়েকটা বেঞ্চি খালি পড়েছিল, সেগুলোতে না গিয়ে আমায় এই ভাবে বিরক্ত করাতে আমি মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লুম এবং সেই ভাববিরোধী, তলোয়ারধারী শান্ত্রী-পাহারাটির সংসর্গ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম।

সেখানে বসে বসে আবার তাজের দিকে চেয়ে কখন যে আত্ম-বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম জানি না। কিন্তু হঠাৎ আমার কাঁধের কাছে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস শুনে চমকে উঠে দেখি, সেই মূর্ত্তিমান আবার আমার পাশে। অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে যেমন

দাঁড়িয়েছি অমনি সে বলে উঠলো পরিষ্কার উর্দ্দু ভাষায় ক বাবুজি, আমার ওপর কি আপনার গোসা হলো ?

বললুম, হবে না ? এত জায়গা থাকতে একটা মানুষের ঘাড়ের ওপর এসে বসলে কোন ভদ্দর লোকের মেজাজ ঠিক থাকে ?

সে বললে, একলা আমার ভাল লাগছে না তাই আপনার কাছে বসতে এলুম।

তার মুখ থেকে এই কথা শুনে ভারী রাগ হলো, বললুম, একলা ভাল লাগছে না তা আমি কি করবো—একটা সঙ্গী কোথা থেকে ধরে আনলে পারতে।

সঙ্গী ! বলে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে লোকটা চুপ করলে। আমিও কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললুম, তোমার স্ত্রী নেই ?

সে কোন জবাব না দিয়ে তেমনি নীরব রইল।

আমি বললুম, তা যদি ভাল না লাগে ত চলে গেলেই ত পারো এখান থেকে।

এইবার সে কথা বললে। বুকের মধ্যে যেন একটা গভীর নিশ্বাস চেপে নিয়ে বললে, এখান থেকে চলে যাবার আমার হুকুম নেই।

বললুম, হুকুম নেই ? কেন ?

সে বললে, আমাদের বেগম-সাহেবা এসেছেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাজমহল দেখতে। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন আমাদেরও ততক্ষণ থাকতে হবে।

বিস্মিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম, বেগম-সাহেবা !

সে বললে, হ্যাঁ, ফেন্দৌসগড়ের বেগম-সাহেবা। ফেন্দৌসগড়ের নাম শোনেননি ?

বললুম, হ্যাঁ শুনেছি। তুমি বুঝি ওখানে প্রহরীর চাকরী করো ?

মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করে থেকে সে উত্তর দিলে, আমি বেগম-সাহেবার হারেমের খোজা প্রহরী।

খোজা প্রহরী ! অস্ফুট স্বরে আমার মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে পড়লো। তার পর তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই ত কোথাও কোন দাড়ি-গোঁফের রেখা নেই অথচ ক্ষুর দিয়ে কামানোও নয়। এর পর কি প্রশ্ন করবো ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে গেলুম, সেও আর কোন কথা না বলে তেমনি নীরবে বসে রইল।

এই চন্দ্রালোকিত রজনীতে, তাজমহলে এসে এক জন খোজা প্রহরীর পাশে বসে আছি, এই কথাটা মনে করে তখন কেমন যেন গা-টা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠলো। আমি সেখান থেকে উঠে দূরে আর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। সেই বেঞ্চিটা ছিল কতকগুলো ঝাউগাছের ঝোপের আড়ালে। সে আমাকে উঠে যেতে দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না, শুধু তেমনি ভাবে বসে কি যেন ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমার পাশে তার উপস্থিতি অনুভব ক'রে চমকে উঠলুম। কেমন করে কখন্ নিঃশব্দে সে যে আমার পাশে এসে বসেছে জানতে পারিনি। এবার বিরক্তিভরা মুখে তার দিকে তাকাতে গিয়ে কিন্তু অবাক হলুম। এ ত সেই খোজা প্রহরী নয়—এ যে এক সুন্দরী রমণী ! চক্ষে তার বিলোল কটাক্ষ, কণ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গীতে পুরুষের হৃদয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে যায়—মাথায় কালো চুলের রাশ।

আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বললে, বাবুজি, আমি খোজা নই, আমি জেনানা !

বললুম, কিন্তু বাদশাহের হারেমে ত জেনানা প্রহরী থাকে না !

সে এইবার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক, তবে আমি জোর ক'রে খোজা সেজে আছি, কেউ জানে না যে আমি জেনানা।

এই কথা শুনে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বললুম, স্ত্রীলোকের পক্ষে খোজা কি জোর ক'রে সেজে থাকা সম্ভব!

সে উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল।

আমিও তার মত কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করলুম, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে ত বলো না।

এইবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বললে, বাবুজি, তুমি যদি কোন দিন কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, তাহ'লে বুঝতে পারতে তার জন্যে সব কিছুই করা যায় !

বললুম, তার মানে ? তুমি ত বেগমের হারেমে থাকো ?

সে বললে, হ্যাঁ, বেগমের হারেমে এই চাকরী নিয়েছি শুধু বাদশাজাদাকে চোখে দেখতে পাবো বলে।

বললুম, তুমি কি তাহ'লে বাদশাহকে ভালবাস ?

সে বললে, হ্যাঁ।

কেমন ক'রে তা সম্ভব !

সে বললে, তরুণ বাদশা যখন ঘোড়ায় চেপে আমার কুটীরের সামনে দিয়ে প্রত্যহ ভোরে বেড়াতে যেতেন, আমি তখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে জানলার পাশে বসে তাকে দেখতুম। তার পর একদিন কেমন ক'রে যে তাঁকে আমার সমস্ত প্রাণমন এই দেখার ভেতর দিয়ে সমর্পণ করেছিলুম জানি না। যে দিন থেকে তিনি সেই পথে যাওয়া বন্ধ করলেন, সেই দিন থেকে আমি অনুভব করলুম যে, তাঁকে চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না। তাই এই খোজা প্রহরী সেজে হারেমের চাকরী নিয়েছি। উঃ, সে কি যন্ত্রণা ! আমার চোখের সামনে তিনি বেগম-সাহেবার ঘরে যান তাও আমি সহ্য করি, কিন্তু তবু ওঁকে না দেখলে কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। তাই সুদীর্ঘ বারো বছর কেটে গেছে আমি এখনো এ চাকরী ছাড়তে পারিনি। এই বলে সে যেন উদ্গত অশ্রু সংবরণ করতে করতে সহসা সেখান থেকে উঠে দ্রুতপদে এক দিকে চলে গেল।

আমি বজ্রাহতের মত বসে রইলুম। সেই তাজমহল তখন আমার চোখের সামনে থেকে কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল আর তার স্থলে সেই খোজা প্রহরিণীর মূর্ত্তিটি বিলম্বিত হয়ে উঠলো সেই পাথরের ইমারতের বুকে। মৃত তাজমহল যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করলে।

সে দিন সারা রাত আমার চোখে ঘুম এলো না। মনে হ'লো, এত দিনে সার্থক হলো আমার তাজমহল দেখা।

নদীর তীরে সুন্দর তপোবন। ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষি বরুণের সাধনাক্ষেত্র। ঋষির কঠোর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বহু শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মসন্ধিৎসুকে এই পূত তপোবনে আকৃষ্ট করিয়াছে। জ্ঞান বিতরণে ঋষির এতটুকু কার্পণ্য নাই। এক দিন ঋষিশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থিগণ সহ জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত আছেন, পুত্র ভৃগু আসিয়া বলিলেন, "অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" (ভগবন, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে শিক্ষাদান করুন)। পিতা দেখিলেন, পুত্রের প্রার্থনার মূলে কোন পার্থিব কামনা নাই। অন্য কোন বিদ্যালাভের ইচ্ছা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। একেবারে পরাবিদ্যা শিক্ষালাভের সংকল্প! বংশের আদর্শ আজ পুত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহা ভাবিয়া পিতা পুত্রগৌরব অনুভব করিলেন। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে পিতা বলিলেন, বৎস, ব্রহ্ম উপদেশের বিষয় নয়। উহা গভীর অনুভূতির বিষয়। অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য এই সমুদয়ই সেই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবস্তু কি, তাহারও সঙ্কেত পুত্রকে প্রদান করিলেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি" (যাহা হইতে প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে, জন্মলাভ করিয়া যাহা দ্বারা জীবনধারণ করে, এবং প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করে বা লীন হয়, তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম, তুমি তপস্যা কর।

পুত্রের শুভানুধ্যায়ী একাধারে পিতা ও আচার্য—পুত্রকে ব্রহ্মের সংজ্ঞা উপলব্ধির উপায় ও পথনির্দেশ করিলেন। পুত্র বিশ্বসত্তার অনুভূতির জন্য তপস্যা করিতে গেলেন। দুর্বল ইচ্ছাকে তপঃ সতেজ করে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে সাময়িক সদিচ্ছার স্থায়িত্ব লাভ হয়। "আত্মবিদ্যা তপোমূলং," "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তপস্যাকে সত্যোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। "শুচৌ দেশে শুচিঃ সত্ত্বস্থঃ সদধীয়ানঃ সদ্বাদী সদ্ধ্যায়ী সদ্‌যাজী স্যাৎ"। গিরি, নদী, পুলিন এবং গুহাদি স্থানের ন্যায় পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্বক পবিত্র ও প্রসন্নচিত্ত, সদ্গ্রন্থ অধ্যয়নকারী, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, ব্রহ্মসাধনায় রত হইবেন। ইহাও সেই শ্রুতির নির্দেশ। পিতার বাক্য শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়া পুত্র শ্রুতি-নির্দেশিত স্থান ও উপায় অবলম্বনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। তপস্যার বিরাম নাই। তপস্যায় ভৃগু এই অনুভূতি লাভ করিলেন যে, রেতোবীজরূপে পরিণত অন্ন হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর নিজ নিজ জাতির উপযুক্ত অন্ন দ্বারা প্রাণধারণ করে এবং মৃত্যুকালে অন্নাত্মিকা পৃথিবীতে লীন হয়। সুতরাং অন্নই ব্রহ্ম। নব ধারণার কথা ভৃগু পিতাকে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ পিতা দেখিলেন, পুত্রের অনুভূতি জাগিয়াছে। কিন্তু উহা স্থূল অনুভূতি। পিতা পুত্রকে পুনরায় তপস্যা করিতে বলিলেন। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।"

পুনঃ পুনঃ তপ ও ধ্যান দেহ ও মনের মালিন্য দূর করে। তপস্যায় সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আসে একাগ্রতা। তপস্যায় ঋষিকুমার পুনরায় এক নব অনুভূতি লাভ করিলেন। অন্ন অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণও অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্রই আধার ও শক্তির একত্র সমাবেশ। একের অভাবে অন্যটি ক্রিয়াশীল হয় না। এই জন্য জগৎকে অগ্নিষোমাত্মক বলে। (স তপস্তপ্‌ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িং চ প্রাণং চেতি)। প্রাণশক্তি স্পন্দন দ্বারা ক্রিয়া করে। জগৎ ব্যাপারে সর্বত্রই প্রাণের এই আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হইতেছে। ঊষার মনোহারিণী জ্যোতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ব্যাপিয়া এক অপূর্ব স্পন্দন অনুভূত হয়। আদিত্যমণ্ডল হইতে সবিতার প্রাণরূপী সহস্ররশ্মি দিকসমূহ সমুজ্জ্বল করিয়া দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসে ধরাতলে। সেই প্রাণরশ্মি পানে ধন্য হয় প্রাণি-জগৎ। অপূর্ব রূপচ্ছটা ও বর্ণসুষমা বুকে লইয়া তরু, লতা ও পুষ্পরাজি বিকসিত হয়। মানব-নয়নে ফুটিয়া উঠে অপূর্ব দীপ্তি। প্রাণিদেহে প্রকাশিত হয় নূতন স্পন্দন। তপ্ত সমীরণে জাগে দুরন্ত চাঞ্চল্য। বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতেরও এই প্রাণ-স্পন্দনের সুসামঞ্জস্য রহিয়াছে। ভৃগু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাণ হইতে প্রাণীর উদ্ভব। প্রাণশক্তিতে তাহার জীবন এবং পরিশেষে প্রাণেই প্রতিগমন। অতএব প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণতত্ত্বের এই নব অনুভূতি পুত্র পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। বরুণ ভৃগুর সাধনার ক্রমোন্নতি দর্শনে প্রীত হইলেন। দেখিলেন, পুত্রের সাধনার একাগ্রতায় তাহার মধ্যে সূক্ষ্মানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। পিতার আদেশ পূর্ববৎ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্মেতি"। পুত্র আবার তপস্যায় গমন করিলেন। সূক্ষ্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আসিল গভীর তন্ময়তা। এই তন্ময়তা নব-নব তত্ত্বের পরিস্ফুটন-ভূমি। ইতস্ততঃ প্রবহমান চিন্তারাশি তপস্যার দ্বারা সূক্ষ্মানুভূতির ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত হইলে, সাধক সাধনার নব নব স্তরের সন্ধান পায়। ভৃগুর মনে হইল, কত চিন্তা না মন হইতে উদ্ভূত হইতেছে। উদ্ভূত হইয়া মনে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে এবং তৎপরে মনেই লীন হইতেছে। অতএব মনই ব্রহ্ম। নব অনুভূতির বার্তা পুত্র আবার পিতাকে নিবেদন করিলেন। পিতা বুঝিলেন, পুত্রের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। পিতা আবার ইঙ্গিত করিলেন, 'তপ কর'। পুনঃ পুনঃ তপ দ্বারা আত্মশোধন হয়। আত্মশোধনের ভিতর দিয়া অসীম শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। এই শক্তি সঞ্চয়ে সাধক অন্তর্মুখী হয় ও বীর্যবত্তর অনুভূতি লাভ করিতে থাকে। দেহরাজ্য, প্রাণরাজ্য ও মনোরাজ্য জয়ে সাধক সাধনার ঊর্ধ্বগতিতে আর এক নব রাজ্যের সন্ধান পাইলেন। ইহা বিজ্ঞানরাজ্য। প্রাণের পশ্চাতে মন এবং মনের পশ্চাতে আর এক মহাশক্তি। ইহা নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানশক্তি। এই বিজ্ঞানময় রাজ্যে আসিয়া সাধক এই জ্ঞান শক্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখম্"। সত্যের মুখে আপাত মনোরম হিরণ্ময় আবরণ দেখিয়া তাহাকে সত্য ভাবিয়া তাপস বিভ্রান্ত হয়। আবার পিতার নিকট নিবেদন। আবার পিতার পূর্ববৎ ইঙ্গিত। "তপঃ ব্রহ্মেতি"। আবার কঠোর তপস্যা। এবার অনুভূতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাপস আনন্দের আতিশয্যে বজ্রদৃঢ় স্বরে ঘোষণা করিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" সর্বত্রই আনন্দ।

আনন্দ-তরুতে বসি, পাখী গায় আনন্দের গান
আনন্দের ফুল দোলে, বয়ে যায় আনন্দ-তুফান।

উপনিষদ্ এই আনন্দের জয়গানে ভরপুর। "যুবা স্যাৎ সাধু যুবাঽধ্যায়ক আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স এক মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স এক মনুষ্যগন্ধর্বানামানন্দঃ"। ইত্যাদি। রূপ, যৌবন, চরিত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃঢ় বলবান শরীর, এবং সম্পদ ও ভোগোপকরণ-পরিপূর্ণ সমগ্র

ধরণীর একচ্ছত্রত্ব লাভ মানবের কামা, শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। এরূপ শতগুণবর্দ্ধিত আনন্দ এক মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ। শত গন্ধর্ব্বের একীভূত আনন্দ এক দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দের সমতুল। এরূপ শতক্রম-বর্দ্ধনশীল পিতৃগণের, দেবতাগণের, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভের আনন্দ। কিন্তু সকল আনন্দের আধার সেই ব্রহ্মানন্দ, সেই ভূমানন্দ। যেখানে সর্ব্বপ্রকার আনন্দের পরিসমাপ্তি, সেই নিত্য বিজ্ঞানানন্দই ব্রহ্ম সংখ্যা, কাল ও সীমার দ্বারা পরিমাপক ও পরিচ্ছিন্ন হয় না। উহা অনন্ত ও অপার।

তাঁহাকে জানিলে জীব হয় মৃত্যু-পার।
অয়নের তরে অন্য পন্থা নাহি আর॥

*   *   *

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ভৃগুর তপস্যা একটি সহজ সাধনার ইতিহাস। অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রিলোকের আধিপত্য লাভের জন্য বা কোন দেবতার যজ্ঞভাগ ও অধিকার হরণের জন্য এ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিভূতি লাভ বা ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি মারণাস্ত্র লাভ এ তপস্যার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য আশ্রম-পটভূমিকায় কোন শঙ্কিত দেবতার প্রেরিত কোন প্রলোভনময়ী রূপজীবিনীর আবির্ভাব হয় নাই। কোন অলৌকিক ঘটনার নাটকীয় ঘাত ও প্রতিঘাতে সাধনার রহস্য গভীর হইতে গভীরতর হয় নাই। ইহা সহজ মানুষের সরল সাধনার ইতিহাস। আত্মবিকাশের আত্মোপলব্ধের ইতিহাস। পিতার নিকট পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা নিবেদন করিলেন। পিতা সেই সাধনার সহজ পথ নির্দ্দেশ করিলেন। অন্ন, প্রাণ, শ্রোত্র, মন ও বাক্য সেই সাধনার দ্বারস্বরূপ। কেন, জবাল প্রভৃতি উপনিষদের স্বস্তিবচনে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে! "ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং" (আমার অঙ্গসমূহ, বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সর্ব্ব উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্ম অনুভূতিযোগ্য করিয়া গঠন করিতে হইবে। "পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।" ইহাও সেই শ্রুতির অনুশাসন। পিতার আশীর্ব্বাদ, গুরুর উপদেশ সম্বল করিয়া পুত্র ও শিষ্য সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন। তপস্যায় ক্রমশঃ অনুভূতি জাগিতে লাগিল। স্থূল হইতে সাধনার একাগ্রতায় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরের অনুভূতি আসিতে লাগিল। এই সাধনার কালে সাধক যখন নিজের ক্ষমতার রিক্ততা অনুভব করিয়াছে, তখনই ব্রহ্মিষ্ঠ গুরুর একটি উপদেশ, একটি ইঙ্গিত ও একটি স্পর্শ শিষ্যের শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নব শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। পাইয়াছে সত্যের নব নব তত্ত্ব! সন্ধান পাইয়াছে কোশের পর কোশ অতিক্রম করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল, আলোড়ন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের আদি উৎস সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ঈপ্সিত মহাবস্তুর।

একটি বিকাল

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

সারা দিন খাটুনির পর উঠানের একটি ভাঙা চেয়ারে হেলান দিয়ে বৈকালিক আমেজটুকু উপভোগ করছিলাম। বাড়ীর ভেতরে চলছিল বুড়ো চাকর রমজানের সাথে অর্দ্ধাঙ্গিনীর বচসা। সেটাও আমার আত্মপ্রসাদের মস্ত-বড় মাল-মশলা। কারণ, রমজান অলকার বাপের বাড়ীর চাকর, অলকাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে সে। তাই অলকার গিন্নীপণা তার যেমন অসহ্য—আবার অন্য দিকে রমজানের কর্ত্তৃত্বও অলকার তেমনি বিসদৃশ। কেউ কারো তোয়াক্কাও করে না, অথচ একের বিহনে অন্যের চলাও মুস্কিল!

খোটার দেশ, নেহাৎ চাকরীর জন্য টিকে থাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বৈচিত্র্য একটি মুহূর্ত্তেও নেই, যন্ত্রচালিতের মত পার হয়ে যায় একটির পর একটি শনিবার, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও পড়ে যায় লাল কালির দাগ।

পাশের বাড়ীর এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের হিন্দুস্থানী চাকর হাতে খৈনী টিপ্‌তে টিপ্‌তে পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করছিল, সেটাও কাণে এসে উপস্থিত মন্দ শোনাচ্ছিল না। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, ভিজে-মাটীর সোঁদা গন্ধটুকু মনের মাঝে এনে দিচ্ছিলো ঘুমের নেশা, সামনের বাগানে ফুলগুলি এখনও জলে টলমল করছিল, বিরহ-বিধুর আঁখির মত আর বুড়ো অশ্বত্থগাছটা কুকুরকে ঠেকছিলো ঠিক বাঁধানো-দাঁতের হাসির মত। খেয়ালী মনের এত-গুলো খোরাক পেটুকের মত আত্মসাৎ করছি, হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে ভেসে গেল একরাশ ধবধবে মেঘ যেন ব্যাধতাড়িত হংস-বলাকা উড়ে পালাল, ভয়ে ক্রোধে ফুলতে ফুলতে।

পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো চুরমার হয়ে গিয়ে মনের মাঝে এনে দিলে বহু কালের কতকগুলো দূরস্মৃত মরিচাধরা কাহিনী। সেই কবে বর্ষার দিনে পাঠশালার পড়া ভুলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মিনটু আর আমি লুকোচুরি খেলেছি, মাথায় বাজ-পড়ার ভয়ে মিনটুর কাঁচা মুখখানি যখন আরও রাঙা হয়ে উঠতো, তখন সাহস পেয়েছে শুধু আমার মুখ চেয়ে। মনে পড়ে, এক দিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলো, মিনটু তখনও বাড়ীতে নেই দেখে সকলকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলাম বাড়ী-ফাটানো চীৎকারে, তার পর বুড়ো-শিবতলা থেকে ছুটে ছুটে—কত মাঠ বাঁশবন পার হয়ে তালপুকুরের গায়ে এসে দেখি, একটা হেলানো খেজুর গাছের তলায় বসে বসে মিনটু ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে। আমায় দেখে তার মুখে ফুটে উঠলো হাসির বিজলী, ঝাঁপ দিয়ে আমার কোলে চড়ে বলেছিলো, "তুমি কি করে এলে রতুদা? তোমার ভয় করে না? দেখছ না, মেঘগুলো সব ছুটে ছুটে আমাদের দিকেই আসছে।"

সে দিন মেঘ আমার কাছে এসেছিলো কিম্বা মিনটুকে অতি নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু এর পর বছর কয়েক বর্ষার দিনে মেঘের খেলা আমার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্তরকে পীড়া দিয়েছিলো কঠিন ভাবে। অনেক দিন পরে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে

লেখা মিনটুর এক টুকরো চিঠি পেয়েছিলুম,—"রতুদা, তুমি ম্যাটরিক পাশ করেছ শুনে খুব খুসী হয়েছি।"

ভালোবাসার তর্জ্জমা দিয়ে মিনটুকে প্রকাশ করা যায় না, সে পাঠশালার কচি মেয়ে, ঘ্রাণবিহীন সদ্যোজাত কুঁড়ি, ভ্রমরের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবু হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের বিনিময় যে হয়েছিলো এটা জানি, তাই বর্ষার ভেজা আমেজটা আমার চিরকালই লাগে মধুর—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও মোচড় দিয়ে ওঠে বেদনার কুণ্ডলী পাকিয়ে।

এর বছর চারেক পরে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে আর এক বর্ষায় দেশে গিয়েছিলুম মাসখানেকের জন্য। সে-বার মিনটুকে বেশ বড়-সড়ই দেখেছিলাম। আমাকে তখনও ভোলেনি, তবে পাড়ার চোখে আমার সান্নিধ্য তার পক্ষে আজ-কাল আর মোটেই নিরাপদ নয়, তাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ে ওর দেহ, আমার সহস্র যুক্তি ফিরে আসে পরাজয়ের পতাকা বহন করে। ভেবেছিলাম, ছেলেবেলার সে মিনটু আর নেই, হয়তো বা মনটাকে বদলে ফেলেছে, কিন্তু এ ভুল ভাঙলো আমার ওখান থেকে চলে আসার দিন। সমস্ত দিনটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার পর লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে আমার কাছে এসে বলেছিলো, "রতুদা, এতো শীগ্‌গির যে চলে যায় তার না আসাই ভালো।" সে দিন তার বেদনার একটা কিছু পালিশ-করা প্রলেপ হয়তো দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারি, কত দিনের পুঞ্জীভূত ভালোবাসার পুষ্পাঞ্জলি সে সাজিয়ে রেখেছিলো আমার জন্য আর কত বড় বুক-ভরা অভিমান আর ব্যথা প্রকাশ পেয়েছিলো তার ওই ছোট কথাটিকে কেন্দ্র করে। তাই আজও বর্ষার প্রতিটি জলের ধারার মাঝে দিব্যচক্ষে দেখতে পাই, মিনটুর বিদায়-বেলার ছল-ছলে চোখ দু'টি।

আমার বর্ত্তমান বিবাহিত এবং পুরোদস্তর সাংসারিক জীবনের মাঝে মিনটুর প্রসঙ্গটা হয়ে যায় নেহাৎ খাপছাড়া, তবু জাগতিক আদান-প্রদানের আড়ম্বরবাহুল্যে সব-কিছুকে এড়িয়ে চললেও অন্তরের নিভৃততম স্তরে যে গোপন ভালোবাসাটুকু লুকিয়ে থাকে, তাকে স্মৃতির কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটু কঠিন। নীরস হাব-ভাব দেখিয়ে প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চে শুধু নিয়মের মোড়কে বাঁধা নিছক অভিনয় করা খুবই সহজ, কিন্তু আত্মীয়তার কোমল তন্ত্রীগুলো যেখানে মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর হয়ে বাঁধা হয়ে যায়, সেখানে ইচ্ছা করলেই তাকে বেসুরো করা যায় না। তাই বিগত দীর্ঘ জীবনের চঞ্চল মরীচিকায় নিরাশ হয়ে যখন মুসড়ে পড়েছি, তখনও বুকের মাঝে দোলা দিয়েছে মিনটুর প্রাণভরা আবেগের গভীর পরশ। তার পর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যখন শুধু অতীতকে সম্বল করে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্য ভারতের অন্য প্রান্তে চলে এলাম, তারও মাঝে সুখের স্বপন দেখছি শুধু মিনটুর সেই চির-চেনা মুখখানি কল্পনা করে।

চিন্তাস্রোতটা বাধা পড়ে গেল আমার সাত বছরের খোকা স্বপনের গলা শুনে। বেচারা বোধ হয় সমস্ত দিন স্কুলে আটক থাকার ক্ষুব্ধ অভিমানটাকে জাহির করছিল মায়ের সাথে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়ে, হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ মুখে বাইরে এসে আমায় বলে, "বাবা, তোমায় গুলী করবো।" মন্তব্যটিতে বেশ একটু হক্‌চকিয়ে গেলাম, মুখ তুলে দেখি, বাবাজীর হাতে একটি জাপানী ছোট খেলার বন্দুক। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "এখন গুলী-গোলা থাক বাবা, আরও একটু বড় হও, তার পর ও-সব করো।" পলকের মধ্যে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল সামনের বাগানে, তার নিজের হাতে-রোয়া মালতী গাছটার তদারক করতে।

রমজান এক পেয়ালা চা দিয়ে গেল, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে গরম চায়ের মিলটা রাজযোটক বলেই মনে হল। ওপরে সাদা ওড়না-গায়ে মেঘের অভিসার ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝখানে ফুটে উঠেছে নীল আকাশের স্বচ্ছ চাঁদোয়া। মুখ ফিরিয়ে দেখি, রমজান অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে; ভাবলাম, হয়তো বা হতভাগা চাকর অলকার কাছে কতকগুলো মিঠে-কড়া বিশেষণ লাভ করে আমার কাছে তারই নালিশ জানাতে এসেছে—যেমন মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন হয়। কড়া সুরে বললাম, "কি রে, কি বলছিস্?"

মুখখানা পাংশু করে—কাকুতি জানিয়ে বললে, "বাবু, ভুলে গেছি।"

"ভুলে গেছি কি রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।"

ভূমিকার আতিশয্যে আমার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, জোর-গলায় বললাম, "বেরো এখান থেকে।"

ধীরপদে ঘরের মধ্যে চলে গেল। নিজের কর্কশতার জন্য দুঃখিতও হলাম, লোকটা বোকা হলেও অতিরিক্ত সরল আর ততোধিক অমায়িক। খানিক পরে সন্ত্রস্ত হাতে একখানা রঙীন খামের চিঠি সামনের টিপয়ে রেখে দিয়ে গেল। সে যে কি ভুলে গিয়েছিলো তা বুঝলাম এতক্ষণে। আফিস থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই চিঠিখানা হাতে তুলে দিয়ে মনিবের কর্ম্মক্লান্ত মনটাকে খুসী করতে না পারার জন্য তার এই গভীর অনুতাপ।

চিঠিখানা লিখেছে লতিকা। কলেজের হাল্‌কা দিনগুলির মাঝে যখন দুনিয়াটাকে দেখেছিলাম রঙীন চোখে, সেই সময় আলাপ হয়েছিল এই 'আপটু-ডেট' মেয়েটির সাথে। প্রথম জানাশোনার হালকা বাতাসে, আমার মানসিক দুর্ব্বলতাটুকু লতিকার আধুনিক উঁচু আবহাওয়ার দরজায় কি ভাবে এবং কতটুকু প্রবেশ-পথ করে নিয়েছিল তা জানি না, কিন্তু পাউডার-ঘষা মুখখানার সাথে হাই-হিল'এর সামঞ্জস্য আমারও মনে ধরিয়ে দিয়েছিলো চমক, হয়তো মিনটুর স্মৃতিটা মনের মাঝে চুণ-সুরকি দিয়ে গাঁথা না থাকলে ভবিষ্যৎটা হয়ে দাঁড়াতো আরও জটিল। এখনও মাঝে মাঝে পত্রালাপ করে, ভাষাটা বিরহিণীর হা-হুতাশ-ভরা ভাঙা ভাঙা দরদ মাখানো কথার টুক্‌রো। ভাগ্যক্রমে অলকার হাতে চিঠিখানা পড়েনি, তাহলে আমার বাড়ীতেও আরম্ভ হত নতুন ক'রে মাথুর-লীলা।

চিঠিখানা খুলে দেখি, আমার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লতিকার ধারণা খুবই উঁচু, এমন কি, আমার তরফ থেকে সাহেব বনে যাওয়ার কথা। আর বাংলা ভুলে যাওয়ার বিভীষিকা তার মনে এসে গেছে ঠিক একটা সন্দেহের নির্ব্বাণোন্মুখ ফুলকির মত।

আবার মনে পড়ে গেল মিন্‌টুকে। আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা ছিল সম্পূর্ণ উলটো। সে জানতো যে, মাতৃভাষাই ছিল আমাদের ধ্যান, ধারণা, তপস্যা এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মিনটু এটাও টের পেয়েছিলো যে, জীবনের জোয়ার-ভাঁটায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেও বাংলা ভাষা থেকে যাবে আমার অস্থিমজ্জার সাথে মিতালী পাতিয়ে একত্রীভূত হয়ে।

জন্মভূমির ওপরেও তেমনি ছিল আমার একটা অবিচ্ছিন্ন দরদ। সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মায়ের চিন্ময় মূর্ত্তিটি কে যেন আমার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত অক্ষরে রেখেছে খোদাই করে। সেই মন-ভুলানো ভাষা আর প্রাণ-মাতানো গান আজও আমার কর্ণরন্ধ্রে অনুরাগভরে দোলা দিয়ে যায় বসন্তের দক্ষিণ বাতাসের মত। তাই নকলী ভাষা আর নকলী পোষাকের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাপড়া করতে হলেও এ দোকানদারীর ঠাট আমার মনটাকে দেয় বিষিয়ে। ঢের ভাল সেই বাংলার উদার মাঠে নগ্নদেহে ভিজে মাটীর ওপর "আধো আলো আধো ছায়াতে" চাঁদের প্রতীক্ষা। কম্মের তাড়নে উন্মত্ত হয়ে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে স্বর্গে বাস করার চেয়েও ঢের ভাল সেই পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়ার বাতাস, অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় তাদের কুটিল মনোভাব। ঝরা বকুল, ফোটা পদ্ম, কোকিলের কুহুলো আর উৎসবের মাধুর্য্য যেখানে জীবন্ত, থাক না সেখানে কুটিল মনোভাব, তবু 'ডাল-রুটী'র উৎকট আবহাওয়া সেখানের ভিজে মাটাতেও প্রবেশ-পথ না পেয়ে ফিরে আসে পরাজয়ের গ্লানিটাকেই মুকুটের মত মাথায় চড়িয়ে।

ধৈর্য্যসহকারে চিঠিখানা শেষ করলাম। শেষের দিকে লিখেছে, 'মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যদি কোনখানে আমার চিহ্ন খুঁজে পাও, তাহলে উত্তরটা দিও।' এমনিই তার ভাষা, এমন কি, চালচলনটাও এমনি হেঁয়ালিতে ভরা। মিনটুর সাথে লতিকার সবচেয়ে বড় অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছিলো এইখানটাতেই। তাই লতিকাকে চিঠির জবাব দিতে হয় ভদ্রতারক্ষার দোহাই দিয়ে, কিন্তু মিনটুর হাসিটি সময়ে অসময়ে বুকের মাঝে জেগে ওঠে অমানিশার বিজলীর মত। দূরে থাকার বিষাদময় মরীচিকায় প্রাণটা যখন ডুকরে ওঠে শুধু সেই হাসিটিকে কেন্দ্র করে, তখন সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে, পরিবর্ত্তনশীল জগতে বৈচিত্র্যই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণতার দিকে। সংসারের সাবলীল গতির মধ্যে অলস ভাবে গা ঢেলে দিলে ক্ষণিক আনন্দ মনকে বিভোর করে তোলে বটে, কিন্তু সেটা হয়ে যায় গতানুগতিক। তাই মিনটুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার করুণ সুরের মূর্চ্ছনায় আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে নিরন্তর বিষিয়ে তুললেও শুধু একটা চিন্তা আমার এই পরিণতবয়স্ক দোদুল্যমান অন্তরে আনন্দের রেখা জাগিয়ে তোলে যে, আমিও হয়তো তার কলিজার ফাঁকে ফাঁকে দু'-একটা আঁচড় কেটেছিলাম। বর্ষার সরস-মধুর আবহাওয়ায় আমার স্মৃতিটুকু তার মনকে করে তুলবে তাজা, ঠিক টাটকা ফুলের মত।

অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, আমার বড় মেয়ে মালতীকে ঠেলতে ঠেলতে অলকা এই দিকেই তাকে নিয়ে আসছে। মালতীর অন্ততঃ আর মার-ধোর খাবার বয়সটা নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে উদ্যতফণা ফণিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিলাম। অলকা রাগে মুখখানার রঙ আরও একটু টক্‌টকে করে বললে, "তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর পরকালটা গেলে, কিন্তু লোকে যে যাচ্ছেতাই করছে, সেটা কি কাণে যায় না ?"

একটা অদ্ভুত কিছু আশঙ্কা করে চোখ দু'টো বুজে ফেললাম।

—"এতো বড় মেয়ে, এখনও দিঙ্গিপণা করে ছোক্‌রা-মহলে খেলাধূলা, গান-বাজনা করে বেড়ান, শুধু কি তাই ? আবার অভিনেত্রী, সভানেত্রী কতো কি! তাতেও আমি কিছু বলিনি, কিন্তু এবার লোকের মুখে কি চাপা দেবে দাও।"

মালতীর আধুনিক চালচাল অলকা বরদাস্ত করতে পারে না। ভাবলাম, তারই একটা জ্বলন্ত আক্রোশ কোন একটা সামান্য খুঁতকে কেন্দ্র করে প্রকাশ হতে চাইছে। গলায় জোর দিয়ে বললাম, "এতো হাঙ্গামা করছো কেন, কি হয়েছে ?"

অলকার রাগের আগুনে ঘিএর পরিবেশন হয়ে গেল,—"কি হয়েছে, তা তোমার ঐ গুণবতীকেই জিজ্ঞেসা কর।"

মালতীর মুখখানা গম্ভীর, চোখ দু'টো থেকে বার হতে চাইছে নালিশের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ। অপরাধ সম্বন্ধে সেও বোধ হয় অলকার মত এতোটা সজাগ নয় বলেই মনে হয়, তবু অলকার ভয়ে সে নির্ব্বাক্ দাঁড়িয়ে রইলো কাঠের পুতুলের মত।

অলকা বার-দুই মেয়ের পানে আড়চোখে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "এই যে ও-পাড়ার সুধীরের সঙ্গে এমন মেলামেশা, রাত নেই, দিন নেই, ওর না হয় লজ্জা-ঘেন্না সবই গেছে, কিন্তু পাশের বাড়ীর সরকার-গিন্নী কি বলেছে জান তো ? বলে,—'এবার ওদের দু'জনের'—"

সরকার-গিন্নীর মন্তব্য শোনবার মত ধৈর্য্য আমার আর নেই। এই কুৎসিত আলোচনাটার পরিসমাপ্তি ঘটলেই যেন হাঁফ ছাড়ি। তাছাড়া আজকালকার মেলামেশাটা এমন কিছু জীবন-মরণ সমস্যাও নয়। বাধা দিয়ে বললাম, "থাক্, এখন ছেড়ে দাও ও-সব কথা। তুমি ভেতরে যাও, আমি ওকে সাবধান করে দেব'খন।"

অলকা দুম্-দুম্ করে পা ফেলে ভেতরে যাবামাত্র মালতী স্পষ্ট গলায় বললে, "আমি সুধীরদা'কে ভালোবেসেছি বাবা, এমন কিছু অন্যায় তো করিনি।"

সর্ব্বনাশ! আমি প্রমাদ গণলাম। শৈশবের যে ধাক্কা আমি আজ এই শেষ জীবনে গিলিত-চর্ব্বণ করে আরাম অনুভব করছি, ও মেয়েও আমার সেই পথের যাত্রী! আমি নিরুত্তর।

> "যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।...যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয় ? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে ?—বঙ্কিমচন্দ্র

ভারতের শিল্প-প্রগতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল শিল্প প্রবর্দ্ধন ও সমুন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। অর্থনীতি রাজনীতির একটি বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্ট অঙ্গ। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশেই অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে। পরাধীন দেশে অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির বশীভূত; এবং যে দেশে পর-পরিচালিত রাজনীতি রাজশক্তির বিশিষ্ট অথবা স্বতন্ত্র স্বার্থ সাধনার্থ যত কূটমার্গ অবলম্বন করে, সেই পরাধীন দেশে শিল্প-প্রবর্দ্ধন ও সমুন্নয়নের মাধ্যমে (medium) অর্থনৈতিক উন্নতি তত প্রতিহত হয়। এই নিমিত্ত পরাধীন ভারতে শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বহু বৎসরব্যাপী শিল্প-প্রবর্দ্ধন ও সমুন্নয়ন-প্রচেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হইতেছে।

নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা-পূর্ণ বহু বৎসরব্যাপী প্রচেষ্টা এবং তীব্র ক্লেশকর সাধনার ফলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবী আজ সমগ্র জগতের মতে অবিসংবাদিত। কিন্তু ভারতের শাসন-প্রণালী যে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, সে শক্তি দুর্ভাগ্য ভারতকে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কারণ, ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে। পরন্তু, বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের সর্ব্বপ্রকার আর্থিক ও কায়িক সাহায্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব এত অধিক যে, মিত্রশক্তির উচ্চ-বিঘোষিত যুদ্ধের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ভারতের নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীকে আর অধিক দিন প্রতিহত করিয়া রাখা সুদুষ্কর।

কিন্তু স্বার্থ চিরদিন পরার্থ অপেক্ষা প্রবল; সুতরাং শাসন-শক্তির পক্ষে এই কঠিন সমস্যার সমাধান সাধনার্থ কূট কৌশলের আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই হেতু দুর্ভাগা ভারতের প্রতি চির-বিমুখ সাম্রাজ্য-নীতি-প্রমত্ত চার্চ্চিল-শাসিত বৃটিশ শাসন-শক্তি ভারতের নব-নিযুক্ত সৈনিক বড়লাট ওয়াভেলের মারফতে ভারতের প্রতি কূট কৌশল প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভারতের প্রতি নব-প্রযুক্ত কূট নীতি এই যে, শিল্প-সম্বর্দ্ধন ও সমুন্নয়নের অছিলায় ভারতের তীব্র আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্নকে প্রতিহত না হউক, সুদূরপরাহত করিতে হইবে। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গ বণিক্-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড ওয়াভেল তাঁহার অভিভাষণে সেই নীতি দৃঢ় করিয়াছেন। গত বর্ষে ঐ সঙ্ঘ-বার্ষিকে তিনি তাঁহার বড়লাটরূপে প্রথম প্রকাশ্য অভিভাষণে এই নব নীতি—সূচনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রসভার যুগ্ম অধিবেশনে তাহা বিশদ করিয়াছিলেন। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাদিগকে সে পরিচয় যথাসময়ে পূর্ব্বেই দিয়াছি।

সম্প্রতি ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ক্যাক্‌সটন হলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক সভায় ভারত-সচিব মিঃ আমেরী এই নীতির প্রতিধ্বনি করিয়া একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ শাসনশক্তি এবং বৃটিশ শিল্পপতিগণের ঐকান্তিক বাসনা যে, ভারত যথাসম্ভব শীঘ্র চরম শিল্পোন্নতি লাভ করুক। বৃটিশ শিল্পপতিগণ আদৌ মনে করেন না যে, ভারতে শিল্পে অনুন্নতির ফলে বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্য সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু অতীতের ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠ গরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া কিরূপে অপঘাত মৃত্যুলাভ করিয়াছিল এবং ভূরি ভূরি ভারতীয় কাঁচা মাল অতি স্বল্প মূল্যে বিলাতে রপ্তানী হইয়া বৃটিশ শিল্পগুলিকে হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়াছিল, বহু বৃটিশ ইতিহাস-লেখকও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকাই মসলিন আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে। মিঃ আমেরী এই প্রসঙ্গে একটি অতি রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে বৃটিশ-পণ্যের বিক্রয়বৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতীয় শিল্পকে পঙ্গু করা হইয়াছে! এই ভ্রান্ত ধারণার মূল কারণ এই যে, গত শতাব্দীতে বৃটেন অবাধ বাণিজ্যের মোহে এরূপ বিমুগ্ধ ছিল যে, সে মনে করিত, অবাধ বাণিজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং শুভকর। যাহা হউক, পরে নিজেদের দেশে অবাধ বাণিজ্য প্রবল রাখিয়া বৃটিশ শাসনশক্তি ভারতে শিল্পসংরক্ষণ নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন। এখন বৃটিশ শিল্পপতিমাত্রেরই শুভ ইচ্ছা এই যে, ভারতে চরম শিল্পোন্নতি ঘটুক, তাহাতে তাঁহাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। বৃটিশ শিল্পপতিগণের অভিমত এই যে, ভারতের যত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ভারতবাসী সাধারণ ক্রেতাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং ভারতের কল-কারখানার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য ভারতকে ততই বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে; অর্থাৎ বিলাতী দ্রব্যাদির ভারতে কাট্‌তির পরিমাণ তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। তবে বিলাতের শিল্প-পতিগণের মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা ইতঃপূর্ব্বে ভারতে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়াছে, ভবিষ্যতে ভারত ঠিক ঠিক সেই সকল দ্রব্যাদি কিনিবে না; সুতরাং ভারতের নিত্য নব প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলে, ভারতে বৃটিশ বাণিজ্যের সুবিধার অভাব ঘটিবে না; এমন কি বৃটিশ ও ভারতীয় শিল্পরথিগণের মধ্যে সহযোগ-সাহচর্য্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বৃটিশ শিল্পপতিগণের এই শুভবুদ্ধি কি পূর্ব্বে ছিল না? অথবা প্রয়োজনের অভাবে উদ্বুদ্ধ হয় নাই? এখন পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে প্রয়োজনের তাগিদে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধির এই বর্ত্তমান শুভেচ্ছার পশ্চাতে কি কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত নাই? পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে যুদ্ধপরিচালনার্থ ভারতে বহু সামরিক ও অ-সামরিক শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য হইয়াছে। এই প্রয়োজনের সুযোগে ভারতের প্রবল শিল্প-প্রবর্দ্ধন এষণার প্রশ্রয় দিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত ও সুদূরপরাহত করিবার প্রচেষ্টা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ যেমন দুঃসাধ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভও তেমন দুষ্কর। উভয় ক্ষেত্রেই বৃটিশ শাসনশক্তি তাহার বহুদিনার্জ্জিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কোনক্রমে খর্ব্ব করিতে ইচ্ছুক নহে। তবে ঘটনাচক্রে এবং দুঃসময়ে অপরিহার্য্য প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প-সম্বর্দ্ধন-সমুৎসুক ভারতবাসীকে শিল্প-সমুন্নয়ন প্রচেষ্টায় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া, ভারতবাসীর তদপেক্ষা বহু গুণে গুরুতর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব এবং যত দিন সম্ভব ব্যাহত করিবার সঙ্কল্পই বৃটিশ কূটনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারতের কোন স্বাধীনতা নাই; সুতরাং অপরিহার্য্য প্রয়োজনের তাগিদে বৃটিশ কূটনীতিপ্রদত্ত শিল্প-সম্বর্দ্ধন ও সমুন্নয়ন প্রশ্রয়ে আমরা কতটুকু স্বার্থ সাধন করিতে পারিয়াছি এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে পারিব, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাজনীতির মোহজালে নিবিষ্ট-চিত্ত ভারতবাসীকে মোহবিমুক্ত করিয়া শাসনশক্তির পক্ষে তদপেক্ষা কম অনিষ্টকর তাহার শিল্প-সম্বর্দ্ধন ও সমুন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষাকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিবার প্রলোভনে তাহাকে যথাসাধ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেল তাঁহার দ্বিতীয় অভিভাষণে কয়েক জন ভারতীয় শিল্পরথীকে বিলাতে যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচয় লাভ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ জানাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী বাঙ্গালার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার-প্রমুখ কয়েক জন নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং অচিরে তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিবেন। ইতিমধ্যে কয়েক জন সুবিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিলাতে ও আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহারা তথাকার ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তথাকার সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। ভারতের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও প্রগতির সহিত বৃটিশ ও মার্কিণ বৈজ্ঞানিকদিগকে পরিচিত করিয়া উভয়ের সমন্বয়ে ভারতের কল্যাণজনক নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তনের উপায় অবলম্বন করিবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য, রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারী, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ, ভি, হিল ভারতের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অনুষ্ঠানের বর্ত্তমান প্রগতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুমোদনে এবং আগ্রহাতিশয্যে ভারত সরকার ভারতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে বিলাতে ও মার্কিণে যাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘের নেতা ভারত সরকারের শিল্প-উপদেষ্টা স্যার শান্তিস্বরূপ ভটনাগর এবং বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ডাঃ মেঘনাদ সাহা, বাঙ্গালোর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ জে, এন, মুখার্জ্জি ও ডাঃ এস কে, মিত্র ইহার অন্যতম সভ্য। কয়েক মাস ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া অধ্যাপক হিল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারতকে প্রভূতরূপে শিল্পাশ্রয়ী করিতে হইবে। তন্নিমিত্ত উন্নততর রাজপথ, রেলপথ, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ও অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা এবং সার সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে আর সুলভে অধিকতর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ডাঃ মেঘনাদ সাহাও সম্প্রতি বিলাতে এক অভিভাষণে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে প্রভূত পরিমাণে শিল্প-সম্বর্দ্ধন ও শিল্প-সমুন্নয়ন ব্যতীত দুঃস্থ ও নিঃস্ব ভারতবাসীর জীবনযাত্রার ধারা কখনই উন্নত হইতে পারে না।

যুদ্ধ-পূর্ব্বে যে সকল জাতি শিল্পে অনুন্নত ছিল, যুদ্ধকালে তাহারা কিছু কিছু শিল্পোন্নতি সাধন করিয়াছে; এবং যুদ্ধান্তে তাহারা অধিকতর পরিমাণে বহুবিধ শিল্পে সমুন্নতি লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু পাশ্চাত্যের শিল্পে সমুন্নত প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তিগুলির একান্তই তাহা অভিপ্রেত নহে। মুখে তাহারা যত মধুর বাণীই নিঃসরণ করুক না কেন, অন্তরে তাহাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণ-মূলক বিষের ছুরি লুক্কায়িত। যুদ্ধ-পূর্ব্বে যে সকল দেশ তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল যোগাইত, তাহাদের অভিপ্রায়, যুদ্ধান্তেও যেন তাহাই করে; নতুবা তাহাদের দেশের শিল্পের সমূহ ক্ষতি সুনিশ্চিত। এই নিমিত্ত এখন হইতেই নানা অছিলায় নানা বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের সমারোহ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকায় নিউইয়র্কের নিকট রাই সহরে একটি বে-সরকারী আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার-বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠক আমেরিকার চারিটি অতি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বে-সরকারী ভারতীয় বণিক ও শিল্পিসঙ্ঘ হইতে ছয় জন প্রতিনিধি কয়েক জন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার সহিত উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়গুলি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিবেচিত হইবে। ইতিমধ্যে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুদ্ধান্তে মার্কিণ ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতম ভাবে কার-কারবারে লিপ্ত হইতে আন্তরিক ভাবে প্রযত্নশীল। মন্দভাগ্য মহাচীনের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভারতভূমিও বিশাল, বিরাট ও বিচিত্র দেশ। যেমন জনসংখ্যায়, তেমনি শিল্প-সম্পদে ইহারা সমৃদ্ধ; অথচ ইহাদের ন্যায় শিল্পে অনুন্নতি-হেতু বিপুল বিদেশী পণ্য-ক্রেতা জগতে আর তৃতীয় নাই। আফ্রিকা মহাদেশের ন্যায় এই উভয় দেশকেও করায়ত্ত করিতে জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ জাতি সর্ব্বদা বদ্ধ-পরিকর। রাষ্ট্রিক অধিকার না হউক, ইহাদের বিপুল জনমণ্ডলীর বিশাল ক্রয়শক্তিকে আয়ত্ত করিবার প্রলোভন সর্ব্বজাতির পক্ষে অতি তীব্র। তাহারই শলা-পরামর্শ সর্ব্ববিধ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কার-কারবার-বৈঠকে বাঙ্গালা হইতে শ্রীযুত গগনবিহারী মেটা গিয়াছিলেন; কিন্তু কোন বাঙ্গালী সদস্যকে নির্ব্বাচিত করা হয় নাই। মিঃ মেটা বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীর গৌরব কেহ রক্ষা করেন নাই। যদিও বিগত মহাযুদ্ধ কালে এবং তাহার অবসানে আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ও মধ্যম শিল্পে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা শিল্পে সমুন্নত পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে প্রচুর পরিমাণে অতি সুলভ মূল্যে কাঁচা মাল যোগাইতেছিলাম। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আমরা যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। শাসন-শক্তির জাতীয় স্বার্থ-দুষ্ট ঔদাস্য এবং স্বদেশবাসীর চির আরামপ্রিয় আত্মঘাতী শৈথিল্যই ইহার মূল কারণ। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতের তীব্র ও তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা সরকার ও জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া শিল্প-সমুৎসুক ব্যক্তিবর্গের মগ্ন চৈতন্যকে কঠিন ও কঠোর ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বার্থ এবং পরদেশী শাসন-শক্তির স্বার্থ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বিরোধ এইখানে— এই পরস্পরের জাতীয় স্বার্থ-সংঘর্ষে। তথাপি উভয় সম্প্রদায়ই মনে-প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও গুরু লঘু সর্ব্ববিধ শিল্পে সমুন্নত এবং যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিতে না পারিলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল নাই।

শাসন-শক্তির প্রবল কায়েমী জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম পরিচালনা এবং বহুবিধ বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু ক্ষুদ্র এবং মধ্যম শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছি। প্রয়োজনের তাগিদে সরকারও যথাসম্ভব অর্থ-সামর্থ্য সাহায্য করিতেছেন এবং কয়েকটি মূল ও স্থূল শিল্প-প্রতিষ্ঠার যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জাহাজ নির্ম্মাণ, বিমান নির্ম্মাণ, রেলপথের নিমিত্ত এঞ্জিন, যাত্রী ও মালগাড়ী নির্ম্মাণ এবং গুরু রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে।

কলকারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের ব্যবস্থাও কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রপাত ও ব্যবস্থা ভারতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য কাঁচা মাল কিংবা আমাদের প্রয়োজনের পরিমাপ অনুযায়ী হয় নাই। রাষ্ট্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত তাহা হওয়াও সম্ভবপর নহে। পরদেশী শাসন-শক্তির দৃষ্টি তাহার নিজের দেশের শিল্প-সমুন্নয়নের প্রতি দৃঢ়নিবদ্ধ। আপনার অপকার করিয়া অন্যের উপকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও দেশহিতব্রত রাজনৈতিকের পক্ষে অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাবলম্বন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, স্বাবলম্বন শক্তি আমাদের যথেষ্ট নহে। রাষ্ট্রের সাহায্য এবং পোষকতা ব্যতীত কোন দেশই মূল ও স্থূল, গুরু ও বৃহৎ শিল্পে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। রাষ্ট্রই দেশজ শিল্পের গরিষ্ঠ ক্রেতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পরাধীন দেশের পরদেশী রাষ্ট্রনায়কদের শিল্প ও রাজনীতি এক-চক্ষু হরিণের ন্যায় একদেশদর্শী। মিঃ আমেরীর স্বীকারোক্তি ও অভয় বাণীর পশ্চাতে কতটুকু আন্তরিকতা আছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। যুদ্ধ ঘোষণার প্রারম্ভে যেরূপ পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প যদি প্রাণপণ চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা অধিকতর পরিমাণে ব্যাহত হইত। যুদ্ধকালে দ্রব্য-মূল্যের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মূলে বহু কারণ বিদ্যমান। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ভারতে জনপ্রতি ১৬ গজ বস্ত্র ব্যয় হইত। সমগ্র উৎপাদন এবং আমদানীর সমষ্টি তখন ছিল ৬৫০০ মিলিয়ন গজ। যুদ্ধের প্রথম দুই-তিন বৎসরে আমাদের উৎপাদনের অধিকাংশ সরকার নিজ প্রয়োজনে এবং সাগরপারে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত লইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা আমাদের কলে প্রস্তুত কাপড়ের ৪৮০০ মিলিয়ন গজের প্রায় ১৩০০ মিলিয়ন গজ লইতেছেন। যুদ্ধ-পূর্ব্বে আমাদের দেশে উৎপন্ন সূতার প্রকৃষ্টাংশ হস্ত-পরিচালিত তাঁত-শিল্পে ব্যয়িত হইত। ইহারও অধিকাংশ এখন সরকার লইতেছেন; ফলে হাতের তাঁতের উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এই উৎপাদনের সমষ্টি ৬০০০ মিলিয়ন গজের অধিক নহে; তন্মধ্যে প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন গজ রপ্তানী ও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশিষ্ট ৪৫০০ মিলিয়ন গজ মাথা-প্রতি ১১ গজের অধিক নহে। যুদ্ধ-পূর্ব্বেই জন-প্রতি আমাদের কাপড়ের ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল, সুতরাং এখনকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়; শতকরা ৩০ অংশ ন্যূন। ইহা যথার্থই সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় প্রাচীন শিল্প আমাদিগকে কিছু পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিতেছে। কলের তাঁতের উৎপাদন ব্যতীত আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না! বিপুল প্রতিকূল শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আমরা এই শিল্পকে রক্ষা না করিলে আমাদের দেশবাসীর, যোদ্ধৃমণ্ডলীর এবং আমাদের কতিপয় প্রতিবেশীর অসীম বস্ত্রাভাব ঘটিত। গত বর্ষে বয়ন-শিল্পের সমবেত চেষ্টার ফলে এবং যথাসম্ভব নির্দ্দিষ্ট নিরিখের কাপড় (Standard cloth) প্রস্তুত ও বণ্টনের ফলে সুতি-বস্ত্রের মূল্য চরম বৃদ্ধির অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, প্রয়োজনের তাগিদে সরকার বয়ন-শিল্পকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান না করিলে ইহার সাধ্যানুযায়ী পরিমিত সাফল্যেও বিঘ্ন ঘটিত। তথাপি বয়ন-শিল্পের প্রচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

শর্করা-শিল্পের উন্নতিও উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পের প্রচুর উন্নতি না ঘটিলে আমরা শর্করার অভাবে বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিতাম। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শর্করার নিমিত্ত জাভার উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলাম। জাভা আজ তিন বৎসর শত্রু-করতলগত। যদি রক্ষণ-শুল্ক নীতি দ্বারা এই শিল্প পুষ্ট না হইত, তাহা হইলে এই নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব অনিবার্য্য হইত। তাহার পরে কাগজ-শিল্প। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাত্র ছয়টি কাগজের কল বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই শিল্প তখন আমাদের প্রয়োজনীয় এক লক্ষ টন লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করিত। সরকার এই সমষ্টির শতকরা ৭০ অংশ ক্রয় করিতেছিলেন এবং মাত্র শতকরা ৩০ অংশ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই শিল্প আমাদের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইতেছে; নতুবা শত চেষ্টা করিয়াও আমরা যুক্তরাজ্য হইতে কাগজ পাইতাম না; কারণ, যুক্তরাজ্যের উৎপাদন তাহার নিজেদের প্রয়োজনের সমতুল নহে। ইস্পাত, বিলাতী মাটি, মৌলিক ও মিশ্রিত ঔষধাদি, কল-কব্জা এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কীয় শিল্প প্রভৃতিতেও আমরা যুদ্ধের অভিঘাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন শিল্পকে বহু বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইস্পাত-শিল্পে আমাদের অগ্রগতি আজ গৌরবের বিষয়; কিন্তু কিরূপ কঠোর বিঘ্ন-বিপত্তি ইহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা বিষম বিপদ্-সঙ্কুল অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। আজ যদি এই ইস্পাত-শিল্প গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে আমাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা কিরূপ ব্যাহত হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ইস্পাত-শিল্প আজ অন্যান্য বহু শিল্পের আশ্রয়স্থল; ইহার অভাবে সেগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিলে, বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের অবসানান্তে শিল্পনিষ্ঠ ভারতবাসী ধনিক ও বণিক-গণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আবেদন-নিবেদনে সরকারের সহযোগিতা ঘটিলে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আমরা অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারিতাম। যে সকল শিল্প আজ সামরিক ও অসামরিক দ্রব্যসম্ভার যোগাইতেছে, তাহারা শ্রমিক, সৈনিক ও জনসাধারণের অত্যাবশ্যক আহার্য্য ব্যবহার্য্য সরবরাহ করিয়া জাতির ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করিতেছে। যুদ্ধান্তেও ইহারা বহু লোকের জীবনযাত্রার সংস্থান যোগাইয়া দেশের ও জাতির হিতসাধন করিবে। ইহাদিগকে বাঁচাইলে আমরাও বাঁচিব।

শিল্পই জাতির প্রাণ। শিল্প ব্যতীত কৃষিও যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে না। পাট-শিল্পই পাট চাষের উন্নতির মূল। কৃষি শিল্পকে কাঁচা মাল যোগায় এবং শিল্প তাহাকে বহু ভাবে ব্যবহারো-পযোগী করিয়া আমাদের জীবনযাত্রা সুকর করে। উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল, অন্যান্য-সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পের উৎকর্ষই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ভারত যদি কৃষি ও শিল্পে তাহার সম্পূর্ণ সম্পদ ও সামর্থ্যের সমতুল্য উন্নতি লাভ করিতে পারিত—তাহার এখনও বহুল পরিমাণে নিষ্ক্রিয় শক্তিসামর্থ্যকে সক্রিয় করিতে

পারিত, তাহা হইলে হয়ত জাপান বর্ম্মা ও মালয়ের নিকটে আসিতে পারিত না। এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহের নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে চীন ও ভারতের শিল্প-সমুন্নয়নের উপর। যদি এই দুইটি দেশ উপযুক্তরূপে শিল্পসমুন্নতি লভে করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্য কোন শক্তিমান জাতি অথবা জাতিসঙ্ঘ হইতে ইহাদের অনিষ্টাশঙ্কা বহুল পরিমাণে তিরোহিত হয়। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্র-শক্তি শিল্পশক্তির অনুসরণ করে। পৃথিবীর শক্তিমান জাতিগণের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিগণিত হইতে হইলে, ভারতকে আন্তঃশিল্প-সম্প্রসারণ ও শিল্প-সমুন্নয়ন নীতির আশ্রয় লইতে হইবে। শিল্প-সম্প্রসারণ ও শিল্প-সমুন্নয়ন ব্যতীত জাতির সর্ব্বজনীন সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। আপামর সাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইলে, এবং সেই উন্নীত ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, শিল্পোন্নতিই এক মাত্র উপায়। শিল্প-সমৃদ্ধির দ্বারা অর্থ-সামর্থ্যের স্বাচ্ছল্য অর্জ্জন করিতে পারিলে স্বাধীনতা অর্জ্জন ও সংরক্ষণ সুকর হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে একমাত্র পরাধীন ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের অন্যান্য প্রত্যেকটি দেশই তাহার উৎপাদন-সামর্থ্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতবর্ষের উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা দশ অংশ। গত পাঁচ বৎসরে অতি অল্প ক্ষেত্রেই শিল্প-সমুন্নয়ন অথবা সম্প্রসারণার্থ নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার যুদ্ধ-পরিচালনার্থ যে আট শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার বহু ক্ষেত্রে যে, চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। চীন, ইরাক্, ইরাণ, আরব ও তুরস্ক প্রভৃতি আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে ইতিমধ্যে কিরূপ অভাব-অনটন ঘটিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত নহে। এই সকল দেশের কোন কোন স্থানে দ্রব্যমূল্য পঞ্চাশ হইতে এক শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের শিল্পগুলি যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীর কর্ম্মতৎপরতা ও উৎপাদন-সামর্থ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

সামরিক শিল্পে নিঃশেষে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজনের ফলে অ-সামরিক শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, উৎপাদনের স্বল্পতা এবং সমুদ্রপথে আমদানীর প্রতিরোধ হেতু যোগানের বিশেষ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ফলে, জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশন-বসনের অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু রহস্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে যাহারা প্রধান প্রতিপক্ষ সেই বৃটেন ও মার্কিণে আহার্য্য ব্যবহার্য্যের যোগান যুদ্ধ-পূর্ব্ব অপেক্ষা যুদ্ধকালে শ্রেষ্ঠতর ভাবে চলিতেছে। সুতরাং ঐ সকল দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। মোটর গাড়ী এবং এঞ্জিনিয়ারীং দ্রব্য-সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের ব্যবহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং যোগান অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও যে এই দুই দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার কারণ অসামরিক ক্ষেত্রে কর্ম্মীর অভাব এবং সর্ব্বসাধারণের ক্রয়-শক্তির বৃদ্ধি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যুদ্ধ-শিল্পে ও অন্যান্য শিল্পে ভারতবর্ষ যুদ্ধকালে যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য ও তৎপরতা দেখাইয়াছে, তাহার ব্যত্যয় ঘটিলে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

আমাদের দেশের বিস্তৃত কৃষির উন্নতির সহিত তাহার সমানুপাতে শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার ব্যতীত জাতীয় অভ্যুদয় ও অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃষি ও শিল্পের সমবায়-সমুন্নতি ব্যতীত জাতীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধারা উন্নত হইতে পারে না। কৃষির সুযোগ-সুবিধা যেমন আমাদের দেশে প্রচুর, শিল্প-সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাও তেমনি বিপুল। কারণ, শিল্প-পরিচালনার্থ সাধারণতঃ যে সাতাইশ প্রকার মৌলিক কাঁচা মালের প্রয়োজন, তন্মধ্যে বাইশ প্রকার আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট সুলভ। অব্যাহতগতি শিল্প-প্রচেষ্টার সহিত স্বায়ত্ত-শাসনের শুভ সংযোগ ঘটিলেই আমাদের মুক্তি। নান্যঃ পন্থাঃ।

জাতিভ্রষ্টা

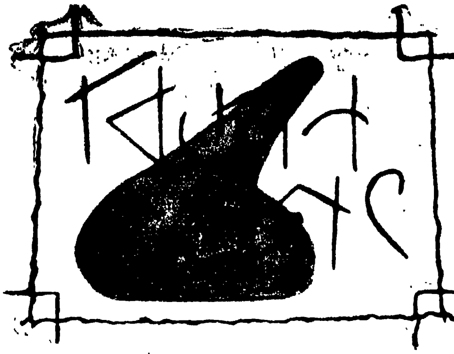
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

রমারে দেখেছি ফ্রক পরা হ'তে, মোটের উপর লাগিত ভালো।
কবঞ্জাক্ষী ছোট্ট মেয়েটি, যদিও তাহার রঙটি কালো।
বছর দশেক বয়েস হইতে খুলে গেল তার গানের গলা।
সকাল বিকেলে স্কিপিং করিত, সদাই নৃত্য-ছন্দে চলা।

আরো গেল দিন, রঙ তুলি দিয়ে কাগজের বুকে আঁচড় কাটে;
হঠাৎ মনের মাধুরী মিশিয়া আঁচড় ছবির রূপেতে ফুটে।
গগনের চাঁদে বন্দী করিল খাতায় কথার মালিকা গাঁথি।
স্বপন-প্রিয়ের স্তিমিত ধেয়ানে জাগিয়া কাটাল মাধবী রাতি।

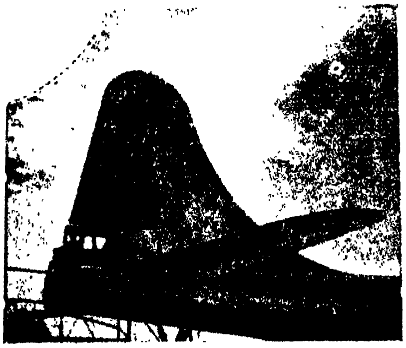
এখন তাহার গানের খাতায় ধোপার হিসাব হতেছে লেখা,
হৃদয়-গগনে ঘোর অমানিশা, উঠে না বুঝি রে চাঁদিমা-রাকা:
ছবির খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খোকনের দুধ গরম করে।
হাট-বাজারের জমা-খরচেতে 'স্বরলিপি' বই গিয়েছে ভরে!

সুরেলা বেহালা ভেঙে গেছে কবে, ভাঙা কাঠগুলি উনুনে গুঁজি,
দশটা-পাঁচটা কেরাণী-স্বামীর ভাত রেঁধে দেছে নয়ন বুজি।
গন্ধ তেলের শিশিতে এখন খুকীর জ্বরের ওষুধ থাকে।
বাস্তব আজ হার মানায়েছে সব দিক্ দিয়া কল্পনাকে।



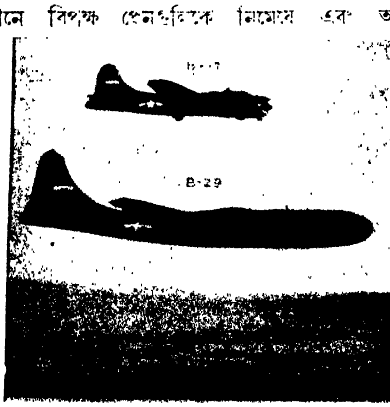
উড়ন-কেল্লার চরম

বহু বৎসরের সাধনায় আমেরিকার বোয়িং এয়ার-ক্রাফ্‌ট কোম্পানি 'বী-২৯' মার্কা যে বিমান-পোত তৈয়ারী করিয়াছে, সে যেন তাঁবুর মধ্যে লুকানো দ্বিতীয় বিংশবিলাস অদ্রি-গিরি! এই 'বী-২৯' বিমান-পোতকে 'সুপার ফোর্ট্রেশ' বলা হয়। এটিতে চারখানি এঞ্জিন সংলগ্ন আছে। অন্য সব পোতের চেয়ে এ বিমানপোত অনেক বেশী



খড়্গ-নাসা বমার

উঁচুতে উঠিতে এবং অনেক বেশী বেগে উড়িতে পারে। এ বিমান-পোতে ভারী-ভারী যে-সব বোমা অনায়াসে বহন করা যায়, সে-সব বোমা বহিবার সামর্থ্য ও পর্যাপ্ত অন্য বিমান-পোতের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই উড়ন-কেল্লা হইতে ২০-মিলিমি কামানে এবং ৫০-কালিবার মেশিন-গানে বিপক্ষ প্লেনগুলিকে নিমেষে এবং অমোঘ ভাবে

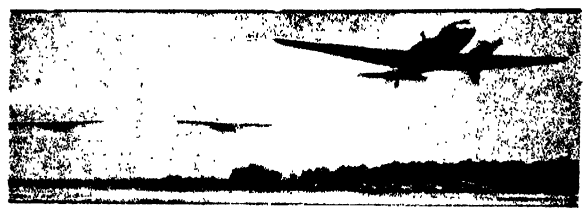


উপরে ফ্লাইং ফোর্ট্রেশ ; নীচে সুপার ফোর্ট্রেশ(বী-২৯)

চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায়। আকারের বিরাটত্ব এবং খড়্গ-নাসিকা ভিন্ন এ-বমারের বহিরবয়বে আর কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। ইহার এঞ্জিন-গুলির প্রত্যেকটি ২২০০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন এবং সবগুলিকেই ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা যা আছে, চমৎকার! পাখা লম্বে ১০০ ফুট; সাড়ে আট হাজার অশ্বের শক্তি-সামর্থ্যে ভূষিত এ বমারের পাশে ফ্লাইং-ফোর্ট্রেশকে দেখায় যেন শিশু! এ বিমান পোত চলে বৈদ্যুতিক-শক্তিতে। ৫০০০ ঘণ্টার পরীক্ষায় এ বমার যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া রায় দিয়াছেন, সব দিক্ দিয়া নিখুঁৎ।

অভিনব গ্লাইডার

'বী-২৯' উড়ন-কেল্লার পর এক অভিনব গ্লাইডারের সৃষ্টিও মার্কিন সমর-বিভাগের দ্বিতীয় কীর্তি! এ গ্লাইডারের শক্তিও অসামান্য—ইহার সঙ্গে নাইলনের তৈরী যে-কাছি আছে, সেই কাছি-সংলগ্ন হুকে



গ্লাইডারে বাঁধা হাউইজার

প্লেন, হাউইজার, এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক-কামান এবং ট্রাক্টর—সব একসঙ্গে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া অনায়াসে বহন করা চলে! এ জাতের বহু গ্লাইডারকে এমন কৌশলে পাশাপাশি উড়াইয়া পরিচালনা করা হয় যে, কাহারো গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কাও অনুভূত হয় না; পাশাপাশি বহু গ্লাইডারে বাঁধিয়া গোটা বারুদখানাকেই বহা যায়, এবং তার ফল কতখানি সাংঘাতিক, অনুমান করা কঠিন নয়।

জখমী বিমান-পোত

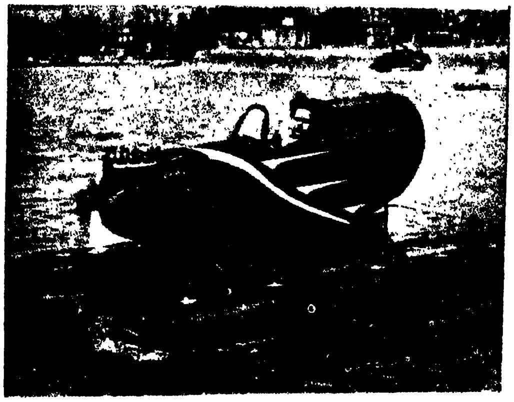
ইংলণ্ডে এবং উত্তর-আয়ার্লণ্ডে বিমান-পোতের ব্যাধি সারাইবার জন্য বহু কারখানা বা বিমানপোত-হাসপাতাল তৈয়ারী হইয়াছে। কোনো বমারু বা লড়ায়ে-প্লেনের অঙ্গে জখম ঘটিলে বা সেগুলির অংশ খোয়া গেলে এই সব হাসপাতালে তাদের আনা হয়। আনিয়া তার পর কার অঙ্গে কি চোট্-জখম, 'এক্স-রে' করিয়া তাহার পরীক্ষা চলে, এবং নির্দ্ধারণমাত্র দেহের টুটা-ফাটা-ক্ষোয়া সারাইয়া সেগুলিকে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিখুঁৎ করিয়া ডিউটি-সাধনে পাঠানো হয়।



বমার-পরীক্ষার এক্স-রে যন্ত্র

তরী, না, তীর !

বাল্টিমোরের প্লেন মার্টিন কোম্পানি এক-রকম তরী বা স্কুটার তৈয়ারী করিয়াছেন,—সে-স্কুটার দেখিতে যেন ডানা-কাটা প্লেন ! এ স্কুটার ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলে। দু'খানি পোনটুনের উপরে ইহার দেহখানি সন্নিবিষ্ট ; বসিবার জায়গাটুক বিমান-পোতের বিবর-আসনের মত। শীতকালে দেহের আধার ঐ-পোনটুন

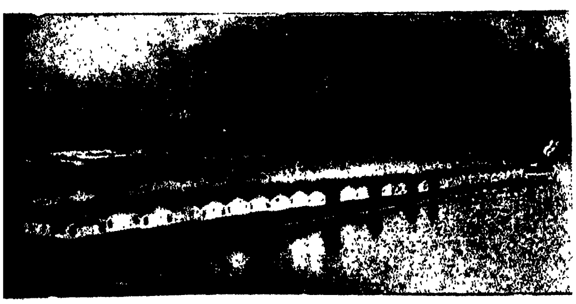


তীরবেগে তরী

দু'খানি খুলিয়া লইয়া ও-জায়গায় দু'খানি স্কাই আঁটিয়া দিলে জমাট বরফের উপর দিয়া তীরের বেগে এ স্কুটার পাড়ি জমাইতে পারে ! স্কুটারখানি চলে ২৭ অশ্বশক্তি-যুক্ত মোটর-এঞ্জিনে। স্কুটারে দু'খানি হাল আছে—মোটরের কনট্রোল হুইলের অনুরূপ। আসনে বসিয়া যাত্রী হুইলের সাহায্যে স্কুটারকে আপন খুশী-মত পরিচালনা করিতে পারেন। স্কুটারের খোলে আট গ্যালন পেট্রোল ধরে ; তার দৌলতে তিন ঘণ্টার পাড়ি যেমন অনায়াস, তেমনি নিরাপদ।

বোটে তুলিয়া গ্রাম সরানো

আমেরিকার কাণ্ড ! প্লেজেণ্ট প্লেজাণ্ট হইতে ইউনিয়ন টাউন—ওহিয়ো নদী-পথে ব্যবধান অল্প নয় ! বোটের উপরে ত্রিশখানি গৃহ-সমেত গোটা



বোটের বুকে গ্রাম

পয়েণ্ট প্লেজাণ্ট গ্রামখানিকে ইউনিয়ন-টাউনে সরানো হইয়াছে। বারো-খানি বোটকে গায়ে-গায়ে বাঁধিয়া তাহারই উপরে গোটা গ্রামখানিকে তোলা হইয়াছিল। জোয়ার-ভাঁটার দরুণ নদীর বুক সব সময়েই তরঙ্গ-লাগিয়াছিল। বাড়ী বলিতে খেলার ঘর-বাড়ী নয় ; বাড়ীগুলির প্রত্যেকখানি প্রায় পাঁচ-সাত কামরাওয়ালা—এবং দৈর্ঘ্যে ৪৬, প্রস্থে ২৪ এবং উচ্চতায় ১৫ ফুট। এই সব বাড়ী-ঘরকে যেমন অটুট ভাবে বোটে তোলা হইয়াছিল, পথে বহিয়া আনিতে বা নূতন আস্তানায় নামাইতেও তেমনি কোন বাড়ী-ঘরে এতটুকু ফাট ধরে নাই বা চিড় খায় নাই !

ব্রাশ-বাল্‌ব্‌

ক্যামেরার লেন্সে, বিশেষ করিয়া ফিল্ম-ক্যামেরার লেন্সে এবং ফিল্ম-প্রোজেকটরে যে মিহি ধূলা জমে, সে ধূলা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না—



লেন্সঝাড়া ব্রাশের বাল্‌ব্‌

সে জন্যও ধূলা লেন্সের গায়ে থাকিয়াই যায় ; তার ফলে ছবি তোলায় বা ফিল্মের ছবি দেখানোয় নানা বিঘ্ন ঘটে। লোক-লোচনে প্রত্যক্ষ এই মিহি ধূলি-জঞ্জাল ঝাড়িবার জন্য উটের লোমের ব্রাশের সঙ্গে বাল্‌ব্‌ আঁটিয়া অভিনব ধূলা-ঝাড়া ব্রাশ, বা ব্লোয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে। বাল্‌ব্‌ টিপিবামাত্র অণু-পরমাণুর মত মিহি ধূলা নিমেষে ঐ ব্রাশের বাল্‌বে পৌঁছে ও সম্পূর্ণ ভাবে সাফ হইয়া যায়।

পেট্রোলের ব্যাগ

যে-সব গভীর জঙ্গলে কিম্বা দুর্গম দেশে ট্রাক চলে না, সে সব স্থানে বিমান পোতের জন্য পেট্রোল জোগানো এত কাল শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব ছিল। সে-অসম্ভবকে আজ সম্ভব এবং সহজ করা হইয়াছে পেট্রোলের জন্য জল-নিবারক ক্যাম্বিশের থলির প্রবর্ত্তনায়। এই থলির ভিতর দিকে প্লাষ্টিকের লাইনিং দেওয়া হইয়াছে ; সে লাইনিং আগুনে পোড়ে না ; এবং এ প্লাষ্টিক শীত এবং তাপ-প্রতিরোধে সমর্থ। ব্যাগের মধ্যে ধাতু-পাত্র আছে ; সেই ধাতু-পাত্রে পেট্রোল ভরিয়া রাখা হয়। উচ্চ আকাশ হইতে নীচে থলি ফেলিয়া দিলে ভিতরকার পেট্রোল-ভরা ধাতু-পাত্র ফাটে না বা তুবড়াইয়া যায় না।

প্রয়োজন হয় না। এক-একটি থলির মধ্যকার ধাতু-পাত্রে পুরাপুরি পেট্রোল ভরিলে থলির ওজন হয় পঁচিশ সের। থলির মধ্যে পেট্রোল



পেট্রোলের থলি

ধরে সাত গ্যালন। এই সাত গ্যালন পেট্রোল-ভরা থলি কাঁধে ঝুলাইয়া বহিতে কেহ বেগ পায় না।

ট্রেণ-কামরার আসন

যুদ্ধোত্তর কালে জীবন-যাত্রাকে কতখানি আরামপ্রদ করা চলে, সে সম্বন্ধে এখন হইতেই বৈজ্ঞানিকগণের সাধনা-অধ্যবসায়ের অন্ত নাই।



ট্রেণের নূতন আসন

বোষ্টনের রেল-কর্ত্তৃপক্ষ হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ট্রেণ-কামরার বসিবার আসনের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাপজোপ করিয়া আসনের উচ্চতা ও পরিসরাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁরা যে সব আসন তৈয়ারী করিতেছেন, সেগুলিতে বসিয়া হাত-পা স্বচ্ছন্দ ভাবে রাখিয়া দীর্ঘ পথ যাইতে কোনো কষ্টবোধ হইবে না; হাতে-পায়ে যেমন ব্যথা বা ঝিন্‌ঝিনি ধরিবে না, তেমনি কাঁধ, কনুই, পা, কোমর, টাটাইবার বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবারও আশঙ্কা থাকিবে না।

কালান্তক মেশিন-গান

মেশিন-গানেও মার্কিন সমর-বিভাগ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

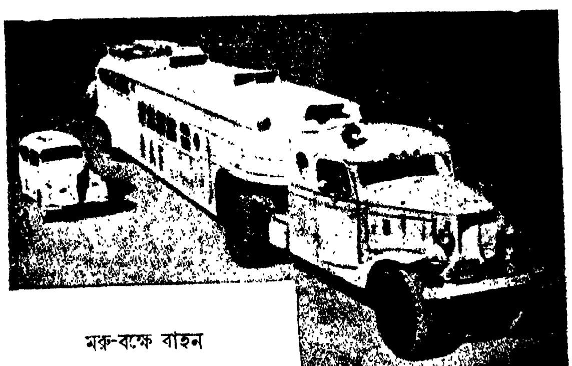


কালান্তক মেশিন-গান

নৌ-বাহিনীর জন্য যে নূতন মেশিন-গান তৈয়ারী হইয়াছে, সেগুলি লম্বে পাঁচ ইঞ্চি সাত ডেষ্ট্রিয়ার মাত্র। এয়ার-ক্রাফট-বাহিনী এবং যুদ্ধ ও সদাগরী জাহাজ এই মেশিন-গানে নিরাপদ করা হইয়াছে। এ মেশিন-গান ছুড়িবার কৌশল এমন সহজ যে, মেয়েরাও এ-অস্ত্র লইয়া দিগ্বিজয় করিতে শ্রান্ত হইবেন না।

মরু-বাহন

বারো-গীয়ার-সম্বলিত বাসের সৃষ্টি হইয়াছে মরুর বালুবক্ষে নিরাপদ বিচরণের জন্য। এ-বাসে লাগেজ সমেত চল্লিশ জন যাত্রী স্বচ্ছন্দ আরামে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে পারেন; ক্লান্তি ঘটে না। এক-একখানি



মরু-বক্ষে বাহন

বাসের ওজন ৩০ টন; লম্বে ৭৫ এবং প্রস্থে ১১ ফুট; চাকাগুলি ৪ ফুট ২ ইঞ্চি উঁচু। বাসের ভিতরকার কামরাগুলিকে স্নিগ্ধ-শীতল রাখিবার সুব্যবস্থা আছে। বাসের মধ্যে পাকশালা আছে, স্নানের কামরা আছে; স্নানের কামরায় তুষার-শীতল জলের ট্যাঙ্ক আছে। এ-বাস যাত্রী লইয়া হাবানিয়া-ইরাক এবং দামাস্কাশের বালুকা-পথে নিয়মিত ভাবে যাত্রা-পর্ব্ব সুরু করিয়াছে।

ছোটদের আসর



মঙ্গল

বিলিতি বাঘা



সোম



বুধ

প্রভুরে দেখিয়া বাঘা ভাবে মনে মনে—
আমি কি রহিব শুধু পড়িয়া পিছনে ?
বিজ্ঞ সাজিতে হবে এই মনে করে—
চশমা চড়ায়ে দিল নাকের উপরে ।

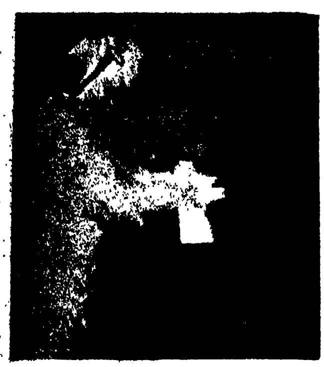
সোমবারে টবে ফেলে কাপড়ের রাশ
মঙ্গলে ইস্ত্রী চলে করি হাঁস ফাঁস ।
বুধেতে সময় আছে খেলিছে পেসেন্স
মুখেতে প্রকাশ পায় পোয়েটিক সেন্স ।



বৃহস্পতি

বৃহস্পতি বারে দিল শরীরেতে মন—
প্রাতে উঠি ডিম দুধ করিল ভক্ষণ ।
শুধু খাওয়া দাওয়া তরে নহে এই প্রাণ—
এই ভাবি শুক্রবারে ধরে অর্গ্যান ।

শনিবারে প্রভু যান ড্রেস স্যুট পরি
ডিনার পার্টিতে খান শ্যাম্পেন শেরী ।
প্রভুভক্ত বাঘা তাই টুপি দিয়া মাথে—
থাইল প্রভুর শেরী প্রভুর পশ্চাতে ।



শুক্র

রবিবারে বেচারার ধরে গেল মাথা,
প্রভু জানে, বাঘা জানে কি দারুণ ব্যথা !



রবি



শনি



দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

১

পড়ার ঘরে বোধ হয় ডাকাত পড়েছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে বাবুলের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো নীচে। একরাশ লাল, নীল, হলদে, নানা রংএর নানান্ রকমের ইংরেজী আর বাঙলা ছবির বই এনে ফেলল বাবুল তার পড়ার টেবিলে, আরো বই এলো চাকরের হাতে। বইএর ধাক্কা লেগে উল্টে গেলো টেবিল-ল্যাম্পের সবুজ সেডটা।

শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। বাবুলের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ঘরের চেহারা গেলো বদলে। টেবিল উল্টে ভাঙ্গা-পা-চেয়ারকে কাৎ করে সোফার ফাটা বালিশটাকে আরো ফাটিয়ে তার তুলো চার-দিকে ছড়িয়ে বাবুলের বাবুচেহারা সেই ছত্রাকার তুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন ভালুকের মত হয়ে এসেছে—তখন পদ্দার পাশে দেখা গেলো মিমিকে।

বাবুল, বিশ্বাস কোরতে ইচ্ছে হয় না আট বছরের বাবুল তার ছোট-বোন মিমিকে, যে আসছে আষাঢ়ে ছ'এ পড়বে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবার দুঃসাধ্য চেষ্টা কোরতে পারে। হ্যাঁ, সত্যিই পারে. এই মুহূর্ত্তে বাবুল সব পারে, সমস্ত অসম্ভবকেই সম্ভব কোরতে পারে।

শূন্যে উঠে গিয়ে মিমির বিপুল চীৎকারে চটে গেলো বাবুল। নীচে নামিয়ে নিয়ে এসে ঠাস কোরে মারলে এক চড় তার গালে। বৈশাখের সেই গরম বিকেল বেলাতেই সঙ্গে সঙ্গে মিমির গাল বেয়ে তার চোখ থেকে শ্রাবণের বর্ষার মত নামল কান্না।

কাঁদতে কাঁদতে মিমি পালাচ্ছিলো—বাবুল তাকে ধরে ফেল্লে হাত বাড়িয়ে। ধরে এনেই বল্লে,—"নে, এই বইটা নে।" বিশ্বাস কোরতে পারছে না—প্রকাণ্ড সেই ছবির বইটা কাঁপছে মিমির এক হাতে—আর এক হাতে কান্না মুছচে তার।

—"ওঃ, বিশ্বাস কোরতে ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝি, বোকা মেয়ে।" সবুজ পার্কারটা খুলে—বড় বড় কোরে লিখলে বাবুল প্রথম পাতায়—

"মিমিকে দিলাম
—বাবুল দাদা।"

কান্না থেমে গেল—হাসির ঝিলিক দিলো মুক্তোর মত দাঁতে।

"তুই আমায় কি দিবি?"

—"এই যে দিচ্ছি।" বাবুলের লম্বা আর কালো কোঁকড়ানো চুলে এক টান দিয়ে পালালো মিমি।

পেছনে পড়ে রইল প্রাইজ-ডে-তে পাওয়া বই, ছুটলো বাবুল মা'য়ের কাছে।

—"মা, ওমা, এবারেও first হয়েছি আমি।"

চুমু খেতে খেতে মা বল্লেন,—"এই কাল আমরা পুরী যাব রে।"

—"পুরী!" কোল থেকে লাফিয়ে উঠল বাবুল। "মিমি—মিমি"—গলার স্বর শুনেই পালিয়েছে মিমি।

—"কি বোকা! মারবো না রে—এই মিমি, আমরা পুরী যাচ্ছি রে কাল—এই শোন—"

দু'জনকে আবার মিলতে দেখা যায়—দরজার আড়ালে। এক জনের পিঠে উঠে আরেক জন আছাড় পাড়ছে তখন।

২

গাড়ী ছাড়বামাত্র, মিমি আর বাবুল দু'জনেই বললো—তারা বুঝবো না।

হরদয়াল বাবু ছেলে-মেয়ের কথায় হাসলেন।

দু'পাশে তাকাতে তাকাতে—অবাক্ হয়ে যায় ওরা দু'জন। এত দূর এর আগে আর কোথায় গেছে?

ট্রেনে চড়ে সেই ত একবার সেই মামার বাড়ী,—আর এ ত অনেক দূর—কত বড় সমুদ্র সেখানে। রাত বাড়তে না বাড়তেই দেখা গেলো দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে কখন!

পুরীতে পৌঁছে প্রথম ক'দিন তোলপাড় কোরলে বাবুল। আনন্দে আর উত্তেজনায় বাবুল আর মিমি ঝগড়া কোরতেও ভুলে গেলো।

সমুদ্রে চান করতে প্রথম প্রথম ভয় কোরতো, এখন মজা লাগে খুব। সন্ধ্যে হতে না হতেই—সমুদ্রের ঢেউগুলো জ্বলতে থাকে। বাবা বলেন,—"ওতে না কি ফসফরাস আছে বলে রাতে জ্বলে।" বাবুল জানে—তা নয় সমুদ্রের নীচে অনেক হীরে আছে। তারাই রাতের বেলায় ঢেউয়ের মাথায় জ্বলতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ বুকে ঠাণ্ডা লেগে বাবুল পড়ল অসুখে। মিইয়ে এলো সব। মিমির ভালো লাগে না একা একা সমুদ্রে চান কোরতে। বাবুলের মাকে হরদয়াল বাবু বোঝান,—তবুও তাঁর নিজের মন বুঝতে চায় না।

অবশেষে ব্যাপার বেঁকে দাঁড়ালো। হরদয়াল বাবু, ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী বিখ্যাত ডাক্তার পুরীতে এসেছে শুনে তাঁর কাছেই গেলেন।

ভদ্রলোক একটু অস্বাভাবিক ধরণের। প্রথমে নানান্ কথা-বার্ত্তার পর—যেই হরদয়াল বাবু বল্লেন—"আমার ছেলেটি মাত্র আট বছরের—ও'র কিছু হলে ওর মা আর বাঁচবে না।" ব্যস, এই শুনেই ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী ক্ষেপে গেলেন, বলে দিলেন—"না, ছোট ছেলের চিকিৎসা আমি করিনে।'

ফিরে এলেন হরদয়াল বাবু। ভেবে পেলেন না, কেন ডাঃ চৌধুরী অত ক্ষেপে গেলেন। আগে ত বেশ ভদ্র ব্যবহার কোরছিলেন। 'ছোট-ছেলে' শুনেই ওরকম পাগলের মত হয়ে গেলেন কেন? বোধ হয় মাথার গোলমাল।'

হ্যাঁ—সত্যিই মাথার গোলমাল।

হরদয়াল বাবু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী। মনে পড়ে গেলো—মেঘনায় বছর পাঁচেক আগে—সেই ঝড়ের কথা। সেই ঝড়ে গেছে তার একটি মাত্র ছেলে—তার পর থেকে কোন ছোট ছেলের কথা শুনলেই তাঁর মাথায় খুন চেপে যায়।

৩

ফিরে যাচ্ছেন হরদয়াল বাবুরা। বাবুল এক দিন মা'র কোলে মাথা রেখে সেই যে চোখ বুজলো আর খুলল না। মিমি তাকে অত করে ডাকল, তবুও নয়। হরদয়াল বাবু যাবার আগের দিন একাই বেরিয়েছেন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনে হল, সমুদ্রের ওই নীল জল—বাবুলকে পাগল করে দিত, সমুদ্রের দেবতা তাই বোধ হয় তাকে ডেকে নিলেন।

—"এই যে"—হরদয়াল বাবু কার ডাক শুনে ঘাড় ফেরালেন—সামনে ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী।

—"ডাঃ চৌধুরী—আপনি গেলেন না—আমার ছেলে আর বাঁচল না।"

চুপ করে রইলেন ডাঃ চৌধুরী। কোথায় যেন তাঁর লাগল।

—"আজ আপনাকে বলি ডাঃ চৌধুরী।" আবার বলেন হরদয়াল বাবু—ও আমার নিজের ছেলে নয়—মেঘনার ঝড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে—'

—"কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া!" অসম্ভব কাঁপছে ডাঃ চৌধুরীর গলা।

—"'মেঘনায়, বছর পাঁচেক আগে।"

হরদয়াল বাবুর দু'হাত ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় এই ক'টি কথা বেরুল ডাক্তার চৌধুরীর মুখ দিয়ে—"কী,—কী নাম ছিল তার ?"

—"নাম, সেও তার বাপ-মায়ের দেওয়া, আমার নয়।" হরদয়াল বাবু পকেট থেকে একটা আংটি বার করে ডাক্তারের হাতে দিলেন—"এই আংটিতে তার নাম লেখা ছিল, ওই নামেই তাকে আমরা ডাকতাম'—'বাবুল।"

সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে কোলকাতার সেরা ডাক্তার সঞ্জীব চৌধুরী বালির ওপর বসে পড়ে পাগলের মত হাসতে লাগলেন।

চোখের পলক পড়ছে না হরদয়াল বাবুর।

তার সামনে এই যে বৃদ্ধ উন্মাদ পাগলের মত হাসছে, সেই যে বাবুলের বাবা ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী,—এ কথা কী কোন দিন জানতে পারবে কেউ ?

তত্ত্ব-তাবাশের ইতিকথা

পুরাকালে আমাদের দেশে বিবাহ দিয়া কন্যাকে যখন বহু দূরে তার শ্বশুর-গৃহে পাঠানো হইত, তখন যান-বাহনের মোটেই সুবিধা ছিল না।



বেতার-যন্ত্র (১৯০১)

তার উপরে ছিল পথে দস্যু-তস্করের উৎপাত ; এ জন্য কন্যা-জামাতার খবরাখবর নেওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। কোনো মতে মেয়ের মা-বাপ যদি মেয়ে-জামাইয়ের সংবাদ লইবার জন্য লোক পাঠাইতেন, তাহা হইলে সে লোকের সঙ্গে খাদ্যাদি পাঠাইতেন। খাদ্যাদি পাঠানো ছিল গৌণ উদ্দেশ্য ; লোক-পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়ে-জামাইয়ের তত্ত্ব বা সংবাদ লওয়া। সংবাদ আনার সঙ্গে খাদ্যাদি পাঠানোর ব্যাপার এমন বিজড়িত হইয়া যায় যে আজকাল ট্রেণ-মোটর-ষ্টীমারের যুগে মেয়ে-জামাতার সং... ...লে চিঠি-পত্রে, টেলিগ্রামে,—খাদ্যাদি উপঢৌকন পাঠানোর নাম দাঁড়াইয়াছে তত্ত্ব-তাবাস !

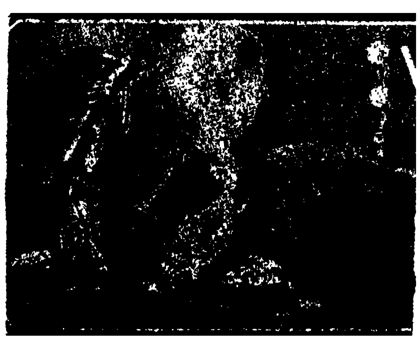
আজ আত্মীয়-বন্ধুরা যত দূর-দেশেই যান, তাঁদের খবরাখবর নেওয়া-দেওয়ায় সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে ! এই সুখ-সুবিধা ঘটিবার পূর্বে সুদূর আত্মীয় বন্ধু বা রাজ্য-সাম্রাজ্যের সংবাদাদি গ্রহণের জন্য কি ভা... মানুষের সাধনা চলিয়াছিল, সে-ইতি... হাস উপন্যাসের চেয়ে... উপভোগ্য ! সে ... সম্বন্ধে তোমাদে... দু-চারিটি কথা বলি...



ঢাকের বাদ্যে (আফ্রিকা)

পৃথিবীর সর্ব... আজ রেডিয়ো-মারফ... চকিতে সকল সং... দের আদান-প্রদা... চলিয়াছে। এই রেডিয়োর কল্পনা যখন মানুষের মনে... কোণে উদয় হয় নাই তখনো দূর-দূরান্তরের সংবাদ সভ্য জগতে অজানিত থাকিত না! সংবাদ-প্রেরণ বা আনয়নের জন্য তখন ব্যবস্থা ছিল যেমন বিলম্বিত, তেমনি অনিশ্চিত। সংবাদ-প্রেরণের এ সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে আজ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর মাত্র

মার্কিনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যখন পূর্ণ তেজে চলিয়াছে, তখন ভূ-ভাগে তাহার সংবাদ চলিত ঘোড়-সওয়ার দূতের মারফৎ। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলে ঢাক বাজাইয়া জরুরি সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ঢাকের বিভিন্ন বোলে আশা



আগুন জ্বালিয়া রেড-ইণ্ডিয়ানের সংবাদ প্রচার

নিরাশা, জয়-পরাজয়, সুবিধা-অসুবিধা—বিভিন্ন সঙ্কেতে জানানো হই... রেড-ইণ্ডিয়ানরা সন্ধ্যার পর বিরাট অগ্নিকুণ্ড রচনা করিত ; তাহ... গগনস্পর্শী শিখায় বিবাদ-বিসম্বাদের বার্তা দিক্-দিগন্তরে প্রচা... হইত। পায়রার গলায় চিরকুট বাঁধিয়া বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা জগতে পূর্বে যেমন প্রচলিত ছিল, এখনও তেমনি আ... প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সংবাদ পাঠানো হইত ...

মারফৎ—আলোক-রশ্মির মারফৎ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৭৮ বৎসর পূর্ব্বে সোলার বড় বড় পাত্র তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে বাঁশের চোঙার মধ্যে সংবাদ-বিবরণাদি লিখিয়া সেই সোলার পাত্র জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত!—পত্রের সাঙ্কেতিক পরিভাষা থাকিত—শত্রুপক্ষের হাতে সে-বিবরণ পড়িলে তাদের পক্ষে অর্থ নির্ণয় কাজেই সম্ভব ছিল না; স্বপক্ষ সাঙ্কেতিক সঙ্কেত বুঝিয়া পত্রার্থ সঠিক অবধারণ করিত। এ ভাবে সংবাদ-প্রেরণে যে নিশ্চয়তা ছিল না, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই!

রোমানরা বহু স্থানে সঙ্কেত-টাওয়ার নির্ম্মাণ করাইয়াছিল; সেই টাওয়ারের উপর দিনের বেলায় ধূম্রবাষ্প সৃষ্টি করিয়া এবং রাত্রে তীব্র আলো জ্বালিয়া সংবাদের আদান-প্রদান চলিত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সর্ব্ব প্রথম বায়ব-টেলিগ্রাফে (aerial telegraph) বার্ত্তা-প্রেরণের ব্যবস্থা করে। এ রীতিতে ন'-দশ মাইলের বেশী কোনো বার্ত্তা-প্রেরণ অসম্ভব ছিল। এ-টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির নাম ছিল সেমাফোন টেলিগ্রাফ। উচ্চ একটি টাওয়ারে ঘড়ির মত প্রকাণ্ড একটি যন্ত্র সংলগ্ন থাকিত; এবং সেই ঘড়ির কাঁটা বিধি-অনুযায়ী ঘুরাইলে ঘড়ি বাজিয়া উঠিত—ন'-দশ মাইল ব্যাপিয়া ঘড়ির সে শব্দ শুনা যাইত; এবং বিশেষজ্ঞেরা ঘড়ির শব্দ-সংখ্যা গণিয়া সঠিক বার্ত্তা সংগ্রহ করিত। এ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রান্সে প্রাসিয়ান এবং ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-বাতির আবর্ত্তন ঘটে।



সেমাফোন টেলিগ্রাফ

নেপোলিয়নের আমলে



সেমাফোনের চক্র-চালনী

তার পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টেলিফোন-যন্ত্রে দু'মাইল দূরে সংবাদ পাঠানোর সাধনা সফল এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এ-বাতির এমন উৎকর্ষ সংসাধিত হয় যে তার ফলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পারে সংবাদ-সূত্র-সংসাধন সার্থক হইয়া ওঠে। টেলিফোনে তখন খুব চড়া গলায় কথা কহিতে হইত, নহিলে তাহা স্পষ্ট শুনা যাইত না।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এ ত্রুটি সারিয়া টেলিফোন আধুনিক রূপে গড়িয়া ওঠে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট হাউসে বসিয়া সহজ কণ্ঠে কথা কহিয়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজ বাণী পাঠাইয়াছিলেন সমগ্র যুক্তরাজ্য; কানাডায় এবং য়ুরোপের যুক্তরাজ্যের নানা প্রদেশে।

বেতারের সাধনা আংশিক ভাবে সফল হইয়াছিল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। তখনকার দিনে বেতার বার্ত্তা-যন্ত্রের আকার যেমন অদ্ভুত ছিল, তার প্রয়োগ-প্রণালীও ছিল তেমনি জটিল। আর এখন?

তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ পৃথিবী জুড়িয়া শব্দ-তরঙ্গ ছুটিয়াছে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাণী। কোটি কোটি বাণী বক্ষে বহিয়া সংবাদ চলিয়াছে; এই বিপুল ব্যূহ হইতে যার যেটি প্রয়োজন, সেটি সে কি করিয়া গ্রহণ করিতেছে, সে-কাহিনী আরো উপভোগ্য। বারান্তরে সে অপরূপ কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল

গরীবের ছেলে

ম্যাট্রিক ক্লাশের একটি ছেলে সেদিন দুঃখ করে বলছিল—আমার বাবা গরীব মানুষ—মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পান,—বাড়ীতে খেতে-পরতে অনেকগুলি, যে-সব বই পড়ানো হয়, তার অর্দ্ধেকের উপর আমার কেনা হয়নি, কেনার সঙ্গতি নেই! এর-তার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে পড়ি, তাতে এগজামিনে পাশের আশা রাখি না। আমার মনের সাধ, আমি বড় হবো, খ্যাতিমান হবো, কিন্তু সে আশা মিথ্যা।

এ-কথায় মন অভিভূত হয়! যখন ভাবি, একটি ছেলে স্পষ্ট করে এ-কথা বলেছে, তখন এ-কথা তুচ্ছও নয়! আমাদের গরীব দেশে ক'জন লোকের সঙ্গতি আছে যে এ-কালে ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে তোলেন! অর্থের যেখানে অভাব, সেখানে রোগ-শোকের মধ্যেও এত রকমের বিঘ্ন-বিপত্তি এত-মূর্ত্তিতে এসে উদয় হয় যে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ; সে-তপস্যার নিষ্ঠা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলুম, এমন সময় ক'জন মহা-পুরুষের জীবনীগ্রন্থ পড়বার সুযোগ মিললো। সে সব জীবনী পড়ে দেখছি, জগতে মানুষ খাড়া হয়েছে দুটি বস্তুর উপর ভর দিয়ে। তার একটি হলো ভালো স্বাস্থ্য এবং অপরটি মনের জোর। দেহ-মনের স্বাস্থ্য এবং শক্তি রক্ষা করতে হলে গোড়া থেকেই কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা উচিত—নিয়ম-পালনকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক জগতে যাঁরা বড় বড় সত্য বা তথ্য বা বস্তু আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবার সুযোগ পাননি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা তক্‌মা নিয়ে বেরিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন অর্থোপার্জ্জনের সাধনায় মনকে ডুবিয়ে হারিয়ে বসেন! যাকে বলে inventive genius, সে বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় দুর্লভ। দীন-দরিদ্রের মধ্যেই সে প্রতিভার বীজ বেশী দেখা যায়। তবে এ বীজকে কাজে খাটাবার মত মন চাই!

যে হেনরি ফোর্ডের নামে পৃথিবী আজ শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়ায়, তিনি ছিলেন ডেট্রয়েরের এক কারখানায় সামান্য এক জন মিস্ত্রী। কোনো মতে দিনের কাজ সেরে মনিবকে তুষ্ট করে নিজের পাওনা-গণ্ডা আদায়ের দিকেই তাঁর মন ছিল না। কলকব্জা নিয়ে নূতন কিছু সৃষ্টির সাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন। চালাতে চালাতেই বুদ্ধি খোলে! তাঁর বুদ্ধি খুলে গেল এবং সেই বুদ্ধির জোরে তিনি আজ মস্ত এক জন কৃতী পুরুষ। যে এডিশনের বুদ্ধি-কৌশলে পৃথিবী পেয়েছে গ্রামোফোন, বায়োস্কোপ প্রভৃতি, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় তিনি নিউ-ইয়র্কে গিয়েছিলেন। পড়ার বইগুলিকে দেনার দায়ে বোষ্টনে বাঁধা রেখে যেতে হয়েছিল। বাড়ীতে পড়ে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানে তাঁর মনের দ্বার খুলে যায়।

আমাদের দেশে পয়সার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ যাদের ভাগ্যে অগ্রসর হয় না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ কল-কারখানায় ঢুকছেন—উদরান্নের সংস্থান করতে। দুঃখ এই যে ঝুল-কালি মেখে বিড়ি ফুঁকে তাঁরা শুধু দিনগত পাপক্ষয় করছেন! মাথা খাটিয়ে ঐ যন্ত্রপাতিকে আরো সহজ-সুলভ করে' তোলা, কিম্বা নতুন কিছু গড়ে তোলার দিকে তাঁদের লক্ষ্য কৈ? অথচ যন্ত্র-যুগে ঐ কল-কারখানায় যাঁরা কাজ করতে ঢুকেছেন, মনের জোরে বুদ্ধিকৌশলে তাঁরা নব-নব বহু তথ্য আর সত্য আবিষ্কার করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারেন! গরীবের ছেলের পক্ষে ধন-সম্পদ লাভ কেন সম্ভব হবে না? তবে তার জন্য চাই একাগ্র সাধনা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলে গেছেন, জ্ঞান কখনো নিষ্ফল হয় না—তা সে জ্ঞান যে রকমেরই হোক না কেন! **Investment in knowledge always pays the best interest.**

'জ্ঞান' বলতে যা বুঝি, সে-জ্ঞান স্কুল-কলেজে মেলে না, স্কুল-কলেজ থেকে মনকে তৈরী করে বেরুবার পর জীবনের ক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্র হলো আমাদের জ্ঞানলাভের আসল জায়গা। শিক্ষা সম্বন্ধে মস্ত এক জন বৈজ্ঞানিক বলে গেছেন—শিক্ষা-বিজ্ঞানের আসল অর্থ, মানুষ যা কিছু জানতে চায়, সেই জানার সম্বন্ধে যে-বিজ্ঞান সহায়তা করে।

স্কুল-কলেজে বাঁধা রুটিনে যাদের মন বসে না কিম্বা পয়সার অভাবে স্কুল-কলেজে ঢুকে লেখাপড়া করবার সুযোগ যাদের মিলবে না, তাদের নিরাশ হবার কারণ নেই! তারা বাড়ীতে বসে পড়ো—যে বই পাবে, পড়ো। জ্ঞানাৎপরতরো ন হি। পড়া ছেড়ে বসে থাকা মানে, অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন থাকা—মনে তাতে মরচে ধরে; বুদ্ধির গোড়ায় ঘূণ ধরে যায়! যদি ভেবে থাকো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেবার সামর্থ্য নেই পয়সার জন্য, অতএব জীবনে কৃতিত্ব লাভের সম্ভাবনা নেই, তাহলে জানবে সে চিন্তা বা ধারণা ভুল! জগতে কৃতিত্বের পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত আছে। মনের জোরে একাগ্রতায় যে-কোনো ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের গুণে সকলেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন!

বঙ্গভূমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কাঞ্চনগিরি-মুকুটশীর্ষে, চরণে সাগর বঙ্গ,
বক্ষে কেদার তীর্থ-বাহিনী করে কল্লোল রঙ্গ।
মহামহিমার বিপুল ছন্দে
তরু-কিশলয় দোলে আনন্দে
ছয় ঋতু নাচে ঘিরিয়া তোমার অমল শ্যামল অঙ্গ।
যুগে যুগে তুমি বীর-প্রসবিনী
জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-শোভিনী
দেশে দেশে তব শৌর্য্যকাহিনী বাজায় বিজয়-শঙ্খ।
শ্যাম কাম্বোজে ব্রহ্ম মালয়ে
চীন তিব্বতে অক্ষয় হয়ে
কীর্ত্তি তোমার মণ্ডিত,—তুমি দুর্ব্বার নিঃশঙ্ক।
আর্য্যদ্রাবিড় সিয়া-সুন্নীর
শোণিতে তোমার রঞ্জিত তীর
ব্যাঘ্র-বৃষভে এক করে মা গো রচেছ মিলন-সজ্ঘ।

পাখী

কে, এম, শমসের আলী

অলস মধ্যাহ্ন বেলা তাকাইয়া সুদূর গগনে
হেমন্তের জলহারা নবনীত শুভ্র মেঘস্তরে
কি যেন খুঁজিতেছিনু নিষ্পলকে একান্ত নয়নে,—
সহসা ডাকিল পাখী নাতিদূরে তরুশাখা 'পরে।
আমার অন্তর যবে অনামিকা প্রেয়সীর লাগি'
মরতের দুঃখ-গ্লানি অবহেলে করি' বিসর্জ্জন
স্বপনচারিণী-ধ্যানে আত্ম-ভোলা মুগ্ধ অনুরাগী,—
তুমি কোথা হ'তে আসি' অনায়াসে জুড়ালে শ্রবণ!
আকাঙ্ক্ষার যত কিছু কিংবা যত নিঃস্বতা হিয়ার
সহসা ভরিয়া গেল মনে লয় সুধাকণ্ঠ গানে;
আলেয়ার পিছে হাঁটা বুঝিলাম নিদারুণ ভুল।
ধরণীর ধূলিমাটী শ্যাম-শোভা তরুলতা ফুল
কান্না হাসি হাহাকার সবি যেন একান্ত আমার,—
মুহূর্ত্তে সম্বিৎ হলো, দীপ্ত আলো লভিনু পরাণে।

প্রথম অধ্যায়

৭

সঙ্কেত :—১১১ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের পর বরোদা-সংস্করণের পাদটীকায় ধৃত একটি পাঠান্তরে ছয়টি নূতন শ্লোক পাওয়া যায়। ঐ সকল শ্লোক বরোদা-সংস্করণের মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই—অন্য কোন সংস্করণেও ঐগুলি পাওয়া যায় না। তথাপি এতগুলি শ্লোক (যদিও তাহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই গণ্য হয়) অনূদিত না হওয়াও অনুচিত—এই বিবেচনার নিম্নে উহাদিগের ভাষান্তর প্রদত্ত হইল। শ্লোকগুলির পাঠ বহু প্রমাদ-কণ্টকিত—এ কারণে অনেক স্থলে যোজনা করাও যায় না। সেই হেতু এস্থলে ভাবানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল।—

(নাট্য) দুঃখিতগণের প্রমত্ত অংশ, শোকার্ত্ত তপস্বিগণের (বেচারিগণের) হিতোপদেশজনক—নানাবস্থান্তরাত্মক। প্রকৃতিগণ নানা-শীল-বিশিষ্ট ; (আর) শীল হইতেই নাট্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব, নাট্য-বক্তৃগণ-কর্ত্তৃক লোকপ্রমাণানুসারে (নাট্যরচনা) কর্ত্তব্য।

দেবতা-ঋষি-রাজা ও কুটুম্বগণের কৃতানুকরণ লোকে নাট্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা মহাভিলাষ-সম্পন্ন, বিদগ্ধ, যৌবনৈশ্বর্য্যশালী, তাঁহাদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত এই নাট্যবিধি প্রযোজ্য।

প্রায় সকল লোকেরই স্বভাবতঃ নৃত্ত অভীষ্ট। আর মাঙ্গলিক বলিয়া এই নাট্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রসব, লাভ, বিবাহ, হর্ষ, নানাবিধ অভ্যুদয়ে ও রাজগণের প্রস্থান-সময়ে এই নাট্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী—দুঃখিতগণের প্রমত্তাংশ—প্রমাদ বা অনবধানতাই দুঃখের মূল কারণ। তাই 'দুঃখিতগণের প্রমত্তাংশ' অর্থে—দুঃখিতগণের দুঃখকারণ যে প্রমাদ, তাহার যতটুকু অংশ প্রদর্শনীয়, তাহাই নাট্য। এরূপ অর্থ কোন রকমে টানিয়া করা চলে। 'প্রমত্তানাং' পাঠ হইলে অর্থ ভাল হয়—প্রমত্তগণের। দুঃখিত, প্রমত্ত, শোকার্ত্ত, তপস্বিগণের হিতোপদেশ-দায়ক নাট্য। তপস্বী—যাঁহারা তপস্যা করেন—এ অর্থ এ স্থলে ঠিক লাগে না। এ ক্ষেত্রে অর্থ—বেচারী, poor হইলেই ভাল হয়। অভিনব কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থ করিয়াছেন—পরে উহা প্রদর্শিত হইবে। নানাবস্থান্তরাত্মক—নানাবিধ অবস্থা-ভেদ যাহাতে প্রদর্শিত হয়। শীল—স্বভাব, চরিত। নানাশীলাঃ প্রকৃতয়ঃ—প্রজাপুঞ্জ সাধারণতঃ বিচিত্র স্বভাব ও বিচিত্র চরিত্রের হইয়া থাকে। শীলাৎ নাট্যং বিনির্ম্মিতম্ (মূল)—লোকচরিত্র অবলম্বনেই নাট্য-রচনা হইয়া থাকে। লোকপ্রমাণানুসারে নাট্য কর্ত্তব্য—লোকসমাজে যেরূপ চরিত্র প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ চরিত্র-চিত্র নাট্যে প্রদর্শনীয়। কৃতানুকরণ—কৃত কর্ম্মের অনুকরণ। মহেচ্ছাঃ (মূল)—মহাভিপ্রায়-বিশিষ্ট। বিদগ্ধ—পণ্ডিত ও রসিক, connoisseur অর্থ-সিদ্ধয়ে (মূল)—'অর্থ' —প্রয়োজন ; প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্য। প্রযোজ্য—প্রয়োগ কর্ত্তব্য। নৃত্ত—মহর্ষি ভরত নৃত্ত ও নৃত্যের ভেদ প্রদর্শন করেন নাই। এই শ্লোকটিতে তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, নৃত্ত স্বভাবতঃ লোক-মাত্রেরই প্রিয়। আর নাট্য কেবল জনপ্রীতিকর নহে, অধিকন্তু মাঙ্গলিক ব্যাপারও বটে। প্রসব—পুত্রাদির জন্ম। লাভ—রাজ্য-সম্পদাদির লাভ। অভ্যুদয়—উন্নতি। প্রস্থানসমূহে রাজ্ঞাম্—রাজগণের যুদ্ধাভিযান-কালে। এই সকল কালে মাঙ্গল্য আচার বলিয়া নাট্য-প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

এই পর্য্যন্ত পাদটীকার শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা। অতঃপর মূলানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

মূল :—[নাট্য—অর্থোপজীবিগণের অর্থ, উদ্বিগ্নচিত্তগণের ধৃতি (ধৈর্য্য) ।—]

(উহা) নানাভাবোপসম্পন্ন, নানাবস্থান্তরাত্মক। ১১১।

সঙ্কেত :—নানাভাবোপসম্পন্ন—নানাভাবযুক্ত। নানা ভাব—রতি-হাস-শোক ইত্যাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নানা রসান্তরাত্মক—নানাবিধ বিভিন্ন অবস্থার স্বরূপ-বর্ণনাই নাট্যের প্রাণ।

মূল :—লোকবৃত্তের অনুকরণ-স্বরূপ এই নাট্য মৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে।

সঙ্কেত :—বৃত্ত—আচরণ, চরিত্র ; লোকবৃত্ত—লোক-চরিত্র, লোকের আচরণ, লোকে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সকল ঘটনা। অভিনব-গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—এই নাট্য-ক্রীড়া লোকবৃত্তানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ, লোকে ধর্ম্মাদি আশ্রয়স্বরূপে পরিগৃহীত হয় না অর্থাৎ লোকে ধর্ম্মাদির প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞান অসম্ভব—শাস্ত্রমুখে বা আপ্তবাক্যানুসারে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞান করিতে হয়—নিজ-বুদ্ধিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না।—এই হেতু ধর্ম্মাদির আশ্রয়ভূত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ যে সকল চরিত্র (যথা—ধার্ম্মিক বলিয়া প্রথিত শ্রীরামচন্দ্র-যুধিষ্ঠিরাদি), সেই সকল চরিত্রই নাট্যে অনুকরণার্হ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

মূল :—উত্তম-অধম-মধ্যম নরগণের কর্ম্মাশ্রিত—। ১১২ ॥

হিতোপদেশকর, ধৃতি-ক্রীড়া-সুখাদিকৃৎ।—ইহা রস-সমূহে ভাব-সমূহে ও সকল কর্ম্মকরণে—॥ ১১৩ ॥

সকল প্রকার উপদেশ-জনক নাট্য লোকে হইবে।

সঙ্কেত :—কাশী-সংস্করণের পাঠ অনুসারে ভাষান্তর করিলে দাঁড়ায় উত্তম-অধম-মধ্যম নরগণের কর্ম্মাশ্রিত, হিতোপদেশ-জনক হইবে এই নাট্য। রসসমূহে ভাবসমূহে ও সকল প্রকার কর্ম্মকরণে সর্ব্বপ্রকার উপদেশজনক হইবে এই নাট্য।

১১২। কর্ম্মসংশ্রয়ম্ (মূল)—কর্ম্মে সংশ্রিত অর্থাৎ আশ্রিত। উত্তম অধম ও মধ্যম প্রকৃতির নরগণের কর্ম্মাবলী অবলম্বনে রচিত—নাট্য।

১১৩। হিতোপদেশজননম্ (মূল)—হিতোপদেশ-দায়ক। ধৃতি-ক্রীড়া-সুখাদিকৃৎ—ধৃতি (ধৈর্য্য), ক্রীড়া ও সুখ ইত্যাদি উৎপাদন করে। কাশীর পাঠে এ অংশটুকুর পরিবর্ত্তে পাঠান্তর—"নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি"। সর্ব্বকর্ম্মক্রিয়াসু (মূল)—সকল প্রকার কর্ম্মকরণের প্রক্রিয়ার উপদেশ নাট্যে পাওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য।

১১৪। সর্ব্বোপদেশজননং (মূল)—সর্ব্বপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকে (নাট্য) ; অথবা—"সর্ব্বোপদেশ" বলিতে বুঝিতে হইবে—সকলের উপদেশ ; সকলকেই উপদেশ দেয় এই নাট্য।

মূল :—দুঃখার্ত্ত, শ্রমার্ত্ত, শোকার্ত্ত, তপস্বিগণের—। ১১৪

কালে বিশ্রান্তি-জনক হইবে এই নাট্য।

ধর্ম্মপথ হইতে অপ্রচ্যুত, যশস্কর, আয়ুর্বর্দ্ধক, হিতকর, বুদ্ধি-বিবর্দ্ধক—। ১১৫

লোকের উপদেশ-জনক হইবে এই নাট্য।

সঙ্কেত :—১১৪। পাদটীকার শ্লোকে 'তপস্বী' শব্দটির অর্থ করিবার সময় বলা হইয়াছিল যে—তপস্বী বলিতে তপস্যাকারী—এরূপ অর্থ না করিয়া 'হতভাগ্য—বেচারী'—এইরূপ অর্থ করিলেই অধিকতর শোভন হয়। কিন্তু এই শ্লোকে অভিনবগুপ্ত 'তপস্বী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অনবরত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদির আচরণকারী—তপস্যাকারী।

অভিনব বলিয়াছেন—নাট্য প্রেক্ষকগণের বিশ্রান্তি-জনক। প্রেক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃখে ক্লিষ্ট, কিংবা পথ-গমনক্লেশাদি-জনিত শ্রমে শ্রান্ত, অথবা বন্ধুমরণাদি-জনিত শোকে আর্ত্ত, আর যে সকল তপস্বী অনবরত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদির আচরণে অতিশয় দুর্ব্বল-শরীর ও খিন্ন-হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, নাট্য তাঁহাদিগের সকলেরই বিশ্রান্তি-জনক অর্থাৎ—তাঁহাদিগের এই সকল নানাবিধ দুঃখ যাহাতে বাড়িতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করে—এক কথায় নাট্য দুঃখ-প্রসারের বিঘাতক। আবার যাঁহাদিগের দুঃখ প্রতিহত হইয়াছে, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য-ভাবে আহ্লাদ-ধৃতি ইত্যাদি উৎপাদন করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায়—নাট্য শোকার্ত্তের ধৃতি (ধৈর্য্য), শ্রমার্ত্তের সুখ উৎপাদন করিয়া থাকে ; তপস্বিগণের মতি ও বিবোধ জন্মাইয়া দেয়।

১১৫। কেবল ইহাই নহে—কালান্তরে নাট্য-কৃত উপদেশ পরিপাকজ সুখ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ—নাট্য-দর্শনে যে তাৎকালিক সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা তৎক্ষণ-মাত্র-স্থায়ী নহে—পরন্তু পরিণামেও সুখকর হইয়া থাকে। এমন অনেক সুখ আছে (যথা—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত সুখ, যথা—অতিরিক্ত মিষ্টান্নভোজনের যে সুখ), তাহা আপাততঃ সুখকর বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে উহার ফল-দান-কালে (বিপাক-কালে বা পরিপাক-সময়ে) অত্যন্ত দুঃখের জনক হইয়া থাকে। নাট্য সেরূপ সুখের জনক নহে। ইহা হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয়—তাহা দুঃখিতের দুঃখ-প্রশমন-পূর্ব্বক আপাততঃ সুখ-রূপে ত গণ্য হয়ই, অধিকন্তু কালান্তরেও নাট্য-কৃত উপদেশ সুখ-দায়ক হইয়া থাকে। ১১৫ শ্লোকে যে 'কালে' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে—উহার তাৎপর্য্য উক্তরূপ—কালান্তরেও এই নাট্য দুঃখার্ত্ত শ্রমার্ত্ত শোকার্ত্ত ও তপস্বিগণের বিশ্রান্তিজনক (দুঃখ-প্রসারের বিঘাতক) হইবে।

আর যাঁহারা অদুঃখিত—বহু সুখে লালিত-পালিত (যথা রাজ-পুত্রাদি), তাঁহাদিগের ধর্ম্মাদি-বিষয়ে বুদ্ধি-বৃদ্ধি করে এই নাট্য। লোকাচরিত এই সকল ধর্ম্মাদি উপায়বর্গ—নাট্যোপদেশের ফলভূত। তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহাদিগের দুঃখ ভোগ করিতে হয় না—চিরদিন সুখভোগে অভ্যস্ত, নাট্য তাঁহাদিগের দুঃখ প্রশমন করে না বটে, কিন্তু নাট্য-কৃত উপদেশ-দ্বারা সকল লোকের আচরণীয় ধর্ম্মাদি-বিষয়ে তাঁহাদিগের মতি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নাট্য ইঁহাদিগকে গুরুর ন্যায় উপদেশ দেয় না—এই কার্য্যটি ধর্ম্মজনক, অতএব ইহা কর, বা ইহা অধর্ম্ম, ইহা করিও না ; পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম-বিষয়ে আন্তরিক প্রবণতা বা নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া দেয়—অন্তর হইতেই ধর্ম্মাদি-বিষয়ে এই আকর্ষণ বা প্রেরণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—উহার নিমিত্ত বাহিরের কোন নির্দ্দেশ বা উপদেশের অপেক্ষা থাকে না। এই যে আন্তরিক নিষ্ঠাবৃদ্ধি, ইহা শুভবিষয়িণী নিষ্ঠা—অশুভবিষয়িণী বৃদ্ধি নহে ("বুদ্ধিং বিবর্দ্ধয়তি, স্বপ্রতিভামেবং তাদৃশীং বিতরতীত্যর্থঃ। ন চ সা দুষ্টা প্রতিভেত্যাহ—হিতম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)। কারণ, ইহা হিতকর—যেহেতু, হিতকরী বুদ্ধির জনক। তাহার হেতু—ইহা ধর্ম্ম্য ধর্ম্মপথ হইতে অবিচ্যুত—ধর্ম্মানুকূল। যশস্য—'যশঃ' বলিতে বুঝায় লোকে প্রসিদ্ধি-লাভের হেতুভূত অদ্ভুত-রসজনক বস্তু, যথা, শ্রীরামচন্দ্র-কৃত সপ্ততাল-বিদ্ধকরণাদি। এবম্ভূত যশের সুষ্ঠু উপদেশকর—এই নাট্য। আয়ুষ্য—'আয়ুঃ' বলিতে বুঝাইতেছে—আয়ুর্ব্বৃদ্ধির হেতুভূত আচার-সমূহ। সেই সকল আয়ুর্ব্বর্দ্ধক সদাচারের সুষ্ঠু উপদেশকর এই নাট্য (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

১১৬। লোকোপদেশজননম্ (মূল)—'লোক'-শব্দের অর্থ লোকবৃত্ত বা লোক-চরিত্র। বিচিত্র লোক-চরিত্রের যথাযথ চিত্রণই লোকোপদেশ-জনন—(অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

লোকোপদেশজনন—লোকবৃত্তের পরিচয়-প্রদান। অথবা—লোকের উপদেশ-জনক—এরূপ সরল অর্থও করা যাইতে পারে।

তাহা হইলে মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই যে—নাট্য বস্তুটি কি দুঃখিত কি অদুঃখিত উভয়েরই সমভাবে গ্রহণযোগ্য। দুঃখ দুই প্রকার—শারীর ও মানস। শারীর দুঃখও আবার ত্রিবিধ—দৈবকৃত, স্বয়ংকৃত ও পরকৃত। স্বয়ংকৃত দুঃখ আবার কোন ফললাভের আশায় কৃত অথবা অন্যরূপ (ফলাশাহীন) হইতে পারে। এইরূপ বিশ্লেষণে বুঝা যায়—দুঃখবর্গ ও দুঃখিতবর্গ সংখ্যায় অনেক। এই কারণে দুঃখার্ত্তগণের—এই বহুবচন-প্রয়োগ-দ্বারা বহু শ্রেণীর দুঃখে ক্লিষ্ট নানা ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

এই প্রসঙ্গে অভিনব আরও বলিয়াছেন—১০৮ শ্লোকে "ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রবৃত্তানাং"—এই বাক্যটি কেহ কেহ মধ্যে অকার-প্রশ্লেষ করিয়া সন্ধি-দ্বারা সেটিকে লুপ্ত-অকার-রূপে প্রদর্শন করেন, যথা—ধর্ম্মোঽধর্ম্ম-প্রবৃত্তানাম্"। যাঁহারা অধর্ম্মে প্রবৃত্ত—তাঁহাদিগের পক্ষে এই নাট্য ধর্ম্মোপদেশ-দ্বারা ধর্ম্মজনক—ইহাই তাৎপর্য্য। আর এইরূপ অর্থ করিলেই ১১৫ শ্লোকের 'ধর্ম্ম্যং' পদটির সার্থকতা হয়। কারণ, ১০৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে ইহা অধর্ম্ম-পথ-প্রবৃত্তগণের ধর্ম্মজনক ; আর ১১৫ শ্লোকে বলা হইল যে—যাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপথে আছেন, তাঁহারা যাহাতে ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট না হন, নাট্য সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকে—অর্থাৎ ইহা ধার্ম্মিকগণেরও ধর্ম্মোপদেশ-জনক। এইরূপ অর্থ করিলে আর পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আবার কেহ কেহ বলেন, না, তাহা নহে—ধর্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের নিকট ইহা (নাট্য) ধর্ম্মোপদেশ-দায়ক বলিয়া গণ্য হয়। হৃদ্গত অভিপ্রায়ের একতানতা-হেতু ধার্ম্মিকগণ মনে করেন—'নাট্য যেন আমারই মর্ম্মকথা (অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ) প্রকাশ করিতেছে'। যিনি যেরূপ ভাবের ভাবুক, তিনি নাট্যমধ্যে সেইরূপ ভাবেরই স্ফুরণ দেখিতে পান। তাই একই নাট্যবস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাবের উৎস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক—উভয়েই উপদেশ্য (অর্থাৎ উপদেশার্হ)—এই কারণে 'ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রবৃত্তানাং' ইত্যাদি বলিবার পরও 'ধর্ম্ম্যং' ইত্যাদি পুনরুক্তি করা হইয়াছে। আর একটি কথা—কেবল প্রাচীন পুরুষগণের প্রতি এই উপদেশ প্রযোজ্য নহে—অথবা, পুরুষার্থের (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের) উপায়মাত্র-সম্বন্ধে এ উপদেশ—এমনও নহে, কিন্তু যত কিছু উপায় (means) ও উপেয় (end) থাকা সম্ভব—সেই সকল সম্বন্ধেই—এ উপদেশ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪২) ;

মূল :—এমন কোন জ্ঞান নাই, এমন কোন শিক্ষা নাই, এমন কোন বিদ্যা নাই, এমন কোন কলা নাই—। ১১৬।

এমন কোন যোগ নাই, এমন কোন কর্ম্ম নাই—যাহা এই নাট্যে দৃষ্ট না হইয়া থাকে।

(সকল শাস্ত্র ও শিল্প, আর বিবিধ কর্ম্ম। ১১৭।

এই নাট্যে সমেত—অতএব ইহা মৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে।)

সঙ্কেত :—১১৬—১১৭। সপ্তদ্বীপ-গত ভাবানুকীর্ত্তন-স্বরূপ এই নাট্যে যাহা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ—হৃদয়-গোচর হয় না, তাদৃশ জ্ঞানাদিরই অস্তিত্ব নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৬। জ্ঞান—আত্মজ্ঞান; ইহার দৃষ্টান্ত বেণীসংহারে—"আত্মারামা বিহিতরতয়ো নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ" (১।২৩)—যাঁহারা আত্মারাম, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিবিষ্টচিত্ত ইত্যাদি।

শিল্প—চতুঃষষ্টি ললিত-কলার অন্তর্গত কর-কৌশলায়ত্ত—মালা-চিত্র ইত্যাদি।

বিদ্যা—দণ্ডনীতি ইত্যাদি। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা—চারিটি বিদ্যা। এতদ্ব্যতীত চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থান ইত্যাদি।

কলা—শিল্প ও কলার ভেদ অতি সূক্ষ্ম। শিল্প—কর-কৌশলাদি শারীরিক পরিশ্রম ও নিপুণতা মাত্র যাহাতে প্রকাশ পায়, যথা মাল্য-গ্রথনাদি। কলা—যাহাতে প্রতিভা, মনন-শক্তি, বুদ্ধি-কৌশলের প্রকাশ, যথা গীত-বাদ্যাদি। ইহাই অভিনবের অভিপ্রায়। পক্ষান্তরে, মহর্ষি বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্রাদি গ্রন্থে চতুঃষষ্টি ললিত-কলা-তালিকার মধ্যে মাল্য-গ্রথনাদি শিল্প ও গীত-বাদ্যাদি কলা—এতদুভয়ের একত্র সন্নিবেশই দৃষ্ট হয়—শিল্প ও কলার কোন ভেদ সে সকল গ্রন্থে করা হয় নাই।

যোগ—যোজনা। যোজনা দুই প্রকার—(১), শিল্প বিদ্যা ও কলা—এই চারিটি বিভাগের এক একটির নানাবিধ উপবিভাগ আছে। যে কোন একটি বিভাগের অন্তর্গত একটি উপবিভাগের সহিত সেই বিভাগেরই অন্য একটি উপবিভাগের যোগ প্রথম প্রকার যোজনা—ইহা স্বগত ভেদ-বিশেষের সহিত স্বগত ভেদান্তরের যোজনা—যথা—গীতের সহিত বাদ্য বা নৃত্যের যোগ। গীত-বাদ্য-নৃত্য—তিনই একটি বিভাগের (কলার) স্বগত উপবিভাগ মাত্র। (২) একটি বিভাগের একটি উপবিভাগের সহিত বিভাগান্তর-মধ্যস্থ কোন উপবিভাগের যোগ—অন্যোন্য-ভেদ-যোজন; যথা—শৃঙ্গার-সহ বৈদ্যক বিদ্যার যোজনা (দৃষ্টান্ত অভিনব দিয়াছেন, অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪২)।

কর্ম্ম—যুদ্ধ, বাহু-যুদ্ধাদি ব্যাপার। মূল—( ) ব্র্যাকেটের মধ্যবর্ত্তী ১১৭-১১৮ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়; কারণ, অভিনব উহা ধরেন নাই। কিন্তু কাশী-সংস্করণে উহা ১১৪-১১৫ শ্লোকরূপে পঠিত হইয়াছে। [ক্রমশঃ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

শ্রীসুবলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিশ্বের মাঝে নিঃস্ব করিয়া নিজেরে দিয়াছ ঢালি
স্রষ্টা তোমার সৃষ্টির মাঝে লুকানো রূপের ডালি।
মহিমা তোমার অগাধ অপার
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-পারাবার
তোমাকে ঘিরিয়া করিছে নৃত্য, করিবে চিরকালই
তুমি রবে চির-অজ্ঞাত প্রভু ষড়ৈশ্বর্য্যশালী।

ভুবনে ভুবনে নিত্য তোমারে বিত্ত করিবে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিবে তোমারই জয়গান।
তোমারি করুণা হাস্যে লাস্যে
জড়িত রহিবে শিশুর আস্যে
তব নামসুধা করিবে বসুধা চাতকের সম পান
অশ্রুর মাঝে রহিবে গো চির ভক্তের ভগবান।

সৃষ্টির মাঝে আছ আচরিত নিতি নব নব সাজে
রূপে, রসে আর গন্ধে স্পর্শে তোমারি সত্তা রাজে।
দয়া, মায়া, প্রেম, অনুরাগ, প্রীতি
মহতী করুণা মহতের রীতি
অভিনব তব অভিব্যক্তি হর্ষে, দুঃখে লাজে
বিশ্বরূপেতে বিশ্ব সেজেছ বিধাতার বরসাজে।

মোরা খুঁজি হায় তীর্থে তীর্থে, বিগ্রহে, দেবালয়ে
তুমি থাক নাথ সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার রূপ লয়ে।
সদা আছ তাই তুমি সনাতন
সচ্চিদানন্দ তাপসের ধন
গরলের মাঝে অমৃতধারা মা ভৈঃ মরণ-ভয়ে
সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কারণ তুমি আছ এক হয়ে।

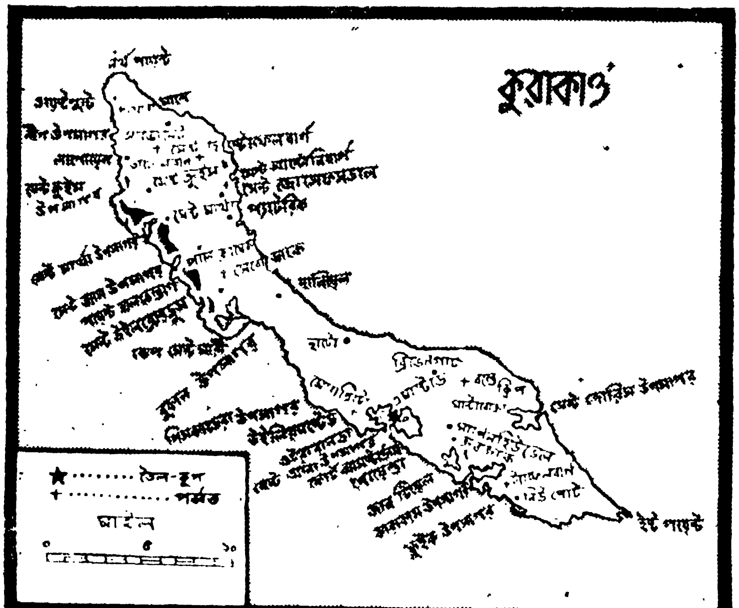
চিরসাথী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

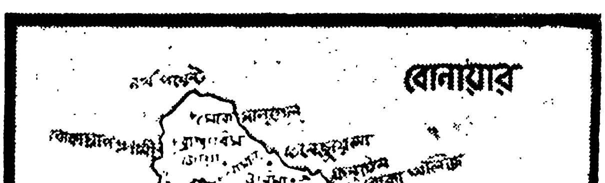
দুখের নিশায় সবে গিয়েছিল ফেলি'
ধরণীর এক প্রান্তে মোরে অবহেলি'।
ডেকেছিনু কত—কেহ দেয়নি উত্তর,
প্রলয়ের ঘনঘটা মাথার উপর!
শিহরিয়া উঠেছিনু হেরি' দীপ্যমান
দামিনীর ছটা! শুধু শরণের স্থান
খুঁজিয়া ফিরিতেছিল আকুল এ প্রাণ!
অলখে রহিয়া কোথা দয়াময় স্বামী,
বলেছিলে "ভয় নাই—এই আছি আমি!"
দুঃসহ শোকের মাঝে শুধু অনুক্ষণ
আহত ক্রৌঞ্চের মত ক'রেছি ক্রন্দন।
কেহ আসে নাই ছুটে—দেয়নি সান্ত্বনা,
জাগে নাই কারো বুকে করুণার কণা।
হাহাকারে কাটাইয়া নিদ্রাহীন রাতি,
খুঁজেছি ব্যথার ব্যথী—মরমের সাথী!
সে ঘোর দুর্দ্দিনে মোর দয়াময় স্বামী,
ব'লেছিলে "ভয় নাই,—এই আছি আমি!"
এক দিন হবে মৃত্যু নিশ্চয় সে জানি,
জীবনের যবনিকা ধীরে দিবে টানি'।
এ ধরার দৃশ্যপট শেষ হবে দেখা,—
একাকী এসেছি ভবে—যেতে হ'বে একা!
অজানা অচেনা দেশে নিঃসঙ্গ হৃদয়
খুঁজিয়া ফিরিবে সাথী সকল সময়।
সে দিন দাঁড়ায়ে পাশে কহিবে কি স্বামী—
"ভয় নাই, ভয় নাই—এই আছি আমি!"

আরুবা-কুরাকাও

নামটা শুনাইতেছে হেঁয়ালির মত! কিন্তু হেঁয়ালি নয়! আরুবা, কুরাকাও এবং বোনায়ার তিনটি দ্বীপ। কলম্বিয়া-ভেনেজিউলার উত্তরে, হাইতি-কিউবার দক্ষিণে এবং পানামা-কেনালের পূর্ব্ব দিকে



কারিবীয়ান সাগর; সেই সাগরের বুকে আরুবা, কুরাকাও এবং বোনায়ার দ্বীপের অবস্থান। কথায় বলে, ভূমি লক্ষ্মী! আজ এই যুদ্ধের মরশুমে এই তিনটি দ্বীপ নানা বৈশিষ্ট্যে মিত্রপক্ষের বিজয়-লক্ষ্মী-লাভে পরম সহায় হইয়াছে।



আরুবা এবং কুরাকাও—এ দু'টি দ্বীপ ডাচ-শক্তির অধিকার-ভুক্ত। এ তিনটি দ্বীপে পেট্রোলের পাথার আছে—এবং সে পেট্রোল আজ মিত্রপক্ষের প্লেন, ট্যাঙ্ক এবং জাহাজগুলিকে সজীব ও সচল রাখিয়া ফৌজ এবং রসদপত্র জোগানোর কাজকে করিয়াছে যেমন সহজ, তেমনি নিরুপদ্রব। চার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে—যে সময়ে জার্ম্মানি ডাচ-শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, তখন বৃটিশ এবং ফরাসী-শক্তি বিপুল উদ্যমে আরুবা এবং কুরাকাওয়ে পেট্রোল-ভাণ্ডার-রক্ষার্থে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। তারা তখন প্রভূত ফৌজ পাঠাইয়া এই আরুবা এবং কুরাকাওকে দুরধিগম্য করিয়া তুলিয়াছিল। পরে ফ্রান্সের পতনে ফরাসী-ফৌজ এ দুই দ্বীপ হইতে অপসারিত হয় এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিণ ফৌজ গিয়া বৃটিশ ফৌজে সঙ্গে মিলিত হইয়া এ দুই দ্বীপের রক্ষা-ভার গ্রহ করে। এখনো পর্য্যন্ত মার্কিণ এবং বৃটিশ-ফৌ এ দুই পেট্রোল-ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছে। ডাচ গভর্ণমেন্টের আহ্বানেই অবশ্য এ ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃটিশ ও মার্কিণ ফৌজের আগমনের সংবাদ পাইয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী জার্ম্মানরা এখান কার জলপথে টর্পেডো চালনা এবং আরুবা পেট্রোলের ভাণ্ডারে ও গুদামে শেল বর্ষণ করিয়া ছিল। তার ফলে মিত্রপক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক মা নষ্ট হইয়াছিল—কোনো শেল পেট্রোল-ভাণ্ডার আঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এ দুই দ্বীপ-রক্ষায় সশস্ত্র মার্কি প্রহরীর এক-নিমেষ বিরাম নাই। কাজ এম নিখুঁত যে, জার্ম্মান-বোমা এ দুই দ্বীপের কাছেও কখনো ঘেঁষি পারে নাই।

জার্ম্মানরা পরে হলাণ্ড অধিকার করিয়াছে এবং ডাচ-ইণ্ডি আজ জাপানের হস্তগত; কিন্তু এখানকার কয়টি দ্বীপে আজো ডা শক্তি অক্ষত অটুট আছে। এই কয়টি দ্বীপ এবং দক্ষি আমেরিকার উপকূলে সুরিনাম ও ডাচ-গায়েনা মাত্র এ ডাচের হাতে অবশিষ্ট আছে।

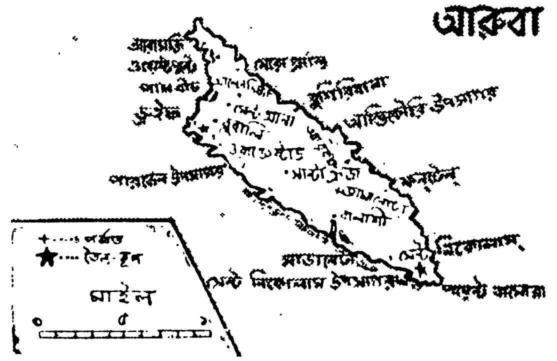
কুরাকাওয়ের ক'মাইল দূরে বোনায়ার দ্বীপ এবং সু সুবা, সেণ্ট ইয়সটেটিয়াস এবং লীওয়ার্ড দ্বীপাবলীর সেণ্ট-মার্টি নামক দ্বীপের অংশও ডাচ-হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই শেষোক্ত দ্বীপের বাণিজ্য সম্পর্কিত মূল্য সামান্য এবং এগুলি লোকের বসতিও খুব অল্প।

কুরাকাও, আরুবা এবং সুরিনাম—এই তিনটি দ্ব হলাণ্ডের সম্পদ-লক্ষ্মী। পেট্রোল, বক্সাইট এবং এলুমিনিয়াম এ কয় সম্পদে তিনটি দ্বীপ রীতিমত সমৃদ্ধ। তাই এ সম্প রক্ষার জন্য হলাণ্ড আজ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরুবায় এবং কুরাকাওয়ে পেট্রোলের খনি নাই; মা কাইবো হ্রদ এবং দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী ভেনেজিউ উপকূল হইতে প্রচুর পেট্রোল আনিয়া এ দ্বীপগুলির বি ভাণ্ডারে তাহা সংরক্ষিত হয়। সাগরের দেহ এখানে শী সে জন্য মারাকাইবো বা ভেনেজিউলার উপকূলে বড় বড় জাহাজ না; আরুবার চারি দিকে জল বেশ গভীর এবং বন্দর হিসাবে কুরা অতুলনীয়। এই কারণে ভেনেজিউলা ও মারাকাইবো হ্রদ হ পেট্রোল আনিয়া এ দুই দ্বীপে ভাণ্ডারজাত করা বিশেষ সুবিধাজন

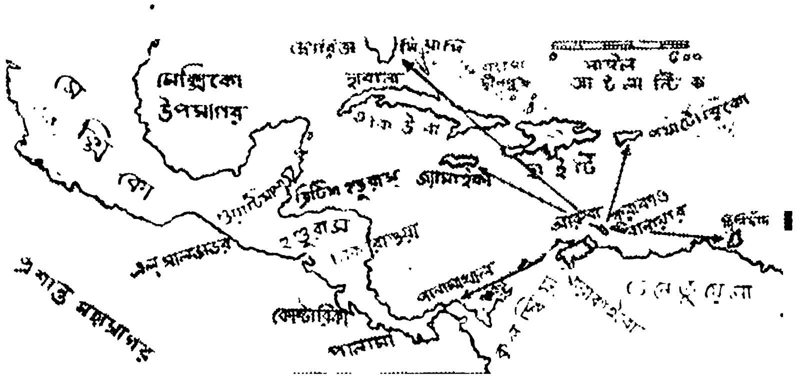
মারাকাইবো হ্রদের পরিসর বিপুল। হ্রদের চারি দিকে

অরণ্য। হ্রদের জল ও তীর-ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪০০০০ বর্গ-মাইল এবং এই বিস্তীর্ণ অংশের নীচে পেট্রোলিয়ামের বিরাট স্তর।

দ্বীপগুলির আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে মনে হয় হলাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ। উইলেমষ্টাড কুরাকাওয়ের প্রাচীন সহর ও রাজধানী।



এখানকার বাড়ী-ঘর পথ-ঘাট ডাচ আদর্শে বিনির্ম্মিত হইয়াছে—পথের নাম, মহল্লার নাম ডাচ। ডাচ আকৃতি-প্রকৃতির জন্য বিস্ময়ের কিছু নাই। তার কারণ, ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ দ্বীপগুলি আছে ডাচ-অধিকারে। সভ্য সমৃদ্ধ নিউ-ইয়র্ক যখন নিউ-নেদার্লাণ্ড নামে পরিচিত ছিল এবং সেখানে যখন বর্ব্বর ইণ্ডিয়ান জাতি লুণ্ঠন



দ্বীপমালা

করিত, তখন কুরাকাওয়ের ডাচ গবর্ণর কুরাকাও হইতে ফৌজ পাঠাইয়া সেখানকার অশান্তি-উৎপাত দমন করিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরকে অতিরিক্ত ডিউটি দেওয়া হয়—কুরাকাও, আরুবা, বোনায়ার দ্বীপগুলি শাসনের উপর নিউ-ইয়র্কের শাসন-পালনের দায়িত্ব বহন করার। এই গবর্ণরের নাম ছিল পীটার স্তুভেসান্ত। আজ আমেরিকা সে ঋণ শোধ করিতেছে আরুবা কুরাকাও এবং বোনায়ার রক্ষার জন্য মার্কিণ ফৌজ পাঠাইয়া।

বন্দর হিসাবে উইলেমষ্টাড অতুলনীয়। তার কারণ, ইহার গায়েই সেণ্ট আনা উপসাগর। এই উপসাগরটি সুগভীর এবং ইহার সুদীর্ঘ দেহ বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তার পরই স্কোটেগাটে আর একটি উপসাগরে গিয়া অঙ্গ মিশাইয়াছে। এখান পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। এই দুই উপসাগরের সমগ্র তীর-ভূমি বড় বড় অসংখ্য ট্যাঙ্কারে আজ সুরক্ষিত। ট্যাঙ্কারগুলি এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, বাহির হইতে সেগুলির চিহ্ন দেখা যায় না। বন্দরের কূলে বহু পেট্রোল-ভাণ্ডার! সেগুলিও এমন ভাবে অস্ত্র-শস্ত্রে সংরক্ষিত এবং আচ্ছাদিত রাখা হইয়াছে যে, বাহির হইতে তাদের অবস্থান-নির্ণয় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

উপসাগরের বুকের উপর দিয়া পোনটুন-সেতুযোগে উইলেমষ্টাড পোয়েস্তা এবং নূতন সহর অণ্ড্রাবাণ্ডা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ। বড় জাহাজ উপসাগরের কূলে আসিবামাত্র লোহার মোটা শিকলে পুলটিকে উঁচু করিয়া তোলা হয় এবং জাহাজ উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করে। পুল তোলা এবং ফেলার কাজ দিনে বহু বার করিতে হয়; কারণ, এ উপসাগরে জাহাজ-যাতায়াতের বিরাম নাই। এ-পথে বছরে প্রায় ছ'হাজার বড় জাহাজ যাতায়াত করে। এই ৬০০০ জাহাজের ওজন দাঁড়ায় মোট ২৭০০০০০০ টন! এ জন্য মোটর-বাইক-যাত্রী, ও পথ-চলা পথিকের পক্ষে এক সহর হইতে অপর সহরে যাতায়াতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। পূর্ব্বে কলিকাতার হাওড়া পোন্‌টুন্ ব্রীজে যে ব্যবস্থা ছিল—পুল খোলা থাকিলে মোটর-বোটে, নৌকায় বা ষ্টীমারে চড়িয়া পার হওয়া—এখানে তেমনি মোটর-বোটে পারাপারের ব্যবস্থা আছে।

পোয়েস্তার কাছে সাগরের মুখে প্রাচীন আমষ্টার্ডাম দুর্গ। বন্দরমুখী জাহাজকে এই দুর্গের প্রস্তর-পরিখা হইতে সিগনাল নির্দ্দেশ করা হয়।

পুল-প্রাকারের পরেই গবর্ণরের বাসগৃহ। গৃহের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারি দিকে যত সরকারী অফিস, ডাকঘর এবং গির্জ্জা। গবর্ণরের বাস-গৃহের পাহারাদারী করে ডাচ প্রহরীরা। তাদের কাঁধে খোলা সঙ্গীন, মাথায় খড়ের বাঁটদার টুপি।

এখানকার পুলিশ-প্রহরীরা পিঠে বন্দুক রাইফেল তুলিয়া পথে-ঘাটে পাহারা দেয়। তাদের উর্দ্দীর রঙ সবুজ—মাথায় টিনের হ্যাট। এখন মার্কিণ পুলিশও পাহারার কাজ করিতেছে। পথে জীপ এবং লরির বিরাট ভিড়। কুরাকাও দ্বীপের লোক-সংখ্যা প্রায় ৬৫০০০। ইহার অর্দ্ধেক লোক উইলেমষ্টাডে বাস করে; বাকীর মধ্যে অধিকাংশের বাস এমাষ্টাডে—পেট্রোল-ভাণ্ডারের কাছাকাছি। এখানকার অধিবাসীরা বর্ণসঙ্কর। প্রাচীন কালে কুরাকাও ছিল দাস-ডিপো—চাষ-আবাদের কাজ করিত নিগ্রোর দল।

এখানে একটি হিব্রু-মহল্লা আছে। বহু ইহুদী আসিয়া আশ্রয়-নীড় বাঁধিয়া ছিল। আধুনিক ইহুদীরা তাদের বংশসম্ভূত।

এখানকার বাজার ইষ্ট-ইণ্ডিয়ানদের হাতে। পেট্রোল-ব্যবসায়ের জন্য নানা জাতি এখন এ দ্বীপে আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে।

জার্ম্মান-অভিযানের পূর্ব্বে আরুবায় প্রায় ৪১টি বিভিন্ন জাতের



কুরাকাওয়ের পথে মার্কিণ ফৌজ

নর-নারী বাস করিত। আরুবার জন-সংখ্যা কুরাকাওয়ের সংখ্যার অর্দ্ধেক।

এখানকার সরকারী ভাষা ডাচ। আদিম অধিবাসীর ভাষা পালিয়ামেণ্টো অর্থাৎ স্পানিশ, পোর্ত্তুগিজ এবং ডাচ ভাষার খিচুড়ী! এমন বিচিত্র মিশ্র ভাষা পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে নাই।

ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সব গৃহই রঙ-করা। সাদা রঙের বাড়ী এখানে আদৌ নাই। কোন্ ডাচ গবর্ণর না কি বাড়ীর সাদা রঙে রৌদ্রতাপ বেশী বলিয়া সহিতে পারেন নাই, তাই ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে বাড়ীর সাদা রঙ ঢাকিয়া রঙীন করিতে বাধ্য করেন। সে জন্য সব বাড়ীর রঙ হয় নীল, নয় সবুজ, নয় হলুদ। গবর্ণরের গল্পটি সত্য কি মিথ্যা জানা যায় নাই, তবে সরকারী অফিসগুলিতেও সাদার ছোপ কোথাও নাই! সেগুলি নানা রঙে রঙীন্ রামধনুর মত দেখায়!

ব্ল্যাক-আউটের জন্য বাড়ী-ঘরের এই রঙে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়! এখানে দিন-আর-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান —দিন ছোট, রাত বড় কিম্বা দিন বড়, রাত ছোট—সে বালাই নাই, কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্র মানুষ গিয়া বিছানায় ঢুকিবে, সে বড় কষ্টকর; অন্ধকারে জোনাকির মত মিট-মিটে আলোকে মানুষ জীবনাতিপাত করিতেছে!

কয়টি দ্বীপেই মনসা-গাছের সুগভীর জঙ্গল আছে। বাতাস বহিতেছে অবিরাম একঘেয়ে ভাবে উত্তর-পূর্ব্বে। এই বাতাস ট্রেড-উইণ্ড নামে অভিহিত। প্রকৃতির গুমট ভাব এ সব দ্বীপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই ট্রেড-উইণ্ড না থাকিলে কেহ স্বচ্ছন্দ ভাবে বাস করিতে পারিত না। পেট্রোল পরিশুদ্ধির কারখানাগুলিতে আজ যে রাশি-রাশি কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইতেছে, এই অবিচ্ছিন্ন অবিরাম ট্রেড-উইণ্ডের (মরশুমী হাওয়ার) কল্যাণে সে-ধূম নীচে নামিতে বা থিতাইতে পারে না, সে জন্য আকাশ নির্ম্মল থাকে, লোকের শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

এখানে জলের কষ্ট অত্যন্ত বেশী। বৃষ্টিপাত কদাচিৎ হয়। খুব বেশী বৃষ্টি হইল তো বছরে তার পরিমাণ বড় জোর বিশ ইঞ্চি মাত্র। দু'বছর চার বছর হয়তো এক-বিন্দু বৃষ্টিও পড়িল না, এমন ঘটনা বিরল নয়—তবে ডাচ উইণ্ডমীল আছে; সেগুলির সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিয়া সেই জল ক্ষেতে সেচন করা হয় এবং মানুষ সেই কূপের জল খাইয়া প্রাণধারণ করে। তাছাড়া এ সব দ্বীপে এক-জাতের গাছ আছে, সে-গাছের ডাল-পালার জল-পরিশুদ্ধি-শক্তি অসাধারণ—সেই



পোনটুন ব্রিজ—ফোর্ট আমষ্টার্ডাম

ডাল-পালা দিয়া সমুদ্রের জল এবং অপরিষ্কার জল পরিশুদ্ধ ও লবণমুক্ত করিয়া পানের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ের কোলে বা ছায়ায় ছাড়া অন্য কোথাও গাছ-পালা জন্মায় না। ফুল-ফলের বাগান তৈরী করিয়া সে সব বাগানে জল দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে এ সব দ্বীপে ফুল বা ফল ফলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে যে সব ফল-মূল খাদ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, সে সব চালান আসে ভেনেজিউলা হইতে। কুরাকাওয়ে কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। লেবুর খোলা কিন্তু সবুজ থাকে, হলুদ-বরণে পাকিয়া ওঠে না। সেই সবুজ খোলা শুকাইয়া তাহা দিয়া সুরাকে সুরভিত করা হয়। মদের ভাঁটি সব হলাণ্ডে; লেবুর শুষ্ক খোলা বস্তাবন্দী হইয়া হলাণ্ডে চালান যায় এবং আমষ্টার্ডাম ও হামবুর্গের ভাঁটিতে সে সব খোলা হইতে সুরভি নিষ্কাশিত করা হয়।

দ্বীপগুলির ভৌগোলিক অবস্থানে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে—উপসাগরের শাখা-প্রশাখা ভূভাগের মধ্যে এমন ভাবে প্রসারিত যে, গভীর অভ্যন্তর-ভাগেও বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এ দিক্ দিয়া স্কোটেগাট সব বিষয়ে অতুলনীয় ; এবং বন্দর হিসাবে সর্ব্বোত্তম। এ সব জায়গায় প্রবেশ সাগর-পথে। প্রবেশ-পথ সঙ্কীর্ণ, একটু পরেই কিন্তু দিগন্ত-প্রসারী জল-বিথার। এই কারণে এ বন্দরে একসঙ্গে বড় বড় বহু জাহাজের স্থান-সঙ্কুলানে এতটুকু অসুবিধা ঘটে না।

কুরাকাওয়ে বারোটি পাহাড় আছে ; সেগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পোর্ট ক্রিষ্টিফেনবার্গ সব চেয়ে বড়—প্রায় ১২০০ ফুট উঁচু। অপর প্রান্তে অতি-উচ্চ পাহাড় টাফেল বার্জ বা টেবিল পাহাড়—ক্যালসিয়াম ফশফেটের স্তূপ। এ পাহাড়টি কারাকাশ ও ফুইক উপসাগরের বক্ষলীন হইয়া বিদ্যমান। পাহাড় কাটিয়া কুলি-



ফণী-মনসার ঝোপের আড়ালে ফৌজের ছাউনি

মজুরের দল গাড়ী বোঝাই করিয়া ক্যালসিয়াম-ফশফেট আনিতেছে সাগরের কূলে ; সেখান হইতে জাহাজে করিয়া চালান যায়।

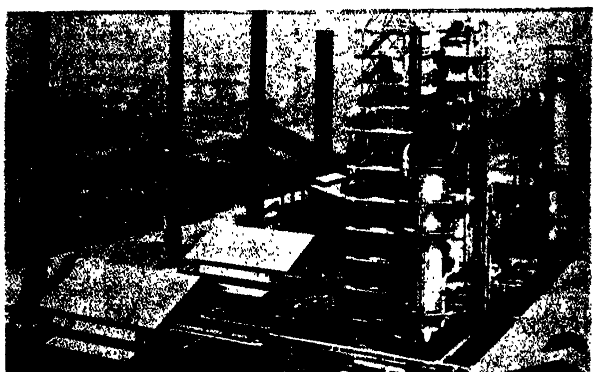
এখানে পেট্রোল-ভাণ্ডার খুলিবার পূর্ব্বে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোক শুধু টুপি তৈয়ারী করিয়া দিন-গুজরান করিত। মারাকাইবো অঞ্চলে এক-জাতের তাল গাছ জন্মায় অজস্র-পরিমাণে—পামেটো। সেই পামেটোর পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহা দিয়া হ্যাট তৈয়ারী হইত। এখন পেট্রোলের কারখানায় মজুরী মেলে অনেক বেশী, তাই টুপির বাজার পড়িয়া গিয়াছে।

ডাচ-আমলের পূর্ব্বে যখন এখানকার অধিবাসীদের নানা ভাবে ভুলাইয়া দাস-রূপে পণ্য-হিসাবে চালান দেওয়া হইত, তখন এখানে ইক্ষু এবং তামাকের চাষ প্রচলিত ছিল ; কিন্তু বৃষ্টির অভাবে এবং আরো নানা কারণে সে-চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিন এখানে পেট্রোলের সন্ধান মিলিয়াছে, সে দিন হইতে দৈন্য-দারিদ্র্যের যেমন অবসান হইয়াছে, তেমনি নানা দেশ হইতে বহু লোক আসিয়া জন-সংখ্যাকেও বিপুল করিয়া তুলিয়াছে। পেট্রোলের কাজে কুলি-মজুর আসিয়াছে সুরিনাম এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে।

এখানকার কয়টি দ্বীপ আসলে কিন্তু কাঁটা-মনসার আড্ং। এত জাতের কাঁটা-মনসার দেখা মিলে যে, শুধু এই কাঁটা-মনসার তত্ত্বানুশীলনেই এখানে বহু জ্ঞানী-গুণীর আনাগোনা আছে। উইলেমষ্টাডে যে মার্কিণ ভাইস-কনশল আছেন, কাঁটা-মনসায় তাঁর এত বেশী অনুরাগ যে, নিজের বাড়ীর বাগানে তিনি ৬৩ জাতের কাঁটা-মনসা লাগাইয়া সযত্নে তাদের লালন করিতেছেন।

গাধা এখানে প্রধান বাহন। গাধা এবং ছাগল এত যে, পথে-ঘাটে বেওয়ারিশ গাধা-ছাগল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যার খুশী ধরিয়া পুষিতে বা পণ্য-হিসাবে বেচিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। সম্প্রতি মার্কিণ সেনারা প্রমোদ-বিচরণের উদ্দেশ্যে গাধার পিঠে চড়িয়া বেড়ায়। কাঁটা-মনসার জঙ্গলে অসংখ্য মার্কিণ ছাউনি পড়িয়াছে ; সে-সব ছাউনিতে মার্কিণ ফৌজের বাস। কাঁটা-মনসার ঝোপের আড়ালে ছাউনিগুলি নিরাপদ। ছাউনি ঢাকিবার জন্য নকল আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় নাই।

এখানকার ডাচ এবং মার্কিণ নৌ-বাহিনী সম্মিলিত ইউনাইটেড



পেট্রোল-রিফাইনারী—কুরাকাও

ষ্টেটস নেভির অধীন। হল্যাণ্ডের পতন হইলে সমস্ত ডাচ সদাগরী জাহাজ এই সব দ্বীপে আসিয়া জমিয়াছে ; ডাচ বিমান-বিভাগের প্রধান অফিসও কুরাকাওয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আরুবা হইতে কুরাকাও, বোনায়ার এবং মারাক দ্বীপ পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল পথে বিমান-পোতের পাড়ি চলিয়াছে অবিরাম। এ-সব জায়গা হইতে বিমান-পোতে সামরিক ও বেসামরিক যাত্রী দল নিত্য জ্যামেকায় যাতায়াত করিতেছে।

কুরাকাওয়ের ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে বোনায়ার। সপ্তাহে কুরাকাও হইতে দু'দিন এখানে বিমান-মেল-যোগে ডাক যাতায়াত করে। বোনায়ারে পেলিকান পাখীর বাস। এখানে লোক-সংখ্যা ৫০০০ মাত্র। তাহাদের জীবন-যাপনের প্রণালী খুবই সাদাসিধা। এখানে পেট্রোলের ভাণ্ডার নাই—তাই ঘাঁটি পাহারারও প্রয়োজন নাই। বোনায়ারে বহু জার্ম্মানকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাদের পাহারাদারীর জন্য এক দল সশস্ত্র ফৌজ আছে। এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে লবণ সংগ্রহ করে ; সেই লবণ চালান দেয়। ক'জাতের গাছ গাছড়া এখানে পাওয়া যায় ; সে সব গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। সে সব গাছ-গাছড়া সংগ্রহ এবং চালান দেওয়া—এ-কাজেও অর্থ উপার্জ্জন মন্দ হয় না।

বোনায়ারের প্রধান সহর ক্রালেশডাইক্—ছোট গ্রাম। এই গ্রামে ছোট লাটের আস্তানা।

আরুবা—আয়তনে ৬৯ বর্গ-মাইল মাত্র। এখানে পেট্রোলের ভাণ্ডার আছে। এখানকার লাগো অয়েল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি এবং ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির ভাণ্ডার ও কারখানা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরুবায় এখন প্রায় ২৫০০ আমেরিকানের বাস। প্রধান সহর ওরানজেষ্টাড। এখন সামরিক ঘাঁটি, ট্যাঙ্ক ও আর্মাড কারে বোঝাই।

এ সব দ্বীপে ডিভি-ডিভি নামে এক জাতের গাছ আছে—একঘেয়ে ট্রেড-উইণ্ডের জন্য সেগুলির ডালপালা এক বিচিত্র রূপে বাড়িয়া ওঠে। দেখিলে মনে হয়—গাছ যেন বাতাসে আঁচল মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এ গাছের এক-রকম শুঁটি হয়। সেই শুঁটি ট্যানিংয়ের কাজে লাগে বলিয়া জাহাজ-বোঝাই হইয়া চালান যায়।



ফোর্ট আমষ্টার্ডামে ডাচ নৌ-বাহিনী

আরুবায় আরো এক জাতের গাছ জন্মায়, সে গাছের পাতার নির্য্যাস বিরেচক হিসাবে চমৎকার। আগাছার মত এ গাছ অজস্র পরিমাণে জন্মায়। এ গাছের পাতা কাটিয়া লোকে সেই পাতার নির্য্যাস সংগ্রহ করে; সংগ্রহ করিয়া জ্বাল দেয়; জ্বাল দিবার পর যে জমাট কাই তৈয়ারী হয়, সেই কাই চালান দেয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বিরেচক হিসাবে এ কাই সমাদরে গ্রহণ করেন।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আরুবায় স্বর্ণের সন্ধান মিলিয়াছিল। শুধু জলে নয়; পাহাড়ের গায়ে, পাথরের বুকেও স্বর্ণরেণু মিলিয়াছিল, সে জন্য নানা স্বর্ণ-কামী কোম্পানি বহু বার এখানে ফাঁদ ঘাড়ে করিয়া আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছিল; তবে দু'-দশ বছর পরে সকলেই আস্তানা তুলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কারিবীয়ানের বুকে যে কয়টি দ্বীপ পাশাপাশি অবস্থিত, সেগুলির মধ্যে চাষ-আবাদের যোগ্য উর্ব্বর ভূমি আছে শুধু এই আরুবায়। এখানকার অধিবাসীরা প্রাচীন আরাওয়্যাক বংশসম্ভূত। ইহাদের গায়ের বর্ণ বাদামী, মুখ-চোখ নিগ্রো ছাঁদের।

এই সব নগণ্য দ্বীপের পরিচয় জগৎ-সভায় সকলের অজ্ঞাত ছিল—আজ যুদ্ধের দৌলতে এই সব নগণ্য দ্বীপ গণ্যমান্য ও পাংক্তেয় হইয়াছে।



সার-সার পেট্রোল-ট্যাঙ্ক—কুরাকাও রিফাইনারী

পানামা-কেনাল হইতে এ দ্বীপগুলি মাত্র ৭০০ মাইল দূরে। কুরাকাও এবং আরুবা যে যথাসময়ে সচেতন হইয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিল, তার ফলে জার্ম্মানির প্রতাপ অনেকখানি খর্ব্ব হইয়াছে, মিত্রপক্ষের পেট্রোল প্রভৃতির জোগান অব্যাহত রাখিয়া নিজেদের দুর্দ্ধর্ষ করিতে পারিয়াছে। এ জন্য আরুবা এবং কুরাকাও এ যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

"দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা; আর এক, হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি।"—বঙ্কিমচন্দ্র



(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৭

উলুন্দীতে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ। মাখন গাঙ্গুলি যাইবেন না। মেয়ের বৌ-ভাতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার রীতি এ বংশে নাই! সুশীল গিয়া ধরিল পরেশ মামাকে; বলিল,—নেহাৎ আমরা যত ছেলে-ছোকরার দল যাবো, তাতে আপনাদের গাঙ্গুলি-বংশের মান থাকবে কেন মামা? আপনার যাওয়া চাই-ই! পরেশ বাবুর গৃহে বজ্রি আসন্ন···যদি গোলযোগ বাধায়! তাই তিনি সুশীলের কথায় 'না' বলিতে পারিলেন না!···

গ্রামের ক'জন মাতব্বরকেও পাওয়া গেল। বড়-মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ-যাওয়ায় গৌরব! তাহাতে মান বাড়ে! শিবকৃষ্ণও সাজিয়া গুজিয়া তৈয়ারী হইল···কেশব-ঠাকুরও। এবং···অর্থাৎ দলটি বেশ পুরু হইয়া উঠিল।

সেখানে আড়ম্বরের অন্ত নাই! নদীর ঘাট হইতে বাঁধা রোশ-নাইয়ের ব্যবস্থা! ঘাট হইতে বাড়ী নেহাৎ কাছে নয়—মোড়ে-মোড়ে নহবৎখানা···বাদ্য-সমারোহ···কুটুম্বদের লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী-পালকি···

দেখিয়া চালশার দল বলিল—হ্যাঁ, ঘটা জানে বটে!

বাড়ী লোকারণ্য। শুধু উলুন্দীর নয়, পাশাপাশি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক একেবারে ঝাঁটাইয়া জড়ো হইয়াছে। সামিয়ানা-ঢাকা বিরাট প্রাঙ্গণে বাই-নাচের আসর। কলিকাতা হইতে আসিয়াছে আখতার জান্। তার খ্যাতি এখন দিল্লী-বোম্বাইকেও না কি টেক্কা দিয়াছে! সে আসরে জাঁকাইয়া বসিয়াছেন মোটা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া বিরাটেশ্বর! সুশীলকে দেখিয়া বিন্দুমতীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাকে টানিয়া তিনি পাশে বসাইলেন।

আখতার জানের নাচ বেশ জমিয়াছে। তবু যে জন্য আসা···ভোজন—সেই ডাকটির জন্য রবাহূতের দল অধীর!

বিরাটেশ্বর বলিলেন,—বাঁদরামি আর কাকে বলে! ছেলের বিয়ে দিচ্ছ, দাও···তা বলে' এ রকম রাজসূয় যজ্ঞের কি দরকার বলতে পারো, বাপু?

হাসিয়া সুশীল বলিল—বড়মানুষ বলে নাম-ডাক আছে, কাজেই।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—এমনি করে গোটা তিন-চার ছেলের বিয়ে দিতে হলে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বও বিকিয়ে যায়, এ তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেবেশ মুখুয্যে!

সুশীল বলিল—আপনি বুঝিয়ে বললেন না কেন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—বলেছি বৈ কি। তা আমার কথা কি গ্রাহ্য করে? আমায় বলে খৃষ্টান, বলে ব্রাহ্ম। বলে, তোমার ছেলেমেয়ে নেই; ছেলেমেয়ের বিয়ে তুমি দেবে না। টাকা তুমি খরচ করতে জানো শুধু নাচনাউলি আর মদের পিছনে। আমি এর কি জবাব দি, বলো তো?

সুশীল কোনো উত্তর না দিয়া সকৌতুকে চাহিয়া রহিল বিরাটেশ্বরের পানে।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—আমি জবাব দি,···মানে, আমার হলো আত্মার তৃপ্তি! একা মানুষ···কার জন্য টাকা-কড়ি রেখে যাবো? বলে, ছেলে নেই, পুষ্যিপুত্তুর নাও! আমি বলি ···বটে! অর্থাৎ কার ঘর থেকে কে এসে আমার সব লুঠিয়ে দেবে! ও-সবে আমি নেই। বলে, বংশ-রক্ষা! শুনে আমি হাসি। বংশ কি শুধু ছেলে হলেই রক্ষা পায়? ছেলে যদি ছেলের মতো হয়, তবেই···না হলে যা দেখছি, বড় বড় ঘরগুলো চুরমার হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের হাতে। বংশ-রক্ষা করবে, তার মতো ছেলে তৈরী করছো কৈ?···আমার কি মত জানো বাবা? মানুষ যে হয়, বংশ যে রক্ষা করে, সে নিজের মন আর শিক্ষা দিয়েই তা করে। তোয়াজ করে ছেলের জন্য বিষয়-সম্পত্তি রেখে গেলেই হয় না।···তা সেদিকে কারো নজর নেই!

কথা শুনিয়া সুশীল চমৎকৃত হইল। বুঝিল, কথাগুলা সহজ মস্তিষ্কে উৎসারিত নয়। কথার পিছনে তরল সুরার রঙীন্ প্রেরণা আছে! তবু তার স্রোতে বিহ্বল হইয়া গর্হিত পাঁচটা কথা না বলিয়া যিনি এমন কথা বলেন···বিরাটেশ্বরকে সুশীলের প্রথম দিন হইতে ভালো লাগিয়াছিল···আজ এ কথা শুনিয়া তাঁর উপর খানিকটা শ্রদ্ধা হইল।

বিরাটেশ্বর বলিতে লাগিলেন—এ-চাল না বদলালে সব যাবে! টাকা খরচ করতে চাও ছেলের বিয়েয়···দীঘি খোঁড়ো, ইস্কুল তৈরী করো, ডাক্তারখানা খোলো, জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাও, রেয়তদের খাজনা মাপ করো···তা নয়···হুঁঃ।

সুশীল বলিল—কিন্তু এতেও বহু লোক প্রতিপালন হচ্ছে তো! এই যে সব বাজনদার, বাজিওয়ালা, ঘরামি-মিস্ত্রী, ময়রা-মুদি···এদের চলা চাই তো। আপনাদের এত পয়সা···এ-সব ব্যাপারে ওরা যদি কিছু না পায়, ওদের দশা কি হবে, বলুন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—ও একটা দিক আছে, আমি মানি। কিন্তু সব-কিছুর সীমা থাকা দরকার। পড়োনি সেই গল্প···ব্যাঙ ছাতি ফুলোতে গিয়ে ফেটে মরেছিল? আমার কথা, ঘটা করো, বেশ, কিন্তু ঘটা করতে গিয়ে ধার নিয়ে পুঁজি জড়ো করো না বাবা নাম বাজিয়ে বাহাদুরী কেনবার লোভে! আজ যারা ভড়ং দেখে বাহবা দিচ্ছে, দু'দিন বাদে ও-ভড়ংও যদি সব ভেঙ্গে চুর করে পথে দাঁড়াও, তখন ঐ ওরাই জেনো সবার আগে হেসে টিটকিরি দেবে।···আমার সব সয়···শুধু বোকা বলে কেউ টিটকিরি দেবে, এইটুকু সহ্য করতে পারি না বাবা!

সুশীল বলিল—তা যদি বললেন, তাহলে অনুমতি পেলে আমি একটা কথা বলি···

—বলো, বলো···নিশ্চয় বলবে, বাবা। তোমরা একালের ছেলে··· লেখা-পড়া শিখেছো···বয়স হয়েছে, জ্ঞান হয়েছে।···তোমাদের কথা বলবার অধিকার আছে···নিশ্চয়!

বিনম্র কণ্ঠে সুশীল বলিল—আপনি যে এই নেশায় এবং আরো পাঁচ রকমে টাকা নষ্ট করছেন, এ নিয়ে যদি কেউ···

সুশীলের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—যদি কেউ বলে, বিরাটেশ্বরটা বিরাট বোকা, এই তো? তার জবাব তো বলেছি বাবা, আত্মার তৃপ্তি! নাচে-গানে আমার সখ আছে। আর তুমি যা বলছো···মানে, বাগান-বাড়ী? তুমি ডাগর হয়েছো

বাবা···প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রের মতো,···বলি তাহলে, স্ত্রী ছিলেন নেহাৎ মাটীর পুতুল···কথা কয়ে আরাম পাইনি কোনো দিন। তিনি জানতেন শুধু শাড়ী আর গহনার দাম। মানুষের দাম বোঝবার মতো শিক্ষা তিনি পাননি তাঁর বাপের কাছে। আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন সাহেব-মাষ্টার রেখে। বাবার সাধ ছিল, ইংরিজি বিদ্যা শিখে সাহেবী চালে সাহেবদের তুষ্ট করে আমি রাজা-মহারাজা টাইটল্ নিয়ে বংশের মান-মর্য্যাদা বাড়িয়ে তুলবো! কিন্তু ওদিকে আমার চোখ খুললো না—আমার চোখ খুলে গেল ঘর-সংসার সমাজকে সুন্দর দেখার ইচ্ছায়। বাবা ভুল করলেন বিয়ে দেবার সময় মস্ত বোনেদী ঘর থেকে একটা মুখ্যু বৌ নিয়ে এসে আমার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে! জমিদারীর মধ্যে মুখ গুঁজে আমি থাকতে পারলুম না। পৃথিবীটাকে আমি ভালো করে দেখতে চাইলুম। পৃথিবী কাকে বলে, স্ত্রী তা জানেন না! আমার সঙ্গে তিনি চলতে পারলেন না! কাজেই আমি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরাটেশ্বর চুপ করিলেন···চাহিলেন আখতার জানের পানে, কহিলেন,—বাঃ বাঃ। কেয়াবাৎ! আচ্ছা, ঐ যে আখতার নাচছে···আসরে এত লোক হাঁ করে তাকিয়ে যেমন ওর নাচ দেখছে, আমিও তেমনি দেখছি। কিছু মনে করো না বাবা, বলেছি তো, ষোড়শে বর্ষে পুত্র তুমি আমার মিত্রবৎ ···তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে না, আমি বলছি, আখতার দেখতে খাশা···ওর ঐ অঙ্গভঙ্গি খাশা···আমি তা দেখছি না। আমি দেখছি, ওর ঐ অঙ্গভঙ্গিতে সাতটা সুর আর তালগুলোকে কি আশ্চর্য্য লীলায় ফুটিয়ে তুলছে!···এ হলো মস্ত আর্ট। ক'জন আর্ট বুঝে এ-নাচের তারিফ করে, বলো তো? তারা দেখে খাশা দেখতে ঐ স্ত্রীলোকের অঙ্গভঙ্গি।···তোমাদের হয়তো ভালো লাগছে না। সে জন্য দোষ দিই না। নাচ দেখা গুণী লোকের কাজ। সকলে নাচ বোঝে না! নাচ কিম্বা ভালো ছবি—কি সকলে বোঝে? নাচে কি আনন্দ, নাচকে যে না হাঁড়ি করেছে, সে তা বুঝবে না।

সুশীল কোনো জবাব দিল না···চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল বিরাটেশ্বরের পানে। তার মনে হইতেছিল যে-লোকটিকে শুধু ইয়ার বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাঁর মধ্যে এত সামগ্রী আছে···আশ্চর্য্য!

বিরাটেশ্বর বলিলেন—কথাটা যখন তুললে, তখন বলি···স্ত্রী ছিলেন···বড় ঘরে যেমন আসবাব-পত্তর থাকে, তেমনি। বোনেদী ঘরের মেয়ে—হীরে-জহরতে গা মোড়া···পাঁচ জনের কাছে পরিচয় দিতে বেশ। কিন্তু সব আসবাব কি কাজে লাগে? তবু যেমন ঘরে থাকে, তেমনি আর কি! আমার মধ্যে মন বলে বস্তু আছে··· সেই মনের সঙ্গে তিনি মন মেলাতে পারেননি···মেলাবার চেষ্টাও কখনো করেননি। অনেক স্ত্রী আছেন, যাঁরা স্বামীর মনের সন্ধান রাখেন না···তা না রাখলেও স্বামীর জন্য খাবার-দাবার তৈরী করেন, স্বামীর সেবা করেন। আমাদের বড়মানুষের বাড়ী···দাস দাসী প্রচুর···আমার তোয়ালে-তেল থেকে পয়সা-কড়ি-ঘড়ি পর্য্যন্ত গুছিয়ে দেওয়া—সব কাজ চলে চাকর-বাকরের মারফৎ। সুখ-দুঃখের কথাতেও চাকর-বাকর। এর মধ্যে স্ত্রীর প্রয়োজন থাকে না··· কাজেই নিঃসঙ্গ মন নিয়ে···বুঝলে বাবা, বাগান-বাড়ীর আসল অর্থ। এই যে তুমি বিবাহ করোনি এখনো,···সেদিন দেবু বলছিল, গাঙ্গুলি মশাইয়ের ভাগনেটির বয়স হয়েছে, এখনো বিবাহ হয়নি। ওঁরা আশ্চর্য্য হন···আমি হই না, তার কারণ, আমি বুঝি। তোমার মধ্যে মন আছে, সজীব মন। স্ত্রী মানে শুধু শাড়ী আর গহনা নয়তো! একটি জীবন্ত মন। তোমার মনের সঙ্গে তারে-তারে মিলে যাবে, এমন মন! তেমন মন পাওনি নিশ্চয়, কাজেই বিবাহ করোনি। কেমন এই নয় কি, এ্যাঁ?

সুশীল জবাব দিল না। এ-কথার কি জবাব দিবে? বিরাটেশ্বর তার চেয়ে বয়সে বড়।···বুঝিল নেশার ঝোঁকে মনের কপাট ভালো করিয়াই মুক্ত করিয়াছেন। কথা কহিয়াই বিরাটেশ্বর তৃপ্তি পান! জবাবের এতটুকু তোয়াক্কা না রাখিয়া দিল্ খোলশা করিয়া বকিয়া যাইতেছেন···যা মনে আসিতেছে, তার কোথাও রাখ-ঢাক নাই!···

কথাগুলা সুশীল মন দিয়া শুনিতেছিল। নেশাখোরের কথার মত উড়াইয়া দিবার মতো কথা নয়! এ সব কথায় চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে!

সে-রাত্রে কাহারো ফেরা হইল না। অতিথিদের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবস্থা ছিল এমন যে কাহারো অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবার কথা নয়। সে-কালের বনিয়াদী ঘরে বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা যতই থাকুক, আদর-আপ্যায়নে প্রাণের সংযোগ-স্থাপনে তিলমাত্র কৃপণতা ছিল না!

২৮

ফিরিয়া আসিবার পরের দিন সুশীলকে পাইয়া মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমার সঙ্গে বৈষয়িক কথা আছে সুশীল। তোমার বাবার কাছ থেকে বহু কাল আগে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে-দেনা আজ পর্য্যন্ত মাথায় চাপানো রয়েছে! এখন দেনার ভার নামিয়ে আমি মাথা হাল্কা করতে চাই।

সুশীল চাহিল মামাবাবুর পানে···দু'চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—মানখানি পরগণার দাম হবে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা···ঐ পরগণা বন্ধক দিয়েই টাকা নিয়েছিলুম। ও পরগণাখানি তোমার নামে কোবালা লিখে দেবো। তোমাকে তার জন্য কিছু দিতে হবে না।

সুশীল কহিল—কিন্তু মামাবাবু···

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—না বাবা, আমি তোমার কথা শুনবো না। তুমি যা বলবে, তা আমি বুঝি। সবো আমাকে এক দিন বলেছিল। বলেছিল, তুমি না কি ওটার রিলিজ-নামা লিখে দেবে। তুমি দিলেও আমি তা নেবো কেন? তোমাকে আমার দেবার কথা··· আমি মামা। তুমি দেবে আর আমি হাত পেতে তোমার কাছ থেকে নেবো···এ-সম্পর্ক তোমায়-আমায় নয়, সুশীল।

সুশীল বলিল—কিন্তু আপনার অনেক কর্ত্তব্য আছে মামাবাবু। আপনার ছেলেরা···তাছাড়া বিজয়দার ঐ বাচ্ছা···

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—দেনা শোধ করা সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। তাছাড়া বয়সের তেজে এক দিন যে সব কথা মনে জাগেনি, এখন বয়স গেছে বলে' সেই সব কথা বেশী করে মনে জাগছে!··· সকলকে মানতে গিয়ে আমি যা ত্যাগ করেছিলুম, এখন বসে বসে সেই সব কথা ভাবি, সুশীল। এত করে' জাত বাঁচিয়ে

আমি কি পেয়েছি? সকলকে ত্যাগ করে। মন যে পাথর হয়ে গেল! স্নেহমায়া জিনিষগুলো কি এতই হেলা-ফেলার?

মাখন গাঙ্গুলি নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর বলিলেন—কথায় কথায় রাজা রামচন্দ্রের নাম করি। সীতাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন ···করে' কি লাভ হয়েছিল-তাঁর? বা তাঁর অযোধ্যাপুরীর? সীতা গেলেন পাতালে···তার পর রামায়ণও গেল ফুরিয়ে। কাল রাত্রে সরোর সঙ্গে বসে কথা হচ্ছিল। সরো বললে, সীতাকে বনে পাঠাবার পর অযোধ্যায় সুখ ছিল কতখানি, রামায়ণে সে-কথা তো পাই না দাদা! বললে, পাই না তার কারণ রামচন্দ্রই শুধু সুখে জলাঞ্জলি দেননি···সারা অযোধ্যা থেকেও ঐ সঙ্গে সুখের ছায়া মিলিয়ে গিয়েছিল। বললে, রাজ্যের সুখের জন্য সীতাদেবীকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন···ত্যাগের পর রাজ্যে যদি তেমন সুখ থাকতো, নিশ্চয় বাল্মীকি মুনি তাহলে সে সুখের কথা লিখতেন। তা যখন লেখেননি···

বলিতে বলিতে কণ্ঠ গাঢ় আর্দ্র হইয়া আসিল। মাখন গাঙ্গুলি গাঢ় স্বরে বলিতে লাগিলেন—সুখ যে অযোধ্যায় ছিল না, আমি তা বুঝি, সুশীল। আমিও সুখের জন্য ত্যাগ করেছি···ছেলে···স্ত্রী! ত্যাগ করবার পর থেকে সুখ কাকে বলে, ভুলে গেছি। কর্ত্তব্য করে যাচ্ছি। যাকে বলে, শুষ্ক কর্ত্তব্য! এ-কর্ত্তব্য করার সঙ্গে প্রাণের যোগ কোথায়? এই যে মেনির বিয়ে দিলুম···খরচ-পত্র করলুম। কিন্তু শুধুই খরচ!···ছেলে-মেয়ের বিয়েয় মানুষ যে আনন্দ পায়, সে-আনন্দ পেয়েছি কি? কন্যাদায় ঘুচলো, এইটুকুই সান্ত্বনা!···

মাখন গাঙ্গুলি চুপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নিশ্বাস!

নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—তোমার কাছে এ কথা না বলে থাকতে পারলুম না! বললুম এই জন্য···কাজ চুকলে চলে যাবে··· যদি আর দেখা না হয়···পাছে ভাবো, মামাবাবু মানুষ ছিল না! সেই জন্যই তোমাকে আজ এ-কথা বললুম।

সুশীল বুঝিল। বোঝে, বিজয়কে ত্যাগ করিয়া, মামীমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া মামাবাবু কি-দুঃখ ভোগ করিতেছেন! নিজের মাকে দেখিয়া মাকে জানিয়া মামাবাবুর মনের পরিচয় বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে, মামাবাবু মানুষ···নিজের সুখ-দুঃখের উপর অপরের সুখ-দুঃখকে মানিয়া আসিয়াছেন চিরকাল। জানে, এমন যাঁদের মন, জীবনে তাঁরা কত-বেশী দুঃখ ভোগ করেন! নিজেদের যাঁরা উঁচু করিয়া ধরেন না, দুঃখ-ভোগ ছাড়া তাঁদের উপায়ও নাই!

বলিল,—বিরাট বাবু বললেন, তিনি এক দিন আসবেন··· শীগ্‌গির। কুটুম্বিতা করতে নয়, মামাবাবু। তিনি আসবেন, মামীমাকে প্রণাম করতে।

অবিচল নেত্রে মাখন গাঙ্গুলি চাহিয়া রহিলেন সুশীলের পানে···

সুশীল বলিল—আর আসবেন মামীমাকে এ-বাড়ীতে এনে আপনাকে জাতে তুলতে।

বিরাটেশ্বর আসিলেন। কন্যা-জামাতা জোড়ে আসিল, তাঁদের সঙ্গে। সেদিন শ্রাবণের ২৩ তারিখ।

ওদিকে পরেশ গাঙ্গুলির বাড়ীর সদরে নহবৎ বসিয়াছে। বাজনা শুনিয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—তবু ভালো! ও-নবৎ এ-বাড়ীতে বাজছে না! আমি ভেবেছিলুম···

মৃদু হাসিয়া সুশীল বলিল—কি ভেবেছিলেন?

—ভেবেছিলুম, বিয়ের সে-ঘটার জের এখনো চলেছে!

মাখন গাঙ্গুলি চাহিলেন বিরাটেশ্বরের পানে। চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি!

বিরাটেশ্বর বলিলেন—কতগুলি খশলো, বেয়াই মশাই? আমি কুটুম-মানুষ বলে এ-প্রশ্নে হয়তো বিরক্ত হবেন! হয়তো ভাবেন, আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু কুটুম্বিতা ছাড়া আরো যে বড় জিনিষ আছে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক···তার উপর বোনেদি ঘর···জমিদারী ভোগ করার নিগ্রহ···ইচ্ছা বা সামর্থ্য না থাকলেও বহু ক্ষেত্রে বহু অপব্যয় করতে হয়···এই যে এক সূত্রে গাঁথা···যাকে বলে, মেম্বার্স অফ দি সেম গ্যাঙ্···সেই সম্পর্ক ধরে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করছি, যা খশলো, তাতে কত দিকে কত বড় বড় কাজ করা যেতো, ভেবে দেখেছেন? প্রজাবর্গের স্থায়ী মঙ্গল? সুশীল বাবাজীর কাছে শুনছিলুম, গ্রামে ভালো ইস্কুলের অভাব···সে-অভাব পূরণ করলো খৃষ্টান পাদরী সাহেবরা এসে!···আমরা বসে বসে জমিদারী করছি আর তলে তলে হাত থেকে সব বেরিয়ে যাচ্ছে! আমার ওখানে হঠাৎ এক দিন হাটে গিয়ে দেখি, ভুষিমাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে মাড়োয়ারের বীরের দল। তাদের নিয়ে আমরা নাটক লিখে রাজপুত-মহিমা কীর্ত্তন করছি, আর সেই রাজপুতের বংশধররা এসে আমাদের ক্ষেত, আমাদের ফশল মাটীর দরে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে আমার নেশা কেটে গেল! হিন্দু-মুসলমান চাষাদের ডেকে মানা করে দিলুম, ওদের মাল দিস্‌ নে···ওরা যে দাম দেয়, সে-দামের উপর শতকরা বিশ টাকা করে বেশী দাম আমি দেবো। ওই সব চাল-ডাল আমার গুদামে জড়ো করছি। সখ বা নেশা বলি, অস্বীকার করবো না। কিন্তু গ্রামে একটা ইস্কুল খুলেছি···লেখাপড়া শিখে সকলে বুদ্ধি পাকাক্‌।

মাখন গাঙ্গুলির দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি বলিলেন,—ঠিক কথা! কিন্তু রায় মশাই, আমার সে-ছাতি ভেঙ্গে গেছে!··· ছাতির জোর ছিল• যখন, এ-সব কথা তখন মাথায় জাগতো না; আচার-বিচার নিয়ে তারি মধ্যে ডুবে ছিলুম!

বিরাটেশ্বর বলিলেন—শাস্ত্র-পুরাণ পড়িনি বেয়াই মশাই···তবে হিন্দুর ঘরে জন্ম, দেখে-শুনে মোটামুটি বুঝেছি যে সত্য যুগে যা চলতো, ত্রেতায় তার বহুৎ অদল-বদল হয়ে ছিল, ত্রেতার সঙ্গে দ্বাপরের মিল ছিল না। এ হলো আমাদের কলিযুগ। এ যুগে দ্বাপরকে মেনে যদি চলি তাহলে ফাঁপরে পড়তে হবে। আমাদের দ্বাপরে ছিল নরাণাং সহস্রবর্ষপরিমিতং পরমায়ুঃ—আর কলিতে সেই পরমায়ু হয়েছে বিংশত্যধিকশতবর্ষং!···কলিতে স্ত্রীরা হয়েছেন অতি-দুর্দ্দান্তা কর্কশাঃ কলহে রতাঃ! ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণ গিয়েছিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে···বড় ভাইয়ের সেবা করবেন বলে'···সুখভোগ আরাম ছেড়ে, নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে! আর এই কলিযুগে স্ত্রীকে খুশী করতে লক্ষ্মণ-ভাইয়েরা রামচন্দ্রের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করতে কোমর বাঁধে! সে সব দিকে কি করছেন বুঝিয়ে দিন তো আমায়! অমন ভাইকে সমাজে শাসিত করা চুলোয় যাক, কে বিলেত গেছে, কে হাড়ি-ডোমদের মন বুঝে তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করছে, দে তাদের ঘাড় ধরে' বার করে। কি লজিক, আপনি বলুন···

মাখন গাঙ্গুলি কোন জবাব দিলেন না। বুঝিলেন, বিরাটেশ্বর

…সুশীল যা বলিয়াছিল…মানুষের মতো মানুষ, সত্যই! এমন সব কথা কেহ বলে না তো!

সুশীল বলিল—আসলে মুস্কিল কি হয়েছে জানেন, রায় মশাই? পড়াশুনা, চিন্তা এ-সব আমরা ছেঁটে দিয়েছি, টোলগুলো উঠিয়ে দিয়েছি, মুন্সীদের দিয়েছি বিদায়। মানে, পড়াশুনা করতে সে কালে আরবী-ফার্শী শিখতে হতো! না হলে দরবারে আসন মিলবে না! দলিল-দস্তাবেজের কাজ জানা চাই! এখন ইংরেজী শিখতে হবে। না হলে কেউ পুঁছবে না। কোনো মতে ইংরেজী গ্রামারখানা রপ্ত করে' ইডিয়ম শিখে নিয়ে সাহেবদের কাছে মান রাখতে পারবো কিসে, এই চিন্তা! ওদিকে অদল-বদল করছি স্বার্থের খাতিরে…সাহেব যদি শেক-হ্যাণ্ড করে, তাতে জাত যাবার ভয় থাকে না…আর বিজয়দার বেলায়…মানে, কি রাখা দরকার, কতখানি রাখা আর কতখানি ছাঁটা দরকার বাঁচবার জন্য, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই ভাবি না!…

বিরাটেশ্বর বলিলেন,—এত কথার প্রয়োজন নেই। আমি বলি, এই যে অন্যায় আপনি করেছেন নিজের উপর স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে,…তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।…আপনার জনকে যে ত্যাগ করবেন, তাদের অপরাধ কি, ভেবে দেখবেন না? আমার প্রার্থনা বেয়াই মশাই, মেয়ে-জামাই এসেছে…তাদের খাতিরে কাল গ্রাম-শুদ্ধ সকলকে করুন নিমন্ত্রণ। সকলে এলে তাঁদের সামনে জোর-গলায় বলুন, বেয়ান-ঠাকরুণের উপর যে মহাপাতক করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন…সসম্মানে। কে বাঁকা কথা কয়, দেখি …তাকে আমি চেপে ধরবো। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিন কাকে কি-গুণে সমাজে শিরোমণি করে রাখবো, আর কি দোষ হলেই বা কাকে আমরা বর্জ্জন করবো।…আমার ছেলে-মেয়ে নেই। এ-সব চিন্তা করতে হয় না…মাঝে মাঝে একলা বসে' এই সব কথা ভাবি। ভেবে যেন দিশাহারা হই। মনে হয়, আমি তো একটা বখা মাতাল…মহামহোপাধ্যায় নই, আমার কথার কি বা দাম? কে বা শুনবে?

সুশীল বলিল—আপনি যা বললেন, তাই হোক্। কাল এখানে নিমন্ত্রণ-সভা ডাকুন। আপনি আছেন…আপনার পিছনে বলেন যদি, আমিও থাকবো। তার পর…

হাসিয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—নিশ্চয় থাকবে, বাবা। তোমরা না থাকলে চলবে কেন? আমাদের তো পালা শেষ হয়ে এলো… তোমরা করবে পালা সুরু। সে-পালা যাতে সতেজ হয়, তার ব্যবস্থা তোমাদেরই করা দরকার!…

নিমন্ত্রণের আসর তেমন জমিল না। তার কারণ, এখানে এই ব্যবস্থা করিয়া মাখন গাঙ্গুলিকে লইয়া বিরাটেশ্বর চলিলেন বিন্দুমতীর কাছে।

বিন্দুমতী সুস্থ হইয়াছেন। সরস্বতী ছিল বিন্দুমতীর কাছে।

বিন্দুমতীকে প্রণাম জানাইয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—মেয়ে-জামাই বাড়ীতে,—আর আপনি এখানে থাকবেন, এ কি ভালো দেখায়? বেয়াই-মশাই মস্ত অপরাধ করেছেন…সে জন্য তিনি যে দুঃখ ভোগ করছেন, জানি। আজ আমরা দু'জনে সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনাকে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি! আপনার ঘরে আপনি ফিরে চলুন…ঘর শ্মশান হয়ে আছে!

বিন্দুমতীর মনে ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখ মিলিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তুলিল। মনে পড়িল বিজয়ের সেই মুখ—বিদায়-কালে বৌমার সেই ছল-ছল ম্লান দু'টি চোখ। কি দুঃখই না তারা সহিয়া গিয়াছে! তাদের তিনি যে-গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই, সে-গৃহে তিনি আজ ফিরিবেন কোন্ মুখ লইয়া! আজ নূতন নয়, সে-গৃহ শ্মশান হইয়া আছে সেদিন হইতে, যেদিন বিজয় ও-গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল…সে-শ্মশানে তাঁর আর ফিরিবার সাধ নাই!

দু'চোখে অশ্রু-ধারা নামিল। বিন্দুমতী বলিলেন—আমাকে মাপ করুন, আমি এখানে ভালোই আছি! এই ঘর থেকেই তারা জন্মের মতো চলে গেছে। শত দুঃখে এই ঘরে তারা শান্তি-সুখ গড়ে তুলেছিল! এ-ঘরের ইট্-কাঠগুলোয় তাদের চিহ্ন রয়েছে। আমাকে এখান থেকে আপনারা যেতে বলবেন না…এ-ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। এ-ঘর আমার স্বর্গের বাড়া!

বিরাটেশ্বর অনেক মিনতি করিলেন…সুশীল অনেক বুঝাইল; বলিল—যাঁরা চলে গেছেন মামীমা…তাঁদের জন্য দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যারা আছে, তারা না দুঃখ পায়, দেখবেন না আপনি?

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে বিন্দুমতী বলিলেন,—থেকে যখন কারো দুঃখ ঘুচোতে পারিনি বাবা, ফিরেই বা কার দুঃখ ঘুচোবো, বলো?

মাখন গাঙ্গুলি কোনো কথা বলিলেন না…নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিলেন…যেন পাথরের পুতুল!

বহু মিনতির পর বিন্দুমতী শেষে বলিলেন—বেশ, আপনারা বলছেন, আপনাদের অসম্মান করবো না…বাড়ীতে যাবো…গিয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করে' চলে আসবো।…আশীর্ব্বাদ সব সময়েই করছি। তবু আপনারা যখন বলছেন, বাড়ী গিয়ে আশীর্ব্বাদ …বেশ, তাই হবে।…

এ কথাটা কোন্ ঘরভেদী বিভীষণের মুখে-মুখে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অনেকে ভাবিল, কি জানি, মাখন গাঙ্গুলি হয়তো এক চাল চালিয়াছেন…নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া শেষে গৃহিণীর হাত দিয়া অন্ন পরিবেষণ! দোষ তাহাতে আছে বলিয়া মনে হইল না! কিন্তু ভয়! কি জানি, কবে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া ছেলেমেয়ের বিবাহে যদি বিভ্রাট বাধিয়া যায়!…

পরেশ গাঙ্গুলি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল—বৌঠাকরুণ বাড়ী আসবেন, তাতে আমার নালিশের কি-বা আছে! তবে বিলাসপুরের ওরা যদি এর অন্য রকম মানে বুঝে গোলমাল করে? কাজ কি আমার ও-ফ্যাশাদে!…

এ-সম্বন্ধে তার প্রধান মন্ত্রী শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণ বলিল,—জয়রাম মুখুয্যের ভয়ানক নিষ্ঠা…আমাকে বার-বার জিজ্ঞেস করছিলেন, মেয়ের বিয়েতে মাখন গাঙ্গুলির পরিবার বাড়ী আসেননি তো? আমি বলেছি, রামচন্দ্র! উনি জমিদার আছেন ঐ জমিদারই…তা বলে এ-সবে ওঁর কথা লোকে শুনবে কেন? (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য

শক্তি ও সৌন্দর্য্য

যিনি সৌন্দর্য্য চান, শরীর-গঠনের দিকে তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রমণীকে আমাদের প্রাচীন কবিরা শুধু রূপময়ী বলিয়া বর্ণনা করেন নাই,—শক্তিময়ীও বলিয়াছেন। এবং সেই জন্যই অতি-বড় দানব—দেবতারা দেবসৈন্য লইয়া যে-দানবদের নিপাত করিতে পারেন নাই, তাদের নিপাত সাধন করিয়াছিলেন শক্তিময়ী দেবী! আমাদের পরম উপাস্যা, আমাদের সকল আদর্শের ললামভূতা দেবী দুর্গা শুধু রূপোজ্জ্বলা নন; তিনি শক্তিময়ী, দশ ভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণী। দেব-



১। কোমর হইতে মাথা পিছন দিকে



২। ডান দিকে

তার কল্পনায় রূপের সঙ্গে এতখানি শক্তির সমাবেশ আমাদের দেশের শাস্ত্রে-পুরাণেই দেখিতে পাই! শক্তি-সাধনা প্রাচীন ভারতে ছিল শ্রেষ্ঠ সাধনা!

এই সব দিক দিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিব, যেখানে শক্তি, সেইখানেই সৌন্দর্য্য—এ-কথা এদেশের প্রাচীন ঋষিরা বুঝিয়াছিলেন। এদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব, যত দিন নর-নারী শক্তির সাধনা করিয়াছিলেন, ততদিন দেশে ছিল সৌন্দর্য্যশ্রী! তার পর শক্তি-সাধনা ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী সৌন্দয্য-শ্রীতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

দুর্ব্বল দেহ ব্যাধির নাটশালা। ব্যাধি সৌন্দর্য্যের যম। সৌন্দর্য্যশ্রী দুর্ব্বল দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দেহে শক্তি-সামর্থ্য, সেই দেহেই শুধু সৌন্দর্য্যশ্রীর বিকাশ!

আজ যে কয়টি ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি, সে কয়টির সাধনায় দেহে সৌন্দর্য্য ও শক্তি বিকশিত হইবে; এবং নিত্য-নিয়মিত এ ব্যায়াম-সাধনে দেহের সৌন্দর্য্য ও শক্তি কোনো দিন অম্লান বা আহত হইবে না।

প্রথম বিধি—সিধা খাড়া দাঁড়ান। তার পর দুই পা অটল সুদৃঢ় রাখিয়া কোমরের কাছ হইতে উর্দ্ধ-দেহ পিছন দিকে নোয়াইয়া দুই হাত সামনের দিকে ১নং ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন—মাথা থাকিবে ছবির মত। এমনি ভাবে থাকিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গণিবেন। তার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া আবার সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়াইবেন। এ ব্যায়াম পর্য্যায়ক্রমে দশ বার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—সিধা খাড়া দাঁড়ান। তার পর বাঁ পা সুদৃঢ় রাখিয়া ডান পা ডান দিকে ২নং ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মাথার পিছনে আনিয়া মুষ্টিবদ্ধ করা এবং মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ডান দিকে হেলাইয়া ২নং ছবির মত দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিবেন; গণার পর ডান পা সুদৃঢ় অটল রাখিয়া বাঁ পা বাঁ দিকে প্রসারিত করিয়া ঐ ভাবে আবার বাঁ দিকে হেলিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণা। এ-ব্যায়ামও পর্য্যায়ক্রমে দশ বার করা চাই।

তৃতীয়—দুই পা সংলগ্ন করিয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান। তার পর দুই পা সুদৃঢ় অটল রাখিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ডান দিকে হেলাইয়া দুই হাত ঠিক ঐ ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিবেন। ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিবেন। তার পর ধীরে ধীরে বাঁ দিকে এমনি ভাবে হেলিয়া দুই হাত বাঁ দিকে প্রসারিত করুন। এ ব্যায়ামও পর্য্যায়ক্রমে দশ বার করা চাই।

চতুর্থ—এবার দুই পা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ৪নং ছবির ভঙ্গীতে নোয়াইয়া ডান হাত দিয়া ভূমি স্পর্শ এবং বাঁ হাত ঐ ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিবেন। ১, ২, ৩, ৩, ৫ গণিবেন। গণার পর এই রীতিতেই বাঁ হাত দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া ডান হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিবেন। এ ব্যায়ামও পর্য্যায়ক্রমে দশ বার করিবেন।

এ কয়টি ব্যায়ামে পিঠের মাজা বেশ শক্ত-সমর্থ হইবে এবং দেহের কোথাও মেদ জমিবে না; মেদ জমিয়া থাকিলে তাহার বিলোপ ঘটিবে।

বধূ ও কন্যা

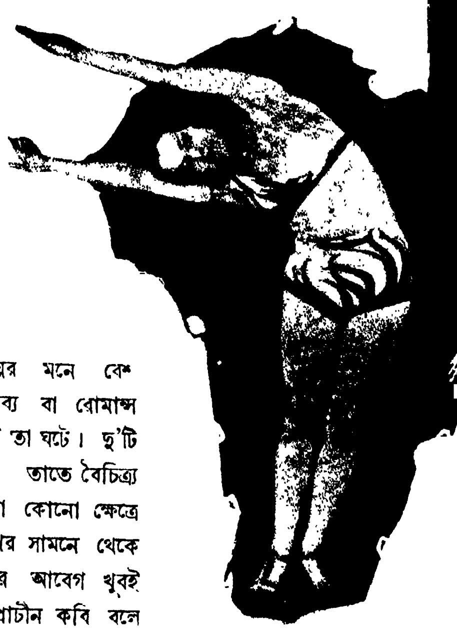
কথাটা অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করা চলে না যদি বলি, ছেলের বিয়ে হবার পর বৌ এলে বৌকে ছেলের মায়েদের মধ্যে শতকরা দশ জন মাত্র মা ঠিক পেটের ছেলে-মেয়েদের মত গ্রহণ করতে পারেন; বাকী নব্বই জন বৌয়ের ছল-ছুতো ধরে নিজেরা নানা অশান্তি ভোগ করেন, ছেলে-বৌয়ের মনেও সে অশান্তির কাঁটা বেশ ভালো করেই বিঁধতে থাকেন। বৌয়েদের সম্বন্ধে মায়েদের মনে আতঙ্ক—ছেলে আমাদের পর হয়ে গেল! রসরাজ অমৃতলাল এর চমৎকার ছবি এঁকে গেছেন তাঁর "গ্রাম্য বিভ্রাট" নামক অপূর্ব্ব প্রহসনে।

অনেকে বলবেন, এর জন্য দোষ দু'পক্ষেই আছে। শাশুড়ী যেমন বৌয়ের উপর অপ্রসন্ন হন, বৌ-ও তেমনি শাশুড়ীকে সুনজরে দেখেন না।

এ-কথা মেনে নিলেও আমরা বলবো, মা-বাপ ছেড়ে বৌ আসে নতুন সংসারে। সকলেই কিছু বিষের বিষে মন ভরে আসে না। নতুন সংসারে এসে সে যদি গোড়া থেকেই ভালোবাসা পায়, দোষ-ত্রুটি হলে স্নেহের শাসন পায়, শ্লেষ বা বাঁকা শাসনের সঙ্গে তার পরিচয় না হয়—তাহলে বৌয়ের পক্ষে হঠাৎ বেঁকে বসবার কারণ থাকতে পারে না। বাঁকে কি না তা বলে'? বাঁকে। যাদে মনের গড়ন বাঁকা, বাপের বাড়ীতেও তারা বিয়ের আ মনের এ-বাঁকা ভাব ঢেকে রাখতে পারে না। ছোট-খাট স্বার্থ নিয়ে ভাই-বোনদে করে হিংসা, মা-বাপকে পদে পদে অমান্য করে, জ্বালায়। ও-সব মেয়ের কথা হলে আলাদা। সাধারণ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস, উপরওয়ালাদের দিক থেকে যদি সত্যকার স্নেহ পায়, তাহলে তাদে সাধ্য কি, শাশুড়ীর উপর বিরূপ হবে!

এবার শাশুড়ীদের কথা বলি। ছেলের উপর মায়েদের অতি-স্নেহ থেকেই এ বিষের সৃষ্টি! বিয়ে হলে ছেলেমেয়ের মনে বেশ খানিকটা ওলট-পালট ঘটে। এ শুধু কাব্য বা রোমান্স নয়! মানুষের তরুণ মনে আবেগের বশেই তা ঘটে। দু'টি তরুণ মন পরস্পরকে পেয়ে মুগ্ধ বিবশ হবে, তাতে বৈচিত্র্য নেই। তবে এ বিবশতার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, বিশ্ব-পৃথিবী কারো বা চোখের সামনে থেকে মুছে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ-সব ছেলের আবেগ খুবই ভঙ্গুর। এদের আবেগকে লক্ষ্য করেই প্রাচীন কবি বলে গিয়েছেন—'ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ!' এরা যেমন নতুন বৌ পেয়ে মাকে আজ তুচ্ছ করছে, তেমনি বৌ পুরোনো হয়ে গেলে তাস-পাশা নেশার নতুন মোহে আচ্ছন্ন হবে—বৌয়ের ভাগ্যে তখন অনাদর হেনস্থা!

শাশুড়ী-বৌয়ে যদি মনের মিল না হয়, তাহলে সংসার অরণ্য হয়ে ওঠে। কাজেই আমরা বৌমাকে বলি,—তোমার মাকে যদি তোমার স্বামী অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে-'অগ্রাহ্যি' যেমন তোমার মনে বাজে, স্বামীর মাকে তুমি অগ্রাহ্য করলে স্বামীর মনেও তেমনি বাজবে—এ কথাটুকু মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ীকে মানতে শেখো। আ শাশুড়ীকে বলি,—নিজের প্রথম বয়সের কথা ভুলে যান কেন ছেলের বিয়ে দেছেন, মন খুলে ওদের একটু নিজেদের মত করে বাঁচ দিন! খানিক স্বাধীনতা দিন আপনার যদি মে থাকে, আর মেয়ের বিয়ে দি থাকেন, তা হলে সেই মেয়ের কথা মনে করুন বৌমার মুখ চেয়ে—আপনার মেয়ে যেমন তার শাশুড়ীর স্নেহ পেলে সুখী হবে, বৌমাও তেমনি আপনার স্নেহের প্রত্যাশা করছে। পাড়ার আর-পাঁচ জনের বৌ-ঝিকে যদি স্নেহে আপন করে নিতে আপনার না বাধে, নিজের বৌকে আপন করে বুকে টেনে নিতেই বা কেন বাধবে? ছেলেকে যদি সত্যি সত্যি নিজের প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন, তাহলে যে-বৌ নিয়ে ছেলে তার জীবন সুরু করছে, সেই বৌকে কেন ছেলের সঙ্গে এক করে মিলিয়ে নিয়ে ভালোবাসবেন না,—বলুন তো?



৩। ডান দিকে হেলাইয়া



৪। বাঁ হাত ঊর্দ্ধে, ডান হাত মেঝেয়

> নূতনের নূতন বলিয়াই একটা আদর আছে। পুরাতন পরীক্ষিত, নূতন অপরীক্ষিত—যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া বোধ হয়।—বঙ্কিমচন্দ্র

যুদ্ধ-সাহায্যার্থ ক্রিকেট-প্রদর্শনী

বিগত ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইডেন উদ্যানে সৈন্যদের তহবিলের সাহায্যকল্পে এক বিশেষ ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। বাঙলা গভর্ণর দলের বিরুদ্ধে মিলিত সৈন্য-দলের এই খেলায় গভর্ণরের দল এক ইনিংসের খেলায় পরাজিত হয়। বিজয়ী পক্ষের হার্ডষ্টাফ, কম্পটন, সিম্পসন প্রভৃতি খ্যাতনামা বিলাতী খেলোয়াড় দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কম্পটন ও হার্ডষ্টাফের শতাধিক রাণ করার মধ্যে মারের বিভিন্ন কায়দা ও কৌশল দেখা যায়। কি ভাবে আউট হইবার সুযোগ না দিয়াও বোলারকে ব্যর্থ করিতে হয়, এই খেলায় তাঁহাদের মিলিত ও এককালীন অবরোধ-প্রণালী এবং আত্মরক্ষা প্রয়াসে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই জুটীর সর্ট রাণ নেওয়ার কৌশল প্রত্যেক ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের অনুকরণ করা উচিত।

ভাল ব্যাটস্‌ম্যান হইতে হইলে অন্য গুণের মধ্যে 'ফুট ওয়ার্ক' যে প্রধান তাহা তাহাদের খেলা হইতে প্রতীয়মান হয়। সিম্পসনের খেলা প্রত্যেক প্রথম জুটীর খেলোয়াড়ের আদর্শস্থানীয়।

গভর্ণর পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে এন, চাটার্জ্জীর উত্তম প্রশংসনীয়। নিজে ১১৫ রাণ করিয়া ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলেও নিজ দলকে তিনি ইনিংস পরাজয়ের গ্লানি হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন নাই।

গভর্ণর একাদশ—টি, সি, লংফিল্ড (অধিনায়ক), কুচবিহারের মহারাজা, এন, চাটার্জ্জী, এ, চাটার্জ্জী, পি সেন, এন, চৌধুরী, এম, সেন, এস, মিত্র, পি, বি, দত্ত, ল্যাংফোর্ড ও ডি, জে, রীমার।

মিলিত সৈন্য একাদশ—হার্ডষ্টাফ (অধিনায়ক), কম্পটন, সিম্পসন, হচকিন, গে, ক্র্যানমার, জাজ, ডোব্রীক্যারী, মেজর কেটল, ইংগ্রাম জন্সন ও প্রেস্কট।

গভর্ণর একাদশ :—১ম ইনিংস—১৪৩ রাণ (এন, চাটার্জ্জী ৩৬, এ, চাটার্জ্জী ৩৬, ক্র্যানমার ৫২ রাণে ৭টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৩২১ রাণ (এন, চাটার্জ্জী ১১৫, জাজ ১০ রাণে ৪টি, ডোব্রীক্যারী ৪৮ রাণে ২টি ও কম্পটন ৬৩ রাণে ২টি উইকেট)

মিলিত সৈন্য একাদশ :—১ম ইনিংস—৪৭১ রাণ (হচকিন্ ৬৮, সিম্পসন ৭৪, হার্ডষ্টাফ ১৫৩, কম্পটন ১০৯, এন, চৌধুরী ১০৩ রাণে ৫টি উইকেট)

গভর্ণর দল এক ইনিংসে পরাজিত হয়।

ল্যাগডেন স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস

বাঙলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এ বৎসর কয়টি আকর্ষণীয় খেলার বন্দোবস্ত করিয়া ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বাঙালী খেলোয়াড়গণও অনুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন। বাঙলার ক্রীড়া-জগতে যুগপৎ খেলোয়াড় ও কর্ম্মী হিসাবে সুপরিচিত পরলোকগত মিঃ আর, বি, ল্যাগডেনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় বিভিন্ন খ্যাতনামা খেলোয়াড়, অধুনা ভারতবর্ষে অবস্থানকারী কয়েক জন নামজাদা বিলাতী খেলোয়াড় ও সিংহলী শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দ্বয়ের সহযোগিতায় ইডেন



এম, ডি, ডি

উদ্যানে এক বিশেষ প্রদর্শনী-খেলার বন্দোবস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ বশতঃ খেলাটি ৬ই জানুয়ারী যথাসময়ে আরম্ভ না হইয়া ৭ই জানুয়ারী বেলা ২টায় সুরু হয়।

রঞ্জী প্রতিযোগিতা

রঞ্জী প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমিফাইন্যালে বাঙলা কোনক্রমে মাত্র ৭৫ রাণে যুক্তপ্রদেশকে হারাইয়া দিয়াছে। ইডেন উদ্যানে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙলা—কুচবিহারের মহারাজা (অধিনায়ক), কে, ভট্টাচার্য্য, এন, চাটার্জ্জী, এ, চাটার্জ্জী, পি, সেন, এম, সেন, পি, বি, দত্ত, এফ হার্কার, পার্থসারথি, এন, চৌধুরী ও ডোব্রীক্যারী।

যুক্তপ্রদেশ—বালেন্দুসা (অধিনায়ক), রাজেন্দ্রনাথ, এস, গান্ধী, খাজা, ফাল্সালকার, তেলাং, রামচন্দ্র, জালালুদ্দিন, মজিদ, সৈয়দুল্লা ও জে, মেহরা।

বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশ পক্ষে একমাত্র খাজা ও ফাল্সালকারের ব্যাটিংএর খ্যাতি ছিল। অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধেও বাঙলা মোটেই আশানুরূপ খেলিতে পারে নাই। তবে কথায় আছে, 'যোগ্যং যোগ্যেন'। হয়ত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আমাদের খেলোয়াড়েরা যথাযথ ও সমুচিত পরিচয় দিবেন।

রঞ্জী প্রতিযোগিতার আলোচ্য খেলায় বাঙলার ব্যাটিংশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর বোলিং ঠিক মত পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ব্যাটিং-বিপর্য্যয়ে পর্য্যবসিত হয়।

বাঙলা—১ম ইনিংস—২৪৮ রাণ (পি, বি, দত্ত ৫৩, পি, সেন ৬৩, গান্ধী ১৭ রাণে ৫টি ও মজিদ ২৫ রাণে ৪টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৫৭ রাণ (পার্থসারথি ৩০)

যুক্তপ্রদেশ :—১ ইনিংস—১৭৬ রাণ (ডোব্রীক্যারী ৪৮ রাণে ৩টি, এন, চৌধুরী ৪০ রাণে ৩টি, কে, ভট্টাচার্য্য ২৫ রাণে ২টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৫৪ রাণ, (ফাল্সালকার ৪৭ নট, আউট ; এন, চৌধুরী ৪১ রাণে ৫টি, এম, সেন ২৮ রাণে ৩টি ও কে, ভট্টাচার্য্য ৩৪ রাণে ২টি উইকেট)

বাঙলা—৭৫ রাণে জয়লাভ করে।

বাঙলার গভর্ণর-দ্বাদশের সহিত মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্টের দ্বাদশের এই খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেষোক্ত দল ৭ উইকেটে পরাজিত হয়।

গভর্ণর-দ্বাদশ : লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক), অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, নিম্বলকার, মানকড়, শতশিবম্, এম, সেন, ডোরাইস্বামী, কে, ভট্টাচার্য্য, আনোয়ার হোসেন ও ভায়া।

মেঃ জেনারেল ষ্টুয়ার্ট-দ্বাদশ : কুচবিহারের মহারাজা (অধিনায়ক), হার্ডষ্টাফ, কম্পটন, সর্ব্বাতে, গিরিধারী, এন, চৌধুরী, জয়বিক্রম, এন চাটার্জ্জী, এ, চাটার্জ্জী, পি, সেন, হিন্দেলকার, ডোব্রীক্যারী।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ষ্টুয়ার্ট-দল মাত্র ১৩৬ রাণ করে। মাঠের অবস্থা বোলারগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। এই দিন সি,

এস, নাইডুর বোলিং-চাতুর্য্য সুপরিস্ফুট হয়। তাঁহার বলে একমাত্র হার্ডষ্টাফ ব্যতীত কেহই নির্ভয়ে খেলিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হার্ডষ্টাফও রাণ আউট হওয়ায় এত অল্প রাণে তাঁহাদের প্রথম দফার খেলা শেষ হয়।

প্রত্যুত্তরে বিজয়ী গভর্ণর-দলও ২২৮ রাণ করে। এই রাণ-সংখ্যার মধ্যে নিম্বলকারের ৯২ রাণ ও শতশিবমের ৫৬ রাণ উল্লেখযোগ্য! অধুনা বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পর পর বলে মানকড়, মুস্তাক আলী ও অমরনাথের ন্যায় বিখ্যাত ব্যাটসম্যানত্রয়কে আউট করিয়া হ্যাট্‌ট্রিক সম্পাদন করেন ও ভারতীয় ক্রিকেটে এক রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রাক্তন সিন্ধুপ্রদেশের ও বর্ত্তমানে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ এসোসিয়েশনের অন্তর্গত ঢোলপুরের গিরিধারীর কৃতিত্বপূর্ণ বোলিংএর বিরুদ্ধে গভর্ণরপক্ষের শেষ খেলোয়াড়গণ কেহই দাঁড়াইতে পারেন নাই।

ষ্টুয়ার্ট দল দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৩১৫ রাণ করে। হার্ডষ্টাফ ৭৩ রাণ করিয়া আউট হইলেও তাঁহার খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পক্ষে শিক্ষণীয় অনেক মারের কৌশল দেখা যায়। কম্পটন খুব ভাল খেলিয়া ১২৩ রাণ করেন।

শেষ দিনের খেলা খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়। উভয় দলই রাণ তোলার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর! কিন্তু গভর্ণর-দল মাত্র ৪ জন আউট হইয়া প্রয়োজনীয় রাণ-সংখ্যা অর্জ্জন করায় সাত উইকেটে জয়লাভ করে। আউট না হইয়া ৮৬ রাণের মধ্যে মুস্তাক আলী তাঁহার খেলার বৈশিষ্ট্য দেখান। অমরনাথ খুব বেশী রাণ না করিলেও তাঁহার খেলা অপূর্ব্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। এরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ ক্রীড়াচাতুর্য্য একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। ৪ জন আউট হইয়া ২২৬ রাণ করিলে এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মেঃ জেনারেল ষ্টুয়ার্ট দ্বাদশ: ১ম ইনিংস—১৩৬ রাণ (অমরনাথ ৩০ রাণে ৪টি ও সি, এস, নাইডু ৭৭ রাণে ৬টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৩১৫ রাণ (কম্পটন ১২৩, হার্ডষ্টাফ ৭৩, জয়বিক্রম ৪১, অমরনাথ ২৫ রাণে ৩টি, মানকড় ৮৮ রাণে ৫টি, সি, এস, নাইডু ৫৫ রাণে ২টি উইকেট)

গভর্ণর-দ্বাদশ: ১ম ইনিংস—২২৮ রাণ (শতশিবম্ ৫৬, নিম্বলকার ৯২, সি, কে, নাইডু ৪০, গিরিধারী ৬০ রাণে ৮টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৪ জন আউট হইয়া ২২৬ রাণ (মুস্তাক আলী আউট না হইয়া ৮৬)

গভর্ণর-দল ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়।

নাইডু সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব

বাঙলার অগ্রণী দলের সেরা মোহনবাগান ক্লাব সম্প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় লেঃ কর্ণেল সি, কে, নাইডুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনায় সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছে। বীরপূজা এক প্রাচীন রীতি। সি, কের ন্যায় অনন্যসাধারণ ক্রিকেট-প্রতিভার সম্মাননা করিয়া মোহনবাগান নিজেদেরও সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উদ্যম ও প্রয়াস প্রশংসনীয়।

ক্রিকেট খেলায় বাঙলা অধুনা পশ্চাদপদ হইলেও বাঙলায় ক্রিকেট-মনোভাব-সম্পন্ন খেলোয়াড়ের অভাব নাই, নাইডুর এই সম্বর্দ্ধনা তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। নাইডু যে কেবল নিজেই কৃতী খেলোয়াড় তাহাই নহে, বস্তুতঃ, তিনি স্বয়ং একটি ক্রিকেট-প্রতিষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার হাতে-গড়া ও উদাহরণে অনুপ্রাণিত বহু খেলোয়াড় আজ ভারতীয় ক্রিকেট-গগনের উজ্জ্বল তারকা। তাঁহার ক্রিকেট-প্রতিভার এই সমাদর সুসঙ্গত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না। আজ বাঙলা ক্রিকেটজ্ঞের সম্বর্দ্ধনা করে, মোহনবাগান নাইডুকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু মোহনবাগানের নিজস্ব বিখ্যাত বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালকে বা অন্য কাহাকেও তাঁহার নিজের ক্লাব অনুরূপ সমাদর করিলে কি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইত! কথায় বলে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না!'

যাক, মোটের উপর নাইডুর অভিনন্দন-উৎসব মনোজ্ঞ হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব তাঁহাকে রৌপ্যাধার উপহার দিয়াছেন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে আপ্যায়িত করিয়াছেন। লেঃ কঃ নাইডু তাঁহাদের আতিথেয়তার যোগ্য ও সমুচিত উত্তর দিয়াছেন।

মোহনবাগান ক্লাব এই উপলক্ষে এক বিশেষ প্রদর্শনী খেলার বন্দোবস্ত করেন। সিংহলী খেলোয়াড়দ্বয় শতশিবম্ ও জয়বিক্রম ব্যতীত নাইডুর হোলকার দলের কয়েক জন খ্যাতনামা সহচর এই খেলায় যোগদান করেন। মোহনবাগানের সভাপতি মিঃ জে, এন, বসুর দ্বাদশ সি, কে, নাইডুর দলের নিকট ১০ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করে!

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় অবশিষ্ট দলের পক্ষে শতশিবম্ এই বৎসর মুসলিম দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রাণ করেন। উভয় ইনিংসে তাঁহার সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গী সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করে। প্রবীণ সিংহলী খেলোয়াড় জয়বিক্রম বিলাতী কায়দায় খেলেন। প্রত্যেক বল নিরীক্ষণ করিয়া স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে খেলিয়া তিনি ১ম ইনিংসে ১২৩ রাণ করিতে সমর্থ হন। রক্ষণ ও আক্রমণের কৌশলে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক খেলিয়া তিনি ক্রীড়ানুরাগীদের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সর্ব্বাতে যুগপৎ ব্যাটিং ও বোলিংএ কৃতিত্ব দেখান। প্রথম ইনিংসে পতনের মুখে দৃঢ়তা-পূর্ণ ব্যাটিং করিয়া মাত্র দুই রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় দফার খেলায় তিনি ১৩৩ রাণ করিয়া এই গৌরব অর্জ্জন করেন। নিম্বলকারের ধীর ও সংযত খেলা লক্ষ্য করার বস্তু। প্রথম ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে তাঁহার খেলা সময়োপযোগী হয়। পার্শী খেলোয়াড় জে, এন, ভায়ার অনবদ্য ফিল্ডিং যে কোন ক্রিকেটদলের পক্ষে মহামূল্য অবদান। সি, এস, নাইডু এই খেলায় মাত্র ১১৪ রাণে ১৫টি উইকেট দখল করেন। এই খেলায় বাঙালী খেলোয়াড়-গণের দুর্ব্বলতার বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। সি, এস, নাইডু বা সর্ব্বাতের বলে প্রথম দফার খেলায় কিছুটা খেলিলেও শেষ বার তাহারা নৈরাশ্যের পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ, হোলকারের বিরুদ্ধে খেলিতে বাঙলাকে আরও কত সংযমের ও বুদ্ধিমত্তার সহিত খেলিতে হইবে, তাহার আন্দাজ পাওয়া যায়। এই খেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য—শেষ দিন বসু-দলে এ, দেব, মহারাজা ও এস, ব্যানার্জীকে পর পর উইকেট রক্ষা করিতে দেখা যায়।

জে, এন, বসু দ্বাদশ: কুচবিহারের মহারাজা (অধিনায়ক), এন, চাটার্জী, এম, সেন, শতশিবম, জয়বিক্রম, এস, ব্যানার্জী, এস, দত্ত, এ, দেব, এস, দেব, এন, চৌধুরী, কে, ভট্টাচার্য্য, ও বল্টু মিত্র।

সি, কে, নাইডু দ্বাদশ : লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু, (অধিনায়ক) সি, এস, নাইডু, মুস্তাক আলী, ভায়া, সর্ব্বাতে, নিম্বলকার, গাইকোয়াড়, এ, মুখার্জী, ডি, দে, এ, হাজরা, এস, রায় চৌধুরী ও ভাণ্ডারকর।

জে, এন, বসু দ্বাদশ :—১ম ইনিংস—৪৩৭ রাণ (এম, সেন ৫৪, শতশিবম্ ৮০, জয়বিক্রম ১২৩, কে, ভট্টাচার্য্য ৪৩, সি, এস্, নাইডু ১৩৫ রাণে ৮টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৬৮ রাণ (শতশিবম্ ৪২, এম, সেন ৩০, সর্ব্বাতে ও সি, এস, নাইডু যথাক্রমে ৫১ রাণ দিয়া ৪টি ও ৭টি উইকেট)

লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু দ্বাদশ :—১ম ইনিংস—৩২১ রাণ (সর্ব্বাতে ৯৮, ভায়া ৮৪, এস, ব্যানার্জী ২৩ রাণে ৩টি, এম, সেন ৪৪ রাণে ৩টি ও জয়বিক্রম ৩৩ রাণে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৫ জন আউট হইয়া ৫২৫ রাণ (নিম্বলকর ১৮৬, সর্ব্বাতে ১৩৩ ও মুস্তাক আলী আউট না হইয়া ১০১)।

সি, কে, নাইডুর দল ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া লনটেনিস্ চ্যাম্পিয়ানসিপ

সাউথ ক্লাবের প্রবর্ত্তনায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর উডবার্ণ পার্কে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বহু বিস্ময়কর ও অভাবনীয় পরিণতির ফলে শেষ পর্য্যন্ত প্রবীণ খেলোয়াড় জিমি মেটা উদীয়মান তরুণ সমস্ত মিশ্রকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী আখ্যা লাভ করেন। এ বৎসর ভারতীয় ২নং খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং, ইরসাদ হোসেন, মনোমোহন ও দীলিপ বসু প্রভৃতি এই খেলায় যোগদান করেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নবীন খেলোয়াড় মিশ্রের নিকট ইফতিকার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অপর দিকে যুধিষ্ঠির বিজয়ী ইরসাদকে পরাজিত করিয়া মেটা ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান। চরম মীমাংসার ফলে প্রবীণের ভূয়োদর্শিতার নিকট নবীনের পরাভব দেখা যায়। দুর্দ্ধর্ষ ও শক্তিমান্ খেলোয়াড় হইয়াও মিশ্র এই দিন মেটার চাতুর্য্যের আন্দাজ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত 'প্লেসিং' মিত্রকে অস্থির করিয়া তোলে।

মেটা ও মিশ্র যুগ্ম-প্রতিযোগিতায় ইফতিকার ও মনোমোহনকে অনায়াসে হারাইয়া দিয়া বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হন।

প্রদর্শনী খেলায় মিশ্র আবার ভারতীয় পেশাদার খেলোয়াড়দের শীর্ষস্থানীয় আজিজুল হককে পরাজিত করিয়া ভারতীয় টেনিস-জগতে নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

টেবিল টেনিস

সম্প্রতি কলিকাতায় বেঙ্গল টেবিল টেনিস্ প্রতিযোগিতার শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক খেলোয়াড় ব্যতীত খ্যাতনামা ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন দুই জন খেলোয়াড়—এরোন্সেন ও বেলাক্ যোগদান করিয়া এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ইঁহারা দুই জনেই আমেরিকান্। বেলাক্ ও অপর এক জন বিখ্যাত খেলোয়াড় বার্ণা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া সকল কেন্দ্রে তাঁহাদের অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বেলাক্ ডাবলসে জগতের মধ্যে এককালীন সেরা জুটীর অন্যতম। এখানকার খেলায় সিঙ্গলসে এরোন্সেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার খেলাই অধিকতর উপভোগ্য ও দর্শনীয় হয়। ডাবলসে বোম্বায়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় চন্দ্রাণার সাহচর্য্যে বেলাক্ ও কে, ব্যানার্জীকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত করেন।

ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলস্—

এরোন্সেন ১৮-২১, ১৩-২১, ২১-১৭, ২১-১১ ও ২১-২০তে বেলাক্‌কে পরাজিত করেন।

ভেটারেন্স্ সিঙ্গলস্—

এস, ব্যানার্জী—২১-১৩, ২১-১৯, ২১-১২তে এ, মুখার্জীকে সহজে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্—

এরোন্সেন ও চন্দ্রাণা বেলাক্ ও কে, ব্যানার্জীকে ২১-২০, ২১-১৮, ১৮-২১, ১৮-২১, ২১-১৯এ পরাজিত করেন।

আজ ও আগামী

শ্রীপ্রশান্ত দত্ত

তোমার বীণাতে ঝঙ্কার তোলো আজি !
এ-যুগের বীণা বিউগল হল না কি ?
কোথায় কোকিল, কই ফোটে ফুলরাজি ?
বারুদে-বোমায় পৃথিবী ফেলেছে ঢাকি।

মদের বোতলে রক্ত দেখেছ কভু ?
ভাভার নেশায় আজিকে মত্ত মানুষ—
মিলনের গান তুমি গেয়ে যাও তবু—
উড়ে চলে যায় কত যে কথার ফানুষ !

বাঁশীতে তুলিছ নিত্য নূতন রাগ
রাইফেল বুঝি দোঁহার দিতেছে তার !
দোলের দিনেতে এবার মাখিনি ফাগ,
পিচকারী কই বেয়নেটই আজি সার।

আগামী যুগের ইতিহাস লেখো আজ :
মৌন অতীত, নীরবে নিবিয়া যাও ;
ধ্বংসের দেব, খুলে ফেলো তব সাজ—
হে নবীন, তুমি বিজয়ের গান গাও !

সারস্বত-মহোৎসব

শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী

মানব-জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি জাতীয় সাধনার যত কিছু ক্রিয়া-কৌশল আছে, তৎসমস্তের প্রসূতি আমাদের বেদমাতা সরস্বতী। বেদমাতা কেবল হিন্দুদিগের মাতা নহেন, তিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-জাতির মাতা। মাতার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম সন্তান-পালন। এই পালনী শক্তি দেবী সরস্বতীতে যেরূপ সুষ্ঠু ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট, এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। কারণ, সর্ব্বসাধারণের জীবন ধারণের মূল যে জ্ঞান—যে বিদ্যা, তাহার একমাত্র পবিত্র উচ্চতর উৎস বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

সরস্বতী মাতার আর্য্য সন্তানেরা তাঁহাকে মহাপ্রকৃতির অন্যতম প্রতীকরূপে শান্তলীলার অন্যতমা শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকেন। শান্তলীলার শক্তিগণ কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতা প্রায়শঃ শাসন-অনুশাসনাদির অনুষ্ঠানে অনুরক্তা থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের সৌকর্য্য সাধন পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করেন। কালবশে যুগধর্ম্মের দ্বন্দ্বকালে হয় অসুরাদির প্রাদুর্ভাব, ও দেবাসুর দ্বন্দ্ব। সেই অসুরমারণাদি কার্য্যে থাকে তাৎকালিক সাময়িক শক্তি-অবতারের আবশ্যক। সারস্বতী শক্তির কিন্তু সেরূপ লীলা-বাহুল্যের—সেরূপ কার্য্যকলাপের প্রয়োজন তত প্রচুর ভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। একবার বহু অতীতের অষ্টাবিংশতি-যুগে তাঁহার তথাবিধ অবতারের আবশ্যক হইয়াছিল।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে, তন্মধ্যে দেবীযুদ্ধ প্রধান। এই যুদ্ধ হয় হিমালয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত দেবী দুর্গার। এই যুদ্ধে দুর্গাদেবীর পক্ষ হইতে ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শক্তির সহিত সারস্বতী শক্তির ডাক পড়িয়াছিল। দুর্গা দেবী চিরসিদ্ধা গৌরী। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া একবারে কৃষ্ণবর্ণা হইয়া যান। "কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী" ইত্যাদি উক্তি সেই যুদ্ধ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে।

দেবী সরস্বতী শ্বেতবর্ণা। ক্রোধের অত্যন্ত অভিব্যক্তিতে যে বর্ণ কৃষ্ণ বা নীল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। দেবী সরস্বতীও তদ্রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া নীলবর্ণা হইয়া যান। সেই অবস্থায় তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহার সংজ্ঞা দিয়াছেন নীলসরস্বতী। পুরাণে কিন্তু আমরা তাঁহার তাৎকালিক-নাম দেখিতে পাই ভদ্রকালী। সেই দেবী দৈত্যযুদ্ধে সমরে অমরগণের ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পূজায় তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মন্ত্র দেখা যায়—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ"

তাঁহার আকার শুভ্র—তিনি বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণা। তাঁহার আধার শুভ্র, তিনি শ্বেতপদ্মে সমাসীনা। তাঁহার আচার শুভ্র, তিনি ঐ পূর্ব্বোক্ত একটি সমরক্ষেত্র ব্যতীত মারণ-শাসনাদি অশুভ্র অর্থাৎ হিংসাত্মক কৃষ্ণ কর্ম্মে কুত্রাপি রত নহেন। তাঁহার ব্যবহার শুভ্র, তাই তিনি সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী। নিরন্তর বেদাদি ব্রহ্মবিদ্যা দানে নিরতা বলিয়া অভিধানে তিনি "ব্রাহ্মী" নাম ধারণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বদন-চতুষ্টয় হইতে যখন বেদধ্বনি নিনাদিত হয়, তখন মর্ত্ত্যে ঋষি-মহর্ষিগণের হৃদয়-যন্ত্রে উহার ঝঙ্কার আসিয়া পৌঁছে। ব্রহ্মার বদনযন্ত্রের মত সমান শক্তিসম্পন্ন যত যত যন্ত্র যে যে স্থলে ছিল, ওয়ারলেস তার-বার্ত্তার মত সর্ব্বত্র উহা প্রতিধ্বনিত হয়। সেই সকল যন্ত্র হইতেছে ঋষিগণের হৃদয়যন্ত্র। সে যন্ত্রের তুলনা নাই, আধুনিক স্থূলযন্ত্রের সহিত সে সূক্ষ্মযন্ত্রের—ঋষিহৃদয়স্থিত আণবিক যন্ত্রের তুলনাই হইতে পারে না। তথাপি ঐ সূক্ষ্মযন্ত্র সহজে বুঝিবার জন্য এ কালের ওয়ারলেস যন্ত্র অর্থাৎ তারহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সহিত তুলিত হইল।

একটি ওয়ারলেস তারযন্ত্র যদি কোথাও বাজিয়া উঠে, তবে উহার তুল্য শক্তিসম্পন্ন অন্য যাবতীয় যন্ত্রে তাহার ঝঙ্কার হয়। এই সব যন্ত্রের যেমন শক্তি, তারতম্যানুসারে তাহার পাল্লাও তেমনি সুদূরপ্রসারী হয়। ব্রহ্মার হৃদয়যন্ত্র ও অনুদিন বেদ-বেদাঙ্গ-বিদ্যাসাধক ঋষিগণের হৃদয়যন্ত্র উভয়ই অনন্ত অফুরন্ত শক্তিসম্পন্ন, তাই ব্রহ্মলোকের বেদধ্বনি মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঋষি-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ঋষিগণ সেই বিদ্যা জ্ঞান প্রভাবে স্ব স্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল বেদধ্বনির মধ্যে যাবতীয় বিদ্যা অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, তাহার সমষ্টি চতুঃষষ্টি। তন্মধ্যে বেদাদি মুখ্য বিদ্যা চতুর্দ্দশ, এতদ্ভিন্ন চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অবশিষ্ট অন্য সকল গৌণ। এই সকল বিদ্যার প্রসূতি সরস্বতীর আর্য্য উপাসকগণ সরস্বতীপূজা প্রসঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্তের বন্দনাই করিয়াছেন—

"বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।"

এক দিকে যেমন জ্ঞানিগণের প্রধান উপাস্য বেদ, অন্য দিকে তেমনই কর্ম্মিগণের অন্যতম সাধনীয় কলাবিদ্যা। এই কলাবিদ্যার অন্তর্গত বার্ত্তা অর্থাৎ বাণিজ্যাদির প্রধান উপকরণ শিল্পজাত যাবতীয় বিষয়-বস্তু। এই বার্ত্তাবিদ্যাই সর্ব্বজগতের আর্ত্তিহারিণী। আজ কাল কলাবিদ্যারই সমধিক ব্যাপকবৃত্তি। বর্ত্তমান কালে ক্যামিকেল অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারী যাহা অর্থসাধনের প্রধানতর পথ-রূপে সর্ব্বজনবিদিত—সর্ব্বজন কর্ত্তৃক উচ্চগ্রীবায় উদ্‌ঘোষিত, তাহাও এই বার্ত্তাশিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্ব্বমানবের উপকারক।

যুদ্ধাদি বিদ্যা—যাহা দ্বারা আজ বিজ্ঞান-প্রধান বিজ্ঞ-সমাজ বিস্ময়ান্বিত—যাহার আলাপ-আলোচনায় আজ সর্ব্বদিক্ মুখরিত, ইহাও বেদের অন্তর্গত অসাধারণ এক অংশ। ইহার অপর নাম উপবেদ। অতীত যুগে যুদ্ধাদি দ্বারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যথাযথ হইত, এজন্য শাস্ত্রে যুদ্ধকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। যজ্ঞশব্দার্থ যেমন পূজা, যুদ্ধশব্দার্থও তদ্রূপ পূজাবিষয়ক ব্যাপার। তাই চণ্ডীতে "যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি" ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ দেখা যায়।

সঙ্গীতবিদ্যাও বেদের অন্তর্গত। সাত্ত্বিক রসসাধক কর্ম্মিগণের প্রধান উপাস্য এই সঙ্গীতবিদ্যা কলা-বিদ্যার এক অংশ। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বদনে যে সারস্বত-বিদ্যার প্রথম প্রকাশ, তাহারও আদি-কারণ সঙ্গীত স্বর। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদধ্বনি নিনাদিত হইতে থাকিলে তাহাই সরস্বতী স্বর-সংযোগে গান করেন। ঋষিগণ সেই বেদ-সঙ্গীত স্বরশাস্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সামবেদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গই ঋষি-সমাজে সঙ্গীতরূপে গৃহীত ও গীত। আর এই সঙ্গীত-সাধনা বেদোপনিষদ্ সাধনার সহিত সমান আসন প্রাপ্ত, তাই ভক্ত সারস্বত সাধকের সভক্তি প্রার্থনা—

বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥

এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত সাধনার সম্বন্ধে একটি সঙ্গত উক্তির উল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

সঙ্গীত-রত্নাকর ও সঙ্গীত-দামোদর নামক গীতি-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—যে গান ভবভঞ্জক অর্থাৎ জীবের জন্ম-প্রবাহ নিরোধ করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করে—তাহাই প্রকৃত সঙ্গীত; আর যাহা ভবরঞ্জক অর্থাৎ কেবল কেলিকলার প্রকাশক শব্দবিন্যাসে গ্রথিত হইয়া—শ্রোতার চিত্ত রসাল ও চঞ্চল করিয়া তোলে, তাহা জন্মের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বিস্তারক বেশ্যা-সঙ্গীত তুল্য। এই প্রবন্ধে আলোচ্য সঙ্গীত—বেদানুমোদিত বেদবিহিত সাধু শব্দ ও সাধুভাব-সমন্বিত; অতএব ভবভঞ্জক—ভবরঞ্জক নহে। তাই সারস্বত মন্ত্রমধ্যে স্থান প্রাপ্ত। বীণাদিযোগে নারদাদি দেবর্ষি ও তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের কণ্ঠে দেব-ঋষি প্রভৃতির সভায় গীত হইত। বীণাবাদ্য সহকারে সরস্বতী সেই সকল সঙ্গীত ব্রহ্মা-সভায় গান করিতেন। এ জন্য তিনি বীণাধারিণী।

সমস্ত জ্ঞানের বিকাশ বা বিস্তার হয় বাক্য দ্বারা। অকারাদি অক্ষর দ্বারা বিন্যাস হয় সেই বাক্যের। উক্ত বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী। সুতরাং দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী, পক্ষান্তরে অক্ষরময়ী। অকারাদি অক্ষর-সমূহ তাঁহার স্বরূপ। সেই অক্ষর-পংক্তি দ্বারা বেদ উপনিষদাদি সর্ব্বশাস্ত্র সন্নিবদ্ধ। সেই অক্ষররাজির নাম মাতৃকা; তাই মা আমাদের মাতৃকা-বর্ণাত্মিকা।

বর্ণাবলী মাতৃকাত্মিকা—মাতার ন্যায় কার্য্যকারিণী। এই সকল বর্ণই আমাদের পরোক্ষ ভাবে পালন করে। বাল্যে অকারাদি বর্ণ লিখনে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার পর উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা যাবতীয় মানব জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

দেবী সরস্বতী সেই অক্ষরমালারূপে আবির্ভূতা, সুতরাং সর্ব্বজগতের—সর্ব্বমানবের মাতা। সনাতন তন্ত্রমতে কলাশাস্ত্র-সম্মত সেই অক্ষরের সংখ্যা পঞ্চাশ—"পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ" ইত্যাদি। উক্ত শাস্ত্র অকারাদি পঞ্চাশবর্ণে মাতৃকাদেবীর একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী।

জগতে যত কিছু ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মেরই এক একটি স্বাধীন বর্ণমালা বিদ্যমান। সকলেই ইহাকে সংক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব সুবিধা-অনুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ জাতীয় অক্ষরের উল্লেখ অসম্ভব—বাহুল্য-ভীতিও তাহার অন্যতম হেতু। অন্য সব বাদ দিয়া কেবলমাত্র বর্ত্তমান শিক্ষায় দীক্ষিতগণের বহুল ভাবে ব্যবহৃত ইংরেজী বর্ণমালার অতি সংক্ষেপ মাত্র ২।৪টি অক্ষরের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়—ঐ সকল বর্ণ আমাদের তন্ত্রোক্ত অক্ষরাদির বর্ণের অন্তর্গত। অ আ প্রভৃতি স্বর ও ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন-বর্ণের অনুকরণে ইংরেজী প্রায় সকল বর্ণ হুবহু মিলিয়া যায়। অতএব ভারতী মাতা কেবল ভারতের কেন, সর্ব্ব-দেশের সর্ব্বজাতির দৈশিকী মাতা বলিয়া অবাধে গণ্য হইতে পারেন। কারণ, সেই অক্ষর-মূলক বিদ্যাই কালে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া সকলের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া আজন্ম-মরণ পালন করিয়া থাকে।

দেবী জ্ঞানদা অক্ষর-ব্রহ্মরূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার প্রথম ও প্রধান জ্ঞানী সন্তানগণের জ্ঞানদানে কৃতার্থতা সম্পাদন করিয়াছেন; বর্ণাত্মক অক্ষররূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মী সন্তানদিগের কৃতকার্য্যতা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত নহেন, সেই অক্ষরমালার লিপি নির্ব্বাহের জন্য মস্যাধার দোয়াত ও লেখনী নাম লইয়া লিখন-কার্য্যের সৌকর্য্য সমাধান করিয়াছেন—যাহার প্রসাদে সর্ব্বজগৎ লিখিয়া পড়িয়া মানব-পদবাচ্য হইতে সমর্থ হইয়াছে।

দক্ষিণায়নে জীবের জাড্য সমধিক প্রবল থাকে, সে সময় সাধনার দিক্ সুষ্ঠু ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। এই পৌষের অবসানে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির অব্যবহিত পরেই উত্তরায়ণ, দেবী ভারতী মাতা এবারও জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া ভারত-সন্তানের দৃষ্টিপথে সমুপস্থিত। তিনি ভারতীয় জ্ঞানশিক্ষার ভাণ্ডার বেদাদি পুস্তক, মস্যাধার লেখনী, বীণাদি যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ লইয়া উপস্থিত। এই মহাসুযোগ সকলেরই—তাঁহার সন্তানমাত্রেরই সেব্য।

শীত-বসন্তের সন্ধি সময়ে বর্ষে বর্ষে সরস্বতীর শুভাগমনের সাড়া পাইয়া ঋতুরাজ বসন্ত তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দানের দ্রব্যসম্ভারে অবহিত হইয়া থাকে। যব-কণিশ, আম্রমুকুল, সুশ্বেত কমল কহ্লার ও কুন্দ কুসুমের সম্ভার যোগাইবার জন্য বসন্ত সাতিশয় ব্যগ্র হয়। এই সময়ে বসন্তের অভিব্যঞ্জক কুসুম্ভরঙ্গে রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া বালক-বালিকারা যুক্তকরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে প্রযত্নবান্। টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষামন্দির পুষ্পাঞ্জলি-দান মন্ত্রে মুখরিত হয়। সাধু-ভাবের সঙ্গীত-সঙ্গতে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত থাকে। এই ভাবে বাঙ্গালার সারস্বত মহোৎসব বর্ষে বর্ষে সুসম্পন্ন হইয়া হিন্দুমাত্রের মনে আনন্দ দান করে। সে দৃশ্য অতি মনোহর—অতিশয় চিত্ত-চমৎকারক।

এই ভাবের সেবা সাধনায় দেবী ভারতীর প্রসাদলব্ধ মহাকবি কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলে ভারতের সারস্বতকুঞ্জ পরিপূরিত হইয়াছিল। তার পর মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিবর অধ্যাপক-বৃন্দে ভারত-ভূমি বিশেষ করিয়া বঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তদন্তিমে অনন্ত রকমের বাঙ্গালা কবির প্রাদুর্ভাবে কবি-পদবী প্রোজ্জ্বল ও কবি-গৌরবের গরীয়সী কীর্ত্তি-পতাকা কবিকাব্যগগনে উড্ডীন ছিল। সে যুগের সে কবি-গৌরবের বিষয় ভাবিলে—আলোচনা করিলে কে না আনন্দে উৎফুল্ল হয়?

হে সারস্বত পদকামী যুবকগণ! বিধিবিহিতরূপে সরস্বতীর পদসেবা কর—তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা কর—

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি।

সুভাষিতাবলী

(বিদেশী কবিদের ভাবানুসরণে)

শ্রীকালিদাস রায়

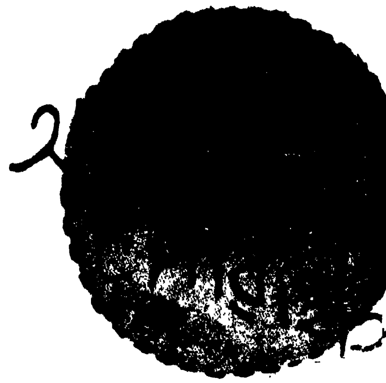
রমণী যখন প্রেমের স্বপ্ন হেরে, পুরুষ তখন যশের পিছনে ধায়।
পুরুষ যখন প্রেমতৃষ্ণায় ফেরে মা হ'য়ে রমণী অবসর নাহি পায়।

প্রাণের সম্মতি লয়ে হাতে হাতে হয় যে মিলন
তারেই বিবাহ বলে মন্ত্র পড়ি হয় না বন্ধন।

চোখের ভাষা অশ্রুকণা ঠোঁটের ভাষা হাসি।
ঐ রসনার ভাষার চেয়ে এদের ভালবাসি।

আশাহীন কণ্ঠ যেন দেহহীন ছায়া
কায়াহীন আশা তা' ত মরীচিকা মায়া

যাহার জীবনে নাই ভয় তৃষা আশা,
নাহি গৃহ-সংসারের স্নেহ-ভালবাসা।
দিনান্তে পায় না গৃহে হাস্যের মাধুরী
সে জীবন সূর্য্যহীন অন্ধকার পুরী।



শ্রীতারানাথ রায়

যুদ্ধের পরে—

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপের যে দশা হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর—মাত্র য়ুরোপ নহে, সমগ্র পৃথিবীর দশা কি একই প্রকার দাঁড়াইবে না? পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপের জাতিগুলি এক দিকে যেমন আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্রীতদাস হইয়া পড়ে অন্য দিকে তেমনি মাকিণ বণিক্‌দের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত রণ-ঋণের দুর্ব্বিষহ বোঝা বহিয়া তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যুদ্ধের পর পণ্যের ক্ষুধা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছিল বলিয়া য়ুরোপের শ্রমশিল্পগুলি প্রসারিত হইলেও মাকিণ শ্রমশিল্পের প্রতিযোগিতা পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমশিল্পে আমেরিকার লগ্নী কারবারের সুদ বহিবার সামর্থ্য কোন দেশের হয় নাই। তাই পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই য়ুরোপের ধনিক ও বণিক্ সম্প্রদায় (বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর) অখিল য়ুরোপ আন্দোলন (Pan Europa Movement) আরম্ভ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে European Customs Union ফ্রান্সের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রশ্ন করেন—

"Are you of opinion that an economic understanding between the nations of Europe would enable them to resist more effectively the growing pressure exercised upon them by the United States?"······কেহ প্রশ্ন করেন—"America Conquers Britain and Who Will Be Master—Europe or America?"

সে বার আমেরিকার ন্যায় য়ুরোপের নির্ব্বীর্য্য জাতিগুলির অপর শত্রু ছিল সোভিয়েট রুশিয়া ও এশিয়ার জাতি সমূহের স্বাতন্ত্র্য-সংগ্রাম। এশিয়া য়ুরোপের শ্রমশিল্পের মালিকদের পণ্যবিক্রয়ের বাজার। গত মহাযুদ্ধের অন্তে এক দিকে আমেরিকা যেমন য়ুরোপের এই ধনিকদের আপনার করধৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অন্য দিকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে য়ুরোপের এই ধনিকদের তথা ধনিক-প্রভাবান্বিত য়ুরোপীয়দের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন প্রবল হয়। এই সময় রুশিয়ার ধনসাম্যবাদী আন্দোলন এই ধনিকদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তাহারা বলিতে থাকে—"The Soviet Union has become an utterly alien Asiatic or semi-Asiatic empire, more dangerous in that it offers thereby a natural ally to the rising tide of Asiatic nationalism."

য়ুরোপীয় জাতিগুলি পঁচিশ বৎসর পরেও যেমন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক ক্রীতদাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই বিজয়ী সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব য়ুরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত ও বণিক সম্প্রদায়কে তাঁহাদের দৈবাধিকার (the divine rights of the bourgeoisie) হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের বিপদ—

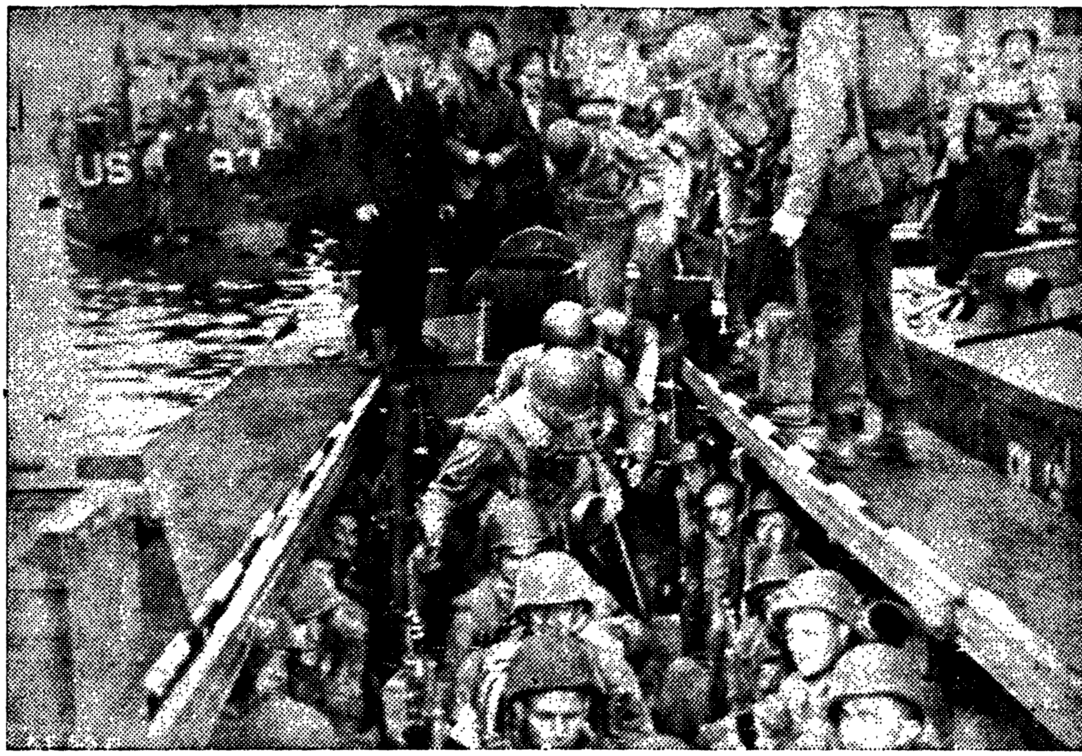
১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের প্রধান হেতু ছিল যোগাযোগ রক্ষার সঙ্কট। বর্ত্তমানেও জার্ম্মাণীর এই সঙ্কট ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ইস্পাত ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে ব্যবস্থা-দৌর্ব্বল্যের সুযোগ মিত্রপক্ষ লইয়াছে। সে সময় ইহাই ব্যবস্থা ছিল যে, প্রথমে সাবমেরিণ, দ্বিতীয়তঃ বিমান-বিধ্বংসী কামান, তৃতীয়তঃ ট্যাঙ্ক এবং সর্ব্বশেষে রেলপথের জন্য ইস্পাতের বরাদ্দ হইবে। মিত্রপক্ষের বিমানবহর পশ্চিম-য়ুরোপে জার্ম্মাণ সামরিক ব্যবস্থার দুর্ব্বল-স্থল রেলপথের উপর আক্রমণ করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে মিত্রপক্ষ প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় ২০টি রেলপথের উপর বোমাবর্ষণ করে। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল সুরক্ষিত করিবার জন্য জার্ম্মাণরা রেলপথ বিস্তার করিলে তাহা ইংরেজ বিমান বহরের আক্রমণ পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়ে।

তাহার পর জনবল। জনবলের অভাব জার্ম্মাণদের আজ প্রবল সঙ্কট। জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ পল হ্যাগেন তাঁহার "Will Germany Crack?" গ্রন্থে এই সঙ্কটের আভাষ দিয়া বলিয়াছেন—"The shortage of labour has now become the Nazi's most desperate problem···It has not been solved and cannot be, for reasons beyond Nazi's control." কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীকে এই জনবলের অভাবে গত দুই বৎসর দিনের পর দিন পরাজিত হইতে হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই সময়ে জার্ম্মাণ প্রচার-বিশেষজ্ঞ লেঃ জেনাঃ কুট ডিটমার বেতারে বলেন—রুশিয়ায় আরও জার্ম্মাণ সৈন্য চাই, রুশরা রিজার্ভ সৈন্য ব্যবহার করিতেছে "The Russians are far ahead of us in exploiting their man power reserves···This year (1943) their drives are more concentrated more exhausting and more dangerous than last."

দৈন্যপ্রবাহ ও কম্যুনিজম্—

ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের কতক অংশ হইতে জার্ম্মাণরা বিতাড়িত হইলেও, এ সকল মুক্ত দেশের অবস্থা আনন্দ করিবার মত নহে। নাৎসীরা এ সকল অঞ্চল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে জনসাধারণ মরিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর এ বৎসর য়ুরোপের শীতের তীব্রতা অসহ্য। মুক্তি-প্রাপ্ত নরনারী যেন জোর করিয়া মুক্তির আনন্দ করিতেছে। বেলজিয়ামের অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, জ্বালানী চাই! মিত্রপক্ষ প্রথম মাসে শত শত টন খাদ্য দিয়া প্রধান মন্ত্রী হুবার্ট পিয়েরলটের সরকারকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও, ফ্রান্সের ন্যায় বেলজিয়মেও কম্যুনিষ্ট-প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা বৃটিশ-সমর্থিত এই সরকার মানিতে চাহিতেছে না।

মিত্রপক্ষের অন্নসাহায্যে হল্যাণ্ড কোন মতে দাঁড়াইয়া আছে। সে অন্নও পর্য্যাপ্ত নহে। বিদ্যালয়গুলি বন্ধ, হাসপাতালগুলিতে ঔষধও নাই—চিকিৎসকও কম। লণ্ডনের রাণী উইলহেলমিনা সরকার



ফ্রান্সের উপকূলে মিত্রসৈন্যের অবতরণ

রিপোর্ট পাইয়াছেন—"Communisim had gained no converts in Holland but old conservative parties were being radicalised. From Dutchmen in Holland, Dutchmen in exile did not know what to expect."

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে নাৎসীরা ২০ হাজারের অধিক ওলন্দাজ দেশভক্তকে হত্যা করিয়াছে; তবু গুপ্ত বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। লণ্ডন হইতে নির্ব্বাসিত স্বদেশবাসীরা নাৎসী-নিয়োজিত ওলন্দাজ শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে থাকে—"Commit acts of sabotage whenever a chance arises......damage high-ways, rail-roads, water ways...your chance is here to do your part in the liberation of your country."—নির্ব্বাসিতা ওলন্দাজরাণী উইলহেলমিনা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ পিটার গারব্র্যাণ্ডি স্থির করিয়াছেন, দেশে ফিরিয়াই তাঁহারা বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিবেন এবং জনসাধারণ যে প্রকার শাসন-তন্ত্র চাহিবে তাহাতেই তাঁহারা সম্মত হইবেন।

এই শীতে বৃটেনের কষ্টও কম নহে। গৃহহীন সহস্র সহস্র নরনারীকে আজ সরকারী 'শেল্টারে' রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। বোমাবিধ্বস্ত প্রায় আট লক্ষ গৃহকে বাসোপযোগী করিবার জন্য প্রায় লক্ষ শ্রমিককে শ্রম করিতে হইতেছে। তবে বৃটিশ নরনারী সুশৃঙ্খল-ধৈর্য্যে এ সকল কষ্ট বরণ করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত বৃটেনে কম্যুনিজমের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু য়ুরোপে আজ যে ভাব-তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্লাবন বৃটেন রোধ করিতে পারিবে কি না ভবিতব্যই জানে। 'নিউজ ক্রনিকেলের' সম্পাদক লিখিয়াছেন—"This has become the common man's war. Man is trying to find the equation between individual liberty and economic orde . Communal control without too great sacrifice of personal freedom seems to be the common denominator of all resistance movement."

রুশিয়ার কৌশলনীতি—

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ সেসিল এফ মেলভিল "The Russian Face of Germany" নামে একখানি বই লিখেন। এই বইয়ে জার্ম্মাণ-সোভিয়েট ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, লেনিনের সময় হইতেই জার্ম্মাণ রণনায়কদের নীতি হইয়াছিল, য়ুরোপের পশ্চিম সামান্তকে বলশেভিক শক্তি দ্বারা বিপন্ন করিয়া সেই সুযোগে জার্ম্মাণ অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করা ও তৎপর জার্ম্মাণীর চিরন্তন শত্রুগুলিকে সায়েস্তা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রুশিয়ায় জার্ম্মাণ তত্ত্বাবধানে গ্যাস, বিমান ও অস্ত্রকারখানা স্থাপিত হয় এবং জার্ম্মাণী হইতে প্রভূত পরিমাণ অস্ত্র রুশিয়ায় চালান যায়। জার্ম্মাণ রণনায়কদের সহিত রুশ লালফৌজের এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন—"In this hellish alliance between Oligarchic Germany and Communist Russia it is plain that each part-

believes it can double cross the other the Kremlin thinks to use Germany in the cause of world revolution, the Reichsrtwen to use the Red Army to give it European hegemony."

রুশিয়া যে জার্ম্মাণীর মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়াছে তাহা য়ুরোপে রুশ-প্রভাব বিস্তার হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে। জার্ম্মাণীর গঠনশক্তির সাহায্যে রুশিয়া যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যে দুর্জ্জয় সামরিক শক্তির অধিকারী হইয়াছে, সে শক্তির বলেই সে মাত্র যে জার্ম্মাণীর প্রভাবই চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, দক্ষিণ-য়ুরোপেও আপনার প্রভাব-গণ্ডী বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের কতকটা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ প্রতিরোধ—

এ মাসে পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের পাল্টা প্রতিরোধ কোথাও হ্রাস পায় নাই। সোভিয়েট সৈন্য এ পর্য্যন্ত বুদাপেস্ত দখল করিতে সক্ষম হয় নাই। ড্যানিউব উপত্যকায় জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ চরম হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়া ও পোলসীমান্তে দারুণ শীত পড়ায় যুদ্ধ বিশেষ চলিতেছে না।

পোল্যাণ্ডে রুশ-প্রভাব—

পোল্যাণ্ডের রুশ-প্রভাব ইংরেজরা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। জেনারল সোসঙ্কোস্কি প্রমুখ লণ্ডনস্থ পোলগণ এই রুশপ্রভাব মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, তাহারা আর স্বদেশে ফিরিবে না, ব্রেজিলে গিয়া বসবাস করিবে। রুশবিদ্বেষী জেনারল বোর ও তাঁহার দল যেন জার্ম্মাণ বন্দি-নিবাসে শৃঙ্খল গণনা করিবেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ সামনার ওয়েলেস পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে ইঙ্গ-রুশ আপোষের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—পোল-সমস্যা সম্বন্ধে যে ইঙ্গ-রুশ সমাধান প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন (major surgical operation) না করিলে মধ্য-য়ুরোপে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুরক্ষিত হইবে না।

রুম্যানিয়ায় রুশনীতি—

রুম্যানিয়া চিরদিনই সোভিয়েট-তন্ত্রের বিরোধী। আজ সেই মনোভাব তীব্রতর হইয়াছে। এখানে কম্যুনিষ্ট দল তত প্রবল না হইলেও বিজয়ী রুশসৈন্যের সমর্থনে তাহারা আপনাদিগকে শক্তিশালী মনে করিতেছে। তবে সরকারী ভাবে সোভিয়েটতন্ত্র রুম্যানীয় কম্যুনিষ্টদিগকে সমর্থন করিতেছে না। গত বৎসর এপ্রিলে রুশ-পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ ঘোষণা করেন—রুশিয়ার বাহিরে সোভিয়েট য়ুনিয়নের কোন দেশলিপ্সা নাই, অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামোর অদল-বদল করিবার বাসনাও তাহার নাই—("The Soviet Union has no territorial ambitions beyond its own frontiers, no intention of changing the social or political structure of other nations.")—তবু রুম্যানিয়ানরা এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না।

ভূমধ্যসাগরে রুশ শক্তি—

শত শত বৎসর য়ুরোপের বড় বড় রাষ্ট্র বল্কান রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া আপনাদের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছে। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের "Eastern Policy" গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে এই দেশ ও দ্বীপগুলির মধ্যে একটা ভ্রাতৃতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েট রুশিয়া এই ভাবের পৃষ্ঠপোষক।

মস্কো বৈঠকে সিদ্ধান্তই হইয়া গিয়াছে যে, রুশিয়াকে বল্কানে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে। গ্রীস্ বৃটিশ প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে থাকিবে। যুগোশ্লাভিয়ায় আপন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রয়োজনের খাতিরে ইংরেজ সোভিয়েট সমর্থিত মার্শাল টিটোকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিজয়ী রুশ কিন্তু অতি-সাবধান নীতি অবলম্বন করিয়াছে। আপনাদের অধিকৃত বল্কান অঞ্চলগুলিতে তাহারা এখনও সোভিয়েটতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করে নাই। এমন কি, মার্শাল টিটোর অনুমতি লইয়াই তাহারা যুগোশ্লাভিয়ায় ডেনিউব নদের পরপারে সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু ইংরেজরা বল্কানে বিপন্ন হইয়াছে। এ স্থানে তাহাদের বহু শতাব্দীর কূটনীতির খেলা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। তাহার খাস তালুক দাস-খণ্ড ভারতের তোরণ সুয়েজের দ্বারদেশে সোভিয়েট-প্রভাবপুষ্ট বল্কান রাষ্ট্রসঙ্ঘ বৃটেনের ত্রাসস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুগ-যুগ ধরিয়া রুশিয়া একটু "গরম দরিয়া" পাইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিল, ভূমধ্যসাগর-তটের অন্যতম শক্তি হইয়া, আজ তাহার সে চেষ্টা সফল হইতে চলিয়াছে। বৃটেন এই বিপদের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে, কিন্তু কি করিবে! সাংবাদিকরা বলিতেছেন—"Britons would be less than Empire builders if they were not aware that, in the cold blooded language of politics the Balkans had become a Russian sphere of influence. As such it undid the work of a hundred years of British statecraft. The area of decision for the Eastern Mediteranean had been snatched from the British lion by the blacksmith's boy from Klanjec."

গ্রীসে রুশপন্থীরা অসন্তুষ্ট

গ্রীসে বৃটিশ-করধৃত প্রধান মন্ত্রী পাপানদ্রু পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রিজেন্ট জেনাঃ প্লাষ্টিয়াসের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য এক সম্মিলন হয়। এ সম্মেলনে গ্রীক বামপন্থী কম্যুনিষ্টদল E L A S যে গণ-নির্ব্বাচন ও গণমত গ্রহণের প্রস্তাব করেন তাহা গৃহীত হয় নাই। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ও পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এন্টনি ইডেন এ উপলক্ষে গ্রীসে গিয়াছিলেন। গ্রীসের বামপন্থী জনৈক সৈন্য গুলী ছোড়ে, চার্চ্চিল আহত হন নাই। গ্রীসে রিজেন্সী স্থাপিত হইবার পরেও বামপন্থীরা অস্ত্র ত্যাগ করে নাই। নূতন মন্ত্রিসভা আপনাদের পরিকল্পনায় বামপন্থীদের অনুসৃত প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশ্বাসের বিষয় এই যে, ২৮শে পৌষ বামপন্থীদের সহিত গ্রীস ও মিত্রপক্ষের একটা রফা হইয়া গিয়াছে।

ইটালীতে এখনও যুদ্ধ—

ইটালীতে জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ শক্তি এখনও চূর্ণ হয় নাই। সার্চ্চিও উপত্যকায় প্রবল জার্ম্মাণ আক্রমণে মিত্রসৈন্যকে সামান্য



আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে মাদাম চিয়াং কাইশেকের সহিত ব্রেজিলের রাষ্ট্রপতির আলাপ

হটিয়া আসিতে হয়। মিত্র-অধিকৃত ইটালী হইতে বিমান-বাহিনী জার্ম্মাণ-অধিকৃত উত্তর-ইটালীর সেতু সমূহ, যুগোশ্লাভিয়ার রেলওয়ে ইয়ার্ড এবং অষ্ট্রিয়ার তৈলকলগুলির উপর বোমা ফেলে। শুনা যাইতেছে, জার্ম্মাণী নরওয়ে হইতে ৮ হইতে ১০ ডিভিশন সৈন্য লইয়া গিয়া ইটালী ও অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে নূতন রক্ষা-ব্যবস্থা করিতেছে।

জার্ম্মাণীর প্রতিরোধ

গত জুনের শেষ ভাগে দুই জন ভ্রমণকারী তুরস্কে পৌছিয়া প্রকাশ করেন যে, জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, পশ্চিমে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি স্তব্ধ করিবার জন্য জার্ম্মাণরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে ও মিত্রসৈন্যগণকে সমুদ্রোপকূলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবে। ইহাতে দুই বৎসরের মধ্যে তাহারা বৃটিশ ঘাঁটি হইতে পুনরায় আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইহার ফলে জার্ম্মাণরা না জিতিলেও একটা থমকা ভাবের উদ্ভব করিতে পারিবে। তখন জার্ম্মাণ সামরিক আলানস্করগণ আশা করেন—"In that event the occupied countries of Europe would again fall into dispair. The U. S and Britain would be shaken beyond repair; Roosevelt and Churchill would surely fall. With its war won anyway Russia would make its own peace with the Reich."

রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণী কি করিবে না করিবে, তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিলেও বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা 'পিতৃভূমি' রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ব দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও একক সর্ব্ব দিকে মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে।

সিগফ্রিড লাইনের বরাবর ফিল্ড মার্শাল রুনষ্টেড পাল্টা আক্রমণ করিতেছেন। আলশাস ও সার নদীর পরপারে তীব্র আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণরা যেন চেষ্টা করিতেছে যে, মিত্রপক্ষের বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী পুনরায় আর সম্মিলিত হইতে না পারে। জার্ম্মাণ-আক্রমণের ফলে রাইন নদীর পশ্চিমে ২০ মাইল জার্ম্মাণ এলাকা হইতে আমেরিকান সৈন্যদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ রণাঙ্গনে এবং উত্তর-আলশাস রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর এই পাল্টা আক্রমণের ফলাফলের উপরেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে হয়। হিটলার তাঁহার সেনাপতি মার্শাল রুনষ্টেড্‌কে বলিয়াছেন—"পশ্চিম সীমান্তে শীতকালীন এই আক্রমণে যুদ্ধের চরম সিদ্ধান্তের জন্য আমি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিব, স্থির করিয়াছি। যদি জার্ম্মাণ সৈন্যদল বিজয়ী না হয়, তাহা হইলে আমার এই বাণী যেন বিদায় বাণীরূপেই গ্রহণ করা হয়।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে ১৫০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সৈন্যের তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হয়। মার্কিণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নব বর্ষের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর সাবমেরিণের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং আটলান্টিক মহাসাগরের যুদ্ধে অবিরাম সতর্কতার প্রয়োজন। গত ডিসেম্বরে সাবমেরিণের উৎপাত বৃদ্ধি পায়; ফলে মিত্রপক্ষের বাণিজ্য-জাহাজের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

ইঙ্গ-মার্কিণ মনোমালিন্যের কথা—

য়ুরোপের পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর কথঞ্চিৎ প্রতি-আক্রমণ সাফল্যে শঙ্কিত হইয়া ইংরেজরা মার্কিণ জেনারল আইজেন

হাওয়ারের অধিনায়কত্ব নেতৃত্ব বিভিন্ন সেনাপতির মধ্যে বণ্টন করিবার প্রস্তাব করিতে পারে, এই সম্ভাবনা দেখিয়া "নিউইয়র্ক টাইমস" প্রথম হইতেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মার্কিণ সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসন জার্ম্মাণ প্রতিআক্রমণ সম্বন্ধে জেনারল আইজেনের নিকট রিপোর্ট তলব করিয়া বলিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে কোন সামরিক কর্ম্মচারীর ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহার নাম চাই। গ্রীস ও ইটালীর বিপন্নদিগের জন্য প্রেরিত মার্কিণ রসদ-বণ্টন ব্যাপার লইয়াও ইঙ্গ-মার্কিণ মনোমালিন্য চলিতেছে বলিয়া এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বৃটেন না কি আমেরিকার অধিক রসদ বিতরণের বিরোধিতা করে।

অন্যান্য ব্যাপারেও ইঙ্গ-মার্কিণ মনোমালিন্যের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। পোল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইটালী, ভারতবর্ষ, ও গ্রীসে চার্চ্চিল সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার দাবী আমেরিকানগণ করিয়াছে ইংরেজ সাংবাদিকরা (বিশেষতঃ Economist) মার্কিণ-নীতির সমালোচনা করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি তাহার পাল্টা জবাবে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি-সভার জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন—"Why should not we criticise Mr. Churchill and his Cabinet for their activities in Belgium, Italy, India and Greece? This is imperialism running riot. We are now bearing the brunt of fight on the Western front, while Mr. Churchill masses the British Tommies to kill Greek patriots. We are fighting this war to defeat Fascism and Mr. Churchill consistantly butters General Franco, while Pandit Nehru languishes in gaol in India." ইহার উপর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এক বিবৃতিতে নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, বহু-প্রচারিত আটলাণ্টিক চার্টার আদৌ স্বাক্ষরিত হয় নাই। মাত্র মার্কিণ জাতি নহে, এই সংবাদে সমগ্র পৃথিবীর ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে।

প্রাচ্য রণাঙ্গন—

বৃটেন দাবী করিতেছে যে, তাহারা বড়দিনের সময় পর্য্যন্ত উত্তর-ব্রহ্মের প্রায় ৩০ হাজার বর্গ-মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপ-পরিত্যক্ত আকিয়াব দ্বীপে ইংরেজ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। ইন্দোচীন উপকূল, সুমাত্রা, ব্যাঙ্কক, ফরমোজা, ও জাপ দ্বীপপুঞ্জে নিয়মিত ভাবে বিমান আক্রমণ চলিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হইতে আমেরিকানরা জাপানকে প্রায় ৩০০০ মাইল হটাইয়া দিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লুজন দ্বীপে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে।

চীনে জাপানের নবোদ্যমের গতিরোধ করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মার্শাল চিয়াং কাইশেক অবশেষে কম্যুনিষ্টদের সহিত রফা করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে ৩ লক্ষ জাপ-অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য চীনকে উদ্বিগ্ন হইতে হইতেছে।

তবু লণ্ডনস্থ রয়টারের সামরিক সমালোচক গত ৩০শে ডিসেম্বরের এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষে সমর-বিশেষজ্ঞগণ এ কথা মনে করেন না যে, জাপানকে অনায়াসে পরাজিত করা যাইবে। জাপানে আভ্যন্তরীণ গোলমাল না হইলে, সে দেশকে পরাজিত করিতে অন্ততঃ প্রায় দুই মাস সময় লাগিবে। কারণ—

১। জাপানের সৈন্যবল অটুট আছে। নূতন সৈন্যদলও সংগৃহীত হইতেছে। জাপ স্থলসৈন্য প্রায় ৪০ লক্ষ। ২০ লক্ষ সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নূতন। প্রতি বৎসর জাপান ২ লক্ষ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবে।

২। বিমান-বল জাপানের যথেষ্ট। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপান রকেট বিমান ব্যবহার করিতে পারে। ইতিমধ্যেই একটি জাপ বেলুনকে মার্কিণ-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে দেখিয়া আমেরিকা সাবধান হইয়াছে।

৩। জাপানের নৌশক্তি রহস্যাবৃত। এত জাপ রণতরী নিমজ্জিত হইয়াছে যে, মনে হয়, জাপানের আর রণতরী নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষ মনে করে যে, জাপানের এখনও দুর্জ্জয় নৌবাহিনী আছে।

৪। অনেকে মনে করিতেছেন যে, জার্ম্মাণী পরাজিত হইলে জাপান আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু এরূপ মনে হয় না। জাপান মনে করিতেছে যে, জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর এংলো-স্যাক্সন শক্তিসঙ্ঘ মনে করিবে, প্রধান আপদ গিয়াছে, এইবার জাপানকে নিরস্ত্র করিতে পারিলেই হয়। তখন অতিক্রান্ত মিত্রপক্ষ বাধ্য হইয়া মিকাডোর সহিত সন্ধি করিবে।

৫। খোদ জাপ দ্বীপপুঞ্জেও বোমাবর্ষণ প্রায়শঃ চলিলেও জাপানের প্রায় সকল শ্রমশিল্পই পূরা মাল উৎপন্ন করিতেছে।

৬। জাপান প্রথমে চীনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মিত্রপক্ষকে বিপন্ন করিতে চাহিতেছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে বহু সৈন্য লইয়া গিয়া সে মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে সমবেত করিয়াছে।

৭। সমুদ্রে দূরবর্ত্তী ঘাঁটিগুলির প্রতি নজর না দিয়া জাপান গৃহপার্শ্বে সুরক্ষিত রক্ষাগণ্ডী স্থাপন করিতেছে। মিত্রপক্ষের দিক্ দিয়াও সাত সমুদ্র ঘুরিয়া জাপান-আক্রমণের উপযুক্ত মালমসলা ও সৈন্যাদি লইয়া যাওয়ার অসুবিধা আছে। রুশিয়া জাপান সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্ত্তন না করিলে, এংলো-স্যাক্সন জাতিদ্বয়কেই এই সকল অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইবে। সোভিয়েট সরকার জাপানকে শীঘ্র ঘাঁটাইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়

এক দিন যৌবনের স্নিগ্ধ-প্রাতে স্বপন-মদির
সুন্দর শ্যামল রূপ দেখেছিনু এই পৃথিবীর!

জীবনে মধ্যাহ্ন এল বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত
আমার মানস-স্বর্গে হয়ে গেল যবনিকা-পাত;

দেখিনু মিথ্যার বিষ দুঃখ-দ্বন্দ্ব বুভুক্ষার ছবি
ক্লিন্নতায় বিমলিন, অতি দীন মাটির পৃথিবী!

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাতা বৃদ্ধি

যুদ্ধের বাজারে যখন সকল দ্রব্যেরই দাম বাড়িয়াছে, তখন ব্যবস্থা-পরিষদের ভাতার হার বৃদ্ধি না পাইলে চলে কি করিয়া? নাজিমুদ্দিন সচিব-মণ্ডলীর বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিরোধী দলের আপত্তি সত্ত্বেও গৃহীত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে সদস্যগণ মাসিক ১৫০৲ টাকার স্থানে ২০০৲ টাকা এবং দৈনিক ১০৲ টাকার বদলে ১৫৲ টাকা পাইবেন। আমরা জানি, সদস্যদের কষ্ট দূর করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা, কিন্তু দুষ্ট লোকে কাণা-ঘুষা করিতেছে—নিজের দল কায়েমী করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের মস্তকে কাঁটাল ভাঙ্গা হইতেছে। ব্যয়বৃদ্ধির ভার তো জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে। সচিব-মণ্ডলীর কার্য্য-কলাপ আলোচনার বহির্ভূত। চুপ করিয়া থাকাই ভাল। আমাদের মনে হয়, এই সঙ্গে সচিব-মণ্ডলীরও বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। আর যদি কখনও তাঁহারা সিংহাসনচ্যুত হন (কারণ, প্রকৃতি চির-পরিবর্ত্তনশীল), তবে তাঁহারা যেন একটা মোটা রকমের গ্র্যাচুইটি বোনাস পান। দুর্দ্দিনের জন্য সাবধান হওয়া ভাল। অনেকে বলেন, বন্দোবস্ত সবই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেরই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। ও সব নিন্দুকের কথা। আর যদি সত্যও হয়, তবে এই মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আরও যদি তাঁহাদের দু' পয়সা হয় তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহাদের সুব্যবস্থা ও সুপরিচালনার মূল্য দিতে হইবে না? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহারা সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘ কাল সচিবত্ব করুন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই হাতে। জনসাধারণ মরে মরুক, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার অভাব ঘটে ঘটুক, তাঁহাদের যেন কোন কষ্ট না হয়। বাঙ্গালা বলিতে তো তাঁহাদেরই বুঝায়, জনসাধারণ কে?

ফুড কমিশন

বাড়ীতে আগুন লাগিলে প্রথমে গৃহবাসীদের বাঁচাইয়া পরে আগুন লাগিবার কারণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। আজ-কাল সবই উল্টা। দুর্ভিক্ষ মিটিয়া গেলে কমিশন বসে। কার দোষ নির্ণয়ের জন্য অর্থ ও বুদ্ধি ব্যয় হয়। দুর্ভিক্ষের সময় সবাই চুপ-চাপ থাকে। কিছু দিন কাটে রিপোর্ট তৈয়ারী করিতে, কিছু দিন কাটে সরকারী দপ্তরখানায় পেশ করিতে। তাহার পর সেই রিপোর্ট ফাইলের তলায় চাপা পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ সেই রিপোর্টে বিশেষ কোন ফল হয় না। শুনা যাইতেছে, দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট মার্চ্চ মাস নাগাদ প্রকাশিত হইবে। তাহাতে না কি বাঙ্গালা ও ভারত সরকারের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করা হইয়াছে। "তাঁহারা দেখাইতে চাহিবেন যে, এমন কতকগুলি অবস্থার জন্য এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে যে, কোন একটি কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলে না।" কথাটা খুবই ন্যায্য। দোষ জনসাধারণের। তাহারা মরিল কেন? ইহা স্রেফ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ইচ্ছা করিয়া দল বাঁধিয়া তাহারা না খাইয়া মরিয়াছে। এই ধরণের একটি রিপোর্টেরই আশা করিতেছি। তবু অপেক্ষা করা প্রয়োজন, যদি সবুরে মেওয়া ফলে।

মর্ম্মান্তিক খেল

পরার্থে দান অতি প্রশংসনীয় কার্য্য বিশেষ করিয়া পরের দ্রব্য দান করার মত আনন্দ আর কিছুতে নাই। বাঙ্গালা দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, কিন্তু "অতিশয় বিশ্বস্ত " হইতে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে অধিকতর চাউল দাবী করা দূরের কথা, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট প্রচুর পরিমাণে চাউল বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, রপ্তানীর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইবে। ইহা ছাড়া আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার কলিকাতার খাদ্য যোগানোর ভার ত্যাগ করিতে চাহেন। ষ্ট্যাণ্ডিং ফুড এডভাইসারী কমিটীর সকল সদস্যই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালা দেশের সদস্যরা পর্য্যন্ত সহি করিয়াছেন। এ যে কি খেল, বোঝা শক্ত!

ও দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে, (১) বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলায় সরকারী এজেন্টকে যে দামে চাউল ক্রয় করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, তাহারা চাষীদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অনেক কমে ক্রয় করে। (২) পল্লী অঞ্চলের গুদাম সমূহ ভরিয়া যাওয়ার জন্য এজেন্টদের চাউল কিনিবার অসুবিধা হইতেছে। (৩) এজেন্টরা গুদামে স্থানাভাব বলিয়া চাউল কিনিতেছে না; ফলে চাউলের দাম অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, এই সকল কারণে যদি বাজারের মূল্য নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কমিয়া যায়, তাহা হইলে সরকার তখনই সমস্ত চাউল কিনিয়া লইয়া মূল্যের অধোগতি বন্ধ করিবেন। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্যে মাল খরিদ করিয়া লইবেন! মরিবে গরীব চাষীরা আর মুনাফা করিবে সরকার আর এজেন্টরা। এও এক খেল!

বালকদের লোষ্ট্র-নিক্ষেপ খেলায় ভেকেদের প্রাণবধ হইয়াছিল, এ কথা ভুলিলে চলিবে না!

"কিন্তু"

বৃটেনের সফর শেষ করিয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিগণ আমেরিকায় গিয়াছেন,—সেখানকার বৃহদায়তন শিল্পাদির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-কার্য্য লক্ষ্য করিতে। যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে এই সব শিক্ষা অনেক কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু—এই 'কিন্তু' সম্বন্ধে ডাঃ মেঘনাদ সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য এবং অত্যন্ত খাঁটি কথা। তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পোন্নতিই সমৃদ্ধির মূল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শিল্প নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কর্ত্তৃত্ব জাতির নিজের হাতে থাকা আবশ্যক—আর সেই কর্ত্তৃত্বলাভ স্বাধীনতা লাভেরই নামান্তর এই 'কিন্তু'র সমাধান আজ অবধি হয় নাই। যুদ্ধের পরও হইবে কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

ভুলাভাইএর দৌত্য

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের প্রতি আটক আদেশের মিয়াদ ফুরাইবে। ভারত সরকার যেন

সুযোগে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। ইংরেজী নববর্ষের প্রারম্ভেই ৫ই জানুয়ারী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন! এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সংবাদ-পরিবেশকগণ অনুমান করিয়াছেন। অনেকে এমন অনুমানও করিতেছেন যে, গান্ধীজীর সহিত এই সাক্ষাতের ফলাফলের উপর কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের মুক্তিলাভ নির্ভর করিতেছে। সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতিও তিনি লাভ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কেন্দ্রী পরিষদের নভেম্বর অধিবেশনের সময় পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে বড়লাটের আলাপ হয়। বড়লাট না কি সে সময় শ্রীযুত ভুলাভাইকে বলেন যে, তিনি ভারত আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগের অবসান ঘটাইয়া বিভিন্ন প্রদেশে গণ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে আগ্রহবান্। তিনি এ আশ্বাসও না কি দেন যে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রী সরকারের কংগ্রেসের দাবীগুলি যথাসম্ভব মানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। তবে ভারত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ অদল-বদল করিতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট নারাজ।

সে সময় শ্রীযুত ভুলাভাই না কি বড়লাটকে জানান যে, গণ-প্রতিনিধির হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে কংগ্রেস সর্ব্বদাই সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। ইহা না হইলে সমর-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যাইবে না। কংগ্রেস দল বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পুনরায় প্রস্তুত কি না, সে সম্বন্ধে শ্রীযুত ভুলাভাই বলেন, এই বিষয়ে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিই মত প্রকাশ করিতে পারেন; তবে তিনি বড়লাটকে এ কথা জানান যে, আপনাদের দাবী পূরণের জন্য কংগ্রেস কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেস সর্ব্বদাই ইংরেজদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াই অভীষ্ট লাভ করিতে চাহেন। সুতরাং বড়লাটের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে—কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সুযোগ দান করা।

পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে না, বড়লাট এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে বলিলে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই না কি বলেন যে, যখন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁহার সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলিতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এরূপ প্রতিশ্রুতির আর প্রয়োজন হইবে না। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গান্ধীজীর পরামর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না।

ক্রিপস্-প্রস্তাব চলনসই করিবার চেষ্টা

অন্য দিকে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর কনশিলিয়েসন কমিটী (আপোষ সমিতি) যেন এক দিকে কংগ্রেস ও সরকার এবং অন্য দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ মনোবৃত্তির পুষ্টি করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এক মূল সূত্র নির্ণয়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আবার ক্রিপস্-প্রস্তাবগুলির কথাও বিশিষ্টদের মুখে মুখে শুনা যাইতেছে। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে, প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া অমার্জ্জনীয় রাজনৈতিক ভুল হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার দলে কংগ্রেস দলের আরও দুই-এক জন ভিড়িয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বড়দিনে হিন্দু মহাসভার বৈঠকে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের গোষ্ঠী-চ্যুত হইবার অধিকারের অংশ লোপ করিলেই ক্রিপস্-প্রস্তাব কতকটা চলনসই হয়। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতও উহাই। কতটুকু অদল-বদল করিলে ক্রিপস্-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়, সপ্রু-কমিটী তাহারই তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইংরেজ বলিয়াছিল যে, যুদ্ধ চলিবার সময় শাসনতান্ত্রিক কোন পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এ যুক্তি যে অচল, তাহা চীনের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। তথায় মহাসঙ্কটের মধ্যেও মার্শাল চিয়াং কাইশেক ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-সাধন করিতে সম্মত হইয়াছেন। য়ুরোপের বিভিন্ন ক্ষুদ্র দেশেও গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজরা সম্মতি দিতেছে। অথচ এ দেশে তাহারা গণদাবী উপেক্ষা করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে ৯৩ ধারার জোরে স্বৈর-শাসন চালাইতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই স্বৈরতন্ত্রকে সাহায্য করিবার জন্যই জনসাধারণকে অবহিত হইতে বলিতেছে।

অধ্যাপকের কৃতিত্ব

আশুতোষ কলেজের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ছন্দ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া 'বঙ্গীয় ছন্দো-মীমাংসা' নামে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে প্রবন্ধ তিনি রচনা করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকবর্গ তাহাতে বিশেষ ভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, এত দিন এই বৃত্তি-পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থিগণ ইংরেজীতেই প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন, কিন্তু তারাপদ বাবু ইংরেজী রচনার গতানুগতিক গৌরবের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বঙ্গভাষাতেই তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষার ইতিহাসে তাঁহার এই সৎসাহস এবং সাফল্য একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য বঙ্গভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রথম পি-আর-এস্ তারাপদ বাবু এবং প্রথম পি-এইচ-ডি বিমানবিহারী বাবুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদগ্ধজন দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষাতেই আলোচনা করুন, ইহাই কামনা।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ২১তম অধিবেশন কানপুরে অতি সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের ২৪শে হইতে ২৬শে তারিখ পর্য্যন্ত অধিবেশনের কার্য্য চালান হয়। অধিবেশনের কার্য্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার—মূল সম্মেলনের উদ্বোধন ৩ ঘটিকা। মূল সভাপতি—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা শাখা ও প্রদর্শনী—সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ।

শিল্পশাখা ও প্রদর্শনী—সভাপতি শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার—সকাল ৯টা সাহিত্যশাখার অধিবেশন,

—সভাপতি শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যশাখার অন্যান্য শাখার অধিবেশনও এই সঙ্গেই হয়।

অপরাহ্ণ ২।৩০ মিঃ—সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাখার-অধিবেশন —সভাপতি শ্রীযুত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অপরাহ্ণ ৪।৩০ মিঃ—ইতিহাস ও সংস্কৃতি-শাখার অধিবেশন—সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অপরাহ্ণ ২।১০ মিঃ মহিলা-শাখার অধিবেশন—শিশু ও কিশোর-সম্মেলন।

২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—সকাল ৯টা বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার অধিবেশন—সভাপতি রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ।

অপরাহ্ণ ২টা বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন—সভাপতি ডাঃ মহম্মদ কুদরাত এ খুদা।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা

ডিসেম্বর ২৪শে হইতে ২৬শে তারিখ পর্য্যন্ত বিলাসপুর সহরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৬তম অধিবেশন হয়। বীর সাভারকর তিন দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। বিলাসপুর ডাঃ মুঞ্জের জন্মস্থান। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বীর সাভারকর বলেন—এমন এক সময় ছিল যখন ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু সম্মেলনের জন্য সমস্ত ভারতের ১২.১৪ জন লোককে একত্র করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেন। আজ তাঁহারই জন্মস্থানে সহস্র সহস্র যুবক তাঁহারই মতবাদে দীক্ষিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ দৃশ্য দেখিবার পর ডাঃ মুঞ্জে শান্তিতে মরিতে পারিবেন। স্বাধীন ভারতের,—মহাসভার প্রস্তাবে যাহার নাম হিন্দুস্থান হইবে,—ভাবী শাসনতন্ত্রের মূল গ্রহণীয় নীতি সম্বন্ধে ও স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের মূল নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবগুলিই বোধ হয় এই অধিবেশনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সমান নাগরিক অধিকার ও সংখ্যানুপাতে ব্যবস্থা সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার থাকিবে। 'হিন্দুস্থান' সর্ব্বতোভাবে এক এবং তাহাকে ব্যবচ্ছেদ করা চলিবে না। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভাবী রাষ্ট্র কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ও শোষণ হইতে অব্যাহতি দানে কৃতসংকল্প। বেকারদের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

আমেরিকায় অপপ্রচার

আমেরিকায় ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেশ কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ডেপুটী লিডার মিঃ মেটা ভারতে ফিরিয়া জানাইয়াছেন যে, অপপ্রচার দ্বারা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, বিশেষতঃ কংগ্রেস সম্বন্ধে মার্কিণী-মন বিষাক্ত করা হইয়াছে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের পরিচালনে বৃটিশ দৌত্যাবাস এই অপপ্রচারের জন্য ভারতবাসীর কষ্টার্জ্জিত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতেছে। ভারত সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আমেরিকাকে জানিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, মিসেস পার্ল বাক, তাঁহার স্বামী মিঃ ওয়াল্‌স্‌, মিঃ লুই ফিশার, মিঃ লিন-য়ুতাং, মিঃ নর্ম্মান টমাস প্রভৃতি যাঁহারা ভারত-হিতৈষী, তাঁহারাও অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতের কোন খবরই তাঁহারা পান না। মিঃ মেটা জানাইয়াছেন যে, ভারত হইতে কেহ আমেরিকায় গেলে মার্কিণী জনসাধারণের সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। 'হিন্দু'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতাও এই অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, মার্কিণ সরকারের যাঁহারা ভারতীয় ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা মাত্র বৃটিশ সরকারী বা অর্দ্ধ সরকারী তরফ হইতে প্রাপ্ত সংবাদেরই মূল্য প্রদান করেন।

ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা জানুয়ারী ১৯৪৫ হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন চলে। সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদলের সহিত ইংলণ্ডে থাকায় তাঁহার প্রেরিত অভিভাষণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পাঠ করেন। কার্য্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৩রা জানুয়ারী, বুধবার—পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব-শাখার, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ। বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনা।

৪ঠা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—রসায়ন-শাখার, গণিত ও সংখ্যা-বিজ্ঞান-শাখার, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ। বিভাগীয় আলোচনা।

৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা-শাখার, কৃষি-বিজ্ঞান-শাখার, শারীরবিদ্যা-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ। বিভাগীয় আলোচনা।

৬ই জানুয়ারী, শনিবার—প্রাণিবিদ্যা ও পতঙ্গবিদ্যা শাখার, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল-শাখার, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সভাপতিদের অভিভাষণ। বিভাগীয় আলোচনা।

৭ই জানুয়ারী, রবিবার—রামতেক খিনসি ও মানসার ম্যাঙ্গানীজ খনিতে ভ্রমণ।

বিভিন্ন শাখার সভাপতি

গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান—ডাঃ বি,এন,প্রসাদ, (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)
পদার্থ-বিজ্ঞান—ডাঃ আর, সি, মজুমদার (দিল্লী „)
রসায়ন—ডাঃ কে, বেঙ্কট রমন (বোম্বাই „)
ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—মিঃ এন, এন, চ্যাটার্জ্জী (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা)
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—অধ্যাপক জি, পি, মজুমদার („ „)
প্রাণিবিদ্যা ও পতঙ্গবিদ্যা—ডাঃ এইচ, এন, রায় (ইম্পিরিয়াল ভেটিরিনারি কুমায়ুন)
নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব—ডাঃ এ, আইয়াপ্যান (গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়াম, মাদ্রাজ)
চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান—অধ্যাপক এস, ডব্লিউ, হার্ডির (ওসমানিয়া মেডিক্যাল কলেজ হায়দ্রাবাদ)
কৃষিবিজ্ঞান—অধ্যাপক এন, ডি, যোশী (ফার্গুসন কলেজ, পুণা)
শারীরবিদ্যা—ডাঃ বি, মুখার্জ্জি (বাইও কেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশন লেবরেটরি, কলিকাতা,
মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান—মিঃ, বি, কৃষ্ণ স্বামী (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়)
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা—রায় বাহাদুর এ, এন, খোসল (পাঞ্জাব সেচ বিভাগ, পাঞ্জাব)

আমেরিকা ও বৃটেনে প্রচার

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকায় গিয়া এই ভারত-বিদ্বেষ বুদ্ধি কথঞ্চিৎ প্রশমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিষ্টার রুজভেল্টের পত্নী মিসেস রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে অভ্যর্থিত করিতে অসম্মত হইয়াছেন, তবু ডাঃ তারকনাথ দাস, মিঃ জি এল কাল-প্রমুখ ইণ্ডিয়ান লীগ অব আমেরিকার সদস্যগণ নিউইয়র্ক-প্রবাসী ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, ন্যায়ের খাতিরেও বৃটিশ সরকার যদি আরও কয় জন প্রকৃত ভারতীয় নেতাকে এদেশে আসিতে দিতেন!

ভারতবাসীর প্রতি এংলো-স্যাক্সন শ্বেতাঙ্গদের বিদ্বেষ আজ নূতন নহে; তবু ইহাদের চিত্ত-চিপিটক রসসিক্ত করিবার জন্য কি আমেরিকায় কি বৃটেনে প্রবাসী ভারতবাসীরা বাক্যবিস্তার দ্বারা যত দূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে সাংবাদিক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে এবং মিঃ রেজিনাল্ড রেনল্ডস প্রভৃতির ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম ক্যাম্পেন আসন্ন বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। বাক্য দ্বারা সম্রাট্ জাতির চিত্ত ও রক্ত হইতে সাম্রাজ্যবাদ বন্ধুরা লুপ্ত করিতে পারিবেন কি?

জাতিগত বিশেষত্ব

শ্রীযুত গগনবেহারী লাল মেটার দৃষ্টিশক্তির তারিফ করিতে হয়। সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় তিনি না কি একটি ছোট গল্পের দ্বারা বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশ্লেষণটি সত্যই উপভোগ্য। গল্পটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। য়ুরোপের কোন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতির ছাত্র একত্রে অধ্যয়ন করিত। এক দিন শিক্ষক তাহাদের হস্তী সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করিতে দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্র লিখিল, হস্তী-শিকার সম্বন্ধে। ফরাসী রচিল হস্তীর প্রেমবিলাস সম্বন্ধে একটি কবিতা। পোল্যাণ্ডবাসীর প্রবন্ধ, হস্তী ও পোলিশ সমস্যা। জার্ম্মাণ রচনা করিয়া ফেলিল, ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ, নাম দিল, হস্তিতত্ত্বের ভূমিকা। আর মার্কিণ লিখিল, বৃহত্তর ও উন্নততর হস্তী উৎপাদনের সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। বিদ্যালয়ে আজকালকার ভারতীয় ছাত্র থাকিলে হস্তী ও পাকিস্থান সম্পর্কে অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ যে পাওয়া যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

বুদ্ধির গুঁড়ি

ঢাকায় সরকারী গুদামে রক্ষিত ৪২ হাজার মণ পচা আটা জিলা ফুড কমিটী কর্তৃক নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রথমে বিক্রয় করিবার বহুবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকাবাসী কেহই তাহা খরিদ করিতে রাজী হয় নাই। অগত্যা! লোকে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মরিতেছে। সেই সময় এত আটা গুদামজাত করিয়া, বিকৃত করিয়া, অবশেষে নষ্ট করিয়া ফেলা অসহ্য! আর এই ব্যয়ভার বহন করিবে কে? সচিবদের বুদ্ধির গুঁড়ি মাপিবার মত মেজারিং টেপ মেলা কঠিন!

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা

২৭শে পৌষ বৃহস্পতিবার সকালে সিনেট হলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের এক সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—ভারতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্ব মুক্তির সন্ধান পাইবে। সকল জাতির নিকট দাসত্ব একই বস্তু। ইহাকে কখনও ভাগ করিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং শোষকের করাল গ্রাস হইতে নিখিল বিশ্বের নিপীড়িত মানবকে মুক্ত কর। তোমাদের শিক্ষা যেন সে পথে প্রসারিত হয়। মহান্ ও উদার আদর্শ লইয়া মানবতার মুক্তির জন্য অগ্রসর হও। ভৌগোলিক বাধা-বন্ধন যেন তোমাদের অগ্রগতি প্রহত না করে।

ডাঃ সরসীলাল সরকার

অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডাঃ সরসীলাল সরকার ১০ই পৌষ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এনট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এল-এম-এস উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সহঃ-সার্জ্জন হিসাবে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিন বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলিয়ট পুরস্কার বোধ হয় একমাত্র তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। ডাঃ সরকারই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, বেরিবেরি রোগের কারণ বাজারের সরিষার তৈল। গত দুর্ভিক্ষের সময় আর্ত্তসেবা-সঙ্ঘের সভাপতি হিসাবে তিনি দুর্গত জনগণের প্রভূত সেবা করিয়াছেন। কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় নহে, সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত "মনের কথা" ও "রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী পরিকল্পনা" তাঁহারই রচিত। তাঁহার স্ত্রী, দুই কন্যা ও তিন পুত্র বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ

জগদ্বিখ্যাত মনীষী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ শনিবার ১৫ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি নিখোঁজ ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার পরিবার তাঁহাকে খুঁজিয়া পান। তাঁহার তিরোধানে বিশ্বের সংস্কৃতিবান্ নর-নারী মাত্রেই ব্যথিত। রোলাঁ ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। কিন্তু এ সবের উপর তিনি ছিলেন দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, সার্ব্বভৌম শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর উপাসক। তাঁহার এই বিশ্বপ্রীতির জন্য তাঁহাকে জীবনে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিজের মতবাদ ও আদর্শ হইতে কখনও তিনি বিচ্যুত হন নাই। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিয়াছেন তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জীবনী লিখিয়া। তাঁহার বিয়োগ আমাদের বুকে পরমাত্মীয় বিয়োগের মতই আঘাত দিয়াছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার



— স্নাতা —

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সৌজন্যে]

মাসিক বসুমতী

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৩শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৫১ | ৪র্থ সংখ্যা



সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সমাধান

ডাঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সমস্যা অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম সমস্যা-রূপী বিষবৃক্ষ ভারতের মাটি থেকে জন্মগ্রহণ করেনি। এর আয়ুও বেশী দিনের নয় আর আপনা হতেই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে এর জন্ম নয়। মানুষের দ্বারাই এর সৃষ্টি এবং পুষ্টি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাইট অনারেবল হিজ হাইনেস দি আগা খান তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট মুসলিমদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন চাই এই উদ্দেশ্যে দরবার করেন। এই দরবার সম্বন্ধে তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন—এটা একটা 'হুকুমী দরবার'। অর্থ এই যে, উচ্চতর রাজশক্তির নির্দ্দেশে (হুকুমে) এই দরবার পেষ করা হয়েছিল। সেই সময় রাষ্ট্রসচিব ছিলেন লর্ড মর্লে, লিবারাল দলের নেতা। তিনি এই হীন ষড়যন্ত্রে অর্থাৎ পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকতে রাজী ছিলেন না। তাই বড়লাটকে তিনি লিখে পাঠালেন—"I won't follow you again into our Mohametan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was your early speech about their extra claims that first started the Moslem hare."

পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথা আবিষ্কারের জন্য রাজশক্তিই সর্ব্বতোভাবে দায়ী ছিল। উদ্দেশ্য ভারতের গণমত এবং জাতীয়তা গঠনের অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রমাণ জুটে গেল অতি অদ্ভুত ভাবে। লেডি মিণ্টোর ডায়েরী থেকে একটি পত্র পাওয়া গেল। মুসলিমদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে এক জন অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি লিখেছেন—"I must send your Excellency, a line to say that a very big thing has happened today, a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the putting back of sixty two million of people from joining the ranks of seditious opposition."

ইনি মনে করেছিলেন—'ডিভাইড এণ্ড রুল'-নীতিই ভারতবর্ষে অবলম্বনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি। এই যে মুসলিমরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের ধুয়া তুলেছে এর পিছনে আছেন কোন কূটনৈতিক রাজকর্ম্মচারী। মুসলিমদের এই পুতুল-নাচের সুতো ধরা আছে বৃটিশ রাজনীতিকদের হাতে। ষ্ট্যাচুটারী সাইমন কমিশনের ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটির রিপোর্টেও এ কথার স্বীকারোক্তি আছে।

"That there was no spontaneous demand by the Moslem at that time for seperate electorate but it was only put forward by them at the instigation of an official whose name is wellknown."

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সেই ডেপুটেশনকে লর্ড মিণ্টো পৃথক্ নির্ব্বাচন অধিকার দিতে রাজী হয়েছিলেন এক সর্ত্তে। যেখানে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ, কেবল মাত্র সেইখানেই এই প্রথা প্রযোজ্য। কিন্তু সেই থেকেই ভারত জুড়ে মুসলিমদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবী নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেল; আর তাতে তারা প্রকাশ্যে এবং পর্দ্দার আড়াল থেকে সাহায্য ও উৎসাহ পেল বৃটিশ রাজশক্তির। ভারতের রাজনীতির মাটিতে চিরকালের জন্য বিষবৃক্ষ রোপিত হ'ল। পৃথক্ নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এলো ব্যবস্থা সভায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও তাদের সংখ্যা-নির্ণয়ের প্রশ্ন। ভারতবর্ষকে ফালি ফালি করে বিভক্ত করলে সেই বিষাক্ত ছুরি। যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত আজ পাকিস্থান পরিকল্পনা এসে উপস্থিত হ'ল।

পাকিস্থান পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে চায় দুই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়ে। ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে থাকবে কেবল হিন্দু আর এক ভাগে কেবল মুসলিম। তাহলে নাগরিক অধিকারের জন্য আর আপোষে ঝগড়া

হবে না। কিন্তু এই পরিকল্পনা কখনই কার্য্যকরী হতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে কোন দিন কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায় নিয়ে জাতি অথবা রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। সর্ব্বত্রই বহু সম্প্রদায় নিয়ে জাতি এবং রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপর সম্প্রদায়গুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ সমস্যা চিরকালের, প্রতি দেশের। কালির এক আঁচড়ে তার সমাধান হয় না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিলিত চেষ্টায় এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নিজেদের মনোমালিন্য ভুলে একত্র হয়ে দেশের সকলকে নিয়ে করতে হবে তার সমাধান।

ভারতবর্ষের অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যা রুশিয়া ও যুক্তরাজ্যকেও এক সময় বিব্রত করে তুলেছিল, কিন্তু তারা আজ অনেক পরিমাণে তার সমাধান করে এনেছে। ভারতবর্ষ আজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করছে, তখন তাদের নিয়মতন্ত্রের অনুকরণ করতে দোষ কি? ভাগাভাগি, পৃথক্ নির্ব্বাচন, সাম্প্রদায়িক অধিকার ইত্যাদির গণ্ডগোল যুক্তরাজ্যে শেষ হয়ে গেল Civil Warএর সঙ্গে সঙ্গে এবং তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিঙ্কনের এক কথায়—"The Union of the State is perpetual."

রুশিয়ার সমাধান-পদ্ধতি কিন্তু অন্যরূপ। সেখানকার সম্প্রদায়-সমস্যা ভারী গোলমেলে। এক শত আশী বিভিন্ন জাতি, এক শত একান্ন ভাষা, তেত্রিশটি রিপাবলিক। প্রত্যেকের আবার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি। কিন্তু এত বিভক্তি সত্ত্বেও রুশিয়া এক। এক রাষ্ট্রই পরিচালনা করছে সবাইকে। কতখানি কৃতিত্ব! সেই কৃতিত্বের পরিচয় আজ পাওয়া যাচ্ছে রণাঙ্গনে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিকে আজ তারা করেছে কোণ-ঠাসা। নিজেদের মধ্যে মনের প্রাণের মিল না থাকলে তা কখনই সম্ভব হ'ত না।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এবং পুষ্ট। এ সমস্যা সেদিনের। ভারতের সরস মাটিতে ঐ ধরণের বিষবৃক্ষ পূর্ব্বে কখনও জন্মায়নি। আর এই সমস্যা রুশিয়ার মত এত দুরূহ নয়। তার চেয়ে অনেক সোজা। অথচ সমাধান হচ্ছে না কেন? কারণ, এই সর্ব্বনাশী বহ্নির ইন্ধন জোগাচ্ছে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা। চিরকাল ভারতের লোকেরা ভারতবাসী নামেই পরিচয় দিয়ে এসেছে। আর সেদিন আবিষ্কৃত হল ভারতের বাসিন্দা ভারতবাসী নয়। তারা দুই বিভিন্ন জাতি—হিন্দু আর মুসলিম। ধর্ম্ম দিয়ে জাতীয়তা অথবা নাগরিক অধিকার বিচার করা চলে না। হিন্দু অথবা মুসলিম যদি ধর্ম্ম বদল করে তবু তারা ভারতবাসীই থাকবে। যা রুশিয়াতে সম্ভব হয়েছে তা ভারতবর্ষেও সম্ভব হবে। সে জন্য জাতিকে ভাঙ্গবার দরকার নেই, দেশকে ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন নেই। যদি এমন এক ফেডারাল কণ্ট্রোলের সৃষ্টি হয়, যে দেশের সেই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে যা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমস্যা; যেমন—মিলিটারী, ডিফেন্স, শুল্ক, যান-বাহন, ব্যবসায়িক চুক্তি, মুদ্রা ও তার বিনিময়ের হার ইত্যাদি, অথচ কোন সম্প্রদায়ের অথবা ধর্ম্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না তবেই এর সমাধান হতে পারে। কিন্তু ভারতে তা কি সম্ভব হবে? যে মিলনের ভিত্তির উপর একে গড়ে তুলতে হবে তারই মূলে হচ্ছে কুঠারাঘাত। তবু ভারতকে এক হয়ে চেষ্টা করতে হবে সমাধানের, ভুলে যেতে হবে সকল আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য। স্বাধীন ভাবে মাথা তুলে বাঁচতে হলে, এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কে?

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

কি জানি কেমন ছোঁয়া সে—
মেঘে ও মাটীতে ভুল হয়! হেরি
চাঁদিনী দিনের আকাশে।

জনতায় মরু সে আনে:
ক্ষণেতে ডুবায় ধেয়ানে,
কি-সুর বাজায় পাতার নূপুরে
অশথ-বনের বাতাসে!

বুঝি না সে ছায়া-লীলারে—
ধরিবারে যাই, পলকে হারাই
—দুলায় ভাঁটা ও জোয়ারে।

ধূলিরে করে সে ধরণী,
তরু হ'তে চায় তরণী,
সাগর-বারতা ব'য়ে আনে যেন
শিশির-কৌটার আভাসে।

"নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ পর-ধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।"—বিবেকানন্দ

শরৎচন্দ্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের ইতিহাসে এক একটা কাল এক এক জন মানুষের প্রভাবে এমন প্রভাবান্বিত হয় যে, সেই কাল বা নিরবচ্ছিন্ন কালের সেই খণ্ডাংশ সেই মানুষের নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে—মনে হয়, কালের প্রভাব সেই মানুষের মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছিল! সেই মানুষের নামকে সগৌরবে নিজের আগে স্থান দিয়ে কাল স্বীকার করে যে আমাকে সে জেনেছিল—আমাকে সে চিনেছিল—তাই আমি তার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম—তাই সে আমার সঙ্গে একাত্ম হবার গৌরব লাভ করেছে। মরণের মধ্যেও সে তাই অমৃতত্ব লাভ করেছে।

বাঙালীর বিগত দু'শো বৎসরের জীবনক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই কালে বাঙালীর জীবন বিকাশ লাভ করেছে—সাহিত্যে, সমাজধর্ম্মে এবং রাজনীতিতে। পরাধীন জাতির জীবনকে বন্দী মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে বিন্দুমাত্র ভুল হবে না। গরাদে ঘেরা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনকে দূরে সুদূরে প্রসারিত করে দিয়ে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কল্পনা করেছে, আকাশের নীলের বার্তাকে সে সঙ্গীতে পরিণত করেছে, বৃহত্তর মহত্তর মুক্ত জীবন ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে বদ্ধ জীবনেই তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্রের পক্ষীরাজের অভিযানের কাহিনী রচনা করেছে, আবার ক্রম-উপলব্ধির ফলে—বন্দীশালায় নিজেদের জীবন-যাত্রার কথা নিয়ে গান কাহিনী রচনা করে সমগ্র বন্দীশালায় তুলেছে নূতন ভাবের আলোড়ন, সেই বাস্তব দুঃখের করুণ গানের আনন্দ-রসে জীবনের বেদনাকে সুধাস্বাদী সঞ্জীবনীতে পরিণত করতে চেয়েছে। এই বাঙালীর সাহিত্য। রাজনীতি—সমাজ-ধর্ম্ম—এ দুটি ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন-বিকাশের কথা আজ আমার আলোচ্য নয় তবুও এ কথা অবিসম্বাদী ভাবে সত্য যে, এই দুই ক্ষেত্রের জীবন-বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—অতি ঘনিষ্ঠ।

বাঙালীর এই দু'শো বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস এমনি কয়েক জন কালজয়ী মানুষের দ্বারা চিহ্নিত; তাঁদের মধ্য দিয়েই বাঙালীর সাহিত্যের কালাংশ রূপ লাভ করেছে এবং তাঁদের নামেই এই কাল নিজেকে চিহ্নিত করে তাঁদের অমৃতত্ব লাভের কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে।

আমরা এই দু'শো বৎসরের যুগ বিভাগ করে থাকি পাঁচটি নামে চিহ্নিত করে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এই সঙ্গে আরও একটি নাম যুক্ত হওয়া উচিত। পণ্ডিত জন এবং ঐতিহাসিকেরা তাঁর নাম যোগ করেও থাকেন। তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙালীর নব জীবনের বীজ। দ্বিদল বীজের মত এই দুই মহাপুরুষের জীবন সাধনার পুষ্টিতে নব জীবনের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। ইতিহাসে বাঙালীর জীবন-বিকাশের রাজনৈতিক এবং সমাজ ও ধর্ম্মনৈতিক ক্ষেত্রের মত এ কথাও থাক। আমার আলোচ্য এই দু'শো বৎসরের সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন-কাল যে কয়েক জন মানুষের দ্বারা চিহ্নিত—যাঁদের নাম পূর্ব্বে করেছি—তাঁদের শেষোক্ত জন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালীর কাছে তাঁর উপাধি নিষ্প্রয়োজন—কুল-পরিচয় বাহুল্য, তিনি বর্ত্তমান থাকতেই তাঁর নামের শ্রী বাদ দিয়েছিল বাঙালী—তিনি সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত আত্মশক্তির গরিমায় মণ্ডিত হয়ে শরৎচন্দ্র নামেই বাঙালীর হৃদয়ে আসন লাভ করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা যুগ। একালের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেখান পর্য্যন্ত গণনা করি আমরা—তিনি সেই যুগ। শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে, তবুও বাঙালী-জীবনের সাহিত্যের ভাব-ধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব-ধারা! কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন আছে। নতুবা কবিগুরুর প্রতি আমি অসম্মান প্রদর্শন করছি এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে আমি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব। তাঁর বহু মূল্যবান 'আধুনিক সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের বইয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎ-চন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে।"

"আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে," এই বাক্যটির আমি পুনরুক্তি করছি; এবং শরৎ-চন্দ্রের ভাবনার ধারাই যে আধুনিক সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা—এই কথাটাই আমি বলতে চাই! শরৎচন্দ্রকে তাঁর কোন এক জন ভক্ত রবীন্দ্রনাথ দুর্ব্বোধ্য—তাঁর রচনা অপেক্ষা আপনার রচনা শ্রেষ্ঠ—এই জাতীয় উক্তি করেছিলেন। তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন—ও কথা উচ্চারণ ক'র না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য, আমরা লিখি তোমাদের জন্য। আমিও সেই কথাই বলি। রবীন্দ্র-সাহিত্য স্বর্গলোকের ধারা; শরৎচন্দ্রে সে ধারা ধরিত্রী-বক্ষো-বাহিনী হয়েছে। মোহিতলাল বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের দূরারোহিণী কল্পনার ঊর্দ্ধশাখায় যে ফুল গুচ্ছে-গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিল—তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরিল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্ন-ভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হইল। তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতা-গুল্মের বেড়াগুলি এক নূতন ধরণের ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে—তার বর্ণ-গন্ধ যেমন চমকপ্রদ, তেমনি অতি সহজেই প্রাণ-মন অভিভূত করে, তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ যে চিরদিনের দেখা জিনিষ—অথচ এমন করিয়া কখনও তো দেখি নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার যে রূপ দেখে লিখেছিলেন—সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা, অমলা-কমলা-সরলা সুস্মিতা-ভূষিতা—বাঙলার সে রূপ তখনও বজায় ছিল। সাধারণ বাঙালীর জীবনে ভাঙন ধরলেও পল্লীর অবস্থা শোচনীয় হলেও যে-কূলে রবীন্দ্রনাথ জন্ম লাভ করেছিলেন—যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি মানসিক পুষ্টি লাভ করেছিলেন—তাঁর কবি-মনের উন্মেষ হয়েছিল—তাতে পৃথিবী তার অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিক দেখিয়েই নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল; এবং সেই পরিচয়ের ক্ষণে যে মন্ত্র পঠিত হয়েছিল, সে মন্ত্র উপনিষদের বাণী! প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারায় তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সপ্তপদী যাত্রা লাজহোম সম্পন্ন হয়েছিল। তা

ছাড়া তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা—সে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার পরিণতি বলুন—অথবা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বংশধারার মহা-পরিণতি বলুন—অথবা সাধারণ জীবন নিয়ম কারণ অনির্ণীত ব্যতিক্রম বলুন—সে যাই বলুন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই লোকোত্তর প্রতিভা এক মহা সত্য।

শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে এক কালের সমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ কয়েকখানি পল্লীর মধ্যে; মজে যাওয়া সরস্বতীর ক্ষীণ পঙ্কিল স্রোতের কূলে, ঘন জঙ্গলে ভরা চারি দিক, মহামারী ম্যালেরিয়ারূপে স্থায়ী বাসা গেড়েছে সেখানে, প্রাচীন সংস্কৃতির নামে অন্ধ সংস্কারে সমস্ত আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের কালিতে কালো হয়ে আসছে চারি দিক, মা যা হইয়াছেন—অর্থাৎ হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকার বেদীর সম্মুখে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে। ধরিত্রীর রূপের মধ্যে যে আকাশের নীলে গ্রহ-তারকার দীপ্তিতে সূর্য্য-চন্দ্রের রশ্মিজালে, ফুলের বর্ণসম্ভারের মধ্যে যে চিরন্তন অপরূপের বাস—তার সন্ধান তিনি পাননি। তাই শরৎ-সাহিত্য মাটীর সাহিত্য।

বাঙলা দেশে ছেলে-ঘুমপাড়ানী ছড়া আছে—

> "আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দেব :
> সোনা রূপোর বাটী দেব, তাইতে দুধ খাবি—
> ঘুম দিয়ে যা রে চাঁদ—পাখা দিয়ে বাতাস দেব—
> আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাবি।

অবোর এ ছড়াও আছে—

> আয় রে ঘুম যাই রে, বাউরীপাড়া দিয়ে
> বাউরীদের ছেলে ঘুমলো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

একটিতে অপরূপ রূপের কাব্য-শোভা। কিন্তু সে ছড়া-রচনা সম্ভবপর হয়েছে—সেই করতে পেরেছে—যার গোয়ালে গাই আছে, সোনা রূপোর বাটী দেবার সামর্থ্য আছে, আম-কাঁঠালের বাগান রচনার জমি আছে, জমা আছে।

বাউরীর ছেলে-ঘুম-পাড়ানোর কালে বাউরী-মায়ের চাঁদের কথা মনে হয়নি, মনে হয়েছে কাঁথার কথা।

* * * * *

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে আমরা এক মহাবাণীর সন্ধান পেয়েছিলাম। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই যে মহা-মানবতার বাণী,—এই বাণী শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই বাণী নয়। সমগ্র পৃথিবীর মর্ম্মবাণী—এই বাণী পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদি কথা।

আকাশের নীল, আলো, অন্ধকার, জ্যোতির্লোক, ফুলের শোভা, পাখীর কলস্বর, বেণুবনের গান, সমুদ্রের কল্লোল, নদীর কলতান, গন্ধসম্ভার, সুকোমল স্পর্শ—জীবনময়ী ধরিত্রীতে থরে থরে বিকাশ লাভ করেছে, তারই মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে অব্যক্ত। এই বর্ণ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ বা উপলব্ধির জন্য বহু কোষ মিলনের ফল। দৈব জীবন দেহ থেকে দেহান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে মানব। মানব-রূপের মধ্যেই জীব-জীবনে প্রকাশমান হয়েছে মনময় চেতনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানব-চৈতন্যের মিলনের ফলে যে আনন্দ—সেই আনন্দের অকপট অভিব্যক্তিই প্রথম সাহিত্য। সেই আনন্দ থেকে মহানন্দে মানুষ উপনীত হল তার আত্ম-চৈতন্যকে উপলব্ধি করে। মানুষ আত্মাকে চিনে—চিনলে সমগ্র সৃষ্টিকে, অনুভব করলে স্রষ্টাকে। এই মহানন্দময় উপলব্ধিই ভারতীয় সাধনার স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ এই সাধনায় অপরূপ অরূপের গুণ্ঠন মোচন করে প্রমাণ করেছে—সবার উপরে মানুষ সত্য, কারণ, সে-ই সব সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধক। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চেতনা-বিলুপ্তির মধ্যেও তাঁর চৈতন্য বলেছিল শব্দহীন ভাষায়—

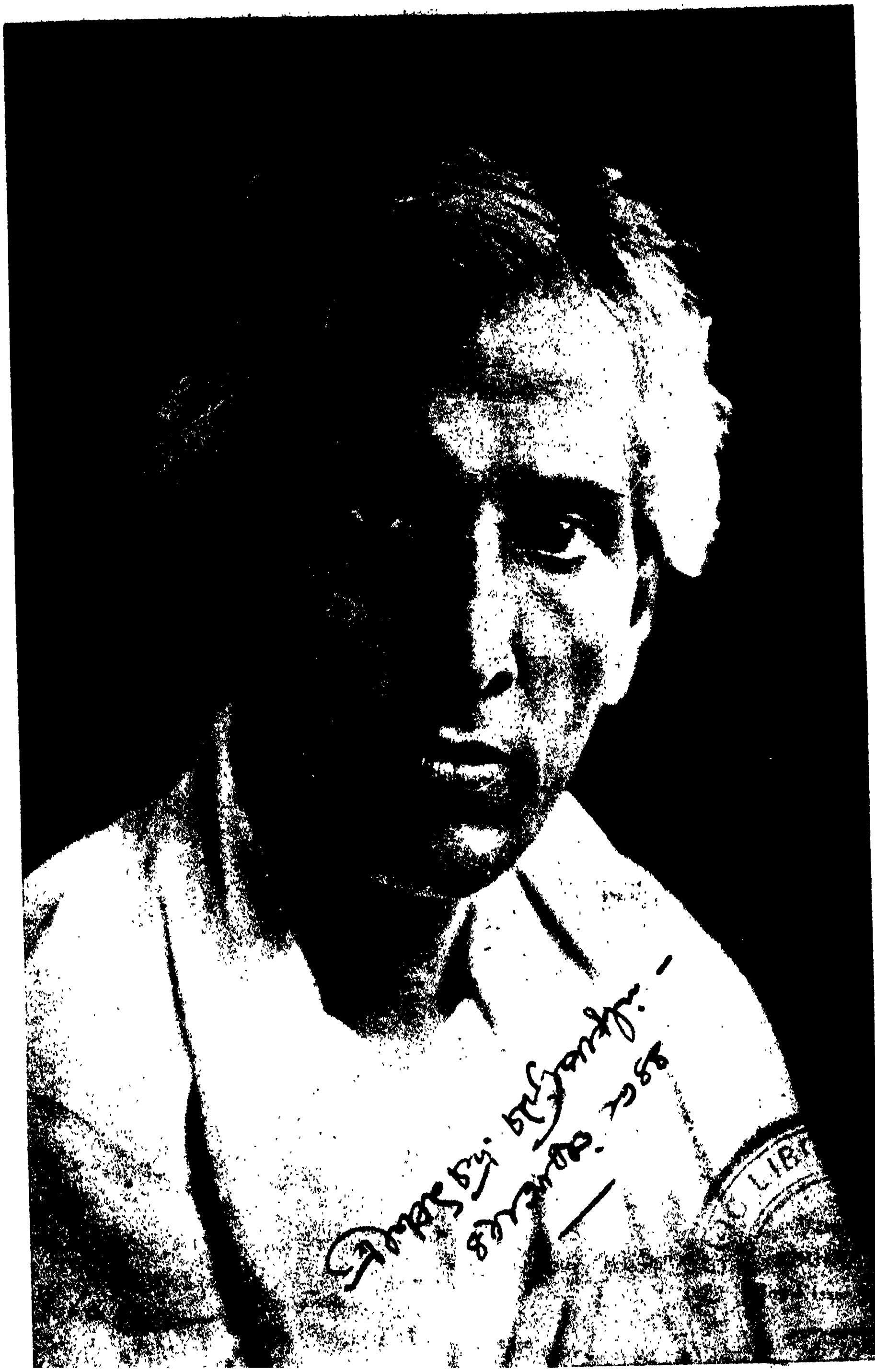
হে পূষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল এবার প্রকাশ কর তোমার কল্যাণতম রূপ!

ঈশোপনিষদের

> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
> সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

বাঙালীর নব জীবনে ভারতীয় সাধনার বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোধ করি শেষ দীপ্তি লাভ করেছে—যার প্রতিফলনে সমস্ত মানব-চৈতন্য এক ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা-মুখে সচকিত হয়ে উঠেছে—সসম্ভ্রমে মাথা নত ক'রে বলেছে—তুমি সত্য—তোমার বাণী মহাসত্য।

ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতেই এল মানব-সভ্যতার নব পর্য্যায়। যন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হল মানুষের শ্রমশক্তি। অন্য দিকে সৃষ্টির বাস্তব রূপের মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করে বিজ্ঞানের পথে মানব-সংস্কৃতি হল ধাবমান। একদা ষ্টিম-ইঞ্জিন-চালিত জলযানে বাহিত হয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে যন্ত্র-নির্ম্মিত পণ্যের সঙ্গে এল সেই নূতন পথের বার্ত্তা। এ দেশের মানুষ সে বার্ত্তা গ্রহণ করতে চায়নি; কিন্তু সে পণ্য গ্রহণ না করে পারেনি। পণ্যগ্রহণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল। রাজবংশের পর রাজবংশ ভেঙে পড়েছে, রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, ধর্ম্মবিপ্লবের পর ধর্ম্মবিপ্লব হয়েছে, জাতির পর জাতি এসেছে অভিযানে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, সর্ব্বশেষে এল ইংরেজ—তবু এ দেশের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙেনি। এই ইংরেজ আমলেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হয়েছিল, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আবার মানুষ সামলে উঠেছিল—এই সমাজ-ব্যবস্থার গুণে। সেই সমাজ-ব্যবস্থা এবার ভেঙে পড়ল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যন্ত্র-শক্তির সংঘাতে। এত বড় যে শক্তি, কে তাকে বলবে মিথ্যা? ভারতীয় সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথও একে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—দুই জীবন-ধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা এই শেষোক্ত জীবন-ধারার আবেগে প্রবহমান হয়ে ওই রবীন্দ্র-সাধনা-সমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য থেকেই নূতন খাত কেটে চলতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎস থেকেই শরৎ-সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে বাস্তব রূপের প্রথম আবেগ—প্রথম স্রোত। আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বাঙলা দেশের মানব-জীবনের ভাবপ্রবাহ বাস্তবমুখী। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানেই শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটলেও শরৎ-সাহিত্যই বাঙালীর সাহিত্যের ভাব-ধারায় অব্যবহিত-পূর্ব্ব ভাব-ধারা।



রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ ভাষা, রবীন্দ্রনাথের মহাচৈতন্য থেকে প্রকাশমান সুগভীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি থেকেই লাভ করা রূপবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন—দুঃখ-প্রপীড়িত দুর্গত পতিত জীবনের পটভূমিতে মানুষের সেই সত্য—যে সত্য সবার উপরে সত্য। প্রকৃত অতীন্দ্রিয় লোকের অস্তিত্ব শরৎ-সাহিত্যে একেবারে নাই তা নয়—তবু শরৎ-সাহিত্যে বাস্তব জীবন প্রধান। শ্রীকান্তে [illegible] রূপদর্শন অপরূপ কাব্য : সেখানে লেখকের অনুভূতির সঙ্গে আমরাও অনুভব করি অন্ধকারে অতীন্দ্রিয় রূপলোকের স্পর্শ, তবুও সে অনুভূতি শ্রীকান্তে গৌণ।

পূর্ব্ববর্তী জীবন-ধারা থেকে নূতন কালের জীবন-ধারায় প্রয়াণের কালে যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, জাগতিক জীবন-ধারণ-ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে যা আমাদের মধ্যেও সঞ্চরমান হয়েছিল—অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল না, তার আবেগ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে।

পৃথিবীর নবভাবের সংঘাতে পুরাতন সমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন সুরু হয়েছে, বাঙলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙেছে—এক কোণ ঠেকে আছে বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খলার ঠেকায়, অথচ শাসন এবং শোষণে মানুষ হয়েছে স্বত্বসর্ব্বস্ব, ভ্রষ্টসর্ব্বস্ব, দীনতায় হীনতায় মানুষ শীর্ণ, মানুষ কাঙাল, চোখে তার লুব্ধ দৃষ্টি,—তাদের কথাই শরৎ-সাহিত্যে মুখ্য।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে এসেছিল বিনোদিনী! শরৎ-সাহিত্যে এসেছে সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী।

বিনোদিনী বিদ্বেষ-বশে নিষ্ঠুর ভাবে যে খেলা আরম্ভ করেছিল সে-খেলা সে শেষ করেছে বৈরাগ্যের মধ্যে, সে তীর্থ যাত্রা করেছে প্রশান্তমুখে ঊর্দ্ধলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, বিহারীর প্রেম-নিবেদন তার অন্তরকে যখন পরিপূর্ণ করে দিল, তখন সে চলে গেল রক্ত-মাংসের জীবনের ঊর্দ্ধলোকে। কিন্তু সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখীর খেলা জীবন-মরণের খেলা,—সে খেলায় তাদের বিয়োগান্ত পরিণতিতে যে বেদনায় তাদের অন্তরে অশ্রুসাগর উথলে উঠেছে তাতেই তাদের মধ্যকার সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে—যার বলে মানুষ সবার উপরে সত্য। সে সত্যও চিরন্তন সাহিত্যের প্রাণশক্তি, অথচ সে বাস্তব। এবং এই সত্য উপলব্ধির বেদনায় মানুষের চোখে নামল যে উত্তপ্ত অশ্রুর তরঙ্গ তার মধ্যে আছে বিপ্লবের আবেগ। শরৎ-সাহিত্যের নারীদের চোখেও সেই উত্তপ্ত অশ্রু। শুধু কি ওই চন্দ্রমুখীর দল? রমা, অন্নদাদিদি, বামুনের মেয়ে, অচলা, বিলাসী, একাদশী বৈরাগীর ভাইঝি—এদের অন্তরের যে সত্য রূপকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারও মধ্যে বিপ্লবের ধ্বনি জেগে উঠেছে। সমাজের বিধি-বিধানের অনুশাসনকে অতিক্রম করে দেহের গণ্ডী ছাড়িয়ে নারীর আত্মিক মূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এ স্বীকৃতি তুচ্ছ নয়। এ এক বিপ্লবাত্মক স্বীকৃতি। সতীদাহ নিবারণে আইনের প্রয়োজন হয়েছিল, আইনের সমর্থন লাভ করেও বিধবা-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করেনি; সেই দীর্ঘকালের সংস্কার আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের বাণীর মধ্য দিয়ে যখন বিপ্লবাত্মক ঘোষণা উচ্চারণ করলেন তখন তা স্বীকৃত হ'ল। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলার নারী-সমাজে যে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে, তার বীজও দ্বিদল বীজের মত। তার একটি দল হল শরৎ-সাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ-মহিমার প্রকাশ, অপরটি হল ১৯২১ সালে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে নারী-শক্তিকে গণশক্তির অংশ স্বীকার করে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী-গঠন।

শুধু নারী-জীবন সম্পর্কেই শরৎ-সাহিত্য বিপ্লবাত্মক নয়। তাঁর দৃষ্টি এই দেশের বিপর্য্যস্ত সমাজ-জীবনের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়েছিল—সর্ব্বত্রই তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছেন বিপ্লবী ভাব-ধারার বাণী। অজ্ঞান-তমসায় আচ্ছন্ন দেশ, কোটী কোটী মানুষ ভাষাহীন মূক, অন্নহীন—অর্দ্ধনগ্ন, জীর্ণ শতছিদ্র আশ্রয়ের তলদেশে তারা জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে কাঁপে; একমাত্র সম্পত্তি গরু—সে গরুর খাবার ঘাস নাই, জল নাই; সমস্ত হারিয়ে সে চলে কন্যার হাত ধরে কলের পথে—সেই গফুরের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। মহেশের প্রতি ভালবাসা তার নিজের কষ্টকে উপেক্ষা ক'রে মহেশের কষ্ট বড় ক'রে দেখার মধ্যে নিরক্ষর দরিদ্র চাষীর অন্তরের যে সত্য সর্ব্বোত্তম সত্য, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে ছিল যে মহাবিপ্লবের বীজ, সে বৈদেশিক ভাবধারা থেকে সংগৃহীত নয়—সে তাঁর অন্তরোদ্ভূত সত্য। সে বিপ্লবের বীজ আজ অঙ্কুরিত।

নিষ্ঠুর সত্যকে কোন দিন অপ্রিয় বলে গোপন করেননি, তাই শরৎচন্দ্র নিজে বিপ্লবী—তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

বর্ত্তমানকে একমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাঙবার প্রেরণায় তিনি কিছু করেননি, মানুষকে ভালবেসে বর্ত্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্ত ভাবে বর্জ্জন ক'রে নব কল্যাণে যাবার কামনার আবেগ, শরৎচন্দ্রের মধ্যে সে আবেগে উদ্বুদ্ধ তাঁর সাহিত্য তাই তিনি বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

সে দিনের বাঙালীর জীবনের অন্তর্গূঢ় বিপ্লবের আবেগ—যার সম্পর্কে সে দিন বাঙালীর স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে রূপ নিতে চেয়েছে শরৎ-সাহিত্যে, তাই শরৎ-সাহিত্য সত্য এবং সেই কারণেই শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের একটা যুগ। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁর তিরোধান ঘটলেও তিনিই আধুনিক যুগের অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ। কারণ, বাঙলা সাহিত্যে সমগ্র ধারা আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জীবন-বিপ্লবের খাতে প্রবহমান।

মানুষের জীবন এই বিপ্লবের খাত খনন করে সার্থকতার সাগর-সঙ্গমে যাবার স্বপ্ন দেখছে, বাঙালী পরাধীন দরিদ্র হলেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সেবকদের চিত্তে পৃথিবীর সে স্বপ্ন ছায়াপাত করেছে; শরৎচন্দ্র কালো কালির তুলিতে প্রথম এঁকেছেন সে ছবি। সে ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং উঠবে বাঙলা সাহিত্যে। মনে হয়, সে বিপ্লব দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হলেও সার্থক হবে, তারই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর শরৎচন্দ্র সার্থকতর হয়ে উঠবেন।

একটি কবিতা

অবন্তী সান্যাল

তুমি চ'লে গেলে বহু দূর সেই আসামের একপ্রান্তে
মুহূর্ত্তগুলো বিস্বাদ তাই। পৌষের ভোরে নামলো
কান্নার মত বৃষ্টির ধারা, বরফের কুচি ঝাপটা।
জানলার ধারে নিমডাল যত বাতাসের বেগে কাঁপছে।
পর্ব্বত দেশে এই দুর্য্যোগে ট্রেন ত এবার থামলো।
হৃদয় আমার উষ্ণকোমল হৃদয়ের ছোঁয়া ভাবছে।

তুমি চলে গেলে পাইন-ফারের উপত্যকার রাজ্যে
সে-দিন দুপুরে, তার পর আর কতটা সময় মাত্র!
তবু মনে হয় কত মাস যেন কত বৎসর কাটল
মুহূর্ত্তগুলো ভারী হয়ে শুধু বুকের উপরে চাপছে।
এমন করে ত ভাবিনি তোমাকে কোন দিন কোন রাত্র।
আজ এই ভোরে তোমায়ই দু'চোখ হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

"আমি কি ভাবচি বলো তো?"

জিজ্ঞেস্ করল অণিমা।

অণু কখন যে কি ভাবে তার অণুমাত্র ধারণা-শক্তি প্রাণকেষ্টর নেই; তবু সে আন্দাজ করার চেষ্টা পায়:

"কি ভাবচ বল্‌বো? আচ্ছা, ভেবে দেখি—"

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই ওর দৌড়। খতিয়ে দেখলে ওতে ক্ষতির অবশ্যি কিছু নেই, তবে এ-হেন চিন্তাশীলতায় লাভও নাস্তি! শেষ পর্য্যন্ত অণিমাকেই প্রকট হয়ে নিজের মহিমা প্রকাশ করতে হয়। এক সিদ্ধি থেকে আর এক স্বয়ং-সিদ্ধিতে এগুতে হয়।

তাই অণিমাই ব্যক্ত করল—

"ভাবছিলুম যে, দু'জনে যখন ভালোবাসায় পড়ে, এই ধরো, যেমন তুমি আর আমি,—তখন বে-থা করে' ঘর-কন্না করার আগে তাদের একটু রিহার্স্যাল দেয়া—অন্ততঃ বছরখানেক ধরে অভ্যেস করা উচিত নয় কি? দাম্পত্য-জীবনটা কিরূপ হবে, আগে থেকে একটু চেখে রাখলে কেমন হয়?"

"চেখে রাখলে?"

"মানে আমি বলছিলুম কি, তারা ভাবখানা দেখাবে যেন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।" অণিমা ব্যাখ্যা করে' দেয়—"বীমা করা কিম্বা টীকা নেয়ার মতই অনেকটা। ভাবা নিরাপত্তার জন্যেই।"

"কিসের নিরাপত্তা?" প্রাণকেষ্ট ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

"একটি ভালো-মেয়ের নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার অধিকার আছে কি না?" অণিমা বলে, "বিশেষতঃ এটা, বল্‌তে গেলে, একটা যাবজ্জীবনের ব্যাপার যখন।"

"ও।" প্রাণকেষ্ট বলে, "হ্যা, তা বটে।"

"নিছক মুখের কথায় নির্ভর না করে' একটু বাজিয়ে দেখা ভালো নয় কি? চোখে দেখলে তবেই তো বিশ্বাস হবে?" অণিমার এই হচ্ছে বক্তব্য।

"তা বটে। কথায় বলে পরীক্ষিত সত্য।" প্রাণকেষ্ট সায় দেয়।

বলে বটে, কিন্তু মনে তার খটকা লাগে। যে পরীক্ষিত সত্য এক জন্মের লভ্য নয়, যাকে জন্মে জন্মে লাভ করতে হয় (এবং জনমেজয় লাভ করেছিল বলে' মহাভারতে না কি লেখে,) সেই বস্তু এই জীবনে, একমাত্র দাম্পত্য-জীবনে লাভযোগ্য কি না তার সন্দেহ জাগে। লাভজনক কি না সে তো আরেক প্রশ্ন।

"তোমার মাকে বলেছ কথাটা?" প্রাণকেষ্ট জিজ্ঞাসা করে।

"কোন্ কথা মাকে বল্‌ব?"

"এই বাজিয়ে দেখার কথাটা। বিয়ের আগে বাজিয়ে নেয়ার যে কথা তুমি তুলছ।"

"মা নিজে দেখে-শুনে পছন্দ করে বাবাকে বিয়ে করেছিলেন, তা জানো?" অণিমা প্রকাশ করে। "পর পর কুড়িটা সম্বন্ধ নাকচ করে' অবশেষে বাবাকে—"

"বলো কি?" প্রাণকেষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়ে।

তাও আবার বিয়ে করে বাবার সঙ্গেও যখন বণিবনা হোলো না তখন বাবাকেও তিনি নাকচ করে' দিলেন।"

"কি করে'?" কৌতূহল হয় প্রাণকেষ্টর।

"বিধবা হয়ে।"

"ওব্—বাবা!" প্রাণকেষ্টর চোখ কপালে উঠে যায়।

"তাই বল্‌ছিলুম, বিয়ের পরে মনের মিল হবে কি না সেটা বিয়ের আগেই যাচাই করে নেয়া ভালো, তাই নয় কি? এ কি, তুমি এমন কাঁপচ কেন? শীত করছে না কি?"

"না, কাঁপব কেন!" প্রাণকেষ্ট অকম্পিত থাকার প্রয়াস পায়। কষ্টি-পাথরের ঘষামাজার ফলে এস্পার ওস্পার যা কিছু হবার আগে ভাগেই হয়ে যাওয়া মন্দ নয় তার মনে হয়। নইলে, বিধবা হবার দায়টা কেবল অণিমার থাক্‌লেও, কেন বলা যায় না, নিজেকেও সেই দায়িত্বে বিজড়িত বলে তার জ্ঞান হতে থাকে। আর, এ রকম জ্ঞান, তমোগুণ আর ক্লোরোফর্মের মতই, কেমন করে' যেন মানুষকে আচ্ছন্ন করে' অজ্ঞান করে দেয়।

"তাহলে এ বিষয়ে তোমার মত কি?" প্রশ্ন তোলে অণিমা।

"আমার অমতের কি আছে?" প্রাণকেষ্ট জানায়, "আর সকলের মতামত নিয়ে কথা। পাড়াপড়শীরা কি বলবে সেই কথাই আমি ভাবছি।"

"পাড়াপড়শী?" অণিমা অবাক্ হয়, "তাদের এ ব্যাপারে কথা বল্‌বার কি অধিকার আছে শুনি?"

"মানে, আমরা যখন এই পরীক্ষামূলক দাম্পত্য-জীবন যাপন করব, ওরা তখন কানাঘুষা আরম্ভ করতে পারে।" প্রাণকেষ্ট বিশদ করার চেষ্টা করে: "তাদের এটা অনধিকার-চর্চ্চাই বটে, তবু এটাকে ওরা অবৈধ জ্ঞান করবে বলে' মনে হয়—ওদের পাপ মন তো!"

অণু বসেছিল, তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল—"প্রাণকেষ্ট বাবু, আপনার



সাহস তো কম নয়! আমি কী এমন কথা বলেছি যে আমার সামনে এরূপ অভদ্র ইঙ্গিত করতে মুখে আপনার একটুও বাধলো না?"

"অণু, রাগ কোরো না"। ঠাণ্ডা হও। আমি কিছু বলছি কি? এমনটা হলে পাড়াপড়শীরা কি বলবে সেই কথাই আমি বলছি। তোমার আমার—তু'জনের ভালোর জন্যই বলছি তো।" প্রাণকেষ্ট বলে, "বিয়ের আগে দাম্পত্য-জীবন যাপন করা যে ভালো নয়, সেই কথাই তো বলছি আমি।"

"তাই বলছ? তাছাড়া কিছু বলছ না তো? ভেবে ত্যাখো।"

তখনো অণু কট্-মট করে' তাকিয়ে—"তাছাড়া যদি আর কিছু বলে' থাকো, বলা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমি বলি যে অণিমা মিত্রকে তুমি সে ধরণের মেয়ে পাওনি! তাহলে এ বাড়ীতে তোমার আর না আসাই আমার বাঞ্ছনীয় হবে।"

"আহা, অত চটছ কেন অণু? কখন আমি সে কথা বল্লাম? তুমি একেবারে আমাকে উলটো বুঝ্লে। তুমিই তো ওই সব বাজিয়ে দেখার কথা তুলেচ। আমি তো তার প্রতিবাদে—যাতে তোমার নির্ম্মল চরিত্রে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ না করে—আমাদের তু'জনের সম্বন্ধ যাতে সরল সৎ এবং পবিত্র—মানে, এখন যেমন সেই রকম চিরদিন থাকে—সেই কথাই তো এতক্ষণ ধরে বলবার আমি চেষ্টা করছি।"

"ঠিক বলছ?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে তোমার কোনো দোষ নেই। তোমাকে এবার মাপ করছি। আমার কথা বলার বেকায়দায় তোমার মনে ঐ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, বুঝতে পারছি আমি। আমারই দোষ। সেই জন্যেই তোমায় মাপ করলাম। আর কক্ষণো কিন্তু এমন কথা বোলো না।"

"কক্ষণো না।" প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে। "প্রাণ থাকতে নয়, এবং—এবং আমি বলিও নি।"

"তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে।" অণু ওর চুলগুলো এলোমেলো করে' দেয়, এবং হয়ত বা তার আদর একটু মাত্রা ছাড়ায়, কিন্তু সে কথা ফের বলতে যাওয়া বুঝি বিপজ্জনক। প্রাণকেষ্টও অণুর আদরের প্রতিবাদে কিছু বলে না। নিজের অনুবাদ অম্লান বদনে সহ্য করে।

আদরের পালা সাঙ্গ হলে অণু জানায়, "তাহলে তো আজ থেকেই আমরা সুরু করতে পারি।"

"কিসের সুরু?"

"যে কথা বলছিলাম। তুমি আর আমি এমন ভাব দেখাব যেন আমরা একটি সুখী-দম্পতী। অবশ্যি আমাদের নিজেদের মধ্যেই। পাড়াপড়শীদের জানতে দেব না। আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণীর চক্ষে দেখবে। এবং তোমার যা কিছু বোতাম-ছেঁড়া জামা-টামা আছে সব এর পর থেকে এখানে নিয়ে এসো। সমস্ত আমি বোতাম বসিয়ে দেব। আমার কর্ত্তব্যেও আমি অবহেলা করতে চাইনে।"

"সে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।" প্রাণকেষ্ট জানায়: "আমাদের বাসার ঝি আছে, তাকে পয়সা দিই, সেই টেঁকে দেয়।"

"তাই না কি?" অণিমা টিপ্পনি কাটে: "তাহলে তোমায় বলি, শুনে রাখো। ও সব ঝি ফি আর চলবে না। এমন কি, সাবিত্রী-মার্কা ঝি হলেও—বুঝেচ? তাছাড়া, অমন করলে আমিই বা এই বারো মাস ধরে' পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিই কি করে'? বৌ থাকতে ঝি কেন? অতএব ফি শনিবার তুমি সার্ট পাঞ্জাবী সব এখানে নিয়ে আসবে।"

"বোতাম-ছেঁড়া না থাকলেও?···বেশ, তুমি যখন বলছ, আনব। বোতাম ছিঁড়েই আনব না হয়।" প্রাণকেষ্ট অকাতরে আত্ম সমর্পণ করে।—"অপরের সুখের জন্য আমি কি না করতে পারি? সকলকে বাধিত করতে সব সময়েই আমি তৈরি আছি।"

"এই তো গেল দাম্পত্য-জীবনের প্রথম ভাগ।" অণিমা পাতা ওলটায়, "এর পর দ্বিতীয় ভাগে আসা যাক্। দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে ঘরকন্না।"

"ঘরকন্না?"

"হ্যাঁ, যার নাম গেরস্থালি। তার প্রথম কাজ হচ্ছে মাসকাবারে তুমি যা মাইনে পাবে তার সমস্ত আমার হাতে এনে ধরে দেবে। এর যেন অন্যথা না হয়।"

"কি বললে?" প্রাণকেষ্টর নিজের কানের ওপর অবিশ্বাস জন্মায়।

"ভয় খেয়ো না। তোমার হাত-খরচের মত সামান্য কিছু তার



থেকে অবশ্যি দেব তোমায়। ভেব না সেজন্য।" অণিমা ওর দুর্ভাবনা দূর করার চেষ্টা পায়।

"য়্যাঁ, কি বলচ?" তথাপি প্রাণকেষ্ট সঠিক বুঝতে পারে না।

"কিসে কিসে কি খরচ করতে হবে না হবে আমি তার হিসেব রাখব। আমার কাছে তার জমা-খরচ থাকবে।"

"তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমার সমস্ত বেতন তোমাকে সঁপে দিয়ে আমি নিজে ফতুর হয়ে হাঁ করে' বেড়াব তাহলে তুমি বড্ড ভুল বুঝেচ। আমি সে বান্দাই নই, আগেই তোমাকে বলে' রাখি। আর, এ রকম একটা প্রস্তাব আমার কাছে করার সাহসও তো তোমার কম নয় দেখচি।"

প্রাণকেষ্টকে অত্যন্ত উষ্ণ দেখা যায়। তার মনে হতে থাকে, দ্বিতীয় ভাগ ছাড়িয়ে তৃতীয় ভাগে—একেবারে কথামালায় গিয়ে সে পৌঁছেচে—যেখানে একজনের হচ্ছে কথা বলা—হরদম্ বলা কেবল—এবং আরেকজনের হচ্ছে কথা শোনা—শুধু শুনে যাওয়াই নয়—বলবামাত্র চুপটি করে' শুনে মুখটি বুজে পালন করবার জন্য দরকার হলে প্রাণপাত পর্য্যন্ত!

"বাঃ, তোমার টাকা যদি আমাকে না দাও তাহলে কি করে' আমি তোমার সংসার চালাবো বলো তো? তাহলে গৃহিণী হওয়া কি জন্যে? আমাকে যদি সামান্য টাকা দিয়ে বিশ্বাস না করতে পারো তাহলে আমাকে বিয়ে করবে কি করে'?" অণিমা বিস্মিত হয়।

"অবশ্যি, সে কথা যদি বলো—" প্রাণকেষ্টকে একটু কাবু হতে হয়।

"সেই কথাই তো বলছি। বলছি না, এটা আমাদের দাম্পত্য জীবনের আদ্য পরীক্ষা? ঘর-গেরস্থালী করতে হলে কি কি চাই, কি কি কেনা দরকার, কি কি না হলেই নয়, সে সব কি আমাদের জানতে শিখতে হবে না? তোমার টাকা হাতে নিয়ে আমি দোকানে বাজারে ঘুরব, অবশ্যি কিনব না কিছুই, কেনবার ভাণ করব কেবল। তার পর তোমার টাকা আবার তোমায় ফিরিয়ে দেব।"

"ও! এটা তাহলে মিছি মিছি? তাই বলো! তা যদি হয়, তাহলে অবশ্যি—"

তাহলে অবশ্যি প্রাণকেষ্টর টাকা ধরে' দিতে কোনো বাধা নেই জানা যায়।

"তা'বলে' সবটাই কি মিছি মিছি? স্বামীর যত্ন-আত্তি করতে হবে না? তার স্বাস্থ্যের দিকে, খাওয়া দাওয়ার দিকে, ভিটামিনের দিকে নজর দিতে হবে না? তোমার ওই টাকা থেকেই মাছ মাংস আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি কিনে আনা হবে। তোমার জন্য মাংসের সিঙাড়া, মাছের কচুরি আমি বানিয়ে রাখব, আপিস থেকে ফিরে এসে তুমি খাবে।"

"সত্যি বলছ? সত্যি-সত্যি বলছ? সত্যিকার সিঙাড়া-কচুরি—না কি, সেও মিছি মিছি?" প্রাণকেষ্টর যেমন লালসা তেমনি সংশয় হয়: "সত্যি খাবো, না, কেবল খাবার চেষ্টা করব মাত্র?"

"সহজে যদি খেতে পারো সেইটেই ভালো। নাহলে চেষ্টা করে' খেতে হবে বই কি। নইলে আমি দুঃখিত হব না? তোমার প্রাণের বৌ কতো কষ্ট করে' সারাদিন ধরে' তেতে পুড়ে রেঁধেছে!"

"তা বটে।" কথাটা প্রাণকেষ্টর প্রাণে লাগে।

"তার পর তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে আমার সুভাষকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরুব।"

"এই সুভাষ হতভাগাটা কে, শুনি একবার?" প্রাণকেষ্ট আবার রেগে উঠে।

"আহা, কে সুভাষ উনি যেন জানেন না! সুভাষ—আমাদের ছোট্ট খোকা—আমাদের ভেলভেলেটা।" অণিমা ঘোষণা করে; "তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে তার পর সুভাষকে নিয়ে আমি হাওয়া খেতে বেরুব।"

"দাম্পত্য জীবন, তা যতই আদর্শ এবং নিখুঁত হোক,—মাত্র বারো মাসের মধ্যে ভ্রাম্যমান সুভাষকে পাওয়া যাবে কি না আমার সন্দেহ আছে।" প্রাণকেষ্টকে দ্বিধান্বিত দেখা যায়।

"পেলে খুব সুখের হোতো." অণুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, "কিন্তু পাবার আশা আমিও করি না। আমাদের সত্যিকারের বিয়ের আগে কি করে' তা হতে পারে?"

ভবিষ্যতের ভাবনা ওইখানে এসে মুলতুবি থাকে। অণুর কাছে বিদায় নিয়ে প্রাণকেষ্ট বাসায় ফেরে সেদিনের মত।

পরদিন সে আপিসে বসে' কাজ করছে,—অণুদের চাকর এসে একখানা চিঠি দিল তার হাতে।

তাতে লেখা:

"তোমার বাড়ী যখন আমার বাড়ী, তখন আমার বাড়ীও নিশ্চয় তোমার বাড়ী—তাই না? আমাদের বাড়ীর তিন কোয়ার্টারের ট্যাক্সো বাকী পড়েছে, সেটা পত্রপাঠ তুমি মিটিয়ে দেবে, আমি আশা করি। দিলে খুব সুখী হব। ইতি, তোমার অণু।"

অণুর এই অনুরোধের সঙ্গে কর্পোরেশনের একটা বিল্ জড়ানো—সাতান্ন টাকা সাত আনার দাবী। প্রাণকেষ্টকে দাবিয়ে দেয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেইখানেই শেষ হয়নি, তার পরেও অণুর পুনশ্চ আছে:

"আমার গয়নার ফর্দটা আর এবারে পাঠালাম না। সে আসছে মাসে হবে'খন। কি বলো?"

"আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে।"—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীমদ্ভাগবত

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার

গুণরাজ-উপাধিক মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্। "বৌদ্ধ-গান ও দোঁহা"র ভাষাকে বাংলা বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয়। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কোন্ পদগুলি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, কোন্গুলিই বা পরবর্ত্তী, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর! কৃত্তিবাসের কাল এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া কথিত "আত্ম-বিবরণ" যে পুথিতে ছিল বলিয়া স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। দত্ত মহাশয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক বই সম্বন্ধেই চমকপ্রদ তথ্য যোগাইয়াছিলেন, অথচ তাহার প্রমাণ চাহিতে গেলেই বলিতেন, "মূল পুথি হারাইয়া গিয়াছে, শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমি টুকিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া তাহা রক্ষা পাইয়াছে।" কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণে"র বেলায় যেমন, তেমনি মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" সম্বন্ধেও দত্ত মহাশয় যে রচনা-কাল-জ্ঞাপক পয়ার বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আর কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থের যে প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি আটখানি সম্পূর্ণ ও সাতখানি অসম্পূর্ণ পুথির কোনখানিতেই "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-রচনার কালজ্ঞাপক পয়ার পান নাই। রায় বাহাদুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের নিম্নলিখিত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় নিঃসংশয়ে প্রাক্চৈতন্য যুগের রচনা :—

> কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
> প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া॥
> গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
> তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
> "নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"।
> এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫৩)

কিন্তু ইহা ছাড়াও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"কে প্রাক্-চৈতন্য যুগের রচনা বলিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র বলিয়া কথিত জয়ানন্দ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> "রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি
> পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
> শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে।
> গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
> জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
> শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥"

যদিও ডাক্তার সুকুমার সেন বলেন যে, "কৃত্তিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না" তথাপি এই প্রমাণের বলে জোর করিয়া বলা যায় যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় উভয়ই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বের রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের আসল ভাষা ও বিষয়বস্তু কি ছিল তাহা স্থির করা এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কেন না, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ নানা কবি, গায়ক, পুথিলেখক ও আধুনিক সম্পাদকের যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয়েরও পুরাতন রূপটি কি ছিল, তাহাও জানা ছিল না। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১ অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সভ্রাতৃব শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক" যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন ভাষাকে আধুনিক আকারে ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নকল করা পুথিকে আদর্শ করিয়া ভাষা ও বানান অবিকৃত রাখিয়া এবং অন্য দুইখানি পুথির পাঠান্তর ধরিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এই সংস্করণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১১৫, ১৫৫) শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে "মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে কাব্য রচনা করিয়াছেন।" মিত্র মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকার শেষে ভাগবতের কোন কোন শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন্ কোন্ পয়ার রচিত হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মালাধর বসু কোথায় শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন, কোথায় তিনি মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়াছেন, কোথায় বা মূলের ভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। তাঁহার ভূমিকার পরিপূরক হিসাবে ঐ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য এই অবতারণা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের খুব অল্প স্থানেই ভাগবতের শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ঐ প্রচেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে তাহা কয়েকটি উদাহরণ লইয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক।

(১) নলকূবর মণিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—

> বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
> হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
> স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ-প্রণামে
> দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্। ১০। ৩৮

মালাধর বসু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

> বলিব তোমার গুণ সেই হউক বাণী।
> সেই কর্ণ হউক তোমার কথা শুনি।
> সেই হস্ত হউক তোমার কর্ম্ম করে।
> সেই মস্তক হউক যে তোমায় নমস্করে।
> সেই দৃষ্টি তোমায় দেখে নিরন্তরে।
> বহুত প্রণতি দুহেঁ করিল সত্বরে। (৪০২—৪)

এই অনুবাদে মূলের "মন যেন তোমাকে স্মরণ করে" এবং "নয়ন যেন তোমার মূর্ত্তিরূপ সাধু দর্শন করে" এই দুইটি ভাব নাই।

(২) কেশিবধের উপমা ভাগবতে—

> তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্
> ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ। ৩৭।৮

মালাধর সুন্দর ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

ফুটি কাকুড়ি জেন হৈল থান থান।
বাহির করিল কৃষ্ণ আপন হস্তখান॥

(৩) কুব্জাকে সুন্দরী বানাইবার পর সে যখন শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় ধরিয়া তাঁহাকে তাহার গৃহে যাইবার জন্য আহ্বান করিল, তখন—

এবং স্ত্রিয়া যাচমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ।
মুখং বীক্ষ্যানু গোপানাং প্রহসংস্তামুবাচ হ।
এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্ষণম্।
সাধিতার্থোহগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥৪২।১১।১২

মালাধরের অনুবাদ—

"কুব্জিন বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল॥
লজ্জিত হইয়া তারে বলে গদাধর।
করিব সন্তোষ তোরে আজি যাহ ঘর॥
পাথিকের প্রাণ তুমি পাথিকের নারী।
তোর ঘরে রহিয়া যাব গোকুল নগরী॥" ১৪৪৯-৫১

এখানে "রামস্য পশ্যতঃ" অর্থে বড় ভাই বলাইকে দেখিয়া কৃষ্ণের সঙ্কোচের ইঙ্গিত করিয়া মালাধর সুন্দর ভাবব্যঞ্জনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে 'অগৃহাণাং' ('অকৃতদারাণাং' শ্রীধর) শব্দের অর্থ বাদ পড়িয়াছে। মাধবাচার্য্য এই শ্লোক দুইটির ভাবার্থ-প্রকাশে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—

বিদ্যমানে দেখ গোপগণ জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুখপানে চাহিতে অধিক লাজ পাই॥
হাসি প্রবোধেন তারে পরিহাসচ্ছলে।
শুন শুন গুণবতী না হও উতবোল॥
আমি সব পরবাসী অদার দুই জন।
শতেক প্রকারে তুমি করিবে পালন॥ (পৃঃ ১৪২)

শেষ চরণে "তুমি করিবে" না করিয়া "তোমা করিব" পাঠ ধরিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।

(৪) কংসভয়ে বিভিন্ন ভাবের লোক শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ কি ভাবে দেখিতেছেন, সে সম্বন্ধে ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি এই—

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥৪৩।১৪

মালাধর লিখিয়াছেন—

"হাসিতে নাচিতে দুহে করিল গমন।
সেই কালে নানা মূর্ত্তি ধরে নারায়ণ॥
মল্ল সব দেখে যেন বজের সমান।
ধার্ম্মিক রাজা দেখে সুন্দর মূর্ত্তিমান্॥
স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন।
নন্দ আদি গোপ দেখে যেন শিশুগণ॥
রাজা সব দেখে যেন দণ্ড হস্তে কাল।
বসুদেব দেবকী দেখে কোলের ছাওয়াল॥
প্রাণ নিতে যম আসে দেখে কংস রায়।
যোগসিদ্ধগণ দেখে যোগসিদ্ধময়॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখিল তথাই।
কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর কানাই॥" ১৪৯৮-১৫০২

এখানে গুণরাজখান "নৃণাং" অর্থে ধার্ম্মিক রাজা, 'পরদেবতেতি' অর্থে 'কুলের প্রদীপ' করিয়াছেন এবং 'বিরাড়বিদুষাং' (অবিদ্বান্ লোকের নিকট জড়) এই ভাবটি বাদ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

(৫) শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে ভাগবতধর্ম্ম কে কে জানেন, তাহা যম বলিতেছেন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ॥ ৬।৩।২০।২১

ইহার অনুবাদ করিবার সময়ও মালাধরের সামনে ভাগবত ছিল না! তিনি লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মা মহেশ্বর আর নারদ মুনিবর।
সভাএ আছএ আর বলি নৃপবর॥
সনক আদি জানে আর ভৃগু মুনিবর।
শুক জানে, আমি জানি শুন দূতবর॥
বাশিষ্ঠ জনক জানে সংসার ভিতরে।
কেমতে জানিবে দূত তুমিত তাঁহারে॥

মূলের 'কুমার' শব্দের অর্থ সনৎকুমার; মালাধর তাঁহাকে 'সনক' করিয়াছেন। তিনি ভৃগু ও বশিষ্ঠের নাম করিয়াছেন, উহা মূলে নাই; অনুবাদে মূলের কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, ও ভীষ্মের নাম বাদ পড়িয়াছে। ভাগবতধর্ম্মের ইতিহাসে ভাগবতোক্ত ঐ ১২টি নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুণরাজখান্ ১২ জনের জায়গায় দশ জনের নাম করিয়াছেন।

নামের এইরূপ গোলমাল মালাধরের গ্রন্থে আরও অনেক আছে। দশম স্কন্ধের ৮৪ অধ্যায়ের ৩, ৪, ৫ শ্লোকে যে সব ঋষির নাম আছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ৪৬৭০-৪৬৭৩ পয়ারের নামের সহিত তাহা মেলে না। ঐরূপ দশমের ৭৪ অধ্যায়ের ৭-৯ শ্লোকের নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ৩৫৭৯-৩৫৭২ এর মিল নাই।

এই সব অমিল দেখিয়া মনে হয় যে, "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে" ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোকের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ থাকিলেও মালাধর বস্তু মোটের উপর অনুবাদের চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, অনেক স্থলে তিনি গ্রন্থ লিখিবার সময় চোখের সামনে ভাগবত রাখেন নাই। এই জন্য তাহার গ্রন্থে কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ ঢুকিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(ক) মালাধর দ্বাবিংশ অবতার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি

ভাগবতের ১।৩।১৩ শ্লোকে এ স্থানে নাভির পুত্র ঋষভকে অষ্টম অবতার বলা হইয়াছে। ভাগবতের মতে (৫।৪।৮) ভরত ঋষভের পুত্র। এ স্থানে পিতার অবতারত্ব পুত্রে আরোপিত হইয়াছে।

(খ) দশমের ৩৪ অধ্যায়ে দেবযাত্রা উৎসবের কথা আছে, মালাধর (১২২৬ পয়ারে), উহাকে কাত্যায়নী মহোৎসব লিখিয়াছেন।

(গ) ভাগবতের ১০।৫৯।২ মতে নরক (ভৌম) প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা ; মালাধর তাঁহাকে মধ্যদেশের রাজা করিয়াছেন (২৬৪১ পয়ার)।

(ঘ) ভাগবতে (১০।৫৮।৫৭) মদ্রদেশের রাজার কথা আছে, মালাধর বা লিপিকার তাঁহাকে ভদ্ররাজা (২৬০০ পয়ার)করিয়াছেন।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ৪১৪-১৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, বলদেব গোকুলে দ্বিবিদ বানরকে বধ করেন ; ভাগবতের ৬৭।৮ শ্লোক অনুসারে ঐ ঘটনা রৈবতকে ঘটিয়াছিল।

(চ) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ৩৩১০ পয়ারে আছে যে, পৌণ্ড্র বাসুদেবের ও কাশীরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ দ্বারকানগরে হইয়াছিল, ভাগবতের ১০।৬৬।১০ অনুসারে ঐ যুদ্ধ কাশীতে হইয়াছিল।

(ছ) ভাগবতের (১১।৭।২১) যদু-অবধূত সংবাদকে মালাধর ভরত-অবধূত সংবাদ করিয়াছেন (৫১৮৬)।

(জ) ভাগবতের চতুর্বিংশতি গুরু-প্রসঙ্গে আছে—

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু।
তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ॥
সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ॥ ১১।৯।৫-৭

ইহার অনুবাদ :—এক অবিবাহিতা কন্যার বন্ধু (আত্মীয়-স্বজন) গৃহে উপস্থিত না থাকার সময়, তাহাকে বরণ করিবার জন্য (পাকা দেখা দেখিতে) তাহার গৃহে আগত লোকজনকে নিজে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পরে তাহাদের খাইতে দিবার জন্য কিছু শালীধান লইয়া গোপনে উদূখলে কুটিতে লাগিল ; সেই সময় তাহার হাতের শাঁখায় বড় আওআজ হইতে লাগিল। অতিথি আসিলে চাল তৈয়ারী করা বড় লজ্জার কথা ভাবিয়া সে ব্যাপারটা গোপন করিবার জন্য এক এক হাতে দুই দুই গাছি চুড়ি রাখিয়া আর সকলগুলি খুলিয়া ফেলিল।

মালাধর বসু এই ঘটনাটি এই ভাবে লিখিয়াছেন—

দম্পতী ঘর করে লঞা কন্যাখানি
(অথবা পাঠান্তর) (সকল প্রত্যেকরএ চোর আছে কন্যাখানি)
কন্যা বিভা দিলে পিতা নিজ ঘরে আনি॥
অতির্থ আনিঞা ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।
জল আনিবারে মাতা করিল গমনে॥
ছিয়া লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে ;
দুই হাতে সঙ্খ বাজে লজ্জা বড় করে॥
দু'গাছি সঙ্খ এড়ি কাড়িয়া পেলিল।
তথাপি তাহার সঙ্খ বাজিতে লাগিল॥ (৫২৭০-৭৩)

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারী।
তাহাকে বরিতে আইল জনা দুই চারি।
পিতামাতা বন্ধুগণ না ছিল মন্দিরে।
আপনে ব্রাহ্মণ-কন্যা পূজিল আদরে।

মালাধরের রচনা মূলানুগত না হইলেও, এই স্থানে মাধবাচার্য্য তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

অতিথি করিতে পিতা গেল ভিক্ষাটনে।
জল আনিবারে মাতা করিল গমনে॥
ছেয়া লক্ষ করি ধান্য কুটি শূন্য ঘরে।
দুই হাতে শঙ্খ বাজে লজ্জা হেন করে॥ (পৃঃ ৩৩৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে অনেকগুলি স্তবস্তুতি আছে। সাত্বত-ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ঐ স্তবস্তুতি সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মালাধর বসু জনসাধারণের জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তিনি দুরূহ দার্শনিক মতবাদ সর্ব্বত্র বাদ দিয়া গিয়াছেন। ভাগবতের ৪০ অধ্যায়ে অক্রূরের স্তব ও ৮৭ অধ্যায়ে শ্রুতিস্তুতি সম্বন্ধে আমাদের কবিকে নীরব থাকিতে হইয়াছে। এইরূপে মালাধর বসু দেবকীর স্তব (৩।২৪-৩১), কংসের দার্শনিক মতবাদ (৪।১৭-২২) নারদকর্ত্তৃক দারিদ্র্য-প্রশংসা (১০।৮-১৮), যমলার্জ্জুনের স্তব, (১০।২৯ ৩৭), ব্রহ্মার স্তব (১৪।১-৪০) গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ (৩২।১৭-২২), নারদের স্তব ও ভবিষ্যদ্বাণী (৩৭।৯-২০), অক্রূরের ভক্তিময় ভাবনা (৩৮।১-২৩), বৃন্দাবনে উদ্ধবের সান্ত্বনাপ্রদান (৪৬।৩০-৩৩, ৪৭।২৯-৩৭, ৪৭।৫৮-৬৩) মুচুকুন্দের স্তব (৫১।৪৫-৫৭), শিবজ্বরের স্তব (৬৩।২৫-২৮), রুদ্রের স্তব (৬৩।৩৪-৪৫) এবং নৃগের স্তব (৬৪।২৯-৪৪) বাদ দিয়াছেন।

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রজের মধুর রস আস্বাদন করা জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। তাই দেখিতে পাই যে, মালাধর বসু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের লীলাসমূহ অতি সংক্ষেপে সারিয়া বীররসের উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত বেণুগান (২১ অধ্যায়), ভ্রমরগীতা (৪৭।১২-২১) প্রভৃতি মাধুর্য্যরসের আকর-স্বরূপ অংশগুলি মালাধর বাদ দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের দেশের সাহিত্যানুরাগীরা শ্রীকৃষ্ণলীলা কি ভাবে আস্বাদন করিতেন তাহা জানিতে শুধু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গীতি কবিতা আলোচনা করিলে চলিবে না ; গুণরাজখানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অনুধাবন করা প্রয়োজন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিতে অশেষ শ্রমস্বীকার করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নূতন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলা, হিন্দী, আসামীয়া, উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণচরিত সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের স্থান কোথায়, তাহা বিশদ ভাবে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা, পাঠান্তরাদি ও শব্দসূচী সহ খুব কম বাংলা বইই এ পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইয়াছে।*

---

* শ্রীকৃষ্ণ বিজয়—মালাধর বসু, অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

রাত্রির তপস্যা

(উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভূপেন সসম্মানে বি-এ পাশ করিল। শুধু-যে ফাষ্ট ক্লাস অনার্স পাইল তাহা নয়, তালিকায় তাহার নামটা গোড়ার দিকেই ছাপা হইল!

এ সম্বন্ধে তাহার মনের মধ্যে একটু ভয়ই ছিল। সে পরীক্ষার আগের দিন পর্য্যন্ত ত পড়াইতে গিয়াছেই, পরীক্ষার মধ্যেও কামাই করে নাই। মোহিতবাবু বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে শোনে নাই। ফল বাহির হইতে সে তাড়াতাড়ি মোহিতবাবুকে সংবাদটা দিয়া প্রণাম করিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঐ সময়টা বেশী পড়লে ফার্ষ্ট হ'তে পারতে!

ভূপেনও হাসিয়া জবাব দিল, বলা যায় না। এখানে না এলে হয় ত সিনেমায় যেতুম। তাতে ফল আরও খারাপ হ'তো।

পরীক্ষা দিবার পর তাহার এক মাসীমা লক্ষ্ণৌ হইতে চিঠি দিয়াছিলেন সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্য, খরচা তিনিই দিবেন এমন প্রতিশ্রুতিও ছিল চিঠির মধ্যে, তবু ভূপেন যায় নাই। সে কোথাও না যাওয়াতে তাহার বন্ধু-বান্ধবরা একটু বিস্মিতই হইল। অবশ্য সে ক্ষতি তাহার পূর্ণ করিয়া দিলেন মোহিতবাবুই। তিনি দিন-পনেরোর জন্য দার্জ্জিলিং গেলেন, সঙ্গে সন্ধ্যা ও ভূপেন দু'জনকেই লইয়া গেলেন। ভূপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহার সঙ্কোচে বাধিতেছিল কিন্তু সন্ধ্যা দুই ধমক দিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল; কহিল, আমাদের সঙ্গে যাবেন তাতেও বুঝি আপনার আত্মসম্মানে বাধছে? তার মানে এখনও আমাদের আপনি পর ভাবেন।

মোহিতবাবুও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সে-ত যাইতেই চায়, দার্জ্জিলিং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা—কত দিনের আশা তাহার! তাহার উপর মোহিতবাবুর সঙ্গ একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ যাহাকে বলে। সে রাজী হইয়া গেল। বন্ধু বিশুর বাড়ী হইতে দুই-একটা গরম জামা ও নিজের পৈত্রিক শাল সংগ্রহ করিয়া বন্ধু-বান্ধব সকলকেই প্রায় সংবাদটা পৌছাইয়া দিয়া সে এক দিন দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া বসিল। সেকেণ্ড-ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া কোন দিন সে দার্জ্জিলিং যাইতে পারিবে, এ ছিল তাহার কল্পনারও অতীত। শুধু এই যাওয়াটাই তাহার জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আর দার্জ্জিলিং! পৃথিবীতে এত সুন্দর স্থান যে আছে তাহা সে কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই। মেঘ ও কুয়াশার সহিত আলোকের সেখানে নিত্য লুকোচুরি চলে, মনে হয় তাহারা আছে মেঘলোকের ঊর্দ্ধে, বাকী সমস্ত পৃথিবীটা পড়িয়া আছে অনেক নীচে, তাহাদের পায়ের তলায়। ফুলের মেলা চারি দিকে, ঘাস-ফুলের মতই অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। সাধারণ একটা বন-ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে দিশাহারা হইয়া যাইত এক-একদিন। তাহার মনে হইত, এই যদি স্বর্গরাজ্য না হয় ত স্বর্গ ইহার চেয়ে খারাপ জায়গা নিশ্চয়ই।

মোহিতবাবু সন্ধ্যাকে পাঠ্যপুস্তক কিছুই লইতে দেন নাই। সে শুধু একখানা 'সঞ্চয়িতা' লইয়াছিল, মোহিতবাবু ভূপেনকে বলিয়াছিলেন অবসর সময়ে দুই একটি কবিতা. বুঝাইয়া দিবার জন্য। এক এক দিন তাহারা বই হাতে করিয়াই বাহির হইয়া পড়িত। হয়ত জলা-পাহাড়ে উঠিবার পথে কোন একটা বেঞ্চের উপর নয়ত বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘাসের উপর বসিয়া চলিত তাহাদের কাব্য-চর্চ্চা। তাহাকে চর্চ্চা বলিলে ভুল বলা হইবে, সন্ধ্যা এক-একটি কবিতা বাছিয়া দিত, ভূপেন সেই কবিতাটি একবার আবৃত্তি করিয়া লইবার পর বুঝাইয়া দিত। তাহার সৌভাগ্যক্রমে দু'-একটি নাম-করা অধ্যাপকের সঙ্গ পাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছিল—কিন্তু তবু যে-টুকু হয়ত তাহার নিজে হইতে কোন দিনই বোঝা সম্ভব হইত না, সেটাও অনেক সময়ে সন্ধ্যার প্রশ্নে যেন তাহার মানস-চক্ষুর সামনে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া যাইত। এই মেয়েটির কাছে কোন ব্যাপারেই ফাঁকি চলিত না, সেই জন্য কি পাঠ্য কি কবিতা পড়াইতে বসিয়া সর্ব্বদা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ-সতর্ক রাখিতে হইত।...এমনি করিয়া সেই চিরতুষারাবৃত মৌন হিমাদ্রি-শিখরের সামনে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহাদের কাব্য পাঠ—ভূপেন আপন মনে বলিয়া যাইত আর সন্ধ্যা তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ শান্ত চোখ দু'টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। যে দিন মোহিতবাবু তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন সে দিন ভূপেন কিছুতেই পড়িতে চাহিত না, কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল তাহার মনে, মোহিতবাবু নিজেই দুই-একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্ট এবং বাচনভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ও অর্থবোধক—ভূপেন তাঁহার আবৃত্তি হইতেই অনেক জিনিস বুঝিতে পারিত যা এত দিন বার-বার পড়িয়াও নিজে বুঝিতে পারে নাই।...

এমনি করিয়া দিন-কুড়ি কাটিয়া গেল। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন ভূপেন প্রথম আবিষ্কার করিল যে, তাহারা তিন সপ্তাহ হইল এখানে আসিয়াছে। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের তাহ'লে কালই যেতে হবে।

মোহিতবাবু হাসিয়া বলিলেন, হ্যা বাবা, কালই নামতে হবে। পরশু আমার একটা জরুরী কেস আছে, না গেলে তারা অত্যন্ত বিপদে পড়বে, তা ছাড়া আমারও কথার খেলাপ হবে।

অগত্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভূপেন সেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' জন্য প্রস্তুত হইল। সে-দিন সে দুপুর-বেলাই একা খানিকটা ঘুরিয়া আসিল। দুপুরবেলা দার্জ্জিলিঙের নির্জ্জন রাস্তায় কেমন একটা মায়া আছে—যাহারা সে সন্ধান পাইয়াছে তাহারা এমনি করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে। অনেকখানি ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা অনুযোগের সুরে কহিল, বাঃ রে, আপনি ত বেশ লোক মাষ্টার মশাই, দিব্যি একা-একা ঘুরে এলেন। আজই ত শেষ দিন, আমি বুঝি আর বেরোব না?

অপ্রতিভ ভাবে ভূপেন জবাব দিল, বেশ ত চলো না, আর খানিকটা ঘুরে আসি—

সন্ধ্যা কহিল, হ্যা, তাই বই কি! আপনি কত ঘুরে এলেন, এখনও হাঁপাচ্ছেন—আবার এখনই বেরোলে আপনার কষ্ট হবে।

ভূপেন জিদ্ ধরিয়া কহিল, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আর তা ছাড়া আজই ত শেষ, কষ্ট একটু হ'লই না হয়, তবু যতটা বেড়িয়ে নিতে পারি!

তবে একটু দাঁড়ান, আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা ক'রে আনি।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি, এখনও ত তিনটেই বাজেনি, এরি মধ্যে চা ?

সন্ধ্যা জবাব দিল, হ'লই বা এরি মধ্যে। এক কাপ না হয় বেশীই খেলেন। কি রকম পরিশ্রমটা হয়েছে, তা ত আপনি বুঝছেন না—এই শীতে এখনও ঘামছেন।

কথাটা বলিতে-বলিতেই সে চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। খানিক পরে নিজেই এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিয়া কহিল, নিন, চট্ করে খেয়ে নিয়ে চলুন ঘুরে আসি। দাদুকে বলে এসেছি—পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে চা খেয়ে আবার বেরোব সবাই মিলে।

ভূপেন 'চলো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বই নিলে না ?

সন্ধ্যা কহিল, আজ থাক মাষ্টার মশাই—আজ শুধু দেখব।

অনেকক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে হাঁটিবার পর বার্চ্চ হিলের রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যা অনুতপ্ত সুরে কহিল, না, আপনাকে টেনে আনা অন্যায় হয়েছে, আপনি দস্তরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!···আর গিয়ে দরকার নেই, এইখানটাতেই একটু বসি আসুন—

ভূপেন সত্যই এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রতিবাদ-মাত্র না করিয়া বসিয়া পড়িল। দুই জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সন্ধ্যাই আবার কথা কহিল, মাষ্টার মশাই, বি-এ ত পাশ করলেন এবার নিশ্চয়ই এম-এ পড়বেন। তার পর কি করবেন ?···

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার পর যে কি করব এখনও স্থির করিনি। বাবার ইচ্ছে আমি তাঁর অফিসে ঢুকি। এম-এ পড়ারও কোন অর্থ নেই তাঁর কাছে—তিনি এই পরীক্ষা দেওয়ারই সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত করতে বলছিলেন—এ যাত্রা কোন রকমে ফাঁড়াটা কাটিয়েছি।

সন্ধ্যা যেন একটা রূঢ় আঘাত পাইল, কহিল, আপনি অফিসে চাকরী করবেন ?

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, করবই যে তা এখনও ঠিক হয়নি—তবে করবারই ত কথা।···আমার মত অবস্থার শতকরা সাড়ে নিরেনব্বই জন ছেলেরই ত ঐ গতি।

সন্ধ্যা যেন একটু শিহরিয়া উঠিয়া জবাব দিল, না মাষ্টার মশাই, আপনি কেরাণীগিরি করবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন কহিল, তোমার দাদু বলছিলেন যে, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটা পড়ে ফেলতে, তাহ'লে উনি আমার পসারের একটা উপায় করে দিতে পারবেন। কিন্তু ওকালতীও আমার ভাল লাগে না।

বয়স্কা অভিভাবিকার মতই ঘাড় নাড়িয়া সন্ধ্যা কহিল, না না, ওতে বড় মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া ও সংসর্গটাই খারাপ। আমি বলব, আপনি কি হবেন ?

বলো।···ভূপেন সকৌতুক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, আপনি অধ্যাপক হবেন কোন কলেজে। আপনি পড়ানো ছাড়া অন্য কিছু কাজ করছেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন মাথা নীচু করিয়া একটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, অধ্যাপকের কাজ পেলে আমিও আর কিছু চাই না, কিন্তু সে কি আর হবে ? কত এম-এ পাশ ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রোফেসারের চাকরী আর ক'টা। তা ছাড়া, আমার তেমন কেউ জানাশুনো লোকও নেই যে, তদ্বির করে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যা আশ্বাস দিয়া কহিল, সে আপনি কিছু ভাববেন না মাষ্টার মশাই, যাহোক করে একটা উপায় হয়েই যাবে। না হয় আর একটা এম-এ পাশ দিয়ে নেবেন। ডবল এম-এ হ'লে অনেকটা জোর হবে না ?

ভূপেন তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, দেখা যাক্।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, ঐ কথাই ঠিক রইল; অধ্যাপক আপনাকে হ'তেই হবে। আর কোন কাজ আমি করতে দেবো না।

ভূপেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমরা বড় গরীব সন্ধ্যা! বাংলা দেশে আমাদের মত গরীব অথচ ভদ্র-ঘরের ছেলেরা যে কত অসহায় তা তুমি শুধু আজ নয়, কোন দিনই বুঝতে পারবে না। ইচ্ছে করলেই আমরা কিছু হতে পারি না। সমস্তটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

কথাটা তাহার বুঝিবার কথা নয়, তবু ভূপেনের কথার স্বরে সন্ধ্যা স্তব্ধ হইয়া গেল, আর জবাব দিতে পারিল না।

ভূপেনের ঐ কথাটা যে কি মর্ম্মান্তিক সত্য, তাহা বোধ হয় সে বলিবার সময় নিজেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল আরও মাস-কতক পরে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই এক দিন।

দার্জ্জিলিং হইতে নামিয়া যথারীতি সে এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। ইদানীং মোহিতবাবু তাহাকে চল্লিশ টাকা করিয়া বেতন দিতেন—একটা কেরাণীর বেতন। সুতরাং বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্ত্তি হইতে তাহার বাধে নাই। তাহার সব খরচ সে নিজেই চালায়, উপরন্তু সংসারেও কিছু দেয় বলিয়া তাহার বাবা একটু সমীহ করিয়াই চলিতেন। কিন্তু মাস-কয়েক সহজ ভাবে কাটিয়া যাইবার পর সহসা এক দিন মোহিতবাবু তাহাকে নিজের অফিস-ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আজ আলোচনা করব।

ভূপেন চুপ করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি কথা তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, শুধু মোহিতবাবুর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মোহিতবাবু মুহূর্ত্ত কয়েক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কথা দিতে হবে বাবা। হঠাৎ তুমি কোন জবাব দিও না, বা মন স্থির করো না। আমি যা বলব মন দিয়ে শুনবে আর তার সব অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করবে—এই আমার অনুরোধ। অর্থাৎ আমায় ভুল বুঝো না।···ঠিক ত ?

ভূপেন একটু হাসিয়া জবাব দিল, আপনার অতি তুচ্ছ কথাও আমি মন দিয়ে শুনি, সুতরাং সে দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মোহিতবাবু তবুও যেন খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কথাটা সন্ধ্যাকে নিয়েই। সন্ধ্যা পনেরো পূর্ণ হয়ে ষোলয় পড়েছে—এই গত আশ্বিন মাসে। ঠিক অতটা বয়স ওর দেখায় না বটে, কিন্তু আমাদের দেশের হিসেবে ওটা বিবেচনাযোগ্য বয়স।···তা ছাড়া

আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে মেয়েদের মন এই বয়সেই পরিণতির দিকে বা পরিণত ধারণার দিকে মোড় ফেরে—সুতরাং এই সময় থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মোহিতবাবু আরও একবার চুপ করিলেন। তাঁহার বক্তব্যটা ঠিক কি বুঝিতে না পারিলেও একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সেও কথা কহিতে পারিল না।

মোহিতবাবুই আবার শুরু করিলেন, সন্ধ্যা তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি, অত শ্রদ্ধা সে এখন আমাকেও করে কি না সন্দেহ। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহ মেশানো। যাক্—কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে আরও কিছু দিন গেলে সেটা অন্য দিকেও মোড় ফিরতে পারে। এবং সেটা আমি চাই না।

এই সংবাদ, এই আশঙ্কাটা ভূপেনের কাছে এতই অভাবনীয় যে, সে রীতিমত একটা বিস্ময়ের আঘাত অনুভব করিল। সন্ধ্যাকে এত অল্প বয়স হইতে দেখিয়াছে, এবং তাহাদের সম্পর্কটা প্রথম হইতেই এমন একটা মধুর যে, সেখানে অন্য কোন গভীরতর সম্পর্কের সম্ভাবনাই তাহার কোন দিন মনে পড়ে নাই। সে কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করিল না, কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মোহিতবাবু বলিয়াই চলিলেন, এই না চাওয়ারও একটা ইতিহাস আছে বাবা। তোমাকে আমি ভাল ছেলে বলেই জানি, তোমার ওপর আমার অনেক আশা আছে। যদিও তোমরা ঠিক আমাদের পালটি ঘর নও, তবু সে রকম প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার হাতে তাকে তুলে দিতে একটুও ইতস্তত করতুম না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ওর মাকে আমি একটি সৎপাত্র দেখে গরীবের ঘরে দিয়েছিলুম—বোধ হয় সে কিছু দুঃখ পেয়েছিল তার ফলে।·· যাই হোক্, মরবার সময় আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তার মেয়েকে আমি যেন কখনও গরীবের ঘরে না দিই। এই কথাটা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার—আমার সমস্ত ফিলজফীর বিরোধী এটা—কিন্তু আমি তার কথাটাও ঠেলতে পারব না বাবা, বিশেষ করে সে ঐ কথাটাই আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে—'আপনার মেয়েকে আপনি যেখানে খুশী দিয়েছিলেন, আমার মেয়েকে আমি তা দিতে দেবো না।'

মোহিতবাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি কন্যার মৃত্যুশয্যার ছবিটাই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া দিয়াছিল।···মিনিট তিন-চার পরে যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছো বাবা?

এতক্ষণ পরে ভূপেন কথা কহিল, কিন্তু এ সম্ভাবনা যে একটুও আছে, তাই যে আমার মনে হয় না—

সম্ভাবনা আছে কি না জানিনে বাবা, আশঙ্কা আছে। আর সেটা যখন আছে তখন আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভাল নয় কি? আজ যেটা অসম্ভব আছে, কাল যদি সেটা সম্ভব হয়ে পড়ে, তখন ত আর ফেরার পথ থাকবে না!

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আপনিই তাহ'লে বলুন কি করা উচিত।

মোহিতবাবু বলিলেন, সন্ধ্যা যা পড়াশুনো করেছে তাতে এখন থেকে ও নিজেই পড়তে পারবে বলে মনে হয়—ও বলছিল, পরীক্ষাগুলো একে একে দিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু সে-ও ও নিজে নিজেই দিতে পারবে।···কিন্তু একটা কথা, তোমার পরীক্ষাটাও দেওয়া দরকার। তোমার কথা তুমি সবই আমাকে বলেছ, সেই জন্যই সাহস ক'রে একটা অনুরোধ করছি—আর স্নেহেরও একটা অধিকার আছে আমার, এম-এ পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার খরচ আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।···তোমার ওপর অনেক আশা আমার, মিথ্যা অভিমানের বশে নিজের কোন ক্ষতি ক'রো না, এই অনুরোধ।

মোহিতবাবুর কথা বলার ধরণে প্রথম হইতেই ভূপেন একটা বড় রকমের আশঙ্কা করিতেছিল বটে, তবু আঘাতটার আকস্মিকতা তাহাকে কিছু কালের জন্য যেন জড়, অসাড় করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করিয়া কহিল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি এ ভিক্ষা নিতে পারতেন?

মোহিতবাবু মাথা নীচু করিয়া জবাব দিলেন, তুমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছ বলে এত বড় কথাটা বললে বাবা, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের ঠিক এতটা দূরত্ব আর নেই। বেশ, তুমি এই টাকাটা ঋণ বলেই নাও, এর পরে তোমার সময়মত শোধ দিও। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা মাটি করো না!

শেষের কথাগুলি মোহিতবাবু কতকটা মিনতির স্বরেই বলিলেন। ভূপেন নিজের রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সন্ধ্যাকে বলেছেন এ কথা?

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না। তাকে পরে বলব। সে আঘাত পাবে নিশ্চয়ই—কিন্তু আমার ওপর তার বিশ্বাস আছে, সে আমাকে ভুল বুঝবে না।

ভূপেন হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন। এ সমস্ত কথাগুলোই এত আকস্মিক আর অভাবনীয় যে, আমি এখনও কিছু স্থির করে ভাবতেই পারছি না।

মোহিতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ভূপেনের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, এই ভয়টাই এত দিন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল যে তুমি আমাকে ভুল না বোঝো। তুমি এখন বাড়ী যাও, ভাল করে সব ভেবে দ্যাখোগে। শুধু এইটে মনে রেখো যে, এখন যদি তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দাও তাহ'লে আমার আত্মীয়-বিয়োগের মতই তা প্রাণে লাগবে।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি সব কথা আর একবার আগাগোড়া না ভেবে আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।

সে আর অপেক্ষা করিল না। তাহার মানসিক জড়তা এখনও কাটে নাই বলিয়া আঘাতের তীব্রতাটা সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু একটা অপরিসীম দৈহিক দুর্ব্বলতাতে পা দুইটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কোন মতে সিঁড়িটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া সামনেই যে রিক্সাটা দেখিতে পাইল সেইটাতেই চড়িয়া বসিল। একটা ভয় ছিল পাছে এই অবস্থাতে সন্ধ্যার সামনে পড়িতে হয়—নানা রকমের জবাবদিহি এবং পীড়াপীড়ির কথা তখন সে ভাবিতেই পারিতেছিল না—কিন্তু দৈবক্রমে সে পরীক্ষায় আর তাহাকে পড়িতে হইল না।

[ক্রমশঃ

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতবাদ প্রধানতঃই নীতিমূলক। পারমার্থিক-তত্ত্বের আলোচনা সেখানে নেই। বস্তুতঃ, যে কোন প্রকার তত্ত্বালোচনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিমুখ ও মৌন। এই জীবন দুঃখ-ময়, কিসে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় ও জীবনে পরম শান্তি লাভ করা যায়—এই দিকেই ছিল বুদ্ধদেবের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই মৌনতাকে কেন্দ্র করেই একটি সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন হলো, এই মৌনতার—অর্থ কি? বাস্তবিকই কী তিনি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বাইরে কোনো শাশ্বত সত্তাকে স্বীকার করেননি? অথবা স্বীকার ক'রলেও তাকে নিজেই উপলব্ধি ক'রতে পারেননি? অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই ধরণের প্রশ্ন ও তার উত্তরকে অবলম্বন ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠলো। নাগার্জ্জুন-প্রচারিত 'শূন্যবাদ' তাদের অন্যতম।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সাত শ' বছর পরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে নাগার্জ্জুনের জন্ম হয়। বুদ্ধদেব নিজের নীতিশাস্ত্রকে মধ্যপন্থা ব'লে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, যে-কোনো প্রকার একান্ত সিদ্ধান্ত বা মতবাদকে তিনি অস্বীকার ক'রতেন। নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবের এই দিক্‌টা গ্রহণ করে গ'ড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব দার্শনিক পদ্ধতি। একান্ত 'হাঁ' ও একান্ত 'না'—'জগৎ-ই একমাত্র সত্য' অথবা 'জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা'—এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে তিনি তাঁর দার্শনিক বিচারে এক অপূর্ব্ব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁর প্রচারিত মতবাদের আর এক নাম 'মাধ্যমিক' দর্শন। নাগার্জ্জুন গোড়াতেই সত্যের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে নিয়েছিলেন। যার মধ্যে অর্থ-সঙ্গতি নেই ও যা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়—তা কখনই সত্য হতে পারে না। অর্থসঙ্গতি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা—সত্যের এই মানদণ্ড নিয়ে তিনি তাঁর বিচার সুরু করলেন। ফলে দেখা গেল, কোনো কিছুই সত্য নয়। কারণ, কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত এই জগতের কোনো কিছুরই স্বকীয় অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক কার্য্য বা পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে কতকগুলি সমসাময়িক কারণ ও অবস্থার উপর। উপযুক্ত কারণ ও অবস্থার অভাব ঘটলে ঐ কার্য্য বা পদার্থেরও বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জগতের কোনো বস্তুই আত্মস্থ নয়। আর, যা আত্মস্থ নয় তা' সত্যও নয়। কাজেই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু তাই ব'লে সে অস্তিত্বহীন নয়। জগতের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার মূল বা সত্য এখানে নেই। এখানে অর্থাৎ এই ব্যাবহারিক জগতে যা আছে তার সমস্তই অর্থ-সঙ্গতি-হীন ও অবোধ্য; আমরা চলি, ফিরি, উঠি, বসি—আমাদের মধ্যে গতি আছে। কিন্তু এই গতি জিনিষটি আসলে কি? নাগার্জ্জুন প্রমাণ ক'রলেন যে, গতির ব্যাখ্যা হয় না। অর্থাৎ চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে গতির ধারণা অযৌক্তিক। একটি পদার্থ একই মুহূর্ত্তে দুই স্থানে থাকতে পারে না। চলবার সময় যে-পথকে আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি, সে-পথে আমরা চলি না; অথচ যে-পথকে অতিক্রম ক'রতে এখনও বাকী আছে, সে-পথও অবর্ত্তমান, অর্থাৎ নেই। কিন্তু পথকে মাত্র দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অতিক্রান্ত ও অতিক্রম্য। প্রথমটি শেষ হ'য়ে গেছে, আর দ্বিতীয়টি নেই। অতএব অতিক্রমণ বা গতি ব'লে কোনো বস্তুই নেই (মাধ্যমিক শাস্ত্র ২; ১)। অতিক্রমণ যখন নেই, তখন অতিক্রমণকারী—কোনো ব্যক্তিও নেই (মা, শা, ২; ৬-৮)। মাধ্যমিক শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাগার্জ্জুন এই ভাবে গতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অসারতা প্রমাণ ক'রলেন। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি নিলেন যৌগিক পদার্থ (সংস্কৃত—**composite substance**)। আমরা জানি, যৌগিক পদার্থের জীবন বা অস্তিত্ব তিনটি মুহূর্ত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ—উৎপত্তি, স্থিতি, ও বিনাশ (উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ-সমাহার-স্বভাবম্) অর্থাৎ এই তিনটি ধর্ম্মের একত্র সমাহার বা সমাবেশকেই যৌগিক পদার্থ বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু একই সময়ে এদের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। যে-কোনো পদার্থেরই উৎপত্তি-মুহূর্ত্তে তার স্থিতি বা বিনাশ অনুপস্থিত। আবার স্থিতি ও বিনাশের মুহূর্ত্তেও ঠিক তাই—উৎপত্তি সেখানে অনুপস্থিত। তাহ'লে বলতে হয় যে, উৎপত্তি, বা স্থিতি বা বিনাশ, এদের কোনো অবস্থাতেই যৌগিক পদার্থ ব'লে কোনো কিছু নেই, কেন না, যে-কোনো মুহূর্ত্তেই তিনটি মুহূর্ত্তের একত্র সমাহার নেই। যৌগিক পদার্থও তাই সত্য নয়।

নবম অধ্যায়ে নাগার্জ্জুন 'আত্মা' সম্বন্ধে বিচার ক'রলেন। আত্মার কাজ হ'লো দেখা শোনা ও অনুভব করা। এই ক্রিয়াগুলিকে বাদ দিলে আত্মাকে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, নাগার্জ্জুন বলতে চাইলেন যে, আত্মার, এদের নিরপেক্ষ কোনো পূর্ব্ব-অস্তিত্ব (**Prior existence**) নেই; অথচ এমনও বলা চলে না যে, সে অস্তিত্ব লাভ করে এই ক্রিয়াগুলির পরে (**Posterior existence**)। কেন না, দেখা, শোনা ইত্যাদি যদি আত্মাকে বাদ দিয়েই সম্ভব হয় তবে আত্মা নামে কোনো কিছুকে এই জটিলতার মধ্যে টেনে আনাই বৃথা। আত্মা বলে যদি কিছুকে অভিহিত করতেই হয়—তবে মুহূর্ত্তগত মানসিক অবস্থা (**momentary mental states**) সমূহের বাইরে কোনো কিছুর সম্বন্ধে তা চলবে না। কেন না, বিশুদ্ধ চেতনা (**Consciousness as such**) বা আত্মার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। নাগার্জ্জুন অবশ্য এমন কথা বলেননি যে, গতি, বা যৌগিক পদার্থ বা আত্মা নেই। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, এই ব্যাবহারিক জগতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা কোনো বস্তুর সত্যরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। অর্থসঙ্গতি ও বোধগম্যতা যদি হয় সত্যের মাপ-কাঠি, তাহলে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাঁরা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা দেখবেন যে, ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে (**Bradley**) ও তাঁর দর্শনে এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্র হ'লো: **Ultimate reality is such that is does not contradict itself. 'Reality is consistent.' 'The world···contradicts itself, and is therefore appearance, and not reality.'** এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নাগার্জ্জুনেরই মতো গতি, বস্তু, আত্মা—ইত্যাদি ধারণার অবোধগম্যতা প্রমাণ করেছেন। অবশ্য ব্রাডলের দর্শনে যুক্তির যে গঠন-কৌশল ও প্রয়োগ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ। যদিও নাগার্জ্জুনের মধ্যে এতোটা চমৎকারিতা ও উৎকর্ষ হয়তো পাওয়া যাবে না, তবু এটা ঠিক যে, সতের শ' বছর আগে নাগার্জ্জুনের এ মতবাদ ও আধুনিক জগতে ব্রাড্‌লের

দর্শন—পদ্ধতির দিক থেকে এদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্যই নেই। নাগার্জ্জুনের মতে, আমরা দেখেছি, এই ব্যাবহারিক জগৎ বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন, আপেক্ষিক ও মায়াময়। 'কার্য্যকারণ' 'অংশ-সমগ্র' ইত্যাদি যে সব ভিত্তির উপর জগতের অস্তিত্ব, তাদের সবই অর্থ-সঙ্গতিহীন ও আপেক্ষিক। ফলে, তাদের ভিত্তিতে যে জগৎকে আমরা অনুভব করি তা প্রকৃত সত্য নয়, প্রতিভাসিত সত্য ও সংবৃতি বা ব্যাবহারিক জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ জগৎ আছে অথচ তার যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যাখ্যা নেই—একেই নাগার্জ্জুন বললেন 'শূন্য'।

আমরা আগেই দেখেছি যে, নাগার্জ্জুনের মতে এই জগতের কোনো কিছুরই স্বকীয় অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধদেব তাঁর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'-এর দ্বারা এই কথাই বলেছিলেন। কার্য্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত এই জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ও কতকগুলি মুহূর্ত্তের সমষ্টি মাত্র। একের পর এক মুহূর্ত্তের উৎপত্তি ও লয়কে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে এই বিনাশশীল জগতের বৈচিত্র্য। একটি মুহূর্ত্তকে জানতে হ'লে আমাদের যেতে হবে তার কারণস্বরূপ তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিতে, কিন্তু সেখানেও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, কারণ, তারও অস্তিত্ব নির্ভর ক'রছে তারও পূর্ব্বতর মুহূর্ত্তটিতে। এই ভাবে মুহূর্ত্ত থেকে মুহূর্ত্তে যতো দূরেই যাওয়া যাক না কেন, এই গতির আর শেষ নেই। অর্থাৎ কোনো বস্তুই স্বভাব-সম্পন্ন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। নাগার্জ্জুন এই সত্যটিকে আরও বিশদ করে প্রকাশ ক'রলেন। তিনি বললেন, যদি মনে করা যায় যে, বস্তু তার স্বভাবেই অবস্থান করে তা'হলে বলতে হয় যে, তার অস্তিত্বের কোনো কারণ নেই। কেন না, স্বভাবে বা আত্মভাবে থাকার মানেই হ'লো কারণ বা অন্য যে কোনো-কিছুর নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীন অস্তিত্ব (মা, শা, ২৪, ১৬)। বস্তুকে যদি কারণ-সম্ভূত ব'লেই মানতে হয়, তাহলে তার স্বভাব বা স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আবার যদি বলা যায় যে, কোনো বস্তুই অন্য-নিরপেক্ষ নয়, স্বাধীন ও স্বভাবসম্পন্ন, তাহলে 'কারণহীন'-বাদ মানতে হয় ও কারণ, কার্য্য, কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়া, জন্ম ও মৃত্যু এদের সকলকেই অস্বীকার করতে হয় (মা, শা, ২৪, ১৭)! কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো তা নয়। এমন কোনো ধর্ম্ম নেই যা কারণ সম্ভূত নয়, অতএব এমন কোনোও ধর্ম্মই নেই যা নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল নয় বা 'অশূন্য' (মা, শা, ২৪, ১৯)। নাগার্জ্জুনের মতে, তাহলে এই জগৎ স্বভাবহীন, নিয়ত পরিণামী ও অবোধ্য: 'শূন্যতা' দ্বারা নাগার্জ্জুন এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

'কার্য্য-কারণ-সমুৎপত্তিকেই আমরা 'শূন্যতা' ব'লে থাকি' (মা, শা, ২৪, ১৮)। শূন্যতার অর্থ, তাহলে, অস্তিত্বহীনতা নয়—নাগার্জ্জুনকে ঠিক মতো বুঝতে হ'লে এই কথাটা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক। জগতের ঘটনা যে ভাবে বর্ত্তমান র'য়েছে, 'শূন্যতা' তারই বর্ণনা মাত্র। এই জগৎ 'শূন্য'—মানে, বিরুদ্ধভাবাপন্ন, পরিণামী ও অসত্য। স্বয়ং বুদ্ধদেবও এই ধরণের নেতিমূলক কথাই ব'লেছিলেন। কিন্তু জগৎ ও জীবনের ইতিমূলক সত্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো মতবাদ তিনি প্রকাশ করেননি। আর, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই ইতিমূলক দিকটিকেই কেন্দ্র ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গ'ড়ে উঠেছিলো। ব্যাবর্ত্তিক জগতকে অসত্য প্রমাণ ক'রে নাগার্জ্জুন এই কথা বললেন যে, জীবনের মূল সত্য এখানে নেই। সে র'য়েছে দেশ-কাল ও কার্য্য-কারণ বহির্ভূত নিরপেক্ষ এক অস্তিত্বের মধ্যে। কারণ, বিশুদ্ধ নেতি ব'লে কিছু থাকতে পারে না। নেতির পশ্চাতে যদি 'ইতি' না থাকে তাহলে সমস্ত চিন্তাই ভিত্তিহীন। নেতির ভিত্তিস্বরূপ তাই ইতি থাকতে বাধ্য। নাগার্জ্জুন বলছেন, বুদ্ধদেবের উপদেশ দুইটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—একটি ব্যাবহারিক ও অন্যটি পারমার্থিক। যারা এই দু'য়ের পার্থক্য না বুঝেছেন, তাদের পক্ষে বুদ্ধোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব (মা, শা, ২৪ ; ৮-৯)। নাগার্জ্জুনের এই মন্তব্য বিশেষ অর্থপূর্ণ। কারণ, এর থেকে তাঁর চিন্তা ও মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শুধু মাত্র এই ব্যাবর্ত্তিক জগতের অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য উদ্ঘাটন ক'রেই যে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন তা' নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো এই পরিণামী ও আপেক্ষিক অস্তিত্বের অন্তরালে কোনো একটি নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্তা আবিষ্কার করা। এই ব্যাবহারিক জগৎ যদি হয় মিথ্যা, তাহলে তার বাইরে সত্য ব'লে নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। কেন না, সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার কোনো অর্থ থাকা সম্ভব নয়। অতএব যুক্তির দিক দিয়ে কোনো পারমার্থিক শাশ্বত সত্তাকে আমাদের স্বীকার ক'রতেই হয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মন ও তার মননরীতি এই জগতেরই বস্তু, সেই হেতু পারমার্থিক সত্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ অচল। কোনো প্রকারেই সেই সত্যকে বর্ণনা করা বা প্রকাশ করা যেতে পারে না। "চোখে দেখা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না, মানুষ সেখানে প্রবেশ ক'রতে পারে না,—সেই হ'লো সব চেয়ে বড়ো সত্য। যেখান থেকে সমস্ত কিছুকে এক সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা যায়, বুদ্ধদেব তাকেই বলেছেন পরমার্থ বা পরম সত্য। তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।"

এই হ'লো নাগার্জ্জুনের চিন্তাধারার ইতিমূলক দিক। একে বাদ দিয়ে জগতের কল্পনা করা যায় না। নাগার্জ্জুন একেও বললেন 'শূন্য', কোনো জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে একে জানা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। প্রজ্ঞাপারমিতায় বলা হ'য়েছে, "শূন্যতা বলতে তাকেই বোঝায়, যার কোনো কারণ নেই; যা চিন্তা ও ধারণার অতীত; যা অস্পষ্ট, অজ্ঞাত ও অপরিমেয়।" কুমারজীব তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "এই শূন্যতাই হ'লো একমাত্র মূল যার থেকে সমস্ত সম্ভব হ'য়েছে এবং একে বাদ দিলে জগতের কোনো কিছুই সম্ভব নয়।" নাগার্জ্জুনের মতে তাহলে শূন্যতার দু'টি দিক্। ব্যাবর্ত্তিক (Phenomenal) জগতের ক্ষেত্রে এর মানে হ'লো কিয়ৎ পরিবর্ত্তনশীলতা ও স্বভাবহীনতা; আর পারমার্থিক জগতের ক্ষেত্র শূন্যতা বলতে বোঝায় পরম অসীমতা (absolute unrestrictedness)। পারমার্থিক সত্য অব্যক্ত। তাকে জানতে হ'লে আমাদের ব্যাবহারিক জগতের সমস্ত বৃত্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। "সে অস্তিত্বময়ও নয়, আবার অস্তিত্ব-হীনও নয়। অস্তিত্ব অনস্তিত্ব এদের দুইকে নিয়েও সে নেই, আবার এদের বাদ দিয়েও সে নেই" (মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ; রাধাকৃষ্ণণ থেকে)। একে অস্তিত্বময় সত্তা বলা ভুল, কারণ একমাত্র সম্পূর্ণ (concrete) সত্তারই অস্তিত্ব আছে; আবার একে অস্তিত্বহীন অ-সত্তা বলাও ভুল, কেন না, যার কোনো প্রকার অস্তিত্ব নেই, যে অসৎ, তার থেকে সত্যের উদ্ভব হ'তে পারে না।

অথচ গোড়াতেই জগতের শাশ্বত কারণস্বরূপ একে আমরা মেনে নিয়েছি।

অতএব এর সম্বন্ধে যে কোনো প্রকার বর্ণনা এড়িয়ে চলাই সব চেয়ে নিরাপদ। নাগার্জ্জুনের মতে যুক্তি ও ভাষার সার্থকতা শুধু মাত্র এই ব্যাবহারিক জগতেই সীমাবদ্ধ। ফলে, আমাদের দৃষ্টিতে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টিতে সে তাই শূন্য। তাই বুদ্ধদেব বলছেন, যে জিনিষকে বর্ণমালার কোনো অক্ষর দিয়েই প্রকাশ করা যায় না, তার সম্বন্ধে কোনো প্রকার বর্ণনা কি ক'রে সম্ভব? এমন কি, এই যে বলা হ'লো যে, বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না, এ-ও সেই বর্ণমালারই সাহায্যে সেই অনির্ব্বচনীয় পারমার্থিক সত্য, শূন্যতা শব্দের দ্বারা যাকে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে, তারই সম্বন্ধে বলা হ'লো। পারমার্থিক সত্য সকল প্রকার আপেক্ষিকতার অতীত ও জাগতিক দৃষ্টিতে শূন্য—এই ধারণাটা, মনে হয়, অনেকেই উপলব্ধি ক'রেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিক ডান্‌স্‌ স্কোটাস্‌ (Duns Scotus) বলেছেন, ঈশ্বরকে যে 'শূন্য' বলা হয় সেটা অসঙ্গত নয় (God is not improperly called nothing)। আধুনিক যুগে ব্রাড্‌লে বলছেন; 'যা সম্বন্ধগত আপেক্ষিক নয়, চিন্তার পক্ষে তা শূন্য' (For thought, what is not relative, is nothing)। পরম সত্যকে ধারণা করবার অক্ষমতা থেকে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রলে অন্যায় হবে। তাঁর সপক্ষে একমাত্র প্রমাণ হ'লো নির্ব্বাণ-সুখ। জগৎ-প্রপঞ্চের উপশম ও পরম আনন্দময় চেতনা, সেই হলো নির্ব্বাণ।

চেতনার যে-স্তরে আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করি, সেখানে জগৎ-প্রপঞ্চের সাথে আমাদের চেতনা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত হ'য়ে র'য়েছে এবং সে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে এই জগতের মূল সত্তাটিকে উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পরম সত্যের দর্শন পেতে হ'লে চেতনার মুক্তি আবশ্যক। জগৎ-প্রপঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে চেতনাকে তার মুক্ত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা—এই হ'লো জগতের উপশম ও আনন্দময় চেতনা। এক দিকে ব্যাবর্ত্তিক জগৎ, আর অন্য দিকে পারমার্থিক জগৎ—এই দু'য়ের এক থেকে নিষ্ক্রমণ ও অন্যে প্রবেশ, এই নিয়েই নির্ব্বাণ। আমরা দেখেছি, নাগার্জ্জুন তাঁর শূন্যতার ব্যাখ্যার সময়েও এই দুই জগৎ ও সত্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শূন্যতা ও নির্ব্বাণ প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। বাস্তবিক (objective) ক্ষেত্রে যা 'শূন্য' ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তাই নির্ব্বাণ। শূন্যতার এক অর্থ হ'লো সংসার গতির যথাযথ বর্ণনা, নির্ব্বাণের ত এক অর্থ তাই। এই জন্যেই নাগার্জ্জুন বললেন, সংসার ও নির্ব্বাণ একই বস্তু (মা, শা, ২৫, ১৯)। যদি মনে করা যায় যে, জগতের বিনাশ সাধনই নির্ব্বাণ, তাহলে নির্ব্বাণ হয়ে দাঁড়ায় এক আপেক্ষিক তত্ত্ব। কেন না, তাহলে বলতে হয় যে, জগতের বিনাশের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার যদি বলা যায় যে, নির্ব্বাণের পূর্ব্বে জগৎ ছিল, কিন্তু নির্ব্বাণের পর আর থাকে না, তাহলে সে হবে অযৌক্তিক। কেন না, তাহলে বলতে হয় যে, বুদ্ধদেবও কোনো দিন নির্ব্বাণ লাভ করেননি, কারণ মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও তিনি যে কর্ম্মব্যস্ত জীবন যাপন করে গেছেন তা থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে, জগতের অস্তিত্ব তাঁর কাছ থেকে কোনো দিনই লোপ পায়নি। এই প্রকার চিন্তা থেকে নাগার্জ্জুন বললেন যে, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সংসার ও নির্ব্বাণ—এদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কার্য্য-কারণের দিক থেকে দেখলে, এই জগতকে আমরা ব্যাবর্ত্তিক ব'লে থাকি। আবার কার্য্য-কারণ ও অন্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে একেই আমরা পরমার্থিক বলে থাকি (রাধাকৃষ্ণণ থেকে)।

যতক্ষণ কার্য্য-কারণের দিক থেকে এই জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করছি, জীবনের দুঃখ কষ্ট ব্যাধি ইত্যাদি আমাদের কাছে শুধু ততক্ষণই সত্য। কিন্তু যিনি পারমার্থিক দৃষ্টিলাভ ক'রেছেন তাঁর কাছে এদের সবই মিথ্যা, এবং কোনো প্রকার নীতিজ্ঞানও তাঁর কাছে অর্থহীন। কেন না, ভালো-মন্দের সমস্যা থেকেই নীতিজ্ঞানের উদ্ভব। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভালো-মন্দের পৃথক সত্তা একেবারেই বিলুপ্ত। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছি যে, বুদ্ধদেবের শিক্ষার মধ্যে নাগার্জ্জুন দু'টি সত্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন—ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। আমাদের যতো কিছু সমস্যা, প্রশ্ন, প্রযত্ন—সবই এই ব্যাবহারিক সত্য-সংক্রান্ত। পারমার্থিক সত্যের আলোকে এরা এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তুলনা ক'রে ব্যাবহারিক সত্যকে যদি বলা যায় সুপ্ত অবস্থা, পারমার্থিক সত্য তাহলে হবে জাগ্রত অবস্থা। সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্ন-জগৎ একান্ত সত্য ব'লে প্রতীয়মান হয়। জাগরণে তা আর হয় না। কিন্তু তাই ব'লে সে একেবারে মিথ্যা হ'য়েও যায় না। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার একান্ত রূপটি দূর হ'য়ে গিয়ে সে আর এক অর্থ ও রূপ পরিগ্রহণ করে।

হের-ফের

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ইস্কুলে যবে বিরোধ ঘটেছে কখনো কাহারো সাথে,
সেই স্কুল করিয়াছি ত্যাগ তার পরদিনই প্রাতে!
স্থান-হিসাবেই সম্ভব ছিল, ধারি নি কো কারো ধার,
অফিসে যে আজ এত লাঞ্ছনা—কি করেছি প্রতিকার?

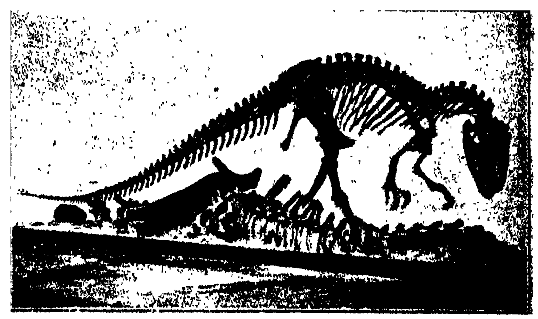
ফোসিল

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

"ফোসিল" শব্দটি ল্যাটিন কথা "Fossilis" হ'তে এসেছে। "Fossilis" কথাটি আবার "Fodere" কথা হতে। "Fodere" কথার অর্থ "খনন করে তোলা।" ফোসিল তা'হলে হ'লো এমন একটি বস্তু যা মাটী খনন করে তুলতে হয়। ফোসিল কথার সংজ্ঞা অনেকে অনেক রকম দিয়েছেন। তবে, ফোসিল বলতে সচরাচর যা বোঝায় সেটি হ'চ্ছে প্রস্তরীভূত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ বা দেহের কোন অংশ। কোন কালে সে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জীবিত ছিল। এই পৃথিবীরই জল, বায়ু, রোদ সেবন করে' এই পৃথিবীর বুকেই সে বেড়ে উঠেছিল। তার পর কোন ক্রমে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পরে মাটীর স্তরে চাপা পড়ে যায়। মাটীর স্তরের পর স্তর তার ওপর জমা হয়ে এক বিপুল ভারের সৃষ্টি করে। ওদিকে মৃতদেহের জৈব পদার্থগুলি ধীরে ধীরে মাটী শুষে নেয়। তার পরিবর্ত্তে মাটীর অজৈব পদার্থগুলি ধীরে ধীরে ওর ভেতর ঢোকে। ক্রমে ক্রমে জৈব-পদার্থের পরিবর্ত্তে অজৈব পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অন্তস্তল পূর্ণ করে ফেলে। সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ বা প্রাণিদেহের কঠিন অংশই "ফোসিলে" পরিণত হয়। প্রাণিদেহের মাংস, পেশী ও অপেক্ষাকৃত কোমল অংশগুলি গলিত হয়ে মাটী হয়ে যায়। হাড়ের ভেতরের মেদ ও মজ্জা ধীরে ধীরে বাহির হয়ে মাটীতে মিশে যায়, আর ঐ সমস্ত জৈব পদার্থের স্থানে অতিসূক্ষ্ম চূণ বা ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, পটাসিয়াম্, সিলাকা প্রভৃতি বস্তুর কণা প্রবেশ করে কালক্রমে হাড়ের ভেতরের শূন্য স্থান পূর্ণ করে ফেলে। ঐ জৈব ও অজৈব পদার্থের স্থানান্তর এত ধীরে ধীরে হয়, ও ঐ পদার্থের কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, হাড়ের বাইরের আকার প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। কাজেই রাসায়নিক পদার্থের আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও,—হাড়ের আকার ও গঠনের আদৌ কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

এক জায়গায় হয়ত এক দিন একটি বিরাট বনানী ছিল; হঠাৎ এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলে বড় বড় গাছগুলি ভূমিসাৎ হ'লো; মাটীর বিরাট গহ্বরের ভেতর তার কতক কতক ঢুকে গেল। তার পর গাছ আপনার ভারে আপনি মাটীর নীচে নামতে সুরু করল। কালক্রমে মাটী ওপর থেকে তাদের সমাধিস্থ করে ফেললে। আগ্নেয়-গিরির গলিত ধাতু-নিঃস্রাব, লাভা, ছাই, ভস্মও অনেক সময় ওপর থেকে তাদের আবৃত করে ফেলে। বহু কাল এই ভাবে তারা ভূগর্ভে শায়িত রইল, তার উপরে আবার নতুন গাছপালা জন্মে স্থানটিকে এমন করে ফেললে, যাতে পরিবেশ হ'তে সে স্থানটিকে পৃথক্ করার আর কোন উপায়ই রইল না। হঠাৎ এক দিন এক দল লোক এসে, নতুন বসতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই হোক আর খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যেই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক সেই স্থানের মাটী খুঁড়তে সুরু করল। সহসা খনন-যন্ত্র এক কঠিন জিনিষে গিয়ে ঠেকে ঝন্-ঝন্ শব্দে ঠিক্‌রে ফিরে এল। খননকারীর দৃষ্টি পড়ল, কঠিন বস্তুটির ওপর—অতি সাবধানে তার চার পাশের নরম মাটী খুঁড়ে—কঠিন পদার্থটি অতি সন্তর্পণে পরিষ্কার করা হ'ল—কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেটি একটি গাছের গুঁড়ি,—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার সমস্ত গা, কাচের মতন কঠিন পদার্থে তৈরী, আকার গঠন সাধারণ গাছের বল্কলের মত হলেও,—সাধারণ গাছের গায়ে ধারাল অস্ত্রের ঘা দিলে ঘা যেমন বসে যায়, তার গায় ঘা তেমন বসে না—অবিকল পাথরের মত অস্ত্রের ধার ভোঁতা করে দেয়, অস্ত্র ঠিকরে ফিরে আসে—সাধারণ গাছের মত ইহা অস্ত্রে কাটে না, কাচের মত ভেঙ্গে যায়।

এর ওজনও কাঠের চেয়ে বহু গুণ বেশী ভারী। এর নাম হ'লো প্রস্তরীভূত গাছ বা গাছের ফোসিল। ভূতত্ত্ববিদেরা এ স্থানে এলে গাছের অজৈব খনিজ পদার্থের সমন্বয় এবং ভূমির ওপরের স্তর হ'তে এগুলি কত নিম্নে প্রোথিত হয়েছে, তা দেখে বলে দেবেন,—কত কাল পূর্ব্বে ঐ গাছগুলি জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীর মাটীর একেবারে ওপরের স্তরে ছিল। প্রাণিদেহের কঠিন অংশও ঠিক এই ভাবেই প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদেরা এ রকম কত ফোসিলের আবিষ্কার করেন, তার ইয়ত্তা নেই। নৃতত্ত্ববিদেরা জাভায় পিথিকান্‌থ্রোপাস্ নামক মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার এবং ইহার অনুরূপ পৃথিবীর অপরাপর অংশের মানুষের সম্পূর্ণ বা আংশিক কঙ্কালের ফোসিল হ'তে আজ মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষদের আকৃতি কিরূপ ছিল তার প্রায় সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। এইরূপ পর পর ধারাবাহিক কতকগুলি ফোসিল থেকেই বোঝা যায়,—একটি ছোট জলহস্তীর মত মুখবিশিষ্ট ইয়োসিন যুগের মিরিথেরিয়াম নামক প্রাণী হ'তেই আজকের বিরাটকায় হস্তীর উদ্ভব হয়েছে; এই আদি জীবটির আদৌ কোন শুঁড় ছিল না। এইরূপ ধারাবাহিক ফোসিল-কঙ্কালের



ডিনোসর

আবিষ্কার হতেই জানা গেছে,—আজকের অশ্ব যত বড়, এর পূর্ব্ব-পুরুষরা এত বড় ছিল না। এদের আদি বংশধরটি ছিল একটি অতি ছোট জীব—তার আজকের ঘোড়ার মত খুর ছিল না,—তার পরিবর্ত্তে ছিল পাঁচটি নখবিশিষ্ট পাঁচটি আঙ্গুল, এখনকার অশ্বের দাঁতের সঙ্গেও তার দাঁতের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রাচীন ভূখণ্ডের (উত্তর আমেরিকার) নিম্ন-ইয়োসিন্-স্তরে এই জীবটি পাওয়া যায়; ইহার নাম "ইয়োহিপ্পাস্"; অশ্ব-বংশের ইহারই পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যে জীবটি আমরা পাই, তার নাম হ'লো "অরোহিপ্পাস্"; এটির ফোসিল-কঙ্কাল পাওয়া গেছে ইয়োমিংয়ের মধ্য-ইয়োসিন্-স্তরে। এর পায়ের একটি আঙ্গুল কম। এর আকারও ইওহিপ্পাস্ থেকে বড়। তার পরের পর্য্যায়ে উত্তর আমেরিকার মধ্য-ওলিগোসিন্-স্তরে, মেসোহিপ্পাস্ নামক একটি জীব পাওয়া যায়,—সেটি আকারে আরও বড়; মুখের আকৃতি অশ্বের আরও কাছাকাছি। এদের পায়ের আরও একটি আঙ্গুল কম অর্থাৎ তিনটি, এইরূপ আরও কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী অবস্থার ভেতর দিয়ে নেবরাস্কার প্লিয়োসিন্-স্তরে প্লিওহিপ্পাস্ নামক একটি জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়; এর অবয়ব, দাঁত, পায়ের খুর

অবিকল আধুনিক কালের অশ্বেরই মত। এদের আকারও আদি পূর্ব্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বড়, তবে আধুনিক অশ্বের চেয়ে কিছু ছোট। এই রকম ফোসিল কঙ্কাল হ'তেই আমরা জান্‌তে পারি,—সরীসৃপ হ'তে আধুনিক উড্ডয়নশীল পক্ষীর উদ্ভব হ'য়েছে। ব্যাভেরিয়াস্থ সোলেন্‌হোফেনের লিথোগ্রাফিক্ "চুনা-পাথর"-স্তর থেকে দুটি পাখীর মত বিচিত্র জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন, এই দুটিই হ'লো জুরাসিক যুগের জীব। এর একটির নাম "আর্‌কিওপ্‌টেরিক্স-লিথোগ্রাফিকা" ও অপরটির নাম আরকি-অর্‌-নিথেস্। এই দুটি প্রস্তরীভূত পাখীর কঙ্কাল প্রমাণ করে,—সরীসৃপ হ'তেই আধুনিক পক্ষী জাতির উদ্ভব। এদের মুখে সরীসৃপের মত দাঁতের চিহ্ন আছে; পায়ে সরীসৃপের মত নখ আছে,—ডানার ওপরে সরীসৃপের সামনের নখযুক্ত পা দুটির চিহ্ন এখনও স্পষ্ট বর্ত্তমান,—এবং এদের লাঙ্গুলের অস্থিসারি অবিকল গিরগিটীর মত। আবার লাঙ্গুল ও ডানায় পাখীর পালকের মত বড় বড় পালক আছে। কিন্তু এদের ল্যেজের পালক-সজ্জায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক পাখীর ল্যেজের পালকগুলি জাপানী পাখা বা তালপাতার মত চতুর্দ্দিকে



ম্যামথ

বিস্তৃত ভাবে ছড়ান থাকে, দীর্ঘ ল্যেজের দু'পাশে পালকগুলি নারিকেল পাতার মত সাজান। এ পাখী দুটি এক দিকে সরীসৃপ অপর দিকে আধুনিক উড্ডুক্কু পাখীর মধ্যবর্ত্তী জীব। পাশাপাশি দুটি সম্পূর্ণ দুজাতীয় জীবেরই লক্ষণ যুগপৎ এদের দেহে বর্ত্তমান রয়েছে। এই ফোসিল দু'টি হ'তে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "শীতল-রক্ত, চতুষ্পদ শল্কাবৃত, ভূচর, জলচর বা উভচর "গিরগিটী" জাতীয় জীব হ'তেই উষ্ণ-রক্ত, দ্বিপদ, পালকবিশিষ্ট উড্ডয়নশীল আধুনিক পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে।" এরূপ ফোসিল পাওয়া গেছে বলেই আজ আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'চ্ছি; এ প্রমাণ ব্যতীত, সম্পূর্ণ, বিপরীতধর্ম্মী সরীসৃপ হ'তে পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে এ কথা বললে লোকে পাগল বলেই উপহাস করত। এই পাখী দুটির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অতি সূক্ষ্ম 'লাইম-ষ্টোনে' বা চুনা পাথরে প্রোথিত থাকায় ফোসিলগুলি এত চমৎকার আছে যে, অস্থির ত কথাই নেই এদের সমস্ত পালকগুলি পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে। এই ত গেল সাধারণ ফোসিলের কথা, কিন্তু সব ফোসিলই এ রকম হয় না। ফোসিল নানা ভাবে হতে পারে।

কি কি উপায়ে ফোসিল বা জৈবদেহের সংরক্ষণ হতে পারে এবার তার আলোচনা করা যাক।

১। (ক) বরফে ও স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণ

পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চল,—যেমন সাইবেরিয়ার আর্টিক তুন্দ্রার বরফের চাংড়ের মধ্যে কিম্বা মাটির ওপর বরফ চাপা অবস্থায় অনেক জীব-জন্তুর মৃতদেহ পাওয়া যায় একেবারে অবিকৃত অবস্থায়। লেনা 'ব'-দ্বীপে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একটি জন্তুর ফোসিল পাওয়া যায়; লেলিনগ্রাড য়্যাকাডেমিতে এখন জন্তুটি সংরক্ষিত আছে। এর মাথা ও পায়ের চামড়ার লোমগুলি পর্যান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ায় বেরিং প্রণালীর ৮০০ মাইল পশ্চিমে এই রকম একটি জন্তু পাওয়া যায়। এটিকে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, জীবটি ছুটতে ছুটতে স্বাভাবিক ভূগর্ভে পড়ে যায়, তার পর বরফ চাপা পড়ে। জন্তুটির একটি সামনের পা ও পাছার হাড় ভাঙ্গা, বুকের নিচে খানিকটা জমা রক্ত পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেখা যায় এবং বদ্ধ দাঁতের ফাঁকের ভেতর তখনও অভুক্ত কতকগুলি ঘাস ছিল। জন্তুটি যখন চরছিল, সম্ভবতঃ কুকুর অথবা অপর কোন হিংস্র জন্তু তাকে তাড়া করে; বেচারী ছুটতে ছুটতে গর্ত্তে পড়ে'গিয়ে মারা যায়। তার পর বরফে ওর দেহ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে যায়। এখন এটি লেলিন্‌গ্রাড্ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

(খ) তেল, মোম, পিচ্ প্রভৃতিতে সংরক্ষণ

স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণের আর একটি উপায় আছে। এটি হলো তেল, মোম বা পিচ দ্বারা। বরডোজ্যানিতে পোল্যাণ্ডের ইস্টার্ণ গোসিস্নায় বিস্তীর্ণ তেল ও মোমের খনি আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি গণ্ডার নিখুঁত, স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং এই অঞ্চলেই,—প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত একটি ম্যামথ্‌ও আবিষ্কৃত হয়।

নিউ-মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরির গহ্বরে সমস্ত পেশী ও লোম-সমন্বিত একটি শ্লথ পাওয়া গেছে; এটি বাদুড়ের বিষ্ঠায় এইরূপ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এর দীর্ঘ লোমের হ'লদে রং পর্য্যন্ত এখনও অবিকৃত আছে। ইয়েল পি-বডি যাদুঘরে এটি সংরক্ষিত আছে। তবে এ জাতীয় সংরক্ষণকে ঠিক ফোসিল বলা যায় না।

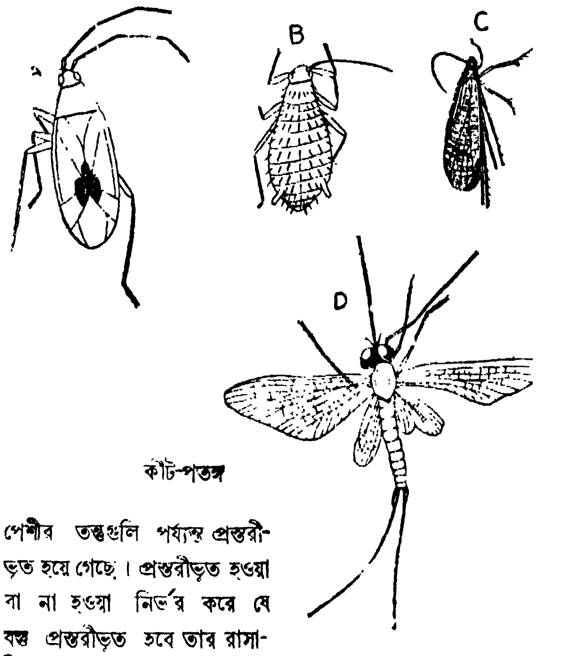
(গ) য়্যাম্বারে বা রজনে সংরক্ষণ

রজন বা য়্যাম্বারেও ছোট ছোট জীব-জন্তু এবং কীট-পতঙ্গ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। পিসিয়া সাক্‌সিনিফেরা নামক এক রকম পাইন্‌গাছের রস বা আঠা গাছ হ'তে বার হওয়ার সময় বেশ তরল থাকে, কিন্তু পরে বাতাস লেগে কঠিন হয়ে যায়। তরল অবস্থায় এই আঠাল রস ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের দেহের ভেতর অতি সহজেই প্রবেশ করে; চার পাশ হতে ওদের দেহ আবৃত করে ফেলে, তার পর কঠিন হয়ে কালক্রমে কাঁচের মত হয়ে যায়; কঠিন অবস্থায় এই আঠাকে য়্যাম্বার বলে। য়্যাম্বারে কীট-পতঙ্গের ডানা, শোঁয়া প্রভৃতির মত অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি পর্য্যন্ত একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে। ওলিগোসিন্ যুগের য়্যাম্বারে সংরক্ষিত প্রায় দু'হাজার জাতের কীট পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাকড়সা ও অপরাপর প্রাণীও অনেক পাওয়া গেছে। প্রায় এক শত বিভিন্ন জাতের দ্বি (বীজ) পত্রী অর্থাৎ উচ্চস্তরের চারা গাছ

য়্যাম্বারে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। জার্মাণীর বাল্‌টিক্ উপকূলের বাল্‌টিক-য়্যাম্বার বহু দূর পর্যান্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

২। প্রস্তরীভূত হয় কেমন করে ?

জীবজন্তু ও গাছপালা কি করে প্রস্তরে পরিণত হয় আগেই সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। পূর্ব্বেই বলেছি যে, সাধারণতঃ গাছ ও জীবজন্তুর দেহের কঠিন অংশ অর্থাৎ অস্থি, দন্ত, শম্বুকের খোল, কাঁক্‌ড়া জাতের জীবের খোলা প্রভৃতি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে,—অপেক্ষাকৃত কোমল অংশ যে একেবারেই প্রস্তরীভূত হয় না, এ কথা বলা যায় না। ব্যাস্‌ফোর্ড ডীন্ ওহিওর ক্লিভল্যাণ্ড-স্তর হ'তে একটি জন্তুর ফোসিল্ আবিষ্কার করেছেন ; তা'তে



কীট-পতঙ্গ

পেশীর তন্তুগুলি পর্য্যন্ত প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। প্রস্তরীভূত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে যে বস্তু প্রস্তরীভূত হবে তার রাসায়নিক সমন্বয় ও তার পরিবেশের মাটীর খনিজ পদার্থের ওপর। তবে, প্রস্তরীভূত হওয়ার মাত্রা সময়ের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে—সাধারণতঃ যত কাল যায়, তত রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বাড়ে ও ফোসিল্ কঠিন হ'তে থাকে। কালক্রমে ফোসিল্ এমন এক অবস্থায় এসে পড়ে, যখন এর সমস্ত অংশটি অতি কঠিন কাঁচ বা সিলিকায় (Silica) পরিণত হয় ; এ সম্বন্ধে আমেরিকার ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোসিল-তত্ত্ববিশারদ রিচার্ড স্যোয়ান্ লাল্ বলেছেন—"Petrifaction implies interstitial addition, or an extremly gradual replacement, molecule for molecule, as the original substance is lost through disintegration. The resultant fossil retains therefore, not only the external form, but the histologic characters." অতি ধীরে ধীরে অণু অণু করে। উদ্ভিদ বা জীব দেহের মৌলিক পদার্থের অন্তর্দ্ধান ও তার জায়গায় নতুন রাসায়নিক পদার্থের আগমনকে আর এক কথায় বলা হয় "হিষ্টোমেটাবেসিস্"। হিষ্টস্ অর্থে "টিস্যু" এবং "মেটাবিস" অর্থে বিনিময়। এই ভাবে যে ফোসিলের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা যেতে পারে আসল ফোসিল্। এই জাতির ফোসিলে বাহিরের ও ভেতরের আকার ও গঠন দুইই থাকে অপরিবর্ত্তিত। পরিবর্ত্তন যা হয়, সেটা কেবল পদার্থের, আকারের নয়। "Petrifaction presersves histology as well as morphology" কাজেই অতীতের জীব বা উদ্ভিদ্ দেহের নিখুঁত আকৃতির ইতিহাস আবিষ্কারের পক্ষে এ জাতীয় ফোসিল্ অমূল্য সম্পদ্। ভেতরের গঠনও অবিকৃত থাকায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের পরীক্ষার পক্ষেও এগুলি অতি মূল্যবান অতীতের সাক্ষ্য।

আদিম কালের "cycad' গাছের আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন ছিল, তা নিয়ে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা এক দিন কঠিন সমস্যায় পড়েন। তার পর বৈজ্ঞানিক ওয়াইল্যাণ্ড এই জাতির সিকেড্ গাছের প্রস্তরীভূত একটি ফোসিল পান ;—অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে ঐ ফোসিলের আভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষা করে এই অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করেন। অবশ্য এই জাতির পরীক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কাঁচের মত কঠিন পদার্থকে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করতে হ'লে অতি সন্তর্পণে ও বহু পরিশ্রমে প্রথমে ফোসিলকে খুব পাত্‌লা পাত্‌লা ফালিতে পরিণত করতে হয়, ঠিক যেমন করে হাকাক্ (যারা হীরে কাটে) মূল্যবান মণি জহরাদি কাটে ; তার পর ঐ ফালিগুলিকে ঘষে ঘষে অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর মত সেকশ্যানে পরিণত করা হয় ; অতঃপর পালিস্ করে ঐ 'সেকশ্যান'-গুলি স্বচ্ছ করা হয় ; যাতে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষার সময় ওদের ভেতর দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারে। এর পর সুরু হয় পরীক্ষা। এক এক দিক হ'তে এক এক সেট্ সেকশ্যান্ কেটে' পরীক্ষা চলে ; তার পর এই খণ্ড ইতিহাসগুলি বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের মত একত্রিত করে, পরীক্ষা-বস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠনের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়।

উদ্ভিদ্-দেহে প্রচুর পরিমাণে কঠিনজাতীয় বস্তু থাকায়, ফোসিল্ অবস্থায় ওদের দেহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হয় ; গাছের বাইরের আকার অবিকৃতই থাকে, কিন্তু প্রাণিদেহের বাইরের কোমল মাংস, পেশী প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়, আর অস্থি, দন্ত, খোলা প্রভৃতি কঠিন অংশগুলি ফোসিলে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রেই যে প্রাণিদেহের কোমলাংশ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তা স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায় না ; অনেক ক্ষেত্রে প্রাণিদেহের অতি কোমলাংশও প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ফোসিল্ দেহে "Replacing substance" হ'তে পারে iron-pyrites, iron-oxide, sulphur, malachite, magnesite, কিম্বা carbon. কাঠের 'টিস্যু' বা তন্তু, শামুকের চুণ-জাতীয় পদার্থের খোল, প্রবালের চুণ-জাতীয় পদার্থের পঞ্জর, সিলিকা (silica)-জাতীয় পদার্থের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। যে ক্ষেত্রে বাহিরের আকার অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ গঠন বদলে যায়,—সেখানে এই রকম ফোসিল্‌কে "সিউডোমর্‌ফ্" বলে। এইমাত্র বলা হ'লো,—চুণজাতীয় পদার্থ সিলিকা দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, আবার একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সিলিকা রচিত পঞ্জরবিশিষ্ট 'স্পোঞ্জ'দের ফোসিল্ অবস্থায় সিলিকা স্থানান্তরিত হয় আর তার স্থান পূরণ করে চুণ-জাতীয় পদার্থ।

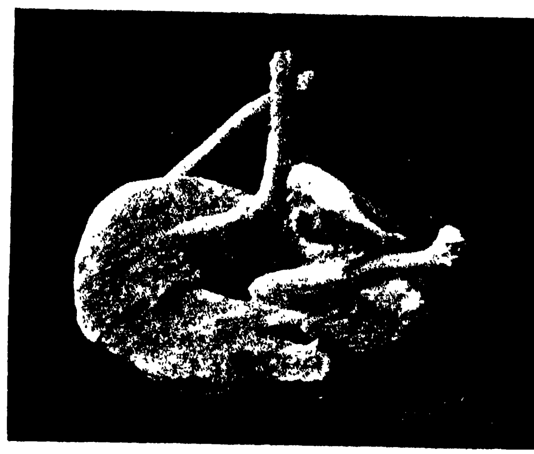
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় ফোসিলের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায় ; ফোসিলে পরিণত হওয়ার অল্প কাল পরে অনেক ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ গঠন হুবহু থাকে। কিন্তু যত কাল যায়, তত বাহিরের পদার্থের সমাবেশের জন্য তিলে তিলে আভ্যন্তরীণ আকারের একটু

একটু পরিবর্ত্তন হ'তে হ'তে ক্রমে এমন পরিবর্ত্তন হয়ে যায় যে, ফোসিলের ভেতরের আদি আকার কি রকম ছিল তা ধারণা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য আভ্যন্তরীণ গঠনে এ রকম "obscurity" আসতে অনেক সময় লাগে। কেন এ পরিবর্ত্তন আসে? রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় হয় "crystal"এর আকারে। "Crystallography"র নিয়ম-অনুসারে, ঐ সব "crystal" কালের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবস্থান পরিবর্ত্তন করে কিন্তু ওদের নিজ নিজ আকার ঠিকই থাকে। ওদের বিন্যাসে ও সংস্থানে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসার কারণেই কালক্রমে ফোসিলের আভ্যন্তরীণ গঠন বদলে যায়।

(৩) স্বাভাবিক ছাঁচ।

ফোসিল্ শিরোনামার অধীনে আর এক দল অতীতের সাক্ষী আসে। এগুলিকে বলা হয় "Natural moulds বা casts." এই জাতীয় ফোসিলে আদিবস্তুর কিছুই থাকে না, থাকার মধ্যে থাকে কেবল একটি ছাঁচ। কোন জীবজন্তুকে তার পারিপার্শ্বিক পদার্থ চতুর্দ্দিক হ'তে একেবারে ঘিরে ফেললো, তার পর পারিপার্শ্বিক পদার্থ কঠিন হয়ে গেল। তার পর "Percolating water" পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে ঢুকে ধীরে ধীরে জন্তুর দেহের গলন ঘটাতে লাগল: ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে জীবদেহের সমস্ত হাড়, মাংস, পেশী প্রভৃতি যাবতীয় জান্তব পদার্থ গলিত হয়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল; অবশেষে রইল কেবল একটি শূন্য ছাঁচ। এই কঠিন ছাঁচে সমাধিস্থ জীবদেহের ছাপটি হুবহু সংরক্ষিত রইল। পম্পিআইয়ে এই রকম অসংখ্য ফোসিল ছাঁচের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই পম্পিআইকে অনেকে বিশ্বের "Fossil city" আখ্যা দিয়েছেন। কেন পম্পিআইকে "ফোসিল-সিটি" বলা হয়, সে সম্বন্ধে একটু বলি।

৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিস্যুভিয়সের এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে সমস্ত পম্পিআই সহর ভস্মীভূত হয়ে যায়; সমস্ত নগর এক পুরু আগ্নেয়-গিরির ভস্মের আবরণের তলায় চাপা পড়ে। অতি সূক্ষ্ম ছাইয়ের কণা ঘর বাড়ীর জানালা দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্ত ঘর-দোর, আসবাবপত্র, জীব-জন্তু, মানুষ সব প্রোথিত করে ফেলে। প্রথমে কয়েক জায়গা খুঁড়ে কতকগুলি কঙ্কালের ফোসিল্ পাওয়া যায়; তার পরে ঐ মিহি ছাইয়ের ভেতরে "Natural mould"এর সন্ধান পাওয়া গেল; ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ্ ও বৈজ্ঞানিকরা এক অতি বিরাট গবেষণার ক্ষেত্র পেলেন। ভস্মের মধ্যে কেবল অজস্র ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মুখে জল। গলা প্লাষ্টার্-অব্-প্যারিস্ ঢেলে দিয়ে দিয়ে প্লাষ্টার্ কঠিন হয়ে গেলে পর চার পাশের ছাই সরিয়ে ফেলে পাওয়া যেতে লাগল কাঠের দরজা, জানালা, আসবাব-পত্র প্রভৃতির অবিকল অনুকৃতি। এই ভাবে অসংখ্য মানুষের অনুকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত প্লাষ্টার-কাষ্টে ইউরেশিয়ান্, এথিওপিয়ান্ প্রভৃতির সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় প্লাষ্টার্ ঢেলে দিয়ে পাওয়া গেছে অনেকগুলি মূর্ত্তির অনুকৃতি। তার মধ্যে কতকগুলি পুরুষ ও কতক-গুলি নারী; স্পষ্ট বোঝা যায়, কতকগুলি ইউরেশিয়ান্ ও কতকগুলি এথিওপিয়ান্। তাদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল, সেটি আগুনের ভস্মে প্রোথিত হয়ে গিয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করতে যেমন মারা যায়, তার সেই আড়ষ্ট অবয়বের ভঙ্গিমার অনুকৃতিটুকু অবধি প্লাষ্টার কাষ্টে হুবহু ফুটে উঠেছে; পায়ের আড়ষ্ট ভঙ্গিমা ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাঁ করা মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, জীবন্ত অগ্নি-সমাধিতে জীবটি কি যন্ত্রণাই না পেয়েছে! কুকুরের গলার চওড়া বগ্‌লস্‌টি পর্য্যন্ত প্লাষ্টার্ কাষ্টে উঠে' এসেছে। এরও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মেরুদণ্ডী জীবের অনেকগুলি ফোসিল ছাঁচের সন্ধান পাওয়া গেছে। কানেক্‌টিকাট্-ভ্যালীতে জলের "পারকোলেশনে" ঐ জীব-জন্তুর দেহের সমস্ত অংশ গলে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এখন কেবল হুবহু নিখুঁত ছাঁচগুলি পড়ে' আছে। 'প্লাষ্টার কাষ্ট' করে এখন ঐ সব মেরুদণ্ডী জীবের কঙ্কালের হুবহু অনুকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। কঠিন অংশ ছাড়াও, অনেক সময় কোমলাংশের ছাঁচও এই ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং প্লাষ্টার্ কাষ্ট করার মত, প্রকৃতিই নানা বস্তু দিয়ে ঐ ছাঁচ ভরিয়ে তুলে "Pseudomorph"য়ের সৃষ্টি করে। জেলিফিস্ ও শামুকের মাংসল অংশের মত অতি কোমল বস্তুরও এই রকম "Pseudomorph" আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একাধিক ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডী জীবের মাথার খোলের মধ্যে সমস্ত মস্তিষ্কের কোমল বাহিরাবরণের সম্পূর্ণ ফোসিল্ অনুকৃতি পাওয়া গেছে।



'পম্পিয়াই'এর কুকুর

এই মস্তিষ্কের ফোসিলে অতি সূক্ষ্ম গঠনগুলি পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় আছে, যথা, স্নায়ুমূল-বিভিন্ন স্নায়ুর পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গমস্থল সমস্ত সুস্পষ্ট ভাবে এই "Natural cast"এ ফুটে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে মাটীর ওপরের স্তরের ভারে এই সমস্ত ছাঁচের আকার পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হয়ে যায়।

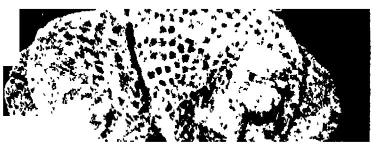
(৪) পদ-চিহ্ন ও ট্রেল্।

ফোসিল্-বিশারদরা ফোসিলের সঙ্গেই পদ-চিহ্নের বর্ণনা করলেও ফোসিল্ নামের কোন সার্থকতা এতে নেই। পূর্ব্বোক্ত "Natural moulds"এ যেমন সমস্ত জীবের ছাঁচটি সংরক্ষিত থাকে এতে তেমনি অতীতের জীব-জন্তুর কেবল পদ-চিহ্নটির ছাপ সংরক্ষিত থাকে। যে সমস্ত জীব বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের "Trail" বৃষ্টির জলের ছাপ, ঢেউয়ের ছাপ, নদীর স্রোতের পালিমাটীর ফাটল, চারণ-ভূমির অবস্থা ও অদল-বদলের অনেক তথ্য এতে মেলে। পদচিহ্ন দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, কোন জীবের পায়ের পাতা, আঙুলের সংস্থান কি রকম ছিল, তাদের দেহের ভার কি রকম ছিল

প্রভৃতি। পায়ের চাপ হ'তে দেহের ভার এবং দেহের ভার হতে দেহের আয়তন অনুমান করা অতি সহজ। কিন্তু এই যে ফোসিল্ এ হ'লো জীবের জীবিত অবস্থার জীবন্ত কালের নিদর্শন,—বাকী আর সব জীবের মৃত্যুর পরের ছাপ মাত্র। জীবিত অবস্থায় জীব কেমন গতিভঙ্গিমা করে' কেমন ভাবে চলা-ফেরা করত তার হুবহু নিদর্শন মেলে এই ধরণের ছাপে।

ফোসিল-সৃষ্টির মূলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হ'চ্ছে সমাধিস্থ হওয়া। যে সমস্ত ফোসিল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জলের স্রোতে তলিয়ে গিয়ে, জীব বা উদ্ভিদটি চাপা পড়ে সমাধিস্থ হয়। অপর নিমজ্জনের ক্ষেত্র হ'লো তেল বা পিচের খনি।

ভারী জন্তুদের বিপদ অনেক; পাঁক, খনির ধার বা ঐ জাতীয় জমির ওপর দিয়ে চলবার সময় কোন ক্রমে যদি অসাবধানে, যে ভূমি তার দেহের ভার রাখতে না পারে,—তার ওপর পা পড়েছে, কি মরেছে। দেহের ভারের জন্যে এরা হাল্কা দেহের হরিণ বা খর-গোসের মত লাফিয়ে পালাবার কোন উপায় পায় না। যত ওঠবার চেষ্টা করে ততই নিজের দেহের ভারে, আরও গভীর ভাবে যায় ডুবে।



সিকেড

নিউইয়র্ক ও এর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে চোরা-বালি ও পাঁকের মধ্যে এই কারণেই ম্যাস্টোডন নামক অতিকায় হস্তিবিশেষের এত ফোসিল পাওয়া গেছে! আয়ারল্যাণ্ডের পিটবেগে এই ভাবেই অতিকায় "Irish elk"রা নিমজ্জিত হয় এবং নিজেদের উদ্ধার করতে না পারায়, আজকের বৈজ্ঞানিকরা তাদের এত ফোসিল পায়। মিরিয়াম্ এই অঞ্চলের ফোসিল সম্বন্ধে বলেছেন,—মাটীর নীচে "asphaltic oil"য়ের পুষ্করিণীর মত আছে; মাটীর ফাটলের ভেতর দিয়ে ঐ তেল ওপরে উঠে, বাতাস ও রোদে চিট্‌চিটে হয়ে যায়; এই তেল এত আঠাল হয়ে যায় যে, এলিফাস্, ম্যাস্টোডন্ প্যারাসাইলোডন্ প্রভৃতি অতিকায় জীবও ওতে পড়লে আটকে যায়, আর নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। মাঝখানে ক্রমাগত নতুন তেল উঠে জমতে থাকে, কিন্তু ধার বেশ শক্ত হয়ে যায়। ওর ওপর ধূলো-বালি পড়ে পড়ে এমন রং ও আকার ধারণ করে যে পারিপার্শ্বিক মাটী থেকে ঐ অংশ আবিষ্কার করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যত মাঝের দিকে যাওয়া যায়, তেল তত গভীর, নরম ও আঠাল। কোন জন্তু ছুটতে ছুটতে মাটী-ভ্রমে ধুলো-বালি ঢাকা ঐ তেলের ওপর এসে পড়েও—মাটীর মত শক্ত হওয়ায় ঔষধ-পিচের পুষ্করিণী বলে জানতে পারে না,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার নিজের ভারে সে নেবে না যায়। যখন নেবে যাচ্ছে, সে সময়, হঠাৎ যদি লাফিয়ে উঠে পালাতে যায় তাতে তার বিপদ হয় আরোও বেশী; পালাবার চেষ্টা করে আরও বেশী করে ঐ ফাঁদে ঢুকে যায়। কোনক্রমে একটি নিরীহ উদ্ভিদ ভোজী একবার এই ভাবে আক্রান্ত হ'লে—অনেক মাংসাশী জীবকে সে সেখানে আকৃষ্ট করে আনে। জীবটি আটকে গিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে প্রাণ ভয়ে চিৎকার করে; ক্ষুধার্ত্ত মাংসাশী জীবেরা ভোজের লোভে সে শব্দে সেখানে ছুটে আসে। তার পর ভক্ষক ও ভক্ষ্য উভয়েই মারা পড়ে। ওপর থেকে মাটীর স্তর তাদের দেহ একেবারে ঢেকে' ফেলে। পরে ওদের দেহ ফোসিলে পরিণত হয়। কিম্বা মাটীর স্তরের ভেতর দিয়ে জল ও অম্লজল ঢুকে ঐ জীবদের দেহ গলিত করে ফেলে। অবশেষে আগের বর্ণনার মত ভূগর্ভে ওদের একটি ছাঁচ মাত্র থাকে। ঐ ছাঁচের ভেতর নানা রকম খনিজ পদার্থ ঢুকে ঢুকে ক্রমে পূর্ণ করে ঐ জন্তুদের অনুকৃতি।

ফোসিলের প্রয়োজনীয়তা যে কত ব্যাপক তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। চীনদেশের, অষ্ট্রেলিয়ার ও স্পেনের প্রাগৈতি-হাসিক যুগের ফোসিল-নর-কঙ্কাল—মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় কি মূল্যবান সম্পদই না দিয়াছে।

পদার্থবিদ্যার নিয়ম লক্ষ লক্ষ বৎসরেও পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু জীব-জগতে যুগে যুগে আসে বহু পরিবর্ত্তন। এই কারণেই মাটী এবং ভূগর্ভের খনিজ পদার্থ অপরিবর্ত্তিত থেকে বিভিন্ন যুগে জীব ও উদ্ভিদদেহে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার ফোসিল্ স্তরে স্তরে যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত রেখে আজকের ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদের গবেষণার পথ সুগম করে দিয়েছে। জীব ও উদ্ভিদ্-জগতের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের অনেক missing linkই আজ আর "missing" নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত ফোসিল্‌গুলি আজ জীব ও উদ্ভিদ-জগতের অনেক লুপ্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছে। ফোসিল না থাকলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষরা কেমন ছিল তার ইতিহাস রচনা করা কতদূর সার্থক হ'ত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঐ ফোসিল হ'তেই যথেষ্ট বোঝা যায়, আধুনিক জীবেদের পূর্ব্বপুরুষরা কেমন ছিল, তাদের আকৃতি ও গঠন হতে তাদের পরিবেশের প্রকৃতি বোঝা যায়, তার থেকে তখনকার কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, আবহাওয়া প্রভৃতির স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়। এক কথায় ফোসিল না থাকলে জীব, উদ্ভিদ এমন কি পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের ইতিহাস রচনা অতি কঠিন হত!

সৃষ্টি অবিরত ভাবে তার সৃষ্টির কাজ চালিয়ে চলেছে। এক দিকে পুরনো লয় পাচ্ছে অপর দিকে নতুনের সৃষ্টি হচ্ছে। যে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ্ এক দিন এই পৃথিবীর জল-বায়ুতেই বৃদ্ধি পেয়ে জীবন ধারণ করে এসেছে তাদের সৃষ্টি থেকে লোপ করলেও সেই সমস্ত অতীতের জীব ও উদ্ভিদের লুপ্ত অস্তিত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের দেহের কিছু কিছু অংশ পূর্ব্বোক্ত ফোসিল আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। যে জীব বা উদ্ভিদ্ একবার ফোসিলত্ব লাভ করেছে, বায়ু, রোদ, বৃষ্টি, তার আর কিছুই করতে পারে না। অনাদি কাল হতে বিশ্বের সর্ব্বত্র যে জান্তব দেহের এক বিরাট পচন বা গলন ক্রিয়া চলে আসছে ফোসিল একেবারে তার' প্রভাবের বাইরে। পৃথিবীর বুকের মধ্যে

লুকান এই অতীতের ইতিহাসের পাতাগুলি অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে,—(যথা ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত) বিকৃত হ'লেও আজ নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা তার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতীতের পৃথিবীর এক অখণ্ড ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন।

মাত্র একশ' বছর আগেও অনেক বড় বড় পণ্ডিতের ধারণা ছিল,—প্রত্যেকটি জীব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এই মতের ভিত্তির উপর "Theory of special creation" গড়ে ওঠে। কিন্তু যে দিন ফোসিলের অস্তিত্ব আবিষ্কার হ'ল সে দিন সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর পড়ল এক নতুন আলো; বৈজ্ঞানিকেরা দেখ্‌লেন, এ যুগের জীব ও উদ্ভিদের সঙ্গে সে যুগের লুপ্ত জীব ও উদ্ভিদের ফোসিলের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; শুধু তাই নয়, এই সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ্ আজ যে অবস্থায় এসে পৌছেচে তার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক "Successive



পাখীর পূর্ব্বপুরুষ

stages" পাওয়া গেছে ঐ ফোসিল-ধ্বংসাবশেষে। ক্ষুদ্র এক পাঁচ-আঙ্গুলবিশিষ্ট শিয়ালের মত আকারের তৃণভোজী জীব হ'তে আজকের অশ্বজাতির উদ্ভব—চতুষ্পদ সরীসৃপজাতি হতে আজকের উড়ুক্কু পাখীর উদ্ভব—এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে—ঐ সমস্ত জীবের আদি ও বর্ত্তমান প্রতিনিধির মধ্যবর্ত্তী ফোসিল-সাক্ষ্য পাওয়ায়। এই ফোসিল-সাক্ষ্যগুলিই প্রমাণ করে, প্রকৃতিতে হঠাৎ কোন জীবের সৃষ্টি হয়নি; ক্রমে ক্রমে তিলে তিলে একটু একটু করে বিবর্ত্তন ঘটে এক জীব হতে অপর জীবের সৃষ্টি হয়েছে এই ফোসিলের আবিষ্কারই "Theory of special creation"য়ের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং "Theory of Evolution"কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

শিল্পী—বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডোডা-ভিঞ্চি এই উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁর বহু পরে কুভিয়ে আওয়েন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। "Paleontologist"এ Paleobotanist"রা প্রস্তরীভূত জীব ও উদ্ভিদদের সম্পূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ করেছেন কোন বিশেষ জীব বা কোন বিশেষ উদ্ভিদ্ হ'তে। কোন্ কোন্ স্তরের ভেতর দিয়ে আজকে বিশেষ কোন্ জীব বা উদ্ভিদের বিকাশ ঘটেছে তা এই শ্রেণী-বিভাগ হতে আজ স্পষ্ট বোঝা যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা এক এক কালের জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অনুশীলন করেই সৃষ্টির কাল বিভাগ করেছেন। ফোসিলকে অবলম্বন করে যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তা অঙ্কশাস্ত্রের মত নির্ভুল।

একবার প্রাণিতত্ত্ববিদ্ আওয়েনের কাছে অষ্ট্রেলিয়া হতে মাটী খুঁড়ে পাওয়া এক ফুটের কিছু কম লম্বা এক টুকরা হাড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই হাড়ের টুকরাটিকে অবলম্বন করে, আওয়েন একটি জীবের সমগ্র কঙ্কাল গঠন করেন,—তার দৈর্ঘ্য প্রায় নয় ফুট। আওয়েনের সেই হাড় অবলম্বনে গড়া ঐ কঙ্কালের মত কোন জীব যে অষ্ট্রেলিয়ায় থাকতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বে কারোরই ছিল না। কাজেই ও দিকে বিশেষ কারোর নজর পড়ল না। এর কিছু কাল পরে হঠাৎ অষ্ট্রেলিয়ার মাটীর অনেক নীচু থেকে একটি পাখীর প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হল। এই পাখীর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আওয়েনের তৈরি কঙ্কালের হুবহু সাদৃশ্য দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; কাজেই বিজ্ঞানের এই শাখাটি একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের মত স্থির সত্য।

ফোসিল-সাক্ষ্য থেকেই আজকের বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির সমগ্র সৃষ্টিকে একটা অখণ্ড "progress" বলে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এবং এক জীব বা উদ্ভিদ্ হতে ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে আর একের উদ্ভব হয়, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন। মেরুদণ্ড-হীন জীবের সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমবিকাশের ফলেই উচ্চস্তরের মেরুদণ্ডী জীব এবং প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের উদ্ভব; নিম্নস্তরের অপুষ্পক বসন্তের ক্রমবিকাশেই আজকের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধময় পুষ্পপ্রসূ গাছের (Flower's plant) উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ফোসিল যে কত বড় অমূল্য সম্পদ্, সাধারণ লোকের পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।*

---

* এ প্রবন্ধ লিখতে নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহ হ'তে উপকরণ ও তথ্য নেওয়া হয়েছে :—

(১) Organic Evolution by R. S. Lull.
(২) A Text Book of Zoology by Schuchert.
(৩) Extinct Animals by E. Ray Lankester.
(৪) Evolution of Vertebrates by Newman.
(৫) Orgainc Evolution by Dendy
(৬) Historical Geology by Schuchert.
(৭) Geographical Distrbution by Wallace.
(৮) Encyclopaedia Britannica.
(৯) Fossil-man of Spain.
(১০) The Ways of Life by R S Lull.
(১১) The Evolution of Earth and Man by G. A. Baitsell.

ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত

ঘরমুখো বাঙালী হইয়াও ঘরে ফিরিবার উৎসাহ ছিল না। কিছু আহার্য্য আর এক কাপ চা সম্মুখে ধরিয়া দিয়াই গৃহিণী মস্ত বড় এক ফর্দ্দ দাখিল করেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, চারি দিক্ দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে হইবে। রেশন, ঘানির তেল, কয়লা, কেরোসিন, এ সব সংগ্রহ তো আছেই, তা' ছাড়া ডাক্তারখানা, ধোপার তাগাদা, মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, কোনো কাজ বাকী নাই। গৃহকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমার কর্ম্মতালিকাটি ভরাট করিয়া রাখেন। অকস্মাৎ মনে বৈরাগ্য চাড়া দিয়া উঠিল। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদগর! 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ' চমৎকার লিখিয়া গিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য! তুত্তোর, ঘরে ফিরিব না, লেকের ধারে একটু ঘুরিয়া বৈরাগ্যটা পাকা করিয়া আসি।

রাস্তায় ভীড় জমিয়াছে। একটা খোলা মাঠের চারি দিকে ঠাসা-ঠাসি করিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে! কলিকাতা সহরে ভীড় জমানো একটা নেশা, সুতরাং সে নেশা হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলাম, কিন্তু ঢুকিতে পারিলাম না, জনতা এমনি জমাট। চাক্ষুষ না জানিলেও বাচনিক জানিবার ইচ্ছায় এক জন বর্ষীয়সী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? কোনো স্বদেশীওয়ালা বক্তৃতা করিতেছে কি?' স্ত্রীলোকটি মুখ না ফিরাইয়াই বলিল 'না, না, বক্তিমে নয়, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই!'

সে আবার কি? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মহাভারতে পড়িয়াছি। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা রামায়ণে লেখা আছে জানি। বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপে লড়াই চলিয়াছে, সে কথা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি।



অনেক আমুদে লোক তিতির পক্ষীর লড়াই দেখিয়া আমোদ করে, এ তো সব জানা কথা, কিন্তু ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই। জোর করিয়া ভীড়ের মধ্যে মাথাটাকে ঢুকাইয়া দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চে দুই জন লোক পরস্পরের দিকে এমন করিয়া তাগ করিয়া আছে যে, মহাভারতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের চিত্র মনে পড়িয়া গেল। এক জন স্থূলোদর, বেঁটে মুখে জমকালো গোঁফদাড়ী, মাথার টাকটি চক্-চক্ করিতেছে; পরনে মালকোঁচা মারা ধুতী, গায়ে বোতাম-ছেঁড়া একটা কোট। অপরটি দীর্ঘাকার, শীর্ণ, লিক্‌লিক্ করিতেছে, গোঁফ-দাড়ী কামানো, ময়লা হাফ্-প্যাণ্ট ও গেঞ্জি পরিয়া আসরে অবতীর্ণ।

বুঝিলাম, ইহারাই ন'কড়ি, ছ'কড়ি। কিন্তু লড়াই করিতেছে কেন? দুর্য্যোধন সূচাগ্র মেদিনী দিতে গররাজী হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সীতা-হরণের ফলে রাম-রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, রূপসী নারী হেলেনের জন্য লড়াই করিয়া ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, দিগ্বিজয় করিবে বলিয়া আলেক্‌জাণ্ডার সংগ্রাম করিয়াছিল, সমস্ত বিশ্বে না কি শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু ইহাদের লড়াইয়ের হেতু কি? লক্ষ্য কে? জ্ঞাতি-শত্রুতা নয় তো?

আর একটু ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়িবে না বলিয়া সকলেই যেন পণ করিয়াছে। কাছেই এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমার মত তাঁহারও কেশে কালের পরশ লাগিয়াছে দেখিয়া ভরসা হইল। বিগলিত স্বরে বলিলাম, 'ব্যাপার কি দাদা? এরা লড়াই ক'র্‌ছে কেন?'

ভদ্রলোকটির ভদ্রতা-বোধ আছে, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই হ'চ্ছে দাদা!'

বুঝিলাম। 'কিন্তু ন'কড়ি ছ'কড়ি লইয়া লোকে খেলে এই তো জানি, খেলুড়েরা বরং লড়াই করিতে পারে, কিন্তু—'

তিনি বলিলেন, 'ঐ যে মোটা দৈত্যের মত লোকটা, ওর নাম ছ'কড়ি। ছেলেবেলায় ওর খুব ফাঁড়া ছিল ব'লে ওর মা ছ'কড়ি নিয়ে ওর মাসীর কাছে ওকে বেচে দিয়েছিল, আর ওই যে রোগা-পট্‌কা প্যাঁকাটির মত লোকটা, ওর মায়ের না কি ছেলের উপর রাহুর দৃষ্টি ছিল, তাই ওর মা ন'কড়ি নিয়ে ওর পিসীর কাছে ওকে বেচে দিয়েছিল। তাই নিয়েই লড়াই।

সব যেন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কবে কার মা পাঁজি দেখিয়া কয় কড়ি দিয়া কার কাছে বিক্রয় করিয়াছিল, তাই লইয়া এখন লড়াই কেন? বর্ত্তমান সময়ে লড়াই করিতে হয়, খাদ্য লইয়া কর, বস্ত্র লইয়া কর, ঔষধ লইয়া কর, বাড়ীভাড়া লইয়া মহালড়াই করিলেও আপত্তি নাই, কিন্তু—'ও দাদা!' দাদা ভ্রূকুটি করিলেন। "ডিস্‌টার্ব করছেন কেন মশাই! 'দাদা' ডাক মশাই'তে পরিণত হইতে দেখিয়া আর ভরসা রহিল না। গোঁফ ওঠে নাই, অথবা কামাইয়া ফেলিয়াছে, এমনি একটা চ্যাংড়া ছেলেকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে আমার ব্যগ্র-দৃষ্টি দেখিয়াই চট্ করিয়া বলিল, 'দেখছেন না, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই হচ্ছে।'

'সে তো দেখছি, কিন্তু লড়াই করছে কেন?'

আমার অজ্ঞতা দেখিয়া সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, 'কেন আবার কি? লড়াই, মানে লড়াই, যুদ্ধ, সংগ্রাম, **fight** সোজা কথা বোঝেন না, কি আশ্চর্য্য! একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া, মুখ দিয়া এখনো দুধের গন্ধ ছাড়ে, সে-ও শিক্ষকের মত চোখ রাঙ্গাইয়া লইল। 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ!'

সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, 'লড়াই শব্দের অর্থ জানি, কিন্তু লড়াইয়ের কারণ কি?'

'তা-ও জানেন না?'···ছেলেটা কৃপা-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াইয়ের হেতু না জানার মত মূর্খতা বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। তার দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম! আমার অবস্থা দেখিয়া তাহার করুণা জন্মিল। 'ওই যে হোঁৎকা মোটা লোকটা, সে ভীড় ঠেলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইল, "ওই যে, যার ইয়া গোঁফ, আর মস্ত টাক্, ওকে বেচেছে ছ'কড়ি দিয়ে, আর ঐ যে প্যাঁকাটির মত লোকটা দেখ্‌ছেন তো? ঐ যার পেটে পিঠে লেগে গেছে, গাল দুটো কে যেন চড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে, ওকে বেচেছে ন'কড়ি দিয়ে। বলুন তো এতে রাগ না হয় কার?" কার রাগ হয় জানি না, কিন্তু রাগ না হইয়া আমার হাসিই পাইল, গম্ভীর হইয়া বলিলাম 'সে তো বটেই!'

উৎসাহিত হইয়া ছেলেটি বলিল, 'তেবে বাবে ওই কোমর-ভাঙ্গা ন'কড়ি, আর হারাই উচিত। ওই তো ছেলের ছিরি, সারা শরীরে এক তোলা মাংস নেই, ওর দাম আবার ন'কড়ি! ছোঃ—ওর পিসীরও তেমনি আক্কেল! কিন্‌তে গেছে ন'কড়ি দিয়ে। ওকে এক কড়ি দিয়ে কিন্‌লে ঠিক হত।'

বিচারকের মত তার স্বর গুরু-গম্ভীর! ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'তা' সে তো অনেক দিন হ'যে গেছে, তাই নিয়ে এখন লড়াই ক'রে লাভ কি?'

'বাঃ'—ছেলেটি রুখিয়া উঠিল 'আপনি তো আচ্ছা লোক দেখি। বিংশ শতাব্দীতে জন্মেও আপনার কোনো জ্ঞান নেই! শক্তির পরীক্ষা হবে না? দেখছেন না, শক্তির পরীক্ষায় সারা পৃথিবীতে লড়াই চ'লছে! আছেন বেশ! বলি, ঘরে বুঝি চাল-কয়লা মজুত আছে? যোগ্যতার মাপ-কাঠি দিয়েই জগৎ চলছে, বলে, যুদ্ধ কেন? বোগাস্—'

দেখিলাম, আর একটা লড়াই স্বরু হওয়া বিচিত্র নয়। বয়স হইয়াছে, শক্তি পরীক্ষায় জয়ের আশা নাই। বৈরাগ্য ফিকা হইয়া আসিয়াছিল, 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ!' গৃহের দিকে পা বাড়াইলাম।

সাধনার কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

অনন্ত কর্ম্মের আধার এই বিশ্বজগতে কর্ম্মতৎপর জীবের কর্ম্ম-প্রবাহে শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হওয়াই সাধনা। ইহাতে ত্রিবিধ বস্তু বর্ত্তমান—সাধক, সাধ্য ও সাধনা। সাধন-কার্য্যাভ্যাসকারীই সাধক, সাধনার লক্ষ্য বস্তুর নাম সাধ্য ও সাধ্য বস্তু লাভের জন্য আয়াস বা যত্নই সাধনা। সাধনার প্রথম কার্য্য আত্মসমর্পণ। উপদেষ্টা বা সত্যপথ-প্রদর্শকের নিকট আত্মনিবেদনই কর্ম্মারম্ভের আদি সোপান! আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী সাধকের কর্ম্মারম্ভ হেতু আশ্রয় অনুসন্ধান বা কর্ম্মপথ-লাভের আশায় পথপ্রদর্শক বা উপদেষ্টার আশ্রয় লাভ হেতু মানসিক ব্যস্ততাই সাধক-হৃদয়ের প্রথম উন্মেষ। সেই ব্যস্ততার বর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "দীপ্তশিরা জলরাশিমিব শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ উপসৃত্য তম্ অনুসরতি।" মাথায় আগুন ধরিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপণ হেতু জল প্রাপ্তির আশায় জীব যে ব্যস্ততা সহকারে ধাবমান হয়, সাধক সাধনার প্রারম্ভে উপদেষ্টা বা গুরু অনুসন্ধানে আপন হৃদয়ে সেই ব্যাকুলতা অনুভব করে। ব্যাকুলতার পরিমাপ অনুসারে গুরু লাভ ঘটিয়া থাকে। 'গুরু' এই কথার সাধারণ অর্থ "ভারী।" সাধক নিজেকে লঘু মনে না করিলে গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। নিজেকে ভারী মনে করিয়া থাকিলে তাহার জ্ঞান-পিপাসার সার্থকতা কোথায়? সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের অভাববোধই জ্ঞানপ্রদাতার সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে।

গুরু শব্দের তাৎপর্য্যার্থ—'গ'কারস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ 'র'কারস্ত নিরোধকঃ। সাধক-হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশকারী জ্ঞানালোক-প্রদাতাই গুরু। 'সাধক'-হৃদয়ের সমস্ত মোহান্ধকার দূর করিয়া যিনি জ্ঞানালোক দ্বারা আশ্রিত সাধকের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করেন, তিনিই 'গুরু'। 'গুরু' উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক, কর্ম্মাভ্যাসের সন্ধানদাতা, সাধকের চিত্ত-দৌর্ব্বল্যনিবারক ও সর্ব্ব কর্ম্মে শক্তিপ্রদাতা ও প্রযোক্তা।

সাধারণের নিকট এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, "গুরু মিলে না" কিন্তু আসল কথা, গুরুলাভের অধিকার প্রাপ্তি হয় নাই। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারীর কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা"। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত পাপ দূর হইলে সম্পূর্ণ নির্ম্মলান্তঃকরণ-বিশিষ্ট চতুর্ব্বিধ সাধনক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হয়। কেবলমাত্র আলস্য আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাকিয়া 'গুরু না মিলিবার' দোষ দিলে হয় না। গুরুলাভ করিবার যাহাতে অধিকার আসে তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। যে কায না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলে। কোন বিশেষ বস্তু প্রাপ্তি হেতু অনুষ্ঠিত কর্ম্ম 'নৈমিত্তিক'। অপরাধ প্রশমন হেতু কর্ম্ম 'প্রায়শ্চিত্ত'। চতুর্ব্বিধ সাধন যথা (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, (২) ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, (৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি (৪) মুমুক্ষুত্ব। (১) নিত্যানিত্য বিবেক, যথা—'নিত্য' ও 'অনিত্য' এই উভয়বিধ বস্তুর মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান বিচার। 'নিত্য' বলিতে "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যম্"। 'ব্রহ্ম'ই একমাত্র নিত্য বস্তু, তাহা ছাড়া সমস্তই অনিত্য। 'নিত্য' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনশীল; যে বস্তুর কাল ও অবস্থাভেদে কোন পরিবর্ত্তন নাই, যাহা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাব তাহাই নিত্য। আর কাল ও অবস্থাভেদে যাহার পরিবর্ত্তন হয় তাহাই অনিত্য। যাহা জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও নানা প্রকার বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে তাহাই অনিত্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট সমুদয় পদার্থের কাল ও অবস্থা-ভেদে পরিবর্ত্তন হয়। জীবের কৌমার, যৌবন, জরা ও দেহান্তরপ্রাপ্তিরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অপরিবর্ত্তনশীল অনাদ্যনন্তকালস্থায়ী বিকার-শূন্য বস্তুই নিত্য। (২) 'ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ'—ইহকালে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ও অমুত্র অর্থাৎ পরকালে বা জন্মান্তরে সর্ব্ববিধ ভোগ-প্রাপ্তির বিষয়ে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা। (৩) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় প্রকারকে ষট্ সম্পত্তি বলে। অন্তরিন্দ্রিয়কে অন্য বিষয় হইতে সরাইয়া যথার্থ বস্তুতে নিয়োগ করাকে শম বলে। মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এইগুলিই অন্তরিন্দ্রিয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে বলপ্রয়োগের দ্বারা অনিত্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্য বস্তুর দিকে ধাবমান করার নাম দম। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বিবিধ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহারা উভয়েই পঞ্চবিধ—বাক্, পাণি, পাদ

পায়ু ও উপস্থ। এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শ্রোত্র, ত্বক্‌, অক্ষি, রসনা ও ঘ্রাণ ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রভাব যাহাতে এ দেহ সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তোমার দেহ ও মনে বিঘ্ন উৎপন্ন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান বাধাস্বরূপ না হয়, তজ্জন্য ঐ নৈসর্গিক প্রভাবগুলি সহ্য করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বিষয়প্রাপ্তি বিষয়ে অপ্রবৃত্তির নাম উপরতি। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসেয় নাম শ্রদ্ধা। ধ্যেয় বস্তুতে বৃত্তিশূন্য ভাবে চিত্তের স্থিরতাকে সমাধান বলে। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে পুরুষার্থ বলে, ইহাদের মধ্যে 'মোক্ষ'কে 'পরম-পুরুষার্থ' বলা হয়। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ লাভের জন্য মানুষ কত না পরিশ্রম করে। কিন্তু মোক্ষ হইতেছে পরম-পুরুষার্থ। ইহা লাভ করিতে কত জন্ম-জন্মান্তর পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। এই পরম-পুরুষার্থ লাভের জন্য প্রকৃত ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরিত হইয়া জীবকে তৎপ্রাপ্তি পথে ধাবমান করিবার জন্য ব্যাকুলতায় পরিণত হইলে তবেই জীব পরমার্থ লাভ করিবার অধিকারী হয়। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তিকেই পরম-পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলে। এতগুলি গুণসম্পন্ন হইবার পর সাধকের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের সন্ধান করিবার অধিকার আসে। সাধারণ জগতে মানুষ অর্থলাভের জন্য সদা ব্যস্ত থাকে; এই অর্থের মূলে ধর্ম্ম থাকা প্রয়োজন। সত্য পথে সত্য আশ্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে তবে তাহাকে পুরুষার্থ বলিয়া ধরা যায়। সেই কারণ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের আদিতে ধর্ম্ম কথার প্রয়োগ আছে। ধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত যে অর্থ সেই ধর্ম্ম বা সত্যপথার্জ্জিত অর্থের দ্বারা যে কাম বা বাসনার নিবৃত্তি হয় তাহাই পুরুষার্থপদ বাচ্য, অপরবিধ কাম পুরুষার্থ নহে। যে কামনার ভোগের পর অবসান হয় না এবং যাহা অগ্নিশিখার ঘৃতাহুতি প্রয়োগে বৃদ্ধির ন্যায় বাড়িয়াই চলে, সে কামনাকে পুরুষার্থ বলা যায় না। গন্তব্য বা লক্ষ্য স্থানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পথভ্রান্ত পথিকের অবিরাম পথভ্রমণের ন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ প্রয়োগে কামনাভোগের অবসান হয় না। অর্থলাভের জন্য পরিশ্রম করিয়া বিফলতা ঘটিলে পুনঃ পুনঃ উদ্যমের প্রয়োজন হয় এবং সাধারণ জীব অভ্যাস বশতঃ সংসারদশায় কত দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাটাইয়া থাকে। আর যে অর্থের পূর্ব্বে একটি পরমশব্দ যুক্ত আছে সেই পরমার্থ লাভের জন্য সাধককে বিফলতা দূরে ঠেলিয়া পুনঃ পুনঃ এ দেহে ও দেহান্তরে পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। জন্ম ও মৃত্যু দেহ ও দেহান্তরের ব্যবধান মাত্র। বহু জন্ম ও জন্মান্তর লইয়া জীবাত্মার জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। 'গুরু পাওয়া যায় না' এই উক্তির সাধারণ সংসার দশায় যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহারই প্রতিবাদ ও নিরসন করিতে গিয়া সাধকের অধিকারিত্ব ও সাধনার আদ্যপাদের কিছু আভাস দেওয়া হইল।

আমরা সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি। জন্মগ্রহণের পর হইতে আমরা সমস্তই দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। 'মা' বোল হইতে আরম্ভ করিয়া যত বলা ও চলা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া—যত বিদ্যা ও শিক্ষা সমস্ত বিষয়ই আমরা শিক্ষকের আশ্রয় হইতে শিক্ষা করি। জন্মলাভের পর হইতে এমন কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাপার নাই যাহা আমরা গুরু ভিন্ন অন্যত্র লাভ করিতে শিখিয়াছি। অতএব যখন সমস্ত ব্যাপারেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, তখন আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধন প্রয়োগে গুরুর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। সাধনবিষয়ে আদ্য অনুষ্ঠান গুরুকরণ অর্থাৎ 'গুরু' নির্দ্দিষ্ট করিয়া তন্নিয়োজিত কর্ম্মে আত্মনিয়োগ বা আত্মনিবেদন। "গুরোরাজ্ঞা গুরুঃ স্মৃতঃ" গুরুর আজ্ঞানুসারে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত নিখুঁত ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যাওয়ার নামই সাধনা।

একটি কথা বিশ্বাস। অনেকে বলে থাকেন, '—হঠাৎ না দেখে, শুনে বা বুঝে কি করে বিশ্বাস করা যায়?' "গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা" পূর্ব্বে বলা হয়েছে বটে কিন্তু প্রথমেই বিশ্বাস কি করিয়া হয়?' আমরা সংসারদশায় সমস্ত অনুষ্ঠানের আদিতে বিশ্বাসনীতির আশ্রয় করিয়া চলি। প্রত্যেক কর্ম্মে সফলতা লাভ করিতে হইলে অন্ধবিশ্বাস আশ্রয় করিয়াই চলিতে হয়, সেইরূপ কোন অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তন্নিয়োজিত কর্ম্মে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সফলতা লাভ হইলে তখন আর বিশ্বাস থাকে না। তখন থাকে অপরোক্ষানুভূতি। প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে বিশ্বাস আশ্রয় না করিয়া উপায় নাই। অতএব ইহ সংসারে সমস্ত বিষয় লাভের জন্য বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়; সেইরূপ সাধনমার্গে গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইয়া উপায় নাই।

কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াই আমরা ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কর্ম্মারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রাপ্তি হয় না। ভোজন করিলেই যে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় তাহা নয়। সুখাদ্য ভোজনের পর মনের তুষ্টিসাধন হয় বটে কিন্তু বহু পরে যথাকালে পুষ্টির অনুভূতি হয়। সাধন ব্যাপারেও তাহাই। 'সদ্‌গুরু' লাভ বহু ভাগ্যের কথা। সময় হইলে সাধকের হৃদয়াকাশে ভগবৎকৃপারূপ সুবাতাস বহিবার প্রয়োজন হইলে, সাধকের ব্যাকুলতার পরিপক্কতা লাভ হইলে ভগবান গুরুরূপে আপনি আসিয়া উপস্থিত হন। 'গুরু' পাওয়া যায় না বলিয়া নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় সমর্থ শিষ্য অর্জ্জুনকে ফলপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া কালক্ষেপ করিবার আশঙ্কা হইতে নিবারণ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্যই তোমার অধিকার, কখনও ফলের দিকে লক্ষ্য করিও না, তাহাতে তোমার অধিকার নাই। পাছে অর্জ্জুন ফলের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া আপন একাগ্রতা ও নিষ্ঠা হারাইয়া ফেলেন তাই শ্রীগুরু ভগবান বলিতেছেন, তোমার ফলের দিকে লক্ষ্য করিবার কোন অধিকার নাই। কার্য্য করিতে করিতে তাহার সফলতা আপনি আসিবে, তাহার জন্য পৃথক্ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কৃষিকার্য্যে প্রযত্ন করিলেই যে ইচ্ছানুযায়ী ফল পাওয়া যায়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কর্ষণ করিলে ক্ষেত্রের এই উপকার হয় যে, বর্ষণ হইলে ভাল শস্য হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ষণ করিলেই যে বর্ষণ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তার পর ধান্য চারা হইলেই যে শস্য ফলিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? সময়ে বর্ষণ চাই এবং শস্যের ক্ষীর উৎপাদন হেতু শিশির-বিন্দুপাত আবশ্যক। তদভাবে শস্যের ক্ষীর উৎপন্ন হইবে না। তেমনই সাধকের সাধনা জীবনে ভগবৎকৃপারূপ বর্ষণ ও শিশির-বিন্দু পাত প্রয়োজন। শীতের মধ্যে পুষ্পবৃক্ষে

কদাচ ফুল ফুটিয়া থাকে; শীতের প্রকোপে বৃক্ষাদি ম্রিয়মাণ হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু শীতের অবসানে যেমন বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হয়, অমনি সমস্ত পুষ্পবৃক্ষ ও লতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে নবপল্লব ও কুসুমনিচয় প্রকাশ করে, শিশু-হৃদয় যুবতী-যৌবনের মর্ম্ম বুঝে না, কিন্তু যেমন ঐ শিশুর যৌবনোদ্গম হয় তখনই তাহার হৃদয়ে যুবতী-যৌবনের আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, পৃথক্ ভাবে কাহারও অপেক্ষা করে না। সাধক-শিশুর হৃদয়ে যখন সাধন-যৌবন উপস্থিত হয়, তখন তাহার হৃদয় সদ্বস্তুমিলন আকাঙ্ক্ষায় নাচিয়া উঠে, সাধক-হৃদয়ে পরম স্বামী সমাগমের অভিসার ঘটনের জন্য দূতের অন্বেষণ করিয়া থাকে। এই দৌত্যকার্য্যের নায়ক 'শ্রীগুরু-কৃপা'। এই কৃপাই 'অঘটনঘটন-পটীয়সী' গুরুকৃপাই সত্য এবং সেই গুরু শক্তিই সাধক-হৃদয় মুকুলিত করিয়া পরমাত্মজ্ঞান বা ইষ্টদর্শনরূপে পর্য্যবসিত হয়।

অনেকে বলেন, সংসারে কর্ম্মনিরত মন বড় চঞ্চল, সর্ব্বদাই অনিত্য বস্তুতে প্রধাবিত হয়—এই মন লইয়া কি করা যায়? এরূপ ভাবিয়া নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রপন্ন শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কালে তাহার সমাধান করিয়াছেন। গুড়াকেশ অর্জ্জুন সাধনার অনুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। মন বড় চঞ্চল, এ মন লইয়া কিরূপে শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করা সম্ভব। তাই তিনি যুক্তকরে শ্রীভগবানের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

অর্জ্জুন বলিতেছেন,—হে ভগবন্ গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যথা-বিহিত আদেশ করিতেছেন। কিন্তু মন এরূপ চঞ্চল ও এমন প্রবল ভাবে দৃঢ়তার সহিত পীড়া দান করে যে, তাহাকে নিজের বশে আনিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করা অতি কঠিন। বায়ুকে যেমন হস্তমুষ্টি-মধ্যে আনিয়া বাধ্য করা অতীব কঠিন, ইহাও তদ্রূপ। দয়াময়! ইহার প্রতিকারের উপায় কি, তাহা জানিবার জন্য ভবদীয় সমীপে প্রার্থনা করিতেছি। পরম-কারুণিক শ্রীভগবান তাহার উপায় বলিতেছেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অর্জ্জুন শঙ্কিত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভরসা দিতেছেন তোমার ভয় কি? তুমি যে মহাবাহু অর্থাৎ বীরপুরুষ, তুমি মনের সহিত যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। মন যে চঞ্চল ও অতি কষ্টে নিগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয়ই। সমর্থ সাধক অর্জ্জুনের ধারণা যথার্থ। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণের সুন্দর উপায় আছে। আবার উপায় বলিবার সময় কুন্তীপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি বিশুদ্ধহৃদয়া নিষ্ঠাবতী সংযম ও সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা সম্রাজ্ঞী কুন্তীদেবীর পুত্র। তুমি এক দিকে অভ্যাস ও অপর দিকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চঞ্চল মনকে নিজ বশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। এক দিনে হইবে না; মনকে নিত্য বস্তুর প্রতি ধাবমান করিতে যত্ন করিতে থাকিবে ও অনিত্য বস্তুর দিক্ হইতে নিরুদ্ধন করিতে থাকিবে। ভগবান বলিতেছেন, অভ্যাস কর, যত্ন করিতে থাক। মনকে বশে আনয়ন এত সহজসাধ্য নয়। ইচ্ছা করিলাম আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া গেলাম আর মন স্থির হইয়া গেল তাহা নয়, তাহা কখনও কোন কালে সম্ভব হয় নাই। আদি-গুরু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মত বীর ভক্তকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বৈরাগ্য সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে এক দিন সে সৌভাগ্যোদয় হইবে, মন বশে আসিবে বা লয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মার তুরীয়াবস্থা আনয়ন করিয়া দিবে, তখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "তত্র স্থিতৌ যত্নো অভ্যাসঃ" তত্র সেই ব্রহ্ম-বস্তুতে বৃত্তিশূন্য মনের অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীগুরূপদেশ মত শৃঙ্খলা সহকারে যত্ন বা চেষ্টা বা পুনঃপুনঃ অভ্যাস। আর "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" দৃষ্টে অর্থাৎ ইহলোকে মানবদৃষ্টির গোচরীভূত এবং অনুশ্রবিক অর্থাৎ পরলোকস্থিত বিষয়সমূহে বিতৃষ্ণা যখন স্থায়ী ও বশীভূতা হইবে তখনই তাহাকে বৈরাগ্য বলে। মাত্র ক্ষণ কালের জন্য কোন বিষয়-সঙ্গ লাভের জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেই বৈরাগ্য হইল না। ইহকালে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ আছে এবং পরলোকে কর্ম্মানুযায়ী যে ভোগ্য বিষয় আছে, এই উভয়বিধ বিষয় হইতে মনকে একেবারে দূরে আনিয়া নিত্যবস্তুতে সংলগ্ন করিতে হইবে। সেই লগ্নতা অল্পস্থায়িত্বের জন্য নয়, তাহা চিরস্থায়ী হইতে হইবে। প্রকৃত সন্ন্যাস বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা আসে। গুরুপদিষ্ট পথে নিষ্ঠা সহকারে অনন্যচিত্ত ভাবে অকৈতব হৃদয়ে চলিতে চলিতে পরমস্বামী পরমাত্মসাক্ষাৎকার বা প্রতিনিয়ত-ভগবৎ-প্রেম-স্মৃত্যুপলব্ধি হইতে থাকিবে। ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন—

"যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

হে ভগবন্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা, আমার প্রতি এই দয়া কর, আমি স্ত্রী বা পুরুষ ভাবে যে দেহেই অবস্থান করি সেইখানে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি প্রদান কর, ইহার সরলার্থ এই—একান্তানুরক্তিকেই ভক্তি বলে। যে দেহেই আমার আত্মা অবস্থান করুক সেখানে কোন ক্ষণের জন্য তোমার প্রতি অনুরক্তির বিরাম না ঘটে। যদি নিজ দেহ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ ভুলিয়া আমার আত্মচৈতন্যে তোমার পরম চৈতন্য শক্তির স্মৃতি লইয়া অবস্থান করে, তখন দেহাদির অবস্থানের প্রভাব কোথায়? এই অবিরাম স্মৃতির কথা বলিতে গিয়া বেদান্তের শ্রীভাষ্যকার শ্রীরামানুজাচার্য্য "অবিরাম তৈলধারাবৎ" ভগবৎ-স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জলের ধারার বিরাম সম্ভব কিন্তু তৈল-ধারার বিরাম নাই। এই অবিরাম পরমাত্ম-স্মৃতিই সাধকের প্রাপ্তব্য বিষয়। বিশ্ববিশ্রুত ভক্ত প্রহ্লাদ ইষ্ট দর্শনান্তে প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভগবান্, প্রভু, মদেকসদয়, যদি আমার প্রতি কৃপাই হয় এই কৃপা হউক যেন সাধারণ বিষয়ী ব্যক্তি যেমন বিষয়ে অনুরক্ত থাকে হে দয়াময়! তুমি আমার বিষয় হও, আর তোমায় লইয়া আমি বিষয়ী হইয়া থাকি।' তাই স্তোত্রে আছে—

ন জানামি ভক্তিং ন চ দেব মুক্তিং
চরণপঙ্কজে দেহি মে শরণম্।
শরণাগত-দুর্দ্দমকামহরম্
প্রণমামি পরাপরানন্দধরম্।

আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে ভারতের সহযোগ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধে ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বহুবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত বহু সংখ্যক লোকের কর্ম্ম-বিচ্যুতি ঘটিবে, বেকার-সমস্যা প্রবল হইবে এবং তাহার ফলে সকল দেশেই জনসমষ্টির ক্রয়শক্তি (Purchasing power) বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সুতরাং সর্ব্ব দেশেই অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটিবে। এই নিমিত্ত যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক যুধ্যমান এবং যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ অতি সুনিশ্চিত যুদ্ধোত্তর বিপর্য্যয়ের প্রশমন ও প্রতিকার কল্পে প্রতিবিধানমূলক বিধি-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও সংগঠন-সমন্বয়ন পরিকল্পনার ইহাই মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য। যেমন যুধ্যমান তেমনি যুদ্ধে নির্লিপ্ত, এই উভয় শ্রেণীর দেশের পক্ষেই এইরূপ পরিকল্পনা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের ক্রম-বর্দ্ধমান সুযোগ-সুবিধার ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে এরূপ ঘনিষ্ঠ অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে যে, কোন একটি দেশে অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিলে, তাহার প্রতিক্রিয়া ঐ দেশের সহিত কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ অন্যান্য দেশের অর্থনীতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া প্রায়শঃ সমগ্র জগতের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটায়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে এই বিপ্লব তীব্র ও তীক্ষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বিগত মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বহুগুণে ব্যাপক এবং ভীষণ ধ্বংস ও ধর্ষণমূলক; সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে বহুল পরিমাণ অধিক গুণে এবং তাহার প্রতিকার কল্পে এখন হইতেই বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া না রাখিলে যুদ্ধান্তে সহসা-সমুপস্থিত পরিস্থিতিকে শাসনের বশীভূত করিতে পারা যাইবে না।

সংগ্রামের অবসানেই শান্তি ও শৃঙ্খলার যথাযোগ্য বিধান করিতে না পারিলে, অপরিসীম মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতির পশ্চাতে আসিবে প্রচণ্ড বেকার-সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিয়া অনতিবিলম্বে অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ পূর্ব্বক স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে রাখিয়া মিত্রশক্তি নায়কগণ সম্প্রতি কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হট্‌স্প্রিঙের খাদ্য বিষয়ক বৈঠক এবং ব্রেটন উডসের অর্থ সম্বন্ধীয় বৈঠক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উভয়েরই আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। মিত্রশক্তি সংহতির কর্তৃত্বাধীনে আহূত এই সকল আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ব্যতীত গত নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের সন্নিকট 'রাই' সহরে মার্কিণের চারিটি প্রধান কারবার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠক বসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টা; এবং নিখিল জগতের ইতিহাসে ইহা প্রথম। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সমিতির আমেরিকান শাখা, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সমিতি, শিল্পি-কারিকর সম্প্রদায়ের জাতীয় সভা এবং জাতীয় বৈদেশিক ব্যবসায়-সংসদ—এই চারিটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানই এই বৈঠকের উদ্যোক্তা ও আহ্বায়ক। ইহারাই মার্কিণ রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয়। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধ-পূর্ব্বে সক্রিয় ছিল এবং ইহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল প্যারীনগরে। ভারতীয় জাতীয় সমিতির মারফতে ভারতবর্ষও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সমিতির সভ্য ছিল। এই ভারতীয় জাতীয় সমিতির কার্য্যালয় ভারতীয় বাণিজ্য শিল্প-সমিতি সমবায়ের কার্য্যালয়ে অবস্থিত এবং ইহা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সমিতির ভারতীয় শাখারূপে পরিগণিত।

আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলি স্বাধীন দেশ সমূহের মন্ত্রণাগার; এই সকল বৈঠকে ভারতের যোগদান মুখ্যতঃ অনুগ্রহমূলক। কারণ, ভারত স্বাধীন দেশ নহে। ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় বৃটিশ শাসন শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ভারত সরকারের অভিমত অনুযায়ী এবং তাঁহারা সর্ব্বত্রই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের স্বাধীন ভাবে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। ব্রেটন্ উডসের আর্থিক বৈঠকে ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এই বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে যখন যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমিতির সাধারণ নীতি-নির্দ্ধারক শাখা-সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আলোচনা হয়, তখন ঐ সমিতির বে-সরকারী সদস্যগণ দৃঢ়রূপে প্রস্তাব করেন যে, সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সরকারী প্রতিনিধিদের সহিত কয়েক জন বে-সরকারী সদস্য প্রেরিত হওয়া অতীব আবশ্যক। অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইস্‌ম্যান এই অতি সমীচীন প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া তাহাতে সম্মত হয়েন। ফলে, অর্থ-সচিবের নায়কত্বাধীনে সরকারী সদস্যদের সহিত দুই জন স্বাধীনচেতা বে-সরকারী প্রতিনিধিও প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মণ্ট্রীলের সাধারণতন্ত্র বিমান-পরিচালন বৈঠকে এবং নিউইয়র্কের আন্তর্জ্জাতিক অ-সামরিক বিমান-পরিচালন বৈঠকে এই নীতি রক্ষিত হয় নাই। এই দুই বৈঠকেরই প্রতিনিধি ছিলেন খাস সরকারী।

মার্কিণের চারিটি বে-সরকারী বাণিজ্য-সমিতি কর্ত্তৃক আহূত আন্তর্জ্জাতিক কারকারবার বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত যখন ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হয়, তখন শ্বেতাঙ্গ বণিক্-সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সহিত ভারতীয় বণিক্ ও শিল্পি-সমিতি সমবায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে স্থির হয়। ভারতীয় সঙ্ঘ ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলেন যে, ভারতীয় বণিক্ ও শিল্পি-সমিতি সমবায়ই ভারতের জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের একমাত্র প্রতিভূ-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহিত তাহাদের জাতীয় স্বার্থ কখনই একীভূত হইতে পারে না। মার্কিণের বাণিজ্য সমিতি চতুষ্টয় এই আপত্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া তাহাতেই সম্মত হয়েন। ফলে, কার-কারবার বৈঠকে ভারতের জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিনিধিগণ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বৈঠকের অনুষ্ঠানে ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারী প্রচেষ্টা; কিন্তু ইহাতে আলোচ্য বিষয়গুলির গুরুত্বে ইহা কোন-অংশে সম্মিলিত-জাতি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক আহূত কোন সরকারী আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। অবশ্য ইহাতে পরিগৃহীত প্রস্তাবগুলি কোন রাষ্ট্রসরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে; ইহার সুপারিশগুলি উপদেশ ও অনুমোদনমূলক মাত্র। বস্তুতঃ পক্ষে, সম্মিলিত-জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক আহূত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলিতে পরিগৃহীত প্রস্তাব সকলও কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে; পরন্তু, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের শাসন-পরিষদ্ অথবা সচিবমণ্ডলীর অনুমোদন-সাপেক্ষ। কিন্তু সর্ব্ব স্বাধীন দেশেই শিল্পী ও বণিক্

সম্প্রদায়ের প্রভাব রাষ্ট্রনিয়ন্তৃবর্গের উপর অপরিসীম। যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রভাব যুক্তরাজ্যের শিল্পী বণিক্‌দিগের প্রভাব অপেক্ষাও অধিকতর প্রবল হইবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের যে চারিটি শিল্পি-বণিক্ প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠক আহ্বান করিয়াছিল, তাহারা স্বরাষ্ট্রে অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী। ভারতের পক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র বিধান। আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে; এবং আমাদের শিল্প-বাণিজ্য-ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের বশীভূত নহে। আমরা পরাধীন জাতি; সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রের উপর কোন প্রতিপত্তি নাই। অথচ এই আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে যে সকল সমস্যার সমাধান আলোচিত হইয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র শিল্পি-বণিক্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে নহে; রাষ্ট্রেরও তাহাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কারণ, এই বৈঠকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা অর্থনৈতিক এবং তাহার সহিত সমগ্র দেশের সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের প্রকৃষ্ট স্বার্থ বিজড়িত।

নিখিল জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের কার-কারবারে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের এই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল, (১) বিভিন্ন জাতির বাণিজ্য নীতি; (২) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কীয় সম্বন্ধ; (৩) আন্তর্জ্জাতিক অর্থ বিনিয়োগের নিয়মনীতি এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে বিনিযুক্ত মূলধনের রক্ষণাবেক্ষণ; (৪) নূতন নূতন ক্ষেত্রে শিল্প প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন; (৫) স্থলপথে, সমুদ্রবক্ষে ও বিমান-মার্গে যাত্রী ও মাল পরিবহনের সুবন্দোবস্ত; (৬) কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের আন্তর্জ্জাতিক যোগান; (৭) কার-কারবারে বে-সরকারী উদ্যম (Private enterprise); এবং (৮) প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করিয়া দ্রব্য মূল্যের উচ্চহার রক্ষা করিবার নিমিত্ত একাধিক কারবার প্রতিষ্ঠানের চক্রান্ত (Cartels)। যেমন আমাদের দেশে তেমনই অন্যান্য দেশে এই আটটি বিষয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে এই আটটি বিষয় লইয়াই বিরোধ চলিতেছে; এবং এই বিরোধই বর্ত্তমান যুদ্ধের মূলীভূত কারণ। যুদ্ধান্তে যাহাতে এই বিরোধের অবসান ঘটে, এবং প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন জাতির সহিত নির্ব্বিবাদে কার-কারবার চালাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন। এই নিমিত্ত বায়ান্নটি জাতি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন জাতিই নিখিল জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, স্বতন্ত্র জাতি সমূহের আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠানে পরাধীন ভারতেরও যোগদান করিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্ববিধ বৈঠকে জগতের অন্যান্য বিভিন্ন জাতিকে ভারতের অভাব-অভিযোগের সহিত পরিচিত করা যেমন প্রয়োজন, ঐ সকল বৈঠক হইতে বিভিন্ন জাতির গতিবিধি আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ভারতের অভিজ্ঞতা লাভও তেমনই প্রয়োজন। ব্রেটন্ উড্‌সের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই বটে; কিন্তু জগতের অন্যান্য স্বাধীন শক্তিশালী জাতিগণ, ভারতীয় বে-সরকারী প্রতিনিধিদ্বয়ের মারফতে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছেন। ইহাও আমাদের পক্ষে কম লাভ নহে। আমরা কাহারও সাহায্যপ্রার্থী নহি, কিন্তু জগতের বিভিন্ন জাতির সহিত কার-কারবার পরিচালনার নিমিত্ত তাহাদের সহানুভূতি ও সহৃদয় সহযোগ আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-নীতির বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিব। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী-বাণিজ্য চালাইয়াছিলাম—এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের আমদানী বাণিজ্যের মূল্য দিয়াও যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জমাখরচে আমাদের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক বিলাতের প্রাপ্য (Home charges) মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। এখন এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্ত-মানে যদি আমরা একটি নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত ভাবে কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী করিতে না পারি, তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি তদ্রূপ তীব্র লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ, কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ এই মত পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি বিশেষতঃ যুক্তরাজ্য তাহাদের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার নিমিত্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনকে অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের বে-সরকারী প্রতিনিধি স্যার সম্মুখান চেটীকে কোন দেশের উৎপাদন-সম্পদের সদ্ব্যবহারই যে সেই দেশের আর্থিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই মূল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভারতের ন্যায় দেশে আভ্যন্তরীণ সাম্য এবং স্বভাবজাত সম্পদ সদ্ব্যবহারের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা সংরক্ষণ তদ্রূপ প্রয়োজন, যেমন যুক্তরাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন তাহার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি। উভয়ের উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, গত পাঁচ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অভিঘাতে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির অর্থাৎ বণিক্ পণ্যের প্রকার এবং তাহাদের বিক্রয়-কেন্দ্রের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যে পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইতাম, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম কাঁচা মাল আমরা রপ্তানী করি। ইহার প্রধানতঃ তিনটি কারণ। প্রথম, আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হেতু আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক কাঁচা মাল কলকারখানায় ব্যবহার করিতেছি; দ্বিতীয়, যুদ্ধের নিমিত্ত সমুদ্র-পারের বহু দেশের সহিত আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়, মাল পাঠাইবার নিমিত্ত মাল-চালানী-জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন-বিপত্তি। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হেতু আমরা পূর্ব্বে যে সকল ও যে পরিমাণ পাকা মাল আমদানী করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাকা মাল আমদানী করি এবং শুধু তাহাই নহে, আমরা এখন অনেক শিল্প-জাত পাকা মাল বিদেশে রপ্তানী করি। যুদ্ধান্তে আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্প সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। যুদ্ধপূর্ব্বে যে যে দেশে আমাদের বিবিধ পণ্য চালান যাইত, এখন তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের সম্পর্ক-বিচ্যুত হইয়া দুই একটি নূতন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতি বিশেষ বিবেচ্য।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে দুইটি বিষয় আমাদের বিশেষ

প্রণিধানযোগ্য। আটলাণ্টিক সনদের চতুর্থ সর্ত্ত এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উভয়ের পরস্পর সাহায্যের যে চুক্তি তাহার সপ্তম সর্ত্ত—যে সকল দেশ মার্কিণের ইজারা-ঋণ বন্দোবস্তে আবদ্ধ, এই দুইটি সর্ত্তের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই দুইটি সর্ত্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিণের মতি-গতির পরিচয় ইহাতে প্রকট। এই দুইটি সর্ত্তের একটি উদ্দেশ্য হইতেছে, শুল্ক প্রশমন অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত সর্ব্ব দেশে বিদেশী পণ্যের প্রতি নির্দ্ধারিত শুল্কের হ্রাস। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, নিখিল জগতের কাঁচা মালের উপর সমস্ত জাতির অবাধ ও সমান অধিকার। ভারতের স্থায় প্রচুর কাঁচা মালের উৎপাদক, অথচ শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে এই দুইটি উদ্দেশ্যের কোনটিই কল্যাণজনক নহে। ভারত অবশ্য ইজারা-ঋণ বন্দোবস্তের পক্ষভুক্ত। কিন্তু মার্কিণের সহিত আমাদের কোন অন্যোন্য-সাপেক্ষ চুক্তি নাই, কারণ, ভারত উক্ত চুক্তির সপ্তম সর্ত্তের শুল্ক-প্রশমন-নীতি মানিয়া লইতে সমর্থ নহে। যুদ্ধান্তে এই গুরুতর সমস্যা ভারতের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইবে। ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর এই সমস্যা ব্যতীত আমাদের আর একটি গুরুতর বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিপক্ষীয় অথবা বহুপক্ষীয় কিরূপ চুক্তি ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে।

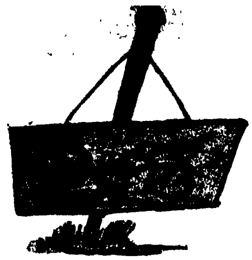
এই প্রসঙ্গে আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ভবিষ্যৎ বিশেষ বিবেচ্য। যদি আমরা আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিতে না পারি, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের সহিত বহুপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই সংস্থিতির উদ্ধারের নিমিত্ত আমাদিগকে কিছু কালের নিমিত্ত যুক্তরাজ্যের সহিত দুই পক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কারণ, সে দিনও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহকারী মিঃ এটলি বৃটিশ অর্থ-সচিব স্যার জন এণ্ডারসনের ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছেন যে, মার্কিণের সহিত অন্যোন্যসাপেক্ষ চুক্তিতে যে প্রকার সর্ত্তই থাকুক না কেন, বৃটেন কখনও সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন-নীতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহের সহিত অপেক্ষাকৃত কম শুল্কে আদান-প্রদান নীতি পরিহার করিবেন না। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলও কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি অতি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ-ও এই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছেন ; কারণ, বৃটেন চলতি ব্যবস্থাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আটলাণ্টিক সনদ ও পরস্পরের সাহায্যকারী চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, যুক্তরাজ্যের স্থায় প্রভূত পরিমাণে শিল্পে সমুন্নত এবং শক্তিশালী জাতির পক্ষে যদি যুদ্ধান্তে তাহার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কল্পে সাম্রাজ্যাভ্যন্তরে কম শুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতের স্থায় শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে রক্ষণ-শুল্কের অপরিহার্য্য প্রয়োজন পরিহার একান্ত অসম্ভব। ভারত সরকার বিশেষরূপে অনুসন্ধান এবং বিবেচনা না করিয়া কোন রক্ষণ-শুল্কের প্রবর্ত্তন করেন না, কারণ, ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র জাতীয় শাসনতন্ত্র নহে এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে শাসন শক্তির স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন প্রথা সর্ব্বথা ভারতের অনুকূল নহে ; কারণ, আমাদের রপ্তানী পণ্য এরূপ বিবিধ প্রকারের যে, সেগুলির রপ্তানী কেবলমাত্র সাম্রাজ্যান্তর্গত অথবা কোন বিশিষ্ট দেশে নিবদ্ধ রাখা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং যুদ্ধান্তে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে যে, যুদ্ধকালে আমরা যে সকল দেশের সহিত রপ্তানী-বাণিজ্যের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছি, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস না পায়। এই প্রকার পক্ষপাত অথবা অনুগ্রহ-মূলক শুল্ক-প্রশমন প্রথায় ভারত সম্মত হইতে পারে—যদি তাহার কোন বিশিষ্ট স্বার্থের হানি না ঘটে এবং তাহার নিজস্ব প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোন বিঘ্ন না ঘটাইয়া এরূপ পক্ষপাত অথবা অনুগ্রহ তাহার স্বাধীন স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমাদের আত্মস্বার্থ সংরক্ষণার্থ আমরা যে সকল অনিষ্ট নিবারক বিধি-বিধান দাবী করি, আমাদের আত্ম-স্বার্থ-পরায়ণ প্রতিপক্ষগণ তাহার অপব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আমরা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষী। আমাদের অনুন্নত অবস্থার নিমিত্ত যে আত্ম-স্বার্থ-সংরক্ষণ-মূলক ব্যবস্থার অতীব প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের দাবী আমাদের অনুন্নত অবস্থার নিমিত্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং যুক্তিসম্মত। আমাদের এই দাবী সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে ; পরন্তু আমাদের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দ্বারা জন-সাধারণের অতি হীন জীবনযাত্রার ধারা উন্নতি সাধন হেতু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-নীতির স্থায় বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মানের মুদ্রা প্রকরণের মধ্যে একটি স্থিতিশীল বিনিময় সম্পর্কের প্রশ্নও বিশেষ প্রবল। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে এ বিষয়ে ভারত তাহার সমস্যার কথা বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধান হয়—রাজনৈতিক স্বার্থের কুটিল চক্রে। তাহাতে বিভিন্ন জাতির বিশেষতঃ অনুন্নত দেশের প্রতি কদাচ সুবিচার হয় না। শক্তিমান্ জাতিগুলির স্বার্থসংঘর্ষে তাহাদের স্থায্য অধিকার বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের পরিচালক-মণ্ডলীতে ভারত স্থায়ী আসন পায় নাই। চীন ভারত অপেক্ষা শিল্পে সমৃদ্ধ নহে, তথাপি চীন একটি স্থায়ী আসন পাইয়াছে ; এবং মার্কিণের প্রভাবে ল্যাটিন আমেরিকা পাইয়াছে দুইটি আসন। যেহেতু, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন, সেই হেতু ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র আসন সম্ভবপর নহে। আমরা কোন স্থায্য অধিকার দাবী করিলেও আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মতে আমাদের স্থায়সঙ্গত অর্থ নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিদুষ্ট হয় ; কিন্তু সমস্ত স্বাধীন দেশে এবং প্রত্যেক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে অর্থ নৈতিক নিয়মনীতি রাজনীতির কূট কৌশলে নিরূপিত ও পরিচালিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত না হইলেই আমাদের অর্থনীতির অপব্যাখ্যা হয়। এই হেতু আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির স্থায়সঙ্গত ভাবে আমাদের স্বার্থের অনুকূলে আদায়ের প্রয়াসও নিন্দিত। আমাদের ডলার-সংস্থিতির সমষ্টি কত এবং তাহা কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের স্বার্থের অনুকূল স্থায্য অধিকার রক্ষা করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিনিময় ও সমন্বয়-ভাণ্ডারে যোগদান আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

শিল্পোপযোগী অর্থ-সম্পদ্ ভারতের প্রচুর, কিন্তু ভারতবাসী চির-দরিদ্র। শিল্প-বাণিজ্যের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের

জন প্রতি অতি-স্বল্প আয় এবং জনসাধারণের অতি হীন ও হেয় জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিয়া আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মূলধনেরও প্রয়োজন! সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিনিময়ের ন্যায় আন্তর্জ্জাতিক মূলধন বিনিয়োগের বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের যোগদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অধিকতর প্রবল। যুদ্ধান্তে বৃটেনকে রপ্তানী-বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করিতে হইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে অন্যান্য দেশে অর্থ-বিনিয়োগ সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধান্তে মার্কিনের প্রচুর অর্থ থাকিবে বিভিন্ন দেশকে ঋণ দিবার এবং বিভিন্ন দেশে শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের নিমিত্ত। আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নায়ক স্যার চুণীলাল মেটার অনুমানে এই অর্থের পরিমাণ ২০০০ মিলিয়ন ডলার। ভারতের বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক অবস্থা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অনুকূল। আমাদের দেশে কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, অথচ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ভারতে প্রাপণীয় নহে। সুতরাং বিদেশে ঋণ গ্রহণ যুক্তি-সঙ্গত—যদি ঋণের সহিত কূট রাজনৈতিক প্রভাব এবং দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক স্বার্থের প্রভুত্ব আমদানী না হয়। আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-শালী শিল্পি-ব্যবসায়ীর সর্ব্বগ্রাসী চক্রান্ত যে কত মারাত্মক, তাহা আমরা জানি। আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে আমাদের জাতীয় প্রতিনিধিগণ দৃঢ় ভাবে এইরূপ চক্রান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শিল্পে বাণিজ্যে সমুন্নত শক্তিশালী জাতিগুলি চিরদিন শিল্পবাণিজ্যে অনুন্নত দেশ হইতে স্বল্পমূল্যে প্রচুর কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া সেই সব দেশেই তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া স্বদেশে শিল্পপুষ্ট করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি লভে করে। এই নিমিত্ত নিখিল জগতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাঁচা মালের বণ্টন প্রশ্নে আমাদের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। ভারত প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল উৎপাদন করে এবং তাহার প্রকৃষ্টাংশ রপ্তানী করে। ইহাতে আমাদের শিল্প প্রসার-প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। এ সম্বন্ধেও আমাদের প্রতিনিধিগণ 'রাই' বৈঠকে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পে সমুন্নত শক্তিমান্ জাতিগুলির শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ ভারতের ন্যায় কাঁচা মাল-সম্পদে সমৃদ্ধ, অথচ শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির প্রাথমিক উৎপন্ন দ্রব্যজাতের প্রতি। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর (অধুনা লর্ড টেম্পল উড্) নিখিল জগতের কাঁচা মাল বণ্টন সম্পর্কে একটি আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন —প্রধানতঃ হিটলার ও মুসোলিনীকে খুশী করিবার নিমিত্ত। আটলাণ্টিক সনদেও এইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং শক্তিমান্ জাতিসমূহের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিগণ তাহাদের দুরভিসন্ধি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকেই জানেন না যে, গত দুই তিন বৎসর হইতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের যুগ্ম শাসনে কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য একটি সংযুক্ত-মণ্ডলী লিপ্ত রহিয়াছে। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনৈতিক শাসন বিভাগ তাহার বিভিন্ন শাখার মারফতে দুষ্প্রাপ্য ধাতু এবং কূট প্রয়োজনীয় (strategic) কাঁচা মালের সন্ধানে লিপ্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক আন্তর্জ্জাতিক বিধি-নিষেধে যোগদান করিতে হইবে; নতুবা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সুদূর-পরাহত হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ কাঁচা মাল আমাদের দেশে সম্ভাব্য ও প্রচলিত শিল্পে সদ্ব্যবহার করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, মাত্র তাহাই আমরা হস্তান্তরিত করিব! তাহার অধিক নহে।

জলপথে স্থলপথে ও শূন্যমার্গে যাত্রী ও মাল পরিবহনার্থ যানবাহনের যথাযোগ্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় আমাদের স্বদেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। জাহাজ ও বিমান পরি-চালনে আমরা শৈশবাবস্থায় আছি। এই দুইটি বিষয়ে পরদেশী-প্রাধান্য আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অনুকূল নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সর্ব্বশেষে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও কুটিল প্রশ্ন হইতেছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে বে-সরকারী প্রচেষ্টা। এই বিষয়ে ভারতের শিল্পী বণিক্ সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে মতদ্বৈধের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। প্রায় সর্ব্ব স্বাধীন দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বিদ্যমান। ভারতের ন্যায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত ও অসহায় দেশে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সাহায্য সহায়তা এবং সহযোগিতা ব্যতীত আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। বে-সরকারী প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্যপুষ্ট না হইলে প্রবল বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কখনই সফলকাম হইতে পারে না। আমাদের দেশে এই প্রতিযোগিতা অতি ভীষণ। আমরা পরাধীন জাতি! রাষ্ট্রশক্তির স্বতন্ত্র স্বার্থ, ঐ শক্তির মিত্রশক্তি-সঙ্ঘের স্বার্থ এবং অন্যান্য পরদেশী শক্তির প্রবল প্রচেষ্টা—এই ত্রিশক্তির চাপে আমরা চিরখিন্ন। সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার সমঞ্জস সম্মিলনই আমাদের উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতিগণ তাঁহাদের সম্প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় বিবৃতিতে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বে-সরকারী কার-কারবার বৈঠক অবশ্য নিরঙ্কুশ বে-সরকারী প্রচেষ্টার পক্ষপাতী।

"অহঙ্কারকে, ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।"—রবীন্দ্রনাথ



[চাঞ্চল্যকর উপন্যাস]

শ্রীফাল্গুনি রায়

বিকেলে চা খাচ্ছি। প্রায় চারটে হবে। এমন সময় এক জন বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল। স্যর মোহনচাঁদ অগ্রওয়াল লিখেছেন। "অবিলম্বে আসুন, বিশেষ প্রয়োজন।" রামানুজের দিকে চাইলুম। রামানুজ বললে—"যাওয়া উচিত। কি থেকে কি হয় বলা যায় না। তবে সেখানে যাবার আগে পুলিশে একটা খবর দিতে হবে।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের কাছে গেলুম। তাঁর সঙ্গে রামানুজের অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিল। অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আগমনের কারণ জিগ্যেস্ করলেন। রামানুজ ডক্টর বিজয় গুপ্তের উদ্ধারের কাহিনী সবিশেষ বর্ণনা করে বললে—"এখন আমরা স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী যাচ্ছি। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়ত' সেখানে কোন দুর্ঘটনা হবার চান্স রয়েছে। আপনি কয়েক জন পুলিশ-কর্মচারীদের ছদ্মবেশে বাড়ীর চারিধারে মোতায়েন করে দেবেন।"

কমিশনার সাহেব বললেন—"বেশ, তাই হবে।"

আমরা স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী গেলুম। তিনি ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালেন। দু'-একটা অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদসূচক কথার পরই তিনি বললেন—"মিষ্টার বসু, কাল আপনারা ডক্টর গুপ্তর বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আমার কাছে এসেছিলেন। শুনলুম, অল্পক্ষণ পরেই দ্বিতীয় বার এসে আমার টাইপিষ্ট সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তার পর সে আপনাদের সঙ্গে চলে যায়। এখন পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে বললে—"জানি অনেক কিছু, কিন্তু সব কথা আপনাকে বলে কোন লাভ হবে না। কেবল এইটুকু জানলেই বুঝতে পারবেন, সে কেন ফিরে আসেনি। তার আসল নাম র‍্যাচেল ফেরিস। জাতে ইহুদী। ক'লকাতায় এক গুরুতর অপরাধের জন্য পুলিশ তাকে সন্দেহ করে। কিন্তু প্রমাণ অভাবে বেঁচে যায়। এখন সে নাম ভাঁড়িয়ে আপনার কাছে চাকরী করছে।"

সবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে স্যর মোহনচাঁদ বললেন—"তাই না কি! কি ভয়ানক কথা! গেছে ভালই হয়েছে।"

"আপনি কি কেবল এই জন্যই ডেকেছিলেন?" রামানুজ প্রশ্ন করলে।

স্যর মোহনচাঁদ নিম্ন স্বরে বললেন—"না। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর এবং গোপনীয়। কাল রাত্রে আমার ল্যাবরেটরীতে চোর ঢুকেছিল। কয়েকটি অতি দরকারী কাগজপত্র চুরি হয়েছে। এক জন সাধারণ চোর সেই কাগজ-পত্র নিয়ে কি করবে? কোন অর্থই বুঝতে পারবে না।"

"হয়ত' যে বুঝতে পারে এমন লোকের কাছে বিক্রী করবে।"

"না, মিষ্টার বসু, তাও সম্ভবপর নয়। সবই সংক্ষিপ্ত নোট। কিছুই পুরোপুরি লেখা ছিল না। আমি ছাড়া অন্য কেউ তার অর্থ বুঝতে পারবে না। তবে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে। সেফের মধ্যে অতি মূল্যবান সামগ্রী আছে। বোধ হয় সেইটাই চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু তারা সেফ খুলতে পারেনি। তাই বোধ হয় আমায় ক্ষতিগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে যা সামনে পেয়েছে তাই নিয়ে চলে গেছে।"

"হতে পারে। তবে একটা চিন্তা করবার বিষয় রয়েছে। কাল থেকে মিস ফেরিস ফেরার। কালই আপনার ল্যাবরেটরীতে চুরি হয়েছে। হয়ত' এর মধ্যে আপনার লেডি-টাইপিষ্টের কোন হাত আছে। ডক্টর গুপ্তর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে তার বিলক্ষণ হাত ছিল। আচ্ছা, আপনার এখানে সে কত দিন কাজ করছে?"

"তা প্রায় মাস দু'য়েক হবে। মেয়েটির ব্যবহারে আমি কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাইনি।"

"তা না পেতে পারেন, কিন্তু আমি যা বলছি সবই সত্য। বাহিরের চোর আপনার সেফে কি আছে জানবে কি করে? ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ লোক চুরি করতে আসে না। আপনার সেফে কি আছে? টাকা কড়ি? গহনা?"

মৃদু হাস্য সহকারে স্যর মোহনচাঁদ বললেন—"তার চেয়ে অনেক দামী জিনিষ। রেডিয়াম আর ইরিডিয়াম। জগতে অতি দুর্লভ। আমার নয়। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এক্সপেরিমেণ্টের জন্য ধার করে এনেছি। আমার কাছে যা আছে অত্যন্ত অল্প, কিন্তু তার দাম এক কোটি টাকারও অধিক! সুতরাং আমার দায়িত্ব বুঝতে পারছেন।"

"আর কত দিন এই রেডিয়াম আপনার কাছে থাকবে?"

"মাত্র দু'দিন। আমার এক্সপেরিমেণ্ট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—"সাবিত্রীও নিশ্চয়ই এ কথা জানত। তাই সে কালই চুরি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কাল পারেনি। সুতরাং আবার এ চেষ্টা হবে। হয়ত' আজকেই। আপনি আমার সম্বন্ধে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবেন না। কিছু ভাববেন না। আমি কথা দিচ্ছি, রেডিয়াম চুরি যাবে না। আপনার বাড়ীতে ঢোকবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই?"

স্যর মোহনচাঁদ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—"তা আছে। কিন্তু কেন?"

"কারণ, তাদের লোক নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীর ওপর নজর রেখেছে। আমাদের তারা বেরিয়ে যেতে দেখবে। আবার রাত্রে যখন ফিরব তখনও দেখতে পাবে। আমি তাদের অলক্ষ্যে আপনার বাড়ীতে ঢুকতে চাই। নইলে সব প্ল্যান ফেঁসে যাবে।"

স্যর মোহনচাঁদ বললেন—"ঠিক বলেছেন, এটা আমার মাথায় এতক্ষণ আসেনি। আমার বাড়ীর পিছনের রাস্তার নাম ফ্ল্যাগষ্টাফ রোড। সেই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই একটা গলি পাবেন। সে গলিটা বাড়ীর পিছনের বাগান পর্য্যন্ত এসেছে। এই নিন চাবী, খিড়কী দরজায় তালা লাগান আছে। এই চাবী দিয়ে খুলে বাড়ীর ভেতর ঢুকবেন।"

রামানুজ নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। বললে—"ধন্যবাদ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যখন কাজের ভার নিয়েছি চেষ্টার ত্রুটি করব না। তবে কাউকে যেন কিছু বলবেন না।"

স্যর মোহনচাঁদ বললেন—"না, না, তাকি কখনও বলি।"

আমরা বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে বসলুম। রামানুজ দেখলুম খুবই খুসী। পথে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—"এখন কি করবে?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"হোটেল থেকে জিনিষপত্তর নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে ক'লকাতাগামী ট্রেণে চেপে বসব।"

"ক'লকাতা ফিরে যাবে। আর স্যর মোহনচাঁদের রেডিয়াম?"

হো হো করে হেসে রামানুজ বললে—"ক'লকাতাগামী ট্রেণে চেপে বসব বলেছি, ক'লকাতায় ফিরে যাব তো বলিনি। একটু ভেবে দেখ স্বান্তনি। এটা নিশ্চিত যে, শত্রুপক্ষ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তাদের বিশ্বাস করাতে হবে যে আমরা দিল্লী ত্যাগ করছি। কি করে তা সম্ভব? যদি আমরা ক'লকাতাগামী ট্রেণে উঠি এবং দিল্লী ত্যাগ করি তবেই।"

"তার মানেই তো দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

"তা যাচ্ছি বটে, কিন্তু বেশী দূর নয়, শাহাদরা পর্য্যন্ত। সত্য করে দিল্লী ত্যাগ করছি নিজের চোখে না দেখলে তারা বিশ্বাস করবে কেন?"

"কিন্তু শাহাদরায় তো ট্রেণ থামবে না?" আপত্তি করলুম।

"পয়সা দিলে সবই হয়।" রামানুজ উত্তর দিলে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—"ড্রাইভারকে অথবা গার্ডকে ঘুষ দিলে মেল যেখানে ইচ্ছা দাঁড় করানো যায় এই প্রথম শুনলুম। আগে জানতুম না।"

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করে রামানুজ হেসে বললে—"বন্ধু, ট্রেণের প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টে একটা করে শেকল থাকে বোধ হয় লক্ষ্য করেছ। শেকলটি টানলেই ট্রেণ দাঁড়িয়ে যায়।"

"অযথা শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিতে হয়।

"তা দেওয়া যাবে!"

"তুমি শেকল টানবে?"

"না। কোন্ কম্পার্টমেণ্টে শেকল টানা হয়েছে জানা বিশেষ শক্ত নয়। অন্য এক জন লোক অন্য এক কম্পার্টমেণ্ট থেকে শেকল টানবে। গোলমাল হবে। ট্রেণ দাঁড়াবে। সব লোক-জন ছুটে আসবে। সেই ফাঁকে তুমি আর আমি সরে পড়ব।"

"মাল-পত্তর?"

"সোজা ক'লকাতা চলে যাবে। সেই লোকের সঙ্গে।"

"লোকটি কে?"

"দিল্লী পুলিশের এক জন কর্ম্মচারী। সে বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। সাধারণ বেশে যাবে, যাবার জন্য তাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দেব।"

অতঃপর আমার প্ল্যান মত সকল কার্য্যই করলুম। শাহাদরার কাছে ট্রেণ দাঁড়াল। গণ্ডগোল হল। আমরাও সরে পড়লুম। রামানুজের হাতে একটি মাত্র ছোট স্যুটকেশ। টঙ্গা করে দিল্লীতে ফিরে এলুম। একটা ছোট ধর্ম্মশালায় উঠলুম। আধ ঘণ্টাটাক পরে ধর্ম্মশালা থেকে বার হ'ল দু'জন গুণ্ডা। বলা বাহুল্য যে, স্যুটকেশে ছদ্মবেশের সরঞ্জাম ছিল এবং গুণ্ডা দু'জন আর কেউ নয়—আমি আর রামানুজ।

রাত্রি বারোটা নাগাদ আমরা স্যর মোহনচাঁদের বাড়ীর কাছে উপস্থিত হলুম। চারি দিক্ নিস্তব্ধ। চাপা-স্বরে রামানুজ বললে—"এখনও তারা আসেনি দেখছি। আজ রাত্রে নাও আসতে পারে। হয়ত' কাল রাত্রে হানা দেবে। যাই হোক, ভেতরে যাওয়া যাক।"

অতি সন্তর্পণে বাগানের দরজা খুলে আমরা বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। এক পা এক পা করে নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছি হঠাৎ দশ-বারো জন লোক আমাদের আক্রমণ করলে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দেখতে দেখতে আমাদের মুখ-হাত-পা সব বেঁধে ফেললে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাড়ীর বাইরে না নিয়ে গিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল। তার পর এক জন লোক একটা দরজা খুললে। আমাদের একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। সেই ঘরটি স্যর মোহনচাঁদের ল্যাবরেটরী। আলোয় দেখলুম, প্রত্যেকের মুখ মুখোসে আবৃত। ঘরের এক প্রান্তে বিরাট সেফ। যে সেফে স্যর মোহনচাঁদ রেডিয়াম ছিল বলেছিলেন। এক জন চাবী দিয়ে সেফের দরজা খুললে। আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এরা কি আমাদের সেফের মধ্যে বন্ধ করে দম আটকে মেরে ফেলবে। কি ভীষণ মৃত্যু! ভয়ে আমার কপালে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু না। সেফের এক প্রান্তে চাপ দিতেই দেয়াল সরে গিয়ে সিঁড়ি দেখা দিল। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়ে মাটীর নীচের এক কুঠুরীতে নীত হলুম। ঘরে উজ্জ্বল আলোক, সেই আলোকে দেখলুম, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মনুষ্য মূর্ত্তি। কালো আলখাল্লায় দেহ আবৃত, কালো মুখোসে মুখ আচ্ছাদিত, এমন কি হাত পর্য্যন্ত কালো দস্তানায় ঢাকা। কেবল মুখোসের দু'টি ছিদ্র থেকে দু'টো চোখ জ্বল্-জ্বল্ করছে। সে কি ভীষণ চাউনি, বাঘের চেয়েও হিংস্র! আর তার চেয়ে ভয়ঙ্কর সেই ব্যক্তির হাতের কালো পিস্তল।

ইঙ্গিত করা মাত্রই আমাদের সেইখানে নামিয়ে রেখে অপর সকলে প্রস্থান করল। আমরা একলা রইলুম সেই ভীষণদর্শন রহস্যময় কৃষ্ণ-বেশধারীর সামনে। আন্দাজে বুঝলুম, ইনিই হলেন ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা—যাঁর বুদ্ধিতে ষড়যন্ত্রকারীরা পরিচালিত হচ্ছে। লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমাদের মুখের বাঁধন খুলে দিলে। হাত-পা অবশ্য বাঁধাই রইল। শ্লেষ কণ্ঠে বললে—""রামানুজ বাবু যে! কি সৌভাগ্য যে বিখ্যাত সখের ডিটেকটিভ রামানুজ বাবু আজ আমার অতিথি। আপনার সাহস ও বুদ্ধির আমি তারিফ করি, কিন্তু হঠকারিতা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। জানেন সেক্সপীয়ার বলেছেন—'ডিসক্রীশন ইজ দি বেটার পার্ট অব ভ্যালর।' আমি আপনাকে সাবধান করে পাঠিয়েছিলুম আপনি তা উপেক্ষা করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে আপনার বুদ্ধি-শক্তির পরখ করতে চেয়েছিলেন—তার এই পরিণাম!"

রামানুজ কোন উত্তর দিলে না। একদৃষ্টে মুখোসধারী ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে রইল। কি যেন সন্ধান করছে।

লোকটা বলে চলল—"আমাদের কার্য্যে কেউ বাধা দেয় তা আমরা পছন্দ করি না। সরিয়ে ফেলি। তার প্রমাণও কিছু কিছু আপনারা পেয়েছেন। মৃত্যু আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তো প্রকাশ করে ফেলুন।"

ভয়ে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গিছল। গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। রামানুজের কিন্তু মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না—ছিল কেবল একটা কৌতূহল! একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে রামানুজ বললে—"আপনাকে বেশ লাগছে। কথাবার্ত্তার প্রণালীও বড় মনোমুগ্ধকর। বড়ই দুর্ভাগ্য যে আমাদের পরিচয় এইখানেই শেষ হয়ে যাবে। তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে। খুনী আসামীরও ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার পূর্ব্বে শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। আমার পকেটে সিগারেট কেস আছে। মরবার পূর্ব্বে শেষ বারের মত ধূমপান করে নিতে চাই।"

লোকটা অট্টহাস্য সহ বললে—"আপনিই কেবল বুদ্ধিমান, কেমন? হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে; কারণ, আপনি ধূমপান করবেন। আমি নির্ব্বোধ নই রামানুজ বাবু। তবে সিগারেট দিচ্ছি।"

এই বলে রামানুজের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট রামানুজের মুখে গুঁজে দিলে। তার পর নিজের পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বার করে জেলে রামানুজের সিগারেটের সামনে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারলুম না। লোকটা "ওরে বাপ রে" বলে চার পা পেছিয়ে গিয়ে চোখ রগড়াতে লাগল। হাত থেকে পিস্তল ও লাইটার পড়ে গেল। রামানুজ হেসে বললে—"ঘণ্টা-খানেক এখন চোখে কোন কাজ করতে পারবেন না। সিগারেটের মধ্যে এক রকম তীব্র বিষ মেশানো আছে। অবশ্য অন্ধ হয়ে যাবার ভয় নেই।"

লোকটা রামানুজের কথার কোন উত্তর না দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দরজা আবিষ্কার করলে। তার পর কোথায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ দিকে রামানুজ দেখি ধীরে ধীরে নাগপাশের মত বাঁধন থেকে মুক্ত হচ্ছে। আমাকে বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে থাকতে দেখে বললে—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এক দড়ি দিয়ে পিচমোড়া করে বাঁধছে দেখে আমি বুকের ছাতি ও দেহের সমস্ত পেশীগুলো ফুলিয়েছিলুম। এখন কমাচ্ছি। তাই বাঁধন আপনা হতেই ঢিলে হয়ে খসে পড়ছে।"

সিগারেট-লাইটারটা তখনও জ্বলছিল। সেই শিখায় রামানুজ নিজের পায়ের বাঁধন পুড়িয়ে মুক্ত করলে। তার পর শরীরটাকে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে হাত দু'টোকে সামনে আনলে। অতঃপর পায়ের মত হাতের বাঁধনও অপসৃত হল। আমার বাঁধন খুলে রামানুজ বললে—"এইবার এ স্থান পরিত্যাগের চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঘরটা মাটীর নীচে। নিশ্চয়ই এতে ঢোকবার এবং বেরোবার গুপ্ত রাস্তা আছে। খুঁজে বার করতে হবে। না পারলে জীবন্ত সমাধি।"

আমরা গুপ্ত পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত হলুম। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাই না। লৌহময় কবর। কি ভীষণ অবস্থা। চারি দিকের লোহার দেয়ালে টোকা মেরে দেখতে লাগলুম, যদি কোথায় ফাঁপা থাকে। হঠাৎ রামানুজ চেঁচিয়ে উঠল—"উঃ, কি পৈশাচিক ষড়যন্ত্র!" জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে চাইতেই ছাদের দিকে দেখালে। দেখলুম—দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। ভয়ে হাত-পা ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। ছাদ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে! একটু পরেই আমরা পিষে, চিপে,—উঃ কি ভয়ঙ্কর! এরা মানুষ না দানব। আমি সেইখানেই বসে পড়লুম। রামানুজের মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব। চোখ যেন জ্বলছে। একবার এদিক একবার ওদিক ছুটোছুটি করছে! দেয়ালে ঘা দিচ্ছে, হাত বুলোচ্ছে, ধাক্কা মারছে। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে ইষ্টনাম জপ করছি। ওদিকে সুনিশ্চিত মৃত্যু নেমে আসছে—ধীরে ধীরে।

অকস্মাৎ রামানুজ বলে উঠল—"হয়েছে, ফাল্গুনি হয়েছে।" তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখি, একটা ছোট পেরেক ধরে টানাটানি করছে। একটা লোহার পাটাতন নামতে লাগল। দেয়াল যেন মুখ ব্যাদান করলে। সামনেই সিঁড়ি। আমরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। ফাঁকটা আপনিই বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠলুম গিয়ে এক ঝোপের মধ্যে। সেখান থেকে হাতড়ে হাতড়ে বাইরে এসে দেখলুম, এক নতুন জায়গায় গিয়ে পড়েছি। চারিধারে গাছপালা আর ঝোপ। কোন্ ঝোপ থেকে আমরা বার হয়েছিলুম বলা কঠিন। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। তার পর খুঁজে খুঁজে স্যর মোহন-চাঁদের বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলুম। পুলিশের লোকেরা তখনও অপেক্ষা করছিল, আমাদের গুণ্ডা মনে করে তখনই এসে ধরে ফেললে। রামানুজ পরিচয় দিতে তারা বিস্মিত হয়ে বললে—"আপনারা?" কণ্ঠে অবিশ্বাসের আভাষ। রামানুজ উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমরা। এই দেখ তার প্রমাণ।" পুলিশ কমিশনারের প্রদত্ত সনাক্ত চিহ্ন দেখাতে তারা সেলাম করে বললে—"কই, কাউকে তো এখনও দেখলুম না।" রামানুজ বললে—"আজ রাত্রে হয়ত' কেউ আসবে না। তবু তোমরা এইখানেই অপেক্ষা কর। আমি একবার স্যর মোহন-চাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা অবশ্য কাউকে বললুম না। স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী গিয়ে কলিং বেল টিপতে এক জন চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। স্যর মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে বললে—"কর্ত্তার সঙ্গে তো এখন দেখা হতে পারে না। তিনি ঘুমুচ্ছেন। সকালে আসবেন।"

রামানুজ বললে—"জরুরী কাজ। আমরা পুলিশের লোক। স্যর মোহনচাঁদকে একবার খবর দাও।"

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললে—"না, এখন হবে না।"

বুঝলুম, আমাদের গুণ্ডা ভেবে আপত্তি করছে। রামানুজের মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম, সে যেন কি ভাবছে। তার পর বললে—"আচ্ছা, কাল সকালেই আসব।"

পুলিশদের নিয়ে আমরা থানায় গেলুম। ভোর হতেই পুলিশের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিয়ে স্যর মোহনচাঁদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। অবশ্য ছদ্মবেশ ত্যাগ করে। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম, স্যর মোহনচাঁদ তখনও ঘুমুচ্ছেন। পুলিশ কর্ম্মচারী বললেন—"এতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন কেন? আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, তাঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়নি তো? তোমার মনিবের শোবার ঘরে আমরা একবার যেতে চাই।"

চাকরের সঙ্গে স্যর মোহনচাঁদের শয়নকক্ষে গেলুম। নাড়া দিতেও তাঁর ঘুম ভাঙ্গল না। রামানুজ তাঁর চোখের পাতা টেনে দেখে বললে—"চোখটা যেন ভয়ানক লাল আর ফুলো দেখাচ্ছে।"

কর্ম্মচারীটি এদিক ওদিক ঘুরে একটি লিউমিনলের শিশি আবিষ্কার করলেন। বললেন—"বোধ হয় ঘুমোবার ওষুধ খেয়েছেন, এখন কি করতে চান?"

রামানুজ বললে—"আর কিছুই করবার নেই।"

আমরা স্যর মোহনচাঁদের গৃহ ত্যাগ করলুম। পুলিশের কর্ম্মচারী থানায় ফিরে গেলেন। আমরা ঘুরে বাড়ীর পিছন দিকে রাস্তায় গেলুম। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলুম সেটা তালা বন্ধ কিন্তু একটু দূরে অনুরূপ আর একটি দরজা, সেটিও তালা বন্ধ দু'টো তালাই এক।

রামানুজ বললে—"বোধ হয় আমরা ভুল বাড়ীতে ঢুকেছিলুম।

সেই দিনই আমরা দিল্লী ত্যাগ করলুম। পথে রামানুজ জিজ্ঞেস করলে—"কিছু বুঝলে?"

উত্তর দিলুম—"খুব বেঁচে গেছি।

রামানুজ গম্ভীর ভাবে বললে—"বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে একটা খুব বড় রকম আবিষ্কারও করে ফেলেছি। অবশ্য এমন প্রমাণ দিতে পারবো না যা পুলিশে শুনবে। তবু যা জেনেছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"কি আবিষ্কার করলে?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"ত্রিমূর্তির মাথা—ব্রহ্মা, বুদ্ধিবল।"

বুঝলুম, রাত্রের নিশ্চিত মৃত্যুর ছাপ ওর মনের ওপর অতি গভীর ভাবে দাগ কেটেছে। হয়ত' মাথার একটু ছিট হয়েছে। তাই হেসে বললুম—"ভালই তো!"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে বললে—"কথাটা বিশ্বাস করতে পারছ না। যা বলব তা আরও অবিশ্বাস্য! হয়ত' তুমি আমায় পাগল মনে করবে। কিন্তু ভুল আমার হয়নি। আমার একটা গর্ব্ব ছিল। শত্রুর ফাঁদ বুঝতে পারি—তাতে পা দিই না। কিন্তু কাল রাত্রে অকাতরে সেই ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। অথচ ফাঁদ নয়। ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি। স্বেচ্ছায় সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করেই গিছলুম। তাদের এত বুদ্ধি আমি ভাবতে পারিনি। আমি কি ভাবে কাজ করব সবই ছিল তাদের নখদর্পণে। ট্রেণ থামিয়ে ফিরে আসব এ পর্য্যন্ত তারা জানত'। কোন্ পথে কখন থাকব তা জানত' বলেই আমাকে ধরতে পেরেছিল এত সহজে এবং অতর্কিতে।"

তার কথাবার্ত্তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ক্ষীণ স্বরে বললুম—"কি বলছ তুমি!"

রামানুজ উত্তর দিলে—"ঠিকই বলছি। কি রূপে জানতে পারল শুনবে। কারণ, ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা অপর কেউ নয়—স্বয়ং স্তর মোহনচাঁদ!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—"রামানুজ, হয় তুমি ক্ষেপে গেছ না হয় ঠাট্টা করছ।"

রামানুজ বললে—"না বন্ধু, আমি ক্ষেপিওনি অথবা ঠাট্টাও করিনি। একটু চিন্তা করে দেখ। আমাদের গতিবিধি এক স্তর মোহনচাঁদ ছাড়া অপর কেউ জানত না। কথায় কথায় অন্য কাউকে বলে ফেলবেন এমন কাঁচা লোক তিনি নন। বাগানের দরজার চাবী চাইতেই তিনি বার করে দিলেন। কোন ব্যক্তি বাগানের চাবী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। তিনি জানতেন, আমি চাবীটা চাইতে পারি তাই তৈরী হয়ে ছিলেন। তার পর কণ্ঠস্বর এবং চোখ। মুখোস পরেও তা আমার কাছ থেকে গোপন করতে পারেননি। শেষ তাঁর ঘুমোনো। চোখের পাতা খুলে দেখলুম, চোখ লাল এবং ফুলে রয়েছে। রাত্রের ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া। অসহ্য যন্ত্রণার জন্য ঘুমোবার ওষুধ খেয়েছিলেন।"

অতিশয় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"পুলিশে খবর দিচ্ছ না কেন?"

গম্ভীর ভাবে রামানুজ উত্তর দিলে—"কারণ, এখনও সে সময় আসেনি। এখন থেকে পুলিশে খবর দিয়ে শত্রুকে সাবধান করে দিলে আমার সমস্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। আর প্রমাণ?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। চুপ করে রইলুম।

[ক্রমশঃ

আলো ও ছায়া

শ্রীকিশোরী পাল

সর্পিল পথের রেখা দেয় নাকো সীমার ইশারা ;
অভিশপ্ত জীবনের গৈরিক যাত্রীরা
অতীতের রেখা ভোলেনিকো, জ্বালাময় বর্ত্তমান
ভবিষ্যৎ নিশীথের দেয় না সন্মান,
নিষ্পলক চোখে শুধু পৃথিবীর রিক্ত ভবিষৎ—
কঙ্কালের অভিনব জীর্ণ জয়রথ
সগৌরবে সাথে তার নিয়ে আসে মৃত্যুর স্বপন ;
বৈশাখী হাওয়ায় যেন কেঁপে যায় অশোকের বন।

সব কিছু ভুল মনে হয়,
কোন দিন কিছু স্বপ্ন ছিল মধুময়,
ভুলে যাই আজ তার সব পরিচয়।

এই ত সে দিন ছিল শ্যামল প্রান্তর,
লঘু শুভ্র মেঘছায়া চির মনোহর ;
অশান্ত উজ্জ্বল দিন ছায়া ফেলেছিল জানি
অতন্দ্র তারার মাঝে, কামনার মায়া-দীপখানি
অকম্পিত জ্বলেছিল হলুদ শিখায়—
অতীতের স্বপ্নালু হাওয়ায়।

আবিরের রক্ত-রাঙা গোধূলির ক্ষণে
কিংবা কোন জ্যোৎস্না রাতে মহুয়ার বনে ;

জীবনের প্রতি পলে করেছিনু পান
সোমপায়ীদের মত, আজিকার বর্ত্তমান কুহেলিকাময়,
ভুলে গেছে অতীতের সব পরিচয়।
তার পর কোন তমিস্রায়
নিশীথচারীর দল দেয় খুলে নূতন অধ্যায়
পৃথিবীর ইতিহাসে, অভিশপ্ত দিনগুলি চলে
ছায়াহীন পদক্ষেপে মৃতস্বপ্ন তীব্র আর্ত্ত-রোলে,
আহত কামনা সব দাগ আঁকে ধূসর সন্ধ্যায়
যান্ত্রিক যন্ত্রণা যেন ক্ষুব্ধ বুভুক্ষায়
প্রলাপ কহিয়া চলে রক্তাক্ত প্রান্তরে
নিঃসহায় বর্ত্তমান তিলে তিলে ঝরে।
কোন দিন তন্দ্রাহীন ধরণীর লাগি
ছায়ানীল আকাশের আলো ছিল জাগি ;
জীবনের কিছু স্বপ্ন গন্ধ হয়ে বসন্ত বাতাসে ;
তারকার সাথে ছিল বিশ্বের আকাশে,
অতীতের সাথে সাথে বকুলের ফুল যদি রয় ;
স্তিমিত দৃষ্টিতে আজ সব কিছু কুহেলিকাময়,
ভাবি তাই বহু দূরে লব নির্ব্বাসন
আজো যেথা দিনগুলি উন্মত্ত বিহ্বল ;
মুক্তপক্ষ বলাকারে নীলাকাশ দেয় না শৃঙ্খল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধার বিচার

মানুষ এবং জীব মাত্রেই গোড়ায় কোন অচিন্ত্য অদৃশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ ছিল; তারই আপন স্বভাবে তার এই দেহ ধারণ—অরূপ থেকে এই রূপায়ণ—কারণ থেকে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে তার এই আত্মপ্রকাশ। যেমন একটি ছোট্ট সরিষার দানার মত বট-বীজে সমস্ত বট গাছটির স্বভাব নিহিত আছে, যেমন একটি আমের বা বেলের বীজে তাদের স্ব স্ব স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও আকৃতি লীন আছে বলেই সে বীজ থেকে গজানো গাছে তা' কালে প্রকাশ পায়, প্রত্যেকটি জীবাণুতে, ভ্রূণে ও শিশুতে তেমনি একটি বিশেষ পূর্ণাঙ্গ মানুষের ভাল মন্দ গুণাগুণ চরিত্র আকৃতি প্রকৃতি নিহিত আছে, শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আধারে ক্রমশঃ সেই বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। একটি ভ্রূণের মাঝে ঘুমিয়ে আছে হিটলার, আর একটিতে আছে ব্যাসদেবের মত এক মহাজ্ঞানী পুরুষ; কোনটিতে আছে এক ধূর্ত্ত প্রতারক এবং অন্য একটিতে আছে এক বদ্ধ বাতুল। মানুষের মাথার গঠনে, হাতের আকারে ও রেখায়, তার দেহের ধরণে ও ছন্দে, তার জন্মের মুহূর্ত্তের গ্রহ-সন্নিবেশে সর্ব্বত্র আছে এই সব ভাবী সম্ভাবনার চিহ্ন। শিশুর দেহটি হচ্ছে তার অন্তরস্থ চিমনির কৌটা; তরল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব বলে সে বস্তু পাত্রেরও স্বভাব কতকটা গ্রহণ করে; কারণ, তার অন্তরের প্রেরণা ও ভাবী প্রকাশের ধারাটিকে ব্যক্ত করে রূপায়িত করবার অনুকূল করেই সে গড়েছে এই তার পাত্র ও যন্ত্রকে। দেহ হচ্ছে তাই জড় জগতে সেই দেহীর প্রতীক, তার জীবন-মন্ত্রের বেতার যন্ত্র, তার প্রকাশ ধর্ম্মের রূপ-কোষ।

পৃথিবীতে কত রকম বিচিত্র মানুষ আছে, তাদের রকমারি আকৃতি প্রকৃতি স্বভাব ও গুণ অপগুণের না আছে হিসাব, না আছে হদিস। সে অনন্ত চেতনা ফুটছে অনন্তমুখী হয়ে—বৈচিত্র্যে ও তার অনন্ত অসীমতার পরিচয় দিয়ে। মানুষের এই অসংখ্য অগণ্য টাইপকে বুঝতে হলে তাদের একটা কার্য্যকরী শ্রেণী বিভাগ করে নিতে হয়; তাদের গুণাগুণের তারতম্যের হিসাবে মানুষকে তাদের পরিস্ফুট কতকগুলি টাইপ বা জাতিতে ভাগ করে তবে তাদের প্রকৃতি আমাদের স্থূল মনবুদ্ধির মানদণ্ডে কতকটা ধরা যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারদের মানুষ চেনবার ছিল সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি ধারা। আধুনিকেরা হয়তো পুরাতন ঋষিদের এই ত্রিগুণকে একটা কল্পিত ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের খেলা এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ শুধু মানুষেই নয়, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ সকল জীব ও পদার্থেই পাওয়া যায়। এই তিনটি হচ্ছে মানুষের ও জীবমাত্রের সত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা গুণ। সত্ত্ব অর্থে জ্ঞান বা প্রকাশ গুণ—আলো; রজঃ অর্থে প্রচুর প্রাণশক্তি, ভাব বা গতিময়তা; তমঃ মানে সত্তার মূকত্ব, জড়তা—যা' থেকে আসে জাড্য, অনুদ্যম, অপ্রকাশ, মোহ। যার মাঝে সত্ত্বগুণ বেশি সে স্বভাবতঃই হয় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ধীর ও বিচারশীল; রজঃপ্রধান মানুষ হয় ভাবুক, প্রেম-প্রবণ, ক্রোধী, অশ্রান্তকর্ম্মী; আর তমোগুণী মানুষের মাঝে জ্ঞানের ক্ষুধা বা কর্ম্ম ও ভক্তির কোন বিশেষ তীব্র প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যায় না, সে স্বভাবতঃ হয় মূঢ়, স্থূলধর্ম্মী, গতানুগতিক—স্থিতিকামী।

শাস্ত্রের ভাষায় না বলে আরও কত ভাবে এই তিনটি টাইপ বা শ্রেণীকে বোঝানো যায়; জ্ঞানী, কর্ম্মী ও মূঢ়; মনোময়, প্রাণময় ও ক্ষিতিময়; প্রস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট ও অস্ফুট,—এমনি কত ভাবে ও ভাষায় ঐ একই সনাতন টাইপত্রয়কে বোঝানো যায়। যে কোনো টাইপ বা জাতি তার স্পষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণ আছে সেই মানুষটির আকৃতি প্রকৃতিতে—তার চলায় বলায় গতিবিধিতে, তার হাত-পায়ের গঠনে, তার মুখাকৃতিতে—যথা চোখের, নাকের, কাণের, ওষ্ঠের, মুখমণ্ডলের গড়নে আকৃতিতে। সদা সর্ব্বদাই সে মানুষটি তার অন্তর-পুরুষের স্বভাব ও স্বধর্ম্মকে তার কাজে কর্ম্মে গতিবিধিতে চলায় বলায় প্রকাশ করে ধরা দিয়ে দিয়ে চলেছে। যার গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই তা' স্পষ্ট দেখতে পান, এবং তা' দেখে মানুষ চিনে নেন।

এই সব স্থূল চিহ্ন এবং তার বহিঃপ্রকৃতির স্ফুরণের লক্ষণগুলি ছাড়াও যোগের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে—intuitionএর বলে যোগীরা মানুষ চেনেন। তাঁদের কাছে এমন কি তোমার কণ্ঠস্বরে, ব্যবহৃত পাদুকায় ও বস্ত্রে, লেখাতে, পদধ্বনিতে, গাত্রগন্ধে, স্পর্শে আছে তোমার আমার স্বভাবের পূর্ণ ও সূক্ষ্ম পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে চিনে মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের অনুকূলে চালাতে পারলেই সে মানুষ সার্থক হয়ে ফুটে ওঠে ক্রমশঃ তার খণ্ড মনুষ্যত্ব থেকে পূর্ণত্বের পথে অন্তর্নিহিত দেবত্বে। শুধু যোগানুশীলন কেন, সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই খাঁটি শিক্ষক, যে বোঝে তার কোন্ ছাত্রটির কি প্রকৃতি, কোন্ দিকে কার স্বাভাবিক প্রবণতা, তার চরিত্রের কোন্ দুর্ব্বলতা কতটুকু প্রতিবন্ধক—শিক্ষানুশীলনের পথে—এক কথায় তার কোন্ শিক্ষার্থীটিকে কি মতিগতি বা প্রেরণা দিয়ে প্রকৃতিরাণী জগতে পাঠিয়েছেন ঠিক কি হয়ে গড়ে ওঠবার জন্য—কবি হয়ে, না শিল্পী হয়ে, না বাস্তব ক্ষেত্রে কর্ম্মী হয়ে।

মানুষের রয়েছে বাহিরের স্ফুট সত্তা এবং রূপ ও তার অনুগ ধর্ম্ম, তদুপরি মানুষের আছে গভীরের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা। ঐ গভীরের সম্ভাবনা যোগদৃষ্টিতে দেখেই যোগীরা যোগার্থীর আধার নিরূপণ করেন, সে কোন্ পথের অধিকারী বুঝে তাকে তদনুযায়ী পথ ধরিয়ে দেন। যিনি খণ্ড যোগী, যাঁর এই অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি আদৌ নাই অথচ শিষ্য করার দিকে ঝোঁক আছে, তিনি স্বভাবতঃই ভুল করে বসেন—হয়তো ভক্তকে টানেন জ্ঞানের পথে, যে আত্মবিচারের পথে চলতে তদনুকূল মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে তাকে হয়তো দেন হঠযোগের স্থূল প্রক্রিয়ার mechanical শিক্ষায় ঠেলে, যে কোমল ভাবপ্রবণ মানুষ এসেছে প্রেম-করুণা আদি হৃদয়বৃত্তি নিয়ে সেই ভূমিতে ফুটতে, অধীর বৈদান্তিক যোগী তাকে হয়তো টেনে নিয়ে চলেন শুষ্ক আত্মানাত্ম বিচারের দিকে—মানস অখণ্ডতার নীরস মরুদেশে। ফলে সেই সব যোগার্থীর চাপা রুদ্ধ সত্তায় যোগ খোলে না, তার সহজ পথটি বন্ধ হয়ে গিয়ে অসার নিষ্ফলা তপস্যায় দিন কেটে যায়। যিনি যে পথের পথিক, যে সাধনায় তাঁর আংশিক সফলতা এসেছে, স্বভাবতঃই সেই পথের ওপর সেই যোগীর একটা মোহ ও অনুরক্তি থাকেই; কাজেই আধার ও অধিকারী নির্ব্বিচারে তাঁর ঝোঁক হয় প্রার্থী মাত্রকেই আপন অভ্যস্ত পথে টানবার। দুনিয়ায় এই ভ্রান্তিবিলাসের গোলকধাঁধায় কত মানুষ যে এমনি ভাবে

পথভ্রষ্ট হয়ে চলেছে তার হিসাব নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভুল-ভ্রান্তিতে খুব বেশি আসে যায় না, কারণ, আসলে তো আমরা এই জগচ্চক্রের কর্তা নয়, আমাদের যন্ত্র করে কাজ করছে পরম এক অভ্রান্ত স্বভাব; পরিণামে সে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও কাজে লাগিয়ে নেয়, অর্থাৎ খুব উঁচু পরমার্থ দৃষ্টি থেকে বলতে গেলে বলতে হয়—সেই করায় ভুল আবার সেই নেয় তা' শুধরে।

ভাল চক্ষুষ্মান্ শিক্ষকের হাতে পড়লে যোগার্থীর সাধনা স্বতঃই অনায়াসে যায় খুলে, তার যোগ তাকে আপনি নেয় খুঁজে, আম গাছে আম ফলার মত সে উজ্জ্বল সমর্পিত আধারে আপনি যোগ ফলে—দ্রুতপদক্ষেপে সে চলে অনুভূতি থেকে নবতর অনুভূতিতে, নিত্যই অনির্ব্বচনীয় ও প্রত্যক্ষ বস্তু পেয়ে পেয়ে। ব্যাবহারিক জীবনে মানস শিক্ষায় যেমন ছাত্রের চাই উত্তম শিক্ষকের সাহায্য, যোগপথেও তেমনি অতি প্রয়োজনীয় হয়ে আসেন গুরু। যত দিন সাধক নিজের একটা ধ্রুব ছন্দ ও গতি না পায়, একটা সমস্ত-গঠিত অনুকূল ভিত্তির উপর সাধনাকে ফোটাবার কৌশল না আয়ত্ত করে, তত দিন তাকে চলতে হয় গুরুর নির্দ্দেশে। এইটিই সাধারণ নিয়ম, অসাধারণ আধারে এ নিয়মেয় ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নয়।

প্রকৃত সাধক হচ্ছে সেই, যার আধারে—মনে প্রাণে ও দেহে আছে যোগের অনুকূল উপাদান ও প্রেরণা, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব যার প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত, এইরূপ আধারেই সারবান কর্ষিত ভূমিতে বীজ পড়ার মত যোগ-বীজ পড়তে না পড়তে গজিয়ে ওঠে—সাধন খুলে যায়; ক্ষেত্রের স্বভাবজ উর্ব্বরতা শক্তির তারতম্যের অনুসারে এই সাধন-খোলার হয় কালবিলম্ব। প্রকৃত গুরু হচ্ছেন সেই যোগী বা সাধক যাঁর ঘটে আছে খাঁটি তপোবল ও যোগশক্তি এবং সাধনার্থীর আধারে তা' সঞ্চার করে দেবার সামর্থ্য (power of radiation)। সংসারে কিন্তু গুরুগিরির ব্যবসায়ই বেশি, সত্যকার শক্তিমান্ গুরু কম। স্কুলে চাকরী দিয়ে বেত হাতে বসিয়ে দিলেই যেমন শিক্ষক হয় না—তাঁর ঘটে চাই প্রকৃত বিদ্যা ও জ্ঞান এবং ছাত্রের মধ্যে তা' সঞ্চার করে দেবার কৌশল ও নিপুণতা, তেমনই উত্তম গুরু তিনিই যিনি যোগাগ্নিতে দীপ্ত-আধার, ও যিনি যোগাগ্নি শিষ্যে সঞ্চারিত করবার শক্তি রাখেন, স্বভাবতঃই এক প্রকার যোগশক্তি বিকিরণ করবার সামর্থ্য সহজাত বৃত্তিরূপে তাঁর আছে।

অনেক যোগী আছেন যাঁরা স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রী, জগতে তাঁরা প্রধানতঃ আপনি ফুটতেই এসেছেন, তাই তাঁরা নির্জ্জনে self-contained হয়ে সাধনা করেই চলেন; সে আধার থেকে যোগশক্তি আধারান্তরে সহজে চলে না, তার সত্তায় ও আধারে সে তপোবল হয়ে থাকে কূটস্থ (static) ও অন্তর্মুখী। কোন কোন সাধক কিন্তু গোড়া থেকে নিজের অপূর্ণ অবস্থায়ই গুরুর আসনে স্বতঃই উঠে বসে; সে জন্মেছে শিক্ষক বা গুরু হয়ে, চালক বা নেতা হয়ে—ঠিক যেমনটি এই ব্যাবহারিক কর্ম্মব্যস্ত জগতেও ছোট-বড় নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। অপূর্ণ অবস্থায় সে জন্ম-গুরু অপূর্ণকেই আংশিক সাধনা দিতে পারে, তারই অনুভূতিগুলির কিছু কিছু প্রার্থীর মধ্যে জেগে ওঠে।

যোগপথে পরমার্থ ক্ষেত্রে সাধকদের লক্ষ্যও সকলের এক নয়; কাহারও লক্ষ্য নিজেরই উন্নতি ও মুক্তি, কাহারও লক্ষ্য বিশেষ কোন সিদ্ধি ও উচ্চ ভূমিলাভ, কাহারও লক্ষ্য ভগবদ্দর্শন, আবার কাহারও বা লক্ষ্য পরমার্থ পথে লোক-কল্যাণ—জগতের উন্নতি ও রূপান্তর। যাঁরা নিজের উৎকর্ষ ও মোক্ষ নিয়েই যোগরত, তাঁদের আত্মকেন্দ্রী ও অন্তর্মুখী আধারের যোগশক্তি স্বভাবতঃই নিজের মন প্রাণের ও স্বকীয় গূঢ় স্বভাবের পরিধির মাঝেই আবদ্ধ। বিভিন্ন যোগী বা সাধকদের মুক্তির বা সিদ্ধির রূপও সকলের এক নয়; কেউ বা পরা শক্তির মাঝে নিমগ্ন থাকতে ভালবাসেন, কেউ বা প্রেমানন্দে বিভোর, কেউ বা দ্বন্দ্বময় সৃষ্টিকে এড়িয়ে নেতি নেতির পথে অব্যক্তে বা তুরীয়ে আত্মলোপ সাধনকেই পরম পুরুষার্থ ভাবেন এবং তাই লাভ করেন। এই প্রকার রুচি ও প্রেরণার বিভিন্নতা তাঁদের সত্তার স্বধর্ম্মেই নিহিত আছে; খুব উচ্চ ভূমিতে উঠে ব্যাপক অখণ্ড দৃষ্টিতে সকল সিদ্ধির সামঞ্জস্য সকলে করে উঠতে পারেন না এবং পারলেও স্ব স্ব স্বভাবের টানে স্বধর্ম্মের পথেই চলে যান। মূল পরাশক্তির সঙ্গে যাঁরা নিত্য-যোগে যুক্ত হয়ে সহজ স্থিতি লাভ করেছেন, তাঁরা এত সমদৃষ্টি যে কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বিচরণ করেন না। নির্ব্বাণকে চরম লক্ষ্য বলে যিনি সিদ্ধ হলেন, জগৎ-প্রপঞ্চকে যিনি অনিত্য দুঃখময় বলে স্থির করলেন, সেই মহাপ্রাণ ইহবিমুখ পরম বৈরাগী বুদ্ধদেবও সিদ্ধিলাভের পর মৈত্রী করুণার বশে লোককল্যাণে রত হয়েছিলেন। অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য যুক্তিবলে দুনিয়াকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েও সেই মায়ার মধ্যে সত্যধর্ম্ম স্থাপনের জন্ম আপ্রাণ প্রয়াস করেছিলেন। মায়ার পুতুলের পক্ষে মায়াকে বা জগচ্ছক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা নিজের ছায়া ডিঙানোর মত হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবু মহাপ্রাণ মানুষ লোককল্যাণ না করে পারেন না, এ হচ্ছে তাঁদের স্বভাবধর্ম্ম।

দু'-চার জন দীপ্ত শক্তিধর আধার ছাড়া সকল সাধকেরই পক্ষে গোড়ায় চালক দরকার হয়। যোগসাধনার পথ—স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণের মাঝে চলার পথটি নিতান্ত নির্ব্বিঘ্ন নয়, শাস্ত্রে বলছে—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের অগ্রভাগের উপর চলার মত দুর্গম এই পথ;—সে জ্যোতির পথে সূক্ষ্ম অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানের পথে, অখণ্ড তত্ত্বের ভূমিতে অজ্ঞান-অনভ্যস্ত পথিককে হাত ধরে চালাবার—হাত ধরে নিয়ে যাবার মানুষ চাই। সত্য অগ্নি, পরম তেজ, দুর্ব্বার তার শক্তি, সে পরম বস্তু যেমন সারবান শুদ্ধ আধারকে দীপ্ত করে—ত্রাণ করে, তেমনি অসতর্ক অশুদ্ধ চঞ্চল আধারকে কিন্তু দগ্ধ করে, চূর্ণ করে দিতে পারে। অগভীর জলের মাছ গভীর জলে বাঁচে না, নীচের স্থূল বায়ুর অধিবাসী উর্দ্ধের সূক্ষ্ম বায়ুস্তরে শ্বাস নিতে পারে না; জলের সে গভীরতায় মহাশূন্যের সে তরল বায়ুমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বাস করার অভ্যাস তাকে শনৈঃ শনৈঃ আয়ত্ত করতে হয়। এই জন্ম যোগ সাধনা করতে গিয়ে অনেকে পাগল হয়ে যায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেহ কেহ বা যোগশক্তির স্পর্শের প্রতিক্রিয়া-জনিত বর্দ্ধিত ভোগাসক্তির বশে উন্মার্গগামী হয়ে যায়। মানবপ্রকৃতির আবরণ যখন খুলতে থাকে, উর্দ্ধের উজ্জ্বল ভূমি সব যখন উন্মুক্ত হতে থাকে, তখন তার সত্তা অনাবৃত হয়ে যায়—অধো-উর্দ্ধে উভয় দিকে। যোগীকে নিভৃতে যোগাসনে যে কাম-ক্রোধ-মোহ-বেগ ধারণ করতে হয় সাধারণ সংসারীকে তার শতাংশের একাংশও করতে হয় না। যোগপথের

এই সব বিঘ্ন আছে বলেই এ পথ দুর্গম, উপযুক্ত গুরুর হাতে চালিত উত্তম অধিকারীর পক্ষে এ পথ সুগম ও সহজ হয়ে যায়।

সাধনার্থীর অ'ধার আছে অনেক রকম, তা' পূর্ব্বেই বলেছি। তা' ছাড়া সাধনার্থীর ক্রমবিবর্ত্তনের একটা পূর্ব্ব ইতিহাস আছে; অন্ততঃ পূর্ব্বের এক দুই বা তিন জন্মের সাধনার গতি, ছন্দ ও মূল ধারাটি অনুসরণ করেই তাকে এ জন্মেও সাধন-পথে পা বাড়াতে হবে; সূক্ষ্মদর্শী গুরুর চক্ষে শিষ্যের পূর্ব্বজন্মানুসৃত সাধনা এবং অনুশীলনের এই ধারাটি ধরা পড়ে,—মানুষটিকে দেখতে দেখতে তাঁর চক্ষের উপর ভেসে ওঠে হয় শুষ্ক শীর্ণ কঠোর প্রকৃতি এক তাপস মূর্ত্তি, নয় একটি ভাব-ঢুলুঢুলু কোমল প্রাণ ভক্ত মূর্ত্তি, অথবা অর্দ্ধ উন্মাদের মত এক হ্যালাক্ষ্যাপা ছন্নছাড়া রূপ। এইরূপ সূক্ষ্মদর্শন ছাড়াও আমাদের ইহজন্মের স্থূল দেহের গঠনে, চলনে, বলনে, রুচি ও অনুরাগে চিহ্ন আছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের। ত্রিকালদর্শী সিদ্ধ মহাযোগী যিনি, তাঁর তো কথাই নাই, শিষ্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী নিখুঁৎ চিত্রের মত চিদাকাশে দেখে তিনি সাধনার্থীকে করেন তার অনুকূল পথে চালনা। এই সব চক্ষুষ্মান্ পুরুষ কখনও ব্যগ্র হন না মানুষকে শিষ্য করার জন্য। ঐশী শক্তিতে আপনি যা' ঘটে তারই গতি অনুসরণ করে এই সব ঈশ্বরার্পিত পুরুষ চলেন।

সাধক মাত্রেই মনের অতীত ভূমির যাত্রী; গোড়া থেকেই কাঁচা অবস্থায় তাঁদের শিখতে হয় মনের গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াতে, নিজের সাধ, আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, ভাল-মন্দে অনুরক্তি, চিন্তা ভাবনা ছেড়ে ভগবদর্পিতচিত্ত হয়ে রইতে শিখলেই সব আপনি হয়।

কথাঃ বাণীকুমার

সংগীত

স্বরঃ অনিল দাস

সুরঃ পঙ্কজ মল্লিক

জীবন-মন্দিরে-যে ভৈরব আজ
করাল-পিনাক বাজায় নাচি'
কোথায় রে সব ধরার ছেলে
মুক্তি-সুধা নাও না যাচি'॥
আজ্‌কে পূজার সাজ সেজে নে,
অমল জ্যোতির তান সেধে নে,
প্রথম জাগার ভেরীর রবে
ক্ষেমঙ্কর উঠ্‌লো নাচি'॥

অলস শয়ন আয় রে ছেড়ে
দেবতা ওই যায়-যে ডেকে।
আরতি-শাঁখ উঠ্‌লো বেজে,
বিজয়-কেতন উড়াবে কে।
রুদ্র বাজায় প্রলয় বিষাণ,
গাও সবে জয়-জয়ন্তী গান,
অসীম-বরণ সাধন হোলো
অরুণ-সোনায় জাগ্‌লো প্রাচী।

II	মা	গমা	পদা	|	দা	দা	-া	I	পা	পদা	মপদা	|	পা	-া	দমা	I
	জী	ব০	০০		ন	ম	ন্		দি	রে০	০০০		যে	০	০০	
	মা	গমা	পণদা	|	-া	পা	মপা	I	মপা	মগা	া	|	-া	-া	-া	I
	ভৈ	০০	০০০		০	র	ব০		আ০	০০	০		০	০	জ্	
	সমা	মা	-া	|	মা	মা	-া	I	গা	গঋা	গা	|	ঋাগঋা	সা	-া	I
	ক	রা	ল		পি	না	ক্		বা	জা০	য়		না০০	চি	০	
	না	র্সা	-া	|	র্ঋা	র্সা	-া	I	না	দা	না	|	দনদা	পা	-া	I
	কো	থা	য়		রে	স	ব,		ধ	রা০	র		ছে০০	লে	০	
	মপা	মপণা	ণা	|	দা	পদা	.মা	I	গা	মা	গমগা	|	ঋা	সঋা	ণ্সা	II
	মু	০	০০ক্		তি	সু	ধা০	০	না	ও	না০০০		যা	চি০	০০	

II দা -া দা | না র্সা -া I র্ঋা -া র্সনা | র্সা র্সা -া I

আ জ্ কে পূ জা র্ সা জ্ সে• জে নে •

I না র্সা নর্সর্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I নর্সর্ঋা নর্সা না | দা (পদা মপা) } I পা -া I

অ ম ল্•• জ্যো তি র্ তা•• •ন্ সে ধে নে• •• নে •

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I র্রর্মা র্জ্ঞা -া | র্ঋা র্সা -া I

প্র থ ম জা গা র ভে• রী র্ র বে •

পা পা দা | ণা র্সা র্জ্ঞা I র্রা র্জ্ঞা র্সর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া II

কে ম ঙ্ ক র • উ ঠ্ লো• না চি •

II সঋা মা মা | মা মা -া I মা -া, মা | মা মপা মগা I

অ• ল স শ য় ন্ আ য়্ রে ছে ড়ে• ••

মা গমা পদা | দা দা -া I পা -া দা | মপা মপণা দা I

দে ব• •• তা ও ই যা • য় যে• •••ডে

পা -া -া | -া -া -া I } না র্সা -া | র্ঋা র্সা -া I

কে • • • • • আ র • তি শাঁ খ্

না র্সা নর্সনা | দা (পদা মপা) } I পা -া I মা গমা পণা |

উ ঠ্ লো•• বে জে• •• জে • বি জ• ••

দা পা মা I গমা গা ঋগা | ঋা সা -া I { দা -া দা |

য় কে তন্ উ• ড়া •• বে কে • রু • দ্র

না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা | না র্সা -া I র্সা র্সার্জ্ঞা র্জ্ঞা |

বা জা য় প্র ল য় বি ষা ণ্ গা •ও স

র্ঋা র্সা -া I না র্সা নর্সনা | দা (পদা মপা) } I পা -া I

বে জ য় জ য় ••ন্ তী গা• •ন্ গা ন্

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I

অ সী ম ব র ণ সা• ধ• ন হো লো •

পা পা দা | ণা র্সা র্জ্ঞা I র্রা র্জ্ঞা র্সর্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া II II

অ রু ণ সো না য় জা গ্ লো• প্রা চী •

"সুর বিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

চোর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অমূল্য বিছানার ওপর রাখল, তার পর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল,—'নাও, তুলে রাখো।'

রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে। তার পর সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আজ আবার এ-সব এনেছ যে!'

অমূল্য একবার যেন চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তীব্র দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে বলল,—'এনেছি বাজারে বিক্রি করবার জন্য।'

সঙ্গে সঙ্গেই স্বর বদলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠল অমূল্য—'বলি, জিনিষগুলি হাত থেকে নিতে পারবে কি না?'

রেণু আস্তে আস্তে বলল—'হাতে করে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন?'

এর পর জিনিষগুলি তুলে নিয়ে রেণু জল-চৌকিটার ওপর রেখে দিল।

অমূল্য বলল—'শেষ পর্য্যন্ত না নিয়ে যখন পারবেই না জানো, তখন আগে থাকতে ভদ্র ভাবে নিলেই হয়। অত চেঁচামেচি অত সতীপনা কিসের জন্য? আর এক দিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম বলে কি রোজই তাই করব না কি। এগুলি আমার নিজের পয়সায় কেনা।'

রেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল, 'দেখ আর যাই কর, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না!'

অমূল্য আবার জ্বলে উঠল, 'না খড়দ'র মা-গোঁসাই এসেছ কি না তুমি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না!'

এবার সত্যি সত্যিই হাসি পেল রেণুর, 'খড়দ'র মা-গোঁসাই, ছাড়া আর কারো কাছে বুঝি সত্যি কথা বলা যায় না?

অমূল্য এক মুহূর্ত্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।

রেণু একবার চোখ নামিয়ে নিল, তার পর আবার অমূল্যের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হ'লে আমার আর কি, এক দিন যদি হাতে হাতে ধরা প'ড়ে যাও, তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায়?'

অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলল, "ক্ষেপেছ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয়।" হাত কাঁচা নয়, এই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাও হয় না অমূল্যর, সেই লজ্জায় রেণুর নিজের মরে যেতে ইচ্ছা করে। হাত কাঁচা নয় তা ঠিক। কোন যে দ্বিধা নেই অমূল্যর! বিয়ের ক'দিন পরে তারা ট্রামে করে যাচ্ছিল—ইডেন গার্ডেন দেখতে। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রেণুর সঙ্গে গল্প করছিল অমূল্য। কনডাক্টর এলো টিকেট চাইতে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পে অমূল্যের মনোযোগ আরও বেড়ে গেল।

কনডাক্টর তবু জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, টিকেট?'

অমূল্য একবার মাথা নেড়ে, রেণুর সঙ্গে গল্পই করতে লাগল। রেণু স্পষ্ট দেখল, কনডাক্টরটা একটু মুচকি হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অমূল্য অনর্গল কথা বলতে লাগল কিন্তু লজ্জায় রেণুর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ছি ছি, কি মনে করল কনডাক্টরটা মাত্র দু'আনার তো ব্যাপার।

কনডাকটর একটু দূরে স'রে গেলে রেণু চুপে চুপে স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'টিকেট করলে না যে!'

অমূল্য হেসে বলেছিল, 'ওঃ, তুমি বুঝি আবার তা লক্ষ্য ক'রেছ! টিকেটই যদি করব তো ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছি কেন!'

রেণু অবাক্ হয়ে বলেছিল, 'ওমা, ফার্ষ্ট ক্লাসে ছাড়া আবার ভদ্রলোকে মেয়ে-ছেলে নিয়ে ওঠে না কি। তাই ব'লে টিকেট করবে না?'

অমূল্য সগর্ব্বে বলেছিল, 'একা যখন উঠি তখনই ডবলু টিতে চলি, আর আজ তো তুমি সঙ্গে আছ। বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু'-চার পয়সাও যদি এ ভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা হ'লে কি ক'রে চলে বল।'

রেণু ভেবেছিল, অমূল্য বুঝি পরিহাস করছে। কিন্তু ফেরার পথেও অমূল্য যখন কনডাক্টরকে দেখে গম্ভীর মুখে একবার মাথা কাত ক'রে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন রেণুর বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করছে। রক্ষা যে, সেই আগের কনডাক্টরটা নয়। এবার সে তা হ'লে অমূল্যের কাছ থেকে টিকেটের পয়সা আদায় ক'রে তবে ছাড়ত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এক-গাড়ী লোকের সামনে কি ক'রে তাদের মান থাকত, কি ক'রে মুখ দেখাত তারা!

গাড়ী থেকে নেমে রেণু বলেছিল, 'ছিঃ, এ-সব আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

অমূল্য বলেছিল, 'কি সব?'

—'এই টিকেট না কেটে ট্রামে বাসে চলা, ছিঃ।'

অমূল্য হেসেছিল, 'ও, গম্ভীর ভাবে তুমি বুঝি সেই কথাই ভাবছ। আচ্ছা শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে তো হে তুমি! বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভোগাবে। হিষ্টীরিয়া টিষ্টীরিয়া নেই তো আবার?'

—'কেন? তার মানে?'

—'তার মানে এ সব মেয়েদের তাও থাকে।'

রেণু বলেছিল, 'ছিঃ, সামান্য দু'আনার পয়সার জন্য—'

অমূল্য বাধা দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দু' আনা নয়, দু' আনা দু' আনা চার আনা, দিব্যি এক প্যাকেট সিগরেট হবে।'

'চাইলে না কেন, সিগরেটের পয়সা তোমাকে আমি দিতাম।'

এর ক'দিন পরে অমূল্য দামী একখানা চিরুণী নিয়ে এসে উপস্থিত।

—'দেখতো, কেমন চিরুণীখানা!'

রেণু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিরুণীখানা নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার তো! কত দাম?'

অমূল্য বলল, 'আড়াই টাকা।'

রেণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'ছিঃ, এত দাম দিয়ে কেন আনতে গেলে বলো দেখি, চিরুণীর তো আমার অভাব নেই, এই সে দিন বৌভাতেই তো তিনখানা চিরুণী পেয়েছি। যা-ই বলো, এ সব বাজে

বাবুগিরি আমার মোটেই পছন্দ হয় না, যে দিন-কাল, তাতে এ ভাবে পয়সা নষ্ট করবার কোন মানে হয়?'

অমূল্য আত্মপ্রসাদে হেসে বলল, 'পাগল হয়েছ! গাঁটের পয়সা ব্যয় ক'রে বাবুগিরি করতে যাব, অত পয়সা পাল ব্রাদার্স দেয় না।'

রেণু বলল, 'ও, কোম্পানী বুঝি নিজেদের লোক ব'লে খুব সস্তায় দিয়েছে!'

অমূল্য হেসে বলল, 'কেবল সস্তায় নয় হে, একেবারে বিনামূল্যে। জানে কি না, আনকোরা নতুন বৌ এসেছে ঘরে।'

রেণু সলজ্জে বলল, 'যাও, কি যে বল। মুখের তোমার কোন আগল নেই। সত্যি, আড়াই টাকার জিনিষ কত দামে পেলে বল না, আমার বৌদির জন্য একখানা আনাব।'

অমূল্য অকস্মাৎ চটে উঠল, 'হয়েছে। আর ন্যাকামী কোরো না, মেয়েদের ন্যাকামী কখনো কখনো ভালো লাগে, তাই ব'লে কি সব সময়েই সহ্য হয়?'

—'তার মানে?'

—'তার মানে, পয়সা লাগেনি, হাত সাফাইতে এসেছে। তা তোমার জন্য পারি ব'লে তোমার বৌদির জন্যও পারতে হবে এমন কি কথা আছে?'

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে রেণু বলেছিল, 'ও চিরুণীতে আমার কাজ নেই। ওটা তুমি কালই ফেরৎ দিয়ে এসো, ছিঃ।'

—'অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বৌদির জন্যও একখানা হবে। হাজার হ'লেও শালাজ তো!'

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে রেণু আর কথা বলেনি।

আজও রেণু চুপ ক'রে রইল। কোন ভদ্রলোকের ছেলে যে এ-সব করতে পারে, তা যেন ধারণায় আনা যায় না। গরীব তো তার বাপ-ভাইও। কিন্তু পরম শত্রুও কি কোন দিন বলতে পারবে যে, পরের কোন জিনিষ লুকিয়ে আনা তো পরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে পর্য্যন্ত তারা দেখেছে?

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্য্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হলো তাকে। আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তার পর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যর প্রবৃত্তি আর বদ্‌লাবে না। কেন না, এ সব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হোলেও না, পয়সা হোলেও না,—রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তার পর সব একাকার হয়ে যাবে। কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বৌ।

অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি ক'রে আনতে যার কোন লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

—'কি?'

রেণু বলল, 'ও-ভাবে জিনিষপত্র আর এনো না। সত্যি বলছি, ও-সবে আমার কিছু দরকার নেই। আমি আর কিছু চাইনে; কেবল তুমি ভালো হও, ভদ্র হও। দশ জনে যদি তোমাকে ভদ্রলোক বলে জানে, তাহ'লেই আমার তৃপ্তি।'

এবার স্তব্ধ হবার পালা অমূল্যর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে সে পাশ ফিরল। এই নীতি-শিক্ষার দক্ষিণা রেণুকে পুরোপুরি ভাবে না দিয়ে তার শান্তি নেই।

রেণু বলল, 'ও কি, রাগ করলে না কি? তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

অমূল্য জবাব দিল, 'আমিও ভালোর জন্যই বলছি। চুপ ক'রে ঘুমোও।'

পরদিন ভোরে উঠে অমূল্য স্ত্রীকে কাছে ডাকল, 'এই, শোন।'

রেণু কাছে এসে বলল, 'কি।'

অমূল্য ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ওপরের বিনোদ বাবুদের ঘরে কাল নতুন কতকগুলি কাঁসার বাটি এসেছে না?'

রেণু অবাক্ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে তোমার কি!'

—'বিনোদ বাবুদের বৌয়ের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব। ও-ঘরে তো তোমার অবাধ গতিবিধি।'

—'হ্যাঁ, মাসীমা ভারি ভালোবাসেন আমাকে। আর তাঁর ছোট ছেলে তো আমার হাতে ছাড়া খেতেই চায় না।'

অমূল্য তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তবে তো আরও সুবিধে। দুধ-খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় ক'রে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।'

রাগে এবং দুঃখে মুখ দিয়ে রেণুর কিছুক্ষণ কথা সরলো না। একটু পরে সে বলল, 'কি যা তা বলছ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

অমূল্য অম্লান মুখে বলল, 'মোটেই না, কাঁসার আজ-কাল সের কত করে জানো? দু'-তিনটে বাটি যদি সরাতে পারো তাহ'লে দু'দিন বক্সে ব'সে দু'জনে বেশ থিয়েটার দেখে আসতে পারব।'—অমূল্য হাসল, পরিতৃপ্তির হাসি।

রেণু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেমন মানুষ, তেমন তার ঠাট্টা। ও-সব ঠাট্টা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

অমূল্য বলল, 'ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলছিলাম।'

দুপুরবেলায় মাসীমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর হাত কাঁপতে লাগল, কি সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে!

কয়েক দিন পরে, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু বিছানা থেকে অমূল্যর ওঠার নাম নেই, অন্য দিন চা-টা খেয়ে এর মধ্যে অমূল্য রওনা হয়ে পড়ে। দোকানে আটটা থেকে তার ডিউটি।

রেণু কাছে এসে অমূল্যর মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি মশাই, খুব যে ঘুমোন হচ্ছে? বেলা হয় না আজ?'

অমূল্য অদ্ভুত একটু হাসল, 'আজ আর বেলা হবে না।'

স্বামীর হাসি আর কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল রেণুর; বলল, 'কেন, দোকান আজ বন্ধ না কি? কি উপলক্ষে বল দেখি!'

অমূল্য চটে উঠে বলল, 'ছাকা! কি উপলক্ষে! উপলক্ষ আবার কি, উপলক্ষ আমার শ্রাদ্ধ।'

বলতে বলতে অমূল্য আবার পাশ ফিরতে চেষ্টা করল।

রেণু এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন যে হবে আমি আগেই জানতুম।'

অমূল্যর আর পাশ ফেরা হলো না, 'কি, কি বললে ?'

রেণু বলল, 'বলবার আর আছে কি, তবু ভাগ্য যে, পুলিসে দেয়নি। অমনিই ছেড়ে দিয়েছে।'

অমূল্য বলল, 'উঃ, কি আপশোষের কথা! কিন্তু এর চেয়ে বোধ হয় পুলিসের হাতে যাওয়াই ভালো ছিল। আমি জেল খাটতুম আর তুমি তত দিন সাধুসঙ্গ করে একটু মুখ বদলে নিতে পারতে!'

কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কি মতলব ঠিক ক'রে অমূল্য উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে, রেণু দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়ে বসে আছে।

অমূল্য কাছে এসে বলল, 'বা, অমন ক'রে বসে রয়েছ যে! হলো কি তোমার ?'

কিন্তু রেণুর কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

অমূল্য বলল, 'বা, মুখই তুলবে না ব'লে ঠিক ক'রেছ না কি ?' কিন্তু মুখ দেখাতে লজ্জা তো আমার হবার কথা, তোমার কি ?'

রেণু হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তোমার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলতে কিচ্ছু নেই একেবারে ? তুমি কি পাষাণ ?'

অমূল্য পাষাণ নয়। নীরবে আস্তে আস্তে রেণুর চুলের ওপর আঙুলের ডগা বুলাতে লাগল।

মিনিট খানেক পরে রেণু মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি এমন অপরাধ ক'রেছিলে যে ওরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিল ?'

কৈফিয়ৎটা অমূল্যর কাছে নয়, অমূল্যর মনিবদের কাছেই যেন দাবী করছে রেণু। অমূল্য একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'অপরাধ আবার কি। বুড়ো ক্যাশিয়ার বেটা পিছনে লেগেছিল। অপরাধ—তার স্ত্রীর জন্য কেন এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি। ম্যানেজারকে গিয়ে লাগিয়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

রেণু আজ স্বামীর কথার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস ক'রে বলল, 'হুঁ, সাধু যে পৃথিবীতে সকলেই তা জানা আছে।'

দিন কয়েক খুব চাকরি খুঁজল অমূল্য। কিন্তু হয় হয় ক'রে কোনটাই ঠিক হয়ে উঠল না। রেণু ভরসা দিয়ে বলে, 'অত ভাব কেন, চাকরির কি অভাব আছে না কি আজকালকার দিনে ? হবেই এক দিন।'

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই চাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল। শুধু চাল নয়, তেল নুণ ডাল বলতে কিছুই নেই।

অমূল্য মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তার পর বলল, 'এক কাজ করা যায়, কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না তো ?'

—'না, মনে আবার কি করব ?'

—'স্নো আর সাবানের বাক্সগুলি দাও। জানা লোক আছে। উচিত দামেই দিয়ে দিতে পারব।'

রেণুর মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠল। তার পর বলল, 'আচ্ছা নাও। কিন্তু এ ভাবেই তো আর দিন চলবে না!'

অমূল্য বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে।'

দু'-তিন দিন পরে দেখা গেল, অমূল্য কোত্থেকে একটা দামী ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসেছে।

রেণু একবার পেনটার দিকে তাকাল, আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল। অমূল্য প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতে লাগল, এই বুঝি রেণু তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না। যেন কোন নতুন কিছু ঘটেনি, তেমনি সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

মাঝখানে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'নারকেল তেল কিন্তু একেবারেই নেই।'

অমূল্য বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার দিকে পেনটা আর দেখা গেল না। তার পরে সুগন্ধি নারকেল তেল এক শিশি, চাল ডাল তেল কয়লায় ঘর ভ'রে গেল।

রেণু এবারও কোন কথা না ব'লে জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলছে, অমূল্য বলল, 'দাঁড়াও, আর একটা জিনিষ আছে তোমার জন্য।'

রেণু বলল, 'কি ।'

অমূল্য পকেট থেকে একটা ওটিন স্নো বের ক'রে রেণুর হাতে দিয়ে বলল, 'পাল ব্রাদার্স থেকে একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা। বুড়ো বিষ্টু বাবুর নাকের সামনে পাঁচ টাকার নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, 'চেঞ্জ প্লিজ! একটু তাড়া আছে বাইরে।'

রেণু হেসে বলল, 'এতও জানো তুমি, আর এতও তোমার মনে থাকে!'

রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাঁপছে এখনো। এত সাহস কি ভালো ?'

রেণুর খোঁপার ওপর সাদরে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অমূল্য বলল, 'সাহস ভালো নয় ? সাহস না থাকলে এত দিন উপোস ক'রে মরা ছাড়া গতি ছিল না কি ? তোমার মত ভারু হলেই হয়েছিল আর কি! আস্ত একটি অকম্মার ধাড়ী; তোমার মত অমন সুবিধা-সুযোগ যদি আমার থাকত!'

অভিমানে কথা ফুটল না রেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার। এর জবাব রেণু স্বামীকে এক দিন না এক দিন না দিয়ে ছাড়বে না।

দু'-তিন দিন বাদে। সুযোগ তো এসেছে, কিন্তু রেণুর হাত কাঁপে আর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। দেয়ালের এক কোণে পেরেকে বিনোদ বাবুর হাত-ঘড়িটা ঝুলানো রয়েছে। এমন প্রায়ই থাকে। ভারি ভুলো মন বিনোদ বাবুর। যে দিন অফিসের বেলা বেশী হয়ে যায়, সে দিন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোন দিন বা ঘড়ি ফেলে যান, কোন দিন মণিব্যাগ।

খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে মাসীমা অচেতন ভাবে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর কোলের ছেলেকে দুধ খাইয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল রেণু। নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই যেন শুনতে পাচ্ছে রেণু। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি

এত শব্দ হয়? না, এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ। একবার রেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার সাধ্য নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাটা দু'টি তার দু'চোখের তারাকে বিদ্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে, যদি খোঁজ পড়ে ঘড়ির। তার রেণু কি জানে? এই ছ' মাস ধ'রে বিনোদ বাবুদের ঘরে সে আসে যায়, বসে, গল্প করে, একগাছা কুটো পর্য্যন্ত নড়চড় হয়েছে কেউ বলতে পারবে?

রেণু যখন কোন রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব্ব। আর একবার ছোট ঘড়িটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শ কি এত তীব্র, এত উত্তেজক, এত রোমাঞ্চকর?

সন্ধ্যার পর অমূল্য ম্লান মুখে ঘরে ফিরে এলো। আজ আর কোন দিকে সুবিধা হয়নি হঠাৎ। রেণুর দিকে চেয়ে অমূল্য অবাক্ হয়ে গেল।

—'কি ব্যাপার, আজ যে একটু বিশেষ সাজের ঘটা দেখছি।'

দরজায় খিল দিয়ে এসে রেণু স্বামীর সঙ্গে প্রায় মিলে গিয়ে স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বলল, 'অত হিংসা কেন, সাজ তোমারও আজ মন্দ হবে না। যদিও কেবল এই রাত্রিটুকুর জন্য। কিন্তু একটা রাত্রিই কি কম?'

অমূল্য ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ, একটু পরিষ্কার ক'রে বল, হেঁয়ালি ভালো লাগে না সব সময়!'

রেণু বলল, 'সবুর, সবুর, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তোমাদের সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো, একটুও ধৈর্য্য সয় না প্রাণে, না?'

খাওয়া দাওয়ার পরে আলো না নিবিয়েই স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল রেণু।

অমূল্য অবাক্ হয়ে বলল, 'আলোটা কি সারা রাত জ্বালাই থাকবে না কি আজ?'

রেণু মুচকি হেসে বলল, 'থাকলই বা, ক্ষতি আছে না কি তাতে? না গো না, সারা রাত জ্বালা থাকবে না, একটু পরেই নিববে। দেখি, দেখি, বাঁ হাতখানা বার কর দেখি।'

—'বাঁ হাত দিয়ে আবার কি করবে।'

—'অল্প একটু দরকার আছে।'

ব্লাউজের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডশুদ্ধ ছোট ঘড়িটুকু বের ক'রে রেণু স্বামীর মণিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলল, 'দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে?'

অমূল্য মুহূর্ত্ত কাল অবাক্ হয়ে থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি সর্ব্বনাশ, এ তুমি কোথায় পেলে?'

রেণু গভীর রহস্যলোক থেকে যেন মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তা নিয়ে তোমার দরকার কি, মানাচ্ছে কি না তাই বলো।'

তার পর হঠাৎ উঠে গিয়ে লাইটটা অফ ক'রে এসে রেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোন কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় ক'রে ফিরেছে।

—'কি গো, কথা বলছ না যে। বলো না, ঠিক মানিয়েছে কি না?'

মানাবারই তো কথা। আজ রেণু তার যথার্থ সহধর্ম্মিণী। এত দিন ধ'রে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা ক'রে এসেছে। আজ তার উল্লসিত হয়ে উঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত হাতখানি তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে, তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-কণিত মৃণাল-ভুজ নয়, তাও আজ পরুষ-কঠিন, শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

আনুকারিক হাস্যরস

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত সাহিত্যে নব রসের মধ্যে হাস্যরসের একটি স্থান আছে। ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরসের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

সাহিত্যকে যদি সত্য সত্যই জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে জীবনে হাসির যে মূল্য দিই, সাহিত্যেও তাহার সেই মূল্য স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। জীবনেও যেমন হাসির প্রকার-ভেদ আছে, সাহিত্যেও তাহা না থাকিয়া পারে না। হাসির কারণ সম্বন্ধেও একই কথা বলিতে হয়।

শান্তরসেও হাস্য সঞ্জাত হইতে পারে। পুত্র যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করে, তখন পিতার মনে আনন্দের উদ্রেক হয়। সেই আনন্দ মুখে স্মিতহাস্যের সঞ্চার করে। এই যে হাসি, ইহা কিন্তু হাস্যরসের বিষয়ীভূত নহে। হাস্যরসের হাসির মধ্যে আছে কৌতুকের প্রাধান্য। যে হাসির মূলে কৌতুক নাই তাহা আর যে রসেরই উদ্রেক করুক না কেন, হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে না।

কৌতুক জিনিষটার উৎপত্তি হয় অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি হইতে। যাহা হওয়া উচিত এবং যাহা হইতেছে বা হইয়াছে অর্থাৎ সম্ভাব্য এবং সম্ভূত—এই দুইয়ের মধ্যে যখন বিরোধ ঘটে তখনই তাহা কৌতুকের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য দুই জোড়ার দুই পাটি জুতা পায়ে দিলে হাসি পায়, বাড়ীতে বিলাতী কাপড় পরিয়া সভাস্থলে খদ্দর ব্যবহার করিলে হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়, পুরুষ মানুষের মেয়েলি ভাব দেখিলে হাসি আসে। যাহার ঘরে 'ছুঁচোর কীর্ত্তন' বাহিরে সেই ব্যক্তির কোঁচার পত্তন হাস্যকর।

কৌতুক হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাকে ঠিক আনন্দ বলা চলে না, তাহাকে আমোদ নাম দিলেই সঙ্গত হয়। আনন্দে স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু আমোদে আছে উত্তেজনা। এই উত্তেজনার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার কিছু না কিছু যোগ আছে। কৌতুকের মধ্যে সেই নিষ্ঠুরতার নিদর্শন সুস্পষ্ট।

A degree of barbarism and rusticity seems necessary to the perfection of humour (১)—

(১) English Humour—J. B. Priestley.

অর্থাৎ কতকটা পরিমাণে বর্ব্বরতা এবং গ্রাম্যতা হাস্যরসের সম্পূর্ণতা সাধনের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। প্রিষ্টলি সাহেবের এই অনুমান অনেকাংশে সত্য। বাসরঘরে শ্যালিকার হস্তে কর্ণমর্দ্দন, তন্দ্রাগত গুরু মহাশয়ের শিখা কর্ত্তন, নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকায় নস্য প্রদান, চেয়ারে বসিতে দিয়া উপবেশনকারীর অজ্ঞাতে চেয়ার অপসারণ প্রভৃতি সুপ্রচলিত কৌতুক প্রচেষ্টা শাস্তরসাম্পদ বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। ইহাদের মধ্যে আঘাত আছে বলিয়াই কৌতুক।

কৌতুকহাস্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজউদ্দৌলা দুই জনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত, তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন।" (২)

কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা এক রকম বুঝা গেল। কিন্তু কৌতুকের সহিত যে অসংগতির অবিচ্ছেদ্য যোগ সে অসংগতিটা কোথায়? তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

"ইহার মধ্যে অসংগতি কোথায়? নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসংগতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

"এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্য্যের অসংগতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।" (৩)

কৌতুকের মধ্যে যে আঘাত আছে তাহার মূল কারণটাই হইল নিয়মভঙ্গ। "নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্য নৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ক এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।" (৪)

এই নিয়মভঙ্গ এবং তজ্জনিত পীড়া এবং তজ্জাত উত্তেজনা ইহাদিগকেও স্থূল সূক্ষ্ম, অমার্জিত, সুমার্জিত, ইতর, ভদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীকেও নানা স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বৈয়ক্তিক পরিহাসই বিবর্ত্তনবিধি অনুসরণ করিয়া সাহিত্যিক পরিহাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। আদিম মানবের সহিত আধুনিক মানবের যে পার্থক্য, আদিকালের রসিকতার সহিত আধুনিক যুগের রসিকতার সেইরূপ প্রভেদ। তবে অদ্যকালীন মানব-সমাজেও যেমন আদিমকালীন মনোভাবের পরিচয় একেবারে দুর্ল্লভ নয়, হাস্যরসেরও তেমনই।

নিয়মভঙ্গ বা অসংগতি কৌতুকের উপকরণ বটে, কিন্তু নিয়মভঙ্গ কি কি উপায়ে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর যদি দিতেই হয় তো এক কথায় দেওয়াই ভাল, যেহেতু, অনেক কথায় তাহা দেওয়া অসম্ভব।

---

(২) কৌতুকহাস্যের মাত্রা, পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) " " "
(৪) " " "

আর সে এক কথা এই যে, নিয়ম ভাঙ্গিলেই নিয়মভঙ্গ হয়। বস্তুতঃ, ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়মভঙ্গের অভাব নাই। বরং নিয়মটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইয়া দাঁড়ায়।

যাহার কণ্ঠে সুর নাই, সে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, যে ছন্দ মিলাইতে অক্ষম, সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে নিজে বিকৃত-মস্তিষ্ক, সে অন্যকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছে, খোসামোদ-প্রিয় বলিয়া যে রামের নামে নিন্দা রটায়, সেই আবার রামের শ্রীচরণ-কমলে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতেছে। যাহা হওয়া উচিত তাহাই নিয়ম। কিন্তু যখন উচিতের স্থলে অনুচিতটা ঘটিয়া বসে তখনই হয় নিয়মভঙ্গ। নিয়মভঙ্গের কি অভাব আছে?

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।

ভক্ত সাধকের মুখে ভক্তির বাণী। শুনিয়া মন মুগ্ধ হয়। কথার মধ্যে কারীগরি নাই। অলঙ্কারের আড়ম্বর নাই। কিন্তু হৃদয়ের যে আবেগ—অন্তরের যে অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসটুকু বাহির হইয়া পড়িতেছে তাহা ভক্ত পাঠকের বা শ্রোতার অন্তঃকরণ স্পর্শ না করিয়া পারে না। কিন্তু ঐ সুরের অনুকরণে আজু গোঁসাই যখন গান ধরিলেন,—

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি রে তোর মেসো আর মাসী।

অমনি আমাদের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইল। একটা মহৎ ভাবের মাথায় যেন কোন্ দুষ্ট ছেলে সশব্দে ভুঁইপটকা ফাটাইয়া বসিল।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটি।

আজু গোঁসাই উত্তর করিলেন :

এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি।
যার যেমন মন, তার তেমনি মন কর রে পরিপাটি।
ওহে সেন, অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ওরে, শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।
জনক রাজা ঋষি ছিল কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে খেতে পেত দুধের বাটি।
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।

এই গানের মধ্যে অতিরিক্ত আর একটি চরণ কোথাও কোথাও পাওয়া যায় :

যদি ধোঁকাই জান তবে কেন তিনবার বেঁধেছ ঘুঁটি।

পুত্র না হওয়ায় রামপ্রসাদ না কি তিন বার বিবাহ করিয়াছিলেন—তাই এই ব্যঙ্গোক্তি।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

মুক্ত কর, মা মায়া-জালে।

অমনি আজু গোঁসাই ধরিলেন :

বন্ধ কর মা খ্যাপলা জালে।
যাতে চুনো পুঁটি এড়াবে না মজা মারব ঝোলে ঝালে।

ইউরোপীয় আলঙ্কারিকগণ হাস্যরসের যে বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, wit তাহার অন্যতম। Wit বড়র বড়ত্ব সহিতে পারে না। এক জন গুণী ব্যক্তি যদি খোঁড়াইয়া চলেন তো সে গুণটাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া খঞ্জতা লইয়াই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে। রামপ্রসাদের গানে সংসারের অসারতা সম্পর্কীয় যে মহত্ত্বাবের অভিব্যক্তি আছে, তাহাই ঐ কথা কয়টিকে মনোজ্ঞতা দিয়াছে। সেই জন্যই প্রসাদী গান শুনিয়া আমাদের অন্তর তৃপ্ত হয়। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদী গানের মর্মটা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়কে নিতান্ত হাল্‌কা হাসির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন।

কিন্তু আজু গোঁসাই হাস্যরস পরিবেশন করিতে গিয়াও মাঝে মাঝে বিপদে পড়িয়াছেন। ভাবুক তত্ত্বজ্ঞানী লোকের পক্ষে হাস্যরসিকতা তেমন জমে না। গোঁসাইজীর রসিকতা ও তত্ত্বকথার সংমিশ্রণে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পায় নাই।

"শিবের ভাবে ভাব না কেন শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।"
"মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।"
"অভেদ জেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।"

প্রভৃতি পংক্তি হাস্যরস ব্যাহত করিয়াছে। কারণ, হাস্যরসে যে কৌতুক—যে অসংগতি থাকা আবশ্যক, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানে যেন সমস্ত হাস্য-পরিহাসের সমাপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত ছত্রগুলি বাদ দিলে আজু গোঁসাইয়ের গানকে প্যারডি আখ্যা দেওয়া যাইত। কারণ, প্যারডি শুধু যে কবিতা বা গানের অনুকরণ মাত্র তাহা নয়, উহা হাস্যরসাত্মকও হওয়া চাই।

আমরা আজু গোঁসাইয়ের গান হইতে দেখিলাম যে, অনুকরণ মাত্রেই হাস্যরস নাই। অনুকৃত্য এবং অনুকৃতির মধ্যে আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যটা যদি নিতান্ত প্রকট হয় তবেই তাহা কৌতুকাবহ হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে কেহ হাস্যরসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিবে না। কারণ, উভয় রচনায় ভাবের কিছু সাম্য আছে। অন্ততঃ এতটা অসাম্য নাই—যাহা সহজে ধরা যায়।

অনুকরণ হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম উপায়। বঙ্গসাহিত্যে সেই উপায়টির কিরূপ প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। অনুকরণের দ্বারা অসংগতি প্রদর্শনের সুবিধা আছে বলিয়াই হাস্যরসের ক্ষেত্রে অনুকরণের বাহুল্য দেখা যায়। সে অনুকরণ নানাবিধ।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস নূতন নয়। ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী হে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।

অথবা

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।

স্মরণ করুন। ইহাতে বাংলার উচ্চারণ রীতি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বিচিত্র বোধ হয় বটে, কিন্তু তবু ইহারা হাস্যোদ্রেক করে না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও।
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।

'যক্ষের নিবেদন' হইতে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি পড়ুন। মন্দাক্রান্তা ছন্দ বাংলা ভাষার পথে হ্রস্ব দীর্ঘের বাহন পাইয়া দিব্য সহজ গতিতে চলিয়াছে। কৌতুকের কোন অবসর নাই। কিন্তু যদি কোন ছান্দসিক পণ্ডিত বাঙ্গালী ছাত্রকে সংস্কৃত ছন্দ শিখাইবার জন্য রচনা করেন:

ঢাকা কুমিল্লা বরিশালবাসী
লঙ্কামরীচেষু সদাভিলাষী।
জেলে গিয়া কষ্ট করে কয়েদী
গঙ্গাতীরে বাস করে তপস্বী।

তাহা হইলে না হাসিবার উপায় নাই। সংস্কৃত কবিতায় যখন গুরু-গম্ভীর কোনো একটা কিছু শুনিবার জন্য প্রত্যাশা করিতেছি, তখন অকস্মাৎ একটা একান্ত তুচ্ছ—একান্ত অসম্ভব কথা আনিয়া ফেলা হইল। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ছন্দ রক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ভাষারই উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা হইল।

সংস্কৃতে পঞ্চকন্যা স্তোত্র আছে:

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।

অনুকরণ করা হইল:

হেয়ার কল্বিন পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চগোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।

বিষয়-বস্তু হাস্যকর না হইলেও ভঙ্গীটা হাস্যকর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত ছন্দে কয়েকটি সুমধুর হাস্যরসাত্মক কবিতা আছে।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত টঙ্কাদেবী-মাহাত্ম্য:

ইচ্ছা সম্যক্‌ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে দুঃখ-জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না, খালি ভস্মে ঘি ঢালা।

শিখরিণী ছন্দে রচিত ইঙ্গ-বঙ্গের বিলাত-যাত্রায় কৌতুকটা একটু প্রবল:

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে।
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজনবশে কিছু হয় না।
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিহরনে মান যায় না।
পিতা-মাতা-ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছুট করি'।
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কুর্তা বুট পরি'।
সিগারে উদ্‌গারে মুহুরমুহু ধূম-লহরী।
সুখস্বপ্নে আপনে মুলুকপতি মানে হরি হরি।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে ফেটিক করি।
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে।
কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
ফিরে এসে দেশে গলকলরবেশে হটহটে।
গৃহে ঢোকে রোখে উলগ তনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে।
ছুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

ইংরেজী সাহিত্যে প্যারডি অসংখ্য এবং অনেক প্যারডি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যেও প্যারডি রচনার চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চদরের প্যারডি অধিক নাই, এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত কবিতারই প্যারডি হইয়া থাকে। প্যারডিতে সাধারণতঃ কবিতার উচ্চ কল্পনা থাকে না, থাকে witএর অম্লমধুর উত্তেজনা। মূল কবিতাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া তাহার উত্তুঙ্গ মাহাত্ম্যকে ধূলিশায়ী করাই প্যারডির ধর্ম্ম। সেই জন্যই উহা হাস্যরসের কারণ।

হাস্যরস সাহিত্যের অঙ্গ নয়, উহা সাহিত্যের ব্যঞ্জন। কিন্তু ব্যঞ্জনটাই যখন ভোজনপাত্রের একমাত্র আধেয় হয়, তখন ভোজপর্ব্বটা ভোক্তার সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। তবে এমন ঔদরিকও আছে, যে এক কলসী নলেন গুড় পাইলে পরম তৃপ্তিভরে তাহাই গলাধঃকরণ করে। সাহিত্য সমাজে এইরূপ ঔদরিকের সংখ্যা বিরল নয় বলিয়া ভাঁড়ের ভাঁড়ামিও রসিকতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 'ডি প্রোফণ্ডিস' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন :

"ইংলণ্ডের হাস্যরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র 'পঞ্চে' এই কবিতাটিকে বিদ্রূপ করিয়া 'De-Rotundis' নামক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। (মূলটিকে কবিতা এবং অনুকৃতিকে পদ্য বলা হইয়াছে।) আমরা এরূপ বিদ্রূপ কোনো মতেই অনুমোদন করি না। এরূপ ভাব ইংরেজদের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান্ ভাবের কবিতাকে বিদ্রূপ করা তাঁহারা আমোদের মনে করেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন যে, কোনো কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া রং ঢং মাখাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দশ জন অলস লঘুহৃদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি এক জন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভামধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে তবে তাহা দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের ধোবা-নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।"

হাস্যরসের উপাদান মাত্রই দুঃখমূলক। তাহাতে অনেক সময়ই নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। কবি নিজেই তাহা দেখাইয়াছেন।

যদি কেহ কোন মান্য ব্যক্তির অনুকরণে বিকৃত মুখভঙ্গী করে, তাহা হইলেও কৌতুকের কারণ ঘটে। যে নিষ্ঠুরতা এবং অসংগতি কৌতুকের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সেই কৌতুক রসই যদি হাস্যের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার ধোবা-নাপিত বন্ধ করিবেন কেন?

পঞ্চভূতে কবি নিজেই হাস্যরসের যে উদাহরণটি দিয়া কৌতুকের প্রকৃতি বিচার করিয়াছেন, সেটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

"একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্যের উদ্রেক করিয়াছিল।"

হুঁকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নয় এবং আনন্দজনকও নয়; তবু তাহা আমাদের হাসি উদ্রেক করে। কেন করে, সে আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু উদ্রেক যে করে তাহা তো অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন :

"কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেবলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।...এইরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে।"

মানুষের স্বভাব জিনিষটা এমনই স্বৈরাচারী যে, সে বিজ্ঞের নিষেধ, প্রবীণের নির্দেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন এ সব সকল সময় মানিয়া চলে না। এমন কি, বিধির বিধানকেই মধ্যে মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া বসে। কৌতুকে হাসিয়া উঠা মানুষের স্বভাব, এবং কৌতুক করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ক্ষেত্রবিশেষে কৌতুক-প্রচেষ্টা এবং তাহা দেখিয়া হাস্য করা সুরুচিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

বস্তুতঃ একই আঘাত কাহারও পক্ষে অল্প, আবার কাহারও পক্ষে অধিক পীড়াদায়ক। তাই একই ব্যাপার এক জনের কাছে ক্রীড়া হইলেও অপরের কাছে দুঃখের কারণ। কৌতুক বস্তুটা কতক পরিমাণে আপেক্ষিক। যে উত্তেজনা কৌতুকের জন্মদাতা, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট আছে।

"এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতা-বায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূট-ধূম-পিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না। কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যতমুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত।"(৫)

ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যে সভায় এক জন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির হৃদয়নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিলে সকল সভাসদই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, এমন সভায় কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা মুখভঙ্গী করিতে সাহস পাইবে না। পাইলেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

প্যারডি জিনিষটাও একটা অমার্জ্জিতরুচি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-মণ্ডলীর জন্য রচিত হয় না। তাহা সর্ব্বসাধারণে পড়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য তাহা রচিত হয়। অমার্জ্জিত এবং অনতিমার্জ্জিত রুচির খোরাক জোগাইয়া তাহা অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। মূল কবিতার যদি সত্যই কিছু বিশেষত্ব থাকে তাহা হইলে তাহা নিজগুণেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহত থাকিবে।

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, প্যারডি মাত্রই বিদ্রূপাত্মক নহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেছি। এটি একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্যারডি। মূল ছড়াটি হইল :

"জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ।

---

(৫) পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো কন্তে, তোমার হাতের শঙ্খ॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা করবী রাঙা রাঙা কুসুম ফুল।
তাহার অধিক রাঙা কন্তে, তোমার মাথার সিঁদুর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো কন্তে, বোন সতিনের ঘর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম কন্তে, তোমার বুকের ছাতি॥"

রবীন্দ্রনাথের প্যারডিটি এইরূপ :

"এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি।
তাহার অধিক মিঠে কন্তে, তোমার হাতের চাপড়ি॥
এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ।
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি।
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি॥
এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত।
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত॥
এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর ত
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি
এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
মিথ্যে ভেল্কি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না।
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥" (৬)

যাহা নিজেই হাস্যকর তাহার অনুকরণের দ্বারা হাসির উদ্রেক হয় না। অন্তত: হাস্যরসের পক্ষে তাহা অনুকরণীয় নহে। প্যারডির ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে সকল রচনা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে, প্যারডি রচনার পক্ষে তাহাদেরই উপযোগিতা বেশী। কিন্তু হালকা জিনিষও যে প্যারডি উদ্রেক করিতে পারে, উল্লিখিত কবিতাটি তাহার একটি সুন্দর নিদর্শন।

(৬) প্রহাসিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটাই সাধারণতঃ প্যারডির উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতাটি মনে করুন :

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে। ইত্যাদি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি :

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই
পথে যে ভয়ানক কাদা ;
বাড়ির লোক বলে ঘরেতে বসে থাকা
কেমন আরামটি দাদা।
পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি
গরমে গেল গেল প্রাণ ;
বাড়ির লোক বলে আহা হা কি আরাম
টান রে টানাপাখা টান।
পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
পথ যে ফুরায় না হরি ;
বাড়ির লোক বলে ঘুম তো ভেঙে গেল
দিন যে যায় না কি করি।

অথবা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ"—এর দ্বিজেন্দ্রলালকৃত প্যারডি :

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হল মরি লাজে—
আলু-থালু এই কবরী আবরি এই আলু-থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পসারী,
রাস্তায় লোক, আমি কুলনারী,
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়ে চলিব পথের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের "আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি"—গানের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন :

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি liesure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
দাঁত বের করে হাসিও।

ব্রাহ্ম-সঙ্গীতও দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই :

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটি করে আর অন্যে করবে সিংহনাদ।
অন্যে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে ;
শমন এসে বলবে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ।
ঘুঘু দেখেছ তো ফাঁদ এখন তবে দেখ ফাঁদ।

[ক্রমশঃ

ভূপতি চৌধুরী বি-এস্‌-সি। নর্থ সাবার্ব্বান স্কুলে অঙ্কের টীচার। বয়স ত্রিশ পার হয় নাই; এখনি মাথার সামনের দিকে টাক পড়িতেছে, গোঁফগুলা কাঁপিয়া উঠিয়াছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি···রবিবার ছাড়া কামানোর ফুরশৎ মেলে না! বেশ-ভূষা নাই। চেহারা সুশ্রী হইলেও ঔদাস্যে-অবহেলায় যেন কেমন এক-রকম!

বিবাহ হয় নাই। বিবাহের অবকাশ কোথায়? পাড়াগাঁয়ে বাস করিত; বাড়ীতে বিধবা মা আর বিধবা বোন। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছিল···তার পর দু'-দু'টা পাশ করিয়াছে। পাশ করিয়া নর্থ সাবার্ব্বানে মাষ্টারী করিতে ঢুকিয়াছে। মাহিনা যাট টাকা; তার উপর একটা টুইশনি আছে শ্যামপুকুরে রামময় বাবুর বাড়ী। সেখানে পায় ত্রিশ টাকা। এই নব্বই টাকার উপর নির্ভর! চেষ্টা করিলে হয়তো আরো দু'-চারিটা টুইশনি মেলে···বেশী মাহিনার ব্যবস্থাও হয়তো হয় অন্য স্কুলে গেলে—কিন্তু সে-চেষ্টা করিবে, সময় কৈ? থাকে কম্বুলিয়াটোলার গলিতে রায়-মশায়ের মেশে। এ মেশের সঙ্গে পরিচয় সেই কলেজে পড়ার সময় হইতে!

সেদিন সোমবার। ধোপার পাট খুলিয়া কাচা কোট-ধুতি বাহির করিয়া পরিতে গিয়া দেখে, কাপড়ের মাঝখানটা খোঁচায় ফাঁসানো—কোটের ডান হাতের নীচের দিকটা মসী-ধরা ছোপ্‌! বিরক্ত হইল। কোট আর ধুতি হাতে রায়-মশায়ের কাছে আসিয়া হাজির হইল। রায় মশায় তখন চাকরের সঙ্গে মাছের দর লইয়া রসাতল-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে! মাছের জন্য বরাদ্দ দেড়টি করিয়া টাকা! চাকর বিশ্বনাথ আজ মাছে সাত সিকা খরচ করিয়া আসিয়াছে। রায় মশায় বকিতেছে, এ ভাবে খরচ বাড়াইলে তাকে এখানকার পাততাড়ি গুটাইতে হইবে! বিশ্বনাথ বলিতেছে—মাছের দর কি রকম চড়া! এই যুদ্ধের বাজার! বাবু নিজে বাজারে গিয়া দেখিয়া আসুন না! তর্কের মুখে বিশ্বনাথ এমন কথাও বলিয়াছে, না পোষায়, তাকে ছুটি দিলেই ঢুকিয়া যায়···মেশে সাত বাবুর খিদ্‌মত খাটিয়া পায় দশটি করিয়া টাকা। কারখানায় গিয়া ঢুকিলে এখনি কম্‌সে-কম্‌ ডেলি তিন টাকা মিলিবে···

কথা শুনিয়া রায় মশায় একেবারে থ! স্ত্রী-পুত্র গেলে যুদ্ধের বাজারে আবার স্ত্রী ও পুত্র মিলিবে, কিন্তু ভৃত্য গেলে পাগলের মতো নৃত্য করিতে হইবে···মাথা খুঁড়িয়া রক্ত-গঙ্গা হইলেও ভৃত্য মিলিবে না!

বিষণ্ণ বিরক্ত মন···তার উপর ভূপতি আসিয়া নালিশ জানাইল—এ রকম করলে তো আর পারা যায় না। আপনি ধোপাকে জরিমানা করুন···ধুতিখানা খোঁচা লাগিয়ে ফাঁসিয়ে এনেছে, দেখেছেন? বলিয়া ভাঁজ খুলিয়া রায় মশায়ের সামনে মেলিয়া ধরিল···তার পর রোষে ক্ষোভে অভিমানে বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—একখানা ধুতির এখন কি দাম, জানেন তো! আর-বারেও একটা সার্টের হাতা ফাঁসিয়ে এনেছিল···

রায় মশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না। সে বলিল—পুরোনো ধুতি।

ভূপতি বলিল—পুরোনো হলেও আস্ত ছিল তো তার পর, এই কোটের হাতা দেখেছেন? বলিয়া হাতার মসী-ধরা দাগ দেখাইল।

রায় মশায় বলিল—বললে আপনি রাগ করবেন, কিন্তু মাষ্টার মশাই, বোর্ডের খড়ির অঙ্ক আপনি ন্যাগে·না মুছে যদি জামার হাতা দিয়ে মোছেন, তাহলে লোহাতেও ছাতা ধরে মশাই, এ তো সুতির কোট!

কথাটা সত্য! কোটের হাতায় বোর্ড মোছা তার কেমন মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে!

কথা বলিয়া রায় মশায় ঝোলা চশমাখানাকে নাকের উপরে তুলিয়া হিসাবের খাতা খুলিল। নিরুপায় বুঝিয়া ভূপতি বিদায় লইয়া আসিল।

বাড়ী হইতে মা চিঠি লিখিয়াছেন, এই সংক্রান্তিতে তিনি আর দিদি···দু'জনে যাইবেন প্রয়াগে তীর্থ করিতে! সুবিধা হইয়াছে গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা সপরিবারে প্রয়াগে চলিয়াছে, এমন ভালো সঙ্গী আর কখনো ভাগ্যে মিলিবে না···তাই ভূপতি যেন মনি-অর্ডার করিয়া অবিলম্বে তীর্থের ব্যয়-ভূষণের জন্য মাকে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দেয়। বিধবা মায়ের তীর্থ-পুণ্যার্জ্জনের দায় সন্তান হইয়া যদি গ্রহণ না করিল তো ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেভিংস-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া ভূপতি দেখে, ব্যালান্স টু ক্রেডিট একশো বারোটি টাকা। তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা তীর্থের জন্য তুলিয়া দিলে···

কিন্তু উপায় নাই! মা টাকা চাহিয়াছেন। স্কুলের পথে শ্যামবাজার পোষ্ট অফিস হইতে একখানা উইথ-ড্রয়াল ফর্ম্ম লইয়া সেখানার ফাঁক্‌ ভরাট করিয়া টাকা তুলিল।

ঘড়িতে বাজিল এগারোটা। সর্ব্বনাশ! সাড়ে এগারোটায় তার ক্লাশ নাইন! মনি-অর্ডার করিতে গেলে এখন ঐ কিউয়ে লাইন করিয়া দাঁড়ানো···যার নাম, কাজ চুকিতে বেলা সেই দু'টো!

···মনি-অর্ডারের একখানা ফর্ম্ম চাহিয়া লইয়া ভূপতি স্কুলে আসিল।

দেশবন্ধু পার্কের ও-পাশে স্কুল।···

ক্লাশ নাইনে এ-আওয়ারে আজ এ্যালজেব্রা! ক্লাশে ঢুকিয়াই কণ্ঠে 'সাইলেন্স'-হাঁক! তার পর বোর্ডের সামনে গিয়া খড়ি হাতে অঙ্ক ফাঁদা—ফ্যাক্টরাইজ···

পিছনে গানের কলি ভাসিয়া উঠিল,

কেন রে তুই ফুটলি বনে

বিজন বনে, ও বনের ফুল!

স্প্রিং টিপিলে কলের পুতুল যেমন ঘাড় ফিরায়, তেমনি ক্ষি বেগে ভূপতি ঘাড় ফিরাইল। ঘাড় ফিরিতেই চোখ পড়িল বে উপবিষ্ট শ্যামলের উপর। শ্যামল গান গাহিতেছে।

ভূপতি ডাকিল—শ্যামল···

বলিল,—স্যার···

—ষ্ট্যাণ্ড আপ···

শ্যামল দাঁড়াইল।

ভূপতি কহিল—ক্লাশে গান গাইছ!

—সঙ্গীত···বিদ্যা! সাধনা করছি, স্যার। মিউজিক-কম্পিটিশ এবারে নাম দিয়েছি।

—না। ক্লাশে বসে গান গাইবে না!···

শ্যামল বলিল—অঙ্ক আমার মাথায় আসে না স্যার, জোর করে আপনি আমার মাথায় অঙ্ক গুঁজে দেবেন?

মুখের উপর এমন করিয়া কথা কয় পিউপিল্! ডিসিপ্লিন থাকিবে কেন?

ভূপতি কহিল—আমি যেমন বুঝিয়ে দেবো, তোমারো তেমনি বোঝবার চেষ্টা করা চাই!

শ্যামল কহিল—জোর করে অঙ্ক হয় না, স্যার! কালকে সিনেমায় শুনে এলুম খুব খাঁটি কথা···হীরোইন চম্পা বলছিল—গান শেখা বলো, প্রেম করা বলো, জোর করে বা গাঁট্টা মেরে ও হয় না, হতে পারে না।

ক্লাশ-শুদ্ধ ছেলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভূপতির মুখ-চোখ রাগে অপমানে ঝাঁজিয়া লাল। ভূপতি জোর গলায় বলিল—সাইলেন্স!

ছেলেরা চুপ। ভূপতি চাহিল শ্যামলের দিকে, বলিল—তোমার নামে আমি হেডমাষ্টার-মশাইকে রিপোর্ট করবো, ইউ আর ব্যাড··· ভেরী ব্যাড!

—করুন রিপোর্ট। আমি এ-লাইন ছেড়ে দেবো স্যার, মিউজিক ক্লাশে ঢুকবো। পাশ করে তো ভারী লাভ! আপনি যে এত মার্ক পেয়েছেন, স্কুলে ক'টা টাকাই বা পান! মিউজিক শিখে আমি সিনেমা-লাইনে যাবো। মিউজিকাল্-ডাইরেকটর হবো। জানেন না তো রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক···এরা কি ছিউজ্ টাকা মাহিনা পায়!

ভূপতি রাগিয়া উঠিল···তীব্র স্বরে ডাকিল,—শ্যামল···

শান্ত স্বরে শ্যামল বলিল—ক্লাশ থেকে বার করে দেবেন? ···তা কেন, আমি নিজে থেকেই যাচ্ছি।

এ কথা বলিয়া বেশ নির্লিপ্ত ভাবেই বই-খাতা হাতে লইয়া ক্লাশ হইতে সে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় গাহিল,—

তুই চাঁপা নোস্, গোলাপ নোস্,
নোস্ রে বকুল!

ভূপতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। দুই চোখের সামনে যেন আগুনের গোলা ঘুরিতেছে!

বেলা চারিটায় স্কুলের ছুটি। ছুটির পর ভূপতির ডিউটি, দিনের মাহিনা-কালেক্সনটুকু মিলাইয়া গণিয়া থলিতে ভরিয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা। সে ব্যাপারে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। তার পর সাড়ে চারিটায় স্কুল বন্ধ করিয়া সে আসে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট চিত্রার সামনে একটা হোটেলে। সেখানে বসিয়া এক পেয়ালা চা, দু'টা ডিমের ওমলেট, আর দু'-পিস্ টোষ্ট রুটি খাইয়া দেহ-রক্ষার ব্যবস্থা করে; তার পর শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের রামময় বাবুর গৃহে টুইশনি স'-পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত।

সেদিন আসিয়া হোটেলে দেখে, ভীষণ ভিড়। কিশোর-কিশোরীর ভিড় একটু বেশী। সব ক'টি আসনই পূর্ণ···কোণের দিকে একটা টেবিল শুধু খালি। ভূপতি গিয়া সেই টেবিলের সামনে বসিল। বয় আসিয়া নিত্যকার রুটিন-মাফিক্ আনিয়া দিল চায়ের পেয়ালা, ওমলেট আর টোষ্ট···

ভূপতি পেয়ালা মুখে দিল···ওদিককার এক বেঞ্চে কিশোর-কণ্ঠে গান ছুটিল—

কেন রে তুই ফুটলি বনে
বিজন বনে রে, ও বনের ফুল!

ভূপতি চমকিয়া উঠিল! চোখ তুলিয়া গায়কের পানে চাহিল। ভাবিয়াছিল, সেই শ্যামলই বুঝি···কিন্তু চাহিয়া দেখে, শ্যামল নয়। শ্যামলের চেয়ে বয়সে অনেক বড়···নিশ্চয় কলেজে পড়ে!

ভূপতি চায়ের পেয়ালায় মন দিল।

হঠাৎ তার সামনে আসিয়া বসিল···ঐ টেবিলেই এক সুবেশা কিশোরী। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের আগমন। তরুণী বলিল—চা আর ভালো কেক্ থাকে যদি তো দু'খানা কেক্।

ভূপতির মাথার মধ্যে রক্ত ছলাং করিয়া উঠিল!···মেয়ে-জাতকে সে অসম্ভব রকম লজ্জা করে···বিশেষ এই বয়সের মেয়েদের···ভূপতির মনে হয়, কঠিন রোগের ব্যাসিলির চেয়েও মারাত্মক! লজ্জায় সে কাঠ হইয়া রহিল। ওমলেট টোষ্ট···সব ভুলিয়া গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিতে লাগিল!

বয় চলিয়া গেল, কিশোরী বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে গান ধরিল—

কেন রে তুই ফুটলি বনে
বিজন বনে রে, ও বনের ফুল!

ভূপতি অবাক্! দেশটাকে হঠাৎ এই এক-গানে আজ পাইয়া বসিয়াছে কেন! ক্লাশে সেই শ্যামল···এখানে ঢুকিবামাত্র ঐ গান ···তার পর এই মেয়েটিও···

ভূপতির কি হইল, সে বসিতে পারিল না···উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়কে ডাকিয়া পয়সা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ঐ কিশোরী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া কহিল—আপনার বই···

ভূপতি দাঁড়াইল···যেন পুতুল! দু'চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তরুণীর উপর নিবদ্ধ। ইলেকট্রিক্ তারে হাত দিলে যেমন শক্ লাগে, সারা মনে তেমনি শক্!···চোখের পাতা কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চোখের তারার উপরে পর্দার মতো আবরণ টানিয়া দিল। অর্থাৎ তার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল।

হাসিয়া তরুণী বলিল,—আপনার বই ফেলে যাচ্ছিলেন,··· এ্যালজেব্রা!···

স্বপ্ন নয়! ভূপতি চোখ মেলিয়া চাহিল···তার পর তরুণীর হাত হইতে বই লইয়া কোনো মতে ছিটকাইয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

পরের দিন সকালে সাদা জুতায় খড়ি মাখাইতেছে, হঠাৎ কে ডাকিল—স্যার···

চোখ তুলিয়া ভূপতি দেখে, ক্লাশ নাইনের সেই ছাত্র শ্যামল। শ্যামলের সঙ্গে দোহারা বনিয়াদী চেহারার একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বেশ মোটা গোঁফ···মুখে সিগার···গায়ে গরদের পাঞ্জাবি। রায় মশায়ের জীর্ণ-মেশে এ-চেহারা একেবারে মানায় না!

জুতা রাখিয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোটা-গোঁফ ভদ্রলোককে দেখাইয়া শ্যামল বলিল—আমার মেসোমশাই।

মুখে শুষ্ক ম্লান হাসি···ভূপতি মেসোমশাইকে নমস্কার করিল।

মেসোমশাই বলিলেন—নিজের স্বার্থে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। অর্থাৎ আমার প্রাইভেট টিউটর চাই···ম্যাথামেটিক্সে ষ্ট্রং। আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছি···ছেলে এবার ম্যাট্রিক দেবে··· অঙ্কে ভারী কাঁচা। শ্যামল আপনার কথা বলছিল। আপনার

অসুবিধা হবে না। যেমন করে হোক ছেলেটাকে ম্যাট্রিকের বেড়া ঠেলে পার করানো চাই-ই···বুঝলেন ?

টুইশনি!···বদলির চাকরি! নিশ্চয় তাহা হইলে ডেপুটি কিম্বা সাব-জজ! বলিলেন, কোনো অসুবিধা হইবে না। মাহিনা মোটা!

ভূপতির বুকের মধ্যে যে-সাহারা মরুভূমি খাঁ-খাঁ করিতেছিল, সহসা সেখানে যেন নির্ঝর বহিল···আর সে নির্ঝরের পাশে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ ওয়েশিস্!

ভূপতি বলিল—কখন পড়াতে হবে ?

মেসোমশাই বলিলেন—যখন আপনার সুবিধা ?

ভূপতি বলিল—সন্ধ্যার সময় রামময় বাবুর বাড়ীতে পড়াই··· সাতটা পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয়।

মেসোমশাই বলিলেন—বেশ, সাতটার পর আমার ওখানে আসবেন।···আমি বাসা নিচ্ছি দেশবন্ধু পার্কের ঠিক পূব-গায়ে। সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত আমার ওখানে যদি ব্যবস্থা করেন, অসুবিধা হবে ?

নম্র মৃদু কণ্ঠে ভূপতি বলিল—আজ্ঞে, না।

—বেশ! তাহলে আজ থেকেই···আমি ত্রিশ টাকা দেবো। আর ঐ সঙ্গে যদি মানে, আমার মেয়ে আই-এস-সি পড়ছে···তাকেও ম্যাথামেটিক্‌স্‌টা একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে পারেন তো আরো পনেরো···মোট পঁয়তাল্লিশ! কি বলেন ?

বুকের মধ্যে হৃদয়-যন্ত্রটা ভীষণ বেগে দুলিয়া উঠিল। পঁয়তাল্লিশ! ওঃ, এ যে কল্পনাতীত! কিন্তু মেয়ে! আই-এস-সি-পড়া মেয়ে! যার নাম···বুকের দোলন চকিতে হইল স্থির স্তম্ভিত! মুখে কথা ফুটিল না···জিভটাকে কে যেন কণ্ঠবিবর হইতে কষিয়া টানিয়া ধরিল!

তাকে মৌন দেখিয়া মেসোমশাই খুশী হইলেন!···মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্‌···এ-জ্ঞান তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ সুদৃঢ়।

—তাহলে বেশ, আজ থেকেই···শুভস্য শীঘ্রং। সাড়ে সাতটায় আপনি আসবেন। এই আমার নাম আর ঠিকানা···

মেসোমশাই পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া ভূপতির হাতে দিলেন! বলিলেন—আপনার টাইম ভালুয়েব্‌ল্‌! সে-টাইম আর নষ্ট করবো না। তাহলে আসি, নমস্কার!

মেসোমশাই চলিয়া গেলেন! ভূপতির চোখের সামনে ছেলে-বেলায় পড়া ইংলিশ হিস্ট্রীর একখানা পাতা ভাসিয়া উঠিল···যেন জুলিয়াস সিজার আসিয়াছিলেন এবং গেলেন ঠিক তাঁরি মতো···ভিনি ভিডি ভিসি!

মেসোমশায়ের নাম গজপতি রায়। সিনিয়র বি-সি-এস··· কলিকাতায় সেক্রেটারিয়েটে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। চাকরি লইয়া ইস্তক মফঃস্বলে কাটাইয়াছেন, তাই কলিকাতার হাকিমী-চাল এখনো মজ্জাগত হয় নাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খবরাখবর রাখেন এবং নিজের প্রোমোশনের চিন্তাকেই সর্বস্ব জ্ঞান না করিয়া তাদের কথাও চিন্তা করেন!···

সাড়ে সাতটায় ছাত্র-ছাত্রীকে ভূপতির হাতে সমর্পণ করিলেন; বলিলেন—ওদের ইংরেজী আর অন্য সাবজেক্টের জন্য ইউনিভার্সিটির শৈলেন মিত্তির একটি ভালো লোক দেছেন! অঙ্কর জন্য ছিল আমার দুশ্চিন্তা···শ্যামল আপনাকে এনে দেছে। ওদের দায় আপনার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত!···

ছাত্রটির নাম দুলাল। এত বড় দুরন্ত অন্যমনস্ক ছেলে ভূপতি জীবনে দেখে নাই!

ছাত্র আজ আসে নাই। সকাল হইতে তার টন্‌শিল্‌ আওরাইয়া আছে···জ্বরের মতো···টি-চাব-সিনামন খাইতেছে। তার আজ ব্যবস্থা হইয়াছে, বিশ্রাম···এ্যাবসলিউট রেষ্ট!

ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও দুলালকে একটি অঙ্ক কষানো গেল না। খাতার পাতায় অঙ্ক লিখিয়া ভূপতি যত বুঝাইয়া দেয়, সে চাহিয়া থাকে উদাস নয়নে অন্য দিকে। ভূপতির সাধনায় সে শেষে বলিয়া ফেলিল—আমার এ ভালো লাগছে না। কলকাতাকে সকলে বলে প্যারাডাইসল, ছাই! যেন একটা খাঁচা! দিনাজপুরে কি আরামেই ছিলুম, স্যার!

দিনাজপুরের সুখময় জীবন-ধারার বর্ণনায় সে মশগুল হইয়া উঠিল! ভূপতি হিমসিম খাইয়া গেল। দুলাল সাফ বলিয়া দিল—দু'-দশ দিন আমাকে সইয়ে নিতে দিন স্যার এখানকার বাতাস। তার পর পড়াশুনা!

ভূপতি ভাবিল, এখানকার বাতাস ধাতে না সহিলে এ-ছেলে কিছু করিবে না! অথচ···

পঁয়তাল্লিশটি টাকা। ভাবিল, ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেন।

পরের দিন ছাত্রী আসিল···নীরজা। তাকে দেখিয়া ভূপতি চমকিয়া উঠিল! এ-মুখ যেন চেনা!

ছাত্রী বলিল—আপনি স্যার!···পরশু দিন হোটেলে এ্যালজেব্রা ফেলে চলে যাচ্ছিলেন! চিত্রার সামনে হোটেল!

ঠিক! এই মেয়েই বটে। গান গাহিতেছিল। বনের ভ্রমরের গান। গায়ে কাঁটা দিল! এত বড় মেয়ের সঙ্গে জীবনে কথা বলে নাই···আর এখানে এই ছাত্রীকে পড়াইতে হইবে!

ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিল। মুখের মধ্যে কথাগুলা যেন সব তালগোল পাকাইয়া গেল—সে-জোট খুলিয়া একটি কথাও নিঃসারিত করিবার জো নাই!···

নীরজা বলিল—শ্যামু বলছিল, আপনার মতো অঙ্ক স্যার কেউ জানে না। বলে, আপনি ভারী কড়া টীচার! জিওমেট্রির মতোই কড়া।

কথার জবাব দিবে কি, মাথা সে তুলিতে পারিল না। মাথা আরো ঝুঁকিয়া যেন মাটিতে ঠুকিয়া যাইবে!

দুলাল বলিল—আমার আজ অঙ্কে মন লাগছে না, স্যার। সিনেমায় গিয়েছিলুম। গ্র্যাণ্ড ছবি···আঃ! দেখে এসে অবধি মনে হচ্ছে, ওরাই সার্থক জন্মেছে···বন-জঙ্গল···এ্যাডভেঞ্চার···কি গ্র্যাণ্ড! আর আমরা এখানে···জিওমেট্রি, এ্যালজেব্রা, নয়, ঐ পাথস্‌ অফ পিসের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছি!

নীরজা বলিল—বাবা দুলালকে পাশ করাবেনই, বলেছেন। লাষ্ট ফাইনালে ম্যাথামেটিক্‌সে ও কত মার্ক পেয়েছিল জানেন? ফিফটীন···আউট অফ হানড্রেড!

খিঁচাইয়া দুলাল বলিল—ড্যাম্‌ ইট···দিলে তো তবু প্রোমোশন।

নীরজা বলিল—শুধু বাবার খাতিরে। বাবা সেখানকার সিনিয়র ডেপুটি···তাই!

দুলাল বলিল—প্রোমোশন না দিলেও আমার ভারী বয়ে যেতো! ··কে চায় ম্যাটি ক পাশ করতে! দু'হাজার দশ হাজার ছেলে ফী বছর ম্যাট্রিক পাশ করছে···তাদের বাইরেই আমি থাকতে চাই। গোয়ালের ওকে আমি গোরু হতে চাই না, মশাই।

নীরজা বলিল—ও কি বলে, জানেন স্যার? বলে, বাইরে গিয়ে এমন কিছু করবে, যার জন্ম দেশ-বিদেশে ওর কীর্ত্তি রটে যাবে!···মা হেসে বলেন, চুরি-ডাকাতি করবি···না হয় জাল-জালিয়াতী!

দুলাল রাগিয়া নীরজার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া এমন জোরে টান দিল যে তার মুখখানা টেবিলে ঠুকিয়া গেল। রাগে অপমানে নীরজার মুখে যেন লাল পদ্ম ফুটিল! সে বলিল—আবার আমার গায়ে হাত! বাবাকে বলে আজ যদি তোমায় বাড়ী থেকে না তাড়াই তো আমার নাম নীরু নয়!

—যা···যা···যা···বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে! ছেলেকে তাড়ানো অমনি মুখের কথা নয়!···

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরজা দুম-দাম করিয়া চলিয়া গেল। দুলাল একখানা বই খুলিয়া বসিল।

ভূপতি আড়ষ্ট যেন কাঠ! মনে হইল, ইহাকে বলে, হাই লাইফ! বাপ রে! বাহির হইতে এই লাইফের সম্বন্ধে মনে-মনে কি ছবিই না রচনা করে!···

বাহিরে অভিযোগ-ভরা কণ্ঠ! নীরজার স্বর! ভূপতির যেন চমক ভাঙ্গিল! সে ঘাড় তুলিয়া চাহিল। দুলাল বই বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইল···নিমেষের জন্ম! তার পর পাশে বাথ-রুমের মধ্যে গিয়া ঢুকিল ···এদিকে গজপতি রায়ের প্রবেশ। পিছনে নীরজা।

গজপতি হাঁকিলেন—দুলাল···

দুলালের ছায়াও ঘরে নাই! ভূপতির উপর গজপতির দু'চোখের দৃষ্টি। ভূপতির মনে চাঞ্চল্য। ভূপতি বলিল—বাথ-রুমে গেছে।

—হুঁ···গজপতি গিয়া বাথ-রুমের দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নাই! বাথ-রুমের ওদিকে ছোট একটা দরজা···খোলা। বুঝিলেন, ঐ খোলা দ্বার-পথে সে সরিয়া পড়িয়াছে।

গজপতি চাহিলেন ভূপতির দিকে; কহিলেন,—কি রকম ছাত্র ···পরিচয় পাচ্ছেন! ইউ মুড বী ভেরী ভেরী ষ্ট্রিক্ট! দরকার মনে করলে উত্তম-মধ্যম দাওয়াই দেবেন!···কর্পোরাল পানিশমেণ্ট!··· বুঝলেন?

ভূপতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দু'মাস পরের কথা। দুলালকে বশে আনিতে ভূপতিকে যে চিন্তা করিতে হইয়াছে, সে-চিন্তার অর্দ্ধেক সে জীবনে করে নাই··· বি-এস-সি এগজামিনের জন্ম নয়···সংসারের জন্মও নয়!··· চিন্তার পাথারে তলাইয়াও তল মিলে নাই। শেষে নীরজা দিয়াছিল বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া···

রবিবার দুলালের সঙ্গে ভূপতিকে সিনেমায় যাইতে হয়। মাঠে খেলাধুলা থাকিলে তাহাও দেখিতে যায়। যেদিন খেলা থাকে, সেদিন রামময় বাবুর বাড়ীতে দেরীতে হাজিরা দেয়। মিথ্যা সাফাই দিয়া কোনো রকমে চাকরি বজায় রাখিতেছে!···মনের মধ্যে বিবেক ত্রিশূলের খোঁচা মারে! কিন্তু উপায় কি?

যে সহজ সরল বুদ্ধি লইয়া এত দিন চলিয়া আসিয়াছে, সে বুদ্ধি বার-বার বলিতেছিল, এ চাকরি পোষাইবে না বাপু! বনের দুর্দ্দান্ত বাঘকে যদি বা বশ করিতে পারো, তবু এই গজপতি-দুলাল দুলালকে পারিবে না!···চাকরি ছাড়ার কথা মনে হইলে মন বেদনায় টনটন করিয়া ওঠে! মাস গেলে পঁয়তাল্লিশটি টাকা! এ-টাকায় মায়ের কতখানি সুবিধা হইতেছে! দু-তিনখানা গহনা ভূপতির এগজামিনের ফী দিতে বাঁধা পড়িয়াছিল, সে-গহনা খালাশ করিবার আশাও ছিল না···এখন মায়ের সেই গহনা বন্ধকী-ফাঁদ কাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে! তার উপর ছাত্রী নীরজা! এমন ছাত্র পাওয়া যায় না! কি মেধা! শিখিবার জন্ম কি আগ্রহ! স্কুলের ছেলেগুলার যদি এ মেধার, এ আগ্রহের সিকি থাকিত, তাহা হইলে এই হাতে সে দু'-তিন জন স্যার আশুতোষ তৈয়ারী করিয়া দিত। নীরজাকে পড়াইয়া যে আনন্দ পায়···সে-আনন্দের বিনিময়ে দুলালের দৌরাত্ম্য, ছল, কৌশল···বিবেককে ধরিয়া এ-সব সহানো কিছুই নয়!

বিবেকের প্ররোচনায় সঙ্গে সঙ্গে তার একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে! জামা-কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার দিকে ভূপতির নজর পড়িয়াছে! বিশেষ নীরজা যেদিন বলিল—আপনার ধোপা বুঝি কাপড় দিতে খুব দেরী করে মাষ্টার-মশাই? সে-প্রশ্নে প্রব্লেম্ হইতে মনকে উপড়াইয়া চোখে প্রশ্ন ভরিয়া ভূপতি নীরজার দিকে চাহিয়াছিল। সে-দৃষ্টির উত্তরে নীরজা বলিয়াছিল—এত ময়লা জামা পরেন, তাই বলছিলুম!

সেদিন হইতে ধোপার উপর নির্ভর ছাড়িয়া ভূপতি সান্‌রাইজ ডায়ার্সের আশ্রয় লইয়াছে!···সিনেমা দেখিতে গিয়া যখন দেখে, নায়িকা গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া পুষ্প-কুঞ্জের অন্তরালে লুকাইতেছে আর নায়ক গানের কলি গাহিয়া তার সন্ধানে ছুটিয়াছে··· তখন ফ্যাক্টর-সিম্‌প্লিফিকেশনের বেড়া ভাঙ্গিয়া তার মনও যেন কোন্ অজানা কুঞ্জ-কাননের বেড়ার ফাঁক খুঁজিয়া ছুটিতে চায়!···স্বপ্নে কত দিন বোর্ডে জিওমেট্রির ফিগার আঁকিতে গিয়া সেই ফিগারের মধ্যে নীরজার মুখ ফুটিতে দেখিয়াছে! রম্‌বাসের মধ্যেও নীরজার মুখ! সেদিন একটা দোকানে দাঁতের মাজন কিনিতে গিয়া রকমারি প্যাটার্ণের বেলোয়ারি চুড়ি দেখিয়া তার মন বলিল, ঐ রেশমী সুতার মতো যে-চুড়ি···কিনিয়া নীরজাকে দিলে কেমন হয়? তার সুন্দর হাত দু'টি চমৎকার মানায়!···কিন্তু সে মাষ্টার··· গরীব মাষ্টার···পঁয়তাল্লিশ টাকার ভৃত্য···তার এ-সাধ হয়তো স্পর্দ্ধার সামিল মনে হইবে! মন বলে, ছাত্রী···ছোট ভাইবোনের সমান! কিন্তু মনকে কে যেন থাবড়া মারিয়া বলে, তাই যদি তো দুলালের জন্ম কিছু উপহার কিনিবার কথা ভাবো না কেন, বাপু?

দুলাল খানিকটা বশ হইয়াছে···তবু যখন বাঁকিয়া বসে, কার সাধ্য সিধা করে!···

সেদিন তার গোঁ ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে! দুলালের আড়ালে নীরজা ভূপতিকে বলিয়াছে, আজ খুব শাসন করবেন মাষ্টার-মশাই! বাড়ীতে যা করে' বেড়ায়! মাকে বলেছি, দু'দিন আপনাকে খালি

কষ্ট দিচ্ছে···আদবে অঙ্ক কষছে না। তাতে মা বলেছে, ঠ্যাঙাতে বলিস্! উনি তো বলে দেছেন কর্পোরাল পানিশমেণ্ট!···সত্যি মাষ্টার-মশাই, মা বলছিল আপনি যদি ওকে না সামলাতে পারেন, তাহলে আসছে মাস থেকে দেখে-শুনে খুব এক জন ঠ্যাঙাড়ে মাষ্টার রাখবেন ওর জন্য!

কথাটার শেষ দিকে···ভূপতির মনে হইল, নীরজার কণ্ঠ যেন আর্দ্র! তার মনেও সে-আর্দ্রতার স্পর্শ লাগিল। জবরদস্ত ঠ্যাঙাড়ে মাষ্টার! তাহা হইলে এখানকার সঙ্গে ভূপতির সম্পর্ক চুকিয়া যাইবে! ···দুলালের মতো ছাত্রের জন্য চিন্তা নাই! কিন্তু নীরজা? ভূপতির বিশ্বাস, নীরজা যে-রকম মেয়ে, সে ঠিক কমপীট করিবে!···

ভূপতি ভাবিল, ঠ্যাঙাইতে সে-ও কি জানে না? কি-ঠ্যাঙান দিয়াছিল ক্লাশে সেদিন দিলীপকে···ক্লাশে বসিয়া নাকে নস্য গুঁজিয়াছিল বলিয়া! হুঁঃ···

আজ সে পণ করিয়াছে, দুলালকে আর এতটুকু প্রশ্রয় নয়! দুলাল বাঁদরামি করিলে আজ ভূপতি এমন মূর্ত্তি ধরিবে···

দুলালকে বলিল—খাতা আনোনি যে?

দুলাল বলিল—ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগাতে হবে, দুলাল। তোমার বাবার কাছে আমি কি জবাব দেবো বলতে পারো? মাস গেলে তিনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন!

বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি-সহকারে দুলাল চাহিল তার পানে! কহিল—তার জন্য হাজরে দিচ্ছেন তো! ব্যস!

নীরজা বলিল—কি হচ্ছে ও, দুলাল? মাষ্টার মশাইয়ের কথা শুনছো না? ওঁর অপমান করছো?

দুলাল বলিল—তোমার এত গায়ে লাগছে কেন? আমার খুশী! অপমান! মাষ্টার মশাই তোমাকে পড়াতে পেলেই খুশী! উনি চান তোমাকে নিয়ে মত্ত থাকতে! আমি যেন কিছু বুঝি না, না?

কি-রকম বিশ্রী কথা! ছি! ভূপতির দুই কাণের ডগায় কে যেন বিছুটি মারিল! নীরজা হুঙ্কার তুলিল,—বাঁদর ছেলে···কার সঙ্গে কি কথা কও, জানো না! ছোটলোক ইতর অভদ্র···

দুলাল বলিল—ছোটলোক কি রকম! আমি ও-সব খুব জানি, বুঝি। জানি, মাষ্টার মশাই ইজ ইন ডীপ লাভ উইথ ইউ! সেই নন্দিতা ফিল্মে যেমন···সেখানে প্রাইভেট টিউটর উমাচরণ···

—রাস্কেল পাজী···দুম্ করিয়া নীরজা দুলালের পিঠে মারিল প্রচণ্ড কিল! দুলালও অমনি চোখ পাকাইয়া বাঘের মতো নীরজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল! কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ভূপতির চোখের সামনে যেন সদ্যদেখা সেই অলকোয়ায়েট ছবির দৃশ্য জাগিয়া উঠিল···ফৌজের বেয়নেট চার্জ্জ!

ভূপতি রাগে জ্বলিয়া উঠিল। টানিয়া দুলালকে ছাড়াইতে গেল। কর্পোরাল পানিশমেণ্ট!

কিন্তু দুলালের আশ্চর্য্য কৌশলে ভূপতির শাসনোদ্যত হাত দুলালের কাণ টপকাইয়া নীরজার কাণ ধরিয়া ফেলিল···এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের চড়ও পড়িল নীরজার গালে! চড়ের বেগে নীরজা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল সোফার নীচে···চকিতে মুখ নীল···গাল একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা!

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলা যেন গায়ে-গায়ে ঠুকিয়া সশব্দে চূর্ হইয়া পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে!···চীৎকার-কলরবে ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া মা আসিয়া দাঁড়াইলেন ঘরের মধ্যে···মাথায় কাপড় টানিয়া ···বলিলেন—কি হচ্ছে সব?

জোর গলায় দুলাল দিল জবাব। বলিল—দিদি ভয়ঙ্কর জ্বালাত[illegible] করছিল মাষ্টার মশাইকে···তাই মাষ্টার মশাই ওর কাণ ধরে গা[illegible] চড় বসিয়ে দেছেন।

মায়ের দুই চোখ বিস্ময়ে-বিভীষিকায় বিস্ফারিত! মা বলিলেন—সত্যি?

কথাটা বলিয়া মা আগাইয়া আসিলেন। নীরজার মাথা ঘুরিতে ছিল···মা তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিলেন। মেয়ের মূর্ত্তি [illegible] দেখিলেন—দুলালের বাক্যে অপ্রত্যয়ের হেতু পাইলেন না। এত-বড় মেয়ের গালে চড় মারিয়াছে···তার কাণ মলিয়া দিয়াছে··· মাষ্টার! এমন অভদ্র···এতখানি তার স্পর্দ্ধা! মা চাহিলেন ভূপতি[illegible] দিকে···দু'চোখে তাঁর আকাশের বিদ্যুৎ! মা বলিলেন—এখনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে···আর পড়াতে হবে না। এ মাসে[illegible] পুরো মাহিনা উনি এলে পাঠিয়ে দেবো!

ভূপতির মনে হইতেছিল, ছেলেবেলায় পড়া বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণীর সেই পরিচ্ছেদের কথা···দেবীর বজরায় সাহেবের [illegible] ব্রজেশ্বরের চড়···সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ওঠা এবং বজরার মধ্যে সেই [illegible] ব্যাপার! হরবল্লভ যেমন ভাবিয়াছিল দেবতাকে ডাকিয়া ফল নাই তার ভবলীলা শেষ হইয়াছে, ভূপতিরও ঠিক সেই দশা!···নিঃশব্দে কি করিয়া সে বাহির হইয়া পথে আসিল···যেন স্বপ্ন!

পরের দিন···সকাল। ঘরের জানলা খোলা···তক্তাপো[illegible] গুম্ হইয়া ভূপতি বসিয়া আছে।

মেশের ভৃত্য পাঁচু আসিয়া একখানা চিঠি দিল।···চিঠি খুলিয়া উদাস নয়নে ভূপতি পড়িল। গজপতি বাবুর চিঠি। লিখিয়াছেন—

ভূপতি বাবু, কাল যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তার জন্য অপরাধ লইবেন না। আমার স্ত্রী সেজন্য অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, আজ যথাসময়ে এ বাড়ীতে আসিবেন। আজ রাত্রে এইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা। তার উপর ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে খুব জরুরি পরামর্শ আছে। ইতি

বিনীত

শ্রীগজপতি রায়

মনের উপরকার জমাট মেঘের ভার···চিঠিতে কি বার্ত্তা বহিল, ফাঁসিয়া সাফ হইয়া গেল! এবং···

সন্ধ্যার সময় দোতলায় গজপতি বাবুর বসিবার ঘর। সেই ঘ[illegible] আছেন গজপতি বাবু, গজপতি বাবুর গৃহিণী অর্থাৎ দুলালের [illegible] এবং ভূপতি।

দুলালের মা বলিলেন—বাড়ীর ছেলের মতোই আমার সে ক[illegible] ভুলে যেয়ো বাবা। ভাবো, আমি যেন তোমার মা। মায়ে যে অনেক সময় ভুল করেও বকে, গাল দেয়! তেমনি মনে করো, বাবা ···নীরুর কাছে সব শুনলুম। দুলালের কথায় বিশ্বাস করে' তোমা[illegible] সে কথা বলে অবধি আমি মরমে একেবারে মরে আছি!

ঘূর্ণী···জলের বুকে যেমন ঘূর্ণী দেখা দেয়, সে-ঘূর্ণীতে খড়কুটা-পাতা হইতে সুরু করিয়া ডিঙ্গি-নৌকা পড়িলেও যেমন তলাইয়া যায়··· ভূপতির বুকের ঘূর্ণীতে পড়িয়া তার কথার যত কিছু পুঁজি, সে-সবও তলাইয়া চলিয়াছে !

গজপতি বলিলেন—আরো একটি কথা বলি তাহলে···ছেলে-মেয়েরা কেউ জানে না···নীরু হলো আমার শালীর মেয়ে। ছোট বয়সে মা-বাপ মারা গেছে। উনি নিজের মেয়ের মতো করে নীরুকে মানুষ করেছেন। উনি আর আমি ছাড়া এ-কথা আর কেউ জানে না। সকলে জানে, আমাদের দু'টি ছেলেমেয়ে। বড় নীরু, ছোট দুলাল। আসলে কিন্তু···

ভূপতি তেমনি বসিয়া আছে। ওদিককার কথাগুলা আসিয়া বুকে লাগিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকমের ছবি ফুটিতেছে বুকের মধ্যে।

আধ ঘণ্টা ধরিয়া এ-কথা ও-কথার পর দুলালের মা বলিলেন—নীরুর বাপের লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের টাকা আছে—পাঁচ হাজার। ব্যাঙ্কে ফিক্‌স্‌ড্ ডিপজিটে সে-টাকা বেড়ে নেহাৎ অল্প হয়নি, বাবা। ···ওর বিয়ের জন্য পাত্র দেখতে বাকী রাখিনি···কোনো পাত্র পছন্দ হয়নি। আমাদের সাধ, বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাইকে কাছে কাছেই রাখি। তা তুমি তো মেশে পড়ে কষ্ট পাচ্ছো···তাছাড়া এত লেখাপড়া শিখে মাষ্টারী করে জীবন কাটাবে, সে হতে পারে না ! তার চেয়ে···

গজপতি বাবু এইখানে হঠাৎ যেন কি প্রয়োজনে উঠিয়া গেলেন ! দুলালের মা চারি দিকে সন্তর্পণে চাহিয়া কণ্ঠ মৃদু করিয়া আবার বলিলেন—মেয়ে ডাগর হয়েছে···সত্যি, ওরো তো পছন্দ-অপছন্দ আছে। তা নানা রকমে ওর কাছেও এ-সব কথা আমি পেড়েছি। ভারী চাপা মেয়ে···লজ্জা করে ওর বিয়ের কথায়। একালের মেয়েদের মতো অতখানি ইয়ে হয়নি ! তা ওর মনের ভাব যা বুঝলুম, তাতে তোমার উপর ওর টান আছে। তোমাকে ···যাকে তোমরা বলো ভালোবাসা, তাই আর কি ! তাছাড়া ওর চিরদিনের সখ, খুব লেখাপড়া করবে, পাশ করবে ! তাই আমাদের ইচ্ছা, বাবা, ওকে আমরা তোমার হাতে···

ভূপতির মাথার উপর যেন একরাশ প্লেন উড়িতেছে ! কি বিপুল ঘর্ঘর শব্দ ! তার কাণে তালা ধরিল ! দুলালের মা তখনো কথা বলিয়া চলিয়াছেন···সে-সব কথা কাণে গেল কি না, সন্দেহ ! প্লেনের ঘর্ঘর শব্দ যেন এক-তালে বলিতেছে—ভালোবাসা···ভালোবাসা··· ভালোবাসা !

কন্যা যে ক্ষেত্রে স্বয়ংবরা এবং কন্যার গার্জেন যেখানে বরকে কাম্য বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রজাপতি সেখানে হাসি-মুখে আসিয়া উদয় হন ! সুতরাং এ ক্ষেত্রে পাঁজির সুতহিবুকযোগ ব্যর্থ হইবার নয়।

ভবিষ্যৎ ?···স্কুল ছাড়িয়া ভূপতি সিভিল সাপ্লাইয়ের অফিসে ঢুকিয়াছে।

বেতন ভালো ! তাছাড়া যুদ্ধের শেষে প্রশপেক্ট আছে। গজপতি রায় ঝানু অফিসার···ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিরকাল চলিয়া আসিতেছেন !

দুলালকে বোর্ডিংয়ে দেওয়া হইয়াছে। একবার শেষ চেষ্টা !

প্রাচীন কালের আদালত ও বিচার

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে আদালত বা বিচার-স্থানকে ধর্ম্মাধিকরণ বা ধর্ম্মের আগার বলা হইত। অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বিবাদের ন্যায়বিচার দ্বারা মীমাংসা করিয়া দেওয়াই ছিল উহার একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন কালে শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগে একই শ্রেণীর অথবা একই মনোভাব-সম্পন্ন লোককে নিযুক্ত করা হইত না। সাধারণতঃ তাহাদের পরস্পারের মধ্যে কুটুম্বিতা বা ঘনিষ্ঠতা থাকিত না। তবে রাজা ছিলেন শাসন এবং বিচার উভয় বিভাগেরই কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার একাকী কোন মামলার বিচার করিবার অধিকার একেবারেই ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারেই রাজা বিচার করিতে বাধ্য ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নে রাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কোন প্রভাবই ছিল না। উহা প্রণয়ন করিতেন সংসার হইতে অবসরপ্রাপ্ত বহুদর্শী এবং স্থিরধী মুনিগণ। সুতরাং রাজার পক্ষে স্বীয় শাসন বিভাগের অনুকূল কোন বিধানই সেখানে রচনা করা সম্ভব ছিল না। 'মন্যতে পূজ্যতে অসৌ ইতি মুনিঃ'। যিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের শ্রদ্ধাভাজন এবং সমদর্শী, তিনিই হইতেন মুনি। আইন-প্রণেতা হইতেন মুনি-জনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতম এক জন মহামুনি। ঐ ঋষির সংসদে প্রত্যেক বিষয় বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইত কি না, অথবা সে সভায় সাধারণ লোক দর্শক হিসাবে যাইতে পারিত কি না, তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ নাই। যখন সংসদে উহা প্রণীত হইত, তখন উহা লইয়া আলোচনাও হইত। ইহা সকলেই জানেন যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ সারা জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তবে তাঁহারা মুনিবৃত্তি অব-লম্বন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার যিনি অগ্রগণ্য, তিনিই ছিলেন বিধির বিধানকর্ত্তা। তখন এ কালের মত রাজনীতি প্রয়োজনে আইন রচিত হইত বলিয়া মনে হয় না। এ কালের মত প্রাচীন কালে কূটনীতিজালে দেশাত্মবোধবিহীন অশিক্ষিত এবং অবিবেকী সুতরাং লোভপরতন্ত্র ইতরগণকে বশীভূত করিয়া কোন স্বার্থসর্ব্বস্ব লোক বা তাহাদের প্রতিনিধিরা আইন-সভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

মনু, যম এবং সম্ভবতঃ দক্ষ এই তিন জন সংহিতাকার ছিলেন ক্ষত্রিয়। অবশিষ্ট ১৭ জন ব্রাহ্মণ। রাজা ইঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়া চলিতে বাধ্য ছিলেন। এই হেতু প্রাচীন কালের রাজারা ছিলেন নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত (consiitu!ional)। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করিলে স্বৈরাচারী রাজাকে নিহত অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইত। অধিকন্তু, তখনকার লোক বিশেষ ভাবে পাপের ভয় করিত। সেই জন্য রাজা ক্ষত্রিয় হইলেও বিচারকার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু একাকী নয়। তাঁহাকে তিন জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সহিত একযোগে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত (১)। সকল আদালতে উপস্থিত থাকিয়া রাজার পক্ষে বিচারকার্য্য সাধন বা পরিদর্শন করা সম্ভব হইত

(১) মনু—৮।১-২, যাজ্ঞবল্ক্য ২।১

না। অতএব রাজাকে প্রত্যেক ধর্ম্মাধিকরণে এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইত। সেই প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ হইতেন এবং তিনি অন্য তিন জন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিচারকার্য্য সাধন করিতেন। যে সভায় উপযুক্ত বেদজ্ঞ তিন জন ব্রাহ্মণ ও রাজার ব্রাহ্মণ-প্রতিনিধি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা বলা হইত (২)। বিচার বিভাগে ব্রাহ্মণ এবং শাসন বিভাগে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ই নিযুক্ত হইত।

মনু বলিয়াছেন, যে আদালতে বিচারকগণের সম্মুখে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম এবং মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অযথার্থ বা অন্যায় বিচার ফলে যে পাপ হয় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী পায়, আর এক ভাগ মিথ্যা সাক্ষী পায়, সমুদয় সভাসদ্ এক ভাগ এবং রাজা এক ভাগ পাইয়া থাকেন (৩)। অনেকে অনুমান করেন, তখনকার ব্রাহ্মণদিগের পাপের ভয় অধিক ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিচারক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা মনু বলিয়া গিয়াছেন। এ অনুমান সত্য হইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃ ক্রোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মনু বিচারকার্য্যে নিয়োগ করিবার বিধান করেন নাই। এ কালে সুসভ্য জাতির শাসনাধীন দেশে যেরূপ শাসন বিভাগের রাজপুরুষরা বিচার-কার্য্যের ভার পাইয়া সময় সময় বিচারকার্য্যে পক্ষপাত করেন অথবা আসামীদিগকে অযথা কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন, প্রাচীন হিন্দু-দিগের আমলে তাহা হইত না। শাসকের হস্তে কোনরূপ বিচার-ভার ছিল না। ইহা ভিন্ন বিচারকগণ যদি পক্ষপাতপূর্ব্বক কোন মামলায় পক্ষবিশেষের প্রতি অবিচার করিতেন, তাহা হইলে সেই মামলায় ন্যায়তঃ যে পক্ষের পরাজয় হওয়া উচিত তাহার যে দণ্ড হইত, প্রত্যেক বিচারক তাহার দ্বিগুণ দণ্ড পাইতেন (৪)। বশিষ্ঠের মতে বিচারকের অবিচারজনিত পাপ রাজাতেই বর্ত্তে (৫)। হিন্দুদিগের আমলে রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে আসামীর উপর বিদ্বেষবশতঃ কঠোর দণ্ড দান নিষিদ্ধ ছিল (৬)। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে ন্যায়বিচার করিবার জন্য কিরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

এখন জিজ্ঞাস্য, পূর্ব্বকালে এ কালের মত উকিল-মোক্তার দ্বারা পক্ষগণ বিচারকার্য্য চালাইতে পারিতেন কি না? সে কালে ব্যবহার-দর্শক বা ব্যবহারদর্শী ছিল। কিন্তু ইহারা এখনকার ব্যবহারা-জীবদিগের মত পক্ষগণ কর্ত্তৃক পারিশ্রমিক হইয়া মোকদ্দমা চালাইতেন কি না সন্দেহ। অনেকের মতে উঁহারা জুরী ছিলেন। সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। ব্যবহারদর্শীরা পক্ষগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতেন না। তাঁহারা আদালতেরই লোক ছিলেন। পক্ষগণই নিজ নিজ কথা বিচারকদিগের সমক্ষে বলিতেন,—প্রতি-নিধির দ্বারা বলিতেন না।

প্রাচীন কালেও এ দেশে আপীল আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতপূর্ণ হইয়াছে মনে করিলে পক্ষগণ উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারিতেন। মনু বলিয়াছেন যে, অন্যায় ভাবে পরাজিত পক্ষ উচ্চ বিচারালয়ে আপীল করিতে পারিবেন। অন্যায় বিচার করিয়া পক্ষবিশেষকে পরাজিত করা হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে রাজা সেই বিচারকদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন (৭)। উচ্চ আদালতেও রাজাই তিন জন ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ লইয়া আপীলের বিচার করিতেন। আপীল রুজু করিলেই সে কালে এ কালের ন্যায় মামলা গ্রহণ করা হইত না। আপীলের কারণ আছে বুঝিতে পারিলে তবে আপীল গ্রাহ্য হইত, অন্যথা নহে (৮)। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, প্রাচীন কালে আইনের খুঁটিনাটি লইয়া বিচার-পূর্ব্বক আপীল গৃহীত হইত না। তখন আইন সরল ছিল। আইনের অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রায় উঠিত না। অপরাধ হিসাবে দণ্ড অধিক হইয়াছে দর্শাইতে পারিলে আপীল গ্রাহ্য করা হইত। কারণ, বিধি-পুস্তকে যত দূর দণ্ড দিবার বিধান থাকিত, বিচারকের পক্ষে আসামীকে বা দোষী পক্ষকে তত দূর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা ছিল না। রামায়ণেও বলা হইয়াছে যে, প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করা রাজার কর্ত্তব্য নহে (৯)। উত্তরাকাণ্ডে বলা হইয়াছে যে, অপরাধ অনুসারে দণ্ডদান করিলে প্রজা সুরক্ষিত হয় (১০)। রাজা অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম, বয়স এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া দণ্ড দিতেন (১১)। লঘু দণ্ডে যে দোষ হইত না তাহা নহে। অনেক সময় ধিক্কার দণ্ড অথবা বাগ্দণ্ড দণ্ড মাত্র দিয়া দোষী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত (১২)। এখন তাহা হয় না। যে মনু অনেক অপরাধে অঙ্গচ্ছেদাদি কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন, একেবারে কঠোর দণ্ড দিবে না, প্রথমে অল্প দণ্ড দিবে, পরে অপেক্ষাকৃত অধিক দণ্ড দিবে, কিন্তু কিছুতেই যদি কোন অপরাধী অপরাধ করিতে নিরস্ত না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবে (১৩)। আধুনিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে বলেন যে, মনু অত্যন্ত কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া ঘোর নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তেই মনু সাধারণ ভাবে অবস্থা বিবেচনায় ক্ষমা করিবার কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে রাজা আপনার হিতকামী—তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগের, বালকদিগের, পীড়িত এবং বৃদ্ধদিগের নিন্দা বাক্যাদি প্রভৃতি ক্ষমা করিবেন (১৪)। এখন যেমন রাজকার্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে একটু পান হইতে চুণ খসিলে রাজপুরুষরা ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন, পুরাকালের রাজাগণ তাহা কদাচ করিতেন না। শুক্রনীতিসারে এবং কামন্দকীয় নীতিসারে উদাত্ত স্বরেই ঘোষিত হইয়াছে, যেন দণ্ডের অপপ্রয়োগ না হয়। উভয় গ্রন্থই অত্যন্ত প্রাচীন। কামন্দকীয় নীতিসারে স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে যে, হিন্দু আমলে প্রাণান্তিক দণ্ড প্রায় প্রদত্ত হইত না। কামন্দকীয় নীতিসারে আরও বলা হইয়াছে—অতিগুরু অপরাধ করিলেও আসামীকে প্রাণান্তিক দণ্ড দিবে না (১৫)। অন্যত্র বলা হইয়াছে, দণ্ডব্যসনে রাজ্য ক্ষয় পায়। কাম এবং কোপজনিত দোষই ব্যসন। দ্বেষ ঈর্ষ্যা এবং নিষ্ঠুরতা দ্বারা প্রযুক্ত দণ্ডই দণ্ডব্যসন। শাস্ত্রে গুরুদণ্ডের বিধান থাকিলেও উহা যত্র তত্র

(২) মনু—৮।৯—১১। বিষ্ণু—৩।৫০—৫১
(৩) মনু—৮।১৮—১৯ (৪) যাজ্ঞবল্ক্য—২।৪
(৫) বশিষ্ঠ—১৬ (৬) শুক্রনীতি—৪।৯।৫৬

(৭) মনু—৯।২৩৪ (৮) মনু—৯।২৩৩ (৯) রামায়ণ অঃ ১০০।২৭ (১০) রামায়ণ উঃ ৭১।৩২। (১১) যাজ্ঞ ১।৩৬৮ (১২) যাজ্ঞ ১।৩৬৭ (১৩) মনু ৮।১২৯ (১৪) মনু ৮।৩১২
(১৫) কাম—১৪।১৬

প্রয়োগ করা নিষেধ। অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এখনও তাহা হয়। মহাভারতও বলিয়াছেন যে, পরের অপবাদ শুনিয়া লোককে দণ্ড দিতে নাই। শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া তবে বন্ধন এবং মুক্ত করিবে (১৬)।

এ কালে বিচারকগণ যেমন বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও ভারতে সেইরূপ করিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই মনে হয়। তবে সে পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায় না। মনু বলিয়াছেন—রাজা ও বিচারক সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত-দেহ হইয়া ধর্ম্মাসনে বসিবেন। তিনি বিচারালয়ে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবেন। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনের অর্থ—সকলকে অভয়দান। ইহাতে তিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করিবেন, নিরপরাধকে দণ্ড দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞাই সূচিত হয়। ফলে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বধদণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল অপরাধে বিচারকবর্গ সেই চরম দণ্ড দিতেন না। যে মনু অঙ্গাদিচ্ছেদ পূর্ব্বক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনিও তারস্বরে বলিয়া দিয়াছেন যে, আসামীর অপরাধ যদি প্রথম হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে সেই অপরাধ জন্য তিরস্কার মাত্র করিবে, দ্বিতীয় বার করিলে ধিক্কার প্রদান করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তথাপি যদি সেই আসামী আবার সেই অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্থদণ্ড অর্থাৎ জরিমানা করিবে; কিন্তু যদি কিছুতেই তাহার স্বভাবের শোধন না হয়, তাহা হইলে শেষকালে তাহার অঙ্গচ্ছেদাদি কারাদণ্ড দিবে; আর বধদণ্ড অর্থাৎ অঙ্গাদিচ্ছেদ দণ্ড দ্বারাও যদি কাহারও অপরাধ করিবার প্রবৃত্তির সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ সর্ব্বপ্রকার দণ্ডই দিবে (১৭)। মনু ভারতের আদি দণ্ডনীতি-প্রণেতা এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি এথেন্সের দণ্ডনীতি-প্রণেতা ড্রেকোর ন্যায় অপরাধী মাত্রকেই প্রাণান্তিক দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি অনেক স্থলে প্রথম অপরাধকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য (১৮)। অধিকন্তু, মনুর বধদণ্ড অর্থে প্রাণদণ্ড নহে,—দৈহিক দণ্ড। নতুবা তিনি এমন কথা বলিতেন না—বধদণ্ডেও যাহার সংশোধন হয় না, তাহাকে সর্ব্ববিধ দণ্ডই প্রদান করিবে। যে সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ভারতের আদি দণ্ডনীতি-প্রণেতা মনু ড্রেকোর ন্যায় অতি নিষ্ঠুর আইন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ঐরূপ ধারণা আছে বলিয়া আমি এই কথাটি বিস্তৃত ভাবে বলিলাম।

প্রাচীন কালে আদালত-গৃহ স্বতন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ। রাজার সভাগৃহের এক অংশে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠেই আদালত বসিত। ছোট ছোট অপরাধীদিগের বিচার করিতেন পল্লী-পঞ্চায়েতবর্গ। কঠোর বা দুর্দ্দান্ত অপরাধীর বিচার হইত রাজকীয় আদালতে। সুতরাং রাজকীয় আদালতে মামলা কম হইত। তাহা হইলেও রাজধানী ভিন্ন রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সরকারী আদালত থাকিত। রাজার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্রাহ্মণরা ঐ সকল আদালতের বিচারকার্য্য চালাইতেন। ঐ সকল বিচারপতির বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে রাজাকে সে জন্য পাপভাগী হইতে হইত।

প্রাচীন কালেও কুলাচার, স্থানীয় রীতি, জানপদ ধর্ম্ম, গুরুপরম্পরাগত ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচারপতিরা অপরাধের বিচার করিতেন। সম্প্রদায়-বিশেষের বিশেষ কুলাচার বা সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা তাঁহারা কোন মতেই উপেক্ষা করিতেন না (১৯)। বর্ত্তমান কালে যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্বতন্ত্র, পুরাকালে হিন্দু আমলে তাহা ছিল না। একই আদালতে সর্ব্বপ্রকার মামলার বিচার করা হইত। বাদী এবং ফরিয়াদীকে অগ্রে কোর্ট-ফি দিয়া উকিলের মারফতে মামলা রুজু করিতে হইত না। কাজেই উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজদ্বারে অভিযোগ করা অনেক সহজ ছিল। সকলেই অবাধে মামলা করিতে পারিত। জানিয়া শুনিয়া যে মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিত, তাহাকে শাস্তিগ্রহণ করিতে হইত। কাজেই মিথ্যা মামলা প্রায় উপস্থিত করা হইত না। তবে শেষকালে আদালতের খরচা বাবদ কোর্ট-ফি ও জরিমানার টাকা পক্ষগণ দিতে সমর্থ, ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহাদিগকে ঐ টাকার জামিন দিতে হইত (২০)। দুই পক্ষের যে পক্ষ মামলায় পরাজিত হইত, তাহাকে অর্থদণ্ড করিয়া সেই টাকা আদায় করা হইত। ফলে বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু আমলে গরিব প্রজারা উৎপীড়িত হইলে অতি অল্পব্যয়ে মামলা করিতে পারিত।

(১৬) মহাভারত, শান্তি, ৮৫।২৫ (১৭) মনু—৮।১২৯-৩০
(১৮) মহাভারত—২৮।২৯
(১৯) মনু—৮।৪১-৪২
(২০) যাজ্ঞ—২।১০

নতুন চোখ

শামসুদ্দীন

তোমরা মরিয়া গেছ; প্রেত চলে শুধু
জীবন্ত কঙ্কাল সাথে; তোমাদের গান
মূক আজি; স্বর্ণ বঙ্গ মরুভূমি ধূ ধূ;
শৃগাল বাঁধিছে বাসা—আঁধার শ্মশান।

নদী সে ভুলিয়া গেছে সাগরের তান,
পাখীর কূজন নাই মাধবী-লতায়,
সকলের হাসি-অশ্রু—যত অভিমান
নিঃশেষে মিলায়ে গেছে বারুদ-ধোঁয়ায়।

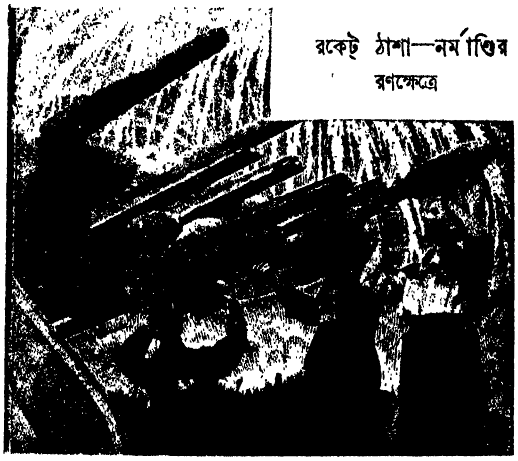
কুয়াশা বিদায় নেছে, মেঘ ভুলিয়াছে
বর্ষণ-মুখর রাত, ঘোর অন্ধকার
তোমাদের পথ,—তবু সবে ছুটিয়াছ
আলেয়ারে ধরি। হায়, দিন জাগিবার—

এখনো আসেনি কি গো? তোমাদের চোখ
কখন্ দেখিবে পুনঃ নতুন আলোক?



রকেট-অস্ত্র

পাল্টা-আক্রমণে মিত্র-শক্তির রকেট একেবারে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে রকেট-প্লেন ঝাঁকে-ঝাঁকে গিয়া জার্ম্মাণদের বেতার-বার্ত্তার আস্তানাগুলি প্রথমে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়; তার ফলে জার্ম্মাণীর খবরাখবর রাখার সকল আশা



রকেট্ ঠাশা—নর্ম্যাণ্ডির রণক্ষেত্রে

নির্ম্মূল হয়—তার পর সুরু হয় রকেট-প্রোজেকটরে মুহুর্মুহু গোলা-বর্ষণ। কাজেই অতর্কিত এ-আক্রমণে জার্ম্মাণীর পক্ষে পরাভব মানিয়া লওয়া



এ্যান্টি-ক্র্যাফটে রকেট ছোটে

ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। প্রত্যেকখানি ব্রিটিশ ও মার্কিন লড়ায়ে-প্লেন পক্ষপুটতলে চারখানি করিয়া রকেট লইয়া গিয়া জার্ম্মাণ-বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই মিত্রশক্তির হাতে জার্ম্মাণী জর্জ্জরিত হয়। এই রকেট-অস্ত্রের জন্ম রাশিয়ায়। করিয়াছিল। প্রতি ক্ষেপে 'রকেটে' অসংখ্য গোলা বর্ষিত হয়—'তারা'-বাজি'তে যেমন অজস্র ফুল কাটে, তেমনি ভাবেই এ-অস্ত্রক্ষেপে অসংখ্য 'শেল' ফাটে! রকেটের কামান হাল্কা অথচ ইহার শক্তি ১০৫ মিলি-মীটার শেলের তুল্য। লড়ায়ে-প্লেনের এক-একখানি পাখায় দু'খানি করিয়া রকেট-নল আঁটিয়া অনায়াসে তাহা বহন করা এবং দু'খানি পাখায়-আঁটা 'রকেট' একসঙ্গেই ছোড়া চলে। রকেটে শেল ছোটে প্রচণ্ড বেগে; ছুড়িবার সময় প্লেনের গতিকে মৃদু বা মন্থর করিতে হয় না এবং তাহার লক্ষ্য হয় অব্যর্থ। এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট্ কামানেও রকেট আঁটিয়া বিপক্ষের বমার-বিনাশ-সাধনকার্য্য অনেকখানি সহজ ও সুনিশ্চিত হইয়াছে।

গাছের সেবা

লালনে যত্ন লইলে গোরু যেমন পুষ্ট থাকিয়া বেশী দুধ দেয়, গাছকেও যদি তেমনি যত্ন করা হয় তো গাছ পুষ্ট দেহে অনেক-বেশী ফল-ফুল দেয়—এ সত্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। অসুস্থ দুর্ব্বল মানুষকে সুস্থ ও বলশালী করিতে হইলে তার শরীরের কোথায় কি ত্রুটি বুঝিয়া সে ত্রুটি-মোচনের জন্য টনিকের ব্যবস্থা করিতে হয়; দুর্ব্বল শীর্ণ গাছের স্বাস্থ্য বুঝিয়া



স্বাস্থ্যামৃত-ধারায় গাছের স্নান

গাছকেও তেমনি টনিক দ্রাবকাদি প্রয়োগ করিতে হয়। করিলে গাছ বাড়ে, গাছে ফল-ফুল হয় পর্য্যাপ্ত এবং সে ফল-ফুলের স্বাদ-গন্ধাদি হয় উৎকৃষ্ট। গাছের লালন-কল্পে মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বহু রাসায়নিক চূর্ণ-দ্রাবকাদি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সব দ্রাবকাদি প্রয়োগে তাঁরা উদ্ভিদ-জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন। 'ডু-পট' আরম্ভ

চূর্ণ আসেট প্রভৃতি তাঁহাদের আবিষ্কারের ফল। চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয় গাছের গা কাটিয়া অথবা ইনজেকসন দিবার রীতিতে—দ্রাবকাদি প্রয়োগ করিতে হয় স্প্রে-যোগে।

মরু-বিমান

পৌষ মাসে মরু-বাহন বাসের পরিচয় দিয়াছি; এবারে বলিতেছি মরু-বক্ষের বিমানের কথা। এ-যুদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করিয়া তুলিলেন! এক-কালে মরুর বালুকাবক্ষ হইতে বিমানের উড়িবার-নড়িবার সামর্থ্য ছিল না—সম্প্রতি ২৬ টন ওজনের একখানি লড়ায়ে প্লেন অচল হইয়া মরুর বুকে পড়িয়া গেলে বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে চালু করিবার জন্য অসাধারণ প্রয়াসে এ-কাজে



মরু-বিমান

আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের সাধনা সফল হয়—বিমানের দু'পাশে ডবল-টায়ার চাকা সংযোজনায়। এই ডবল-টায়ার চাকার দৌলতে বিমানের পক্ষে বালুকাতটে ওঠা-নামার আর এতটুকু অসুবিধা ঘটিতেছে না!

বৈদ্যুতিক করাত

যুদ্ধের কাজে বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তক্তা বাহির করিতে হয়। এ কাজ নিমেষে করা চাই। এ-কাজের জন্য তাই তৈয়ারী

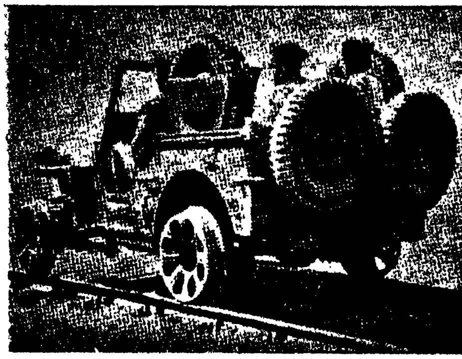


বৈদ্যুতিক করাত

হইয়াছে বৈদ্যুতিক করাত। চেন-টাইপের করাতে দশ অশ্ব-শক্তি-যুক্ত মোটর-এঞ্জিন সংলগ্ন করা হইয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর এই করাত বসাইয়া দু'দিকে করাতের দুই প্রান্ত ধরিয়া দু'জনে বসেন; বসিয়া বৈদ্যুতিক-এঞ্জিন চালাইয়া দেন; করাত চলে; চলিয়া গাছের গুঁড়িকে নিমেষে কাটিয়া দেয়। এঞ্জিন-সমেত এ করাতের ওজন এক মণ দশ সের। ফৌজের দলে এ-করাতও রণদের সামিল হইয়াছে।

জীপের নব রূপ

'জীপ' আমাদের চোখে আজ আর নূতন নয়! কিন্তু এ জীপ আবার নূতন রূপে দেখা দিতেছে। জীপের 'বেশিজোপ্স'-মডেল তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার অঙ্গে দু'শেট করিয়া অর্থাৎ প্রতি গাড়ীর জন্য আটখানি করিয়া চাকা! চারখানি চাকা মোটরের চাকার মত—



রেল্-লাইনেও এ জীপ চলে

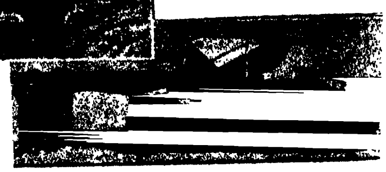
টায়ার-সম্বলিত; আর চারখানি চাকায় টায়ার নাই,—সেগুলি রেলওয়ে ট্রেণের চাকার ছাঁদে রচিত। প্রয়োজন হইলে টায়ার-সম্বলিত চাক খুলিয়া গাড়ীর পিছনে ক্লাম্পে গুঁজিয়া দ্বিতীয় ছাঁদের চাকা আঁটিয় জীপকে রেলোয়ে-লাইনের উপর দিয়া নির্ব্বিবাদে চালানো যায়।

মাইন-চুর ট্যাঙ্ক

জার্ম্মাণ-মাইনকে সমূলে চূর্ণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সমর-বিভা 'ফ্লেইল্-ট্যাঙ্ক' নামে এক জাতের ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ ট্যাঙ্কে



ট্যাঙ্কের আসল রূপ

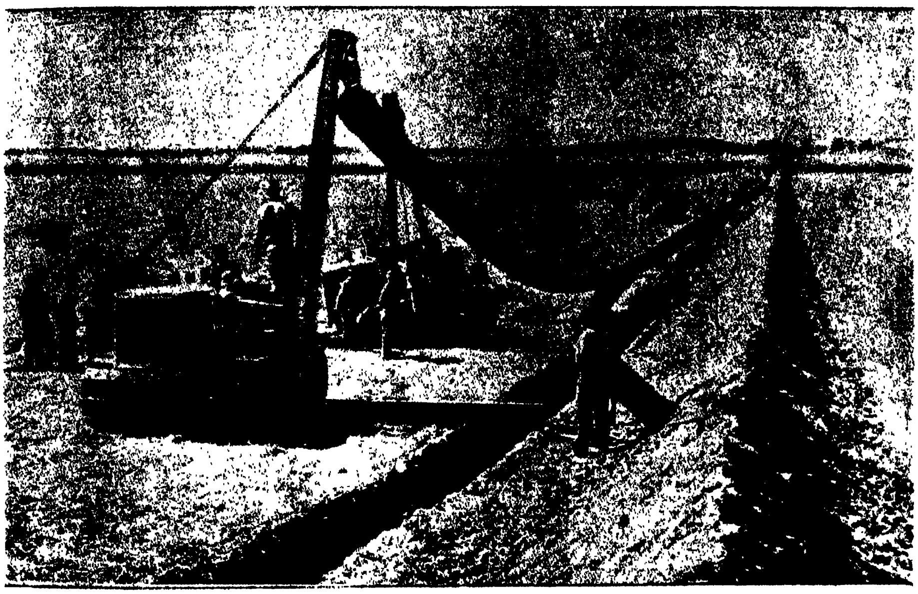


ফ্লেইল ট্যাঙ্কে মাইন সন্ধান

সামনের দিকে ইস্পাতের একখানি চক্র সংলগ্ন আছে। সেই চ কয়েক ফুট লম্বা একরাশ শিকল আঁটা। ট্যাঙ্ক চলিলে চক্র-আঁটা শিকলগুলি বিষম বেগে ঘুরিতে থাকে; সে ঘোরায় মাটী ভা চুরিয়া ধূলার ঘূর্ণী রচিয়া তোলে। কাজেই পোঁতা মাইনের মাটীর বুকে আত্মগোপন করিয়া থাকা সম্ভব হয় না; শিক ঘূর্ণীবেগে 'মাইন' সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই ট্যাঙ্কের সাহ উত্তর-আফ্রিকার পথে পোঁতা সমস্ত জার্ম্মাণ-মাইনের বি সাধন ঘটিয়াছিল।

এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধে শক্তির উৎস কিন্তু তৈল—পেট্রোলিয়াম্! আকাশে বিমান—তৈলের অভাব ঘটিলে ও-বিমানের পতন অনিবার্য্য। ফৌজের সঙ্গে চলিয়াছে কাতারে-কাতারে অত ট্যাঙ্ক, ট্রাক,—ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র-ও-রসদবাহী লরি—তৈলের অভাব ঘটিলে, ও-সব গাড়ী ছবির মত নিথর নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয় দাঁড়াইয়া থাকিবে; তার উপর বে-সামরিক নর-নারীর দল! পেট্রোলে টান পড়িলে তাঁদেরও দুর্গতির সীমা থাকিবে না। ফ্যাক্টরি, মিলের কাজ হইবে বন্ধ; রেলপথে ট্রেণ চলিবে না; বিলাসী ও কর্ম্মীদের মোটরগাড়ী খেলনার মত পড়িয়া থাকিবে! আজিকার এ যন্ত্রযুগে—যে-যন্ত্রে মানুষের প্রাণ, মানুষের শক্তি, সেই যন্ত্রে প্রাণ-শক্তি জোগাইতেছে তৈল, পেট্রোলিয়াম। সুতরাং পেট্রোলিয়াম-বিহনে চলমান বিশ্বজগৎ চকিতে স্তম্ভিত হইবে!

মানুষ এ তৈলের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছে ১৮৫৯



পেট্রোলের পাইপ পাতা

খৃষ্টাব্দে পেনশিলভানিয়ায়। তখন বাষ্পীয় এঞ্জিন, রীপার, এলিভেটর প্রভৃতির শৈশব। এঞ্জিনের চাকা চলিতে-চলিতে থামিয়া যাইত ঘর্ষণবেগে; সে-চাকাকে মসৃণ সচল রাখিবার জন্য প্রলেপ-তৈলের (**lubricating oil**) সন্ধান মানুষ পায় নাই।

আজ পৃথিবী-ময় যে **lubricating** তৈলের ব্যবহার চলিয়াছে, তার শতকরা ৫৭ ভাগ জোগাইতেছে মার্কিণ যুক্তরাজ্য! এই তৈলের অভাবে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ-যন্ত্রাদি বহু ক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য হইয়া জার্ম্মাণীকে নিগৃহীত করিতেছে!

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় তৈল-খনির সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। এগুলি হইতে ১৩৫৪৪২৩০০০ পিপা-ভরতি **crude** তৈল মিলিয়াছিল। মার্কিণের বাহিরে রাশিয়া, ভেনেজিউলা, ইরাণ, ডাচ-ইণ্ডীজ, রুমানিয়া এবং মেক্সিকোতেও প্রচুর তৈল-খনি আছে। তবে মেক্সিকোর খনিগুলিতে তৈলের জোগানে সম্প্রতি টান ধরিয়াছে!

ধরণীর গর্ভে এই যে তৈল—এ-তৈলের সন্ধান প্রাচীন যুগের মানুষও অল্পস্বল্প পাইয়াছিল। তখন যেটুকু তৈল মিলিত তাহা জ্বালানি এবং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত। জোরায়াস্ত্রীয় মন্দিরগুলিতে যে অনির্ব্বাণ দীপ সেই কোন্ প্রাচীন কাল হইতে সমভাবে জ্বলিয়া আসিতেছে, সে দীপ জ্বলে সেখানকার বায়ুস্তরোৎপন্ন নৈসর্গিক বাষ্পের বলে। গলিত আসফাল্টও তৈলের মত জ্বলে। নেবুকাডনেজারের যুগে বাবিলনের প্রাসাদ-নির্ম্মাণে এই আস্ফাল্ট ব্যবহৃত হইয়াছিল পাথর ও বালি-চুণের সঙ্গে উপাদান-রূপে! মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে যে তৈল সহজে মিলিত, সে-তৈল প্রাচীন যুগে প্রলেপ-ঔষধাদি-রূপে ব্যবহৃত হইত, বলিয়াছি। আমেরিকায় সে-তৈলের নাম ছিল সেনেকা তৈল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ড্রেক সব-প্রথম পেন্সিলভানিয়ায় মাটী খুঁড়িয়া পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পান। তার পূর্ব্বে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কেনটাকি প্রদেশে এক ভদ্রলোক লবণ তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে মাটী খুঁড়িতে গেলে তৈলাক্ত তরল পদার্থের স্রোত মাটী উপছাইয়া চারি দিকে প্রবাহিত হয়; এবং কি করিয়া সে-প্রবাহে অগ্নিশিখার স্পর্শ লাগে; লাগিবা মাত্র দপ্ করিয়া প্রচণ্ড অগ্নিধারা চকিতে প্রসারিত প্রবাহে কাম্পালাং নদী পর্য্যন্ত অগ্নিময় করিয়া তোলে;—সে আগুন বহু চেষ্টাতেও কেহ নিবাইতে পারে নাই। সে-আগুন দেখিয়া ভয়ে সকলে অস্থির হইয়া বলিয়া ছিল, নরকের আগুন জ্বালাইয়াছ! সকলে ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতে ছাড়ে নাই!

ড্রেকের আবিষ্কারের পূর্ব্বে কয়লা হইতে কোন-কোন প্রদেশে তৈল নিষ্কাশন করা হইত। সে তৈলের দাম ছিল অত্যন্ত অধিক। তার পর পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কার ঘটিলে তৈলের দাম শস্তা হয়। এত বেশী তৈল মিলিতে লাগিল যে ঔষধার্থে মানুষ কত ব্যবহার করিবে? তখন এ তৈল জ্বালানির কাজে লাগিত। ছাঁকিয়া ল্যাম্পে ঢালিয়া এ তৈল-যোগে সকলে আলো জ্বালিতে সুরু করিল। এমনি করিয়া পেট্রোলিয়ামের প্রসার বাড়িল।

এখন পেট্রোলিয়ামের কল্যাণে মানুষ নানা দিকে আরাম ও বিলাসিতা বাড়াইয়া জীবনকে কত দিক্ দিয়াই না পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে!

মাটীর গর্ভ হইতে যে ধূলিজঞ্জাল-সমাকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন মোটা তৈল

মিলিত, তাহা হইতে প্রথমে পাইতাম কেরোসিন তৈল; তার পর মিলিল গ্যাসোলিন বা পেট্রোল। প্রথম যুগে পেট্রোলে ছিল কদর্য্য দুর্গন্ধ। সে দুর্গন্ধের জন্য মানুষ তাকে মাটী খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু মোটর-এঞ্জিন সৃষ্টির সঙ্গে যখন গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল এবং গাড়ীর চাকায় আঁটা হইল রবারের টায়ার, তখন মাটীর বুক হইতে পেট্রোলিয়াম তুলিয়া সে পেট্রোল ভরা হইল মোটর গাড়ীর এঞ্জিনে। পেট্রোলের জোরে এঞ্জিন সচল এবং পেট্রোলের জীবন ধন্য হইল। সেই সঙ্গে সার্থক হইল মানুষের যান-বাহনের উৎকর্ষ সাধনের সকল সাধনা।

কি করিয়া মাটীর গর্ভ হইতে পেট্রোল নিষ্কাশিত হইল, সে কাহিনী বিশেষ উপভোগ্য।

পেট্রোলিয়াম লাভের জন্য মাটীর বুকে কূয়ার মত গভীর রন্ধ্র খুঁড়িতে হয়। কিন্তু মাটাতে যে রন্ধ্র রচনা করিবেন,—বুঝিবেন কি করিয়া যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচে খোঁড়া এ-রন্ধ্রে পেট্রোল মিলিবে কি না? তাহা ছাড়া কোন্‌খানটিতে রন্ধ্র রচিলেই বা পেট্রোল মিলিবে?

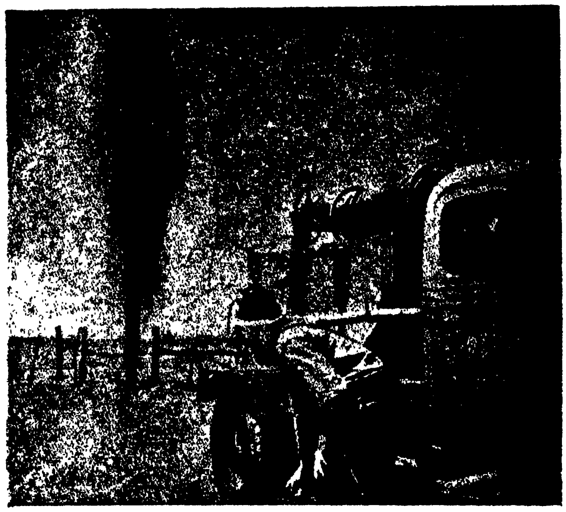
বিজ্ঞানের যুগে সর্ব্বত্র আজ আর শিক খোঁচাইয়া তৈলের উৎস খুঁজিতে হয় না। এখন শিসমোগ্রাফ-যন্ত্র হইয়াছে। এ যন্ত্র সাহায্যে রন্ধ্র মধ্যে ডিনামাইট ফেলিয়া মাটী ফাটানো হয়। সঙ্গে থাকে রেডিয়ো-যন্ত্র। ডিনামাইটে রন্ধ্র বিবরের মাটী ফাটিলে তার কাঁপন রেকর্ড হয় ঐ বেতার-যন্ত্রে। সেই রেকর্ড দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা নক্সা তৈয়ারী করেন —এবং নক্সার রেখা ধরিয়া নীচে যে পাথর বা লবণস্তূপ পাওয়া যায় সেইখানে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান অব্যর্থ ভাবে মিলিবে।

যাঁরা পেট্রোল-নিষ্কাশন করেন, তাঁদের সঙ্গে থাকে ট্রাক, বোট এবং 'পঙ্ক-বগি'। এই 'পঙ্ক-বগি' এক বিচিত্র রকমের গাড়ী। এ গাড়ী সাগর-জলে যেমন পাড়ি দিতে পারে, তেমনি আবার পঙ্ক-কর্দ্দম কাটিয়াও পাড়ি দিতে সমর্থ। এ বগি-গাড়ীর চাকা দশ ফুট উঁচু—চাকায় খুব মোটা টায়ার। এ টায়ার প্রোপেলারের কাজ করে জলে এ গাড়ী সাঁতার কাটিয়া চলে। পেট্রোল-সন্ধানী আরো নানা জাতের যন্ত্র আছে—সেগুলির নাম টার্সি ব্যালান্স, ম্যাগনিটোমিটার, গ্রাডিমীটার প্রভৃতি।

মাটীর বুক কুরিয়া রন্ধ্র রচিয়া নীচে হইতে পাথর-চূর্ণ তোলা হয়; সেই চূর্ণ পরীক্ষা করিয়া বুঝা যায়, মাটীর নীচে পেট্রোলিয়াম-স্তর আছে কি না। বহু বিশেষজ্ঞের মত, ধরণীর নীচে বহুযুগ-সঞ্চিত গাছপালা এবং বিচিত্র প্রাণীর দেহাস্থি না কি পেট্রোলিয়াম-স্তর হইয়া জমিয়া আছে—কাজেই ভূগর্ভস্থ মাটী বা পাথরের চূর্ণাবশেষ পরীক্ষা করিয়া তাঁরা বলিয়া দিতে পারেন, কোথায় পেট্রোলিয়াম মিলিবে, কোথায় বা তাহা মিলিবে না।

এই সব রন্ধ্র বা কূপ হইতে পাম্প করিয়া পেট্রোল তোলা হয়। তুলিয়া ট্যাঙ্কে ভরিয়া রাখিবার পালা। একমাত্র পেনশিলভানিয়ার কূপগুলি হইতে যে পরিমাণ পেট্রোল ওঠে, তাহা যদি এক বৎসর চালান না দিয়া সার-সার ট্যাঙ্কে মজুত রাখা হয়, তাহা হইলে পেট্রোল-ভর্ত্তি ট্যাঙ্কগুলির জন্য ১৬০০০ মাইলব্যাপী জমির প্রয়োজন হইবে।

সাধারণতঃ পেট্রোল তোলা হয় ইস্পাতের উঁচু ডেরিক-যন্ত্রে। এই ডেরিকেই রোটারি ড্রিল-যন্ত্র থাকে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটীর বুকে খুঁড়িয়া রন্ধ্র রচনা করে। রন্ধ্র যদি খুব গভীর হয় তো ড্রিলের মাথায় পাইপের পর পাইপ আঁটা হইতে থাকে। অনেক সময় এ পাইপ হয় দৈর্ঘ্যে দু'মাইল। নীচে পেট্রোল মিলিবা মাত্র পাইপের মুখে তাহা উছলিয়া ওঠে। তখন পাম্প লাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। মাটীর নীচে পুঞ্জিত বাষ্পভারে গিয়া ড্রিলের আঘাত লাগিলে বিপদ ঘটে—সে আঘাতে মাটী সশব্দে ফাটিয়া যায়। এত জোরে ফাটে যে ড্রিল-ডেরিক সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার আশঙ্কা। এ জন্য ড্রিল-যন্ত্র নামাইবার সময় তার চাপের মাত্রা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোয় এক খনির কাজে মাটী ফাটিয়া রীতিমত ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাষ্পোদ্‌গম হয় প্রচুর এবং কি করিয়া সে বাষ্পে আগুন লাগে। তার ফলে ৫৮ দিন ধরিয়া দারুণ অগ্ন্যুৎপাতে আধ মাইল ব্যাপিয়া চারি দিক্ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এ আগুন এমন তীব্র তেজে জ্বলিয়াছিল যে এগারো মাইল দূর হইতে তাহার লেলিহান শিখা দেখিয়া লোকজনের হৃৎকম্প ঘটিয়াছিল। এ আগুন



পেট্রোলের অবস্থান-পরীক্ষা

নিবানো হয় প্লেন সাহায্যে অজস্র বালুকাবর্ষণে। আগুন নিবিলেও সে জায়গায় এক মাইল জুড়িয়া craterএর সৃষ্টি হইয়াছিল।

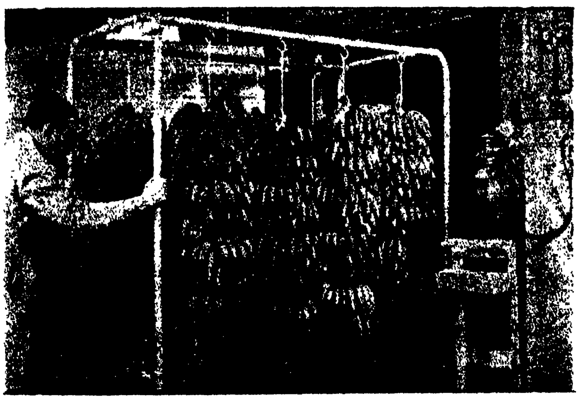
খনির সন্ধানে আগুন ও ধূম ব্যতীত কর্দ্দমোদ্‌গম লইয়াও মাঝে মাঝে বিভ্রাট ঘটে। কালিফোর্ণিয়ায় একবার বিষম কর্দ্দম-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুস্তাভ এগলাফ লিখিয়াছেন —এ খনি ড্রিল করিবার পূর্ব্বে জানা গেল, খনির মধ্যে আছে ৬২০০০ পাউণ্ড ওজনের প্লেন মাটী, ১১৬০০০০ পাউণ্ড শুষ্ক মাটী, ৬৫০০ পাউণ্ড সিমেণ্ট, ৬৩০০ পাউণ্ড অস্থি-কঙ্কাল-স্তূপ, ৭৮১ বস্তা কাঠের গুঁড়া, আর ২৩ গাঁট খড়। দশ দিনে ৩৬০০ ফুট খুঁড়িবার পর এই রিপোর্ট মেলে। তখন সতর্ক ভাবে কর্দ্দমাদি সরাইয়া এ খনির তৈল উদ্ধার করিতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় এক বৎসর।

এ পর্য্যন্ত যত খনি খোঁড়া হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর কালিফোর্ণিয়ায় ওয়ানকোয় কনটিনেণ্টাল কোম্পানির খনি।

এটি ১৫০০৪ ফুট গভীর। সাধারণতঃ দেড় হাজার ফুট খুঁড়িলেই পেট্রোলিয়ামের সাক্ষাৎ মেলে।

এক-একটি খনি খুঁড়িতে এখন ব্যয় হয় (আমেরিকার) ষোল হাজার হইতে দুই লক্ষ ডলার! ঘাটা মাটার ফাঁকে-ফাঁকে এত রকমের নিরেট তরল পদার্থ ও বাষ্প ওঠে যে, তাদের নাম নির্ণয় করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও রীতিমত কঠিন। আসফাল্ট্ বলিয়া যে-বস্তুকে এত কাল ধাতু বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাহা চুণ এবং আলকাৎরার (pitch) মিশ্র স্তূপ! এই আসফাল্ট্ পাথর পেট্রোলের মতই দাহ্য। প্রাচীন বাইজান্‌তাইন্ যুগে গ্রীকজাতি জ্বলন্ত আসফাল্টখণ্ডকে আগ্নেয়াস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিত। ওহিয়ো এবং ইণ্ডিয়ানা অঞ্চলে খনি-খনন-কালে ভূগর্ভ হইতে এক রকম বাষ্প নির্গত হইয়াছিল; সে বাষ্পের সংযোগে বালুকাস্তর জমাট কাচে পরিণত হয়।

এখন যে 'শুষ্ক বরফ' (dry ice) পাইতেছি, এ বরফের জন্ম ভূগর্ভস্থ কঠিন ডায়ক্সাইড বাষ্পের কল্যাণে। শুষ্ক বরফ তৈয়ারী



পেট্রোল-বাষ্পে কদলী পাকানো

করিতে বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। শুষ্ক বরফের জন্ম-কথা বৈচিত্র্যময়। ডক্টর গুস্তাভ এগলফ লিখিয়াছেন,—কলরাডো প্রদেশের ওয়ালডেনে মাটী ড্রিল করিবার সময় ভূগর্ভ হইতে পীতাভ এক রকম জমাট পদার্থ সবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়—তাহা দেখিতে পীতাভ বরফের মত। মাটী খুঁড়িবার পর ভূগর্ভে এমনি পীতাভ পাথরে রচা গিরিশ্রেণী দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখি, গিরি নয়, কঠিন ডায়ক্সাইড বাষ্প জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই বস্তুই শুষ্ক বরফ নামে পরিচিত। মেক্সিকো, নিউমেক্সিকো এবং উটার খনিতে প্রচুর শুষ্ক বরফ মিলিতেছে; এ বরফ এখন প্যাক করিয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়!

লস্ এঞ্জেলেসে এক তৈল-খনি খুঁড়িবার সময় ভূগর্ভ হইতে প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড এবং অখণ্ড একটি হস্তীর কঙ্কাল সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হস্তি-কঙ্কাল ছাড়া খনিগর্ভ হইতে অন্যান্য পশু-কঙ্কালও উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

পেট্রোলের সঙ্গে অনেক সময় প্রচুর আর্দ্র বাষ্প ওঠে। পূর্ব্বে এ বাষ্প তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইত; এখন এ বাষ্পকে নানা কাজে লাগানো হইতেছে। কাচের ও তামার বিবিধ কারখানাগুলি এ বাষ্প জ্বালানি-রূপে ব্যবহার করে; ইহাতে জ্বালানির ব্যয় হয় যেমন খুব অল্প, তেমনি আঁচ মেলে প্রচুর। এ বাষ্পকে তরল ট্যাঙ্কে পুঞ্জিত রাখা হয়। ট্যাঙ্কের মধ্যে তরল বাষ্প বরফের মত শীতল থাকে। পেট্রোল হইতে বুটেন এবং প্রেপিন্ নামে আরো দু'-রকম বাষ্প উদ্‌গত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রাবকের সহিত এ দুই বাষ্প মিশাইলে কশমেটিক, পেইন্ট, এ্যান্টিফ্রিজ দ্রাবক, রেজিন, নকল সিল্ক, কাপড় রঙাইবার রঙ, বিস্ফোরক এবং আরো কতো সামগ্রী তৈয়ারী হয়, তার সংখ্যা হয় না।

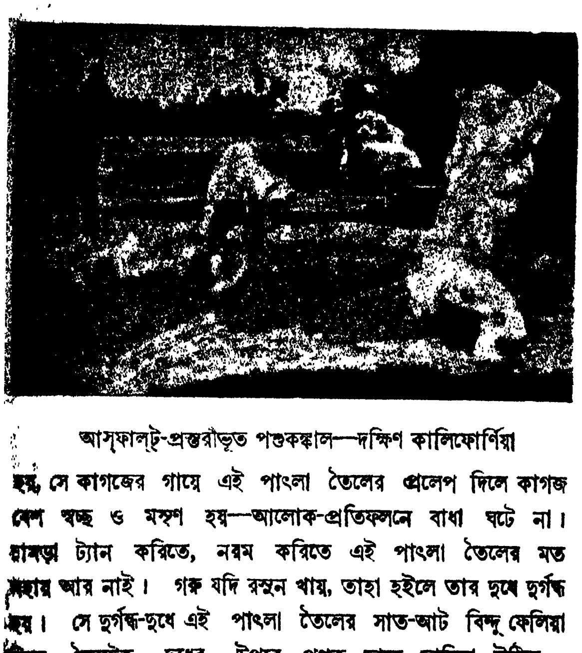
এক কথায় পেট্রোলিয়ামের খনি যেন মায়াবীর মায়া-ছড়ি! বৈজ্ঞানিকের নিপুণ হাতে এ মায়া-ছড়ির প্রভাবে খাদ্য-পানীয় বসন-ভূষণ হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে! এই যে এত রকমের বিলাস-প্রসাধনী, সুরভি-সার, তাস, রবার-টায়ার, মুখে মাখিবার ক্রীম, বর্ষাতি কোট, পর্দ্দা, আসবাব, মায় অদন্তের মুখের দন্তপাতি—এ সব আজ এমন মজবুত, সুলভ এবং সুন্দর হইয়া প্রচুর ভাবে বিরচিত হইতেছে, ইহা শুধু পেট্রোলিয়ামের প্রসাদে। গ্লিসারিণ তৈয়ারী হইতেছে পেট্রোলিয়াম হইতে। তার পর পেট্রোল হইতে



পঙ্ক-বগি

তৈয়ারী গ্লিসারিণের সঙ্গে বাতাস-হইতে-পাওয়া নাইট্রেট মিশাইয়া দিন; নাইট্রো-গ্লিসারিণ মিলিবে। তার উপর পেট্রোলিয়াম-বাষ্প হইতে যে কালো কার্ব্বন (black carbon) পাওয়া যাইতেছে, তাহার কল্যাণে আমেরিকার মুদ্রাযন্ত্রের কাজে আশ্চর্য্য সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে। পেট্রোলিয়াম-বাষ্প জ্বালাইয়া উপরে ইস্পাতের প্লেট রাখিলে সেই প্লেটে যে ঝুল পড়ে, সেই ঝুলই কার্ব্বন ব্ল্যাকরূপে নানা কাজে লাগিতেছে। ছাপিবার কালি এই কার্ব্বন ব্লাক হইতে তৈয়ারী। আধুনিক তীব্র-বেগসম্পন্ন মুদ্রাযন্ত্রে কার্ব্বন ব্ল্যাকের তৈয়ারী কালি এমন অনায়াস স্রোতে অক্ষর ও হাফটোন ব্লকগুলিকে সুস্নাত করিতেছে যে, কোনোখানে ছাপার হরফে বা ব্লকে কমবেশী কালি লাগার বালাই ঘটে না। দক্ষিণ-মেরু-অভিযানে আডমিরাল বার্ড কার্ব্বন ব্ল্যাক চূর্ণের বোমা লইয়া গিয়াছিলেন মেরু-প্রদেশের পরিমাপ-কার্য্য-সাধনে। মেরু প্রদেশে নদী নাই, গাছপালা নাই, গ্রাম-নগর বা পথঘাটের চিহ্নও নাই যে সেগুলির সাহায্যে নিদর্শন রাখা চলে—কাজেই এই কার্ব্বন-বোমা ফেলিয়া তুষারের গায়ে কালো দাগ রাখিয়া সেই দাগ দেখিয়া বিমান হইতে তিনি মেরু প্রদেশের মাপ-জোপের কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টায়ার নির্ম্মাণে

একশো ভাগ রবারের সহিত এই কার্বন ব্ল্যাক ৫০ ভাগ মিশানো হয় ; মিশাইলে টায়ার মজবুত হয়। পেট্রোলিয়াম হইতে উপধার্থে যে সব সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে প্যারাফিন-ওয়াক্স, পেট্রোলিয়াম জেলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভ্যাশেলিনও পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি। পেট্রোলিয়াম জেলি হইতে রাসায়নিক প্রণালীতে শুধু ভ্যাশেলিন নয়, আরো নানা বহুবিধ মলম প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। মুখে মাখিবার সৌখীন সুরভি ক্রীম, গায়ে মাখিবার বিবিধ লোশনও এই পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি। পেট্রোল পরিশুদ্ধ করিবার সময় তাহা হইতে প্রোপিশিন নামে এক-প্রকার বাষ্প উদ্‌গত হয়। তাহা হইতে আজ সাইক্লোপ্রোপেন নামে ঘুম-পাড়ানিয়া আরক—(anesthetic) তৈয়ারী হইতেছে। ইহার গন্ধ বেশ মিষ্ট—গন্ধে ঘুম আসে—এ গন্ধে ক্লোরোফর্মের মত দম বন্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। এ আরক আঘ্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ এবং অব্যাহত থাকে। পেট্রোল পরিশুদ্ধ করিবার সময় তাহা হইতে প্যারাফিন-ওয়াক্স পৃথক করিয়া লইলে হালকা ও পাৎলা যে তৈল পাওয়া যায়, সে তৈল প্রয়োগে ক্ষুরের ব্লেডে মরীচা ধরে না। কাগজে যে শস্তা ল্যাম্পসেড তৈয়ারী



আস্‌ফাল্‌ট্‌-প্রস্তরীভূত পশুকঙ্কাল—দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া

হয়, সে কাগজের গায়ে এই পাৎলা তৈলের প্রলেপ দিলে কাগজ বেশ স্বচ্ছ ও মসৃণ হয়—আলোক-প্রতিফলনে বাধা ঘটে না। চামড়া ট্যান করিতে, নরম করিতে এই পাৎলা তৈলের মত সহায় আর নাই। গরু যদি রসুন খায়, তাহা হইলে তার দুধে দুর্গন্ধ হয়। সে দুর্গন্ধ-দুধে এই পাৎলা তৈলের সাত-আট বিন্দু ফেলিয়া দিলে—তৈলটুকু দুধের উপরে পৃথক ভাবে ভাসিয়া উঠিবে—দুধের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না—ভাসিয়া-ওঠা তৈলের গায়ে দুধের যত দুর্গন্ধ গিয়া লাগিবে। তখন সে দুধ খাইলে এতটুকু দুর্গন্ধ মিলিবে না। পান করিবার সময় উপরের তৈলটুকু ফেলিয়া দিয়া তবে সে দুগ্ধ পান করিতে হয়।

প্যারাফিন-ওয়াক্স কি কাজে যে না লাগে, তার হিসাব করিয়া বলা কঠিন। বিলাতী-লোকের অতি-সাধের চিউইং-গাম তৈয়ারী হইতে বাতি, নকল ফুল-ফল, ক্রীম, আচার, স্যালাড্‌, চীজ, মাখন রাখিবার আধার তৈয়ারী করিতেও প্যারাফিন-ওয়াক্স অমূল্য। ফুল বা পাকা ফল বিদেশে চালান দিবার সময় সেগুলির গায়ে প্যারাফিন ওয়াক্সের পাৎলা প্রলেপ মাখাইয়া দিলে ওয়াক্সের কল্যাণে ফল-ফুলের বর্ণে-ঘ্রাণে এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিবে না—ফল পচিবে না, বিবর্ণ হইবে না ; ফুল সমান তাজা থাকিবে। চীন, আর্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশে প্যারাফিন-ওয়াক্সের প্রলেপ লাগাইয়া নিত্য কত ফুল-ফল চালান যায়, তার সংখ্যা নির্ণীত হয় না। নিউ ইয়র্কের মেলায় সে-বার বড় বড় ঝাউগাছ উপড়াইয়া আনিয়া নূতন করিয়া মেলাক্ষেত্রে বসানো হইয়াছিল ! সে সব গাছের আপাদ-মস্তক প্যারাফিন-ওয়াক্সের প্রলেপে সিক্ত করা হয়। তার ফলে দর্শকের দল মেলায় আসিয়া সাজানো বাগান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল।

বড় বড় বাগানে দামী গোলাপ গাছগুলিকে শীতের সময় এই প্যারাফিন-ওয়াক্সে অভিসিঞ্চিত রাখিলে সে সব গাছের জীবন-যৌবন অটুট অক্ষয় থাকে ; এতটুকু শীতের আঁচ তাদের লাগে না। কীটের হাত হইতে গাছপালা রক্ষা করিতে হইলে কেরোসিনের সঙ্গে পাইরেক্রাম বা ডেরিশ গাছের মূল-চূর্ণ মিশাইয়া সেই দ্রাবক পিচকারি-ধারায় গাছের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিন, কোনো কীটের সাধ্য থাকিবে না সে-গাছের গায়ে দন্তস্ফুট করিবে ! কালিফোর্ণিয়ার ইউনিয়ন অয়েল কোম্পানি উদ্ভিদ-রক্ষার্থে এই বিষাক্ত তৈল অজস্র পরিমাণে তৈয়ারী করিতেছে। মশামাছি আর্শুলা প্রভৃতি দুষ্ট কীট-পতঙ্গের উচ্ছেদ-সাধনে যে তৈল—ফ্লিট্‌—আজ পিচকারী-ধারায় বর্ষিত হয়, তাহাও পেট্রোলিয়াম-সম্ভূত। এরোপ্লেনকে লেখনী করিয়া আকাশের গায়ে ধূম্রলেখায় সম্প্রতি যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করা হইতেছে, সে কাজও সফল হইয়াছে এই পেট্রোলিয়ামের দৌলতে। এই লিখনের প্রথম প্রচলন হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ক্যাপটেন সিরিল টার্ণার ডার্বির দিন আকাশের গায়ে "ডেলি মেল" অক্ষরগুলি ধূম্ররেখায় বিরচিত করেন। এই ভাবে লিখন ফুটানোর কাজ আজ এমন সহজ হইয়াছে যে ঘণ্টায় দেড়শো মাইল ব্যাপিয়া আকাশ-পটে অক্ষর রচনা করা বাহাদুরি বলিয়া গণ্য হয় না ! ১৫০০০ ফুট উর্দ্ধে শূন্যপথে আট-দশ মাইল ব্যাপিয়া যে বিজ্ঞাপনী ধূম্র-রেখায় লিখিত হয়, মাটীর মর্ত্ত্যলোকে বসিয়া সে-লিখন সুস্পষ্ট পড়া যায়।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের বুকে শিরার মত ৩২১০০০ মাইল দীর্ঘ পাইপ পাতা আছে, সেই পাইপ বহিয়া পেট্রোলের জোগান চলিয়াছে নানা দেশে। সে পাইপ লোকলোচনের অন্তরালে এমন কৌশলে পাতা যে উপর হইতে পাইপের অস্তিত্ব বুঝিবার জো নাই। সাগর-তলেও পেট্রোলের পাইপ। সে পাইপ বহিয়া দিক্‌-দিগন্তরে চলিয়াছে পেট্রোলের জোগান। নিজের ভারেই পেট্রোল ঈপ্সিত স্থানে গিয়া পৌঁছায়। ক্বচিৎ কোথাও পেট্রোলের ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য পাম্পিংয়ের প্রয়োজন হয়। পাইপযোগে চালান হয় বলিয়া পেট্রোলের কোথাও টান্‌ পড়ে না। রেলোয়ে বা জাহাজ মারফৎ পাঠাইতে হইলে কতটুকুই বা এক-কালে পাঠানো সম্ভব ছিল ! পাইপ বহিয়া দিনে মার্কিণ-পেট্রোল চালান যায় প্রায় ৩৫০০০০০ পিপা। এত পেট্রোল রেলোয়ে-মারফৎ চালান দেওয়া কোনো কালে সম্ভব হইতে পারে না ! তবুও পাইপ-চালানী ছাড়া রেলোয়ে-মারফৎ দিনে ৪৬০০০ ট্যাঙ্ক-কারপূর্ণ পেট্রোল চালান যায়। ইহার উপর আছে জাহাজ। পেট্রোল চালান দিবার জন্য আমেরিকার দু'হাজার ট্যাঙ্ক-জাহাজ আছে। তাছাড়া ছোট-খাট জাহাজের সংখ্যা নাই ! এ সব জাহাজকে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ করা হইয়াছে। ব্যবস্থার ফলে পেট্রোলবাহী জাহাজের যাত্রীদেরও এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবার অবকাশ নাই।

৮

মূল :—অতএব এই বিষয়ে আপনাদিগের অমরগণের প্রতি কোপ (বা ক্ষোভ প্রকাশ) করা উচিত নহে। ১১৮।

এই নাট্য সপ্তদ্বীপের অনুকরণাত্মক হইবে।

যেহেতু নাট্য অনুকরণাত্মক, অতএব যাহা মৎকর্তৃক কৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ। ১১৯।

সঙ্কেত :—১১৮। ব্রহ্মা এইরূপে নাট্যের প্রয়োজন বলিবার পর প্রকরণ-গত পুরাকল্প বিবৃত করিতেছেন। পুরাকল্প—প্রাচীন কথা। মূলে আছে—"তন্নাত্র মন্যুঃ কর্ত্তব্যো ভবদ্ভিরমরান্ প্রতি"। তৎ—তস্মাৎ—সেই হেতু ; যেহেতু নাট্যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান-শিল্প-বিদ্যা-কলা-যোগ-কর্ম্ম বর্ত্তমান, অতএব—। অত্র—এই বিষয় অর্থাৎ নাট্য-বিষয়ে —নাট্যাভিনয়-দর্শন-বিষয়ে। মন্যুঃ—"মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি"। মন্যু অর্থে এস্থলে কোপ করাই ভাল ; কারণ, দৈত্যগণ দৈন্য প্রকাশ করেন নাই—ক্রোধবশেই নাট্যবিঘ্ন করিয়াছিলেন। অমরান্ প্রতি —অমরবৃন্দের প্রতি। অমরগণ যে নাট্যে অবশ্য প্রশংসনীয়—এমন কোন নিয়ম নাই—কারণ, নাট্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ তাঁহারা নহেন—"তেঽপি তত্র ন কেচিৎ" (অভিনব, নাট্যভারতী, পৃঃ ৪৩)। শুধু তাহাই নহে—নাট্যে অমরগণের বস্তুসত্তাও নাই। কয়েক জন নটমাত্র অমরগণের বেশ-বাক্ ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া থাকেন—বস্তুতঃ অমরগণের নাট্যে অনুপ্রবেশ নাই। অভিনব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—সপ্তদ্বীপের অনুকরণাত্মিকা ক্রিয়া রঙ্গে প্রদর্শিত হয় মাত্র—বস্তুতঃ, সপ্তদ্বীপান্তর্গত কোন সাগর বা দ্বীপের তথায় সম্ভাব-সম্ভাবনা নাই। রঙ্গে সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত নানা বিভাগের যে অনুকরণ প্রদর্শিত হয়, তাহা কৃত্রিম—যথার্থ নহে। রঙ্গে প্রদর্শিত ইন্দ্রাদি দেবগণ—বস্তুতঃ দেবতা নহে—ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুকারক নটমাত্র। অতএব, অনুকারক নটের ক্রিয়া দর্শনে উহাকে যথার্থ দেবতার ক্রিয়া মনে করা বা সেই হেতু কোপ প্রকাশ করা অনুচিত—ইহাই অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৩)।

১১৯। সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি (বরোদা) —সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যে হ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ (কাশী)।

যেনানুকরণং নাট্যমেতত্তদ্‌যন্ময়া কৃতম্—যেন (হেতুনা) অনুকরণং নাট্যম্, (তস্মাৎ) যৎ ময়া কৃতং তৎ এতদ্ (ঈদৃশম্)—অর্থ একটু অস্পষ্ট হইলেও অবোধ্য নহে। যেহেতু নাট্য অনুকরণাত্মক, সেই হেতু যাহা আমি করিয়াছি সেই নাট্যে বর্ণিত দেবাসুর-চরিত্র এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বকালের দেবাসুরবৃন্দের চরিত্র-চিত্রের অনুরূপ হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা আমি করিয়াছি—ইহার অর্থ—যে নাট্যরচনা আমি করিয়াছি, সেই নাট্যোক্ত দেবাসুর-চরিত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ; এইরূপ—পূর্ব্বকালের দেবাসুর-চরিত্রের অনুকারক ; ইহার কারণ কি ?—যে হেতু নাট্য অনুকরণাত্মক, অর্থাৎ নাট্য অনুকরণাত্মক বলিয়াই আমি পুরাকল্পের দেবাসুর-চরিত্রানুকরণে নাট্যোক্ত দেবাসুর-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছি—দেবগণের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তাঁহাদের বিজয় ও অসুরগণের প্রতি দ্বেষবশতঃ তাহাদের পরাজয় প্রদর্শন করি নাই। পক্ষান্তরে, পুরাকল্পে—দেবাসুর-সংগ্রামে বস্তুতঃ দেবগণের বিজয় ও অসুরগণের পরাজয় ঘটিয়াছিল—বর্ত্তমান নাট্যে সেই অতীত ঘটনার অনুকরণ-মাত্র করিয়াছি। অতএব, অসুরগণের কোপ জন্মান উচিত নহে—ইহাই ব্রহ্মার উক্তির তাৎপর্য্য।

মূল :—দেবর্গণ, অসুরবৃন্দ, রাজমণ্ডল, কুটুম্বগণ ও ব্রহ্মর্ষিসমূহের বৃত্তান্ত-দর্শক নাট্য—(ইহাই) বিজ্ঞেয়। ১২০।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—নাট্য অনুকরণাত্মক এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অসুরগণকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেও অসুরগণ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারেন—"নাট্য অনুকরণাত্মক হউক—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু কি কারণে দেবাসুরগণের নাম নাট্যে উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতা ও বিরূপাক্ষাদি বিঘ্ন প্রভৃতির নাম নাট্যে উক্ত হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ (personal reference) করা হইল কেন'? এই প্রশ্নের উত্তর-দান-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা এই শ্লোকটি বলিয়াছেন—ইন্দ্রাদি দেবতা, বলি-প্রহ্লাদাদি অসুর, প্রিয়ব্রতাদি রাজা, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি ইঁহারাই ত স্বনামধন্য আধিকারিক পুরুষ, ইঁহাদিগের চরিত্র সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগকে বাদ দিয়া নাট্য-রচনা অসম্ভব। কারণ, চরিত্র বাদ দিলে নাট্য আধারহীন হইয়া পড়ে। চরিত্রগুলিকে বাদ দিয়া কেবল ঘটনার বর্ণনা করিলে উহা সংবাদপত্রের বিবৃতির আকার ধারণ করে। এরূপ নিরাধার বৃত্তান্ত নাট্যে দেখান যাইতে পারে না—"তেষামেবাধিকারিপুরুষত্বং নিরাধারস্য বৃত্তস্য দর্শয়িতুমশক্যত্বাৎ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৩)।

আরও এক কথা। অসুরগণের অভিযোগ—তাঁহাদিগের অপমানই মাত্র নাট্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এ অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ, অকৃত্রিম সহজাত ঔদার্য্য ধর্ম্ম ইত্যাদি সদ্গুণের আধার-রূপে প্রসিদ্ধ প্রহ্লাদ বলি প্রভৃতির চরিত্রও আশ্রয়রূপে নাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব দৈত্যগণ কিরূপে এ অভিযোগ করেন যে—নাট্যে তাঁহাদিগের পরাভবই মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

অধিকন্তু—ইহাও সত্য নহে যে, যাঁহারা অসুরগণের শত্রু কেবল তাঁহাদিগেরই চরিত্র নাট্যে প্রশংসিত হইয়াছে। কারণ, দেবগণ ব্যতীত ব্রহ্মর্ষিগণের উন্নত চরিত্রের প্রশংসাও নাট্যে দৃষ্ট হয়। দেবগণ দানব-বৈরী হইতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত ত আর অসুরগণের শত্রুতা নাই—ব্রহ্মর্ষিগণ জগতের সকলেরই মিত্র। অতএব, ১০৩ শ্লোকে অসুরগণ যে আশঙ্কাপূর্ব্বক অভিযোগের উত্থাপন করিয়াছেন—"প্রত্যাদেশোঽয়মস্মাকং সুরার্থং ভবতা কৃতঃ"। (দেবগণের প্রতি পক্ষপাতের নিমিত্ত এই নাট্য আমাদিগের অবমানকর-রূপে আপনি রচনা করিয়াছেন)—সে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া এই শ্লোকে প্রমাণিত হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৩)।

মূল :—লোকের এই যে সুখ-দুঃখ-সমন্বিত স্বভাব তাহাই অঙ্গাদি অভিনয়-যুক্ত হইলে নাট্য-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১২১।

সঙ্কেত :—কাশী-সংস্করণে এই শ্লোকটি পঠিত হয় নাই। এই শ্লোকটির উপর অভিনবগুপ্ত বহু বিচার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সারার্থ-মাত্র এ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে। যোঽয়ম্ (মূল)—এই যে 'এই'—বলিলে বুঝায়—নাট্য পুরাকল্পীয় ঘটনা নহে—প্রত্যক্ষকল্পীয় ঘটনার অনুব্যবসায়-বিষয়ক ; অর্থাৎ—প্রত্যক্ষকল্পে (বর্ত্তমানে) যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাদিগের যথাযথ সন্নিবেশ নাট্যে নাই—নাট্যে আছে বর্ত্তমান ঘটনার অনুসরণে দৃঢ় আগ্রহ। নাট্য প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমান বর্ত্তমান ঘটনাবলীর জীবনহীন প্রতিচ্ছবিমাত্র নহে—পরন্তু সজীব অনুকরণ (—ইহারই নাম 'অনুব্যবসায়') ; ইহাতে বাক্য

সত্য বা অসত্য বলিয়া বিবৃত হয়, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ সত্যাসত্য হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখুন—নাট্যে প্রদর্শিত মৃত্যু—লোকে প্রসিদ্ধ মৃত্যু হইতে অত্যন্ত পৃথক্। নাট্য জীবনের সজীব অনুকরণ হইলেও—নাট্যের সবই কৃত্রিম। লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা ও নাট্যোক্ত ঘটনার ভেদ এইখানেই। এই যে—'যে'—পদের তাৎপর্য্য যে বিষয়। এই বিষয়টি হইতেছে 'স্বভাব'—'এই যে স্বভাব'। 'স্বভাব' বলিলে কি বুঝায়? স্ব—স্বকীয়; ভাব—ভাব্যমান—চর্ব্যমাণ বিষয়। 'ভাবশব্দটি ভূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভূ-ধাতুর অর্থ—সত্তা (থাকা বা হওয়া), জন্ম, প্রকাশ। ভাব—ভাব্যমান বিষয়। ভাব্যমান—যাহা ভাবিত হইতেছে। অভিনবের মতে ভাব্যমান অর্থে চর্ব্যমাণ। চর্ব্যমাণ—আস্বাদ্যমান। যে বিষয়কে সকল লোক স্বকীয় বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করে, তাহাই লোকের স্বভাব। যে বিষয় সর্ব্বজন-সাধারণ, সে বিষয়কে সকল লোকই নিজ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করে (কারণ উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে—সর্ব্ব-সাধারণের)—তাই উহার নাম 'স্বভাব'। সকল-লোক-সাধারণ বলিয়া যে বিষয় সকল-লোক-কর্তৃক স্বকীয় বিষয়-রূপে ভাবিত (অর্থাৎ আস্বাদিত—প্রত্যক্ষ অনুভূত) হয়, তাহারই নাম 'নাট্য'—"স্বচ্ছন্দবাচ্যো লোকস্য সর্ব্বস্য সাধারণতয়া স্বত্বেন ভাব্যমানশ্চর্ব্ব্যমাণোঽর্থো নাট্যম্" (অ: ভা:, পৃ: ৪৩)।

নাট্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব নহে—নাট্যে বর্ণিত বিষয় সকল-লোক-সাধারণ। তাই নাট্য-বর্ণিত বিষয়কে সকল লোকই স্বকীয় বিষয় মনে করে। ইহা অবশ্যই সম্ভব যে, রামচন্দ্র বা চাণক্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন। তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের অনুভূত সুখ-দুঃখ কেবল তাঁহাদিগেরই নিজস্ব ছিল। কিন্তু এই রাম-চরিত্র যখন নাট্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে তখন নাট্য-বর্ণিত রাম-চরিত্রের সুখ-দুঃখ দর্শনকালে প্রত্যেক দর্শকই উহা নিজ নিজ সুখ-দুঃখ হইতে অভিন্ন ভাবে অনুভব করেন—ইহাই নাট্যের স্বরূপ ও 'স্বভাব' পদটির তাৎপর্য্য।

এই নাট্যরূপ বিষয়টি বিচিত্র সুখ-দুঃখ-যুক্ত—কিন্তু সুখ-দুঃখের সহিত একাত্মক নহে। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত দেখাইয়াছেন—কিরূপে রতি-হাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলি সুখ-দুঃখ-রূপ বা সুখ-দুঃখ-মিশ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে বিস্তৃত বিচার এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে কেবল দৃষ্টান্তরূপে একটু আধটু বিচারাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

স্থায়ি-ভাবগুলির মধ্যে রতি-হাস-বিস্ময়-উৎসাহ স্বতঃই সুখ-স্বভাব; কিন্তু তাহা বলিয়া উহাদিগের কোনটিই পরিপূর্ণ সুখাত্মক নহে। রতি-ভাব সুখ-স্বভাব হইলেও উহার মধ্যে কখনও কখনও রতি-বিরোধী ভাবের উদয়ের আশঙ্কা মিশ্রিত থাকে—এ কারণে সুখমধ্যেও দুঃখের ঈষৎ সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। আবার ধরুন—উৎসাহ স্থায়ী ভাব। উহাতেও আয়াস-রূপ দুঃখের মিশ্রণ আছে। তবে উহাতে বহুজনের ভাবী ও চিরস্থায়ী উপকারের ইচ্ছা বর্ত্তমান—ইহাতেই উহার সুখ-রূপতা। আবার দেখুন—শোক স্থায়িভাব আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—উহা সর্ব্বদা দুঃখরূপ; কিন্তু উহাতেও প্রাক্তন সুখের স্মৃতি অনুবিদ্ধ হইয়া আছে—এ কারণে উহাতে দুঃখ-বাহুল্যমধ্যেও সুখ-লেশ-মিশ্রিত। আবার ভয় স্থায়িভাবেও দেখা যায় যে—উহাতে তাৎকালিক দুঃখ থাকিলেও সেই দুঃখ দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। এই দুঃখাপগমের আকাঙ্ক্ষাতেই সুখের উৎপ্রেক্ষা। অতএব ভয়ও সুখ-সম্ভিন্ন দুঃখ-রূপ—নিছক দুঃখমাত্র নহে। এইরূপে অভিনব প্রত্যেকটি স্থায়ি-ভাবের স্বরূপ-বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই বিচিত্র সুখের ও দুঃখের সম্মিশ্রণ বিদ্যমান। অবশ্য ইহা সত্য যে প্রত্যেক স্থায়িভাবেই সুখ-দুঃখ সম-পরিমাণ বা একজাতীয় নহে—প্রত্যেক স্থায়ি-ভাবেই সুখের বা দুঃখের পরিমাণ ভিন্ন, সুখের স্বরূপ বিচিত্র। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে—এমন কোন স্থায়িভাবই নাই, যাহাতে কোন না কোন রূপে কিছু পরিমাণ সুখের বা দুঃখের সম্মিশ্রণ নাই। অভিনব আরও বলিয়াছেন—এই সিদ্ধান্ত ব্যভিচারি-ভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব প্রভৃতির পক্ষেও প্রযোজ্য,—অর্থাৎ ভাবমাত্রই সুখদুঃখানুবিদ্ধ—সুখদুঃখানুগত।

সুখ-দুঃখ-সমন্বিত—স্বভাব-পদের বিশেষণ। সুখ-দুঃখাদি সংবিৎ-স্বভাব—ইহাই অভিনবের মত; অর্থাৎ—সুখ-দুঃখ-প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়া জ্ঞান-রূপ (১)। কিন্তু মতান্তরে—সুখ-দুঃখাদির বেদন বা অনুভবই এ প্রসঙ্গে অভিপ্রেত। মোটের উপর, উভয় মতের পার্থক্য এই যে—অভিনব-মতে—লোক-স্বভাব সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি-যুক্ত, আর মতান্তরে উহা সাক্ষাৎ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত নহে—কিন্তু সুখাদির অনুভব-বিশিষ্ট (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে—লৌকিক যে সকল ভাব—রতি-হাস-ভয়-শোকাদি—সেগুলি সকলই সুখ-দুঃখাত্মক। নাট্যরূপ বিষয় তৎসদৃশ ও তৎসংস্কারানুবিদ্ধ,—অর্থাৎ লৌকিক রত্যাদি ভাবের অনুসরণাত্মক নাট্য। এখন প্রশ্ন উঠিবে—এবংবিধ নাট্য প্রতীতি-গোচর হয় কিরূপে? তাহার উত্তর-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অঙ্গাদি অভিনয়-যুক্ত হইলে লৌকিক ভাবগুলি নাট্যরূপে পর্য্যবসিত হয়।

অঙ্গাদ্যভিনয়োপেতঃ (মূল)—অঙ্গাদি-বিষয়ক অভিনয়—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক—এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়। ইহাদিগকে 'অভিনয়' বলা হয় কেন?—ইহার উত্তর-দান-প্রসঙ্গে অভিনব বলিয়াছেন যে, ইহারা রসের অভিমুখে নয়ন করে (অর্থাৎ লইয়া যায়), তাই ইহাদিগের নাম 'অভিনয়'—"আস্বাদপর্য্যায়-প্রতীত্যুপযোগিনোঽত এবাভিমুখ্যনয়নহেতুত্বাৎ" (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)। আঙ্গিকাদি অভিনয়-দ্বারা শৃঙ্গারাদি রসের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার বা অনুভূতিরই নামান্তর আস্বাদ বা চর্ব্বণা। রত্যাদিভাবে এ চর্ব্বণা থাকে না। এ কারণে রস ভাব হইতে বিলক্ষণ। আঙ্গিকাদি অভিনয় যেরূপ রসাস্বাদের হেতু, সেইরূপ অঙ্গাদিও রসের অভিমুখে নয়নের হেতু—"রসাভিমুখ্য-নয়নহেতবঃ (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)। অঙ্গাদি বলিতে বুঝায়—অঙ্গ-সমূহ (অর্থাৎ শাখা-নৃত্ত-গীত) আদি (প্রধান) যাহাদিগের—অর্থাৎ ব্যভিচারি-ভাবসমূহ ও বিভাব-অনুভাব-সমূহের। কারণ ষষ্ঠাধ্যায়ে বলা হইবে—'রত্যাদি স্থায়িভাব-বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে

১। মূলে আছে—"সংবিৎস্বভাবাঃ সুখাদয়ঃ" (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)। এস্থলে সংবিৎ অর্থে—অন্তঃকরণের বৃত্তি-রূপ জ্ঞান—বিষয়-জ্ঞান বুঝিতে হইবে—**knowledge of any object**; বেদান্তে 'সংবিৎ' শব্দের অর্থ—চিদ্রূপ স্বরূপ-জ্ঞান—**Consciousness**; সে অর্থ এস্থলে গ্রাহ্য নহে। কারণ, সুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—অচেতন—বৃত্তিরূপ-মাত্র—চৈতন্য-স্বরূপ নহে।

রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে' (২)। তাহা হইলে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে—শাখা-নৃত্ত-গীতাদি (৩)। অঙ্গ—স্থায়িভাব-বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব সমূহ আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক-নামক চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের সাহায্যে রস সৃষ্টি করে।

অঙ্গাদ্যভিনয়োপেতঃ—অভিনব সমাস ভাঙ্গিয়াছেন—"তৈঃ (অঙ্গাদ্যভিনয়ৈঃ) উপেতঃ উপ সমীপমিতঃ সংবিদ্দর্পণমভিসংক্রান্তঃ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৪)। উক্ত প্রকার অভিনয়সমূহ-দ্বারা উপেত (যুক্ত)—অর্থাৎ সংবিদ্‌রূপ দর্পণে সংক্রান্ত (৪)। যে বিষয় অভিনয়-দ্বারা চিত্তে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ রসস্ফূর্ত্তির অনুকূল অভিনয়-দ্বারা যে বিষয় চিত্ত-রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই 'নাট্য'। স্পষ্ট কথায়—বাহিরে আঙ্গিকাদি অভিনয়ের ও বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাবাদির প্রদর্শন-দ্বারা যাহা চিত্তমধ্যে রস-সৃষ্টি করে—সেই বিষয়ের নামই 'নাট্য'। 'নাট্য' বলিলে বুঝায় নাটকীয়—নর্ত্তনীয়—নর্ত্তনের যোগ্য—অর্থাৎ নর্ত্তন-ব্যাপার—"এবম্ভূতোঽর্থো নাট্যং নটনীয়ং নর্ত্তনীয়ং নর্ত্তনং…তথা নাটকানাং পারম্পর্য্যাত্মকং বৃত্তং নাট্যং ধর্ম্মাম্নায়রূপঞ্চ, তচ্চ সুখ-দুঃখাভ্যাং ফলরূপাভ্যাং সম্যগন্বিতম্" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৪)।

এই নাট্য—নাটক-সমূহের পারম্পর্য্যাত্মক বৃত্ত অর্থাৎ নাটকাদিতে যে ঘটনা-পরম্পরা লিপিবদ্ধ থাকে—উহাই নাট্য। উহা ধর্ম্মাত্মক ও উহাকে আম্নায়তুল্য বলা হইয়াছে। 'আম্নায়' অর্থে বেদ। নাট্য কেবল নাটকীয় ঘটনা নহে—উহার স্বরূপ ধর্ম্মাত্মক ও উহা বেদ-মূলক বলিয়া উহাকে বেদতুল্য শাস্ত্র—'নাট্যশাস্ত্র'—বলা হইয়া থাকে। ভাবী সুখ-দুঃখ-রূপ ফল উহার সহিত সম্যগ্‌রূপে সম্বদ্ধ—ইহাই অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য।

মূল :—বেদ-বিদ্যা-ইতিহাসাদির আখ্যান-পরিকল্পন (-রূপ) (এই নাট্য লোকে বিনোদ-করণ হইবে)॥ ১২২ ॥

সঙ্কেত :—কাশী-পাঠ বিনোদ-জননং কালে। তাৎপর্য্য—বেদ-বিদ্যা ও ইতিহাসাদির আখ্যানাংশের পরিকল্পনা নাট্যে করা হইয়া থাকে। বেদে একটি উপদেশ পাওয়া গেল; নাটকে একটি আখ্যান পরিকল্পনাপূর্ব্বক তাহার মধ্য দিয়া উক্ত উপদেশটির প্রচার করা সম্ভব হয়। আবার ইতিহাসে একটি ঘটনার শুষ্ক বিবরণমাত্র পাওয়া গেল। উহাকে সরস করিতে হইলে নাট্যে একটি বিস্তৃত আখ্যান-পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হয়। এইরূপ নাট্য লোকে চিত্ত-বিনোদন-কর হইয়া থাকে।

মূল :—(শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারের পরিশিষ্ট-বিষয়-কল্পন-রূপ) এই নাট্য লোকে বিনোদ-জনক হইবে॥ ১২৩ ॥

সঙ্কেত :—১২২ শ্লোকের শেষার্দ্ধ বিনোদকরণং লোকে নাট্য-মেতদ্ ভবিষ্যতি—হইতে—১২৩ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ শ্রুতিস্মৃতি-সদাচারপরিশেষার্থকল্পনম্—পর্য্যন্ত অংশ—ব্র্যাকেট-মধ্যে মুদ্রাপিত। কাশী-সংস্করণের পাঠ—"বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্"॥১১৬॥ বিনোদজননং কালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি। শ্রুতিস্মৃতিসদাচার-পরিশেষার্থকল্পনম্॥ ১১৭॥—এইটুকু মাত্র আছে। বরোদার অতি-রিক্ত শ্লোকার্দ্ধ—বিনোদজননং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি—এ পুনরুক্তির অংশটুকু কাশী-সংস্করণে নাই।

শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচার—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রমাণ। শ্রুতি ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রধান প্রমাণ; স্মৃতি ও সদাচার—শ্রুতির অনুকূল হইলে (অন্ততঃ শ্রুতিবিরোধী না হইলে) ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমাণ।

শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচার—সাধারণ ভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয় করিয়া দেয় কিন্তু এই সাধারণ বিধানকে লোকের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইলে আখ্যানের অবতারণা করিতে হয়। এই আখ্যান-পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়—নাট্যে। শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারের সাধারণ বিধিসমূহের পরিশিষ্ট বিষয় হইতেছে—এই সকল আখ্যান (concrete illustrations serving as suitable appendices to the general rules of the sruti, smriti and good conduct)।

বিনোদকরণ, বিনোদজনন—চিত্ত-বিনোদন-কর।

কাশী-সংস্করণে এই শ্লোকটির পর—বরোদার ১২০নং শ্লোকটি নিম্নোক্ত পরিবর্ত্তিতাকারে উক্ত হইয়াছে—

"দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে"॥ ১১৮॥

মূল :—এই সময়ে পিতামহ দেব-সকলকে বলিয়াছিলেন—'আজ নাট্যমণ্ডপে যথাবিধি যজন কর॥ ১২৪॥

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—এই ভাবে সাম-বাক্য-প্রয়োগে বিঘ্নগণ অপসারিত হইবার পরও রঙ্গমণ্ডপে যজন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া ব্রহ্মা স্থির করিয়াছিলেন; কারণ, ইতঃপূর্ব্বেই তিনি রঙ্গ-মণ্ডপের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কল্পনা করিয়া এক এক জনের উপর তত্তদধিষ্ঠিত রঙ্গভাগের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন—তাঁহার এই দিব্য আদেশ ত ব্যর্থ হইবার নহে। এতস্মিন্নন্তরে—ইহার মধ্যে। অভিনব বলিয়াছেন—'অন্তরে' অর্থে সময়ে। অর্থাৎ এই সময়ে। যথাবিধি—কিরূপ বিধি তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে উক্ত হইতেছে।

পাঠান্তর—ক্রিয়তামদ্য বিধিবদ্ (বরোদা),—ক্রিয়তাং নাট্য-বিধিবদ্ (কাশী); কারয়ন্তত্র ভগবান্; কুরুধ্বমত্র যজনং বিধিবৎ—ইত্যাদি।

মূল :—মন্ত্র ও ওষধি-সমন্বিত বলি-প্রদান ও হোম-দ্বারা (যথা বিধি যজন কর); ভোজ্য, ভক্ষ্য ও পান-সমূহ-দ্বারা বলি প্রকল্পিত হউক॥ ১২৫॥

সঙ্কেত :—"জপৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ পানৈশ্চ" (বরোদা) "[illegible] ভোজ্যৈশ্চ" (কাশী)। পাদটীকায় পাঠান্তর—"ভোজ্যৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ পানৈশ্চ"—অভিনবের টীকা-দর্শনে বোধ হয়—তিনি এই পাঠটিই গ্রহণ করিয়াছেন—খরবিশদং শষ্কুলীমোদকাদি ভোজ্যং ভক্ষ্যমুচ্যতে। ভক্ষণীয়ন্তু ভক্ষ্যম্। পায়সং কৃসরাদি। পানানি ক্ষীরেক্ষুদ্রাক্ষারসা-দীনি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৫; উহার তাৎপর্য্য—যে সকল ভক্ষ্য দ্রব্য কঠিন ও শুষ্ক (যথা, শষ্কুলী-মোদকাদি) তাহাদিগকে 'ভোজ্য' বলা হয়। 'ভক্ষ্য' অর্থে—ভক্ষণীয় দ্রব্য, যথা—পায়স-কৃসরাদি। 'পান'

২। গত পূর্ব্ব বর্ষদ্বয়ের মাসিক বসুমতীর ঊনবিংশতি সংখ্যায় ধারাবাহিক 'রস'-প্রবন্ধে রস-নিষ্পত্তি ও রসাস্বাদনের বিষয় বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৩। শাখা-নৃত্ত-গীতাদি অঙ্গের বিষয় যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

৪। 'অভিনয়' বলিতে বুঝাইতেছে—রসের অভিমুখে নয়নের হেতু—(১) আঙ্গিকাদি চতুর্ব্বিধ অভিনয়—রস-সৃষ্টির অনুকূল, ও (২) বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাবাদি ও (৩) শাখানৃত্ত-গীতাদি অঙ্গ রস-নিষ্পত্তির হেতু। ইহারাই অভিনয়-শব্দের বাচ্য।

স্মরণ

বসুমতীর প্রাণ-সর্ব্বস্ব সতীশচন্দ্রের অন্তিম ইচ্ছা এবং নির্দ্দেশ-অনুসারে তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী খড়দহের নিকট রহড়ায় অনাথ বালকগণের আশ্রয় ও লালনের জন্য রামচন্দ্র-প্রীতি-স্মৃতি ভবন নামে যে-আশ্রম এবং শুঁড়ার মেডিকেল ইনষ্টিটিউট হাসপাতালে টাইফয়েড রোগের প্রতিকারাদি-কল্পে যে-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—গত ১১ই মাঘ সতীশচন্দ্রের এক-মাত্র কৃতী পুত্র ৺রামচন্দ্রের জন্ম-তিথি-দিবসে সেই স্মৃতি-ভবনে এবং শুঁড়ার উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাস-পাতালে বিশেষ উৎসবের আয়ো-জন হইয়াছিল। উৎসবের দিন মধ্যাহ্নে রহড়ার আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহু দরিদ্রনারায়ণকে ভোজ্য-পানীয়ে পরিতৃপ্ত করা হয় এবং একটি জনসভার আয়োজনও হইয়াছিল। সভায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পৌরোহিত্য করেন এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সুধীবর্গ স্মৃতি-ভবন ও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত করেন; এবং উপেন্দ্রনাথ, সতীশ-চন্দ্র ও রামচন্দ্রের চরিত-চিত্ত-কথার আলোচনা করেন। সন্ধ্যার সময় আশ্রমের অনাথ বালকগণ 'অভিমন্যু বধ' অভিনয়ে সকলের চিত্ত-বিনোদন করিলে উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।



উপেন্দ্রনাথ

শুঁড়ার উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালের উৎসবানুষ্ঠানে স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সজ্জিত উৎসব-প্রাঙ্গণে বহু জ্ঞানিগুণী-জনের সমাবেশ হইয়াছিল। হাস-পাতালের চিকিৎসক-অধ্যক্ষবর্গ সমাদরে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া হাসপাতালের ঘর-দ্বার ও কার্য্য-পদ্ধতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। হাসপাতালের কর্ম্মসচিব-গণের পক্ষ হইতে শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক মহাশয় বিধানচন্দ্র এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনায় সম্মানিত করিলে বিধানচন্দ্র—সতীশচন্দ্র ও রামচন্দ্রের চিত্ত-বৃত্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্রের অমায়িকতা এবং বিনয়-নম্রতার উল্লেখ করেন। এত বড় কৃতী হইয়াও রাম-চন্দ্র কিরূপ নিরহঙ্কার ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করেন। রামচন্দ্রের অকাল-বিয়োগে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলেন—রামচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহাকে হারাইয়া শোকার্ত্ত পিতা-মাতা এ বিয়োগ-বেদনায় অপরের বিয়োগ বেদনা তীব্র ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং সে-অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যাহাতে আর কোনো পিতা-মাতাকে না কাতর করে,—একটি সন্তানের প্রাণও যদি সুচিকিৎসার গুণে রক্ষা পায়, এই উদ্দেশ্যেই এ-হাসপাতালটিকে সঞ্জীবনী-শক্তিতে তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া-ছেন। বিধানচন্দ্র বলেন, হাস-পাতালের সুপরি-চালনার জন্য আরো অনেক জমি চাই, টাকা চাই। এবং এ-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্ত্ত ও রোগীর সেবা-সাহায্য-কল্পে বহু দাতা যে মুক্তহস্তে অগ্রসর হইয়া আসিবেন, এ আশাও তিনি রাখেন। উপসংহারে বিধানচন্দ্র বলেন,—যাঁহারা আমাদের সহিত বিযুক্ত হইয়া পরলোক-গমন করেন এমনি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই তাঁহাদিগের সহিত সংযোগ এবং তাঁহা-দিগকে মৃত্যুহীন করিয়া আমরা রাখিতে পারিব।



সতীশচন্দ্র



রামচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলেন—বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন ৺উপেন্দ্রনাথ; তার পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ৺সতীশচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর বিরাট মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ দেশের কল্যাণে অর্থ দান না করিলেও তাঁহার দান এই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির তাঁহার কীর্ত্তিকে অবিনশ্বর ও উজ্জ্বল রাখিবে। সন্তানের জন্মতিথি দিনে রামচন্দ্রের মাতৃদেবী এক পুত্রকে হারাইয়া বহু পুত্রের প্রাণরক্ষার যে-চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সাফল্যে দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের পর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সতীশ-চন্দ্রের বহু গুণাবলীর কথা বলেন। সতীশচন্দ্রের অতুলনীয় কর্ম্মশক্তি

অধ্যবসায়, বন্ধু-বাৎসল্য, অমায়িকতা ও সামাজিকতার উল্লেখ করিয়া সৌরীন্দ্রমোহন বলেন—শাস্ত্র-পুরাণ গ্রন্থাদি এবং সৎসাহিত্য সুলভে সর্ব্বজনলভ্য করিয়া তোলা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এ ভাবে নিরক্ষরতা-মোচন এবং জনশিক্ষার কাজে তাঁহার সাহায্য বাঙ্‌লার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। প্রথমে বিদুষী কন্যা, পরে একমাত্র কৃতী পুত্রের বিয়োগে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তবু যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, মাসিক বসুমতীর সেবা নিমেষের জন্য ভুলেন নাই। এক দিকে অসাধারণ কর্ম্মবীর; অপর দিকে পত্নী, পুত্র, কন্যা ও বন্ধুপরিজনের উপর আন্তরিক স্নেহ-মমতার প্রাচুর্য্য—সতীশচন্দ্রের চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

সৌরীন্দ্রমোহনের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য রামচন্দ্রের সম্বন্ধে বলেন, রামচন্দ্রের মত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র তিনি আর দেখেন নাই! ধনীর দুলাল হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাস এতটুকু ছিল না। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এবং কর্ম্মানুরাগ ছিল অসাধারণ। সদা-প্রফুল্ল মুখ—সদা-চঞ্চল মন—কিশলয়ের মত কোমল প্রাণ রামচন্দ্র অল্প বয়সেই বহু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান সাধনার জন্য গৃহে লেবরেটরি গড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে চিরদিন বেদনার মধ্য দিয়াই বড় জিনিষ গড়িয়া ওঠে। যে মর্ম্মান্তিক বেদনার মধ্য হইতে এই মহান্ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি আশা করেন, তাহার দ্বারা দেশের বহু কল্যাণ সংসাধিত হইবে।



প্রীতি দেবী

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেন, রামচন্দ্রের মনে অনেক আশা ছিল অভিলাষ ছিল। তিনি তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মরণের মধ্য দিয়াও তিনি মরণজয়ী হইয়া থাকিবেন।

প্রধান অতিথি এবং সভ্যদিগকে ধন্যবাদ-দানান্তে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে জাগে। মনে জাগে পুরাণের দধীচি মুনির কথা। সে দিন এ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া বার বার এই কথাই মনে জাগিয়াছে, যে দধীচি মুনি যেমন প্রাণ দিয়া—নিজের অস্থি-পঞ্জর দিয়া বজ্র রচনার সহায়তা করিয়াছিলেন—সেই বজ্রে দুরন্ত দৈত্য-কুল নিহত হইয়া শঙ্কাচ্ছন্ন কম্পিত স্বর্গ আবার যেমন সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি রামচন্দ্র-প্রীতির ও সতীশচন্দ্রের প্রাণশক্তি লইয়া আজ যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা—সে প্রতিষ্ঠানও শঙ্কাকুল বিয়াতুর বাঙ্গলার গৃহ-সংসারকে সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল স্বর্গতুল্য করিয়া তুলিবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেই শুভদিন অচিরাগত হোক।

ফাল্গুন-মধু

শ্রীশান্তি পাল

ওগো, আজকের নব ফাল্গুনে, রোঁদ দিয়ে রোদ জাল বুনে;
ফুলে ফলে কাঁচা রঙ্ ধ'রে গেল, রূপো হ'ল সোনা কার গুণে!

আহা, মিঠে হাওয়া বয় ফুরফুরি, অন্তরে কাটে সুড়সুড়ি,
হুহু করে মন, কুহু কুহু ডাকে, কার লাগি করে খুনসুড়ি?

হের, সজ্‌নের ফুলে ঝুপঝুপি, বোলতারা বসে চুপচুপি;
হিমে-ভেজা ঘাসে রস ঝরে পড়ে, টুপ টুপ ক'রে টুপটুপি।

কত, মৌমাছি ফেরে মৌ খুঁজে, চাক ছেড়ে দিয়ে তাল বুঝে,
বোঁ-ও বোঁ-ও সুরে বন বন ঘুরে, আম-ডালে বসে চোখ বুজে।

হায়, প্রজাপতি খুদে তার পিছে ফর ফর ক'রে ধায় মিছে;
ভীমরুল খেপা গোঁৎ মেরে ফেলে, ঘুরপাক খেয়ে যায় নীচে।

ওই, আম-ডালে ফিঙে ল্যাজ নাড়ে বৌ-কথা-কও পাক মারে,
চোখ-গেল-পাখী চোখ গেল ব'লে, উড়ে গিয়ে বসে বাঁশ-ঝাড়ে।

সেথা, বুলবুলি নাচে ঢুমঢুমি পলাশের রঙে কুমকুমি;
জল স'য়ে ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁ-ঝাঁ করে, বনে বনে বাজে ঝুমঝুমি।

শোন, শিস্ দিয়ে ডাকে কোন্ পাখী দেবদারু বনে গাও ঢাকি,
তেল কুচকুচে কাঁচ-পোকা রঙ, টুকটুকে দুটো লাল আঁখি।

হোথা, সাঁওতালী মেয়ে যায় জলে লাল শাড়ি প'রে ঝলমলে,
ঘট কাঁখে ঘাটে ছল ছল করে, ভোর হ'য়ে ভাবে টলমলে।

সে যে, ঝিঙে-ফুল দিয়ে চুল বাঁধে কথা কেটে কথা বাদ সাধে,
টং হ'য়ে কত ঢং করে চলে, খুঁট খসে পড়ে—পায় বাধে।

তার, দুই কানে দুল দুলদুলি জৌলুস হ'ল চুল খুলি,
মৌসুমী ফুলে মর্ম্ম খোঁজে, জল ভেঙে জলে ঢেউ তুলি।

আজ, কার কথা রটে বনে বনে চারি দিকে
ফাল্গুন-মধু লুঠ হ'য়ে যায়, দুরন্ত কার যৌবনে।

ছোটদের আসর



একটি ছোট আরব্য উপন্যাস

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখা আরব দেশের লোকের আতিথেয়তার গল্প নিশ্চয়ই তোমাদের পড়া আছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের চেয়ে আমিও যে কিছু কম যাই না—অর্থাৎ আরব্য আতিথেয়তার গল্প যে আমারও কিছু কম জানা নেই, সেটাই আজ তোমাদের কাছে প্রমাণ করব। বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প ছিল স্রেফ ছেলেভুলানো গল্প। আর আমি তোমাদের যা বলব তা হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—একেবারে নির্জলা সত্য।

আরব্য উপন্যাস পড়ার পর থেকে, সত্যি বলতে কি, আরব দেশটা আমার মন্দ লাগত না। তার পর বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প পড়বার পর থেকেই আরব দেশ সম্বন্ধে আমি মাঝে মাঝেই কেমন একটা বিলক্ষণ উৎসাহ বোধ করতাম। প্রায়ই ইচ্ছে হত, যাই নিজেই যাই। স্বচক্ষে গিয়ে অতিথিপরায়ণ মহান্ আরবদের দেখে আসি। কিন্তু সব সময়ে ত' আর সময় হয়ে ওঠে না!

সে বার কি একটা কাযে—পড়াশোনা, না দেশভ্রমণ ঠিক মনে নেই—ঐ দিকেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প। আর যেই মনে পড়া—অমনি হাজির আরব দেশে। সেখানে খোঁজ করতে লাগলাম বাড়ী বাড়ী। আতিথেয়তা ত' দূরের কথা—সেখানকার লোকগুলি এমন অশিক্ষিত যে, বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম পর্যন্ত শোনেনি। যত দূর বুঝলাম, বর্ণপরিচয়ের খবর তারা রাখে না—সামান্য অক্ষর-পরিচয়ও তাদের হয়নি। অনেক খোঁজ-খবরের পর এক গাইডের কাছে কিছু খবর পাওয়া গেল। সে বললে যে সে যত দূর জানে, লোকালয়ে আরব দেশবাসীদের এ-হেন ব্যবহারের কথা তার জানা নেই। তবে মরুভূমিতে বেদুইনদের মাঝে এ সব প্রথা চলিত থাকলেও থাকতে পারে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্পের একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য আমি তখন উঠে-পড়ে লেগেছি। বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প যদি স্রেফ গল্পকথা হয়, তবে সেটা ভাল করে যাচাই করে পরে দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে আমার জানিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক টাকা দিয়ে—অনেক আসরফি কবুল করে তবেই বেদুইনদের খোঁজে আমার সাথে মরুভূমিতে যেতে গাইডকে রাজী করানো গেল।

মরুভূমির মধ্যে সারা দিন ধরে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে, অনেক উটপাখী এবং মরীচিকা দর্শনের পর সন্ধ্যেবেলা এক মরূদ্যানে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। মরূদ্যানে দেখলাম, একটি ছোট আরব পরিবার বেশ শান্তিতে বসবাস করছে। তারা ঠিক বেদুইন কি না বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমাদের তারা খুব আদর-আপ্যায়ন করলে। গিন্নীটি আমাদের নিজের হাতে খেজুর খাওয়ালে। স্বামীটির ত সর্ব্বদাই কেমন একটা তটস্থ ভাব। আর তাদের দু'টি ছোট ছেলে-মেয়েও আমাদেরই আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্তির বেলা ঘুমোবার সময়ই লাগল মুস্কিল। তাদের ঘরে দেখলাম, একটি মাত্র বিছানা—আর তাতে মাত্র দু'টি লোক শুতে পারে। মরুভূমি দিনের বেলা যেমন গরম—আবার রাত্তিরে ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা। বিছানায় যে শেষ পর্য্যন্ত কে শোবে—ছেলে-মেয়ে দু'টি না আমরা দু'জন, না কর্ত্তা-গিন্নী—তাই নিয়ে আমি ভাবিত হ'য়ে পড়লাম। ছেলে-মেয়ে দু'টির ওপর যদিও মায়া হচ্ছিল—তবুও সারা রাত বালির ওপর কাটাবার কথা আমি ভাবতে পারছিলাম না। কর্ত্তা-গিন্নী হয়ত' ভদ্রতা করে নিজেরা বিছানায় শোবে না—কিন্তু তা বলে যে ছেলে-মেয়েদের ফেলে আমাদের বিছানায় শুতে বলবে—তা মনে হয় না। গাইডের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তার অবস্থাও সঙ্গীন। সেও এই কথাই ভাবছে।

যা ভেবেছিলাম—একটু পরে তাই-ই হল। একটু রাত হতেই কিছু খেজুর খাইয়ে গিন্নীটি তার ছেলে-মেয়ে দু'টিকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলে। দেখতে দেখতে—করুণ নয়নে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা ঘুমে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। বুঝলাম, আমাদের আর বিছানায় শোবার আশা নেই।

তার পর আমাদের খাবার ডাক পড়ল। সারাটা রাত জেগে কিংবা বালির ওপর শুয়ে কাটাতে হবে জেনে খাওয়ায় আমার আর তখন উৎসাহ ছিল না। গাইডের অবস্থাও তথৈব চ। যা হোক, সারা দিন ধরে হাঁটাহাঁটির পর 'খাবো না' 'খাবো না' বলেও বেশ কিছু খেয়ে ফেললাম। খেয়ে উঠে ভীষণ ঘুম পেতে লাগল। আমাদের ঘুম আসছে দেখে কর্ত্তা-গিন্নী হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল এবং বিছানা থেকে তাদের ছেলে-মেয়ে দু'টিকে পাঁজাকোলা করে তুলে বালিতে শুইয়ে দিলে। আমি মৃদু আপত্তি জানালাম। কর্ত্তা-গিন্নী দু'জনেই করযোড়ে জানালে, এটা না কি তাদের অভ্যেস আছে। আর আমরা বিছানায় না ঘুমোলে তাদের না কি পাপ হবে। আমরা অতিথি, অতএব দেবতা!

চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে দু'জনে গিয়ে বিছানায় শায়িত হলাম। যাক্, এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বিদ্যাসাগর মশায় মিথ্যে গল্প লেখেননি। আরব দেশে তাহলে সত্যিই এ ধরণের আতিথেয়তার রেওয়াজ আছে। ঐ রকম বিদ্বান লোককে সন্দেহ করা আমারই ভুল হয়েছিল।

অন্যায় সন্দেহ এবং অশ্রদ্ধার জন্য বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে মাপ চাইতে চাইতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—কিংবা ঘুমোতে ঘুমোতে কখন যে মাপ চেয়েছি ঠিক স্মরণে নেই। অনেকক্ষণ

ঘুমোবার পর হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি যেন উত্তর-মেরুতে বরফের মধ্যে শুয়ে আছি। মরুভূমির মধ্যে উত্তর-মেরু নেহাৎ অলীক কল্পনা। স্বপ্ন দেখছি জেনে আমি ব্যাপারটাকে বিশেষ আমল দিচ্ছিলাম না—যেমন ছিলাম তেমনি শুয়ে রইলাম। কিন্তু ক্রমশঃ স্বপ্নটা যে নেহাৎই স্বপ্ন নয়—এ ধারণা দৃঢ় হতে লাগল। ভাবলাম—মনে মনে স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ভাবলাম—তা, বলা যায় না! আরব্য উপন্যাসের দেশ ত'! হয়ত' কোন ফাঁকে মন্ত্রদান সমেত সত্যিই উত্তর-মেরুতে এসে হাজির হয়েছি কোন দত্যি বা জিনের-খেয়াল-খুসীতে। নাঃ, ব্যাপারটা দেখতে হয় চোখ খুলে—ভাল করে! তবে কি আরব দেশের আতিথেয়তার মত আরব্য উপন্যাসও সত্যি ঘটনা! চোখ মেলে আর সন্দেহ রইল না। দেখলাম, বালিতে শোয়ানো ছেলে-মেয়ে দু'টি কখন্ এসে বিছানায় হাজির হয়েছে।

উহুঃ, ভুল বললাম। আমরাই কখন এসে বালিতে ছেলে-মেয়ে দু'টির পাশে আশ্রয় নিয়েছি।

আর, বিছানা—সে তত্ক্ষণে হয়ত' কর্ত্তা-গিন্নীকে আশ্রয় করেছে।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১

আজ হ'তে আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। সূর্য্যাক নামে এক রাজা ছিলেন গিরিব্রজপুরে! তাঁর ছেলে শিশুনাগ বারাণসীর রাজা হ'ন (১)। তাঁর ছেলে কাকবর্ণ। কাকবর্ণের ছেলে ক্ষেমধর্ম্মা (২)। ক্ষেমধর্ম্মার ছেলের নাম ক্ষত্রৌজাঃ (৩)। ক্ষত্রৌজার ছেলের নাম প্রায় সকলেরই জানা—বিম্বিসার (৪)। বিম্বিসারের ছেলে অজাত-শত্রু (৫)। অজাতশত্রুর ছেলে দর্ভক (৬)। দর্ভকের ছেলে উদয়াশ্ব (৭)। উদয়াশ্বের ছেলে নন্দিবর্দ্ধন। তাঁর ছেলে মহানন্দী। বিষ্ণুপুরাণে বলা আছে যে, শিশুনাগ-বংশে এই দশ জন রাজা।

মহানন্দীই শিশুনাগ-বংশের শেষ রাজা। পুরাণগুলিতে তাঁকেই কলির শেষ ক্ষত্রিয় রাজা বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে যে, এই মহানন্দী এক শূদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন। এই শূদ্রার গর্ভে তাঁর এক অতি দুর্দ্দান্ত ছেলে জন্মায়। এর নাম মহাপদ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—এঁর নাম নন্দ। তবে মহাপদ্ম সংখ্যক ধনের পতি ছিলেন বলে লোকে এঁকে ডাকৃত মহাপদ্মপতি নন্দ বলে। তাই থেকে সংক্ষেপে এঁর নাম হয়েছিল—মহাপদ্ম। মহাপদ্মের আর একটি নাম ছিল সর্ব্বার্থসিদ্ধি। তবে তাঁর 'নন্দ' নামটিই খুব বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। সেই নামেই সকল লোকে তাঁকে ডাকৃত। এই নন্দবংশের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন—তাঁরা সকলেই জানেন।

মহাপদ্ম নন্দের রাজ্য ছিল বিশাল। তাই রাজকার্য্য ভাল ভাবে চালাবার জন্যে তাঁকে অনেক মন্ত্রী রাখ্তে হয়েছিল। এক মন্ত্রীর নাম ছিল বক্রনাস, আর এক জনের নাম ছিল রাক্ষস। রাক্ষসই ছিলেন নন্দের প্রধান মন্ত্রী—জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাক্ষসের স্বভাব ছিল যেমন রুক্ষ, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। প্রভুভক্তি, কূটরাজনীতি আর জিদ এই তিন বিষয়ে তাঁর জোড়া এখনকার যুগেও খুঁজে পাওয়া যেত না। মহারাজ নন্দ ত রাজকার্য্য বড় একটা দেখতেনই না—সর্ব্বদাই তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকতেন। রাজকার্য্য যা কিছু চালাবার রাজার নামে রাক্ষসই চালাতেন।

মহারাজ নন্দ বিবাহ করেছিলেন দু'বার। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন এক ক্ষত্রিয় রাজার মেয়ে—নাম সুনন্দা। সুনন্দা রূপে গুণে অনুপমা। তবু নন্দ মহারাজ নিজের বদ-স্বভাবের জন্যেই এমন ভাল রাণীকেও দু'চোখে দেখ্তে পারতেন না। তাই কিছু দিন বাদে

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এঁর নাম শিশুনাগ; মৎস্য-পুরাণে এঁর নাম শিশুনাক। (২) বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এঁর নাম ক্ষেমধর্ম্মা; মৎস্যপুরাণে এঁর নাম ক্ষেমধামা। (৩) বিষ্ণুপুরাণে এঁর নাম ক্ষত্রৌজাঃ; শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষেত্রজ্ঞ; আর মৎস্যপুরাণে এঁর নাম ক্ষেমজিৎ (মতান্তরে হেমজিৎ)। (৪) বিষ্ণুপুরাণে এঁর নাম বিম্বসার; শ্রীমদ্ভাগবতে বিধিসার; এঁরই নামান্তর শ্রেণিক; মৎস্য-পুরাণে নাম বিন্ধ্যসেন। বিম্বিসারই প্রথম বারাণসী ছেড়ে রাজগৃহে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অঙ্গদেশও জয় করেছিলেন। ইনি মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ের লোক। কেহ বলেন যে, ইনি বুদ্ধ-দেবের ভক্ত ছিলেন, আবার কেহ বা বলেন যে, জৈনধর্ম্মের উপর এঁর খুব ভক্তি ছিল। এঁর ছেলে অজাতশত্রু কিন্তু বৌদ্ধদের ভয়ানক শত্রু ছিলেন। রাজগৃহ এখনকার রাজগীর—নালান্দার কাছে—বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলে যেতে হয়। অঙ্গদেশ এখনকার মুঙ্গের ভাগলপুর ইত্যাদি জায়গা। রাজগৃহ অঙ্গেরই মধ্যে পড়ে। (৫) অজাতশত্রুর অন্য নাম কুনিক। ইনি মগধে গঙ্গার তীরে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর স্থাপন করেছিলেন। পাটলিপুত্র গঙ্গা-শোণের সঙ্গমের কাছে। এখন এ নগর মাটীর নীচে বসে গেছে। এর খানিকটার উপর এখনকার পাটনা-বাঁকীপুর গড়ে উঠেছে। মাটী খুঁড়ে পুরানো নগরটি বার করবার চেষ্টা এখন চলেছে। মৎস্যপুরাণে অজাতশত্রুকে ভূমিমিত্রের ছেলে বলা হয়েছে। বিন্ধ্যসেনের ছেলে কাণ্বায়ন, তাঁর ছেলে ভূমিমিত্র, তাঁর ছেলে অজাতশত্রু। অজাতশত্রু বৈশালী ও কোসলের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই সময়ে বুদ্ধদেব ও মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন। (৬) বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে নাম—দর্ভক; মৎস্যপুরাণে—বংশক; ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্ত' নাটকে এর নাম—দর্শক। মগধ—এখনকার বিহার। (৭) শ্রীমদ্ভাগবতে নাম—অজয়; মৎস্যপুরাণে—উদাসী। ইনিই পাটলিপুত্রের কাছে কুসুমপুর নগর স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র ছিল শোণ-নদের উপর; কুসুমপুর—গঙ্গা-নদীর উপর।

বিষ্ণুপুরাণ মতে শিশুনাগ-বংশে দশ রাজা—শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষত্রৌজাঃ, বিম্বসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, উদয়াশ্ব, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে—শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিধিসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী।

মৎস্যপুরাণ মতে বার জন রাজা—শিশুনাক, কাকবর্ণ, ক্ষেমধামা, ক্ষেমজিৎ (হেমজিৎ), বিন্ধ্যসেন, কাণ্বায়ন, ভূমিমিত্র, অজাতশত্রু, বংশক (বংশদ), উদাসী, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের প্রদত্ত রাজবংশ—শিশুনাগ (৬৪২ খৃঃ, পূঃ?), কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেমজিৎ (ক্ষত্রৌজাঃ), বিম্বিসার (শ্রেণিক), অজাতশত্রু (কুনিক), দর্শক, উদাসী (উদয়), নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী (আন্দাজ ৪১০ খৃঃ-পূঃ ?)

তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন মুরা নামে এক শূদ্রের মেয়েকে! মুরাও দেখতে সুন্দরী ছিলেন আর রাজার মন জুগিয়ে চলতে জানতেন। তার ফলে কিছু দিন যেতে না যেতেই পাটরাণী সুনন্দা হ'য়ে উঠলেন—ঠিক যেন রূপকথার দুয়ো-রাণী। আর ক্রমে ক্রমে মুরা সুয়ো-রাণী হ'য়ে শেষে পাটরাণীর সিংহাসন পর্য্যন্ত দখল ক'রে বসলেন। [ক্রমশঃ

ইতিহাস যারা তৈরী করে

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নামটা তার মস্ত বড়, মনে রাখতে পারবে কি? ভ্লাডিমার ইলিয়ানভ্ আইভানোভিচ্। বন্ধুরা সংক্ষেপে ডাক্‌ত ইলিচ ব'লে।



লেনিন

সেই রোগা যুবকটি তার ছোট্ট নোংরা ঘরে রাশি রাশি বই আর কাগজপত্রের মাঝখানে ব'সে ভাবছিল একটি মেয়ের কথা। তার নাম লেনা।

লেনাকে তার ভারী ভালো লেগেছিল। বিয়েও করবে ঠিক ক'রেছিল।

কিন্তু মুস্কিল বেধেছিল রাজনৈতিক মতামত নিয়ে। ইলিচ্ ছিল বল্‌শেভিক্ দলের। লেনা ছিল মেন্‌শেভিক্; যে দু'টো দলে রাশিয়ায় অনেক রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

লেনা বলেছে ইলিচ্‌কে তাদের দলে চ'লে এসে বিয়ে করতে। নিজে কিন্তু দল ছাড়তে রাজী নয়।

তাই ইলিচ্ ভাব্‌ছিল—কি করবে? বিয়ের জন্তে সে কি তার নীতিকে চূর্ণ করবে?

সেই সকাল বেলা অখ্যাত যুবক ইলিচ্ কি স্থির করে, তার ওপরেই পৃথিবীর ইতিহাসের ফলাফল নির্ভর করছিল। মহাকালও

যেন তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে ইলিচ্ বল্‌লে—এ হ'তে পারে না। তার চোখের তারা যেন জ্বল্‌ছিল। নিজের মত ও বিশ্বাস, দেশ ও জাতির জন্তে সব কিছু ত্যাগ করা যায়।

হাওয়ায় দুল্‌ছিল দেয়ালে কার্ল মার্কসের ছবি, তার দিকে চেয়ে কলম তুলে নিয়ে ইলিচ লেনাকে লিখলে—হে বন্ধু, বিদায়।

বিদায় দিলে বটে, কিন্তু স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার জন্তে ইলিচ্ নাম নিলে—লেনিন্।

* * * *

দিন যায়।

অখ্যাত যুবকের নাম দেশে দেশে বিখ্যাত হয়ে পড়লো। রাশিয়ার বিপ্লবের পুরোহিত লেনিন তাঁর জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে লাগলেন—দুনিয়ার বাধা ও বিপক্ষতার সামনে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে।

আজ তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। পড়ার ঘরে ব'সে কাজের সমুদ্রে তিনি ডুবে আছেন কাগজের পাহাড়ের নীচে।

কে এক জন দেখা করতে এসেছে।

আসতে বল্‌লেন।

এ কি! এ যে লেনা! বড় হ'য়েছে, বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সেই লেনা, তেমনি রূপসী!

ভালো লাগলো অল্প বয়সের বান্ধবীকে পেয়ে। অনেক কথা হ'ল অনেকক্ষণ ধ'রে। শেষটা বল্‌লেন—যদি কখনো প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ কোর। জেনো, আমার সাহায্য চাইবামাত্রই তুমি পাবে।

কে জান্‌ত, এমন একটা দিন আস্‌বার দেরী ছিল না!

কিছু দিন বাদেই লেনিনের দলে লেনা বন্দী হ'ল মেন্‌শেভিক বলে।

বিচারে প্রমাণ হ'ল সে দেশদ্রোহী, আর হুকুম হল গুলী ক'রে মারবার।

বিচার নয়, বিচারের প্রহসন বলা যায় তাকে। তবে শাস্তিটা নির্ম্মম এবং অমোঘ।

এমন দিনে লেনার মনে প'ড়ে গেল লেনিনকে,—এ দলের সেই সর্ব্বময় কর্ত্তার নামে একটা আবেদন-পত্র লিখে সে ব'লে দিলে যথাস্থানে যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে।

দুরু-দুরু বুকে ভরসা করছিল সাহায্য সে পাবে তার চরম দুঃসময়ে। যার কথা এখানে 'শেষ কথা,' তার কাছেই যখন সে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে এক দিন, তখন মুক্তি আস্‌তে বিলম্ব হবে না, এই সে ভেবেছিল।

কিন্তু তাকে মার্চ্চ করিয়ে মাঠে নিয়ে যাবার সময় পর্য্যন্ত কোনো জবাব এলো না।

কুয়াসায় ঢাকা এমন একটি রহস্যঘন প্রভাত সেটি ছিল, যে-প্রভাতে কেউ কখনো মরতে চায় না।

কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে সে প্রশ্ন তুল্‌লো—কম্‌রেড লেনিনের কাছে আমার আবেদন পাঠান হয়েছে কি?

হয়েছে!—রুক্ষ ত্রস্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঝক্‌ঝকে বন্দুকগুলো তার দিকে চেয়ে যেন বল্‌লে, ছেড়ে দাও আশা।

চোখের ওপর কাপড় বাঁধা হল যেন তাকে জানাতে শেষ-নিশ্বাসের জন্যে প্রস্তুত হও।

শেষ নিশ্বাসগুলি জোরে জোরেই পড়ছিল।

দলপতির গলায় হঠাৎ শোনা গেল—গুলী করো!

* * * *

ক্রেম্‌লিন প্রাসাদে কাগজের পর কাগজে লেনিন্ সই করে যাচ্ছিলেন—নানান্ ধরণের আদেশপত্রে।

কোনোটা শাসন-সংক্রান্ত কাজের নির্দ্দেশ, কোনোটা বা মৃত্যুদণ্ড, কোনোটা সেই দণ্ড-স্থগিতের প্রত্যাদেশ।

যেন কোন্ মাদামের আবেদন-লিপি তাঁর কাছে পৌঁচেছিল। ভালো ক'রে নামটাও প'ড়ে দেখেননি, গ্রাহ্যও করেননি। অমন কত আসে, সব ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করাও উচিত নয়। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যা বুঝবে, করবে। তাছাড়া, লেনার বিবাহিত অবস্থার নাম তাঁর স্মরণও ছিল না।

কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মিলিয়ে নিলেন নামটা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা লেনা তাঁর সাহায্য চেয়েছে—তাকে ত' মুক্তি দিতেই হবে। দেরী হ'য়ে গেল না কি?

পাগলের মতন টেলিফোন-রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে তিনি হুকুম দিলেন, ছেড়ে দাও মাদাম্ অমুককে।

এইমাত্র গুলী করা হ'য়ে গেল!—এলো ওদিক্ থেকে উত্তর।

অসহ্য যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন লেনিন—প'ড়ে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—প্রতিশ্রুতি রাখ্‌তে পারলেন না তিনি লেনার কাছে! চ'লে গেল সে দুনিয়া ছেড়ে, লেনিনের একটি মুখের কথায় জীবন যার সুদীর্ঘ হ'ত পৃথিবীর আলো-বাতাসে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছে আস্‌তে কেউ সাহস করলো না। মনে হল, তিনি যেন সব কাজ ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু বিদ্রোহের কোলাহল তাঁকে ডাক দিলো, ডাক দিলো কর্ত্তব্য, ডাক দিলো দেশের মাটি।

ক্ষুদ্র নারীর চিন্তা পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় বাধা দিতে পারলো না। কাজের মধ্যে ডুবে ভুলে যাবার চেষ্টা করলেন তাকে, যার নাম তাঁর নামের মধ্যে অমর হ'য়ে রইলো।



শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

ভুল যদি করে কেউ ভুল তারে বলে না
বড় বড় ভুল অত দিনে-রাতে ঘটে না।
ডালনায় নুণ দিতে ভোলে বটে রাঁধুনি
টাকা দিতে ভুলে কেউ কাঁদে নাকে-কাঁদুনি।
বর্ম্মায় ক'টা নদী ক'টা গাছ চায়নায়
এ রকম ছোট ভুল হিসাবে কি ধরা যায়?
আকবর ছিল বোকা চেঙ্গিস্ সাধু লোক
বুদ্ধের দাড়ী নিয়ে ভুল করে কত লোক।
গাছে উঠে এক দিন পাকা জাম পাড়িতে
এক পাটি স্যাণ্ডাল ফেলে গেনু বাড়ীতে;
ভূগোলের পড়া দিতে এঁকে দিনু বৃত্ত
ত্রিভুজেরা বাহু তুলে করে যেন নৃত্য।
ঘটাইএর খাতাখানা দেখেছে কি অগ্নি
মাষ্টার চটে মটে লিখে দিল শূন্যি।
ভুল বটে হয় তার ভুলো তার নাম তাই
জাঁদরেল মামা তার দিছলো কি মারটাই।
সেই মামা এক দিন কামানোর চেষ্টায়
নাপিতের আড্ডায় ঢুকলো সে শেষটায়।
ক্ষুর ধরে প্যাচ প্যাচ চটপটে নাপিতে
চেঁচে দিল দাড়ীখানা দেখিতে না দেখিতে।



হাত পেতে দাম চায় চেয়ে থাকে কেউ বা
পকেটেতে হাত দিয়ে মামা কাটে জিহ্বা।
"ভুল ক'রে জামাটা ছেড়ে আসি র‍্যাকেতে
পকেটেতে আছে তার টাকা মনি-ব্যাগেতে।
ছেড়ে দাও এক ছুটে এনে দিই দামটা।
জুচ্চুরি নয় এটা—হ'ল বদনামটা।"
"তাহা নয় তাহা নয়" হেঁকে কয় নাপিতে
গুণ্ডার রাজা যেন লাগিল সে কাঁপিতে।
"যাবে কোথা বাপু হে খালি ট্যাক বাজায়ে
থাকো হেথা তত দিন দাড়ী যাক গজায়ে।"
ভাবাচ্যাকা খেয়ে মামা ছিল সেথা আট্‌কা
তিন দিন পরে ফেরে দাড়ী নিয়ে টাট্‌কা।
এর পর কোন দিন ভুল তার হয়নি
জামা ছেড়ে কোন দিন কামাতেও যায়নি



[উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরেশ গাঙ্গুলি নিমন্ত্রণে আসিল না। তার একান্ত অনিচ্ছা ছিল, তা নয়! জয়রাম রায়ের নিষ্ঠার কথা তুলিয়া শিবকৃষ্ণ তাকে খানিকটা সন্ত্রস্ত করিয়াছিল, তাই! পরেশ ভাবিল, বিবাহটা চুকিয়া যাক, তার পর গিয়া মাখন গাঙ্গুলিকে ধরিয়া বুঝাইয়া আসিবে। এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে পরেশের অনুশোচনার সীমা থাকিবে না। জয়রামের বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর; আর এইটিই জয়রামের একমাত্র সন্তান! নানা দিক্ দিয়া পরেশ ঋণ-জালে জড়াইয়া আছে। তিন পুরুষ ধরিয়া এ ঋণ জমিয়া এমন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে যে, বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে সব যাইবে। কথাটা তেমন প্রচার হইবার পূর্ব্বে অখিলের বিবাহ যদি সারিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ঐ জয়রাম রায়ের সম্পত্তিকে অবলম্বন করিয়া আবার দাঁড়াইবার সামর্থ্য হইবে! জয়রাম রায়ের বয়স হইয়াছে; যদি···

পরেশ তাই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ঋণের বোঝার উপর আরো খানিকটা ঋণ চাপাইয়া চূড়ান্ত সমারোহ করিবে জমিদারী চালাইয়া এটুকু বুঝিয়াছে, প্রাণ আর মান রাখিয়া কোনো মতে নিজের জীবনটা কাটানো যাক্; তার পর···যে যেমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছে!

বিবাহের দিন আকাশ ফাঁশাইয়া বৃষ্টি নামিল। ঐরাবত যেন ওদিককার সঞ্চিত সমস্ত জল ঢালিয়া পৃথিবীকে ডুবাইয়া দিবে। ভাড়া-করা বজরা আসিয়াছে। কাল হইতে ঘাটে বাঁধা। বাজনার ব্যবস্থা হইয়াছে মাখন গাঙ্গুলিকে টেক্কা দিয়া। তাছাড়া বড় একখানা নৌকা-বোঝাই শুধু এক-হাজার খাশগেলাস যাইবে সঙ্গে। বিলাসপুরের ঘাটে নামিয়া সেই এক-হাজার খাশগেলাস জ্বালাইয়া দু'দল ব্যাণ্ড আর রশুনচৌকির বিরাট প্রোসেশন! কলিকাতা হইতে দু'জন ইহুদী মেয়ে আনা হইয়াছে···তারা চলিবে সে-প্রোসেশনের সঙ্গে নৃত্য-লীলায় তরঙ্গ তুলিয়া। ব্যাণ্ড খাশগেলাসের জাঁক-জমক অনেকে দেখাইয়াছে; কিন্তু ইহুদী মেয়ের নাচে পরেশ গাঙ্গুলি সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিবে!

বৃষ্টির ঘটা দেখিয়া পরেশ গাঙ্গুলি দমিয়া গেল। এ-বৃষ্টিতে বজরায় এবং নৌকায় চাপাচুপি দিয়া কোনো মতে সকলকে লইয়া গেলেও তার পর···বিলাসপুর! সেখানেও যদি আকাশের এমন ঘনঘটা চলে!

শিবকৃষ্ণ বলিল—কুছ পরোয়া নেই। বাবার মাথায় বেল-পাতা চাপাবো সেজবাবু, কেন ভাবছেন? বাবা আমার আশুতোষ।

বেলা দু'টায় বর বাহির হইবার কথা। বৃষ্টির বেগ সমানে চলিয়াছে। দু'শো লোক যাইবে কথা ছিল—যাত্রার সময় পঁচিশ জনের বেশী লোক পাওয়া গেল না। এ-জলে বরযাত্রী সাজিয়া যাওয়ার উৎসাহ অনেকের নিবিয়া গেছে।

মাখন গাঙ্গুলির তরফ হইতে সুশীল আসিয়াছে। মাখন গাঙ্গুলি আসেন নাই; তাঁর ছেলেরাও আসে নাই। সুশীল বলিল—ওঁদের আসার পথ আপনিই বন্ধ করেছেন, মামা।

পরেশ বলিল—তুমি বরযাত্রী যাবে তো?

সুশীল বলিল—নিশ্চয় যাবো। মেনির বিয়ের পরেই মাকে নিয়ে চলে যাবো ভেবেছিলুম। রয়ে গেলুম শুধু অখিলের বিয়ে দেখবো বলে।

পালকী করিয়া বর ও বর-যাত্রীদের আনিয়া বজরায় তোলার ব্যবস্থা। সুশীল পালকীতে উঠিবে, হঠাৎ কালো আসিয়া হাজির। রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি···যেন কত কাল ভুগিয়াছে! মাথার চুল উস্কোখুস্কো··· চোখ দু'টো জবাফুলের মতো লাল টকটক্ করিতেছে!

দেখিবা মাত্র শিবকৃষ্ণ খিঁচাইয়া উঠিল,—ব্যাটা মাতাল···কাজ কামাই করে আয়েস করছিলেন! এখন এসেছেন নেমন্তন্ন গিয়ে পেটপূজোর মতলবে! সে-সাধে বালি! এখানেও আর কাজ করতে হবে না।

কালো কোনো জবাব দিল না। ছলছল নেত্রে কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। সুশীলকে দেখিল। দেখিবা মাত্র তার পায়ের উপরে পড়িয়া একেবারে তার দুই পা চাপিয়া ধরিল। বলিল—আমাকে রক্ষা করুন দাদাবাবু!

সুশীল তার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল; বলিল—কি হয়েছে কালো?

কালো বলিল—আমার ভয়ঙ্কর বিপদ! কি যে করবো···দু'-চোখে আমি অন্ধকার দেখছি!

সুশীল বলিল—কারো অসুখ করেছে না কি?

কালো প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—অসুখ হয়ে গুষ্টিশুদ্ধ মরে গেলেও দুঃখ ছিল না দাদাবাবু! এ আমাকে···আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা হচ্ছে!

সুশীল বলিল—কাঁদিস নে কালো। আমাকে বল, কি বিপদ!

কালো বলিল—তাহলে আমার সঙ্গে একটু এ-দিকে তোমায় আসতে হবে দাদাবাবু। কিন্তু কি করেই বা আসবে! আমি কর্ত্তাবাবুর কাছে গিয়েছিলুম। আপনার নাম করে তিনি বললেন, তাঁর কাছে যা। তাই আমি···কিন্তু···

সুশীল বলিল,—তোর যদি উপকার হয় কালো, আমি নেমন্তন্ন যাবো না! সে চাহিল পরেশ গাঙ্গুলির পানে; বলিল,—আমাকে বাদ দিন মামা! লোকটা কাঁদছে। বলছে, বিপদ। নিশ্চয় গুরুতর কিছু হয়েছে!···ওকে দেখা···কি বলেন?

একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—বুঝছি! তবে তুমি সঙ্গে গেলে আমার খুব আনন্দ হতো!

সুশীল বলিল—আমার আনন্দ আপনার আনন্দের চেয়ে অল্প হতো না মামাবাবু! কিন্তু আপনি তো দেখছেন···উপায় কি?

বর-পক্ষকে ছাড়িয়া সুশীল একান্তে সরিয়া আসিল। কালো সঙ্গে আসিল।

সুশীল বলিল—বল্, কি হয়েছে?

কম্পিত আর্দ্র-কণ্ঠে কালো বলিল—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু। মান-সম্ভ্রম সব গেল। লোকে শুনলে আমার মুখে চুণ-কালি দেবে।

সুশীল বলিল—বিপদের কথা বল্‌বি, না, এমনি আজে-বাজে যাত্রার পালা গাইবি ?

সুশীলের স্বর তীব্র···ভৎর্সনা-ভরা।

ভৎর্সনা খাইয়া কালো থামিয়া-থামিয়া নিশ্বাস লইয়া যে-কাহিনী বিবৃত করিল, তার মর্ম্ম—কালোর বোন কালিন্দী এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বিধবা হইয়া শ্বশুর-বাড়ীতেই বাস করিতেছিল। তাকে সব কাজ করিতে হইত। রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ঘাট হইতে জল বহিয়া আনা, ধান-ভাঙ্গা, ধান সিদ্ধ করা, গোরু-বাছুরকে জাব দেওয়া···সব! শ্বশুরের ক্ষমতা আছে, কিন্তু হাড়-কৃপণ। বিধবা বৌকে দিয়া ধাঙ্গড়ের কাজ পর্য্যন্ত করাইয়া লইত। বিনা-মাহিনার বাঁদী যেন! তাও কি পেট ভরিয়া খাইতে দিত! সকলের খাওয়ার শেষে যেমন যাহা পড়িয়া থাকিত, তাই!···ইহার উপর শাশুড়ীর গঞ্জনা গালি প্রহার!··· একবার পিঠে ছ্যাঁকা দিয়া পথে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পিঠে এত বড় ফোস্কা লইয়া তিন ক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া জলা ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া বেচারী ভাইয়ের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কালো খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল···দম ফুরাইয়া গিয়াছিল।

সুশীল বলিল—সে কত দিনের কথা ?

কালো বলিল—গেলো চোত মাসে দাদাবাবু।

সুশীল বলিল—তার পর সেই থেকে তোর কাছেই আছে ?

কালো বলিল—না। বোশেখ মাসে শ্বশুর এলো।···কি আত্তিশো! বললে, বৌমা-বিহনে সংসার সেখানে অচল। আসলে এত খাটা খাটবে কে ? আমি মানা করলুম কালিকে···বললুম, যাস্‌নে কালি। আমার যদি দু'মুঠো জোটে, তোরও জুটবে। সেখানে কারো মুখে একটু মিষ্টি কথা নেই! ধরে-ধরে মারে, ছ্যাঁকা দেয়···গেলে তুই মরে যাবি! তা শুনলো না! বললে, এক ননদ ছিল···মরে গেছে। তার বাচ্ছা-ছেলেটা না কি ওকে না হলে থাকতে পারে না! তার হাড়ির হাল হচ্ছে, দাদা!···গেল চলে হতভাগা শ্বশুরের সঙ্গে!··· তখন কি জানি, হতভাগীর পালক গজিয়েছে!

কথা শেষ করিয়া কালো একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীল বলিল—বল্‌···

কালো সুশীলের পা জড়াইয়া বলিল—মুখ দিয়ে সে কথা বলতে আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দাদাবাবু! কালি পোড়ারমুখী এমন করে' সবার মাথা খেলো শেষে!···সে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুশীল চাহিল চারি দিকে···বর বাহির হইতেছে···ওদিকে প্রচণ্ড হট্টগোল। রশুনচৌকিওয়ালারা তার-স্বরে শানাইয়ে পোঁ ধরিয়াছে··· অন্দরে শাঁখের রোল।—এদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই!

সুশীল বলিল—বল্‌···যা হয়েছে। কাঁদলে তো আর সে-সব 'না' হবে না!

—তা হবে না দাদাবাবু। কিন্তু···

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা রুদ্ধ হইল।

সুশীল তার মাথায় হাত রাখিল। কণ্ঠে দরদ ভরিয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল—বল্‌ কালো···যত বড় বিপদ হোক, যদি কোনো উপায় থাকে, আমি দেখবো।

বিগলিত কণ্ঠে কালো বলিল—পরশু ওর শ্বশুর একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল, ভয়ঙ্কর দরকার···আমি যেন চিঠি পেয়েই নিশ্চয়-নিশ্চয় সেখানে যাই। না গেলে জন্মের মতো আপশোষ থাকবে!···চিঠি পড়ে আমার ভয় হলো। মনে হলো, কালির নিশ্চয় খুব অসুখ করেছে···হয়তো বাঁচবে না!···কিন্তু এর চেয়ে তার কলেরা হলো না কেন দাদাবাবু? কলেরা হয়ে কেন সে মরে গেল না? তা হলে আমার আজ কোনো দুঃখ থাকতো না। চোখে এক ফোঁটা জলও ফেলতুম না!

সুশীল ধমক দিল, বলিল—চলে যা, আমি তোর কথা শুনবো না, কিছু করবো না তোর জন্য।

ধমক দিয়া কালোর বাহুপাশ হইতে সে পা টানিয়া লইল।

কালো আরো জোরে পা দু'টো জড়াইয়া ধরিল, বলিল— গেলুম চিঠি পেয়ে। যাবা মাত্র সকলে আমাকে মারতে উঠলো। কালিকে দেখি, উঠানের কোণে ছাগল রাখবার এতটুকু খোঁয়াড়, সেইখানে পড়ে আছে। আমাকে সকলে খিঁচিয়ে উঠে বললে, এ-পাপ এখনি আমরা বিদায় করবো···নিয়ে যাও এখান থেকে! নাহলে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে ওকে পথে বার করে দেবো!···কালির মূর্ত্তি দেখে আর ঐ কথা শুনে আমি হক্‌চাকিয়ে গেলুম। কালি উঠে কেঁদে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমাকে মেরে ফ্যালো দাদা···আমি আর এক-দণ্ড বাঁচতে চাইনে!

থামিয়া আবার নিশ্বাস ফেলিয়া কালো বলিল—নিয়ে এলুম। কিন্তু নিয়ে এসে কি করবো দাদাবাবু, আমাকে বলে দাও? সর্ব্বনাশী কি করলে! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে? আমি বলেছি, পুকুরে ডুবে তুই মর্‌! আজ সে পুকুরে ডুবতে গিয়েছিল··· ডুব দিয়েছিল। নন্দর মা দেখতে পেয়ে ধরে তুলে এনেছে! এ কি বিপদ বলো দিকিনি দাদাবাবু! আমি বেচারী ছাপোষা মানুষ! ওকে ঘরে ঠাঁই দিলে আমার জাত যাবে! অথচ মায়ের পেটের বোন···মেরে ফেলতেও হাত উঠছে না!

শুনিয়া সুশীল যেন কাঠ! নিমেষের জন্য। তার পর হাত ধরিয়া কালোকে তুলিয়া সুশীল বলিল,—মারবি কি! চ, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। এখনি ব্যবস্থা করছি!···মামাবাবুকে সব বলেছিস্‌?

—বলেছি। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

সুশীল বলিল—আর দেরী নয়। তাকে একলা রেখে আসিসনি তো ?

—না। নন্দর মা আগুলে বসে আছে।

—তোর বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

—বুড়ো মা···কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে। কালিকে গাল দিচ্ছে, খিঁচুচ্ছে। বলছে, তুই মর! এমন সর্ব্বনাশীকেও পেটে ধরেছিলুম!

—তোর বৌ ?

—সে তার বাপের বাড়ী গেছে। সেখানে আমার শ্বশুরের খুব ব্যামো।

[ক্রমশঃ

অবসর

শ্রীনন্দিতা পাল

বিভিন্ন পত্রিকায় যখন মেয়েদের দেহচর্চ্চা বা রূপচর্চ্চার বিষয় আলোচিত হয়, তখন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ভাবেন যে, রূপ-চর্চ্চার নির্দ্দিষ্ট উপকরণগুলি ব্যয়বহুল না হলেও, বহু সময়-সাপেক্ষ। কারণ এই পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ ভূখণ্ডের কোন বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তার ধারণা হয়ত আমাদের খুব কমই আছে, কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ঢেউ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের গৃহাঙ্গনেও তার ছোঁয়াচ লাগিয়ে তাকে সচেতন করেছে। ধোপা তার ২।• টাকা হারে কাপড় কাচা ছেড়ে ৭ টাকায় দাঁড় করিয়েছে, ঝি-চাকর নিতান্ত বড়লোকদের বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও পায়ের ধুলা দেওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাই ঝি-চাকর, ধোপা ও রাঁধুনীর কাজ যখন বাড়ীর মেয়েদের এক-হাতে করতে হয়, তখন রূপচর্চ্চার বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা দেখলে তাঁদের কর্ম্মক্লান্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা মানে না।

কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনেই হোক বা ভাগ্যবিধাতার পরীক্ষার দিন উপস্থিত হওয়ার ফলেই হোক, নানা রকম গৃহকাজের ভার যখন আমাদের উপরে এসে পড়েছে, তখন তাকে অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। কিন্তু মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ধরা-বাঁধার মাঝে কিছুতেই জীবন কাটাতে পারে না। যে অতি দরিদ্র তার মনেও সামান্য পরিবর্ত্তনের সখ জাগে, আর সে এই সখের উপকরণ শত অভাব সত্ত্বেও না জুগিয়ে পারে না।

অনেক সংসারে দেখা যায় যে, তাঁরা শুধু কাজ নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন, কিন্তু নিজেদের দৃষ্টিকে একটু সচেতন করলে এবং সংসারের বিপুল কর্ম্মভারকে লাঘব করবার ইচ্ছা থাকলে প্রতিদিনের কাজের ফাঁকেও একটু সময় পাওয়া যায়। যে সময়টুকু অন্য কোনও কাজে না হোক নিজেদের মনের বিশ্রামের জন্যও প্রয়োজন।

প্রত্যেকের সংসারেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে। তাদের মাকে অবিশ্রান্ত ভাবে ঘর-দোর পরিষ্কারের কাজে লেগে থাকতে হয়। অনেকের ধারণা, ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার থাকা অসম্ভব। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ছোট বেলা থেকে যদি তাদের উপযুক্ত শিক্ষা থাকে নিজেদের জিনিষপত্র বয়স অনুপাতে গুছিয়ে রাখবার, তাহলে তাদের সে ভাব চিরদিনই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ মায়ের যদি উপযুক্ত দৃষ্টি থাকে এবং তারা যদি জানে যে, কোনও জিনিষ অপরিষ্কার করলে তাদেরই আবার সেটা গুছিয়ে রাখতে হবে, তাহলে তারা বাড়ী-ঘর নোংরা করতে ভয় পাবে। ছেলে-মেয়েদের যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে বাড়ীর অর্দ্ধেক কাজ কমে যায় বলেই আমার বিশ্বাস।

কাপড়-জামা পরিষ্কার রাখতেও বাড়ীর মেয়েদের প্রাণান্ত পরিশ্রম হয়; কারণ, অধিকাংশ বাড়ীর ন'-দশ বৎসরের ছেলে-মেয়েরাও নির্ব্বিচারে জামা-কাপড় নোংরা করে, তার উপরে ধুলো পায়ে বিছানায় উঠে তারা মায়ের কাজ বাড়াতে সাহায্য করে। দু'-তিন বৎসরের শিশুদের কথা আলাদা, কিন্তু যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কাপড়-জামা নোংরা করলে তাদের দিয়ে যদি দু'-এক দিন নিজেদের ময়লা কাপড় ধোয়ানো যায় তাহলে নিজে থেকেই তাদের ও অভ্যাস কমে তখন ওটাও ইচ্ছা করলেই সংশোধন করা যায়।

তৃতীয়তঃ রান্নার কাজ—যা আমাদের গৃহকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। সাধারণ বাড়ীতে সকালে উনুনে আঁচ পড়ে, ১১।১২টা পর্য্যন্ত সকালের কাজ চলে, আবার ৩।৩।•টার সময় বিকালের কাজ আরম্ভ হয়। যাঁরা এ কাজও সংক্ষেপ করতে চান, তাঁরা সকালে দুটো উনুনে আঁচ দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন, তাহলে বেশী না হোক ১১টার সময়ে যে কাজ শেষ হয় সেটা ১০টার মধ্যে শেষ হবে আন্দাজ করা যায়। সকালের কাজের শেষে বিকালের জলখাবারও সেই সঙ্গে করে রাখা চলে, তাহলে ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরলে, তাদের খাবার করে দেওয়ার তাড়া থাকে না। সন্ধ্যার সময়ে উনুনে আঁচ দিয়ে রাত্রের কাজ আরম্ভ করা যায়।

আমার ধারণা যে, সংসারের কাজ সংক্ষিপ্ত করবার ইচ্ছা থাকলে নানা ভাবেই তা করা যায়। প্রত্যেক সংসারের কর্ম্মধারা ও প্রণালীর মধ্যে কিছু না কিছু তারতম্য থাকেই—নিজেদের বাড়ীর সুবিধা-অসুবিধা বুঝে যদি কিছু ব্যবস্থাও করা যায়, তাতে অন্য কোনও উপকার না হোক, নিজেদের শারীরিক বিশ্রামও তো হয়।

মাংস-পেশী

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা অন্যান্য অনেক জিনিষের মত মানুষকে রূপচর্চ্চার অনেক উপাদান জুগিয়েছে। মানুষ তাই আজ রুজ, পাউডার, ক্রীম আর লিপষ্টিকের সাহায্য নিয়ে নিজের রূপ-বৃদ্ধির জন্যে করে অস্বাভাবিক চেষ্টা। কিন্তু এ জাতীয় প্রচেষ্টাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা যেতে পারে, এবং এই বিদ্রোহে সফলকাম হওয়া হয়ত মানুষের ভাগ্যে ঘটবে না। মানুষের রূপের মূল উপাদান রং নয়। দেহচর্ম্ম আর পেশীর সৌন্দর্য্যই হচ্ছে প্রকৃত সৌন্দর্য্য। প্রসাধনে সময় নষ্ট না করে সামান্য সময় ব্যয় করলেই দেহচর্ম্মের লাবণ্য আর সুগঠিত মাংসপেশীর সৌন্দর্য্য লাভ করা যায়। আমাদের দেশে দেখা যায় যে, বয়স ত্রিশের ওপর না যেতেই মুখের চামড়া যায় কুঁচকিয়ে, পিঠের হাড় যায় বেঁকে, মাথার চুল যায় উঠে, কপালে ফুটে ওঠে রেখা আর মনে এসে যায় বার্দ্ধক্য। তখন প্রাণপণ চেষ্টা চলে আগতপ্রায় ভাঙ্গনকে রোখবার জন্যে। কিন্তু যদি নিয়মিত ভাবে সামান্য চেষ্টাও করা যায় তাহলে হয়ত দীর্ঘদিন বার্দ্ধক্যের সঙ্গে লড়াই করা যায়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী হতে হলে সর্ব্বপ্রথমে নজর দিতে হবে মাংসপেশীর দিকে। স্বাস্থ্যচর্চ্চার আগে পেশীর একটু পরিচয় জেনে রাখা দরকার।

প্রাণিদেহের সৌন্দর্য্য আর শক্তির আধার হচ্ছে মাংসপেশী। অধিকাংশ মাংসপেশীই হাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন। নরকঙ্কাল ঢেকে রেখে তার হাড়গুলোকে দিয়ে কাজ করানই হচ্ছে অধিকাংশ পেশীর ধর্ম্ম।

মাংসপেশী দু'রকমের। কতকগুলোকে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করা যায়, আর বাকীগুলোকে তা করা যায় না। দেহের হাড়ের সঙ্গে যে সমস্ত পেশী সংযুক্ত আছে তারা প্রথম জাতীয়। দ্বিতীয় রকমের পেশী আছে পরিপাক-যন্ত্রে, শ্বাস-নলীতে এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য জায়গায়।

মাংস খাবার সময় তেল বা চর্বি বাদ দিয়ে যে মাংস আমরা পাই সেটাকেই পেশী বলে ধরা যেতে পারে। আসলে কিন্তু মাংস-পেশী হচ্ছে সুক্ষ্ম। পেশী-তন্তুর সমষ্টি। সে সব তন্তু দেখতে সুতোর মত।



একটা একটা তন্তু হয়ত এক ইঞ্চির পাঁচশো বা দু'শো ভাগের এক ভাগ মোটা। তবে লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির মত। এই সব পেশীর কোনটার বা লাল রং, কোনটা বা ফ্যাকাশে।

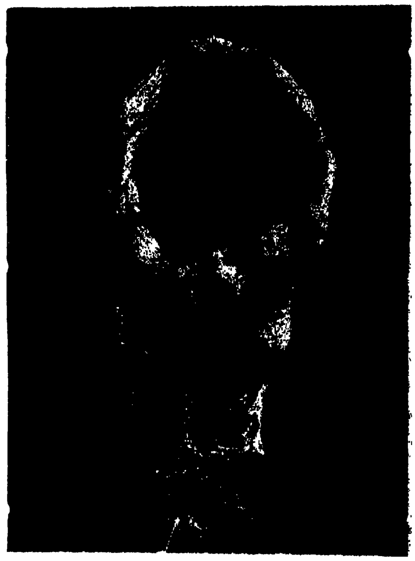
পেশী-তন্তু হচ্ছে খুব ছোট ছোট কোষ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে পেশী ইচ্ছামত চালান যায় তার তন্তুতে থাকে আড়া-আড়ি ডোরা। হৃৎপিণ্ডের তন্তুও এই জাতীয়—যদিও তাদের খুশী-মত পরিচালনা করা যায় না। বাকী সমস্ত পেশীর তন্তুতে ডোরা কাটা থাকে না।

এই সব পেশীর কিন্তু নিজেদের কোন কাজ করবার ক্ষমতা নেই। পেশীদের চালনা করে স্নায়ু। আগুনের কাছে হাত রাখলে হাতে লাগবে গরম। সেই গরম লাগার খবরটা একটি স্নায়ু পৌঁছে দেবে মস্তিষ্কে। তখন সেখান থেকে খবর পেয়ে আর একটি স্নায়ু সঙ্কোচিত করবে হাতের পেশী। ফলে আগুনের কাছ থেকে যাবে হাতখানা সরে। একটা ব্যাং মেরে সদ্য সদ্য তার পায়ের পেশী বা গুলিটিকে আলাদা করে কেটে নিয়ে এ বিষয়ের পরীক্ষা করা যায়।



অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে পেশী আর তার পরিচালক স্নায়ুটিকে স্পষ্ট দেখা যাবে। জলে একটু লবণ দিয়ে সেই জলে ঐ পেশীটিকে ভিজিয়ে রাখলে পেশীটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে, তখন পেশীটিতে খোঁচা দিলে একটুও নড়বে না, কিন্তু স্নায়ুটিতে অতি সামান্য আঘাত লাগলেও পেশীটি সঙ্কুচিত হবে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মাংসপেশীর পরিচালক হচ্ছে স্নায়ু।

পেশীকে সুপুষ্ট, কর্ম্মক্ষম আর শক্তিমান্ করে তুলতে হলে চাই নিয়মিত ব্যায়াম। পেশীতন্তুদের যে ইচ্ছে করলেই বাড়ান যায় তা নয়। তারা বাড়ে ধীরে ধীরে। আর তাদের বাড়ার একটা সীমাও আছে। মানুষের সৌন্দর্য্যের মূল হচ্ছে এই সমস্ত পেশী। নিয়মিত ব্যায়াম করলে দেহে চর্বি জমে না, দেহ-চর্ম্ম কুঞ্চিত হয় না—শুধু তাই



নয়, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষমতা অটুট থাকে। সঙ্গে মালিশেও পেশী সুস্থ থাকে। আয়ত্তাধীন পেশীর সংখ্যা ২৪৫টি। উপযুক্ত ব্যবহার না হলে তারা পঙ্গু হয়ে যায়। এই সব পেশী হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয় দড়ির মত এক রকম জিনিষের সাহায্যে। সব পেশীই এক রকম সূক্ষ্ম আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে।



জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদ্ স্যাণ্ডোর ছবি দেওয়া আয়ত্তাধীন মাংস-পেশীর সংস্থান দেখাবার জন্য।

হৃৎপিণ্ডের মাংস-পেশীগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কাজ করে চলে।

প্রতিযোগিতা

অঞ্চলীয় ফাইন্যালের পরিসমাপ্তি

আন্তঃ-প্রাদেশিক রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চারি অঞ্চলের শেষ খেলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে মাদ্রাজ ও হোলকার দলের জয়লাভ সকলেই আশা করিয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য একমাত্র উত্তরাঞ্চল ব্যতীত প্রতি ক্ষেত্রেই বিজিত দল 'ফলো-অনের' গ্লানি হইতে রক্ষা পায় নাই! পশ্চিমাঞ্চলে বরোদা ইনিংস পরাজয়ের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ও শেষ পর্য্যন্ত সাত উইকেটে পরাজিত হয়।

বাঙলা ও মহীশূর ইনিংসও বহু রাণে পরাজিত হইতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বাঞ্চল—

ইন্দোরে যশোবন্ত ষ্ট্যাডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় হোলকার বাঙলাকে এক ইনিংস ও ২১৮ রাণে শোচনীয় ভাবে হারাইয়া দিয়াছে। লেঃ কর্ণেল সি, কে, নাইডুর ন্যায় অনন্যসাধারণ ক্রিকেট-প্রতিভার নেতৃত্বে ও বহু খ্যাতনামা ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় গঠিত হোলকার দলের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য বাঙলা দলের ইহাদের বিরুদ্ধে পরাজয় সকলেই প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ধারণা করিলেও বাঙলার এই শোচনীয় বিপর্য্যয় একেবারে আশাতীত ও মর্ম্মান্তিক। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল শুধু যে বাঙলার ললাটে পরাজয়ের কালিমা আঁকিয়া দিয়াছে তাহা নহে, বাঙলা তথা বাঙালীর ক্রিকেট-জগতে নিঃস্বতার পরিচয় প্রকট করিয়াছে।

বাঙলার এই চরম পরিণতির ফলে আলোচনা ও সমালোচনার অন্ত নাই। তবে বাঙলা ক্রিকেটের অধোগতি সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর সমর্থক একমত। জয়-পরাজয় খেলার অঙ্গ। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার লীলাক্ষেত্র। আশাতীত বিপর্য্যয়ের ইতিহাস ক্রিকেট-জগতে বিরল নহে। কিন্তু বাঙলার এই পরাজয় অত্যন্ত আশাবাদীর মনেও কোন রেখাপাত করে না। সকল রকমে বাঙালীর ব্যর্থতা এই খেলায় সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে। শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্রিকেটের প্রধান অবলম্বন। এ বিষয়ে সি, কে, নাইডু সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের পর কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে যাহা বলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। মাঠে শৃঙ্খলা রক্ষা ও একাগ্রতা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ধর্ম্ম। বোধ হয়, বাঙালী খেলোয়াড়ের খেলার মাঠে অমনোযোগ তিনি লক্ষ্য করিয়াই এই কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ বাঙলার পরাজয়ের মূলে ছিল আমাদের খেলোয়াড়দের ফিল্ডিংএ অসংখ্য ত্রুটি। এই সমস্ত ত্রুটি অমনোযোগজনিত, সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ খেলোয়াড় কখনও অনুরূপ ভাবে ব্যর্থকাম হয় না। বাঙলার নৈরাশ্যজনক ফিল্ডিং-এর সুযোগে হোলকার ৫৩৮ রাণ করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বাতে ১২৭ রাণের মধ্যে একাধিক বার আউট হইবার সহজ সুযোগ দেন। গাইকোয়াড় ৭৩ রাণ করিতে নির্ভুল ভাবে ব্যাট চালনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের মাশুল আদায় করার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা ক্ষিপ্রতা বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায় নাই। এই খেলার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশেষ খেলায় নামজাদা ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের



এম, ডি, ডি

গণ অনুশীলন-প্রভৃতি কোনরূপ উন্নতির আভাষ দিতে পারে নাই। একই খেলায় একাধিক খেলোয়াড়ের রাণ আউট সর্টরাণ নেওয়ার ব্যাপারে খেলোয়াড়দের মধ্যে অসহযোগ ও বোঝা পড়ার অভাব নির্দ্দেশ করে। অনেকে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের ত্রুটি দেখিয়াছেন। কেহ বা পরিচালকমণ্ডলীর মুণ্ডপাত করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমাদের গোড়ায় গলদ। গণ্ডুষ মাত্র জলে শফরীর অবস্থা আমাদের খেলোয়াড় সম্প্রদায়ের। সবজান্তা না হইয়া যদি আমাদের তরুণ খেলোয়াড়েরা শিক্ষা নেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে আগ্রহান্বিত হয়, তবে ভবিষ্যতে আশার আলোর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ক্রিকেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদেরও অবহিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রচলন, অনুশীলনের অবাধ সুযোগ এবং সর্ব্বোপরি যোগ্যতার সমাদর করিতে না পারিলে বাঙলার মাথায় এই দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দেওয়ার দুষ্কৃতি হইতে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পাইবেন না।

হোলকার প্রথমে খেলিয়া সর্ব্বসমেত ৫৩৮ রাণ করে। তন্মধ্যে সর্ব্বাতে ১২৭, গাইকোয়াড়ের ৭৩, সি, এস, নাইডুর ৫০, জে, এন, ভায়ার ৬১ রাণ উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ খেলোয়াড় সি, কে, নাইডু নিজস্ব ১৪১ রাণ করিতে বিভিন্ন মারের কায়দা ও কৌশল দেখান। বাঙলার নবাগত তরুণ বোলার পি, বি, দত্ত ৮৫ রাণ দিয়া ৪টি ও এন, চৌধুরী ৮০ রাণ দিয়া ৩টি উইকেট পান।

প্রত্যুত্তরে বাঙলা প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৪ রাণ করিতে সমর্থ হয়। সি, এস, নাইডুর মারাত্মক বোলিং এই বিপর্য্যয়ের অবতারণা করে। 'ফলো অন' করিয়া বাঙলা দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ রাণ করে। ইহার মধ্যে পার্থসারথির ৬০ ও ডোত্রিকারীর ৩৩ রাণ উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, অবাঙালী এই দুই জনেই বাঙলার মানরক্ষার জন্য কিছু প্রয়াস পান।

পার্থসারথি উইকেট রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া চার জনকে আউট করেন। এই খেলায় সি, এস, নাইডু মোট ১টি ও সর্ব্বাতে ৬টি উইকেট অধিকার করায় স্পিন্ বলের বিরুদ্ধে বাঙালী ব্যাটস-ম্যানদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়।

হোলকার :—

লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক), মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, কম্পটন, জগদেল, সর্ব্বাতে, ভায়া, ভাণ্ডারকর, নিম্বলকার, গাইকোয়াড় ও বাওয়াল।

বাঙলা :—

কুচবিহারের মহারাজা (অধিনায়ক), কে, ভট্টাচার্য্য, এন, চাটার্জ্জী, জাজ, ডোত্রিকারী, এন, চৌধুরী, পি, সেন, এম, সেন, পার্থসারথি, এস, মিত্র ও পি, বি, দত্ত।

রাণ সংখ্যা :—

হোলকার—১ম ইনিংসে ৫৩৮ রাণ

বাঙলা—১ম ইনিংসে ৬৪ রাণ; ২য় ইনিংসে ১৭৬ রাণ

হোলকার এক ইনিংসে ও ২১৮ রাণে জয়ী হয়।

দক্ষিণাঞ্চল :—

এই অঞ্চলের ফাইন্যালে মাদ্রাজ এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে মহীশূরকে পরাজিত করে। প্রথমে খেলিয়া মাদ্রাজ মোট ৩৬৩ রাণ করে! নবীন ও উদীয়মান খেলোয়াড় অনন্তনারায়ণ সংযত ও নির্ভুল ভাবে খেলিয়া ১২৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। মহীশূরের দলপতি ও বহুদর্শী খেলোয়াড় পালিয়া ৭৩ রাণ দিয়া পাঁচটি উইকেট পান।

রঙ্গাচারী ও রামসিংএর কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং মাত্র ৭৮ রাণে মহীশূরের প্রথম ইনিংস শেষ করে। যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৩ রাণের বিনিময়ে তাঁহারা সাতটি ও তিনটি করিয়া উইকেট লাভ করেন। 'ফলো অন' করিয়া মহীশূর দ্বিতীয় দফায় ১৫১ রাণ করিতে সমর্থ হয়। দ্রুত পতনের মুখে দাঁড়াইয়াও পালিয়া ও শ্যামসুন্দরের দৃঢ়তা সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। তাঁহারা যথাক্রমে ৭৮ ও ৪৮ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে মাদ্রাজের অধিনায়ক গোপালমের বল বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

মাদ্রাজ :—গোপালম (অধিনায়ক), রামসিং, ফিলিপস, রবিন্সন, নেলার, রিচার্ডসন, শ্রীনিবাস, অনন্তনারায়ণ, পরাণকুসুম, রঙ্গাচারী ও আলভা।

মহীশূর :—পালিয়া (অধিনায়ক), দারাসা, ইরাণী, শ্যামসুন্দর, ম্যাপলস্, ফ্রাঙ্ক, আয়েঙ্গার, গরুড়াচার, রামারাও, বামদেব ও রামস্বামী।

রাণ সংখ্যা :—

মাদ্রাজ—১ম ইনিংস ৩৬৩ রাণ
মহীশূর—১ম ইনিংস ৭৮ রাণ
২য় ইনিংস ১৫১ রাণ
মহীশূর এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে পরাজিত হয়।

উত্তরাঞ্চল :—

উত্তর-ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশন দক্ষিণ ভারতকে ৩৬২ রাণে পরাজিত করিয়া প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। টসে জয়লাভ করিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাব দলের নির্ব্বাচিত অধিনায়ক অমরনাথ অজ্ঞাত কারণে ব্যাট করার সুযোগ অবহেলা করিয়া বিজয়ী উত্তর-ভারতকে প্রথমে খেলার সুযোগ দেন।

ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ ও পাতিয়ালার মহারাজার অনুপস্থিতিতে মহম্মদ সৈয়দ ও অমরনাথ যথাক্রমে দল পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষে বহু তরুণ খেলোয়াড় যোগদান করিয়া সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁহাদের খেলায় উক্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের ধারা ও গতি কতটা উন্নতিশীল তাহা বোঝা যায়। ইমতিয়াজ ও মকসুদের ন্যায় উদীয়মান খেলোয়াড়দ্বয় যথাক্রমে আউট না হইয়া ১০০ ও ১১৪ রাণ করার সৌভাগ্য ও সুনাম অর্জ্জন করেন। চুণীলালের চাতুর্য্যপূর্ণ বোলিং দক্ষিণ-পঞ্জাবের পরাজয়ের কারণ হয়।

উত্তর-ভারত :—মহম্মদ সৈয়দ (অধিনায়ক), রামপ্রকাশ, আবদুল হাফিজ, নাজার মহম্মদ, মহম্ম দআসলাম, ইন্দ্রজিৎ, চুণীলাল, ফজল মামুদ, মুনীলাল, বদরুদ্দীন ও ইমতিয়াজ আমেদ।

দক্ষিণ-পঞ্জাব :—অমরনাথ (অধিনায়ক), রামসিং, ডালজিন্দর সিং, হীরালাল, অমৃতলাল, মকসুদ আমেদ, মহম্মদ ইক্রাম, মুরাওয়াৎ হোসেন, গুলজার, রামকিষেণ ও সবীর।

রাণ সংখ্যা :—

উত্তর-ভারত—১ম ইনিংস—৪৪১ রাণ (আসলাম ১৭, রামপ্রকাশ ৭৭, মুনীলাল ৪১, সবীর ১০৬ রাণে ৪টি উইকেট)

২য় ইনিংস—সাত উইকেটে ২১৮ রাণ (মুনীলাল ৮৫, ইমতিয়াজ নট আউট ১০০, সবীর ৮৫ রাণে ২টি ও রামকিষেণ ৪০ রাণে ২টি উইকেট)

দক্ষিণ-পঞ্জাব—১ম ইনিংস—২১৩ রাণ (মকসুদ ১১৪, মুরাওয়াৎ ৭১, চুণীলাল ৬৬ রাণে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৯২ রাণ (চুণীলাল ২৫ রাণে ছয়টি ও বদরুদ্দীন ১১ রাণে দুইটি উইকেট)

উত্তর-ভারত ৩৬২ রাণে জয়লাভ করে।

পশ্চিমাঞ্চল :—

দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা বোম্বাই বনাম বরোদা খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বোম্বাই পক্ষে প্রথম ইনিংসে ইব্রাহিম, মার্চ্চেন্ট ও আনোয়ার হোসেন বিশেষ কিছু করিতে না পারায় অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদীয়মান পার্শী খেলোয়াড় আর, এস, মুদী কুপারের সাহচর্য্যে নিজ দলকে রক্ষা করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যাটিং-প্রতিভা বোম্বাইএর বিজয়াভিযানের পাথেয় হয়। ২৪৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া তিনি আলোচ্য বৎসরে দুই বার দুই শতাধিক রাণ করার যোগ্যতা দেখান। বোম্বাই দলের ৪৬৮ রাণের প্রত্যুত্তরে বরোদার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫১ রাণে শেষ হয়। বহুদর্শী ও খ্যাতনামা খেলোয়াড় বিজয় হাজারীর ব্যাটিংএ ব্যর্থতা সকলকে হতাশ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে গুল মহম্মদ দৃঢ়ভাবে খেলিয়া ১০০ রাণ করেন। অধিনায়কোচিত চাতুর্য্য দেখাইয়া নিম্বলকার মাত্র চার রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন।

বোলিংয়ে উভয় পক্ষে হাজারী, আমীর এলাহী, মন্ত্রী ফাড়কার ও তারাপোর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোম্বাই—মার্চ্চেন্ট (অধিনায়ক), এম, কে, মন্ত্রী, আর, এস, মুদী, কে, সি, ইব্রাহিম, আর, এস, কুপার, ফাড়কার, তারাপোর, কোর, খোট, পালওয়াঙ্কার ও আনোয়ার হোসেন।

বরোদা—আর, বি, নিম্বলকর (অধিনায়ক), বিজয় হাজারী, অধিকারী, আমীর এলাহী, গুল মহম্মদ, সেখ, পাওয়ার, বিবেক হাজারী, মীরচন্দনী, ভি, এন, রায়জী ও এ, প্যাটেল।

রাণ সংখ্যা :

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৪৬৮ রাণ (আর, এস, মুদী নট আউট ২৪৫, কুপার ৬২, পালওয়াঙ্কার ৭৮, গুল মহম্মদ ৮৫ রাণে ৩টি, হাজারী ১৪২ রাণে ৪টি ও আমীর এলাহী ১৪১ রাণে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—তিন উইকেটে ৭৪ রাণ

বরোদা—১ম ইনিংস—১৫১ রাণ

২য় ইনিংস—৩৯০ রাণ (গুল মহম্মদ ১০০, নিম্বলকার ৯৬, ফাড়কার ৭৩ রাণে ২টি, তারাপোর ১০৮ রাণে ৪টি ও আনোয়ার হোসেন ৭৭ রাণে দুইটি উইকেট)

বরোদা সাত উইকেটে পরাজিত হয়।

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা:

নিখিল ভারতীয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগীয় অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবের প্রতিযোগিতা বিভিন্ন প্রাদেশিক তরুণ খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও অনুশীলনের সুযোগ দেয়। খেলোয়াড়-সৃষ্টি ব্যাপারে অনুরূপ প্রতিযোগিতার কার্য্যকারিতা অতুলনীয়।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানে সাড়ে ৬৭ পয়েন্ট লাভ করিয়া পঞ্জাব শীর্ষস্থান অধিকার করে।

ক্রিকেট:—রোহিণ্টন বারিয়া আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। তরুণ পার্শী খেলোয়াড় আর, এস, মুদী ১১০ রাণ করিয়া নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। বিজিত পঞ্জাব পক্ষে ডালজিন্দর সিং যথাক্রমে উভয় ইনিংসে ৪০ ও ৭২ রাণ করেন। ফাড়কার ১০৬ রাণ দিয়া নয়টি ও পঞ্জাবের হাফিজ ৭৫ রাণে পাঁচটি উইকেট দখল করেন।

বোম্বাই—১ম ইনিংস—২৩৭ রাণ
২য় ইনিংস—২০০ রাণ
পঞ্জাব—১ম ইনিংস—১১৮ রাণ
২য় ইনিংস—১১৬ রাণ
বোম্বাই ৪৩ রাণে জয়ী হয়।

টেনিস:—টেনিস খেলায় মাদ্রাজ ৩—২ ম্যাচে পঞ্জাবকে পরাজিত করে। পঞ্জাবের কিশোর মাদ্রাজের সম্পদকে ৬—৪ ও ৬—৩ এবং নারায়ণ রাও (মাদ্রাজ) মাশুদ হাসানকে (পঞ্জাব) ৭—৫, ৩—৬ ও ৬—২ সেটে পরাজিত করেন।

ফুটবল:—ফুটবল খেলায় পঞ্জাব এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় এবং মাদ্রাজকে ৪—০ গোলে বিপর্য্যস্ত করে।

বাঙ্গালাকে রক্ষার উপায়

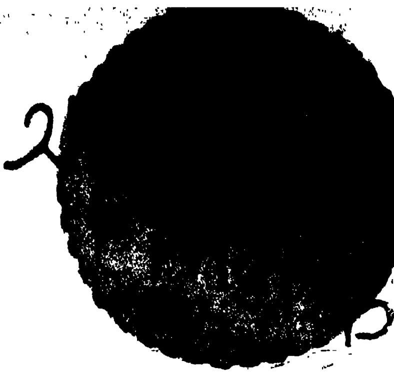
শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গত ২২শে পৌষ কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট কক্ষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে এক সভায় বঙ্গদেশে ক্রম-বর্দ্ধমান পতিতাবৃত্তির বিষয় আলোচিত হয়। সমগ্র ভারত পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এমন অবাঙ্গালী সন্ন্যাসীদিগের মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, চরিত্রের পবিত্রতায় বঙ্গনারী ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজ যদি অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও বর্ত্তমানের অর্দ্ধাহারই তাহার একমাত্র কারণ। সাধারণ সময়ের সাড়ে তিন টাকা মণ চাউলই লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, এখন পনর ষোল টাকার চাউল কত দিন কিনিতে পারে? ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত চাউলের মূল্যবৃদ্ধি এইরূপ:—

চাঁদপুর ৮৷১ টাকা হইতে ১২৷০।১৩; পাবনা ১২৷০ হইতে ১৪৷১৫; মৈমনসিং ১০ হইতে ১৪৷০; সিরাজগঞ্জ ১২৷১২৮০ হইতে ১৫ টাকা; ১১ই নভেম্বর প্রকাশিত নয়াদিল্লীর সংবাদে দেখা যায়, সে সময়ে কুমিল্লায় চাউলের দর ১৫ হইতে ৭ টাকা, ঢাকায় ১৫ হইতে ১১৷০ টাকা, বরিশালে ১৩ হইতে ১০৷০ ও চট্টগ্রামে ১৫৷২০ হইতে ১০৷১২ টাকায় নামিয়াছিল।

দর নামিয়া আবার উঠিবার কারণ কি? স্মরণ করিলে মনে পড়িবে, গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমন ধান কাটিবার পূর্ব্বে দাম পড়িয়াছিল আবার উঠিয়া যায়। ত্রিপুরা জিলায় দুর্ভিক্ষের সময়ে চাউলের দর ভয়ানক বাড়ে, আসন্ন আমন ফসলের ভয়ে সেখানেও আশাতীত মূল্য হ্রাস হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বের বৈশাখ মাসের প্রথমে কলিকাতায় চাউলের মণ ২২ টাকা হয়। সে সময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ধান-কাটার দুই মাসের মধ্যে এমন চাউলের অভাব হয় নাই যে, দর অত দূর উঠিবে। এই সকল হইতে একটি কথা প্রমাণিত হইতেছে যে, সঞ্চয়কারীরা ধান চাউল ধরিয়া রাখিতেছেন ও যখনই ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন তখনই দর নামিয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে ধরিয়া রাখিয়াছিল ব্যবসায়ীরা ও গত বৎসর রাখিয়াছিল বড় বড় চাষীরা। এই মজুতের কারসাজি না থাকিলে উপরি উপরি দুই বৎসর আমন ধান কাটিবার পূর্ব্বে দর পড়ে কেন?

দুর্ভিক্ষের সময়ে দুই মাস ধরিয়া বিহারের প্রথম রেল-ষ্টেসন মিহিজামে ১৪ টাকায় ও মাত্র ১৫ মাইল দূরে আসানসোলে ৪০ টাকায় চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। বিহারের পুলিশ যদি বাঙ্গালার মত কর্ত্তব্যে অবহেলা করিত, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না। এই অবহেলা আজও চলিতেছে ও যত দিন যে কোন সচিবসঙ্ঘকে শিখণ্ডী খাড়া করা যাইবে তত দিন চলিবে। স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীরা মন দিয়া কাজ না করিলে কোন দেশেই শাসনকার্য্য যুদ্ধের সময়ে ভালরূপ চলিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে হইলে সচিবসমর্থক ও বিরোধী দলের মধ্যে আপোষ করিয়া ৯৩ ধারার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও অত্যধিক য়ুরোপীয় ভোট-কণ্টকিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাঙ্গালার সমূহ ক্ষতি করিয়াছে, এইবার তাহাকে বিদায় দিতে না পারিলে প্রদেশ ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িবে।



শ্রীতারানাথ রায়

জার্ম্মাণীর ভাগ্য সম্বন্ধেই না কি গবেষণা ও পরামর্শ করিবার জন্ত ত্রিমূর্ত্তি—রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও ষ্টালিনের বৈঠক বসিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে—জার্ম্মাণী ও জাপানের বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের আওয়াজ এবার একটু নরম করা হইবে। কেহ বলিতেছেন যে, য়ুরোপীয় রণাঙ্গনে অস্ত্র ও রসদাদি অধিক প্রেরণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক প্রচেষ্টা মন্দা করিবার পরামর্শ করা হইবে। সেপ্টেম্বরে (১৯৪৪) ডাম্বার্টন ওকসের গুপ্ত বৈঠকের পর রুশিয়ার মতিগতি সম্বন্ধে সকলেই যেন একটু উদ্বিগ্ন হন। রুশিয়া যেন এংলো-স্থাক্সন মিত্রদ্বয়কে তেমন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। প্রস্তাবিত যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা-রক্ষা-সঙ্ঘ সম্বন্ধে রুশিয়া জিদ ধরে যে, চারিটি দেশের মধ্যে কোন দেশ কোন দেশকে আক্রমণ করিলে তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্ম সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার অধিকার চারি শক্তির যে কোন শক্তির থাকিবে—নাকচকারী শক্তি স্বয়ং আক্রমণকারী হইলেও। যথা, এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও কার্জ্জন লাইনের পূর্ব্বপারস্থিত পোল্যাণ্ড যদি নিরাপত্তারাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট রুশিয়াকে পররাষ্ট্র-গ্রাসকারী রাষ্ট্ররূপে অভিযুক্ত করে, আমেরিকা ও বৃটেনকে তাহা শুনিতেই হইবে। কিন্তু রুশিয়া তাহা মানিবে না। রুশের বক্তব্য—পৃথিবীর নিরাপত্তা চাও, আপত্তি নাই। কিন্তু আপন জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্ম রুশিয়ার যে অধিকার আছে তাহা তোমাদের প্রথমে মানিয়া লইতেই হইবে।

জার্ম্মাণী সম্বন্ধে সোভিয়েট মনোভাব—

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর ষ্টালিন এক বক্তৃতায় বলেন—"জার্ম্মাণীকে ধ্বংস করিবার নীতি আমরা অবলম্বন করিব না। রুশিয়াকে ধ্বংস করা যেমন অসম্ভব, জার্ম্মাণীকে ধ্বংস করাও তেমনই অসম্ভব। জার্ম্মাণীর সমগ্র সুসংগঠিত সামরিক শক্তি আমরা নষ্ট করিব না। যে একটু লেখাপড়া জানে সে-ও এ কথা বুঝে যে, জার্ম্মাণ সামরিক শক্তি ধ্বংস করা অসম্ভব! তবে আমরা হিটলারের সৈন্তদল ধ্বংস করিতে পারি এবং করিবও।"

এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত রুশিয়া বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মস্কোএ এক ফ্রি জার্ম্মাণ কমিটী গঠন করা হয়। ইহার অল্প পরেই লিগ অব জার্ম্মাণ অফিসার্স গঠন করা হয়। মস্কোর অনতিদূরে বসিয়া জার্ম্মাণ কমুনিষ্ট ও বন্দী জার্ম্মাণ সামরিক নেতৃবৃন্দ জার্ম্মাণীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরিকল্পনা গড়িতে থাকেন। নূতন পোল্যাণ্ডের ন্তায় রুশমিত্র নূতন জার্ম্মাণী গড়িবার আয়োজন হইতে থাকে। জার্ম্মাণ কমুনিষ্ট গ্রন্থকার ইরিচ উইনার্টের (ইনি জার্ম্মাণী হইতে রুশিয়ায় পলায়ন করেন) চেষ্টায় ও ষ্টালিনের সমর্থনে রুশ-জার্ম্মাণ মৈত্রীর পত্তন গড়িতে থাকে এবং বহু জার্ম্মাণ অভিজাত সামরিক নেতা ফ্রি জার্ম্মাণ কমিটীতে যোগদান করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে এই কমিটীর চেয়ারম্যান হইলেন ইরিচ উইনার্ট। অফিসার্স

ওয়ালথার ফন সেইডলিজ। ১৭ জন জার্ম্মাণ জেনারল এ দলে যোগদান করিয়াছেন।

যুদ্ধবিরতির কথা—

৩রা ফেব্রুয়ারী কায়রো হইতে একটি সংবাদ প্রচার করা হয় যে, জার্ম্মাণরা মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধ-বিরতি সন্ধি করিয়াছে। কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে কোন আভাসই পাওয়া যায় না। তবে এ কথা মনে হয় যে, এংলো-স্থাক্সন জাতিদ্বয় অপেক্ষা সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মাণী সম্বন্ধে অধিক আগ্রহবান্।

জার্ম্মাণ প্রতিরোধ—

একাধিকবার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল "কর্পোরাল হিটলারের" ব্যাজ স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলিতে তিনি সেরূপ শ্লেষ প্রয়োগ করেন নাই!

জার্ম্মাণীতে হিটলারের প্রভাব স্তিমিত হইয়াছে এরূপ প্রচার ও ঘোষণার মূলে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু পশ্চিম রণক্ষেত্রে হিটলার যে ভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়! সমর সাংবাদিকদের অভিমত—"The use the Germans have made of the past two months to recover, and their remarkable resurgance of military power show no amateur is now in charge but shrewd professional soldiers"—জার্ম্মাণীর এই পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারীর ভাষায়—"The hardest and most costly fighting I have ever seen, worse than anything in the last war." এ যুদ্ধে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত কাহাদের হতাহতের সংখ্যা অধিক হইয়াছে তাহা সামরিক কারণে প্রকাশ নিষিদ্ধ। যুদ্ধে সাধারণতঃ আক্রান্তগণ অপেক্ষা আক্রমণকারীদের হতাহতের সংখ্যাই অধিক হয়, তবু এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষ অপেক্ষা জার্ম্মাণদের হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা অধিক। অশেষ নিপুণ হইলেও জার্ম্মাণদের জনক্ষয়ও অশেষ হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম রণক্ষেত্রে শেয়ানে শেয়ানে যে লড়াই চলিতেছে (যাহাকে সামরিক ভাষায় "toe-to-toe slugging" বলা হয়) তাহা দেখিয়া মিষ্টার চার্চ্চিল তেমন উচ্ছ্বসিত ভাবে আশার কথা বলেন নাই। তাঁহার ভাষায় মনে হয়, এদিকে যুদ্ধ কবে শেষ হইবে বলা কঠিন। পূর্ব্বে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন—"early summer" এ যুদ্ধ শেষ হইবে, কিন্তু "early" কথাটি বাদ দিয়া এখন বলিয়াছেন—"I must warn the House and this country against any indulgence in feeling that the war will soon be over."

জার্ম্মাণ আত্মরক্ষার আয়োজন—

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত জার্ম্মাণীর আয়োজন দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর। সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেন্‌জ গুডেরিয়ানের আয়োজনে ৮ হইতে ১৫ টন ওজনের চলমান কংক্রিট দুর্গ পূর্ব্ব

সীমান্তের প্রদেশগুলি রক্ষা করিতেছে। এ সকল দুর্গের নাম "স্কর্পিয়ন্‌স্" (বৃশ্চিক)। স্কর্পিয়নগুলির সম্মুখে ৬ হইতে ৮ সারি মাইন প্রাকার। মাইনগুলির মধ্যে আছে কাচনির্ম্মিত স্পর্শ-বিস্ফোরক মাইন এবং বৈদ্যুতিক তার বা রেডিও প্রজ্বালক ব্যবস্থাযুক্ত কনট্রোল্ড মাইন। এই রক্ষা-বেষ্টনীর মধ্যে ট্যাঙ্কধ্বংসী রকেট ও কামান লইয়া জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে।

পশ্চিম সীমান্তেও অনুরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। গ্রামগুলির চতুর্দ্দিকে বহু পরিখা খনন করা হইয়াছে। সাধারণ গৃহগুলির চারি দিকে ৫ ফুট কংক্রিট প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া গভীর ভূগর্ভ আশ্রয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক একটি গৃহ এক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ। বড় বড় সহরের বড় বড় বাড়ীগুলির প্রতিটি কক্ষ রীতিমত লড়াই করিয়া মিত্রপক্ষদিগকে জয় করিতে হইতেছে।



উহারা কি মানুষ?

জার্ম্মাণরা সকল রণক্ষেত্রেই মাত্র মরিয়া হইয়া নহে, হিংস্র শ্বাপদের শেষ প্রতিরোধের ন্যায় অসম সাহসিক ভাবে লড়িতেছে। বন্দী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা দানবের ন্যায় যুদ্ধ করে। শুনা যাইতেছে, সে দেশের পঙ্গু ও দুষ্টরোগগ্রস্ত নরনারী যুদ্ধে আত্মবলি দিতেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তা ৫০ বৎসরের এক স্ত্রীলোক ওয়ানম্যান টর্পেডো (এক জন দ্বারা চালিত টর্পেডো) লক্ষ্যস্থলে চালাইয়া লইয়া গিয়া আত্মদান করে। ১৯ বৎসর বয়স্ক এক কিশোরের মেরুদণ্ডে টি-বি ছিল। সে ডিনামাইট পূর্ণ গাড়ী লইয়া মিত্রপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিতে চাহে। কিন্তু এত প্রতিরোধ ও এত আয়োজন সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা হতাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জার্ম্মাণ সামরিক মুখপাত্র লেঃ জেনাঃ ডিটমার বলিয়াছেন—"দুই দিকে সঙ্কট ও সর্ব্বনাশ, মধ্যে ক্ষীণ সরু পথ, পদস্খলন হইলেই মৃত্যু। আজ জার্ম্মাণ নরনারীর কর্ত্তব্য—স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করা।" ৩০শে জানুয়ারী স্বয়ং "হিটলার" (অনেকে সন্দেহ করিতেছেন হিটলার আর কথা বলেন না, আছেন কি না সন্দেহ।) এক বেতার বক্তৃতায় কৃষক, নাগরিক, সৈনিক—সকলকে দেহ ও প্রাণ বলি দিতে আহ্বান করেন। তবে তিনি ধনসাম্যবাদ-বিরোধী বৃটেনকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, বন্য বলশেভিককে সে পোষ মানাইতে পারিবে না, বরং নিজেই বন্য হইয়া যাইবে। এ যেন কতকটা হিটলারবাদের সহিত বৃটেনের আপোষ করিবার আবেদন।

বার্লিনে রুশপতাকা উড়িবে—

বাল্টিক সাগর হইতে কার্পেথিয়ান গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত রুশিয়া প্রায় ৩ শত ডিভিসন সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর প্রায় ২ শত ডিভিসন সৈন্য আত্মরক্ষার যুদ্ধ করিতেছে।

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে রুশরা বার্লিন অভিযান আরম্ভ করে। এই "বলশেভিক বন্যার" গতিরোধ করিবার জন্য জার্ম্মাণরা যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সাফল্য দেখা যাইতেছে না। বার্লিনের পূর্ব্বদ্বারে রুশ রণ-নায়ক কোনিভ ও জুকোভের দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী প্রবল হানা দিয়াছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংবাদ—রুশরা বার্লিনের প্রায় ৫০ মাইল পূর্ব্বে ওডার নদী অতিক্রম করিয়াছে। জার্ম্মাণরা জনক্ষয় তুচ্ছ করিয়া বাধা দিতেছে। কিন্তু দারুণ শীত পড়ায় জার্ম্মাণরা উল্লসিত হইয়াছে। কয়মাস বরফ পড়িবে। 'লণ্ডন টাইম্‌সের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন—**"If the thaw in Brandenburg continues, its effect on operations will be incalculable, greatly favouring the defenders and prolonging the battle now impending."**—এই সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, এদিকে রুশ আক্রমণ কতকটা শিথিল হইয়াছে, কারণ—(১) দূর হইতে রসদ সরবরাহের অসুবিধা, (২) প্রবলতর জার্ম্মাণ প্রতিরোধ এবং (৩) রণক্ষেত্রে দ্রুত ও প্রবলতর তুষার সমাচ্ছাদন।

ইটালীতে—

ইটালীতে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য—মাত্র কোন মতে নাৎসীদের উপর চাপ বজায় রাখা। কাজেই যুদ্ধ এখানে ঢিমে তালে চলিতেছে। কোন কোন স্থানে জার্ম্মাণরা আক্রমণ করিয়া মিত্রপক্ষের পঞ্চম বাহিনীর কবল হইতে দুই-একটি পাহাড় কাড়িয়া লইতেছে, কোন কোন স্থানে মিত্রপক্ষরা কয়েক শত গজ স্থান জয় করিতেছে। নিট ফল তেমনি মন্দা।

জাপান বনাম মিত্রপক্ষ—

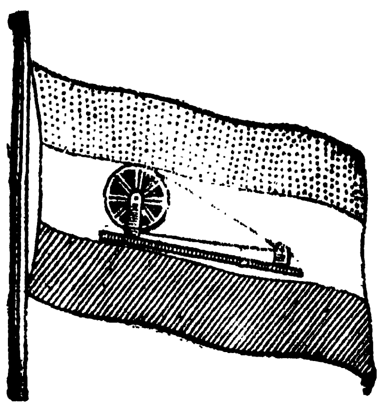
জাপান ১৯৪৪ এপ্রিল হইতে এ পর্য্যন্ত চীনে যে অভিযান করিয়াছে, তাহাতে মাত্র চীন নহে আমেরিকা পর্য্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়াছে। হাংকো-ক্যান্টন রেলপথ দখল করিয়া তাহারা দক্ষিণ চীনের সমুদ্রতট সুরক্ষিত যেমন করিয়াছে, তেমনই এক দিকে হ্যানিং (এ স্থান হইতে রেলপথ ইন্দোচীনের হানই পর্য্যন্ত গিয়াছে) দখল করিয়াছে এবং অন্য দিকে কাওইয়াংএর (চীন-ব্রহ্ম পথ মিচিনা, কুনমিং ও কাওইয়াং হইয়া উত্তরে চুংকিং পর্য্যন্ত গিয়াছে) দিকে ধাবিত হইতেছে। কাওইয়াংএর পতন হইলে জাপ সৈন্য চীনের রাজধানী চুংকিংএর নিকটে আসিয়া পড়িবে। এই স্থানে আমেরিকার বিমান-ঘাঁটী আছে। ইতিমধ্যে চীনে ৯টি মার্কিণ বিমান-ঘাঁটী জাপ করায়ত্ত হইয়াছে। এই ঘাঁটাটিও তাহাদের কবলগত হইলে জাপান ব্রহ্মপথ ধরিয়া উত্তর পথে চুংকিংএর দিকে অগ্রসর হইবে এবং কুনমিং ও পিচিয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চীনে মার্কিণ রসদ সরবরাহের বিকল্প পথও রুদ্ধ করিবে।

চীনকে এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিত্রশক্তি ব্রহ্মের উপর প্রবল আক্রমণ করিতেছে। জাপান চীন লইয়া ব্যস্ত, ওদিকে মিত্রপক্ষ ব্রহ্মদেশে আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। শ্যাম, ইন্দোচীনে পুরাতন চীন-ব্রহ্মপথের সূত্র-স্থান লাশিও ও আরাকানে রীতিমত ভাবে তাহারা প্রহার করিতেছে। দক্ষিণ সুমাত্রায় জাপ পেট্রোল কারখানাগুলির উপর নৌ-বাহিনী হইতে আক্রমণ করা হইয়াছে। আমেরিকার ম্যানিলা জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার নূতন ধ্বনি—"চল টোকিও।"



সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতির "স্বাধীনতা দিবস" উৎসব, আর ভারতের ন্যায় প্রহার ও অনাহারক্লিষ্ট পরাধীন জাতির "স্বাধীনতা দিবস" অনাগত আশার স্মারক দিবস! এ দিন ব্যথিত জাতি আবার বলিয়াছে—চাই স্বাধীনতা; ভিক্ষায় নহে—দানে নহে—অর্জ্জনে অধিকারে। শোণিত শোষিত—সম্বল অপহৃত—অনাহারে, রোগে শোকে দেহ নির্জ্জীব! তবু চাই স্বাধীনতা—নিঃসর্ত্ত, অখণ্ড, পূর্ণ স্বাধীনতা! বাঁচিবার ও বাঁচিতে দিবার; ভোগের ও ভোগ করিতে দিবার, আহরণ ও অর্জ্জনের, রক্ষা ও আক্রমণের, ক্রন্দনের ও আনন্দের—দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিচারণের স্বাধীনতা!

পৌণে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জাতি দুঃসহ বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছে—এ মৃত্যু অসহ্য, আমার কি মুক্তি নাই—এ বন্ধনের কি শেষ নাই? পৌণে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এক মন্বন্তরে জাতি দলে দলে মরণ বরণ করিয়া ভবিষ্য জাতির মুক্তি কামনা করিয়া গিয়াছে। তাহার পর এক শত বৎসর গিয়াছে, বন্ধন শিথিল হয়



নাই, জাতির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আবার ডাকিয়াছেন—"আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?" কি জানি, বিধাতার কোন্ অভিশাপে জাতির মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। তবে যুব-ভারতের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। মাত্র প্রাণবলির সঙ্কল্প নহে, একাগ্র দেশপ্রেমে প্রবুদ্ধ হইয়া যুব-ভারত "আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরের" অত্যুগ্র সাধনায় ব্রতী হইল। পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। জাতি আবার বন্ধন-বেদনায় আর্ত্তনাদ করিল। ৫০ সালের মন্বন্তর আসিল। দলে দলে নর-নারী আবার কীট-পতঙ্গের মত মরিল। জননী চামুণ্ডা অনাহারে ক্ষুণ্ণ যুগ যুগ প্রহার-পীড়ন-বেদনাতুর সন্তানের কঙ্কাল-করোটি-ভূষিত হইয়া হুঙ্কার করিলেন—ময় ভুঁখা হুঁ! দেশের দিকে দিকে শ্মশান-মশানের নিভৃত কন্দর বনানী হইতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আবার নূতন জাতি "স্বাধীনতা দিবসে" মাতৃপূজার মন্ত্রোচ্চারণ করিল—বন্দে মাতরম্।

পরামর্শদান বৃথা

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার উইলিয়মস্ কলেজের Woodrow Wilson Professor of Government অধ্যাপক স্যাক্সন জাতিকে যে উপদেশ দিয়া পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—Freedom and Democracyর আওয়াজদারদের আমরা আবার তাহা শুনাইয়া দিতে চাই। অধ্যাপক শ্যুমান লিখিয়াছিলেন—"পশুবলে শাসিত ও বিপ্লব-বিদ্রোহে বিক্ষিপ্ত ভারত সর্ব্বজন-শত্রুর প্রতিভূস্বরূপ। ইংরেজ মার্কিণ সৈন্য ভারতকে রক্ষা করিতে পারিবে না কখনও। আজ আমেরিকার ঔদাসিন্যে কাল যদি ভারত আমরা হারাই, তাহা হইলে চীনের পরাধীনতা অবশ্যম্ভাবী; তাহা হইলে তাহাতে হইবে সমগ্র মধ্য-প্রাচী এক্সিস শক্তিবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া, তাহা হইলে রুশসৈন্যকে য়ুরালের পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইবে। ইহার ফলে বৃটেনের অদৃষ্টে আছে—শত্রুর অভিযান, আর আমেরিকার অদৃষ্টে—বিশ্ব যাহারা গ্রাস করিবে তাহাদের সহিত অবিরাম নিষ্ফল যুদ্ধ।

"বৃটিশ-কারাকক্ষে একটি ভারতবাসীও যদি আবদ্ধ থাকে, একটি ভারতবাসীও যদি বৃটিশ-বেত্রাঘাতে আর্ত্তনাদ করে, একটি ভারতবাসীও যদি বৃটিশ-বন্দুকের গুলীতে মরে, তাহা হইলে বিশ্বের কোটি কোটি অ-শ্বেত নর-নারীর নিকট সে হইবে দারুণ নৈরাশ্যের প্রতীক। এই সব মূক অপেক্ষমাণ নরনারী তখন বুঝিবে,—ভুল করিয়া হইলেও, এ সিদ্ধান্ত তাহারা করিয়া বসিবেই যে, পশ্চিমের সাদা লোকগুলি মুখে মিষ্ট, কাজে দুষ্ট। তাহারা বলিবে, প্রতিদ্বন্দ্বী পীড়ক জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে অ-শ্বেত জাতির করণীয় কিছুই নাই। তাহারা বলিবে, ডিমোক্রাটিক ধাপ্পাবাজীর অপেক্ষা এক্সিস ঔদ্ধত্য হয়ত তত অসহ্য নাও হইতে পারে।"

বৃটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠী ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত সমান অধিকার ও সম-স্বাধীনতা-সম্পন্ন মুক্ত ও স্বতন্ত্র ভারত যাহাতে বৃটিশ রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত সমরে—শান্তিতে সংযুক্ত রহিতে পারে, তজ্জন্য অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের প্রস্তাব করিয়া অধ্যাপক উপসংহারে বলিয়াছিলেন—"এ সুযোগ এড়াইলে পরাজয় বরণ করিতে হইবে। এ সুযোগ অবলম্বন করিলে বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে। বিশ্বের নরনারী বুঝিবে, মিত্ররাষ্ট্রবর্গ স্বাধীনতা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। আমরা যে বাঁচিয়া টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত, তাহার অগ্নি-পরীক্ষা আজ ভারতবর্ষে। এখানে পরাজয় হইলে পরাজয় সর্ব্বত্র। মাত্র এখানে সাফল্য হইলেই মার্কিণ রাষ্ট্রপতির এ বাণীর আন্তরিকতা প্রমাণিত হইবে—অতঃপর মানুষের অধিকার সম্বন্ধে মানুষকে নিশ্চিন্ত করিতে মিত্ররাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত আমাদের লোকবল যেমন আছে শক্তিও আছে তেমনই।"

সে সময় মার্কিণ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা বলেন, "মুক্তি-প্রিয় প্রত্যেক মার্কিণবাসী আশা করেন যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই গুরু সমস্যার কার্য্যকরী সমাধানে উপনীত হইবার জন্য মার্কিণ সরকার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন।"

কিন্তু সে চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আটলান্টিক চার্টারের বুদ্বুদ ফাটিবার পর, প্যাসিফিক চার্টার দেখা দিয়াছে; পরাধীন ভারতের আশঙ্কা, ইঙ্গ-মার্কিণ ধনিক, বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী

জাতি। ইহা দ্বারা ভারতকে মাত্র প্যাসিফাই করিয়া তাহাদের সমর-বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িতে বলিতেছে।

সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনা

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ জন সার্জ্জেণ্ট বলেন—"কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে, আদর্শ শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন তাহার লক্ষ্য নহে। ভারতবর্ষ যাহাতে শিক্ষা বিষয়ে মোটামুটি অন্যান্য দেশের সমান স্থানে উন্নীত হইতে পারে, তজ্জন্য নিম্নতম কার্য্য রচনাই এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার পর শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সেই জন্য যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ই প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া বোর্ডের নিকট দাবী জানাইয়াছি। ভারতকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে।—তাড়াতাড়ি এবং ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনাটি অনুসরণ করা যাইবে না, এ দেশে এইরূপ একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায়। অপর দেশে যাহা সম্ভব, এ দেশে তাহা সম্ভব নহে, এই ধারণা ভাবী উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর! ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারাই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে। শিক্ষা সকল শক্তি ও সকল কল্যাণের উৎস। কিন্তু ইহা যথার্থ শ্রেণীর না হইলে অকল্যাণের কারণ হইতে পারে। প্রগতির শক্তি সংগ্রহ হইলে চরম জয়ের পথে চলার সুযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী আসিবে, আধুনিক আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নিবিড় বাঁধনে বাঁধিতেছে। জাতীয় স্বাধীনতা ভাল জিনিষ, কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্যৎ যদি নির্ণীত হয়, তবে জাতীয় স্বাধীনতাও আসিবে।

আমি রাজনীতিবিদ্ নহি। তবে মনে-প্রাণে আমালতান্ত্রিক-নীতিও সমর্থন করি না। শাসননীতি যেরূপই হউক, উহা ভাল ভাবে প্রযুক্ত হইলেই ভাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তখন শিক্ষার বিষয়ে এ দেশ অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না।"

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের দু'-একটি বক্তব্য আছে। শিক্ষাপ্রণালী যদি দেশের আবহাওয়ার সহিত খাপ না খায়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বৃটিশরা ভারতের শিক্ষার জন্য কতটুকু করিয়াছে তাহা সুবিদিত। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার চেয়ে অধিক কিছু আশা করা যায় না। ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ। খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিলাতে যে ধরণে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, ভারতে তাহা মোটেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। সে দেশে শিক্ষার ব্যয় বহন করে সরকার, আর আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ব্যয়ভারই বহন করিতে হয় দরিদ্র দেশবাসীদের। রাশিয়াতেও গণশিক্ষার অভাব আমাদের দেশের মতই ছিল, কিন্তু তাহারা অতি শীঘ্রই তাহা দূর করিতে পারিল। কেন? কারণ তাহারা স্বাধীন জাত। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে শিক্ষার ভার।

শিক্ষায়, ব্যবসায়, বিজ্ঞানে, যে কোন পথে ভারতের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় গভর্ণমেণ্টের এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন। নচেৎ পরিকল্পনা কাগজেই মনোমুগ্ধকর হইবে, কার্য্যে তাহা হইতে কোন সুফলই ফলিবে না।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের মুক্তি

উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান-সচিব ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস ১৩ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় বহরমপুর (গঞ্জাম) জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মুক্তিতে সমগ্র ভারতবাসীই আনন্দিত। সাধারণতঃ জেল হইতে মুক্তিলাভের পর এমন সব নিয়ম-কানুনের বাঁধাবাঁধি থাকে যে, মুক্তির যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জেলের দ্বারদেশেই নূতন পরোয়ানা দেখাইয়া আবার জেলে ফিরাইয়া আনা হয়! আমাদের সৌভাগ্য যে, জেলের দ্বারে তাঁহাকে সেইরূপ কোন পরোয়ানা দেখান হয় নাই।

ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নতি

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যুদ্ধের পর যেরূপ অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক গণ্ডগোল চলিবে তাহাতে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ভারতের বর্ত্তমান দৈন্য ও অনগ্রসরতা দূর করিতে হইলে সর্ব্ব দিকে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া যুগোচিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হিলের ভারত-ভ্রমণ ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বৃটেন-সফর—মনে হয় তাহারই পূর্ব্বাভাস। হয়ত সময় লাগিবে, কিন্তু ভারতবাসীর ধৈর্য্যের অভাব নাই। এত বড় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্যের অভাব সবই তো সহ্য করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতের উন্নতি দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে।

হিল সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতিবিধান প্রচেষ্টার সদর ঘাঁটীরূপে বৃটেনে একটি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে এবং এই সমিতিই ভারতবর্ষস্থিত শাখা-সমিতিগুলিকে পরিচালিত করিবে। কৃষি, স্বাস্থ্য, যানবাহন প্রভৃতির বিস্তার, উন্নতি, নব নব কলকারখানা স্থাপন, এক কথায় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বিধানই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, এবং ফলও যে ভাল হইবে তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু! এই কিন্তু লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো না বদলাইলে এই প্রচেষ্টা যে কত দূর কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা শক্ত। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু সেই সম্পদ কাজে লাগাইবার হুকুম নাই। প্রথমেই ভারতের এই আদেশ-নিষেধের শৃঙ্খল দূর করিতে হইবে। দ্বিতীয়, ভারতের মূলধনে এবং সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর দ্বারাই ইহার পরিচালনা করিতে হইবে। তবেই সত্যকার উন্নতি ও কল্যাণের পথে ভারতের যাত্রা সার্থক হইবে, নচেৎ নহে। বৈজ্ঞানিক হিল সেইরূপ কোন আভাষ-ইঙ্গিত দেন নাই। অবশ্য বেসরকারী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এরূপ আভাষ দেওয়া সম্ভবও নয়। বৃটিশ বড়কর্ত্তারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্।

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহার কথা মনে পড়িয়া গেল। বৃটেন প্রবাসকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতের রাজনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত করিবার সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তৃত্ব

ভারতবাসীর হাতে না আসিলে সত্যকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি কোন মতেই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক ভারতবাসীরই এই মত।

কিন্তু আমাদের মতে তো আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, হয় বৃটিশ-কর্ত্তাদের মর্জ্জিতে।

দেশাই-লিয়াকৎ-ওয়াভেল আলোচনা

সুখবর 'গুজব' হইলেও মুখরোচক। ভারতবর্ষের অচল অবস্থার সমাধান হইবে। সত্য হউক, গুজব হউক, তবুও প্রাণে আনে আশা, আনন্দ। বহু বার এইরূপ খবর আমরা পাইয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, ঠকিয়াছি, তবুও সমাধান আসন্ন শুনিলে আনন্দিত হই, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। সম্প্রতি পঞ্জাবের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই, বড় জোর এক সপ্তাহ অথবা দশ দিনের মধ্যে ওয়াভেল-দেশাই মুলাকাতের ফলাফল জানিতে পারা যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানের মধ্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট বুঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে এবং বড়লাট উভয়ের সম্মত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা ও বিবেচনার ফলে না কি দেশে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুদূর-প্রসারী ফল ফলিবে। কি ফলিবে জানি না, তবে অনেক দূর যে গড়াইবে সে কথা জানি।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুক্তি

একটি প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি দিয়াছেন। গত আট মাস যাবৎ তিনি পেটের পীড়ায় ও অর্শরোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বহু পূর্ব্বেই খারাপ হইয়াছিল। স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি আরও পূর্ব্বে দিলেই যুক্তিযুক্ত কাজ হইত। এ যেন অনেকটা নিরুপায় হইয়া আপদ বিদায়ের মত মনে হইতেছে। একান্ত অসুস্থ বলিয়াই বোধ হয় বিনা সর্ত্তে মুক্তি!

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কারারুদ্ধ সদস্যদের মধ্যে এ যাবৎ শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষই কেবল মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

বোম্বাই পরিকল্পনা

মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত দেশগুলির সম্মুখে বর্ত্তমানে যে সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে তাহা—যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন ও সামাজিক পুনর্জীবনের সমস্যা। ভারতবর্ষের নিকট এই সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভবিষ্যতে ভারতের যে কোন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনার সহিত তাহার রাজনৈতিক সমস্যাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ আর্থিক পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে আমাদের তাহার পূর্ব্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন।

বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা এই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কি না আমরা জানি না, তবে এ সম্বন্ধে যে তাঁহারা তেমন উদ্বিগ্ন নহেন, তাহা তাঁহাদের কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারে "স্বাধীন" একটি জাতীয় সরকারের দাবীতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই যথেষ্ট হইবে, রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ কাম্য হইলেও তাহার আশু প্রয়োজনীয়তা তেমন নাই। আমাদের বিশ্বাস, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা কল্পনাবিলাস মাত্র।

বোম্বাই পরিকল্পনানুসারে—১৫ বৎসরের মধ্যে জাতীয় উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার জন্য সর্ব্বক্ষেত্রে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা মূলধন প্রযুক্ত করিতে হইবে। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বোম্বাই পরিকল্পনায় যন্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতুশিল্প প্রভৃতি বনিয়াদী ও গুরুশিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। বনিয়াদী ও গুরু-শিল্পের প্রসার ব্যতীত জাতীয় শিল্পায়ন কখনই সম্ভব নহে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এই বনিয়াদী শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে কোন প্রকার সহায়তা করেন নাই, পদে পদে আমাদের দেশীয় শিল্প-নায়কদের যাবতীয় প্রচেষ্টায় তাঁহারা প্রচণ্ড বাধা দিয়াছেন। এমন কি এই যুদ্ধের মধ্যেও, যখন ভারতবর্ষের যুদ্ধের প্রয়োজনেই এই সকল গুরু-শিল্পের প্রসার একান্ত ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাঁহারা যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইবার অজুহাতে ভারতীয় শিল্পনেতাদের এই কার্য্যে বাধা দিয়াছেন। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের "অটোমোবাইল শিল্প" প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাদের বনিয়াদী শিল্প-প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা প্রশংসনীয় হইলেও রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ ব্যতীত তাঁহারা আদৌ এই ইচ্ছা পূরণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা গুরু-শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেও এই সকল শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইবে কি না তাহা তাঁহারা এড়াইয়া গিয়াছেন। অথচ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার পরিকল্পনার কথা উঠিলে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দায়িত্বের কথা এড়াইয়া যাওয়া অর্থহীন। অর্থনীতির যে কোন ছাত্রই জানেন, বনিয়াদী ও গুরু-শিল্প রাষ্ট্রীকরণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হইবে।

কংগ্রেসের "জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী" যাহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা তাহা নির্ব্বিঘ্নে এড়াইয়া গিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

ইহা ব্যতীত বোম্বাই পরিকল্পনার প্রথম ভাগে বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই। সেই মারাত্মক ত্রুটি সম্প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগে খণ্ডন করা হইলেও বণ্টন-ব্যবস্থার যে পরি-কল্পনা করা হইয়াছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় একটি নিম্নতম ন্যায্য মান থাকিবে এ কথা বলা হইয়াছে, অথচ প্রত্যেক সুস্থ ও সবল ব্যক্তির কাজ করিবার অধিকার বা নিম্নতম ন্যায্য পারিশ্রমিক ও বেতনের দাবী তাঁহারা কোথাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য ও ভাবপ্রবণতার আশা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যে সমাজে প্রত্যেক সুস্থ, সবল ও যোগ্য ব্যক্তির কাজ করিবার বা পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই, সে সমাজের কোন পরিকল্পনার প্রতিই জনসাধারণের শ্রদ্ধা

ক্ষেমেন্দ্র সেন এবং কেশব ঘোষ, 'সংহতি' পত্রিকার সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, 'বিশ্ব-উড়িয়ার' মধুসূদন মহাপাত্র, বারাণসীর কমলাপতি ত্রিপাঠী, 'অর্জ্জুন' পত্রিকার পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্ম্মা ও মিঃ জয়ন্ত—ইঁহাদের স্বাস্থ্যের ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। জেলে তাঁহাদিগকে যে সকল ডাক্তারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা অবস্থার অবনতি নিবারণ হয় নাই, এই জন্য সম্মেলন তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

যে সকল সাংবাদিক বিনা বিচারে আবদ্ধ আছেন, সম্মেলন তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন।

মিঃ দেবদাস গান্ধী প্রস্তাব করেন এবং এস এন ভাটনগর সমর্থন করেন।

(৬) নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি সংবাদপত্র সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কারণ না ঘটিলেও গবর্ণমেণ্ট অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত উক্ত অর্থ জমা রাখিয়াছেন। নূতন যে সমস্ত সংবাদপত্রের নিকট হইতে জামানত তলব করা হয়, তৎসম্পর্কে আইনে এইরূপ বিধান আছে যে, যদি তিন মাসের মধ্যে উহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তাহা হইলে উহাদিগকে জামানতের টাকা প্রত্যর্পণ করা যায়। সম্মেলন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, পুরাতন সংবাদপত্র সম্পর্কেও জামানত সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হউক।

শ্রীযুত সি আর শ্রীনিবাসন উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং স্যার ফ্রান্সিস লো উহা সমর্থন করেন।

(৭) 'ন্যাশনাল হেরাল্ডের' পুনঃপ্রকাশের অনুমতি গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করায় সম্মেলন গবর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্যের নিন্দা করিতেছে এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে উক্ত পত্রের পুনঃপ্রকাশ যাহাতে সম্ভবপর হয় তদ্বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিতেছে।

সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রণোদিত বিষয়ের অবতারণার নিন্দা করিয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবগুলিকে যদি কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে দেশের ও সংবাদপত্রের যে অনেক উপকার হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাংবাদিকগণের বেতনের হার বৃদ্ধির জন্য যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং প্রাদেশিক ভাষার সংবাদপত্রের সহিত ইংরেজী সংবাদপত্রের কর্ম্মীদের বেতনের যে পার্থক্যের বিরুদ্ধে ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহার কি মীমাংসা হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। যাঁহারা জাতীয় সংবাদপত্রের কল্যাণ ও প্রসার কামনা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত কি কারণে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সাংবাদিক কর্ম্মীদের প্রতি উদাসীন হইলেন আমরা সামান্য বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রাজভাষার সংবাদপত্রের মর্য্যাদা কি বেশী? ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে কি ইংরেজী ভাষাই জনভাষা ও জাতীয় ভাষা হইবে, না হিন্দী, গুজরাটী, বাঙ্গালা, তামিল প্রভৃতি ভাষাই জনসাধারণের ভাষা ও জাতীয় ভাষা হইবে? যদি ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা না হয়, তাহা হইলে জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্রের উন্নতির জন্য বেশী সচেতন হওয়া উচিত নহে কি?

অধ্যাপিকার কৃতিত্ব

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা অসীমা মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডি, এস, সি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি, এস, সি। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, কে, দত্ত, মহাশয়ের কন্যা কুমারী গীতা দত্ত এ বৎসর ইণ্টার-মিডিয়েট আর্টস্ পরীক্ষায় সংস্কৃত বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে



প্রথম স্থান অধিকার করায় মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়াছেন। আমরা এই কৃতী ছাত্রীর দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

বিচিত্রার পরিচালক-সম্পাদক, প্রেসিডেন্সী ও রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ সুশীলচন্দ্র মিত্র মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এক জন প্রতিভাশালী অধ্যাপক ও সাহিত্যিক হারাইলাম।

সুপরিচিত শিশু-সাহিত্যিক সুবিনয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। কত গল্প, কত প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বালক-বালিকাদের একই সঙ্গে হাসি ও জ্ঞানের খোরাক জোগাইয়াছেন। স্বনামখ্যাত সুকুমার রায়চৌধুরীর ভ্রাতা, সুবিনয় রায়চৌধুরী সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার পারিবারিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সচিত্র
মাসিক বসুমতী
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
২৩শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৫১ | ৫ম সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমার মত কতকটা তোমাদের বল্‌তে চেষ্টা করব। এ কথা আমি স্বীকার করি যে, যুগে যুগে নতুন ক'রে ধর্ম্মোন্মাদনা আসে। শিক্ষিত জগতে আজ তেমনি এক উন্মাদনা এসেছে। প্রত্যেক যুগেই ধর্ম্মজাগরণে অসংখ্য বুদ্‌বুদ জাগে। বুদ্‌বুদগুলো দেখতে একই রকমের। এদের পেছনের আকাঙ্ক্ষাও একই রকমের। এ যুগে যে ধর্ম্মভাব ভাবুকদের মধ্যে ক্রমে প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন চিন্তা-ঘূর্ণির উদ্দেশ্য এক—ভগবদ্দর্শন, তাঁকে দেখবার ও বুঝবার আকাঙ্ক্ষা। দেহগত, নীতিগত, ধর্ম্মগত এবং সর্ব্ববস্তু এক ক'রে দেখে অখণ্ড সত্তাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার একটা বাসনা যেন সবার মধ্যে জেগেছে। এ যুগের তাই সব আন্দোলন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অদ্বৈত বেদান্তের মহা দার্শনিক আদর্শের পথে চলেছে।

সর্ব্বদাই বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন চিন্তা-বুদ্‌বুদের মধ্যে সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী হয় মাত্র এক বুদ্‌বুদ। অন্য সব বুদ্‌বুদ জাগে এক মহাতরঙ্গের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিতে। এই তরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে সমাজে আনে প্লাবন।

যে সব দেশের কথা আমি জানি, ভারত, আমেরিকা বা ইংলণ্ড সব দেশেই দেখেছি, শত শত ভাবুকের মনে বিপ্লব এসেছে! ভারতে দ্বৈতবাদের অবসান হ'তে চলেছে, মাত্র অদ্বৈতবাদ এখানে করছে শক্তির প্রতিষ্ঠা। আমেরিকায় বহু আন্দোলন প্রবল হয়ে যাচ্ছে। এর সবগুলোতেই কম বেশী অদ্বৈত ভাব। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটিমাত্র অন্য সব-গুলোকে গ্রাস ক'রে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু এ কোন্‌ আন্দোলন?

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শক্তিমান্‌ই বেঁচে থাকে। এই বাঁচার উপযুক্ততা চরিত্র-প্রতিষ্ঠা ছাড়া কি ক'রে হয়? চিন্তাশীল জগতের ভাবী ধর্ম্ম যে হবে অদ্বৈত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। জীবনে যারা চরিত্রবলে শক্তিমান্‌ হবে তাদেরই হবে জয়। হয় ত দেরী হতে পারে, কিন্তু হবেই।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার এ কথা একটু বলি শোন। যখন ঠাকুর দেহ রাখলেন, তখন রইলাম কপর্দ্দকহীন অজ্ঞাত আমরা জন বারো যুবক! আমাদের বিরুদ্ধে তখন শক্তিমান্‌ বড় বড় কত প্রতিষ্ঠান। ওরা আমাদের উঠতেই মেরে ফেলবার কত না চেষ্টা করেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের একটা মস্ত সম্পদ দিয়ে গেছলেন—মাত্র কথা না ব'লে বাঁচার মতন ক'রে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় জীবন-মরণ সংগ্রাম করবার শক্তি। তাই আজ ভারত ঠাকুরকে চিনেছে, তাই ভারত আজ ঠাকুরকে ভক্তি করে! তাই আজ তাঁর শেখান সত্য দাবানলের মতন চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে তাঁর জন্মোৎসব করবার জন্য আমি একশ' জনকেও জুটিয়ে আনতে পারিনি। গত বছর ৫০ হাজার লোক এসে জমেছিল।

তোমার ঐ সংখ্যা, শক্তি, তোমার ঐ বিত্ত, বিদ্যা, বক্তৃতা কিছুই স্থায়ী হবে না, চাই পবিত্রতা, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, চাই অনুভূতি। প্রত্যেক দেশে আপন-শৃঙ্খলমুক্ত সিংহের মতন কেশরী-চিত্ত এমন মাত্র বারো জন ক'রে মানুষ জাগুক; জাগুক তেমন বীর—যারা তাঁর স্বাদ পেয়েছে, জাগুক গুটিকয়েক তেমন মানুষ—যাদের সমস্ত চিত্ত তাঁতে সমর্পিত হয়েছে; জাগুক তারা—যারা চায় না সম্পদ, চায় না শক্তি, চায় না যশ—দেখবে, এরাই বিশ্ব কম্পিত ক'রে তুলবে।

কৌশল ত' এই-ই! যোগদর্শনের স্রষ্টা পতঞ্জলি বলেছেন—মানুষ যখন অলৌকিক শক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তখনই তাতে হয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সে ভগবানের দর্শন পায়। সে স্বয়ং হয়ে যায় ভগবান্‌। আর আপনি ভগবান্‌ হয়ে সে অন্যকেও করতে চায় ভগবান্‌। এই কথাই আমি প্রচার করতে চাই। মতবাদের ব্যাখ্যা ঢের ঢের হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকে পুঁথি লিখছে, কিন্তু অভ্যাস অনুশীলন একটু কি হবে না!

সমিতি-সংগঠন এ সব আপনি আসবে। যেখানে হিংসার কিছু নাই, সেখানে হিংসা জাগবে কি ক'রে? অসংখ্য লোক আমাদের

ক্ষতি করতে চাইবে, কিন্তু ওতেই ত' প্রমাণ হবে যে, আমরা চলেছি সত্য পথে। লোকে যতই আমায় বাধা দিয়েছে, ততই আমার শক্তি ব্যক্ত হয়েছে। আমায় একমুঠো খাবার দেয়নি, খেদিয়ে দিয়েছে; কিন্তু তার পর দেখেছি, রাজা-রাজড়ারা আমাকে চর্ব্ব্য-চুষ্য খাইয়াছে, আমার পূজো করেছে! পুরুত ও সাধারণ সমভাবে আমায় তুচ্ছ করেছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ওদের সবারই ভাল হোক। ওরা আমারই আত্মা। ওরাই ত' আমায় সাহায্য করেছে। ওদের থেকে বাধা না পেলে আমার শক্তি উঁচু থেকে আরও উঁচুতে চড়তে পেত না।

এক মহা রহস্য আমি আবিষ্কার করেছি—ধর্ম্ম নিয়ে যারা ব'কে মরে, তাদের শঙ্কা করবার কিছু নেই। যারা সব বুঝেছে, তারাও কারু শত্রু নয়। বচনবাগীশ ব'কে মরুক। ওরা আর কি জানে! তারা নাম, যশ, কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মত্ত থাকুক। আমাদের অনুভূতি অর্জ্জন করতে হবে, ব্রহ্ম পেতে হবে, ব্রহ্ম হ'তে হবে, উঠে পড়ে লাগ। মরণ কবুল, সত্য ছেড় না। জন্ম জন্ম সত্য ভাস্বর হয়ে উঠুক তোমাতে। অন্যে কি বলে, তাতে মোটেই কান দিও না। তার পর জীবনভর চেষ্টায় একটিও—মাত্র একটিও বীর সংসারের শেকল ভেঙ্গে মুক্ত হ'তে হবে, তবে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ —হরি ওঁ!

আর এক কথা। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতকে আমি ভালবাসি। তবু প্রত্যহ আমার চোখ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমাদের কাছে ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকায় ফারাক নাই। মূর্খরা যাকে ভুল ক'রে বলে মানুষ—সেই ভগবানের দাসানুদাস, যে গোড়ায় জল ঢালে, সে কি আর গোটা গাছকেই জল দেয় না?

সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মূলে ঐ এক কথা—আমি আর আমার ভাই এক, অভিন্ন নাই। এই কথা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতির পক্ষে সত্য। প্রাচ্যবাসীর চেয়ে পাশ্চাত্যবাসী এ কথা শীগগির বুঝবে। প্রাচ্য ভাবসূত্র রচনা ক'রে আর গুটিকয়েক সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্ম দিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!

নাম, যশ চুলোয় যাক, অপরের উপর প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা দূর হোক। কায ক'রে যাও। কাম-ক্রোধ-লোভের তিন বাঁধন থেকে মুক্ত হও, দেখবে সত্য তোমার নিত্য সঙ্গী! *

প্রত্যেক জাতিরই আছে বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি। কেহ রাজনীতি, কেহ বা সমাজনীতি, কেহ বা অন্য অন্য পথে কায করে। আমাদের পথ ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মপথে ভিন্ন আমরা অন্য পথে চলতে পারি না।···

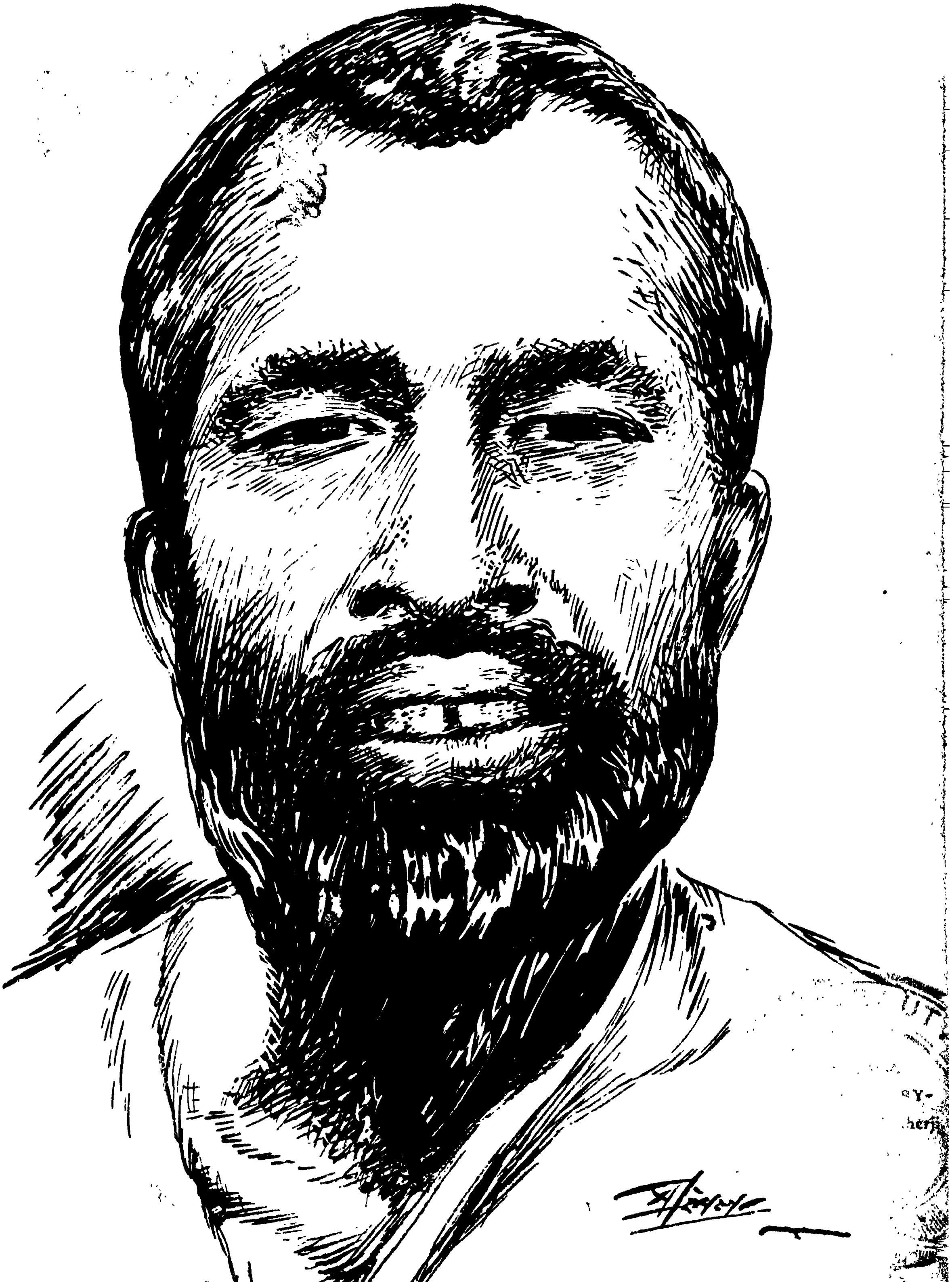
এই ধর্ম্ম হয়ে পড়েছিল বিপন্ন। মনে হয়েছিল, আমরা যেন জাতীয় জীবন হতে এই ধর্ম্ম ছেঁটে ফেলতে চাই, মনে হয়েছিল, আমাদের অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ফেলে দিয়ে তার স্থলে রাজনৈতিক মেরুদণ্ড বসাতে চাই। এটা সফল হলে আমরা পৃথিবী হতে লোপ পেয়ে যেতুম। আমাদের ধ্বংস নেই। তাই ধর্ম্ম হলেন স্বপ্রকাশ। এই মহাপুরুষকে কি চোখে তোমরা দেখবে না দেখবে, আমার তাতে কিছুই এসে যায় না, তাঁকে তোমরা কতটুকু শ্রদ্ধাভক্তি কর—তাতে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু পরিষ্কার এই কথা তোমাদের মুখের ওপর বলে যাই, অদ্ভুত শক্তির সর্ব্বোত্তম প্রকাশ—এমনটি ভারতে বহু শতাব্দী ধরে হয়নি। তোমাদের কর্ত্তব্য, এই শক্তির পরিচয় লওয়া, তোমাদের কর্ত্তব্য, খুঁজে দেখা ভারতের নব জাগরণ ও কল্যাণ এবং ভারতের যোগে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত তিনি কি করে গিয়েছেন!···

আমাদের শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হ'ল নিরাকার পুরুষ। ভগবানের কৃপায় এই আদর্শ অধিগত করবার মত উচ্চ আমরা হতে পারলে কথাই ছিল না। কিন্তু এটা যখন সকলের পক্ষে সম্ভব-পর নয়, তখন অগণিত নর-নারীর পক্ষে সাকার আদর্শই অপরিহার্য্য, জীবনের সাকার এইরূপ এক আদর্শের পতাকাতলে সাগ্রহে এসে যোগদান না করলে কোনও জাতি জাগতে পারে না, কোনও জাতি বড় হ'তে পারে না, কোনও জাতি বিন্দুমাত্র কায করতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শ এমন কি, সামাজিক বা বাণিজ্যিক আদর্শের কোনও ব্যক্তি ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমাদের সম্মুখে চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ, শক্তিমান্ ধর্ম্মগুরুদের ঘিরে আমরা পরম উৎসাহে সমবেত হতে চাই। আমাদের নেতাকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হতে' হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবকে সেই গুরুরূপে আমরা পেয়েছি। আমার কথা বিশ্বাস কর, এই জাতি যদি জাগতে চায়, তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে তাকে সাগ্রহে সমবেত হতে হবে···আর তিনি—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আমার জাতির কল্যাণের জন্য, আমার দেশের কল্যাণের জন্য, মনুষ্য-জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দিন আমরা চেষ্টা করি চাই না করি, অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এ দেশে আসবেই আসবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মহা পরিবর্ত্তনের জন্য তোমাদের অটল শক্তি প্রদান করুন, তোমাদের সত্য-মণ্ডিত করে তুলুন।

* জনৈক মার্কিণ শিষ্যের নিকট লিখিত পত্র হইতে অনূদিত।

"শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীতে যে একাগ্র ভগবৎ-প্রেম এবং ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইয়া যাইবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আর কোথাও এত দৃঢ়—এত সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি হইতে তাঁহার বিশ্বাস ও মতের পরম উচ্চাদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্ঞানের রহস্যলোকে তিনি কত গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, ভগবৎপ্রেমে কত গভীর ভাবে তিনি মগ্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার উপদেশগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই।"

—ম্যাক্সমুলার



জগন্নাথবল্লভ ও রায় রামানন্দ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে রায় রামানন্দ-কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটক সুপরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন, জগন্নাথ-বল্লভ তাহাদের অন্যতম—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে গায় শুনে পরম আনন্দ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য়

এই পংক্তি দুইটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর আস্বাদ্য কাব্য বা গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি সংস্কৃতে রচিত; বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ এবং রামানন্দ-প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটক। সমস্তই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধ, সে জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দুই কবির কোনও গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া শুধু কবির নাম উল্লেখ করিলেন। রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের নাম করা হয় নাই বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে, জগন্নাথ-বল্লভের আর একটি নাম রামানন্দ-সঙ্গীত নাটক।

শ্রীরামানন্দ রায়েণ কবিনা তত্তৎগুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-
নাম গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীতনাটকং নির্মায়···
—জগঃ-বঃ, ১ম অঙ্ক।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহার নাটক, তাঁহাকে লইয়াই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। এখানে 'রামানন্দ' বলিতে অবশ্য রায় রামানন্দকেই বুঝিতে হইবে। নীলাচল-লীলায় স্বরূপদামোদরের ন্যায় রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী ছিলেন।

এই নাটকখানি মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের সাক্ষাতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে নান্দী বা মঙ্গলাচরণে নূপুরশোভিত চরণ, নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আছে, শ্রীচৈতন্যের বন্দনা নাই। * গোদাবরীতটে উভয়ের মিলনে যে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, তাহাতে রামানন্দ গৌরাঙ্গময় হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঐ ঘটনার পর রামানন্দ রায়ের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা না করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

রামানন্দ রায় ছিলেন, গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে এক জন প্রধান রাজপুরুষ, তাঁহার রাজধানী ছিল বিদ্যানগর—বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী। ইঁহার পিতা ভবানন্দ রায় এক জন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, ভবানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন। মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, রায় ভবানন্দ যে রাজা ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। মৃণাল বাবু সম্ভবতঃ জগন্নাথ-বল্লভের "পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ রায়স্য" লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ভবানন্দ যে বিদ্যানগরের রাজা ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না।

রামানন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, রায় রামানন্দের ন্যায় তিনিও লীলারসিক বিদগ্ধজন ছিলেন। কবি তাঁহাকে "নিরুপম-কান্তি-লক্ষ্মী-লুব্ধ-লক্ষ্মীরমণাবস্থানোচিত চিত্তদুগ্ধাব্ধিনা বিভাবাদি পরিণত রস-রসালমুকুল-রসাস্বাদ-কোবিদপুংস্কোকিলেন শ্রীকণ্ঠ-হার সহচরগুণ মুক্তা-ফলমণ্ডিতহৃদয়েন" বলিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠহার অর্থাৎ (শ্রীরাধাকণ্ঠহারের যিনি সহচর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুণরূপ মুক্তাফলে ভূষিত হইয়াছে হৃদয় যাঁহার)।

তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, শ্রীচৈতন্য নীলাচলে গমন করিবার পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে কারণে লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভায় জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নীলাচলের বিখ্যাত স্বাধীন ভূপতি প্রতাপরুদ্রের রাজ-সভায় রায় রামানন্দ জগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে গজপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে পতিত হইয়া রাজধর্ম-পালনে উদাসীন হইয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবধর্মই তাঁহার পরাজয়ের কারণ। কিন্তু রায় রামানন্দ তাঁহার আশ্রয়দাতা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা ঐ ধারণার অনুকূল নহে।

গজপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজ পুরুষোত্তম দেবের পর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রামানন্দ তাঁহার প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গ্রথিত করিয়াছেন। যথা 'প্রতাপরুদ্রের' পরাক্রমে সেকন্দর (সেকন্দর লোদি ১৪৮৯-১৫১৭) ভীত হইয়া গিরিকন্দরে পলায়ন করিয়াছেন, কলবর্গ (গুলবর্গা) দেশের ভূপতি তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য আশঙ্কিত হইয়াছেন, গুর্জ্জরের (গুজরাটের) রাজা তাঁহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছেন এবং গৌড়-ভূপতি বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতের আরোহীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন।' এরূপ পরিচয় হইতে মনে হয় যে, তখনও বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটে নাই। কৃষ্ণদেব রায় শুধু যে উড়িষ্যাধিপকে পরাজিত করেন তাহা নহে, বিদ্যানগর দুর্গ ধ্বংস করেন। মাদলাপঞ্জী অনুসারে এই ঘটনা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে। তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বেই জগন্নাথবল্লভের রচনা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। রায় রামানন্দ নিজে এক জন রাজা ছিলেন,—কেহ কেহ বলেন, করদ রাজা ছিলেন,—কাজেই তাঁহার প্রশংসা গতানুগতিক প্রশস্তি-পাঠের ন্যায় না হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সময়ে বঙ্গে হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা কটক (প্রতাপরুদ্রের রাজধানী) পর্য্যন্ত গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভয়ে জগন্নাথের মূর্ত্তি চটক পর্ব্বতে লইয়া লুকানো হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপরুদ্র সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ত্বরান্বিত হইয়া ফিরিলেন এবং মুসলমানগণকে গড মান্দারণ পর্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। এই ঘটনার পরে জগন্নাথবল্লভ রচিত হইলে নিশ্চয়ই সে কথা নাট্যকার লিখিতে ভুলিতেন না। সেকন্দর লোদি এক জন ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের জন্য হিন্দু নরপতিগণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভাল চোখে দেখিতেন না। কাজেই তাঁহার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে হিন্দু লেখকের কলমে যোগ্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। গুলবর্গে বাহমণি রাজবংশের শেষ রাজা বিরাজ করিতেছিলেন;

---

* বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে, ঐ শ্লোকের চৈতন্যপক্ষে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, মুরারি অর্থে সুন্দর-গৌরসুন্দর (মুরকুৎ-সিত) See East Bengal Times, 25|5|1936

রাজ্যরক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। কারণ, কৃষ্ণদেব রায় মহাশয় এই রাজাকে পরাজিত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে এই জগন্নাথবল্লভ নাটক আস্বাদন করিতেন, তাহা মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এই নাটকখানির বৃত্তান্ত তিনি অবগত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। নীলাচলে আসিবার দুই মাস পরেই বৈশাখ মাসে প্রভু যখন দক্ষিণ ভ্রমণে গমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৭ম

এত দিন তাঁহাকে বুঝি নাই, তিনি বৈষ্ণব, ভক্তি-রসের অধিকারী, রসিক; ইহা লইয়া তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তোমার প্রসাদে বুঝিলাম যে, তিনি কত বড়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে বা শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী কালে বা সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিচার-প্রসঙ্গে কোনওখানে জগন্নাথবল্লভের নাম কেহ করেন নাই। ইহার কারণ কি? রায় রামানন্দের পক্ষে ইহা বৈষ্ণবোচিত বিনয় হইতে পারে। কিন্তু রূপগোস্বামী বা মহাপ্রভুও ত ইহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। মহাপ্রভুর যে এই নাটক ভাল লাগিত সে প্রমাণ ত আমরা পাইয়াছি। আরও প্রমাণ পাইতেছি যে, রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন:

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।—ঐ, মধ্য, ২য় পরি

অর্থাৎ কবি, ভক্ত, রসিক ও দার্শনিক রামানন্দ তাঁহার রাজ্য-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সখ্যে বশীভূত করিলেন। রায় রামানন্দের বৈরাগ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সনাতনেরই ন্যায় তাঁহার ত্যাগের মহিমা।

তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥

—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ১ম।

রূপগোস্বামীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠীর উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু এক জনের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা এবং অপরের অপূর্ব্ব রসানুভূতি প্রকাশ করিবার সুযোগ দিলেন। রস-প্রবীণ রামানন্দ প্রশ্ন-কর্ত্তা, রূপ উত্তরদাতা, মহাপ্রভু স্বয়ং বিচারক এবং অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস স্বরূপ গোস্বামী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসজ্ঞগণ শ্রোতা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ইষ্টগোষ্ঠীর বর্ণনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রশ্ন ও তাহার উত্তর উভয়ই সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য; উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টীকৃত না হইলে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। এই ইষ্টগোষ্ঠীর বিবরণ কতটা প্রকৃত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কবিরাজ গোস্বামীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই এই ব্যাপারে আমাদের অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ইষ্ট-গোষ্ঠীতে আমরা দুই জন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিকের যে পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিচয় পাইতেছি, তাহা সহজ সত্যের আভায় উজ্জ্বল। স্বরূপ দামোদর সভাস্থ লোকের সমক্ষে রূপগোস্বামীর বিখ্যাত নাটকদ্বয় বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধবের পরিচয় দিতেছেন; তাহার পূর্ব্বে এই নাটকদ্বয় অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রাম রায় তাঁহাকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন আর রূপগোস্বামী সবিনয়ে তাহার উত্তর দিতেছেন। যেখানে স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত, সেখানে রামানন্দ কেন প্রশ্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, ইহা প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ, রসের বিচারে জগন্নাথবল্লভ নাটক-রচয়িতা রাম রায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ইহা মহাপ্রভু নিশ্চয়ই জানিতেন এবং সভাস্থ সকলেরও যে ইহা অননু-মোদিত নহে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রূপগোস্বামীর উক্তিতে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে:

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥

—ঐ, অন্ত্য, ১ম

এই বিনয়-প্রকাশ শ্রীরূপের পক্ষে যে অত্যন্ত শোভন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের একমাত্র সমসাময়িক তুলনাস্থল বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। শ্রীকৃষ্ণলীলা লইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা নাটক নহে, কাব্য। রূপগোস্বামীর নাটকদ্বয় শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলায় উল্লিখিত হইলেও ললিতমাধব সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। বিদগ্ধমাধব সম্পূর্ণ হয় ১৫৩২ এবং ললিতমাধব ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে। সুতরাং জগন্নাথবল্লভ নাটক যে তাহার বহু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্ব্বেই যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যশঃ পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইমাত্র অনুমান করা যায়। জগন্নাথবল্লভে সূত্রধার বলিতেছেন যে, তিনি এমন একটি প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থাৎ যাহাতে অন্য কোনও পুরাতন প্রবন্ধের ছায়া না থাকে।

অভিনবকৃতিমচ্ছায়য়া নো নিবন্ধং···

ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রূপগোস্বামীর বিখ্যাত নাটকদ্বয়ের পূর্ব্বেই জগন্নাথ-বল্লভ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীরূপ ও রায় রামানন্দের কবিতার সমালোচনার স্থল ইহা নহে। তবে নান্দী শ্লোকে উভয়ে যে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভঙ্গী দেখিলে ইঁহাদের কবিতার ক্রম বুঝা যায়:

জগন্নাথ-বল্লভ :

ন ভবতু গুণগন্ধোঽপ্যত্র নাম প্রবন্ধে
মধুরিপুপদপদ্মোৎকীর্ত্তনং নস্তথাপি।
সহৃদয়হৃদয়ান্যানন্দসন্দোহহেতু-
র্নিয়তমিদমতোঽয়ং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ।

এই প্রবন্ধে গুণলেশও না থাকিতে পারে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্বন্ধে আমাদের এই কীর্ত্তন সহৃদয় ব্যক্তির প্রচুর হৃদয়ানন্দের কারণ হইবে, অতএব এই প্রয়াস কখনও নিষ্ফল হইবে না।

বিদগ্ধ-মাধবে যথা—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ-কলুষতাম্।

হে পণ্ডিতগণ! আমি স্বল্প-বুদ্ধি হইলেও আমার কবিতা আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে; কেন না, অতি নিকৃষ্ট পুলিন্দ বা শবর কর্ত্তৃক কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি কি কাঞ্চন-সমূহের অন্তর্মালিন্য বিনষ্ট করে না?

কবিত্বের দিক্ দিয়া তুলনা করিলে শ্রীরূপগোস্বামীকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। বস্তুতঃই রূপের তুলনা নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যে জগন্নাথ-বল্লভের কবি অপেক্ষা রূপগোস্বামী যে বহু গুণ অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে? তবে রূপগোস্বামীর উপর রায় রামানন্দের কাব্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। জগন্নাথ-বল্লভে রাধা পরকীয়া নায়িকা, * রূপগোস্বামীর নাটকেও তাহাই। বিদগ্ধমাধবে মুখরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "চঞ্চল! অভিমন্যোঃ সহধর্ম্মিণী পত্নী তব বন্দনীয়া।" শ্রীরাধা অভিমন্যুর পত্নী অতএব তোমার নমস্যা।

এই পরকীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে উভয়ের ঐকমত্য কি আকস্মিক? অথবা রামানন্দের প্রভাবের ফল? জগন্নাথবল্লভে ললিতা বিশাখা নাই, রাধার সখীর নাম মদনিকা শশিমুখী। মদনিকা এবং পৌর্ণমাসী উভয়েই বয়োজ্যেষ্ঠা এবং লীলার প্রধান প্রযোজনকর্ত্রী। জগন্নাথ-বল্লভের বিদূষক রতিকন্দল, রূপের নাটকে মধুমঙ্গলে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু গানের দিক্ দিয়া জগন্নাথবল্লভ যথেষ্ট জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে। জগন্নাথবল্লভ পঞ্চাঙ্ক নাটক, যথা—পূর্ব্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবপ্রকাশ, রাধাভিসার ও রাধাসঙ্গম। প্রথম অঙ্কে ৪টি করিয়া ১২টি, ৪র্থ অঙ্কে ৫টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ৪টি গান আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গান পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কীর্ত্তনের আসরেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা রাধা মধুর বিহারা; (অভিসার) (অভিসার); গোপকুমার সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং (রূপানুরাগ) ইত্যাদি।

এই গানের অনেকগুলিই জয়দেবের অনুকরণে রচিত। জয়দেবের প্রভাব কোনও বৈষ্ণব কবিই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জগন্নাথ-বল্লভের ন্যায় ক্ষুদ্র নাটকখানিতে বিংশত্যধিক গানের সমাবেশ দেখিলে জয়দেবের কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। তবে জয়দেব যেমন শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন, রামানন্দ সেরূপ করেন নাই। পঞ্চম অঙ্কে (রাধাসঙ্গম) মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার মদনিকার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে; তাহাও বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানন্দের ভাষায় জয়দেবের শব্দালঙ্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ

মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতি ভীষণং।
মন্দ মরুদন্তরগ গন্ধ কৃত দূষণং।

অথবা, রাধিকে পরিহর মাধবে রাগময়ে। ইত্যাদি পদ লওয়া যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের প্রভাব রাম রায়ের কাব্যে না থাকিবারই কথা; কারণ, চণ্ডীদাস বাঙালী কবি। তথাপি তাঁহার রাধাপ্রেমের আকুতি দেখিলে চণ্ডীদাসের কথা মনে না হইয়া পারে না। বিশেষ যখন তিনি বলিতেছেন:

তন্মন্যে বিরহে নবৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা।

চণ্ডীদাসের অমর চিত্র 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' অবশ্যই মনে পড়িবে। বিদ্যাপতির প্রভাবও রায় রামানন্দের উপর লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের পদটি

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।

নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত। রায় রামানন্দ গানে যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। তাঁহার গানগুলির জনপ্রিয়তার ইহাও একটি হেতু। আর এক জন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি সেই জন্যই তাঁহার সংস্কৃত গানগুলিকে বাংলা রূপ দিতে অনুপ্রেরিত হইয়াছিলেন! জগন্নাথবল্লভের শ্লোক ও সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া লোচনদাস ৪০টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদগুলি অতি সুললিত এবং স্থানে স্থানে কাব্যসৌন্দর্য্যে মূল কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লোচনদাসের পদেও ব্রজবুলি ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার ৪০টি পদের মধ্যে ১৩টি ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত।

রায় রামানন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার সংলাপে, যেখানে তিনি মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সাধ্যের স্থাপন করিতেছেন। অদ্যাপি এই সাধ্যসাধনতত্ত্ব বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ এই প্রসিদ্ধ সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিচারের ন্যায় প্রেমধর্ম্মব্যাখ্যা আর কোথায়ও দেখা যায় না। রায় রামানন্দ ছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-জ্ঞানের সীমা।' কাজেই তাঁহার এই তত্ত্বব্যাখ্যা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নির্যাস বলিয়া আদৃত হইয়াছে।

এই সুপরিচিত সাধ্য-বিচারের মধ্যে মাত্র দুইটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। প্রথমতঃ, কান্তা-ভাবের ভজন এই প্রথম স্পষ্টভাবে অঙ্গীকৃত হইল। ভগবান যে প্রিয়তম এ কথা বৃহদারণ্যক এবং নারায়ণীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ব্রজে গোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণকান্তরূপে ভজনা করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভক্তিধর্ম্মের

---

* দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবং।
জঃ বঃ নাটক, ২য় অঙ্ক।

ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল তাহাতে মধুর বা উজ্জ্বল রসের স্থান স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য যে ভক্তি সাধনা প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহাকে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' বলা হইয়াছে। তিনি যে মধুর রস-সমন্বিত ভক্তির প্রবর্ত্তক ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে তাহার প্রেরণা এই দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে আসিয়াছিল ইহা না মানিয়া উপায় নাই।*

দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি পদ গান করেন :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি। ইত্যাদি

এই পদটির ব্যাখ্যায় অনেক কথক এবং জনৈক সুধী সমালোচক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, 'না সো রমণ' ইত্যাদির দ্বারা বিপরীত বিহারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রায় রামানন্দ এখানে কান্তা-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া এমন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থার আভাস দিতেছেন, যেখানে কান্ত ও কান্তা, নায়ক ও নায়িকা, ভক্ত ও ভগবান একাত্ম হইয়া যান ; কোনও রূপ ভেদ থাকে না, ইহাই কান্তা প্রেমের চরম পরিণতি।†

বৈষ্ণবদের এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক অপূর্ব্ব বস্তু! রায় রামানন্দ যেরূপ ভয়ে ভয়ে ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, প্রেমের এই অভেদতত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ় এবং রহস্যমণ্ডিত মর্ম্মকথা। কান্তা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বক্তা মনে করিলেন যে, এ প্রসঙ্গের ইহাই চরম হইল। কিন্তু

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার।
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।

সন্দেহে দোলায়িত রায় রামানন্দ ইহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজকৃত এক পদ গাহিলেন : 'পহিল হি র্যাগ নয়নভঙ্গ ভেল।' এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রশ্ন নিরস্ত হইয়া গেল। তিনি উদ্যত-ফণা অজগরের ন্যায় দুলিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে—

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' অর্থে এখানে এমন একটি অবস্থার ইঙ্গিত করা হইতেছে তত্ত্ব হিসাবে যাহার উপরে আর নাই। 'বিবর্ত্ত' অর্থে ভ্রম, অর্থাৎ যেমন শুক্তিতে মুক্তাভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রেমের জগতে ভেদ ভ্রম, অভেদই সত্য। অর্থাৎ প্রেমবিলাসে যে দ্বৈতত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাথমিক। প্রেমের পরাকাষ্ঠা হয় তখন, যখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের আর কোনও ভেদ থাকে না।

চণ্ডীদাসের কবিতায় ইহার আভাস আছে :

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

এই অভেদতত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে রসরাজ মহাভাবের একত্বে। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' (চৈঃ চঃ) এই রসরাজ মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ রায় রামানন্দের সম্মুখে বিরাজমান। অর্থাৎ রামানন্দ সর্ব্বশেষে যখন রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে গৌরাঙ্গতত্ত্বে আসিয়া পড়িলেন, তখন মহাপ্রভু স্বহস্তে প্রেমে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। এই

ব্যধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা
প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপ্যধত্ত।
—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং, ৭ম অঙ্ক

কবিকর্ণপূর বিপ্রের মুখ দিয়া এই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলাইয়াছেন কিন্তু এই তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। এখানে কবিকর্ণপূর ইহাকে চাপা দিয়াছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* অধুনালুপ্ত 'উদয়ন' পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৩৪১) বাংলার প্রেমধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ উদয়নে (পৌষ, ১৩৪১) তাহার প্রতিবাদ করেন ; আমার প্রত্যুক্তি (বসুমতী বৈশাখ, ১৩৪২) দ্রষ্টব্য।

† প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে (আষাঢ় ১৩৪৪) আমি যে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ যে প্রত্যুত্তর (ভাদ্র, ১৩৪৪) দিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারদের উত্তর পাইলাম না, কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম :

"যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়,—অনন্ত যশ।
বিক্রেতা,—কাল।
মূল্য,—জীবন।
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"—বঙ্কিমচন্দ্র



আশাপূর্ণা দেবী

গাড়ীর ঝাঁকুনী খাওয়ার মধ্যে হাসির কি থাকিতে পারে, এ কথা অশোকের বুদ্ধির অগম্য। বারে বারে গাড়ীর ধাক্কার সঙ্গে মণিকার উচ্ছ্বসিত হাসির ধাক্কায় সহসা এক সময় বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠে—খুব আরাম হচ্ছে বুঝি? উঃ, আমার তো হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেল, শেষ পর্য্যন্ত তোমার সাধুবাবার কাছে বোধ হয় দেহমুক্ত আত্মাটুকুই গিয়ে পৌঁছবে, বেছে বেছে আশ্রম করেছেন ভালো জায়গায়।

মণিকা এলোমেলো অবাধ্য চুলগুলা সামলাইয়া প্রায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলে—কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায়? গাড়ীর ঝাঁকুনী ভালো লাগে না তোমার? আমার কিন্তু খুউ-ব ভালো লাগে, বড়ো হয়ে পর্য্যন্ত নাগর-দোলায় চড়তে পাইনে তো

অশোক বাঁকা কটাক্ষে একটু দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসিয়া কহিল—পাও না বুঝি? যাক, খেদটা মিটলো তাহলে? এই এই···ঈস্—

আবার একটা প্রবল ঝাঁকুনীর সঙ্গে সঙ্গে মণিকা হাসিয়া একেবারে অশোকের কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল।

—আঃ, কি হচ্ছে? মগনলালটা মনে করবে কি?

অশোক বিব্রত ভাবে পত্নীকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল।

স্বামীর বিরক্তি গায়ে না মাখিয়া মণিকা আবদেরে খুকীর মত গা এলাইয়া দেয়।

—বাঃ, ও বুঝি দেখতে পাচ্ছে? মাথার পিছনে চোখ আছে না কি ওর?

—চোখ না থাক, অনুভূতি বলে একটা জিনিষ আছে তো?

—'খোট্টার আবার অনুভূতি! আমার খুসি আমি হাসবো, যত ইচ্ছে হাসবো, কি করবে শুনি?

নিরুপায় ভাবে অশোকও হাসিয়া ফেলে। সত্যই মণিকাকে আঁটিয়া উঠা দায়, সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হইল ছেলেমানুষী ঘুচিল না। তবু ভালও লাগে বৈ কি, মণিকার হাসি গান দুষ্টুমী দুরন্তপনা মান অভিমানে দীর্ঘ দিন-রাত্রি ভরাট হইয়া আছে, নিঃসন্তান জীবনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করিবার অবসর অল্পই ঘটে।

অশোকের বাড়ীটা তো বন্ধুবান্ধব আত্মীয়বর্গের আড্ডা বসাইবার একটা কেন্দ্রবিশেষ। টেলিফোনের বেল বাজিয়াই আছে। গাড়ীখানা গৃহসুখ ভুলিয়া হামেসাই এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী টানাপড়েন করিতে ব্যস্ত। অতিথি-সৎকারের বিপুল আয়োজন সর্ব্বদাই ঘরে মজুত, পৌষ পার্ব্বণেই হোক বা পয়লা জানুয়ারীতেই হোক, উৎসবের আগ্রহ মণিকার সমান।

এক কথায় অশোকের সংসারটা 'সংসার-চক্র' নয়, সংসার-যন্ত্র, গুণীর হাতের মিঠা সুরে বাজিতে থাকে এবং অশোকের উপার্জ্জনের প্রাচুর্য্য কখনো তালভঙ্গ হইতে দেয় না।

সাধুবাবাকে দেখিতে যাওয়াও অবশ্য মণিকার দশটা খেয়ালের একটা খেয়াল মাত্র, তবে একলা মণিকাই নয়—সাধুবাবার আবির্ভাব এই ছোট সহরটিতে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাঁহার আশ্রমে। হোমরা-চোমরা সরকারী চাকুরে হইতে সুরু করিয়া কেতাদুরস্ত আধা সাহেব-মেমরা পর্য্যন্ত 'দোহাত্তা' লোক দীক্ষা লইতে সুরু করিয়াছে।

অশোকরা অবশ্য এখানকার বাসিন্দা নয়, বেড়াইতে আসিয়াছে মাত্র। তবু দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিতে দোষ কি?···আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়া পড়ায় অশোক তাড়া দিয়া বলিল—সুস্থির হয়ে বোসো এইবার, গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নাও, চলেছ সাধুদর্শনে—কোথায় একটু গম্ভীর হবে তা নয় খালি হাসি-ঠাট্টা। কোন কালে আর বড়ো হবে না তুমি।

—বেশ বেশ, খুব কসে গম্ভীর হচ্ছি—বলিয়া গাম্ভীর্য্যের অনুকরণে দুই গাল ফুলাইয়া ভারিক্কি চালে বসিয়া থাকে মণিকা।

—হোপ্‌লেস। এই মগনলাল, রোখো রোখো—

আশ্রমের সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের দুই ধারের যানবাহনের সারি তাহার সাক্ষ্য। গোযান হইতে সুরু করিয়া রিক্শা, সাইকেল, হাওয়াগাড়ী কোনোটাই কম নয়।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিল ধরিবার ঠাঁই নাই। 'বাবা' একখানি 'ভক্ত-দত্ত' পুরু কার্পেটের উপর বসিয়া অভয় দৃষ্টি ও স্মিতহাস্য দান করিতেছেন। ডান দিকে পুরুষদিগের ও বাঁ দিকে মেয়েদের স্থান।

সেই বিরাট্ নারীমণ্ডলীর ভিতর মণিকাকে ছাড়িয়া দিয়া অশোক গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া একটির পর একটি সিগারেট ধ্বংস করিতে থাকে। অবশ্য নিতান্ত নাস্তিক সে নয়, কিন্তু পরিচিত অপরিচিত এত লোকের মাঝখানে গদ্গদ চিত্তে 'বাবা' বলিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িতে তাহার রুচিতে বাধে।

বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে থাকে, লোকে এত মুগ্ধ হয় কেমন করিয়া? ভক্তি কি সত্যই এত তাড়াতাড়ি গজায়?

অশিক্ষিত লোকের মূঢ়তার তবু মানে বোঝা যায়, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই ইচ্ছাকৃত মূঢ়তার মানে বোঝা ভার। খোঁয়াড়ের গরু-ভেড়ার মত দীক্ষার শেষে শিষ্যের খাতায় নম্বর দিয়া যাহাদের নাম দাগিয়া রাখা হয় মাত্র, পারমার্থিক উন্নতি তাহাদের কতটুকু হয়? কতটুকু হওয়া সম্ভব? গুরুর দায়িত্ব কি এতই লঘু?

সত্য কথা বলিতে কি, এই লোকারণ্য দেখিয়াই অশোকের অশ্রদ্ধা আসে।

অজস্র নরনারী আসিতেছে—চলিয়া যাইতেছে—ইহারই মাঝখানে হঠাৎ এক সময় মণিকাকে রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গীতে ধীর মন্থর পায়ে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া অশোকের চমক ভাঙ্গে, ব্যস্ত ভাবে নিজেও উঠিয়া পড়িয়া বলে—কি ব্যাপার, এ হতভাগ্যকে ফেলেই চলে যাচ্ছিলে না কি? আধ ঘণ্টার মধ্যেই এত দূর তত্ত্বজ্ঞান? 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?'

মণিকা উত্তর দেয় না, থমথমে মুখে বাহিরের পানে চাহিয়া থাকে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে···অশোক মণিকার ভাবান্তর অতটা লক্ষ্য করে না, বেশ রসালো ভাষায় আশ্রমতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেট ধরাইয়া বলে—তার পর কত দূর কি জ্ঞান সঞ্চার হ'ল? কথা নেই কেন? হ'ল কি তোমার? মুখখানা যে একেবারে আষাঢ়স্য প্রথমদিবস করে তুলেছ? কেউ কিছু বলেছে না কি?

—ওখানে কেউ কিছু বলতে আসে না—মণিকা ঝাঁজিয়া উঠে—বাবাকে একবার প্রণাম পর্য্যন্ত করতে যাওয়া হ'ল না কেন শুনতে পাইনে? মানের হানি হ'ত?

অশোক ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলে—কথাটা কি জান, অত লোকের মাঝখানে আমার কেমন কিছু আসে না।

—ও কথার কোন মানে হয় না। আসল কথা তোমার অহঙ্কার।

অশোক বিস্মিত ভাবে বলে—তুমি কি আমাকে হঠাৎ নতুন দেখলে মণিকা?

মণিকা উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অশোক আবার কথা তুলিবার চেষ্টা করে—আচ্ছা তোমার তা'তে রাগ কেন? বেশ, না হয় আর এক দিন এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে যাবো।

—থাক, অত দয়া না করলেও চলবে, তোমার প্রণাম না পেয়েও বাবার দিন আটকাবে না।

মণিকার মেজাজের ওজনটা ঠিক বুঝিয়া উঠা আপাততঃ সম্ভব নয় দেখিয়া অশোক চুপ করিয়া যায়।

উঁচু-নীচু পাথুরে রাস্তায় ধাক্কা খাইতে খাইতে গাড়ী আপন পথে চলে।

দুইটি যাত্রী নীরবে দুই দিকে চাহিয়া থাকে।

রাত্রে শুইবার আগে মণিকা গম্ভীর ভাবে বলিল—আসছে পূর্ণিমায় আমি দীক্ষা নেব।

—ভালো কথা—বলিয়া অশোক বালিশটা উল্টাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

ওদের সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে বোধ করি এমন ঘটনা বিরল। ঘুমাইবার পূর্ব্বে মণিকা ভাবিল,—শুভক্ষণে বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম, প্রথম দর্শনেই তাঁহার কৃপা লাভ করিলাম···অশোক ভাবিল··· কুক্ষণে আজ বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম, সাধ করিয়া শনিগ্রহ জুটাইলাম।

রাত্রি কাটিয়া দিনের আলো ফুটিল নীরবে, মণিকা কলহাস্যে অশোকের বেলায় ওঠা সম্বন্ধে বাছা বাছা মন্তব্য প্রয়োগ করিয়া ঘুম ভাঙাইতে আসিল না, স্নানের পর পাশের ঘরে দুয়ার দিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কি যে করিল সেই জানে।

অশোক উঠিয়া বসিয়া মণিকার এই আকস্মিক খেয়ালটা দূর করিবার চিন্তা করিতে লাগিল।

পাশেই মণিকার বালিশটা পড়িয়া আছে···সুগন্ধি কেশতৈলের মৃদু সৌরভ জড়াইয়া আছে, হঠাৎ চোখে পড়িল সরু একটু কালো ছাপ ···মণিকার চোখের কাজল। ঘুমের ঘোরে—অসাবধানে বালিশে লাগিয়া গিয়াছে। শুধু ঘুমের ঘোরে নয়, মণিকা জাগিয়াও অসাবধানী, এই তো—গত কালই বেশ-ভূষা করিয়া বাহির হইবার সময় মণিকার ছেলেমানুষী কাণ্ডে অশোক বিব্রত হইয়া বলিয়াছিল,—ছিঃ ছিঃ, করলে কি? ফর্সা পাঞ্জাবীটায় দিলে কাজল লাগিয়ে? এখন উপায়?

—উপায়—নিরুপায়। ফর্সা পাঞ্জাবী পরে বড্ড বাবু সাজা হয়েছে—

—না, সত্যি ভারী অন্যায়, তোমার ও-সব কাজল-ফাজল পরা ছাড়ো এবার।

—ঈস্—কেন শুনি? মণিকা ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে উত্তর করিয়াছিল,—নিজে বুড়ো হচ্ছেন বলে আমাকেও বুড়ি বানাতে চান।

—কিন্তু মণিকা, কাজল তুমি কেনই বা পরো? এত চমৎকার টানা-টানা চোখ তোমার—'

নিজস্ব ধরণে গ্রীবা দুলাইয়া উত্তরটা দিয়াছিল মণিকা আরো চমৎকার···বলিয়াছিল—চোখ টানা দেখাবার জন্যে নয় মশাই, ওটা তোমাদের মন টেনে রাখবার রাশ, কাজল নয়—মায়া-কাজল, পুরুষকে বশ করবার যাদুমন্ত্র।

হঠাৎ সে মন্ত্রের প্রয়োজন ফুরাইল না কি মণিকার?

চা আনিয়া দিল ভৃত্য, আহারের সময় কেবল মাত্র বামুণ ঠাকুরের রূঢ় উপস্থিতি সহ্য করিয়া নীরবে আহার্য্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতে হইল, মণিকার পাত্তা নাই।

অধৈর্য্য অশোক বামুণ ঠাকুরকেই প্রশ্ন করিয়া বসিল—তোদের মা'র খাওয়া হয়ে গেছে?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক নয়, মণিকা আগে ভাগে খাইয়া বসিয়া আছে এমন মনে করিবার হেতু নাই, কিন্তু বামুণ ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করিবার মত এর চাইতে ভালো কোন প্রসঙ্গ অশোকের মাথায় আসিল না।

কিন্তু ঠাকুরের উত্তরটা আশাতীত।

—মা তো আজ খাবেন না বাবু, 'সঙ্কল্প'র উপোস।

বন্ধ্যা মণিকার বারব্রতের বালাই ছিল না বলিলেই চলে—তা ছাড়া সঙ্কল্পের উপবাসটা কি বস্তু অশোক ঠাহর করিতে পারে না—সবিস্ময় প্রশ্ন করে—কিসের উপোস?

—আজ্ঞে 'সঙ্কল্পর'। সাধুবাবা বলেন—মন্তর নেবার আগে এক দিন উপোস করে শরীর শুদ্ধ করতে হয়—এখানকার সকল লোকই ওই করছে দেখছি—বড় হুজুগে দেশ বাবু! আমাদের কলকেতার কোন বালাই নেই—দেশসুদ্ধ লোক এত নাচানাচি করতে জানে না।

বলা বাহুল্য, কথাটা অশোকের কাণে ঠিক মধুবর্ষণ করিল না। দেশসুদ্ধ লোক নাচানাচি করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু মণিকা হঠাৎ নাচিতে সুরু করিবে—এ কেমন কথা?

খেয়ালী মণিকার বোধ করি এ এক নূতন খেয়াল, কিন্তু অশোক একবার সত্যকার নিষেধ করিলে নিবৃত্ত হইবে না? প্রশ্রয় দেয়

অশোক শুষ্ক স্বরে কহিল—অত টাকা এখন কোথায় পাবো ?

—আহা, কতই যেন টাকা ? ইচ্ছে করলে যেন দিতে পারো না ?

—না তা' পারিনে, তা ছাড়া সে ইচ্ছে আমি করবো কেন ?

—বা রে, আমি লোকের কাছে অপদস্থ হই তাই ভালো ?

—ভালো হয়তো নয়, কিন্তু নিজের ওজন না বুঝে যা হয় কিছু করে বসলে অপদস্থ তো হতেই হবে মণিকা।

—হাজার পাঁচ-ছয় টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই—তা বুঝতে পারিনি—গম্ভীর ভাবে উঠিয়া দাঁড়ায় মণিকা—আমার জড়োয়া গহনাগুলো বেচলে এ টাকাটা উঠতে পারে বোধ হয় ?

—হয়তো পারে—বলতো ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে দেব কাল।

অশোকের মমতাহীন নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে মণিকার অভিমান উদ্বেল হইয়া দুই চোখে জল ভরিয়া আসে। গহনা বিক্রীর প্রস্তাবটাও এমনি অবলীলাক্রমে স্বীকার করিয়া লইল অশোক ?

কত সাধে কত বাছাই করিয়া এক দিন নিজের হাতে যেগুলি কিনিয়া দিয়াছিল ?

সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা আঁকা টানা টানা কালো চোখের কোল বহিয়া ঝরঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

গেরুয়া ও কাজল !

তেমনি সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে অশোকের ঠোঁটে। যাদুমন্ত্রের প্রয়োজন তবে আজও ফুরায় নাই মণিকার ?

—কাজল পরেছ না কি ?

বলিবার ইচ্ছা সত্যই ছিল না, অসতর্ক ভাবে বাহির হইয়া যায় কথাটা।

—পরেছি, পরেছিই তো, বেশ করেছি।

—সে তোমার রুচি। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল রয়ে গেছে মণিকা। মায়া কাজল তোমাদের পরতে হয় না, পরি আমরা, তাই তোমরা সুন্দর, তোমরা দেবী, তাই আমাদের যাদুমন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, হয়—পূজার মন্ত্রের। কিন্তু ভুল এমনি করেই এক দিন ধরা পড়ে, প্রতিমার ভেতর থেকে খড় উঁকি মারে, স্তব্ধ হয়ে যায় স্তব-গান। কিন্তু ছিঃ, কান্নাটা কমাও মণিকা, ওটা দেখা যায় না। সামান্য কটা টাকার জন্যে তোমাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু সত্যিই আজ আর দেবার ক্ষমতা নেই আমার। 'আমার' বলে যা কিছু জানতে, সবই এখন রামকৃষ্ণ মিশনের।

কান্না ভুলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদে মণিকা বলিয়া ওঠে,—তার পর ? তুমি ?

—তার পর ? তার পর আমি আছি আর মিশন আছে।

প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া ওঠে অশোক।

পিতৃযজ্ঞ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বংশের আদি মাতা-পিতাগণে প্রণতি জানাই পায়।
গঙ্গাসাগরে করি তর্পণ গোমুখী ভেদি তা যায়।
পুণ্যপুঞ্জ হে স্বর্গবাসী,
ভক্তি ও পূজা করি, ভালবাসি,
তোমাদের দীন সন্তান, করি বন্দনা কবিতায়।

তোমাদের স্নেহ শুভ আকাঙ্ক্ষা বংশ-লতিকা ধরি,
সুরভির মত নামিয়া এসেছে রেখেছে এ বুক ভরি।
তোমাদের দান করি আমি ভোগ,
পারিজাত সাথে এ ফুলের যোগ,
তোমাদিকে আমি পরশিতে গিয়া হরিবে পরশ করি।

সাধু পবিত্র পুণ্য জীবন হেথায় কাটালে হায়,
নব নব আভিজাত্য দিয়েছ বংশ-মর্য্যাদায়।
ধর্ম্মনিষ্ঠ উন্নত শুচি,
জ্ঞানী, তেজস্বী, বিশুদ্ধ রুচি,
পেলে আনন্দ দেবের সেবায়, জীবের শুশ্রূষায়।

সৃষ্টির সেই আদি হতে এই সুদূর বর্ত্তমান,
এলো তোমাদের অমৃতের ধারা পাই তার সন্ধান।
সয়েছ এমনি দুখ সুখ ব্যথা,
এই প্রতীক্ষা এই ব্যাকুলতা,
করেছ ধরার এই মধু-বিষ আমাদেরি মত পান।

তোমাদের কাছে এক হয়ে গেছে নর আর নারায়ণ,
স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সেথা হয়েছে সম্মিলন।
পিতৃলোকের অমৃতের হ্রদে
গঙ্গা মিশেছে গিয়া হরিপদে,
আমি নর বটি—কিন্তু আমার দেবতারা পর নন।

কত সভ্যতা, কত বিপ্লব, কতই যুগান্তর
হেরেছ তোমরা সহ্য করেছ কত মন্বন্তর।
যায়নি শুকায়ে তোমাদের ধারা,
বিপর্য্যয়েতে হয় নাই হারা,
হলে দিন দিন শাখা-প্রশাখায় বৃহৎ—বৃহত্তর।

সর্পের একটি নাম চক্ষুঃশ্রবা। এই নামটির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সর্পের মস্তকের বহির্ভাগে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অথচ উহারা একটু কিছু শব্দ পাইলেই ত্রস্তে পলায়ন করে। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বাহিরে কর্ণ না থাকায় সর্পেরা বায়ু-চালিত শব্দ-তরঙ্গ আদৌ শুনিতে পায় না। মাটির উপর দিয়া যে সকল শব্দ-তরঙ্গ চালিত হয়, সেইগুলিই উহাদের দেহের অভ্যন্তরে চালিত হইয়া শব্দের বিষয়ে উহাদিগকে সচেতন করে। সাপুড়িয়ারা ভেরী বাজাইয়া যে সর্প-নৃত্য দেখায় তাহাতে অনেকেরই ধারণা এই যে, ভেরীর সুমধুর ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া ফণা তুলিয়া সাপ তালে তালে নৃত্য করে; কিন্তু ইহা একেবারেই ভ্রমাত্মক। সর্পেরা অহিতুণ্ডিকের জানু ও ভেরী চালনা লক্ষ্য করিয়াই ফণা দুলায়; ভেরীর শব্দ আদৌ শুনিতে পায় না। এ বিষয়ে কর্ণেল ওয়াল সাহেব বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটি গোক্ষুরের চক্ষু নেকড়ার পটি দিয়া .একেবারে বন্ধ করিয়া তাহার নিকট সজোরে একটি কানেস্তারা বাজাইতে থাকেন, কিন্তু এই ভীষণ শব্দেও সর্পটি ফণা তোলে নাই। তার পর সর্পের নিকট সজোরে একটি ভেরী বাজাইলেও সর্পটি কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় নাই। কিন্তু সর্পের কিছু দূরে মেঝের উপর একটি চেয়ারকে সরান হইলে সে শব্দে সর্প ফণা তুলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল। সর্পের অদূরে বারান্দার উপর দিয়া একটি ভৃত্য চলিয়া গেলে তাহার মৃদু পদশব্দেও সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া ফণা বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সর্পেরা বায়ুচালিত শব্দের সম্বন্ধে একেবারেই বধির। শুধু ভূমিচালিত শব্দই ইহারা উপলব্ধি করিতে পারে। চক্ষু বন্ধ করিয়া সর্পের নিকট পিস্তলের আওয়াজ করিলেও সর্প উহার উৎকট শব্দ অনুভব করিতে পারে না। তবে চক্ষু উন্মুক্ত থাকিলে হস্তাদির সঞ্চালন লক্ষ্য করিয়া দংশনে উদ্যত হয়। এই সকল ব্যাপার অনুধাবন করিলেই সর্পের চক্ষুঃশ্রবা নামের অর্থ সম্যক্ বুঝা যায়।

সর্পের আস্বাদ গ্রহণের কোনও শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। জিহ্বাকে ইহারা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন হস্ত বা করধৃত যষ্টি দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করিয়া তাহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করে, ইহারাও সেইরূপ দ্বিখণ্ডিত জিহ্বাকে মুখ-বিবর হইতে বারংবার নিষ্কাষিত করিয়া পারিপার্শ্বিক পদার্থের অনুভূতি গ্রহণ করে। অনেকে অনুমান করেন, সর্পেরা জিহ্বার দ্বারা শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের কার্য্যও কতক পরিমাণে চালাইয়া থাকে। অনুভব করিবার প্রয়োজন না হইলে সর্পেরা জিহ্বাকে মুখের মধ্যে একটি নলাকার থলির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। এক কথায় জিহ্বাই ইহাদের প্রধান স্পর্শেন্দ্রিয়।

মাছের মত সর্পের চোখে পাতা নাই। কাজেই চক্ষুকে ইহারা বন্ধ করিতে পারে না। ইহাদের চক্ষু দুইটি স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত। মাছেদের মত ইহারা চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যায়। সর্প-দেহে ফুসফুসের দুইটি কোষের মধ্যে বাম কোষটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং দক্ষিণ কোষ অতি ক্ষুদ্রাকার হইয়া থাকে। দক্ষিণ কোষ অপেক্ষা বহু গুণে বৃহৎ এই বাম কোষই শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দেহের আকারের অনুপাতে এই ফুসফুস্ অত্যন্ত সুদীর্ঘ। সর্পের দেহ যেরূপ দীর্ঘ, ফুসফুসও সেই অনুপাতে লম্বা। এই প্রকার ফুসফুসের নিমিত্ত সর্পেরা জলের মধ্যে দুই-এক ঘণ্টা ডুবিয়া থাকিতে পারে। স্থলচর অপেক্ষা সামুদ্রিক সর্পের ফুসফুস আরও বৃহৎ। আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারিটি কোষ থাকে। সর্পের হৃৎপিণ্ডে তিনটি মাত্র কোষ দেখা যায়। ইহাদের স্বরযন্ত্র নাই, সুতরাং ইচ্ছামত কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না! সুদীর্ঘ ফুসফুসের বায়ু নিম্নোষ্ঠের ছিদ্র দিয়া বাহির হইবার সময়েই কেবল "ফোঁস" বা "হিস্" শব্দের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার শব্দোচ্চারণে আফ্রিকার পফ্ অ্যাডার ও এ দেশের চন্দ্রবোড়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। খুব নিকট হইতে আমি চন্দ্রবোড়ার গর্জ্জন শুনিয়াছি। খুব বড় ফুটবলের ব্লাডারকে বায়ু দ্বারা স্ফীত করিয়া ছাড়িয়া দিলে যেরূপ শব্দ শুনা যায়, চন্দ্রবোড়া উত্তেজিত হইলে ঠিক সেই ভাবেই গর্জ্জন করে। এই গর্জ্জন গোক্ষুর ও কেউটিয়ার ফোঁস্ করার মত নয়। চন্দ্রবোড়াদের নাসিকার ছিদ্রও খুব বড় হইয়া থাকে। এ দেশের আর কোনও সর্পের নাসারন্ধ্র এরূপ বড় হয় না।

ইহাদের নিম্নেকার চুয়াল দুইটি পরস্পর যুক্ত না থাকায় মুখ-মণ্ডলকে ইহারা বিশেষ ভাবে প্রসারিত করিতে পারে। মস্তকের অস্থিগুলিও দৃঢ় ভাবে যুক্ত না থাকার দরুণ বৃহৎ শিকার গলাধঃকরণে ইহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। শিকার ধরিয়াই ইহারা গলনলিটিকে মুখের মধ্যে সজোরে টানিয়া আনে। এই কারণে শিকার গলাধঃকরণ কালে ইহাদের নিশ্বাস বন্ধ হয় না। অনেক সময়ে খুব বৃহৎ শিকার ধরিয়া উদরস্থ করিবার কালে ইহাদিগকে বিব্রত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের দন্তের পার্শ্বে অনেকগুলি দন্তাঙ্কুর দেখা যায়। শিকার ধরিবার সময় কোনও দন্ত ভগ্ন হইলে তাহার তলস্থিত দন্তাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া ভগ্ন দন্তের স্থান অধিকার করে।

সাধারণ সর্পের মুখে ছয় মাড়ি দাঁত থাকিতে দেখা যায়। তালুর উপরে চারি মাড়ি এবং নিম্ন চোয়ালের দুই পার্শ্বে দুই মাড়ি। এই দাঁতগুলি গলার ভিতর দিকে বাঁকানো থাকে বলিয়া গৃহীত ভেকাদি কোনও মতে পলাইতে পারে না।

সাধারণতঃ দুই মাস অন্তর ইহারা নির্ম্মোক (খোলস) ত্যাগ করে। শিশু সর্পেরা দেহের বৃদ্ধির সহিত খুব শীঘ্র শীঘ্র খোলস ছাড়ে। খোলস ত্যাগ করার পূর্ব্বে ইহারা অলস ভাবে পড়িয়া থাকে এবং ইহাদের চক্ষু ঘোলাটে হয়। সেজন্য সে সময় ইহারা ভাল দেখিতে পায় না; খোলস পরিত্যক্ত হইবার কালে উহা সর্প-দেহ হইতে উল্টাইয়া বাহির হইয়া থাকে।

ইহাদের পরিপাক-শক্তি অতি অদ্ভুত। ইহাদের পাকস্থলীর পাচক-রস সকল প্রকার বস্তু—এমন কি পক্ষীর পালক, পশুর চর্ম্ম, শৃ ও অস্থি অবধি জীর্ণ করিতে পারে। আবার অনাহারে উপবাসী হইয়াও ইহারা অতি দীর্ঘকাল (অনেকের মতে ২।৩ বৎসর অবধি) জীবিত থাকিতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মত বায়ুর অভাবে ইহারা সহসা প্রাণ ত্যাগ করে না। বায়ু না পাইলেও ইহারা বহুক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। এই জন্যই ইহাদের একটি নাম পবনাশন ব বায়ুভুক্ এবং ভেক ধরিয়া আহার করে বলিয়া ইহাদের আর একটি নাম ভেকভুক্।

পঞ্জরাস্থি ও উদরের নিম্নভাগে শল্ক দ্বারা ইহারা ভূমির উপ গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই জন্য ইহাদের একটি নাম উ পাদ এবং পতিত ভাবে গমন করে বলিয়া আর একটি নাম পন্ন ভূমি বন্ধুর হইলে ইহাদের গতায়াতের খুব সুবিধা হয়। ভূমি মসৃ হইলে ইহারা সুবিধামত চলাফেরা করিতে পারে না। কাচের

মসৃণ বস্তুর উপর গমনাগমন ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। আমাদের মেরুদণ্ড মাত্র তেত্রিশখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। সর্পের মেরুদণ্ডে প্রায় চারি শত অস্থি দেখা যায়। স্থলচর সর্পেরা জলে পড়িলে কিছুমাত্র বিব্রত হয় না। সন্তরণে জলাশয় প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সামুদ্রিক সাপরা এ বিষয়ে অত্যন্ত অসহায়। তরঙ্গের বেগে কোনক্রমে সমুদ্র-তটে আসিয়া পড়িলে সামুদ্রিক সর্পেরা অসহায় অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। পুরীর সমুদ্র-তটে বালীর উপর কতকগুলি সামুদ্রিক সর্পকে নিৰ্জ্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সমুদ্রের উচ্ছাস ইহাদিগকে পুনরায় জলের মধ্যে লইয়া যাইতে না পারিলে তটের উপরেই ইহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে সি-গাল নামক সামুদ্রিক পক্ষীরা ইহাদিগকে উদরস্থ করিয়া ফেলে।

সর্পেরা প্রচুর পরিমাণে জলপান করে। জল না দিলে পালিত সর্পকে জীবিত রাখা দুষ্কর। অধিক পরিমাণে জল পান করিলেও ইহাদের উদরে মূত্রকোষ (Bladder) নাই।

পুং-সর্পের দুইটি জননেন্দ্রিয় থাকে। সর্পীর সহিত সঙ্গম কালে এই দুইটি জননেন্দ্রিয় নলাকারে সম্মিলিত হইয়া থাকে। স্ব স্ব প্রাণীর মধ্যেই সর্পদের সঙ্গম ঘটিয়া থাকে। দুইটি ভিন্ন শ্রেণী যেমন ঢেমন ও গোক্ষুরে সম্মিলন হইতে দেখা যায় না। সঙ্গম কালে সর্প ও সর্পীকে বহুক্ষণ একত্র জড়িত থাকিতে দেখা যায়। সাধারণ বোড়া সর্পকে সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই ভাবে অবস্থান করিতে দেখা গিয়াছে। এ সময়ে ভয় পাইলে বা তাড়িত হইলে সর্পমিথুন বিজড়িত ভাবেই পলায়নের চেষ্টা করে। টিকটিকিদেরও দুইটি জননেন্দ্রিয় আছে। সঙ্গম কালে সম্মিলিত জ্যেষ্ঠীমিথুনকে সহজে বিযুক্ত করা যায় না, এরূপ প্রয়াসে উহাদের দেহই বরং বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

মাছ ও অন্যান্য সরীসৃপের মত সর্পের রক্তের তাপ অত্যন্ত কম। এই কারণে উহাদের দেহ সর্ব্বদাই শীতল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের রক্তের তাপ মাত্র ৯৮।° (ফার্ণ)। পাখীদের রক্তের তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—১৮°। সর্পেরা এক কালে দশ হইতে এক শতটি পর্য্যন্ত অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। অণ্ড হইতে শাবক জাত হইতে গড়ে প্রায় ৩ মাস সময় অতিবাহিত হয়। গোক্ষুরেরা এক কালে ১২ হইতে ২২টি পর্য্যন্ত অণ্ড প্রসব করে। গোক্ষুরের অণ্ড হইতে শাবক বাহির হইতে প্রায় ২ মাস সময় অতিবাহিত হয়। কালাচ বা ক্রেট্ জাতীয় সর্পেরা ৬টি হইতে ১০টি অণ্ড প্রসব করে। চন্দ্রবোড়ারা অণ্ড প্রসব না করিয়া একেবারেই শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা এক কালে ৩০ হইতে ৪০টি শাবক প্রসব করে। অণ্ড হইতে বাহির হইবার কালে শিশু-সর্প প্রায় ৮ হইতে ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। প্রথম বৎসরের মধ্যেই সর্প-শাবকের দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি বিশেষ ভাবে ঘটিতে দেখা যায়, এবং সাধারণতঃ চারি বৎসরের মধ্যেই ইহারা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্পেরা সাধারণতঃ বিশ বৎসর জীবিত থাকে।

অনেকে অনুমান করেন, পৃথিবীতে প্রায় দুই হাজার বিভিন্ন জাতীয় সর্প আছে। ইহাদের মধ্যে বিষধর সর্পের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এ দেশে গোক্ষুর, চন্দ্রবোড়া ও কালাচ জাতীয় সর্পই শুধু বিষধর। শল্কের বিন্যাস-রীতি দেখিয়া সর্পতত্ত্ববিদেরা ইহাদের জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

গোক্ষুর প্রভৃতি বিষধর সর্পেরা রাত্রিতেই ভেকাদি অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে। ঢেমন প্রভৃতি নির্ব্বিষ সর্পেরা সাধারণতঃ দিবাচর। গোক্ষুর শাবকেরা কিন্তু দিবাভাগেও বাহির হয়। কালাচ সর্পের বিষ গোক্ষুর বিষের চেয়ে তিন গুণ তীব্র। কৃষ্ণ ও পীত বর্ণে রঞ্জিত শাঁখামুঠি সাপ অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহারা করাতি অথবা কালাচ সর্পজাতীয়। ইহাদের বিষ গোক্ষুর বিষ অপেক্ষা ১৫ গুণ তীব্র। কালাচ সর্পের বিষ-দন্তের আকার ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। চন্দ্রবোড়ার মত বৃহৎ আকারের বিষ-দন্ত হইলে কালাচের বিষের ক্রিয়া যে কিরূপ হইত তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। চন্দ্রবোড়ারা একবারের দংশনে যে পরিমাণ বিষ উদ্গীর্ণ করে, তাহাতে দুইটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটিতে পারে। চন্দ্রবোড়া যে স্থানে দংশন করে উহা বিশেষ ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে। দষ্ট ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিলেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে বেগ পাইতে হয়।

চন্দ্রবোড়া গভীর জঙ্গলে বাস না করিয়া রৌদ্রযুক্ত উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করে। ভাঙ্গা ইটের পাঁজা, খোয়াযুক্ত মাঠই ইহারা পছন্দ করে। কেউটিয়া ভিজা সেঁতসেতে জায়গায় থাকিতে ভালবাসে। শুক্‌না উঁচু স্থান গোক্ষুররা পছন্দ করে। সর্পের মধ্যে চন্দ্রবোড়াই সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত প্রকৃতি।

পৃথিবীর সকল স্থানে সর্প দেখা যায় না। উত্তর-মেরু প্রদেশে অ্যাজোর্স (Azores) দ্বীপপুঞ্জে, নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ারল্যাণ্ড ও ম্যাডাগ্যাসকার দ্বীপে বিষধর সর্পের বাস নাই। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র ভাইপার একমাত্র বিষধর। এই ভাইপারের বিষে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না; এমন কি, ক্ষুদ্র বালকেরও জীবননাশ ঘটিতে পারে না। শুধু বিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব-জন্তুরই প্রাণান্ত ঘটিতে পারে।

সর্পের বিষ এত দিন মানবের প্রাণান্তকর বলিয়াই জানা ছিল। এক্ষণে উহা হইতে নানা কঠিন রোগের অমৃতোপম ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। বৈদ্যেরা বিসূচিকা ও সান্নিপাত জ্বরের নিদান কালে যে 'সূচিকাভরণ' প্রয়োগ করেন, তাহা কালসর্পের বিষ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে গোক্ষুর সর্পের বিষ হইতে হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ কঠিন পীড়ার ও ওলাউঠার শেষাবস্থায় ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধের নাম ন্যাজা বা কোব্রা। আমেরিকার এক জাতীয় ভয়ানক বিষাক্ত বোড়া সর্প (Lance headed viper) হইতে নানা প্রকার কাসি, তালুমূল-প্রদাহ, বিষব্রণ, কর্কটরোগ (Cancer), বিসর্প (Erysepelas), প্রচণ্ড শিরঃপীড়া, হৃৎশূল প্রভৃতির উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধের নাম ল্যাকেসিস্। আমেরিকায় ভয়ঙ্কর বিষধর ঝুমঝুমি সর্পের (Rattle snake) বিষ হইতে গ্যাংগ্রীণ, রক্তস্রাব, যকৃতের পীড়া, মারাত্মক জ্বাবা, রক্তস্রাবী বসন্ত প্রভৃতির অত্যুত্তম ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঝুমঝুমির বৈজ্ঞানিক নামানুসারে ঔষধের নাম হইয়াছে ক্রোটেলাস হরিডাস।

রাত্রির তপস্যা

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

৬

কোনটা যে তাহার বড় আঘাত, সেইটা বুঝিতেই ভূপেনের অনেকক্ষণ সময় লাগিল। আর্থিক ক্ষতিটাও তাহার বর্ত্তমান অবস্থাতে অনেকখানি সন্দেহ নাই এবং হয়ত সে জন্য, তাহাকে এই অসময়েই, ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় ভাবে ভাঙ্গিয়া উন্নতির প্রথম অধ্যায়েই পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হইবে। কারণ, মোহিত বাবু যত আত্মীয়তার দাবীই করুন, যেটা তিনি দিতে চাহিতেছেন সেটা দয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে দান কোন অবস্থাতে, কোন বিবেচনাতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়—কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছিল সন্ধ্যাকে হারানোটা। তাহার এই ছাত্রীটি কখন নিঃশব্দে ছাত্রীর পদ হইতে বন্ধুর আসনে চলিয়া আসিয়াছিল তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই যে ভূপেন এত দিন নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল, এইবার সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল। মোহিত বাবু যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন, সেটা ভূপেনের কাছে অবিশ্বাস্য—সুদূর কল্পনারও অতীত! সন্ধ্যা বালিকা কি কিশোরী, সে কথা লইয়া মাথা ঘামানো দূরে থাক—ভূপেন নিজের মনে বার বার শুধু এই কথাটাই অনুপস্থিত মোহিত বাবুকে বুঝাইতে চাহিল—সে পুরুষ কি নারী এই তথ্যটাই সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। সব চেয়ে সে কেমন দেখিতে, ফর্সা না কালো, সুন্দরী না কুৎসিত, এটাও সে কোন দিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। সন্ধ্যা শুধু সন্ধ্যাই—সে তাহার ছাত্রী। তাহার কথা মনে হইলে শুধু তাহার সশ্রদ্ধ, একাগ্র চোখ দুটির কথা, শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার অসীম কৌতূহল ও একান্ত নিষ্ঠার কথাই মনে পড়ে। সন্ধ্যা সেই ছাত্রী, যাহার শ্রদ্ধা হারাইবার ভয়ে নিজেকে অনেক যত্নে প্রস্তুত করিতে হয়, রাত জাগিয়া মোটা মোটা বই পড়িতে হয়। যাহার অন্তরের মাধুর্য্য ও তপস্যা পবিত্র দীপশিখার মত জ্বলিয়া গুরুর অন্তরকে শুদ্ধ দীপ্ত করিয়া তোলে।

ক্ষতির পরিমাণটা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন মোহিত বাবু সম্বন্ধে একটা প্রবল অভিমান এবং ক্ষোভ অনুভব করিতে লাগিল। মোহিত বাবুকে সে শ্রদ্ধা ত করিতই, ভালও বাসিত। সেই জন্যই অভিমানটা তাহার এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, মানুষের যখন স্বার্থে আঘাত লাগে তখন অপর দিকটা সে কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারে না। ভূপেনও, মোহিত বাবুর কথার মধ্যে যত যুক্তি যত আন্তরিকতাই থাক, তিনি যে নিতান্ত অকারণে তাহার প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিলেন, এ কথাটা না ভাবিয়া পারিল না।

তবে একটা প্রতিজ্ঞা সে ইতিমধ্যেই মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার বেদনাবোধের তীব্রতা না কমা পর্য্যন্ত মোহিত বাবুকে সে কোন উত্তর দিবে না।...কিন্তু সেটা কমিতেও অনেকখানি সময় লাগিল। সে-রাত্রে ত সে ঘুমাইতে পারিলই না, পরের দিনও সমস্ত সকালটা পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মনে মনে কেমন একটা অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করে সে—কি যেন তাহার হারাইয়া গেছে, মূল্যবান কিছু, যা আর কোন দিন সে ফিরিয়া পাইবে না। অনেকক্ষণ, প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত এই ভাবে ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে যখন জোর করিয়া সে স্নানাহার সারিয়া পড়ার টেবিলের কাছে বসিল তখন সে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে—বরং নিজের এই অপরিসীম চিত্ত-ক্ষোভের জন্য নিজের কাছেই যেন একটু

মোহিত বাবু তাহাকে অবশ্য একেবারে বাড়ী যাইতে নিষেধ করেন নাই, আজ হইতেই যে পড়ানো বন্ধ করিতে হইবে এমন কথাও বলেন নাই, তবু আর ও-বাড়ী যাওয়া যায় না। মোহিত বাবুকে যাহা বলিবার চিঠি দিয়াই জানাইতে হইবে। সন্ধ্যা হয়ত তাহাকে আশা করিবে, কিন্তু আজ সেখানে গেলে তাহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইয়া আসিতে হয়, অথচ কি-ই বা বলিবে তাহাকে! আর, মোহিত বাবু যে আশঙ্কা করিতেছেন যদি আলোচনা-প্রসঙ্গে সে কথার আভাসমাত্র সন্ধ্যার কাছে প্রকাশ পায় ত লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে। তাছাড়া, কোনরূপ নাটকীয় বিদায় লইবার সম্পর্ক ত তাহাদের নয়—কোন পক্ষেই কিছু বলিবার নাই। ক্ষতি যেটুকু সেটুকু একান্ত অন্তরের, তাহা মনেই থাক।

সে প্যাড ও কলম লইয়া মোহিত বাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল। শ্রীচরণেষু পাঠ পর্য্যন্ত লিখিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। চিঠিতে কোন দুঃখ, কোন আবেগ না প্রকাশ পায়। অথচ যে ভাষা প্রথমেই বাহির হইয়া আসিতে চায়, তাহা সবই অভিমানের। অতি কষ্টে, কঠোর শাসনে মনকে সংযত করিয়া সে লিখিল—

শ্রীচরণেষু—

বাড়ীতে আসিয়া আপনার কথাগুলি ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখিলাম। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আপনার আন্তরিক স্নেহ এবং মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু স্নেহ স্নেহই—সেটা যখন আর্থিক মূল্যে পরিণত হয় তখন সেটাকে আমরা দান বলিয়া মনে না করিয়া পারি না এবং সে দান গ্রহণ করিলে আপনার চোখে আমি খানিকটা ছোট হইয়া যাইবই—অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। সুতরাং আপনার স্নেহ যদি আজ মাথা পাতিয়া না লইতে পারি ত তাহাকে অকৃতজ্ঞতা বা স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে করিবেন না। বরং আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সর্ব্বতোভাবে আপনার স্নেহের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারি। আমার মনে হয়, আমি যদি নিজের চেষ্টাতেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই আপনাদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের মর্য্যাদা থাকিবে, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না—আপনার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা রহিল—যে এম-এ পাশ করা পর্য্যন্ত আপনি আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, সে এম-এ পরীক্ষা আমি দিবই। তাহার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন যদি করিতে হয় তাহাও করিব।

কাল যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছে তাহার পর আর আপনার বাড়ী যাওয়া বাঞ্ছনীয় কি না ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ডাকেই চিঠি দিলাম। এই সঙ্গে সন্ধ্যাকে একখানি চিঠি দিলাম, যদি বাধা না থাকে, তাহাকে দিবেন। প্রণাম লইবেন।

ইতি—প্রণত ভূপেন্দ্র।

সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিল সে তিন ছত্র—

কল্যাণীয়াসু—

তোমাকে পড়াতে যাওয়া কোন কারণে আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো। মন দিয়ে পড়াশুনা ক'রো—আর কারুর সাহায্য লাগবে ব'লে মনে হয় না। আমি যেখানেই থাকি, আমার আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণ-কামনা তোমাকে নিরন্তর ঘিরে থাকবে।

ইতি—মাষ্টার মশাই।

চিঠিখানা খামে মুড়িবার আগে 'কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো' লাইনটা কাটিয়া দিল। থাক—সন্ধ্যা যদি তাহাকে অকৃতজ্ঞ, স্নেহহীন ভাবে সে-ও ভাল, তবু কোন কদর্য্য সংশয়ের কালি তাহাকে যেন স্পর্শ না করে।

চিঠি সে নিজেই ডাকে দিয়া আসিল।

মুক্তি!

যত বেদনাদায়কই হোক্—মুক্তির একটা আনন্দ আছেই। চিঠি ডাকে দিয়া কতকটা সেই আনন্দেই ভূপেন যেন নিজেকে অনেকখানি হাল্কা বোধ করিল। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, 'যাক্—বাঁচিলাম! কাল হইতে যে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ মনকে ভারি করিয়া রাখিয়াছিল তাহার হাত হইতে ত অন্ততঃ অব্যাহতি পাইলাম। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের সহিত কর্ত্তব্য মিশিয়া ক্রমশঃই ওখানে একটা বন্ধন দৃঢ় হইতেছিল, সেটার হাত হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। এ এক রকম ভালই হইল।'

কিন্তু খানিকটা ঘুরিবার পরই কেমন একটা অবসাদে পা দুটো ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু পথে থাকা আরও অসম্ভব। কোথায় যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কি যেন এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত চারি দিকের আবহাওয়ায়।···সে কতকটা নিজের উপর বিরক্ত হইয়াই বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ঢুকিতেই প্রথম দেখা হইল অবিনাশ বাবুর সঙ্গে। কানে একটা আধ-পোড়া বিড়ি এবং হাতে পানের বোঁটায় চূণ—ব্যস্ত ভাবে কোথায় যাইতেছিলেন, ভূপেনকে দেখিয়াই কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া কহিলেন, কি বাবাজী, এমন সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলে যে! তোমার সেই টুইশ্যনী নেই? বড়লোকের মেয়ে, গেঁথেছ মন্দ নয়—এখন খেলিয়ে তুলতে পারলে হয়।

সাধারণতঃ অবিনাশ বাবুর কথায় কান দিত না ভূপেন, লোকটির কথার ভঙ্গিতে সর্ব্বদা এমন একটা নোংরামীর ইঙ্গিত থাকে যে তাঁহাকে দেখিলেই তাহার গা ঘিন্-ঘিন্ করিত। কিন্তু সে দিন পাশ কাটাইতে গিয়াও তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই লোকটির হাতে ছোট-খাট বিস্তর টুইশ্যন থাকে—সে কোন মতে ঢোঁক গিলিয়া বলিয়া ফেলিল, সে টুইশ্যন ছেড়ে দিয়েছি—আমাকে আর একটা দেখে দিতে পারেন?

খানিকটা তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবার পর অত্যন্ত অর্থপূর্ণ একটা হাসিতে অবিনাশ বাবুর মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল! তিনি কহিলেন, ছেড়েছ না ছাড়িয়েছে? ও আমি আগেই জানতুম বাবাজী, বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েছেলে দেখেছে কি অমনি বাড়াবাড়ি সুরু করে দেয়······থাক, দুঃখ করো না, ও অমন হয়েই থাকে। মোদ্দা, এত দিন রাজত্ব করে এসে এখন কি আমাদের আট-দশ টাকার টুইশ্যান করতে পারবে?

অবিনাশ বাবু যতটা বলিলেন তাহার চেয়ে ঢের বেশী কদর্য্যতা প্রকাশ পাইল তাঁহার মুখভঙ্গীতে। সে দিকে চাহিয়া রাগে ভূপেনের সর্ব্বদেহ জ্বলিয়া গেল, সে তাহার কথার উত্তর না দিয়াই উপরে উঠিতে সুরু করিল। কিন্তু অপরের সৌজন্যের অভাবে উৎসাহ কমিবে অবিনাশ বাবু তেমন লোক নন্—উপরে পৌঁছিয়াও ভূপেনের কানে গেল অবিনাশ বাবু বাঙ্গালীর ছেলের নৈতিক চরিত্রের উপর বক্তৃতা করিতেছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা তাঁহাকে বলার জন্য ভূপেনের অনুতাপের সীমা রহিল না। সবচেয়ে বেশী ভয় তাহার বাবাকে, অবিনাশ বাবু প্রথমেই তাঁহাকে সংবাদটা দিবেন এবং টীকা ভাষ্য সমেত দিবেন। অথচ আবার সেই অবিনাশ বাবুর আট টাকার টুইশ্যন্ করা কি সম্ভব? ভূপেন আপন মনেই মাথা নাড়িয়া উঠিল, না, আর তা সম্ভব নয়।

সে যখন উপরে আসিল তখন মা রান্নাঘরে বিষম ব্যস্ত; কেন সে আজ পড়াইতে গেল না, সে কৈফিয়ৎ চাহিবার সময় সেটা নয়। আপাততঃ জবাবদিহির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানাতেই শুইয়া পড়িল। এটি তাহার নিজস্ব ঘর, মোহিত বাবুর কৃপায় এত বড় বিলাসও তাহার সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু এখন কি আর রাখা সম্ভব হইবে!

একটু পরেই বাবা ফিরিলেন। অফিস হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহই বাজার হইয়া আসেন—আজও সেই পুঁটলিটি হাতে ছিল কিন্তু আজ সোজা রান্নাঘরে না গিয়া তিনি পুঁটলি সমেত এ ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ রে, তোর টিউশ্যনীটা না কি গেছে? অর্থাৎ অবিনাশ বাবু ইতিমধ্যেই তাঁহার কাজ সারিয়াছেন। বাবার প্রশ্ন করিবার ধরণে ভূপেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তবু কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ!

কণ্ঠে তাঁহার বিরক্তি আর চাপা রহিল না, আজকালকার বাজারে অমন একটা টিউশ্যনী পাওয়া কি সোজা কথা! এখন খরচ চলবে কিসে শুনি?

এতক্ষণের সঞ্চিত সমস্ত ক্ষোভ এখন বাবার উপরই গিয়া পড়িল, সে তিক্ত কণ্ঠে কহিল, সে ভাবনায় আপনার দরকার কি বাবা, এ টিউশ্যনী কি আপনি জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন?

উত্তরটাতে দমিয়া গেলেও উপেন বাবু হাল ছাড়িলেন না, গলার স্বর যতটা সম্ভব আহত শোনাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকতে গেলেই দু'টো-একটা কথা কইতে হয়, তা ছেলের মেজাজ দেখ না! তবু যদি চার চালের ভার নিতে। সংসার করতে হয় না বলেই অত মেজাজ রাখতে পেরেছ, সংসারের ভার ঘাড়ে পড়লে বুঝতে!···ঐ মেজাজের জন্যই ত সব গেল—টিউশ্যনী হ'ল চাকরমনিব সম্পর্ক, চাকরী যেখানে করতে হবে—সেখানে কি মান-অভিমান রাখতে গেলে চলে, মন জুগিয়ে চলতেই হবে। ঐ যে কথায় বলে না—

ভূপেন বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া আবার জামাটা টানিয়া লইল। উপেন বাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি এখন সহজে থামিবেন না। অথচ তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় ধৈর্য্য রাখাও কঠিন। সে জুতা পরিতেছে দেখিয়া উপেন বাবু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইলেন, কিন্তু বক্তৃতা তখনও তাঁহার থামে নাই, তিনি চলিতে চলিতেই বাড়ীসুদ্ধ লোককে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ জন্যেই তখন বলেছিলুম যে, বি-এ পাশ করলি, এই বার চাকরীতে ঢুকে পড়্। তখনও গস্ সাহেব ছিল, অনায়াসে ঢোকা যেত—চাই কি এত দিনে এক বছর হয়ে গিয়ে একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেতিস্। সেই চাকরীই যখন করতে হবে, তখন মিছিমিছি এম-এ পাশ করে সময় নষ্ট করবার কি দরকার বুঝিনে—

ভূপেন দ্রুতপদে সিঁড়ি ক'টা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বাবার শেষ কথাগুলা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল, তাহাদের জ্বালা হইতে সে অত সহজে অব্যাহতি পাইল না। 'চাকরীই যখন করতে হবে'—সত্যই ত, আর কি আশা তাহার আছে? এম-এ পাশ করিয়াই বা কি তাহার হাত-পা গজাইবে, কোন্ পথ তাহার সামনে খোলা পাইবে সে! এত দিন বড়লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার ফলেই এই অনিষ্টটি হইয়াছে তাহার, নিজের অবস্থার কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। কোথা দিয়া কি করিয়া যেন ইদানীং তাহার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এম-এ পাশ করিবার পরও শিক্ষার পথ তাহার কাছে বন্ধ হইয়া যাইবে না, সাধনা চলিবে অব্যাহত গতিতে।···হায় রে!

ভূপেনের হাসি পাইল। কত আশা তাহার!···গরীব হইয়া নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়ার মত অপরাধ আর নাই।··· না, মোহ যখন তাহার ঘুচিয়াছেই তখন আর বৃথা আশার পিছনে দৌড়িয়া সময় নষ্ট করিবে না। ভূপেন যেন একবার নিজেকে একটু নাড়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিল—এম-এ পড়া থাক্, চাকরীর চেষ্টা দেখাই ভাল।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে হেঁদোতে আসিয়া অবসন্ন ভাবে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। সে আজই মোহিত বাবুকে কথা দিয়াছে যে, সে এম-এ পাশ করিবেই। তাছাড়া সন্ধ্যা—সন্ধ্যা দুঃখ পাইবে। সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে শুনিলে তাহার দৃষ্টিতে যে বেদনা ফুটিয়া উঠিবে কল্পনায় তাহার আভাস মাত্র পাইয়াই ভূপেন অস্থির হইয়া উঠিল। অথচ উপায়ই বা কি, বাবার যা আয় তাহাতে সংসারই চলে না, পড়ার খরচ সেখান হইতে আশা করা বাহুল্য। টিউশ্যনী করিবে? ইতিপূর্ব্বেকার ছোট ছোট টিউশ্যনীর যে তীব্র অভিজ্ঞতা ভূপেনের ছিল, চোখ বুজিয়া তাহার ছবিটা মনে করিবার চেষ্টা করিতে সে শিহরিয়া উঠিল। না, তখন যাহা সম্ভব ছিল এখন আর তাহা নাই। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীই তাহার বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—সে অপমান, শিক্ষার সে অমর্য্যাদা আর সহিবে না।

কিন্তু চাকরীই বা কোথায়? কি কাজ পাইবে সে? বাবার সেই সওদাগরী অফিসে হয়ত একটা কেরাণীগিরী এখনও মিলিতে পারে—হয়ত বাবা চেষ্টা করিলে সেটা জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন হইবে না। কিন্তু, এই জন্যই কি সে এত লেখাপড়া শিখিল? বছরের পর বছর সেই একই চেয়ারে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া, এবং বয়স ও সম্পর্ক-নির্ব্বিশেষে অশ্লীল রসিকতা করা? পঁয়তাল্লিশ টাকা হইতে সুরু, মরিবার বয়সে একশ' পনেরো টাকায় অব্যাহতি, সব ক্ষেত্রে তাও না। এই ত সে চাকরীর মূল্য!

ভূপেন আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা, তাহার ইচ্ছা ছিল—ভূপেন অধ্যাপকের কাজ করে। দার্জ্জিলিং-এর সেই নিভৃত বেঞ্চিতে বসিয়া বলা কথাগুলা যেন আজও কানে বাজিতেছিল, 'আপনি আর কিছু করছেন, এ আমি ভাবিতে পারি না!'

হতাশা ও ক্ষোভে ভূপেনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, অধ্যাপকের পদ পাওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত তাহার কাছে হাস্যকর। প্রথমতঃ এম-এ পাশ করার সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ শুধু এম-এ পাশ করিয়া প্রোফেসরী করিতে ঢুকিবার আগে অনেকগুলি মুরুব্বি প্রয়োজন হয়। সে মুরুব্বি তাহার নাই। না, ও-সব কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। গরীব কেরাণীর ছেলে সে—স্বপ্ন দেখার সময় নাই।···কিন্তু সে যে আজই মোহিত বাবুকে সদম্ভে চিঠি দিয়াছে, তাহার সাহায্য ছাড়াও সে এম-এ পরীক্ষা দিবে, সে কি এতই ভুয়া, অন্তঃসারশূন্য?···একটা উপায় আছে প্রাইভেটে দেওয়া—কিন্তু সওদাগরী অফিসের চাকরীর সহিত শিক্ষার সাধনা—এ কি সম্ভব!···তা ছাড়া, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কিছু করিতেছে, এ কথা আজ যেন সে ভাবিতেই পারে না।···টিউশ্যনী ছাড়া অন্য কোন রকমে শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা যায় না?

অকস্মাৎ তাহার চোখ দু'টি জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক ত—মাষ্টারী ত সে করিতে পারে। তাহার অনার্স-এর এটুকু মূল্যও কি মিলিবে না? বাংলা দেশের ইস্কুল-মাষ্টারীর বেতন সামান্য—কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের খরচা ত চলিবে!···এম-এ পরীক্ষা দেওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, অবসর বেশী, পড়াশুনার সময় পাওয়া যায়। তাতেও যদি সে নিজের উন্নতি করিতে না পারে ত সেটা তাহার নিজেরই অক্ষমতা।

সে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে মন স্থির করিয়া ফেলিল,—ইস্কুল-মাষ্টারীর চেষ্টাই দেখিবে সে, 'তাই হোক্ সন্ধ্যা—তোমার চোখে ছোট আমি কিছুতেই হবো না!'

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,"—বঙ্কিমচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই বিচিত্র সংসারে কত না বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আমরা দেখতে পাই। যোগীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথা স্বতন্ত্র—যার দ্বারা মানুষের স্থূল বহিঃসত্তার অন্তরালে গুপ্ত গভীর সম্ভাবনাগুলি দেখা ও নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়াও ব্যবহারিক জগতে সাদা চোখেই আমরা পাই কতই না বহু বিচিত্র মানুষের টাইপ। চতুর, মূর্খ, ক্রূর, সরল, রসিক, ভাবালু, শান্ত, চঞ্চল, পাগলাটে, অহঙ্কারী, গম্ভীর, বুদ্ধিমান্ এমনই কত-শত বিভিন্ন জীব অহরহঃ আমাদের চোখের উপর দিয়ে অবিরাম জীবনের শোভাযাত্রায় চলেছে! শুধু এদেরই যদি একটা বিশেষ টাইপকে ধরা যায়, যেমন ধরুন বোকাটে ভোঁতা টাইপ; তার মধ্যে এমন বিশটি বোকা মানুষকে একত্রে সারিবন্দী করে দাঁড় করালে দেখা যাবে তারা বিশ জনে বিশ রকম, বিভিন্ন,—তারা বোকামীর তারতম্যে কেউই অন্য কারু মত নয়। তাদের কেউ অধাতস্থ বা বাতিকগ্রস্ত জীব, কেউ বা শুধু স্থূলবুদ্ধি বশতঃ নিরেট গবেট; কেউ বা অস্থিরমনা বলে স্থির হয়ে কিছু ধরতে পারে না, হঠাৎ আবেগ বশে ক্রমাগতঃ ভুল করে বসে, বুদ্ধির শান্ত একাগ্র সূচ্যগ্র নিয়োগ-ক্ষমতা সে আধারে গজায়নি। বানরের মত অস্থির প্রাণধর্ম্মী মানুষও আছে, বানর যেমন কাজে অকাজে অনর্থক এ-ডাল ও-ডাল করে মরে, কিছুতেই অকাজ বা কুকাজ না করে পারে না, তেমনি অস্থিরগতি impulsive তরল মানুষও এ জগতে বিস্তর আছে। অলস ক্ষিতিধর্ম্মী তমের অবতার মানুষের অপেক্ষা এরা সক্রিয় ও চঞ্চল বটে কিন্তু সমান বোকা। আরও বহু প্রকার নির্ব্বুদ্ধি মানুষের প্রকার-ভেদ দেখান যায়, তাদের অগভীর বা অস্থির বুদ্ধির অন্তর্নিহিত কারণ বিভিন্ন হলেও তারা সবাই বোকা পর্য্যায়ের মানুষ।

এমনই চতুরেরও আছে বহু বিচিত্র রকমারি, বুদ্ধিমানেরও আছে নানা শ্রেণী, ভাবালুরও আছে বহু জাতি। স্নায়বিক, প্রাণবান্ ও হৃদয়বান্ এই তিন ধারার মানুষের মিল থাকলেও তারা পরস্পর থেকে বিভিন্ন; কারণ, তাদের জীবনের ভিতই বিভিন্ন। কথাটা একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলা যাক্। যে দয়ালু আর যে দুর্ব্বল স্নায়ুর মানুষ, দু'জনেই রক্তপাত সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে তারা কি এক? এক জন হচ্ছে নিউরসিস্ রোগে রুগ্ন এবং অপর জন কোমল স্নেহার্দ্র প্রকৃতির মানুষ। প্রেম-প্রবণেরও আছে বহু রকম; সংসারে অধীর প্রেমিকও আছে, শান্ত প্রেমিকও আছে; প্রেমপ্রবণের মাঝে স্বার্থপর, নিঃস্বার্থ, ক্রূর, লোভী, একনিষ্ঠ, বহুনিষ্ঠ কতই না শ্রেণী বা প্রকারভেদ দেখা যায়, সুতরাং শুধু emotional বা ভাবপ্রবণ বললেই তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না। প্রেম সকলেরই অন্তরে অল্প-বিস্তর আছে কিন্তু দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রীর প্রেম ও ধীর নিঃস্বার্থ মহতের প্রেমের ধারা বা খেলা কখনই এক রকম হয় না।

মনোপ্রধান বা mental মানুষ, প্রাণ-প্রধান বা vital মানুষ, জড়প্রধান অর্থাৎ ক্ষিতিধর্ম্মী বা physical মানুষ থাকলেও মানুষের বৃত্তিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় তার সবগুলি যন্ত্রের যোগে অর্থাৎ মন প্রাণ হৃদয় ও দেহ দিয়ে—তাদের সকলের সহযোগিতায়। এই জন্য মানুষের এত রকমও শ্রেণী সম্ভব হয়েছে। যার প্রকৃতির ওপর বুদ্ধি বা reasonএর প্রভাব বারো আনা এবং যার ওপর মাত্র চার আনা, তাদের দু'জনের মাঝে কতখানি পার্থক্য হতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু, শুধু নিজের হৃদয় মন প্রাণ দেহ দিয়েই মানুষ চলে না, কারণ মানুষ পৃথক্ অসংলগ্ন একটা কিছু নয়, সে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত, চারি দিকের মানুষ জীব জন্তু বৃক্ষ লতা এমন কি লোক-লোকান্তরের সঙ্গেও তার চলেছে অহরহঃ লেন দেন আদান-প্রদান মন-বিনিময়। কত সব কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল শক্তির প্রভাব নানা ছিদ্র দিয়ে তার ওপর এসে পড়ছে, কত জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম ও ভাব-প্রবণতা তাকে দিতে চেষ্টা করছে গতি। একটি অসীম শক্তি-সমুদ্রে সে ভাসছে, তারই বুকের দোলায়িত তরঙ্গ হয়ে, গোটা সমুদ্রটি এবং তার কোটি কোটি ঢেউ তাকে সর্ব্বক্ষণ দিচ্ছে গতি ও দোলা!—এই তো মানুষ?

এই সব বহু-বিভিন্ন জাতির মানুষকে একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই বোঝা যাবে যে, কত কঠিন এই আধার নির্ব্বাচন; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে লোক-লোকান্তরে যার যোগদৃষ্টি জাগ্রত, শিবের চোখে যে চোখ মিলিয়েছে, তারই দ্বারা এ নির্ব্বাচন নির্ভুল ভাবে হওয়া সম্ভব; তবু যে খণ্ডযোগীদের ও অপূর্ণ গুরুদের আংশিক দৃষ্টিতে ও জ্ঞানে এ কাজ চলছে, তার কারণ জীবনের নিয়ামক আমরা নই, আমরা যন্ত্র, যন্ত্রের পিছনে আছে মহাশক্তির অভ্রান্ত প্রেরণা। সেই এক অভিন্ন মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ হচ্ছে প্রারব্ধ, পুরুষকার, গুরু, পরিবেষ্টন, গ্রহ-সংযোগ, এমনই আরও কত কি। আমি যে ভাবে মানুষের পিছনের সম্ভাবনাগুলিকে ব্যাখ্যা করলাম, সে ভাবে বুঝলে সহজেই অনুমান করা যায়, পরমার্থ-পথের পথিক সিদ্ধ গুরু দূরে থাক, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ও কতখানি অজ্ঞ হয়ে যা'-তা' করে ছেলে ঠেঙিয়ে ছাত্রকে মানুষ হবার পথে চালনা করেন! কোন্ অপরিণত মানুষটিকে কি ভাবে ধরলে তার অন্তরস্থ মেধা-নাড়ী জাগবে, চরিত্রের বাঁকা দিক সোজা হবে, তা' কয়টি শিক্ষক কতটুকু বোঝেন এবং বুঝে দরদীর স্পর্শ দিয়ে তাকে মানুষ করেন? এ সব ক্ষেত্রে সত্য সত্যই "Ignorance is bliss"—অজ্ঞতাই এক প্রকার আশীর্ব্বাদস্বরূপ। আমাদের এত অজ্ঞতা, এত ভুল-ভ্রান্তিতেও যে মানুষের আমরা খুব বেশী ক্ষতি করতে পারি না, তার কারণ এই জগচ্চক্র চলছে তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত স্বভাবে (স্ব-ভব), স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতির ছন্দে; সে গতি ও সে ধারা ঘুরে ফিরে সব ব্যর্থতা ও বিপত্তি কাটিয়ে পরিণামে নিজেকে সফল করবেই।

Chiroর জ্যোতির্বিদ্যার বা সামুদ্রিকের গ্রন্থে মানুষের নানা গঠনের আঙুল, নাক, চোখ, ইত্যাদি আকৃতি নিয়ে চিত্র সাহায্যে চরিত্র-বিচার করার প্রণালী লেখা আছে। আবার Phrenology মানুষের মাথার বিচিত্র গঠন থেকে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাবের বা প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে শেখায়। এ সবগুলিতেই আছে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণ করার বিভিন্ন পথ। বাহিরের এই স্থূল মানবাধারের প্রতি অঙ্গে প্রতি অংশে রয়েছে সেই মানুষটির অন্তর্নিহিত স্বধর্ম্মের লক্ষণ ও পরিচয়। এই সব বহির্লক্ষণ দেখে এবং প্রধানতঃ সূক্ষ্ম জ্ঞান বা প্রজ্ঞার (intuition) সাহায্যে এই নিগূঢ় অন্তর্নিহিত স্বভাবের সম্যক্ সন্ধান পাওয়া যায়।

এই স্বধর্ম্ম ও স্বভাব এমনই অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী যে, তার বিকাশ কেউ রোধ করতে পারে না। প্রতি মানবাধারের এই অমোঘ স্বধর্ম্মকে লক্ষ্য করেই শাস্ত্রকার বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" কর্ম্মীকে গোড়ায় ধর্ম্মের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি ও ভোগের অবসর না দিয়ে তাকে প্রথমেই কর্ম্মবিরতি অভ্যাস করানোর মত বিড়ম্বনা আর নেই, তার ফলে সাধনার্থী ও গুরু দু'জনেই ক্রমাগত ব্যর্থতা অর্জ্জন করে চলেন। স্বভাব যাকে কর্ম্মপথে অহরহঃ টানছে, তাকে কিন্তু গোড়ায় যদি প্রাণ ভরে কর্ম্ম করতে দেওয়া যায়, তা হলে ধর্ম্মের প্রতি স্বভাবজ টানকে সে ভোগে তৃপ্ত করে কতকটা ক্ষীণ করে আনতে পারে, তখন তার অবসাদগ্রস্ত ভোগতৃপ্ত প্রশান্ত চিত্ত আপনিই কর্ম্মবিমুখ হয়। বৈরাগ্য তখন আপনি আসে এবং তাকে যোগমুখী করে; উপদেশ বা ক্রিয়া মন্ত্রসাধন-প্রচেষ্টা সকলই কর্ষিত উর্ব্বর ভূমিতে পড়ে জীবন্ত সতেজ হয়ে গজিয়ে ওঠে। স্নেহপরতন্ত্রা অথচ সন্তানবঞ্চিতা নারী অন্ততঃ পরের সন্তানকে বা সযত্ন-পালিত পশুপক্ষীকে বুকে ধরে সে সহজাত স্নেহের অধীর ক্ষুধাকে তৃপ্ত না করে পারে না। সাধনপথে তাকে নিতে হ'লে ভগবানকে গোপালরূপে তার ইষ্ট করে দিতে হয়, গুরুকে বা কোন পরের সন্তানকে বালগোপালরূপে ভালবেসে সে নারী সহজে ক্রমশঃ ভগবানে ডুবতে বা একাগ্র হতে পারে। তাকে বেদান্তী-গুরু এসে বেদান্তের শুষ্ক জ্ঞানাত্মক উপদেশ দিলে সে ভক্তিমতী প্রেমপ্রবণা নারীর কোমল চিত্ত শুকিয়ে কঠিন হয়ে যায়, সেই মরু-প্রান্তরে দম্‌কা বাসনার হাওয়া তাকে একাগ্র হতে দেয় না।

জ্ঞানী স্বভাব-পণ্ডিত আবার কর্ম্ম বা প্রেমের কোনটারই ধার ধারে না। বুদ্ধিজীবী বিচারশীল মানুষের কাছে প্রেম বা স্নেহ হাস্যকর দুর্ব্বলতা-বিশেষ, তার চোখে কর্ম্মপ্রবণতা চঞ্চল অগভীর সফরীর ধর্ম্ম। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, ঐ অধীর কর্ম্মী অমন করে কেন ব্যর্থ কর্ম্মে ছুটে বেড়ায়, ঐ স্নেহ-অন্ধ মা কেন মাতাল অকৃতজ্ঞ অত্যাচারী সন্তানের পিছনে এত লাঞ্ছনা ভোগ করেও তাকে ছাড়তে পারে না। কর্ম্মীর অশ্রান্ত প্রাণশক্তি প্রেমিকের বুকের অযাচিত প্রেরণা ও জ্ঞানীর ভাস্বর মেধা একই আধারে সমান প্রাবল্যে ক্বচিৎ দেখা যায়—এমন মানুষ সত্য সত্যই দুর্ল্লভ, যার তিনটি প্রধান চক্র (মন প্রাণ হৃদয়) বা জীবন-কেন্দ্রই সমান বিকশিত।

যে মহাশক্তি জীব-জগৎরূপে রূপায়িত পুষ্পিত হচ্ছে, সে এসেছে অগণ্য আধারে অনন্তমুখী প্রেরণা নিয়ে রূপ গ্রহণ করতে, দলের পর দলটি মেলে বিকশিত হতে; তাতেই তার সার্থকতা ও আনন্দ। প্রত্যেক আধারস্থ চিৎশক্তিকে তার স্বভাবের ধারায় ফুটতে দিতে হবে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তার মোড় ফিরিয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে তারই নিজস্ব পূর্ণাভিব্যক্তির পথে, তাতেই তার সত্যকার চরিতার্থতা ও কল্যাণ। একটা সুদূরের বৃহত্তর সম্ভাবনার লালসায় ব্যস্ত হয়ে অসময়ে অযথা তাকে তাড়না করে লাভ নেই; তার স্বভাবকে চেপে সে ...কের আতিশয্যকে দমন করে, রোধ করে কোন শ্রেয়ঃই নেই, কারণ, আপাতদৃষ্টিতে যত ব্যাকুল ও উন্মার্গগামীই হোক তার স্বভাবই তার ...ক্ষে সহজ ও সুগম পথ—line of least resistance, কি ভোগ-পথে আর কি ত্যাগ-সাধনায়। এই ভাবেই নিজের স্বধর্ম্ম অনুসরণ করে নিপুণ চালকের হাতে জীবন তার মধুর সার্থকতায় ভরে ওঠে —'যোগঃ ভোগায়তে, ভোগঃ যোগায়তে"। জ্ঞানী রামপ্রসাদ জ্ঞানে-অজ্ঞানে আলোয়-অন্ধকারে এই সমান সার্থক গতিকে লক্ষ্য করেই গেয়েছিলেন,—

"আমি উজিয়ে যাব উজান কালে
ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।"

আসলে জীবনের সমস্তটাই গতি, বিকাশ, পরিণতি ও উন্নতি, কিছুই এর ব্যর্থ নয়; কারণ, একই পরম সত্য আপন শক্তির আবেগে ফুটে চলেছে তার নিগূঢ় পরম ছন্দে; একটি সমগ্র সুসঙ্গত পূর্ণ দৃষ্টি পেয়ে যে সৃষ্টি-রহস্যের এই মূল সত্য, এই গভীর রহস্য ও ইঙ্গিত যে বুঝতে না পেরেছে, তার পক্ষে মানুষকে গড়তে বা চালাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এই নিত্য গতিশীল স্বতঃরূপায়িত শক্তিরই তুমি তরঙ্গ, তুমি গুরু ও তোমার শিষ্য, তোমরা উভয়েই এই জীবন্ত রূপোন্মুখ শক্তির দুই মুখ, দুই জন দুই জনকে না বুঝলে এবং তোমাদের অন্তরে অনুস্যূত সেই শক্তিসিন্ধুকে না চিনলে সেই মহামায়ার লীলার সাথী হ'তে পারবে না।

তুমি নিজে শুষ্ক ভোগ-বিরক্ত সন্ন্যাসী হ'তে পার, কারণ, তোমার এসেছে বাসনা-রস শুকাবার সময়, ভোগ-বিরতির কাল, গুটিয়ে সংহত হবার অন্তর্ম্মুখী টান; তা বলে তোমার কাছে যে অতৃপ্ত কর্ম্মচঞ্চল বা স্নেহ-ব্যাকুল চিত্তটি এসেছে পথ চলার সম্বল সঞ্চয়ের জন্য, তাকে না বুঝে তোমার রিক্ত শুষ্কতার মরুপথে তাকে টানতে যাওয়া তোমার পক্ষে বিড়ম্বনা, তার পক্ষেও দুর্দ্দৈব। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব পুনরেবাভিবর্দ্ধতে"—হবির মুখে অগ্নির মত ভোগে ভোগ বেড়েই চলে এ কথা সত্য বটে, ভোগও যে মহাশক্তিরই খেলা, অনন্ত তার বৃদ্ধির সামর্থ্য, সে বাড়বে না কেন? সে ইন্ধনযোগে বাড়ে বলে সকল ক্ষেত্রেই ইন্ধন সরিয়ে নেয় ত্যাগ-বাতুলে, তেমনি আবার সকল ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে ইন্ধন যুগিয়ে দেয়ও বাসনা-পাগলে বা ভোগ-মূঢ়ে। আমরা ক্ষুদ্র ও আসক্ত জীব বলেই ভোগ বা ত্যাগের মোহে পড়ি, একটাকে স্বীকার করে অপরটাকে তিরস্কার করি। জগচ্ছক্তি কিন্তু পরম মুক্ত, তাই মহামায়া দশ হাতে পরম নির্ব্বিচারে ভোগ ও ত্যাগ, রূপ ও অরূপ, পাপ ও পুণ্য সমান আদরে গড়ে চলেন। তাই মায়ের জাগা ছেলে—যে মায়ের খেলার স্বচ্ছন্দ গতি ও ধারা বুঝেছে তাঁর কোনই ব্যস্ততা নেই মানুষকে আলোর পথে জোর করে টানবার; সু ও কুর মোহ তার নেই; উৎকট কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞান বা অহঙ্কারও তার নেই। মোহের অধীর কর্ম্মে কল্যাণ প্রসব করে না, কল্যাণ প্রসব করে মুক্ত মনের নিরহঙ্কার কর্ম্মে যে কর্ম্ম জগচ্চক্রের সঙ্গে সুর বাঁধা।

যোগপথে গুরুর অধীনে সাধনা করে সফল হবার জন্যে দু'টি জিনিষ চাই, গুরুর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি—শিষ্যের প্রকৃতি ও আধার বিচারের জন্য ও তাকে তদনুযায়ী তার পরম সার্থকতার পথে চালনা করার জন্য; শিষ্যেরও চাই তার আধারে যোগ-সাধনার অনুকূল উপাদান ও শক্তি। জগতে মানুষ এসেছে বিভিন্ন রকম শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করতে; শুধু মানুষ কেন, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-লতা, মাটি-পাথর, ধাতু সব কিছুই উৎপন্ন হয়েছে এক এক প্রকার উপাদানের সমবায়ে গঠিত হয়ে, এক একটি বিশেষ কাজে লাগবার জন্য। জলের পরিবর্ত্তে তৈল পান করে তৃষ্ণা দূর করা যায় না, বেল গাছে আম ফলে না, বানরকে দিয়ে মানুষের কাজ হয় না,

কবিকে দিয়ে লাঠিবাজী চলে না। এটা অতি সহজ বুদ্ধির কথা। ঊর্দ্ধের পরম লোকের আলোর দিকে একেবারে রুদ্ধ বহু গুণী ও জ্ঞানী মানুষ সংসারে এসেছেন, যোগ-সাধনার জন্য নয়, কিন্তু বিভিন্ন পথে লোক-কল্যাণের জন্য। প্রকৃতির নিগূঢ় ব্যবস্থায় নেই যে, তাঁরা পরাজ্ঞান পেয়ে বৃহতের পথে মুক্ত হয়ে যাবেন। এটা তাঁদের ত্রুটিও নয়, নিকৃষ্টতার চিহ্নও নয়।

অন্যান্য বিদ্যানুশীলনের পথের মত পরাবিদ্যার অনুশীলন-পথেও চাই কুশলী নির্দ্দেশক বা গুরু এবং উজ্জ্বল উর্দ্ধমুখী আধার, তবেই এ সাধনা সফল হয়। প্রকৃতির কোল থেকে এ পথের জন্যও এসেছেন চিহ্নিত মানুষ সব এই পথেরই অনুকূল উপাদান ও অনুপ্রেরণা নিয়ে। তাঁদেরই পক্ষে এ সাধনা সহজ; তাই আধার-বিচার একান্ত দরকার। শ্রদ্ধেয় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমি অঙ্কন-বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় বলেছিলেন, 'চিত্রবিদ্যার ছ'টা অঙ্গ কেউ শেখে ৬ দিনে, কেউ শেখে ৬ হপ্তায়, কেউ শেখে ৬ মাসে এবং কেউ শেখে ৬ বছরে। ৬ বছরেও যে ছয়টি অঙ্গকে আয়ত্তে আনতে না পারে, সে এ পথের নয়।' প্রত্যেক সাধনার ও অনুশীলন-পথের আচার্য্য এই সহজ শ্রেণী-বিচারের রহস্যটি জানেন। প্রকৃতির এই সহজজাত কৌলিন্যের ও প্রতিভার ঘরে ডিমোক্র্যাশী বা সাম্যবাদের স্থান নাই; ওটা নিতান্তই মানুষের মন-গড়া থিওরী।

চৈত্র-মধু

শ্রীশান্তি পাল

ফাগুন গেল,—চৈতী এল,
মাধবী কই ? নয়ন মেল।
আজ কে না কি তোমার বিয়ে
গোধূলি পায়,—সত্যি কি এ ?
মলয় এসে দখিণ থেকে
ফুল-বৌয়েরে কইছে ডেকে,—
বর এসেছে রাজার রাজা;
ঢুলি কোথায় ?—বাজ্না বাজা।
জুঁই, চামেলি, রঙন, মতি,
কোথায় চাঁপা, পাঁচ এয়োতি ?
বসন্ত যে বরের বেশে
দুয়ারে দেখ্ দাঁড়িয়ে যে সে।
ভোমরা সে তা' শুনতে পেয়ে
সানাই-এ 'পোঁ' ধরল যেয়ে,
মৌমাছিও যন্ত্র নিয়ে
বেরিয়ে প'ল গুন্গুনিয়ে।
হলুদ গায়ে ছুঁইয়ে তারা
ঢুকল প্রজাপতির পাড়া,
আগ বাড়িয়ে পথকে যেতে
আমের বনে বস্‌ল মেতে।
পারুল দেখে আড় নয়ানে,
কুঁচকে ভুরু ঘোমটা টানে;
ফুল-সোহাগী অম্‌নি নেমে
দু'গাল চুমে পাপ্ড়ি ভেঙে।
গোলাপ হেসে কইল তারে,
অতিথি, ছি ছি, দাঁড়িয়ে দ্বারে,
লজ্জা-সরম নেইক' মোটে,
অকালে ফুল সব কি ফোটে ?
রঙ্গ ছাড়, হেলছে বেলা
এখনো ঢং ? এ কি খেলা !
জল সইতে কখন যাবি
কখনই বা বৌ নাওয়াবি ?
কখন ছিরি গড়বি তোরা,
হাই আমলা, ফুলের তোড়া ?
স্ত্রী-আচার ও কুশণ্ডিকা
ক'রবি কবে ?—ভ্রমরিকা।
কথার খোঁচা সইতে নেরে
পালিয়ে গেল কানন ছেড়ে,
ঝাঁঝলা রোদে ঝাঁঝিয়ে জলে
নামল গিয়ে দীঘির জলে;
পদ্মবনে জাগল সাড়া
বিছিয়ে দিল আসন তারা,
সাজিয়ে সভা মৃণাল মেয়ে
ছলছলিয়ে রইল চেয়ে।
বর বসবে কোথায় আগে
সেইনে' সব ঝগড়া লাগে
শিরীষ বলে,—এইখানেতে,
দাও না হেথা আসন পেতে ?
বকুল ব'সে একলা কাঁদে
পলাশ বলে,—আলপনা দে।
কেশর বেলা গুম্‌রে উঠে
ছড়িয়ে গেল পত্রপুটে।
তরুলতায় কিংশুকেরে
শাঁখ হাতে দে' ফেললে ফেরে,
মল্লিকা সে চালাক বড়
উলু দে' সব ক'রলে জড়।
অশোক বেঁধে তূণীর পিঠে
গোপনে শর মারল মিঠে,
কুন্দবালা উড়িয়ে ধ্বজা
দূর থেকে সে দেখছে মজা।
উঠল ডেকে দোয়েল শ্যামা—
নামা হেথায় পাল্কী নামা
কোকিল গিয়ে মন্ত্র প'ড়ে
বরকে ধ'রে তুলল ঘরে।
মাধবী আজ বিয়ের ক'নে
সেই কথাটি রইল মনে,
বাসরে বর বসল বধূ
ঝরছে শুধু চৈত্র-মধু।

কালীপূজা

শ্রীঅমলা দেবী

কালীপূজার দিন। সকাল আটটা। কার্ত্তিক মাস সবে পড়িয়াছে। শরৎ শেষ হইলেও হেমন্তের পুরাপুরি আবির্ভাব এখনও হয় নাই, দিগন্তের কোলে কুহেলিকার ক্ষীণ আভাস দেখা গিয়াছে মাত্র। আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল। ঘাসের উপর প্রচুর শিশির-কণা জমিয়া রহিয়াছে। শিউলি-গাছের তলায় এখনও ঝরা-ফুলের ছড়াছড়ি। সূর্য্য চক্রবাল-রেখা ছাড়াইয়া কতকটা উপরে উঠিয়াছে। মুখুজ্যেদের বড়কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর মুখুজ্যের বৈঠকখানার সামনের জমিটা কাঁচা রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর তাঁহার চার বৎসর বয়সের পৌত্রকে কোলে লইয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স ষাট্ পার হইয়া গিয়াছে। লম্বা কাহিল গঠন, রং ফর্সা; মাথার চুল সব পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন মুখ বার্দ্ধক্য-রেখাকীর্ণ। পরিধানে পাড়হীন ধুতি, কোঁচাটি কোমরে গোঁজা। গায়ে ফতুয়া ও শাদা সুতি চাদর—চাদর দিয়া নিজের চেয়ে পৌত্রকেই ভাল করিয়া ঢাকিয়াছেন।

সম্মুখেই মা কালীর মন্দির। অতি প্রাচীন মন্দির; এক কালে যখন মুখুজ্যেরা গ্রামের জমিদার ছিল, তখনকার তৈয়ারী। বহু টাকা খরচ করিয়া ভাল-ভাল মিস্ত্রী দিয়া নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল। কার্নিশের ধারে ধারে কত রকমের নক্সা—থামের উপরে কত রকমের কারিগরি। সামনে প্রকাণ্ড আটচালা—এখানেও খুঁটিতে ও চালের কাঠামোতে নানা কারুকার্য্য। এখন মন্দিরের জীর্ণাবস্থা—দেওয়ালে নোণা ধরিয়া চূণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে—সমস্ত কার্নিশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—শেওলা ধরিয়া মন্দিরের শাদা রং কাল হইয়া উঠিয়াছে, ছাদে ফাটল ধরিয়াছে, এখানে-সেখানে অশ্বত্থের চারা গজাইয়া উঠিয়াছে। আটচালার চালের অবস্থাও অত্যন্ত জীর্ণ—কত দিন যে নূতন করিয়া ছাওয়া হয় নাই কে জানে! কিন্তু মুখুজ্যেদের কাহারও সে দিকে লক্ষ্য নাই। ভাগ্যে মা কালীর নিজস্ব কিছু জমি আছে, প্রজার খাজনা আছে, তাই কোন মতে বৎসরে একবার পূজাটা চলিয়া যায়—না হইলে পূজা কোন্ দিন বন্ধ হইয়া যাইত! মা কালীর জমি বিশ্বেশ্বর নিজে চাষ করান, খাজনা নিজে আদায় করেন। অন্যান্য শরিকরা ইহাতে অসন্তুষ্ট। তাহাদের ইচ্ছা—সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়া মা কালীর পূজা তুলিয়া দেওয়া। যাহাদের নিজেদের অন্নসংস্থান নাই—তাহাদের দেবী-পূজা করার স্পর্দ্ধা না থাকাই ভাল। এ সব সাজে বড়লোকদের—অর্থাৎ গণপতি বাঁড়ুজ্যের—যার বৎসরে লাখ টাকা আয়!

গণপতি বাঁড়ুজ্যে মুখুজ্যেদেরই দৌহিত্র। আগে অবস্থা ভাল ছিল না। এক কন্‌ট্রাক্টারের অধীনে সরকারের কাজ করিত। পরে কন্‌ট্রাক্টারের অধীনে ছোট-খাটো কন্‌ট্রাক্টারী সুরু করে—ক্রমে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর কন্‌ট্রাক্টার—তার পর যুদ্ধের বাজারে মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টার—এখন লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে সে। গ্রামে বিরাট বাড়ী করিয়াছে, গাড়ী করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের বাজারে সস্তা দামে এ তল্লাটের বিস্তর জমি কিনিয়া জমিদার বনিয়াছে। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলে তাহার অন্নদাস। মুখুজ্যেদের কেহ তাহার সরকার, কেহ গোমস্তা, কেহ বাজার-সরকার, কেহ মুন্সী, কেহ বা নিছক মোসাহেব। যাহারা চাষী, তাহারা ভাগে গণপতির জমি চাষ করে, প্রাপ্য অংশ গণপতিকে বিক্রয় করে, গণপতি তাহা আবার উচ্চমূল্যে মিলিটারীকে সরবরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করে। বাউরী-হাড়িদের মেয়ে-পুরুষ গণপতির কাছে কুলি-কামিনের কাজ করে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা যুবতী রূপসী—তাহারা গণপতিকে দেহ বিক্রয় করে। কাহাকেও ন্যায্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করে না গণপতি। কাজেই শোষিত হইয়াও কেহ গণপতির প্রতি ক্ষুব্ধ নয়—বরং কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। গ্রামের মধ্যে শুধু বিশ্বেশ্বর গণপতির কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। গণপতির সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই কখনও—পূজা-পার্ব্বণে আত্মীয়ের মত আমন্ত্রণ করিয়াছেন, দেখা হইলে কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন—অসুখে-বিসুখে খবরাখবর করিয়াছেন। গণপতিও ভিতরে ভিতরে তাঁহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলেও প্রকাশ্যে কখনও তাঁহার অসম্মান করে নাই। বরং গত বৎসর দারুণ বিপদের দিনে পরম আত্মীয়ের চেয়েও সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহেশ্বর রোগশয্যায়; সহরের ডাক্তাররা হাল ছাড়িয়া দিল; বেয়াই কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিবার জন্য পরামর্শ দিলেন; কিন্তু হাতে অর্থের অস্বচ্ছলতা হেতু বিশ্বেশ্বর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। গণপতি লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া নিজে আসিয়া বিনা খতে তাঁহাকে তিন হাজার টাকা গণিয়া দিল, এবং নিজে ডাক্তার আনিবার ব্যবস্থা করিল। মহেশ্বরের মৃত্যুর দিনেও গণপতি কম সাহায্য করে নাই। বাড়ীতে তাঁহার পুত্রবধূ ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছিল—তিনি নিজে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা—ক্ষয়কাশের রোগী—বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্পর্শ করিবে না বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সে দিন গণপতি দাঁড়াইয়া মহেশ্বরের শেষ-কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর অবশ্য তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে সেরা সম্পত্তি—বামুন-বেড়ার এক-চকে পনেরো বিঘা জমি গণপতিকে দিয়া সুদে-আসলে তাহার ঋণ শোধ করিয়াছেন—কিন্তু সে দিনের সেই উপকারের জন্য তিনি অন্তরের মধ্যে গণপতির কাছে ঋণী রহিয়া গিয়াছেন। এই ঋণ খানিকটা শোধ করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। মা কালীর জমি মুখুজ্যেদের জমিদারীর মধ্যে সেরা জমি। গণপতির তাহার উপর অত্যন্ত লোভ। সে এই জমির পরিবর্ত্তে কালীপূজার সমস্ত ভার বহন করিবার প্রস্তাব করিল। উপরন্তু মা কালীর মন্দির ও আটচালা সংস্কার করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। মুখুজ্যেদের সকলে সাগ্রহে সম্মতি দিল—শুধু বিশ্বেশ্বর একা বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। মা কালীর পূজায় গণপতি যদি সাহায্য করিতে চায়—তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু পূজার ভার হস্তান্তরিত করা চলিবে না। তাহাতে বংশের অকল্যাণ হইবে। অন্ততঃ তিনি যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন—তত দিন পূজা চালাইয়া যাইবেন। এই লইয়া মুখুজ্যেরা সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে আদালতের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে কি না—উকীলদের সঙ্গে না কি পরামর্শ করিতেছে। একমাত্র পৌত্রের মুখের পানে তাকাইয়া তিনি স্থির হইয়া আছেন। এ বৎসর এখনও পর্য্যন্ত মুখুজ্যেরা যোগ

কালী-মন্দিরের দিকে পা বাড়ায় নাই, বোধ হয় পূজায় যোগও দিবে না। ওদিকে গণপতি বিরাট আড়ম্বরে কালীপূজার আয়োজন করিতেছে। মুখুজ্যেরা সকলে এবং গ্রামের সকলে তাই লইয়া মত্ত হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মন্দিরে কেহ উঁকি পর্য্যন্ত মারে নাই।

গণপতির পূজামণ্ডপ হইতে নহবতের মিষ্ট সুর কানে আসিতে লাগিল। পূজার তিন দিন পূর্ব্ব হইতে নহবৎ বসাইয়াছে গণপতি; এ তল্লাটের যত ঢাকী আছে—সকলকে বায়না করা হইয়াছে; তাছাড়া, ব্যাণ্ড-ব্যাগপাইপ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে যাত্রার দল—রাণীগঞ্জ হইতে বাইনাচ আনা হইতেছে! বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িল—তাঁহাদের কালীপূজায় আগে কত ধুমধাম হইত। সাত দিন ধরিয়া নহবৎ বসিত। কত বাজনা-বাদ্যি হইত—বাজি পুড়িত, আটচালার সামনে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে মতিলাল রায়ের, নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের যাত্রা হইত—হাজার ব্রাহ্মণের সেবা হইত, সারা গ্রামের কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ী চড়িত না দু'দিন—এ তল্লাটের যত কাঙ্গালী পেট ভরিয়া লুচি-মোণ্ডা খাইয়া মুখুজ্যেদের জয়গান করিতে করিতে ঘরে ফিরিত। শৈশবে এই সব নিজের চোখে দেখিয়াছেন—যৌবনে নিজের হাতে ভার লইয়া অতটা করিতে পারেন নাই—তবু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন। আর এখন? একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল তাঁহার।

নহবতের সুর কখন্ থামিয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে, একটি মেয়েমানুষের উচ্চকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুর। বাঁড়ুজ্যে-পাড়ার এক জন জোয়ান ছোকরা তিন দিনের জ্বরে মারা গিয়াছে সে দিন—তাহারই মায়ের কান্না। গ্রামে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইয়াছে। ঘরে ঘরে রোগী, দু'-এক জন মারা যাইতে সুরু করিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর গায়ের চাদরটা পৌত্রের গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন।

খোকাকে মন্দিরের চাতালে নামাইয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন—দাদু, নমো কর। খোকা দাদুর শিক্ষা-মত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিশ্বেশ্বরও উঠানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই কে থামের আড়াল হইতে গুরু-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—মুখুজ্যে মশায়ের কুশল তো?

এ কণ্ঠস্বর বিশ্বেশ্বরের সুপরিচিত। মা কালীর প্রধান পূজারী খাঁদা গোঁসাইয়ের। কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলেন—খাঁদা গোঁসাই বারান্দার এক পাশে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া, পাতার তৈয়ারী লম্বা নলের উপর কলিয়া বসাইয়া তামাক খাইতেছেন। বিশ্বেশ্বর প্রশ্ন করিলেন—কখন্ এলেন?

খাঁদা গোঁসাই জবাব দিলেন—এই কিছুক্ষণ আগে। ভাল ত সব?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—ভাল! হ্যাঁ, ভালই আছে সব—বলিয়া ম্লান হাসিলেন।

খাঁদা গোঁসাইয়ের লম্বা-চওড়া দেহ, বিস্তৃত বুক, মেটে রং, লম্বা ধাঁচের মুখ, চ্যাপ্টা নাক, টাঙ্গির মত গোঁফ। এক কালে শক্তিমান্ বলিয়া খ্যাতি ছিল তাঁহার। এখন বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, গাত্রচর্ম শিথিল, মাথার চুল, ভুরু ও গোঁফ পাকিয়া শণের মত শাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও বেশ সোজা হইয়া চলেন, খাড়া হইয়া বসেন, দশ-বারো ক্রোশ একটানা হাঁটিতে পারেন এবং একটি ছোট-খাটো পাঁঠা অবলীলাক্রমে হজম করিতে পারেন।

বিশ্বেশ্বর খোকাকে ডাকিলেন—দাদু, এস। গোঁসাইএর বিশাল চেহারা দেখিয়া খোকা বোধ করি ভয় পাইয়াছিল। ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়া আসিয়া দাদুর কোলে উঠিল। গোঁসাই কহিলেন—এইটিকে রেখেই বুঝি মহেশ—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—হ্যাঁ। খোকাকে কহিলেন—দাদু, গোঁসাই মশায়কে নমো কর। খোকা দুই হাতে দাদুর গলা ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইল। বিশ্বেশ্বর সস্নেহে পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন—ছিঃ দাদু!

খাঁদা গোঁসাই হাসিয়া কহিলেন—আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে বোধ হয়। হ্যাঁ গো দাদু! এস না, ভয় কিসের? খোকা তেমনি মুখ গুঁজিয়া রহিল।

মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপর নবনির্ম্মিত দেবী-প্রতিমা। সেই দিকে তাকাইয়া খাঁদা গোঁসাই কহিলেন—এবারের মূর্ত্তি কিন্তু আগের মত হয়নি, লম্বাতেও ছোট, মুখের গড়নও অন্য রকম।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আমাদের যারা বরাবর গড়ে, তারা তো আসেনি এ বছর, অন্য লোককে দিয়ে গড়াতে হয়েছে।

খাঁদা গোঁসাই কহিলেন—আসেনি কেন?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আমাদের এখানে ওরা বরাবর যা পায় তাতে ওদের পোষাচ্ছে না। কাজেই যেখানে বেশী পাবার আশা আছে সেখানেই গেছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—ওদের দোষও দেওয়া যায় না। সব জিনিষের দাম চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে, কাজেই সবাই মজুরি বাড়াতে চাচ্ছে। আমাদেরই না হয় দেবার ক্ষমতা নাই! কিন্তু যুদ্ধের বাজারে ব্যাংএর ছাতার মত বিস্তর হালি বড়লোক গজিয়ে উঠেছে, তারা যেমন দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে তেমনি খরচও করছে। এই দেখুন না, আমাদের গাঁয়ের গণপতি বাঁড়ুজ্যে—

খাঁদা গোঁসাই এতক্ষণ ঘাড় কাৎ করিয়া, চোখ বুজিয়া নির্লিপ্ত ভাবে তামাক টানিতেছিলেন, গণপতির নাম শুনিবামাত্র চাঙ্গা হইয়া ঘাড় সোজা করিয়া দুই চোখ মেলিয়া কহিলেন—জগপতি বাঁড়ুজ্যের ছেলে তো? ও তো লাখপতি হয়েছে শুনছি। তা কি হয়েছে গণপতির?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—কিছু হয়নি। কালীপূজো করছে এ বছর বিস্তর খরচ করে।

খাঁদা গোঁসাই দুই চোখ চড়াইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—তাই না কি?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আপনি শোনেননি!

খাঁদা গোঁসাই ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—না, আমি তো ঘরে ছিলাম না, শিষ্যবাড়ী গিছলাম, অজ পাড়া-গাঁ, চিঠি-চাপাটি লিখলেও পৌঁছুবার কথা নয়—বলিয়া চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিলেন—আপনাকে দেখে আমি তাই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। গণপতি আমাদের কারিগর, নাপিত, ঢাকী মায় আমার আত্মীয়দের পর্য্যন্ত হাত করেছে, শুধু পুরুতটি বাদ দিল কি করে!

খাদা গোঁসাই জোর করিয়া হাসিয়া কহিলেন—কি পাগল! বাপ-ঠাকুরদা যে কাজ করে গেছেন, সে কাজ কি ছাড়তে পারি! হাজার চিঠি লিখলেও আমাকে পেত না। ঢোক গিলিয়া কহিলেন—তা' ওখানে পূজো করবে কে?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আমাদের রামদাস আর তার ছেলে ক্ষুদিরাম।

খাঁদা গোঁসাই বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—রামদাস ওখানে বসলে এখানে কি হবে? আমি তো একা সব পারব না।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—রামদাসের ভাইপো গৌর থাকবে এখানে।

খাঁদা গোঁসাই উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—সেটা তো ষণ্ডামার্ক! পূজা-পদ্ধতির জানে কি!

বিশ্বেশ্বর ঔদাসীন্যের সহিত কহিলেন—কি করব বলুন! ওকে নিয়েই এক রকম করে কাজ শেষ করতে হবে আপনাকে।

বিশ্বেশ্বরের বাড়ীর ঝি আসিয়া কহিল—খোকাকে বৌদিদি একবার নিয়ে যেতে বললেন, দুধ খাওয়া হয়নি এখনও। খোকা এতক্ষণে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া, খাঁদা গোঁসাইএর দিকে মুখ ফিরাইয়া, বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—যাও, দাদু।

খোকা এক হাতে বিশ্বেশ্বরের গলা জড়াইয়া ঘাড় নাড়িল। বিশ্বেশ্বর তোষামোদীর স্বরে কহিলেন—যাও, দাদু, যাও। আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে। সকাল থেকে এমনই দাঁড়িয়ে থাকলে কি চলে? যাও—ঢাক বাজলে আসবে আবার।

গোঁসাই বাঁজখাই স্বরে কহিলেন—না যায় তো আমার কাছেই দেন ওকে—রেখে দিই এই ঝুলির ভেতরে।—পাশেই একটা খেরোর তৈয়ারী ঝুলিতে গোঁসাইয়ের কাপড়, গামছা, পুথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ছিল। সেই ঝুলিটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন—নাতি-ঠাকুরদাদা দু'জনকেই ধরবে বোধ হয়—বলিয়া গোঁফ চুমরাইয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিশ্বেশ্বর খোকার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিলেন—তাই ভাল।

খোকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ঝিএর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া কহিল—বাড়ী যাব।—ঝি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

গোঁসাই কহিলেন—আটচালার চালটার যে বড় দুরবস্থা দেখছি—ছাওয়ান উচিত ছিল এ বছর।

বিশ্বেশ্বর বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া গোঁসাইএর পাশে বসিয়া কহিলেন—খড় কোথায়?

গোঁসাই বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—আপনাদের এত বড় চাষ—খড়ের ভাবনা?

বিশ্বেশ্বর দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন—চাষ আর কারও বাড়ীতে নেই—জমি-যায়গা বিক্রী করে দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী সেজে বসে আছে সব। আমার কিছু খড় হয়েছিল—তা' গাই-গরুর খাওয়া আছে—ঘর ছাওয়া আছে। আর একাই বা কত দেব বলুন! শরিকরা সব হাত ঝেড়ে দিয়েছে—মা কালীর সম্পত্তির আয়ে পূজোটুকু কোন মতে চলে, এ সব করতে কুলোয় না।

গোঁসাই কহিলেন—ভাগীদারদের কি হ'ল?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—গণপতি বাঁড়ুজ্যে মা কালীর জমিটা মেরে নেবার চেষ্টা করছিল, আমি বাধা দিয়েছি। তাতেই বাবুরা সব রাগ করে গণপতির সঙ্গে জোট পাকাচ্ছেন। গণপতির চাকর তো সব। গণপতির কাছ থেকে পয়সা না আনলে হাঁড়ি চড়ে না কারুরই—বলিয়া তিক্ত হাসি হাসিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—জগপতি বাঁড়ুজ্যেকে তো মনে পড়ে আপনার—মুখুজ্যেদের বাড়ীতেই সারাদিন পড়ে থাকত, মুখুজ্যেদের বাড়ী থেকে চাল না নিয়ে গেলে হাঁড়ি চড়ত না তার। এখন মুখুজ্যেদের বাড়ীর ছেলেরা তার দরজায় দিনরাত ধন্না দিয়ে পড়ে আছে, দিনরাত তার পা চাটছে, তার কাছ থেকে হাত পেতে পয়সা নিয়ে এসে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখে আহার দিচ্ছে। কি বলবেন বলুন—বলিয়া ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করিলেন।

একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ে আসিয়া মন্দিরের সামনে দাঁড়াইল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে! তোর বাবা রয়েছে বাড়ীতে?

মেয়েটি কহিল—ছিল তো, চা খেয়ে এখুনি কোথায় বেরিয়ে গেল।

গোঁসাইএর মুখের দিকে তাকাইয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন—শুনলেন! সব এক গোত্তর, কেউ এখানে পা দেবে না ঠিক করেছে। কি যে রাজা-উজীর করে দিচ্ছে গণপতি, তা' তো বুঝি না! এ দিকে পাঁচটা টাকা ধার চাইলে তো খত লিখিয়ে নেয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সব যাবে গোঁসাই মশায়—এ বংশে শনির দৃষ্টি পড়েছে—

মেয়েটির দিকে তাকাইয়া কহিলেন—একটা কাজ করতে পারিস্ দিদি! তোর বাপ-মাকে বলিস না যেন—শুনলে গালাগালি করবে আমাকে।

মেয়েটি লজ্জিত মুখে কহিল—কি করতে হবে বলুন।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—বালিকে খবর দিগে যা—গোঁসাই মশায় এসেছেন, ওঁর খাবার যেন ব্যবস্থা করে। যা-কিছু দরকার আমার বাড়ী থেকে যেন নিয়ে যায়।

বালি মুখুজ্যে-বংশেরই মেয়ে। বিধবা, গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। নাম বালিকাবালা। এখন অবশ্য বালিকা নয়, প্রৌঢ়া—বয়স চল্লিশ পার হইয়া অনেকটা আগাইয়া গেছে। গোঁসাই আসিলে বালির বাড়ীতেই তাঁহার আস্তানা পড়ে। বালি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করে।

গোঁসাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—থাক, আর খবর দিতে হবে না। ও তো আমার পরিচিত বাড়ী, আমি নিজেই যাচ্ছি—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝুলিটা কাঁধে ঝুলাইয়া খড়ম পায়ে খট-খট করিতে করিতে বালির বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সোভিয়েট থিয়েটার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মস্কভিন সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অফ লেনিন্'এ সম্মানী ব্যক্তি, সোভিয়েটের সর্ব্ব-বৃহৎ রাষ্ট্র পরিষদের সভ্য এবং জনগণের নটশিল্পী বলেই সোভিয়েটের কাছে স্বীকৃত। তিনি সোভিয়েট থিয়েটার সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা লিখেছেন, তা আমাদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"Soviet theatre is a theatre of the people. It serves the people and is inseparable from them." সোভিয়েটে "people" অর্থাৎ "জনগণ" বলতে অনেকখানি বুঝায়—এবং কতখানি বুঝায় তা আমাদের দেশে বোধগম্য হওয়া কঠিন। তবুও আজকের দিনে দেশে আমাদের জনসাধারণের কথা আমাদের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে তুলেছে তাই—সোভিয়েট থিয়েটার সেখানকার জনগণের জন্য যে কি পরিমাণ শিক্ষা ও মঙ্গলের এবং চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, তাই বুঝাবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মস্কভিনের বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সোভিয়েটে আপাততঃ ৭১০টি থিয়েটার বা নাট্যশালা আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব্ব-সীমান্ত ব্লাডিভস্টকের নাট্যশালা থেকে যখন শ্রোতৃবৃন্দ অভিনয় দেখার পর বেরিয়ে আসছে, ঠিক তখনই ইউরালের সভারডলভস্ক্ সহরের নাট্যশালায় আসন গ্রহণের জন্য প্রথম সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। আবার ঠিক সেই সময়ে সোভিয়েটের পশ্চিম-সীমান্তে মিন্‌সক সহরে বৈকালিক মহড়া সবেমাত্র শেষ হয়েছে—মঞ্চসজ্জাকরেরা তখন দৃশ্যপট সাজিয়ে প্রথম অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আরও উপরে Arctic circle অথবা তারো পরে ইগারকার (Igarka) নাট্যশালা চোখে পড়বে। প্রচণ্ড শীতে সেখানে—শ্রোতৃবৃন্দ ভালুকের চামড়ায় সারা দেহ ঢেকে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে আসন গ্রহণ করছে—আবার দক্ষিণে সম্প্রতি স্থাপিত কুর্ড থিয়েটারে (Kurd theatre) গ্রীষ্মকালের উপযোগী পাতলা পোষাক পরে জমায়েৎ হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র লক্ষ লক্ষ লোকে সোভিয়েটের নাট্যশালা পূর্ণ হয়ে যায়।—এটা অতিরঞ্জিত কথা নয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েটের থিয়েটারগুলিতে ৬ লক্ষেরও বেশী লোকের সমাগম হয়েছিল এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এর চাইতেও অনেক বেশী লোকের ভীড় হয়েছিল এই সব বিভিন্ন থিয়েটারগুলিতে।

এখন একটা দিনের হিসাব নিতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে—হ্যামলেট (Hamlet)এর দার্শনিক স্বগত উক্তি থেকে আরম্ভ করে কারমেনের (Carmen) উদ্দীপক সঙ্গীত অথবা অফেনবাক্‌সের হাস্যমুখরিত অপেরা থেকে অষ্ট্রভ্‌স্কির (Ostrovsky) সুসংবদ্ধ ক্লাসিক নাট্য এবং আইভানভের (Ivanov) অগ্নিময়ী ভাষায় লিখিত নাটক—এ সব রকমের নাটকই একই সঙ্গে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে।

এই সব নাটক শুধু যে রুশীয় ভাষায় অথবা এগারটি গণতন্ত্রী প্রদেশের ভাষায় লিখিত তাই নয়—সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে চল্লিশটি এমন কি তারও বেশী ভাষায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। বহু জাতির সমন্বয় হয়েছে সোভিয়েটে—তাই বহু ভাষার সাহায্য নিতে হয়েছে সোভিয়েট থিয়েটারের নাটক অভিনয়ে।

সম্প্রতি গণতন্ত্রী আর্মেনিয়ায় ২৪টি থিয়েটার আছে, তাজিক্ (Tajik)এ আছে ২১টি, কিরঘিজ (Kirghiz)এ আছে ১৫টি, তুর্কমেনে (Turkmen) আছে ৯টি। সোভিয়েটের নাট্যশিল্পের নাটকের রঙ্গমঞ্চের যে কতখানি উন্নতি হয়েছে, সেটা বুঝতে হলে প্রতি বৎসর মস্কোতে যে জাতীয় শিল্পের উৎসব হয় সেটা দেখা দরকার। প্রতি বৎসর মস্কোতে নট-নটীরা আসেন, গায়ক-গায়িকারা আসেন, সঙ্গতকারীরা আসেন, আর আসেন নৃত্যশিল্পীরা। মস্কভিন বলেছেন যে—Those who attended these festivals came away with indelible impression of the wistful Ukrainian songs, the temperamental Georgian dancers, the amazing Azerbaijaman melodies, the inimitable pageantry of the Uzbeck theatre and the excellence of the Kazakh performances. সোভিয়েটের নাট্যশালা তার দূরতম পল্লীর অগণ্য জনগণের অভিনয় দেখার সুযোগ বিধান করে দিয়েছে। কোন দিন নাট্যশালা বা নাটক অভিনয়ের কোনো ধারণাই যাদের আগে ছিল না, আজ তারা নিয়মিত শ্রোতা হয়ে পড়েছে—সারা সোভিয়েটে বিস্তৃত বহু নাট্যশালা ও সখের রঙ্গালয়ের।

ছোট ছোট থিয়েটারে পল্লী অঞ্চলে অভিনয় করা যে সম্ভব হয়েছে—সেটা শুধু কৃষি ও কৃষি-ব্যবসায়ের সমন্বয়ে। সমষ্টিগত ভাবে প্রজা ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে পল্লীগ্রামে যে সব কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদেরি আনুকূল্যে। প্রায় ৩০০ এই রকম ভ্রাম্যমান থিয়েটারে —১০ হাজারের বেশি অভিনেতারা অভিনয় করছেন। শীত, গ্রীষ্ম, তুষার বা রৌদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করে' রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে, অশ্বারোহণে বা কুকুরদলের সাহায্যে তারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়—এক কৃষি-প্রতিষ্ঠান থেকে আর এক কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে। সেই সব কৃষক বা কৃষি-ব্যবসায়ীদের কাছে নটশিল্পীরা শিক্ষকের মত, ডাক্তারের মত অপরিহার্য্য বলে মনে হয়। তারা প্রাচীন এবং আধুনিক সব নাটকের অভিনয় করেন।

শিশুদের জন্যও পৃথক্ থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সোভিয়েটে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর শিশুদের জন্য প্রথম থিয়েটার খোলা হয় মস্কোতে—রুশ-বিপ্লবের সাম্বাৎসরিক উৎসবের দিনে। আজ সোভিয়েটে শিশুদের জন্য থিয়েটার হয়েছে ১৩১টি—তার মধ্যে পুতুলনাচ হয় অর্দ্ধেক থিয়েটারে। উদীয়মান জাতির যারা অগ্রদূত, সেই শিশুদের অনেকখানি শিক্ষার ভার নিয়েছে সোভিয়েটের এই থিয়েটারগুলি। সোভিয়েটের মধ্যে সহরে বা পল্লীগ্রামে এমন কোনো বাড়ী পাওয়া যাবে না, যেখানে একখানি না একখানি থিয়েটারের 'প্রোগ্রাম' রয়েছে। এমন কোন দূরতম পল্লী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায় না, যেখানে এই প্রাদেশিক থিয়েটার তার অভিনয় দেখিয়ে আসেনি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায় যে, এই সব প্রাদেশিক ভ্রাম্যমান থিয়েটারে—অষ্ট্রোভস্কি (Ostrovsky)র ৭২ খানা, গোর্কির (Gorky) ৫০ খানা, সেক্‌স্পিয়ারের ৩৪ (শুধু 'ওথেলো'ই অভিনীত হয়েছে ১৩টি থিয়েটারে), লোপ ডি ভেগা (Lope-de-Vega)র ১৭ খানি, শিলার (Schiller)এর ১৫ খানি নাটক অভিনীত হয়েছে।

স্বাধীনতা-দিবসের গান

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মানুষ হইয়া জন্মেছি চাই মানুষের অধিকার,
এ শুভ প্রভাতে এল আহ্বান খোল খোল খোল দ্বার।
স্বদেশী বিদেশী রাজার শাসন
হয় যদি তাহা মুক্তি-নাশন
মানিব না মোরা আঘাতে আঘাতে ভাঙিব সে কারাগার।
নির্ভয়ে এস যোগ দাও ব্রতে যারা সন্তান মার॥

হিংসা-অস্ত্র নহে আমাদের অহিংস রণনীতি,
গুরু রয়েছেন সহায় মোদের নাহি কো দানব-ভীতি।
শুধু এক ভয় পাছে ভুল করি
আপন জনেরা যায় দূরে সরি
আত্মকলহ তার চেয়ে ভাল পর-শৃঙ্খল-ভার।
ভেদাভেদ নাই মার কোলে সব ভায়ে ভায়ে একাকার॥

সবাই মিলিয়া পথে পথে আজ করি মার জয় গান'
সম্বল আর কিছু নাই মোরা শুধু দিতে পারি প্রাণ।
করি না আমরা মরণের ভয়
সত্যে যদিন আগ্রহ রয়;
সব সংশয় ঘুচে যাবে জানি ঘুচিবে অন্ধকার।
জননীর নামে তরিব আমরা দুর্গতি-পারাবার॥

★

[সোভিয়েট থিয়েটার]

সোভিয়েট থিয়েটারের আদর্শ হচ্ছে Socialist realism—সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা—পরিভাষাটা ঠিক হয়ত হল না। কথাটার অর্থ হচ্ছে এই যে—জীবনের সঙ্গে শিল্পের থাকবে সত্যকার সম্বন্ধ অর্থাৎ শিল্প সত্যকার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না—**"The prime maxim of socialist realism is that art shall be true to life."** কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে—সোভিয়েটের নটশিল্পীরা জীবনকে দেখবেন ফটোগ্রাফারের চোখে। তাঁরা শিখেছেন জীবনকে তার বিভিন্ন গতি ও পরিণতির মধ্যে দেখতে—তার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে।

সোভিয়েট নাট্যশালার নট-নটীদের কাছে অভিনয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আনন্দবিধানের অনুষ্ঠান। সমাজে তাঁরা অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁরা এটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁরা দেশের সার্থক-জন্মা নর-নারী। শ্রেষ্ঠ থিয়েটারগুলি রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করেছে, মস্কোর আর্ট থিয়েটার ১১৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর রাষ্ট্রসম্মানে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এমনি বহু প্রতিভাবান্ নট-নটী উপাধি ও সম্মান লাভ করেছেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে। কিন্তু জনগণের কাছে তারা যে কতখানি বিশ্বাসভাজন ও সম্মানের পাত্র, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-পরিষদে তাদের সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায়।

মস্কভিনের মত নটও বলছেন—যে **"We Soviet actors want our art to help the people to know life and improve it······inspite of all that we have achieved, we are still aspiring higher and higher for we shall always be in debt to the people for their good opinion and the honours they bestowed upon us."** জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে তাদের জীবনকে নানা বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে জীবনকে উপলব্ধি করার দিকে আমাদের দেশের অভিনয়-শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হবে। জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে, তার পরিণতিকে মহনীয় করতে, তার বৈচিত্র্যের মধ্যে তাকে চরিতার্থ করে তুলতে অভিনয়-কলার একটি বিশিষ্ট প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

পঞ্চম অধ্যায়

দু'দিন হ'ল কলিকাতা এসে পৌঁচেছি। কিংসওয়ের ঘটনা এখনও ভুলতে পারিনি। কিন্তু স্যার মোহনচাঁদ অগ্রওয়ালের মত লোককে ত্রিমূর্ত্তির মাথা বলে মেনে নিতে কিছুতেই মন চাইছে না। অত বড় এক জন বৈজ্ঞানিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকবেন কেন? অবশ্য কাল সকালে রামানুজ দেখিয়েছে কাগজে ছাপা একটি খবর। "স্যার মোহনচাঁদ বিশেষ অসুস্থতার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় যোগদান করতে পারবেন না।..." যোগাযোগ হয়তো আছে। কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।



[চাঞ্চল্যকর উপন্যাস]

শ্রীফাল্গুনি রায়

সকালে চা খেতে বসে রামানুজ সে-দিনকার কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে—ফাল্গুনি, পড়ে দেখ। দু'জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়েছি।"

পড়লুম। এক স্থানে লেখা ছিল—"বিখ্যাত ধনকুবের শ্যামলদাস টপোরিয়া বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেছেন।" আর এক জায়গায় কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের কলমে—"এক জন সুদক্ষ সেক্রেটারী আবশ্যক। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকিলে ভাল হয়। আবেদনকারীর উপস্থিতি প্রয়োজন।" নীচে নাম লেখা আছে স্বয়ং শ্যামলদাস টপোরিয়ার। কাগজ ফেরত দিয়ে বললুম—"এতে মাথা ঘামাবার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

রামানুজ হেসে বললে—"বন্ধু, মাথা ঘামাবার বিলক্ষণ কারণ রয়েছে। একবার পুরোনো কথাগুলো ভেবে দেখ। হঠাৎ এক দিন শ্যামলদাসের সেক্রেটারী এল। আমায় কলিকাতার বাহিরে পাঠাবার চেষ্টা করলে। যেতে যেতে যাওয়া হ'ল না। তার পর থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। হতে পারে শুধু মিল—কিন্তু এমন মিল সচরাচর ঘটে না। এখন তিনি স্বয়ং কলিকাতায় এসে পড়লেন। এইবার ব্যাপারটা আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হবে—আরও জটিল হয়ে উঠবে। মনে আছে কুলদারঞ্জনের কথা। ত্রিমূর্ত্তির দু'নম্বর অর্থাৎ বিষ্ণু হল অর্থবল।"

বিস্ফারিত নেত্রে বললুম—"মানে, তুমি কি বলতে চাও ত্রিমূর্ত্তির দু নম্বর হলেন শ্যামলদাস?"

রামানুজ উত্তর দিলেন—"আমার তাই বিশ্বাস। অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। তবে প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ অপ্রত্যাশিতরূপে আমাদের হাতের কাছে এসে পড়েছে। তবে বড়ই বিপদসঙ্কুল।"

রামানুজের কথা থেকে চট করে অর্থ বার করা যায় না। অর্দ্ধেক ভাষায় প্রকাশ করে, অর্দ্ধেক মনের মধ্যেই থেকে যায়। বিরক্ত হয়ে বললুম—"একটু স্পষ্ট করে গুছিয়ে বল। আমি তো থট রীডিং জানি না যে তোমার মনের কথা বুঝতে পারব।"

রামানুজ হেসে বললে—"ব্যাপারটা তোমার সুবিধার জন্য বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু এই বিপদের মুখে তোমায় ছেড়ে দিতে মন সরছে না।"

—"ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।"

—"তা জানি। সেই জন্যই বলতে ইতস্ততঃ করছিলুম। আমার ইচ্ছা, তুমি শ্যামলদাসের সেক্রেটারী-পদের জন্য আবেদন কর। আমিই করতুম, কিন্তু মুস্কিল আছে। আমার এই বিরাট দেহ বিশাল [illegible] কোন রকমেই ঢাকা পড়বে না। তা ছাড়া, শ্যামলদাসের গৃহে আটকে থাকলে বাহিরের ব্যাপার কি রকম এগোচ্ছে তা বুঝতে পারব না।"

আমি উত্তর দিলুম—"বেশ তো, আমিই এ কাজের ভার নিচ্ছি। তবে চাকরীটা পাবার সম্ভাবনা অল্প।"

—"পাবেই। সে বন্দোবস্ত আমি করব। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তোমায় সার্টিফিকেট দেবে।"

এর পর আর কিছু বলবার নেই। রামানুজ তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল এবং ঘণ্টা-দু'য়েক পরে ফিরল এক তাড়া চিঠি নিয়ে। দেখলুম, প্রশান্তকুমার দাসের একখানা আবেদন-পত্র, আর গোটাদশেক তার যোগ্যতার সার্টিফিকেট। মহা-মহারথীদের লিখিত। সে কি প্রশংসা!

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"এই প্রশান্তকুমার দাসটি কে, যার প্রশংসায় এবং যোগ্যতায় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ মুগ্ধ?"

হেসে রামানুজ উত্তর দিলে—"তুমি। আজ থেকে তোমার নতুন নামকরণ হ'ল প্রশান্তকুমার দাস।"

বিস্মিত হয়ে গেলুম। লোকটার বাহাদুরী আছে। যার জানে না কি? অস্তিত্বহীন লোকের জন্য সার্টিফিকেট—তা আবার ঐ রকম বিরাট বিরাট লোকেদের কাছ থেকে। মুখে বললুম—"তারিফ না করে থাকতে পারছি না।"

রামানুজ হেসে বললে—"এতে তারিফ করবার মত কিছু নেই। এঁদের সকলের জন্যই কোন না কোন সময়ে ছোট-খাট দু'-একটা কাজ করে দিয়েছি—সেজন্য তারা কৃতজ্ঞ। ফলে প্রশান্তকুমার দাসের প্রশংসাপত্র লাভ। এখন তোমায় সেক্রেটারী পদের জন্য একটু মেক-আপ করে দিতে হবে। যাতে তোমায় চিনতে না পারে। অর্থাৎ ফাল্গুনী রায় এইবার প্রশান্তকুমার দাসে রূপান্তরিত হবেন।"

রামানুজের শয়ন-কক্ষের পাশেই একটি ছোট ঘর আছে। সেই ঘরে আমরা গেলুম। হরেক রকমের সাজ-পোষাক-পরচুলা থরে থরে সাজান। ঘণ্টাখানেক ধরে আমার ওপর প্রসাধন চলল। তার পর যখন আর্শীতে নিজের চেহারা দেখলুম, তখন যেন নিজেকে নিজে চিনতে পারলুম না। উঁচু হালের জুতো পরিয়ে আমাকে একটু লম্বা করে দিয়েছে। তার ওপর ঢিলে স্যুট পরে দীর্ঘতর দেখাচ্ছে। মুখের মধ্যে রবার দিয়ে গাল দু'টো ফুলিয়ে মুখটা অন্য রকম হয়ে গেছে। ভ্রূযুগল ঈষৎ কামিয়ে এবং চুল ভিন্ন ধরণে আঁচড়ে চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে। গোঁফ কামিয়ে দিয়েছে। আমার সামনের একটা দাঁত বাঁধান ছিল, সেই দাঁতটা বদলে সোনার দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। মোটের ওপর, তখন আমাকে দেখে আমিই চিনতে পারলুম না।

যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। রামানুজ বললে—"বন্ধু, তুমি যাচ্ছ, কিন্তু মনে আমি শান্তি পাচ্ছি না। এ যেন জেনে-শুনে বিপদ-সমুদ্রে ঠেলে দিচ্ছি। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন; হ্যাঁ, মনে রেখ, তোমার নাম প্রশান্তকুমার দাস।"

লক্ষ্য করলুম, রামানুজের কণ্ঠস্বর যেন ঈষৎ ভারী।

ওল্ড বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিরাট একখানি বাড়ী—প্রাসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না—শ্যামলদাস টপোরিয়া ভাড়া নিয়েছেন। নীচে হলে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। আবেদন-পত্র এক জন লোকের

মারফত পাঠিয়ে দিলুম। আরও অনেক আবেদনকারী সেখানে কম্পিত-হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমারও বুকটা দুরু দুরু করছিল, কিন্তু অন্য কারণে।

আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা করবার পর এক জন ভৃত্য এসে খবর দিলে—"কর্ত্তা প্রশান্তকুমার দাসকে বোলাচ্ছেন।" উঠে ভৃত্যকে অনুসরণ করলুম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরে টেবিলের সামনে শ্যামলদাস বসে। তাঁর হাতে আমার আবেদন-পত্র। শ্যামলদাসকে এই প্রথম দেখলুম। এক জন বুদ্ধিমান্ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি বলে মনে হ'ল। প্রশান্ত ললাট, উজ্জ্বল চোখ, বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের এই রকম চেহারা দেখব আশা করিনি। আমার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন—"বসুন।" সামনের খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বসলুম।

আবেদন-পত্রটি টেবিলের ওপর রেখে বললেন—"মিষ্টার দাস, আপনার অবেদন-পত্র পড়ে দেখলুম। আপনাকে উপযুক্ত লোক বলেই মনে হচ্ছে। চেহারাও আমার বেশ পছন্দ হয়েছে: অন্য লোকের সঙ্গে আর দেখা করা প্রয়োজন মনে করছি না। আপনার তো কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ আছে?"

বিনীত ভাবে উত্তর দিলুম—"আজ্ঞে তা আছে।"

—"বেশ, বেশ। কাজ খুব বেশী নয়। আমার আরও দু'জন সেক্রেটারী আছেন। কিন্তু তাঁরা এ দেশের লোক ন'ন। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমায় কারবার করতে হবে। চা-পার্টি, ডিনার ইত্যাদিও দিতে হবে। আপনি আমার সেই সব ব্যাপারে সাহায্য করবেন। মোট কথা, এখানকার আদব-কায়দা তো আমার বিশেষ জানা নেই। আপনি একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।"

উৎসাহের সঙ্গে বললুম—নিশ্চয়ই।"

সেই দিন থেকেই নতুন কাজে বহাল হয়ে গেলুম। কাজ বিশেষ কিছুই নয়। সব সময়ই প্রায় ছুটী। সুতরাং চারিদিকে নজর রাখবার খুবই সুবিধা হ'ল। অন্য দু'জন সেক্রেটারী অতি নিরীহ। তাদের কাজও অনেক বেশী। ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র নিয়েই থাকে। আমার সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হলেও ঘনিষ্ঠতা হ'ল না। বাড়ীর চাকরদের সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছুই পেলুম না। কয়েক জন শ্যামলদাসের সঙ্গেই এসেছিল। বাকী এখানকার লোক। স্বয়ং কর্ত্তাকেও চোখে চোখে রাখলুম। কিন্তু সবই অনর্থক। ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কে কাউকে আসতে-যেতে দেখলুম না। আমার মনে ক্রমেই এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে, রামানুজ ভুল করেছে। ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে শ্যামলদাসের কোন সংস্রব থাকতে পারে না। প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। মেলামেশা করে বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মাল। লোকটি সত্যই চমৎকার। স্বল্পভাষী হলেও খুব ভদ্র।

এক জনকে খুব ভাল লাগল—তাঁর নাম জানকী বাঈ। মেয়েটি শ্যামলদাসের দূর-সম্পর্কে ভগিনী হন। দেখতে সুশ্রী, বয়স আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হবে। বেশ লেখা-পড়া জানেন। শ্যামলদাস স্বয়ং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায়ই আমার কাছে সাহিত্য-চর্চা করতে আসেন। মধ্যে মধ্যে বিকেলে তাঁর সঙ্গে ব্যাড-মিণ্টনও খেলতে হয়। অলস একঘেঁয়ে জীবনে জানকীর সাহচর্য্য খুবই ভাল লাগে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাগানে বেড়াচ্ছি। হাতে কোন কাজ নেই। শ্যামলদাস ব্যবসা-সংক্রান্তে আসানসোল গেছেন। এমন সময় জানকী বাঈ এসে হাজির। লক্ষ্য করলুম, তাঁর মুখটা খুব গম্ভীর। জিগ্যেস করলুম—আজ বিকেলে তো হাওয়া ছিল না। ব্যাড-মিণ্টন খেললেন না কেন?"

একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি উত্তর দিলেন—"মনটা ভাল ছিল না। চুপ করে শুয়ে ছিলুম।"

ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"শরীর ভাল তো?"

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন—"শরীর ভালই।" তার পর আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে উদাস ভাবে বললেন—"মিষ্টার দাস, আপনার তো অনেক বড়লোকদের সঙ্গে আলাপ রয়েছে। আমায় একটা চাকরী খুঁজে দিতে পারেন?"

বিস্মিত হয়ে বললুম—"আপনি! চাকরী করবেন! কি বলছেন!"

"হয়তো কিছুই এমন হয়নি, কিন্তু তবু আমার মনে বিলক্ষণ আঘাত দিয়েছেন। কাল অনর্থক মামা এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন—" বলতে বলতে জানকী বাঈএর চোখে জল ভরে এল।

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললুম—"ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। আপনার মামাকে যতটুকু চিনেছি, তাতে তিনি অনর্থক রাগারাগি করবার লোক বলে তো মনে হয় না। হয়তো কিছু বোঝবার ভুল হয়েছে।"

তিনি বললেন—"আপনি যে আমাকেই দোষী করবেন, তা আমি জানতুম। কিন্তু ব্যাপারটা শুনে তার পর বিচার করবেন। কাল ধোপা এসেছিল। মামার জামা-কাপড় আমিই গুছিয়ে নিই আর পাঠাই। একটা জামা ধোপাকে দিতে গিয়ে দেখলুম, পকেটে কি যেন রয়েছে। বার করে দেখি একটা চিঠি। খামের ওপর মামার নাম আর এক কোণে একটা সংখ্যা—"তিন" লেখা ছিল। কিছু বললেন কি?"

হয়তো আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে কোন কথা বার হয়ে গিছল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম—"না, কিছু বলিনি তো। তার পর।"

—"তার পর কৌতূহল-বশত চিঠি বার করে পড়লুম। অবশ্য এটা আমার দোষ হয়েছে স্বীকার করি। পড়া শেষ হলে চিঠিটা আবার খামে পুরে মামাকে গিয়ে দিলুম। সে কি রাগ! আমাকে যেন মারতে আসেন আর কি!"

আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছে। অতি কষ্টে ধীর কণ্ঠে বললুম—"হয়তো চিঠির মধ্যে গোপনীয় কিছু ছিল।"

—"না, না। সেই জন্যেই তো আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। অতি সাধারণ ব্যবসাদারী চিঠি। কয়েক লাইন মাত্র। আমার কথাগুলো এখনও মনে আছে।"

ব্যাপারটা ঘনিয়ে আসছে। বললুম—"কথাগুলো একবার বলুন তো। লিখে দেখা যাক, রাগের কোন কারণ থাকতে পারে কি না।"

—"বেশ তো"—বলে জানকী বাঈ বলে গেলেন। আমি নোট-বুকের একটা পাতায় তাঁর কথাগুলো টুকে নিলুম।

"মহাশয়,—আপনার পত্র পাইলাম এবং পাঠ করিয়া জানিলাম, আমার সর্ত্তাবলী পাইয়াছেন। সঙ্গে ফর্ম্মও ছিল। সাক্ষাৎ শীঘ্রই হইবে। প্রার্থনীয় বস্তুটি দিব। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে পার্ক বরাবর একটি দক্ষিণ-খোলা বাড়ী। কোণে বড় রাস্তা। সতেরো হাজার চায়। বারো বলেছি। ফোনে সময় জানাব। বোধ হয় সন্ধ্যায় সুবিধা। বাড়ীর তিন দিক খোলা।

বিনীত

হীরালাল পোদ্দার।"

বললুম—"এর মধ্যে মারাত্মক কিছুই তো দেখছি না।"

হেসে জানকী বাঈ বললেন—"আমিও তো সেই কথাই বলছি।"

দু'-চারটে কথা বলে তাঁকে শান্ত করলুম। তিনি চলে যেতেই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসলুম। সত্যি কথা বলতে কি, জানকী বাঈএর কথায় অনেক রকম আশা মনে জেগেছিল। এইবার ঠিক সন্ধান পাব। কিন্তু চিঠি পড়ে নিরাশ হতে হল। অত্যন্ত মামুলী ব্যবসাদারী চিঠি। হীরালাল বোধ হয় বাড়ীর দালাল। কিন্তু খামের উপর তিন লেখা কেন? নিশ্চয়ই চিঠি পড়বার কোন গুপ্ত সঙ্কেত আছে। অনেক চেষ্টা করেও সে রাত্রে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলুম না।

পরদিন সকালে উঠেই আবার চিঠিটা নিয়ে বসলুম। বহুক্ষণ কেটে গেল। কিছুই সুবিধা হলো না। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। "তিন" সংখ্যাটিই তো রহস্যের চাবী। দুটো করে কথা ছেড়ে তৃতীয়টি নিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার রূপ প্রকট হয়ে উঠল চিঠির গুপ্ত বার্ত্তা।—"পত্র পাঠ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়। বালীগঞ্জ পার্ক, দক্ষিণ কোণে। সতেরো, বারো। সময় সন্ধ্যা। তিন।" সংখ্যাগুলির অর্থও সহজ। সতেরো তারিখ, ডিসেম্বর মাস। তিন বোধ হয় ত্রিমূর্ত্তির চিহ্ন! শ্যামলদাসের বাড়ী বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে। কাছেই পার্ক; সব মিলে যাচ্ছে। এত দিনে সন্ধান মিলেছে। রামানুজ ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

একবার ভাবলুম, নিজেই কাজটা হাসিল করি। রামানুজকে খবর দিয়ে কাজ নেই। তার পর ভাবলুম, না, দরকার নেই। কাজটা ঝুঁকির। যদি ফেঁসে যায়! শেষ অবধি রামানুজকে খবর দেওয়াই ঠিক করলুম। কাল ১৭ই ডিসেম্বর। অবিলম্বে রামানুজকে সকল কথা বিশদ ভাবে জানিয়ে এবং অবশ্য আসতে অনুরোধ করে চিঠি লিখে খামে পূরে নিজে গিয়ে ডাক-বাক্সয় ফেলে দিয়ে এলুম।

পর দিন শ্যামলদাস আসানসোল থেকে ফিরে এলেন। সমস্ত দিন ছটফট করে কেটে গেল। কোন কাজও ছিল না যে, অন্যমনস্ক থাকি। শ্যামলদাসের সামান্য সর্দ্দি এবং জ্বর। তিনি বাড়ী এসেই সোজা এসে বিছানা নিলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় চুপি-চুপি বালীগঞ্জ পার্কের দক্ষিণ কোণে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শীত কাল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখি, পার্কের কোণে একটা ঝোপ। যেই গাছপালা একটু সরিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকেছি, অমনি একটা গভীর কণ্ঠস্বর কানে এল—"মাথার উপর হাত তোল। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। নড়েছ কি গুলী করেছি। সাইলেন্সার লাগান আছে, একটুও আওয়াজ

চমকে উঠে দেখি, বুকের সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং শ্যামলদাস। পিছন থেকে এক জন লোক এসে আমার মুখ ও হাত পা বেঁধে ফেললে। পিস্তল নামিয়ে শ্যামলদাস বললে—"আজ তোমাদের দু'জনকেই শেষ করব। বড্ড বাড়িয়ে তুলেছ। বন্ধুটি এখনও এসে পড়লেন না কেন?"

তাই তো! এতক্ষণ ভুলে ছিলুম। রামানুজ এখনই এসে ফাঁদের মধ্যে পা দেবে। আমি তাকে ডেকে এনেছি, অথচ সাবধান করে দেবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যেন রামানুজ না আসে। যেন কোন কাজে আটকে যায় অথবা একেবারে ভুলে যায়। তার জীবনের জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

আমার আশা ভঙ্গ হ'ল। কাণে এল পদধ্বনি—নিকটে—আরও নিকটে। রামানুজ পতঙ্গের মত ধীরে ধীরে মাকড়সার জালের দিকে এগিয়ে আসছে। মৃত্যুর উন্মুক্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছে আমারই চোখের সামনে, অথচ তাকে সাবধান করে দেবার উপায় নেই। আমার হাত-পা-মুখ সব বাঁধা। নিজের অক্ষমতার গ্লানিতে যেন মরে যেতে লাগলুম।

একটু পরেই রামানুজ অতি সন্তর্পণে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলদাস তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"মাথার উপর হাত তুলুন। নড়লেই গুলী করব।"

ওদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিঃশব্দে রামানুজের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

রামানুজ বিনা বাক্যব্যয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়াল। ব্যঙ্গভরে শ্যামলদাস বললে—"আপনার নাম শুনেছি, আজ চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটল। পূর্ব্বেই সুযোগ ঘটতে পারত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আপনি বম্বে যাত্রা নাকচ করে আমাকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যাক, বেটার লেট দ্যান নেভার, কি বলেন?"

রামানুজ হেসে বললে—"নিশ্চয়ই!" নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে হাসি! আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। রামানুজ চারি ধারে দৃক্‌পাত করে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে—"আরে, ফাল্গুনি যে! কিন্তু অবস্থা এমন বিপন্ন কেন?"

—"কারণ, আপনারা উভয়েই আমার ফাঁদে পা দিয়েছেন—ত্রিমূর্ত্তির ফাঁদে।" সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি।

—"ফাঁদ?" বিস্মিত হয়ে রামানুজ প্রশ্ন করলে।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বুঝতে পারছেন না? পিস্তল উঁচিয়ে অতিথি সংকার দেখেই তো বোঝা উচিত ছিল।"

রামানুজ হেসে বললে—"ঠিক। বোঝা উচিত ছিল বই কি! কিন্তু ফাঁদ তো আমি পেতেছি। আপনার ফাঁদ বলছেন কেন? আপনারাই ফাঁদে পড়েছেন। আমরা কেন পড়তে যাব।"

—"অ্যাঁ!" শ্যামলদাস বিস্মিত হয়ে বললে।

—"হ্যাঁ।" রামানুজ উত্তর দিলে। "আমাকে অথবা ফাল্গুনিকে যদি গুলী করেন কুড়িটা চোখ সাক্ষ্য দেবে যে আপনি হত্যা করেছেন। পালাবেন তার উপায় নেই। তাদেরও পিস্তল আছে। তার উপর সংখ্যায় আপনারা দু'জন, আর তারা দশ জন। সুতরাং বুঝতে পারছেন—একেবারে মাৎ।"

রামানুজ মুখ দিয়ে বিচিত্র রকমের শীষ দিলে; সঙ্গে সঙ্গে দশ জন

পিস্তলধারী লোক ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে শ্যামলদাস ও তার সঙ্গীর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিলে, পালাবার পথ রইল না। তাদের সঙ্গে যে সার্জ্জেণ্ট এসেছিল, তাকে রামানুজ চাপা স্বরে কয়েকটা কথা বললে। তার পর আমার বাঁধন খুলে আমাকে নিয়ে ঝোপের বাইরে এল। গাড়ী পার্কের ধারেই অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাড়ী পৌছলুম। পথে রামানুজকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাকে চোখ বুজিয়ে বসে থাকতে দেখে কৌতূহল দমন করেছিলুম।

দ্বিতলে বসবার ঘরে পৌছতেই রামানুজ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—"যাক্, তোমাকে যে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, এর জন্ম ভগবান্‌কে ধন্যবাদ। তোমাকে পাঠাবার পর থেকে কি দুশ্চিন্তায় যে দিন কেটেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্ত আমি নিজেকে দুষেছি।"

ভৃত্যকে দু'কাপ চা আনতে বলে রামানুজ একটা চেয়ার টেনে বসল। আমিও আসন গ্রহণ করে বললুম—"আমি তো জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছি। অবশ্য এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু তুমি তাদের মতলবটা বুঝলে কি করে?"

—"বুঝব আবার কি? আমি তো অপেক্ষা করছিলুম। তোমায় পাঠালুম কেন? এই জন্যই তো। তোমার ছদ্মবেশ ও নকল নামে যে তারা প্রতারিত হবে, এ ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না।"

আমি চটে উঠলুম। বললুম—"কিন্তু আমাকে পাঠাবার সময় তো এ কথা বলনি। অনর্থক আমাকে বেকুব বানাবার কি প্রয়োজন ছিল?"

রামানুজ হেসে বললে—"রাগ কোরো না বন্ধু। বেকুব বানাবার জন্য নয়, কিন্তু না বলবার সত্যই প্রয়োজন ছিল। তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। অভিনেতা নয়। মুখে আর মনে এক। তোমাকে না ঠকালে তুমি তাদের ঠকাবার চেষ্টা করতে পারতে না। অবশ্য তোমার চেষ্টায়, ছদ্মবেশে, নকল নামে তারা ভোলেনি। প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল, তোমাকে আমিই পাঠিয়েছি। তখন আমি যা ভেবেছিলুম, তারা ঠিক তাই করলে। মেয়েটি তোমার সঙ্গে আলাপ করলে। নিজের দুঃখের কাহিনী তোমায় শোনালে কেন? কারণ, তুমি কবি লোক। সুন্দরীর দুঃখে তোমার মন কাঁদবে। মনস্তত্ত্ব—বুঝলে কি না? তার পর একটা চিঠি মুখস্থ বললে। কেউ ও-রকম বাজে ব্যবসাদারী চিঠি মুখস্থ করে? তাহলেই বুঝতে পাচ্ছ, মেয়েটিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। চিঠিটা একটু ঘোরাল, কিন্তু খুব জটিল নয়। পাছে বুঝতে না পার, তাই মেয়েটি বলেই দিলে খামের ওপর তিন লেখা ছিল। তুমি মাথা ঘামিয়ে চেষ্টা করে চিঠির অর্থ আবিষ্কার করলে। আমায় ডেকে পাঠালে, একসঙ্গে দু'জনকে হাতে পাওয়া যাবে ভেবে তারা খুবই খুসী হ'ল। কিন্তু রামানুজ তো একেবারে নির্ব্বোধ নয়। ফলে যা হ'ল নিজের চোখেই দেখতে পেলে। এবার ধড়াচুড়া ছেড়ে এস। চা এল বলে। প্রশান্ত-কুমার দাস এইবার আমাদের পুরোনো বন্ধু ফাল্গুনি রায়তে পরিণত হোক। রাগটা ভুলে যাও, সব ভাল যার শেষ ভাল, জান তো?

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। একটু পরেই মুখ-হাত ধুয়ে বেশ-পরিবর্ত্তন করে ফিরে এলুম। ততক্ষণে চা, জলখাবার এসে পড়েছে। চা খাচ্ছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সেন এসে হাজির হ'ল। ঘরে ঢুকে আমাদের দেখেই বলতে আরম্ভ করলে—"আচ্ছা বেকুব বানালে যা হোক।'

আমরা দু'জনেই অবাক্ হয়ে গেলুম। রামানুজ বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে—"মানে?"

—"মানে অতি সহজ। যাদের ধরে নিয়ে গেলুম, তারা বাড়ীর দু'জন চাকর। শ্যামলদাসও নয়, ত্রিমূর্ত্তিও নয়।

—"চাকর!" অস্ফুট স্বরে বললুম।

"হ্যাঁ।" দীপঙ্কর উত্তর দিলে। "তারা বললে, নতুন সেক্রেটারী বাবুর সঙ্গে একটু রহস্য করছিলুম। অন্য চাকরদের সঙ্গে বাজী রাখা হয়েছিল, তোমাকে—বুঝলে ফাল্গুনি—তোমাকে বেকুব বানাবে।"

—"কিন্তু এ যে অসম্ভব!"

"মোটেই অসম্ভব নয়। শ্যামলদাসের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম, তিনি বিছানায় শুয়ে, জ্বর হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখলুম, সত্যই জ্বর। চাকরদের প্রশ্ন করতে সকলেই বাজীর কথা বললে। তোমাকে বেকুব বানাতে গিয়ে আমাদের শুদ্ধ বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে আপিসে কাল থেকে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।"

—"কিন্তু পিস্তল?"

"রঙ খেলবার। ছিঃ ছিঃ!"

দীপঙ্কর চলে গেল। বসল না পর্য্যন্ত। লোকটা সত্যই ভয়ানক রেগে গেছে। রাগবার কথাই। আমি রেগে ছিলুমই। দীপঙ্করে বর্ণনায় রাগটা আরও বেড়ে গেল। শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললুম—"শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই বেকুব বানিয়ে ছাড়লে। এর জন্য তুমিই দায়ী। মিছিমিছি শ্যামলদাসকে সন্দেহ করলে—ত্রিমূর্ত্তির মাথা। মুণ্ড!"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে বললে—"অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমরা বেকুব বনে গেছি। কিন্তু আমারও বোঝা উচিত ছিল, ওরা নির্ব্বোধ নয়। মাথায় কিছু না থাকলে শ্যামলদাস ত্রিমূর্ত্তির মাথা হতে পারত না। এতক্ষণে সব বুঝতে পারছি। মেয়েটি মিস্ র‍্যাচেল ফেরিস।"

—"তোমার উৎকট কল্পনা। আর চাকরটি?"

—"চাকরটি স্বয়ং মহেশ্বর—ত্রিমূর্ত্তির তিন নম্বর। বেরোবার পথ রেখে তবে তারা ফাঁদ পেতেছিল। পিস্তল ঝুটো এ কথা ঠিক। তাই তোমার হাত-পা বেঁধেছিল, গুলী করেনি। আমাকেও বেঁধে ফেলত। সত্যকারের এক নম্বর অর্থাৎ শ্যামলদাস পার্কে এসে মারামারি করবে, এ কথা ভাবাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। শত্রুপক্ষ বুদ্ধিমান্ জানতুম, কিন্তু তাদের যে এত বুদ্ধি তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু তাদের ছেড়ে দিয়ে দীপঙ্কর ভয়ানক বেকুবি করেছে। কোন মতে আটকে রেখে আমায় খবর দিলে মহেশ্বরকে চিনতে পারতুম। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তাহ খানেকের ওপর শ্যামলদাসের বাড়ী থেকে এসেছি রামানুজ বাড়ী থেকে প্রায় বার হয় না বললেই চলে। স্রেফ খায় পড়া-শোনা করে, আর ঘুমোয়। মধ্যে মধ্যে বাঁশী বাজায়। ও বাঁশী শোনবার মত। চমৎকার বাজায়। এই সাত দিনের মধ্যে তিনটে কেস ওর কাছে এসেছিল, এক জন বেশ মোটা রকমের

দিতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে কোনটাই নেয়নি। আমি ওর ঐ রকম নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলুম। কলকাতায় এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের আশায়। স্রেফ খাওয়া আর শোয়া এ তো পাটনায়ও হতে পারত। এখানে এসে লাভ কি? এক দিন অতিষ্ঠ হয়ে বলেও ফেললুম—"বলি রামানুজ, ব্যাপার কি? কোন কেস হাতে নিচ্ছ না কেন? এ ভাবে চুপ-চাপ বসে থাকার উদ্দেশ্যটা কি?"

রামানুজ একটু হাসল। ওর হাসি দেখলেই আমার পিত্ত জ্বলে ওঠে। কথার উত্তরে লোকে কথা শুনতে চায়, হাসি দেখতে চায় না। রেগে বললুম—"হাসছ কেন? কথার উত্তর দাও। না, বলবার মত কোন উত্তর নেই?"

আবার সেই হাসি। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এবার হাসির সঙ্গে রামানুজের মুখ থেকে ভাষাও নির্গত হ'ল। বললে—"চুপ করে বসে নেই বন্ধু। দেখছি, লক্ষ্য করছি এবং বোঝবার চেষ্টা করছি। অন্য কেস হাতে নিলুম না, কারণ, অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকলে বুদ্ধি এবং সময় সেইখানেই আটকে পড়বে। আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চাই ত্রিমূর্ত্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য।"

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললুম—"তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। আহার, নিদ্রা ও বংশীবাদন। আর একটু আধটু পড়া-শোনা। চেষ্টার তারিফ করতে হয়। কি লক্ষ্য করছ শুনতে পারি?"

—"নিশ্চয়ই পার। জানলা দিয়ে একবার বাইরে রাস্তার দিকে নজর কর। দেখবে, একটি নতুন পানের দোকান।"

—"ক'দিন থেকেই দেখছি। কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার মত কি আছে?"

—"কিছু না। স্রেফ এইটুকু যে, দোকানের মালিকের দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীর দিকে নিবদ্ধ থাকে।"

—"কথাটা সত্য। একটা ছোঁড়া ও-দোকানে থাকে। আমি যখনই বার হই, দেখি, সে আমার কাছে এগিয়ে আসে এবং কিছু না বলে আবার সরে যায়।"

—"দেখেছি। যাই হোক, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো। সেই জন্য বাড়ী থেকে বার হচ্ছি না।"

—"দীপঙ্করকে একবার খবর দিলে হয় না?"

হেসে রামানুজ উত্তর দিলে—"তাতে কোন লাভ হবে না। বাড়ীর সামনে পানের দোকান খোলায় অথবা কারো বাড়ীর দিকে দোকানে বসে চেয়ে থাকায় দোষের অথবা অপরাধের কিছু নেই।"

—"তবে আমাদের এখন কি করা দরকার?"

—"কিছু না। তুমি সকাল-বিকেল যেমন বেড়াতে বার হও বেরোবে এবং খুব বেশী করে বাজে কাজে ঘুরে বেড়াবে। অনুসরণকারী যাতে বিরক্ত হয়ে পড়ে। আর আমি বাড়ীর মধ্যে স্রেফ চুপ করে বসে থাকব। ওরাও চুপ-চাপ বসে-বসে ক্লান্ত হয়ে শেষে হয় তো দোকান-পাট তুলে দিতে পারে।"

—"আমার অনুসরণ করে না কি?"

—"নিশ্চয়ই করে। ভাবে, আমি যখন বাড়ীর বার হই না, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে বাহিরের কাজগুলো করিয়ে নিই।"

আমি রেগে উঠলুম। এ কি অন্যায় কথা। রাস্তায় বার হব না? ... বললুম—"ধরে ঠেঙালে কি রকম হয়?"

রামানুজ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"না, না, ও কাজ কোরো না। এখন অনর্থক হাঙ্গামায় আটক পড়লে চলবে না। তার চেয়ে এক কাজ করলে সুবিধা হতে পারে।"

—"কি?"

"তুমি আজ একটা ছোট স্যুটকেশ আর বেডিং নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাও। আমি শিবদাসকে দিয়ে সিটি বুকিং আপিস থেকে টিকিট আনিয়ে দিচ্ছি। তার পর পাটনাগামী ট্রেণে চেপে কলিকাতা ত্যাগ কর।"

বিস্মিত হয়ে চোখ কপালে তুলে বললুম—"তার মানে? তুমি আমায় সরে পড়তে বলছ?"

—"ঠিক ধরেছ। আমি তোমায় ক'লকাতা থেকে সরে পড়তে বলছি। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। পরের ষ্টেশনে নেমে আবার ফিরে আসবে। আমি ওদের বোঝাতে চাই যে, তুমি চলে যাচ্চো। আমি একলা আছি।"

—"তা না হয় বোঝালে, কিন্তু উদ্দেশ্য?"

—"উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমি একা আছি জানলেই ওরা একবার আক্রমণের চেষ্টা করবে। তবে আমার বিশ্বাস, রাত্রের আগে কিছু করতে সাহস করবে না। তুমি বিকেলের ট্রেণে বেরোলে রাত দশটা-নাগাদ ফিরে আসতে পারবে।"

রামানুজের উপদেশ মত বিকেলের ট্রেণেই কলিকাতা ত্যাগ করলুম। বর্দ্ধমানে নেমে আবার কলিকাতাগামী ট্রেণে উঠে পড়লুম এবং সাড়ে ন'টা নাগাদ ট্যাক্সি করে রামানুজের বাড়ী ফিরে এলুম। গৃহ নিস্তব্ধ। সদর-দরজা খোলা। ভাড়া চুকিয়ে স্যুটকেশ ও বেডিং সিঁড়ির নীচে রেখে উপরে উঠলুম। রামানুজের বাঁশীর আওয়াজ কানে এল।

সবে মাত্র দোতালায় পা দিয়েছি, এমন সময় কে যেন লাফিয়ে পড়ে আমার মুখ চেপে ধরলে। আর এক জন এসে আমার হাত দু'টো পিছন দিকে বেঁধে ফেললে। প্রথম ব্যক্তি মুখে রুমাল পুরে দিব্য করে বাঁধলে যাতে কথা না কইতে পারি। ব্যাপারটা অতর্কিতে এবং এমন তাড়াতাড়ি ঘটল যে, আমি বাধা পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না। তারা আমাকে টেনে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পা দু'টোও বেঁধে ফেললে। ঘরে আলো জ্বলছিল। দেখি, আততায়ী দু'জন মুখোসধারী এবং দু'জনের হাতেই পিস্তল।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দু'জন মুখোসধারী ব্যক্তি রামানুজকে হত্যা করতে এসেছে। আমার বাড়ী ফেরার শব্দে তারা আমায় আক্রমণ করে বেঁধে ফেলেছে। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে বসে রামানুজ মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাহিরে তার অলক্ষ্যে মৃত্যুদূত তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। যে মুহূর্ত্তে সে বাঁশী বাজান শেষ করে ঘর থেকে বেরোবে, সেই মুহূর্ত্তেই—ভাবতে গা শিউরে ওঠে। অতর্কিতে তাকে তারা আক্রমণ করবার জন্য দাঁড়িয়ে আর আমি সব জেনেও রামানুজকে সতর্ক করে দিতে পাচ্ছি না। অথচ রামানুজের প্ল্যানই ছিল আমি ফিরে এসে তাকে সাহায্য করব। নিজের অক্ষমতার জন্য নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলুম।

ঘরের ভেতর বাঁশী বাজছে। কি মধুর সেই সুরের খেলা। হয়তো রামানুজের এই শেষ বাঁশী বাজান। আগন্তুক দু'জন পিস্তল

হাতে শোবার ঘরের দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে। নিষ্পলক চক্ষু তাদের দরজার দিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ কার গম্ভীর স্বর বলে উঠল—"হাত থেকে পিস্তল ফেলে দাও। নড়েছ কি মরেছ। আমি দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে তোমাদের লক্ষ্য করে আছি। মনে রেখ, আমার লক্ষ্য অব্যর্থ এবং কথার নড়চড় হয় না।" চমকে উঠে চেয়ে দেখি, বসবার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে রামানুজ স্বয়ং। দুই হাতে দু'টো পিস্তল। শোবার ঘরে তখনও বাঁশী বাজছে।

ঘটনাস্রোত ঘুরে গেল। শত্রুপক্ষ এ রকম একটা ঘটবে আশা করেনি। তারা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের অবশ হাত থেকে পিস্তল যেন আপনা হতেই খসে পড়ল। রামানুজ সৈন্যাধ্যক্ষের মত হুকুম করলে—"এক জন ওর বাঁধন খুলে দাও।" বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালিত হ'ল। আমাকে রামানুজ বললে—"ফাল্গুনি, তুমি ওদের হাত পিছন দিকে বেঁধে দাও। বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না। তাহলেই আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় পাবে।"

আমি তখনই দু'জনের হাত পিছন দিকে বেঁধে ফেললুম। রামানুজ এগিয়ে এসে তাদের পকেট হাতড়ে আরও একটা পিস্তল ও একটা ছোরা পেল। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে আমাকে বললে—"ফাল্গুনি, এইবার দীপঙ্করকে ফোন করে বল, এখনই আসতে। বিশেষ দরকার। যেন দেরী না করে।" তখনও বাঁশী বাজছে।

রিসিভারটা তুলতে যাচ্ছি, এমন সময় সিঁড়িতে দীপঙ্করের গলা শোনা গেল—"কি হে রামানুজ, খুব যে বাঁশী বাজাচ্ছ?"—সঙ্গে সঙ্গে সে স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। এ যেন জল না চাইতেই মেঘ। দু'জন অপরিচিত লোককে হাত-বাঁধা অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করল—"এরা কারা?"

রামানুজ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। বিস্ফারিত নেত্রে দীপঙ্কর বললে—"তা তো বুঝলুম, কিন্তু বাঁশী বাজাচ্ছে কে?"

রামানুজ হেসে বললে—"আততায়ীদের মতে আমি, কিন্তু আসলে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে।"

হঠাৎ বাঁশীধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। রামানুজ বললে—"অটোমিটিক সিসটেম। রেকর্ড শেষ হয়ে গেল। আজ বলতে গেলে ঐ রেকর্ডটাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যত্ন করে রেখে দিতে হবে।"

দীপঙ্কর বললে—"বরাতে বেঁচে গেছ! তুমি যা অসাবধান! যখন তোমার প্রাণ নিয়ে এমন টানাটানি চলছে, আমাকে একবার জানালেই তো পারতে। পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করে রাখতুম। ভয়ানক ডিসিপ্লিনের অভাব!"

রামানুজ হেসে বললে—"ভবিষ্যতে তোমার উপদেশ মেনে চলব। এখন এই দুই ব্যক্তিকে সরাবার বন্দোবস্ত কর। অনাহূত অতিথিদের আমার বাড়ীতে আর কতক্ষণ আশ্রয় দেব। সম্রাটের অতিথিশালায় স্থানান্তরিত করে দাও।"

—"নিশ্চয়ই! এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে দীপঙ্কর থানায় ফোন করে দিলে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সার্জ্জেণ্ট বিনোদ পাল দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে উপস্থিত হল। সার্জ্জেণ্টের হাতে লোক দু'টোকে সমর্পণ করে দীপঙ্কর উপদেশ দিলে—"খুব সাবধানে নিয়ে যেও বিনোদ। যেন পালাতে না পাবে। লোক দু'টো ভীষণ গুণ্ডা-প্রকৃতির। জবানবন্দী যদি কিছু পাওয়া যায় লিখে নিও।"

বাঁধন খুলে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাদের নিয়ে সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলদ্বয় চলে গেল।

আমরা বসে চা খাচ্ছি আর গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ! সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বিনোদ পাল ও দু'জন কনষ্টেবল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে দীপঙ্কর প্রশ্ন করলে—"কি ব্যাপার বিনোদ! হঠাৎ ফিরে এলে যে? সেই লোকদুটো কোথায়?"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বললে—"কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। ফিরে এলুম মানে? আর লোক দু'টোই বা কে? আমি তো আপনার টেলিফোন পেয়েই থানা থেকে সোজা আসছি।"

সকলেই স্তম্ভিত। কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে রামানুজ। বললে—"দীপঙ্কর, আমরা প্রতারিত হয়েছি। শত্রুপক্ষের হাতে আমরাই তাদের অনুচর দু'টিকে সমর্পণ করেছি। তাঁদের বুদ্ধির কাছে আমরা আজ পরাজিত হয়েছি।"

দীপঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে—"একেবারে বেকুব বানিয়ে দিলে। ছিঃ ছিঃ! আমি সন্দেহ পর্য্যন্ত করতে পারলুম না। হুবহু বিনোদের মত দেখতে। উঃ ভারী ঠকিয়েছে। ব্যাটাদের একবার নাগালে পেলে—"

হেসে রামানুজ বললে—"এতক্ষণে তারা নাগালের বাইরে চলে গেছে। চট করে যে তাদের আবার নাগালে পাওয়া যাবে তা তো মনে হয় না।"

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললে—"বিনোদ তোমরা তা হলে থানায় ফিরে যাও। একটু সতর্ক থেক।"

পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবল দু'জন চলে গেল। দীপঙ্কর আমাদের দিকে ফিরে বললে—"আমি ওদের ছাড়ব না। এর প্রতিশোধ নেবই। ব্যাটারা শয়তান!"

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলুম—"শয়তান হতে পারে কিন্তু ঠকিয়েছে বুদ্ধিবলে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, তারা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান্।"

—"বুদ্ধিমান্ না ছাই। ব্যাটারা জোচ্চোর। ঠকিয়েছে—" দীপঙ্কর গর্জ্জে উঠল।

রামানুজ হেসে বললে—"যে ঠকে তার চেয়ে যে ঠকায় তাঁর বুদ্ধি বেশী। আমরা ঠকেছি তারা ঠকিয়েছে। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে, তাঁদের বুদ্ধি আমাদের তুলনায় অধিক। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ হবে না। তুমি আপাততঃ একটা সাহায্য করতে পার?"

দীপঙ্কর প্রশ্ন করলে—"কি করতে হবে?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"ক'লকাতায় সব থিয়েটারের পাশ যোগাড় করে দিতে হবে। আর প্রত্যেক থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। যাতে অবাধে ষ্টেজের ভেতর যেতে আসতে পারি। কেউ কোন প্রশ্ন অথবা সন্দেহ না করে।"

দীপঙ্কর বিস্মিত হয়ে রামানুজের মুখের দিকে চেয়ে বললে—"দিতে পারি, কিন্তু কেন?"

রামানুজ হেসে বললে—"থিয়েটারে বই চালাব।"

আমি তার এই উত্তরে এত দূর অবাক হয়ে গেলুম যে, মুখ দিয়ে একটি কথা পর্য্যন্ত বার হ'ল না।

আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিজের দিক থেকে শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অন্তত যাঁরা আমার মত সাহিত্যিক অর্থাৎ যাঁরা উপন্যাস গল্প নাটক লেখেন, তাঁদের পক্ষে। যাঁরা কাব্য রচনা করেন, কবি, তাঁরাও আমাদের দলের লোক। তবে আমি কবি নই, তাই তাঁদের কথা পৃথক ভাবে বলছি। এ বলার জন্য একটি বিশিষ্ট অধিকারের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন সত্যই হয়। সে প্রয়োজনকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। সে অধিকার পাণ্ডিত্যের, বিশেষজ্ঞতার। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের যা মত সে বড় আশাজনক নয়।

সে দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আজ নেতিবাদই প্রবল। নেতিবাদেরও কিছু বেশী। কিছু বেশী এই কারণে বলছি যে নেতিবাদের অর্থ হল—'কিছু হচ্ছে না।' বাংলা সাহিত্যের ধ্বনি শুধু 'কিছু হচ্ছে না' এইটুকুই নয়, যা হচ্ছে সে ধ্বংসাত্মক। শিবের অসাধ্য ব্যাধি সৃষ্টি করছে বাংলা সাহিত্য। প্রমাণ-স্বরূপ তাঁরা আঙুল দেখিয়ে বলছেন—"কল্পনা-শক্তি নাই—ভাববিলাস আছে, বিশ্বাস নাই—সৌখীন মতবাদ আছে, সাহস নাই—শঠতা আছে, প্রেম নাই—কলহ আছে, প্রতিভা নাই—অনুকরণপ্রিয়তা আছে।" তার কারণ স্বরূপ বলেন—"আজকাল সাহিত্যে spirit-এর উপর matter জয়ী হইয়াছে। আধুনিক লেখকেরা যে স্বাধীন ভাবকল্পনার দাবী করিয়া থাকেন, মূলে তাহা বাহিরের নিকট অন্তরের পরাজয়, বস্তুর নিকটে আত্মসমর্পণ, সমাজের যুগ-প্রয়োজনে স্বকীয় কল্পনার পক্ষচ্ছেদ। ইহারা জড়জীব, চিৎশক্তিহীন, বর্ত্তমানের আবিল ও বিক্ষুব্ধ জনস্রোতের ক্ষণবুদ্বুদ—ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মত মিলাইয়া যাইবে।" গুরুতর অভিযোগ। এ অভিযোগ সত্য হলে আধুনিক সাহিত্য বাঙালীর জীবনের অভিশাপ, বাঙালীর উন্মত্ত আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এ কথা স্বীকার করতে হবে। এ অভিযোগ সত্য হলে বাঙালী সাহিত্যিককে তার শক্তিপ্রবাহের মোড় ফেরাতে হবে, না পারলে তাঁদের লেখনী পরিত্যাগ করাই উচিত।

তবে বিচার ক'রে দেখতে হবে—এ অভিযোগ কি সত্য? এ অভিযোগের বিচার করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে—আমরা কি হয়েছি। এ থেকে অবশ্যই বলতে হবে—আমরা যা ছিলাম তা নাই। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীর এক বিশিষ্ট অংশ বা সম্প্রদায়ের যে নব জাগরণ শুরু হয়েছিল, যার প্রেরণায় আবেগে এই সম্প্রদায়ের জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছিল তার এ পরিণতি কেন? সে এমন শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কেন? তাদের স্বাস্থ্য গেল কেন? তাদের সাহস গেল কেন? তারা এমন কলহপরায়ণ হয়ে উঠল কেন? তাদের প্রতিভার স্ফুরণের আভাস কৈ?

প্রথম প্রশ্ন স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য যদি একমাত্র বাঙলা সাহিত্যের দুর্নীতিপরায়ণতা মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলে নষ্ট করে থাকে তবে অবশ্যই সাহিত্য তার জন্য দায়ী। কিন্তু যদি খাদ্যাভাবে বাঙালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে থাকে, যদি অর্থনৈতিক গোপন যুদ্ধে বাঙালী—গোয়ালের গাই, ক্ষেতের ফসল নিজেকে বঞ্চিত ক'রে অপরের হাতে তুলে দিতে হয়ে থাকে, সেই যুদ্ধে যদি তার ক্ষেত খামার নষ্ট হয়ে থাকে, তার জন্যে অনাহারে দুশ্চিন্তায় বাঙালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে দায়িত্ব সাহিত্যের নয়। এই কারণে যদি বাঙালীর ঘর ভেঙে থাকে, গ্রাম ভেঙে থাকে, সমাজ ভেঙে থাকে, তবে সে দায়িত্ব সাহিত্যের নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই দেখি, তখন সদ্য সদ্য তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তবু বাংলার গ্রামে তখন সম্পদ ছিল, খাদ্য ছিল, কাজেই বাঙালীর স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল, ছিল না কেবল সাংস্কৃতিক চৈতন্য। ইংরেজ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দু বাঙালীর নব জাগরণ হল। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার গ্লানিও অনুভব করলেন তাঁরা। আরও অনুভব করলেন এই সম্পদ ক্ষয়ের সমস্যার আভাস। তাঁরা তখন সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করে তাই জাতীয়তার ভিত্তির উপর জীবন-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আবেগ সৃষ্টি করতে চাইলেন। বাঙালীর সাহিত্যেই সেই আবেগ প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সে আবেগ পরাধীনতার বাঁধকে ভাঙতে পারলে না, সম্পদ-শোষণের পথও রোধ করতে পারলে না। ক্রমে ক্রমে শোষণের পথে বাঙালার সম্পদ গেল—খাদ্য গেল। খাদ্যাভাবেই গেল স্বাস্থ্য।

জাতির স্বাস্থ্য সাহিত্যের দুর্নীতি প্রচারের অভাবে মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য ভাঙেনি। বাঙলার সমাজ, বাঙলার গ্রাম, বাঙালীর ঘর নিঃস্বতার দৈন্যে ভেঙে পড়েছে। নিষ্ঠুর নিরুপায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য। যে কারণে টোলের পণ্ডিতের বংশধর জুতোর দোকান করে, বিশ্ববিদ্যালয় ফেরতা ছেলে আর্দ্দালীর কাজ করে, যার জন্য কৃষক অর্থ নৈতিক দুরবস্থার শেষ স্তরে এসে ভূমিশূন্য হয়ে মেয়ে-ছেলের হাত ধরে কলে গিয়ে মজুর হয়—সেই জন্য। যার জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়ে আপিসের চাকরীর জন্য ছুটোছুটি করছে, তার মা-বাপ তার উপার্জ্জনের অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে—সেই জন্য।

কিন্তু আমাদের আবেগময় স্বাধীনতা আন্দোলন, নৈতিক তপস্যা, সমাজসেবা, ধর্ম্মসংস্কারের প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আমরা শাসনের বন্ধনকে ছিঁড়তে পারলাম না, কেন শোষণের মুখকে রুদ্ধ করতে পারলাম না, কেন বিপুল জীবনাবেগ শাসনতন্ত্রের গোড়ায় মাথা ঠুকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল? তার ভিত্তি কিসে এত শক্ত হল? এর কারণ কি? যে কারণে তিনশ' বৎসর পূর্ব্বে গ্যালিলিওকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল, নিজের আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করতে হয়েছিল, যে কারণে মানুষ আজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—সেই কারণে। গ্যালিলিও এবং বিচারক আজ যদি অলৌকিক কোন রহস্যবশে পৃথিবীতে এসে দাঁড়ান তা হ'লে যে কারণে আজ সেই বিচারককে দণ্ড ভোগ করতে হয়, সেই কারণে।

বিজ্ঞানবিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনী শক্তির ক্ষুধায় দেশকে শোষণ করছিল বিজ্ঞানবাদে বীতশ্রদ্ধ শুধু আত্মিক শক্তির সাধনার দ্বারা সে শক্তির শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভবপর হ'ল না। এমন কি যদি কোনক্রমে পরাধীনতার উচ্ছেদও হ'ত তবুও সেদিন আমাদের সম্পদকে আমরা শোষণের মুখ থেকে রক্ষা করতে পারতাম না। নানা দেশের ষ্টীম ইঞ্জিনবাহী জাহাজে ক'রে অশিল্পোৎপন্ন পণ্যসম্ভার

এসে জিরের দামের জিনিষ দিয়ে হীরে নিয়ে গেলেও আমরা তা রোধ করতে পারতাম না। এই কারণে স্বাধীন থেকেও চীন নিজেকে শোষণের ক্ষয়রোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। আমরা জীবনে ধর্ম্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্প নব প্রেরণা এনেছিলাম, কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছিলাম। বিজ্ঞানকে আমরা তুচ্ছ করেছিলাম। তাকে আমরা অকিঞ্চিৎকর ভেবেছি। যাকে বিশ্বাস করতে চাই বলে আজও জড়জীবী, চিৎশক্তিহীন বলে আমরা তিরস্কৃত হচ্ছি। Spirit-এর উপর matter জয়ী হয়েছে বলে আজও যার জন্য বিপুল আক্ষেপে আকাশ ভ'রে রয়েছে।

বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর জীবনাবেগ পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। সে আবেগময়ী শক্তি বাস্তববাদের শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে, তাই বাঙালীর জীবনীশক্তির সঙ্গে তার সাহিত্যও আজ বাস্তবমুখী—অনিবার্য্যরূপে বাস্তবমুখী।

দ্বিতীয় অভিযোগ সাহস নাই। এও কি সত্য ?

বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা উন্মত্ত, কিন্তু অতি বড় দুঃসাহসের পরিচায়ক—এ ঐতিহাসিক সত্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে যে দমননীতির প্রয়োগ হয়েছে, যত অর্ডিনান্স বাহাল হয়েছে সে আর ভারতের কোন্ প্রদেশে হয়েছে ? শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর ক'টা দেশেই বা হয়েছে ? দমন করে কি ? দুঃসাহসিক-দুর্দ্দমনীয়তা অথবা ভীরুতা ? এ সব সত্ত্বেও বাঙ্গালীর সাহস নাই এই অভিযোগ সত্য ? এরাই তো সেই বাঙালী—যাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু রেনেসাঁস। এদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, নাস্তিপরায়ণতা, সবই ছিল। এঁরাই তো বহু চিন্তার পর পরবর্ত্তী কালে নিজেদের মতবাদ পরিবর্ত্তন করে নব মতবাদকে গ্রহণ ক'রেছেন।

এঁদের সাহস নাই, বিশ্বাস নাই, এঁরা শঠ—এ কথা কে বলবে ? উনবিংশ শতাব্দী থেকে হিন্দু রেনেসাঁসের মধ্যে এঁরাই তো সমস্ত বাঙালী জাতি। সেই জাগরণের সময়ে বলা অবশ্যই হয়েছে—মুচি মেথর চণ্ডাল আমার ভাই। তাদের রোগে আমরা সেবাও করেছি, দুর্ভিক্ষে সাহায্যও করেছি, জলপ্লাবনে উদ্ধারও করেছি। কিন্তু এতেই কি তারা আমাদের ভাই হয়েছে ? আমাদের সাহিত্য তাদের জন্য নয়, শিল্প তাদের জন্য নয়, গ্রামে তাদের স্বতন্ত্র পল্লী, অস্পৃশ্যতা নিবারণের সঙ্কল্প সত্ত্বেও সমাজে তাদের পৃথক্ স্থান। এ কথা অস্বীকারের উপায় আছে কি ? এ ছাড়া বাঙলার আরও এক বৃহৎ সম্প্রদায় আছে।

তাই অনিবার্য্যরূপে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনাবেগ প্রচণ্ডতা এবং মহনীয়তা সত্ত্বেও প্রতিহত হয়েছে। স্তব্ধ হয়েছে। তাই সে প্রতিহতধারা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর উত্তরাধিকারী বিংশ-শতাব্দীর বাঙালীর মধ্যে নূতন আবেগ, নূতন মতবাদ সৃষ্টি করেছে। সে মোড় ফিরেছে। মহাদেবের জটার পাকে পাকে ঘুরে দেবাদিদেবের শিরোবাহিনী হওয়ার গৌরবলাভ করেও সে স্রোত কঠিন মাটির বুকে নামল। স্বর্গের জলধারা পঙ্কিল দেখাচ্ছে হয়তো, স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারার শুভ্রবর্ণ হয়তো মাটির সংস্পর্শে ঘোলা হয়েছে, কিন্তু উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাবারই সম্ভাবনা আছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই বাঙলার প্রাণশক্তি তার স্বাভাবিক পথের সন্ধান করেছে, সে সেই দিকেই মোড় ফিরতে চেয়েছে। মুক্তি আন্দোলনে বাঙলায় বিলাতী কাপড় বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের রব উঠেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এল চরকা। তার সঙ্গে এল গণসংযোগ। হরিজন আন্দোলন। বর্ত্তমান জীবনবাদ—যাকে নিতান্তই ধূলিমলিন নশ্বর বিদেশীয় বলে বর্জ্জনের রব আজ আকাশভেদী—তার ভূমিকা তৈরী হয়েছে ওইখানে। সে আজ ব্যাপ্ত হয়েছে, যতটুকু গণ্ডীর মধ্যে তাকে ধরে রাখার পরিকল্পনা ছিল, আদর্শবাদের প্রেরণায়, জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গাঘাতে সে তার স্বাভাবিক প্রসার লাভ করবার জন্যেই—পরিকল্পনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে। ছুৎমার্গ বর্জ্জিত হরিজন আন্দোলন, জাগ্রত গণ-শক্তি আন্দোলনের কল্পনা আজ সাম্যবাদে পরিণতি খুঁজতে চাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে যদি বলি সাম্যপ্রবণতা বাঙালীর আজ নূতন নয়, সাম্যপ্রবণতা তার জীবনে আগেও আসবার চেষ্টা করেছিল তবে মিথ্যা বলা হবে না। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে বাংলায় এক জীবনাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। সে দিন বাংলার হিন্দু সমাজ রক্ষা পেয়েছিল, এই শক্তিতে, অথচ তারা ভীত হয়েছিল, ত্রস্তও হয়েছিল এই শক্তির বিকাশে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্মে সামাই বড়। তাই তাঁর পশ্চাতে বাংলা থেকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজপথে এক গণমিছিল যাত্রা করেছিল মানস-সরোবর অভিমুখে হংস-বলাকার মত। সৃষ্টি করেছিল নূতন গান, নূতন সাহিত্য, নূতন নাটকাভিনয়—এক নূতন সংস্কৃতি। কীর্ত্তন পাঁচালী পদাবলী কৃষ্ণযাত্রা এই সংস্কৃতির দান। বাঙলার কৃষক-কবি, নৌকার মাঝি-কবি, পথের ভিখারী বাউল কবির গানে বাঙলার সংস্কৃতি সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলার পটুয়া-শিল্পীর পটে ছবিতে শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলার নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতির যে ক্ষীণ রেখা আজও জ্বলছে—সে সেই সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব আন্দোলনের ফল। কিন্তু সে টিকল না দুটি কারণে। প্রথম, যে বিপ্লব চৈতন্যদেব এনেছিলেন—সে ভাববিপ্লব। রাষ্ট্র এবং সমাজ তাতে বদলায়নি। বিষয়কে বিষ বলে পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি। তাই ভিক্ষার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এই সম্প্রদায় অর্থশালীদের চাপে ক্রমে ক্রমে হীন থেকে হীনতর স্তরে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে। তাই আজ ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ভাব-বিপ্লবের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বৈদেশিক দৃষ্টান্ত মাত্র। তাকে এ দেশের উপযোগী করেই গ্রহণ করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক হলেও আমরা গ্রহণ করেছিলাম এ দেশের উপযোগী ক'রে। লোহার কারখানা, কাপড়ের কলের প্ল্যাণ্ট বিদেশ থেকে এনে আমরা বসিয়েছি, তাতে তার উৎপন্ন বস্তু বৈদেশিক হয় নাই বা হয় না।

এ বাঙালীর চরিত্রদুর্ব্বলতার ফল নয়, সাহসের অভাবের জন্যে নয়, অনুকরণপ্রিয়তার জন্য নয়। ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে এ পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীর জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।

এখন প্রশ্ন উঠবে—ঐতিহাসিক বিচারে এই পরিণতি হলেও এ পরিণতি শ্রেয়ঃ কি না ? বলবেন—spiritএর উপর matter জয়ী হলে মানুষ পতিত হবে, আমরা আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হব।

আরও প্রশ্ন উঠবে। যাঁরা নিছক সাহিত্যের পক্ষপাতী—তাঁরা

সমস্ত কিছুকে একটি কথার ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মত উড়িয়ে দিতে চাইবেন, বলবেন—'এহ বাহ্য।' সাহিত্যের সঙ্গে এই লৌকিক অবস্থান্তরের সম্বন্ধ কি? এ সমস্তই অনিত্য! সাহিত্য নিত্য শাশ্বত চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবর্ত্তনশীল রাজনীতি, Matter বা বস্তুজগৎ লৌকিক বাহ্য! মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান হারিয়ে মানুষের সঙ্গে সাহিত্য মাটির ধূলোয় মিশে যাবে।

তাঁদের বক্তব্য—পৃথিবীর এই কঠিন বস্তুবাদ চিরদিনই আছে। জীবন Life তার সঙ্গে সংঘর্ষে, দ্বন্দ্বে, আত্মরক্ষার তাগিদে, জয়ের কামনায়, অন্তরের তপস্যাবলে রূপ হতে রূপান্তরে প্রকাশমান হয়ে মননশক্তিসম্পন্ন জীবদেহ এই মানব পরিণতি লাভ করেছে! মানুষও তার সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বস্তুপ্রধান বহির্লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে দুঃখ পেয়েছে; সেই বেদনায় সে সৃষ্টি করেছে অন্তরলোকে কামনার কল্পলোক। সেখানে শোকে-মিলনে, দুঃখে-সুখে, আলোকে-অন্ধকারে একাত্ম হয়ে গেছে। সেই লোকের পথ দিয়েই সে আবিষ্কার করেছে সৃষ্টিরহস্য, রূপের বসতির মধ্যে অরূপ স্রষ্টাকে, এবং তারই সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির আনন্দে তার মনে যে রসসৃষ্টি হয়েছে—তাই অমৃত, তারই অভিব্যক্তিই চিরন্তন সাহিত্য। সুতরাং মানব-জীবনে বস্তুই সর্ব্বস্ব হলে মনোলোক খর্ব্ব হবে, সে তার কল্পনার দূরপ্রসারী শক্তি ও সৃষ্টি হারাবে; যা নশ্বর নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, তাকে সর্ব্বস্ব করে অমৃতময় চিরন্তনত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই বাহ্য রাজনীতিতে বাধা—তাই বস্তুবাদপ্রধান জীবনবাদে বাধা।

আশঙ্কার কথা সত্য। কিন্তু বহির্লোকের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ যে বেদনা পেয়ে স্বপ্নের কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে, সেই বহির্লোক জয়ের ফলে যতই তার বেদনার পরিমাণ কমে আসবে—ততই তো তার কল্পনাশক্তি স্বপ্নের কল্পলোক থেকে সরে বহির্লোকমুখী হবেই। এই তো স্বভাব-নিয়ম। কিন্তু তার ফলে মানুষের মনের সূক্ষ্ম স্পন্দমানতা ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ হবে এ আশঙ্কা কেন? বহির্লোকও যে নূতন দৃষ্টিতে নব দর্শনের ফলে ক্রমশঃ স্পন্দমান হয়ে উঠেছে। ফুল চিরদিন ফুটে আসছে। এক দিন ছিল—যে দিন ফুলের বর্ণ, ফুলের গন্ধ, তার সৃষ্টি—শুধু স্রষ্টার চরণে আত্মনিবেদনের জন্য—এই বলেই সাহিত্য রচিত হয়ে এসেছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান আবিষ্কারের পরবর্ত্তী কালে, তার বর্ণ, তার গন্ধের মধ্যে যে বাণীর সন্ধান পেলাম —সে বাণী বললে অন্য কথা। সে দিলে ভ্রমরে ডাক। তার মধ্যে মানবজীবনের যৌবন-রহস্যের সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষিত হ'ল। সৃষ্টি-রহস্যের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা বস্তুপ্রধান নিশ্চয়ই। সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি তাতে খর্ব্ব হয় নাই। ফুলের স্পন্দন তারও কল্পনায় স্পন্দন তুলে তাকে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছে। সে কাব্য মহৎ সাহিত্য হয়েছে, তাতে বাধা হয় নাই।

তা ছাড়া, সমগ্র বহির্লোকের মধ্যে মানুষ যখন জীবনস্পন্দন আবিষ্কার করতে পারবে, তখন বস্তুস্পন্দনের সঙ্গে নিজের জীবন-স্পন্দনের যে একাত্মতা সে করবে অনুভব—সে অনুভূতির ফলেও আমরা চিরন্তন অমৃতরস অনুভব করতে পারব। বরং মানুষের অনুভবের শক্তি তাতে বৃদ্ধিই পাবে।

লোহা গলে। ঢালাই হয়। ফুটন্ত লোহার তারল্যের মধ্যে অণু-পরমাণুর দ্রুত স্পন্দনশীলতা নব যুগের সাহিত্যিকের অন্তরে লোহায় গানের ধ্বনি স্পন্দন তুলবে। সাহিত্যিকের কল্পনার মাথায় হাতুড়ির ঘা মেরে তাকে ভোঁতা করে দেবার আশঙ্কার কথাটাই বড়। বিশেষ করে যখন তার শীতল কাঠিন্যের মধ্যেও প্রাণস্পন্দনের আভাস আমরা পাব। যেমন পাথর। সে যখন পড়ে থাকে মাটিতে তখন তাকে লোকে মাড়িয়ে যায়। সে যখন প্রাণময় দেবতা হয়ে সিংহাসনে বসে তখন তার সঙ্গে আমরা কথা কই।

এর পর সাময়িক সমাজ এবং রাষ্ট্রের কথা। রাজনীতি আর সমাজনীতির কথা।

এ প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি চিন্তা ক'রে দেখেছি। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে দু-দিক থেকেই বুঝবার ভুল আছে। আসল আপত্তি অর্থাৎ বাদ-প্রতিবাদের কোন অবকাশই নেই এখানে।

সাহিত্য অর্থে—কথাসাহিত্যে, গল্প-উপন্যাস-নাটকে জীবন-লীলাই প্রধান মুখ্যবস্তু। এ কথায় কোন পক্ষেরই আপত্তি নাই বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু জীবনের পশ্চাতে তো স্থান ও কাল আছে। রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে স্থান-কালের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য্য স্থির আছে, গতিশীল পৃথিবী বিবর্ত্তিত হচ্ছে, চলছে; ফলে বর্ণে ও উত্তাপের বিভিন্নতায় প্রভাত ও সন্ধ্যার লীলা রূপান্তরিত হচ্ছে—কালো জলের বুকে পদ্মের পাপড়ি খুলে যাওয়া এবং মুদিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের জীবনলীলাও তো তেমনি ধারা সাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক। বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ যেমন বেদনা পেয়েছে, তেমনি বেদনা সে পেয়েছে রাজনীতি এবং সমাজনীতিনিয়ন্ত্রিত তার স্বজন, তার প্রতিবেশী, তার দেশবাসী এবং অন্য দেশবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে। বরং এ বেদনা আরও প্রগাঢ়, আরও গভীর। কারণ, মানুষের যে কল্পলোক তার সঙ্গে তার কালের ও দেশের সর্ব্ববিধ নীতি বা বাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। একটা অপরটার প্রতিফলন। আত্মিক বহিঃপ্রকাশ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানুষের বিকাশ ঘটছে।

চণ্ডীদাস ভালবাসেন রামীকে।

সমাজনীতি-বিরোধী ভালবাসা। সমাজ তাতে বাধা দিল। সে বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে তাঁকে নির্য্যাতন ভোগ করতে হ'ল। তার মধ্যেই তো হ'ল চণ্ডীদাসের জীবনের প্রকাশ। তার মধ্যেই তো তিনি উপলব্ধি করলেন জাতি ধর্ম্ম সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে রজকিনীর বরণীয়তা। তাই তো তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হ'ল—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

রাজনীতি সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। এর বহু দৃষ্টান্তই আছে। রামায়ণ, মহাভারত সমস্ত কিছুই সেকালের রাজনীতি এবং সমাজ-নীতির পটভূমিকায় রচিত। তবে জীবন পটভূমি অপেক্ষা অথবা পটভূমি জীবন অপেক্ষা বড় হবে সেই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন অবান্তর। সমাজনীতির অনুশাসনের কাছে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বনবাস ভোগ করতে হয়েছে, আবার পরীক্ষাস্থলে তিনি পরীক্ষা দিয়েই বিজয়িনীর রূপেই বসুন্ধরার গর্ভে অন্তর্হিতা হয়েছেন। জীবন জয়ী হয়েছে, বড় হয়েছে। এই জীবনের জয়েই সাহিত্যের সার্থকতা। সমাজ আঘাত পেয়েছে—তারও এসেছে নব চেতনা। সমাজের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে নবপ্রেরণা। রস তো শুধু আস্বাদনেই মধুর নয়, তার সঙ্গে তার সঞ্জীবনী শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

মতবাদ বা একটা জীবনদর্শন প্রত্যেক অভিব্যক্তির মধ্যেই াছে। কারণ, দৃষ্টির ফলে ভাবের উদ্রেক হয়। ভাবের প্রকাশের ধ্যে অবশ্যই দৃষ্টির দর্শনভঙ্গির পরিচয় থাকবে। সেই তো তবাদ। তবে মতবাদ অত্যুগ্র হয়ে জীবনলীলা অপেক্ষা প্রকট লেই সে হয় প্রচারধর্মী। সে বস্তু সাহিত্যই নয়। আবার যে ীবন দেশ ও কালের পটভূমির উপর স্থাপিত নয় সে জীবন খণ্ডিত সম্পূর্ণ। তাই সে সুন্দর হলেও সম্পূর্ণ নয় অর্থাৎ সত্য নয়।

সমগ্র বাঙালী জাতি—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায় গত ঞ্চাশ বৎসর যে পথে চলে এসেছে—সে পথ রাজনীতির পথ, সমাজ- ীতির পথ। বাঙলার আকাশে-বাতাসে দুঃখ-দারিদ্র্যের যে ধ্বনি ঠেছে তার মধ্যে রাজনীতির স্পর্শ রয়েছে। যেমন ছিল অষ্টাদশ তাব্দীতে বয়নশিল্পীদের কান্নার অন্তরালে। যাকে কোন মতে পেক্ষা করা যায় না। বাঙলায় উল্লাসের ধ্বনি যদি কিছু উঠে াকে সেখানেও আছে এই অনুরূপ কারণ। রাজনীতি এবং সমাজ- ীতিকে বর্জ্জন করার অর্থ দেশ ও কালের পটভূমিকে বর্জ্জন রা, তাকে বর্জ্জন করে যে সাহিত্য সে good art হতে পারে, reat artএর পর্য্যায়ে সে উঠিতে পারে না। সাজানো গোজানো নে অসুন্দর নয়,—কিন্তু তার সে স্বভাবরূপ নয়।

যাঁরা আজ খণ্ডিত জীবন নিয়ে দেশ-কালের আংশিক পটভূমির পর রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা সমগ্র েশের এবং যুগকালের পটভূমির উপর জাতীয় জীবন নিয়েই বা হত্তর সাহিত্য রচনা করতে অক্ষম হবে কেন? জাতীয় জীবনের ছিল চলেছে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ত্যাগ, স্বার্থপরতা প্রভৃতির া দিয়েও সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে জীবনের চিরন্তন াকাশ নূতন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে চাচ্ছে—সেই তো চির পুরাতন থচ চির নূতন। রাজনীতি সমাজনীতিকে যাঁরা বর্জ্জন করতে ন, তাঁরা জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গণ্ডীকে বৃহত্তরে প্রসারিত রতে ভীত হচ্ছেন—সেই তাঁদেরই মত যাঁরা নিজেরা এবং সন্তান- ন্ততিদের রাজপথের জয়যাত্রীর দল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেন, াশঙ্কা করেন—ওখানে গেলে কুলধর্ম্ম নষ্ট হবে। কিন্তু কুলধর্ম্মের য়ে জাতিধর্ম্ম বড়, এ কথা নূতন নয়, এ কথা চিরকালের কথা। বং যেখানে জাতিধর্ম্মের কথা সেখানে সবাই ভিড় ক'রে আসবে। ী আসবে, দরিদ্র আসবে, হিন্দু আসবে, মুসলমান আসবে, স্পৃশ্য াসবে, অস্পৃশ্য আসবে; রাজপথে চলমান মিছিলের মধ্যে পরস্পরের ধ্যেও ঘাত-প্রতিঘাত লাগবে। চলার পথে সামনের পংক্তি ক্ষ্যস্থলে পৌঁছুলেই গোটা মিছিলের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুনো যখন হয় , তখন সকলকে স্থান দিতে হবে সামনের পংক্তিতে অর্থাৎ ক পংক্তিতে। এবং এই সত্যকে অস্বীকার যাঁরা করতে চান ারা সত্যের পূজা করছেন কি না এ কথা ভেবে দেখতে তাঁদেরই নুরোধ করি। হাঁ—নব কল্পনার সব কিছুই এই দেশের মাটির বং মানুষের উপযোগী, তার জন্য যাঁরা চিন্তিত হয়ে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান- ী উচ্চারণ করেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানাই। ব অতি সাবধানীর বর্জ্জন করার যুক্তিকে আমি অস্বীকার ি।

আর আছে ঐতিহ্যের কথা। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ঐতিহ্য কি? ঐতিহ্য কি কতকগুলি নীতি? রীতিতে প্রকাশ হলেও তার মর্ম্মগত অর্থ কি ভেবে দেখব না? মাটির প্রদীপে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালনই ঐতিহ্য না অন্ধকারে আলোর ব্যবহার জানাটা ঐতিহ্য? যে পন্থায় জীবনের কল্যাণ আসে, জীবন মহনীয় ভাবে বিকশিত হতে পারে তার পন্থার গতি যেখানে থেমে গেছে, নূতন কল্যাণকে বরণ করার, গ্রহণ করার আগ্রহ সাহস যেখানে নাই, সেখানে ঐতিহ্যের অর্থ কি? আত্মকল্যাণের সঙ্গে সর্ব্বজনীন কল্যাণ গ্রহণ করবার উদারতা এবং শক্তিই তো ঐতিহ্যের ধর্ম্ম এবং মর্ম্মকথা।

আমার বিশ্বাস, মানুষ একদা যাত্রা করেছে অরণ্য গিরি-কন্দর থেকে, সে দিন হাতে ছিল তার পাথরের হাতিয়ার, তার পর সে গড়েছে গ্রাম, তার পর সে গড়েছে জনপদ। আজ সে গড়েছে সহর, পাথর থেকে সে আবিষ্কার করেছে লোহা! ক্রমে সে লোহার মধ্যে পাথরের মধ্যে প্রাণশক্তিসম্পন্ন পরমাণুর আবিষ্কার করেছে। এ যাত্রাপথে চিরন্তন দেহধর্ম্ম সত্ত্বে তার মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে তার জীবনধারণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেছে এবং করবে! আগে যা মেনেছে পরে তা ভেঙেছে, আবার তা ভেঙেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সে নিজেকে প্রসারিত করেছে, নিজেকে সে ব্যাপ্ত করেছে, অপরকে স্বীকার করেছে, আপনার মধ্য দিয়ে অন্যকে সে উপলব্ধি করেছে। এই বাণী আজ বাংলা সাহিত্যেরও বাণী হয়ে উঠতে চাচ্ছে। তার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত আছে। সেই সম্ভাবনার পথেই মানুষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চলতে চাচ্ছে। চলবে। চলার পথে ভ্রান্তি-বিভ্রম আসে চিরকাল। আগেও এসেছিল, এ যুগেও এসেছে, আবারও হয়তো আসবে। নব সাহিত্যের ধারার মধ্যেও প্রথম যুগে এসেছিল। সে কথা ঐতিহাসিক সত্য। সে ভ্রান্তির কথা স্বীকার করি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি সে যে ভ্রান্তির কুফল—আজ আবর্জ্জনায় পরিণত হয়েছে, মানুষ তা' গ্রহণ করেনি। সে ভ্রান্তির সময় যাঁরা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছেন তাঁরা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু তাই সব নয়। নূতন ভাব ও সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করার এইবার প্রয়োজন হয়েছে। নূতনকে গ্রহণের কাল এসেছে। নূতন উপলব্ধিতে এই নূতন কালে আমাদের যাত্রাপথ ক্রমশঃ প্রসারিত হোক, বাঙালীর জাতীয় জীবন বেগবান হোক।

সেই সঙ্গে নব যুগের বাঙলা সাহিত্যের ধারা যা আছে ক্ষীণ সে হোক দুকূলপ্লাবিনী। বাঙলা সাহিত্য বাঙলার সকল মানুষের কল্যাণ-কামনায় তপস্যা পরিপূর্ণ হোক। সর্ব্বজনীন সম-অধিকারের নব্য-ন্যায়ের সত্যকে প্রকাশ করে অমৃতত্বের অধিকার লাভ করুক। বাঙলার কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বর ভূমির অভ্যন্তরের অণু-পরমাণুর স্পন্দনের মিলন ঘটুক; ঊর্দ্ধে জ্যোতির্লোকের প্রাণস্পন্দন বাঙ্ময় হয়ে সাহিত্যিকের বিজ্ঞান সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলে স্পন্দিত হোক। প্রাণি-জগৎ থেকে উদ্ভিদ্-জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ থেকে ধাতুতে প্রস্তরে বস্তুজগতের স্তরে স্তরে প্রাণময় নব রহস্যলোকের যবনিকা উদ্ঘাটিত হোক তার দৃষ্টির সম্মুখে—সমৃদ্ধ হোক তার কল্পনা। কল্পনালোকের অরূপ অপরূপ হয়ে প্রকাশমান হোক জীবনে সাহিত্যে। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা সত্য হোক, জীবন ধন্য হোক।

দৃষ্টি-প্রদীপ

"ভাস্কর"



১

বিধবার সংসার। ছোট একখানি দোতলা বাড়ীতে চার-পাঁচটি প্রাণী। অনসূয়ার স্বামী একখানি ছোট বাড়ী ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামীর স্মৃতি বুকে করিয়া দুই বছরের খোকাকে কোলে করিয়া অনসূয়া যেন নূতন সংসার পাতিয়াছেন। বৃদ্ধা শাশুড়ী দারুণ শোক পাইয়া পুত্রবধূ ও পৌত্রকে যেন আরো বেশি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। একটি পাচক ও একটি ভৃত্য সংসারের কাজ-কর্ম্মের জন্য রাখা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসার যেমন করিয়া চলে অনসূয়ার সংসারও তেমনি করিয়াই চলিয়াছে। বিধবা হইয়াও ভাগ্যক্রমে একেবারে পরগলগ্রহ হইতে হয় নাই।

খোকাকে লইয়াই সারাদিন কাটে। তাহাকে খাওয়ানো, পরানো, দুধ খাওয়ানো, কাজল পরানো, ঘুম পাড়ানো—এ সব কি কম কাজ! তার পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক রাখা, বিছানা বালিশ মশারি ঠিক করা, তার খেলনার ব্যবস্থা করা, বৈকালে ঠেলাগাড়ীতে করিয়া বেড়াতে পাঠানো, আরো কত কাজ! খোকাকে লইয়া অনসূয়ার এক দণ্ড বিশ্রাম নাই।

একটু অসুখ করিলে, অমনি অনসূয়া চঞ্চল হইয়া উঠেন। তখনি চাকর যায় ডাক্তারের বাড়ীতে। ডাক্তার আসে, ঔষধ আসে, খোকা কাঁদে, কখনও ঔষধ খায়, কখনো খায় না। কখনো ঘুমায়, কখনো ঘুমায় না—অনসূয়ার সে কি উদ্বেগ! যে কয় দিন খোকা অসুস্থ থাকে, সে কয় দিন অনসূয়াও যেন অসুস্থ হইয়া পড়েন। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী কত বকেন, কত বলেন, কেন অত ভাব বউমা? একটু সর্দ্দি লেগেছে, সেরে যাবে। ছেলেপিলের অমন কত হয়। অনসূয়ার মন বোঝে না।

খোকা যতক্ষণ চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে যায়, বাড়ীটা খালি খালি লাগে। অনসূয়া গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সারিয়াই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান, হয়তো পাশের বাড়ীর কারো সঙ্গে একটু কথা বলেন কিংবা বলেন না, কিন্তু তাঁর মন আর চোখ পড়িয়া থাকে যে পথে খোকা বেড়াইতে গিয়াছে, সেই পথে। একটু দেরী হইলে ভাবনার অন্ত থাকে না। পথে বাহির হইলেই তো কত রকমের বিপদ! বাড়ী ফিরিয়া খোকা যখন কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অনসূয়া তখন যেন স্বর্গ হাতে পান।

খোকা একটু একটু করিয়া বড় হয়। অনসূয়া তারই মধ্যে স্বামীর প্রতিচ্ছবি দেখেন। অনেক বই হইতে অনেক বাছিয়া, চেনা-শুনা আত্মীয় স্বজনের ছেলেদের নাম মনে করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল যে সব কাগজে বাহির হয়, সেগুলি পড়িয়া, বহু বার স্থির করিয়া বহু বার পরিবর্ত্তন করিয়া অনসূয়া খোকার নাম রাখিলেন প্রদীপকুমার। নিজের চির-অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো ওই খোকা। ওই খোকাই তাঁর গৃহের প্রদীপ।

খোকা আর একটু বড় হয়। লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে, তার পর যায় স্কুলে। অনসূয়ার দুশ্চিন্তা দশ গুণ বাড়ে। সময়মত ঠিক রাখা, দুপুরে জলখাবার পাঠানো, বৈকালে স্কুল হইতে বাড়ী ফেরা—প্রত্যহ যেন এক মহাযজ্ঞ। বাড়ীর বাহির হইলেই পুনরায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কত ভাবনা। স্কুলে কি করে, পথে কি করে, কখন খিদে পায়, কখন অসুখ করে, এমনি কত ভাবনা সদা-সর্ব্বদা অনসূয়ার মনে জাগিয়া থাকে।

খোকা পাশ করে, জলপানি পায়, অনসূয়ার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। খোকা এখন আর খোকাটি নাই। এখন হইতে সে প্রদীপ। প্রদীপকুমার কলেজে ভর্ত্তি হয়, মোটা মোটা বই পড়ে, হাফপ্যান্ট পরিয়া খেলিতে যায়—দেখিয়া দেখিয়া অনসূয়ার মন শান্তিতে অভিষিক্ত হয়।

প্রদীপ এম্-এস্-সি পাশ করিল, পুরস্কার পাইল, মেডেল পাইল। একটি কঠিন পরীক্ষা দিয়া প্রদীপ সরকারী চাকুরীতে ঢুকিল। মায়ের অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা আজ সফলতার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রদীপের দিকে চাহিয়া অনসূয়া ভাবেন, আহা, যদি আজ তিনি থাকিতেন! ভাবিতে ভাবিতে মনের মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস জমিয়া উঠে, পুত্রের মুখ চাহিয়াই তাহা নীরবে সকলের অলক্ষে মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখেন।

প্রদীপের বদলীর চাকরি। কিছু দিন অনসূয়া কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া খোকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিলেন। একা যে তাহার কষ্ট হইবে! কে তাহার দেখাশুনা করিবে? প্রদীপের অল্প একটু আপত্তি সত্ত্বেও অনসূয়া দেখিয়া শুনিয়া প্রদীপের বিবাহ স্থির করিলেন।

শুভলগ্নে খোকার বিবাহ হইয়া গেল। কিছু দিন পর্য্যন্ত অনসূয়া পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরিলেন। প্রদীপ ও সন্ধ্যা তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায় আনিয়া দিয়াছে। সংসারের ভারকেন্দ্র ক্রমশঃ তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। প্রদীপের বদলিও বড় ঘন ঘন হইতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার পরিত্যক্ত বাড়ীতেও নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত দেখিয়া ও সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া অনসূয়া এত দিন পরে তাঁহার প্রদীপকে ছাড়িয়া কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

প্রদীপ ও সন্ধ্যা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসে। মায়ের কাছে দুই-এক দিন থাকে, আবার চলিয়া যায়। মা চিঠির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। প্রদীপ ও সন্ধ্যা দু'জনেই পত্র লেখে। কুশল-সংবাদ পাইলে তৃপ্তিলাভ করেন, অসুখ-বিসুখের সংবাদ পাইলে ভাবিয়া আকুল হন। আরোগ্য-সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত এতটুকু শান্তি পান না। পুরানো ঝি যখন বলে, ওদের জন্য কেন অত ভাব? ওরা

অনসূয়া বলেন, ওরা যে আমার চোখের মণি। ওদের না দেখে আমি থাকতে পারি নে যে।

২

ত্রিশ বৎসর পরে। এই ত্রিশ বৎসরে অনসূয়ার শরীরে ও মনে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বামীর স্মৃতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও এখনও তাহার মনোরাজ্যে অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই। বসতবাটীখানি ক্রমশঃ পুরাতন হইলেও তাহার প্রত্যেকখানি ঘর, প্রত্যেকখানি জানালা তাঁহাকে একান্ত আপন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সহ তাঁহার প্রদীপ বহু দিন বহু দূরে থাকিলেও তাঁহার মনের নিভৃত কন্দরে সর্ব্বদা তাহাদের ছবিই ভাসিয়া উঠে।

নিজের বার্দ্ধক্য ও বৈধব্যের ভার আর একা বহিতে পারেন না। একটি দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা ভাইঝিকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। পুরাতন ঝি কয়েক বৎসর হইল, হাসপাতালে মারা গিয়াছে। একটি দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি আজ কয়েক বৎসর হইল এখানে আছেন—তিনিই সাংসারিক ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জীবন যেমন করিয়া চলিত, এখনও তেমনি চলিতেছে। এই ত্রিশ বৎসরে কত নবীন জীবন অঙ্কুরিত হইয়াছে, কত জীবন-দীপ নিবিয়া গিয়াছে; মানুষের সমাজে কত নবীন চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, বিজ্ঞান কত অভিনব তত্ত্ব ও অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে: কত প্লাবন, কত ঝঞ্ঝা, কত মহামারী, কত অশান্তি বহিয়া গিয়াছে পৃথিবীর বুকে; কত প্রয়াস ও নিষ্ফল কামনা স্তূপীকৃত হইয়াছে মানুষের জীবনে, সমাজে ও চেতনায়; কিন্তু মানুষের একান্ত আপন যে জীবন, যে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের তারে গাঁথা বৈচিত্র্যের মালা, কতটুকু পরিবর্ত্তন তার হইয়াছে?

অনসূয়া আজ বৃদ্ধা। তাহার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সবই আজ প্রায় নিস্পন্দ। তাঁহার বাড়ীখানি, তাঁহার সঙ্গী ও সঙ্গিনী কয়েকটি নরনারী, আর বিদেশবাসী তাহার প্রদীপের সংসার, ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান জগতের সবটুকু। এই ক্ষীণ পরিধির বাহিরে তাহার মন যায় না। তাঁহার চক্ষুর পরিধি আরও ক্ষীণ। একটি চক্ষু একেবারেই গিয়াছে। আর একটি চক্ষুতে খুব অল্প দেখিতে পান। ক্রমশঃ তাহাও যেন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রদীপ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন অনসূয়া তার, সন্ধ্যার এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদের প্রত্যেকের মুখখানি হাতে করিয়া চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়াছিলেন। নাতি-নাতনীরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। ভাইঝি সারদা বলিয়াছিল, পিসিমা, তুমি একেবারে পাগল! অনসূয়া উত্তর দিয়াছিলেন, ওরা যে আমার চোখের মণি।

প্রদীপ বদলি হইয়াছে পুণায়। সেই যে তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহার পরে আর এদিকে আসা হয় নাই। কবে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। অনসূয়ার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে ধীর মন্থর গতিতে। এ গতিতে কোন সুর নাই, কোন তাল নাই, কোন বিস্ময় নাই, কোন মাধুর্য্য নাই, কোন তিক্ততা নাই।

কয়েক দিন হইতে মনে হইতেছে, চোখের অবশিষ্ট জ্যোতিটুকুও যেন কমিয়া আসিতেছে। অনসূয়া মাঝে মাঝে সারদাকে কাছে ডাকিয়া তাহার মুখের উপর আলো ফেলিয়া দেখেন, চোখের দৃষ্টিটা আছে না একেবারেই গেছে। এক দিন তাঁহার মনে সত্যই সন্দেহ হইল, বোধ হয় আর বেশি দিন চোখের দীপ্তি থাকিবে না। চোখের কোণে জলের ফোঁটা জমিয়া উঠিল। সারদাকে বলিলেন, শীগগির একখানা টেলিগ্রাম করে দিতে বল্। এখুনি যেন ওরা চলে আসে, নইলে এ জন্মে আর ওদের দেখতে পাব না।

টেলিগ্রাম গেল। এ বাড়ীর সকলেই পথ চাহিয়া আছেন। উহাদের থাকিবার সুবিধার জন্য ঘরগুলি পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং যথাসম্ভব সাজানো-গুছানো হইয়াছে। প্রত্যহ দুই বেলা ট্রেণের সম্ভাবিত সময়ে পথের দিকে সকলে চাহিয়া থাকে। টেলিগ্রামের উত্তর না আসায় উহাদের আসিবার সম্ভাবনা আরও বেশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সকলেই বলিতেছেন, না আসতে পারে টেলিগ্রামের উত্তর আসত।

সাত-আট দিন পরে উদ্বেগের প্রশান্তি হইল। টেলিগ্রাম নয় একখানা পত্র আসিল। ছোট চিঠি। মর্ম্মও ছোট। প্রদীপ ছেলে-মেয়েদের লইয়া কাশ্মীর বেড়াইতে যাইতেছে। এখন কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়।

অতি ধীরে সন্তর্পণে সংবাদটি অনসূয়াকে জানানো হইল। বৃদ্ধা বোধ হয় একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। চোখটিও বোধ হয় একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গেল!

প্রেম

শ্রীউমা দেবী

আজ ফিরে ফিরে শুধু তোমার কথাই
মনে পড়ে বাদলের দুপুর বেলায়।
কেমন ঘিরেছে মেঘ। তুমি আর আমি
দু'জনে দু'ঠাঁই আছি। কেবল আকাশ
মেঘের সজল-ছায়া আঁচলের তলে
এইক্ষণে আমাদের এনেছে সংযোগ—
সংযোগ এনেছে আজ দেহের মনের—
বর্ষণ-শীকর-স্নিগ্ধ দুপুর বেলায়।

আজ যেন মনে হয় যত দূর যাও
লক্ষ শত জন্ম ধরে পথচারী হয়ে
সমাপ্তি-বিহীন এই আকাশের তলে
বিচ্ছেদ কখনো তবু হবে না কোথাও।
অনন্ত উদার কাল—অনন্ত আকাশ—
অনন্তের অধিকার রয়েছে আমার।

শুক্লপক্ষ রাত ছিল। ছাদের উপরে
শুধু তুমি আর আমি সেদিন ছিলাম।
আকাশে অপূর্ব্ব চাঁদ অদ্ভুত উজ্জ্বল
(দ্যুলোকে ভুলোকে যেন যত আলো ছিল
তিল তিল আহরণে হয়েছে নির্ম্মাণ)
উজ্জ্বল অদ্ভুত চাঁদ—লক্ষ যুগ পরে
সেদিনই পেয়েছিল অপূর্ব্ব পূর্ণতা
আমি চেয়ে দেখিলাম সে চাঁদ তুমিই।

আজো বসে আছি ছাদে। শুধু তুমি নাই,
আকাশে ওঠেনি চাঁদ। অন্ধকার হতে
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের জ্যোতির কণিকা
নির্ণিমেষ চেয়ে আছে আমার নয়নে।
চূর্ণিত চাঁদের রেণু—আলোক কি ওরা?
দেখিলাম তারাদলে রয়েছি আমিই।

এসো আজ নদী-তীরে বসিব দু'জন,
বিছানো—কোমলতর বেলাবালুকায়,
দু'জনে জাগিয়া আজ করিব যাপন
এ যামিনী প্রিয়তম নিবিড় মায়ায়।
কেমন গহন আজি রাতের আঁধার,
ঝিমায় তারার দল সুদূর আকাশে,
ঘুমন্ত নদীর মৃদু মন্থর নিশ্বাস,
শয়ান শৈবাল দল গভীর আলসে।

ছোঁয়া লাগে কেশের না বাতাসের প্রিয়!
নাসায় কিসের ঘ্রাণ? ফুলের? দেহের?
জলের গুঞ্জন এ কি তোমার গুঞ্জন?
অন্তরে রয়েছো তুমি অথবা বাহিরে?
যে আলো নয়নে মোর ফেলিছে আভাস
তোমার নয়ন কি এ পূবের আকাশ?

সে যে ঠিক কোন দিন পড়ে নাকো মনে
দোতলার ছোট ঘরে জানলার পাশে
গদি-আঁটা কেদারায় তুমি ছিলে বসে
আর তার হাতলেতে আমিই ছিলাম।
আলো ও আঁধারে মেশা আবছায়া ঘর
জানলার লতাজালে সন্ধ্যার লালিমা
উন্মুক্ত কেশের ছায়ে আধো ঢাকা তুমি
মনে পড়ে দিয়েছিলে সরাগ চুম্বন।

চাহিলাম নীলাকাশে বাতায়ন পথে
খণ্ডিত মেঘের দল সূর্য্য ডুবে যায়
বর্ণ-আলিম্পন মেঘে দ্রুততর বেগে
রন্ধ্রহীন অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলায়—
আমি ভাবিলাম শুধু সূর্য্য ডুবে গেলে
রঙের ভঙ্গিমা কেন আকাশ হারায়!

দেখিতে কি পাও বন্ধু সন্ধ্যাকাশ তটে
ওই ঘোর হয়ে নামে নিশার কালিমা?
ভয়ত্রস্ত বিহঙ্গের উন্মত্ত কূজনে
শুনিছ কি দিবসের প্রলাপ-ক্রন্দনা?
তৃষাতুর দিবসের ক্রন্দনা ও নহে
নহে জেনো ও কালিমা আসন্ন নিশার
যৌবন দেখিছে মুখ জরার দর্পণে
উচ্ছ্বাস আর্ত্তস্বরে ফেরে অনিবার।

এ দুঃস্বপ্ন যায় যদি শুধু একবার—
যদি একবার চাও নয়নে আমার—
যেখানে আরক্তরাগে জেগেছে পিপাসা
সন্ধ্যাতটলগ্ন শেষ আলোকের মত।
নিশার শীতল ছায়া করিয়া হরণ
যদি বা নামে গো সেথা নয়নে নয়ন।

সহসা চাহিয়া দেখি আমার আকাশে
প্লাবন আনিল কোন আশ্চর্য্য আলোক
চকিতে সহস্র ফুলে বিচিত্র ভঙ্গীতে
হাসিল অসহ্য সুখে মেঘের স্তবক।
চূর্ণিয়া চূর্ণিয়া ঝরে আলোক-রেণুকা
অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণদীপ্তি করিয়া হরণ
ভাবিনু আশ্চর্য্য হয়ে কে ঐশ্বর্য্যবান্
চিত্রিল বিচিত্র রূপে নভো অকারণ?

নিমেষে হেরিনু ভূমে শান্ত তৃণদল
শ্যামল শীর্ষের সারি সংযত আবেগ
কে আহা গোপনচারী সঞ্চারিয়া দিল
নিঃশব্দে প্রাণের স্পর্শ পত্রের অন্তর?
এই প্রয়োজন আর অপূর্ব্ব বিলাস
কে করিয়েছে রূপময়? শুনিলাম 'প্রেম'।

আনুকারিক হাস্যরস

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

বাঙালা সাহিত্যে প্যারডি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের নামই বিশেষ করিয়া মনে জাগে। তিনি হাসিতে জানিতেন এবং হাসাইতেও জানিতেন। রসিকতা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। বঙ্গসাহিত্যে তখন হাস্যরসের প্রাচুর্য ছিল না—এখনই যে আছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না—যাহা ছিল তাহাও আদিরসের আত্যন্তিক সংমিশ্রণে পঙ্কিল। হয়তো সেই কারণেই আমাদের দেশে হাস্যরস অপাংক্তেয় ছিল; বিশুদ্ধ সমাজে হাস্যরসের জন্য কোনো স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব লক্ষ্য করিয়াই বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করিতে মনোযোগী হন। তাঁহার 'হাসির গান' এবং বিবিধ প্রহসন হাস্যরসের অমৃত নির্ঝর। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট। কেবলমাত্র আনুকারিক হাস্যরসই ইহার আলোচনার বিষয়। তাই তাঁহার প্যারডির গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। তিনি শুধু যে অন্যের রচিত গান বা কবিতার অনুকরণ করিয়াই নিশ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। অন্য নাটকের অনুকরণে একটি রঙ্গনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'আনন্দবিদায়'। অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত 'নন্দবিদায়' নাটকের অনুকরণে ইহা রচিত হয়।

হাস্যরসের সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমাত্রই অল্প-বিস্তর পীড়াদায়ক। যে কৌতুকের আক্রমণের বিষয় যত সংকীর্ণ, সে কৌতুক তত বেশী পীড়াদায়ক। হাস্যরসে যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তখন তাহার নির্ম্মলতা নষ্ট হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' রচিত হয় ১৩১৯ সালে এবং ঐ বৎসরই ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। কিন্তু প্রথম দিনের অভিনয়ের পরই রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। দর্শকগণ মনে করেন, ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে অশোভনরূপে আক্রমণ করা হইয়াছে।

উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত যে অনুকার কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি আনন্দবিদায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্যারডি হিসাবে এগুলি ভাল। স্বতন্ত্র ভাবে ধরিলে কবিতাগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দবিদায় নাটিকাখানি সমগ্র ভাবে বিচার করিলে সন্দেহের উদয় হইতেও পারে। নাটকের কোনো কোনো চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নামও আছে। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া আর লাভ নাই। বাহিরের লোকের কথা কাণে না তুলিয়া গ্রন্থকারের কথায় আস্থা স্থাপন করাই সঙ্গত বোধ করি। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন:

"প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবারই কথা। কারণ বিখ্যাত রচনারই প্যারডি লোকে করিয়া থাকে। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেম বাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুর দেবতা বিষয়ক বহু গানও নকলের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মানলাভ করিয়াছে।

"এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। 'মি'র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে এ ব্যঙ্গ তাঁহাদের গায়ে লাগিবার কথা নহে। এক জন কবি অপর কোন কবির কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় আমি তাহা স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।…"

ইহা ছাড়া "সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ" করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবনায় তাঁহার বক্তব্যটি আরও সুস্পষ্ট।

প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্টে ঝাঁটিকা।
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাটিকা।

নাটকটি যে কেবলমাত্র রঙ্গ নয়, ইহাতে যথেষ্ট ব্যঙ্গও আছে এবং সে ব্যঙ্গকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলিয়া মনে করা অসম্ভব নয়—এ আশঙ্কা লেখকের ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাই বেশ উদ্ধত ভাবেই বলিলেন:

কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা।

ব্যক্তিগত আক্রমণের মধ্যে যে হীনতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় তেজস্বী পৌরুষধর্মীর পক্ষে সেই হীনতার আশ্রয় লওয়া স্বাভাবিক নয়। তবে "মি"'র প্রতি তাঁহার বিপরীত আক্রোশ ছিল, সেই "মি"কে ব্যঙ্গ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে তিনি সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটি তাৎকালিক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

"দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্রে ও আচরণে সর্ব্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই তিনি লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুল রাখা, নাকি-সুরে কথা কওয়া, মন্থর পাদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার আনন্দবিদায় নামক অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া অশোভনরূপে ও অন্যায় ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।" (১)

এই নাটিকায় শুধু রবীন্দ্রনাথের নয় গিরিশচন্দ্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনারও প্যারডি আছে। যে নন্দবিদায় নাটিকার অনুকরণে প্রহসনটি রচিত হয়, তাহারও অনেকগুলি গানের প্যারডি ইহাতে আছে। দুই-এক জন পুরাতন কবির রচনাও অনুকৃত হইয়াছে।

গোবিন্দ অধিকারীর "শুক শারীর দ্বন্দ্ব" এক দিন দেশে সুপ্রচলিত

---

(১) দেবকুমার রায়চৌধুরী, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২২।

ছিল। কিন্তু আজিকার পাঠকের কাছে হয়তো তাহা অপরিচিত। মূলটি জানা না থাকিলে প্যারডির রস উপভোগে বাধা হইবে। সেই জন্য মূল কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ—
নইলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল—
নইলে পারবে কেন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা—
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে—
চূড়া তাইতে হেলে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন—
নইলে শূন্য জীবন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী—
সে তোমার কৃষ্ণ জানে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম—
নইলে মিছে সে গান।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো
নইলে আঁধার কালো। ইত্যাদি

এবার দ্বিজেন্দ্রনাথের প্যারডি শুনুন :

কৃষ্ণ বলে, আমার রাধে বদন তুলে চাও।
রাধা বলে, কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়।
কৃষ্ণ বলে, রাধে দুটো প্রাণের কথা কই।
রাধা বলে, এখন তাতে মোটেই রাজী নই—
মরি ধোঁয়ায় মরি।
কৃষ্ণ বলে, সবাই বলে আমার মোহন বেণু।
রাধা বলে, ওহো শুনে আমি মরে গেনু—
আমায় ধর ধর।
কৃষ্ণ বলে, পীতধড়া বলে মোরে সবে।
রাধা বলে, বটে! হল মোক্ষলাভ তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া।
কৃষ্ণ বলে, আমার রূপে ত্রিভুবন আলো।
রাধা বলে, তবু যদি না হতে মিশ কালো—
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে।
কৃষ্ণ বলে, আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা।
রাধা বলে, ঘুম হচ্ছে না এতো ভারী জ্বালা—
তাতে আমারই কি।
কৃষ্ণ বলে, শুনি হরি লোকে আমায় কয়।
রাধা বলে, লোকের কথা ক'রো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে।
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা।
রাধা বলে, হাঁ হাঁ কৃষ্ণ হাঁ হাঁ তা তা বটে,
সেটা সবাই বলে।
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার কিবা চারু কেশ।
রাধা বলে, কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ
সেটা বলতেই হবে।
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা।
রাধা বলে, কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে।
কৃষ্ণ বলে, এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু।
রাধা বলে, হাঁ আজ সাবান মাখিনি তো তবু
নইলে আরও সাদা।
কৃষ্ণ বলে, তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে।
রাধা বলে, এ সব কথা বললেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত।

বাংলা সাহিত্যে ভাল হাসির কবিতা বেশী নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে এই প্যারডিটি একটি উচ্চাসন দাবি করিতে পারে।

আনুকারিক রচনায় যে হাস্যরসের উদ্ভব হয় ভাবের বৈপরীত্যই তাহার কারণ। রচনার বাহ্যিক আকারটাই অনুকৃত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটা নয়। মূল ও অনুকৃতির মধ্যে ভাবের অসঙ্গতি যত বেশী হইবে (অবশ্য তাহাও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে), হাস্যের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পাইবার কথা। আলোচ্য অনুকৃতির হাস্যরস যে একটু তীব্র, বাহিরের সহিত ভিতরের আত্যন্তিক অসংগতিই তাহার কারণ।

'শুক-শারীর দ্বন্দ্ব' কবিতাটির মধ্যেও বেশ একটি সুমধুর হাস্যরস আছে, কিন্তু ভক্তিরসের সংমিশ্রণে তাহা কিছু গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুকার কবিতায় সেই গভীরতা নাই, আছে চপলতার আতিশয্য। কৃষ্ণভক্ত শুক এবং রাধিকাভক্ত শারী স্ব স্ব ভক্তির পাত্রকে বড় করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিয়াছে। এখানে আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ রন্ধনরত রাধিকার কাছে আত্মমহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। উত্তরে রাধা কিন্তু আপন মাহাত্ম্য প্রচার করেন নাই অথবা তিনি যে কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক উচ্চে এমন কথাও বলেন নাই। তবে তাঁহার উত্তরে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অসহিষ্ণুতার মধ্যে আপন প্রশস্তি শুনিবার জন্য যে ব্যাকুলতাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা শেষের কয়েকটি অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাধা অবশ্য বলিয়াছেন :

"এ সব কথা বললেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত।"

কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু লেখক যে গোল মিটাইবার জন্য কলম ধরেন নাই।

একটি সত্য কথা

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সহরের কোলাহলময় পথের পাশে হোটেল। সহরের এই প্রধান রাস্তায় হোটেলের সংখ্যা কম নয়। দু'পাশে দেশী-বিদেশী নানা জাতের। সকলেই নিজেকে জাঁকজমকে সাজিয়ে পথের জনস্রোত আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। দেখে স্পষ্টই মনে হয়, একে অপরকে ঐশ্বর্য্যের সম্ভারে পেছনে ফেলে সগর্ব্বে দাঁড়াতে চায়। নানা হোটেলগুলোর মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা; চাকচিক্যের চমক লাগিয়ে সকলেই পসার জমাতে চায়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, এই হোটেলটার আকর্ষণ কিছুমাত্র কম ছিল না—বিশেষ করে বাঙালীদের কাছে। বাঙলাদেশ ছেড়ে এই সুদূর বিদেশে যে সব বাঙালীরা নিত্য নূতন আসতেন, তাঁরা তাঁদের ক্ষণজীবী আস্তানা এই হোটেলেই গাড়তেন। বাঙালীর হোটেল—ম্যানেজার বাঙালী। যাঁরা খেতে আসেন, গল্প-গুজব করেন বা তাস-দাবা পেড়ে বসেন তাঁরা সবই প্রায় বাঙালী। বোর্ডাররাও সব বাঙালী। তাই এখানে পুরোদস্তুর বাঙালী হাওয়া বয়। ঘরের মতই এখানে নিবিড় আকর্ষণ জাগে। এ সব গৃহ-হারা লক্ষ্মীছাড়া প্রবাসী সন্তানদের।

এই হোটেলে আমি প্রায় পাঁচ মাস আছি। এত দিনের ঘর-ছাড়া মনের বেদনা, এই হোটেলের আবহাওয়া আশ্চর্য্য ভাবে ভুলিয়ে রেখেছে। এত দূরে এসেও সব সময় কাণে আসছে বাঙলা কথা, হাসি, বাঙালী-মনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না।

আমার মত এত দিনের বন্ধু এ হোটেলে বেশী নেই। যাঁরা আসেন তাঁদের প্রায় সকলেই হয় কোনো ফার্মের রিপ্রেসেণ্টেটিভ, না হয় কোনো ব্যাঙ্ক বা ইন্‌সিওরেন্সের এজেণ্ট। থাকেন দু'-এক দিন বড় জোর। তাই বেশীর ভাগ ঘরেই নিত্য-নতুন বাঙালীর মুখ দেখি।

আজ এই হোটেলে-দেখা এমনই এক নতুন মুখের কাহিনী শোনাব।

নীচে ম্যানেজারের টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে, গল্প করছিলাম স্বয়ং ম্যানেজার নিতাই বাবুর সঙ্গে। বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। মাঝামাঝি বয়েস। মাথার কাঁচা চুলের মাঝে দু'-একটা পাকা চুল সন্তর্পণে উঁকি মারে বৈ কি। ঘর ছেড়ে এই বিদেশে এসে দিব্যি পসার জমিয়েছেন।

নিতাই বাবুর সঙ্গে নানা গল্প করছিলাম। এমন সময় গেটের কাছে রিক্‌সা থামল। নামলেন এক জন বাঙালী ভদ্রলোক। পাতলা চেহারা; মাথায় একটু খাটো, হাঁটু অবধি নেমে আসা ধুতি, পায়ের জুতোটার একেবারে ভগ্ন দশা উপস্থিত। জামার ওপরে মোটা কোট—দু'-এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। আঁচড়ান নয়, ছোট ক'রে ছাঁটা চুল। গালের নীচে দাড়ি গজিয়েছে খুশীমত। এই অমার্জ্জিত চেহারায় তাঁর আবির্ভাব।

তিনি এগিয়ে এলেন নিতাই বাবুর কাছে।

"আপনিই কি এই হোটেলের ম্যানেজার?"

জবাব দিলেন নিতাই বাবু—'হ্যাঁ, কি দরকার আপনার বলুন।'

নতুন কোন বাঙালী এলে দেখেছি নিতাই বাবু খুব বিনীত ভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুখ-সুবিধার জন্যে যত দূর সম্ভব তৎপরতা নেন।

'থাকা-খাওয়ার সুবিধে হবে এখানে?'

'চার্জ্জ কি রকম?'

'মান্থলি পঁয়ত্রিশ টাকা।'

একটা দোমড়ান টিনের সুটকেশ আর ছোট্ট বেডিং দরজার পাশে রেখে রিক্‌সা-চালক অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়েছিল। সে দিকে চোখ পড়তে ভদ্রলোক বললেন, 'একে দশ আনা দিয়ে দিন না। খুচরো নেই আমার কাছে।'

দশটা আনা দিলেন নিতাই বাবু। বিপদে সাহায্য তিনি প্রসন্ন মনেই করেন। রিক্‌সা-চালক সেলাম ক'রে বিদায় নিতে, নিতাই বাবু মোটা খাতা খুলে দোয়াতে কলম ডোবালেন।

'আপনার নাম?'

'গিরিশ দত্ত।'

বাঙালী বোর্ডারদের নাম ছাড়া আর কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করেন না বা ঐ মোটা খাতায় টুকে রাখেন না। বাঙালীদের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিতাই বাবুর।

'অ কেষ্ট, এই বাবুকে সাত নম্বরের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর সুটকেশ-বেডিং ও ঘরে দিয়ে আয়।'

সাত নম্বরের ঘর মানে আমার পাশের ঘরটা। গিরিশ বাবু কেষ্টর পেছু নিলেন।

নিতাই বাবুর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, 'যাক্, আপনার এক জন বোর্ডার বাড়ল।'

'বাড়ল আর কৈ।' মোটা খাতাটা টেবিলের কোণে ঠেলে রেখে বললেন, 'ঘনশ্যাম বাবু আজ রাতেই তো বললেন।'

'ও হ্যাঁ, তা বটে, তিনি আজ টু্‌রে বম্বে যাচ্ছেন বটে, মনে ছিল না'। উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙ্গলাম, 'যাই একবার, নতুন লোকটির সঙ্গে আলাপ করিগে।'

'তা করবেন বৈ কি, আপনার পাশের ঘরেই।'

'ও ঘরে যে কত লোকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল,' হেসে ম্যানেজার বাবুর কাছে বিদায় নিলাম।

ছুটির দিন, সময়ের তাই কোন জরুরী নোটিশ নেই। গিরিশ বাবুর ঘরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়ে দেখলাম তিনিই সশরীরে হাজির।

'এই যে, আপনি এখানে!' গিরিশ বাবু হাসলেন।

জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, এই ঘরটাই আমার।'

'দিব্যি সাজান ঘরটি তো!' তিনি চারি দিকে প্রশংসাময় দৃষ্টি বোলালেন। 'এই যে দাড়ি কামাবার সব সরঞ্জাম রয়েছে দেখছি, দাঁড়িটা তবে কামিয়ে নিই, কি বলেন? বড় বেড়ে উঠেছে।' প্রশ্নটার উত্তরের জন্য মোটেই অপেক্ষা করলেন না। আরসিটা টেনে নিয়ে দাড়ি কামাতে বসে গেলেন।

আমার চোখে এ জিনিষটা ভাল না ঠেকলেও হেসে জানালাম, 'তা কামান না···তাতে আর কি!'

ভদ্রলোক তখন কামাতে ব্যস্ত, তাঁর দিক থেকে কোনো জবাব এল না। তখন সাবানের ফেনায় ব্লেড চলেছে, বিছানায় বসে অগত্যা একটা সিগারেট ধরালাম।

কামান শেষ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কি সিগারেট ওটা মশাই?'

জবাব দিলাম, 'ডি লাক্স।'

নিলেন। পরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মন্তব্য করলেন, 'এখানের সিগারেটগুলো সব ছাই।'

প্রথম দিনেই তাঁর ব্যবহার আর যা কিছু হক, আনন্দদায়ক মোটেই নয়।

পরদিন অফিসের তাড়া। নেয়ে উঠে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে আয়নায় ছায়া পড়ল গিরিশ বাবুর।

'আপনি কি তেল মাখেন মশাই?···এই যে জবাকুসুম দেখছি! যাক, বাঁচা গেল'। শিশি থেকে খানিকটা হাতে ঢাললেন, 'আমার'টা শেষ হয়ে গেছে একেবারে।'

চুল আঁচড়ান শেষ করে কোট গায়ে গলালাম নিঃশব্দে। তেল মাখতে মাখতে গিরিশ বাবু প্রশ্ন করলেন 'অফিসে চললেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে জানালাম, 'হ্যাঁ।'

এর পর আমার ঘরে আসতেন তিনি যখন-তখন। আমার ঘরই শুধু নয়, ঘরের সব কিছুই নির্ব্বিকার মনে ব্যবহার করতেন। মুখে কিছু না বললেও, তার এই আচরণে মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠতাম। তার এই নির্ব্বিকার ভাব, নির্লজ্জতার সামিল মনে হত। কিন্তু দোষ আমার স্বভাবেরই। কেন জানি না, সহজে কাউকে কটু কথা বলতে পারতাম না।

সে দিন গিরিশ বাবু বিকেলে অনেকক্ষণ আমার ঘরে কাটালেন। এক সময় বললেন, 'ললিত বাবু আপনার এই পাঞ্জাবিটা আজকের জন্যে নিয়ে চললাম। তাড়াহুড়োয় পাঞ্জাবিগুলো সব বাড়ীতে ফেলে এসেছি। অথচ এই বিদেশ-বিভুঁয়ে ভাল জায়গায় যেতে-টেতে হ'লে কি মুস্কিল বলুন তো—'

এ চাওয়ায় সরল আবেদন নেই। গিরিশ বাবুর ওপর মন বিরক্ত হয়েই ছিল। তবু দিলাম পাঞ্জাবি। নেই বলতে পারলাম না—আছে যে তিনি দেখেছেন। 'দোব না' বলতেও মুখে কেমন যেন বাধল। আর এক দিন চাইলেন দশটা টাকা। বললেন, 'বড় মুস্কিলে পড়েছি; হাতে কিছু নেই। ব্যাঙ্ক এখন বন্ধ নইলে চেক্ ভাঙ্গিয়ে—'

দিলাম টাকা। টাকা নিয়ে বললেন তিনি, 'চেক্টা ভাঙ্গিয়ে টাকা কালই শোধ দিয়ে দোব।'

বলা বাহুল্য, সে টাকা ফেরৎ পাইনি। তিনি ইচ্ছে করেই দেননি, না দিতে ভুলে গেছেন, তা জানি না। জানতে চেষ্টাও করিনি। থাক্, ভারি তো কটা টাকা।

এ ভাবে দু'টো মাস এগোলো। জবাকুসুমের শিশি সপ্তাহেই খতম হচ্ছে, সিগারেটের প্যাকেট হাওয়ার মত উড়ে যাচ্ছে। তবু দু'মাস কাটল। এই দু'মাসেই গিরিশ বাবুর আসল পরিচয় যা পেয়েছি, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণাই শুধু জমেছে। এমন নির্ব্বিকার নির্লজ্জ খুব কম দেখেছি। মাঝে মাঝে তার আচরণ সহ্যের সীমা ছাড়ালে, রূঢ় হয়ে আঘাত দিতে বাধ্য হয়েছি। দেখেছি, তিনি ম্লান মুখে ঘর ছেড়েছেন। কিন্তু পরের দিন থেকে আবার সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হত তিনি চাকরি-বাকরি করেন কি না। কিন্তু চাকরদের কাছে জেনেছি, দুপুরে গিরিশ বাবু বাইরে যান। তাহলে চাকরি করেন। কিন্তু মাইনে যা পান, দিন চলে না তাতে নিশ্চয়ই, তা না হলে এমন স্বভাব হবে কেন? সব সময় হাত পাতবার এই হ্যাংলা প্রবৃত্তি কেন?

সে দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ত গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় কাণে লাগল নিতাই বাবুর উত্তেজিত কণ্ঠ। 'ও-মাসে বললেন এ-মাসে দোব, এখন আবার বলছেন আর মাসে! আমি ছা-পোষা মানুষ, অত দয়া দেখাতে গেলে মারা পড়ব।' কাকে উদ্দেশ্য ক'রে কথাগুলো বলা হচ্ছে বুঝতে দেরী হল না। কেন না, পরক্ষণেই গিরিশ বাবুর গলা শুনলাম, 'আর মাসে ঠিক দিয়ে দোব।'

'এ কথা তো গেল মাসেও বলেছিলেন; এ মাসেও বলছেন দেখছি। ও-সব ধাপ্পায় ভোলাবেন কত দিন শুনি? প্রথম মাসে দিলেন না যখন, কিছুই বলিনি। ভাবলাম, বিদেশে এসেছেন যখন, খরচপত্রের টানাটানি প্রথম মাসে একটু বেশী হবেই। আপনি দেখছি তুখড় লোক মশাই।'

কাছে থাকলে গিরিশ বাবুর মুখের ভাব লক্ষ্য করতাম। নীচে নামবার কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। ওপরের ঘরে দাঁড়িয়েই ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

'বেশ, দু'মাসের পাওনা আজ বিকেলেই চেক্ দিয়ে মিটিয়ে দোব।' গিরিশ বাবু বলে উঠলেন।

'থাক, আর চেকের দরকার নেই। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স যে কত, তা আমার বেশ জানা আছে। চাকরি-বাকরিও যে কিছু করেন না সে খবরও পেয়েছি। মিথ্যে কথার জোরে ও ধাপ্পা দিয়ে এত দিন আপনার জীবন কেটেছে। জারিজুরি সব ধরা পড়ে গেছে—এখানে আর সুবিধে হবে না। এখন মানে-মানে বিদেয় নিন। নেহাৎ বাঙালী বিদেশে এসেছেন, তাই বিশেষ কিছু করলাম না। অন্য কেউ হ'লে এ জোচ্চুরি আর ধাপ্পাবাজির ফল দেখাতাম।'

নিতাই বাবুকে কোন দিন এমন কঠোর হতে দেখিনি। এ ভাবে তিনি যে কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন, আগে ভাবতে পারিনি।

গিরিশ বাবুর অপরাধ গুরুতর। চাকরি করেন না; গরীব তো বটেই, তার ওপর এত দিন জোচ্চুরি আর মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে এসেছেন, দত্ত মশায়ের ওপর আমার আক্রোশও কম নয়। তবু কেন জানি না, আজকে তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে দয়া হল। এই প্রথম দয়া হল তাঁর ওপর। নিতাই বাবু ব্যবসাদার লোক। তাঁর এই কঠিন ব্যবহার হয়তো অন্যায় নয়। এত দিন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে তিনি যা কিছু বলেছেন, ক্ষতির তুলনায় কিছুই নয়। তবু এ ভাবে প্রকাশ্য অপমানের ওপর তাঁর অবস্থা অনুমান করে মনের কোণে কেন যে ব্যথা জমল বুঝতে পারলাম না। এ অপমান যদিও গিরিশ বাবুর নায্য পাওনা।

সিঁড়িতে পদশব্দ। কার, চিনতে দেরী হ'ল না। গিরিশ বাবু আমার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে চলে গেলেন, দেখলাম। নিজের ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখেছেন অবশ্যই। কিন্তু লজ্জায় আমার ঘরে আসতে পারলেন না। কেন না, আজ অবধি কখনই তিনি ঘরে ঢোকবার আগে আমার ঘরটাতে একবার না বসে যাননি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আগে আমার ঘর। ওঠবার আর নামবার সময় আমার এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসা তাঁর অভ্যেসের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রোজকার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে বুঝলাম, গিরিশ বাবুর মনের অবস্থা আজ সত্যিই খারাপ।

ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে এলাম। তাঁর এ লজ্জা বড়ই ব্যথা দিল

আমায়। দেখি, খোলা জানলার কাছে তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। শব্দ পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'দেখলেন তো, ম্যানেজার বাবু আমায় কি অপমানটা করলেন? অন্য কেউ হলে···' কথাটা শেষ না করেই গিরিশ বাবু চুপ হলেন। পরে সুরু করলেন, 'আপনার কাছে সত্তরটা টাকা হবে ললিত বাবু? দিন তো। নিতাই বাবুর পাওনাটা চুকিয়ে দিই।'

জবাব দিলাম, 'অত টাকা কোথায় পাব!'

'ও!' তিনি চুপ করলেন। দেখলাম, তাঁর মুখে কেমন এক নিঃস্ব অসহায় হীনতার ছায়া।

প্রশ্ন করলাম, 'এ ভাবে এত দিন ধাপ্পা দিয়েছেন কেন?'

জবাব দিলেন না। নতমুখে হাতের নখ খুঁটতে লাগলেন। তাঁর এমন করুণ রূপ দেখিনি কখনও।

প্রশ্ন করলাম, 'সত্যিই কি চাকরি-বাকরি করেন না?'

'করতাম।'

'ছাড়লেন কেন?'

'ছাড়িয়ে দিল।'

'কেন?'

কেন'র জবাব এল না। বুঝলাম, কারণটা প্রকাশ করবার যোগ্য নয়। তাই বলতে লজ্জা পাচ্ছেন।

প্রশ্ন করলাম, 'দেশে কে আছেন?'

'মা-বাবা আছেন।'

'বিয়ে করেছেন?'

'হ্যাঁ।' বিয়ের কথায় তাঁর মাঝে দেখলাম উল্লাসের ভাব। দেখবেন আমার বৌয়ের ছবি? খুব সুন্দর দেখতে। ফটোতে কিন্তু ভাল ওঠেনি।' সুটকেশ খুলে মহা উৎসাহে বৌ-এর ফটো বার করে তিনি আমায় দেখালেন। 'কেমন, সুন্দর না? ওর নাম হচ্ছে বীথিকা। আমি কিন্তু বীথি বলি না, আমি ডাকি রাণী বলে।'

হ্যাঁ, বৌ তাঁর সুন্দরী বটে। এ সৌন্দর্য্যের চেয়ে আমাকে বেশী মুগ্ধ করল গিরিশ বাবুর কথাগুলো। এ কথাগুলোর মাঝে তাঁর প্রেমিক প্রাণের অনাবিল রূপ আজ হঠাৎ ধরা পড়ল।

'রাণী আমার খুব ভাল চিঠি লেখে। এই দেখুন না কত লিখেছে। ও জানে না, আমি ওর সব চিঠি যত্ন করে রেখে দিই।' সুটকেশ থেকে একতাড়া চিঠি এনে ধরলেন আমার সামনে।

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, 'থাক থাক, ও আর কি দেখব!'

'দেখুন না পড়ে, কি সুন্দর লেখে। মা বলতেন, বৌমার আমার মুক্তোর মত হাতের লেখা।'

চিঠিগুলোতে চোখ না বুলিয়ে মুক্তি পেলাম না। মুক্তোর মত না হক, সুন্দর অবশ্যই।

'সে দিন আপনার কাছে যে দশটা টাকা নিয়েছিলাম, সে তো ওকেই পাঠালাম। দেখুন না, টাকা পাঠাতে পারি না বলে কত দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। কি করে যে ওদের দিন চলেছে ভগবানই জানেন। গিরিশ বাবুর মুখে ফুটল মলিন হাসি, 'চাকরিটা তো ওরই জন্য গেল। বলেছিলাম রাণীকে, ভাল শাড়ী কিনে দোব, অফিস থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করলাম। ভাল শাড়ী কি কুড়ি টাকার কমে হয়।' থামলেন তিনি। নিঃশব্দে এই ব্যথাতুর কাহিনী শুনছি। আমি অভিভূত।

খানিক থেমে আবার গিরিশ বাবু বললেন, 'রাণীকে আমি খুব ভালবাসি ললিত বাবু।' কথার সঙ্গে সরমের আভা তাঁর মুখ লাল ক'রে দিল, স্পষ্ট দেখলাম।

বিকেলে অফিস ফেরতা নিতাই বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। হেসে বললেন, 'তিনি পালিয়েছেন।'

'কে, গিরিশ বাবু?'

'তা ছাড়া আর কে! দুপুরের দিকে কখন চুপিচুপি প্যাঁটরা নিয়ে সটকেছে। বুঝেছে গতিক ভাল নয়।

গিরিশ বাবুর এই চোরের মত পলায়ন। নিতাই বাবুর কাছে এটা আনন্দেরই খবর বটে। এ ঘটনা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। আমি কিন্তু এই উল্লাসে যোগ দিতে পারলাম না। গিরিশ বাবুর এই পালানোর ব্যথা বুকে কাঁটার মত বিঁধল।

সন্ধ্যের দিকে কথায় কথায় নিতাই বাবু বললেন, 'কি ধড়িবাজ লোক মশাই বলুন তো! স্রেফ মুখেরই জোরে যে বেঁচে রয়েছেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

সায় দিলাম, 'তা আর বলতে।'

'আপনাকেও অনেক ভুগিয়েছে বোধ হয়? পাশের ঘরেই থাক্‌তো যখন! জিনিষ-পত্তর ভাল করে দেখে এসেছেন তো? খোয়া যায়নি ত কিছু?'

গিরিশ বাবুর আচরণ মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়ালেও, কোন দিন নিতাই বাবুর কাছে অভিযোগ করিনি। আমার ঘরে ঢুকে সব জিনিষপত্তর নির্বিকার ভাবে ব্যবহার করতেন। এ সম্বন্ধেও কিছু তাঁকে জানাইনি। সুতরাং পলাতক গিরিশ বাবু আর আমার মধ্যে যা ঘটেছে, সে সব ম্যানেজারের অজ্ঞাত ছিল।

আমার জবাবে নিতাই বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, 'যাক্। বেঁচেছেন খুব।'

এক সময় দত্ত মশায়ের সঙ্গে আমার আজকের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ তুললাম। সব শুনে নিতাই বাবু হাসলেন।

'আপনিও যেমন। ও-সব বিশ্বাস করেন না কি! বৌ আছে না ঘোড়ার ডিম! আপনার মন ভেজাবার জন্যে মিথ্যে ধাপ্পা দিল।'

বললাম, 'কিন্তু ফটো দেখাল যে। হাতের লেখাও দেখাল।'

'ওর মত মানুষের পক্ষে এ তো অসম্ভব নয়!' ম্যানেজার জোরে ঘাড় নাড়লেন।

তাঁর মত আমি কিন্তু গিরিশ বাবুর আজকের কথাগুলো শুধু ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

তার পর ক'টা দিন চলে গেছে। হোটেলের জীবন রোজকার বাঁধা-ধরা পথে এগোচ্ছে। গিরিশ বাবু সম্বন্ধে নানা বৈচিত্র্যময় আলোচনা হতো হোটেলের অধিবাসীদের মধ্যে। তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা গড়ে উঠত। এ-সবও একটু যেন মিলিয়ে এসেছে অবশেষে।

সন্ধ্যের দিকে বেড়াচ্ছিলাম। মিউনিসিপাল্ পার্কের কাছাকাছি পিচের রাস্তায় এসেছি, হঠাৎ কাণে এল পরিচিত ডাক। ফিরে দেখি গিরিশ বাবু। শরীর এ ক'দিনে শীর্ণ রুক্ষতায় নেমেছে। গাল ভ'রে একরাশ দাড়ি। চোখ দু'টিতে ম্লান জ্যোতি।

'এই যে গিরিশ বাবু', হেসে বললাম, 'আছেন কেমন? এখন উঠেছেন কোথায়?'

'একটা মারাঠি হোটেলে।' গিরিশ বাবু দাড়ি চুলকোলেন।

'আপনি এরই মধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছেন।'

'তা হয়েছি।' ম্লান হাসলেন তিনি। পরে বললেন, 'কিছু খাওয়াবেন ললিত বাবু? বড্ড খিদে পেয়েছে।'

তাঁর এই করুণ অনুরোধ বড় আঘাত দিল! আজ এ চাওয়াতে নেই নিলর্জ্জতা। সেখানে নিষ্ঠুর পরাজয়ের বেদনা।

বললাম, 'বেশ তো, কাছাকাছি কোন হোটেলে চলুন।'

হোটেলে বসে তিনি যে ভাবে গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগলেন, বুঝলাম দীর্ঘ দিনের অভুক্ত। খাওয়া শেষ ক'রে বললেন, 'অন্ততঃ কুড়িটা টাকা যদি দেন ললিত বাবু···'

'কেন, কি করবেন?'

'রাণীর আমার খুব অসুখ। চিঠি পেয়েছি কাল। যেতে পারতাম কালই—বিনা টিকিটে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি কোরব? হাতে আমার কিছু নেই। কুড়ি না হক, পনেরটা টাকা আপনি আমায় দিন। আমার রাণী বাঁচবে না ললিত বাবু, আর বুঝি বাঁচবে না।'

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ মানুষটার আজ এ কি করুণ আবেদন! বেদনার গভীরতায় স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এর পরও কি নিতাই বাবু এই কথাগুলোকে এক জোচ্চোরের মিথ্যে ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন?

মণিব্যাগে ঠিক কত ছিল জানি না। তবে গোটা পঁচিশ টাকা হবে নিশ্চয়ই। নিঃশব্দে সব উজাড় করে দিলাম।

গিরিশ বাবুর সঙ্গে আজকের এই সাক্ষাতের কথাটা বললাম না নিতাই বাবুকে। ইচ্ছেও হ'ল না। জানি, তিনি শুনে হাসবেন। আমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে আক্ষেপ করবেন। সারা হোটেলে তার পর সুরু হবে আমাকে নিয়েই আলোচনা।

দু'সপ্তাহ বাদে, এক দিন শরীর ভাল ছিল না বলে আফিসে যেতে পারিনি। হোটেলের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ যেন দরজায় কার ছায়া পড়ল। বই থেকে মুখ তুলে চমকে উঠলাম, —গিরিশ বাবু। শরীরের সব কিছু নিঃশেষে নিষ্পেষণ করে কে যেন শুধু বেদনাময় রিক্ততা ভ'রে দিয়েছে।

'আপনি এখানে।' বিস্ময়ের কণ্ঠে বললাম।

'হ্যাঁ, দেশ থেকে আজই এসেছি। এই নিন আপনার টাকা। খরচ হয়নি মোটেই। মাত্র দু'-চার টাকা হবে।' নোট চারখানা আমার হাতে তিনি এগিয়ে দিলেন।

'রাণী ভাল আছে তো?'

'পৌছলাম যে দিন, সে দিনই রাতে মারা গেল।'

খবর শুনে আমি স্তব্ধ। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই।

'কি অসুখ হয়েছিল?'

'টাইফয়েড।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ তিনি শিশুর মত হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। এ কি করুণ অসহায় কান্না!

সারা জীবন ধরে গিরিশ বাবু যত মিথ্যে কথাই বলে থাকুন, একটা সত্যি কথা বলেছিলেন। সেখানে ধাপ্পা দেননি! রাণীকে সত্যিই তিনি ভালবাসতেন। নইলে সারাটা জীবন যার ধাপ্পা আর জোচ্চুরি করেই কেটেছে, সে কেন টাকাগুলো ফেরৎ দিতে এল?

কবিতা-রান্না

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

রাত্রিশেষের পাণ্ডুর চাঁদ দেখেচ কখনো তুমি?
রাত্রি যখন আস্তে আস্তে যায়?
দেখেচ কি তুমি থেকে কভু বুনো সরকারী বাংলায়
পর্ব্বতমূলে অরণ্যকূলে কোনো?
শুনেচ কি ঘনো ঘনো
আকাশের চাঁদ তাকায়ে হঠাৎ হায়নার হায় হায়?

দেখেচ কি তুমি? আমি তো দেখিনি উক্ত চন্দ্রটিকে।
দেখব কি করে'? তখন আমি কোথায়?
নিজ শয্যায় হয়ত তখন নিদ্রায় অচেতন।
স্বপ্নেও দেখা দেয়নি সে চাঁদ (মেমরি আমার ফিকে)
যদি দেখে থাকি দেখেছি কল্পনায়।
হায়না সে চাঁদ দেখিয়াছে কি না জানে শুধু হায়নাই—
এবং তাছাড়া চাঁদের প্রতি যে ভালোবাসা তার কেমন
সেই জানে; কভু ভুলেও সে কথা আমারে জানায় নাই।

আর হায়নার কথা বলো যদি ভাই, কেমন হায়না ডাকে
শুনিনি কখনো সত্যি বলতে গেলে।
দূরে অরণ্য দূরে থাক্—কভু পা দেব যে তার দিকে
অতীব সুদূরপরাহত মোর; বল্‌তে লজ্জা পাই,

তবে কি না, যদি কবিতা লিখতে হয় কোনো কবিকেই,
আমাকে কিম্বা তোমাকে—কবিতা এলে—
মানবে এ কথা, (ইতিমধ্যেই না ফেলে থাকলে লিখেই,)
হায়নার সাথে হায় হায় বেশ মেলে?

কবিতার সাথে কোনোই তফাৎ নেই ভালো রান্নার—
তরি-তরকারি-মশলা-আনাজে বাঁধুনি যে রাঁধুনির—
বাবুর্চ্চি—বাহাদুরি
নোলা-সক্‌সক্‌কর।
শব্দে গন্ধে মিলায়ে মিশায়ে বিস্তর ভুর্‌ভুরি—
মজা সে রসনার
রন্ধন সুকবির।
মশ্‌লা আনাজ্‌, নুন্‌ ঝাল্‌ আর ফোড়ন্‌ সম্বরার
কিছু কমবেশি হবার যো নেই,
হলে পরে কান্নার,
সে কবিতা লক্কর।

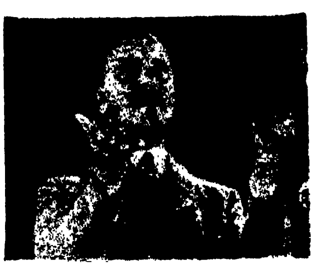
তবে কি না কথা এই,
ডাক্ রোস্‌ট খেয়ে মনে জাগে যদি মানসের সরোবর
হিম-অরণ্যপার:
সগোত্র তাঁহা লৌরিক্, সনেট আর ম্যারাথার—

গোলক-ভোগ













ততঃ ? কিম্



দ্বিতীয় অধ্যায়

১

মূল :—ভরতের বাক্য শুনিয়া ততঃপর মুনিগণ প্রত্যুক্তি করিয়াছিলেন—'হে ভগবন্! রঙ্গসংশ্রিত যজনের (বিষয়) (আমরা) শুনিতে ইচ্ছা করি'। ১।

সঙ্কেত :—ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যূচুর্ম্মুনয়স্ততঃ। ভগবাঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামো যজনং রঙ্গসংশ্রয়ম্।—(বরোদা); ভগবান্—সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ—'ভগবন্' হওয়াই সঙ্গত।···মুনয়স্তদা—ভগবন্··· (কাশী)। তদা—তখন; ততঃ—তাহার পর। পাঠান্তর—শ্রুত্বা তু বচনং তস্য প্রত্যূচুর্ম্মুনয়স্তথা। শ্রোতুমিচ্ছাম ভগবন্ যজনং নাট্যমণ্ডপে।

ততঃ—তাহার পর—ব্রহ্মার মত কবি, ইন্দ্রের মত প্রযোজয়িতা, ভরতের তুল্য নাট্যাচার্য্য, কোহলাদির মত নটবৃন্দ, অপ্সরোগণের ন্যায় সুকুমার উপকরণ (অভিনেত্রী-কুল), স্বাতির মত অবনদ্ধ-বাদ্যবিৎ, নারদের ন্যায় গীতজ্ঞ, সুরক্ষিত নাট্যমণ্ডপ, ইন্দ্রোৎসব-সদৃশ নাট্য-প্রয়োগকাল, যাঁহাদিগের রাগ-দ্বেষ প্রশান্ত হইয়াছে—এরূপ সামাজিক-বর্গ, দেবতা-পূজন-পূর্ব্বক প্রয়োগ—পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে নিরূপিত এই সকল বিষয় সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার পর (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৮)। প্রথমাধ্যায়ের চরম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা ভরতকে আদেশ করিলেন—'রঙ্গপূজা কর'। অতএব, দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই যে মুনিগণ ভরতকে রঙ্গপূজা বা রঙ্গ-যজনের প্রশ্ন করিবেন—তাহা স্বাভাবিক। অভিনবের মতে এ শ্লোকটিতে অধ্যায়-সঙ্গতি নিরূপিত হইয়াছে।

মূল :—অথবা, তাহাতে যে সকল ক্রিয়া, যে লক্ষণ ও যে পূজা (বিহিত), তাহা ভবিষ্যৎ নরগণ-কর্ত্তৃক নাট্যগৃহে কিরূপে করণীয়? ২

সঙ্কেত :—সঙ্গতি দেখাইবার পর অভিনব বলিয়াছেন—দ্বিতীয় শ্লোকের প্রশ্নটি আগেই করা উচিত ছিল; কারণ, দেবগণের পক্ষে রঙ্গদেবতা-পূজা কেবল সদাচার-প্রবর্ত্তনার্থ (গীতার 'লোক-সংগ্রহ' তুলনীয়)। দেবগণ রঙ্গপূজা না করিলেও পারিতেন—উহাতে তাঁহাদের কোন ফললাভের সম্ভাবনা ছিল না—কেবল মনুষ্যাদি-লোকে তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত এ শিষ্টাচারটির অনুসরণ যাহাতে হয়, তদুদ্দেশ্যেই তাঁহারা রঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। অতএব, দেবগণ-সম্বন্ধে রঙ্গপূজার প্রশ্ন যত দূর প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় ক্রিয়া-প্রশ্ন। দেবগণের বিষয়ে মণ্ডপের ক্রিয়া ব্যতীত নাট্যের নিষ্পত্তিই হইতে পারে না—এ কারণে প্রথমেই ক্রিয়া-প্রশ্ন কর্ত্তব্য ছিল। হয়ত মুনিগণ প্রথমে উহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, পরে হঠাৎ উহা স্মরণে আসায় দ্বিতীয় শ্লোকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন—অথবা ইত্যাদি বলিয়া। পূর্ব্বপ্রশ্নের তাৎপর্য্য উপমর্দ্দিত করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রশ্নের মধ্যেও পুনরায় পূজা-বিষয়ক প্রশ্ন করা হইয়াছে (অঃ ভাঃ পৃ, ৪৮)। তাহাতে—নাট্যমণ্ডপ-সংক্রান্ত-বিষয়ে। ক্রিয়া—ইতি-কর্ত্তব্যতা-রূপ ক্রিয়া। লক্ষণ—নাট্যমণ্ডপের সন্নিবেশ, পরিমাণ ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নরগণ-কর্ত্তৃক—অতীত যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি ত উপদেশ ব্যর্থ, কারণ, তাঁহারা ত আর কর্ম্মাধিকারী নহেন। উপদেশ ভবিষ্যৎ নরগণেরই পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকে—এ কারণে ভবিষ্যৎ নরগণ-কর্ত্তৃক—এই কথা উক্ত হইয়াছে। নরগণ-কর্ত্তৃক দেবগণের পক্ষে মানসী সৃষ্টি সম্ভব, দেবগণ ইচ্ছামাত্র বিনা আয়াসে সৃষ্টি করিতে পারেন,—এ কারণে দেবগণের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে প্রশ্ন না করিয়া নরগণের কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। ভাবী কালের নরগণের পক্ষেই উপদেশানুযায়ী মণ্ডপ-নির্ম্মাণাদি ক্রিয়া করা সম্ভব (অঃ ভাঃ পৃঃ ৪৯)। লক্ষণ—লক্ষণ আবার কর্ত্তব্য হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—'লক্ষণ' অর্থে সন্নিবেশ। অথবা এরূপ যোজনাও করা যায়—ভাবী নরগণ-কর্ত্তৃক যে নাট্যগৃহ করণীয়, তাহাতে যে ক্রিয়া, যে লক্ষণ ও যেরূপ পূজা (বিহিত)—তাহা কিরূপে (কর্ত্তব্য)?

কথং বৈ নাট্যবেশ্মনি (কাশী); কথং তন্নাট্যবেশ্মনি (বরোদা)।

মূল :—'যেহেতু এই (শাস্ত্রে) নাট্যযোগের আদিভূত (হইতেছে) নাট্যমণ্ডপই; সেই হেতু এখন (আপাততঃ) তোমার পক্ষে তাহার লক্ষণই বলা উচিত'। ৩।

সঙ্কেত :—ইহাদিনাট্যযোগস্য নাট্যমণ্ডপ এব হি (বরোদা): ইহাদির্নাট্যবেদস্য কীর্ত্তিতো নাট্যমণ্ডপঃ; (কাশী)।—এই পাঠটি একাংশে ভাল—এই (নাট্যশাস্ত্রে) নাট্যমণ্ডপ নাট্যবেদের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইহ—এই শাস্ত্রে—নাট্যশাস্ত্রে। নাট্যযোগস্য—অভিনব এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। নাট্যের যোগ অর্থাৎ উৎপত্তি। নাট্যোৎপত্তির আদিতে নাট্যমণ্ডপের কথাই বলা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য। তাবৎ—ততক্ষণ, আপাততঃ (রঙ্গযাগ-বিষয়ক) পূর্ব্ব প্রশ্ন পরিত্যাগ না করিয়া এই প্রশ্নটি যে আপাততঃ উত্থাপিত হইয়াছে—তাহারই সূচনা—এই 'তাবৎ' শব্দটিতে। তস্যৈব তাবত্ত্বং লক্ষণং বক্তুমর্হসি (মূল):—এব—ই—এই এব-শব্দটি লক্ষণের পর বসিবে—'তাহারই লক্ষণ'—এরূপ অর্থ না হইয়া—'তাহার লক্ষণই' (আপাততঃ বলুন)—এইরূপ অর্থ। লক্ষণই অগ্রে কেন উক্ত হইবে?—ইহার উত্তর—'লক্ষণ' হইতেছে নাট্যমণ্ডপের সন্নিবেশ; নাট্যমণ্ডপ-নির্ম্মাণানন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা ও তদঙ্গভূত যজনের প্রশ্ন উঠিতে পারে; এ কারণে প্রথমেই লক্ষণ-ঘটিত প্রশ্ন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৯)। মুনিগণ ভরতকে কখনও 'আপনি, ভগবান্' ইত্যাদি বলিতেছেন, আবার কখনও বা 'তুমি, তোমার' বলিতেছেন—ইহাতে তাঁহাদিগের বিস্ময়ের আতিশয্য সূচিত হইতেছে।

মূল :—সেই মুনিগণের (এই) বচন শুনিয়া ভরত বলিয়াছিলেন—'নাট্যগৃহের লক্ষণ ও পূজনের (কথা) শুনুন'। ৪।

সঙ্কেত :—মুনিগণের প্রশ্ন শুনিয়াই ভরত লক্ষণের কথা বলিয়াছিলেন, নতুবা রঙ্গপূজার কথাই বলিতেন লক্ষণ বলিতেন না। অভিনব বলিয়াছেন—এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, লক্ষণ-পূজন-জ্ঞান দেবগণেরও উপযোগী। কারণ, সঙ্কল্প দ্বারা মানসী সৃষ্টিতেও জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে উহার বাস্তব-সৃষ্টি দূরে থাকুক মানস-সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। যদি কাহারও ঘটের জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মৃত্তিকা-উপাদানের দ্বারা ঘট-নির্ম্মাণে যেরূপ অসমর্থ হইবে—কেবল মনঃ-সঙ্কল্প বা মানস-সৃষ্টিতেও সেইরূপ অসমর্থ হইবে। কারণ, ঘট কি—তাহাই যখন সে ব্যক্তি জানে না, তখন কিরূপে বাস্তব ঘট বা মানস ঘটের সৃষ্টি করিবে? দেবগণের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই; তাই ক্রিয়ার কথা এস্থলে আর বলা হইল না (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৯)। ইতিকর্ত্তব্যতা (ক্রিয়া)—কেবল মনুষ্যেরই।

মূল :—দিবাগণের গৃহসমূহে ও উপবনসমূহে মানসী সৃষ্টি। সকল (মানুষ ভাব যথাযোগ্য ভাবানুসারে নির্ব্বর্ত্তিত)। নরগণের প্রযত্নবশতঃ কর্ত্তব্য লক্ষণাভিহিত ক্রিয়াসমূহ—(শ্রবণ করুন)। ৫ ॥

সঙ্কেত :—অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—পূর্ব্বশ্লোক হইতে 'শ্রূয়তাং' (আপনারা শুনুন) পদটির অনুবৃত্তি এই শ্লোকে করিতে হইবে। কি শুনিতে হইবে?—নরগণের কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বিষয় শ্রবণ করুন। শ্লোকমধ্যস্থ 'চ' (ও) পদটি হইতে বুঝিতে হইবে যে, এস্থলে অনুক্ত লক্ষণ ও পূজনের বিষয়ও শুনিতে হইবে। এই ক্রিয়া—কেবল নরগণেরই কর্ত্তব্য—ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কেবল নরগণের ক্রিয়া কেন? ইহার উত্তর—কেবল নরগণের পক্ষেই ইতিকর্ত্তব্যতার (ক্রিয়ার) বিষয় বিহিত হইয়াছে, যেহেতু, দেবগণের ত কোনরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা নাই। দেবগণ অন্য কোনরূপ বাহ্য-সাধন-ব্যতিরেকে কেবল মনঃসঙ্কল্প-দ্বারাই মানসী সৃষ্টি করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ইতিকর্ত্তব্যতার স্থান থাকিতেই পারে না। ঐ স্থানে নানা সাধন-উপাদানাদির সাহায্যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতির ক্রম অবলম্বনে কোন বস্তু উৎপাদন করা যায়, সেই স্থলেই ইতি-কর্ত্তব্যতার অপেক্ষা থাকে। দেবগণের মানসী সৃষ্টি—এই সকল মানস-সৃষ্ট বস্তুগুলি সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইলেও বস্তুতঃ ঘট-পটাদির ন্যায় বিষয়রূপে গণ্য হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে স্বপ্ন-সৃষ্টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্নে যে হস্তী, অশ্ব, গৃহ, বৃক্ষ, মনুষ্য প্রভৃতি পদার্থ দেখা যায়, সেগুলি ব্যক্তিগত ভাবে স্বপ্নদ্রষ্টারই মানসী সৃষ্টি—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তথাপি সেই সকল স্বপ্নের মানস পদার্থ জাগ্রল্লোকের হস্তি-গৃহ-বৃক্ষাদির ন্যায় বাস্তব বিষয় নহে। ঐ গুলি নিশ্চিতই মানসী সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্ম্ম—তথাপি উহাদিগকে বিষয় বলা চলে না। এই কারণে স্বপ্নের জ্ঞান নির্ব্বিষয় জ্ঞান। স্বাপ্ন সৃষ্টিতে সাধনাদির ক্রম প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্য-তার জ্ঞানও থাকে না। ব্যাবহারিক জগতে যেমন গৃহ নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজান প্রভৃতি নানাপ্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন আছে, মানসী স্বাপ্নসৃষ্টিতে সেরূপ জ্ঞানের কোনই প্রয়োজন নাই। বিনা ইষ্টকাদি উপাদানে—বিনা গাঁথিবার ক্রমে—কোনরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা বিনা—স্বপ্নের বাড়ীখানি ক্ষণিকের মধ্যে গড়িয়া উঠে। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, মানসী সৃষ্টিতে ইতিকর্ত্তব্যতার প্রয়োজন নাই। দেবলোকের যে, উপবন—তাহাও মানস-সৃষ্টি। সাধারণতঃ, নরলোকে উদ্যান সৃষ্টি করিতে হইলে কত-দূর ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা সকলেই জানেন। প্রথমে উদ্যানের মাটী তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহার পর তাহাতে গাছের বীজ-বপন, অথবা চারা, অথবা ডাল প্রভৃতি রোপণ করিতে হইবে। যে বৃক্ষ-গুল্ম-লতা জন্মিবে, তাহাদেরও বীজ-অঙ্কুরোদ্গম—বৃদ্ধি—ফুল—ফল—এইরূপ নিয়ত-ক্রমানুসারে পরিপূর্ণতা আসিবে। উদ্যানস্থ তরু-লতা—স্থলভাগ—সরোবর—ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি বহু বিচিত্র অংশ-গুলিও এক দিনে গড়িয়া উঠে না—নিয়ত-ক্রমানুসারে তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহাদির কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবগণ এ স্থলে ক্রমের অপেক্ষা রাখেন না। ক্ষণমধ্যেই তাঁহারা কুসুম-ফল-শোভিত, বহু-বিচিত্র-তরুলতা-গুল্ম-সরোবর-ক্রীড়াক্ষেত্রসমন্বিত উদ্যানের সৃষ্টি তাঁহারা করিতে সমর্থ—যাহা নরগণের পক্ষে দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ ও নিয়তক্রম-সাধ্য বলিয়া মনে হয়। গৃহের ত কথাই নাই। মহর্ষি এই কথাই অতি অল্পাক্ষরে বলিয়াছেন—গৃহ বা উপবন—সবই দেবগণের মানসী সৃষ্টি—সাধন-ক্রম-সময়-নিরপেক্ষ; উহাতে ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই।

ইহার পরবর্ত্তী অংশ—যাহা মূলে ব্র্যাকেট-মধ্যে মুদ্রাপিত হইয়াছে ও যাহার একটা অনুবাদের আভাসমাত্র আমরাও ব্র্যাকেট-মধ্যে দিয়াছি—দুর্ব্বোধ্য; অন্ততঃ বরোদা-সংস্করণের মূলে যেরূপ পাঠ ছাপা হইয়াছে—তাহা হইতে কোনরূপ অর্থগ্রহ হয় না। পাঠটি এইরূপ—"যথা ভাবাভিনির্ব্বর্ত্ত্যো সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ।" আমরা যে অনুবাদ উপরে দিয়াছি, উহা মূলের আক্ষরিক অনুসরণ মাত্র—অতএব উহা হইতেও কোনরূপ স্পষ্ট অর্থবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে এ স্থলে সম্ভবতঃ কিরূপ পাঠ হইলে অর্থ প্রকরণ-সঙ্গত ও বোধগম্য হয়, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

'ভাব'—শব্দের অর্থ—(১) হৃদ্গত ভাবনা—মনের ভাব; (২) ভাবপদার্থ—অভাবের বিপরীত—যাহার বস্তু-সত্তা আছে।

সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ—মানুষ সকল ভাব অর্থাৎ মনুষ্যলোকে ব্যবহার্য্য সকল ভাব-পদার্থ Positive entity উক্ত পদার্থগুলি কিরূপ? তাহার উত্তর—

যথা ভাবাভিনির্ব্বর্ত্ত্যোঃ—যথাযোগ্য ভাবানুসারে নির্ব্বর্ত্তিত (অর্থাৎ নিষ্পাদিত)। যেরূপ মনোভাব তদনুসারে সৃষ্ট।

মোট অর্থ দাঁড়াইল—মানুষলোকের পদার্থগুলি মনোভাবানুসারে সৃষ্ট। অর্থাৎ মানুষ যেরূপ ভাবনা করে, তাহার ব্যবহার্য্য পদার্থগুলি তদনুসারে সৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দেবসৃষ্টির সহিত মানুষসৃষ্টির পার্থক্য কোথায়—ইহা তলাইয়া বুঝিতে যাইলে আর পূর্ব্বোক্ত অর্থের সঙ্গতি থাকে না। মূলে আছে—"সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ" 'তু' পদটির অর্থ—পক্ষান্তরে; অর্থাৎ পূর্ব্বে দেবগণের মানসী সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সেই সৃষ্টির সহিত মানুষ-সৃষ্টির পার্থক্য কোথায়—তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরে বলা হইতেছে যে—পক্ষান্তরে মানুষ-ব্যবহার্য্য পদার্থগুলি অন্যরূপ (দেবগণের ন্যায় মানসী সৃষ্টি নহে)। কিন্তু—যথাভাবাভিনির্ব্বর্ত্ত্যাঃ এই পাঠ ধরিলে অর্থ হয়—ভাবানুযায়ী। পক্ষান্তরে, মানুষসৃষ্টিও মনোভাবানুযায়িনী—এ অর্থ করিলে ত আর দেবগণকৃত সৃষ্টির সহিত মনুষ্য-কৃত সৃষ্টির কোন ভেদই রহিল না। কারণ, দেবসৃষ্টি মানসী; আবার মনুষ্যসৃষ্টিকেও বলা হইল ভাবানুগতা—অর্থাৎ এক কথায় উহাও মানসীই। তবে আর প্রভেদ রহিল কোথায়?

এই কারণে আমাদিগের মনে হয়—উক্ত পাঠ অশুদ্ধ। কাশী-সংস্করণে ঐ অংশটিই দৃষ্ট হয় না। বরোদা-সংস্করণে একটি পাঠান্তর পাদটীকায় দৃষ্ট হয়—"যত্র ভাবা বিনিষ্পন্নাঃ সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ"। 'বিনিষ্পন্ন' শব্দটিকে একটু বিশ্লেষিত করিলে—একটা চলনসই অর্থ দাঁড়াইতে পারে। বিনিষ্পন্ন—বিশেষ ভাবে নিষ্পন্ন—অর্থাৎ মানসী সৃষ্টি মাত্র নহে—কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিষয়াকারে সৃষ্ট। এরূপ অর্থ করিলে ভেদটি পরিস্ফুট হয়—দেবসৃষ্টি মানসী—নির্ব্বিষয়া, পক্ষান্তরে মানুষসৃষ্টি সবিষয়া। স্বপ্নসৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টিতে যতটা ভেদ, দেব-সৃষ্টি ও মানবসৃষ্টিতেও ঠিক ততটাই ভেদ পাওয়া গেল।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভাল পাঠ পাওয়া যায়—দ্বিতীয়াধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে—"দেবানাং মানসী সৃষ্টির্গৃহেষূপবনেষু চ। [illegible] বিনিষ্পন্না সর্ব্বে ভাবা হি মানুষাঃ"। (২।২৭)—

ভাবাভিনিষ্পন্না—এ পাঠের অর্থসঙ্গতি হয় না। কিন্তু "সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ"—এ স্থলে 'হি' পাঠের পরিবর্ত্তে 'তু' পাঠটি অধিকতর সঙ্গত; যেহেতু—'তু'-শব্দের অর্থ—পক্ষান্তর। দেবসৃষ্টি ও মনুষ্যসৃষ্টির পার্থক্য দেখাইতে হইলে 'তু'-শব্দের ব্যবহারই সঙ্গত। কাশী-সংস্করণেও "যত্নভাবাদ্বিনিষ্পন্নাঃ সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ"—এই পাঠ ২২ শ্লোকে পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকটি বর্ত্তমান শ্লোকেরই পুনরুক্তি কি না, সে বিচার অভিনব করিয়াছেন,—আমরাও যথাস্থানে উহা করিব। কিন্তু বর্ত্তমানে আলোচ্য এই যে—"যত্নভাবাদ্বিনিষ্পন্নাঃ সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ"—এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি অতি সুন্দর হয়।

যত্নভাবাদ্বিনিষ্পন্নাঃ—যত্ন-সহকারে নির্ম্মিত।

সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ—মানুষলোকের সকল পদার্থ।

মনুষ্যলোকের সকল পদার্থ প্রযত্ন-সাধ্য—মানসী সৃষ্টি নহে; কারণ, মানসী সৃষ্টিতে কোন প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। প্রযত্ন বা যত্ন—শারীরিক ব্যাপার—দেহ-চেষ্টা।

তাহা হইলে মোট পার্থক্য দাঁড়াইল এই যে—দেবগণের মানসী সৃষ্টি নির্ব্বিষয়া, অপ্রযত্নসাধ্যা; পক্ষান্তরে, মানুষগণের সৃষ্টি সবিষয়া—অতএব প্রযত্ন-সাধ্যা।

নরাণাং যত্নতঃ কার্য্যা লক্ষণাভিহিতাঃ ক্রিয়াঃ—লক্ষণোক্ত ক্রিয়া-সমূহ নরগণের পক্ষে যত্নানুসারে কর্ত্তব্য। এস্থলে 'ক্রিয়া'-পদের অর্থ—ইতিকর্ত্তব্যতা; আর লক্ষণ—সন্নিবেশ-পরিমাণাদি—ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যদি এই অংশটুকু মূলে থাকে, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত অংশের (যত্নভাবাভিনির্ব্বর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বে ভাবাস্তু মানুষাঃ) কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না; কারণ, উভয় অংশেরই তাৎপর্য্য একরূপ। এই কারণেই সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত অংশ ব্র্যাকেট-মধ্যে ছাপা হইয়াছে—অন্যথায় পুনরুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

মূল :—সেই হেতু শ্রবণ করুন—যে প্রকারে, যে দেশে ও যে কালে নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য; আর তাহার বাস্তু ও পূজা যে প্রকারে প্রযত্নানুসারে প্রযোজ্য ॥ ৬ ॥

সঙ্কেত :—সেই হেতু—যেহেতু নরগণের পক্ষে প্রযত্ন-সহকারে ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মূলে আছে 'যত্র'—যে দেশে ও যে কালে। বাস্তু—গৃহ ও ভূমির পরিমাণ এ ক্ষেত্রে 'বাস্তু'-পদের অর্থ (অঃ ভাঃ পৃঃ ৫০)।

মূল :—এই (নাট্যমণ্ডপে) প্রেক্ষাগৃহ দর্শন করিয়া ধীমান্ বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক ত্রিবিধ সন্নিবেশ শাস্ত্রানুসারে পরিকল্পিত হইয়াছিল ॥৭॥

সঙ্কেত :—ইহ প্রেক্ষাগৃহং দৃষ্ট্বা (বরোদা); ইহ প্রেক্ষাগৃহাণাং তু (কাশী)—এই পাঠটিতে অর্থসঙ্গতি স্পষ্ট—এই নাট্যমণ্ডপে ধীমান্ বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক প্রেক্ষাগৃহ-সমূহের ত্রিবিধ সন্নিবেশ শাস্ত্রানুযায়ী পরিকল্পিত হইয়াছিল।

ইহ—নাট্যমণ্ডপে; বিষয়াধিকরণে সপ্তমী—নাট্যমণ্ডপ-সংক্রান্ত বিষয়ে। সন্নিবেশ—আকার, form; পরের শ্লোকে ত্রিবিধ সন্নিবেশের নাম বলা হইবে—(১) বিকৃষ্ট, (২) চতুরস্র ও (৩) ত্র্যস্র। সন্নিবেশশ্চ—এই 'চ'-কার-দ্বারা প্রমাণ ও (পরিমাণ—মাপ) পাওয়া যাইতেছে; উহাও পরের শ্লোকে বলা হইবে—(১) জ্যেষ্ঠ (২) মধ্যম ও (৩) অবর।

বিশ্বকর্ম্মা তিন প্রকার নাট্যগৃহের সন্নিবেশ ও তিন প্রকার প্রমাণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা কি স্ববুদ্ধি-প্রসূত? না, শাস্ত্রতঃ—শাস্ত্রানুসারে প্রেক্ষাগৃহ-সম্বন্ধে বিচারপূর্ব্বক উহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা যে শাস্ত্রবিচারে পটু ছিলেন—তাহা তাঁহার একটি বিশেষণ হইতেই বুঝা যায়—ধীমান্।

শাস্ত্রতঃ—শাস্ত্রানুসারে, অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা যখন শাস্ত্রার্থ-বিচার-পূর্ব্বক সন্নিবেশাদির বিধান করিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে—উক্ত শাস্ত্র ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রেরও মূলভূত। সে শাস্ত্রও আবার ছিল অপর শাস্ত্রমূলক। অতএব, নাট্যশাস্ত্র প্রবাহরূপে অনাদি (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫০)।

মূল :—বিকৃষ্ট ও চতুরস্র ও ত্র্যস্র—(এই তিন প্রকারই) মণ্ডপ। তাহাদিগের তিনটি প্রমাণ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম আর কনিষ্ঠ ॥ ৮ ॥

সঙ্কেত :—সন্নিবেশ ত্রিবিধ—সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে। ত্রিবিধ কি কি—তাহা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। বিকৃষ্ট—বিভাগানুযায়ী কৃষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ—চারিদিক্ সমান নহে ("বিভাগেন কৃষ্টো দীর্ঘো ন তু চতসৃষু দিক্ষু সাম্যেন"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫০)। বিকৃষ্টের দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা অধিক—ইহাকে rectangular বলা চলে, square নহে। চতুরস্র (কাশী—চতুরশ্র)—সমচতুষ্কোণ ও সমচতুর্ব্বাহু—square. ত্র্যস্র (ত্র্যশ্র—কাশী)—তিনটি অশ্রি যাহার, তাহা ত্র্যশ্রী; ত্র্যশ্রী ইহাতে আছে এই অর্থে ত্র্যশ্রী—অস্ত্যর্থে অচ্।

অভিনব বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও মতে—এই বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্রই যথাক্রমে—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ? মতান্তরে—বিকৃষ্ট-চতুরস্র-ত্র্যস্রের প্রত্যেকটির ত্রিবিধ পরিমাণ জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ; তাহা হইলে মোট নয় প্রকার ভেদ দাঁড়াইল। অভিনবের মতে ইহাই যুক্তিযুক্ত। প্রমাণ বা পরিমাণ ত্রিবিধ-সন্নিবেশাশ্রিত নহে—পরন্তু হস্ত-দণ্ডাশ্রিত ও জ্যেষ্ঠাদিভেদে ত্রিবিধ—ইহাই অভিনবের মত। তাহা হইলে নববিধ প্রেক্ষাগৃহের ভেদ নিম্নোক্তরূপে করা যাইতে পারে—

(১) বিকৃষ্ট — জ্যেষ্ঠ
(২) বিকৃষ্ট — মধ্যম
(৩) বিকৃষ্ট — অবর
(৪) চতুরস্র — জ্যেষ্ঠ
(৫) চতুরস্র — মধ্যম
(৬) চতুরস্র — অবর
(৭) ত্র্যস্র — জ্যেষ্ঠ
(৮) ত্র্যস্র — মধ্যম
(৯) ত্র্যস্র — অবর

এই নয় প্রকার প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি আবার হস্ত-দণ্ড-গত পরিমাণভেদে দ্বিবিধ—অতএব মোট ভেদ অষ্টাদশ প্রকার—ইহা নবম শ্লোকে বলা যাইতেছে।

মূলে—ইহাদিগের হস্ত-দণ্ড-সমাশ্রিত প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে—এক শত আট, চতুঃষষ্টি হস্ত অথবা বত্রিশ ॥ ৯ ॥

সঙ্কেত :—"শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্হস্তা দ্বাত্রিংশদেব বা" (বরোদা)। অভিনব বলিয়াছেন—"শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্দ্বাত্রিংশচ্চেতি নিশ্চয়াৎ"—এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়; কাশী-সংস্করণের পাঠ—নিশ্চিতম্; নিশ্চয়ঃ—এইরূপ পাঠও আছে। যাহা হউক, মোটামুটি অর্থ এই যে—উক্ত নয় প্রকার প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটির পরিমাণ—

হস্ত-দণ্ড-ভেদে দ্বিবিধ—জ্যেষ্ঠ-পরিমাণ—১০৮ হস্ত অথবা ১০৮ দণ্ড; মধ্যম-পরিমাণ—৬৪ হস্ত অথবা ৬৪ দণ্ড; অবর-পরিমাণ—৩২ হস্ত অথবা ৩২ দণ্ড।

অভিনব বলিয়াছেন—এই সকল ভেদের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই শাস্ত্র-বাক্যের পুনরুক্তি তিনি করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ভেদের প্রত্যেকটিই প্রতিক্ষেত্রে উপযোগী নহে। শাস্ত্রে অবশ্য উক্ত অষ্টাদশ-প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহাদের সব কয়টি যদিও সর্ব্বত্র অনুপযোগী, তথাপি সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদার্থ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—কোন কালে বা কোন স্থলে হয় ত কোনটির উপযোগ হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনায় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫১-৫২)।

মূল:—অষ্টাধিক শত জ্যেষ্ঠ, চতুঃষষ্টি মধ্যম, আর পক্ষান্তরে কনিষ্ঠ গৃহ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বলিয়া অভিমত ॥ ১০ ॥

সঙ্কেত:—জ্যেষ্ঠ প্রমাণের মাপ—১০৮ হাত;—মধ্যম প্রমাণ—৬৪ হাত। কনিষ্ঠ (অবর) প্রমাণ—৩২ হাত। চতুরস্রে বা ত্র্যস্রে—চারদিক্ ও তিন দিক্ই সমান। বিকৃষ্টে ইহাই দৈর্ঘ্যের মাপ—বিস্তার দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধ—ইহা পরে পাওয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ।

বোম্বাই পরিকল্পনার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় বিবৃতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বৎসর পূর্ব্বে যে বোম্বাই পরিকল্পনা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন সম্পর্কে গভীর অর্থনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বাভাষ-স্বরূপ প্রথম-প্রকাশিত বিবৃতির পরিণত পরিবর্দ্ধনরূপে এই বিবৃতি অতি মূল্যবান্ অর্থনৈতিক আলোচনা। এই পরিকল্পনার অষ্ট শিল্পপতি-রচয়িতাদের অভিমত এই যে, সমগ্র ভারতের অর্থনীতিকে একটি সুসঙ্গত পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালন করিবার, জন-সাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের বিষম বৈষম্য নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ধনতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতা এই উভয়ের পার্থক্যকে সাধারণতঃ অত্যধিক অতিরঞ্জিত করা হয়।

বোম্বাই পরিকল্পনার প্রথম বিবৃতি যখন প্রকাশিত হয়, তখন অনেকেই ইহাকে ধনতান্ত্রিক নীতিমূলক মনে করিয়াছিলেন। রচয়িতাগণ সকলেই বিশিষ্ট ধনী শিল্পপতি। এই নিমিত্ত বহু লোকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ধনীকে অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করিবার যে চিরন্তন ধনতান্ত্রিক নীতি, ইহাতে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে, এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কৃষি অপেক্ষা শিল্পের প্রসার ও উন্নতিকল্পে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। এ ধারণা অভ্রান্ত নহে। শিল্পপতিগণ তাঁহাদের প্রথম বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতি-কল্পে একটি পরিকল্পনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়া সর্ব্বসাধারণের আলোচনার বিষয়ীভূত করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের প্রচেষ্টার পূর্ব্বে যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন পরিকল্পনার প্রচুর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, কিন্তু কেহই সাহস পূর্ব্বক একটি সুচিন্তিত ও সুসঙ্গত পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সুতরাং শিল্পপতিদের এই প্রথম রচনা তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বভাবতঃই ঐ পরিকল্পনায় তাঁহারা ইহাকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত কর্ম্মপ্রণালী এবং বিধি-বিধানের নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে অর্থ-সম্পদের যথাযোগ্য বণ্টন বিভাগ দ্বারা ব্যক্তিগত আয়ের সমতা অথবা উন্নতি সাধন, কিংবা ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিগত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত রাষ্ট্রের কিরূপ সংস্রব-সম্পর্ক সমীচীন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন নিয়ম-নীতির ইঙ্গিত করিতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহাদের দ্বিতীয় বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা ধনসম্পদের বিধি-সঙ্গত বণ্টন-বিভাগ এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে গঠন করিতে হইবে এবং তাহার বিশিষ্ট নিয়ম-নীতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। এই সঙ্কোচ তাঁহাদের প্রথম বিবৃতি সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার ফল কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রথম বিবৃতির ন্যায় দ্বিতীয় বিবৃতিতে তাঁহারা আর কোন ভবিষ্যৎ আলোচনার ইঙ্গিত করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন মনে করিতে হইবে।

শিল্পপতিদের এই দ্বিতীয় বিবৃতি যে গত এক বৎসর তাঁহাদের প্রথম বিবৃতির অনুকূল আলোচনা ও প্রতিকূল সমালোচনা পর্য্যালোচনার ফল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। যতই প্রভাব ও প্রতিপত্তি-শালী হউন না কেন, কয়েক জন বে-সরকারী শিল্পপতি ব্যক্তির পক্ষে ভারতের যুদ্ধোত্তর ও ভবিষ্যৎ সংগঠন-সমুন্নয়ন সম্পর্কে যে পরিমাণ ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব, রচয়িতাগণ সসঙ্কোচে তাহাতে কৃপণতা করেন নাই। তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে বহু গণ্যমান্য ও নগণ্য ব্যক্তিও পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এই বোম্বাই পরিকল্পনা—সর্ব্বপ্রথম নহে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠও বটে! এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত সরকারের মতদ্বৈধ নাই। এই নিমিত্ত সরকার এই রচয়িতাদের অন্যতম স্যার আর্দ্দেশির দালালকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর সংগঠন-সমুন্নয়ন বিভাগের ভার অর্পণ করিয়াছেন। স্যার আর্দ্দেশির অত্যন্ত আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সরকারও ইতিমধ্যে তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারের পক্ষ হইতে এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা বিরচিত হয় নাই ভারতের ন্যায় বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষিশিল্প সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সহজসাধ্য নহে। বিভিন্ন প্রদেশে কৃষিশিল্পের অবস্থা-ব্যবস্থা বিভিন্ন এবং বৃটিশ-শাসনাধীন ও ভারতীয় নৃপতিবর্গের আয়ত্তাধীন

অঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ-পার্থক্য প্রচুর। সুতরাং ধীরে ধীরে অগ্রসর না হইলে বিভিন্ন অবস্থা-ব্যবস্থা ও স্বার্থের সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে সংঘর্ষের উৎপত্তি অনিবার্য্য। একটি নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলি—একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতির সৃষ্টি করিয়া। দেশনায়ক জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এই সমিতির সভাপতি এবং ভারতের কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস শাসনের অবসানের সহিত এই সমিতির প্রচেষ্টা রুদ্ধ হইয়া যায়। বোম্বাই-এর শিল্পপতিগণ তাহার পর যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া ভারতের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ প্রদান করেন। তাঁহাদের সৎসাহস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

সরকারী কর্ম্মে ব্রতী হইয়া স্যার আর্দ্দেশির বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। প্রথম বিবৃতিতে তাঁহার সহযোগ ও স্বাক্ষর ছিল। স্যার আর্দ্দেশির সম্প্রতি একটি বেতার বক্তৃতায় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, ধনীকে অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করিবার কূট উদ্দেশ্যে বোম্বাই পরিকল্পনা রচিত হয় নাই। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—১৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় আয়কে তিন গুণ বৃদ্ধি করিয়া, সাধারণের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি পূর্ব্বক দেশের নিদারুণ দারিদ্র্য বিদূরণ। এই শুভ সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য উপযুক্ত অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পীড়িতের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যের যোগ্য ব্যবস্থার বিধান দিয়াছে। এই পরিকল্পনায় অনুমিত একুন ব্যয়-সমষ্টি দশ কোটি টাকার শতকরা চল্লিশ অংশ ব্যবহৃত হইবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। আমাদের দেশের কৃষিকে শতকরা ১৩০ অংশ উন্নত এবং শিল্পকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। কারণ, বর্ত্তমানে আমাদের কৃষিজ উৎপাদনের তুলনায় শিল্পের উৎপাদন অতি কম। ইহাতে আমাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কৃষির উপর চাপ যেমন গুরু, শিল্পের উপর চাপ তেমনি লঘু। এই অসমীচীন পার্থক্যই আমাদের দেশের অসমঞ্জস অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির আদিম কারণ। শিল্পের উন্নতি ব্যতীত কোন দেশই সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভ করিতে পারে না। কৃষিতে অর্থাগম হয় অতি সামান্য, পরন্তু শিল্পে অর্থাগম হয় প্রচুর। অর্থাগম ব্যতীত সুষ্ঠু ভাবে পারিবারিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ এবং সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে আমরা বুঝিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে সেই অভিজ্ঞতা দৃঢ়তর হইয়াছে যে, শিল্পে-অনুন্নত দেশের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই। শিল্পে-অনুন্নত দেশের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব; কোন সুযোগে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেও তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য। বহুমুখী শক্তিশালী শিল্প-প্রচেষ্টাকে অনতিবিলম্বে শত্রুদমনে নিযুক্ত করিতে না পারিলে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। অধুনা যে দেশ শান্তিকালীন সর্ব্বতোমুখী শিল্প-প্রচেষ্টাকে যত শীঘ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পরিণত করিতে পারে, যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে তত অধিক। আধুনিক যুদ্ধের ইহাই প্রকৃষ্ট রীতি। যত দিন ভারত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও গুরু-লঘু সর্ব্ববিধ শিল্পে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে না পারিবে, তত দিন তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হইবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ব্যতীত সর্ব্বতোমুখী শিল্প সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অসম্ভব। এই নিমিত্ত বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ তাঁহাদের পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য্য প্রয়োজন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। কারণ, যখন তাঁহাদের পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইবে, তখন আমদানী-রপ্তানী, মূলধন-সংগ্রহ, কলকারখানা স্থাপনের স্থান-নির্দ্ধারণ, বিভিন্ন ব্যাপারে মূলধন বিনিয়োগ, কারকারবারে বিশ্বস্ত-মূলক বাজার-সম্ভ্রম, লভ্যাংশ বিতরণের মাত্রা-নির্দ্ধারণ, বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের পর্য্যায়ক্রম, জমির যোত-নিরূপণ প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র-শাসন প্রয়োজন হইবে। শুধু ইহাই নহে, সময় সময় আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের ব্যয়ের মাত্রা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কঠোর বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে; এমন কি, অনেক সময় জনসাধারণের অভ্যস্ত আচার-ব্যবহারেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহযোগ ও সমর্থনের অধিকারী জাতীয় শাসন-তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ শাসন-সংযম প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে। কারণ, জনসাধারণ এইরূপ শাসন-সংযম তখনই মানিয়া লইবে, যখন তাহারা বুঝিবে যে, তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদেরই প্রদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত শাসনতন্ত্র এবংবিধ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু কত দিনে কিংবা কখনও আমাদের দেশে স্বায়ত্ত-শাসনশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে কি না—তাহা একমাত্র বিশ্ববিধাতাই জানেন। সুতরাং সেই অনিশ্চিত অনাগত সুদিনের প্রতীক্ষায় কাল-হরণ করিলে জাতীয় স্বার্থের সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে। অতএব বর্ত্তমান পরিস্থিতির অভ্যন্তরে এখন হইতেই আমাদিগকে যথাসম্ভব জাতীয় সমুত্থান-প্রচেষ্টায় প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়া বোম্বাই-এর অষ্ট শিল্পরথী তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের প্রথম প্রকাশিত কাঠামোকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। নিখিল ভারতকে তাঁহারা এক অখণ্ড অর্থ-নৈতিক একক নির্দ্ধারণ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে অসমীচীন নহে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতিকল্পে ধনতান্ত্রিকতা পরিবর্জ্জনীয় নহে; পরন্তু, ধনতান্ত্রিকতার আবেষ্টনে ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুষ্ঠানের অকুণ্ঠিত অবকাশ আছে, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, ব্যক্তিগত উদ্যম অনুষ্ঠানকে কোন প্রকারে খর্ব্ব করা কর্ত্তব্য নহে। তবে ব্যক্তিগত প্রয়াস-প্রচেষ্টা যাহাতে জাতীয় স্বার্থের কোন প্রকার হানি না ঘটায়, তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং দেশের ও জাতির অর্থ-নৈতিক সম্পদের বৃদ্ধি ও সদ্ব্যবহার সম্পাদন নিমিত্ত রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। জাতীয় আয় যাহাতে বিধি-সঙ্গত ভাবে ধনিক-শ্রমিক নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরিত হয় এবং বহুকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ না থাকে, তাহাই তাঁহাদের উদ্দিষ্ট। তাঁহাদের মতে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা ও তাহার পরিণতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, যদি তাহার ফলে দেশের ও দেশবাসীর দারিদ্র্য বিদূরিত হইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত ও সংযত না করে। এই নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পনার পরিশিষ্টে জনসাধারণের মধ্যে আয়ের অসঙ্গত বৈষম্য বিদূরণ পূর্ব্বক যাহাতে একটি সুসঙ্গ

অথচ সর্ব্বনিম্ন জীবনযাত্রার ধারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আয়ের নীতিসঙ্গত ব্যাপকতম বিতরণের নিমিত্ত ধন-সম্পত্তি উপভোগের বিষম বৈষম্য তিরোহিত করিয়া ইতর-সাধারণের অধিকারের মাত্রা প্রশস্ততর করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, মৃত্যুকর অর্থাৎ ধন-সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারীকে তাহার প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী রাষ্ট্রভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে ধনীর সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়া ধন-বৈষম্য কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবে। দ্বিতীয়, জমি-জমাই স্বত্বের (Land tenure) পরিবর্ত্তন। শিল্পরথিগণ মনে করেন যে, কৃষির যেরূপ উন্নতি তাঁহাদের অভীপ্সিত, জমিদারী প্রথায় তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। কৃষক যে জমি চাষ করে, তাহার স্বত্ব কৃষকের নিজের না হইলে জমিতে তাহার মমত্ব-বোধ থাকে না, সুতরাং জমির উন্নতির প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ জন্মে না। কৃষির উন্নতির নিমিত্ত রাষ্ট্রের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলেন যে, চাষী কৃষকের জমি যাহারা চাষ করে না, এমন কোন ব্যক্তির হস্তে না যায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমি-রাজস্বের হারও যথাসম্ভব কমাইয়া বিভিন্ন স্থানে সমপর্যায়ে আনিতে হইবে। বর্ত্তমানে সহরাঞ্চলেই বহু শিল্পের একত্র সমাবেশ ঘটিতেছে। ইহাতে শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না; এবং তাহার ফলে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে তাহার সর্ব্বপ্রকার উপকার ভোগ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত যৌথ কারবারের অংশ বহু স্থানের বহু জনের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার সাধন করিতে হইবে, বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন শিল্পের বিস্তার বিন্যাস করিতে হইবে এবং সমবায়-প্রচেষ্টার প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন শিল্প যত বিস্তার লাভ করিবে, ততই অধিক হইতে অধিকতর লোক তাহার সুযোগ ও সুফল লাভ করিবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধন-বৈষম্য বিদূরিত করিবার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এই নহে যে, সকলের আয়ের সমতা সম্পাদন করিবে। এই বৈচিত্র্যময় জগতে তাহা সম্ভবপরই নহে। নিজের নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ফল লাভ করিবেই; তবে তাহার তীব্র তীক্ষ্ণতা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। তাহারও দুইটি উপায়। প্রত্যেক সুস্থ সবল ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার নিমিত্ত তাহার ভরণ-পোষণের উপযোগী আয়সম্পন্ন কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় যথাসম্ভব কমাইতে হইবে, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দ্রব্যমূল্য যাহাতে যথা হ্রাস না পায়, তৎপ্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাথমিক, বিশেষতঃ কৃষিজ উৎপাদনের মূল্য ন্যায়সঙ্গত না হইলেই অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে। সুতরাং কৃষিজ পণ্যের মূল্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র ন্যায়সঙ্গত পর্য্যায়ে রাখিতে হইবে। পরন্তু, সহরে ও মফস্বলে উভয়ত্রই শ্রমিকের মজুরী তাহাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী করিতে হইবে; এবং জনসাধারণের বহুবিধ প্রয়োজন সাধনার্থ বহু শ্রেণীর সমবায় সমিতির সুদৃঢ় বিস্তার-সাধন করিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ কর নির্দ্ধারণ দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিদারুণ ধনবৈষম্য কথঞ্চিৎ নিবারণ করা যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সুস্থ সবল ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, দেশব্যাপী দারিদ্র্য নিরাকৃত করিয়া সকলের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা কখনই সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত কৃষির উন্নতির সহিত সর্ব্বপ্রকার উটজ ও উন্নত শিল্পের সম্প্রসারণ-সমুন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ তাহাদের ক্ষেত্রে একটির অধিক ফসল উৎপাদন করে না, সুতরাং প্রায়ই তাহারা বারো মাস কর্ম্ম করে না। একই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করিয়া এবং কৃষি-কর্ম্মের অবসর কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ অতি প্রয়োজনীয় এবং আশু লাভজনক কুটীরশিল্পে তাহাদিগকে বারো মাস নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি ও শিল্পে পারিশ্রমিকের পার্থক্য যথাসম্ভব সত্বর সর্ব্বত্র নিরাকৃত করিয়া উভয়ের বিধিসঙ্গত সমতা ও সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি এবং শ্রমিকদিগের কর্ম্ম-কৌশল ও কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে, তাহাদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের প্রতিও তীক্ষ্ণ মনোযোগ প্রদান প্রয়োজন। এই নিমিত্ত পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ যথাসম্ভব বিনামূল্যে তাহাদিগের সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও পীড়িতাবস্থায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ আধুনিক অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাহাকে সামাজিক বীমা ও ব্যারাম বীমা বলে, তাহার বিধান দিয়াছেন এবং অবস্থাবিশেষে পূরা বেতনে ছুটিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে আয়ের বিষম বৈষম্য দূর এবং দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা ও রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা-সমন্বিত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে রাষ্ট্রের অকপট সহায়তা ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। যে কোন দেশে বৃহদাকারে ব্যাপক ভাবে দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি সাধনার্থ অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ—নিষেধাত্মক ও প্রবর্ত্তাত্মক। তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে যে সমষ্টি ভাবে সর্ব্বনিয়ন্ত্রণাত্মক হইতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণ কৃত-কার্য্যতার সহিত তাহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য এবং ধন-সম্পদকে যুদ্ধ-কার্য্যে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা হইলে শান্তিকালে দেশের ও দেশবাসীর সুখ-সম্পদ্-সমৃদ্ধি সঙ্কল্পে দারিদ্র্য, রোগ এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও তাহারা সংগ্রাম করিয়া সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারে। অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে সকল বিধি-নিষেধ ও শাসন-সংযম প্রয়োজন, দেশবাসী যদি তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে পরিকল্পনাকে অতি সহজেই এবং সুষ্ঠু ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায়। এই নিমিত্ত শিল্পপতিগণের অভিমত এই যে প্রযোক্তব্য পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রচুর অবকাশ থাকিবে, অথচ এরূপ প্রয়াস-প্রচেষ্টা কোন প্রকারে জাতি অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থের পরিপন্থী হইবে না। পক্ষান্তরে, দেশের অর্থ-নৈতিক সম্পদকে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস-প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের যে বিশিষ্ট কর্ত্তব্য, তাহাও রাষ্ট্র যথাযথ ভাবে সম্পাদন করিবে। এই উদ্দেশ্যে স্বত্ব-স্বামিত্ব, শাসন এবং কর্ম্ম-পরিচালন সম্পর্কে রাষ্ট্রের অধিকার অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃততর হইবে। রাষ্ট্রের এইরূপ অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার সমাজের

কল্যাণজনক হইবে। এই বিষয়ে শিল্পপতিদের দৃঢ় মত এই যে, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বত্বাধিকার কিংবা প্রত্যক্ষ কার্য্য-পরিচালন অপেক্ষা রাষ্ট্র-শাসনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যে সকল প্রচেষ্টা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইবে এবং যাহাদের পরিচালনা জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত, অথচ সরকারী স্বত্বাধিকার ব্যতীত যাহাদের সুষ্ঠু শাসন সম্ভবপর নহে, সেগুলিতে অবশ্য সরকারের স্বত্বাধিকার থাকিবে। পক্ষান্তরে, যে-সকল প্রচেষ্টা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে সরকারের স্বত্বাধিকারে এবং জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান, মৌলিক শিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসায় এবং যে-সকল শিল্প দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিক সম্পদ্ ব্যবহার কিংবা উৎপাদন করে এবং তন্নিমিত্ত সরকারী সাহায্য লাভ করে, মাত্র সেগুলি সরকারের শাসনাধীন হইবে। পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ সরকারী স্বত্বাধিকার অপেক্ষা সরকারী শাসনেরই অধিকতর পক্ষপাতী এবং সে শাসন নিয়ন্ত্রিত হইবে দ্রব্য-মূল্য-নির্দ্ধারণে, লভ্যাংশের সীমা নির্দ্দেশে, শ্রমিকগণের কার্য্যকাল এবং মজুরী নির্দ্ধারণে, সরকারী পরিচালক (Directors) মনোনয়নে, এবং হিসাব পরীক্ষার সুবন্দোবস্তে। সরকারের স্বত্ব-স্বামিত্বে যে সকল অনুষ্ঠান, তাহাদের পরিচালনায় সরকারের অধিকার স্বাভাবিক; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সরকারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেও বে-সরকারী ব্যক্তিগত কিংবা আইন অনুসারে গঠিত সার্ব্বলৌকিক সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, সরকারী পরিচালনা অপেক্ষা বে-সরকারী প্রচেষ্টারই তাঁহারা অধিকতর পক্ষপাতী। উদার ধন-তান্ত্রিকতার পরিবেশে জনসাধারণের মধ্যে যথাসম্ভব ধন-সম্পদ বিতরণই তাঁহাদের উদ্দিষ্ট। ইহা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়া, জার্ম্মাণী কিংবা জাপানের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে এবং সঙ্গতও নহে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সমঞ্জস্ সমবায়-সম্পন্ন উন্নতিশীল মধ্যপন্থাই আমাদের অবলম্বনীয়।

যুদ্ধাবসানের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। সুতরাং এখন হইতে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার প্রচেষ্টাই আমাদের সুরু করিতে হইবে। সরকার এই নিমিত্ত কতকগুলি প্রাথমিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কয়েকটি যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন সমিতি বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা রচনায় নিযুক্ত আছেন। তদ্ব্যতীত যুদ্ধোত্তর কৃষি-শিল্প প্রভৃতির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকুশল শিল্পী, মিস্ত্রী ও কারিকর শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও বিভিন্ন শিল্পবৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার বিস্তার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের খনিজ সম্পদ এবং তড়িৎশক্তি সরবরাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিবার নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,০০,০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিবার একটি পরিকল্পনা হইয়াছে। সেচ, নদীপথ এবং দেশাভ্যন্তরে ষ্টীমার চলাচলের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য একটি সেচ ও জলপথ-মণ্ডলী স্থাপিত হইতেছে। রেলপথ ও মোটর রাস্তা বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকার টেনেসি ভ্যালী কর্ত্তৃসঙ্ঘের আদর্শে দুই-তিনটি প্রতিবেশী-প্রদেশ মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেচের সুবিধা সংযুক্ত সলিলশক্তি পরিচালিত তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সর্ব্বত্র অধিকতর পরিমাণে তড়িৎশক্তি সরবরাহের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি কেন্দ্রীয় শিল্পশক্তি পরিচালকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অ-সামরিক বিমান-পরিচালনা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও পরিকল্পিত হইয়াছে। কৃষি-গবেষণার কেন্দ্রীয় পরিষদের একটি শাখা সমিতি কৃষির উন্নতি দ্বারা কৃষিজ উৎপাদন দশ বৎসরে দেড় গুণ এবং পনর বৎসরে দ্বিগুণ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে; এই কার্য্যে ব্যয় হইবে হাজার কোটি টাকা। বনজ এবং মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হইতেছে। লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, বিলাতী মাটি, চিনি, মদ্যের সার (Alcohol) খাদ্যফেন (Food yeast) গুরু ও লঘু রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এবং ইলেক্‌ট্রো কেমিক্যাল প্রভৃতি শিল্পে শতকরা ৮০ অংশ বৃদ্ধি সাধন হেতু ঊনত্রিশটি কর্ম্মিষ্ঠ উপ-মণ্ডলী (Panels) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এ সকলই উদ্যোগপর্ব্বের ব্যাপার। এই সকল জল্পনা-কল্পনাকে বাস্তব পরিকল্পনায় পরিণত করিতে এখনও অনেক বিলম্ব। এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অর্থ আসিবে প্রধানতঃ বে-সরকারী শিল্পব্রতী ব্যক্তিবর্গের সংস্থান হইতে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক উপ-মণ্ডলীতে বে-সরকারী সদস্য দুই-এক জন থাকিবে। প্রত্যেক উপ-মণ্ডলীকে সরকার সর্ব্বপ্রকার তথ্য ও উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং উপ-মণ্ডলীগুলিও প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট শিল্প প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত সরকারকে জানাইবেন। এই উদ্দেশ্যে স্যার আর্দ্দেশির দালাল সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রার্থনা অবশ্য নিষ্ফল হইবে না। কিন্তু এই ঊনত্রিশটি বিভিন্ন শিল্পসংক্রান্ত উপ-মণ্ডলী নিয়োগ যুদ্ধোত্তর প্রথম পাঁচ বৎসরের শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রথম অনুষ্ঠান। যুদ্ধের পাঁচ বৎসরের অন্তে অনুষ্ঠানের মাত্র সূত্রপাত! ইহার পরিণতি কত দিনে, কিরূপে ঘটিবে, তাহা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ভবিতব্যতার কবলে নিহিত। নিরবদ্য দেশ-হিত-ব্রতে আমলাতান্ত্রিক সরকারের শম্বুকগতি চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা এই সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাদের স্বার্থ ও ভারতের জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন নহে,—বিশেষ বিভিন্ন। জাতীয় শাসনতন্ত্র ব্যতীত, জাতীয় স্বার্থের অনুকূল পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা বহু বাধা-বিঘ্ন ও বিলম্ব-সঙ্কুল।

"আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

—রবীন্দ্রনাথ



বরাতে না থাকলে

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

নামটা ছিল তার সুবোধ, কিন্তু অমন দুষ্টু ছেলে ওদের পাড়াতেই নয় শুধু, সারা বাংলাদেশ ঢুঁড়েও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তার মাথায় অঙ্ক কোন দিন ঢুকতো না, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি ঢুকতো একবারে সদলবলে ভিড় করে।

অঙ্কের পরীক্ষায় সে পেতো একশোর মধ্যে আট কি নয়; কিন্তু দুষ্টুমির যদি কোন পরীক্ষা থাকতো, তাহলে সে পেতো কত জান?—একশোর মধ্যে একশো-আট কি নয়।

এ-হেন সুবোধচন্দ্র আজ মহা ব্যস্ত। রবিবার;—ইস্কুলে যাবার হাঙ্গামা নেই। তার ওপর পাড়ার পার্কটাতে আজ মহা ধুম। বেলা এগারটা থেকে তাদের টিমের সঙ্গে ও-পাড়ার জিপ্‌সি-ক্লাবের ক্রিকেট-ম্যাচ চলেছে। পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মালীদের যে ঘরটা আছে, সেইটে হয়েছে তাদের টেণ্ট।

সুবোধ তাদের দলের এক জন দুর্দ্দান্ত খেলোয়াড়। তাদের দল ব্যাট্ করতে সুরু করেছে। দু'টো উইকেট্ গেছে পড়ে। তৃতীয় আর চতুর্থ ব্যক্তি ব্যাট্ করছে। এদের এক জন আউট্ হলেই সুবোধ ব্যাট্ করতে নাববে। কাজেই সে প্যাড্ পরে তৈরী হয়ে বসে আছে। এমন সময় একটি আধাবয়সী দর্শক সুবোধের কাছে এসে দাঁড়ালো। ঠিক সেই সময় তৃতীয় ব্যক্তি আউট্ হয়ে গেল।

সুবোধ খুব কায়দা করে ব্যাটটাকে হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে খেলতে যাচ্ছিল। লোকটি কাছে গিয়ে চুপি চুপি বল্লে—দেখে-শুনে মেরো ভাই, বলটাতে ব্রেক্ আছে। গোঁয়ারতুমি করতে যেও না খবরদার।

কারুর মুরুব্বিয়ানা সুবোধ কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারতো না, আজও পারলে না,—এগুতে এগুতে বলে গেল—ব্রেক্ আছে না ছাই আছে! ও-সব বল মেরে ছাতু করে দেবো।

কিন্তু বল্‌টা আর ছাতু হোলো না, ছাতু হোলো সুবোধের উইকেটটাই। প্রথম বলেই বেচারার তেকাটি একবারে বেঁকে ত্রিভঙ্গ-মুরারি হয়ে গেল।

ব্যাটটি বগলে করে বেচারা পত্রপাঠ ফিরে এলো টেণ্টে। লোকটা তখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপয়া অনামুখো লোকটা। সুবোধের মনে হতে লাগলো—লোকটার মুণ্ডুটা যদি বল হোতো, তাহলে একটা ওভার বাউণ্ডারির মার হাঁকড়ে হাতের সুখ করে নিতো।

ভদ্রলোক একটা মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে বললে—বল্‌লুম দেখে-শুনে মেরো, কথা শুনলে না। তার পরেই হঠাৎ নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বিড় বিড় করে আপন মনেই বকতে লাগলো—নাঃ, আর দেরী করলে চলবে না, চারটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে, এইবার উঠতে হোলো।

কথাটা শেষ করেই সুবোধের দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, নবীন মিস্ত্রিরের লেনটা ঠিক কোন্‌খানটায় হবে বলতে পারো?

সুবোধ একেবারে লাফিয়ে উঠলো। যাক্ লোকটাকে জব্দ করবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে।

নবীন মিস্ত্রিরের লেনেই সুবোধদের বাড়ী। গলিটা পার্কের একেবারে গায়ে বল্লেই চলে। সুবোধ কিন্তু মুখের ভাবটা এমন যেন লোকটা ভুল করে একেবারে উল্টো পথে এসে পড়েছে।—বললে—নবীন মিস্ত্রিরের লেন এখানে কোথায় মশাই? পার্কের উত্তর দিকে ঐ যে গলিটা দেখছেন, ঐ যে যার মোড়ে ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐ গলিটা ধরে বরাবর সিধে চলে গেলে ট্রাম-রাস্তা পাবেন। সেটা ক্রস্ করে ঐ গলিরই ঠিক সামনা-সামনি যে সরু গলিটা পাবেন, সেই গলি ধরে বরাবর উত্তর দিকে চলে গেলে এই রকম একটা পার্ক পাবেন। সেই পার্কের কাছে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই আপনাকে নবীন মিস্ত্রিরের লেন দেখিয়ে দেবে।

লোকটা চলে গেলে পর সুবোধ মনে মনে ভারি খুসি হয়ে উঠলো। যাক্, লোকটা তাকে যেমন অপদস্থ করেছে, সেও তেমনি তার শোধ তুলে ছেড়েছে।

এই ঘটনার কিছু দিন পর সুবোধের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার নগেন মামার কথা। নগেন মামা তার ঠিক আপন মামা নন। তার মার পিস্‌তুতো না মাসতুতো ভাই। কিছু দিন হোলো, ভদ্রলোক 'চিত্র-জগৎ' নাম দিয়ে একটা সচিত্র সাপ্তাহিক বার করেছেন। কাজেই বায়স্কোপের পাস্ তিনি অনায়াসেই সংগ্রহ করে দিতে পারেন। লোকটা কিন্তু কেমন যেন গোমড়ামুখো। পাসের কথা তুললেই বলেন—এ বয়েসে এত বায়স্কোপ দেখার সখ তো ভাল নয়, এখন মন দিয়ে লেখাপড়া…ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য বার বার তাগাদার ফলে মামাকে অবশেষে রাজি হতে হয়েছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভদ্রলোক কথা দিয়ে ফেলেছেন শীগগিরই একটা পাস্ যোগাড় করে দেবেন। সে-ও আজ প্রায় মাসখানেক হতে চল্লো।

নগেন মামার কি কথার ঠিক!—সুবোধ আজ ঠিক করেছে নগেন মামার বাড়ী চড়াও হয়ে বেশ দু'-চার কথা শুনিয়ে আসবে।

বিকেল ছ'টা নাগাদ নগেন মামাদের বাড়ীতে গিয়ে সুবোধ হাজির হোলো। সদর-দরজা পার হয়েই একতলার বাইরের ঘর। উঁকি মেরে দেখে, নগেন মামার মেয়ে বেণুটা মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। সুবোধ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাষ্টার মশাইটির

কে চেয়েই লাফিয়ে উঠলো।—কি আশ্চর্য্য, এ যে সেদিনকার সেই ঁঢ়া লোকটা, যার মুখ দেখে ব্যাট করতে নেমে তার তেকাটি ভেঁ ে গেছলো!

লোকটা ঘাড় গুঁজে আপন মনে বেণুকে অঙ্ক না কি খাচ্ছিল। সুবোধকে দেখতে পায়নি ভাগ্যিস্!

এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুবোধ যেন হাঁফ ছেড়ে চলো। তার পর একটু দম নিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে সটান্ উঠে ল দোতলায়। দোতলার হল্-ঘরটায় বসে নগেন মামা একরাশ গজপত্র নিয়ে মাথা-মুণ্ডু কি সব করছিলেন। ধপ করে ফরাসের পর বসে পড়েই সুবোধ বললে, খুব তো পাস্ দিলেন নগেন মামা।

কাগজগুলোর ওপর থেকে চোখ না তুলেই নগেন মামা লেন—পাস্ তো জোগাড় করেছিলুম, কিন্তু তোর কপালে নেই, কি করব বল্? এক-আধ জনের পাস্ নয় রে, একেবারে গোটা টা বক্সের পাস্।

সুবোধ বললে—সে পাস্ কি হল তা হলে?

নগেন মামা এইবার নথিপত্তর ছেড়ে সিধে হয়ে বসলেন। লেন—আর বলিস্ কেন। কত করে তো পাস্ জোগাড় করলুম। র মাষ্টার মশাইকে পাঠালুম তোদের বাড়ীতে পাস্টা পৌঁছে দিতে। রবিবারের কথা বলছি আমি। সেই দিনেরই পাস্—সন্ধ্যে ছ'টার । বলে দিলুম, চারটের মধ্যেই যেন পাস্ যথাস্থানে পৌঁছয়। মি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—হঠাৎ রাত আটটার সময় সাত-ক ঘুরে এসে মাষ্টার মশাই পাস্খানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—পনার নবীন মিত্তিরের লেন তো খুঁজে পেলুম না মশাই।

—সে কি! আমি যে আপনাকে পড়াপাখীর মত করে দিলুম! সুমুখেই অত বড় পার্ক; ও তো ভুল হবার যো

মাষ্টার মশাই বললেন—পার্ক তো খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু সে কাছে নবীন মিত্তিরের লেন্ বলে তো কোন গলি নেই।

লুম—পার্কটা কি রকম বলুন তো?

ার মশাই পার্কের যা বর্ণনা দিলেন, তা থেকে বুঝলুম, ভদ্রলোক ন গিয়েই পৌঁছেছিলেন। বললুম—ওখানে নবীন মিত্তিরের ল কোন গলি নেই, এ কথা কে আপনাকে বললে?

ষ্টার মশাই বললেন—একটি ছোক্রা।

গেন মামা আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে সুবোধ লো—বুঝতে পেরেছি, ভদ্রলোক ভুল করে ঘুরে মরেছেন।

গেন মামাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সুবোধের ডাক্ ছেড়ে ইচ্ছে করল।

গুপ্ত

শ্রীরবি-নর্ত্তক

(২)

ভাবেই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু রাজা মহাপদ্ম নন্দের বিষম দুঃখ—তাঁর দুই রাণী সুনন্দা বা মুরা কারুরই ছেলে রাজা অনেক চেষ্টা করলেন—যাগ-যজ্ঞ-ঠাকুর-দেবতার কবচ-কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—রাণীদের ছেলে হবার বয়স রিয়ে যায় যায়। এমন সময় এক দিন হঠাৎ এক জন মস্ত বড় রাজ নন্দের রাজসভায় এসে উপস্থিত। তাঁর মুখে বাণী—

'মহারাজের জয় হোক! আপনার কাছে আজ আমি অতিথি। অনেক দিন তপস্যা করেছি—কিছুই খাওয়া-দাওয়া ছিল না এত দিন। আজ আপনার অন্তঃপুরে আমার মনের মত খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

রাজা ত এ-হেন ঋষিকে অতিথি পেয়ে নিজের বহু-ভাগ্য মনে করলেন। ঋষি ত নয়—যেন জ্বলন্ত আগুন! তপস্যা ক'রে তাঁর শরীরে এত তেজ জমেছে যে, ঋষির দিকে ভাল ক'রে চাওয়াই যায় না—চোখ ঝলসে যায়! তাই রাজা ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্লেন। ঋষির চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে তাঁকে সসম্ভ্রমে নিজে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। এমন কি, পা ধোয়াবার জল পর্য্যন্ত নিজের হাতে ব'য়ে এনে খুব যত্ন ক'রে নিজেই ঋষির পা দু'খানি ধুইয়ে দিলেন। তার পর ঠিক গুরুর মত পরম সমাদরে ঋষিবরের উত্তম রাজভোগ সেবার ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন রাজবাড়ীর রাঁধুনীদের।

ঋষির পা ধুয়ে পাদোদকটুকু তিনি একটা পাত্রে সাবধানে রেখে দিয়েছিলেন। রাণীরা যখন এসে ঋষিকে প্রণাম করলেন, তখন সেই পাদোদক একটুখানি নিয়ে তিনি দুই রাণীর মাথাতেই ছিটিয়ে দিলেন। বড় রাণী সুনন্দার মাথায় পড়ল পাদোদকের ন'টি ফোঁটা, আর ছোট রাণী মুরার মাথায় এসে পড়ল একটি ফোঁটা মাত্র। কিন্তু ছোট রাণী এই একটি মাত্র ফোঁটা পেয়েই কৃতার্থ হ'য়ে গিয়েছিলেন! তাঁর মনের সেই আনন্দের ভাব তিনি মুখে প্রকাশ করতে লাগ্লেন—'আমার কি সৌভাগ্য! আপনার মত ঋষির পাদোদক আমার মাথায় প'ড়ে আমার সকল পাপ দূর ক'রে দিয়েছে। প্রভু! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমার নারীত্বে গৌরব এনে দেয় মাতৃত্বের সৌভাগ্য'!

ঋষিও তাঁর এই ভক্তিভাব দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন, আর আশীর্ব্বাদ করলেন যে, খুব শীগ্গিরই ছোট রাণীর একটি মনের মত ভাল ছেলে হবে।

বড় রাণী সুনন্দাও ভয়ে-ভক্তিতে জড়-সড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বড় অভিমানী—স্বভাবই ছিল তাঁর গম্ভীর—তাই তিনি মুখ ফুটে কোন কথা বলেননি। ঋষি তাঁরও মনের ভাব বুঝে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরও মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে দেরী হবে না।

এর কিছু দিন পরেই ঋষির কৃপায় সুনন্দা ও মুরা দুই রাণী এক সঙ্গে গর্ভবতী হলেন। ঠিক সময়ে মুরার সত্য সত্যই একটি ছেলে জন্মাল। মা মুরার নামের সঙ্গে মিল ক'রে ছেলেটির নাম রাখা হ'ল—মৌর্য্য।

এ দিকে বড় রাণীর দুঃখের বরাত কি না—কোন কাজই তাঁর ভাল ভাবে হ'ত না। তাই তাঁর পেট থেকে বেরুল—ছেলে নয়, মেয়ে নয়—একটা প্রকাণ্ড মাংসের ডেলা! মহারাজ নন্দ ত তাই দেখে চ'টে আগুন! তিনি তখনই বড় রাণীর মাথা কেটে ফেল্বার হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস অনেক ক'রে বুঝিয়ে তাঁকে একটু শান্ত করলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন—'মাংসের পিণ্ডিটা নদীর জলে ফেলে দাও।' কিন্তু রাক্ষস তা'তেও বাধা দিয়ে বললেন—'মহারাজ! আমার আর একটা নিবেদন শুনতে আজ্ঞা হয়! যে ঋষির বরে বড় রাণীমা এই মাংসের ডেলা প্রসব করেছেন, তাঁর দৈব-ক্ষমতা ত আপনার অজানা নেই—হয়তো

হাতে প্রত্যক্ষ ফল আপনি নিজেও পেয়েছেন এই ক'দিন আগে। কত শত চেষ্টাতেও ত একটি ছেলের মুখ দেখ্‌তে পাননি এত দিন। আজ ঋষির পাদোদক মাথায় দিয়েই যে ছোট রাণীমার সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে—এ ত আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই এ মাংসপিণ্ডটা ফেল্‌বেন না। এতে হয়ত ঋষিবরেরই অসম্মান করা হবে। দিব্য-দৃষ্টিতে তিনি তা জান্‌তে পারবেনই। তখন তাঁর কোপে হয়ত আপনার নতুন বংশধরটিরও অনিষ্ট হবে—এমন কি, আপনি সবংশে নির্ব্বংশ হ'তেও পারেন। তাই আমি বল্‌ছি কি—আমাকে একবার দেখতে দিন ঐ মাংসের ডেলাটা। আমি যদি বুঝি ওটা কোন কাজে লাগ্‌বে না, তখন ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে'!

প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস ছিলেন খুব বেশী চালাক। তিনি মনে মনে বেশ বুঝেছিলেন যে, ঋষির বর কখনও ব্যর্থ হবে না—তবে হয়ত একটা অঘটনের মধ্যে দিয়ে ছেলে জন্মাবে। মহাভারতের কথা তাঁর মনে পড়ল। গান্ধারীরও ত এমনই একটা মাংসপিণ্ড পেট থেকে বেরিয়েছিল। তা থেকেই একশ' ছেলে জন্মায়। এ-ও সেই রকম হয়ত হ'তে পারে। রাক্ষসের এই আন্দাজ মোটেই মিথ্যা হয়নি। মাংসপিণ্ডটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে তাঁর মনে হ'ল যেন কতকগুলো ছোট-ছোট ছেলে ময়দার লেচি-মাখার মত এক সঙ্গে মাখা হ'য়ে রয়েছে। তাদের হাত-পা-মুখ-বুক-পেট খুব অস্পষ্ট—তবু সে সব ছাপ যে ভেতরে রয়েছে তা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। তাই তিনি কাউকে কিছু না ব'লে মাংসপিণ্ডটা নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে এসে একটা প্রকাণ্ড গামলার মত পাত্রে পরিষ্কার সর্ষের তেল ভর্তি ক'রে তাইতে ঐ মাংসের তালটা ডুবিয়ে রেখে দিলেন। রোজ রোজ নিজের হাতে তিনি পাত্রের তেল বদ্‌লে দিতেন—মাংস-পিণ্ডটাকে নরম নেক্‌ড়ায় পুঁছে রাখ্‌তেন। ক'দিন যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে ফুলের পাপ্‌ড়ি খোলার মত ঐ মাংসের তালটা থেকে ছোট ছোট শিশুদের দেহ আলাদা হ'তে লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে মাংসপিণ্ডটার জোড়গুলো সব খুলে গিয়ে ন'টি শিশুর জন্ম হ'ল। তখন রাক্ষস ছেলেগুলিকে আলাদা ক'রে ন'টি পাত্রে দুধে ডুবিয়ে রেখে দিলেন দিন দুই। তখন দেখা গেল—বাচ্ছারা হয়ত পা'-নাড়তে আরম্ভ করছে। শেষে যখন ছেলেগুলো কেঁদে উঠ্‌ল—তখন রাক্ষস তাদের ভাল ক'রে তুলো দিয়ে পুঁছিয়ে নরম তুলোর বিছানায় শুইয়ে ছুটে গেলেন রাজসভায়। মাঝে ক'দিন তিনি অসুখের ভাণ ক'রে রাজসভাতেই যাননি। দিন-রাত আহার-নিদ্রা ছেড়ে মাংসপিণ্ডটার তদারকে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে হন্তদন্ত-ভাবে ছুটে আস্‌তে দেখে মহাপদ্ম নন্দ মহারাজ চম্‌কে উঠ্‌লেন। সভায় সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—'কি মন্ত্রিবর! ব্যাপার কি'? হাঁফাতে হাঁফাতে রাক্ষস উত্তর দিলেন—'মহারাজ! বড় রাণীমাকে সঙ্গে ক'রে শীগ্‌গির চলুন আমার বাড়ী। সেই মাংসের ডেলাটা থেকে ন'টি ছেলে জন্মেছে। এখন তাদের মুখে মা'য়ের মাই-দুধ দিতে হবে—নইলে বাঁচান যাবে না'।

সভাশুদ্ধ সকলে ত অবাক্! মহারাজ, সুনন্দা, মুরা, রাজসভাসদরা সকলেই ছুটে চল্‌লেন রাক্ষসের বাড়ীর দিকে। চারি দিকে রাক্ষসের অদ্ভুত বুদ্ধির সুখ্যাতিতে 'ধন্য ধন্য' রব প'ড়ে গেল।

[ক্রমশঃ

—

গ্যারিবল্ডির বন্দী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মিলাজ্জোর যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল। দুর্গের যে ঘরটা থেকে ভূম সাগরের নীল ঢেউগুলি দেখা যায়, সেই ঘরে ব'সে গ্যারিবল্ডি তাঁ অনুচরদের নিয়ে। বহু দিন শূন্য প'ড়ে ছিল এখানকার ঘরগু ধূলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে সৈন্যরা লম্বা হ'য়ে শুয়ে রণক্লান্ত সৈনিক সব। বিশ্রামের ভয়ানক প্রয়োজন।

বেলা-তটে। গ্যারিবল্ডির ঘরের তিনটি জানলা সমুদ্রের দিকে দেখা যাচ্ছে ইটালীর ধূসর রঙের বাড়ীগুলি এবং ছোট শহর। বাংলোগু লাল টালি দিয়ে ছাওয়া এবং বাগানগুলি ফুলে ভরা—যার মধ্য দি হঠাৎ কখনো কোনো মেয়ের ভয় আর কৌতূহল মেশানো মুখ ম উঠছে। দুর্গপ্রাসাদের দেয়াল এক দিন সজ্জিত ছিল, আজ রং উ গেছে, কিন্তু তবু যে সব ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরদের লম্বা নাক আর সরু মু ছবি টাঙানো রয়েছে, তাদের চোখগুলো যেন জ্বল্‌ছে বিদ্রোহী গ্যা বল্ডির দিকে চেয়ে।

গ্যারিবল্ডি তাঁর সেনাপতিকে তাঁর কাছ ঘেঁসে বস্‌তে বল্‌লেন সাবধান ক'রে দিলেন, দেখো, চেয়ারটা যেন ভেঙে না পড়ে।

—আমরাও ত' আমাদের বিজয়ী নেতাকে ভালো আসন দি পারিনি, বল্‌লে সেনাপতি।

জীর্ণ কাঠের কেদারায় হাত বুলিয়ে গ্যারিবল্ডি বল্‌লেন—আম যোগ্য আসনই পেয়েছি! গোলাপ ফুলের শয্যা আমার জন্যে নয়।

সেনাপতি অভিবাদন জানালো। প্যালের্মো জয় হয়েছে, অনে সৈন্য ক্ষয় ক'রে। মিলাজ্জোতে আরো বেশী। তবু গ্যারিবল্ডি, যি তাঁর তরবারি নিয়ে সারাদিন যুদ্ধ করেছেন, একটুও ক্লান্ত হননি আরো দুর্গ যদি জয় করবার প্রয়োজন হত, এগিয়ে যেতেন, বিশ্রামে জন্যে এখানে বস্‌তেন না।

ইটালীর জননেতা গ্যারিবল্ডি তরুণ বয়সেই স্বদেশ থেকে নির্ব্বা সিত হয়েছিলেন রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করার দরুণ। দক্ষিণ-আমেরিক আশ্রয় নিয়ে তাদের যুদ্ধ-জয়ে তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে। রোমা রিপাব্‌লিক্ প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে আবার তিনি দেশে এসেছেন আবার যে তাঁকে বিদায় নিতে হবে তা কি তিনি জেনেছিলেন?

কাউণ্ট রমোলি তাঁর পরাজিত বন্দী। তবু তিনি মুগ্ধ নে গ্যারিবল্ডির দিকে দেখছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি শুনেছিলে সিসিলির সমস্ত অধিবাসীরা এই বিদ্রোহী বীরকে নতজানু হ'য়ে 'মুক্তিদাতা' ব'লে অভিনন্দিত ক'রে নিয়েছে। মেয়েরা ভগবানে কাছে এঁর মঙ্গল প্রার্থনা করেছে আর মায়েরা তাদের ছেলেদের এগিয়ে দিয়েছে এঁর হাতের পবিত্র স্পর্শ নেবার জন্যে। ব্রেজিলের অরণ্যে নদীতীরে এঁর কত না বীরত্বের কাহিনী, সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি আ জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প মুখে মুখে প্রচারিত হ'য়ে গ্যারিবল্ডি নামকে তাঁর জন্মভূমিতে বিখ্যাত আর রহস্যময় ক'রে তুলেছে—কাউণ্টের মনে পড়লো। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন

গ্যারিবল্ডির কথায় তাঁর চমক ভাঙ্‌লো—আপনি আমার বন্দী কিন্তু নেপল্‌স্ থেকে হুকুম না আসা পর্য্যন্ত আপনি আমার অতিথি।

কাউণ্টের সাদা মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে গেল। সত্যিই ত বিজ কাউণ্ট আজ বিদ্রোহী গ্যারিবল্ডির বন্দী, যাকে তিনি দেশ থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন।

—ধন্যবাদ জেনারেল, বললেন তিনি রুক্ষ স্বরে। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, এক বার আমি আমার সৈন্যদের দেখে আসি।

—সৈন্যদের দেখে আসবেন? গ্যারিবল্ডির মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল। তার পরেই ফুটে উঠলো উজ্জ্বল হাসি। তিনি উঠে কাউন্টের হাত ধ'রে বললেন—মনে করেছিলাম, শান্তির মধ্য দিয়েই আমি অভীষ্ট লাভ করব বিনা রক্তপাতে। তা হয়নি, অনেক রক্তক্ষয় হ'য়ে গেল। দোষ আমারও নও, আপনারও নয়, যুদ্ধ বাধিয়ে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় দোষ সেই সব শয়তানদের। যান আপনার যেখানে খুসি। আসবেন আপনি যখন খুসি! কিন্তু ভুলবেন না, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খেতে বসব—রুটি আর মদ আর খানিকটা ঝোল। সামান্যই উপকরণ, তবে আমার মতন দুর্দান্ত ক্ষিদে যদি আপনার হয়, ভালো লাগতেও পারে।

কাউন্টের কথা জড়িয়ে এলো, তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, খাপ থেকে তরোয়াল খুলে টেবিলের ওপর রেখে তিনি বললেন—আমার হাতিয়ার জামিন রেখে গেলাম, শপথ ক'রে বলছি আমি পালাব না, সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব।

গ্যারিবল্ডি লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন।

তরোয়ালটি তুলে নিয়ে কাউন্টের কোমরবন্ধের খাপে সযত্নে পুরে দিলেন।

—আমরা দু'জনেই ভদ্রলোক এবং পরস্পরের বন্ধু। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন গ্যারিবল্ডি—এখানে জামিনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পাথর-খুদে বার করা অসমতল সোপানশ্রেণী ধরে টলতে টলতে কাউন্ট নেমে গেলেন, চোখে তাঁর জল টলটল করছিল—বিদ্রোহী গ্যারিবল্ডি তাঁকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছেন। দেশের রণক্ষেত্রে তাঁরা দু'জনেই শত্রু দু'জনের, কিন্তু অন্তরের শান্তি-রাজ্যে অন্তরতম বন্ধু চিরদিনের।

জননেতা গ্যারিবল্ডির পূজা কেন ইটালীর ঘরে ঘরে, আজ তিনি বুঝতে পারলেন।

গৃহ-শিল্পী

যাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো-পাখা আছে, তারা জানে, সে আলো-পাখার তার ফিউজ হইলে কি অসুবিধায় পড়িতে হয়। তখনি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ডাকা চাই; নহিলে পাখা চলিবে না, আলো জ্বলিবে না। অথচ ফিউজ-তার ঠিক করিয়া লওয়া শক্ত নয়। এ কাজটুকু বাড়ীর ছেলেমেয়েদের শিখিয়া রাখা উচিত। শেখা থাকিলে এই সামান্য বিপত্তিতে পরের উপর নির্ভর রাখিতে হয় না। ইলেকট্রিক তারের সম্বন্ধে এ-জ্ঞান থাকা এযুগে যেমন আবশ্যক, তেমনি ছোট-খাট আরো যে নানা ব্যাপার সংসারে ঘটে, সে সবের সম্বন্ধে ছোট বয়স হইতেই শিক্ষার প্রয়োজন। এমনি কয়েকটি বিপত্তির কথা বলিতেছি।

কালির দোয়াত উলটাইয়া গেলে জামা-কাপড়, টেবল-ক্লথ, বিছানার চাদর নোংরা হয়। কাচিতে দিলেও ধোপা অনেক সময় জামা-কাপড়ের সে-দাগ তুলিয়া দিতে পারে না; তার ফলে জামা-কাপড় প্রভৃতির এমন চেহারা হয় যে গায়ে দিয়া ভদ্র-সমাজে বাহির হওয়া দায়! অথচ এই কালির দাগ অতি-সহজে মুছিয়া বিলুপ্ত করা চলে। বাজারে ব্লীচিং পাউডার পাওয়া যায়। এক-পেয়ালা জলে খানিকটা ব্লীচিং পাউডার মিশাও; সঙ্গে সঙ্গে আর-এক পেয়ালা জলে সাধারণ সোডার গুঁড়া (ওয়াশিং সোডা) ঢালিয়া গোলো। তার পর দুই পেয়ালার জল তৃতীয় পেয়ালায় ঢালিয়া মিশাও। মিশাইয়া দশ-পনেরো মিনিট পরে এই মিকশ্চারটুকু পরিষ্কার ব্লটিং-কাগজে বা পাৎলা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লও। এই ছাঁকা জলে কালির দাগ-লাগা অংশটুকু ঘষিয়া ধুইয়া লইলে কালির রেখা নিশ্চিহ্ন হইবে। আর একটি সহজ উপায় আছে,—তুল্যাংশে নাইট্রিক এসিড ও পোটাসিয়াম-বাইটারট্রেট (ক্রীম অফ টার্টার) মিশাইয়া লও। মিশাইলে এ-জিনিষ হইবে খড়ির গুঁড়ার মত। তার পর একটি এনামেলের বা এলুমিনিয়ামে প্লেট তাতাইয়া কাপড়ের যে-অংশে কালি লাগিয়াছে, সেই অংশটুকু জলে ভিজাইয়া তাতানো প্লেটের উপরে রাখো: রাখিয়া কালির দাগে ঐ গুঁড়া ঘষো, তাহা হইলে কালির দাগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে। কালির দাগ উঠিয়া গেলে ভালো জলে কাপড় বা জামা কাচিয়া লইয়ো। ব্লীচিং পাউডারের মিকশ্চারে শুধু কালির দাগ নয়, জামা-কাপড়ে যদি ফলের দাগ, লোহার কষানি বা খয়েরের দাগ লাগে তো সে সব দাগও মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে।

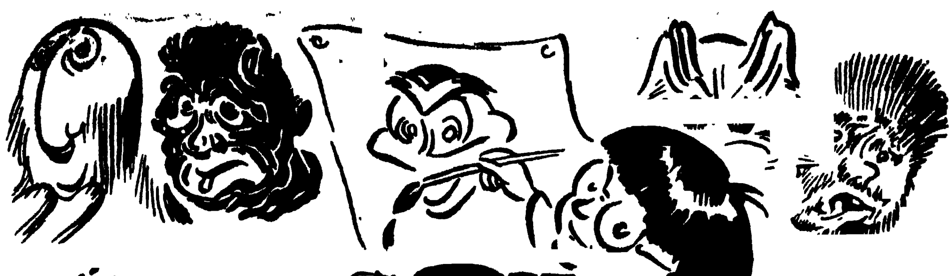
জামা-কাপড়ে পোড়া-দাগ ধরিলে সামান্য একটু পোটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেটের সঙ্গে হাইড্রোজেন-পেরক্সাইড মিশাইয়া সেই মিকশ্চারে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহা দিয়া ঘষিলে দাগ মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে।

চীনা-মাটির ডিশ পেয়ালা প্রায় ভাঙ্গে। ভাঙ্গিলেই তাহা ফেলিয়া দিয়ো না—ভাঙ্গা ডিশ-পেয়ালা বেমালুম জোড়া চলে। জুড়িবার জন্য খানিকটা সাদা-খড়ির গুঁড়া লও। তার সঙ্গে খানিকটা সোডিয়াম-সিলিসেট-সলিউসন মিশাইয়া ঘুঁটিয়া লইলে ঘন কাইয়ের মত হইবে। ডিশ বা ভাঙ্গা পেয়ালার গায়ে এই কাইয়ের প্রলেপ লাগাইয়া লাইনে-লাইনে চাপিয়া ধরো—কাইয়ের আঠায় সম্পূর্ণ আঁটিয়া জুড়িয়া যাইবে। ডিশ-পেয়ালার গায়ে যদি আঠা লাগে তো ভিজা ন্যাকড়া বুলাইলে সেটুকু মুছিয়া যাইবে। তার পর এই জোড়া পেয়ালা-ডিশ দু'দিন রাখিয়া দিয়ো—ব্যবহার বা ঘাঁটাঘাঁটি করিবে না। দু'দিন পরে আস্ত অটুট ডিশ-পেয়ালার মতই এ ডিশ-পেয়ালা ব্যবহার করিতে পারিবে।

জামা-কাপড়ে আয়োডিনের দাগ লাগিলে একটি টিউবে কিম্বা গ্লাসে হাইপো-মিশ্রিত জল ভরিয়া আয়োডিনের দাগের উপর ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিয়ো—হাইপো-জল লাগিবামাত্র আয়োডিনের দাগ বেমালুম মুছিয়া যাইবে।

লেবেল, খাম প্রভৃতির জন্য ময়দার কাইয়ের আঠা আমরা ব্যবহার করি। সে-আঠার কাজ হয় একটু জ্যাবড়া। ভালো আঠার জন্য একটু গাম-আরেবিক (gum arabic) বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া জলে গোলো। জলে বেশ গুলিয়া গেলে সেই জলে মিশাও এক-ছিটা ষ্টার্চ চূর্ণ করিয়া এবং সেই সঙ্গে ছোট চামচের এক-চামচ চিনি। এক-সঙ্গে গুলিয়া মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লও। সিদ্ধ করিলে ষ্টার্চ গলিয়া জলে মিশিয়া যাইবে। এই মিকশ্চারে সরকারী খামের আঠা তৈয়ারী হয়! এ আঠা যেমন কায়েমি, তেমনি সৌখীন।

যে-সব রাসায়নিক দ্রাবক বা চূর্ণের কথা লেখা হইল, এগুলি খুব দামী নয় এবং বাজারে পাওয়া যায়। এ কাজে শুধু যে সংসারের উপকার হইবে তা নয়, এ কাজ করিতে খুব আনন্দ পাইবে।



আঁকতে পারো ভূতে ?

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

খ্যাঁস্ খ্যাঁস্ কাগজেতে টানলে কি ছবি হয় ?
দেখে যাক বেরসিক ছবি আঁকা কারে কয় ।
কালি আর রং তুলি ধরা বেশ শক্ত,
কালি মেখে ভূত সাজে যারা ছবি ভক্ত ।

ভক্তেরা হরদম বসে কেন রবাবে
পটুয়ার কাজ কি এ ? বোঝাবো তা সবারে ।
দিন-রাত কসরং দিন-রাত ভাবনা
হয়রাণ হয়ে ভাবি খাবো কি না খাবো না ।

সাধনায় সিদ্ধি বলে শুধু বোকারা
সিদ্ধির সরবৎ খায় বুড়ো খোকারা ।
দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে খাবি খায় শকুনি
ছাতে বসে ছবি আঁকি, খাই খাব বকুনি ।

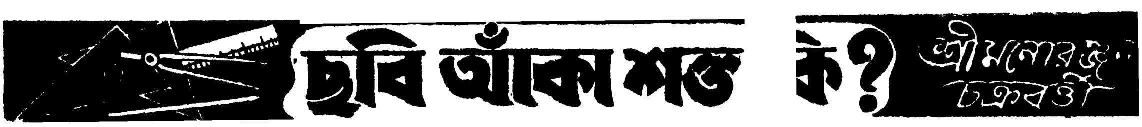
বিদ্ঘুটে বাতাসের ছম্ছম্ আওয়াজে
খাঁ খাঁ করে মাঠখানা মেতে যাই রেওয়াজে ।
খ্যাস্ করে টেনে যাই মশগুল আবেশে
যস্তুত চরে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে ।

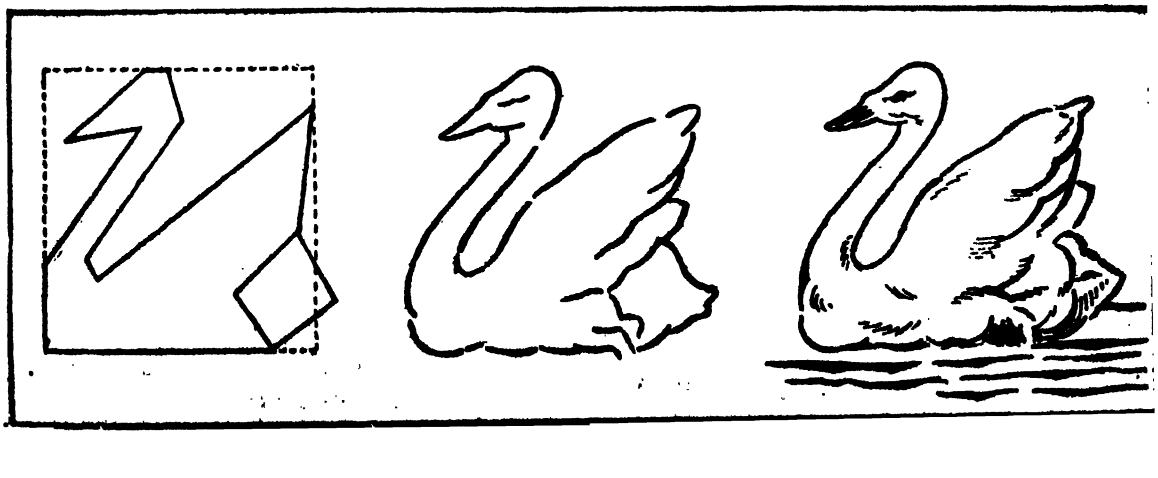
এঁকে ফেলি যস্তুত লিক্লিকে চেহারা ।
পাঁকাটির খাঁচা নিয়ে ওড়ে যেন বেহারা !
তার পর অদ্ভুতে এঁকে ফেলি পোঁচড়ে
অদ্ভুত ভূত নয়, মুড়ি খায় কোঁচড়ে ।

কিম্ভূত হেসে ফেলে তবু চোখে জল তার
বিচ্ছিরি মুখখানা তেঁতো খেয়ে পলতার ।
লোম্ভূত লোমে ভরা কাঁদ কাঁদ চাহনি
এঁকেছি তা হুবহু, দেখেছ কি দ্যাখনি ?

মোম্ভূত মোলায়েম পিছলেই সরে সে
ব্যাঙাচির ভক্ত ল্যাজ দিয়ে ধরে সে ।
রোম্ভূত বোম্ বলে বোমা যেন ফাটালে
হেঁচে হেঁচে নাজেহাল, খুসী হয় কাঁটালে ।

আরও কত ভুতেদের ছবি আঁকি কাগজে
কিনবে কি থান ছুই ? ঢুকবে কি মগজে ?

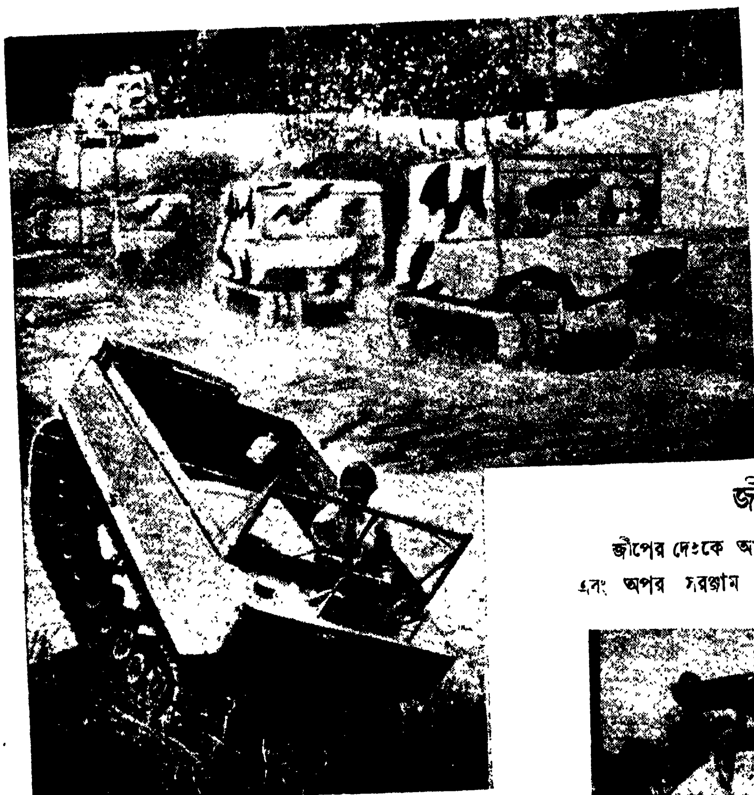




বিজ্ঞান জগৎ

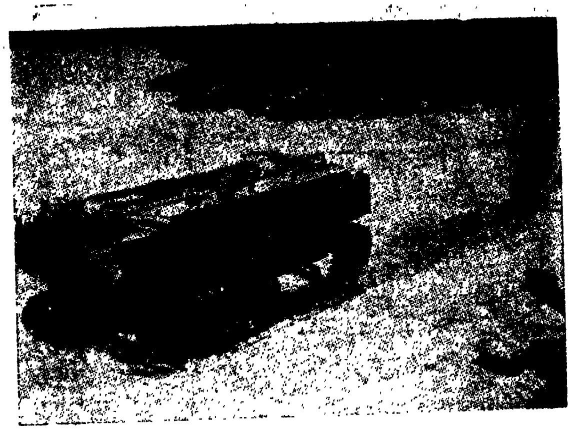
শিবাঃ পন্থানঃ

এবারকার এ মহাযুদ্ধ পৃথিবীর সকল দিক্, সকল প্রান্তকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে ! ইহার বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও বহ্নি-



বরফ ভাঙ্গিয়া চলা ; খাড়াই-পথে নামা

জ্বালা হইতে কোনো দেশ, কোনো মহাদেশের মুক্তি নাই। অভিযান চলিয়াছে গিরি-পর্ব্বত বহিয়া, জলা-জঙ্গল ফুঁড়িয়া, কর্দ্দম-তুষারের স্তূপ ভাঙ্গিয়া—সে-অভিযানকে অবাধ-অব্যাহত এবং অমোঘ করিবার জন্ত মানুষের সাধনারও সীমা নাই। এই সাধনার সাফল্য-স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে "এম-২৯" মডেলের নূতন বিদ্যুৎ-বাহন। তার নাম উইশ্‌ল গাড়ী। লোকজন এবং রসদপত্র বহিবার জন্ত এ-গাড়ীর সৃষ্টি। এ গাড়ী পঙ্ক-কর্দ্দম, গিরি-গহ্বর, তুষার-স্তূপের বাধা মানে না ; সে-সব বাধা



রশি ধরিয়া গাড়ী টানা

চলে। এ গাড়ীর বড় বড় মোটা চাকা রবার প্যাডে মণ্ডিত ; ওজন লঘু। পথ চলিতে সাধারণ গাড়ীর যে চাপ পথের বুকে পড়ে, এ গাড়ীর চাপ তার সিকি ভাগ। তাছাড়া পঙ্ক-কর্দ্দমে চাকা পুঁতিয়া গাড়ী অচল হইলে ড্রাইভার অনায়াসে নামিয়া 'রশি' টানিয়া গাড়ীকে সচল করিতে পারে। তুষার-স্তূপে গাড়ী চাপা পড়িলে ড্রাইভারের কোন আশঙ্কা নাই। গাড়ীর মাথায় ক্যাম্বিশের আবরণ আছে। ছয়-সিলিণ্ডার ষ্টুডিবেকার-এঞ্জিনে এ গাড়ীর প্রাণ-শক্তি !

জীপের ক্রমোন্নতি

জীপের দেহকে আকারে বাড়াইয়া সে-দেহে আরো দু'খানি চাকা এবং অপর সরঞ্জাম আঁটিয়া নব-রূপে তাহাকে অগ্নি-নির্ব্বাণের



অগ্নি-বারণ-রূপী জীপ

কাজে আজ অব্যর্থ সহায় করিয়া তোলা হইয়াছে। বর্দ্ধিত

রাধার সঙ্কুচিত ভাবে সুদীর্ঘ মই ; এবং বাক্সে গ্যাস-মুখোশ, বৈদ্যুতিক গঠন, আসবেষ্টশের তৈয়ারী অঙ্গাবরণাদি সংরক্ষিত থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্কেত পাইবামাত্র এ-জীপ চকিতে গিয়া সে-আগুন নিবাইতে পারে।

সংহার ও স্থিতি

এত কাল হেলিকোপটারের কাজ ছিল শুধু সংহার-লীলা-সাধন। সম্প্রতি 'এক্স্ আর ৫' মডেলের যে নূতন হেলিকোপটারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দুই রূপ ধারণ করিতে পারে। প্রথম রূপে সংহার-সাধন—



হেলিকোপটারের নব পর্য্যায়



• হেলির বুকে হাসপাতাল

দ্বিতীয় রূপে আহতদের সেবা-পরিচর্য্যা। নব-নির্ম্মিত হেলিকোপটারের শক্তি-সামর্থ্য ও গতিবেগ বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। গতিবেগ এখন হইয়াছে ঘণ্টায় ১২০ মাইল। পঞ্চাশ ফুট খোলা জমি পাইলেই এ হেলিকোপটার অনায়াসে সেখানে নামিয়া দেহকে অক্ষত রাখিতে পারে। বুকের মধ্যে চার জন আহতের যোগ্য শয্যা এবং পরিচর্য্যাদির রশদ-সংস্থান, অস্ত্রশস্ত্র, পাইলট প্রভৃতি লইয়া এ হেলিকেপটার প্রায় চৌদ্দ মণ ওজনের ভার বহিয়া গতিবেগ স্বচ্ছন্দ রাখিতে সমর্থ!

মশা-মাছি-নিপাত

বৈজ্ঞানিক-সাধনায় মার্কিণ আজ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধির বীজাণু-নিপাত-কল্পে ডিমেথিল ফথালেট নামে বর্ণহীন এক রাসায়নিক দ্রাবক তৈয়ারী করিয়াছে। কাপড়-চোপড়ে ও বিছানাপত্রে পিচকারী-ধারায় এ দ্রাবক দু'-তিন আউন্স মাত্র ছিটাইয়া দিলে মশা-মাছি বা কোনো রোগের বীজাণু সে সবের কাছে পাঁচ দিন ঘেঁষিতে পারিবে না; গায়ে এ দ্রাবক মাখিলে ছয় ঘণ্টা কাল দুষ্ট কীটপতঙ্গ বা বীজাণুর আক্রমণ-ভয় থাকিবে না। এ দ্রাবক সৃষ্টি করিয়াছে আমেরিকার ডুপণ্ট কোম্পানি।

বিমান-নির্দ্দেশ

বিপক্ষের বিমান আসিতেছে কি না, সে-সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে জানিবার জন্য হিটলার এক অমোঘ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে! এক অতিকায় যন্ত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে একটি ম্যাগনেটিক-ডিটেক্টর সংলগ্ন করা হইয়াছে। তাহা হইতে আকাশে অতি তীব্র আলোক-রশ্মি ফেলিয়া আসন্ন বিমানের অবস্থান জানা যায়। বিপক্ষ-বিমানের পক্ষ-চালনার ধ্বনি অতি ক্ষীণ ধারায় কাণে বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রে স্পন্দিত হইবার বহু পূর্ব্বেই উক্ত আলোর ধারায় তাহার অবস্থান সঠিক নির্দ্ধারণ করা

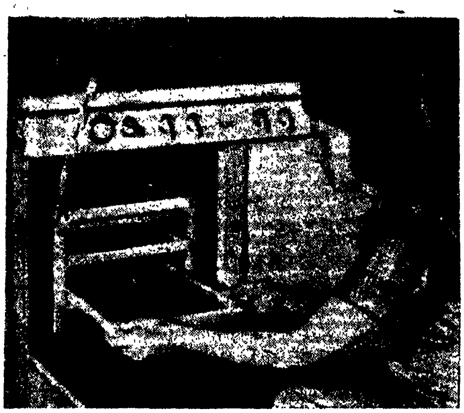


জার্ম্মানির বিমান-সন্ধান

সম্ভব হইয়াছে। এ যন্ত্রটি বিপক্ষ-গতি-প্রতিরোধে হিটলারের আজ প্রধান সহায়।

খাদ্য-সার-রক্ষা

দীর্ঘকাল মজুত রাখা এবং বহু দূরদেশে পাঠানোর জন্য খাদ্যাদি হইতে জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত করিয়া সেগুলিকে ডী-হাইড্রেট করা হইতেছে। ডী-হাইড্রেট করার ফলে খাদ্যের সারাংশ সম্পূর্ণ ভাবে যেমন রক্ষা পায়, তেমনি দু'-চার বছর সে খাদ্যকে তাজা রাখা চলে। এই রীতিতে ফলমূল মাছ-মাংস প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্যই ফৌজের জন্য বা ব্যবসায়ের জন্য যেমন সুদূর দেশে পাঠানো সম্ভব হইয়াছে, তেমনি খাদ্যগুণের এতটুকু অপচয় ঘটিতেছে না। এ রীতিতে খাদ্যের ক্ষয় নাই, অপচয় নাই। গৃহস্থ-ঘরেও যাহাতে এ রীতি অনুসৃত হইয়া খাদ্য-সার রক্ষা পায়, সে জন্য 'হার্ড-উড' জাতের কাঠে 'ডী-হাইড্রেট' যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। গ্যাসের, তেলের, কয়লায় বা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এই নূতন ডী-হাইড্রেট যন্ত্র ব্যবহার করা চলে। তিনখানি ড্রাইং

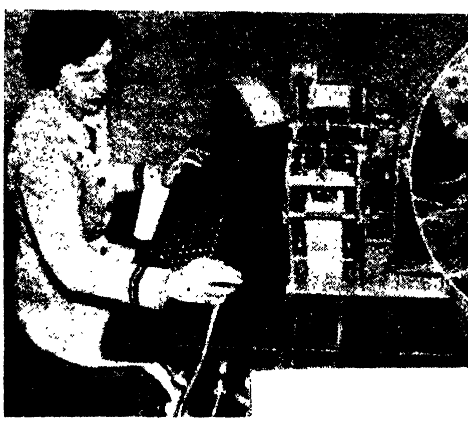


খাত্ত-সার-সঙ্কলনী যন্ত্র

ট্রে সুকৌশলে আগুনের আঁচে বসাইতে হয়। কি ভাবে এ যন্ত্র ব্যবহার করিতে এবং খাত্তাদি তৈয়ারী ও সংরক্ষণাদি করা হয়, সে সব বিবরণ পুস্তিকাকারে যন্ত্রের সঙ্গে পাওয়া যায়।

গণিত-যন্ত্র

হার্ভার্ড বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক আইকেন এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটি দেখিতে টাইপ-রাইটার যন্ত্রের মত—



অঙ্ক-কষা যন্ত্র



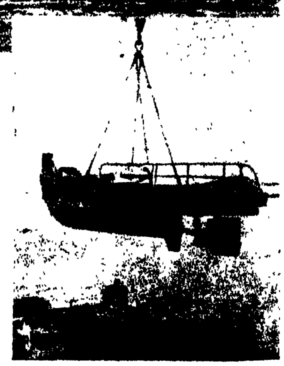
বন্ধ রেখায় অঙ্ক-লেখা

দৈর্ঘ্যে ৫১ ফুট, এবং উঁচুতে ৮ ফুট। যন্ত্রটিতে ৫০০ মাইল দীর্ঘ সরু তার সংলগ্ন আছে; তার উপর অঙ্ক যোগ করিবার ছোট ছোট ৭২টি মেশিন সংযুক্ত আছে। সংখ্যা-লেখা বোতাম টিপিলে প্রয়োজনীয় অঙ্কগুলি যন্ত্রে আঁটা কাগজে রন্ধ রেখায় প্রতিলিখিত হয়; তার পর সংখ্যা-লেখা বোতাম টিপিয়া যান, যন্ত্রে নির্ভুল যোগ-ফল ছাপা হইবে। এ-যন্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্ক নির্দ্ধারণ হইতে বীজ-গণিতের যে-সব সমীকরণ আজ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়াছে, সে সবের সহজ এবং অনায়াস সমাধানে এতটুকু ত্রুটি থাকিবে না।

জাহাজ না বিড়ালছানা!

বার্ম্মিংহাম ইঙ্গল্‌স্ আয়রণ ওয়ার্কস কোম্পানি এক-জাতের 'জল-জীপ' তৈয়ারী করিয়াছে। এ জীপ 'টাগ'-বোটের কাজ করিতেছে অর্থাৎ জখমী সাগর-প্লেন বা জাহাজ নিষ্ক্রিয় অচল হইলে সেগুলিকে বিড়াল যেমন টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলাইয়া তার শাবককে বহন করে,— তেমনি ভাবে ঝুলাইয়া বহিয়া ইংলিশ চানেল পার করিয়া বন্দরে





বাহন জীপ

লইয়া আসে। টাগখানি লম্বে ৪২, উচ্চতায় ১৫ ফুট; ২৫০ অশ্ব-শক্তিযুক্ত ক্রাইশলারমেরিন এঞ্জিন টাগখানিতে সংলগ্ন আছে; সেই এঞ্জিনের শক্তিতে টাগ চলে। এক জন মাত্র লোক এঞ্জিন চালাইয়া টাগে প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ। এমন শক্তিশালী ও সহজে চালু টাগ-বোট পৃথিবীতে আর নাই।

"মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃ-স্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রেম যে চুপে চুপে

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

টাকা যাঁরা করেছেন তাঁদের মুখেই শোনা টাকা করার চেয়ে রাখা শক্ত'। 'লক্ষ্মী চঞ্চলা' এ কথাতেও তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু এ অপবাদটা লক্ষ্মীরই এক-চেটিয়া নয়। প্রেমের দেবতাও বড় কম চঞ্চল নয়। বিবাহিত মাত্রেই আমার কথায় হয়ত সায় দেবেন এবং তা দেবেন ঠিক স্ত্রীর অসাক্ষাতেই। অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, দৈবাৎ-পাওয়া প্রেম শুধু কেন, কষ্টার্জ্জিত প্রেমও স্থায়ী হওয়ার পক্ষপাতী নয়—যেটুকু সময় সে টিকে থাকে তা যেন নেহাৎ অনিচ্ছায়—ঘুষ নিয়ে বললেও ভুল হয় না। লজেঞ্চ হাতে গুঁজে শিশুকে আটকে রাখার মত। লজেঞ্চের ষ্টকের দিকেই তার দৃষ্টি থাকে পড়ে, ওটি ফুরোবার সঙ্গেই তার নোটিশ-না-দেওয়া অন্তর্ধান।

যার চলে যাওয়ার পথের দিকেই শুধু চোখ পড়ে থাকে, সে যখন হঠাৎ এসে পড়ে চমকে দেওয়ার কায়দায় বাধাবন্ধহীন দমকা হাওয়ার মত, তখন কিন্তু একসঙ্গে কয়েক হাজার রজনীগন্ধা ফুটে ওঠে—একসঙ্গে কয়েকটা কোকিল ডেকে ওঠে। ঘড়ির কাঁটাগুলো সময়ের সব কটা ঘরকেই অভিসার-মুহূর্ত্ত বলে ঘোষণা করতে থাকে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, টেলিফোন, দর্শন শুভলগ্নের অপেক্ষা করে মাত্র! তরুণ-তরুণীর উচ্ছ্বাস-উদ্বেল মানস লোকের কাহিনী সে—কাব্যের উপাদান সে।

উচ্ছ্বাসের মেঘ সরিয়ে আসুন উঁকি দিয়ে দেখা যাক লজেঞ্চ-প্রিয় শিশুটি কেমন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত মনে। আরও স্পষ্ট দেখুন



উপহারের উপসংহার

নায়ক কেমন শিকারী বলে নিজেকে ধরে নিয়েছে, সে নায়িকাকে সেই যে সে দিন একপাল আত্মীয়ের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সিনেমার কোটরে ঢুকেছিল। একেই সে শিকারের স্তরে তুলে ধরতে চায়।

আরও এক দিনের কথা, যে দিন সে নায়িকাকে অনেক খুঁজে বার করে নম্বর হারানো বাড়ীর ঠিকানা থেকে, তার পর তার মনোযোগ টানবার অভিপ্রায়ে তাকে কত কি উপহার দিতেও সে ছাড়েনি। সর্ব্বদাই একটা স্থায়াই হারাই ভাব তাকে নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি।

বেশীর ভাগ পুরুষের ইতিহাস এ রকম হলেও সব ক্ষেত্রে নয়। মেয়েদের মনেও শিকারীর চোখ আছে যা খুঁজে নেয় বেছে নেয় —গড়ে নেয়—তার পর নিশ্চিন্ত আরামে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে, গা ভাসিয়ে দেয়। মেয়েরা যে দড়ি দিয়ে টানে সেটা সূক্ষ্ম ক'রে পাকানো, শক্ত, অথচ দেখা যায় না; পুরুষের দড়ি কাছির মত শক্ত ও স্থূল, টানতে হ'লে তার ভারটাও বইতে হয়, চোখেও পড়ে সহজে। মেয়েরা তাই সূক্ষ্মতার আড়ালে সুতো ধরে আছে কি না বোঝা যায় না, অবশ্য না ধরার ভাণই তারা করে বেশী।

দাম্পত্য প্রেমে এমন দেখা যায়, স্ত্রীই বাঁচিয়ে রাখে প্রেমকে জমে হিম হয়ে যাওয়া থেকে। এ ঐ সূক্ষ্ম সুতালি আকর্ষণেরই গুণে। তার পক্ষে অভিনয় করা সহজ, ছলা কলা তাকেই সাজে তাই। স্বামীকে সে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারে আবার নাড়া দিয়ে সচেতন করতেও পারে সময় বুঝে আবার সরে গিয়ে রহস্যের অবগুণ্ঠন টেনে নিতে পারে। সত্যি কথা—তার এগিয়ে আসা ও পেছিয়ে যাওয়া, তার ঝংকার তুলেই পর্দ্দা বদলান এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার এগিয়ে আসাকে সংযত করে তার পেছিয়ে যাওয়া। তার দাক্ষিণ্যের সূচনাতেই কার্পণ্যের কষাকষি প্রেমকে অটুট করে। ধরা দিতে এসে অধরা হয়ে পড়া শুধু অধর সম্পর্কেই নয় অন্য বিষয়েও রোমাঞ্চকর, সন্দেহ নেই।



সুতোলি টান

বলা বাহুল্য, নায়িকা-ভেদে যে এ রীতির তারতম্য ঘটে তা সহজেই ধরা যায়। অতি সুন্দরী মেয়ের কাহিনী সাধারণী বা অরূপার থেকে স্বতন্ত্র। সুন্দরীদের মধ্যেও যে শ্রেণী-ভাগ বহু ভাবেই করা হয় তাতেও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। যে সুন্দরী বহু জনের দৃষ্টিপথে অনিবার্য্য ভাবে ফুটে ওঠে তার কাছে অযাচিত ভাবেই এসে পড়ে হাজার প্রণয়ীর বা প্রণয়বাদীর অজস্র সম্ভাষণ। তাকে কেন্দ্র করে বহু দূর-দুরান্ত অবধি কলগুঞ্জন চলে—না তার জোটে সব—হাত না বাড়াতেই তার করপুট ভরে যায়। তাই সে ব্যর্থ করে যত বেশী সার্থক করে অনেক কম।



কার্পণ্যের কষাকষি

সাধারণী বা অরূপাদের বেলা কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। তাদের চৌর্য্য প্রয়োজন হয়। নিজের সম্বন্ধে ছোট ধারণা বেশ সজাগ থাকতে তাদের প্রয়োজন হয় অন্যান্য গুণপনার চর্চ্চা করতে। শিকারের দিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয় কিছু বেশী। এই জন্য একটি হিতোপদেশ বলে, অতি সুন্দরী নারী স্ত্রী হিসাবে বাঞ্ছনীয় নয়। এটা সুন্দরীদের প্রতি অবিচার বা পক্ষপাত নয়, আত্ম-সৌন্দর্য্যবোধ তাকে অতি সচেতন রাখে যার জন্যে তার পক্ষে হেঁট হওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।



এপ্রিল হওয়ার নমুনা

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে প্রেমের ব্যাপারে স্বকীয় পরকীয় যাই হোক নারীর অতি খোলাখুলি হওয়া চলে না। তার রহস্য-লোকের সবটুকু পুরুষের কাছে উন্মুক্ত করা বুদ্ধি-সঙ্গত নয়। নিজেকে পুরানো হ'তে দেওয়া আর নিজেকে প্রেম-জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত করা একই কথা। তার অন্তর্জ্জগতের সঞ্চয় ও সাধনা গোপনেই যেন থাকে যা থেকে মিতব্যয়ীর মত কিছু কিছু ভাঙ্গিয়ে সে খরচ করতে পারে।

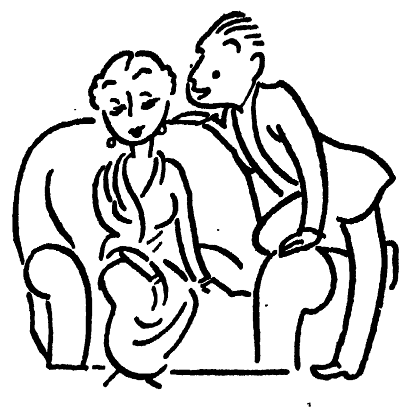
মেলা-মেশার প্রথম পদক্ষেপেই পুরুষের উদগ্র কামনা হয় নারীকে চিনে নেবার। আদম থেকেই ঈভের উৎপত্তি হলেও আদমের চিরন্তন প্রয়াস ঈভকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখে নিতে। নারীকে চেনা জানার এই কৌতূহল প্রণয় ব্যাপারে একটি মূলধন। তার দৃষ্টিকে সে বিশ্লেষণ করতে চায় তার হাসিটিকে সে কালো পাথরে ঘষে পরখ করে। আবার এমন পুরুষ আছে নারীকে যে তার সংসারে ডালা কুলোর মত একটি জীব বলে মনে করে। এ রকম লোককে নিয়েই হয় মেয়েদের মুস্কিল—তাদের কাছে মেয়েদের অন্য পন্থার শরণ নিতে হবে, তার পর ধীরে তার গতজীবনে সুখ সৃষ্টি করতে হবে। আমি জানি, বিবাহিত জীবনে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

নরনারীর অন্তর্নিহিত এই রহস্যলোক নিয়েই প্রণয়ের আয়ু-নির্দ্দেশ। 'বিবাহ প্রেমের সমাধি' কথাটি মিথ্যা নয় এই দিক দিয়েই। একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর কাহিনী জানি। প্রাক্-বিবাহ প্রণয়ের কথাই বলছি। ছেলেটি তার প্রিয়তমার চিত্ত জয় করেছিল ঠিকই; কিন্তু তার অশান্ত উচ্ছাস আর প্রগল্ভ প্রণয় নিবেদন মেয়েটিকে প্রায় উত্যক্ত করে তুলতো। সে সময়ে অসময়ে জানিয়ে দিত কত ভালবাসে তাকে। সে বলে যায়···তোমায় আমি কত ভালবাসি প্রাণের রাণী···আমার জীবনে তুমি না তোমার সঙ্গ চাই তোমায় চাই। তার পর আরও গাঢ় স্বরে বলে 'তোমায় আমি সত্যিই ভালবাসি'।

'আঃ, তোমার সেই একঘেয়ে কথা'। কত আর শুনবো? মেয়েটি বিরক্ত না হয়ে পারে না। শেষে এক দিন তার ঘনিষ্ঠা এক সখিকে সে সমস্যার কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস্ করে বসলো। বলতে পারিস ভাই, এত ভালবাসা থেকে ওকে কি ক'রে থামান যায় —ক'দিন ধরে আমি ত আর শুনতে পারি না?

'এ আর কি?' সখি গম্ভীর ভাবে বল্লে, খুব সোজা কাজ·এটা, তুই ওকে বিয়ে ক'রে ফেল, আর কিছু করতে হবে না।

সখিটি বেশ অভিজ্ঞা এবং বিবাহিতা বলেই অবশ্য মনে হয়। বিবাহের নামে এটি দুর্নাম হ'লেও—কথাটা অমূলক নয়।



সেক্সপিয়ার একটা শ্লোকে বলেছেন,

Men are April when they woo
December when they wed.

বিবাহিত জীবনের পরিণতি ভেবে শিউরে ওঠার প্রয়োজন নেই। কোনও কথাই নিছক সত্যি হ'তে পারে না। আমি এমন লোক দেখেছি, চল্লিশোর্দ্ধেও বধূকে সে নববধূর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করে, অথচ তা বেমানান নয়, আন্তরিকতার রসস্রোতে সম্পূর্ণ অভিষিক্ত।

আমাদের দেশের বিধানে তাই মানুষকে ডিসেম্বর হতেও বলেনি আর এপ্রিল হ'তেও বলেনি—সব সময়েই আগষ্ট থাকলেই বোধ হয় ভাল হয় (?)। মেয়েদের দৃষ্টিতে অনেক সময় তাকে মনে হয়েছে সে যেন বাড়ীর বাগান থেকে ডালা ভর্ত্তি করে তুলে আনা সজ্জি কিম্বা বেগুন পুরুষ প্রয়োজন হিসেবে মেয়েদের তুলে আনতে চায় —তার মধ্যে বেছে নিতে চায়, দরকারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে ফেলে দিতেও কুণ্ঠিত নয়। সৌভাগ্য বলতে হবে এরকম পুরুষের সংখ্যা বেশী নয়। তবে অন্য দিকও আছে যে দিক দিয়ে তাকালে আর একটা জিনিষ চোখে পড়ে।

ফুল অনেক রকম আছে তার মধ্যে সজনে ফুলও একটা। সজনে ফুলের প্রয়োজন শুধু আমাদের পাক-ঘরে, কিন্তু বেল বা গোলাপের প্রয়োজন অন্যত্র। তারা এসে হাজির হয় আমাদের পরিপাটি করে সাজানো ড্রইং-রুমে। মানুষের পাক-ঘর বা ড্রইং-রুম কোনটাকেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। পাক-ঘরে বেশী থাকা মানে অজীর্ণতার

গায়ে চাপানো। এ-হেন দুই আসন্ন বিপদের ধাক্কা বাঁচিয়েই তাকে চলতে হয়—পড়ে যাওয়া থেকে সামলে সরু একগাছি দড়ির ওপর দিয়ে সার্কাস-গার্লএর চলা-বিশেষ। পতনোন্মুখ হওয়ার মুখেই তার যা কিছু কসরৎ। নমুনাও দুর্লভ নয়—যথা, এক গোলাপজাতীয় নববধূ ড্রইং-রুমেই অধিষ্ঠিতা ছিল এক দিন। ফুলের vaseএ না হলেও শব্দসঙ্গীতে ভাসমান অবস্থায়। সেতারধারিণী ঝিনিঝিনি-নাদিনী সে এক মোহিনী মূর্ত্তি তার। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার জমাট হয়ে রাত্রির অবগুণ্ঠনে পরিণত হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা তখনও ঠিক সাড়ে ন'টার ঘরে যায়নি। সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহটি টেনে যান-বাহনের সহস্র ধাক্কা সামলে স্বামিদেবতা তত্তক্ষণে হাজির হয়েছে ঘরে। ঝনৎকারিণী স্ত্রীর দিকে চোখ মেলেই তার ভাল যে লাগল না তা নয়। কিন্তু তার পাকযন্ত্রের অসহ উত্তাপ অনুভব করলো বেশী। তাই প্রশংসা দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবার চেষ্টা সে করলো কিন্তু ফল হলো উল্টো। সারগামের সাধাসাধি ঝন ঝন করে উঠলো তার কাণে।

কি সুন্দর বাজাও যে তুমি বেলু!

শোন না, আরও আছে, নতুন আর একটা সারগাম···

—সারগাম বেশী ভালো কি? আলাপের পর ও আর জমে না।

—কে বল্লে? এই শোনো না···

সারগাম সুরুর আগেই ঘড়ির ঝনৎকার শোনা গেল! দশটা বাজলো। আরম্ভের আগে আরম্ভ আছে কিন্তু আরম্ভের শেষ আছে কি কে জানে? স্বামিপ্রবরের পাকস্থলীর শেষ হয়ত আছে।

—কেমন লাগছে?

—সুর আমার ভালই লাগে—মাত্র সাতটা পর্দ্দায় এত সুর?

—নীতীশ বাবু বলেছেন, সুর পুরোপুরি জানলে সাতটাকে টেনে সাতশ' করা যায়।

—য়্যাঁ বল কি, অত টানাটানি কি ভাল হবে? হাজার হোক কোমল জিনিষ ত।

—দেখ, বেরসিকের মত কথা বলছো। সুর টানলে কি ছিঁড়বে? মীড়ে মীড়ে রস···রসিক হ'লে বুঝতে সুরের কাছে কিছু লাগে না। সুরে ভর দিয়ে ভরপুর হয়ে ইচ্ছে হয় পাখা মেলে উড়ে যাই—গানের আকাশে পাড়ি দিই—

—কিন্তু, বেলু, আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে, আমার খাবারটা দিয়ে যেও।

রবীন্দ্রনাথের এক নায়িকাকে ক্ষুব্ধ হ'তে দেখেছি—স্বামীর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়েই যেন বিধাতা তৈরী করেছেন তাঁদের—স্বামীরা আবার কোথায় একটু আঁট সইতে পারেন না···। মেয়েরা তাই ত ফেলে বদলে অনেক কিছু নতুন মানুষের সাহচর্য্যে এসে। নতুন মানুষের সঙ্গ পেয়ে নতুন ক'রে ঢালাই করে নিতে হয় নিজেকে। অবশ্য ভাঙ্গাগড়াটা যে দু'পক্ষেরই তা আর বলতে হবে না।

তবে এমন মেয়ে দেখা যায়, যারা নিজেদের ঢালাই করার থেকে অপর পক্ষকে গড়ে পিটে নিতেই ব্যস্ত। রাস্তাটা মন্দ নয়, কেন না, নিজেকে ঢেলে সাজার থেকে অন্যকে পেটাই করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটোয়া করে নেওয়া সহজ কাজ বৈ কি!

মেয়েরা জানে এ রহস্য এবং জানাও উচিত। পুরুষকে বশ না করলেও বশে টানবার হাত তাদের হাত আছে। অনেক সময় যখন তারা নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে এবং অলক্ষ্য রজ্জু বা রশি দিয়ে কষাকষি করে? সেটি যে সহজে ছিঁড়বে না এ রকম ধারণা থাকলে মেয়েদের হালচালই বদলে যায়! আত্মনির্ভরতা বেড়ে যায় অন্ততঃ আশী পারসেন্ট। অর্থাৎ পাকা মাছ-শিকারীর মত ছিপ ধরে শিকারের দিকে অবিমিশ্র তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাতে পারে।



গড়ে পিঠে পেটোয়া

একটি পাকা পঁচিশ সের কাতলাকে অবলীলাক্রমে খেলিয়ে তোলার কায়দা ও কসরৎ দেখানো খুবই সহজ। সে যে শিকারকে ডাঙ্গায় তুলতে ব্যস্ত এ রকম সন্দেহ যেন শিকারের মনে না জাগাতে পারে সে দিকে শিকারীর সাবধান-দৃষ্টি যেন থাকে। এইখানেই মুস্কিল, মেয়েদের অর্দ্ধেক মোহ আর আকর্ষণ ছিপের সুতোর সঙ্গেই ছিঁড়ে যাবে তাহলে।

কাতলা মাছের উল্লেখ করেছি এমনিই বলতে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখছি যে রুই-জাতীয় দাম্ভিক মৎস্যকেও বঁড়শিবিদ্ধ হ'তে দেখা বিচিত্র নয়। রূপ বর্ণশ্রী সুঠাম দেহ নিয়ে যারা ভুরু তুলে চলে এ-হেন পুরুষ যারা পৌরুষের বৈজয়ন্তী উঁচিয়ে পা ফেলে, কৌলীন্যের মূলধন আভিজাত্যের মালমসলা যাদের পকেটে পকেটে সে রকম রুই-শ্রেণীকেও দেখা গেছে অবিশ্রাম পুকুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অধিক দৌড়াদৌড়ি করতে। একে জলকেলি



হুইল ও সুতোর খেলা

বলেই তারা ধরে নেয়—এবং কি ভালই যে লাগে তাদের নিজেকে একটি বোকা বেচারা পুত্‌পুতে মাছের মত কল্পনা করে নিজে। এতে তার ছলনা লেশমাত্র নেই, মাছের আচার-ব্যবহার যে সত্যি ভাল নয়—ঐ সুতোলি খেলাটিই লাগে সব চেয়ে ভাল। আর ভাল লাগে ছিপধারিণীকে! বিদ্ধ করেই যে সে গেঁথে তুলতে

আর তুলেই তার ঝুড়িতে পূরতে হয় নিছক মৎস্যভুক্ প্রেরণা বশে··· ছি, এ কল্পনা শুধু অবান্তর নয় অন্যায়ও। ছিপের হুইলে যে গুটানো সুতোর প্রচুর ষ্টক এবং সেই সুতো ছাড়া ও খোলা দু'টোই সমান সহজ—খানিকটা খোলা সুতোর lease নিয়ে যখন মৎস্যপ্রবর খেলতে থাকে সে তখন ঐ সত্য বুঝবে কি করে? ডাঙ্গায় তোলার প্রথম চেষ্টাতেই তাই দেখা গেছে অকৃত্রিম প্রেম ব্যাপারেও ভাটা পড়তে। মাছেরও চোখ খুলে গেছে এবং এ-হেন সঙ্গীন অবস্থাতেই সুতো ছেঁড়ার বহু কাহিনীও মৎস্যপুরাণের পাতায় পাতায় ছাপা আছে।

হিন্দু কোডের প্রতিবাদ

লেডি ননীবালা ব্রহ্মচারী

বিষয়াধিকারে মেয়েদের লাভ কোথায়? পিতা কন্যাকে যথাসাধ্য শিক্ষা দান করেন। সে শিক্ষা আজকাল ছেলেদের মত সর্ব্বোচ্চ কালেজিক শিক্ষায় পরিণত হইয়াছে, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। হিন্দু সমাজ বলিতে যে ব্যাপক বিশাল সমাজকে নির্দ্দেশ করিয়া এই আইন করা হইতেছে, তাহার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত, ইংরেজী-ভাবাপন্ন এবং আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপেই বৈদেশিক সমাজের অনুরূপ চালচলনে চলিতে অভ্যস্ত ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজ প্রভৃতির প্রভাব কাউন্সিল প্রভৃতিতে সমধিক হইলেও সংখ্যায় উহারা অত্যল্প। হিন্দু সমাজের পরিবারগত ব্যবস্থা বিষয়াধিকারের সঙ্গে কতখানি বিজড়িত, তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহেন। শ্রাদ্ধ, পিণ্ড, গৃহদেবতার নিত্যসেবা, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি কুলাচারের প্রতিপালন তাঁহাদের গৃহে থাকে না; বার মাসের লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতির দায়ভার খরচপত্র অজ্ঞাত। মেয়ের বিয়ের খরচ তাঁদের ইচ্ছামত করিলেও মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কার, জামাইকে যদৃচ্ছা কিছু ও পার্টি দিয়াই সারা চলে। বিবাহের বিপুল খরচ, ফুলশয্যার তত্ত্ব, নমস্কারীর অসংখ্য বস্ত্রাদি, ননদতোষণ, সধবাতুষ্টি এ সব জানেনও না। তাঁদের সম্পর্ক বর-কনের মধ্যেই। বার মাসের তের পার্ব্বণের পার্ব্বণী ভারে ভারে কখন কুটুম্ববাড়ী পাঠাইতে হয় না; কন্যার সাধে সন্তানের জন্মে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে ব্যয় করিতে হয় না। কন্যার বিবাহ প্রকৃত হিন্দু সমাজে পিতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায়। বিষয়াধিকার মেয়েকে দিলেই যে বিবাহে ব্যয় আপনি উঠিয়া যাইবে তাহা মনে করা একান্ত বাতুলতা। কেন যাইবে? কোন্ বরের বাপ বা বর নিরলঙ্কারা কপর্দ্দকশূন্যা কন্যাকে বধূ করিতে ছুটিয়া আসিবেন? "পণ" বলিতে যে নগদ টাকাটা দিতে হয়, যদি ধরা যায় বড়লোকের মেয়েদের জন্য সেইটুকুই বাদ দিতে কোন কোন ব্যক্তি রাজী হইলেন, বাকিদের? বড়মানুষ এ দেশে কয়টি? তাঁদের দিকেই আইনকর্ত্তা ও গৃহীতারা উর্দ্ধচক্ষে চাহিয়া আছেন। এ দেশে মানুষের আয় গড়পড়তায় দৈনিক /১০, সে কথা সম্পূর্ণই ভুলিয়াছেন। কিন্তু অসংখ্য দরিদ্র ও অর্দ্ধ-দরিদ্রদের ঘরে কি বিপ্লব বাধিবে সে কথা কেন কেহ ভাবিয়া দেখেন না? শিক্ষায় ধর্ম্মে সমাজকে উত্তোলন এবং হিংসা-বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত না করিতে পারিলে শুধু একটা বিপ্লবী আইন করিলেই হয় না, মেয়েদের ইহাতে কোন দিক দিয়াই লাভ নাই। বাপের বিষয় পাইবে, স্বামি-শ্বশুরের বিষয় ননদকে কাটিয়া দিতে হইবে, দুই স্থানেই টুকরা খুচরা হইয়া সংসার উৎখাত হইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হওয়া ও কুটুম্ব আনিয়া ঘরে ঢুকান এমন কল্পনা অনভিজ্ঞতার একটি প্রধানতম দৃষ্টান্ত। যৌথ পরিবার নাই যাঁরা বলেন, এই কলিকাতা সহরেই কয়েকটি মাত্র রাস্তায় ঘুরিয়া বাড়ী বাড়ী খবর লইয়া জানুন, কয়টি বাড়ীতে আজও ব্রাহ্ম, বিলাতী-ভাবাপন্ন হিন্দু এঁদের মধ্যে বড়লোকেদের ভিতর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখিয়াই তাহাকে নজীর করিবেন না, সে সংখ্যা অত্যল্প। পল্লীগ্রামে যৌথ পরিবারের অভাব আদৌ নাই। মেয়েকে বিষয়াংশ দেওয়ান জুলুম ত বটেই, মেয়ের উপরই সেই জুলুম বেশী করিয়া পড়িবে।

ভাই-বোনে পিতৃধনের মত মাতৃধনের বখরাও হইবে। মাতার যৌতুক ধন কেবল কুমারী কন্যা পাইত। এই প্রাচীন প্রথা বড় মন্দ ছিল? নূতনের পক্ষপাতীদের দূরদৃষ্টি কোথায়? নূতন হইলেই হইল? অযৌতুক ধন কুমারী কন্যা ও ভাইদের মধ্যে সমান অংশে বিভাগ হইত। এখন বিধবা কুমারী, সধবা কন্যারা দৌহিত্রী, পৌত্রী দৌহিত্র, পৌত্র পাইবে। ছেলেরাও বোনের অর্দ্ধেক পাইবে। কেন পাইবে? বিধবার বাপের কাছে বিবাহের ব্যয় মিলিয়াছে, তাহার অংশ স্ত্রীধন আছে, স্বামীর সম্পত্তিও ছেলেদের সঙ্গে সমান অথবা নিঃসন্তান হইলে জীবনস্বত্ব সবই মিলিয়াছে, শ্বশুর বা দাদা-শ্বশুরের (যদি স্বামী পূর্ব্বে মৃত হয়) স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তির যে সব আইন হইয়াছিল যদি পাইলেন, তবে মাতৃ বা পিতৃধনে ভাগ বসান কেন? অনাহারীকে গুরু আহার্য্য দেওয়াব জন্যই কি এ বিধান? পৌত্রীরূপে, দৌহিত্রীরূপে, ভাগিনেয়ীরূপে, কন্যারূপে পত্নীরূপে পুত্র-বধূরূপে সর্ব্বত্র হইতে পাইয়া তাঁহারাই কি সমাজের প্রথম শক্তি হইবেন? পুরুষরা তাঁহাদের প্রতিপাল্য রহিবেন?

বিষয়-সম্পত্তিও কি তাঁরা চালাইবেন? উইল করা প্রোবেট নেওয়া, পার্টিসন স্যুট করা, কলহ এবং দাঙ্গা এ সকলের কথা কল্পনাকুশলীরা এক বার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সরোজিনী নাইডু রাজনীতি বুঝেন, তাঁর হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশেষ কোন পরিচয় নাই। তিনি "মেয়েরা নিজের ভাল নিজেরাই বোঝে না" মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া তাহাই ধরিয়া লইতে হইবে? মেয়েদের পূর্ণ অমঙ্গলের ছবি আমরা ঐ আইনটির প্রতি জিনিষেই দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু সমাজ একটুও অপরিবর্ত্তিত অচলায়তন নয়, কোন দিন ছিলও না, প্রয়োজন মত কালই ধীরে ধীরে তাহা সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। সংস্কার দেশকালপাত্র হিসাবে আপনা হইতেই জন্মায়, আইনের বন্ধন বহু কোটিকে এক সঙ্গে বদ্ধ করে। মুষ্টিমেয় ধনী ও কোটি কোটি দরিদ্রের ঘাড়ে এক দায় চাপান ইহা নৈসর্গিক বিধান নয়। ধনী পিতা কন্যাকে যথেষ্ট দিয়া যান। অনিচ্ছুক পিতা হঠাৎ হার্টফেল না করিলে উইল করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই শুধু দিবেন। উইলের মত সম্পত্তি যাদের নাই, বিপন্ন তারাই হইবে। সমাজনীতি, লোকাচার তারাই বেশী মানে, অনূঢ়া কন্যা রাখিতে তারাই ভয় পায়, তাদেরই ঘটী বাটি থালা লইয়া, জীর্ণ গৃহাংশ, কুটীর লইয়া টানাটানি

বিধবার ও কুমারীর প্রাপ্য আইনদ্বয় নাকচ করিয়া বহু উত্তরাধিকারিত্বের এই জটিল অধিকার দেওয়ার? দুই পুরুষ বাদে কেহই এই আইনের কবলে অবস্থাপন্ন থাকিবে না। হিন্দুর যৌথ পরিবার সত্যকারই ভাঙ্গিবে। উত্তরাধিকারী তো আর শুধু ভাই-বোনই নয়, প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের দেনা-পাওনার আইনবদ্ধ সম্পর্ক হইবে, অথচ মানুষের অন্তর এত উদার নয়, নিজ জন্মার্জ্জিত বা কষ্টার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি প্রত্যেক পরিজনের মধ্যে বিতরিত করা। নিজের গৃহশোভা-সৌকুমার্য্যের জন্য মানুষে নানা দেশ হইতে সযত্নে কত কি আহরণ করে, পুত্র-পৌত্রাদি ভোগ করে এই ইচ্ছায়। মুসলমান ওয়াকফ আইনে বিষয় এক স্থানে আবদ্ধ করিতে পারে, হিন্দুর সে সুযোগ নাই, তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ডরূপে দরিদ্রতর হইতেই হইবে। বড়ঘরের প্রবীণা শিক্ষিতা মহিলারা এ-সব দিক্ না দেখিয়া শুধু "মেয়েরা পাইতেছে" এই আনন্দেই উল্লসিত হন কেমন করিয়া?

জাপান জাতীয় উন্নতিকল্পে সমস্ত ধন রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, কম্যুনিষ্ট রাশিয়া সমস্ত ধন-ভার স্বহস্তে লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে অর্থকরী ব্যাপার সমুদয় সম্পন্ন করিয়া জাতিকে কোথায় তুলিয়াছে। একত্রিত অর্থরাশিই না সামাজিক অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায়তা করিতে সমর্থ। এ দেশে নিজের স্বধর্ম্মী স্বজাতি রাজা নাই, ষ্টেট নাই, থাকিলে তার আশ্রয়ে সবই সমর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া যায় না, যতটা যায় তা ষ্টেটই দিতে পারে। পৈতৃক বিষয় কাড়াকাড়ি করিয়া কোন অধিকারই মেলে না। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, অবৈতনিক বহু বিদ্যালয়, আশ্রম, নারী-রক্ষা সমিতি প্রভৃতি যাহাতে গবর্ণমেণ্ট খুলিয়া দেন সে জন্য আরও চেষ্টা করা, এ সব কি বিষয়াধিকার আইনের চেয়ে ঢের আগেকার কাজ নয়? মেয়েরা আর অবলা বা অসহায় নাই, প্রত্যেক মেয়ে যদি শিক্ষালাভ করে, উপার্জ্জন-শক্তি ধরে, শিল্পোন্নতি কার্য্যে যোগ দেয়, তবে তাদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়। স্বোপার্জ্জিত ধনে সম্মান সহকারেই জীবন-যাপন সংসার-পালন করতে পারে। স্বামিরত স্ত্রীকে পালন করিবার কঠোর আইন আছে। তবে কেন ব্যতিক্রম ঘটে? আইনের অভাবেই যত কিছু মন্দ কাজ হয় না, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবেই হয়। আইন গড়া সোজা, প্রয়োগ করানই শক্ত। এ আইন শুধু অশান্ত সমাজকে অশান্ততর করবে, ভাল করতে পারবে না। রক্ষণশীলতা সকল সময়েই মন্দ নয়।

দ্বিতীয় কথা, একপত্নীত্ব ও ডাইভোর্স। এ যুগে বহুবিবাহ কেহই সমর্থন করে না। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যায় মানুষ এখন দায়ভার এড়াতেই চায়, জড়াতে ইচ্ছা করে না। এক বিবাহেই শিক্ষিত ছেলেরা ভীষণরূপে নারাজ। যদি কোন কারণে কচিৎ কেউ তা' করেই বসে, তাহলে তার জন্যে পূর্ব্ব-স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে ভাসাতে হবে, এর জন্য আইন করা অনর্থক। হয়ত পুত্রার্থে প্রথম স্ত্রী নিজেই স্বামীর বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক নয়, হয়ত নিজে কন্যা বলে এরূপ ব্যবস্থায় অনুমোদন করে। এই আইন প্রথমা পত্নীকে বন্ধ্যাত্বের জন্য, দুরারোগ্য রোগের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদে ফেলে পথে বার করবার ব্যবস্থা করবে। এ পক্ষেও মেয়েদেরই সমূহ ক্ষতি। বিশেষ সমাজের বা বিশেষ প্রকৃতির রূপবতী ধনবতী তরুণীদের ডাইভোর্সের পর বর জুটিতে পাবে, কিন্তু যারা তা নয়, তাদের? ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য করলে সেখানেও স্থান হবে না। হিন্দু সমাজ বাল-বিধবাদের বিয়ে দিতে পারেনি, পুরুষানুক্রমিক সংস্কার সহজে যায় না। বলা হয়, ডাইভোর্স না থাকায় কেউ কেউ মুসলমান হয়ে অন্য বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ক'জন কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর স্ত্রী? ক'জন নিরুদ্দিষ্টের? ক'জন পুরুষত্বহীনের? যে প্রবৃত্তি বহুর দিকে আকর্ষণ করে, তার পথ মুক্ত করলে আমেরিকান বা রাশিয়ান ডাইভোর্স বিধিই নেওয়া উচিত। এ দেশে স্ত্রীরা সহজে আদালতে দাঁড়াবে না, দাঁড়ালে খোরপোষের জন্যই দাঁড়াত। তাঁরা স্পষ্টই বলেন, নালিশ করে আদায় করা কি সোজা? ছ'মাস ছ'মাস পরে খোরাকী বন্ধ করে, ফের হায়রাণী; তার চাইতে কিছু শিখে খেটে খাবো। কেউ বলেন, আইন আদালত তো অমনি হয় না, কে ও-সব করে দেবে? ডাইভোর্সের ব্যাপার ঢের বেশী কঠিন, যথার্থ দুঃস্থারা সে সব পারবেন? সুযোগ নেবে পুরুষেই। বিধবারা সে কালে বিবাহ করে নাই, তার পশ্চাতে ছিল পুরাতন কৃষ্টি, ধর্ম্ম, শিক্ষা। আজ তার কতটুকু বাকি আছে? যাও ছিল, ডাইভোর্স আইন তার প্রায় সবটাই নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মানুষের চেয়ে তার আদর্শই বড়। যে জাতি তার বহু সহস্র বর্ষের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি-মূল উৎখাত করিয়া বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার পতন অনিবার্য্য।

ভগ্ন-বীণা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ভেঙে গেছে বীণ   ছিঁড়ে গেছে তার,
তবু এ বীণার   ক্ষীণ ঝঙ্কার,
কেন তুলে হাহাকার?

কেন আঁখিকোণে   শুধু অকারণে
অশ্রু-বাদল   বিরহ-বেদনে
ঝরে ঝরে পড়ে যায়?

সুখের স্বপন,   সোহাগ রতন!
গেছে যদি যাক্   আঁখি-বিমোহন,
হাসি সাথে যাক্ মায়া,

প্রেম যদি যায়   কিবা রহে হায়!
হৃদি-বিনিময়   ভুলিবার নয়,
কায়া বিনে মিছে ছায়া।

ফৌজ-পালন

কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের পক্ষে যে বিরাট অক্ষৌহিণীর সমাবেশ হইয়াছিল, সে অক্ষৌহিণীর খাদ্য-ব্যবস্থার উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণকে তথাকথিত যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন, এবারকার এ যুদ্ধে এক-একটি প্রদেশে যে ফৌজ জড়ো হইতেছে, তাদের খাদ্যের আয়োজন দেখিলে তাঁরা বুঝিতে পারিবেন, পুরাণের সে-বর্ণনা অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই! কারণ, যুদ্ধ জয় করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্রাদির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সেই অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগে সুনিপুণ অক্ষৌহিণীকে সুস্থ সবল রাখিতে তাদের জন্য যথানুরূপ খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা। গত বৎসর মাঘ-সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে আমরা ফৌজ-ভাণ্ডারীর বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। ফৌজের খাদ্য-পানীয়ের সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অমানুষিক আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। ট্যাঙ্ক কামান বমার বোমার জোগানোর মতই খাদ্য-পানীয় জোগানোর আয়োজনও বিরাট্ এবং বিপুল। এ খাদ্য-পানীয় শুধু মার্কিণ হইতে ভারতাগত-মার্কিণ-ফৌজের জন্যই জোগান যাইতেছে না—ইজারা-ঋণ রীতিতে মিত্রপক্ষীয় অক্ষৌহিণীর জন্যও সর্ব্বত্র পাঠানো হইতেছে। গত বৎসর সমগ্র ফৌজের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু আলু জোগাইয়াছিল ৩৭৬০০০০০০ সাঁইত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ মণ। অর্থাৎ এই আলুর পাহাড় একত্র জড়ো করিলে সমগ্র জিব্রালটার দ্বীপটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে! ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে—যুদ্ধের তখন সবে সূচনা বলিলে চলে—ডিম চালান গিয়াছিল পঞ্চাশ কোটি! তাছাড়া গম মাংস দুধ—এ সবের তো কথাই নাই।

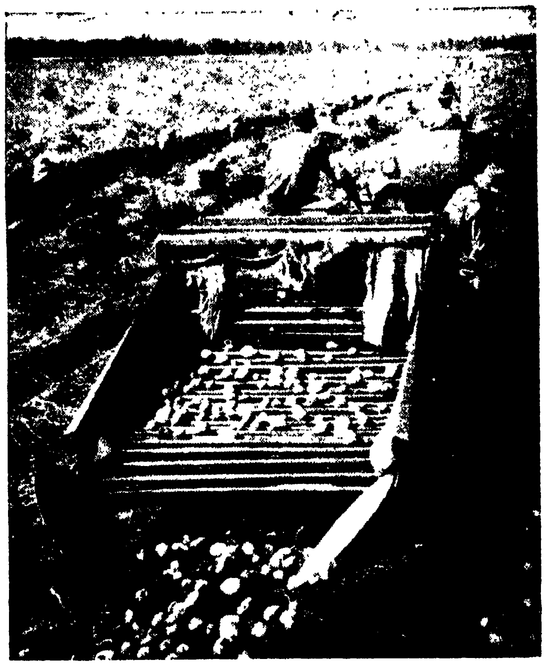
ব্রিটিশ ফুড মিশনের অধ্যক্ষ ব্রাণ্ড ওয়াশিংটনে আছেন। তিনি বলেন—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে খাদ্য জোগাইয়াছে, তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র বৃটেনে পাওয়া যায়! ডেনমার্ক হলাণ্ড বেলজিয়াম হইতে বৃটেনে প্রচুর মাংস ডিম এবং জমাট দুগ্ধ চালান যাইত; এ সব প্রদেশ জার্ম্মাণির করতলগত হওয়ার পর এ-চালান একেবারে বন্ধ হয়; কাজেই আমেরিকার সাহায্য না পাইলে সব অনাহারে মরিতে হইত।

যে-সব খাদ্য পাঠাইতে জাহাজে অল্প জায়গা লাগে, এমনি খাদ্যই পাঠানো হয়—অর্থাৎ মাংস, ডিম, শুকনো বা জমাট দুধ, চীজ, চর্ব্বি, শুষ্ক ফল ও শূকর-মাংস প্রভৃতি।

সাধারণতঃ জাহাজে এখন চালান যাইতেছে ৬০০০ পিপা ডিম,—অর্থাৎ পরিমাণে ২২১১৩৭ মুর্গীর ডিম। ৬০০০ পিপা শুষ্কীকৃত দুগ্ধ—২৭৮৩ গাভীর এক বছরের দুধ। ২০০০০ বাক্স চীজ—এক-বছরে ৩০৩৭ গাভীর দুগ্ধে এ-পরিমাণ চীজ তৈয়ারী হয়। ৬০৬১ বস্তা গম অর্থাৎ ৮৩৮ একর পরিমিত জমিতে যে-গম জন্মায়, তাই। ১৬১১১ টিনে-ভরা তরী-তরকারী প্রভৃতি—অর্থাৎ টোমাটো, কলাইশুঁটি এবং বীনের পাহাড়। ইহার উপর আরো কত কি আছে।

রাশিয়া, আফ্রিকা, ইতালী, ভারতবর্ষ—সর্ব্বত্র এ সব জিনিষ চালান যাইতেছে! তাছাড়া জিব্রালটার, কলম্বো, ফ্রী-টাউন, ডারুইন প্রভৃতি প্রদেশে যে সব ফৌজ গিয়াছে, তারাও এই মার্কিণ খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। রাশিয়ায় মুরমানস্ক হইতে ককেশাস পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের সেনারা আজ মার্কিণ খাদ্য খাইয়া যুদ্ধ করিতেছে। মার্কিণ মুলুকের বড় বড় বন্দরের সমস্ত মাল-গুদামেই এই সব মাল আসিয়া জমিতেছে পাহাড়-প্রমাণ।

এত মাল জোগান দিলেও দেশের লোক না খাইয়া মরিতেছে, তা নয়! স্বাধীন দেশ—সামরিক এবং বেসামরিক—সকল অধিবাসীর প্রাণের দাম সেখানে সমান! সে জন্য ফশল দুধ প্রভৃতির উৎপাদনে দেশের লোক যেন সহস্র-বাহু হইয়া কাজ করিতেছে; এবং চুরি বা ব্যবসাদারী না ঘটে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি এতটুকু শিথিল নয়! বরফের ফ্যাক্টরি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বারুদখানা তৈয়ারী করা কঠিন নয়, কিন্তু জলা বুজাইয়া জঙ্গল উপড়াইয়া সেখানকার মাটাকে উর্ব্বর করিয়া তথায় ফশল ফলানো সহজ ব্যাপার নয়। মার্কিণ আজ সে কার্য্য সাধন করিয়াছে। ৩৫০০০ টন ওজনের একখানি যুদ্ধ-জাহাজ গড়িয়া তুলিতে ২৬১০০০ ঘণ্টা সময় লাগে। যে সব লোক এ জাহাজ গড়িয়া তুলিবে, তাদের সকলকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি দিতে হইলে ৪২০০০ একর



আলুর চাষ

পরিমিত ক্ষেতে একটি বছরের ফশলের আবশ্যক। একটি বমার তৈয়ারী করিতে বহু লোকের প্রয়োজন। তাদের খোরাক জোগাইতে চাই ১৫৫ একর পরিমিত ক্ষেতের ফশল। ট্যাঙ্কের কারিগরদের জন্য চাই ৪৩ একর পরিমিত ক্ষেতের ফশল। ১৬ ইঞ্চি সাইজের একটি কামান একবার মাত্র ছুড়িবার জন্য ধূমহীন বারুদ চাই সাড়ে আট মণ। এই সাড়ে আট মণ বারুদ তৈয়ারী করিতে যে-পরিমাণ তুলা ও সুতি-কাপড় চাই,—তাহা পাওয়া যায় দেড় একর পরিমিত জমিতে ফলানো তুলা এবং এক-পঞ্চমাংশ একর পরিমিত জমির ইক্ষুদণ্ড হইতে।

তার পর পশম। মার্কিণ কৃষিজীবীদের ঘরে মেষের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ। তাদের লোমে যে পশম মিলিত, সে পশম বেসামরিক অধিবাসীদের পরিচ্ছদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না;

এখন আবার আছে ফৌজ এবং জাহাজের নাবিক-সম্প্রদায়। মার্কিণ মুলুকে বছরে সাধারণতঃ ষাট কোটি পাউণ্ড ওজনের পশম লাগে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শুধু ফৌজদের জন্য মার্কিণে পশম লাগিয়াছে একশ' কোটি পাউণ্ড। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিগুণ পশম লাগিয়াছে। তার কারণ বিমান-বাহিনীকে জ্যাকেট দিতে হইয়াছে এবং ফৌজের জন্য গরম কোট প্যাণ্ট হেলমেট প্রভৃতি জোগাইতে হইয়াছে অজস্র পরিমাণে। চামড়ার ব্যাপারেও এমনি সমারোহ। কেল্লায় চুপ-চাপ বাস করিবার সময় সেনাদের দেওয়া হয় বছরে দু'জোড়া কিম্বা তিন জোড়া করিয়া জুতা। কিন্তু আফ্রিকায় গিয়া ফৌজের পায়ে দু'সপ্তাহের বেশী কোনো জুতা টেঁকে নাই। তাহা হইলে ধরুন, দশ লক্ষ ফৌজ ও নাবিক পাঠাইতে হইলে তাদের জন্য কত জুতা চাই!



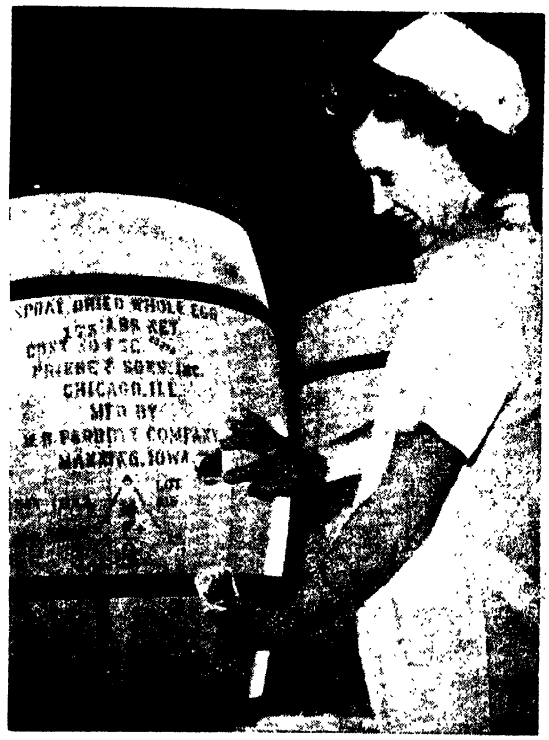
গাজর ডী-হাইড্রেট্

এ জন্য মার্কিণে শুধু যে খাদ্য-পানীয়ের উৎপাদনই শুধু প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো হইয়াছে, তা নয়! চামড়া, পশম অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দ্রব্য-উৎপাদনে সেখানে অজস্র রীতিমত সমারোহ বাধিয়া গিয়াছে।

তিসির তৈল চাই সাগর-পরিমাণ! এ জন্য মিনেশোটা হইতে কালিফোর্ণিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে কৃষিজীবীরা পঞ্চাশ লক্ষ একর জমি লইয়া সেই জমিতে তিসি ফলাইতেছে—তিসির তৈল জোগাইতে।

দড়ি চাই দেড় লক্ষ টন! এই দড়ির প্রয়োজনে তিন লক্ষ একর জমিতে শণ পাটের চাষ হইতেছে।

খাদ্যে চর্ব্বি থাকা চাই। আমাদের খাদ্যে বছরে চর্ব্বির প্রয়োজন সাধারণতঃ ২৬ সের করিয়া। যুদ্ধে দারুণ পরিশ্রম—এ জন্য ফৌজের খাদ্যে বরাদ্দ-চর্ব্বির পরিমাণ মাথা-পিছু বছরে এক মণ এগারো-বারো সের নির্দ্দিষ্ট আছে। চর্ব্বির জন্য মাছ-মাংস জোগানো—তার উপর রাসায়নিক রীতিতে প্রস্তুত ভাইটামিন পাঠানো হইতেছে। চর্ব্বি জোগানে অভাব না ঘটে, এ জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছে, "দেশে শূকরের বংশ বাড়াও! সয়া-বীন এবং চীনা বাদামের চাষ করো প্রচুর পরিমাণে।" চীনা বাদাম ফৌজের জন্য দৈনিক বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মার্কিণে ১০৬৪০০০ একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হইত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ছত্রিশ লক্ষ একর জমিতে চীনা



পিপার মধ্যে দু' মণ আড়াই সের শুষ্ক ডিম ভরা আছে

বাদাম ফলানো হইয়াছিল; তার পর মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন সয়া-বীনের চাষ হইতেছে এক কোটি দশ লক্ষ একর জমি জুড়িয়া।

তাছাড়া, শ্রমিকদের কাজের জন্য সে মামুলি আট ঘণ্টার সময়-নির্দ্দেশ-রীতি উল্টাইয়া গিয়াছে। মার্কিণে এখন শ্রমিকের আর ওভার-টাইম নাই। কাজ চাই ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। মাংসের জন্য গো-বংশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা নাই। গাভীর দুধ পরম পুষ্টিকর। সে-দুধে মাখন হইতেছে—তাহা হইতে চীজ ও বিবিধ খাদ্য তৈয়ারী হইতেছে। শূকর-মাংসই মার্কিণ ফৌজের প্রিয় এবং শূকর-মাংসই অজস্র ভাবে জোগানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। শূকর-পালনে যে অধ্যবসায় চলিয়াছে, আমাদের জন্য তার সিকি-ভাগ যদি কখনো করা হয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রী ফিরিয়া যায়। পালন ও পরিচর্য্যার গুণে মার্কিণ গাভী

কামধেনুর মতো অকৃপণ ভাবে দুগ্ধ দিতেছে। এত দুধ হইতেছে যে, সে-দুধ এক-জায়গায় ঢালিলে ৭৫ মাইল লম্বা দুগ্ধ-নদী তৈয়ারী হয়। এ দুধ বে-সামরিক অধিবাসীদের পাত্র ও পেয়ালার কাণা অপূর্ণ রাখে না। বে-সামরিক অধিবাসীদের প্রয়োজন-মত দুধ জোগাইয়া যে-দুধ বাঁচে, তাহা হইতে চীজ তৈয়ারী হইতেছে। মাটা তুলিয়া দুধ প্যাক করা হইতেছে, মিষ্টান্ন হইতেছে, মাখন হইতেছে; এবং আর্দ্রতা বা জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত করিয়া দুধের সারাংশটুকুকে শুষ্ক করা হইতেছে।

দুধকে শুকনো করা হয় স্প্রে-রীতিতে। এই শুষ্ক দুধ জলে গুলিয়া পান করিলে দুগ্ধপানের ফল মেলে। এ রীতিতে এক মণ দশ সের দুধকে বিশুষ্ক করিলে জমাট শুষ্ক দুধের ওজন দাঁড়ায় চার সের মাত্র! এই চার সের দুগ্ধ-সার জলে ফুটাইয়া তার পরিমাণ প্রয়োজন-মতে দশ সের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত করা চলে। সে দুধ 'জলো' হয় না; খাঁটি দুধের মতই তাহা পুষ্টিকর।

গমের চাষ মার্কিণে বাড়িয়া চতুর্গুণ হইয়াছে। তার পর ডিম। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ হইতে আস্ত ডিম অজস্র বাক্সবন্দী হইয়া বৃটেনে চালান যাইত। তার মধ্যে অনেক ডিম নষ্ট হইত। এখন শুধু বৃটেনে চালান নয়, এ ডিম চালান যাইতেছে আফ্রিকায়, য়ুরোপে এবং ভারতে। ডিমগুলিকে গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিয়া পাঠানো হইতেছে—পচিবার বা নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। তিন ডজন তাজা ডিম লইয়া তাহা হইতে যে ডিম্ব-সার তৈরী হইতেছে, তার ওজন আধ সের মাত্র! ডিম ভাঙ্গিয়া বিশেষ যন্ত্রে পাইপের মধ্যে তার পীত ও হরিদ্রাংশ ঢালিয়া দেওয়া হয়—সেই গোলা ডিম পাইপের অপর প্রান্ত দিয়া পিচকারী-ধারায় বর্ষিত হইয়া তপ্ত পাত্রে পড়ে, এবং পাত্রমধ্যে জমাট বাঁধিয়া চূর্ণ হইয়া ময়দার মত ঝরিয়া মেঝেয় জড়ো হয়। দু'মণ ওজনের পিপায় এই ডিমচূর্ণ ভরা হয়। দু-মণী পিপার মধ্যে যে ডিমচূর্ণ ধরে, তার পরিমাণ আঠারো বাক্স ভর্ত্তি তাজা ডিমের অনুরূপ। এই ডিমচূর্ণ চায়ের চামচের এক চামচ-পরিমাণ খান আর দু'টা তাজা ডিম পোচ করিয়া খান—সমান ফল পাইবেন! চালানি জাহাজে অল্প জায়গা লাগিবে বলিয়া মাংস পাঠানো হয় ডী-হাইড্রেট করিয়া। ছ'সাত মণ মাংসকে ডী-হাইড্রেট্ করিলে তার ওজন দাঁড়ায় ৩০ সের, বড় জোর এক মণ মাত্র। ডী-হাইড্রেট করিতে যেমন পরিশ্রম তেমনি ইহাতে ব্যয়ও পড়ে বেশী।

শূকর বা মেষ কাটিয়া প্রথমে তার ছাল ছাড়ানো হয়। তার পর সিদ্ধ করিয়া লইয়া হাড়গুলাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তার পর টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি ঘূর্ণ্যমান ড্রায়ার-যন্ত্রমধ্যে পূরিয়া দেওয়া হয়। ড্রায়ারে রাখার ফলে মাংস হইতে জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয়। পিপায় ভর্ত্তি ফল-মূল আনাজ-তরকারী শাকসব্জীও এমনি ভাবে ডী-হাইড্রেট করিয়া তবে চালান দেওয়া হয়। ডী-হাইড্রেট করার ফলে জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত হইলেও গন্ধ বা স্বাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে লাল ফৌজের জন্য ডী-হাইড্রেট করা যে পরিমাণ টোমাটো, মটরশুঁটি, বীন প্রভৃতি চালান গিয়াছিল, তার ওজন এগারো কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে চালানির পরিমাণ হইয়াছে তার দ্বিগুণ।

ডী-হাইড্রেট করার লাভ হইতেছে এই যে, যে-সব মাংস বা ফলমূল বা দুধ পাঠাইতে ১০৪৪ খানি জাহাজ লাগিত, সে-জায়গায় ১৭০ খানি জাহাজ লাগিতেছে। সাড়ে পাঁচ হাজার মণ ওজনের তাজা দুধকে শুষ্ক চূর্ণে পরিণত করিয়া তাহা একখানি ছোট প্লেন মারফৎ পাঠানো সম্ভব হইয়াছে। এই দুগ্ধচূর্ণ দশ হাজার মাইল দূর-পথেও নির্ম্মল অনাবিল থাকে—টকিয়া নষ্ট হয় না!

যুদ্ধের ফলে মার্কিণে ইক্ষুর চাষ অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। হনলুলুতে মার্কিণ যে চিনির কল বসাইয়াছে, সেখানকার সে চিনিতে এসিয়াবাসী মার্কিণ ফৌজের জন্য সর্ব্ববিধ মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইতেছে। কেক, চকোলেট, লজেঞ্জেস, গামড্রপ হইতে সুরু করিয়া পাই, আইসক্রীম, জ্যাম, চিউয়িং গাম, চা, কফি—কোনো দিকে ফৌজের এতটুকু অভাব বা অস্বাচ্ছন্দ্য নাই। এ-দিকে কিউবা এবং পোর্টোরিকোয় এত চিনি তৈয়ারী হইতেছে যে, সে-চিনি মজুত রাখিবার উপযোগী জায়গা মিলিতেছে না! চিনি শুধু ইক্ষু হইতেই নয়, বীট হইতেও তৈয়ারী হইতেছে। সয়া-বীনের চাষ মার্কিণে সুরু হইয়াছে আজ ৩৫ বৎসর মাত্র। প্রথমে চীন হইতে সয়া-বীন আনা হয়। বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ে এখন আমেরিকায় সয়া-বীন ফলানো হইতেছে প্রায় ২৫০০ জাতের। যুদ্ধের মর্ত্তমে সয়া-বীনের চাষ



বোতলে যে জল, ও-জল এই মাংসখণ্ড হইতে নিষ্কাশিত

দশ গুণ বাড়িয়াছে। সয়া-বীন হইতে চর্ব্বি, স্যালাড-অয়েল তৈয়ারী হইতেছে। তাছাড়া ময়দা হইতেছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আটা-ময়দায় সয়া-বীন-চূর্ণ মিশাইয়া খাইলে আটা ময়দার পুষ্টি-কারিতা বহু গুণ বাড়ে। এ জন্য রাশিয়ায় এবং বৃটেনে সয়া-বীনের আদর বাড়িয়াছে। খাদ্যার্থে ব্যবহার ভিন্ন সয়া-বীন হইতে রাসায়নিক রীতিতে সাবান, প্লাষ্টিক, পেইণ্ট, বার্ণিশ, গ্লিসারিণ প্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে।

মার্কিণ ফৌজ আকারে বিপুল—এই ফৌজ পরিপুষ্ট করিতেছে বয়স্ক মার্কিণ পুরুষের দল। এত লোক যুদ্ধ করিতে গেল, ক্ষেতে-খামারে কাজ করিবে কে? বারো বৎসর বয়সের ছেলের ক্ষেতের কাজে নামিয়াছে। তাদের সঙ্গে নামিয়াছে মার্কিণ নারী সমাজ। নব-ব্যবস্থায় বে-সামরিক অধিবাসীদিগকে সপ্তাহে একদিন



শাঁটুভোর গম

করিয়া ক্ষেতে নামিয়া কাজ করিতে হয়। কালিফোর্ণিয়া সহর হইতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া ৮০০০ নর-নারী যায় দ্রাক্ষা-ক্ষেতে কাজ করিতে। নাগরিকদের কৃষি-পদ্ধতি শিখানো হইতেছে। সার-সংগ্রহেও অধ্যবসায় এবং সমারোহের অন্ত নাই। মেক্সিকো হইতে কুলি-মজুর-শ্রমিক আনানো হইতেছে এবং বন্দী হইয়া যে সব জাপানী আমেরিকায় আছে, তাদের দিয়াও ক্ষেত-খামারের কাজ করানো হইতেছে। কেনটাকি, মিসৌরি, কনেকটিকাট এবং আরো বহু প্রদেশের ভদ্র বে-সামরিক নর-নারী কৃষিকাজে রীতিমত সহযোগিতা করিতেছে।

এ সহযোগিতায় বিজ্ঞানের সংযোগ—মার্কিণ যুক্তরাজ্যকে সুজলা সুফলা করিয়া তুলিয়াছে। জমিতে জল দেওয়ার জন্ত নব নব ব্যবস্থা—অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করিয়া তোলা—জমিতে সার দেওয়া—গো-মেষের পালন-পরিচর্য্যায় উৎসাহে-অনুরাগ—মার্কিণ যুক্তরাজ্য এ দুর্দ্দিনে যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে, তাহা সর্ব্ব দেশের সকল জাতির অনুকরণযোগ্য। এ সব দেখিয়া এক জন সুধী বলিয়াছেন—মানুষ যত দিন ভূমিকে পরম সম্পদ বলিয়া তার পরিচর্য্যায় কায়-মন উৎসর্গ করিয়াছিল, তত দিন অন্নবস্ত্রের অভাব কেহ অনুভব করে নাই! এ দুর্দ্দিনে ভূমি-লক্ষ্মীর পরিচর্য্যা করিয়াই বিজয়-লক্ষ্মীকে পাইবার আশা! পেট ভরিয়া মানুষ যদি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাকে মারে কে?—এ কথা এ দুর্দ্দিন অপগত হইলেও যেন আমরা না ভুলি!

শেষ হবে রাত্রি কবে

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

পৃথ্বীর আকাশে এলো বসন্ত আবার
বন্দী হ'লো বনানীর কারা-অন্তরালে ;
আকাশ লোহিত নহে আজ দেখি আর
বরণ দিলো না পৃথ্বী কোন ছন্দতালে।

পৃথিবী মরিয়া গেছে নিঃস্ব নভোছায়ে ;
মানুষের অনুর্ব্বর মনের মাটিতে
শান্তির অঙ্কুর ঘুমে র'য়েছে ঘুমা'য়ে ;
শতাব্দীর অবকাশ সে ঘুম ভাঙিতে।

নিরুদ্বেগ জীবনের কাল্-শিরাতলে
কালো মৃত্যুর সে কালো রক্ত, তা'র স্নায়ু
আয়ুঃপটে পিশাচের পাংশু হাসি ঝলে,
সঞ্চরে শরীর-মনে বিষাক্ত জীবাণু।

ভবিষ্যৎ কেঁদে ফেরে প্রান্তরের পারে,
সম্মুখে জমাট এক আঁধারের ভয় ;
দাসত্ব পৌঁচেছে মাত্র দুপুরের দ্বারে,
দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-তাণ্ডবতা নয় শেষ নয়।

আকাশ হবে কি লাল কুঙ্কুম-আবীরে ?
পৃথিবী হবে না ফুল্ল ফাগুনের ফাগে ?
মনের আকাশ কবে লাল হবে ধীরে
আঁধির আগল ভাঙি সোনালী পরাগে ?

তন্দ্রাগত ল'য়ে শান্তি-প্রীতির মূর্চ্ছনা
ছিন্নমস্ত জীবনের মহোত্তর জয়ে,
শেষ কবে হবে রাত্রি বন্ধ্যা অলক্ষণা
প্রসন্ন সে প্রভাতের রক্ত সূর্য্যোদয়ে ?

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য
ও
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

চর্ম্ম

দেহের হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে রক্ষা করবার জন্যে দেহ-চর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের দেহের ভেতরকার যোগাযোগ বজায় রাখবার ব্যবস্থা অবশ্য আছে। মুখ, কাণ, নাক প্রভৃতি অঙ্গগুলো ঐ ব্যবস্থার সহায়ক।

দেহচর্ম্মের মূল্য অনেক বলেই তার পরিচয়, আর কি করে তাকে সুস্থ রাখা যায়, সেটা জানা প্রয়োজন।

চর্ম্মের দু'টো ভাগ। বাইরের যে অংশটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটার নাম অধিত্বক্ বা এপিডার্মিস (epidermis); তার নীচে থাকে অধস্ত্বক্ বা ডার্মিস (dermis)।

অধিত্বকের আবার দু'টো স্তর আছে—তার মধ্যে ওপরেরটির কোষগুলি প্রাণহীন। নীচেকার কোষগুলি জীবন্ত আর অনবরত সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তবে সেগুলি অমর নয়! নীচেকার নূতন কোষের চাপে তাই ওপরের পুরানো কোষগুলি আলাদা হয় এবং ফলে তাদের আর প্রাণ থাকে না। সেগুলি তখন কঠিন অবস্থায় দেহের ওপরে এসে জমা হয়। আমরা স্নান করে গা মুছলে এগুলি উঠে যায়, আর তা না হলে এইগুলিতে ময়লা আটকায়। ফলে, গায়ে খড়ি ওঠে। শুধু তাই নয়, দেহের ঘাম বেরোবার পথও ময়লায় যায় বন্ধ হয়ে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, স্নানের উপকারিতা যেন বোঝা গেল, কিন্তু দেহের রং ফেরান যায় কি? না, দেহের রং বদলান যায় না। তার কারণ, অধিত্বকের নীচেকার স্তরের কোষে থাকে রং। সেই রং-ই কাউকে করে ফর্সা, কাউকে কালো। কিন্তু তাহলেও দেহচর্ম্মের লালিত্য বলে একটা জিনিষ আছে। সেটার অধিকারী কি করে হওয়া যায় তা পরে বলা হচ্ছে।

চর্ম্মের অধস্ত্বকে আছে রক্তশিরা, স্নায়ু, লোমকূপ আর স্বেদ-গ্রন্থি। এদের নীচে থাকে চর্ব্বি। এর ওপরে মাঝে মাঝে কতকগুলি শৃঙ্গের মত জিনিষ আছে। সেগুলির নাম প্যাপিলা (papilla) তাদের মাথায় থাকে অসংখ্য স্পর্শেন্দ্রিয়। তার কোনটি দিয়ে আমরা উষ্ণতা অনুভব করি, কোনটি দিয়ে শীতলতা, কোনটি দিয়ে বা ব্যথা—এই রকম সব অনুভূতিরই স্বতন্ত্র প্যাপিলা আছে। প্যাপিলার সংখ্যা করতলে বেশী, তার মধ্যে তর্জ্জনীতে সব থেকে বেশী। সেই জন্যে তর্জ্জনীর অনুভব-শক্তিও সব অঙ্গ থেকে বেশী।

দেহ-চর্ম্মে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এর মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে লোমকূপ—অর্থাৎ তাদের মধ্যে মানব-দেহের লোম প্রোথিত থাকে। লোমকূপের চার পাশে খুব ছোট ছোট মাংসপেশী আছে। শীত লাগার ফলে কিম্বা ভয়ে বা আনন্দে সেগুলি সঙ্কুচিত হয় বলেই লোম দাঁড়িয়ে ওঠে এবং আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। লোমকূপে এক জাতীয় গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ জন্ম হয় বলে দেহ-লোম সব চকচকে আর তেলা থাকে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে লোম স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজও খানিকটা করে।

লোমকূপ ছাড়া অন্য যে সমস্ত ছিদ্র চর্ম্মের ওপরে আছে, তারা হচ্ছে ঘাম বেরোবার পথ। স্বেদ-গ্রন্থিদের কাজ হচ্ছে রক্তের ক্লেদ ছেঁকে নিয়ে ঐ সব ছিদ্র দিয়ে বাইরে পাঠান। ঘাম আমাদের সমস্ত অঙ্গ দিয়ে সব সময়ে বাইরে এলেও, হাত আর পা-ই বেশী ঘামে। এর কারণ, করতলে আর পদতলে লোমকূপের সংখ্যা কম আর ঘর্ম্ম-ছিদ্রের সংখ্যা বেশী। শরীরে যেখানে লোমকূপের সংখ্যা বেশী, সেখানে আবার ঘর্ম্ম-ছিদ্রের সংখ্যা কম।

ঘাম দেখা যায় আবহাওয়ার ফলে। শুকনো এবং গরম আবহাওয়ায় ঘাম সহজেই বাষ্প হয়ে যায় বলে দেখা যায় কম। কিন্তু স্যাঁৎ-সেঁতে আবহাওয়ায় ঘাম শুকোয় না বলে দেখা যায় বেশী। যাই হোক, মোটামুটি প্রায় এক সের পরিমাণ ঘাম রোজ আমাদের ঘর্ম্ম-ছিদ্র দিয়ে দেহ-চর্ম্মের বাইরে আসে।

ঘাম যে শুধু ময়লা পরিষ্কার করে তা নয়, দেহের চর্ম্ম এবং রক্তকে ঠাণ্ডা রাখতেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

চর্ম্ম দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও খানিকটা হয়, তবে খুবই সামান্য। মানুষের দেহচর্ম্ম পুরু বলে চর্ম্ম দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান সম্ভব হয় না, কিন্তু ব্যাঙের ফুস্‌ফুস্ কেটে বাদ দিলেও তারা পাতলা দেহ-চর্ম্মের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

দেহ-চর্ম্মের পরিচয় মোটামুটি দেওয়া হল। এখন কি করে সেই চর্ম্মকে ঠিক মত বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে কথা আলোচনা করা যাক্।

তেল বেশ ভাল ভাবে মালিশ করলে দেহ-চর্ম্ম সুস্থ থাকে। তার কারণ,—(১) দেহ-চর্ম্ম কিছু তেল শুষে নেয়; (২) মালিশে রক্ত-চলাচলের উন্নতি ঘটে; (৩) অধস্ত্বকের নীচেকার চর্ব্বি ক্রমশঃ সরে যায়; (৪) লোমকূপ এবং ঘর্ম্ম-ছিদ্র সতেজ হয়। তবে মালিশ করার পর ভাল করে তেল তুলে ফেলতে হবে। মালিশের পরে স্নান করলে অধিত্বকের মৃত কোষগুলি সহজেই উঠে যায়।

দেহ-চর্ম্মের সৌন্দর্য্য হচ্ছে স্থায়ী সৌন্দর্য্য। মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গের চর্ম্মকে সতেজ এবং টান রাখতে হলে নিয়মিত মালিশ করা দরকার। অবশ্য এই মালিস করতে খুব বেশী সময় ব্যয় করবার দরকার করে না।

এ ছাড়া ব্যায়াম করলে চর্ম্মের রক্তনাড়ীগুলি স্ফীত হয় এবং যথেষ্ট ঘাম হতে থাকে। তার ফলে শরীরের ক্লেদ দূর হয় আর চর্ম্ম মসৃণ ও সতেজ হয়।

পারিবারিক অশান্তি

বিবাহের সময় আমরা বেশ একাগ্র মনেই মন্ত্র পড়ে' বলি, স্বামীর হৃদয় পত্নীর হোক; পত্নীর হৃদয় হোক স্বামীর হৃদয়—দু'জনের হৃদয় মিলে এক হোক, অভিন্ন হোক! কিন্তু বিবাহের পরে কোনো ক্ষেত্রে দু'-চার বছর, কোনো ক্ষেত্রে বা পাঁচ-সাত বছর স্বামি-স্ত্রীর মনে-মনে পূর্ণ প্রশান্ত মিলন দেখা যায়; তার পর সংসারের নানা অবস্থায় নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দু'জনের সম্পর্ক প্রায়ই দাঁড়ায় বিরস বৈচিত্র্যহীন। স্বামী দেখেন স্ত্রীর চলায়-বলায় নানা ত্রুটি, বেশে-ভূষায় কতই খুঁৎ। স্বামী ভাবেন, স্ত্রী যেন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কি হয়ে উঠেছেন! স্বামী তখন স্ত্রীর সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীন হয়ে ওঠেন —অর্থাৎ উনি ছেলে-মেয়েদের দেখছেন, সংসার-তরণীর হাল ধরে

আছেন। পাঁচটা আসবাবের সামিল হয়ে স্ত্রী তখন সংসারে বাস করেন। স্ত্রীদের মধ্যে অনেকে সংসার আর ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেদের এমন ভাবে নিমজ্জিত রাখেন যে, স্বামী শুধু তাঁর কাছে সংসার-চক্র চালাবার এঞ্জিনমাত্র বলে অনুভূত হয়।

এমনি ভাবে বহু সংসার শৃঙ্খলা-পারিপাট্যহীন হয়। হাসি-গান সৌন্দর্য্য-শান্তির লীলাভূমির বদলে সংসার হয় যেন অফিসের মত, কল-কারখানার মত! কর্ম্মক্লান্ত স্বামী সংসারে ফিরে যেমন শান্তি পান না, স্ত্রীও তেমনি নির্জ্জীব মেশিনে পরিণত হন। দু'জনেরই মনের অপমৃত্যু ঘটে।

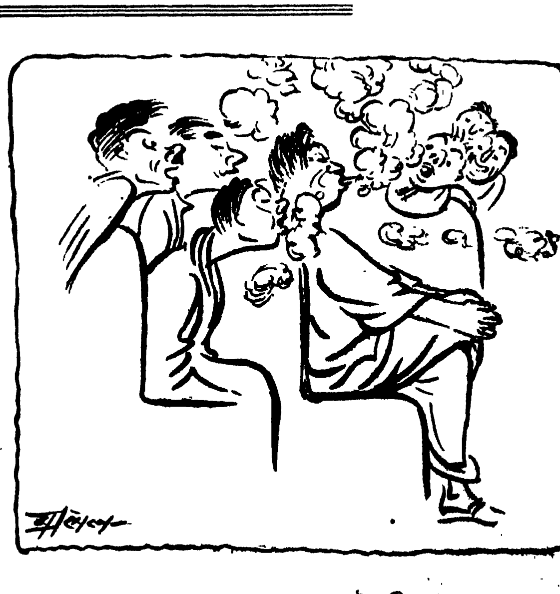
এমন ঘটার প্রধান কারণ—প্রথম মিলনের রহস্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না। হতে পারে না। রোমান্সের আমেজ কাটলে স্বামি-স্ত্রী মোহের আবরণ-মুক্ত এবং পরস্পরের কাছে নিজেদের দীনতা ও দোষগুণ-সমেত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেন। দু'জনেই দেখেন, কাব্য-নাটক-উপন্যাস পড়ে কল্পনার রঙে মিলনের যে-ছবি দু'জনে মনের পটে আঁকতেন—আঁকা-ছবির সে আদর্শের ধারেও কেউ দাঁড়াতে পারেন না! তখন বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ স্বার্থ-খেয়ালের কথা ভুলে তাঁরা পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকেই শুধু বড় করে দেখেন! সে দোষ-সন্নিপাতে গুণাবলী কোথায় চাপা পড়ে যায়! কাজেই অশান্তির বোঝা মনের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে।

এ-অশান্তি-মোচনের উপায়—স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে যদি বাস্তব জগতের জীব বলে মনে করেন, এবং তা মনে করে' পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ঘোরালো রকম করে না দেখে সহজ ভাবে দেখেন, সহজ-সরল ভঙ্গীতে পরস্পরকে মানিয়ে বনিয়ে নিতে পারেন! দু'জনে যদি বোঝেন, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা শুধু বাছা-বাছা কথা বলে, বাছা বাছা ঘটনা নিয়েই তাদের বাস; বাস্তব জীবনের নর-নারীর পক্ষে নায়ক-নায়িকার লিখন-লিপি নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়—তা হলে মনের এ ব্যাধির উপশম ঘটতে পারে। তাছাড়া সংসারে সকলকে নিয়ে, সকলকে সয়ে, সকলকে মানিয়ে বনিয়ে বাস করতে হবে। সকলের সুখ-দুঃখ সাধ-আশা এমন ভাবে বিজড়িত যে, এক জনকে উপেক্ষা করলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকা যাবে না—এটুকু বুঝে চলা চাই! স্বামী যদি চান, স্ত্রী তাঁর ছায়া মাত্র হবে—এবং স্ত্রী যদি চান, স্বামী তাঁর ইঙ্গিতে নড়বেন ফিরবেন, তাহলে তাঁদের মূঢ়তার সীমা থাকবে না। মানুষ রক্ত-মাংসের জীব,—কলের পুতুল নয়। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে ও ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা-সম্মান করে যদি প্রত্যেকে চলেন, তাহলে আপনা থেকেই বহু দোষ-ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। দু'জনে যে মন্ত্র পড়েছিলেন—দুইটি হৃদয় মিলে এক হোক—সেই মন্ত্র মেনে মনের বাঁক ঘুরিয়ে সিধা সরল করুন, তবে তো মনে-মনে মিলবে। মনে-মনে মেলাবার চেষ্টা যিনি না করবেন, তাঁর দুর্ভাগ্য বিধাতাও ঘুচোতে পারবেন না! স্বামী মানুষ—স্ত্রীকেও তেমনি মানুষ বলে মানা তাঁর চাই। সে-মানা মানতে পারলে বহু অসন্তোষের দায় কাটিয়ে শান্তি-সুখের সন্ধান মিলবে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনের পক্ষেই এ একেবারে অবিসম্বাদি সত্য কথা।

সিগারেট নাই



খুকী, শাড়ী বে-সামলে চল'!
(পুড়িবার ভয় নাই)



(ধূমপানের নূতন টেকনিক)

প্রাণেন——



[উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৩০

সুশীলের মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া সরস্বতী আসিল কালোর বাড়ীতে। ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া কালিন্দী পড়িয়া আছে। চোখের জলের কালিতে মুখের চেহারা যা হইয়াছে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

সরস্বতী আসিয়া সস্নেহে তাকে কাছে বসাইল, তার পর বলিল—এ কী চেহারা করেছিস রে, এঁ্যা! যা, মুখ-হাত ধুয়ে আয়!

কালি নড়ে না। নন্দর মাকে দিয়া জোর করিয়া হাত ধোয়ানো হইল। তার পর কালোর মাকে সরস্বতী বলিল—বাড়ীতে দুধ নেই এক-ছিটে?

কালোর মা বলিল—না মা, দুধ আর কার জন্য থাকবে!

—কোনো খাবার?

—মুড়ি আছে, বাতাসা আছে!

—খেতে দিয়েছিলে?

—না। কালোর মা বলিল—খেতে দেবো কি! শুনে ইস্তক মাথার কি ঠিক আছে পিসিমা! আফিং থাকলে তাই দিতুম! কালামুখী কি করে বসলো বলো তো! কালোর মায়ের চোখে জলধারা বহিল।

সরস্বতী বলিল—এখন কেঁদে ফল? আগে থাকতে মেয়েকে সাবধানে রাখতে পারিস্‌নি? নে, মায়া-কান্না রাখ্‌। মুড়ি-বাতাসা নয়, আমাদের ওখানে যা তো তুই নন্দর মা, গিয়ে মতির মার কাছ থেকে আমার নাম করে এক-বাটি দুধ চেয়ে নিয়ে আয়! বলবি, পিসিমা চেয়েছে···পিসিমার দরকার। যদি জিজ্ঞাসা করে, কার জন্য দরকার? তাহলে বলিস্‌, পিসিমা বলতে পারে; তুই তার কিছু জানিস্‌ না।—বুঝলি! এখানকার কোনো কথা বলিস্‌ নে যেন! বিপদে মানুষ ভালো করতে না পারুক, মন্দ করতে ছাড়ে না!

সরস্বতীর কথায় নন্দর মা গাঙ্গুলি-বাড়ীতে গেল দুধের জন্য।

তার পর মমতা-ভরে কালিন্দীকে সরস্বতী নানা প্রশ্ন করিল। লজ্জায় কালিন্দী যেন মরিয়া আছে! অথচ সরস্বতীর এমন স্নেহ··· প্রাণ তার বিগলিত হইয়া গেল! কোনো মতে সব কথা সে খুলিয়া বলিল। নিজের দোষ কোন্‌খানে, তাহাও অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিল।

সরস্বতী বলিল—হুঁ। তা একটা পাপ তুমি করেছো বলে আর একটা পাপ করতে যাচ্ছ! আত্মঘাতী হবার মানে, আর-একটা প্রাণি-হত্যা! সে নিরীহ···কোনো অপরাধ করেনি, পাপও করেনি।

কাঁদিয়া কালিন্দী লুটাইয়া পড়িল, বলিল—আমার কি হবে?

সরস্বতী বলিল—এ কথা আগে ভাবা উচিত ছিল, মা।

কালো বলিল—বোন্‌···আমি ফেলতে পারি না পিসিমা। কিন্তু পাঁচ জনকে নিয়ে বাস করি। তাছাড়া আমার শ্বশুর-শাশুড়ী···

সরস্বতী বলিল—শ্বশুর-শাশুড়ীর কি ধার তুই ধারিস্‌ যে নিজের মায়ের পেটের বোনকে ঘরে ঠাঁই দিতে তাদের ভয় করবি!

কালোর মা বলিল—আমাকে তাহলে কাশী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুক কালো। আমি মন্তর নিয়েছি···আমার দেবতা আছে, ধর্ম্ম আছে।

ধমক দিয়া সরস্বতী বলিল—দেবতা আর ধর্ম্ম তোকে দেখবে ভাবিস্‌, কালোর মা, এত বড় বিপদে পেটের সন্তানকে ঠেলে বাড়ীর বার করে' দিলে? আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে—এ-কথা ছেলে-মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হয়। না বুঝে না জেনে ছেলেমেয়ে আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়ালে তাকে দেখবিনি, বিদায় করে নিজের স্বার্থ-সুখ খুঁজবি? এ তোর ভালো বিচার-বিবেচনা বটে!

এত কথা বলিয়া সরস্বতী আবার চাহিল কালিন্দীর পানে। সে একেবারে চোরের অধম হইয়া নুইয়া ভাঙ্গিয়া আছে। সরস্বতীর মনে মমতা হইল। সরস্বতী বলিল—ওর ভার কাকেও নিতে হবে না, আমি নেবো। এখন ওকে নিয়ে গিয়ে বৌঠাকরুণের কাছে রাখবো। তার জাত নেই, কালিরও জাত গেছে। সে জাত-হারার কাছে এ জাত-হারা আরামে থাকবে।···তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—ভেবেছিলুম, এদিককার সব চুকলে ফিরে যাবো! তা আর হবে না! এ এক নতুন গেরো পায়ে বাধলো। ভালোয়-ভালোয় দু'টো দু'ঠাই হোক, দেখি, তার পরে যাওয়া!

কালোর মা চমকিয়া উঠিল, বলিল—বলো কি গো পিসিমা! তুমি বামুনের ঘরের বিধবা···আচার-নিষ্ঠা মেনে চলো···তুমি এই অনাছিষ্টি ব্যাপারে···

কঠিন কণ্ঠে সরস্বতী বলিল—মানুষ যখন বিপদে পড়ে কালোর মা, তখন তাকে দেখাই হলো সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম, বুঝলি!··· নিখুঁৎ আমরা কেউ নই! কিন্তু যাক, বাঁচলুম তোর তত্ত্বকথার দায় থেকে! নন্দর মা আসছে।

নন্দর মা আসিল। তার হাতে বড় বাটি-ভরা এক-বাটি দুধ, আর কিছু মিষ্টান্ন।

সরস্বতী বলিল—আয় কালি, এইখানে এসে বোস্‌, বসে মুখে কিছু দে দিকিনি।

নন্দর মার হাত হইতে মিষ্টান্ন এবং দুধের বাটি লইয়া সরস্বতী বলিল কালোকে—একখানা রেকাবি-টেকাবি আছে রে কালো?

—আছে পিসিমা।

—আমাকে এনে দে।

—দি।

কালো রেকাবি ধুইয়া আনিল। সরস্বতী রেকাবিতে সাজাইল দু'টি সন্দেশ, দুখানি বালুসাই-গজা এবং দু'টি রসগোল্লা। তার পর কালিকে বসাইয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

নন্দর মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল। কালিন্দীর খাওয়া চুকিলে সরস্বতীর পায়ের কাছে গলবস্ত্র হইয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—তুমি মানুষ নও গো পিসিমা, দেবতা। দাও, একটু পায়ের ধূলো দাও···কৃতার্থ হই।

কালিন্দীকে আনিয়া বিন্দুমতীকে বলিয়া সরস্বতী তুলিল তাঁর কাছে। কালিন্দীর চেহারা দেখিয়া কাঁটা হইয়া বিন্দুমতী বলিলেন,—গায়ে দাগড়া-দাগড়া এ সব কিসের দাগ রে কালি?

কালিন্দী বলিল, এ দু'দিন শ্বশুর-বাড়ীর লোক-জন তাকে দেখ-মার করিয়াছে! শেয়াল-কুকুর মারার মতো! বলিল, এখানে আসিয়াও সেই দূর-ছাই!

বিন্দুমতী বলিল—আহা! আমার কাছে তুই থাক্ কালি··· যত দিন আমি বেঁচে আছি, নিরাশ্রয় হবি নে। তার পর যাবার সময় তোর···আর এত দুর্গতির মধ্যে যেটা আসছে···তোদের দুজনেরই দুটি অন্নের আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা যেমন করে' হোক, আমি করে যাবো।

৩১

চার মাস পরের কথা।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। কেশব-ঠাকুরের গৃহে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া কদম একখানা বাংলা বই পড়িতেছে; সঙ্গে সঙ্গে হেঁসেল চৌকি দিতেছে। কেশব ঠাকুরের খাওয়া হয় নাই। বেলা দশটায় ফিরিবার কথা···এখনো দেখা নাই। কদম তার আগে খাইতে পারে না। ছেলেরা খাইয়া যে যার ধান্দায় বাহির হইয়া গিয়াছে। হাতে কাজ নাই, তাই সময় কাটাইবার জন্য কদম বই লইয়া বসিয়াছে। বই তার প্রাণ। জীবনের চারি দিকে মস্ত প্রাচীর তোলা···সে প্রাচীরের বাহিরে কি আছে, সে পরিচয় লইবে, তার সুযোগ নাই! নভেলের পাতায়-পাতায়, কাব্য-নাটকের লাইনে-লাইনে তার মন যে আরাম পায়, তার জোরেই সে বাঁচিয়া আছে।

কদম পড়িতেছিল রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য। সুশীল তাকে এ বই আনিয়া দিয়াছে। কদম বলিয়াছিল,—বই পড়তে পেলে আমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। সকলের সব অত্যাচার আমি ভুলে যাই তাতে! সুশীল বলিয়াছিল,—সুবিধা হলেই আমি তোমাকে বই এনে দেবো, কদম। সে-কথা রক্ষা করিয়া সুশীল তাকে আনিয়া দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের রাজা-রাণী, সোনার তরী আর মানসী; তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের দু'-চারখানা উপন্যাস।

কদম পড়িতেছিল—

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে।
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে!

পড়িতে পড়িতে বুকের মাঝখানটা যেন হু-হু করিতেছিল! মনে হইতেছিল, আশে-পাশে এত বাড়ী-ঘর এত লোক-জন···তার কি দুঃখ, কেহ বোঝে না! সব যেন পর, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত···

এমন সময় কেশব-ঠাকুর আসিয়া দেখা দিল। রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি··· বলিল—এই যে, এখানে বসে!

কদমের মনের মধ্যকার মায়া-পুরী সে স্বরে কাঁপিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কদম চাহিল কেশবের পানে। মুখের ভাব দেখিয়া কদমের মুখে কথা ফুটিল না; সে চুপ করিয়া রহিল।

কেশব-ঠাকুর বলিল—বড় গিন্নীঠাকরুণের ওখানে তোমার আর যাওয়া হবে না···পাঁচ জনে আপত্তি করছে।

বড় গিন্নীঠাকরুণ মানে বিন্দুমতী।

কদম এ-কথা শুনিল। শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল···কথার জবাব দিল না।

গায়ের উড়ানিখানা দাওয়ায় ফেলিয়া কেশব-ঠাকুর বসিল সিঁড়ির উপর। সিঁড়ির উপরে ছায়া। বসিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল,—কালোর বোনটা ওখানে রয়েছে···হাজার হোক নষ্ট-দুষ্টু মেয়েমানুষ তো···ওঁরা দয়া-ধর্ম্ম করে ওকে ঠাঁই দিলেও ও-সব মেয়েকে শাসিত করা চাই, নাহলে বিপত্তি ঘটতে পারে।

কদম এবার কথা কহিল···বলিল,—কিন্তু তার হাতের রান্না খেতে যাচ্ছি না। সে রান্না-বান্না করে না। বাড়ীতে দাসী-চাকর রাখা হয়···কে কেমন মানুষ, তার কত খপরই বা কে রাখে! মানুষের হাওয়ায় বিষ থাকে না।

কদমের মুখে এ-কথা শুনিয়া কেশব-ঠাকুর চমকিয়া উঠিল। বলিল,—হাওয়ায় বিষ আছে, কি না আছে, অত তত্ত্ব-কথায় তোমার দরকার নেই। গাঁয়ে দশ ঘর যজমান নিয়ে আমাকে চলতে হয়··· তারাই ভরসা। তারা যদি আপত্তি করে···কাজ কি তোমার ও-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করার!

কদম বলিল—জ্যাঠাইমা আমাকে ভালোবাসেন, আমি তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি।

কেশব-ঠাকুর বলিল—আমিও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি···তাছাড়া ছেলের ব্যাপার নিয়ে যে ঘোঁট হয়েছিল, তা মিটে আসছিল···হয়তো মিটে যেতো। কিন্তু এখন ঐ কালোর বোনটার জন্য···

কদম বলিল—ওকে যদি উনি আশ্রয় না দিতেন, তাহলে মেয়েটার কি গতি হতো বলতে পারো?

ঝাঁজিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল—চুলোয় যাক্ ও সব মেয়ে। ওদের গতির জন্য মাথাব্যথা করা উচিত নয়।···

কদম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তার পর ধীর কণ্ঠে বলিল—কিন্তু ওকেই শুধু তোমরা দোষী করছো কেন? যে ওর এ-সর্ব্বনাশ করেছে···

বাধা দিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল—পুরুষ-মানুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের তুলনা হয় না! পুরুষ আর মেয়েমানুষ যদি সমান হতো তাহলে মেয়েরা কাছা-কোঁচা দিয়ে কাপড় পরতো।···যাক্‌গে অত কথা! এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। এ ব্যাপার নিয়ে রীতিমত গোল বেধেছে। অক্ষয় বাবুর বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় সত্যনারাণ পূজা আছে···আমাকে ডেকে পাঁচ জনের সামনে সকলে মিলে বলেছে, তোমার পরিবার বড়গিন্নীর ওখানে যদি হামেশা যাওয়া-আসা করে ভট্‌চাজ, তাহলে পুজো-পার্ব্বণের কাজ করতে অন্য পুরুতের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই বুঝছো, যজমান রাখতে হলে তাদের কথা মানা ছাড়া আমার উপায় নেই!

কদম কোনো জবাব দিল না···বই হাতে দাওয়া হইতে নামিল।

কেশব-ঠাকুর বলিল,—আমি গিয়ে বড়-কর্ত্তাকে কথাটা বললুম। শুনে তিনি বললেন, যা উচিত মনে করবে, করো···এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কাজেই বুঝছো···অর্থাৎ বড়-কর্ত্তা তো এক রকম সংসার থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। ওঁরা হলেন বড় লোক···ওঁরা যা করেন, সব মর্জ্জিমাফিক···আমাদের মতো ছোট-খাটো মানুষের মর্জ্জি বলে কোনো-কিছু থাকতে পারে না তো!

কদম দাঁড়াইয়া এ কথা শুনিল···তার পর কি মনে হইল, বলিল,—এত দিন তো তুমি মানা করোনি!

—না। তার মানে, পাঁচ জনে এতে তখন আপত্তি করেনি···

কদম বলিল—আজ পাঁচ জনে আপত্তি করেছে বলেই তোমার আপত্তি!

কেশব বলিল—ও-কথা ভাববার খেয়াল এত কাল আমার হয়নি। পাঁচ জনের কথায় ভেবে দেখছি, এ সবে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়··· খুবই অন্যায়!

—জ্যাঠামশাইকে গিয়ে এ-কথা বলো না কেন? তাঁদের পুরোহিত তো তুমি···তাঁর মঙ্গলামঙ্গল···

কথাটায় রীতিমত শ্লেষ! কেশব-ঠাকুর তাহা উপলব্ধি করিল; বিরক্ত হইল। কিন্তু সে বিরক্তি চাপিয়া বলিল—ওঁরা পয়সাওলা মানুষ···কারো মতামতের তোয়াক্কা রাখেন না। কেনই বা তাঁকে আমি এ কথা বলবো? বললেই বা তিনি শুনবেন কেন?···আমার আসল কথা, তুমি আমার স্ত্রী···তুমি যদি ওখানে যাওয়া-আসা করো, তাহলে পাঁচ জনে আমার সংস্রব ত্যাগ করবে···বুঝলে?

কদম বলিল—বুঝেছি।

এইটুকু মাত্র বলিয়া কদম গিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যথাস্থানে বই রাখিয়া তখনি বাহির হইয়া আসিল; বলিল—জল-গামছা সব ঠিক করে রেখেছি···মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি তোমার ভাত বাড়ি। বেলা একটা বেজে গেছে!

কেশব-ঠাকুর বলিল—ভাত এ বেলায় খাবো না। অক্ষয় বাবুর ওখানে সত্যনারাণ পূজা করতে হবে। আমাকে দু'খানা লুচি ভেজে দাও বরং।

—দিচ্ছি।

বলিয়া কদম আবার গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। উনুন নিবিয়া গিয়াছে। কোণ হইতে একগোছা শুকনো নারিকেল পাতা আনিয়া উনুনে গুঁজিয়া দিল; তার পর···

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কেশব গিয়া বিছানায় দেহ-ভার এলাইয়া দিল; কদম নিজের জন্য থালায় ভাত বাড়িল।

খাইতে বসিয়াছে, বড় ছেলে বিপিন আসিয়া হাজির। বলিল—বাবা বাড়ী আছে?

মাথা নাড়িয়া কদম জানাইল, আছে।

বিপিন বলিল—সুশীল বাবু এক কীর্ত্তি করেছেন!

কদম শিহরিয়া উঠিল। সুশীল তবে ফিরিয়াছে? আজ দু'মাস সুশীল এখানে নাই। বলিয়া গিয়াছিল, জরুরি কতকগুলা কাজের জন্য বাহিরে চলিয়াছে!

কিন্তু কীর্ত্তি! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কদম চাহিয়া রহিল বিপিনের পানে। বার্ডসাইটাকে টানিয়া নিঃশেষ করিয়া পোড়া টুকরাটুকু উঠানে ফেলিয়া দিয়া বিপিন বলিল—কালির সেই গুণ্ডাওর···মানে যে,··· অর্থাৎ তাকে নিয়ে একটু আগে এখানে ফিরে এসেছেন। বলেন—কালিকে বিয়ে না করিয়ে তাকে ছাড়বেন না! গুণ্ডাওরটার বেশ ভদ্র চেহারা! গায়ে পাঞ্জাবি জামা, পায়ে পাম্‌শু···

কদমের বিস্ময়ের সীমা নাই! কদম বলিল—তুমি দেখেছো না কি?

পুকুরের পাড় দিয়েই যে উনি ফিরলেন। বললুম—এ কে? তাতেই এ-কথা বললেন।

কদম বলিল—লোকটা ভালো মানুষের মতো ওঁর সঙ্গে এলো?

—ভাব-গতিক ভালো মানুষের মতোই দেখলুম। কি জানি তাকে ভয় দেখিয়েছেন, না, লোভ দেখিয়েছেন!···এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহা উৎসাহে ডাকিল,—বাবা,—বাবা···ঘুমোলে না কি?

ঘরের ভিতর হইতে কেশব-ঠাকুর সাড়া দিল,—হতভাগা ছেলে! খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করবো, তার জো নেই!

—আর বিশ্রাম! নাও, এ-বিয়ে দিতে পারো তো কিছু দাঁও মেরে দেবে···হ্যাঁ হ্যাঁ···

—দাঁও! ঘর হইতে কেশব-ঠাকুর বলিল। স্বর এবার শান্ত··· কেশব-ঠাকুর বলিল,—কার বিয়ে? কিসের বিয়ে?

বিপিন বলিল—তোমাদের ঐ কালোর বোন কালিন্দীর গো।

—কালিন্দীর বিয়ে!

কেশব-ঠাকুর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না···বাহিরে আসিল।

বিপিন বলিল, যে কথা শুনিয়া আসিয়াছে।

কেশব-ঠাকুর বলিল—ও মেয়ের আবার বিয়ে হয় না কি? হুঃ! কে বিয়ে দেয় দিক দেখি! আমাকে লক্ষ টাকা দিলেও আমি ও-কাজে নেই।

বিপিন বলিল—দিলে বহুৎ টাকা মেরে দিতে পারো···

কেশব-ঠাকুর বলিল—টাকার লোভে জাত-জন্ম বিসর্জ্জন দিতে হবে? সে-লোভ যদি আমার থাকতো বাপু···

বাপের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিপিন বলিল—জাত-জন্ম নিয়ে ধুয়ে খেলে দুঃখ ঘুচবে না। কে কত মানছে, দেখছি তো! যার যেখানে স্বার্থ। তোমার পয়সা নেই, তাই তোমাকে কেউ মানে না। যার পয়সার জোর আছে, সে সব-কিছু করে' তরে যাচ্ছে।

কেশব-ঠাকুর বলিল—ও কথা বলিস নে, পাপ হবে। আমাদের বড়-কর্ত্তা···পয়সার জোর এ গ্রামে কার আর অত আছে? তবু তো তিনি অমন ছেলেকে, তার পর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন।

বিপিন বলিল—তুমি যাই বলো, ও-কথা আমি মানি না। আমি বুঝি, ম্যনি ম্যনি ম্যনি···ব্রাইটার দ্যান্ সান-শাইন, সুইটার দ্যান হনি।···দু'পয়সা যেখান থেকে আসে। পয়সার মান আমি সবার আগে রাখবো।···এ বিয়ে দিতে কেউ না রাজী হয়, আমি রাজী।

কেশব-ঠাকুরের মুখ গম্ভীর হইল। কেশব বলিল—তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বুক ফুলাইয়া দম্ভভরে বিপিন বলিল—তাতে আমাকে রাজ্য কি রাজ-সিংহাসন খোয়াতে হবে না।

কেশব-ঠাকুর চটিল; বলিল—এই কথা বলতে এসেছিস! তো যা খুশী কর্, গিয়ে, আমার কিছু বলবার নেই।···বড় হয়ে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছো।

বিপিন বলিল—শিখেছিই তো! এত কাল এত যজমান নিয়ে বাস করলে, নিজের অবস্থাটা ফিরতে পেরেছো। পয়সা না থাকলে কেউ দেখবে না, সার কথা আমি বুঝেছি। পয়সা যদি করতে প

ধমক দিয়া কেশব-ঠাকুর বিপিনকে নিবৃত্ত করিল।

বিপিন বলিল—খবরটুকু শুধু দিতে এসেছিলুম।

বিপিন চলিয়া গেল। কেশব-ঠাকুর গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কদম কথাগুলা শুনিয়াছিল। খাওয়া চুকিলে মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া কেশবের পানে চাহিয়া বলিল—কি ভাবছো?

কেশব-ঠাকুর বলিল—বিপিনের কথা শুনেছো?

—শুনেছি।

—বামুন-পুরুতের ঘরে জন্মে হতভাগার এমন মতিগতি!

কদম বলিল—পয়সার লোভে যা-তা করা উচিত, এ কথা বলছি না, তবে কালির এ বিয়েতে বাধা দিলে অধর্ম্ম হবে।

—অধর্ম্ম! কেশব-ঠাকুরের দু'চোখে আগুন জ্বলিল।

কদম বলিল—আমি পণ্ডিত নই, শাস্ত্রও পড়িনি। তবে এটুকু বুঝি, মেয়েটার ইহজন্ম ঐ বিয়ে ছাড়া রক্ষা পাবে না।

—অমন মেয়ের ইহজন্ম রক্ষা না পাওয়াই উচিত। এ বিয়েতে মত দিলে অনাচার প্রশ্রয় পাবে। এ স্রোতে লোকে গা ভাসিয়ে দেবে। তখন?

কদম বলিল—অত-শত বুঝি না, তবে সুশীল বাবু বলছিলেন···

কথা শেষ হইল না। কেশব-ঠাকুরের চোখের আগুনে আরো তেজ! কেশব-ঠাকুর বলিল—সুশীল বাবু তোমার ইষ্টদেবতা হতে পারেন, কিন্তু আমার নন যে তাঁর কথা শিরোধার্য্য করতে হবে!

এ শ্লেষ কদমের মর্ম্মে বিঁধিল!. কদম বলিল—তোমাদের ইষ্টদেবতা নেমে এসে যদি দেখা দিতেন, তা হলে শাস্ত্র-পুরাণের নাম নিয়ে তোমরা মানুষের উপর এতখানি অবিচার করতে পারতে না!

—অবিচার!

কদম ভাবিল, কাহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেছে? ফল? তাই চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্ত স্বরে বলিল—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ···শাস্ত্র পড়িনি···আমাকে তুমি যেমন হঠাৎ বোঝাতে পারবে না, আমিও তেমনি তোমাকে বোঝাতে পারবো না!

কথাটা বলিয়া কদম সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেশব-ঠাকুর বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর একটা চিল ডাকিয়া উঠিল, কোথায় বুঝি, লোভনীয় কিছু দেখিয়াছে!

(ক্রমশঃ

অশ্রু-অর্ঘ্য

কিরণচন্দ্র ঘোষ

বহুবাজারের প্রসিদ্ধ জুয়েলার কে, সি, ঘোষ এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১২ই জানুয়ারী রাত্রি ১-৩০ মিনিটে বৈদ্যনাথধামে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার বি, সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু, অজাতশত্রু ও দানশীল ছিলেন! তাঁহার ২ পুত্র, ২ কন্যা, বিধবা ও নাতি-নাতনীরা বর্ত্তমান।



কিরণচন্দ্র ঘোষ

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

বাঙ্গালার সুপরিচিত অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ২৮শে মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। কিছু দিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপ-বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের ও চিত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল।

বলাইচন্দ্র সেন

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলাইচন্দ্র সেন মহাশয় ১১ই ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহারই আপ্রাণ পরিশ্রমে ও রিপ্রেণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং পিওর ড্রাগস্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি একাধারে ব্যবসায়ী এবং শিল্পী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার প্রচুর দান ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার দানে কালনার মিউনিসিপ্যাল-হাসপাতাল, অম্বিকা হাইস্কুল ও কালনা কলেজ পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অকাল বিয়োগে বাঙ্গালা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইল।



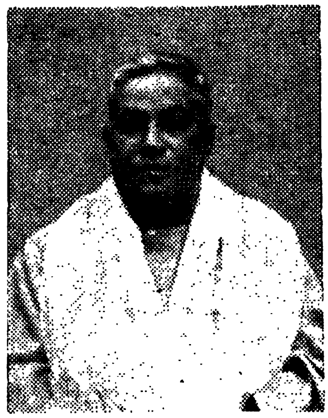
বলাইচন্দ্র সেন

বিভূতিভূষণ সরকার

২৫শে ফাল্গুন বহুবাজার ষ্ট্রীটের "গিনি হাউস"এর সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার বি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেডের সিনিয়র ডিরেক্টার পরলোকগত বি, সরকার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে তিনি রক্তের চাপ-বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা, পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমান। যশোহর



বিভূতিভূষণ সরকার



অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

জিলার যাত্রাপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বগ্রামের কথা কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া গ্রামের উন্নতিতে তাঁহাকে বরাবরই সচেষ্ট দেখা যাইত। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও দানশীল ছিলেন। গত দুর্ভিক্ষে তিনি মুক্তহস্তে হাজার হাজার লোককে অন্ন ও বস্ত্র দান করেন। "গিনি হাউস"এর বিশ্ববিশ্রুত সুনামের মূলে তাঁহার অধ্যবসায় ও সাধুতা বিদ্যমান ছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এইচ, ডি, বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এইচ, ডি, বসু ২০শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ, এস, আর, দাশ, এবং স্যার বিনোদ মিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। আইনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও মার্জ্জিত রুচির সংযোগে তাঁহার ব্যবসা ও ব্যক্তিত্ব দুই-ই প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করে। একাধিক-বার তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজ স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতা হাইকোর্ট এক জন বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী, অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং অমায়িক বন্ধু হারাইল।

কে, এস, গুপ্ত

কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের বিশিষ্ট সদস্য কে, এস, গুপ্ত ৬ই মার্চ অপরাহ্ণে পরিষদ-কক্ষেই অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং কিছুক্ষণ পরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরিষদের অধিবেশন কিছু ক্ষণ বন্ধ রাখা হয় এবং ডাঃ দেশমুখ ও অন্যান্যেরা তাঁহার চেতনা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পাবলিসিটি সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪শে ফাল্গুন পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছু কাল যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রচার-ক্ষেত্রে এক জন অগ্রণী প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠান ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।

খেলাধূলায়ও তাঁহার বিশেষ সখ ছিল, কলিকাতায় প্রথম রেফারিগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, অতিথি-পরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র এবং পরিবার তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইত।

আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ৮ই ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ব্যবসায়ে সাফল্য এবং বৃহত্তম বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন-কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া শিক্ষা-নবীশরূপে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে নিজে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন—ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী সুনাম অর্জ্জন করে।



সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এক জন প্রকৃত ব্যবসায়ী এবং দেশহিতৈষীকে হারাইল। ভারতের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

গোরক্ষপুরে এ বৎসর নিখিল ভারতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভূপাল দল শেষ খেলায় মাত্র এক গোলে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে।



এম, ডি, ডি

হায়দ্রাবাদকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া যুক্তপ্রদেশ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে। যুক্তপ্রদেশের মুস্তাকের খেলা বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। মধ্যপ্রদেশ মধ্য-ভারতের নিকট ৭ গোলে শোচনীয় ভাবে বিপর্যস্ত হয়। টিকমগড়ের প্রাক্তন খেলোয়াড় জাহীর মধ্যভারতের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মাশুদ একাকী পাঁচটি গোল করেন ও অবরোধ প্রয়াসে কুশলতার পরিচয় দেন। গোলরক্ষক সাকী অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত গোলরক্ষা করিয়াও বরোদাকে ভূপালের বিরুদ্ধে ৬—০ গোলে পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী রাউণ্ডে যুক্তপ্রদেশ পঞ্জাবকে কোনক্রমে এক গোলে পরাজিত করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রথম দিন অমীমাংসার পরে বোম্বাই প্রাদেশিক দলকে অনুরূপ ভাবেই পরাজিত করে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে মধ্য-ভারতকে এক গোলে পরাজিত করিয়া বাঙলা গত বৎসরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ক্রীড়ানুরাগী বাঙালীদের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের নিকট সেমিফাইন্যালে মাত্র এক গোলে পরাজয় বরণে বাঙলার ললাটে আর এক দফা কলঙ্কের ছাপ পড়ে। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও বাঙলার খেলোয়াড়গণ গোল পরিশোধ করিতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ না কি খেলায় অবৈধ ভাবে শক্তিমত্তার আশ্রয় নেয় ও বাঙলাকে প্রতিহত করে। ইহা দুর্ব্বলের আত্মপক্ষ সমর্থনের ছল মাত্র। আমাদের খেলার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। অধিকার-সর্ব্বস্ব ও ক্ষমতা-প্রিয় পরিচালকগণের অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। দলাদলি ও চক্রান্তবাদের অবসান করিয়া প্রকৃতপক্ষে বাঙলার খেলোয়াড়গণকে প্রবুদ্ধ করার মত শক্তিমান্ সংস্কারক ও শিক্ষকের প্রয়োজন। খেলোয়াড়দের মধ্যেও নিয়মানুবর্ত্তিতা, তীব্র আগ্রহ ও বাঙলার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে আর কোন আশা নাই।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পরাজিত করিয়া ভূপাল ফাইন্যালে যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

বাঙলা পক্ষের খেলোয়াড়গণ—ডেভিড; লাইম ও মীড্; এস মুখার্জ্জী, ডালুজ ও জে গ্যালিবার্ডী; এ মিত্র, চরণজীৎ রায়, কার (অধিনায়ক), জ্যান্সেন ও রোচ্।

বোম্বায়ে নাইডু-জয়ন্তী উৎসব

মোহনবাগান ক্লাবের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্র বোম্বায়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে লেঃ কঃ সি কে নাইডুর জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ক্রিকেট-জগতের বহু খ্যাতনামা নবীন ও প্রবীণ খেলোয়াড় যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। অধ্যাপক দেওধরের নেতৃত্বে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া নাইডুর দলকে এক ইনিংস ও ১৬ রাণে পরাজিত করে। বিজয়ী পক্ষে মানকড়, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, হাজারী ও কুপার আউট না হইয়া শতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। সর্ব্বসমেত ৬৫৪ রাণের প্রত্যুত্তরে নাইডুর দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭ ও ফলো অন করিয়া দ্বিতীয় দফার খেলায় ২৪১ রাণ করিতে সমর্থ হয়। উভয় ইনিংসে যথাক্রমে গুলমহম্মদ ১১৫ ও বিলাতী খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ১০০ রাণ করেন। হাজারী, আমীর এলাহী ও কিষেণচাঁদ প্রত্যেক ইনিংসে তিনটি করিয়া উইকেট দখল করেন।

শেষ দিন উদীয়মান বোলার হাফিজ প্রতি ওভারে একটি করিয়া উইকেট দখল করিয়া পাঁচ জনকে আউট করেন।

পি, ভি, এম, জিমখানার উদ্যোগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ণের নেতৃত্বে লেঃ কর্ণেল নাইডুকে



সি, কে, নাইডু



মার্চ্চেণ্ট

বিশেষ সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করা হয়। নাইডুর বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, নাইডু এক সময়ে নিখিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নয়নকল্পে তাঁহার অবদান অসামান্য। তিনি কেবল এক জন দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় ও নিপুণ শিল্পী নহেন, তিনি ক্রিকেট-জগতের অন্যতম আচার্য্য। বহু শিল্পব্রতী তাঁহার অনুপ্রেরণায় আজ ভারতীয় ক্রিকেট-গগনের উজ্জ্বল তারকা। স্যর হোমী মোদীর নেতৃত্বে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার তাঁবুতে আহুত সভায় নাইডুকে প্রদর্শনী খেলায় সংগৃহীত ১৮ হাজার টাকা মূল্যের তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। যোগ্যের সমাদর করিয়া বোম্বাই আপনাকে সম্মানিত করিয়াছে।

রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগিতা রঞ্জী ট্রফীর অবসান হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই দল হোলকারকে ৩৭৪ রাণে পরাজিত করিয়া আলোচ্য বৎসরের বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছে।

প্রথম সেমিফাইন্যাল

প্রথম সেমিফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই উত্তর ভারতকে দশ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে।

উত্তর-ভারত: মহম্মদ সৈয়দ (অধিনায়ক), নাজার মহম্মদ, এ হাফিজ, মুনীলাল, রামপ্রকাশ, এম ভাইভী, এম আসলাম, ইমতিয়াজ আমেদ, ফজল মামুদ, বদরুদ্দীন ও মুনোয়ার খাঁ।

বোম্বাই: বিজয় মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), এম রায়জী, কোর, ইব্রাহিম, পালোয়াঙ্কার, আর এস মুদী, আর এস কুপার, ফাডকার, এম কে মন্ত্রী, ইউ এন মার্চ্চেণ্ট ও তারাপোর।

রাণ-সংখ্যা

উত্তর-ভারত: ১ম ইনিংস—৩৬৩ রাণ (হাফিজ ১৪৫, রামপ্রকাশ ৪৮, ইমতিয়াজ ৫৫, ফাডকার ৬১ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৩১২ রাণ (নাজার মহম্মদ ৮৬, মুনীলাল ৫৫)।

বোম্বাই: ১ম ইনিংস—৬২০ রাণ (ইব্রাহিম ৬৭, কুপার ৬৮, আর এস মুদী ১১৩, উদয় মার্চ্চেণ্ট ১৮৩, তারাপোর ৪১, হাফিজ ১৩৮ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ৫১ রাণ।

বোম্বাই দশ উইকেটে জয়ী।

দ্বিতীয় সেমিফাইন্যাল

হোলকারের নিকট মাদ্রাজ দশ উইকেটে পরাজিত হয়।

মাদ্রাজ: সি পি জনষ্টন (অধিনায়ক), রবিন্সন, রিচার্ডসন, নেলার, গোপালম, রামসিং, অনন্তনারায়ণ, শ্রীনিবাস, পরাণকুসুম, রঙ্গাচারী, আলভা।

হোলকার: সি কে নাইডু (অধিনায়ক), সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী, সর্ব্বাতে, জগদেল, ভায়া, ভাণ্ডারকর, কম্পটন, গাইকোয়াড়, রাওয়াল, প্রতাপসিং।

রাণ-সংখ্যা

মাদ্রাজ: ১ম ইনিংস—২৫৪ রাণ (জনষ্টন ৬৪, আলভা ৪০, সর্ব্বাতে ১০ রাণে ৬টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—১৫৮ রাণ (রিচার্ডসন ৪৪, সর্ব্বাতে ৬০ রাণে ৭টি উইকেট)।

হোলকার: ১ম ইনিংস—৪০৩ রাণ (সর্ব্বাতে ৭৪, কম্পটন ৮১, সি কে নাইডু ৫২, সি এস নাইডু ৪৪, ভায়া ৩৬, প্রতাপসিং নট আউট ৩৪, রঙ্গাচারী ১১০ রাণে ৭টি ও রামসিং ১৪৯ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ১১ রাণ।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, উভয় খেলাতেই বিজিত দল যথাক্রমে মাত্র ৫০ ও ১১০ রাণের ব্যবধানে ইনিংস পরাজয়ের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পায়।

ব্র্যাবোর্ণ ষ্ট্যাডিয়ামে ছয় দিনব্যাপী খেলার ফলে বোম্বাই জয়ী হইয়াছে। বোম্বাই ১ম ইনিংসে মাত্র ১০২ রাণে অগ্রগামী হয়। খ্যাতনামা উদীয়মান পার্শী খেলোয়াড় আর এস মুদী মাত্র দুই রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। উভয় ইনিংসের খেলায় মোট আটটি সেঞ্চুরী হয়। মুদী দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রাণ করিয়া রঞ্জী প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এ বৎসর উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রতি খেলায় তিনি শতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। উপরন্তু মোট ১০০৮ রাণ সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রের সোহনী কর্ত্তৃক ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত উচ্চতম রাণ-সংখ্যা ৬৫৬ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করেন। মুস্তাক আলী যথাক্রমে ১০৯ ও ১৩৯ রাণ করিয়া উভয় ইনিংসে শত রাণ সম্পাদনের নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিজয়ী অধিনায়ক মার্চ্চেণ্ট নির্ভুল ভাবে খেলিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলারগণের বিরুদ্ধে ২৭৮ রাণ সম্পাদন করিয়া নিজের বিরাটত্বের আর এক দফা পরিচয় দেন।

বিখ্যাত বিলাতী টেষ্ট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের অপূর্ব্ব ও অনবদ্য ব্যাটিং-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। চতুর্থ ইনিংসে ও ষষ্ঠ দিনের খেলায় মাঠের অবস্থা খেলার মোটেই অনুকূল থাকে না। কিন্তু এইরূপ বিপরীত অবস্থার মধ্যেও আউট না হইয়া ২৪৯ রাণ করিয়া তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে এক অভিনব ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। দশম উইকেটে রাওয়ালের সহযোগিতায় ১০৯ রাণ এই প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড।

বোম্বাই: বিজয় মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), ইব্রাহিম, মন্ত্রী, মুদী, কুপার, উদয় মার্চ্চেণ্ট, খোট, তারাপোর, ফাডকার, পালোয়াঙ্কার ও রায়জী।

হোলকার: লেঃ কঃ সি কে নাইডু (অধিনায়ক), সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী, নিম্বলকর, সর্ব্বাতে, জগদেল, ভাণ্ডারকর, কম্পটন, গাইকোয়াড়, ভায়া ও রাওয়াল।

আম্পায়ারদ্বয়: ভাবে ও রামচন্দ্র।

রাণ-সংখ্যা

বোম্বাই: ১ম ইনিংস—৪৬২ রাণ (মুদী ৯৮, উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭৯, পালোয়াঙ্কার ৭৫, কুপার ৫২, ইব্রাহিম ৪৪, নিম্বলকর ৮৮ রাণে ৩টি, ও সি এস নাইডু ১৫৩ রাণে ৬টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৭৬৪ রাণ (মুদী ১৫১, বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৭৮, কুপার ১০৪, উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭৩, মন্ত্রী ৬৩, সি এস নাইডু ২৭৫ রাণে ৫টি উইকেট)।

হোলকার: ১ম ইনিংস—৩৬০ রাণ (সর্ব্বাতে ৬৭, মুস্তাক আলী ১০৯, সি এস নাইডু ৫৪, জগদেল ৪৩, ফাডকার ৭৫ রাণে ৫টি ও তারাপোর ৯৪ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৪৯২ রাণ (মুস্তাক আলী ১৩০, কম্পটন নট আউট ২৪৯, নিম্বলকর ৪০, খোট ৯৪ রাণে ২টি, তারাপোর ১৩৯ রাণে ২টি ও রায়জী ১৩৩ রাণে ৩টি উইকেট)।

বোম্বাই ৩৭৪ রাণে জয়ী।

পূর্ব্ব-বৎসরের বিজয়িগণ

১৯৩৪—৩৫	বোম্বাই	১৯৩৯—৪০	মহারাষ্ট্র
" ৩৫—৩৬	বোম্বাই	" ৪০—৪১	মহারাষ্ট্র
" ৩৬—৩৭	নওনগর	" ৪১—৪২	বোম্বাই
" ৩৭—৩৮	হায়দ্রাবাদ	" ৪২—৪৩	বরোদা
" ৩৮—৩৯	বাঙ্গলা	" ৪৩—৪৪	পশ্চিম-ভারত রাজ্য



শ্রীতারানাথ রায়

যুদ্ধ অকস্মাৎ শেষ হইবে ?—

জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবলস অকস্মাৎ আশা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইবে। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ম্যাকেঞ্জী কিংও আশা করিয়াছেন যে, আগামী জুনের মধ্যেই য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইবে। তাঁহার এই আশা করিবার "strong reason"ও না কি আছে। এই "হঠাৎ" অবসানের হেতু কি, এবং "strong reason" কি ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে আকস্মিক কি অভিনব পরিবর্ত্তন আসন্ন, তাহার কোন কথা জানা যায় নাই।

ত্রিমূর্ত্তি-বৈঠক—

আগামী ২৫শে এপ্রিল সানফ্রান্সিস্কো বৈঠক বসিতেছে অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন-চীনা সোভিয়েট শক্তিসঙ্ঘ আমন্ত্রণ করিতেছেন। এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয় নাই পোলাণ্ড। ফ্রান্স নিমন্ত্রিত হইয়াও যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যুদ্ধান্তে আপন আপন সুবিধা সংগ্রহের জন্য মিত্রপক্ষের ও অধুনা জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি যুদ্ধঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এই বৈঠকের অভিসন্ধি কি, তাহা এখনও বৈঠকী নেতৃবৃন্দের মনেই আছে। এই বৈঠকের পরিকল্পনা মাথায় আসে ক্রিমিয়ার ত্রিশক্তির শলা-পরামর্শের পরই।



য়ুরোপের পশ্চিম-রণক্ষেত্রে কানাডিয়ান সাজোয়াবাহিনী সীভ নদীর বেলী সেতু অতিক্রম করিতেছে

ক্রিমিয়ার মিত্রপক্ষের ত্রিমূর্ত্তির যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার প্রতিপাদ্য ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তবে এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, এই সম্মিলনের ফলে বৃটেন উদ্বিগ্ন হইয়াছে ("Several speeches however, reflected the feeling that Britain was not pulling well, or not being allowe to pull her full weight"- The Statesman)। এই বৈঠকে পোলাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রুশিয়াকে তুষ্ট করিবার যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহা লইয়া বৃটিশ পার্লামেণ্টে ও সাংবাদিক মহলে বাক্যের ঝড় বহিয়াছে। কিন্তু সকল বাক্যকে চাপা দিয়া এক দিকে মিঃ রুজভেল্ট অন্য দিকে মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ এণ্টনী ইডেন বলিয়াছেন, সব ঠিক হ্যায়। ষ্টালিন কথা বলেন না—সুতরাং কথা বলেনও নাই। তবে 'রিভিউ অব ওয়ার্লড এফেয়ার্স' পত্র এই বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানকে ঘায়েল করিতে রুশ-সাহায্য ক্রয় করিবার জন্য পোলাণ্ড সম্বন্ধে রুশিয়াকে তাহার কাম্য সকল সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। কথাটা এই—"Signs are that Stalin is for intervention against Japan—because if successful, Russia would thus eliminate the only remaining world power outside the Anglo-Saxon group. She would dominate Asia. Her influence over India alone would be enormous. If the present Russian offensive in Europe fully succeeds then Stalin may have enough influence at home to permit him to enter the Pacific war."

কিন্তু এ জন্য জার্ম্মাণীর সহিত রুশিয়ার যুদ্ধের অবসান প্রয়োজন। কারণ, এ দিকে "The strain on Russia is so great that any serious prolongation of struggle with Germany would greatly reduce and might eventually eliminate for a considerable time her capacity to make war elsewhere."

এরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, হিটলারপন্থী জার্ম্মাণী না হৌক, জার্ম্মাণ নেতৃবৃন্দের এক দল রুশিয়ার সহিত আপোষের পক্ষপাতী।

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব রিবেনট্রপ পর্য্যন্ত এরূপ ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী রুশিয়ার সহিত আপোষ করিবে সে-ও ভাল, তবু এ্যাংলো-স্যাক্সন শক্তি-সঙ্ঘের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না। যদি অ-হিটলার-পন্থী জার্ম্মাণী রুশিয়ার সহিত রফা করে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার লোভ দেখাইয়া রুশিয়াকেও জাপানের সহিত তাহার অনাক্রমণ চুক্তির খেলাপও করিতে হয় না।

জাপানের বিরুদ্ধে হিটলারের অভিযোগ—

জাপানের বিরুদ্ধে হিটলার না কি অভিযোগ করিয়াছেন যে, জাপান প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, জার্ম্মাণী যখন রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে তখন জাপানও রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়াই জার্ম্মাণীর পরাজয় হইতেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে রুশিয়া জার্ম্মাণীকে যে ভাবে আক্রমণ করিতেছে, তাহাতে হিটলার পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। রুশ-জার্ম্মাণ রণক্ষেত্রে রুশ সৈন্য বাল্টিক উপসাগরে উপনীত হইয়াছে। সেনাপতি মার্শাল রোকনোভস্কি ও মার্শাল ঝুকোভের বাহিনী মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, জার্ম্মাণীও কঠোর প্রতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। কিন্তু এমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইউক্রেণের রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরে রুশ গেরিলা সৈন্যগণ জার্ম্মাণীকে বিশেষ বিপন্ন করিতেছে।

পশ্চিম রণক্ষেত্রের অবস্থা

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও রাইন নদীর পশ্চিম তটের প্রায় ১১ মাইল মিত্রপক্ষের কবলগত হইয়াছে ও তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিগফ্রিড লাইন বলিয়া বর্ত্তমানে আর কিছু নাই। রাইনল্যাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। সেনাপতি রুনষ্টাটের নেতৃত্বে জার্ম্মাণ সৈন্যরা প্রবল বাধা দিতেছে। শুনা যাইতেছে, হিটলার রুনষ্টাটকে নূতন মান-পদক প্রদান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সাফল্যের জন্য কি অন্য কারণে, তাহা জানা যায় নাই।

'নিউজ ক্রণিকলের' মস্কো-স্থিতি সংবাদদাতা মিঃ পল উইনটার্টন জানাইয়াছেন—"In the East as in the West advance has been no picnic."

জার্ম্মাণীর মরণ কামড়

আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস ষ্টকহলম হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণ নায়কগণ বলিতেছেন, তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, মিত্রপক্ষ এমন বিষবাষ্প প্রয়োগ করিবে যাহা কেবল জমির উপর ছড়াইয়া পড়িবে না, এই গ্যাস গাছে গাছে আটকাইয়া থাকিয়া কিছু দিন উপর হইতে ফোঁটা ফোঁটা মাটিতে পড়িতে থাকিবে। হিটলারও না কি বিষ-গ্যাস ব্যবহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ বেতারমুখে ডাঃ গোয়েবেলস (২৮শে ফেব্রুয়ারী) তাই ভয় দেখাইয়াছিলেন—বৃটিশ সওদাগরি জাহাজগুলি জার্ম্মাণ সাবমেরিণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। ফলে—"Britain faced with the ruin of her former

পরেই মার্চ্চ মাস পড়িতেই ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। উত্তর ও দক্ষিণ ইংলণ্ড উভয় দিকেই আক্রমণ হয়। দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া জার্ম্মাণীর উড়ন্ত বোমা আবার ইংলণ্ডের উপর আসিয়া পড়ে। অনেকে মনে করিতেছেন যে, জার্ম্মাণীর পশ্চিম রণাঙ্গনের বহু পশ্চাৎ হইতে এই "বাজ বোমা"গুলি প্রেরিত হইতেছে। ভি-১ বোমা অপেক্ষা এই বোমাগুলি বড় ও দ্রুতগামী, ইহাদের পাল্লাও খুব দূর।

প্রাচ্যের রণাঙ্গন

চীনের উপকূলে সৈন্য নামাইবার জন্য প্রকাশ্যে তোড়জোড় চলিতেছে উভয় পক্ষে। মিত্রপক্ষ কোথায় সৈন্য নামাইবে তাহার স্থান নির্ণয় পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বলা হইতেছে যে, সাংহাই হইতে ফরাসী ইন্দো-চীনের সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে চীনকে ত্রাণ করিবার জন্য এ্যাংলো-স্যাক্সনদের সৈন্য নামিবে। এই উপকূল রক্ষা করিবার জন্য জাপান বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

মিত্রসৈন্যগণ ইরাবতীর পূর্ব্বতট হইতে ৮৫ মাইল স্থান ইতিমধ্যে দখল করিয়াছে। জাপানীরা মান্দালয়ের চারি দিকে ৮টি বিমানক্ষেত্র স্থাপন করে। মিত্রপক্ষের বিমানবাহী সৈনিক দল মিটকিনা দখল করিয়া মান্দালয় দখলের পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

মিত্রপক্ষ আশা করিতেছে যে, উত্তর-ব্রহ্মে বিপন্ন হইয়া জাপান স্বেচ্ছায় মালয় ত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু অনেকে আবার উল্টা আশঙ্কাও করিতেছে যে, নিউগিনি, নিউবৃটেন প্রভৃতি স্থানে জাপ-রক্ষিসৈন্যেরা যে ভাবে দীর্ঘকাল বাধা দিয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, মালয় ও দক্ষিণ-ব্রহ্ম রক্ষার চেষ্টাই জাপানের শেষ আশা। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মার্কিণ অভিযান এবং বৃটিশ ১৪তম বাহিনীর মান্দালয় অভিযান এক বিরাট সাঁড়াশী অভিযান বলিয়াই অনেকে অনুমান করিতেছেন; ইহার সহিত অধিকৃত চীনের উপকূলে ও জাপ দ্বীপপুঞ্জে মিত্রসেনা অবতরণ করিয়া সাহায্য করিলেই অভিযান সম্পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যেই মিত্রপক্ষের বিমান-বাহিনীকে বঙ্গোপসাগরে জাপ মালবাহী জাহাজ ও মোটর লঞ্চ আক্রমণ করিতে দেখিয়া মনে হয়, জাপানকে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিবার আয়োজন হইয়াছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী আশঙ্কা করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ খাস জাপান আক্রমণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার মতলব করিয়াছে। স্বগৃহে জাপানীদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য তাহারা আইওজিমা ও সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে সৈন্য নামাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মিত্রপক্ষ অনুমান করিয়াছিল, অবাধে কার্য্যোদ্ধার হইবে; কিন্তু ২৫শে ফাল্গুন মার্কিন নৌসেনাপতি এডমিরাল নিমিজ সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন, আইওজিমার যুদ্ধ যে প্রচণ্ডতম হইবে তাহ পূর্ব্বে ভাবা যায় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জাপ-সাম্রাজ্যকে আক্রমণ বহু স্থানে করিতে হইবে। খাস জাপ দ্বীপপুঞ্জে সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিলে জাপানের বে-সামরিক অধিবাসীরা জাপ-সৈন্যদের মতই কঠোর ভাবে বাধা প্রদান করিবে। জাপ-নৌবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও মার্কিন সৈন্যের জাপ-দ্বীপ আক্রমণ কালে যদি সকল জাপ-রণতরী কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের সাফল্য লাভ করিতে দেরী হইবে।

ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি



ভারতীয় বিজ্ঞান মিশনের সদস্যগণ সম্প্রতি বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সদস্যগণের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, ডাঃ এস, কে, মিত্র, অধ্যাপক জে, এন্, মুখার্জ্জি, জে, সি, ঘোষপ্রমুখ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বৃটেনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, নানা রকম যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্যাদির কল-কারখানা পরিদর্শন করিয়া, সেখানকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির যাবতায় নিদর্শন এবং বিশ্ববিখ্যাত "টেনেসী ভ্যালি কর্ত্তৃপক্ষের" পরিকল্পনার ফলাফল স্বচক্ষে দেখিয়া, ভারতে কি ভাবে উক্ত পরিকল্পনা প্রয়োগ করিয়া কার্য্যকরী করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে মার্কিণ বৈজ্ঞানিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েক স্থানে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবিমুখতাই ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবনতির কারণ। ডাঃ সাহা বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবিদ্গণ ও টেক্‌নিসিয়ানগণই একযোগে কাজ করিয়া ইংলণ্ডকে এই যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি বড় একটা শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করিতে হয়, আর এই দেশের দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও আধিব্যাধিরূপ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়, তবে ভারতেও বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। টেনেসী ভ্যালি কর্ত্তৃপক্ষের পরিকল্পনা পরিদর্শন করিয়া ডাঃ সাহা বলিয়াছেন যে, ভারতেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে নদীর অভাব নাই, শস্য, খাদ্য বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ্ অপ্রচুর নহে, কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগাইতে হয়, তাহা জানি না, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে "সকল দেশের সেরা" হইয়াও আমরা দরিদ্র ও পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, শিক্ষা ও মনোভাব লইয়া আজ যদি আমরা সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা পৃথিবীর অন্যতম শিল্পপ্রধান দেশগুলির সমস্তরে পৌঁছাইতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রপতি ও শিল্পপতিদের দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ। দুঃখের বিষয়, ভারত আজ পরাধীন, তাহার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার তাহার নাই। সুতরাং কে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের বিস্তার ও প্রসার কামনা করিবে?

দেখে শুনে, পথ চলুন

১৫শে ফাল্গুন প্রাতঃকালে সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বাঙ্গালার টপি ও আসামস্থ সৈন্যবাহিনীর জেনারাল অফিসার কম্যাণ্ডিং মেজর জেনারাল ষ্টুয়ার্ট কলিকাতার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নগরীতে মোটর-দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাসকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করেন। প্রাদেশিক সরকার এবং কলিকাতাস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবর্গও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারাল ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, প্রতিকার-ব্যবস্থা হিসাবে বিগত মে মাস হইতে কলিকাতার রাজপথ সমূহে পাহারা দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ও বৃটিশ সামরিক পুলিশের একটি সম্মিলিত টহলদার বাহিনী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা সামরিক গাড়ীর চালকেরা নিয়মভঙ্গ করে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

সামরিক মোটর গাড়ীর ধাক্কায় হতাহত অসামরিক ব্যক্তিগণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া জেনারাল ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, ইহা দুঃখের বিষয় যে, অতীতে কলিকাতায় হতাহতের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী সঙ্গে সঙ্গে মিটান হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে নিখিল ভারত ক্লেমস কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ বিলম্ব ঘটিবে না।

তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকান ও বৃটিশ ট্রাফিক পুলিশের বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পথচারীর বেপরোয়া ভ্রমণের জন্য শতকরা ৭০টি দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিশেষে জেনারাল ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য তিনি অসামরিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা আশা করেন:— (১) পথচারীরা যাহাতে ফুটপাথ ও পথপার্শ্বস্থিত পায়ে চলার পথ ব্যবহার করেন, তজ্জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা; (২) অসামরিক ব্যক্তিগণের মোটর গাড়ীর ব্রেক পরীক্ষার জন্য অধিকতর সূক্ষ্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা; (৩) রাস্তা পারাপারের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যাপকতর ব্যবস্থা এবং পথচারীরা যাহাতে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাস্তা পারাপার হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ; (৪) যানবাহনের গতায়াত সম্বন্ধে জনসাধারণ যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অবহিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রচার।

অনেক মোড়েই 'এম, পি' দাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু সবই প্রায় ফিরিঙ্গীপাড়ায়। দেয়ালে ও লরীর অঙ্গে বিজ্ঞাপন শোভা পাইতেছে—'দেখে শুনে, পথ চলুন।' পথচারীদের সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু লরী-চালকদেরও 'দেখে শুনে চালান' নামক একটি সাবধান বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত। পথে পথচারীরা মরিবার জন্য বার হন না। শুনিয়াছি, ভাল মোটর চালাইতে হইলে প্রত্যেক মোটরচালককে ভাবিতে হয়, যত পথচারী সকলেই তার গাড়ীর নীচে পড়িয়া মরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই কথা 'বিশেষ লরীর' চালকদেরও ভাবিতে অনুরোধ করিলে মন্দ হয় না।

রেলওয়ে বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের যানবাহন ও রেলওয়ে-সচিব সার এডওয়ার্ড বেন্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রাথমিক বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯৪৪-৪৫ সালের সংশোধিত বাজেটে রেল বিভাগের

আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ২১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ১৪৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে উক্ত আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে যথাক্রমে ২২০ কোটি টাকা ও ১৫১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য দুই সপ্তাহে সর্ব্ববিধ খরচ মিটাইয়া এবং মূলধন সংক্রান্ত সুদ বাদ দিয়া যথাক্রমে ৪২ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ৩৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া রেলওয়ে-সচিব অনুমান করিয়াছেন। সার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই উদ্বৃত্তের মধ্যে ৩২ কোটি টাকা হিসাবে দুই বৎসরে মোট ৬৪ কোটি টাকা ভারত সরকারের সাধারণ রাজকোষে জমা দেওয়া হইবে এবং বাকী ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাবে মজুত-তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। যুদ্ধের সময় রেলওয়ে সংক্রান্ত পণ্যাদি অধিক মূল্যে কিনিতে হইতেছে বলিয়া এবং যুদ্ধের কাজের চাপে রেলপথ-সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া রেলওয়ে-সচিব বর্ত্তমান বৎসর ও আগামী বৎসরের বাজেটে বিশেষ মূল্যাপকর্ষ বাবদ যথাক্রমে ২৪ কোটি ও ৩০ কোটি টাকা সরাইয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পরিষদের সদস্যগণের অবগতির জন্য সার এডওয়ার্ড জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১৩৭টি ব্রডগেজ এঞ্জিন, ৪১৫টি মিটারগেজ এঞ্জিন, ২৮,৮০০টি ব্রডগেজ মালগাড়ী ১১,৮২০টি মিটারগেজ মালগাড়ী বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। রেল-পরিচালনায় ভারতীয়দের কর্ত্তৃত্ব প্রসার প্রসঙ্গে রেলওয়ে-সচিব বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতকরা পৌনে ১ শত ভাগ ভারতীয় এবং মাত্র সিকি ভাগ বিদেশী। পরিশেষে বর্ত্তমান বৎসরে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বেসামরিক ভোগ্য পণ্য-বহনের ব্যাপারে রেল বিভাগের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সার এডওয়ার্ড তাঁহার এবারের বাজেট-বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের রেলওয়ে-সচিব বাজেট-বক্তৃতায় তাঁহার বাজেট দুইটিকে নিরপেক্ষ বা unorthodox প্রমাণ করিতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মূল্যাপকর্ষ বাবদ ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালে ৫৪ কোটি টাকা সরাইয়া রাখিবার জন্য অনেকে অবশ্য তাঁহার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এই ৫৪ কোটি টাকা ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া সার এডওয়ার্ড ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করেন নাই। সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ভারতীয় রেলপথগুলিতে সাজ-সরঞ্জামের অভাব ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় ভারতকে রেলওয়ে সংক্রান্ত পণ্যাদি বিক্রয়ে বৃটেন, ক্যানাডা, বা যুক্তরাষ্ট্র অধিক মূল্য দাবী করে কোন্ যুক্তিতে? তাছাড়া, যুদ্ধের কাজের চাপেই এ দেশের রেলপথ, এঞ্জিন প্রভৃতি অস্বাভাবিক ভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির কি উচিত নয়, এই বিরাট ক্ষতিপূরণে ভারতবর্ষের সহিত আর্থিক সহযোগিতা করা? মূল্যাপকর্ষ বাবদ টাকার অঙ্ক স্থির করিবার সময় এই সকল কথা কি সার এডওয়ার্ডের মনে একবারও উদিত হয় নাই? তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ভারতীয় রেলপথ সমূহে অসহ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অথচ ইহাদের টাকাতেই রেল বিভাগের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণ সময়ে অর্থাভাবের অজুহাতে ভারত সরকার এই নিম্নশ্রেণীর রেলযাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণে অগ্রসর হইতে পারেন না। বর্ত্তমানের ন্যায় অবিশ্বাস্য আয়ের আমলেও কি ইহাদের জন্য কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সার এডওয়ার্ডের পক্ষে অসম্ভব ছিল? আলোচ্য দুই বৎসরের ৭৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা মজুত-তহবিলে না রাখিয়া আরও কিছু বেশী টাকা কি রেলওয়ে-সচিব এই বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করিতে পারিতেন না? যুদ্ধের পরে রেল বিভাগের আয় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সে সময় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া খুব বেশী মজুত-তহবিল না থাকিলে কি রেল বিভাগ এ ধরণের ব্যয়বহুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবেন? ভারতে রেল-এঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের কথা বহু দিন ধরিয়া ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন, এ বারের বাজেট-বক্তৃতায় কাঁচড়াপাড়ায় এই কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা সার এডওয়ার্ড বেন্থল উল্লেখও করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় ভবিষ্যতে আমদানীর আশায় যে ভাবে এঞ্জিনাদির অর্ডার বিদেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সত্যকার মনোভাব আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রেল বিভাগের ভারতীয়করণ সম্বন্ধে সার এডওয়ার্ডের যুক্তিও আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হইয়াছে। বর্ত্তমানে য়ুরোপ হইতে যোগ্য লোক আমদানী করা কঠিন বলিয়া হয়তো দু'-এক জন ভারতবাসীকে রেল বিভাগের মর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে, কিন্তু এখনও প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী বিরাজমান এবং সংখ্যায় ইহারা শতকরা সিকি ভাগ হইলেও মর্য্যাদা বা বেতনের দিক হইতে শতকরা পৌনে ১ শত ভাগ-ভারতীয় কর্ম্মচারী কি তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন? বর্ত্তমান বৎসরের রেলপথগুলির বে-সামরিক পণ্যবহনের ব্যাপারে সার এডওয়ার্ডের গৌরব অনুভব করিবার কি আছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। রেল বিভাগের অব্যবস্থা ও মালগাড়ীর টানাটানির জন্যই কয়লার অভাবে জনসাধারণ এবং কলকারখানা প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; খাদ্যসামগ্রী এক প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত থাকিলেও অন্য প্রদেশে সরবরাহের অভাবে অগ্নিমূল্য এবং অপ্রাপ্য পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় রেল বিভাগের সাফল্যের জন্য সার এডওয়ার্ড সন্তোষ প্রকাশ না করিলেই আমরা আনন্দিত হইতাম। মোটের উপর আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, রেলওয়ে-সচিব বা তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট রেল বিভাগের বাজেট যতই নিরপেক্ষ মনে হউক, সাধারণ ভারতবাসীর সুখ-সুবিধা বা স্বার্থের কথা ইহাতে আশানুরূপ বিবেচিত হয় নাই বলিয়া বাজেট জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হইবে না।

বাঙ্গালার বাজেট

বাঙ্গালা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় দেশবাসীকে নৈরাশ্যজনক কথা বলিবেন না স্থির করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের আর্থিক অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১১ কোটি টাকা। পরবর্ত্তী বৎসরে তাহা হ্রাস পাইবে না, বরং বাড়িয়া দাঁড়াইবে ১৯ কোটি টাকায়, ইহাই অর্থসচিবের অনুমান।

ঋণ মাত্রেই উদ্বেগের কারণ। কিন্তু যদি ঋণ করিয়া তাহা লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়, তবে ঋণ শোধ করিয়াও মুনাফা থাকে। সে ক্ষেত্রে উদ্বেগ নাই, বরং আশাই থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের ঋণ—এই যা ভয়! প্রধানতঃ, বাঙ্গালা সরকার এই ঋণ দ্বারা শাসনকার্য্য চালান, যাহা হইতে মুনাফা উপার্জ্জিত হইতে পারে না। অতএব এই ঋণ শোধ হইবার নয়।

আয় বাড়াইয়া যে ঋণ শোধ করিবেন, সে পথই বা কোথায়? ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প কোন উন্নতিই তো বাঙ্গালা দেশে হইবার উপায় নাই। সব দিক্ দিয়া সরকার আট-ঘাট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উপায় আছে একটি মাত্র—ট্যাক্স বৃদ্ধি। এ পথেও সরকার প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দফায় দফায় ট্যাক্স বাড়িয়াছে। বিক্রয়-করের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে। কৃষিজাত আয়-করের ব্যবস্থা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রেশন ফি ও প্রসেস ফি যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এখন তাঁহারা কোন্ উপায়ে নূতন ট্যাক্স চাপাইবেন, সেই চিন্তায় মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিতেছেন। তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ট্যাক্স বাড়িয়াছে সাড়ে সাত কোটি টাকা! কিন্তু কেবল ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াই কি এই বিপুল ঋণভার শোধ করা সম্ভব?

আগামী বৎসরে বাঙ্গালা সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় এক বৎসরের স্বাভাবিক আয়ের সমান দাঁড়াইবে। ঋণ শোধ করিতে হইলে যত্র আয় তত্র ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। সংসার চলে কি করিয়া? অর্থসচিব এবং স্বয়ং গভর্ণর দিল্লীতে গিয়া কেন্দ্রীয় অর্থসচিবের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখন অবধি মন স্থির করিতে পারেন নাই। কলিকাতা আকুল নয়নে চাহিয়া আছে দিল্লীর পানে। কবে আসিবে, কতটা আসিবে?

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজেটে কেবল ঋণ শোধের পন্থা অর্থাৎ ট্যাক্সের কথাই আছে। গঠন-মূলক কোন পরিকল্পনাই নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এবং তাহার পরবর্ত্তী মহামারীতে বাঙ্গালার অবস্থা আজ শোচনীয়, কিন্তু উপশমের জন্য কোন চিন্তাই সচিবমণ্ডলী প্রয়োজন মনে করেন নাই। সেটা গাফিলতী না অক্ষমতা? উভয়ই অত্যন্ত গর্হিত।

বাজেটের আয়-ব্যয়ের ও অপচয়ের বহর দেখিয়া বাঙ্গালা দেশকে দরিদ্র বলিয়া মনে হয় না। দরিদ্র দেশে এত অপচয়, এত ঋণ, কি করিয়া সম্ভব?

আগামী বৎসর বাঙ্গালার আয় হইবে ২১ কোটি টাকা, আর ব্যয় হইবে ৩৭ কোটি টাকার অধিক। সরকার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মারফতে ব্যবসা চালাইয়া তিন বৎসরে লোকসানের বোঝা দাঁড় করাইয়াছেন সাড়ে ২২ কোটি টাকা। কি করিয়া এই লোকসান হইল, কেন হইল, কে বুঝাইবে?

শুনা গিয়াছিল, পাঞ্জাব হইতে সুলভ মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া সরকার চড়া মূল্যে বাঙ্গালায় তাহা বিক্রয় করেন। তাহাতে দিব্য দু'পয়সা মুনাফা হইয়াছিল। তবে লোকসান হইল কেন? বহু খাদ্যশস্য পচাইয়া, মনুষ্যের আহারের অযোগ্য করিয়া নষ্ট করা হইয়াছে। ক্ষতির অঙ্কে ইহারও নিশ্চয় কিছু অংশ আছে। যে সচিবমণ্ডলী অব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দরিদ্র দেশবাসীকে অনাহারে রাখিয়া এতগুলি টাকা নষ্ট করিতে পারে এবং পরে ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণের ধৃষ্টতা রাখে, তাহাদের কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। য়ুরোপীয় সদস্য মিঃ গ্রিফিথস্ পর্য্যন্ত বাজেটের তীব্র নিন্দা করিয়া এ কথা না বলিয়া পারেন নাই যে, সরকারী ব্যবসায় পরিচালনার খাতে সাড়ে ২২ কোটি টাকা লোকসান একটা কলঙ্কজনক ব্যাপার। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের অবসর গ্রহণ করা উচিত।

মহাত্মাজীর বিবৃতি

বহু দিন পরে সরকারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। ইহাতে তিনি দিল্লী ও লণ্ডনের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে ভাবে কংগ্রেস-নেতাদের ধড়পাকড় চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ইহা ভ্রান্তি নহে, ইহার মূলে সর্ব্বভারতীয় সরকারী নীতিই ক্রিয়া করিতেছে। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধু এই চারিটি প্রদেশে প্রায় একই সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের একই প্রকারের আচরণ—তাঁহার সন্দেহ সমর্থনই করে।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যক্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই চেষ্টার মধ্যেও আপত্তির কিছু আছে কি?" তিনি মনে করেন, "ভারতবর্ষে যদি সর্ব্বজনীন ভাবে এই কর্ম্মসূচী গৃহীত হয়, তবে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন না চালাইয়া অথবা আইন সভা দখল না করিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে। সেইরূপ করিলে এ দু'টির কোনটারই প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজ তখন ভারতে থাকিয়া ভারত শাসন নিরর্থক মনে করিবে। নেহাৎ যদি সে থাকে, তবে সে নাগরিক হিসাবেই থাকিবে। ১৯৪২এর ভাষায় বলিতে হয়, শাসক হিসাবে তাহাদের ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, তাহাদের সৈন্য হইবে বেকার আর শিল্প হইয়া পড়িবে নিরর্থক।"

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতাই যে ইহার লক্ষ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একটা বিরাট জাতির দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক স্তরে এই কার্য্যক্রম একটা নৈতিক নিরুপদ্রব বিপ্লব আনয়ন করিবে। এই বিপ্লবের পরিণতিতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইবে। ইংরেজ অথবা য়ুরোপীয়ানের প্রতি বৈরিভাব বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে। রাজন্যবৃন্দ ও পুঁজিপতিরা দেশের ধনসম্পদের প্রকৃত ও আইনসঙ্গত অছিরূপে জনগণের বন্ধুর মত বসবাস করিবেন।"

বৃটিশ-কর্ত্তৃত্বের সমর্থক বহু পদস্থ ব্যক্তি এইরূপ আদর্শ চাহিয়াছেন কিন্তু সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে অচল অবস্থার সমাধান তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়, এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয়। বিস্মিত হইয়া মহাত্মাজী প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমার পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য সর্ত্তাবলী ব্যতীত যদি কর্ত্তৃপক্ষ আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যক্রম সহ্য করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহাদের আসল মতলবটা কি? তাঁহারা কি অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না? কর্ত্তৃপক্ষ

কি সুপরিজ্ঞাত ও অল্প-পরিজ্ঞাত সমগ্র ভারতবাসীকেই কারারুদ্ধ রাখিতে চাহেন ? কংগ্রেসকর্ম্মীরা দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবে এবং তাহার ফলে অহিংস আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইবে, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হইয়াছেন কি ?"

মহাত্মা গান্ধী ভারতের ও বৃটেনের উভয়েরই কল্যাণকামী। একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াই আজ তিনি এই সকল প্রশ্ন করিয়াছেন। দিল্লী এবং লণ্ডনের ঊর্দ্ধ্বতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি নিশ্চয়ই কোন উত্তর আশা করেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইবেন কি ?

শীতলবাদের অভিভাষণ

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক-সমিতি-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ জে, সি, শীতলবাদ তাঁহার অভিভাষণে ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলির যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—"আমরা যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছি এবং বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছি, তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। আমরা এই কারণেও অচল অবস্থার অবসান কামনা করিতেছি যে, ইহা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর কোন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাই সুষ্ঠুরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না; এমন কি, সমরকালীন অবস্থা হইতে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াও সহজসাধ্য হইবে না।"

তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হইলেও নূতন নহে। পণ্ডিত জহরলাল (জাতীয় পরিকল্পনা) হইতে আরম্ভ করিয়া সার আর্দ্দেশির দালাল (বোম্বাই পরিকল্পনা) সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা এমন ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে, একটিকে ছাড়িলে অপরটির কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং-সম্পদ্ সম্পর্কে মিঃ শীতলবাদ বলেন যে, এই সমস্যার সমাধানের উপর যুদ্ধোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বৃটেন কি ভাবে এই ঋণ শোধ করিবে সে সম্বন্ধে অবিলম্বে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ব্রেটন উডসে বিশ্ব অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে এই সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনার দাবী ভারতীয় প্রতিনিধিরা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কারণ, ক্ষমতা যাহাদের হাতে, তাহারা ভারতের কথা শুনিতে নারাজ। অদূর ভবিষ্যতে যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, এরূপ আশা করাও দুরাশা মাত্র। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা, চোরা-বাজার প্রভৃতি দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সুফল পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বে-আইনী মজুতদারী ও চোরা-বাজারের কারবার বন্ধ হইয়াছে, এরূপ কথা কোন ক্রমেই বলা যায় না।" মিঃ শীতলবাদ এই ব্যাপারের জন্য সরকারী কর্ম্মচারিগণকেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতাই এই অবস্থার কারণ। এ বিষয়ে অন্যমত থাকিতে পারে না। অনেক ব্যবসায়ীও চোরা-বাজার চালাইয়াছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র বুঝিয়া খরচও করিয়াছেন। তাঁহারাও আংশিক ভাবে দেশের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ব্যবসায়িগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই জাল-জুয়াচুরির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তবেই দেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত হইতে পারে এবং বহু ভাবে পীড়িত জনগণের দুঃখের কিছু লাঘব হইতে পারে।

আমাদের দুঃখ আমাদেরই দূর করিতে হইবে। পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চিরদিনই এই দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।

বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ

মনুষ্য-জীবনের দুইটি প্রধান প্রয়োজন—অন্ন এবং বস্ত্র। বাঙ্গালা-দেশবাসীর অশেষ দুর্ভাগ্য যে, এই দুইটি হইতেই বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। অন্নের অভাব যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, এবং সেই জের এখনও টানিতেছি। এইবার বস্ত্রের অভাবের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই নিদারুণ অভাব সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই সমান। বহু স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে, বস্ত্রের অভাবে কুলনারীগণ গৃহের বাহির হইতে পারিতেছেন না।

এই অভাব দূর করিবার জন্য নানাবিধ বিধি, নিষেধ, অর্ডিন্যান্স, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু কিছুতেই ফল ফলিতেছে না। অতিলাভ, চোরাবাজার, সরকারী অব্যবস্থা, ব্যবসায়ীদের কারসাজী, অনেক কথাই শুনা যায়, শুনিতে পাই না কেবল প্রতিকার ব্যবস্থার কথা। অথচ অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে বাঙ্গালীর ভদ্রতা রক্ষা দূরে থাক, লজ্জা রক্ষা পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে না।

বাঙ্গালায় মাথা-পিছু বস্ত্র বরাদ্দ হইয়াছে, বৎসরে দশ গজ। অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম। কারণ, বাঙ্গালা দেশের লোকেরা আকারে ওজনে অন্য প্রদেশবাসীর তুলনায় ছোট। যাহাই হউক, যাহা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাও তো বাঙ্গালায় আসিতেছে না। তাঁত-শিল্প যে এই সঙ্কটের কিঞ্চিৎ লাঘব করিবে সে উপায়ও নাই। সরকার তাঁত-শিল্পকে চালু রাখিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। সুতা সরবরাহ করিবার ভার তাঁহাদের, কিন্তু যে পরিমাণ সুতা তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার অভাব পূরণ হয় না। বহু স্থানে তাঁত সুতার অভাবে অচল।

যুদ্ধের দরুণ, এবং যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে বস্ত্রের অভাব মানিয়া লইতেছি। কিন্তু যেটুকু বস্ত্র বরাদ্দ আছে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না কেন ? এবং যেটুকু বস্ত্র আসিতেছে তাহাও ঠিক ভাবে বণ্টন হইতেছে না কেন ? ধনীরা অধিক মূল্যে যত ইচ্ছা বস্ত্র ক্রয় করিতেছে, আর দরিদ্রদের সেই পরিমাণ বস্ত্রের অভাব ঘটিতেছে।

অবিলম্বে বস্ত্রের একটা রেশন স্কীম করা প্রয়োজন। খাদ্য যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, বস্ত্রের সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটে না। জন-পিছু খাদ্যদ্রব্যের একটা মাপ কষা চলে। কিন্তু বস্ত্র ব্যবহার নির্ভর করে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর। এ জন্য পয়েণ্ট রেশনিং স্কীমের দরকার।

বাঙ্গালায় বস্ত্র-সঙ্কট সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, প্রক-

৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে বাঙ্গালার অসামরিক জনসাধারণ মাথা-পিছু অন্য প্রদেশ অপেক্ষা ৪ গজ মিলের কাপড় বেশী পাইয়াছে। তবে বাঙ্গালায় বস্ত্রের এই অবস্থা হইল কি করিয়া?

বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র প্রাপ্তি স্থানীয় বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সম্প্রতি টেক্সটাইল কণ্ট্রোলার সম্মেলনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। চোরা-বাজারে প্রবেশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

পরিষদে বিরোধী দলের নেতা মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ২৮শে ফাল্গুন সোমবারে বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যদের নিকট এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, "যে সচিবমণ্ডলীকে অসাধু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সচিবমণ্ডলীকে আপনারা কত দিন অন্ধ ভাবে সহ্য করিবেন?"

বস্ত্র-বণ্টন সমস্যায় সচিবমণ্ডলী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া মিঃ হক বলিয়াছেন,—সমস্যার সমাধান খুব সহজ। সকল সচিবকে পদত্যাগ করিতে বলা হউক এবং তাঁহারা গভর্ণরকে পদত্যাগপত্র দাখিল করুন। এখনই পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিলেও চলিবে, আমরা নির্ব্বিঘ্নে বাজেট গৃহীত হইতে দিব, তাহার পর গভর্ণর ইচ্ছা করিলে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া একটি ন্যায়নিষ্ঠ সচিবমণ্ডলী গঠন করিতে পারিবেন। গভর্ণর যাঁহাকে পছন্দ করেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে এবং যাঁহাকে তিনি পছন্দ করেন না, তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে পারিবেন।

সবই বুঝিলাম। সবই 'ফিউচার টেন্স'। কিন্তু বর্ত্তমানে যে লজ্জা-নিবারণ দায়! তাহার কি হইবে?

আদর্শ প্রচার-কার্য্য

প্রচার এবং অপপ্রচারের মধ্যে পার্থক্য কি? সত্য কথা এবং অবিকৃত সংবাদ জ্ঞাপনের নাম প্রচার এবং মিথ্যা কথা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের নাম অপপ্রচার। ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য আমেরিকায় কি ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তাহাও নানা সূত্রে প্রকাশ পায়। সে দিন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে আমেরিকায় এই ধরণের প্রচার ও অপপ্রচার-কার্য্য চালান হয় কি না, এই বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের পক্ষ হইতে সার মহম্মদ ওসমান বলেন,—"শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ন্যায় ব্যক্তিরা আমেরিকায় গিয়া এই ধরণের প্রচার-কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-গত কোন বিরোধ নাই এবং বৃটিশই ভারতবাসীদের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা উদরান্নের দায়ে লড়াই করে। এমন অবস্থায় ভারতের সম্বন্ধে মার্কিণবাসীদিগকে খাঁটি খবর জানাইবার যে প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করা চলে কি?" অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিলেন যে, অপপ্রচার ।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মার্কিণস্থ ভারতের এজেণ্ট-জেনারাল প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং সেই প্রচারকার্য্যের ভিত্তি কতটা সত্যের উপর স্থাপিত, তাহা সকলেই জানেন।

'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রচারকার্য্যের স্বরূপের একটি নমুনা দিয়াছেন। "আমি ভারত গভর্ণমেণ্টের আমেরিকাস্থ এজেণ্ট-জেনারাল সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার মত এক জন শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কি ভাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বিবৃতিপূর্ণ পুস্তক ও ইস্তাহার সমূহ প্রকাশ করিতে সম্মত হন?" তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"আমি কোন পুস্তকই পড়িয়া দেখি নাই অথবা প্রচারমূলক কোন পুস্তক-পুস্তিকার তথ্য বিচার করি নাই। আমি শুধু বিলে সহি দিয়াছি মাত্র। তাঁহাকে কি শুধু সহি দিবার জন্য বেতন দেওয়া হয়? তিনি চোখ বুজিয়া এমন ভাবে সহি করেন কেন? বাজপেয়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠাপূর্ণ কাগজপত্র ভারতীয় করদাতাদের পয়সায় বিলি করা হইতেছে।"

বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে আমেরিকায় কিরূপ প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে, সে বিষয়ে সংবাদদাতা বলেন—"বাজপেয়ীর আমলে সব চেয়ে বড় কাজ হইল তাঁহার কানাডা পরিদর্শন। সেখানে গিয়া তিনি কানাডার প্রধান মন্ত্রীর নিকট বলেন যে, ভারতে প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাব ঘটে নাই এবং ভারতের মজুতদারেরাই সেখানকার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, নতুবা সেখানে যথেষ্ট খাদ্য ছিল। কানাডার গভর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য খাদ্য সাহায্য পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। এই ভাবে প্রচারকার্য্যের দ্বারা বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাদের নিবৃত্ত করা হয়। কালিফোর্ণিয়ার পঞ্জাবী কৃষকদের এক সভায় বাজপেয়ী মহাশয় বলেন, "বাঙ্গালীরা চিরকালই দুর্ভিক্ষে মরে; বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ একটা অসাধারণ কিছুই নয়। তিনি ধিক্কৃত হইয়াছিলেন; বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সভা হইতে পলায়ন করিতে হয়। ভারতের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর মূল্যবান প্রচারকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে সার গিরিজাশঙ্করকে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার জন্য তাঁহাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। ওয়াশিংটনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তিনি বাস করেন, এবং এই বাড়ীতে বৃটিশ সরকারের সমর্থকদের খানা দিবার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।"

শুধু ভারতের বাহিরে নয়, ভারতের মধ্যেও এই শ্রেণীর প্রচার-কার্য্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। 'ন্যাশনালিষ্টে'র দিল্লীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, মিঃ এম, এন, রায়ের আয় সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বড়লাটের চেয়েও বেশী। বাজেটের বরাদ্দ অনুসারে বড়লাট বার্ষিক ২,৫০,৮০০ টাকা বেতন পান; পক্ষান্তরে, মিঃ রায়ের আয় বার্ষিক ২,৭৫,০০০ টাকা বলিয়া মনে হয়। মিঃ রায়ের আয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া গিয়াছে,—ভারত সরকার হইতে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য মাসিক ১৩,০০০ টাকা, যুক্ত-প্রাদেশিক সরকার হইতে মাসিক ৭,০০০ টাকা এবং অন্যান্য সর্ব্বত্র হইতে মাসিক ২,৫০০ টাকা।"

বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার সাধনায় ভারত সরকারের এ-হেন তৎপরতা দেখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইবে না, এমন মূঢ় ইহ জগতে নাই!

নিখিল-বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে লণ্ডনে নিখিল-বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ কোটি শ্রমিকের প্রতিনিধিরূপে ৪০টি দেশ হইতে ২৪০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। এক দিকে ত্রিনেতৃ সম্মিলন হইয়াছে, আর এক দিকে বিশ্বের শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা-সংযোগ হয় নাই। নিখিল-বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল :—

(১) ফ্যাশিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়কল্পে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের শ্রমিকদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা; (২) একটি শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করা। এই সঙ্ঘের মধ্যে শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকগণ শান্তি ও বিশ্ব-নিরাপত্তা রক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং ভবিষ্যতে মানব জাতি ও মানব-সভ্যতাকে মহাযুদ্ধের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সজাগ ও সতর্ক হইবে; (৩) ভবিষ্যতের শান্তি ও পারস্পরিক মৈত্রীর ভিত্তি গঠন করা এবং ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করা; (৪) বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায্য দাবী ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী করা।

বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইতিহাসের ধারা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, য়ুরোপে প্রথমে ও ইটালীতে এবং পরে জার্ম্মাণীতে যে ফ্যাশিবাদ নাৎসীবাদের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ—এই সব দেশে ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠন দুর্ব্বল ছিল এবং শ্রমিকনেতাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। ইটালীয় সোশ্যালিষ্ট ও জার্ম্মাণ সোশ্যাল ডিমক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, শ্রমিকশ্রেণীকে যে ভাবে বিপথচালিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, ফ্যাশিস্তরা তাহারই সুযোগ লইয়া দেশে দেশে বিপ্লব দমন করিতে এবং শ্রমিক আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্সেও বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ এবং ফরাসী সোশ্যালিষ্টদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শেষ পর্য্যন্ত 'ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট' গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যায় এবং দালাদিয়ে-বনে-গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটেনের শ্রমিক-দলের নেতারাও এই বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। বিগত বিশ বৎসরের এই শোচনীয় ইতিহাস নিখিল বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ ভুলিয়া যান নাই এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার জন্যও তাঁহারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

পৃথিবী হইতে ফ্যাশিবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার এবং বিশ্ব-শান্তির ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে গঠন করিবার সিদ্ধান্ত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। শুধু বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানেই বিশ্বের শ্রমিকগণ সন্তুষ্ট হইবে না বা শান্তি পাইবে না। যে সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার ফলে ফ্যাশিবাদের জন্ম হয় এবং যুদ্ধবিগ্রহ ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়, তাহাকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে শ্রমিকশ্রেণীর শান্তি নাই। যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদর্শ শুধু ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিলে চলিবে না। পরাধীন রাজ্য ও উপনিবেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করিতে হইবে এবং এই পরাধীন দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হইল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করিয়া নিখিল-বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব বিশ্বের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট য়ুনিয়নের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। রক্ষণশীল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ আর কত দিন বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বের শ্রমিকদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবর্ষে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখিবেন, তাহা অদূর ভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে।

রাজ-বন্দিনী

বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যে আটক বন্দিত্বের অভিশাপ আর ঘুচিল না। পুলিশ ও সরকার স্বীয় ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া বিনা বিচারে আটক-নীতির মধ্যে এমন একটা আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন যে, মানবতা, করুণা, ন্যায়ধর্ম্ম সবই তাহার নিকট একান্ত তুচ্ছ। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডুর এক প্রশ্নোত্তরে সরকার পক্ষ হইতে রাজবন্দিনীদের যে তালিকা পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১১টি বন্দিনীর মধ্যে ১৪ জনই নানা জটিল রোগে আক্রান্তা।

শ্রীমতী প্রভা মজুমদার যক্ষ্মারোগে আক্রান্তা হইয়াছেন, শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন, শ্রীমতী বনলতা সেন স্নায়ুরোগে ও কণ্ঠনালী প্রদাহে ভুগিতেছেন, শ্রীযুক্তা হেলেনা দত্ত, শৈলবালা সেন, আশালতা রায়, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা এবং শ্রীযুক্তা লীলা রায় প্রভৃতি মোট ১৪ জন মহিলা কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রোগ-জর্জ্জরদেহে কাল অতিবাহিত করিতেছেন। বিচারও নাই, মুক্তিও নাই। শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ অসুখে ভুগিতেছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া গবর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন কি না? উত্তরে খান বাহাদুর মহম্মদ আলী জানান যে, নিরাপত্তার দিক্‌ হইতে কাহাকেও আটক রাখা অত্যাবশ্যক মনে না করিলে গবর্ণমেণ্ট আটক রাখিবেন না। চমৎকার উত্তর! নিরাপত্তার অজুহাতে আটক রাখিবার কোন হাঙ্গামা নাই। কিন্তু এই রোগ-জর্জ্জরিতা মহিলাদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া আটক করিয়া রাখা কেবল হাস্যকর নহে, নিতান্ত নির্লজ্জতা ও মনুষ্যহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের কিছুই করিবার নাই। আমরা পরাধীন জাতি। কিন্তু যিনি সকল বন্ধনের ঊর্দ্ধে, তিনি কি মানবতার এই অবমাননা নীরবে সহ্য করিবেন?

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



[illegible] ঘটকের সৌজন্যে] সাকী [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

সচিত্র
মাসিক বসুমতী
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
২৩শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৫১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দেবদানবের যুদ্ধ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নবরত্ন-সভা বেশ জমকে উঠেছে। চিঁড়ে-ভাজা, পেঁয়াজের ফুলুরি, বাটি বাটি চা—কিছুরই অভাব নেই। সভাপতি গোপালদা'র মনও বেশ প্রফুল্ল। খপরের কাগজখানি নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "যাক্, বাঁচা গেল!"

খদ্দর-পরিহিত রাইচরণ জিজ্ঞাসু নেত্রে গোপালদা'র দিকে চাইল।

গোপাল দা' হেসে বললেন—"আরে দেখছ না, ষ্টালিন মামার গদা হিটলার বেটার নাকের উপর পড়ো পড়ো হয়েছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই কেল্লা ফতে। তার পর বাকি রইল ঐ বেঁটে বজ্জাত জাপান! তাদের খ্যাঁদা নাক তুবড়ে দিতে ভীমসেন রুজভেল্টের আর ক'দিন লাগবে? বাপ্! সিঙ্গাপুর যখন গেল, তখন কি ভয়টাই না হয়েছিল! বলো কি হে! ত্রিশ বছর সরকারী চাকরী করে তিরানব্বই টাকা দশ আনা পেন্সন পাই, সেটুকু চলে গেলে এই বুড়ো বয়সে যে গিন্নীর হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো। জয় মা কালী! কি বাঁচনটাই না বাঁচিয়ে দিয়েছ মা! এই যুদ্ধপর্ব্ব শেষ হয়ে যাক মা, তোমায় একটি আসল মুক্তো দিয়ে নৎ গড়িয়ে দেবো।"

রাইচরণ খপরের কাগজখানি কুড়িয়ে নিয়ে বললে—"তা তো হ'লো। মা কালী না হয় মুক্তোর নতের লোভে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা শেষ করলেন। কিন্তু সেই খানেই যে দানববধের পালা শেষ হবে, তাই বা কে বললে? আরও দু'-চারটা দত্যিদানা তত দিনে হয়ত আবার গজিয়ে উঠ্‌বে; আর আপনি যেমন মাকে মুক্তোর নতের লোভ দেখিয়ে পেন্সনটা বজায় করে নিচ্ছেন, অপরে হয় ত হীরের বালার লোভ দেখিয়ে আবার কি একটা কাণ্ড ঘটাবে।"

গোপাল দা' হেসে বললেন—"আরে না, না, সে ভয় আর নেই। এবার যে দৈত্যকুল নির্ম্মূল হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই দৈত্যকুল ধ্বংসের পরেই যে সত্যযুগের আরম্ভ, তা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়ও বেশ স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছে।"

প্রেমাঙ্কুর এক মুঠো চিঁড়ে-ভাজা মুখে পুরেছিল। তাড়াতাড়ি সেগুলো গিলে ফেলে বলে উঠল—"জয় বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের জয়! সত্যযুগ আরম্ভ হলেই মানুষের পরমায়ু হাজার বৎসর হবে। গোপালদা'র এই ত উনষাট্ট বৎসর মাত্র বয়েস। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে এখনও ন'শো একত্রিশ বৎসর তাঁর তিরানব্বই টাকা দশ আনা পেন্সন ভোগ করতে পারবেন। আর আমাদের চা, চিঁড়েভাজা ও পেঁয়াজের ফুলুরি অক্ষয় হয়ে রইল।"

আমাদের উদীয়মান কবি লতিকাকান্ত এতক্ষণ ঢুলুঢুলু নেত্রে গোলাপী চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করছিল। এইবার সে মিহিকণ্ঠে ব'লে উঠল—"ধীরে, রজনী ধীরে! অত তাড়াতাড়ি দৈত্যবধের পালাটা শেষ করবেন না। শুম্ভ-নিশুম্ভের বংশে বাতি দিতে কেউ যে আর বাকী থাকবে না, তা ত দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু যাঁরা তাঁদের বধ করবেন, তাঁরা কি সবাই দেবাংশসম্ভূত? সরষে-পড়া দিয়ে ত ভূত ছাড়াচ্ছো, কিন্তু সেই সরষের ভিতরই যে দু'-দশটা ভূত লুকিয়ে নেই, তা বেশ পরখ ক'রে দেখেছ ত?"

গোপাল দা' তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে দু'-একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। রাস্তার পাশেই ঘর। কে আবার কোন্ কথা শুনতে পেয়ে কখন কি বিপদ ঘটায় তা ত বলা যায় না! তার পর ধীরে ধীরে বসে একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্‌লেন—"আরে ছি ছি! অবিশ্বাসী অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর! এই দৈত্যবধ-যজ্ঞের যাঁরা হোতা, তাঁরা তিন জনে যে একেবারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অবতার, তা দেখেও দেখছ না?"

ভক্তি জিনিষটা সংক্রামক! গোপাল দা'র গদগদ কণ্ঠের ধ্বনি শুনে আমার শুষ্ক প্রাণে পুলকের শিহরণ দেখা দিল। আমি বলে উঠলুম—"আর কেউ দেখতে না পাক, গোপাল দা', আমার জ্ঞানচক্ষু তোমার কথায় একেবারে খটাস করে খুলে গেছে। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই দানববধ যজ্ঞ শেষ করে মহেশ্বর ষ্টালিন অতলান্তিক

মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তাঁর ব্যাঘ্রাসন বিস্তার করে ধ্যানস্থ হয়ে পড়বেন। এ যুগের ব্রহ্মা চারচিল, মহেশ্বরকে আর না ঘাঁটিয়ে সারা আফ্রিকায় আর আরব, পারস্য, ভারত, ব্রহ্ম, শ্যামদেশে নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনা করবেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহাতেজা বিষ্ণুকল্প রুসভেল্ট ব্রহ্মাণ্ডময় অবাধ বাণিজ্য বিস্তার করে জগৎ প্রতিপালনের ভার নেবেন। আটলাণ্টিক চার্টারের মুষ্টিযোগ দিয়ে তিনি যে জগৎ থেকে রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, লজ্জা, মান, ভয় সবই দূর করে দেবেন, এ কথা ত ছাপার অক্ষরে খপরের কাগজে অনেক দিন আগেই বেরিয়ে গেছে। তবুও যারা বিশ্বাস করতে চায় না যে, এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-প্রবর্ত্তিত নবযুগ জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, আমি প্রস্তাব করি যে, তাদের কণ্ঠী ছিঁড়ে দেওয়া হোক অথবা Defence of India Ruleএ ফেলে তাদের দৈবশক্তির প্রভাব অনুভব করিয়ে দেওয়া হোক!"

বক্তৃতা শেষ করে আমি আর এক ঢোক চা খেয়ে নিলুম। আশা করেছিলুম, আমার ওজস্বিনী ভাষার গুঁতোয় লতিকাকান্ত লতিয়ে পড়বে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সে তুড়ি মেরে গান ধরে দিলে—

"যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে
কাঁদতে হবে অবশেষে
কলসী তোমার যাবে ভেসে
লেগে প্রেমের ঢেউ

দেখ, গোপাল দা', ইউরোপ আর এসিয়ার দত্যি-দানবদের শেষ করে তোমার ব্রহ্মা-বিষ্ণু যখন আমাদের উপর প্রেমের বন্যা বহিয়ে দেবেন, তখন কাঁখের কলসী কেন, ভাতের হাঁড়ি-কুঁড়ি সুদ্ধ ভেসে না যায়।"

প্রেমাঙ্কুর ক'দিন থেকে র‍্যাডিকাল ডিমোক্রাটিক দলে যাতায়াত করছিল। সে বাধা দিয়ে বললে—"না, লতিকাকান্ত, সে ভয় আর নেই। এবার ব্রহ্মার মন্দাগ্নি হবে। দেনার জ্বালায় তাঁর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হবে। ব্রহ্মার যতগুলি মানসপুত্র আফ্রিকায়, চীনে, ভারতবর্ষে, পারস্যে লোলজিহ্বা বিস্তার করে যজ্ঞভাগ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের রসভাণ্ডার শুকিয়ে যাবে। রসদের অভাবে তাঁদের দেউলিয়া হতে হবে। তা ছাড়া, দেখছ না, ব্রহ্মলোকেই এক আধটা বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিচ্চে।"

রাইচরণ বললে—"হাঁ, ব্রহ্মার মন্দাগ্নি হবে ঐ আশাতেই থাকো। আমি ত দেখতে পাচ্ছি যে, রোগের পর আবার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্যে তিনি দিকে দিকে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়বেন। কার ভাঁড়ে কোথায় কতটুকু তেল লুকান আছে, সে খপর তিনি এখন থেকেই সংগ্রহ করবেন! তার পর যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকলকার বুকের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে হুকুম করবেন—দাও বাবা, পা দু'টোয় একটু তেল মালিস করে। তোমাদের রক্ষা করবার জন্যে ছুটোছুটি করেই আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। এখন তোমরা তেল মালিস করবে না ত করবে কে?"

প্রেমাঙ্কুর পরম বিজ্ঞের ন্যায় দন্তরুচিকৌমুদী বিস্তার করে বললে—"কোন খপরই রাখ না দেখছি। এই পড় দেখি, একবার আমাদের মুসলমান-সাহেব Sir Toric Ameer Ali কি বলেছেন—"I belive that after the war 970% of the British Army will vote for not holding India, Simple because they do not want to go back to that country···The views of the British Army in India would count a great deal in England after the war and in India the war has been a terrible thing."

রাইচরণ লাফিয়ে উঠে বললে—"বলো কি হে! জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, এ কথা শুনেছে কে বা কবে? সে কালে নবীন সেন যে লিখেছিলেন—

মাটী কাটি লভি কোহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায় কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটী মাখিয়া প্রচুর?

সে কথা ত দেখছি ভুল হয়ে গেল! পাছে এ দেশ হাত-ছাড়া হয়ে যায়, সেই ভয়ে ইংরেজ নানা দেশ থেকে সাদা, কালা, হল্‌দে, পাটকিলে নানা রকম সৈন্য একত্র করলে; চারচিল সাহেব মামার বাড়ী থেকে টাকা ধার করে সুদ দিতে দিতে দেউলে হবার জোগাড় হলো; আর তার পর রক্তারক্তি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ইংরেজ সৈন্য 'ধুত্তোর' বলে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে! বলো কি হে! কোন্ দেশের খবরের কাগজ এ খপর ছাপলে? সেখানে গাঁজার দর কত? আমার ত মনে হয়, এর মধ্যে আরও কিছু আছে।"

লতিকাকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার সে মুখ খুললো,—"তাই তো গোপাল দা', ব্রহ্মার এই সব মন্দাগ্নির লক্ষণ ত ভাল নয়। কলিঙ্গদেশ জয় করবার পর না কি মহারাজ অশোকের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল, আর তার ফলে চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মকল্প চারচিলের মন মহারাজ অশোকের মতো ত অত নরম মাটীতে গড়া নয়; ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছিনে ত!"

আমি বললুম—"দেখ, দেবতাদের লীলা নরলোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। দেবতারা ত শুধু দৈত্যদানব বধ করেই ক্ষান্ত হন না। যজ্ঞভাগ নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে মন-কষাকষি, এমন কি লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হয়, তার ত বহু প্রমাণ পুরাণেই রয়েছে। এই দেখ না কেন, যাঁরা বনেদী দেবতা তাঁরা সহজে শিবকে যজ্ঞভাগ দিতে চাননি। অনেক দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে তবে শিবঠাকুরকে জাতে উঠতে হয়েছে। এবারেও দেবতারা শেষ পর্য্যন্ত যে কি লীলা দেখাবেন, তা ত বলা যায় না। কে কোন্ জীবকে তরাবার ভার নেছেন তা নিয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নয়। আর তাই যদি হয়, ত প্রেমের বন্যা আবার রক্তগঙ্গায় পরিণত হতে কতক্ষণ?"

রাইচরণ খানিকক্ষণ মাথা নেড়ে বললে—"আমাদের মহাত্মাজীও যেন ঐ রকম কথা বলেছেন। এই শুনুন না, তিনি বলছেন—Victory won at the expense of India will mean that out of the ashes of Fascism Marxim and Japanese militarism will have risen a new monster that will seek to eat all it sees and in the attempt will be eaten up, leaving I know not what. অর্থাৎ দেবতারা যদি ধর্ম্মপথে না চলেন, তাহলে দুর্ব্বার

দৈত্যবংশ ধ্বংস হবে বটে, কিন্তু যজ্ঞকুণ্ড থেকে এমন এক অতিকায় দানবের আবির্ভাব হবে যে, সকলকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করবে এবং শেষে নিজেও ধ্বংস হবে। কি যে বাকি থাকবে তা ভগবানই জানেন।"

এই সব নূতন ধরণের অতিকায় দানব-টানবের কথা শুনে গোপাল দা'র মুখ শুকিয়ে আসছিল। তিনি চোঁ চোঁ করে আর এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে বললেন—"নাঃ, তোমরা আর আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে পেন্‌সনটা ভোগ করতে দেবে না দেখছি। অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, কিন্তু মহাত্মাজীর ঐ কথাটা ত ভাল বুঝলুম না। দেবতাদের সঙ্গে একটা নূতন দানবের যদি যুদ্ধ হয়, ত এ ওকে খেয়ে ফেলবে, আর ও একে খেয়ে ফেলবে, আর বাকি যা থাকবে, তা মহাত্মাজীও জানেন না—এ আবার কি রকম কথা হলো? দেবতাই হোক, আর দানবই হোক, কেউ একটা বাকি থাকবে ত?"

আমি বললুম,—"না, গোপাল দা', মহাত্মাজী ঠিকই বলেছেন। কেউ বাকি থাকবে না। ছেলেবেলা একবার আমি একটা গোখরো সাপের সঙ্গে একটা কেউটে সাপের লড়াই দেখেছিলুম। দু'বার কোঁস কোঁস করে কেউটে সাপটা গোখরো সাপের ল্যাজটা কামড়ে ধরলে। গোখরো সাপও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও কেউটে সাপের ল্যাজে মারলে কামড়। তার পর ল্যাজ থেকে আরম্ভ করে এ ওটাকে গিলতে লাগলো, আর ও এটাকে গিলতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে—আচ্ছা গোপাল দা', কি হোলো বল দেখি।"

গোপাল দা' বললেন—"কি আর হবে, দু'টোই মরে গেল হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল।"

আমি বললুম—"ঐ ত গোপাল দা', সাপের খেলাই বুঝতে পার না, আর দেবদানবের খেলা বুঝবে কোথা থেকে? কি হলো, জান? বললে বিশ্বাস করবে না, কেউটেটা গোখরাটাকে বেমালুম গিলে ফেললে, আর গোখরোর মুখে পড়ে কেউটেটারও ঠিক ঐ দশা হোলো! রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি—রাস্তা একেবারে সাফ। সাপের নাম-গন্ধ নেই। মহাত্মাজীর কল্পিত দেব-দানবের যুদ্ধও ঠিক তাই হবে আর কি!"

গোপাল দা' মৃদু হাসি হেসে বললেন—"চুলোয় যাক্ দেবতা-দানব, আমার পেন্সনটা বজায় থাকলেই হোলো।"

—বিচ্ছেদ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আশী বছরের বৃদ্ধের সাথে
বাঁধন কাটিল সত্তরার
ষাট বৎসর পরে;—

রাঙা সাড়ী সিন্দুর আলতায়
চৌদোলে গেল সত্তরা, একা
অশীতি রহিল ঘরে।

সহসা বৃদ্ধ মোর মুখে চেয়ে
নিষ্প্রভ আঁখি অশ্রুতে ছেয়ে
ভগ্ন-কণ্ঠে শুধাল আমায়—
'কি করি এখন ক'ন্ ত'?

শিশিরকীর্ণ স্বচ্ছ প্রভাত,
শেফালি-সুরভি বহে শীত বাত,
অকুণ্ঠ নীল অশেষ আকাশ
উড়ে চলে নীলকণ্ঠ;

চাহিয়া ঊর্দ্ধে করযোড়ে নমি'
কহিলাম আমি ডাকি,—
'উত্তর দাও, নীল গগনের
হে নীলকণ্ঠ পাখি'!

দ্বৈত

সন্তোষকুমার ঘোষ



দৈর্ঘ্য ছয় ফুট, গৌরবর্ণ দেহ, তপ্ত কাঞ্চনের আভা। বয়সের ছাপ গোটা কয়েক রেখায় আছে, কিন্তু পদ্মপলাশের মত চোখ দু'টি এখনও স্নিগ্ধতা বিকিরণ করে।

প্রতিমা প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। সারা শরীর তখনো থর থর করে কাঁপছে। দিব্যেন্দু অবশ্য পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ এই শালপ্রাংশু মহাভুজ মহাপুরুষের সম্মুখে দিব্যেন্দুকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হতে লাগল প্রতিমার, তুলনায় অতুলনীয় অকিঞ্চিৎকর।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতখানা তখনো প্রতিমার মাথার ওপরই রয়েছে। প্রতিমা আনত মুখে দাঁড়িয়ে।

স্নিগ্ধ একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

ভয় কি মা, এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজ করেছ,—সমাজের মতো একটা দশমুণ্ড বিশহস্ত রাক্ষসের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এসে শেষ পর্য্যন্ত এই নিরামিষভোজী নিরীহ ব্রাহ্মণকে ভয়? কি রে দিব্যেন্দু, কথা বলছিস্ না যে? সব বীরত্ব, বড়ো বড়ো কথা ফুরিয়ে গেল?

দিব্যেন্দু বলতে চেষ্টা করল,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। তার অস্ফুট কথাটা শোনা গেল না, কিন্তু বোঝা গেল।

আশীর্ব্বাদ? আশীর্ব্বাদ জ্ঞানেন্দ্র কবেই করেছেন, যে দিন দিব্যেন্দু এসে তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলেছে, সে দিনই।

মাথার ওপরের হাতখানা এতক্ষণে প্রতিমার ডান হাতখানা সস্নেহে টেনে নিয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র বললেন,—চলো মা, ঘরে চলো। চা খেতে খেতে সব কথা শোনা যাবে। এসো দিব্যেন্দু।

* * * *

চা খেতে খেতে কতো কাহিনী শোনা গেল। জ্ঞানেন্দ্রের যৌবনের। যৌবনে ওঁরাও বিদ্রোহী ছিলেন। প্রচলিত সব চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সেকালে একাকী দাঁড়িয়ে কতো সহ্য করেছেন, সে কথা সবিস্তারে বললেন।

পরিশেষে বললেন,—দু'টি প্রাণের প্রেরণায় তোমরা দু'জনে একত্র হয়েছো, এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু দেখো মা, কোন অবস্থাতেই এই অনুরাগ, পরস্পরের ওপর উজ্জ্বল শ্রদ্ধা, প্রীতি একে মলিন হতে দিয়ো না।

প্রতিমার দু' চোখ ছল-ছল করে উঠলো। জ্ঞানেন্দ্রের পায়ে হাত দিয়ে আবার নমস্কার করলে।

খুব ভোরে প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল। জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। আজ আকাশের রঙ এমন নতুন লাগছে! ভোর নয়,—সামান্য একটু চাঁদ ঝাউগাছের চূড়ায় লেগে রয়েছে। বাগানের দিকে তাকাতেই প্রতিমার চোখ জুড়িয়ে গেল। এত ফুল আর এত রকমের। লাল, নীল, সাদা,—রঙে রঙে মেশামেশি; আর সবার মাঝখানে জ্ঞানেন্দ্র ধীরে ধীরে পায়চারী করছেন। আজানু-লম্বিত হাত দু'খানা বুকের ওপর রাখা। ধ্যান করছেন কি? বোঝা গেল না। প্রতিমার ভারি লোভ হতে লাগল উঠে যায়। এই প্রাক্‌সকালের হাওয়া, আধফোটা আলো, ভিজে ঘাস আর গন্ধনিবিড় মালঞ্চ, এর কি যেন একটা তীব্র আকর্ষণ আছে! দিব্যেন্দু ঘুমুচ্ছে। প্রতিমা ওর গায়ে চাদরটা ভাল করে ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। যাওয়াটা ঠিক হবে কি? জ্ঞানেন্দ্রনাথ যদি অসন্তুষ্ট হন? হয়ত এই সময়টা উনি একলা থাকতেই ভালবাসেন। কে জানে?

পায়ের শব্দেই জ্ঞানেন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। ফিরে তাকালেন, —এসো মা।

সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুন্দর, প্রতিমা জানে,—কিন্তু সে রূপ যে কত, মহাসমুদ্রের মত দোলায়মান অথচ সংহত, পর্ব্বতের মত উত্তুঙ্গ অথচ অনুচ্ছ্বাসিত, সে কথা আজ এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে উপলব্ধি করলে।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন,—এসো মা। ঘুম ভেঙে গেল? দিব্যেন্দু ওঠেনি?

অকারণেই প্রতিমা একটু আরক্ত হয়ে উঠলো। বললে,—না।

—আর তুমি বুঝি ওকে না জানিয়েই উঠে এলে? আমাদের কালে এমন হলে যে, একটা সিভিল ওয়ার বেধে যেতো।



শিল্পী—জয়নুল আবেদিন

—সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।”—রবীন্দ্রনাথ

—সকালবেলা উঠে একটু বেড়াতে ইচ্ছে হ'ল। আপনি রোজ এত ভোরে ওঠেন ?

এ কথার জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন শুধু। আজ নয়, এ অভ্যাস তাঁর বহু দিনের। সারা দিনের হট্টগোলে নিজেকে মানুষ খুঁজে পায় না,—হারিয়ে যায়, নদীর স্রোতে সূর্য্যকিরণের মত অজস্র ধারায় ভেঙ্গে যায়। খালি এই সময়টুকু তাঁর নিজস্ব, নিস্তরঙ্গ এই প্রাক্‌উষার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটুকু। এই সময় সমস্ত পৃথিবীতে একটা শিশিরস্নাত আর্দ্র বেদনা জড়ানো থাকে,—নিজেকে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সহোদর মনে হয়। চরাচরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার পক্ষে এমন উপযুক্ত সময় আর পাবে না মা। এসো একটু ঘুরি।

সারা বাগান ঘুরে জ্ঞানেন্দ্র প্রতিমাকে গাছপালার সঙ্গে পরিচিত করালেন। ফুলগুলোর নাম চিনিয়ে দিলেন, একে একে। কি তাদের বৈশিষ্ট্য, কোন্‌টা কার প্রকৃতি,—সব।

প্রতিমা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে। জ্ঞানেন্দ্র এত জানেন,—শুধু তাই নয়, এমন উচ্চারণ-ভঙ্গি, এও প্রতিমার কানে নতুন। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছেন, এক কলি ফুলের যেন পাপড়ি খসে যাচ্ছে। আর কত কথা। ফুলের ভেতর, ঘাসের ভেতর, দূর দিগন্তের মৌন নিঃশব্দ অরণ্যানীর ভেতর যে এত কথা ছিল, তা প্রতিমা এত দিন কোথা থেকে জানবে ? বাগানের প্রতিটি ফুল জ্ঞানেন্দ্রের চেনা। এদের প্রতিটির জন্মবৃত্তান্ত জানেন।

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল। চায়ের টেবিলে দিব্যেন্দু এলো ঘুম-জড়ানো চোখ মুছতে মুছতে। একটু নিরালা পেয়েই প্রতিমাকে জনান্তিকে বললে,—চুপি চুপি কখন উঠে এসেছ, আমাকে ডেকে দাওনি যে ?

প্রতিমা সংক্ষেপে বললে,—বাগান ঘুরে দেখছিলুম।

ধীরে ধীরে জ্ঞানেন্দ্রের সব কাজের ভার এসে পড়ল প্রতিমার ওপর। সকালে চা পানের পর খবরের কাগজ। খবরের কাগজের পর ডাক খোলা। জ্ঞানেন্দ্রনাথের নামে এত চিঠিও আসে! শতকরা পঁচিশখানা চিঠি আসে বিদেশের। দেশে-বিদেশে জ্ঞানেন্দ্রের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদিত হয় প্রতিদিন নানা রঙের চিঠিতে।

সেক্রেটারীর কাজ করছে প্রতিমা। প্রতিদিন এই ক্লান্তিকর স্তূপ পড়ে উল্লেখযোগ্যগুলোর সংক্ষিপ্তসার জ্ঞানেন্দ্রকে জানানো। কতকগুলোর জবাব লিখে দেওয়া।

দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা হয় বৈ কি। দুপুর আড়াইটের পর দূর রৌদ্রদগ্ধ মাঠের পায়ে-চলা ধূলো-ওড়া পথে একটা বাইসিকেল এবড়ো খেবড়ো পথ ভেঙে আসে। এই সময়টা জ্ঞানেন্দ্র নিজের লাইব্রেরী-ঘরে নিরালায় বসে পড়াশুনো করেন। প্রতিমার ছুটি। সেই সাইকেলটা এসে ঢোকে জ্ঞানেন্দ্রের বাড়ীতেই। ফটক পার হয়ে বাগান। বাগানের শেষে ছোট্ট দোতলা ঘর।

সাইকেল থেকে নামলো দিব্যেন্দু। চৈত্র মাসে তিন ক্রোশ সাইকেল ভেঙে এসেছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। জামাটা গায়ের রঙের আভাস দিচ্ছে। আর মুখের রঙ ঠিক ফর্সা দিব্যেন্দুর কখনোই ছিল না। এই ক'দিনে ঘুরে ঘুরে আরো যেন পুড়ে এসেছে!

ঘরে ঢুকে দিব্যেন্দু জামাটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে দিলো, তার পর খালি পিঠে ভিজে গামছা জড়িয়ে বললে,—সেক্রেটারীজী, কি খবর।

প্রতিমা একটু হাসলো, জবাব দিলে না। বললে,—খাবার দিই ?

গোঁগ্রাসে খাবার একটা কথা আছে! গোরুর গ্রাস কেমন প্রতিমার জানা নেই, কিন্তু সারা দিন ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরে এসে দিব্যেন্দুর মুখে ভাত তোলবার ভঙ্গী দেখে প্রতিমার ওই কথাই মনে হয়! মনে হতেই হাসি পায়।

দিব্যেন্দু বলে,—হাসছ যে ?

প্রতিমা বলে,—হাসছি ? কই না তো ? তুমি খাও, আমি হাওয়া করছি।

দিব্যেন্দুকে প্রতিমার মায়া হয়। সেই আগের দিব্যেন্দু আর নেই, কলেজের ডিবেটে আর কমনরুমে যার যুক্তিতে প্রতিমা হার মানার অবসর পেতো না! সেই দিব্যেন্দু কই, যার উজ্জ্বল চোখে প্রতিমা এক দিন বিদ্রোহের তেজ জ্বলতে দেখেছে, বাঁকানো ঠোঁটে দেখেছে সঙ্কল্পের কৃপাণ ?

দিব্যেন্দু যেন নিবে গেছে। সব পৌরুষ কি তার এক দমকা হাওয়ায় নিবে গেল,—সমাজের বিরুদ্ধে একটা মেয়েকে জোর করে বিয়ে করতে গিয়েই ? প্রতিমার অবাক লাগে। এই লোকটির পাশা-পাশি অসতর্ক মনে আরো একটা ছবি ভেসে ওঠে। অতি দীর্ঘ সৌম্যদর্শন প্রবীণ একটি রূপ। মোমের মত গায়ের রঙ! সারা শরীর করুণায় যেন গলে গলে পড়ছে। দীর্ঘ চোখে জ্ঞানের অতল-স্পর্শ আভা

কিন্তু দিব্যেন্দু ও তো কম নয়। ও যে তার নিজের আবিষ্কার। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সকলের, কিন্তু দিব্যেন্দু প্রতিমার একার।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের আরো অনেক সখের মধ্যে একটা হ'ল পল্লী-সংগঠন। বাংলার সব গ্রাম নতুন করে গড়বেন! চাষী, তাঁতী, কুমোর, ছুতোর সবাইকে নিয়ে একটা আদর্শ সমবায় গঠন করবেন।

আপাততঃ পাশের খান তিনেক গ্রাম নিয়ে একটা পরীক্ষার রাজসূয় যজ্ঞ চলছে, আর সেই যজ্ঞের কর্ম্মকর্ত্তা দিব্যেন্দু।

সারা দিন দিব্যেন্দুর এতটুকু বিশ্রাম নেই! কোন দিন বেলা দু'টো আড়াইটে নাগাদ ফেরে দু'টো খেয়ে নেবার জন্যে, কোন দিন হয়ত আর সময়মত ফেরাই হয় না। বেলা পাঁচটা ছ'টার সময় ফিরে সাইকেলটাকে ঠেলে দেয় একদিকে, শরীরটাকে চালান করে বাথরুমে। কিন্তু প্রতিমা কই। সারাদিনের আকাশ চারণার পর দিনান্তের নীড় কি এই,—যার জন্যে দিব্যেন্দু সব কিছু তুচ্ছ করে, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক চুকিয়ে, প্রতিমাকে নিয়ে এই গ্রামদেশে এসে ডেরা বেঁধেছে ?

চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে প্রতিমাকে ডেকে পাঠালো। প্রতিমা তক্ষুণি এলো না, এলো যখন তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে আরাম-চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিব্যেন্দু সারা দিনের অবসাদ নিয়ে শুয়েছিল। প্রতিমার পায়ের শব্দ পেতেই একটা আর্ত্ত স্বর বেরিয়ে এলো,—এত দেরী!

হাসিমুখে প্রতিমা বললে,—কাকাবাবুকে আজ ওঁরই লেখা একটা নতুন গান শোনালাম। নতুন লিখেছেন। আমি গোপনে স্বরলিপি থেকে গানটা তুলে অবাক করে দিয়েছি আজ ওঁকে। শুনবে গানটা ?

দিব্যেন্দু বললে,—না থাক। বসবে একটু ?

বেশীক্ষণ তো বসবার সময় নেই প্রতিমার। জ্ঞানেন্দ্র একটা অভিভাষণ লিখছেন,—হাতের কাছে নানারকম বই চাই। সব বই নিজে থেকে নিয়ে লিখতে বসা বড় অসুবিধার,—তাই প্রতিমাকে সর্ব্বদা ওঁর হাতের কাছে চাই। ছোটখাটো ফরমাস খাটবে প্রতিমা, মাঝে মাঝে ওঁর অহেতুক প্রশ্নের জবাব দেবে, ফাঁকে ফাঁকে চা করে দেবে। এ ভারী মজার না ? ভাবতেও আমার গর্ব্ব হয়। ওঁর এই বিরাট অভিভাষণ,—সব কাগজে যা ছাপা হবে, সারাদেশ যার প্রশংসায় মুখর হবে, তার পিছনে আমারো একটা দান আছে, সাধ্যমত আমিও তাকে সাহায্য করতে পাচ্ছি,—এটা গর্ব্বের নয় ? তুমি এখন কী করবে ?

আমি ? দিব্যেন্দু বলল,—আমি একটু ঘুমোবো।

সারাটা বসন্তকাল প্রতিমা জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষ ঘুরে এলো। এই সময়টা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনটে স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। তাছাড়া সর্ব্বত্র প্রত্যহ কতটা বক্তৃতা ছড়াতে হয়েছে তার হিসাব নেই। এত কাল প্রতিমা জ্ঞানেন্দ্রকে দেখেছে তাঁর নিরালার ধ্যানাসনে,—জনারণ্যে এই প্রথম দেখল। দেখল অসংখ্য লোকের ভীড়েও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দ্যুতিমান, সকলের ওপর মাথা তুলে আছেন। দেখল, তাঁর প্রতিষ্ঠা। যেখানেই গেছে, সেখানেই অভিনন্দন, মালা আর চন্দন ; প্রণাম আর করতালি। জ্ঞানেন্দ্রের মোটরের দু'পাশে সারিবদ্ধ লোকের জয়ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বে প্রতিমারও বুক ভরে উঠেছে।

জ্ঞানেন্দ্র বলেন,—তুই আগের জন্মে আমার মেয়ে ছিলি। মেয়ে না হলে বাপের এমন যত্ন কেউ করে ?

প্রতিমা কিছু বলে না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবে,—আপনাকে যত্ন করতে পারাও যে সৌভাগ্যের কথা।

আর সেই দূর প্রবাসে কচিৎ কখনো দিব্যেন্দুর চিঠি এসে পৌছয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আশ্রমের খবরাখবর দেওয়া শুকনো সাংসারিক চিঠি। প্রতিমার কাছেও কখনো বা দু'ছত্র থাকে। বহুদূর প্রান্তর থেকে ক্ষীণ একটা সাড়ার মত। দিব্যেন্দু এখনো আছে। অনেক দূরে আছে।

মমতা প্রতিমার আসে বৈ কি। আহা বেচারা। দিব্যেন্দুর একটা ফটো তার সুটকেসে ছিল। সেখানা খুলে বার করে। অত্যন্ত ভীরু একটা চেহারা। কর্কশ কোঁকড়ানো চুল পিছনের দিকে আঁচড়ানো। বুদ্ধির ছাপ সে মুখেও আছে বৈ কি। জ্ঞানেন্দ্র অপরূপ কিন্তু দিব্যেন্দু অনন্ত।

ওরা যে দিন ফিরে এলো দিব্যেন্দু সে দিন ষ্টেশনে ছিল। জ্ঞানেন্দ্রকে প্রণাম করে প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করল,—কেমন ছিলে ? উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতিমা সারা পথ-ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা দিলে। দেশের দৈনিক কাগজে সে সবের বিবরণী বেরিয়েছিল, কিন্তু প্রতিমার গল্প যেন দৈনিকের নীরস ফিরিস্তির চেয়েও ক্লান্তিকর। অনেক কথাই প্রতিমা বলে গেল, কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করল এই আড়াই মাস দিব্যেন্দু কেমন ছিল, দিব্যেন্দু তার জবাব দিলে না।

স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই আরো সংক্ষিপ্ত, সামান্য দু'-একটা কথায় আদান-প্রদানে মাত্র ঠেকল।

খেতে বসে যদি বা কখনো প্রতিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথা বড় হয় না !

—তুমি আজ কাল বড্ড কম খাচ্ছ।

আগে হলে দিব্যেন্দু ঠাট্টা করে বলতে পারতো,—তুমি সম্মুখে বসে রয়েছ তাতেই পেট ভরে গেছে। কিন্তু আজ চুপ করে রইল। স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিমাও আজ কাল বই পড়তে সুরু করেছে। জ্ঞানেন্দ্রের লাইব্রেরীর বাছা বাছা বই। বলে,—কিছু জেনে শুনে রাখা ভাল বাপু। নইলে ওঁর সঙ্গে কথা কইতেও লজ্জা করে। এত জানেন,—নানা কথা বলেন, কিছু বুঝতে পারি না,—খালি চুপ করে থাকি। তুমিও তো দু'-একটা বই পড়তে পারো !

তার পর দিন কতক দিব্যেন্দুকে আরো দেখা গেল না। প্রতিমার সময় অল্প। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কবিতার বইয়ের প্রুফ দেখা থেকে সুরু করে তাঁর আহারের পরিচর্য্যাও তাকে করতে হয়, তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে সে দিব্যেন্দুর খোঁজ করতে গিয়ে শুনেছে, দিব্যেন্দু বাড়ী নেই। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে, দিব্যেন্দু আলো জ্বালিয়ে পাশের ঘরে শুয়েছে।

পা টিপে-টিপে প্রতিমা উঠে এলো। দিব্যেন্দুর দরজা ঈষৎ খোলা। আলোর একটা তির্য্যক্ তীর বারান্দায় এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে প্রতিমা ভেতরে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে দিব্যেন্দু ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর একটা স্নো আর একটা পাউডার। আর খোলা খাতার পাতায় ওপরে অজস্র কাটাকুটি করা গোটা তিনেক কবিতার লাইন, তাও শেষ পর্য্যন্ত মেলেনি। প্রতিমার মনটা চমকে উঠলো। স্নো আর পাউডার মেখে দিব্যেন্দু জ্ঞানেন্দ্রের মত ফর্সা হতে চায় না কি আর দু'ছত্র ছন্দ মেলাবার ঘর্ম্মাক্ত চেষ্টা করে চায় জ্ঞানেন্দ্রের মত কবি হতে। এত ছেলেমানুষ দিব্যেন্দু ? রুদ্ধ কক্ষে এত দিন তবে এই সর্ব্বনেশে বশীকরণ-তপস্যায় সে মেতেছিল ?

নিজের অজ্ঞাতেই প্রতিমার বুকের নিম্নতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল দিব্যেন্দুর খোলা খাতাটার দিকে। এর কী প্রয়োজন ছিল ? ওর দ্বিধাবিভক্ত নারীচিত্তে দিব্যেন্দু আর জ্ঞানেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন, সে দু'য়ে তো কোন বিরোধ নেই। তবু দিব্যেন্দু জ্ঞানেন্দ্র হতে চায় কেন ?

"মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ-স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।"—রবীন্দ্রনাথ

রাত্রির তপস্যা

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

পরের দিন সকালবেলাই সে পাড়ার লাইব্রেরীতে গিয়া ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্রগুলির কর্ম্মখালি-পৃষ্ঠা খুলিয়া বসিল। ইস্কুল-মাষ্টারী খালি হওয়ার সময় সেটা নয়, সুতরাং বিজ্ঞাপন অল্পই থাকে। তবু সব কয়টা কাগজ খুঁজিয়া দশ-বারোটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিল। এমনি ভাবে প্রত্যহ ঘণ্টা-দুই বিজ্ঞাপন ঘাঁটিয়া তিন দিনে প্রায় গোটা চল্লিশেক দরখাস্ত ছাড়িয়া সে কতকটা সুস্থ হইল। বলা বাহুল্য, ইহার সব কয়টিই মফস্বলের ইস্কুল। কলিকাতার কোন ইস্কুলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল না, পড়িলেও সে দরখাস্ত করিত না—কারণ, কলিকাতা সে ছাড়িতেই চায়! ছিল দুই-একটা সহরতলীর ইস্কুল, কিন্তু সে-ও সেই এক কথা। সেখানে মাষ্টারী করিলে বাড়ী ছাড়ার কোন অজুহাত থাকিবে না, মিছামিছি ট্রাম-বাসে কতকগুলি বাড়তি পয়সা ও সময় নষ্ট হইবে।

না, কলিকাতায় থাকা তাহার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এখানে সময় নষ্ট হইবার অজস্র ফাঁদ পাতা আছে চারি দিকে, চাকরী করিয়া নিজের পড়াশুনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাহার উপর বাড়ীর আব্‌হাওয়াও তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় অসহ্য। ইস্কুল-কলেজ ছাড়া পড়িবার কথা তাহারা চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং এখন তাহার পড়াশুনার সময় যেটুকু সমীহ করে তখন সেটুকুও থাকিবে না। তাহার উপর এই ইস্কুল-মাষ্টারীতে যে তাহার বাবা ঘোরতর আপত্তি করিবেন এ বিষয়েও তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না—প্রতিদিনই কানের কাছে শোনাইবেন যে, চাকরি যদি করিতেই হয় ত সাহেবের চাকরীই করা উচিত। তাঁহার কথা অমান্য করিয়া সে যে বড়লোকের ভরসায় এম-এ পড়িতে গিয়াছিল সে অপরাধ তিনি কোন দিনই ক্ষমা করেন নাই—সুযোগ পাইয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপে এই কয় দিনেই তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তবু অনেকটা সময় সে বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া আসে কিন্তু বারো মাস ত আর সেটা সম্ভব নয়, আর তাহা হইলে পড়াশুনাই বা সে করিবে কখন? তার চেয়ে যত দূর পল্লীগ্রামে চলিয়া যাইতে পারে ততই ভাল। এখানকার এই সব হৃদয়হীন বিরক্তিকর আক্রমণ সেখানে পৌঁছিবে না—বড় জোর কয়েক দিন অন্তর দু-একটা চিঠি, সেটা তত অসহ্য হইবে না।

দরখাস্ত পাঠাইয়া সে যেন প্রতিটি মুহূর্ত্ত গণিতে লাগিল। চাকরীর দরখাস্তের কি ফল হয় তাহা সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে, তবে এ ক্ষেত্রে ভরসা এই যে, মফঃস্বলের ইস্কুল-মাষ্টারী নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কেহ করিতে চায় না। চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দরখাস্তের মধ্যে একটা অন্ততঃ কোথাও লাগিয়া যাইবে—এ ভরসা তাহার ছিল। দিন যেন আর কাটে না। ইউনিভারসিটি যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে; এম-এ পড়া যখন কিছুতেই সম্ভব হইবে না তখন শুধু শুধু মায়া বাড়াইয়া লাভ কি? কি-ই বা বলিবে সে সহপাঠীদের? তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার আশাভঙ্গের বেদনা অধিকতর আঘাত পাইবে, এই মাত্র। ও সংস্রব ত্যাগ করাই ভাল। দুই-একটি বন্ধু হয়ত খুঁজিবে, হয়ত তাহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করিবে, তাহার পর একেবারে ভুলিয়া যাইবে—তাহার পরিণতি বা পরিণাম লইয়া কেহই বেশী মাথা ঘামাইবে না। না, সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আবার যদি কোন দিন ওদের যোগ্য হয়ে এসে দাঁড়াতে পারি তবেই দেখা দেব, নইলে এই ভাল। বড় জোর ভাববে আমি বখে গেছি কিংবা মরেই গেছি।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি। সকালবেলাটা কাটে লাইব্রেরীতে, বাবা অফিসে চলিয়া গেলে বাড়ী ফেরে—তাহার পর লম্বা দিবা-নিদ্রা দিয়া আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়ে, রাত্রি গভীর হইবার আগে আর বাড়ী আসে না। কিন্তু সে-ও বিপদ্ কম নয়, কলেজ স্কোয়ার, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি পরিচিত ও প্রিয় জায়গাগুলি তাহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়, পাছে কোন চেনা-লোক বা সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এবং দূর কোন একটা পার্কে চুপ করিয়া বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় কাটায় সে। এ নিষ্ক্রিয়তা তাহার অসহ্য লাগে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না।

সন্ধ্যার কথা তাহার প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে পড়ে। মনে হয় যে, তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার আগে যদি এমন কোন দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা দুঃখ ভোগ করিতে হইত না—তাহার কাছে সান্ত্বনা মিলিত অতি সহজে। শুধু তাহার সাহচর্য্যই ত একটা মস্ত সান্ত্বনা। এই মুহূর্ত্তে সে যদি সন্ধ্যার কাছে বসিয়া আবার আগেকার মত সাহিত্য বা অন্য লেখা-পড়ার কথা আলোচনা করিতে পাইত, তাহা হইলে এই সমস্ত বেদনা, সমস্ত গ্লানির চিহ্নমাত্র থাকিত না তাহার মনে।

একটা কথা তাহার মনে হয় সব চেয়ে বেশী—একটা কৌতূহল। আচ্ছা, সন্ধ্যাও কি তাহার অভাব অনুভব করে? প্রশ্ন জাগে বার বার—বার বারই সে নিজের অন্তরের মধ্যে উত্তর খুঁজিয়া পায়। সন্ধ্যার সেই সশ্রদ্ধ জ্ঞানপিপাসু চোখ দুটি—ভূপেনের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, উদ্বেগ এবং প্রীতি যেন সে দুটি চোখে ভরিয়া থাকিত। না, সে এত সহজে ভূপেনকে ভুলিয়া যাইবে না। সেই আশ্বাস-বাক্যটিই তাহার এই অপরিসীম নৈরাশ্যের মধ্যে যেন তাহাকে বাঁচিবার পাথেয় যোগাইত।

তৃতীয় দিন ডাকে দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। দু'টি হস্তাক্ষরই তাহার পরিচিত। একটি সন্ধ্যার, আর একটি মোহিত বাবুর। প্রথমেই সে সন্ধ্যার চিঠিটা খুলিল। সে লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

আপনার চিঠি পেলাম দাদুর হাতে। কেন যে আপনি সহসা আমাদের ত্যাগ করলেন তা বুঝতে পারলুম না। সে দিন দাদুর সঙ্গে কথা কইবার পর সেই যে আপনি চলে গেলেন আর এলেন না, তাতে শুধু এইটে অনুমান করতে পেরেছিলুম যে, সেই আলোচনার সঙ্গেই আপনার এই অনুপস্থিতির যোগাযোগ আছে। আজ দাদু আপনার চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দিদিভাই দোষ আমারই—ভূপেন খুব আঘাত পেয়েছে কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমার অন্য উপায় ছিল না।'—কি কারণ, কেন আপনি আঘাত পেলেন তা জানি না, জানবার

অধিকারও হয়ত আমার নেই! তবে দাদু যে কখনও কারুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবেন না, এটা আমি জানি। অথচ আপনাকেও জানি, আপনিও অকারণে অভিমান করবেন কেন? এ সমস্যা আমার সাধ্যাতীত—তা নিয়ে মাথাও ঘামাবো না। কারণ যা-ই হোক—আপনাকে হারাতে হ'ল এইটেই আমার কাছে বড় কথা। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোন দিনই ঘুচে যাবার নয়—যেটুকু আজ জেনেছি শিখেছি তা আপনারই জন্যে, এটা আপনিও কোন দিন ভুলতে পারবেন না; আর সেই জন্যেই আমার ভরসা আছে যে, আমার প্রতি আপনার স্নেহও কোন দিন যাবে না। যেখানেই থাকুন—আমি জানি আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আমি পাবো। আপনি যখন খুব বড় হবেন, খুব বড়—পণ্ডিত বলে দেশবিদেশে আপনার খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়বে—তখন আর সব কথা ভুলে যান ক্ষতি নেই, শুধু এইটে মনে রাখবেন যে সে দিন আর কেউ-ই আমার চেয়ে বেশী খুশী হবে না। আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাষ্টার মশাই, আমার সে আশা যে পূর্ণ হবে তাও আমি জানি।

আপনি দেখা আর না দিতে চান দেবেন না, কিন্তু চিঠি দেবেন ত?

আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন। ইতি—
আপনার সন্ধ্যা।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে নিজের মনকে বার বার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল যে, আর তাহার কোন দুঃখ নাই, অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার এই শ্রদ্ধা এবং এই প্রীতিটুকুই তাহার সমস্ত বেদনাকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে; কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত একটা অপরিসীম ক্ষতিবোধই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার চক্ষুকে সজল করিয়া তুলিল।···

সন্ধ্যার চিঠি পড়া শেষ হইবার অনেকক্ষণ পরে সে মোহিত বাবুর খামখানা খুলিল। চিঠির সঙ্গে বাহির হইল একখানা চেক, এ মাসের পূরা বেতনটাই শুধু দিয়াছেন তিনি, বেশী কিছু দিবার চেষ্টা করেন নাই। মোহিত বাবু লিখিয়াছেন—

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিঠি পড়িয়া, তুমি যে আমাকে ভুল বুঝিয়াছ সে জন্য যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি আমি যে তোমাকে ভুল বুঝি নাই এজন্য একটু গর্ব্ব বোধ না করিয়াও পারিলাম না। তুমি যে আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় দিয়াছ তাহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে এবং, এখন আর স্বীকার করিতে বাধা নাই, আমি তাহা তোমার কাছে আশাই করিয়াছিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়ী হও, যশস্বী হও—তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক। তবে একটা অনুরোধ, যদি কখনও ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন অন্ততঃ যেন এই বৃদ্ধের কথা আগে মনে পড়ে। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে, তখন আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিও, তখনও যদি অভিমান করিয়া দূরে রাখো তাহা হইলে ক্ষুণ্ণ হইব। মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—তোমাদের দাদু।

চিঠিখানা বার-দুই পড়িবার পর পুনরায় খামে মুড়িয়া রাখিয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিল। হয়ত সে ভুলই বুঝিয়াছে মোহিত বাবুকে, কিন্তু তাঁহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভুল যে করে নাই, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।···এই পরিবারটির প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং যে স্নেহ স্নেহাস্পদের সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করে, সেই সত্যকার স্নেহের পরিচয় সে বার বার পাইয়াছে, আজও আর একবার পাইল। বোধ হয় এই জন্যই ক্ষতিবোধ তাহার এত প্রবল, এই জন্যই তাহার বেদনার পরিমাণ এত বেশী। তবু এইটিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়া রহিল, জীবন-যুদ্ধের রহিল প্রধান অস্ত্র।

সন্ধ্যার খোলা চিঠিখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর একবার সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, তাই হবে সন্ধ্যা, আমি তোমার জন্যেই বড় হবো! নিশ্চয়ই বড় হবো, তুমি দেখে নিও।

দিন পাঁচ-ছয় প্রতীক্ষা করার পর যখন চিত্ত তাহার ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, যখন হতাশ হইবার আর খুব বেশী দেরী নাই, তখন হঠাৎ এক দিন সকালে খান-দুই চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। একটি আসিয়াছে এম-ই বা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে—ইঁহারা বিজ্ঞাপনে মাহিনার কথা জানান নাই, এখন তাহাকে ঐ পদে বাহাল করিয়া জানাইয়াছেন যে, আপাততঃ কুড়ি টাকার বেশী বেতন দিতে পারিবেন না। আর একটি বীরভূম জেলার এক গ্রাম্য হাই-স্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহার নিয়োগপত্রে লেখা আছে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনে তাহাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু সেই খামের মধ্যেই একখানা ব্যক্তিগত চিঠিতে হেডমাষ্টার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, খাতায়-কলমে পঞ্চান্ন টাকা থাকিলেও আসল মাহিনা তাহার তেতাল্লিশ টাকা আট আনা, সে যেন কোনরূপ ভুল বুঝিয়া না আসে। এখানে প্রাইভেট টিউশানীরও কোন সম্ভাবনা নাই—অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের লইয়া একটা কোচিং ক্লাস মত আছে, কিন্তু সে-সবই পুরাতন শিক্ষকরা দখল করিয়া আছেন। সে যদি হোষ্টেলেই থাকিতে চায় তাহা হইলে মাসিক চার টাকা খরচ পড়িবে থাকা এবং খাওয়ার। ইত্যাদি—

মাষ্টারীর মাহিনা খুবই কম—এ কথাটা আরও অনেকের মুখে ভূপেন শুনিয়াছিল; সুতরাং তেতাল্লিশ টাকা আট আনাতে সে ভয় পাইল না। বরং সে হয়ত আরও কমই আশা করিয়াছিল। কিন্তু হোষ্টেল চার্জ্জ-এর পরিমাণ দেখিয়া সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। চার টাকায় খাওয়া ও থাকা? সে কেমন দেশ!

সেই দিনই সে সেক্রেটারীর নামে ইংরেজীতে একখানি এবং হেডমাষ্টার মহাশয়ের নামে বাংলায় একখানা চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া দিল। দু'জনকেই লিখিয়া দিল দিন-আষ্টেকের মধ্যে সে ওখানে পৌঁছিবে।

বাড়ীতে এত দিন সে কিছুই জানায় নাই। কথাটা শুনিলেই একটা চেঁচামেচি, এমন কি কান্নাকাটি পড়িয়া যাইবে। সব চেয়ে বিপদ বাবাকে লইয়া, মুখে তিনি যাহাই বলুন, সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে স্নেহ তিনি যে তাহাকেই করেন তা ভূপেন জানে। আশা-ভরসা সবই তাঁহার এই একমাত্র পুত্র-সন্তানটির উপর। এ ক্ষেত্রে কথাটা কি করিয়া পাড়া যায় সেইটাই হইল বড় সমস্যা। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর সে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়টাই বাছিয়া লইল। সন্ধ্যায়

পূর্ব্বেই সংবাদটা মাকে জানাইয়া, তিনি স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া উঠিবার আগেই, সে বাহির হইয়া পড়িল এবং ফিরিল রাত্রি এগারোটার পরে।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়াই সে বুঝিল, ঝড় তখনও কাটে নাই। বাবা তখনও চীৎকার করিতেছেন, নীচের তলার অবিনাশ বাবুরা সকলে উপরে বসিয়া জটলা করিতেছেন আর মায়ের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। তাহাকে দেখিয়া বাবা গলাটা আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিলেন। সেই সুদূর বীরভূম, ম্যালেরিয়া-জলকষ্ট-মহামারীর দেশ, সেইখানে সে সামান্য কয়টা টাকার জন্য যাইতেছে ইস্কুল-মাষ্টারী করিতে? কেন, তিনি কি মরিয়া গিয়াছেন? না হয় গস্ সাহেব নাই, তাই বলিয়া তাঁহার এত দিনের সার্ভিসের কি কোন মূল্য পাওয়া যাইবে না? তিনি যে এখনও মরা-হাতী লাখ টাকা। নিজের ছেলে বলিয়া গিয়া দাঁড়াইলে, বিশেষতঃ যে ছেলে গ্রাজুয়েট, এখনও তিনি পঁয়তাল্লিশ টাকায় ঢুকাইয়া দিতে পারেন যে কোন দিন। তার পর ইন্‌ক্রিমেণ্ট? সে তো তাঁহাদেরই হাতে। তা-ছাড়া যদি দুইটা বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকেন, মাহিনা যা-ই বাড়ুক, বিল সেক্‌সানে তিনি যেমন করিয়াই হউক ঢুকাইয়া দিবেন তাহাকে—তার পর আর ভাবনা কি? হাজার টাকার বিলে দশটা টাকা করিয়া লইলেও মাস গেলে যেমন করিয়া হউক উপরি দুশটি টাকা পকেটে আসিবে। ঐ করিয়া পুলিন দা' কলিকাতাতে দুইখানা বাড়ীই কিনিলেন, মাহিনা ত পান মাত্র দেড়শ টাকা। ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ ধরিয়া এক নিশ্বাসে বকিয়া যাইবার পর, বোধ করি দম লইবার জন্যই উপেন বাবু চুপ করিলেন। বিরক্তিতে ভূপেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, একে সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত তাহার উপর বাবার অফিসের এই মহিমা সে বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে। তবু সে নিজেকে সংযত রাখিয়াই কহিল, —চাকরী আমার ভাল লাগে না বাবা, সে-ত আপনি জানেন।

উপেন বাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—তা ভাল লাগবে কেন? ইস্কুল-মাষ্টারীটা চাকরী নয়—না? ওরে এ হ'ল হাজার হোক—সাহেবের চাকরী, এর ঢের সুবিধে! আর সে দেখবি হাজারটা মনিব। এইত আমাদের অফিসের প্রাণকেষ্ট, এম-এ পাশ করে মাষ্টারী করতে ঢুকেছিল। বড় ইস্কুল, মাইনেও পাচ্ছিল ভাল—দুটি বছর না যেতে যেতে পালিয়ে আসতে পথ পেলে না! পাঁচ টাকা কম মাইনেতেই আমাদের অফিসে এসে ঢুকল। বলে দাদা, এ ঢের ভাল। সেখানে সেই সেক্রেটারী থেকে, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার থেকে হেড মাষ্টার এস্তক পঞ্চাশটা মনিব—সে সহ্য হয় না। তা ছাড়া, যদি মাষ্টারীই করতে হয় ত এখানে চেষ্টা কর, সেই ধাবধাড়া-গোবিন্দপুর না গেলে হয় না!

অবিনাশ বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিলেন, এইবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন,—দ্যাখো বাবাজী, একটা কথা শুনে রাখো, আমার বয়স ঢের হয়েছে, অনেক দেখলুম—বিলেতের খবর জানি না অবিশ্যি, এখানে ইস্কুল-মাষ্টারদের লোকে মানুষের মধ্যে গণ্যই করে না। মাষ্টার শুনলে সবাই মুখ টিপে হাসে—ঠাট্টা করে। আমাদের দেশে ফার্ষ্ট-ক্লাস লোক যারা তারা ব্যবসা করে কিম্বা উকীল-ব্যারিষ্টার হয়, সেকেণ্ড-ক্লাস লোক হয় ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, থার্ড-ক্লাস লোক চাকরী করে, ফোর্থ-ক্লাস লোক প্রফেসার হয় আর যাদের কিছু হয় না তারাই যায় মাষ্টারী করতে। ···তুমি বাবাজী কোন্ দুঃখে মাষ্টারী করতে যাবে? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার উন্নতির কত পথ খোলা—

এবার আর ভূপেন বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই কহিল,—আমি ত আর চিরকালের জন্যে মাষ্টারী করতে যাচ্ছি না—আপনারা এতই বা উতলা হচ্ছেন কেন? চাকরীতে ঢুকলে আমার এম-এ পাস করার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না, লেখা-পড়ার আশা চিরকালের মতই জলাঞ্জলি দিতে হবে। মাষ্টারীতে অবসর বেশী, পড়ার সুবিধেও ঢের, সেই জন্যই মাষ্টারী করতে যাচ্ছি। আর সেই জন্যই কল্‌কাতাতে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই।

উপেন বাবু কহিলেন—কেন কলকাতাতে থাকলে তোমার কি অসুবিধা হবে শুনি? এখান থেকে কেউ পাস করে না? বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা হচ্ছিল না এত দিন? তার পর সেখানে গিয়ে যখন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করে পড়বে—তখন কে মুখে জল দেবে? তখন ত আবার এই পাষণ্ড বাপ-মার কাছেই আসতে হবে!···উঃ, বাপ রে! বাপ-মা এত মন্দ যে পাছে বাড়ী থাকতে হয় বলে সেই নিবান্ধা যমপুরে যাওয়া—

ভূপেন তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কলকাতার ইস্কুলে মাষ্টারী নিয়ে ত কেউ বসে নেই। আর সে শুধু দরখাস্ত করে পাওয়াও যায় না—ঢের ধর-পাকড় করতে হয়। যেখানে যাচ্ছি সে দেশেও মানুষ বাস করে নিশ্চয়, সবাই যদি ম্যালেরিয়ায় মরে যেত তাহ'লে ইস্কুলটাও চলত না। এ আমরা সহজ-বুদ্ধিতে বুঝি—

সে আর তর্ক-বিতর্কের অবসর না দিয়া রান্না-ঘরে গিয়া কহিল, মা, ভাত দাও।

মা তখন উনানের সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে-ছিলেন, ছেলেকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—আমি যে তোর ওপর অনেক আশা করে বসে আছি বাবা—

ভূপেন ধমক দিয়া কহিল,—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? আমি কি মরে যাচ্ছি? না মরতে যাচ্ছি? যদি সবাই মিলে তোমরা অমন কর তাহ'লে আমি এই দণ্ডেই চলে যাবো বলে রাখছি।

ভয় দেখানোতে ভাল কাজ হইল। মা চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভূপেন ভাত খাইতে বসিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার বোনদেরও মুখ থম্ থম্ করিতেছে, যেন তাহার একটা মহা সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। ইহারা কিছুই বোঝে না, শুধু বাবার বিলাপ হইতে ধরিয়া লইয়াছে যে, ভূপেন মফস্বলে ইস্কুল-মাষ্টারী লইয়া তাহাদের সকলকার সমস্ত আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। ভূপেনের মনে মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুও চলিয়া গেল, এ সংসর্গে আর কয়েকটা দিন থাকিলেই লেখাপড়ার সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে চাকরীতে ঢুকিতে হইবে।

তাহার খানিকটা খাওয়া হইয়া গেলে মা আবার ভরসা করিয়া মুখ খুলিলেন,—তা এখন কি আর যাওয়াটা বন্ধ করার কোন উপায় নেই, হ্যাঁ রে?

ভূপেন গম্ভীর ভাবে জবাব দিল,—না, আমি তাদের কথা দিয়েছি। তা ছাড়া বন্ধ করার কোন দরকারও ত দেখছি না।

আরও ভয়ে ভয়ে মা বলিলেন—ইস্কুল-মাষ্টারী ত খুব খারাপ কাজ শুনেছি বাবা!

—হ্যাঁ, চুরী-ডাকাতিরও অধম! এ সব কথা কে বুঝিয়েছে তোমাকে, বাবা ত? তাঁর অফিসের ঐ গস্ সাহেবকেও এক দিন ইস্কুল-মাষ্টারের কাছে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, বাবাও যেটুকু শিখে চাকরী করছেন সেটুকুর জন্য ঐ মাষ্টাররা দায়ী। আশু মুখুজ্জে, সি আর দাশ, গান্ধী যে বড় সবাই জানে মা, কিন্তু তাদের বড় যারা করলে তারা কি এতই হেয়। তুমি অমন করছ কেন? অফিসে কেরাণী-গিরি করার থেকে ইস্কুল-মাষ্টারী করা অনেক গৌরবের কাজ বলেই মনে করি আমি।

মা যে কতকটা ছেলের ধমকের ভয়েই চুপ করিয়া গেলেন তা তাঁহার মুখ দেখিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহারও আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, কোন মতে আহার সারিয়া উঠিয়া পড়িল।

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া সে যখন নিজের ঘরে যাইতেছে, তখনও উপেন বাবুদের বৈঠক ভাঙ্গে নাই। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না বটে, কিন্তু অবিনাশ বাবুর উৎসাহ তাহাতে কমিবার কথা নয়, তিনি তাহার উদ্দেশে গলা চড়াইয়া কহিলেন,—কাজটা ভাল করলে না বাবাজী! আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে পাঁচ বছর কেরাণীগিরি আর তিন বছর মাষ্টারী করলে মানুষ গাধা হয়। তবু দুটো বছর সময় পেতে!

ভূপেন তাহার নূতন মনিবদের কাছে আট দিন সময় লইয়াছিল, কিন্তু এখন আর অত দিনও অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবা যতটুকু সময় বাড়ী থাকেন, বিলাপ করেন আর বক্তৃতা দেন, মা নিঃশব্দে চোখ মোছেন এবং বোনরা গম্ভীর মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। অথচ উপায়ই বা কি, সে নিজে আট দিন সময় লইয়াছে এখন আবার কি অছিলায় আগে যায়?

তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষই। ভূপেনের সম্মতি-পত্র পাঠাইবার দ্বিতীয় দিনেই এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির হইল। তাহাতে লেখা আছে—'এখনই যোগ দিন—কবে যাত্রা করিবেন তার করিয়া জানান।' ভূপেন আর এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করিল না, তখনই ডাকঘরে গিয়া তার পাঠাইয়া দিল—কালই যাইতেছি। তার পর বাড়ী ফিরিয়া যাত্রার আয়োজন সুরু করিয়া দিল। অবশ্য ঘটা করিয়া আয়োজন করিবার মত এমন কিছু ছিলও না—মোহিত বাবুর চেক ভাঙ্গাইয়া সে ইতিমধ্যেই আংশিক বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতি তাহার যাহা দেয়, তাহা মিটাইয়া দিয়াছিল, বাকী টাকা দুই-একখানা কাপড়-জামা, বিছানার একটা চাদর এবং ফাইবারের একটা সুটকেশ কিনিতেই শেষ হইয়া গেল। মাস-কয়েক আগে টাকা জমাইবার শুভবুদ্ধি মাথায় দেখা দিয়াছিল, সেই সময়ে পোষ্ট আফিসে একটা হিসাব খুলিয়া ফেলে। এখন খাতাটা খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে মাত্র আটটি টাকা পড়িয়া আছে। বিছানার দুই-একটা জিনিষ কিনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই আর্থিক অবস্থায় তাহা আর সম্ভব নয়—অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার পুরাতন বিছানার মধ্য হইতেই অপেক্ষাকৃত ভদ্র কিছু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোনগুলি মুখ ভার করিয়াই থাক বা গোপনে রোদনই করুক—শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্যেই সুটকেশ ও বিছানা ঠিক করিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার মুখে আবার বাহির হইয়া পড়িল।…কত দিনের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেছে কে জানে! দীর্ঘকাল, হয়ত বা জীবনের মতই—কিছুই বিচিত্র নয়। এই শেষ সন্ধ্যাটি সে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।

মন খারাপ হয় বৈ কি! জন্ম হইতে সিমলার এই সংকীর্ণ গলি এবং কলিকাতার অতি-পরিচিত রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিতেছে। এত দিন বোঝা যায় নাই, কখন্ অজ্ঞাতসারে এই কদর্য্য পথগুলি তাহার মনে মায়া বিস্তার করিয়াছিল। যে ট্রাম-বাসের কোলাহল চিরকাল অসহ্য বোধ হইয়াছে, আজ যেন তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেই কষ্ট বোধ হইতেছে।…মা কাঁদিতেছেন, বাবাও বাড়ী আসিয়া খবর পাইলে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে চোখের জল ফেলিবেন। যে বোনগুলির স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সে কখনও চিন্তা করে নাই তাহাদেরও চোখ ছল্-ছল্ করিতেছে। এই সব স্নেহের বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, চিরপরিচিত এবং প্রিয় আবেষ্টনী পিছনে ফেলিয়া সে সম্পূর্ণ অজানা কোন্ দেশে যাত্রা করিতেছে—কি সেখানে মিলিবে কে জানে! হয়ত এই কষ্ট করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, বাবার উপদেশ শুনিয়া অফিসে চাকরী লইলে এক রকম করিয়া জীবন কাটিয়াই যাইত, সম্ভবতঃ শান্তিতেই কাটিত। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলের যেমন করিয়া জীবন কাটে—চাকরী করিয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতিপালন করিয়া—অভাবে ও দারিদ্র্যে—তাহার জীবনও না হয় তেমনি করিয়াই কাটিত, দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আদর্শ-বাদী হইতে গিয়া হয়ত সে ভুলই করিল।

এই সব চিন্তার মধ্যে মন যখন অত্যন্ত ক্লিষ্ট, সহসা সন্ধ্যার শান্ত একাগ্র চোখ দুটি যেন দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিল। সে চোখের চাহনি যেন আর একবার মনে করাইয়া দিল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাষ্টার মশাই, আপনি কেরাণীগিরি করছেন এ আমি ভাবতেই পারি না।'…সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্ব্বলতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। পিছনের দিকে, আরামের পঙ্কশয্যার দিকে তাকাইলে চলিবে না। তাহাকে বড় হইতেই হইবে, ধনী নয়, শিক্ষিত হইতে হইবে।

তরুণ বয়স তাহার—জীবনের অন্ধকার দিকের ছায়া তাহার কল্পনাকে তখনও মলিন করিতে পারে নাই, পূর্ব্বপুরুষদের দাসত্বের সংস্কার তখনও তাহার আশা ও আদর্শবাদকে সংকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই—তাই সে-দিন সন্ধ্যারই জয় হইল, সহজ জীবনযাত্রার প্রলোভন ফেলিয়া যশের জয়তিলকই জীবনের কাম্য বলিয়া বাছিয়া লইতে পারিল।

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতে চলিতে অভ্যস্ত পা কখন চোরবাগানে মোহিত বাবুদের বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতেও পারে নাই। সহসা দূর হইতে পরিচিত দারোয়ানকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের জন্যই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে সে, দেখা করিবার অজুহাতের অভাব নাই। একবার ঢুকিয়া পড়িবে না কি বাড়ীর মধ্যে? চলিয়া যাইবার আগে আর একবার সন্ধ্যাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার মনের অবচেতন অবস্থায় বরাবরই ছিল এখন দুর্নিবার লোভে বুক দুলিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,

সন্ধ্যার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, লাইব্রেরী-ঘরেরও জানালা খোলা—সম্ভবতঃ দু'জনেই আছেন। কিন্তু—না, ছিঃ, মনে পড়িয়া গেল চিঠিতে মোহিত বাবু দেখা করার কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। এ অবস্থায় গেলে মোহিত বাবুর চোখে ছোট হইয়া যাইতে হইবে। কোন কারণে, অন্তরের কোন তাগিদেই সে তাঁহাদের কাছে ছোট হইতে পারিবে না।

সে জোর করিয়া নিজেকে ফিরাইয়া লইল। আর ঘুরিবারও ইচ্ছা নাই, এতক্ষণ হাঁটার ক্লান্তিতে এই বার যেন পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, সে বাড়ীর দিকেই ফিরিল।

পরের দিন সকাল দশটায় গাড়ী, মা-বাবা সারা রাতই ঘুমাইলেন না। মা শেষ-রাত্রে উঠিয়া রান্না করিতে গেলেন, বাবা তখনই তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাওয়া বন্ধ করার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কাল হইতে সে কথা আর তুলেন নাই। এখন শুধু স্নান আহার বিশ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ। বীরভূম সাপের দেশ, সাদা করবীর ডাল বিছানার নীচে রাখিয়া দিলে সাপ আসে না, ঐ ডালেরই একটা ছড়ি করিয়া লইলে পথেও নিরাপদ থাকা যায়। জল সর্ব্বদা গরম করিয়া খাইবে, হোটেলে সম্ভব না হইলে নিজেই যেন বন্দোবস্ত করিয়া লয়, স্নান বেশী না করাই ভাল, করিলেও গরম জল ব্যবহার করা উচিত। ধান ক্ষেত, নদীর ধার এবং জঙ্গল এই সব স্থানগুলি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য —ইত্যাদি।

ভূপেনের নিজের মানসিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিল; তাহার উপর এই সব অবান্তর উপদেশ অত্যন্ত বিরক্তিকর। তবু সে শান্ত ভাবেই সব শুনিয়া গেল, শেষ দিনে আর কোন আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না। আজ সে বুঝিল, কেন হিন্দুস্থানীরা হাজার মাইল দূর হইতে এ দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এবং বাঙ্গালীর ছেলেরা ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত সে বলিয়াও ফেলিল, আমি ত মাত্র সওয়া-শ' মাইল যাচ্ছি বাবা, তাইতেই আপনারা এমন করছেন, আপনার আফিসের সাহেবরা রোজগার করবার জন্য কত দূর এসেছে, আর কি দেশ ছেড়ে কি দেশে এসেছে ভেবে দেখুন দিকি!

বলা বাহুল্য, উপেন বাবুর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। কোন মতে স্নানাহারের সময় হইয়াছে এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে অব্যাহতি পাইল এবং যথেষ্ট সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও সাড়ে আটটার সময়ই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

—আমি—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুধা-সাগরের আমি যে কণিকা পাই তার পরিচয়,
উচ্ছ্বসি' উঠে হৃদয় আমার হেরিলে চন্দ্রোদয়।
টান পাই সারা বক্ষে, পাই যে অমিয় আকর্ষণ
ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে তুলিতে চাহে যেন মোর মন।
মহাসাগরের জোয়ার-ভাঁটা যে খেলে এ বুকের মাঝে
রেণু মৃগনাভি ভিতরে ইহার সুরভি রাজ্য রাজে।

গ্রহে গ্রহে মোর আত্মীয় আছে কেহ নয় মোর পর,
বুকের অগাধ আনন্দ মোরে করে যে জাতিস্মর।
সকল গ্রহের কৃপা অকৃপা সকল গ্রহের দান—
না চাহিতে যাহা আপনি পেয়েছে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ।
জ্যোতির্ম্ময় সে অভিভাবকেরা উপরে রয়েছে সব,
সবার সঙ্গে আমি গাঁথা আছি এ কি কম গৌরব!

যদিও ক্ষুদ্র যদিও তুচ্ছ বিন্দু অমিয় আমি
এই বিশ্বের সুধা লয়ে মোর কারবার দিবা-যামি।
ছোট সুখ দুখ লয়ে থাকি তবু এমনি শক্তিধর,
এ মর জগতে আমার সৃষ্টি হবে অবিনশ্বর।
ভেব না এ কণা ধরার তাতল সৈকতে পড়ে রবে
সুধা-সাগরের উত্তাল ঢেউ এসে বুকে তুলে লবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

২

মূল :—দেবগণের হওয়া উচিত জ্যেষ্ঠ ; নৃপগণের মধ্যম হওয়া উচিত ; পক্ষান্তরে, অবশিষ্ট প্রকৃতিগণের নিমিত্ত কনিষ্ঠ (পরিমাণের নাট্যমণ্ডপ) সম্যগ্‌রূপে বিহিত হইয়া থাকে। ১১।

সঙ্কেত :—জ্যেষ্ঠ—১০৮ হাত ; মধ্যম—৬৪ হাত ; কনিষ্ঠ—৩২ হাত—দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে। দেবানাঞ্চ ভবেজ্জ্যেষ্ঠং (বরোদা) ; দেবানাং ভবনং জ্যেষ্ঠম্ (কাশী)। এ শ্লোকটির নিম্নোক্তরূপ অর্থ আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়—দেবগণের রঙ্গমঞ্চের পরিমাণ—জ্যেষ্ঠ (১০৮ হাত), নৃপগণের—মধ্যম (৬৪ হাত) ও অবশিষ্ট লোকগণের—কনিষ্ঠ (৩২ হাত)। কিন্তু উহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। রূপক দশবিধ—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও বীথী (কাশী সং, ২০শ অধ্যায়)। এই দশবিধ রূপকের মধ্যে কোন কোন রূপকের নায়ক-প্রতিনায়ক দেবাসুরাদি (যথা—'ডিম', 'সমবকার' ইত্যাদি শ্রেণীর রূপকে —যাহাতে 'আরভটী' নামক উদ্ধত বৃত্তির প্রাধান্য)১। ঐ সকল রূপকের অভিনয়ার্থ সুবিস্তৃত রঙ্গপীঠ উপযোগী। কারণ, ঐ জাতীয় রূপকের অভিনয় কালে উচ্চ লম্ফ, দীর্ঘ পরিক্রমণ ইত্যাদির প্রয়োজন—তাহা জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গমঞ্চেই সম্ভব। তাহা ছাড়া ঐ সকল রূপকে ভাণ্ড-বাদ্যের প্রাধান্য ২। ভাণ্ডবাদ্যের স্বর গুরুগম্ভীর, উহার বিস্তারের নিমিত্ত বৃহৎ রঙ্গপীঠের প্রয়োজন। এই সকল কারণে দেবাসুর-বহুল-নায়ক-প্রতিনায়ক-বিশিষ্ট রূপকগুলির অভিনয়ে জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গপীঠ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অভিনব বলিয়াছেন—'কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, দেবগণ প্রেক্ষক—ইহাই এ স্থলে বিবক্ষিত ; প্রযোজ্য (পাত্র—dramatis personoe) দেবতা—এরূপ অর্থ নহে ; কারণ, প্রযোজ্যগণের সংখ্যা ত নিয়মিত—উহার ত আর হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই'। এই সকল ব্যাখ্যাতা অভিনবের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অভিনব-সূচিত অর্থ ই যে নাট্যশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য, তাহা অভিনব স্থানান্তরে দেখাইবেন—বলিয়াছেন (অ: ভা:, পৃ: ৫১)। অভিনব যে পূর্ব্বপক্ষটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই আপাত-দৃষ্টিতে শ্লোকটির অর্থ বলিয়া বোধ হয়—ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেবগণ যে রঙ্গালয়ে দর্শক—তাহাই জ্যেষ্ঠ, পরিমাণের হওয়া উচিত—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। দেব-চরিত্র যে রূপকের পাত্রমধ্যে অন্তর্ভুক্ত, সেই রূপকের অভিনয়ের উপযোগী নাট্যমণ্ডপ জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের হওয়া উচিত —এরূপ অর্থ পূর্ব্বপক্ষে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ-স্বরূপে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন,—যে রূপকে দেবাদি নায়ক বা অন্য কোন পাত্ররূপে চিত্রিত হন, সে রূপকে দেবাদি-চরিত্রের সংখ্যা ত গণনা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—অসংখ্য ত নহে ; তবে আর তাঁহাদিগের অভিনয়ে প্রয়োগার্থ বৃহদাকৃতি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন কেন হইবে ? বরং দর্শকগণ যথায় দেববৃন্দ—তথায় স্থান-সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের রঙ্গালয়ের প্রয়োজন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহার বিরুদ্ধ যুক্তি (অভিনবগুপ্ত-সম্মত) পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐরূপ নৃপাদি-চরিত্র যে রূপকে অভিনয়ে প্রযোজ্য—সে রূপকের অভিনয়ার্থ মধ্যম-পরিমাণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন। দেব ও নৃপ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ নর-নারী যাহাতে পাত্রস্থানীয়, সেই সকল রূপকের অভিনয়ার্থ কনিষ্ঠ-পরিমাণের রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মূল :—[সকল প্রেক্ষাগৃহের (মধ্যে) মধ্যম প্রশস্ত (বলিয়া) স্মৃত। তাহাতে পাঠ্য ও গেয় সুখ-শ্রাব্যতর হওয়ার সম্ভাবনা। ১২।

প্রযোক্তৃগণ-কর্তৃক সকল প্রেক্ষাগৃহের তিন প্রকার বিধি স্মৃত হইয়া থাকে—বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। ১৩।

নাট্যবেদ-প্রয়োগকর্তৃগণ-কর্তৃক কনিষ্ঠই ত্র্যস্র (বলিয়া) স্মৃত, পক্ষান্তরে চতুরস্র মধ্যম, আর জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট (রূপে) বিজ্ঞেয় (হইয়া থাকে)। ১৪।]

সঙ্কেত :—এই তিনটি শ্লোক বরোদা-সংস্করণে মূলমধ্যে ব্র্যাকেট-বদ্ধ অবস্থায় ছাপা হইয়াছে। কাশী-সংস্করণে ঐ তিনটি শ্লোক দৃষ্ট হয় না। উহাদিগের উপর অভিনবগুপ্তের টীকাও নাই ! সম্ভবতঃ ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক—উহাদিগের সারার্থ ৭ম ও ৮ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

১২। মধ্যম-প্রমাণের রঙ্গমঞ্চেই পাঠ্য ও গেয় অধিকতর সুখশ্রাব্য হয়। জ্যেষ্ঠে স্বর এলাইয়া পড়ে—কনিষ্ঠে স্বরের প্রতিধ্বনি ভাল খোলে না। অতএব, মধ্যমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৩। ত্রিপ্রকার বিধি—বিধি-বিধান—পরিমাণ ও সন্নিবেশ।

১৪। কনিষ্ঠই ত্র্যস্র, চতুরস্রই মধ্যম, বিকৃষ্টই জ্যেষ্ঠ—এ মত নাট্য-শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহা অভিনব স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে—বিকৃষ্ট-চতুরস্র-ত্র্যস্র—এই ত্রিবিধ সন্নিবেশ-বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের প্রত্যেক সন্নিবেশের ত্রিবিধ পরিমাণ—জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ (অষ্টম শ্লোকের সঙ্কেত দ্রষ্টব্য—অ: ভা:, পৃ: ৫০।) অতএব, এ শ্লোকটি যে নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিয়া নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহই নাই।

মূল :—সকল প্রেক্ষাগৃহের যে প্রমাণ ও লক্ষণ বিশ্বকর্ম্ম-কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বুঝিয়া লও। ১৫।

সঙ্কেত :—প্রমাণ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, অবর (কনিষ্ঠ)।

লক্ষণ—সন্নিবেশ—বিকৃষ্ট, চতুরস্র, ত্র্যস্র।

নিবোধত—বোঝ বা শোন।

মূল :—অণু ও রজঃ, বাল ও লিক্ষা, যূকা ও যব ; অঙ্গুল আর হস্ত ও দণ্ডও প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৬।

সঙ্কেত :—অঙ্গুলশ্চৈব হস্তশ্চ দণ্ডশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ (কাশী) ; অঙ্গুলঞ্চ তথা হস্তো দণ্ডশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতঃ (বরোদা)।

মূল :—আট অণুতে এক 'রজঃ' উক্ত হইয়াছে ; আট উহা এক 'বাল' (নামে) উক্ত হইয়া থাকে ; আট বালে এক 'লিক্ষা' হইয়া থাকে ; অষ্ট লিক্ষায় এক 'যূকা' হয়। ১৭।

পক্ষান্তরে, অষ্ট যূকায় (এক) 'যব'—(ইহা) জানিতে হইবে ; আর আট যবে (এক) 'অঙ্গুল'। আর চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলে (এক) 'হস্ত'—উক্ত হইয়া থাকে। ১৮।

---

১ বৃত্তি—বিলাস-বিন্যাস-ক্রম বৃত্তি—'নাট্যমাতৃকা' নামে খ্যাত—বৃত্তি চতুর্ব্বিধ—কৈশিকী (কোমল), ভারতী (মধ্যম), সাত্ত্বতী (উদার) ও আরভটী (উদ্ধত)—মদীয় 'নাট্যমাতৃকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৪৪। [না: শা:, ২২শ অধ্যায়ে (কাশী সং) বৃত্তির বিবরণ দেওয়া আছে।]

২ ভাণ্ডবাদ্য—পুষ্করবাদ্য—ঢক্কাজাতীয় বাদ্য।

সঙ্কেত :—অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—এ 'অণু' নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের 'অণু'-পরিমাণ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থই এই অণু—যেখান হইতে দৃশ্যতার আরম্ভ ("যতঃ প্রভৃতি দৃশ্যতা প্রবর্ত্ততে সোঽণুঃ"—অ: ভা:, পৃ: ৫২)। এই অণু লোকে প্রসিদ্ধ অণু-পরিমাণ। দুইটি 'দ্ব্যণুক' ও দুইটি পরমাণু দ্বারা ইহা গঠিত—এই অণুগুলি মহত্ত্বযুক্ত। নৈয়ায়িকের মতে দুইটি পরমাণু-দ্বারা গঠিত দ্ব্যণুকে যে পারিভাষিক অণু-পরিমাণ আছে, তাহা থাকুক—তাহার সহিত এ লৌকিক অণু-পরিমাণের কোন বিরোধ নাই (অণুঃ প্রসিদ্ধোঽণুপরিমাণঃ। দ্ব্যণুকদ্বয়পরমাণুদ্বয়ারব্ধাঃ, অণব এব বা মহত্ত্বযুক্তাঃ। পরমাণুদ্বয়ারব্ধে তু দ্ব্যণুকেঽণুপরিমাণমস্তু, কোঽত্র বিরোধ ইত্যলমবান্তরেণ"—অ: ভা:, পৃ ৫২)।

ব্যাপারটি একটু তলাইয়া বুঝা প্রয়োজন। নৈয়ায়িক-বৈশেষিক-দর্শন-সম্প্রদায়ে ক্ষুদ্রতম দর্শনযোগ্য পদার্থের নাম—'ত্রসরেণু' বা 'ত্র্যণুক'। উহার পরিমাণ মহৎ ও দীর্ঘ। ত্রসরেণুকে তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগটির নাম হয় 'দ্ব্যণুক'। দ্ব্যণুক দৃশ্য নহে—উহার পরিমাণ অণু ও হ্রস্ব। দ্ব্যণুককে দ্বিধা বিভক্ত করিলে যে পদার্থ হয়, তাহার নাম 'পরমাণু'। ইহা অবিভাজ্য অদৃশ্য। ইহার পরিমাণের পারিভাষিক-সংজ্ঞা—'পারিমাণ্ডল্য'। পরমাণু ও দ্ব্যণুকের সাধারণ পরিমাণের নাম 'অণু'। দুই পরমাণুতে এক দ্ব্যণুক। দুই দ্ব্যণুকে কিন্তু কিছু মহৎ-পরিমাণের বস্তু উৎপন্ন হয় না; মহৎ-পরিমাণ পদার্থ উৎপাদন করিতে হইলে—(১) হয় কারণের অর্থাৎ উপাদানের (যদি উহা অণু-পরিমাণ হয়) সংখ্যা-বহুত্ব, অথবা (২) উপাদানের (যদি উহা অণু-পরিমাণ না হয়) মহৎ-পরিমাণত্ব—প্রয়োজন। পরমাণু অণু-পরিমাণ; এ কারণে দুই পরমাণু হইতে জাত দ্ব্যণুক মহৎ নহে—অণু-পরিমাণ মাত্র। দ্ব্যণুক—অণু-পরিমাণ; অতএব দুই দ্ব্যণুকে মহৎ-পরিমাণ পদার্থ জন্মে না। মহৎ-পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে অন্ততঃ তিনটি দ্ব্যণুকের প্রয়োজন। তিন দ্ব্যণুকে ক্ষুদ্রতম মহৎ-পরিমাণ পদার্থ ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। মহৎ-পরিমাণ হইলেই পদার্থ দর্শনযোগ্য হইয়া থাকে—অণু-পরিমাণ পদার্থ দৃশ্য হয় না। এ কারণে ত্রসরেণুই ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থ—দ্ব্যণুক বা পরমাণু দৃশ্য নহে। যদি দুইটি দ্ব্যণুক ও দুইটি পরমাণু লওয়া হয়—তাহা হইলে উপাদানগুলি অণু-পরিমাণ হইলেও উপাদানের সংখ্যার বহুত্ব (দ্ব্যণুক দুইটি ও পরমাণু দুইটি—মোট চারিটি) আছে বলিয়া দৃশ্য মহৎ বস্তুর সৃষ্টি হয়—ইহাই ত্রসরেণু। দুই দ্ব্যণুক ও দুই পরমাণু মিলিয়া হয় তিন দ্ব্যণুক; কারণ, দুই পরমাণু ত এক দ্ব্যণুকের সমান। তিন দ্ব্যণুকে হয় এক ত্রসরেণু। উহাই ক্ষুদ্রতম মহৎ-পরিমাণের পদার্থ—দৃশ্যও বটে। অভিনব এই কথাই বলিয়াছেন—"দ্ব্যণুকদ্বয়পরমাণুদ্বয়ারব্ধাঃ, অণব এব বা মহত্ত্বযুক্তাঃ।" নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের এই যে ত্র্যসরেণু—নাট্যশাস্ত্রের ইহাই অণু—এ অণু মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট—অতএব দৃশ্য—ইহাই অভিনবের অভিমত—যাহা হইতে প্রথম দৃশ্যতার আরম্ভ তাহাই অণু—"যতঃ প্রভৃতি দৃশ্যতা প্রবর্ত্ততে সোঽণুঃ।" নৈয়ায়িকের ও বৈশেষিকের দ্ব্যণুকে যে 'অণু-পরিমাণ বর্ত্তমান—তাহা অদৃশ্য; আর নাট্যশাস্ত্রের এ অণু—দৃশ্য। অতএব, উভয়-সম্প্রদায়ের অণু পরিমাণের ধারণা বিভিন্ন হওয়ায় কোন বিরোধ হইতেছে না—"পরমাণুদ্বয়ারব্ধে তু দ্ব্যণুকেঽণুপরিমাণমস্তু, কোঽত্র বিরোধঃ?" (অ: ভা: ১ পৃ: ৫২) মনুসংহিতায় একটি মাপের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (৮।১৩২-১৩৭)। তবে তাহা অবশ্য ওজনের পরিমাণ—দৈর্ঘ্যের নহে। তথাপি তাহাতেও দুই একটি সাধারণ শব্দ আছে। মনুর মতে—গবাক্ষ-বিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়—দৃশ্য-পরিমাণের তাহাই প্রথম—উহার নাম 'ত্রসরেণু'—"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে"।—(মনুসংহিতা ৮।১৩২)। আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা। তিন লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ। খুব বড়ও নয়—খুব ছোটও নয় এমন মাঝারি ছয়টি গৌরসর্ষপে এক যব ইত্যাদি (মনু ৮।১৩৩-৩৪)। বামন শিবরাম আপ্তে মহোদয়ের সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানেও পাওয়া যায় যে, অণু—"the mote in a sunbeam, the smallest perceptible quantity.

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই যে—নাট্যশাস্ত্রের এ 'অণু' নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের ত্রসরেণুরই তুল্য—ইহা মহৎ-পরিমাণের ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থ।

আট অণু—১ রজঃ; ৮ রজঃ—১ বাল; ৮ বাল—১ লিক্ষা; ৮ লিক্ষা—১ যুকা; ৮ যুকা—১ যব; ৮ যব—১ অঙ্গুল (আঙুল); ২৪ আঙ্গুল—১ হাত; ৪ হাত—১ দণ্ড (১১ শ্লোক)।

মূল :—চারি হস্তে (এক) দণ্ড হইয়া থাকে—ইহা প্রমাণতঃ নির্দ্দিষ্ট। এই প্রমাণানুসারেই ইহাদিগের বিনির্ণয় বলিব। ১১।

সঙ্কেত :—"অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যাম্যেষাং বিনির্ণয়ম্"—অভিনব এই প্রসঙ্গে বহু বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"দেবানান্তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ" ইত্যাদি। ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ার্থ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য। ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকে নায়ক দেবতা, প্রতিনায়ক অসুরাদি। বজ্রপাত, উল্কাপাত, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ, যুদ্ধ, বাহুযুদ্ধাদির বর্ণনা যাহাতে বিদ্যমান—দেব-ভুজগ-রাক্ষস-যক্ষ-পিশাচাদি শ্রেণীর ষোড়শ জন নায়ক যাহাতে, তাহার নাম 'ডিম'—ইহা দশবিধ রূপকের (major drama) অন্যতম (না: শা:, বরোদা, ১৮।৮৪-৮৮; কাশী সং, ২০।৮৮-৯২)। মধ্যম-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য—নাটকাদির অভিনয়ার্থ; নাটকাদির নায়ক সাধারণতঃ নৃপতি প্রভৃতিই হইয়া থাকেন (না: শা:, বরোদা, ১৮।১০—১২; কাশী ২০।১০—১২)। আর দেব-নৃপ-ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট প্রকৃতিগণ যে সকল রূপকে প্রযোজ্য, সেই সকল ভাণ-প্রহসনাদি রূপকের অভিনয়ার্থ কনিষ্ঠ-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য (ভাণ, প্রহসন ইত্যাদির লক্ষণ—না: শা:, বরোদা, ১৮ অধ্যায় ও কাশী, ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

দেবাদি-চরিত্রাভিনয়ার্থ—জ্যেষ্ঠ মণ্ডপ;
নৃপাদি-চরিত্রাভিনয়ার্থ—মধ্যম মণ্ডপ;
অবশিষ্ট চরিত্রের অভিনয়ার্থ—কনিষ্ঠ মণ্ডপ;

—এই ত্রিবিধ প্রমাণের মণ্ডপের মধ্যে যে বিনির্ণয় সর্ব্বসাধারণ (অর্থাৎ যে প্রমাণের মণ্ডপে সাধারণ ভাবে সকল প্রকার রূপকের—সকল শ্রেণীর চরিত্রেরই অভিনয় করা চলে) তৎপ্রমাণ মণ্ডপের বিষয় বলিব—অভিনবগুপ্ত শ্লোকেটির এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অ: ভা:, পৃ ৫৬)। অভিনবের অভিপ্রায় এই যে,—সকল শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ের পক্ষে সাধারণ ভাবে উপযোগী—মধ্যম-প্রমাণের নাট্যমণ্ডপ। কারণ, জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গে ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকের অভিনয় সুষ্ঠু ভাবে নিষ্পাদিত হইলেও নাটকাদির অভিনয়ের সৌকর্য্য হয় না—

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের নাট্যমণ্ডপে নাটকাদির অভিনয় খোলে না—ভাব-প্রহসনাদির ত নয়ই ; বরং ভাণাদির অভিনয় মধ্যম-প্রমাণে কিছু খোলে (অন্ততঃ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ অপেক্ষা মধ্যম-প্রমাণে ভাল হয়—ইহা ত নিশ্চিত। দেবাদি-চরিত্রবিশিষ্ট ডিমাদি রূপকের অভিনয় জ্যেষ্ঠ-প্রমাণে খুব ভাল ভাবে অভিনীত হইলেও মধ্যম-প্রমাণে উহাদিগের অভিনয় যে একেবারে অচল হয়—এমন নহে। তাহার উপর ডিমাদি-জাতীয় রূপক সংখ্যায় অতি অল্প—কদাচিৎ তাহাদিগের অভিনয় হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রূপক হইতেছে নাটক-প্রকরণ ইত্যাদি, আর ইহাদিগের অভিনয়োপযোগী নাট্যমণ্ডপ মধ্যম-প্রমাণ —ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ রঙ্গমণ্ডপে নাটকাদির অভিনয়ে রস তেমন জমিয়া উঠে না। এই কারণে সাধারণ ভাবে সকল শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ের উপযোগী নাট্যমণ্ডপ—মধ্যম-প্রমাণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে ("জ্যেষ্ঠমানে নাটকাদিপ্রয়োগসৌকর্য্যাভাবান্মধ্যম এব যুক্তঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৩)। এই সিদ্ধান্তই পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

মূল :—মণ্ডপকে দৈর্ঘ্যে চতুঃষষ্টি হস্ত করিতে হইবে। আর বিস্তারে দ্বাত্রিংশৎ (হস্ত)—মর্ত্ত্যগণের যাহা ইহ (লোকে) করিতে হইবে। ২০।

সঙ্কেত :—দ্বাত্রিংশতঞ্চ বিস্তারান্মর্ত্ত্যানাং যো ভবেদিহ (বরোদা) ; দ্বাত্রিংশেন তু বিস্তারং মর্ত্ত্যানাং যোজয়েদিহ (কাশী)। একটি পাঠে ত্রিশ হস্ত বিস্তার এরূপ কথাও পাওয়া যায়—"বিস্তারস্ত্রিংশদেবাস্য" (বরোদা—পাঠান্তর)।

দীর্ঘত্বেন—নাট্য-প্রযোক্তার সম্মুখে ও পশ্চাতের দিকে নাট্যমণ্ডপের দৈর্ঘ্য স্থির করিতে হইবে। প্রযোক্তা রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকগণের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার সম্মুখের শেষ সীমা হইতে পশ্চাৎ প্রান্ত পর্য্যন্ত—মণ্ডপের দৈর্ঘ্য। উহার পরিমাণ ৬৪ হাত। আর ঐ ভাবে দণ্ডায়মান প্রযোক্তার দুই পার্শ্বের দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী অংশ—'বিস্তার'। উহার পরিমাণ—৩২ হাত। ইহলোকে মর্ত্ত্যচরিত্রের অভিনয়ে প্রয়োগের উপযোগী নাট্যমণ্ডপের পরিমাণ—মধ্যম-পরিমাণ—দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও বিস্তারে ৩২ হাত। এই মধ্যম-পরিমাণই কেন সাধারণ-পরিমাণ বলিয়া নির্ণীত হইল ? উহার কি কোন কারণ নাই ? অকারণেই কি এই মধ্যম-পরিমাণকে সাধারণ-পরিমাণ বলিয়া ধরা হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন, না, প্রয়োগের দ্বারাই এই মধ্যম-প্রমাণের সাধারণ-পরিমাণ-রূপে গণ্য হইবার যোগ্যতা অনুভূত হইবে—ঐ বিষয়ে অধিক যুক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

মূল :—কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক ইহার অধিক নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু, তথায় নাট্য অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ২১।

সঙ্কেত :—অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ (মূল)। অতঃ—ইহা (অর্থাৎ মধ্যম-পরিমাণ) হইতে ; ঊর্দ্ধং—বৃহত্তর। ইহাই শ্লোকটি হইতে আপাত-প্রতীয়মান অর্থ। অভিনবগুপ্ত অন্য ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অতঃ—এই হেতু ;—যেহেতু এবংবিধ মধ্যম-পরিমাণ নৃপচরিত্রাভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—রূপক-সাধারণের প্রয়োগের পক্ষেও উপযোগী, অতএব—। ঊর্দ্ধং—প্রমাণের আধিক্য সূচিত হইতেছে। প্রমাণের আধিক্য বলিতে এ ক্ষেত্রে প্রমাণের ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে। অতএব, প্রমাণের ন্যূনতা ও প্রমাণের আতিশয্য উভয়ই এ স্থলে গ্রহণীয় ("প্রমাণস্যাধিক্যং ন্যূনাতিরেকাভ্যামিতি মন্তব্যম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৩) মধ্যম-প্রমাণের মণ্ডপে যদি সকল শ্রেণীর রূপকের অভিনয় করা যায়, তাহা হইলে আর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গমণ্ডপ নির্ম্মাণার্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের বৃথা আয়াসে কি প্রয়োজন ? তত্র (মূল) তথায়—মধ্যম-প্রমাণের অধিক প্রমাণে (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণে) ও মধ্যম-প্রমাণাপেক্ষা ন্যূন-প্রমাণে (অর্থাৎ কনিষ্ঠ-প্রমাণে)—এই উভয় প্রমাণের মণ্ডপেই—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। নাট্য—নাট্যের সকল অবান্তর ভেদ ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৩)।

মুখ্য তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—নাট্যমণ্ডপ মধ্যম-পরিমাণ হইলে উহাতে অভিনয়কালে নাট্যের সকল ভেদগুলি সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়, আর মণ্ডপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ-পরিমাণের হইলে নাট্যের বিবিধ অঙ্গ অব্যক্ত ভাব ধারণ করার বিশেষ সম্ভাবনা। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহা আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মূলঃ—পক্ষান্তরে মণ্ডপ বিপ্রকৃষ্ট হইলে উচ্চারিত-স্বর পাঠ্য অনিঃসরণ-ধর্ম্মত্বহেতু অত্যন্ত বিস্বরত্ব লাভ করিতে পারে। ২২।

সঙ্কেত :—উচ্চরিতস্বরম্ (বরোদা) ; উচ্চারিতস্বরম্ (কাশী)। অনিঃসরণধর্ম্মত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ (বরোদা); অনভিব্যক্তবর্ণত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ (কাশী)—বর্ণসমূহের অনভিব্যক্তি হেতু অত্যন্ত বিস্বর হওয়ার সম্ভাবনা। অভিনবগুপ্ত প্রথম পাঠটিই ধরিয়াছেন। 'বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ' ও 'বিস্বরত্বং ভৃশং ভবেৎ (কর্ত্তৃপদ উভয় স্থলেই—'পাঠ্যম্')—এই দুইটি পাঠের প্রথমটি শুদ্ধ। 'পাঠ্যং বিস্বরত্বং ব্রজেৎ'—শুদ্ধঃ ; কিন্তু 'পাঠ্যং বিস্বরত্বং ভবেৎ' —ইহা অসংস্কৃত,—'পাঠ্যং বিস্বরং ভবেৎ'—বলিলে বরং চলিত।

বিপ্রকৃষ্ট :—প্রকৃষ্ট অর্থে বুঝাইতেছে প্রকর্ষ ; যাহা প্রকর্ষকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা বিপ্রকৃষ্ট। এ স্থলে মণ্ডপের প্রকর্ষ হইতেছে—মধ্যম-পরিমাণতা। বিপ্রকৃষ্ট—মধ্যম-পরিমাণাতিরিক্ত পরিমাণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ কিংবা কনিষ্ঠ-প্রমাণ—এই দুই প্রকার অর্থই কর্ত্তব্য। পাঠ্য—নাট্যের প্রধান অঙ্গই পাঠ্য—নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'পাঠ্যই নাট্যের তনু বলিয়া স্মৃত' (২৪।২)। এবংবিধ মুখ্য নাট্যাঙ্গ যে পাঠ্য তাহা বিস্বরতা প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ রঙ্গমণ্ডপে—অত্যুচ্চ স্বরে উচ্চারিত পাঠ্য নিকটবর্ত্তী দর্শকগণের নিকট বিস্বর (অর্থাৎ অত্যন্ত উপতাপক) হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপে অতিদূরস্থ দর্শকগণকে শুনাইবার নিমিত্ত অভিনেতৃবর্গকে উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে হয় ; ফলে নিকটস্থ দর্শকগণের নিকট সেই অত্যুচ্চ স্বর বিস্বর (অর্থাৎ কর্কশ) শুনায়—অত্যুচ্চ স্বর কর্ণের পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। তাহার কারণ—পাঠ্যম্ উচ্চরিতস্বরম্ (মূল)। উচ্চরিত-স্বর—উচ্চ করিয়া চরিত (অর্থাৎ অতিক্লেশে সম্পাদিত) স্বর (কাকু প্রভৃতি বিভাগ) যাহাতে—পাঠ্যের বিশেষণ। স্বর—নানাবিধ কণ্ঠস্বর—উহার কোন অংশে প্রশ্ন কোন অংশে কাকু (বচোভঙ্গী) বিদ্যমান। তুমি কি খাবে ? ইহা সাধারণ প্রশ্ন—তুমি খাইবে কি না—ইহাই জিজ্ঞাস্য। কিন্তু 'কি' পদটির উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করিলে এই প্রশ্নই কাকুতে পর্য্যবসিত হইবে—তুমি কি (কী) খাবে ? তুমি কোন্ জিনিষ খাইবে—ইহাই তখন অর্থ দাঁড়াইবে। স্বরের উচ্চারণগত

এই সকল সূক্ষ্ম পার্থক্য—স্বর যথাযথ ভাবে উচ্চারিত না হইলে ধরা কঠিন। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ রঙ্গমণ্ডপের দূরবর্ত্তী দর্শকগণের নিকট স্বরগত এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভঙ্গী ঠিক মত গিয়া পৌঁছায় না—ফলে স্বর বিস্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। বিস্বর—যাহাতে শব্দবিশেষের উচ্চারণ বিগত হইয়াছে—অর্থাৎ যাহাতে শব্দবিশেষের উচ্চারণ শোনা যায় না—অতি উচ্চস্বরে উচ্চারিত হইলেও বহু দূরের দর্শক-মণ্ডলীর নিকট সকল শব্দ গিয়া পৌঁছায় না—পৌঁছাইলেও কাকু প্রভৃতি শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্কারগুলি দূরে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় না। ইহার কারণ মূলে উক্ত হইয়াছে—অনিঃসরণধর্ম্মত্বাৎ। নিঃসরণ—নিঃ (নিরন্তর দেশে) সরণ (অর্থাৎ দ্বিতীয়-শব্দারম্ভ); এই ধর্ম্ম যাহার নাই—তাহাই অনিঃসরণ-ধর্ম্ম। যখন একটি শব্দ উচ্চারণের পরক্ষণে অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ শব্দের অনুরণনাত্মক শব্দান্তর উত্থিত হয়, তখন শব্দের নিঃসরণ-ধর্ম্ম অনুভূত হয়। যে গৃহমধ্যে এরূপ নিঃসরণ সম্ভব হয় না, সে গৃহে অনিঃসরণ-ধর্ম্ম প্রকট। যদি জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ মণ্ডপ হয়, আর তাহার শব্দবিস্তার-যোগ্যতা না থাকে (গৃহ-নির্ম্মাণ কৌশলের দোষে), তাহা হইলে পীঠে উচ্চারিত শব্দ নিঃসরণধর্ম্মের অভাব-বশতঃ বিস্বর হইয়া উঠে। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ মণ্ডপে এ দোষ হইয়াই থাকে—কারণ, বহু দূর পর্য্যন্ত শব্দ-'নিঃসরণ (বা শব্দের অনুরণন) ঠিক মত পৌঁছায় না। আবার কনিষ্ঠ-প্রমাণেও শব্দ-নিঃসরণের অভাব ঘটিতে পারে। কারণ, শব্দ-নিঃসরণ বা শব্দের অনুরণন মূল-শব্দোচ্চারণের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় না। একটু দূর পর্য্যন্ত শব্দ বিস্তার না হইলে অনুরণনের মাধুর্য্য ঠিক বুঝা যায় না। কনিষ্ঠ-প্রমাণ মণ্ডপ অতি অল্পপরিসর। উহার মধ্যে উচ্চ ভাবে উচ্চারিত স্বর অনুরণিত হইবার পর্য্যাপ্ত অবকাশ পায় না (অতএব, কনিষ্ঠ মণ্ডপে উচ্চরিত-স্বর পাঠ্য সর্ব্বদাই অনিঃসরণ-ধর্ম্ম-বশতঃ (অনুরণনাত্মক মধুর-শব্দারম্ভ সৃষ্টি করিতে না পারায়) বিস্বর (অর্থাৎ বিনষ্টস্বর) হইয়া উঠে—অর্থাৎ কনিষ্ঠ গৃহে অনুরণনের অবকাশ না থাকায় স্বর-মাধুর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অনুরণনই স্বরের যথার্থ রূপ। অনুরণনের অভাবই স্বরকে মাধুর্য্যহীন নষ্টপ্রায়—বিস্বর করিয়া তুলে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৩—৫৪)।

[ক্রমশঃ।

—তাকে যে মনে পড়ে—

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

তাকে যে মনে পড়ে।
সমুদ্রের প্রেত অন্ধকারে—
দূরের কুয়াসা ঠেলে
একবার দুরাশার আলো জ্ব'লে ওঠার মতন :
মুখ তার মনে পড়ে যায়।
ঝড়ের মতন যেন অকস্মাৎ ছুটে আসে সে—
প্লাবনের মত আসে ধেয়ে :
কিছুতেই, কিছুতেই ভোলা যায় নাক'।
মরণেও নয়, মনে হয়—
তারও পরে বুঝি রূঢ় প্রহরীর মত
প্রাণপণে ঘিরে রাখে স্মরণের সাঁকো।
পার হ'তে দেয় না কিছুতে।
কিছুতে দেয় না হ'তে পার :
ডাক দিয়ে সরে যায় মহাপারাবার।

সে বড় অদ্ভুত।
নীলে নীলে একেবারে কালো-হয়ে-যাওয়া
প্রাণছেঁড়া জ্বালাময়ী সুরার মতন
অথবা শিশির-ঝরা নিশীথের স্বপ্নমাখা
দুর্ব্বাঘাসবন
যেমন জ্বালিয়ে রাখে খুব তীব্র শংখচূড় সাপের নয়ন—
তার ছোঁয়া-ছোঁয়ানো স্বপন
তার চেয়ে আরো বুঝি উগ্র সুমধুর ;
কোথায় কোথায় যেন কত্ত কত দূর
পলকেতে অতর্কিতে, অলক্ষিতে হায়!
বারম্বার হু হু ক'রে নিয়ে চ'লে যায়।

তখন কোথায় থাকে কাজের পাহাড়—
আদর্শের মণির মিনার,
দেশ-কাল-বেড়াজাল আর—
কুটোর মতন যেন ভেসে যায় সব
সর্ব্বনাশা জলে প্লাবনের।

তার পরে যবে কিন্তু পাওয়া যায় টের :
তখন অনেক দূরে স'রে যেতে চ'লেছে পৃথিবী,
মংগল গ্রহের স্বপ্ন মুছে গেছে তাও—
আরো কত আকাশেতে জীবন উধাও,
দুরান্ত তারারো আলো পিছে প'ড়ে যায়—
নিশানা কোথায়?

যদি কোনো শাওনের বরিষণ-রাতে
প্রাণেতে পিয়াস জাগে বাদলে ভেজার,
গাঁয়ের নদীর তীরে দুপুর বেলাতে
চুপ ক'রে ব'সে-থাকা ভালো লাগে, আর
নির্জন সন্ধ্যায় কোনো ঝড়-ওঠা কাজল প্রান্তরে
এই বার্থ পৃথিবীর কথা মনে ক'রে
এ জীবন লাগে অসহায়—
তখন আশ্চর্য্য কিন্তু :
দেখো তুমি প'ড়ে আছো পাথরের প্রায়—
হৃদয়ে ভীষণ জ্বর, জড়তা কেমন :
তাকে যেন ভোলা বড় দায়,
তোমারি হৃদয় আর তোমারি সে নয়।

কালীপূজো

[বড় গল্প]

শ্রীঅমলা দেবী

বিশ্বেশ্বরের সম্বকার বাবুলাল আসিয়া হাজির হইল।

বাবুলাল জাতিতে রাজপুত। একহারা লম্বা চেহারা, চওড়া চ্যাপ্টা বুক, কোমর হইতে দেহের উর্দ্ধভাগটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছে। পরিধানে ধুতি কোমর বাঁধিয়া পরা, গায়ে ফতুয়া। বাবুলালের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। এখনও বেশ শক্ত, পোক্ত ও কর্ম্মক্ষম। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া সে বিশ্বেশ্বরের বাবার আশ্রয়ে আসিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের বাবা তাহাকে ছেলের মতই মানুষ করিয়াছিলেন। পয়সা খরচ করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, ঘর বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই বৌটি মারা যায়। বাবুলাল আর বিবাহের চেষ্টা করে নাই। বিশ্বেশ্বরের সংসারে সুখে-দুঃখে সমভাগী হইয়া বাস করিতেছে। বিশ্বেশ্বর তাহাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন, বিশ্বেশ্বরের পুত্রবধূরা শ্বশুরের মত তাহাকে শ্রদ্ধা করে।

বাবুলাল কহিল—বাউরীরা কেউ বেগার দিতে আসতে চাইছে না দাদা।

বিশ্বেশ্বর ভুরু কুঁচকাইয়া কহিলেন—কি বলছে সব?

—বলছে কন্‌ট্রাক্‌টার বাবুর বেড়ে কাজ করবার হুকুম হয়েছে তাদের উপর।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—বললে না কেন যে আমাদের হুকুম তাদের আগে তামিল করতে হবে—

বাবুলাল ঘাড় কাত করিয়া কহিল—বলেছিলাম।

—কি বললে সব?

—নফরা বাউরীর ছেলেটাকে তো জানেন, বদমাইসের ধাড়ী। মস্ত ষণ্ডার মত চেহারা—হাফপ্যাণ্ট খিঁচে, হাফহাতা কামিজ পরে ঘুরে বেড়ায়। সে বললে—মজুরী দেবার পয়সা আছে তোর বাবুর—শুধিয়ে আসগে যা—জন-পিছু এক টাকা করে মজুরী দিলে সবাই যেয়ে কাজ করবো। একটু থামিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল—তুই তোকারি করল আমাকে দাদা—

বিশ্বেশ্বরের রাগে মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কঠোর কণ্ঠে কহিলেন—বলগে যাও, মা কালীর যায়গা থেকে সব উঠে যাক এখনই।

বাবুলাল কহিল—তা'ও বলেছি তো, বললে কি জানেন, মা কালী তো তোর বাবুর একার নয়—সব বাবুদেরই—তারা তো কন্‌ট্রাক্‌টার বাবুর বাড়ীর ধুলো চাটছে দিন দু'বেলা।

বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন,—আমাদের বাবুরা তো এখনও পর্য্যন্ত কেউ দেখা দিচ্ছেন না; একবার আমার নাম করে ডাক দেখি তাদের। বংশের পুজো—সবাই মিলে পরামর্শ করা দরকার। তাদের যা ভাল লাগবে তারা করবে, কিন্তু আমার ত্রুটি যেন কেউ না ধরতে পারে—

বাবুলাল চলিয়া গেল।

একটি পনের-ষোল বৎসর বয়সের মেয়ে মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। শীর্ণ চেহারা, মিশমিশে কাল রং; মাথার চুল রুক্ষ, বিশৃঙ্খল, পরনের শাড়ীখানি ছিন্ন ও মলিন। অতি কষ্টে গা-হাত ঢাকিয়া নতমুখে যাইতেছিল। মেয়েটির ডান হাতে একটি ঘটি।

বিশ্বেশ্বর হাঁকিয়া কহিলেন—ওরে এই! তুই অটলা মুচির মেয়ে না?

মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘটীতে কি নিয়ে যাচ্ছিস্?

—দুধ গো কত্তা বাবু।

—কাদের জন্তে?

—ঐ যে—ন' বাবুদের ছোট মেয়ের ছেলের জন্তে।

—তোদের গাই আছে বুঝি?

মেয়েটি কহিল—এজ্ঞে—না; ছাগল।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—এখন তো দুধের বেশ দর—দু'পয়সা আসছে ঘরে—অটলাকে বলবি, চার-পাঁচ বছরের খাজনা বাকী—আজই যেন দিয়ে যায়।

মেয়েটি কহিল—এজ্ঞে, কতটুকুই বা দুধ হয়—একটিমাত্র পাঁঠী; খেতেই কুলোয় না আমাদের—তার উপর বাবার এ ক'মাস অসুখটা বেড়েছে—চলতে বুলতে নারে।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—খাজনা তো দিতে হবে, বাপু! টাকা না থাকে—একটা পাঁঠা দিবি—মা কালীর জন্তে; খাজনা দেওয়াও হবে—ধর্ম্মও হবে।

মেয়েটি শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল—পাঁটা কোথায়? পাঁটীটার দুটো বাচ্চা হয়েছিল—তার একটা আবার হুড়োলে নিয়ে গেছে—নেহাৎ কচি বাচ্চা। পরে কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টি করুণ করিয়া তুলিয়া মেয়েটি কহিল—বাবা কাজকর্ম্ম কিছুই করতে নারে—দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটছে না আমাদের—ঘটা, বাটা সব বিক্রী হয়ে গেছে—খাজনাটা আমাদের মকুব করে দেন কর্ত্তা।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—তোর স্বামী তোকে নিয়ে যায় না?

মাথা নীচু করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—এজ্ঞে না—উ আবার বিয়ে করেছে।

বিশ্বেশ্বরের মন স্বভাবতঃ কোমল—পরের দুঃখ সহজেই আসিয়া বিঁধে। তবু জোর করিয়া কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন—আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বাউরী হাড়িদের মেয়েরা কন্‌ট্রাক্টারের কাছে কাজ করে কত রোজগার করছে—আর তুই পারিস্ না! ঘরে যা' আছে বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রী করে হোক—খাজনা মিটিয়ে যাবি আজ। তোদের কাছে তিন-চার টাকা পাওনা হয়েছে। অটলাকে বলবি গিয়ে—আমি এই কথা বলেছি।

মেয়েটি মুখ তুলিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল। বিশ্বেশ্বর হাত নাড়িয়া কহিলেন—কোন কথা শুনতে চাই না—যা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

বাবুলাল আসিল। বিশ্বেশ্বর কহিলেন—সবাইকে বললে আসতে?

বাবুলাল কহিল—বললাম তো—আসবে কি না কে জানে?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আমি তো কর্ত্তব্য করলাম—না আসে না আসবে। তা' এক কাজ কর দেখি। আমাদের ফকরে মুনিস বোধ হয় এখনও মাঠে যায়নি। বলগে—আজকে মাঠের কাজ থাক। সামনের জমিটার ঘাস-টাসগুলো চেঁছে দিক্ এসে।

বাবুলাল যাইবার উপক্রম করিতেই বিশ্বেশ্বর কহিলেন—আসবার সময় কল্কেটা সেজে নিয়ে আসবে—আর হুঁকোটা—

মুখুজ্যে বাড়ীর সকলে একে একে হাজির হইল—হরি, শ্যাম, কেশব, যামিনী, কৈলাস, রঘুমণি ইত্যাদি। প্রত্যেকের কোলে এক একটি ছেলে কিংবা মেয়ে। বিশ্বেশ্বর কহিলেন—পূজোটা কি একা আমার, না—তোমাদের সবাইকার? বলিয়া জিজ্ঞাসু মুখে সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইলেন। কেহ কোন জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিলেন—কেউ মন্দিরে একবারও পা দিচ্ছ না—কি করে সব যোগাড়-যন্ত্র হবে—কেউ কিছু খবর নিচ্ছ না। কি ব্যাপার বল দেখি? দেবী-পূজো কি সামান্য ব্যাপার ভেবেছ? একটু অঙ্গহানি হ'লে বিপদ কি আমার একলার হবে?

হরি মুখুজ্যে বলিল—বাড়ীতে অসুখ, দেখবার শুনবার কেউ নেই—কি করে আসি বলুন?

শ্যাম জানাইল—তাহার ফিক্ ব্যথা চলিয়াছে আজ কয় দিন ধরিয়া; ব্যথা উঠিলে কাটা ছাগলের মত ছটফট্ করিতে হয়; কবিরাজ নড়িতে চড়িতে নিষেধ করিয়াছে। নেহাৎ বড়কর্ত্তার ডাক বলিয়া—প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সে!

যামিনী কহিল—আমরা এসেই বা কি করব—খরচ-পত্র করবার ক্ষমতা নাই যখন—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—কে চাচ্ছে তোমাদের কাছে? আমি তো বলেছি, চালিয়ে দেব এক রকম করে। কিন্তু পূজোটা যাতে বিধিমত হয় তা' তো দেখতে হবে তোমাদের। সঙ্কল্প সকলের নামেই হবে, তখন কারও নাম ভুল হয়ে গেলে লাফালাফি তো কেউ কম কর না!

যামিনী রাগত স্বরে কহিল,—সঙ্কল্প আমার নামে করবেন না এ বছর—কালীপূজো করে উন্নতির তো সীমা নাই, ভিটেয় ঘুঘু চরবে শেষে!

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, —তোমাদেরও তাই মত না কি?

কেশব ক্যাঁকর্কেঁকে সুরে কহিল,—এ রকম কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে পূজো করার চেয়ে পূজো তুলে দেওয়াই ভাল।

বিশ্বেশ্বর শ্লেষের সুরে কহিলেন—ধূম-ধড়াক্কা করে পূজা কর না হে, বারণ করছে কে?

কৈলাস কহিল—গাঁয়ে দু'টো পূজোর দরকার কি? বাঁড়ুজ্যে মশায় তো পূজো করছেন।

তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন— "কে না কে পূজো করছে বলে পৈতৃক পূজো ফেলে দিতে হবে? বুদ্ধির বৃহস্পতি আর কি!

কৈলাস উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে গেল—শ্যাম তাহাকে থামাইয়া দিল।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—তা হলে পূজোতে তোমাদের কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না, এই তো?

সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন, বেশ! তাই হোক। ক্ষোভের সুরে বলিতে লাগিলেন—তোমরা আমার পুত্রতুল্য। পরের কুপরামর্শে ভুল পথে চলেছ তোমরা, নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচার করে দেখছ না—ছেলেমানুষ হলে মার-ধর করে তোমাদের শোধরাতাম—কিন্তু এখন তা চলবে না। তোমাদের ভুল বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকবার করেছি—এখনও করলাম, এর পর তোমাদের যা ভাল মনে হয় কর।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর একে একে প্রস্থান করিল।

বাবুলাল তামাক লইয়া আসিল। তামাক খাইতে খাইতে বিশ্বেশ্বর কহিলেন—ফকরে আসছে তো?

বাবুলাল কহিল—হ্যাঁ বলে দিয়েছি—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—ঢাকের জন্যে তো তুমি নিজে বলে এসেছ। আসবে তো? না বাঁড়ুজ্যেদের ওখানে গিয়ে জুটবে?

বাবুলাল কহিল—আসবে বৈ কি। বলে এসেছি এত করে। পরে ঢোক গিলিয়া কহিল,—আর কেউ না আসুক পরাণ আসবে।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—তা আসবে। ও তো জানে আমাদের সব, দেখেছেও সব। এ তল্লাটের কোন ঢেকো বাদ যেত না। সব আপনা থেকে এসে হাজির হোত! পেতও খুব। নগদ টাকা ছাড়া শিরোপা পেত কত! আমার বাবা একবার নিজের শালখানাই দিয়ে দিলেন পরাণকে। মা নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াতেন ওদের— বলিয়া নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাবুলাল কহিল—"বাঁড়ুজ্যেদের ওখানে বিশ জোড়া ঢাক আসছে শুনলাম—

বিশ্বেশ্বর হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—আসবে বৈ কি! পয়সা হয়েছে খরচ করছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—মানুষের ভাগ্য—আর নদীর স্রোত এক রকমের—এক ধার ভাঙ্গে—এক ধার গড়ে! আমাদের ভাঙ্গন ধরেছে—সব ধুয়ে মুছে যাবে। মুখের ভাব করুণ করিয়া তুলিয়া ক্ষণেক পরে কহিলেন,—বাড়ীর বাবুরা কি বললে জান? পূজোর দরকার নাই—পূজোতে কেউ কিছু করবে না—বলে একে একে চলে গেল। আমি বেঁচে থাকতে পূজো তুলে দিতে পারি? তুমিই বল—আমি মরে গেলে যা হবার হবে। বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বরের গলা ধরিয়া আসিল।

বাবুলাল উসখুস্ করিতে লাগিল। মরণের কথা সে ভালবাসে না। তাহার ধারণা, সে ও মুখুজ্যে মশায় চিত্রগুপ্তের হিসাবের ভুলে কোন রকমে এখনও বাঁচিয়া আছে। না হইলে গত বৎসর কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় এইটুকু গ্রামেই শতাধিক লোক মরিয়া গেল; মুখুজ্যেদের বাইশ-চব্বিশ বয়সের ছেলে কয়টা মারা গেল; বিশ্বেশ্বরের একমাত্র ছেলে মহেশ্বর মারা গেল—বড় বড় ডাক্তার-বদ্যি দেখাইয়া, জলের মত পয়সা খরচ করিয়াও তাহাকে রাখা গেল না; অথচ তাহারা দুই জনে টিকিয়া রহিল।

ফকির বাউরী ঘাস চাঁচিতে শুরু করিয়াছিল। বাবুলাল হাঁক দিয়া কহিল—হাঁ রে, ফকরে! তোদের পাড়ার পাঁঠা ঠিক আছে তো?

ফকির কহিল—হাঁ, তা' আছেন বৈ কি! মা-কালীর পাঁঠা ঠিক থাকবেন নাই! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, দাঁড়াইয়া দম লইয়া কহিল,—এজমালী একটা পাঁঠা তো দেখেছি বাবু, তবে পাড়ার আর সব পাঁঠার জন্যে বাঁড়ুজ্যে বাবু বায়না দিয়ে এসেছে। এক একটা পাঁঠার দাম দেবে বলেছে—এক কুড়ি টাকা। আমাদের নফর কাকাকে তো জান—ঐ যে যার ছেলে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের হাওয়া-গাড়ী ধোয়—ওই আমাদের পাড়ার মুরুব্বি। টাকার লোভে ও যদি কারচুপি করে তো জানি নাই—বলিয়া ঘাস

চাছিবার উপক্রম করিতেই বাবুলাল বলিয়া উঠিল—কারচুবি করবে কি রকম। তুই কিছু শুনেছিস না কি?

ফকির জবাব দিল না।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"হ্যাঁ রে, তোদের মজলিশ টজলিস কিছু হয়েছে না কি?"

ফকির আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আজ্ঞে আমি তো কিছু জানি না। তবে বৌ বলছিল, লক্ষ্মীমেলায় নফর কাকা পাড়ার সবাইকে জুড় করে বলেছে যে—খাজনা যার যা দিবার নগদ দেব। কুড়ি ঘরে সিকে সিকে করে পাঁচ টাকা—পাঁঠা দিতে গেলে অনেক।

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া কড়া গলায় কহিলেন,—এখন না হয় যুদ্ধের বাজারে পাঁঠার দাম এত হয়েছে—কিন্তু যখন দু'-তিন টাকায় একটা পাঁঠা পাওয়া যেত, তখন এ সব বুদ্ধি কোথায় ছিল?

মুখ কাচুমাচু করিয়া ফকির কহিল,—"আমি তো কিছু জানি না কত্তা। নফর কাকাকে বাঁড়ুজ্যে মশায়রা কি সব বলেছে—

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—কি বলেছে?

ফকির কহিল,—নফর কাকাই জানে, আপনি উয়াকে একবার ডাকুন ক্যান না—বলিয়া নিজের কাজ করিতে শুরু করিল।

বিশ্বেশ্বর বাবুলালকে কহিলেন,—তুমি একবার নফরকে ডাক দেখি, কি বলে শুনি, আর একবার হাড়ীদের ওখানে যাবে, ওরা পাঁঠার কি ব্যবস্থা করেছে দেখে আসবে।

ফকির কাজ করিতে করিতে কহিল,—হাড়ীপাড়ায় তো অনেক পাঁঠা, বাউল হাড়িরই তিন গণ্ডা, তবে বাঁড়ুজ্যে মশায়রা তো ওখানেও বায়না করে দিয়েছে—

বিশ্বেশ্বর রাগতঃ স্বরে কহিলেন,—বায়না করেছে তো মাথা কিনেছে না কি। বাপ-পিতামহের আমল থেকে যা বন্দোবস্ত আছে তা তো দিতেই হবে। বাঁড়ুজ্যেদের সঙ্গে যদি এতই খাতির তো ওদের জায়গাতেই সব বাস করুকগে—আমাদের জায়গায় কেন?

ফকির কহিল,—তাই করবেক সব—বলছে। বাঁড়ুজ্যে মশায় যে নতুন বাঁধ কাটাচ্ছে উয়ার ধারেই জায়গা দিবেক বলেছে সবাইকে, বিনা খাজনায় হাড়ী-বাউরী সব উঠে যাবেক উয়া নে—

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে মেঘ-গর্জ্জনের মত গুরু-গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল। বাবুলাল কহিল,—"বাঁড়ুজ্যেদের ঢাকীর দল এল!

ফকির সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময় ও পুলকের সহিত কহিল,—বাবা! কি রকম আওয়াজ শুনছেন! যেন বাজ ডাকছে। দু'কুড়ি ঢাকের শব্দ! কানে তালা ধরিয়ে দিবেক সবাইকার—

বিশ্বেশ্বর বিরক্তির সহিত কহিলেন,—নে, নে; তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্; এর পর আটচালার চালে খড় দিতে হবে মনে থাকে যেন।

ঝিয়ের কোলে খোকা আসিয়া হাজির হইল। খোকা তারস্বরে কাঁদিতেছে ও হাত-পা ছুড়িতেছে। ঝি অনেক কষ্টে তাহাকে কোলে ধরিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বেশ্বর হাঁক দিয়া কহিলেন,—কি হোল দাদুর? কাঁদছে কেন?

ঝিয়ের নাম কামিনী, ফকিরের স্ত্রী। মাথায় ঘোমটা টানিয়া চাপা স্বরে কহিল,—ঢাকের বাজনা শুনতে যাবে বলছে।

বিশ্বেশ্বর উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—এস দাদু আমার কাছে—বলিয়া হাত বাড়াইতেই খোকা ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে আসিল।

বিশ্বেশ্বর কোঁচার খুঁটে খোকার চোখ-মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, —কাঁদতে আছে কি! ছিঃ! লোকের বাড়ীতে ঢাকের বাজনা শুনতে যেতে হবে কেন! আমাদের এখানেই ঢাক বাজবে, এখনই দেখবে।

খোকা প্রশ্ন করিল—কই ঢাক?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—এখনই আসবে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়া বাঁড়ুজ্যেপাড়ার দিকে ছুটিতেছিল। তাহা দেখিয়া খোকা কহিল,—আমিও যাব দাদু ওদের সঙ্গে—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—তুমি ওদের সঙ্গে যেতে পারবে কেন দাদু—রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে!

—তবে তুমি নিয়ে চল।

—আমি বুড়ো মানুষ—এত দূর যেতে পারব কেন?

—কত দূর?

কণ্ঠস্বর যত দূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন—অনেক দূর—

—তবে ওরা যাচ্ছে কি করে?

বিশ্বেশ্বর ঢোক গিলিয়া কহিলেন,—ওরা তো যেতে পারবে না। রাস্তায় ছেলে-ধরা আছে ঝুলি কাঁধে নিয়ে—ওরা এতক্ষণ তার ঝুলির মধ্যে আঁকু-পাঁকু করছে দেখগে—

খোকা চোখ দুইটা ডাগর করিয়া কি ভাবিয়া কহিল,—তোমাকে তো ঢোকাতে পারবে না—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—আমার জন্যে বুড়ো-ধরা আছে—তারও মস্ত ঝুলি—আমার মত দশ-বিশটা বুড়ো তাতে ধরবে!

এমন সময়ে এক জন বেঁটে খাটো, শীর্ণকায় বৃদ্ধ আসিয়া হাজির হইল—কাঁধে ঢাক; সঙ্গে একটি দশ-বার বৎসর বয়সের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্যাঁকাটির মত ছেলে।

বিশ্বেশ্বর পুলকিত হইয়া কহিলেন,—এই দেখ, আমাদের ঢাক এসেছে। পরাণকে কহিলেন—"হ্যাঁ পরাণ! একাই এলে না কি? আর কৈ?

পরাণ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল,—"আর কেউ এল না কত্তা—সব বাঁড়ুজ্যে বাবুর ওখানে বায়না ধরেছে। তা আমি যত দিন বাঁচব নেমকহারামী করতে নারব—তাই এলাম—

—ও ছেলেটি কে?

—ওটি আমার নাতি—মালোয়ারী জ্বরে ভুগছে—দেখুন না কেন দেহটা—একেবারে জেরে দিয়েছে মশয়—তা ওকে কেউ নিতে চাইলে না, আমিই সঙ্গে নিয়ে এলাম। একটা তো কাঁসি চাই। ওই বাজাবেক যেমন তেমন করে—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—বেশ করেছ পরাণ, আমি যত দিন বাঁচি, তত দিন চালিয়ে যাও—তার পর চোখ বুজলে যা হবার হবে—

পরাণ চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে খোকাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"এই ছেলেটি রেখেই বাবাজী আমাদের—

বিশ্বেশ্বর খোকাকে বুকে চাপিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ পরাণ, এইটিই আমার বংশের শিবরাত্রির সলতে—একে বুকে করেই বেঁচে আছি—বলিতে বলিতে চক্ষু ও কণ্ঠস্বর তাঁহার সজল হইয়া উঠিল।

খোকা কহিল—দাদু, ঢাক বাজাবে না?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—পরাণ ঢাক বাজাও। দাদু আমার ঢাক ঢাক করে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

[ক্রমশঃ

আনুকারিক হাস্যরস

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্যারডির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিরুদ্ধ সমালোচনার তীব্রতা প্যারডির সংস্পর্শে তীব্রতর হইয়া উঠে।

ধরুন, কেহ বলিতে চান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় যথেচ্ছ ভাবে এবং অত্যন্ত অসংগতরূপে নামধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা ছন্দই নয়। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক নায়ক নামের অযোগ্য ইত্যাদি; প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সেই মত ব্যক্ত করিলেন।

প্রথমতঃ, কথাটা অনেকেরই কানে উঠিবে না, কারণ, পাঠকের সংখ্যা বঙ্গদেশে বিরল, বিশেষতঃ প্রবন্ধ-পাঠকের।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাদের কানে উঠিবে তাঁহারাও সকলে ঠিক কানে তুলিবেন না।

তৃতীয়তঃ, যাঁহারা কানে তুলিবেন এবং সমালোচকের সহিত একমত হইবেন না, তাঁহারাও সকলে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন না। (অথচ বাদ-প্রতিবাদ না হইলে কোনো জিনিষই পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।)

চতুর্থতঃ, যাঁহারা প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারাও সকলে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবেন না। প্রতিবাদ করিলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং যুক্তিখণ্ডন করিবার জন্য হয় পাণ্ডিত্য নয় বাক্‌চাতুর্য্য, অন্তত পক্ষে অবাচ্য-কুবাচ্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। 'ঘরের খাইয়া বনের মোষ' তাড়াইবার হেতুটা কি?

অতএব সমালোচকের মন্তব্য মাঠেই মারা গেল। কিন্তু ঐ কথাটা নীরস গদ্যে না বলিয়া যদি সরস (?) পদ্যে এইভাবে লিখি:

"টেবিলিলা সূত্রধর কানড়িশা তাঁতি"

অমনি সকলেরই নজর পড়িবে। যাহার পড়িবে না, সে-ও অপরের মুখে শুনিবে।

প্যারডি বিশেষজ্ঞের যুক্তি নয়। বিশেষজ্ঞের মতামত সে চাহেও না। সে একটা বিদ্রূপপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। আর সেই ইঙ্গিত আপনার কাজ আপনি করিয়া যায়। প্যারডিকারও অনায়াসে পাঁচ জনের মধ্যে খ্যাতি (সাধারণতঃ কুখ্যাতি) লাভ করেন।

'গৌরপদ-তরঙ্গিণী-রচয়িতা' জগবন্ধু ভদ্র বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুকরণে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামক যে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। অথচ ইহার প্রথম প্রকাশের সময় দেশে একটা কৌতুকের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। অনুকারকাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

"ক্রহিণবাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান' সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে শকুন্ত-দুর্জয়
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি'
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিলা ধনী নখরপ্রহারে,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।
অর্কস্নারুহের তলে বিক্রন্ত গমনে—
(অন্তরীক্ষ অঙ্গের যথা জলধারাহিত
সুআশুগ ইরম্মদ গমে সন সনে)
চতুষ্পাদ ছুছুন্দরী মর্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাদ্‌ভাগে। হায় রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(ক্ষ্মাভ্রীশ—আত্মদা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্‌মণ্ডলী।"

এক শতাব্দীর প্রায় ত্রিপাদ অতীত হইতে চলিল। প্যারডি সাময়িক উত্তেজনা জাগ্রত করিয়া কৌতুক-প্রবণ লোকের মনে নির্মম হাস্যের সঞ্চার করিয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। কারণ, তাহার বেশী প্যারডির আর কিছু করিবার নাই। কিন্তু মূল 'মেঘনাদ' আজও বাঙ্গালীর পাঠশালা হইতে সুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্বত্রই নিজগুণে সমাদৃত হইতেছে।

বিখ্যাত কবির ভাব ও ভঙ্গীর প্রতি বিদ্রূপ করিয়া রচিত প্যারডি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক আছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের অনুকরণে রচিত 'ষ্টিফেন'এর (J. K. Stephen) একটি প্যারডি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি:

Two voices are there: one is the deep;
It learns the stormcloud's thunderous melody,
Now roars, now murmurs with the changing sea,
Now bird-like hipes, now closes soft in sleep:
And one is of an old half-witted sheep
Which bleats articulate monotony
And indicates that two and one are three,
That grass is green, lakes damp and mountains steep;
And, Wordsworth, both are thine; at certain times
Forth from the heart of thy melodious rhymes,
The form and pressure of high thoughts will burst:
At other times—Good Lord! I'd rather be
Quite unacquainted with the A B C
Than write such hopeless rubbish as thy worst.

এই ব্যঙ্গ কবিতাটিতে ওঅর্ডস্‌ওয়র্থের ভঙ্গীটি অতি সুন্দর ভাবে অনুকৃত হইয়াছে। সনেটের আঙ্গিক সুরক্ষিত হইয়াছে। মূল কবির দুইটি বিখ্যাত কবিতার (১) কয়েকটি সুপরিচিত কথা সুকৌশলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—তাহাতে সমালোচনার তীব্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্যারডিকার নিজের কথা দিয়া ব্যঙ্গরস এমন জমাইয়া তুলিতে পারিতেন না।

---

(১) প্রথমটি "Thought of a Briton on the subjugation of Switzerland"—যাহার প্রথম চার লাইন এইরূপ:

Two voices are there: one is of the sea,
One of the mountains: each a mighty voice:

মূল কবি বা কবিতার ভাব ভাষা ভঙ্গী মুদ্রাদোষ প্রভৃতির প্রতি বিদ্রূপ করা, তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, তাহাদের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতাকে বৃহত্তর করিয়া দেখান প্যারডির অন্যতম কাজ। 'ছুছুন্দরী বধ' তাহার একটি সুবৃহৎ দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। 'রাহুরচিত মিঠে-কড়া' নামক পুস্তকের কথা আজ বঙ্গবাসী সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-নামক কবিতা পুস্তক বাহির হইলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার কয়েকটি কবিতার ব্যঙ্গানুকরণ করেন এবং সেই ব্যঙ্গানুকৃতিগুলি যে পুস্তকে মুদ্রিত হয় 'রবিরচিত কড়ি ও কোমল'-এর অনুকরণে তাহার নাম রাখেন, "রাহুরচিত মিঠে-কড়া।"

রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠি প্রথম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলে' প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ এইরূপ :

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বকবকম।
আজকে না কি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা,
তাই খানিকটে কোঁসকোঁসিয়ে
বিদায় হলো রবি কাকা।

কাব্যবিশারদের সহ্য হইল না। তিনি লিখিলেন :

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বকবকামি কোঁসকোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য এক টাকা।

'কড়ি ও কোমল'এ একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি কবির বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত। পত্রের পাঠ এইরূপ :

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—স্থলচরবরেষু।

চিঠির কিয়দংশ :

জলে বাসা বেঁধেছিলেম
ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।

সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে
কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায়
ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে তখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে
... ...
জান তো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিন রাত। ইত্যাদি

কাব্যবিশারদ লিখিলেন :

মাছ সেজেছ বেশ করেছ
'জলচরের জাত'।
আর ভেসো না আর ভেসো না
হবে কুপোকাত।
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই,
পায়রা ছিল মাছ হয়েছে
মাচ্ছে উড়োঘাই।
কবি তুমি মানুষ বটে,
হলে পায়রা মাছ।
গেলে স্থলে শূন্যে জলে
বাকি কেন গাছ ?

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

ধার করা নাম নেবো আমি
হবে নাকো সিটি।
জানই আমার সকল কাজেই
অরিজিন্যালিটি।

কাব্যবিশারদ ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন :

চুনো গলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবিঠাকুর লেখে।

রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনা শুধু কাব্যবিশারদের হাতেই শেষ হয় নাই, কবিরাজ পর্য্যন্ত হাত তুলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, কাব্যবিশারদ আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া নাই, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় আছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের ভাগ্যেই এরূপ লাঞ্ছনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সে জন্য দুঃখ করিব না। কিন্তু দুঃখ এই যে রবীন্দ্রনাথের মত কবির ভাগ্যে নাম করিবার মত প্যারডি জুটে নাই। 'কোথায়

In both from age to age thou didst rejoice.
They were they chosen music, liberty !
আর দ্বিতীয়টিও সুপরিচিত "The world is too much with us," ইহার মধ্য হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :
It moves us not,—Great God I'd rather be
A pagan suckled in a creed out-worn :
So might I standing on this pleasant lea
Have glimpses that would make me less
forlorn.

'কড়ি ও কোমল' আর কোথায় 'মিঠে-কড়া'। ওঅর্ডস-ওয়ার্থের কবিতার সমালোচনা করিতে গিয়া ষ্টিফেন সাহেব যে ধরণের প্যারডি রচনা করিয়াছিলেন, বাংলা দেশে এক জন কবিও যদি সেই ধরণের একটি প্যারডিও লিখিতেন, তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও কিছু সান্ত্বনা লাভ করা যাইত।

"Parody, if well executed has this merit, that it pours criticism swiftly into an unforgettable mould." (২)

'মিঠে-কড়া'-রূপ সমালোচনা সেই অবিস্মরণীয় ছাঁচে ঢালা হইয়াছে কি না, তাহা আজিকার বাঙ্গালী পাঠকসমাজ বিচার করিয়া দেখিবেন। শুধু এ দেশের নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও ভাল প্যারডি অত্যন্ত সুলভ নহে। ভাল প্যারডি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে এ কথা সত্য।

"But much that is written in the name of parody is either on the one hand clownish mimicry, or, on the other, of no more value than a school exercise neatly performed by an assiduous student."(৩)

আলোচ্য প্যারডি কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহা বলা বিপজ্জনক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো মতেই করা চলে না; কারণ, উহা আর যাহাই হউক, "neatly performed" কদাচ নয়।

মূল কবিতার প্রতি কিছুমাত্র ব্যঙ্গ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না রাখিয়া মূল কবির সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তাঁহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি:

"বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারী-চূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদ মাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রী অক্ষয়।"

এটি যে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েক ছত্রের অনুকরণ তাহা বোধ করি বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্যারডিরই ভূমিকায় তাহার ইঙ্গিতও আছে:

"তুমি যখন বিদেশে থাকবে তখন আমি 'আর্তনাদবধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব।" কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য' অথবা তাহার কবির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। কবি বা কবিতার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও হাস্যরসে ইহা সমুজ্জ্বল। এই হাসির মধ্যে মাধুর্য্য আছে, বিষ নাই। এখানে যে অসংগতি হাস্যরসের জন্মদাতা, তাহা লঘুগুরুর অসংগতি। যে মেঘনাদবধ কাব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের তথা শিক্ষকবর্গের পক্ষেও বিভীষিকা-স্বরূপ, অনুরক্ত দম্পতির লীলাকলহের অবকাশে তাহার অনুকরণ স্বভাবতঃই হাস্যকর।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত স্বদেশী গান—

"কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।"

বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইহার প্যারডিটিও হাস্যরসমুখর! উপরে উদ্ধৃত প্যারডির মত ইহা নির্বিষ নয়—ইহাতে কটুরস কিছু আছে। তবে তাহা কবির বা কবিতার উদ্দেশে বর্ষিত হয় নাই। তদানীন্তন সমাজই তাহার প্রয়োগস্থল।

"কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্ন-জলের হল ঘোর অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।
যাও ঠাকুর চৈতনচুটকি নিয়া।
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

'চিরকুমার সভা'র যে প্রসঙ্গ হইতে এই কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা রসিক সমাজে সুপরিচিত।

'প্যারডি'র প্রাথমিক অর্থ হাস্যরসাত্মক অনুকার কবিতা। অন্যের রচিত কবিতার ব্যঙ্গানুকরণই তাই প্যারডির বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গদ্যরচনারও কৌতুকানুকৃতি বাহির হইতে লাগিল। গদ্য কবিতার মত গদ্য প্যারডিও মধ্যে মধ্যে পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিবে। তবে এ জিনিষ খুব বেশী নাই। এখানে আমরা বাংলা সাহিত্য হইতে একটি কৌতুকোজ্জ্বল গদ্যানুকৃতির উল্লেখ করিব।

'পরশুরাম'-রচিত পুনর্মিলন' গল্পটি আর একবার পড়ুন!

"পঞ্চপাণ্ডব বিন্ধ্যাটবিতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক। তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, যুদ্ধং দেহি।

রাক্ষসটি তরুণ···তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। বলিলেন, অরে বালক, তোমার সঙ্গে লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, চাতুরী চলিবে না। হয় যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রত পালন করিয়া অভুক্তা আছেন, আজ তাঁহার পারণ। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন, বেশ চল।

অনেক বন-জঙ্গল গিরি-নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল?

রাক্ষস বলিল, মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ, কেমন শিকার আনিয়াছি।

রাক্ষসী বলিল, ও আর দেখিব কি। সব মানুষই সমান, ঝাল করিয়া রাঁধিলে কে ঋষি কে চণ্ডাল টের পাওয়া যায় নাই। আমার এখন সময় নাই। চুল বাঁধিতেছি।

---

(২) Encyclopaedia Britennica—vol 17, 14th edition.

(৩)

রাক্ষস বলিল, চুল বাঁধা এখন থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল, ও মা, আর্য্যপুত্র যে! ছি ছি, লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।

ভীম বলিলেন, কে‘ও-দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।" (৪)

(৪) হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম।

গল্পটি যে ভাসের 'মধ্যম ব্যায়োগ' নাটকের আখ্যানভাগ অনুসরণ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা ভূমিকাতেই বলা হইয়াছে।

"মহাকবি ভাস-রচিত 'মধ্যম' নাটকের আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া বলিতেছি।"

এই তো গেল ভূমিকা। আবার উপসংহারও আছে। লেখক যে আখ্যানভাগ "কিঞ্চিৎ" মাত্র "অদল-বদল" করিয়াছেন, বেশী করেন নাই, কেবল সেইটুকু জানাইবার জন্যই উপসংহার:

"রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।"

গল্প প্যারডি বলিয়া নয় উচ্চশ্রেণীর সুমধুর হাস্যরসের এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

পরিচয়

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত

অবশেষে মালতীর বিয়ের ঠিক হ'ল।

সাধারণ বাঙালী মেয়ে যে বয়সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়, সেই বয়সেই মালতীর নব জীবনের যাত্রা-পথে অভিযান সুরু হ'ল। তবে অন্যের সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে—কুমারী মালতী সেন, এম্-এ পাশ এবং একটি বিদ্যায়তনের উচ্চপদস্থা শিক্ষয়িত্রী। এ সংবাদে তার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ রীতিমত বিস্মিত হ'ল। আর এ বিবাহে মালতীরও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। কৌতুহল দমন করতে না পেরে ওর বন্ধু সুচরিতা এসে জিজ্ঞাসা করল—লতী! বুড়ো বয়সে এ-সব কি?

মালতী বল্‌ল—নিয়মের বাইরে হয়ে গেছে না কি?

সুচরিতা চোখ টিপে বল্‌ল—সুদীর্ঘ কোর্টশিপের ফল বোধ করি।

মালতী ঠোঁট উল্টে বল্‌ল—উঁহু, আলাপ হওয়া দূরে থাক্, ভদ্রলোকটিকে ভাল করে দেখিইনি এ পর্য্যন্ত! যা করবার সব মা আর মামা বাবুই করেছেন।

গালে হাত দিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে সুচরিতা বল্‌ল—বলিস্ কি?

মালতী বল্‌ল—হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই। আর বয়স এমন খুব বেশী হয়েছে কি? জোর সাতাশ কি আঠাশ; এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে গেল না কি?

সুচরিতা বল্‌ল—সে যাই হোক, আমার যেন কেমন ঠেকছে ভাই। এত লেখাপড়া শিখে স্বাধীন ভাবে চাকরী করতে করতে শেষে কি না অতি বাধ্য একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ের মত মায়ের কথায় সায় দিলি? আমি হ'লে অন্ততঃ একটু যাচিয়ে দেখতুম।

'তাই করিস্ খন'—মালতী মুখ ঘুরিয়ে বল্‌ল।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হ'লে এখন গোড়ার কথা একটু জানা দরকার।···মধ্যবিত্ত একটি ঘরের মেয়ে মালতী। স্বাস্থ্যবতী বটে, কিন্তু নেহাৎই সাদামাটা গোছের চেহারা! নিজ অধ্যবসায়ের গুণে, সে প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে ভাল ভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী লাভ করেছে। বর্ত্তমানে সে কোন একটি আধা-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্তা। সংসার প্রতিপালন করবার জন্য তাকে উপার্জ্জন করতে হয় না বটে, কিন্তু বেকারের খাতায় নাম লেখাতেও সে রাজী নয়। গত চার পাঁচ বছর ধরে সে এই কাজ করছে। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের দিকে নজর দেবার সুযোগ বা অবসর তার জীবনে ঘটেনি।

তাই গত বিজয়া-দশমীর দিন দ্বিজদাস অর্থাৎ মালতীর মামা যখন তার মায়ের কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, তখন মালতী চিত্তে চঞ্চলতা অনুভব করল এবং কৌতুহলও বড় কম হ'ল না। নারীজীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে যেন বিশেষ ভাবেই ঠেকল। মনে খুসীর জোয়ার জাগল, যখন জানল যে তার মা কন্যার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

দ্বিজদাস বললেন—কিন্তু দিদি পাত্রের বয়স যা একটু বেশী। কিন্তু ছেলেটি সব দিক দিয়েই চৌখস্। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। আবার দোজবরেও নয়।

মা বললেন—বয়স কত হবে?

দ্বিজদাস জবাব দিলেন—এই বছর চল্লিশ হ'বে আর কি।

মা বললেন—আমার অমত নেই দ্বিজ! আর মেয়েও আমার ছোটটি নয়। এখানেই যাতে লতীর বিয়েটা হয় তারই ব্যবস্থা কর।

দ্বিজদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার দিদি আমাদের দেশেই ছেলেটির বাড়ী। আমায় খাতিরও করে খুব··· বলে—বুড়ো বয়সে বিয়ে করব তার আবার দেখাশোনা কি? মানে বুঝতেই ত পারছ, চাকরী-বাকরী করে, ঘরে একটু আরাম চায়। লেখাপড়া জানে আর স্বাস্থ্যটিও ভাল, এমনি একটি মেয়ে খুঁজছে··· তা' সেদিক দিয়ে লতীকেও আমার কেউ হঠাতে পারবে না। তবে একটি কথা···

মা বললেন—আবার কথা কি?

দ্বিজদাস একটু থেমে বললেন—লতীর মতটা কি, একবার জানবে না? বিশেষ যখন চারটে পাশ দিয়েছে।

মা গর্ব্বমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—তা দিলই বা। মেয়ে আমার তেমন নয় দ্বিজু। কোন দিনই সে আমার ওপর কথা বলেনি, আজও বলবে না।

আশ্বস্ত হয়ে দ্বিজদাস বললেন—সে ত ভাল কথা দিদি। তবে এ কালের মেয়ে···হাওয়া অন্য রকম কি না! সব জেনে-শুনে কাজে নামা উচিত।

মা বললেন—এখন ত সব জানলে, এইবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও দেখি।

বলা বাহুল্য, অতি শীঘ্রই সব কিছু সমাধা হয়ে গেল। পাত্র

অবনী এক দিন নিজে এসে মালতীকে দেখে গেলেন এবং যাবার সময় পাত্রী পছন্দ হয়েছে, এই কথাটা জানাতে ভুললেন না। নূতন জীবনের মোহে মালতীর সারা দেহ-মন উন্মুখ হয়ে উঠল। যথা-সময়ে এক শুভদিনে ও শুভলগ্নে কলিকাতার এক উচ্চ বে-সরকারী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 'শ্রীঅবনীকুমার রায় এম-এ পি এচ ডি'র সঙ্গে কুমারী 'মালতী সেন এম-এ'র শুভ পরিণয় হ'ল।

* * * *

স্বামীর ঘর করতে এল মালতী।

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং মায়াবাদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অবনী-কুমারকে জড় জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হ'তেই দেখা গেল। পূর্ব্বেকার ছোট ফ্ল্যাট-বাড়ী ছেড়ে তাকে ছোট-খাট রকমের একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া করতে হয়েছে। ঠিক বড় রাস্তার উপর না হলেও তার সঙ্গে যোগসূত্র আছে। একটি পরিবারের থাকার পক্ষে বাড়ীটি বেশ।···প্রবেশ-মুখেই সামনের দেয়ালে আঁটা কাঠের বোর্ডে সাদা হরফে লেখা "মালতী-কুঞ্জ" চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে খান-পাঁচেক ঘর···তাছাড়া রান্না-ঘর ইত্যাদি ত আছেই। অবনী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি ঘরের জিনিষপত্র যেখানে যেটি রাখা প্রয়োজন, লোক-জন দিয়ে রাখিয়েছেন এবং এইজন্য তাঁকে কাজ থেকে দিন-কয়েকের ছুটীও নিতে হয়েছে।

সব দেখে মালতী মনে মনে স্বামীর কার্য্যনিপুণতার প্রশংসা করতে লাগল। বল্‌ল—এ সব তুমিই করেছ?

মৃদু হাস্যে অবনী বল্‌লেন—করবার আর দ্বিতীয় প্রাণী কোথায়? অবশ্য এখন তুমি এসেছ···থাক ও কথা। এ সব তোমার পছন্দ হয়েছে ত?

ঘাড় নেড়ে মালতী জানাল—হ্যাঁ।

অবনী বল্‌লেন—এখন আমি মনে মনে কি ঠিক করে রেখেছি তাই শোন। ওই যে রাস্তার দিকের ঘরটা, ওটা তোমার পড়ার আর বসবার ঘর করেছি। ঠিক তার উল্টো দিকেই তোমার শোবার ঘর। কোন অসুবিধে হবে না, কি বল?

মালতী ঘাড় নাড়ল। অবনী বলতে লাগলেন—তোমার ঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। মাঝে শুধু একটা মোটা ছিটের পর্দ্দা ঝুলবে, প্রয়োজন বোধ করলেই আমায় ডাকবে।···আমাদের চা খাওয়া···গল্প-গাছা সব তোমার পড়ার ঘরেই চলবে। দরকার পড়লে তুমিও আমার পড়ার ঘরে চলে আসবে। তাই ত?···য়্যাঁ?

মালতী বল্‌ল—নীচের ডান দিকের ঘরটা বুঝি তোমার পড়ার ঘর করেছ?

অবনী বল্‌লেন—হ্যাঁ।

মালতী মুখ ফুটে আর বলতে পারল না, কি দরকার ছিল এ সব আলাদা ব্যবস্থা করবার? অবনীর পড়ার ঘর ওপরে করলেও চলত। তার নিজের আর ও-সবে প্রয়োজন কি? পড়াশোনা নিয়ে জীবনের অনেকগুলি দিনই ত কেটেছে।

খানিকটা কৈফিয়ৎস্বরূপই যেন অবনী বল্‌লেন—মানে এ রকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, মাসের মধ্যে আমায় একুশটা দিন, রাত জেগে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়—পাছে তোমার কোন অসুবিধা ঘটে, তারই জন্য এ সব করা।

মালতী কতকটা নির্লিপ্ত ভাবেই বল্‌ল—তা বেশ ত···তোমার অসুবিধা বা সুবিধা আগে দেখতে হবে ত।

অবনী বল্‌লেন—তুমি বাড়ীর কর্ত্রী। তোমার মত নেয়াও ত দরকার। কেন? মনে ধরল না আমার কথাগুলো? পছন্দ হয়নি এ ব্যবস্থা?

মালতী বল্‌ল—আমার মত নেবার আগেই ত সব ঠিক করে ফেলেছ। তা বলে আমি বলছি না যে, আবার নতুন করে সব গোছাতে।

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—আমার একটু কাজ আছে···একবার ঘণ্টাখানেকের জন্য কলেজে যেতে হবে। খানকয়েক বইয়ের দরকার।

শত ইচ্ছা থাকলেও মালতী অবনীকে বলতে পারল না,—'আজ না হয় থাক না বই, সে অন্য দিন এনো'খন! এস না বসে একটু গল্প করি।' তাই অবনী চলে যাবার পর খানিকক্ষণ সে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াল। চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে সে অন্যমনস্ক ভাবে স্নোর কৌটা থেকে এক চামচ তুলে নিয়ে গালে ঘসতে লাগল। স্বচ্ছ দর্পণের বুকে নিজের প্রতিবিম্বটি নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করল। না···কমনীয়তার অভাব তার দেহে নেই। সেখান থেকে সরে গিয়ে মালতী খাটের ওপর দেহখানি এলিয়ে দিয়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। আজ আর সে নিঃসঙ্গ নয়···একটি জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বাধীন সত্তাকে সে কোন দিনই বিসর্জন দেয়নি, তবু—তবু পিতৃগৃহের আবেষ্টনীর তুলনায় এই সব আবেষ্টনী কত মধুর! সুখ-স্বপ্নের আবেশে তার আঁখিপাতা স্তিমিত হয়ে এল।

এর পর মাস ছয়-সাত কেটে গেছে। বিকালের দিকে মালতী ঘরে পায়চারী করতে করতে বিনুনী বাঁধছিল আর গুন্ গুন্ করে একটা গানের কলি ভাঁজছিল। অবনী বাড়ী এলেন।

মালতী বল্‌লে—আজ সকাল করে ফিরলে যে?

অবনী হেসে বল্‌লেন—এমনি চলে এলাম···আর বিশেষ কোন কাজও ছিল না আজ। ভাবলাম, অনর্থক কলেজের গণ্ডীর মধ্যে না থেকে বরং বাড়ীই যাই, তোমার সঙ্গে না হয় গল্পই করা যাবে।

মুখ টিপে মালতী বল্‌ল—তবু ভাল।

অবনী বল্‌লেন—কিন্তু বাড়ী ফিরে কি মনে হচ্ছে জান?

মালতী বল্‌ল—কি?

অবনী বল্‌লেন—কি জানি কেন ভারী লজ্জা করছে ঐ কথা ভেবে। হাজার হোক বয়স হয়েছে ত। বুড়ো বয়সে না হয় বিয়েই হয়েছে, তা বলে তারুণ্য ত ফিরে পাইনি।

ঠোঁট উলটিয়ে মালতী বল্‌ল—তা যাও না কলেজেই ফিরে।

অবনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন—তোমার এই চুলবাঁধার অপরূপ ভঙ্গীটি দেখে মনে হচ্ছে যে, যদি তোমার বয়স হ'ত আঠার আর আমার হ'ত আটাশ, তাহলে তোমার হাত দুটি ধরে বলতাম—'ওগো বিশ্বমানবীর প্রতীক! তোমার ও কালভুজঙ্গিনী সম বেণী দিয়ে আমার কণ্ঠরোধ করে আমার চেতনা লুপ্ত করে দাও'···কিন্তু এখন এ বয়সে ও কথাগুলো বলতে ভারী বাধ-বাধ ঠেকে।···বলে হেসে উঠল।

মালতী বল্‌ল—বলতেও কসুর করলে না। বেশী বয়সে বিয়ে করা বুঝি মহাপাপ ? থাক না তুমি সন্ন্যাসী হয়ে লোটাকম্বল নিয়ে··· বলে সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিব্রত অবনীকুমারের অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

২

স্নান সেরে একটি নীলাম্বরী পরে মালতী অবনীর পড়ার ঘরে ঢুকল।

অবনী একখানা চিঠি লিখছিলেন, শেষ করে সেটি খামে মুড়ে রেখে বল্‌লেন—এই যে তুমি এসেছ···ভালই হয়েছে। মাসিক কিস্তিতে একটা রেডিও কেনার ব্যবস্থা করলাম—এই যে চিঠি যাচ্ছে। বলে খামখানি তুলে দেখালেন।

মালতী টেবিলে বসে পা দোলাতে দোলাতে বল্‌ল—আবার কেন মিছে খরচ বাড়ান ?

অবনী বল্‌লেন—তা হোক, বেশীর ভাগ সময় ত তোমায় একলা কাটাতে হয়। তবু যা হোক সময় কাটবে।

সত্যই অবনীর কর্ম্মময় জীবনের মাঝে অবসর বড় একটা মেলে না। সকালে কলেজ যাবার আগে পড়াবার বিষয়গুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। বেশীর ভাগ দিনই বিকাল পর্য্যন্ত কলেজে কেটে যায়, কোন দিন বা সভা-সমিতিও থাকে। কোন কোন দিন ফিরতে রাতও হয়ে যায়, না হলে বাড়ী এসে ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে লেখার দপ্তর নিয়ে বসেন। সময় যে কোন্ দিক্ দিয়ে চলে যায়, সে দিকে তখন হুঁস থাকে না।

অবনী কাজে বসলে মালতী কখনও তাকে বিরক্ত করে না। যদিও সে স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করে অপর পাঁচ জনের মত।

অবনী বল্‌লেন—একটা কথা বলব ?

স্মিতমুখে মালতী বল্‌ল—বল না।

অবনী বল্‌লেন—এ-শাড়ীতে যেন তোমায় ঠিক মানাচ্ছে না। কেমন যেন বয়সের সঙ্গে বেখাপ্পা ঠেকছে।

মুখ ভার করে মালতী বল্‌ল—পরতে নাই না কি ? কত বেশী বয়সের মেয়েরা ছাপা শাড়ী···রঙীন শাড়ী পরে তা জান ?

অবনী বল্‌লেন—পরুকগে তারা! রুচি কি সকলের সমান ?

মালতী বল্‌ল—শাড়ীর সখ আমার চিরকালের। যখন চাকরী করতাম, হাত-খরচা আমাকে মা যা দিতেন তা দিয়ে খালি রঙ-বেরঙের শাড়ী কিনেছি। না হয় আর পরব না।···না হয় কাউকে বিলিয়ে দেব।

আবহাওয়া হালকা করবার জন্য অবনী বল্‌লেন—আহা হা! আমি কি তাই বলছি।

কোন কথা না বলে মালতী চলে গেল। আসন্ন দুর্য্যোগের সম্ভাবনায় অবনী চুপ-চাপ বসে রইলেন। কিন্তু মেঘ কেটে গেল। মালতী ফিরে এল জলখাবারের থালা ও চা নিয়ে। অবনী লক্ষ্য করলেন, মালতী নীলাম্বরী ছেড়ে অন্য আর একখানা শাড়ী পরেছে। নিঃশব্দে তিনি আহারে মন দিলেন।

একটা করুণ অস্বস্তির মাঝে মালতীর বিবাহিত জীবন কাটছে। মিলনের সহজ সূত্রটি যেন হারিয়ে গেছে। কোথায় যেন কাঁটা খচ্ খচ্ করে। তাই কথায় কথায় এক দিন মালতী বল্‌ল—দেখ! আমি আবার চাকরী করব ঠিক করেছি।

বাইরে যাবার পোষাকে অবনী তৈরী হচ্ছিলেন। বল্‌লেন—দরকার কি ? আমি কি তোমায় খাওয়াতে পরাতে পারছি না ?

মালতী বল্‌ল—সে কথা নয়। তবে···বাকীটুকু অসমাপ্ত রয়ে যায়।

আচ্ছা!···আচ্ছা···সে হবে'খন—বলে অবনী কলেজের দিকে রওনা হলেন। মালতীর বিচারে কিন্তু একটুখানি ভুল রয়ে গিয়েছে। 'অবনীর ভালবাসা ফল্গুর মত···বাহুল্য-দোষযুক্ত নয়। আলোড়ন নেই, গভীরতা আছে। প্রমাণ পেতেও বেশী দেরী হল না। সেই দিনই কলেজ থেকে একটু দেরী করে ফিরে এসে পড়ার ঘরে মালতীকে না দেখতে পেয়ে সোজা তার শোবার ঘরে হাজির হলেন। ব্যগ্র ভাবে বল্‌লেন—শুয়ে কেন মালতী ? তোমার কি অসুখ করেছে ?

চোখে হাত ঢাকা দিয়ে মালতী শুয়েছিল পাশ ফিরে।···বল্‌ল—শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।···বড্ড মাথাটা ধরেছে।

—জ্বর হয়নি ত ? বলে অবনী মালতীর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। তার পর বল্‌লেন—থাক···আজ আর বেশী ঘোরা-ফেরা করো না। যা হয় এদিকে আমি ব্যবস্থা করছি।···কলেজের পোষাক বদলিয়ে অবনী মালতীর কাছে এসে বসলেন। চাকরকে হুকুম করলেন, অডিকলোন কিনে আনতে আর ফিরতি মুখে ডাক্তারের বাড়ী খবর দিয়ে আসতে। সারা রাত্রি চল্‌ল ঐকান্তিক সেবা। যা কিছু করেন, মনে হয় যেন মালতীর সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধান হল না। মালতীর বিশেষ কিছুই হয়নি, তবুও সে পরম আরামে ও নির্ব্বিকার চিত্তে স্বামীর এ সেবা গ্রহণ করল। তার দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে এমন নিবিড় করে স্বামীকে অল্পই পেয়েছে। ভোরের দিকে অবনী বল্‌লেন—কেমন বোধ করছ মালতী ?

বিহ্বল কণ্ঠে মালতী বল্‌ল—খুব ভাল।

অবনী বল্লেন—একটু চা করে দেব ?

মালতী বল্‌ল—না থাক। তার চেয়ে বরং তুমি একটু শোও··· সারা রাত জেগেছো। আবার কলেজ আছে ত।

অবনী বল্‌লেন—আজ আর কলেজ যাব না মনে করেছি।

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে মালতী বল্‌ল—কেন যাবে না ? কি হয়েছে আমার ?

অবনী বল্‌লেন—এমনিই যাবো না। কি এমন আমার বয়স হয়েছে যে, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বাণীর বিদ্যাপীঠে ধর্ণা দিতে হবে। তার চেয়ে বরং তুমি আরও একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর দেখি।···বলে সস্নেহে মালতীর মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। মালতী কোন কথা না বলে অবনীর কোলের ওপর একখানা হাত রেখে পাঁজরের কাছে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

———

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগসাধনার পথবিচার

যোগসাধনা কি করে করতে হবে, কার কোন্ পথে আসবে সিদ্ধি, কি উপায় অবলম্বন করলে কোন্ সাধকের কাছে জ্ঞান আনন্দ শক্তির অনন্ত অক্ষয় খনির দুয়ার যাবে খুলে, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ সবাই করেন। তার উত্তরে বলতে হয়, মানুষেরও রকমারির অন্ত নাই, তাই তাদের সাধনারও ধারার বা পথের অন্ত নাই। ঠাকুর বলতেন, যত মত তত পথ, সেই একই কথা অন্য ভাবে বলা যায়—যত রকম প্রকৃতি তার তত রকম পথ। যোগী সন্ন্যাসীদের মাঝে দেখবেন কত সব জটিল আসন মুদ্রা ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে যোগাভ্যাস করবার; তার আয়োজন উপকরণেরও অন্ত নাই আর ক্রিয়া-কসরতেরও শেষ নাই। কেউ শক্ত কণ্টকময় শয্যায় শুয়ে থাকেন, কেউ বা বিস্বাদ খাদ্যবিশেষ খান বা স্বল্পাহারে অনাহারে থাকেন, কেউ হেট-মুণ্ড ও ঊর্দ্ধ-পদ হয়ে করেন জীবনক্ষয়। কারু সাধনা দশ সহস্র বা লক্ষ নাম জপে, কেউ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে কাঠ হয়ে বসে করেন বিন্দুধ্যান। কত কৃচ্ছ্রসাধক অর্থ স্পর্শ করেন না, ভুলেও নারীর মুখ দেখেন না, খেচরী বা ভ্রামরী মুদ্রা অভ্যাস ক'র দিনক্ষেপ করেন।

এ সব কি পথ নয়? মানুষের প্রকৃতি হিসাবে এ সবই পথ; তবে কোনটা ঘুর পথ, কোনটা বা একেবারেই কাণা গলি। কেন 'এ সব কষ্টসাধ্য ঘুর পথে মানুষ যায়?—প্রথমতঃ, ঠিক পথ জানে না বলে; দ্বিতীয়ত', তার প্রকৃতিতে আছে এমন অস্থির রজঃশক্তি বা কঠিন আবরণ—এমন কিছু উপাদান যা' তাকে নাকে দড়ি দিয়ে এই সব কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়ে নেয়। ঐ রকম একটা আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করা হয়তো তার আত্ম-শাসন হিসাবে পরবর্ত্তী বিকাশের জন্য আবশ্যক ছিল, তাই ওটা কর্ম্মসূত্রে জীবনে এসে গেছে। ক্রিয়ার আছেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অন্তরে কামের নগ্ন পশুমূর্ত্তি দেখে অবধি কেউ ভীত হয়ে আত্মনিগ্রহের পথে প্রাণপণে তার উল্টা দিকে যাবার করছে দুশ্চেষ্টা। ঈশ্বর বা তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ পরম লক্ষ্য ভুলে সে ক্রমাগত করছে দৈহিক ব্রহ্মচর্য্যরূপ গৌণ উপায়কেই আয়ত্ত। কেউ বা মহাপুরুষের মুখে বা পুঁথিতে শুনেছে বা পড়েছে যে, নারী নরকের দ্বার, কাম-কাঞ্চন সংসারের ভোগ-সুখেরই যোগায় মৌতাত, তাই সে তার চোখের রূপ-ক্ষুধাকে উপবাসী রাখছে নারী-মুখ সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে, প্রাণপণে হাত-পা গুটিয়ে আছে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে।

যোগসাধনার পথ খুঁজবার তাড়ায় মানুষ বহু অপথ বিপথ কুপথের করেছে আবিষ্কার। প্রকৃতি তোমারই স্বধর্ম্ম, তাকে অকালে জবরদস্তি নিরোধ করতে গেলে সেই নিপীড়িত রুদ্ধ-শক্তি বিকৃত পথ ধরবেই। মহাপ্রভু আনন্দ-লোকের ঠাকুর, তিনি জগতে এসেছিলেন জগৎকে ভাব, মহাভাব ও অপার্থিব প্রেমের সন্ধান দিতে; মানব-দেহে কামবৃদ্ধি থাকতে সে মহাপ্রেমের সন্ধান মেলে না, তা বলে আধার নির্ব্বিচারে কামবৃত্তিকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করলেই মহাভাবময় শ্রীচৈতন্য জন্মায় না। ঊর্দ্ধের নিষ্কাম ভাগবত প্রেমে লক্ষ্য রেখে তিনি দারুময়ী নারী সন্দর্শন থেকে প্রশান্ত পূতচিত্ত অধিকারী শিষ্যকেই বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে উপদেশ মাত্র তারই ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। মহামতি বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্য জগতের অসারত্ব ও মায়াময়তার কথা বলে গেছেন; সে কথা সত্যের একটা দিক্। নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি তত্ত্বের তুলনায় এ জগৎ অলীকই বটে, কিন্তু ঠাকুরের কথায় বেলটি শুধু শাঁস নিয়ে বেল নয়, খোলা বীচি শাঁস আটা সব নিয়েই বেলের বেলত্ব। এই হচ্ছে প্রভূত অখণ্ড পূর্ণদৃষ্টি। তা'বলে কি আচার্য্য শঙ্কর বা বুদ্ধের কথা বা পন্থা ভুল? তাঁরা যুগোপযোগী সত্য নিয়ে পূর্ণ তত্ত্বের এক একটা দিকের উপর জোরদিয়ে সেই দিকই প্রকাশ ও প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন; এক হিসাবে তাঁরা সকলেই ঠিক, সকলেই নমস্য।

অহং বুদ্ধি আশ্রয় করে যে সব সাধনার পন্থা আছে—অর্থাৎ এই উপায়ে অমুক ক্রিয়া অভ্যাস করে আমি স্বচেষ্টায় আত্মসংযম করবো, এই প্রক্রিয়ায় চঞ্চল অস্থির মন ও অশুদ্ধ প্রাণাবেগকে বলপ্রয়োগে বেঁধে ফেলবো, এই রকম হঠকারী বুদ্ধি আশ্রয় করে মানুষ যে কঠোর তপশ্চর্য্যা বা সাধনা করে তা সব সময় কল্যাণ প্রসব করে না। সে অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগের পথে দুর্ব্বল স্নায়বিক অপূর্ণ আধার ভেঙ্গে পড়ে বা দরকচা মেরে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হয়ে থাকে; সবল শক্তিমান আধার পার পেয়ে যায়। তথাপি অধিকাংশ মানুষকে অপরিণত অবস্থায় অল্প-বিস্তর এই অহংকারাশ্রিত সাধনা করিতেই হয়, তার সবটা সব ক্ষেত্রে নিষ্ফল যায় না, একান্ত উন্মার্গগামী চিত্ত মন প্রাণকে সাময়িক বশে রাখার কিছু শক্তি এই যমনিয়মাদি সাধনা থেকে জাগে। এই ভাবে শ্রেষ্ঠতর প্রশস্ততর সাধন-পন্থার জন্য মানবাধার ক্রমশঃ প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিছক এ সব কষ্ট কল্পিত প্রচেষ্টা-দুষ্ট পথে তত্ত্বলাভ হয় না, এটা একেবারে খাঁটি সত্য। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল, যখন এই অহংজ্ঞান বিলয়ই পরম পদ লাভের প্রকৃত পথ, তখন যে পথে এই অহংবুদ্ধি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় সেই পথই বরণীয়। যতক্ষণ সাধক বোঝে না এ পরম বস্তু কি, কি উপায়ে সে পরম শুদ্ধ তত্ত্বের সন্নিহিত হতে হয় ততক্ষণ এই সব এলোমেলো হাতড়ানো চলছে স্বাভাবিক।

পরাতত্ত্বের উদয়ে মণ প্রাণ চিত্তবৃত্তি সব স্বতঃই বিলয় হতে থাকে, একটি প্রশান্ত ব্যাপক অখণ্ডমুখী অবস্থা স্বতঃই উদিত হয়ে যোগীকে করে ইহবিমুখ, তত্ত্বারূঢ়; ত্যাগ তখনই হয় খাঁটি, সেই স্বতস্ফূর্ত্ত ত্যাগই ভববন্ধন মোচন করে, জোর করে অভ্যাস করা কাষ্ঠত্যাগে হয় না। এই সত্য যে উপলব্ধি না করেছে, তার পক্ষে যোগসাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান পাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, সে পথের মানুষ পথেই থেকে যায়, বিপথকে পথ বলে ভ্রমের বশে ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু তার ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। তবু অন্ধ অজ্ঞান অবস্থায় আমরা চেষ্টা না করে পারি না, সে চেষ্টা তখনই প্রশান্তি ও নৈষ্কর্ম্যের পথে যেতে থাকে, যখন সাধকের সাধনা খুলে যায়, ঊর্দ্ধের স্রোতোধারা যখন এসে এসে ছোঁওয়া দিয়ে দিয়ে তাকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখ তত্ত্বার্পিতচিত্ত করে দেয়। তখনই তার আরম্ভ হয় সত্যকার সাধনা, সার্থকযাত্রা, অহংগ্রন্থী মোচনের খাঁটি পালা।

পূর্ব্বেই আধার বিচারে বলেছি, মানুষ নিজে চলে না, সে চলে স্বভাবে, প্রকৃতি তাকে কেশাকর্ষণ করে চালায়। সাধনপথেও ঘটে

তাই, পণ্ডিত করে এক পথে চেষ্টা, ভাবুক চলে আর এক পথে ভাবের টানে ভেসে, অস্থির কর্ম্মী করে কতই না আড়ম্বরে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বহুল তপস্যার আয়োজন। আমরা ভাবি, আমরা আপনি চলছি, বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করছি, আসলে আমরা কিন্তু নিজের নিজের স্বভাবের ঠেলায় ঐরূপ না চলে না করে পারি না। শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমানী মানুষ হচ্ছে মনের রাজা, বুদ্ধিবৃত্তি তার সত্তার প্রধান উপকরণ, তারই রঙে সে সর্ব্বসত্তায় অনুরঞ্জিত। পণ্ডিত মানুষ তাই সাধনার পথে পা বাড়িয়ে অবধি শুধু করে মহা উৎসাহে তর্ক-বিতর্ক, কেবলি সার করে চলে শাস্ত্রের শ্লোক, ন্যায়ের ও যুক্তির বিচার। তর্ক ও বুদ্ধি চালনাই তার পক্ষে এক রকম সম্ভোগ, চর্চ্চা ও ভোগের দ্বারা সে মানস-বেগ না কাটলে ঐ চঞ্চল সবজান্তা মন, বুদ্ধি তার চুপ করবে না, অন্তর্মুখী হবে না, তরঙ্গ তুলে তুলে মন তার অস্থির ও অশান্তই থেকে যাবে। শাস্ত্রেই আছে "ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন"—উজ্জ্বল মেধা বা বহু শ্রুতিপাঠেও আত্ম উপলব্ধি হয় না।" এ কথা বার বার পাঠ করেও সে কথা তর্কানুরাগী শাস্ত্রজ্ঞদের সহজে উপলব্ধি হয় না,—সে বুঝেও বোঝে না যে, শাস্ত্রের শ্লোকে আত্মজ্ঞান নাই—**In books and temples vain thy search;** সেখানে আছে শুধু সে পথের ইঙ্গিত মাত্র, তাও ধরতে গেলে চাই স্থির প্রশান্ত প্রাণ, মূক-তদর্পিত মন। মন বুদ্ধির পারের বস্তুকে ধরবার আয়োজনে এই রকম বুদ্ধিচঞ্চু অশান্ত মানুষ কেবলি তাই চলে মনের ফাঁদ পেতে; তর্ক ও চিন্তার আবর্ত্ত সৃষ্টি করে করে। ফলে, চঞ্চল মন অশান্তই থেকে যায়, বুদ্ধি চালনার মধুর পরমান্নই বার বার সে করে আস্বাদন। তবে এই সূক্ষ্মানুভূতির জন্য তদনুকূলে বিচার করেও ক্ষেত্র-বিশেষে মন যায় কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, বুদ্ধি হয়ে আসে প্রশান্ত গভীর ও দীপ্ত। তখন কোন কোন ভাগ্যবান জ্ঞানীর অন্তরের মানস-পুরুষ—চকিতে প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে দেখতে পায়—প্রশান্ত সূর্য্যালোকদীপ্ত অতি মানসের কৈলাসচূড়া, তখনই যায় তার মনের কাঁটা ঘুরে। তখন তার শাস্ত্র-মোহ যায় ঘুচে, সে বোঝে যে,—

"বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।"

যোগ হচ্ছে জীবনেরই বিকাশ; যোগ অর্থে বুঝি তোমার আমার অন্তর্নিহিত সত্তার ধর্ম্মের পথে উত্তরোত্তর জ্ঞান শক্তি ও আনন্দে বিকশিত হওয়া। আমাদের সত্তা জীবনে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই অবস্থার চাপে অন্তরের প্রেরণায় আপনি বিকশিত হয়ে চলেছে, মন প্রাণ ও হৃদয়ের হয়ে চলেছে ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতি; সুখের, ঋদ্ধির ও পরিপূর্ণতার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু লোভে ও টানে সে ক্রমবিকাশ এক দিন স্বতঃই বৃহত্তর জীবনের দুয়ারে তোমায় আমায় এনে ফেলবে। তখন আর সংসারের অসার ক্ষুদ্র সুখে, তুচ্ছ শক্তি ও জ্ঞানে, দুঃখমিশ্রিত ক্ষণিক আনন্দে আমাদের মন ভরবে না; তখন হবে সত্য সত্যই "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"। তখন জীবন-নদীতে জাগবে পরিপূর্ণ জোয়ার—কোন্ এক বিপুলতার সাগরসঙ্গমের দুরাশায়। এরই নাম মুমুক্ষুত্ব। এই মুক্তির ইচ্ছা যার জেগেছে, সেই যোগী। তার সে মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন উপকরণ আপনি এসে তার দ্বারস্থ হয়। কারণ, সে সত্যই পরম বস্তু খোঁজে। সে মুমুক্ষু যোগীকে যোগ সাধনার জন্যে টানতে হয় না, গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে সাধ্য সাধনা করতে হয় না; যেমন প্রজাপতি হবার জন্যে গুটিপোকাকে বোঝাতে হয় না, সে আপনি নির্জ্জন নিরাপদ স্থান খুঁজে বসে পড়ে নব কলেবর ধারণ করবার উদ্দেশ্যে।

স্বভাব-তার্কিক হয়তো নিছক বাকবিতণ্ডার খাতিরে বলবেন, তবে কি এত পূজার্চ্চনা, শাস্ত্র, মন্ত্র, বিগ্রহ, দেউল, উপদেশ ও গ্রন্থাদির কিছুই প্রয়োজন নাই?" প্রয়োজন আছে বই কি, সব রকম চেষ্টা ও উপকরণের কিছু না কিছু ফল আছেই; জীবমাত্রেই যেমন যে যার রুচি অনুযায়ী আহার খুঁজে নেয়, সাধনকামীও তাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ শাস্ত্রপাঠে, কেউ মন্ত্র বা নাম-জপে, কেউ বা আত্মনিগ্রহে লেগে যায়। এ সবের দ্বারা হয়তো দুর্দ্দম প্রকৃতি কিছু বশে আসে, আংশিক সংযম অভ্যাস হয়, অন্তর ঊর্দ্ধের দিকে উন্মুখ হয়; কিন্তু কেবল এ সব উপায়ে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ বা সত্য উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্র মন্ত্র বিগ্রহাদি তারই সত্য সত্যই কাজে লাগে, যার অন্তরে জেগেছে ভূমার ক্ষুধা, যার ঊর্দ্ধ্ব জীবনে জাগবার এসেছে সময়। সংসারে ধর্ম্মপুস্তক আছে বিস্তর, উপদেষ্টা আছে প্রচুর, পথ আছে বহু, যোগবলসম্পন্ন যোগীও বিরল নয়। তবে পরমার্থ লাভের পথ পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে সবার কাছে খোলে না কেন? গীতা উপনিষদ্ ও রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ পড়ে সবাই সহজে পথ পায় না কেন? এ পথ সবার জন্য নয় বলেই পথ সকলে পায় না, সকলের ঊর্দ্ধের বৃহত্তর চেতনায় জাগবার সময় হয় নাই বলেই তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে থেকেও জীবনে মহাপুরুষ সংস্পর্শ হয়েও সে রুদ্ধ সত্তায় তত্ত্ব স্ফুরণ হয় না। কিন্তু যার জাগে সত্তায় অখণ্ডের ডাক, তাকে জগতের কোন কিছুই বা কেউই নিরস্ত করে রাখতে পাবে না, পথ যাকে ডাকে সেই পায় পথ, ভূমা বা বৃহত্তর দীপ্ততর জীবন যাকে বরণ করে নেয়, সেই স্বতঃই ফুটে চলে অখণ্ডের ও অমৃতত্বের মাঝে।

আমার গুরুদেব বিষ্ণুভাস্কর লেলে বলতেন, "সাধক আছে দু'রকম —প্রবর্ত্তক ও প্রবাহপতিত। প্রবর্ত্তক তাকে বলি, যে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে চলে, তার শক্তি সামর্থ্য মত সে একটু একটু করে স্রোত ও জোয়ার কাটিয়ে এগোয়। প্রবাহপতিত কিন্তু তাকেই বলি, যে নিজের অহঙ্কারের বশে স্বচেষ্টায় সন্তরণ করে না, সে স্রোতের বা জোয়ারের টানে নিজেকে ছেড়ে দেয়, প্রবাহই তাকে হু হু করে টেনে নিয়ে চলে। ট্রেণ হুস্ হুস্ করে চলে যায় পথ অতিক্রম করে, তুমি থাক ট্রেণে চড়ে স্থির প্রতীক্ষায় বসে, এই আসে বর্দ্ধমান, চার-ছ' ঘণ্টা পর আসে আসানসোল, মধুপুর, দেওঘর, দুই-চার দিন পরে পৌঁছে যাও প্রয়াগ, আগ্রা, দিল্লী। অহঙ্কারাশ্রিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ কষ্টকর, নিরালম্ব বা সমর্পণ যোগে সেই সিদ্ধি আপনি আসে আপন ছন্দে।"

এই শ্রেষ্ঠ সুগম পন্থার নাম ভক্ত দেয় সমর্পণ-যোগ, জ্ঞানী একেই বলে সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থিতি—আমারই বৃহৎ স্বরূপের মাঝে আমার ক্ষুদ্র অহংসত্তার আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলয়। এই শ্রেষ্ঠ পথে এক দিন না এক দিন জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত আদি সকল প্রকার সাধককে আসতেই হবে। যে জপসাধনে রত, তারও এক দিন আসে জপ ফুরিয়ে গিয়ে অজপার অবস্থা—

"আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা
জপের ঘরে রইলো টাঙ্গা;

আর কিছু নাই মা শ্যামা
কেবল তোমার চরণ রাঙা।"

যে তর্কবাগীশ, সে খাঁটি তত্ত্বান্বেষী হলে কালে তারও যায় তর্ক থেমে; অনেক হাঁকপাঁকানীর পর অস্থির অহঙ্কারী মন বুদ্ধি তার বুঝে ফেলে নিজের দৌড়। ঠাকুরের সেই চিলের গল্প মনে পড়ে—চিলটি সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল। ইত্যবসরে তার অজ্ঞাতে জাহাজ পড়েছে অকূল সাগরে। জেগে উঠে ব্যস্ত হয়ে তখন সে উড়ে চললো পশ্চিমের দিকে হারাণ কূলের সন্ধানে। কোথাও তটরেখার সন্ধান না পেয়ে ফিরে এসে শ্রান্ত ডানা নিয়ে সে মাস্তুলে ক্ষণেক বিশ্রাম নিল। তার পর আবার গেল পূর্ব্ব দিকে উড়তে উড়তে; সে দিকেও কূল-কিনারা নাই। এই ভাবে চার দিকের অনুসন্ধান নিঃশেষ করে ব্যর্থ হয়ে সেই যে চিল এসে স্থির হয়ে বসলো, আর কোথায়ও গেল না।

"আপনাতে আপনি থেকো মন
যেও নাক কারু ঘরে।
যা চাবি তা পড়ে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন সে পরশ মণি
যা চাবি তা দিতে পারে
ওরে কত রত্ন পড়ে আছে
আমার চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।"

যত প্রয়াস ততই ব্যর্থতা যত নিশ্চল ও স্থির ততই প্রাপ্তি। কারণ, অস্থির দশায় তো আমি এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণের খাঁচায় পড়ি ধরা, দেহ প্রাণ মনোময় হয়ে যাই। কিন্তু স্থির উদাসীন অবস্থায় আমি কিন্তু দেহ মন ভুলে যাই, আমি পাই বৃহতের ও বিপুল পরম শান্তের মাঝে ছাড়া—অখণ্ডের মাঝে সহজ আশ্রয়।

নিমাই

শ্রীশান্তি পাল

রাত্রি গভীর তৃতীয় প্রহর একেলা বসিয়া ঘরে,
বাহিরে বাদল মাদল বাজায়ে কর্ণ বধির করে।
মাঝে মাঝে শুনি গ্রাম্য-কুকুর রহিয়া রহিয়া ডাকে,—
ভাঙিবারে চায় যেন সে বিজন রাতের স্তব্ধতাকে।
জোনাক-পোকারা ধক্ ধক্ জ্বলে কাননের বুক জুড়ে,
বাউরী বাতাসে ব্যাকুল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়ে।
মনে হেন লয় পিশাচেরা যেন গহন অন্ধকারে,
আগুনের কণা লোফালুফি ক'রে আকাশে ছুঁড়িয়া মারে।
ক্বচিৎ কখনো নিশাচর পাখী বনের আড়াল থেকে,
বিকট শবদে চীৎকার ক'রে বনান্তে গেল ডেকে।
সে ডাকের সাথে ভেসে আসে কা'র বুক-ফাটা ক্রন্দন,
"বাপ রে আমার নয়নের নিধি কোথা গেলি বাপধন।
এ সংসারে হায় একেলা ফেলিয়া কা'র কাছে থুয়ে গেলি,
সন্তান-হারা মায়ের দুঃখ দেখ্ রে নয়ন মেলি'।"

* * *

এ কি শুনি এ যে পরিচিত স্বর নিমায়ের মা সে হবে,
এত দিন পরে বুড়ির কপাল ভাঙিল কি বিধি তবে!
অমন ছেলে যে সারা গাঁও খুঁজে একটি দেখিনি আর,
অপরের বোঝা মাথায় করিতে জুড়ি যে ছিল না তার।
কোথায় কাহার চালে খড় নাই, অন্ন নাহিক ঘরে,
গরীব চাষী সে বস্ত্র বিহনে গামছা আঁটিয়া পরে;
কোথায় কাহার পুকুর ছেঁচিয়া শেওলা তুলিতে হবে,
খানা-খন্দর ভরাট করিলে মানুষ চলিবে তবে;
কোথায় কাহার বাঁশ-ঝাড় কেটে, মশা-মাছি সব মেরে,
বাড়ীর সমুখে বেড়-বাগানেরে বেড়া দিয়ে দেবে ঘেরে;
নিমায়ের ডাক পড়িত সেথায় সকল লোকের আগে,
আজিকে সারাটা গাঁয়ের মানুষ সেই কথা শুধু ভাবে।

* *

গাঁয়ের লোকেরা জুটিয়া সবাই নিমায়ের বাড়ী যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিল মা'য়;—
"দাও মা ছাড়িয়া সন্তানে তব শ্মশানে যে যেতে হবে,
রাত বেড়ে যায় মিছামিছি আর বাসি করিও না শবে।
নিমাই তোমার এ মর-জগতে খেলার ছলেতে এসে,
কাজের বোঝা সে চাপাইয়া ঘাড়ে গিয়াছে নূতন দেশে।
জনমের পরে মরণ রয়েছে অমর নহে ত কেহ,
জানিত সে মা গো ধূলায় মিশিবে এই নশ্বর দেহ।
কীর্ত্তি কেবল থাকে মা জগতে মৃত্যু নাহিক তার।"
জননী কহিল,—"ল'য়ে যাও তবে বাধা নাহি দিব আর।
সার্থক মোর জীবন আজিকে ধন্য আমি রে আজ,
দাঁড়াও ক্ষণেক সাজাইয়া দিই এনেছ কি ফুল-সাজ?
কে কোথা দেখেছে আমার মতন এমনি পুণ্যবতী,
সন্তান যার সেবার ব্রতয় মানে নাক' ক্ষয়-ক্ষতি।

দেশের সেবায় দশের সেবায় নিজেরে করিয়া দান,
শান্তির ক্রোড়ে ঘুমায় নিমাই, লভিতেছে বিশ্রাম!"

আধুনিক পারিবারিক আদর্শ

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রামায়ণে আদি কবি বাল্মীকি ভ্রাতৃপ্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক সমাজে তাহা একটা কাল্পনিক উপন্যাস বলিয়াই মনে হয়। সেই সময়কার সমাজের আদর্শ আজ আধুনিক সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়া ভারতীয় সমাজের উপর একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে। সেই বিজাতীয় আদর্শ ভারতের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের উপর যত ক্ষতি করিয়াছে তত ক্ষতি আর কিছুতেই করে নাই। এ দেশ এক সময়ে যে নীতি ধর্ম্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দিয়াছে। পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে যে অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা, গুরু-ভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, দানশীলতা, ত্যাগ ও সেবার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক সমাজে তাহা আজ আর নাই। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ভারতীয় ভাবধারাকে আহত নয় একেবারে নিহত করিয়া দিয়াছে।

রামায়ণে দেখা যায়, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে নিহত হইলে রামচন্দ্র যে বিলাপ করিয়াছিলেন—তাহাতে কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।"

ভার্য্যা এবং বন্ধু-বান্ধব সকল দেশেই পাওয়া যায় কিন্তু সহোদর ভ্রাতা আর পাওয়া যায় না। সেই বিলাপে রামচন্দ্রের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বহু আদর্শ পৌরাণিক উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

আর এই সভ্যতার যুগে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাসের উপসংহারে নায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—"সকলেই এ জগতে ভাইয়ের মত ব্যবহার করে, কেবল আপন ভাই করে না।"

বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কবি, ভাবুক ও মনস্তত্ত্ববিদ্। দুই জনে দুই দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবধানের যুগের সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; অথচ আদর্শের যে আলেখ্য তাঁহারা সমাজের চক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এক কথায় সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষিতে' যে সময়কার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও বহু বৎসর আগেকার সমাজের। সেই সময় পর্য্যন্তও কবি কেবল "আপন ভাই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে না" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যদি কোন মহাকবি আবার সমাজের আধুনিক আদর্শ লইয়া উপাখ্যান রচনা করেন, তবে তাঁহাকে আরো অধঃপতনের দিকে নামিয়া আসিতে হইবে; তাঁহাকে ততোধিক গভীর মর্ম্মান্তিক বেদনায় লিখিতে হইবে—"ভাই ভাইকে বঞ্চনা করিতে, সর্ব্বনাশ করিতে এমন কি স্বার্থের জন্য হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, শত্রুর নিকটও যে সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় আপন ভাইয়ের নিকট তাহা পাওয়া যায় না।" যুগধর্ম্ম আদর্শের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

সেই যুগে সমাজে পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এটা পত্নীপ্রেমের যুগ, এ যুগে পত্নীপ্রেম সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজে বনবাসী হইয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী সীতাদেবীকেও বনবাসে পাঠাইয়া কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। এ রকম উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভারতীয় সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, আজ তাহা লোপ পাইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক আগমনের ফলে এ দেশের সমাজে বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাব বিস্তার করে, তখন হইতেই ধীরে ধীরে সমাজে ভাঙ্গন ধরে, সংসারে আর একান্নবর্ত্তিতা কেহ পছন্দ করে না, বিবাহ করিয়াই এ দেশের যুবকেরা পাশ্চাত্ত্যদের মত পত্নীপ্রেমে এমন মজগুল হইয়া পড়ে যে, পিতামাতা ভাই-ভগিনী প্রভৃতিকে বোঝা-স্বরূপ মনে করিতে থাকে। এমন শোচনীয় ঘটনাও বিরল নহে—পিতা-মাতা বর্ত্তমান থাকিতেও ভাই ভাই পৃথক্ হইয়া যায়। অক্ষম বা উপার্জ্জনহীন ভাই থাকিলে, তাহাদের মানুষ হইবার পথও অনেক স্থলে রুদ্ধ হইয়া যায়। এ দেশে পাশ্চাত্ত্যদের মত প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হইতে সুযোগ পায় না, এক জনের উপার্জ্জনে বহু আত্মীয়-বান্ধব প্রতিপালিত হইত, ইহাই এ দেশের আদর্শ ছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহা অনেক স্থানেই হয় না।

এখন এই সভ্য যুগের সংসারে ভাই ভাইকে বঞ্চিত করিবার ফিকির-ফন্দীই খুঁজিয়া থাকে। এক পরিবারভুক্ত থাকিয়াও যাহাতে নিজের উপার্জ্জিত ধন-সম্পত্তির অংশ অন্য ভাই দাবী করিতে না পারে সে উদ্দেশে যথাসর্ব্বস্ব পত্নীর বেনামীতে রক্ষা করা হয়। আইনে স্ত্রী-ধনের উপর কাহারও দাবী-দাওয়া চলে না; আজকাল খুব উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এই বঞ্চনা-নীতি অনুসৃত হয়। এ দেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের মত উপার্জ্জন করে না, প্রকৃত স্ত্রী-ধন খুব কম নারীরই থাকে, কিন্তু আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিগণ সম্পত্তি, টাকা-কড়ি সব স্ত্রীর নামেই সঞ্চিত করিয়া রাখেন।

অনেকে ব্যবসায় বাণিজ্য কারবারাদি ব্যাপারও পত্নীর বেনামীতে চালাইয়া থাকেন, উহার পশ্চাতেও সেই একই বান্ধব-বঞ্চনানীতি লুক্কায়িত। বাঙ্গালার কোন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক অপর ভাইদিগকে উক্ত ব্যবসায়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা অজুহাত প্রদর্শন করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা চালাইয়াছিলেন। হাইকোর্টের শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে অপর ভাইদের জয় হইয়াছিল। সেই ব্যবসায়ে এখন সকলেই মালিক সাব্যস্ত হইয়াছেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মামলা মোকর্দ্দমা—খুন পর্য্যন্ত এখনকার প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। যে সমাজে ও সংসারে এক দিন "মায়ের পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই" নীতি বর্ত্তমান ছিল—আজ ঐক্য প্রীতি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" নীতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ভ্রাতৃপ্রেম আজ ভ্রাতৃবিচ্ছেদে পর্য্যবসিত। সংসারের ঐক্যবন্ধন আজ একেবারে শিথিল। পাশ্চাত্ত্যদের মত স্ত্রীসর্ব্বস্ব সংসার হইয়া উঠিয়াছে, পাঁচ জন আত্মীয়-স্বজন লইয়া সংসার করিতে সকলেই যেন অস্বস্তি বোধ করে। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন সংসারে পোষ্য, তাহারা হয় কৃপাকাঙ্ক্ষী অথবা অসহায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর সংসার আর আজকার সংসারে কত পার্থক্য ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে আধুনিক সংসারের আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—

"শুন হে মানুষ ভাই—
সবার উপরে পত্নী সত্য তাহার উপরে নাই।"

সত্যশিবের বিয়ে ও বৌ

জগদীশ গুপ্ত

আণুবীক্ষণিক বীজ হইতে বনস্পতির উদ্ভব—এ তুলনাটা সুশীলাসুন্দরীর কাজের সঙ্গে খাটে না। বৃন্তচ্যুত ফলের বৃক্ষ হইতে মৃত্তিকায় পতনের সূত্রে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার—এই তুলনাটা কিছু খাটে। মাধ্যাকর্ষণের, অর্থাৎ দুইটি পদার্থ বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং দূরত্বের বর্গবিপর্য্যয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই তথ্যের সন্ধানলাভের ফলে বিজ্ঞানজগতে ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল। এ প্রাচীন কথা সবাই জানে; কিন্তু সবাই জানে না যে, আরাম পাওয়ার উপায় দৈবাৎ আবিষ্কার করার আগে সুশীলাসুন্দরীর সংবিতে এবং পরে তাঁর সংসারে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, ইহা আধুনিকতম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

সুশীলাসুন্দরীর একটি পুত্র, একটি কন্যা, অর্থাৎ কয়েকটি সন্তান কালগ্রাসে পড়ার পর ঐ দু'টি এখন বর্ত্তমান; সুতরাং উহারা প্রাণাধিক প্রিয়।

ছেলে সত্যশিবের বয়স তেরো; ইস্কুলে পড়ে।

মেয়ে কিরণের বয়স পনর চলিতেছে—ইস্কুলে পড়ে না। কীর্ণাহারের সন্তোষ বাবুর পুত্র শৈলেশ্বরের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে—খুব হৃদ্যভাবেই চলিতেছে। সন্তোষ বাবু নির্লোভ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। বি-এ পড়া ছেলের পিতা হইয়াও তিনি পণ এবং বরাভরণ সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহ যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কিরণের বাবা রাখাল ভট্টাচার্য্য সেই কারণে খুব অবাক্ হইয়া থাকেন, এবং গল্প আর প্রশংসা করিয়া অনেককেই খুব অবাক্ করিয়া দিতেছেন। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ে, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে নিংড়াইয়া কে বেশী আদায় করিতে পারে ইহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সন্তোষ বাবু অলৌকিক সংযম প্রদর্শন করিয়াছেন—রাখাল ভট্টাচার্য্যের বিশ্বাস তা-ই। চারি শত টাকা নগদ, আর সোনা মাত্র দশ ভরি; আর কিছু না। রাখাল বাবুর হিসাবে কিরণের বিবাহে যৌতুকের বরাদ্দ ছিল 'সর্ব্বসাকল্যে' ইহার চতুর্গুণ। সুতরাং রাখাল বাবু গদগদ হইয়া আছেন—সুশীলাসুন্দরী গদগদ হইয়া আছেন; কিরণও গদগদ হইয়া আছে, কিন্তু তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, ইঁহাদের ছেলে পছন্দ হইয়াছে; সুতরাং এ-বিবাহ হইবে; দিন-স্থির করিতে রাখাল ভট্টাচার্য্য সন্তোষ বাবুকে বিনম্র পত্র দিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে বিপ্লবজনক আবিষ্কারের কথা বলিয়াছি তাহা এখনকার।

স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী যতই হউন, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর যত গভীরই হোক্, গৃহকর্ম্মের চক্রে বাঁধা পড়িয়া তাঁর মৌলিক চিন্তার অবসরই থাকে না, যেমন নিম্নের মৃত্তিকা আর সম্মুখের বেড়া ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলে না ঘানির বলদের। বিশেষ করিয়া সুশীলাসুন্দরীর সম্বন্ধে এই তত্ত্বটি নির্ভেজাল সত্য; তিনি ভাবেন অনেক, কিন্তু তা' কেবল স্থূল ঘরের কথা; আরাম যে কত প্রকারের হইতে পারে তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁর মাথায় আসে নাই···আসিয়া গেল দৈবাৎ এক দিন যখন কন্যা কিরণের এ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিগৃহে যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

সুশীলাসুন্দরীর কাজ অনেক, অফুরন্ত, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয় খুব; এবং দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ না শুইয়া পারেন না—শুইলে তাঁর 'হাড়ের ব্যথার' লাঘব হয়।

সেদিন শনিবার। সত্যশিব ইস্কুলে গিয়াছে। সুশীলাসুন্দরী বালিশটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন; অল্প শীতের দরুণ একখানা চাদর কেবল গায়ে দিয়াছেন; পা ঢাকিলে পা জ্বালা করে বলিয়া পা খোলাই আছে। তাঁর পায়ের কাছে প্রচুর স্থান আছে, এবং জানালা দিয়া প্রচুর আলো আসিতেছে বলিয়া কিরণ তার 'সেলাই' লইয়া সেখানেই বসিয়া গিয়াছে···

বসার কিছু পরেই ঘটিল এক দৈব ঘটনা—বিপ্লবজনক সেই আবিষ্কার। সীবন প্রয়োজনে কিরণের হাত এ-দিক্ ও-দিক্ ওঠা-নামা করিতে করিতে হঠাৎ একবার ঠেকিয়া গেল তার মায়ের পায়ের তলার সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে সুশীলাসুন্দরী অনুভব করিলেন, ভারী সুন্দর অব্যক্ত একটু আরাম—

বলিলেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে ত, মা।

সেলাই রাখিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া কিরণ দিত না, যদি এই অনুরোধ আর কিছু দিন পূর্ব্বে আসিত; কিন্তু শীঘ্রই সে বাপ-মাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং সেই বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া মা দুধের সর আর মাছের বড় পেটিটা সত্যকে না দিয়া তাহাকেই দিতেছেন···

কিরণ নিমক্‌হারামি করিল না, সেলাই সরাইয়া রাখিয়া সে মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল···সুশীলাসুন্দরীর আরামের অন্ত রহিল না। কিন্তু শুষ্ক পায়ের সঙ্গে শুষ্ক হস্তের ঘর্ষণে শীঘ্রই একটি তেজ উৎপন্ন হইল—

সুশীলা বলিলেন,—জ্বালা করছে বড়ো, হাতে একটু তেল দিয়ে নে।

কিরণ হাত তৈলাক্ত করিয়া আনিল—

তৈলাক্ত হাত পায়ে বুলাইতে শুরু করিলে সুশীলাসুন্দরীর আরামের আরো অন্ত রহিল না।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে এমন সুন্দর আরাম পাওয়া যায়, এ কথা তিনি আগে ভাবেন নাই! আশ্চর্য্য কিন্তু! প্রত্যহই তিনি এই ভাবে আরাম গ্রহণ করিবেন।···ভাবিতে ভাবিতে সুশীলাসুন্দরীর চিন্তা-মৃত্তিকার সরসতায় ফুলের কুঁড়ির মতো বিস্তার লাভ করিতে লাগিল···মেয়ের যত দিন বিবাহ না হইতেছে তত দিন সে তাঁর এই রকম সেবা-পরিচর্য্যা করিবে, কিন্তু তার পর? তার পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলেই নিশ্চিন্ত—কীর্ণাহারে যাইয়া মেয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মাখাইতে থাকিবে। কন্যার অভাব তখন পূরণ করিবে কে? আরামে বিঘ্ন ঘটিবে মনে হইয়া সুশীলাসুন্দরী তখনই কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন।···কন্যার স্থান গ্রহণ করিতে পারে পুত্রবধূ। সত্যশিবের বিবাহ দিলে কেমন হয়?

বোঁটার ফল মাটিতে পড়িল—আবিষ্কৃত হইল মাধ্যাকর্ষণ; কিরণের হাত পায়ে ঠেকিল সুশীলাসুন্দরীর—আর তাঁর মাথায় আসিল পুত্রবধূ আনয়নের সুবৃহৎ চিন্তা।

তার পর তাঁর মূল চিন্তার সহিত শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইতে লাগিল।

মানুষ এই আছে এই নাই। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দু বৈ ত নয়! পাতা একটু কাত হইলেই বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যাইবে। সেদিন মহেশ মোড়ল মাঠ হইতে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে ঠাস্ হইয়া নীচে পড়িয়া গেল—বাড়ীর লোক দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, মহেশ মরিয়া গেছে। এই ত জীবন! হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ জীবনের মূল্য কি? তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? পরে করা হইবে বলিয়া সাধ-আহ্লাদের কোনো কাজ অনিশ্চিত কালের জন্য মুলতুবী রাখা বুদ্ধির কাজ কি?

ভাবিতে ভাবিতে এখানকারই অপরাজিতার মতো রূপবতী আর অমনি ছোট্ট একটি মেয়েকে বধূ করিয়া আনিতে তাঁর এমন দুর্জ্জয় লালসা জন্মিল যে, তখনই, শুইয়া শুইয়াই, তিনি যেন যাবতীয় প্রতিকূল উক্তির সম্মুখে উগ্র, আর, যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন···

অমনি একটি মেয়েকে যদি বউ করা যায়, তবে জীবন সফল হয়। বিবাহ দিতেই হইবে সংকল্প করিয়া সুশীলাসুন্দরী কিরণের আরামপ্রদ হাতের ভিতর হইতে পা টানিয়া লইয়া একেবারে উঠিয়া বসিলেন।

কিরণ বলিল,—মা, উঠ্‌লে যে? এখনো বেলা আছে।

সুশীলা বলিলেন,—সতে'র বিয়ে দেব।

কিরণ সীবননিপুণা হইলেও, এবং আধুনিক বই খানকতক তার পড়া থাকিলেও, একেবারে সেকেলে ধরণ তার—বিশেষ অবাক্ হইলে চট করিয়া সে গালে হাত দেয়। অত্যাশ্চর্য্য কথা হঠাৎ শোনা এ বাড়ীর কিরণের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ যে বেজায় আশ্চর্য্য! কিরণ বিশেষ অবাক্ হইয়া চট্ করিয়া গালে হাত দিল; বলিল,—ও মা. সে কি কথা!

—হ্যাঁ, দেব। আমি মরব' চিরকাল খেটে খেটে উপায় থাক্‌তে? টুক্‌টুকে বউ আন্‌ব; বাড়ীর ভেতর লক্ষ্মীঠাক্‌রুণটির মতো থাক্‌বে, জল্‌জল করবে—পায়ে পায়ে ঘুরবে আটপহর—দেখে চোখ জুড়োবে। আমি শুয়ে থাক্‌ব—পায়ে সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমাকে মা বলে ডাক্‌বে, ওঁকে বল্‌বে বাবা।—বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বধূর এই মধুর আহ্বানের অপরিমেয় উল্লাসে সুশীলাসুন্দরী এমন বিগলিত হইয়া গেলেন, যেন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—বাবা দিলে ত!

—দেবে, ঘাড় হেঁট করে' দেবে; না দিলে আমি বুঝি তাকে সোয়াস্তি দেব ভেবেছিস্?

শুনিয়া কিরণ বিশেষ অবাক্ হইয়া আবার গালে হাত দিল, আর হাসিতে লাগিল।

বই হাতে করিয়া সত্যশিব আসিয়া উপস্থিত হইল। শনিবারে 'হাফ ইস্কুল' হয়; সত্য সকাল সকাল ফিরিবে বলিয়া সুশীলাসুন্দরী বিশ্রাম করিতে আজ কোঠায় ওঠেন নাই; বৈঠকখানার বাহির-দরজার খিল দেন নাই—বইয়ের 'বোঝা' নামাইতে বিলম্ব হইলে সত্যশিবের রাগ হয়। পড়িয়া না হোক্, পথশ্রমে সত্যশিবের মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছিল; সুশীলাসুন্দরী তার হাত হইতে বই লইয়া আলমারির মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; তাহার মুখের ঘাম আঁচলে করিয়া মুছিয়া দিতে দিতে কষ্টানুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ইস্কুল হয়েছে এক ইয়ে, দেশছাড়া জায়গায়। কাছে-পিঠে করলে ওদের কি হ'ত। তুই বাড়ীতে পড়িস্, সত্য; ইস্কুলে তোকে যেতে হবে না। ইস্কুলে যেতে-আস্‌তেই যদি ছেলে পুড়ে শেষ হয়, তবে সে ইস্কুলে মানুষ আবার ছেলে পাঠায়!

সত্য বলিল,—বাবার সখ, আমার মরণ।

কিরণবালা সেলাই করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—সতে', তোর বিয়ে।

—কবে?

শুনিয়া কিরণ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল; সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। অবাক্ হওয়ার আর হাসির কারণ ছিল বই কি! সত্য ত' বয়ঃক্রম হিসাবে যোগ্য হয় নাই; কিন্তু তার প্রশ্ন শুনিয়া মনে হইল, নিজেকে সে উপযুক্ত মনে করে বলিয়াই ঐ সরল প্রশ্ন করিতে পারিয়াছে—যেন সে বলিতে চায়, এত দিনে হুঁশ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

কিরণ বলিল,—বেহায়া ছেলে। জিজ্ঞাসা কচ্ছে, কবে?

—কি এমন অন্যায় করেছি? তোরও ত' বিয়ে হবে—নিয়ে যাবে চ্যাংদোলা করে। আমার বেলাতেই বুঝি বেহায়াপনা হ'ল। নিজের বিয়ের কথা তুই কেমন কাণ পেতে শুনিস্ তা' বুঝি আমি দেখিনি? নিজের ইয়েটুকু দিদি বেশ বোঝে।···বলিয়া সত্যশিব যুগপৎ আহত প্রবীণ ভাব ধারণ করত জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—অতটুকু ছেলের বজ্জাতি, কম নয়।

সত্য এ-কথারও জবাব দিল, বলিল,—মা, আমি কিছু বলেছি? তুই-ই ত' বল্‌লি আমার বিয়ের কথা। আমি বলতে গিয়েছিলাম, না, শুধিয়েছিলাম? না বললেই পারতিস্? বললেই শুনতে হবে।

পুত্র ও কন্যার কলহে জননী কৌতুকানন্দ অনুভব করিতেছিলেন; হাসিয়া বলিলেন,—গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল—তা-ই হয়েছে তোদের! আসুক তোদের বাবা—

কিন্তু সত্যশিব বাপের মতামতের অপেক্ষায় দেরি করিতে পারিল না; বলিল,—আমি বিয়ে করব' না, মা, এখন। দিদির বিয়ে হ'য়ে যা'ক্ তার পর করব'।

—কেন রে?

সত্য বলিল—"বউয়ের সঙ্গে ত ঝগড়া করবে কেবল।

কল্পিত দোষারোপে ক্রুদ্ধ হইয়া কিরণ কি যেন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু কিছুই তার বলা হইল না—জননীর তুমুল হাসির উত্তাল উতরোলের নিম্নে সে সহসা চাপা পড়িয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরীর এই প্রবল হাসি, বাপের জামা-জুতা-পরা ছেলের মতো অবুহতের সুবৃহৎ রূপ দেখিয়া নয়—বধূ একেবারে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে; বধূ-ননদের সনাতন কলহের চিত্র; যাহা ভাবিতে মধুর কিন্তু ভোগে অমধুর তাহাই রসে ঢল ঢল পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ছেলে আর মেয়ের কথায়—অর্থাৎ তিনি নিজেই গোঁপে তেল দিয়াছেন, কাঁটাল কিন্তু গাছে!

সত্যশিব হাত-পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছিল—

হাসির বেগ থামিলে সুশীলাসুন্দরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—আমি থাকতে? আয়, তোকে খাবার দিইগে।—বলিয়া বিবাহে সম্প্রতি অনিচ্ছুক সত্যশিবকে লইয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রাখাল বাবু কাজ করেন 'সাব পোষ্টাফিসে' দশটা-পাঁচটা ডিউটি। এখন কেবল তিনটে পঞ্চাশ—তাঁর ফিরিতে দেরী আছে···

সুশীলাসুন্দরী মনে মনে ছটফট্ করিতে লাগিলেন।

কিরণের হাত দৈবাৎ পায়ে ঠেকিয়া যাওয়ায়, ঐ সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া, ছোট্ট রাঙা একটি বউ আনিবার কথা তাঁর মনে আসিয়াছে; কিন্তু আসিয়া সে বসিয়া নাই—প্রাণপণে কাজ করিতেছে। স্বামী, অর্থাৎ তথাকথিত মালিক যিনি তিনি, কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানা নাই—সুশীলাসুন্দরী তা' যত শীঘ্র সম্ভব জানিতে চান্; এবং তদনুযায়ী যে সমুদয় কথা যথাযোগ্য মেজাজের উপর বলিতে হইবে, তাহাও যত শীঘ্র সম্ভব তিনি বলিয়া শেষ করিয়া ফেলিতে চান্।

সত্যের বিবাহ দিলেই সুখের গঙ্গা যে কলনাদে ছুটিয়া আসিবে, এ বিষয়ে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ লোকটিকে বিশ্বাস নাই; কথা বুঝিবে না, অথচ মনে করিবে, বুঝিয়াই সব বলিতেছি। অখণ্ডনীয় কর্তৃত্ব তাঁরই, অর্থাৎ ঘোড়ার লাগামটি তিনিই হাতে করিয়া বসিয়া আছেন; যান আর আরোহী খানায় পড়িয়া খুন হউক, চুরমার হউক, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি করিতে চান কেবল বিবেচনা।···এমন যাঁরা লোকের সঙ্গে অত বড়ো একটা কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ যখন শাণিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যদি সুশীলাসুন্দরী স্বামীর পথ চাহিয়া ছটফট্ করিতে থাকেন তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যশিব আহারান্তে মার্ব্বেল লইয়া বাহির হইয়া গেল। কিরণবালা 'কাপড় কাচিতে' নামিল। তাহার পর সে চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিবে। বেলাবেলি প্রস্তুত না হইলে প্রদোষান্ধকারে দর্পণের ভিতর মুখচ্ছবি স্পষ্ট ফোটে না বলিয়া টিপ পরিতে অসুবিধা হয়।

সুশীলাসুন্দরী নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ পড়িয়া রহিল একজোড়া জুতার শব্দের উপর। কূপের ভিতর দড়ি-বালতি নামাইতে নামাইতে সুশীলাসুন্দরী একটা খট্‌খট্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া দড়ি নামানো বন্ধ করিলেন—

কিন্তু কে যেন রাস্তায় বলিয়া উঠিল,—ধ. ধর., বাছুরটা পালিয়ে গেল।

সুশীলাসুন্দরী অসন্তুষ্ট হইয়া দড়ি নামাইতে লাগিলেন; জলে ভরিয়া বাল্‌তি তুলিলেন—টাট্‌কা-তোলা ঠাণ্ডা জলে রাখাল বাবু মুখ ধুইতে ভালবাসেন—তা-ই ঘটিতে করিয়া সেই জল বারান্দায় রাখিয়া দিলেন।

কিন্তু এবার বাছুর নয়, জুতার শব্দ করিতে করিতে রাখাল বাবু আসিয়া পড়িলেন—ঝরঝরে' হাসিমুখে তিনি প্রবেশ করিলেন··· জামা গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারে বসিলেন—

কিরণবালা তাঁহাকে পাখার বাতাস সেবন করাইতে লাগিল···

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—ঘেমেছ বড্ডো।

—যা' গরম। বলিয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—কিরণ, মা, পাখা রেখে এক কল্‌কে তামাক খাওয়াও। অপিসে বিড়ি খেয়ে খেয়ে তেতো হ'য়ে গেছি।

কিরণ পাখা রাখিয়া তামাক সাজিতে বসিল; সুশীলাসুন্দরী পাখা তুলিয়া লইয়া নিজেকে বাতাস করিবার ছলে স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিতে করিতে তিনি ঘুরিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—নিজেকে···

হাওয়া খাইতে খাইতে রাখাল বাবু আরামের একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আঃ···

সুশীলাসুন্দরী হুবহু প্রতিধ্বনির মতো নিষ্কপটে বলিলেন,—গা-টা এতক্ষণে জুড়লো?

—হ্যাঁ। বলিয়া রাখাল বাবু হুঁকা লইতে কিরণবালার দিকে হাত বাড়াইলেন, আর, সুশীলাসুন্দরী হাসিলেন—যে হাসির দ্বারা পুরুষকে ত্বরিতে আত্মবিস্মৃত করা যায় তেমনি একটু হাসিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—তোমাকে আমি অবাক্ করে দেব।

কিরণবালার হাত হইতে হুঁকা লইয়া রাখাল বাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কি বরাত? কি রকম?

—হ্যাঁ, সতের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

শুনিয়া বুকে যেন অতর্কিতে তীর বিঁধিয়া রাখাল বাবু তাঁর চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

—একেবারে ঠিক?—প্রশ্ন করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বাক্‌পটু রাখাল বাবু জীবনে আজ প্রথম হতবাক্ হইয়া রহিলেন মনে রহিল না যে তিনি তৃষ্ণার্ত্ত।

সুশীলাসুন্দরী সেই অবসরে তার আরজি পেশ করিতে লাগিলেন;—তা-ই ইচ্ছে করেছি। আমার বুঝি সাধ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না! মানুষের কথা ত বলা যায় না; কবে আছি কবে নেই। কবে মরে-ধরে যাবো—বউটিকে দেখে যাই।

মরার কথাই চূড়ান্ত কথা।

চিরকাল দেখা যাইতেছে, রাখাল বাবুর স্ত্রীই অগ্রগণ্যা, আত্মসুখ নহে। স্ত্রীর বিষণ্ণতাই তাঁর কিশোর বয়স হইতে একেবারেই সহ্য হয় না—পাগলের মতো কারণ খুঁজিয়া বেড়ান। স্ত্রীর হতাশা আরো কঠিন কথা—মরার কথা ত বজ্রতুল্য। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—মরার কথা বলো না, ওতে আমার কতো কষ্ট হয় তা কি জানো না? তুমি মরে গেলে আমার রইলো কে? আমার দশাটা তখন কি হবে? ভিজিঘিজি ব্যাপার চার দিকেই, একা আমি সামলাবো কেমন করে! তুমি রয়েছ বলেই আমি এক দিকে নিশ্চিন্ত। না, না, মরার কথা মুখেও এনো না। শতবর্ষ তোমার পরমায়ু। দৈবজ্ঞ বলেছেন, আমিও বলি।—বলিয়া সেই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং সহায়তালাভের আনন্দে রাখাল বাবু বিহ্বল হইয়া রহিলেন···তার পর বলিলেন,—তা' বেশ।

মনে হইল, স্বামী এক কথাতেই রাজী হইয়াছেন—সত্যশিবের বিবাহ দিতে তাঁর আপত্তি অনিচ্ছা একটুও নাই। কিন্তু স্বামীর স্ত্রী হিসাবে না হোক্, নিজের পক্ষেরই সুচতুর উকিল হিসাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে যে বিধান আছে তদনুসারে, সুশীলাসুন্দরীর,

কর্ত্তব্য, অত বড়ো কথাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিবিষয়ক একটা অকাট্য শপথ আদায় করিয়া লওয়া—

বলিলেন,—তোমার বিয়েও ত প্রায় ঐ বয়সেই হয়েছিল; মনে নাই?

—মনে আবার নাই?—মনে রাখাল বাবুর ছিল, আছে এবং থাকে; সেই দিন হইতে পত্নীলাভের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনি তাঁর ভাগ্যবিধাতাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আসিতেছেন; আর, সেই বয়সেই বিবাহিতা পত্নী যখন দিবারাত্র সম্মুখেই দেদীপ্যমানা, তখন প্রাপ্তির সেই শুভদিনটিকে স্মরণ না রাখিয়া উপায় কি?

ভাবাকুল কণ্ঠে রাখাল বাবু বলিলেন,—মনে আবার নাই! তা আবার জিজ্ঞাসা করছ!

রাখাল বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি যেন স্ত্রীকে এই উপলক্ষে "অয়ি নিষ্ঠুরে" বলিয়া সম্বোধন করিতে চান্।

তার পর একটু থামিয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—আমি বলিনি যে, তোমায় পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি! "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—এ-কথা একশো বার সত্যি। তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছি বলেই ত' কুপিত শনি কিছু করে' উঠতে পারছেন না—লক্ষ্মীর তেজে তিনি পিছিয়ে আছেন। বলিনি?—বলিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীর জোরে শনির সঙ্গে সংগ্রামে জিতিয়া গেছেন মনে করিয়া রাখাল বাবু সুখে হাস্য করিতে লাগিলেন।

"স্ত্রীরত্নং" তিনি, এই ঘোষণায় সুশীলাসুন্দরী সন্তুষ্ট হইলেন। "দুষ্কুলাদপি" শব্দের অর্থ তাঁর জানা ছিল না; সুতরাং বলিলেন,—বলেছ। কিন্তু তা' আর আমি শুনতে চাইনে। আমি বল্‌ছি, সত্যে'র বিয়ের কথা। ষেটের বাছা ত' তেরো বছরের হ'ল। বলিয়া সুশীলাসুন্দরী এমন করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন, যেন অবোধ ব্যক্তিকে তিনি শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

রাখাল বাবু হুঁকা কিরণবালার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,—কিন্তু মুশকিল কি জানো, অতটুকু মেয়ে তুমি কোথায় পাবে? ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া নেই আজকাল।

অবোধ ব্যক্তিকে শায়েস্তা করিবার ইচ্ছা সুশীলাসুন্দরী আপাতত: [illegible] করিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন,—এই ত' উল্‌টো গাইছ। [illegible]-পঞ্চগুলা ছোট মেয়ে কে চাইছে তোমার কাছে? আট-নয় দশ এগারো কি ছোট হ'ল?

কিরণবালা লজ্জিতা হইয়া তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এ বড় গুরুতর সমস্যা—সুশীলাসুন্দরী যাহাকে ছোট বলিয়া স্বীকার করিতে চান্ না, রাখাল বাবুর তাহাকে মনে হয় ছোট। কিন্তু দুর্নীতি আর দারিদ্র্যের মতো দ্বন্দ্বকেও রাখাল বাবু ভয় করেন; বলিলেন,—তা' নয়; তবে লোকের কি মত হয়েছে আজকাল—এই ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলোকে বলে কুমারী…

বলিতে বলিতে রাখাল বাবু কিরণবালার নিকট হইতে হুঁকাটা আবার চাহিয়া লইলেন; বলিতে লাগিলেন,—"বলে কুমারী আর খুকু। কলকাতায় দেখে এলেম সেদিন, তাদের বড়ো হ'তে কিছু বাকি নেই—অথচ বিয়ে হয়নি।—বলিয়া কলিকাতার ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলো কত বড়ো, হাত উত্তোলিত করিয়া তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি কলিকার আগুন খানিকটা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন—

—ও মা, গায়ে পড়েনি ত?—সুশীলাসুন্দরী শঙ্কান্বিত প্রশ্ন করিলেন।

রাখাল বাবু বলিলেন,—না; মাটিতে পড়েছে।

—আচ্ছা, জলটল খাও। হবে এখন কথা।

'জলখাবার' খাইতে খাইতে রাখাল বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যে' গেছে কোথায়?

—খেল্‌তে বেরিয়েছে। সে ত' রেগে' খুন।

—কারণ?

—কিরণ শ্বশুরঘরে না গেলে সে বিয়ে করবে না।

—কেন?

—বলে, দিদি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

শুনিয়া রাখাল বাবু 'জলখাবার' অর্থাৎ মুড়ির গ্রাস তাড়াতাড়ি ঢোক্ গিলিয়া নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আসনের উপর হইতে প্রায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়া গেলেন…তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—আমার ছেলে ত'! খাঁটি বামুনের রক্ত নেংড়ানো সেরা ছেলে; বুদ্ধি ওর রগে রগে। তা-ই বললে বুঝি?

জননীকে বাদ দিয়া জনকের বুদ্ধির ধার ছেলে পাইয়াছে, এই অন্যায় উল্লাসে স্বামী আত্মহারা হওয়ায় সুশীলাসুন্দরী বিরক্ত হইলেন; বলিলেন,—শুন্‌লেই ত'! এক কথাই বার বার শুন্‌তে চাওয়া কি?

কুঁদুলী বলায় কিরণেরও রাগ হইয়াছিল; ভ্রূভঙ্গি করিয়া সে বলিল,—ওই রকম!

রাখাল বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি মেয়ে খুঁজতে লাগ[illegible] দুই বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দেয়া যাক্। তোমার [illegible] আ[illegible] চিরকাল পালন করে' এসেছি—ধর্ম্মপত্নীর মর্য্যাদা রেখেছি প্রাণপ—এবারও রাখব। খরচেরও সাশ্রয় কিছু হবে।—বলিয়া জলযোগ সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন।

—রাখাল ভট্টাচার্য্য কাজ করেন সাব-অফিসে; আর, কাজ করেন ব্রাঞ্চ অফিসে। সঞ্জীবের একটি মেয়ে আছে বিবাহ দিবার জন্য, অর্থাৎ তাহাকে বিদায় করিবার উৎসুক নয়, অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। পিতা পুত্রীকে আপদ করিয়া তাড়াইতে চান্, কথাটা শুনিতে বড়ো অকরুণ; কিন্তু নেহাত নাচার হইলে অকরুণ কথা উচ্চারণ এবং অকরুণ কাজ সম্পাদন করিতেই হয়। সঞ্জীব তা-ই উদ্যোগী হইয়াছেন। মন্দাকিনী সঞ্জীবের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা—দেখিতে সুশ্রী কিন্তু কলহপ্রিয়া। প্রথমা স্ত্রী ঐ কন্যাটি দিয়া গিয়াছেন, আর রাখিয়া গিয়াছেন পিত্রালয় হইতে সংগৃহীত দুই শত টাকা এবং তিন দফা অলঙ্কার; স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়া গেছেন যে, ঐ টাকা আর অলঙ্কার মন্দার বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ব্যয় করিবেন না। সুতরাং কিছু মূলধন সঞ্জীবের হাতে আছে।

কিন্তু মূলধন হাতে থাকাই বড়ো কথা নয়, বড়ো হইয়া উঠিয়াছে এই কথাটাই যে, সৎমা মন্দাকিনীর সঙ্গে আর পারিয়া উঠিতেছে না—মন্দাকিনী হামেশাই তাঁকে চোখের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া দিতেছে—সঞ্জীব নিজেও থই পাইতেছেন না। সৎমা

কথাটাই এমন যে শুনিলেই মনে হয়, সে পূর্ব্বপক্ষের সন্তানগুলিকে যন্ত্রণা দিতেই আসে এবং লোকে মনে করে, বাপটাও যায় বউয়ের পক্ষে—সন্তানগুলিকে দেয় ভাসাইয়া।

সুতরাং সঞ্জীব সান্যাল বিপন্ন, সন্দেহ নাই এবং অতিষ্ঠ হইয়া মেয়ের বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছেন—এমন কি, মাঝে মাঝে সশব্দে প্রকাশও করিতেছেন···

ধর্ম্মপত্নীর অলঙ্ঘনীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, অর্থাৎ পুত্র সত্যশিবের জন্য একটি কনে' তাঁর চাই, রাখাল বাবুও তাহা যথেষ্ট ব্যাপক ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন; কেহ অবাক্ হইয়াছে, কেহ বিদ্রূপ করিয়াছে, কেহ নিষেধ করিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর পাশে সে-সব লোক তুচ্ছ; রাখাল বাবু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

দেখুন একবার কার্য্যকারণ, আর যোগাযোগের ব্যাপারটা।

গঙ্গাধর বাগদী 'রাণার'। বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বাজাইয়া প্রত্যহ সে সাব-অফিস হইতে ডাকের ব্যাগ লইয়া ব্রাঞ্চ-অফিসে যায়। এই গঙ্গাধর বাগদী করিল ঘটকের কাজ, অবশ্য গল্পচ্ছলে; সাব-অফিসে সে গল্প করিল যে, ব্রাঞ্চ-অফিসের সঞ্জীব বাবু মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজিতেছেন—মেয়ের বয়স মাত্র দশ; আর, ব্রাঞ্চ-অফিসে সে গল্প করিল, সাব-অফিসের রাখাল বাবু পুত্রের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন—ছেলের বয়স মাত্র তেরো।

ইহার পর পালা জমিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না, উভয় পক্ষই লালায়িত—গঙ্গাধর কথার বাহক হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—কেমন হবে বলো দেখি?—আনন্দে তাঁর গলা ধরিয়া আসিল।

রাখাল বাবু বলিলেন,—লক্ষ্মীনারায়ণ···

—শিব আর সতী।—ঐ তুলনা দেওয়ায় স্বামীর উপর, অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের উপর 'টেক্কা দেওয়া' হইয়াছে মনে করিয়া সুশীলা-সুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—কিরণ যাবে ভেবেই আমার বুক হু-হু করছে দিন-রাত; খাওয়া ঘুম আমার এক রকম নেই। বউমাকে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও চিরদিনের তরে ঘরে ফিরে পাবো। আমার যে কি করতে ইচ্ছে হচ্ছে তা' আমি জানিনে।—

রাখাল বাবু বলিলেন,—খুবই আনন্দের কথা বটে, কিন্তু মেয়ে-পক্ষ টাকাকড়ি তেমন খরচ করবে না। জানি ত! অবস্থা ভালো নয়; করতে পারেই না। ছোট ছোট বর-কনে'র খরচও কম কম। কিরণের বিয়ের খরচ বলে' তোমার মামারা কিছু কিছু দিতে চেয়েছেন বটে; কিন্তু আমারও খরচ হবে মেলা। সঞ্জীবকে কি জবাব দেব? তোমার কি মত?

শুনিয়া সুশীলাসুন্দরীর মুখ দিয়া উত্তাপ নির্গত হইল; বলিলেন,—এই ন্যাকামি শুরু হ'ল! আমার মত আমি লুকিয়ে রেখেছি না কি যে টেনে' বার করতে চাইছ? মেয়ে দেখতে যাবার দিন ঠিক করে চিঠি লিখে দাও।

সত্য মায়ের কানে কানে বলিল,—মেয়ের রং কালো হ'লে কিন্তু আমি পছন্দ করবো না!

—কি বলছে?—রাখাল বাবু সোৎসুকে জানিতে চাহিলেন।

—কালো মেয়ে পছন্দ করবে না। তা' তোকে করতে হবে না। গঙ্গাধর বলেছে, মেয়ে পরমা সুন্দরী।—বলিয়া সুশীলাসুন্দরী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রাখাল বাবু বলিলেন,—সুন্দর রুচির জন্য আমাদের বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ। আমার বিয়ের সময় তোমাকে কত বার দেখা হয়েছিল মনে আছে?—বলিয়া রাখাল বাবু তখনকার কর্ত্তা ব্যক্তিদের সুরুচি আর নির্ব্বাচন-শক্তি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার আনন্দে গা দোলাইতে লাগিলেন।

নাক তুলিয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—তা' আবার নেই। জ্বালিয়ে তুলেছিল। বড় মামা ত' রেগে' লাল।

শুনিয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—আমার মা-ও খুব সুন্দরী ছিলেন; ঠাকুমার নাম ছিল তিলোত্তমা; রূপেও তা-ই ছিলেন। তাঁর রূপ দেখতে দেখতে ঠাকুর্দ্দা না কি কিছু দিন পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি—

—তুমি ছিট্ পেয়েছ। যাও, আর দাঁড়িয়ে ঢং করো না। পাঁজি দেখে' দিন-টিন ঠিক্ করে' ফেলো।

—হাঁ, মেয়ে দেখার দিন একটা ঠিক্ করিগে।—বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাখাল বাবু পুত্র সত্যশিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—সত্য, পড়াশুনো করিস্ বাপু মন দিয়ে। দায়িত্ব পড়ল' ঘাড়ে। আমার ছেলে হয়ে যদি মূর্খ হ'য়ে থাকো, আর, ছেলে-পিলেকে খেতে দিতে না পারো তবে সে বড়ো ঘেন্নার কথা হবে। বুঝলে?

সত্যশিব ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বুঝেছি। [ক্রমশঃ

"যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয়, ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল, যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল, যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল, না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র

সোভিয়েট সিনেমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েট সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁদের কাছে অধ্যাপক ইসেনষ্টিনের নাম অজানা নাই। তিনি সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অফ লেনিন' লাভ করেছেন—সিনেমা-শিল্পের মধ্যে নূতন প্রেরণা, প্রয়োগশিল্প ও প্রযোজনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করে। ছায়াছবির উৎকর্ষ সাধনের কথা উঠলে আজকের দিনে ইসেনষ্টিনের নাম হলিউডেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এমন কি, একবার সেখানে প্রযোজনার কিছু কাজ হাতে নেবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁর কাছে এসেছিল—তিনি সেখানে পদার্পণও করেছিলেন, কিন্তু মানুষের জীবনের প্রতি ইসেনষ্টিনের যে দৃষ্টিভঙ্গী, তাতে হলিউডে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হলেও আমেরিকার পুঁজিপাতি-প্রভাবিত চিত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে তাঁকে কাজে লাগানোর সুবিধা হ'ল না। তবুও আমেরিকা বা পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রত্যেক স্থানেই চিত্রশিল্প সম্পর্কে ইসেনষ্টিনকে সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে থাকেন।

তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—We say that the screen is of all arts the most popular in the Soviet Union not for the sole reason that it attracts millions of people to the picture theatres but because of the great public interest displayed during the actual production of films. অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে সব রকম চারুকলার মধ্যে ছায়াছবিই হচ্ছে সব চাইতে জনপ্রিয়; লক্ষ লক্ষ নর-নারী যে তার প্রতি আকৃষ্ট একমাত্র এই কারণেই নয়—যখন বস্তুতঃ ছবির প্রযোজনা হচ্ছে সেই সময় তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের যে উৎসাহ-যত্ন দেখা যায় তারই জন্য। ইসেনষ্টিনের এই কথাগুলির মধ্যে দুটি বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার,—"most popular" এবং "great public interest displayed during the actual production,"

এটা অবশ্য অতি সত্য কথা যে, আমাদের দেশের রাজনীতিক অবস্থার শোচনীয়তাই একমাত্র কারণ, যার জন্য আমাদের দেশে ছায়াছবি সোভিয়েটের মত জনপ্রিয় হতে পারে না এবং বস্তুতঃ পক্ষে তার প্রযোজনার সময়ও সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়ারও সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের আছে বলে তাও মনে হয় না। কিন্তু সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আমাদের মনোভাব তার একান্ত পরিপন্থী না হলেও অনেকটা বিরোধী বটে।

ইসেনষ্টিন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন,—খবরের কাগজে যখন বের হ'ল যে তাঁর ষ্টুডিও থেকে 'আলেকজেণ্ডার নেভেস্কি'র ছবি তোলার কাজ সুরু হবে, তখন সহস্র সহস্র লোক তাঁর কাছে এমন অনেক প্রস্তাব লিখে পাঠালে যাতে তাঁর কাজে খুব সাহায্য হয়েছিল এবং চিঠিতে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যও অনেকে পাঠালেন। মূল তথ্যের সন্ধান তিনি কোথা থেকে পেতে পারেন, তাও তাঁরা জানালেন। এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়—অন্য প্রযোজকেরাও জনসাধারণের কাছ থেকে সমভাবেই সাহায্য পেতেন। Vassiliev Brothers (প্রযোজক) Chapayev ছবি তোলার সময় Michael Romm (মাইকেল রম) Lenin in October এবং Lenin in 1918 তোলার সময়ও এমনি সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে যারা যোগ দিয়েছিল সেই প্রতিপক্ষের দল, এবং যারা অন্তর্বিগ্রহে যোগ দিয়েছিল তারা, তাদের রোজনামচা ফটোগ্রাফ, এবং অন্যান্য কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দিল—যাতে সোভিয়েটের প্রথম বার্ষিকী শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ আছে। এই ভাবে ছবির মাল-মশলা আপনা হতেই ষ্টুডিয়োতে এসে জমা হতে লাগল। এদের মধ্যে আবার অনেকে মস্কোতে নিজে এসে, প্রযোজক, প্রয়োগ-শিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং মঞ্চসজ্জাকর প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গিয়েছিলেন। সাধারণতঃ চারুশিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাতে এ ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই। সোভিয়েটের চিত্রজগতে প্রযোজকেরা, শিল্পীরা, লেখকরা জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতিদিন চারি দিক্ থেকে যে অসংখ্য চিঠি পান তা থেকেই এ কথা বেশ বুঝা যায়। পশ্চিমের চিত্রতারকারা বস্তা বস্তা চিঠি পান, তা আমরা জানি, কিন্তু তার অধিকাংশই বিহ্বল সপ্রশংস অনুরাগী-মহল থেকে। কিন্তু সোভিয়েটের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা লুবা অর্লভা তার প্রশস্তি ছাড়াও অন্যধরণের বহু চিঠি পেয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন লোকে শুনতে পেলে যে তিনি Volga Volga ছবিতে ডাক-পিয়নের অভিনয় করবেন, তখন সারা দেশ থেকে, যে সব মেয়েরা সত্য সত্যি ঐ কাজ করছেন, তাঁরা নানা রকম উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতে সুরু করে দিলেন। কেমন করে ঐ অংশের অভিনয় করলে ঠিক স্বাভাবিক হবে, এমন উপদেশ দিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হলেন না। অর্লভা সেই সব উপদেশগুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করে নিজের ভূমিকাটিকে আয়ত্ত করতে লাগলেন। এমনি ভাবেই তিনি কারখানার মজুরাণীর ভূমিকাতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন।

জনসাধারণ ছবি তোলার ব্যাপারে যে কি ভাবে সাহায্য করে ও যত্ন নেয়, তার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত ইসেনষ্টিন দিয়েছেন। আর্ণষ্টাম যখন কিছু দিন আগে Friends নামে একটা ছবি,—সোভিয়েটের জনসাধারণের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রীর উৎকর্ষ-সাধনের জন্য তৈরী করছিলেন তখন তাঁর একটা দৃশ্যের পরিকল্পনা ছিল যে, বিদ্রোহী পাহাড়ীদের সাহায্য করার জন্য সোভিয়েট সৈন্যেরা আসবে এবং হোয়াইট গার্ডসদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দেবে। যখনই কোনো দৃশ্যে বহু লোকের প্রয়োজন হয়, তখন সোভিয়েট জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এবারও তারা এল। তারা ঘোড়ায় চড়ে দলে দলে আসতে লাগল সামরিক সাজসজ্জায়—তারা অভিনয়ও করলে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন প্রযোজক অনুরোধ করলেন, এক দলকে হোয়াইট গার্ডস্ অর্থাৎ সোভিয়েট দেশের শত্রুপক্ষ সাজতে হবে, তখন তাদের সেই কলঙ্কিত অতীতের কথা স্মরণ করে, তারা আর কিছুতেই তাতে রাজী হ'ল না।

এর পরই ভারী মজার ব্যাপার ঘটল। যখন রেড আর্মি আক্রমণ করতে গেল, যারা দর্শকরূপে সেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেই সব কৃষক ও কৃষিব্যবসায়ীর দল কারো নির্দ্দেশের অপেক্ষা না রেখেই শত্রুনিপাতের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ঘোড়সোয়ার-সৈন্যদের পিছু পিছু আক্রমণ চালাতে লাগল প্রবল উৎসাহে—তাদের উৎসাহিত করে চারি দিকে জয়ধ্বনিও উঠতে লাগল। খুব realistic হ'ল বটে, কিন্তু প্রযোজককে আবার ঢেলে সাজতে হল।

Lenin in October ছবিখানি তোলবার সময় যে ঘটনা

ঘটেছিল তাও বেশ উল্লেখযোগ্য। যে দৃশ্যে রেড্ গার্ডস ও সৈন্যগণ জারের শীত-প্রাসাদ বিধ্বস্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে দিন রাত্রে ভয়ঙ্কর শীত। যারা ঐ দৃশ্যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের জন্ম আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে এবং এক জনকে সেই আগুন অনির্ব্বাণ রাখায় নিযুক্ত করা হয়েছে। সঙ্কেতধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্তেরা আক্রমণের জন্ম ছুটে চল্ল দ্রুতবেগে—কিন্তু প্রযোজক বিস্মিত হয়ে দেখলেন, সকলের আগে ছুটে চলেছে সেই বৃদ্ধ অগ্নিরক্ষক চৌকিদারটি। সমস্ত দৃশ্যটি মাটি হয়ে গেল। প্রযোজক চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি? সেই বৃদ্ধ উত্তর দিলে—"I couldn't help it. I took a hand when the Winter Palace was really captured."—আমি কি করব? যখন শীত-প্রাসাদ দখল করা হয়েছিল তখন যে আমিও তার মধ্যে ছিলাম। সোভিয়েটে যখন ঐতিহাসিক ছবি বিরাট পরিবেষ্টনীতে তোলার ব্যবস্থা করা হয়, অথবা জনতা বা জনবহুল দৃশ্য অর্থাৎ বিপুল সৈন্যসমাবেশের দৃশ্য তোলার দরকার হয়, তখন তাতে যেমন পাওয়া যায় অসংখ্য নরনারীর স্বতঃপ্রবৃত্ত সমাবেশ, তেমনি রেড আর্ম্মির অগণিত সুসজ্জিত সৈন্যদের সাগ্রহ উপস্থিতি। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাধারণ সৈনিকের অথবা সেনাপতির এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। রেড আর্ম্মির অতীত গৌরবকাহিনী, তাদের বীরত্ব ও সাহস-প্রকাশক ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে তারা সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

এই ত গেল জনসাধারণ কি ভাবে ছায়া-ছবি তোলার বিষয়ে যত্ন নেয়, সাহায্য করে। কিন্তু ছবি যখন সত্য সত্যই পর্দ্দার উপর মুক্তিলাভ করে, তখন ছবিগুলি প্রশংসার যোগ্য হলে যেমন তারা প্রশংসা করে—নিন্দার কিছু থাকলে তীব্রভাবে নিন্দা করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তারা ভাবে, এ বিষয়ে তাদের নিজেদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। প্রশংসা বা নিন্দা করার অধিকার আছে প্রত্যেক সোভিয়েটের অধিবাসীর।

সোভিয়েট জনসাধারণের মধ্যে এই একত্ব-বোধ এবং পারস্পরিক যোগাযোগই সমগ্র জাতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যেমন চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষক তেমনি শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ কি করে হতে পারে—কি সুযোগ তাদের দেওয়া দরকার, তার জন্যও তারা সর্ব্বদা অবহিত। ফিল্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তারা বিশেষ সজাগ এবং লেনিন থেকে আরম্ভ করে ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত সকলে ফিল্মের উন্নতির জন্ম ষ্টেট্ থেকে প্রচুর সহায়তা করে এসেছেন। সংস্কৃতির দিক থেকে ছায়া-ছবি সোভিয়েট জনসাধারণকে সর্ব্বদা সজাগ রেখেছে। উৎকৃষ্ট ছবিগুলির হাজার হাজার সংস্করণ করে সারা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু সহরে নয়—গ্রামে গ্রামে, ক্ষেত-খামারে, ক্লাবে, সেনানিবাসে, এমন কি, নৌ-বাহিনীতে এবং সাধারণ সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে। ভ্রাম্যমান যন্ত্র ও যন্ত্রীদের সাহায্যে ছায়া-ছবির এই সুবিস্তৃত প্রদর্শন সেখানে সম্ভব হয়েছে—আর সম্ভব হয়েছে ষ্টেটের প্রধান লক্ষ্য আছে বলে যে কি ভাবে জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায়। "They show films in the most remote corner of the country, the Siberian forests, the Alpine meadows of the Caucasus, the villages Turkmenia and Tajikistain and the auls (native villages) of Kazakhstan." আরো উত্তরে—বিমানপোতের সাহায্যে ছবি সরবরাহ করা হয়, সেখানে বরফের মধ্যে হরিণ বা কুকুরের সাহায্যে যন্ত্রপাতি বহন করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভ্রাম্যমান সিনেমা সাধারণতঃ আধুনিক মোটরের সাহায্যেই চলাফেরা করে।

জননেতা লেনিন ও ষ্ট্যালিন যে ছবিতে আছেন, সেই ছবিই সোভিয়েটে সব চাইতে জনপ্রিয়। এ সম্পর্কে Lenin in October, Lenin in 1918, The Great Dawn, The Man with the Gunএর নাম উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট পশ্চিমের নামজাদা চিত্র-তারকাদেরও খুব ভালবাসে। চার্লি চ্যাপ্লেন ওখানে খুব জনপ্রিয়। তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে সোভিয়েটে খুব সাড়া পড়েছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইসেনষ্টিন বলেছেন—Twenty years ago, encircled by a ring of enemies, exhausted by blockade and famine, the Soviet country began to develop its motion picture industry. The first Soviet films were made in unheated studios by half-starved people, whose enthusiasm made up for the shortage of apparatus, film and other accessories. অর্থাৎ বিশ বছর পূর্ব্বে শত্রু-পরিবৃত অবস্থায়, দুর্ভিক্ষে, অবরোধে অবসন্ন সোভিয়েট তার চিত্র-শিল্পের উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রথম সোভিয়েট-চিত্র তৈরী হয়েছিল উত্তেজনা-বিহীন ষ্টুডিওতে তাদেরি দ্বারা, যারা অর্দ্ধাশনে দিন কাটিয়েছে—কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সব কিছুর অভাব পূরণ হয়েছিল তাদের অদম্য উৎসাহের দ্বারা। সেই প্রথম ফিল্মটি তৈরী হয়েছিল আন্দোলন-মূলক—যারা সম্মুখ সমরে নিযুক্ত তাদেরই জন্ম—সেই গৌরবময় দিনের খবরগুলি হাতে থাকত—সেগুলিকে এখন মহামূল্য সম্পদ্ হিসাবে ষ্টেটে রক্ষা করা হয়েছে—তাতে মুদ্রিত হয়ে আছে স্বাধীনতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম জনগণের অপূর্ব্ব সংগ্রামের ইতিহাস।

এখন মস্কো, কিয়েভ, মিংকস্, লেনিনগ্রাড এবং আরো অনেক জায়গায় ভাল ভাল ষ্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে। সংবাদ-সরবরাহক ফিল্মের ব্যবস্থা সকল সহরেই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোভিয়েটের শাসনাধীন হয়ে অ-রুশীয় প্রদেশগুলিতে ফিল্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। ইউক্রেন, জর্জ্জিয়া, বাইলো-রুশিয়া, আর্ম্মেনিয়া আজেরবাইজান, তুর্কমানিয়া উজবেকিস্তান, টাজিকিস্তান প্রভৃতি প্রদেশের লোক তাদের নিজের নিজের ভাষায় ছায়া-ছবির অতি স্বাভাবিক সংলাপ শুনতে পাচ্ছে।

মস্কোতে ছেলেদের উপযোগী ছবি তৈরী করার জন্ম বিশেষ ভাবে ষ্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে। সে সব ছবির আদর্শ শিক্ষামূলক হওয়াতে ছেলেদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে যিনি ছবিতে নামেন যেমন স্কুলের ছেলে—লেয়ারস্কি শিশু ম্যাক্সিম গোর্কির ভূমিকায় নেমেছিল Among men ছবিতে। তাকে "শিশু-প্রতিভা" বলে পড়া-শুনা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি এবং স্কুলের পড়াশুনায় খুব ভাল ফল না করলে তাকে আর ছবিতে নামতেও দেওয়া হয় না।

প্রযোজক, প্রয়োগশিল্পী ও চিত্রনাট্যলেখক সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মনোনীত Institute of

Cinematographyতে। সেখানকার শিক্ষা অবৈতনিক—যেমন শিক্ষা অবৈতনিক সোভিয়েটের আর সব শিক্ষালয়ে, স্কুলে ও কলেজে। বরং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বৃত্তি পেয়ে থাকেন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট থেকে। চিত্রশিল্পের মধ্যে যাঁরা যান্ত্রিক হিসাবে কাজ করেন, তাঁরা শিক্ষালাভ করেন লেনিনগ্রাডের আর একটি শিক্ষালয়ে। তৃতীয় শিক্ষাগারটি ছায়াশিল্প সম্পর্কে নূতন নূতন গবেষণায় নিযুক্ত আছে মস্কোতে।

চিত্র-শিল্প-জগতের প্রায় ২০০ জন লোক সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সম্মান Order of the U-S S-R পেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা অর্লভাকে Order of Lenin ও Order of the Red Banner of Labourএর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

চিত্রজগতে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা কিন্তু বয়সে প্রবীণ নন। তাঁদের গড়পড়তা বয়স চল্লিশের নীচে। ম্যাক্সিম গোর্কির জীবন সম্পর্কে তিনটি ছবি যিনি তুলেছেন—বিশ বছর বয়সে পৌছিবার আগেই তিনি ছবির কাজ আরম্ভ করেন। প্রয়োজক ট্রবার্গ যখন The Blue Express নামে বিশ্ববিশ্রুত ছবিখানি তুলেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি; এর কারণ অধ্যাপক ইসেনষ্টিন নির্দেশ করে বলেছেন—"This is because our young scenario writers, actors, and producers easily receive opportunities to display and develop their talents." কিন্তু পরাধীন দেশে সে সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া আমরা এ দেশে তরুণ প্রবীণ সবাই অত্যন্ত সহজে এবং সহজাত কৌশলে পৃথিবীর যা-কিছু জেনে ফেলে স্বয়ম্ভূ হয়ে বসে আছি—কি প্রযোজনায়, কি প্রয়োগশিল্পে, কি চিত্রনাট্যরচনায়, কি যান্ত্রিক বিজ্ঞতায় আমরা একেবারে ধুরন্ধর। বাস্তব দিকটার প্রতি যদি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। আরো একটা জ্ঞাতব্য কথা—অধ্যাপক ইসেনষ্টিন বলেছেন—The virtue and significance of Soviet Cinematography is that it gives a true portrayal of life in our Soviet country and has really become, of all arts, the closest to the masses, that it is actively contributing to the further consolidation of cur new system of soceity, that if has a great formative influence on the minds of the Soviet people. অর্থাৎ সোভিয়েট সিনেমা যে গুণে সার্থক হয়েছে সেটা খুব প্রণিধানযোগ্য। সোভিয়েট মানুষের জীবনের সত্যকার ছবি ফুটিয়ে তোলে সোভিয়েট ফিল্ম, এবং সব-রকম শিল্পকলার মধ্যে চিত্রশিল্প জনগণের একেবারে নিকটে এসে পৌছে গেছে, সোভিয়েট সমাজের নূতন ব্যবস্থাকে স্থিতি করার কাজে সোভিয়েট সিনেমা নিযুক্ত আছে এবং আরো একটি কারণ এই যে—সোভিয়েট জনসাধারণের মনকে গড়ে তোলার দিকে এবং প্রভাব অপরিসীম। এ মূল্যবান্ কথার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

—স্বগতোক্তি—

গোপাল ভৌমিক

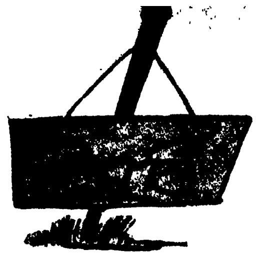
পৃথিবীতে বার বার আমাদের পরাজয় হল;
মুছে নিয়ে ছল ছল
দু'টি চোখ, তবু ত আমরা চলি—
এক রাত্রি শেষ হলে—
আর রাত্রে আমরাই বলি।
দিন কাটে, রাতও কেটে যায়—
সময়ের পাখায় পাখায়
আমরাই তবু ছুটে চলি—
কোথায় ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট—
কোথায় বা ইয়াল্টার অন্ধ সোঁদা গলি।

প্রাত্যহিক কাগজের পাতায় পাতায়—
সংবাদের ছড়াছড়ি;
প্রতি পৃষ্ঠা ভরে ওঠে
আমাদেরই জীবন-গাথায়।
পৃথিবীর কোন প্রান্তে
কয় নেতা বসে—
আমাদের ভাগ্য গোপে ছক কেটে কসে।

এ নতুন যাদুবিদ্যা—
পূর্ণাঙ্গ নতুন তবু নয়;
অলক্ষ্যে পুরানো দিন হাসে—
সেই তার হারাবার ভয়।

এ এক মজার অঙ্ক, মন্দ নয়—
ভাগ্যের এ খেলা;
এ দিনের এত মৃত্যু এ রক্ত-সঞ্চয়—
সব তবে বৃথা হল!
মানুষের সনাতন ভয়—
থেকে গেল আগের মতন—
পুরাতন পৃথিবীতে
এ নতুন শাসন-শোষণ
আগের মতই চলে;
মৌলিক নীতিতে ভেদ কই?
গাছে যারা তুলে দিল—
তারাই ত কেড়ে নিল মই!
খণ্ডিত সময়ে তবু—

আশা নিয়ে বসে আছি ঠায়—
ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, বাস চলে যায়।



[চাঞ্চল্যকর উপন্যাস]

শ্রীফাল্গুনী রায়

৭

কয়েক দিন ধরে প্রতি সন্ধ্যা আমরা থিয়েটারে কাটাচ্ছি। আজ, এখানে, কাল ওখানে। আমি তবু বসে থিয়েটার দেখি, রামানুজ তাও দেখে না। ষ্টেজে গিয়ে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে গল্প করে কাটায়। ঠাট্টা, তামাসা, পান, সিগারেট আর চা।

এক দিন আর থাকতে না পেরে রামানুজকে জিজ্ঞেস করলুম—"কি করছ ? রোজ রোজ এই ভাবে সময় নষ্ট—"

বাধা দিয়ে রামানুজ হো হো করে হেসে উঠে বললে—"থিয়েটারে বই চালাবার চেষ্টা করছি। কেউ আমলই দিতে চায় না। ভারী শক্ত কাজ।"

বিরক্ত হয়ে বললুম—"তা হলে আমি আর এখানে থেকে কি করব ? নিত্য সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না। এসেছিলুম অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে, তা তোমার গতিগতি দেখে তো মনে হচ্ছে যে সে আশা দুরাশা মাত্র। ত্রিমূর্ত্তি ছেড়ে এখন তোমায় থিয়েটারে পেয়েছে।"

"আমায় কি করতে বল ?"

"কাজ করতে বলি। ত্রিমূর্ত্তির ব্যাপারটা যদি বাজে হয়, অন্য একটা কিছু আরম্ভ কর।"

গম্ভীর হয়ে রামানুজ বললে—"ত্রিমূর্ত্তির ব্যাপারটা বাজেও নয়, সোজাও নয়। সেটা ছেড়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করা চলবে না।"

আমি রেগে বললুম—"সে কাজই বা করছ কই ?"

রামানুজ হেসে বললে—"সেই কাজই তো করছি। আচ্ছা, ত্রিমূর্ত্তির মহেশ্বরকে তো ক'বার দেখলে। চিনতে পার ?"

কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাথা চুলকোতে লাগলুম।

রামানুজ বলে চলল—"চিনতে পার না। কেন ? কারণ, তার ছদ্মবেশ নিখুঁত।"

আমি বললুম—"তা ঠিক।"

"কি ঠিক ?" রামানুজ প্রশ্ন করলে। "ছদ্মবেশ নিখুঁত হলেও বিচক্ষণ লোকের চোখ এড়ানো শক্ত। এ-সব থেকে কি প্রমাণ হচ্ছে ?"

"লোকটা ছদ্মবেশ ধারণে পটু।"

"পটু তো বটেই, কিন্তু তা ছাড়া আর কি জানা যায় ?"

"লোকটা ক্রিমিন্যাল।"

বিরক্ত হয়ে রামানুজ বলে উঠল—"না, না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি লোকটা খুব ভাল এক জন অভিনেতা। যে ছদ্মবেশ সে ধারণ করে, সে পার্টের সঙ্গে সে নিজেকে এমন ভাবে মিশিয়ে ফেলে যে কারো বোঝবার যো নেই, সেই পার্ট ছাড়া তার আর কোন ব্যক্তিত্ব আছে।"

তাচ্ছিল্যস্বরে আমি বললুম—"না হয় স্বীকার করা গেল, সে এক জন বড় অভিনেতা, কিন্তু এই আবিষ্কারে লাভটা কি হল ?"

উত্তেজিত হয়ে রামানুজ বললে—"লাভ বিলক্ষণ! সে এক জন অভিনেতা। কোন না কোন সময় ষ্টেজে অভিনয় করত। কিছু দিন যাবৎ করছে না। খুঁজে বের করতে হবে।"

"কি করে ?"

"আমি নিজে গিয়ে এবং লোক দিয়ে তাদের নাম, চেহারা, বয়স সব যোগাড় করেছি; এদের মধ্যে তিন জন ছাড়া আর সকলেরই হদিস পেয়েছি। কেউ মরে গেছে, কেউ বিদেশে গেছে, কেউ চাকরী নিয়েছে, কেউ ব্যবসা করছে। মাত্র তিন জনের কোন রকম পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এরা যেন হঠাৎ এক দিন ষ্টেজ পরিত্যাগ করে কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে।"

প্রশ্ন করলুম—"এই তিন জনের মধ্যে মহেশ্বর বলে লোকটি কে, বুঝবে কি করে ?'

রামানুজ হেসে বললে—"খুব শক্ত হবে না বন্ধু। সব ভেবে-চিন্তে কাজ করছি। মহেশ্বরকে যত বার দেখলে প্রত্যেক বারই তার নতুন চেহারা। এক বার দাঁত উঁচু, এক বার সামনের দাঁত ভাঙ্গা, এক বার সুন্দর সাজানো দাঁত। তার মানে কি ?"

"মানে বাঁধানো দাঁত।'

সোৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে রামানুজ বললে—"ঠিক বলেছ। বাঁধানো দাঁত। এখন খোঁজ করতে হবে, এই তিন জনের মধ্যে বাঁধানো দাঁত কার ছিল। আজ সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। জানো বোধ হয়, আজ 'কসমোপোলিটনে' জুবিলী উৎসব। যত নট-নটী সকলকেই কর্ত্তৃপক্ষরা নিমন্ত্রণ করেছেন। তার পর যদি ভাগ্যে থাকে, কথায় কথায়—বুঝলে কি না। নাও, তৈরী হয়ে নাও। সময় হয়ে গেছে।"

রাত্রে বাড়ী ফেরবার পথে রামানুজকে খুবই প্রসন্ন দেখলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারলুম না। অবশ্য অভিনয় খুব ভালই হয়েছিল আর কর্ত্তৃপক্ষরা খাইয়েছিলও দিব্য, কিন্তু রামানুজের ভাগ্যে দু'টোর কোনটাই বিশেষ জোটেনি। স্রেফ চরকির মত সে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে বেড়িয়েছে। আশা করেছিলুম, সে নিজেই প্রসন্নতার কারণ জানাবে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিজেই প্রশ্ন করলুম—"ব্যাপার কি ? আজ এত খুশী কেন ?"

রামানুজ বললে—"এতদিন পরে আজ আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মহেশ্বরের সন্ধান পেয়েছি।"

উত্তেজিত হয়ে বললুম—"তাই না কি ? কোথায় সে ?"

নিস্পৃহ কণ্ঠে রামানুজ উত্তর দিলে—"জানি না।"

ভয়ানক রাগ হ'ল আমার। রাগ হবার কথাই। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললুম—"এ রকম উৎকট ঠাট্টার প্রয়োজন কি ? নেশা-টেশা করনি তো ?"

হেসে রামানুজ বললে—"আহা, রাগ কর কেন! ঠাট্টা আমি করিনি। আজ এক পুরোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা হল। সে মহেশ্বরকে চেনে। তার সঙ্গে মহেশ্বরের একটু প্রেম হয়েছিল। তখন মহেশ্বরের নাম ছিল কমল গাঙ্গুলী। অবশ্য কমল গাঙ্গুলী নামটা আমার লিষ্টে ছিল। কিন্তু সেই যে মহেশ্বর তা জানতুম না।"

প্রশ্ন করলুম—"জেনে কিছু লাভ হ'ল ?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"না। নাম জেনে কোন লাভ হয়নি সত্য, কিন্তু তার আসল চেহারার বর্ণনা জানতে পারলুম। কাল সেই অভিনেত্রীর বাড়ী যাব। মহেশ্বরের আসল চেহারার ছবি তার বাড়ীতে আছে।"

আগ্রহ ভরা কণ্ঠে বললুম—"এটা জেনে অবশ্য খুবই সুবিধে হয়েছে—"

বাধা দিয়ে রামানুজ বললে—"ছাই সুবিধে হয়েছে। মহেশ্বর তো সর্ব্বদাই ছদ্মবেশে থাকে। নইলে ক'লকাতার রাস্তায় কে সে

অভিনয় করেছে, অথচ কেউ তাকে চিনতে পারছে না। অবশ্য ছবি দেখলে হয়তো কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু আমার মন প্রসন্ন হ'ল অন্য কারণে।"

"কারণটা কি শুনি।"

"মহেশ্বরের মুদ্রাদোষের সন্ধান পেয়েছি। উত্তেজিত হ'লে সে নিজের নাক ধরে টানে।"

হেসে বললুম—"নাক টানা দেখে মহেশ্বরকে ধরে ফেলবে। চমৎকার যুক্তি।"

গম্ভীর হয়ে রামানুজ বললে—"হেস না। ঐ মুদ্রাদোষেই ধরা পড়বে মহেশ্বর।"

পরদিন সকালে উঠেই আমরা সেই অভিনেত্রীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে চক্ষুস্থির! লোকে লোকারণ্য। পুলিশ-অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল—রাত্রে কে এক জন এসে অভিনেত্রীকে খুন করে গেছে। অফিসারের হুকুম নিয়ে আমরা বাড়ীর ভেতর গেলুম। অভিনেত্রীর শোবার ঘরে গিয়ে রামানুজ এ-দিক্ ও-দিক্ দেখতে লাগল। হঠাৎ টেবিলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে বললে—"ফাল্গুনি, এই দেখ ছবির ফ্রেম। ছবি নেই।" তার পর ফ্রেমটা উল্টে পাল্টে দেখে বললে—"দেখেছ, তিন লেখা রয়েছে। কি বুঝলে?"

আমি বললুম—"বোধ হয় ছবির দাম তিন টাকা।"

রামানুজ গম্ভীর ভাবে বললে—"দাম নয়। ত্রিমূর্ত্তির তিন নম্বর। মানে মহেশ্বর। সেই এসে খুন করে গেছে একে। আর নিয়ে গেছে নিজের ছবি। কি রকম স্পাইং সিষ্টেম। ঠিক জানতে পেরেছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি কি বেকুব। আমার উচিত ছিল, অভিনেত্রীটিকে চোখে চোখে রাখা। দীপঙ্করকে বলে পুলিশ প্রোটেকশন নিলে হ'ত। আবার মহেশ্বরের কাছে আমি পরাজিত হলুম। কিন্তু এই শেষ। এইবার এ নাটকের শেষ অঙ্ক। আমার জীবন-পণ। হয় তাদের ধরব, না হয় সেই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।"

মনে মনে একটু হাসলুম। ত্রিমূর্ত্তি যেন রামানুজকে পেয়ে বসেছে। তখন কি জানি তার কথা একটু পরেই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে!

বাড়ী ফিরে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ রামানুজ আমায় বাধা দিলে। বললে—"ফাল্গুনি, দাঁড়াও। আমার যেন কি রকম একটা সন্দেহ হচ্ছে। আগে আমি ঢুকি।"

অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে রামানুজ এ-দিক্ ও-দিক্ চাইতে লাগল! আমি হেসে জিগ্যেস করলেম—"কি হে, সন্দেহ ভঞ্জন হল?"

রামানুজ উত্তর দিলে—"কই, সন্দেহজনক তো কিছু চোখে পড়ছে না।"

আমি বিদ্রূপ করে বললুম—"ত্রিমূর্ত্তির চিন্তা তোমায় পেয়ে বসেছে। রজ্জুকে সর্পভ্রম করছ।"

রামানুজ গম্ভীর হয়ে বললে—"সাবধানের মার নেই। রজ্জুকে সর্পভ্রম করা হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু সর্পকে রজ্জুভ্রম করা মারাত্মক।"

"ও সব দর্শনশাস্ত্রের কচকচিতে দরকার নেই। তার চেয়ে একটা সিগারেট ধরাই, তুমি চা আনতে বল।" এই বলে কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে টেবিলস্থিত দেশলাইয়ের বাক্স নিতে হাত বাড়ালুম।

রামানুজ চীৎকার করে উঠল—"ফাল্গুনি, হাত দিও না।"

কিন্তু—টু লেট। ততক্ষণে বাক্সটায় হাত দিয়েছি। তার পর—বোমা ফাটার মত বিকট শব্দ—চোখ ঝলকানো আলো—অন্ধকার—অন্ধকার—

যখন জ্ঞান হ'ল, চোখ খুলে দেখি নতুন জায়গা। ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করলুম—"আমি কোথায়?"

আমার খাটের পাশেই ডাক্তার, নার্স সকলে দাঁড়িয়েছিলেন। এক জন নার্স আমার কাছে এসে নিম্ন স্বরে বললে—"হাসপাতালে।"

মনে পড়ে গেল দেশলাইয়ের বাক্সে বোমার কথা। উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলুম—"আর রামানুজ?"

নার্স উত্তর দিলে না, ডাক্তারের দিকে চাইলে। আমি ভীত উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করলুম—"আমার কাছে লুকোবেন না। শীগগির বলুন, রামানুজ কোথায়? কেমন আছে?"

একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে ডাক্তার উত্তর দিলেন—"তিনি মারা গেছেন।"

আমি আবার জ্ঞান হারালুম।

৮

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোতে প্রায় দিন পনের লাগল। শুনলুম, রামানুজের মৃতদেহের ওপর পোষ্টমর্টেম করা হয়েছিল, তার পর যথাবিধি সৎকার করা হয়েছে। আমার বন্ধু বলতে কেবল রামানুজই ছিল। তাকে হারিয়ে যেন সমস্ত জগৎ ফাঁকা ঠেকতে লাগল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য দীপঙ্কর আসে, কিন্তু রামানুজের অভাব কি আর কেউ পূরণ করতে পারে! রামানুজের বাড়ীতেই আছি। রোজ সন্ধ্যায় বাড়ীর কাছেই একটা পার্কে একটু বেড়াই। ডাক্তার বলেছে। এক দিন পার্কের বেঞ্চে বসে আছি, এমন সময় এক জন বৃদ্ধ আমার পাশে এসে বসল। তার পর এ-কথা সে-কথার পর আমার দিকে তিনটে আঙ্গুল দেখালে। প্রথমটা আমি কিছুই বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম। কিন্তু যখন সে বললে—"আপনার বন্ধু যা পারেননি, আপনি কি তা পারবেন?" তখন বুঝতে পারলুম, লোকটা ত্রিমূর্ত্তির চর। কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে এ-দিক্ ও-দিক্ চাইতে লাগলুম!

লোকটা বললে—"পুলিশ ডাকবার অথবা কোন রকম গোলমাল করবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন। রামানুজ বাবু আপনার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান্ ছিলেন, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য তাঁকেও সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমি শুধু এই কথাই আপনাকে বলতে এসেছিলুম যে, আর আমাদের সঙ্গে না লেগে ভালয় ভালয় পাটনা চলে যান। অনর্থক কেন পৈত্রিক প্রাণটা হারাবেন।"

রাগে আমার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। বললুম—"তোমরা মানুষ নয়, পিশাচ—"

কথা শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধ বলে উঠল—"আচ্ছা, নমস্কার।"

বৃদ্ধ চলে গেল। আমি গুম্ হয়ে বসে রইলুম। তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টাও যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

সকাল হতে না হতে হন্তদন্ত হয়ে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত। বললে—"ফাল্গুনি, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ত্রিমূর্ত্তির খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"কি বলছ? একটি বর্ণও বুঝতে পারছি না।"

দীপঙ্কর হাঁফাচ্ছিল। একটু দম নিয়ে বললে—"রামানুজ যা বলেছিল ঠিক তাই ঘটেছে। কাল রাত্রে খবর পাওয়া গেছে, তিনটি গ্রামের সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চমৎকার ফসল হয়েছিল। হঠাৎ সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল।"

রামানুজের কথা আমার মনে পড়ে গেল! বললুম—"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ত্রিমূর্ত্তিরা না কি এমন এক কেমিক্যাল আবিষ্কার করেছে যাতে সমস্ত ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। খবরের কাগজের লোকরা এখনও জানতে পারেনি তো?"

"না। এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের কনফিডেনশিয়াল খবর।"

এমন সময় খবরের কাগজ হাতে রামানুজের চাকর ঘরে ঢুকল! খুলে দেখি, প্রথম পাতায় বড় বড় হেড লাইন দিয়ে এই খবর বেরিয়েছে। দীপঙ্করের হাতে কাগজটা এগিয়ে দিলুম। সে খবরটা পড়ে বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কিন্তু এরা খবর পেলে কোত্থেকে?"

আমি ম্লান হেসে বললুম—"ত্রিমূর্ত্তি নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না? তারাই নিশ্চয়ই কাগজওয়ালাদের খবর পাঠিয়েছে। আজ যদি রামানুজ থাকত!"

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"আমি চললুম। একবার কমিশনর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করি।"

ক'দিন পরে দীপঙ্কর এল। বললে—"কমিশনর সাহেব একটা মিটিং ডেকেছেন। কি করে এই নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়, তারই কথা বার্ত্তা, পরামর্শ হবে। তোমাকেও যেতে বলেছেন।"

প্রশ্ন করলুম—"কারা থাকবেন?"

দীপঙ্কর উত্তর দিলে—"অনেক বড় লোক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের এখন মিটিংএর উদ্দেশ্য জানান হয়নি। তুমিও যেও।"

যথাসময়ে মিটিংএ গেলুম। অনেক লোক। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, শ্যামলদাস ও সার মোহন চাঁদ অগ্রওয়ালও সেখানে উপস্থিত। কমিশনর সাহেব ব্যাপারটা সব খুলে ব্যক্ত করে বললেন—"শুধু পুলিসের দ্বারা এর প্রতিকার সম্ভব নয়। আপনাদের সকলের সাহায্য প্রয়োজন। মিষ্টার শ্যামলদাসের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে। তিনি এই কাজের জন্য অর্থ-সাহায্য করতে প্রস্তুত। অবশ্য সরকারও এ-বিষয়ে কার্পণ্য করবেন না। সার মোহনচাঁদ তাঁর এক্সপার্ট মতামত দিয়ে আমাদের [illegible] আমরা একটা বিরাট ল্যাবরেটরী তৈরী করব। [illegible] নির্দ্দেশ মত সেখানে এই উগ্র বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের নতুন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে খোঁজ-খবর করবেন এবং স্যাম্পল নিয়ে আসবেন।"

শ্যামল দাস সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন—"আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আমরা সফলতা লাভ করব।"

কমিশনর সাহেব বললেন—"আমারও তাই বিশ্বাস এবং আমি আশা করি, আপনারা যথাসাধ্য সাহায্যদানে বিরত হবেন না।"

এক জন বৃদ্ধ পিছনে বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"আমি এই উগ্র বিষের প্রতিরোধ করতে পারি।"

সকলেই চমকিত হলেন। কে এই বৃদ্ধ!

অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনর প্রশ্ন করলেন—"আপনি কে? আপনাকে তো আমরা চিনতে পারছি না।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন—"না চেনবারই কথা। আমি নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে আসিনি। তবে এ কাজের গুরুত্ব এত বেশী যে, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করতে পারলুম না। আপনারা তো সকলেরই সাহায্য চান? তাই আমি কর্ত্তব্যবোধে এখানে এসেছি।"

কমিশনর বলিলেন—"ভালই করেছেন। প্রত্যেকের সাহায্যই এ কাজে প্রয়োজন। আপনি কি সত্যই প্রতিরোধ করতে পারেন?"

দৃঢ় স্বরে বৃদ্ধ বললেন—"হ্যাঁ, পারি। যারা এই বিষ প্রয়োগ করে দেশে দুর্ভিক্ষ আনবার চেষ্টা করছে, তাদের আমি জানি।"

বিস্মিত হয়ে কমিশনর প্রশ্ন করলেন—"জানেন?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"জানি।"

"কারা?"

"ত্রিমূর্ত্তি!"

লক্ষ্য করলুম, শ্যামলদাস আর সার মোহন চাঁদের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। নতুন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ক্রমাগত নিজের নাক ধরে টানাটানি করছেন।

কমিশনর সাহেব জিগ্যেস করলেন—"আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন—"নিশ্চয়ই পারেন। আমার নাম রামানুজ।"

এই বলে বৃদ্ধ ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন। দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে রামানুজ! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। মৃত রামানুজ কি উপায়ে জীবন্ত হয়ে উঠল!

নতুন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনর ক্রমাগত নিজের নাক ধরে টানাটানি করছেন।

সভাস্থল স্তব্ধ! নিশ্চল!

রামানুজ বলে উঠল—"দীপঙ্কর!"

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর এগিয়ে গেল অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনরের দিকে। দেখা গেল, শ্যামলদাস, সার মোহনচাঁদ ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনর, প্রত্যেকের পিছনেই দু'জন করে সার্জ্জেন্ট দাঁড়িয়ে। হাতে রিভলভার।

রামানুজ গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"সার মোহনচাঁদ ও শ্যামলদাস ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। আর ঐ নতুন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনর—[illegible]"

রামানুজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—"টু লেট। তিন জনেই আত্মহত্যা করেছে! ধরেও ধরতে পারলুম না।"

কমিশনর সাহেবের কামরায় বসে কথা হচ্ছিল। রামানুজ বললে—"বোমা বিস্ফোরণে আমি আহত হয়েছিলুম সামান্যই। মরিনি। কিন্তু সেই সুযোগে আমি মরে নিলুম। চক্রান্ত জানলে কেবল তিন জন ব্যক্তি। হাসপাতালের ডাক্তার, কমিশনর সাহেব নিজে আর দীপঙ্কর। তারা রটিয়ে দিলে আমি মরে গেছি। একটা বেওয়ারিশ মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেম করে দাহ পর্য্যন্ত করে দিলে।

"কিন্তু আমাকে এত দিন ধরে এই মনকষ্ট দেবার কি প্রয়োজন ছিল?" বিমর্ষ ভাবে আমি প্রশ্ন করলুম।

রামানুজ সস্নেহে বললে—"উপায় ছিল না বন্ধু। তুমি অতি সরল। আমি বেঁচে আছি জানলে তুমি তো এমন ভাবে শোকার্ত্ত হতে পারতে না। তোমাকে দেখে ত্রিমূর্ত্তির দল কাজ করেছে। তাই তারা এমন ভাবে ফাঁদে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরতে পারলুম না। ফাঁকি দিল।"

কমিশনর সাহেব বললেন—"নেভার মাইণ্ড রামানুজ! এক দল ক্রিমিন্যালের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছ—এই কি কম।"*

* 'Agatha Christie'র "The Big Four" নামক উপন্যাস অবলম্বনে।

সমাপ্ত

ভারতের পোত-শিল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ভারতের অতি-তরুণ পোতশিল্প যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, আর কোন গরিষ্ঠ শিল্প সেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সুতরাং যুদ্ধান্তে যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধজনিত ক্ষতি পূরণ করিয়া যাহাতে আমাদের জাতীয় পোত নির্ম্মাণ ও পোত-পরিচালন-প্রচেষ্টা দ্রুত উন্নতি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে এখন হইতেই অবহিত হইতে হইবে। এই প্রচেষ্টা আমাদিগের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট অঙ্গ। যুদ্ধান্তে যে মন্দা আসিবে এবং প্রচণ্ড বৈদেশিক প্রতিযোগিতার যেরূপ প্রাবল্য ঘটিবে, তাহার নিমিত্ত এখন হইতেই আমাদিগকে সতর্ক ও প্রস্তুত হইতে হইবে। এই নিমিত্ত পোতশিল্পে ব্রতী ভারতীয় শিল্পী ও বণিকগণ এই শিল্পের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণার্থ আমাদের আর্থিক সামর্থ্য ও কাঁচা মালের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার প্রযত্নশীল প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন ভারত সরকারের এবং আন্তর্জ্জাতিক কারকারবার বৈঠকের গোচরে আনিয়াছেন। যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টায় যে যুদ্ধোত্তর সহযোগিতার পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে, তাহাতে ভারতের স্বার্থ ও মর্য্যাদা যাহাতে উপযুক্ত প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি প্রয়োজন। আমরা এখন হইতেই নিশ্চিত ভাবে জানিতে চাই যে, এই সকল পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইবে কি না এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয় পোত-শিল্পের যথার্থ উন্নতি ও প্রসার ঘটিবে কি না। আমরা যে কেবল মাত্র ভারত মহাসাগরে এবং প্রাচ্য গোলার্দ্ধে আমাদের জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দাবী করি, তাহা নহে; সাগরপারের বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমরা আমাদের জাতীয় নৌবহরের অক্ষুণ্ণ অধিকার আকাঙ্ক্ষা করি। ভারতে পোত-নির্ম্মাণ শিল্প এবং সমুদ্রবক্ষে অবাধ পোত-পরিচালন প্রচেষ্টার ইতিহাস মসী-কলঙ্কিত। এই উভয়বিধ বৈধ প্রচেষ্টায় আমাদের জাতীয় প্রযত্ন পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের স্বদেশীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থের পরিপুষ্টির নিমিত্ত পদে পদে ব্যাহত ও প্রতিহত হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমুন্নয়ন পরিকল্পনার নিমিত্ত যে কয়েকটি সমিতি ও উপসমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটির প্রতি ভারতের পোতশিল্প ও পোতবাণিজ্য প্রবর্দ্ধনের নিয়ম-নীতি-নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে! কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে ইহার একটি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। যে প্রচেষ্টা বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য ছিল, দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় স্বার্থে অন্ধ শাসক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অনুচিত শৈথিল্যে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে ভারত একটি জাতীয় বাণিজ্য নৌবহর প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করিতেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনোপযোগী দেশ-সমূহের মধ্যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি রাষ্ট্র ও রণনীতির দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অন্যান্য স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনশীল দেশসমূহের ন্যায় স্বীয় উপকূল ভাগে এবং বহিঃসমুদ্রে বাণিজ্য পরিচালনা করিবার তাহার আশঙ্কা যেমন সঙ্গত ও স্বাভাবিক, তদ্বিষয়ে অধিকারও তদ্রূপ অবিসম্বাদিত। কিন্তু নৌবাণিজ্য পরিচালনোপযোগী উদ্যম ও সামর্থ্য সত্ত্বেও ভারতবাসী বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নৌশিল্প ও নৌবাণিজ্য পরিচালন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অথচ এ বিষয়ে তাহার অধিকার যেমন প্রবল, তাহার প্রয়োজনও তদ্রূপ প্রচণ্ড। কিন্তু পরদেশী শাসক সম্প্রদায়ের জাতীয় স্বার্থ ইহার বিষম বিরোধী। সুতরাং সাগর-পার হইতে নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকারের ভারতের জাতীয় পোত-শিল্প ও পোত-বাণিজ্য প্রবর্দ্ধন সম্পর্কে কোন সুনির্দ্ধারিত নীতি নাই। পরন্তু এ বিষয়ে বৃটিশ পোত-শিল্পী ও পোত-বণিক্‌দিগের বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্ট ও তীব্র। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি প্রচণ্ড অভ্যাঘাত। অন্যান্য দেশের পোত-শিল্পী ও পোত-বণিক্ রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ও সহযোগিতা পায়, যাহাতে তাহারা সহজেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা পরাজয় করিতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে বিদেশী শিল্পী ও বণিক্ প্রচুর প্রশ্রয় পায়; এবং তাহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যতীত নূতন নূতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও বিলক্ষণ সুযোগ-সুবিধা পায়। ফলে, আমাদের জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দুষ্কর ও দুঃসাধ্য; অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অতীতে ভারত সরকার একটি ভারতীয় বাণিজ্য-নৌবহর গড়িয়া তুলিবার প্রতিশ্রুতি বহু বার নিশ্চয়াত্মক ভাবে দিয়াছেন। ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন যে, জাতীয় পোত পরিচালন প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ভারতের উপকূল ভাগে এবং বাহির সমুদ্রে বাণিজ্যের একটি প্রকৃষ্ট অংশ দিতে তাঁহারা বাধ্য এবং সমুৎসুক। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গীকৃত দায়িত্ব পরিপূরণের নিমিত্ত কোন কার্য্যকরী নীতি অবলম্বন করেন নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর তীব্র প্রচেষ্টার ফলে, ভারতের জাতীয় পোতগুলি উপকূল ভাগের বাণিজ্যের মাত্র শতকরা পঁচিশ অংশ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাহির সমুদ্রের বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতগুলির উল্লেখযোগ্য কোন অংশ নাই। ভারতের তটরেখার একুন দৈর্ঘ্য ৪,৫০০ মাইল; এবং ইহার বহির্বাণিজ্যের পণ্যের পরিমাণ পঁচিশ মিলিয়ন টনেরও অধিক, এবং যাত্রীর সংখ্যা লক্ষাধিক। যদিও সরকার পনর বৎসর পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় পোতগুলিকে এই যাত্রী ও মাল-পরিবহনের একটি ন্যায়সঙ্গত অংশ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি আজ পর্য্যন্ত সে অঙ্গীকার প্রতিপালনের নিমিত্ত কোন কার্য্যকরী প্রচেষ্টা অবলম্বন করেন নাই। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন উদ্যমশীল ভারতবাসী য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যে যাত্রী পরিবহনের নিমিত্ত একটি দ্রুতগামী পোত পরিচালন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারত সরকার এই প্রচেষ্টার সমর্থন ও সাহায্য দূরে থাকুক, ইহাকে বহুবিধ বাধা-বিঘ্নে প্রতিহত করিয়াছিলেন। পোত-শিল্প ও বাণিজ্যের যুদ্ধোত্তর সমুন্নয়ন-সম্প্রসারণকল্পে এই সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস ভারতবাসী সহজে বিস্মৃত হইতে পারে না।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বোম্বাই সহরে সম্প্রতি যে পোত-শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি-নির্দ্ধারণ সমিতির বৈঠক আহূত হইয়াছিল, তাহার সদস্যদের নিকট ভারত সরকার যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনই তাঁহাদিগের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এত দিনে তাঁহাদের যথার্থই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, ভারতে একটি বাণিজ্য নৌবহরের প্রয়োজন যে কেবল বাণিজ্য ব্যপদেশে, তাহা নহে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার নিমিত্তও তাহা প্রয়োজন। জাতীয় পোত-শিল্প ও বাণিজ্য সমুন্নয়ন সম্বন্ধে সরকারের এই যে নব-জাত অনুরাগ, ইহা বাস্তবিকই আশ্বাসপ্রদ। এই বিশিষ্ট পোত-শিল্প-বাণিজ্য নীতি-নির্দ্ধারণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা বাণিজ্য-সচিবের যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচায়ক। এখন এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নব-প্রেরণাকে যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যকরী করিলে ভারতের পোত-শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা অচিরে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ভারতের পোত-শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি যত শীঘ্র সমুদ্রপথে সাগর-পারের বিভিন্ন দেশ সমূহের সহিত যাত্রী ও মাল পরিবহন ব্যবসায়ের বিশিষ্ট অংশ ও অধিকার গ্রহণ করিতে পারে, ততই মঙ্গল। আমাদের দেশের ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের পোত-শিল্প ও বাণিজ্য-নৌবহর যত শীঘ্র পুষ্ট হইবে, আপৎকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত আমরা ততই প্রস্তুত হইব। শক্তিশালী বাণিজ্য-নৌবহর যেমন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের উপায়, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহে দেশরক্ষার্থ অতীব প্রয়োজন।

ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর বলিতে আমরা কি বুঝি,—তাহাও প্রণিধানযোগ্য। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পণ্য বহন করিবার নিমিত্ত বৃটিশ জাহাজ-মালিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত জাহাজ সমূহ ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর নহে। এমন কি, ভারতের রৌপ্যমুদ্রায় নির্দ্ধারিত মূলধনে ভারতে ভারতীয় আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রীকৃত পরদেশী-পরিচালিত জাহাজ-কোম্পানীর নৌ-বহরকেও আমরা ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর বলিব না। এইরূপ জাহাজ কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলীতে কয়েক জন ভারতবাসী পরিচালক থাকিলেও আমরা তাহাকে ভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন জাহাজ-কোম্পানী রৌপ্য মুদ্রা-মূলধনে ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত হইতে পারে; এবং ইহার পরিচালক-মণ্ডলীর অধিকাংশ ভারতবাসী হইতে পারে। বহু দিন হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত যে-কোন বৃটিশ-কোম্পানী উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানে তাহার জাহাজগুলি হস্তান্তরিত করিতে পারে; এবং এইরূপ হস্তান্তর-করণের পরেও পরদেশী ধনিকগণ অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে তাহাদের স্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই প্রকার অপ অথবা কূট কৌশলে পরিচালিত পরদেশি-শাসিত নৌ-বহরকেও আমরা ভারতীয় সংজ্ঞা দিতে পারি না। ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর আখ্যায় আমরা যথার্থই জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর কামনা করি; ভারতবাসীর অর্থে, ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারে, ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত বাণিজ্য-নৌ-বহরই যথার্থ 'জাতীয়' আখ্যা পাইবার উপযুক্ত। যে জাহাজ-কোম্পানীর সংগঠনে এই তিনটির কোনটির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভাব তাহা জাতীয় নহে; তাহা মিশ্র অথবা আন্তর্জ্জাতিক।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যখন স্বনামধন্য স্যার সি,, পি, রামস্বামী আয়ার কিছু দিনের জন্য ভারতের বাণিজ্য-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসী কর্ত্তৃক সংগঠিত প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত উপকূল-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার-সাধনের নিমিত্ত ভারত সরকার বিশেষ ভাবে ব্যগ্র।" ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন সার জোসেফ ভোর ভারতের বাণিজ্য-সচিব, তখনও তিনি এই নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারত সরকার সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবেন এবং সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারভুক্ত বাণিজ্য-নৌ-বহর ক্রমোন্নতি লাভ করে।" এই দুই জন মনীষী সচিবের উক্তি হইতেও স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, "ভারতীয়" সংজ্ঞায় "জাতীয়" নৌ-বহরই তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয়; এবং জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর প্রতিষ্ঠাই তথাকথিত শাসন-সংস্কার-সম্ভূত বর্ত্তমান ভারত সরকারের নীতি-সম্মত।

কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই সহরে যে পোত-শিল্প-বাণিজ্য নীতি নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পরদেশী পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই নিমিত্ত সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি

সুবিখ্যাত শিল্পরথী মিষ্টার বালচাঁদ হীরাচাঁদ ঐ সমিতিতে নৌবহর সম্পর্কে "ভারতীয়" সংজ্ঞার অর্থ "জাতীয়" কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরাধীন ভারতের বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন। সুতরাং তাঁহারা যে নিছক জাতীয় পোত-শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষপাতী, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নহি। পূর্ব্ব হইতেই ভারতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের হানি ঘটে, এরূপ কোন প্রচেষ্টা তাঁহাদের অনুমোদিত হইতে পারে না। ভারত সরকারের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য বোধ হয় এই পর্য্যন্ত যে, প্রাচীন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পরদেশী অথবা স্বদেশি-বিদেশি-মিশ্রিত প্রচেষ্টার সহিত যতটা সম্ভব তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ভাবে আপত্তির কোন কারণ ঘটিবে না। সাগরপারের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বর্ত্তমান ভারতীয় শাসন-তন্ত্রের পক্ষে ইহার অধিক অগ্রগতিশীল নীতি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বোম্বাই বৈঠকের সদস্যগণ মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদের সংশয়-সমস্যার কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহারা নিশ্চিত "শ্যাম ও কুল" দুই-ই রক্ষা করিয়া চলিবার বিধান দিয়াছেন।

যাহা হউক, বোম্বাই বৈঠকের সদস্যদিগের নিকট প্রচারিত অনুষ্ঠান-পত্রের নির্দ্দেশ যে, "নিখিল জগতের পরিবহন ব্যবসায়ে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণই আমাদের যুদ্ধোত্তর পোত-নীতির উদ্দেশ্য ;"—ইহাই আমাদের আশু প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, আমাদের অবশ্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির জাহাজ ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে সিংহল ও বর্ম্মার সহিত বাণিজ্যে উত্তরোত্তর অধিকতর অধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্ররোচনায় সরকার যদি যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট প্রদান দ্বারা ভারতের জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুশী রাখিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেই অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকে পরিণত হইবে। জাতীয় পোত-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় পোতগুলিকে ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে এবং সিংহল ও বর্ম্মার সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে উত্তরোত্তর অধিকতর অংশ দিতে হইবে। যখন নিখিল জগতের সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোত যথোপযুক্ত অধিকার-বিস্তার করিতে অভিলাষী, তখন তাহার স্বদেশীয় উপকূলে তাহাকে শ্রদ্ধা অথবা অশ্রদ্ধার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ অধিকার দিয়া তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা অত্যন্ত অসঙ্গত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বদেশীয় উপকূলে জাতীয় পোতের অপ্রতিহত অধিকার। ইহাই চিরন্তন ন্যায়সঙ্গত নীতি। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান-পত্রে যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, পারস্য উপসাগর, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মালয় এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতগুলির একটি ন্যায়সঙ্গত অংশ থাকা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্যে এবং ভারত ও যুক্তরাজ্য এবং য়ুরোপীয় মহাদেশের মধ্যে এবং উত্তর-আমেরিকার সহিত বাণিজ্যেও ভারতের জাতীয় পোতগুলির যথাযোগ্য অধিকার আবশ্যক। আমাদের সর্ব্ববিধ অধিকার-বিস্তার প্রস্তাবে সরকারের শুভ ইচ্ছা চির-প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই শুভ ইচ্ছা,—চিরদিন উচ্চ ঘোষণা মাত্রেই পরিসমাপ্তি লাভ করে, কদাচিৎ ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। এই নিমিত্ত জাতীয় পোত ব্যবসায়ে ব্রতী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানবর্গ স্বভাবতঃই জানিতে সমুৎসুক যে, এই অনুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত অভিপ্রায়ের সহিত ভারত সরকারের আন্তরিক সহানুভূতির পরিমাণ কিরূপ, এবং এই প্রচেষ্টায় তাঁহারা সরকারের নিকট কি প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিবার প্রত্যাশা রাখিতে পারেন। জাতীয় পোত ব্যবসায়ে যাঁহারা লিপ্ত, তাঁহারা এখন হইতেই বুঝিতে চাহেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতের কতগুলি জাতীয় পোত প্রয়োজন হইবে এবং উপকূল ও বাহির সমুদ্রে মাল ও যাত্রী পরিবহন ব্যবসায়ে তাঁহাদের কিরূপ অধিকার লাভ ঘটিবে। এখন হইতেই চেষ্টা না করিলে, তাহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত পোত সংগ্রহ সম্ভবপর হইবে না। বিলম্বে নিষ্ফল নৈরাশ্য সুনিশ্চিত। সিন্ধিয়া ষ্টীম্ নেভিগেশন কোম্পানীর সভাপতি মিষ্টার বালচাঁদ হীরাচাঁদ পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক কাল জাতীয় পোত ব্যবসায়ে ব্রতী আছেন ; তাঁহার অভিমত এই যে, উপকূল-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অধিকার জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য প্রাপ্য। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় পোতের অধিকার। দূরবর্ত্তী সাগরপারের দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভারতের জাতীয় পোতপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাপ্য। যুক্তরাষ্ট্র, য়ুরোপীয় মহাদেশ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই পর্য্যায়ভুক্ত ; এবং পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ভারতের জাতীয় পোতবহরের অধিকার। এই অঞ্চলে অধুনা শত্রু-কবলিত দেশগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতে একটি জাতীয় বাণিজ্যপোত-বহর গড়িয়া তুলিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন এবং অপরিহার্য্য। সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-পোত-বহর জাতীয় গৌরবের বিষয়। বৃটেন চিরদিনই তাহার বাণিজ্য-পোত-বহরের গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় অর্থ-নৈতিক উন্নতি-সাধন হেতু আমাদেরও এ বিষয়ে কুণ্ঠাবোধ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। এই সম্পর্কে বৃটেনের যুদ্ধোত্তর নীতি ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ-পরিবহন মন্ত্রীর মহাসভাস্থ কর্ম্ম-সম্পাদক মিঃ লোয়েল বেকার গত বৎসর বলিয়াছিলেন যে, "যুদ্ধ-পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধান্তেও বৃটেন অবশ্যই একটি সুবৃহৎ ও কার্য্য-কুশল বাণিজ্যবহর দ্বারা নিখিল জগতের পরিবহন কার্য্য পরিচালন করিবে।" কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বৃটিশ যুদ্ধ-পরিবহন মন্ত্রী লর্ড লেদার্স এই নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বৃটেনের বাণিজ্য-বহর যুদ্ধান্তে অন্ততঃ যুদ্ধ-পূর্ব্বের ন্যায় সংখ্যা ও শক্তিবিশিষ্ট হইবে।" তিনি এই শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি পার্লিয়ামেন্ট মহাসভাকে এই সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন যে, "মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃঢ় সঙ্কল্প এই যে, বৃটিশ বাণিজ্য-বহর এবং জাহাজগুলির কর্ম্মচারী ও নাবিকবৃন্দকে পুনরায় একটি বৃহৎ এবং কার্য্যকুশল নৌ-বহরে পরিণত করিতে হইবে। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে দেখিবেন যে, এই শিল্প এবং এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধান্তে যেন যুদ্ধপূর্ব্বের ন্যায় ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করে।"

যুদ্ধান্তে যে নব পরিস্থিতির অভ্যুদয় ঘটিবে, তাহাতে ভারতেরও একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু জগতের পরিবহন ব্যবসায়ে আমাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নৌ-বহর কোথা ? কিরূপে আমরা পোত নির্ম্মাণ করিব, অথবা কোথা হইতে আমরা পোত সংগ্রহ করিব, এই প্রশ্নই আমাদের কঠিন সমস্যা।

ভারতে পোত-নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান-উপকরণের অভাব নাই এবং ভারতীয় ধনিক-বণিক ও শিল্পী-শ্রমিকের উত্তম ও আগ্রহের অন্ত নাই। নৌ-বহর-পতি এড্‌মিরাল স্যার হারবার্ট ফিজহারবার্ট দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যত শীঘ্র ভারতে পোত-নির্ম্মাণ শিল্প প্রবর্ত্তিত হয়, ততই মঙ্গল। এইরূপ শিল্পের সাফল্যের নিমিত্ত প্রয়োজন সাহস, উত্তম ও ভবিষ্যৎ চিন্তা। ইহার সকলগুলিই যে ভারতে বিদ্যমান তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।" সংপ্রতি ভারতে একটি পূর্ণাঙ্গ পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ভারতীয় অর্থ-সামর্থ্যে ইহা সুপরিচালিত; কিন্তু ভারতের সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণের অধিকার নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধপরিচালনার্থ জাহাজের তীব্র ও তীক্ষ্ণ অভাব সত্ত্বেও বিলাতের পোত-শিল্পী-কারিকরগণের স্বার্থের ব্যাঘাত আশঙ্কায়, বৃটিশ ও ভারত উভয় সরকারই ভারতের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ না হউক, ব্যাহত করিতেছেন। আমরা যে আমাদের দেশে মাত্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে অধিকারী নহি, তাহা নহে, আমরা ভিন্ন দেশ হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয় করিতেও অধিকারী নহি। যুদ্ধারম্ভে ভারতের নৌ-বহর ছিল অতি ক্ষুদ্র; তথাপি ইহা দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও যুদ্ধের অন্যান্য কর্ম্মে ভারত মহাসাগর হইতে বহু দূরে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ফলে, এই ক্ষুদ্র নৌ-বহর যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির অভিঘাতে ক্ষুদ্রতর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নৌ-বহর ভারত সরকারকে ঋণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের অধিকারে ছিল। সুতরাং ঋণগ্রহীতার মৌলিক দায়িত্ব অনুযায়ী এই নৌ-বহরকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রত্যর্পণ করাই ভারত সরকারের নৈতিক কর্ত্তব্য। বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারত সরকার ভারতীয় পোত-অধিকারীদের এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন! বৃটিশ পোত অধিকারীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। যুক্তরাজ্যে বৃটিশ সরকার বৃটিশ পোত-মালিকদিগের যুদ্ধজনিত ক্ষয় ও ক্ষতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূরণ করেন। পরাধীন ভারতে বিপরীত বিধান। ভারতবাসীর পোত-নির্ম্মাণে অধিকার নাই; এবং তাহাদের মুষ্টিমেয় পোতগুলির সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত অবস্থায় ক্ষয় ও ক্ষতিও সরকার পূরণ করিতে নারাজ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাহার অতি প্রত্যাশিত ও সমীচীন কর্ম্মপরিধির প্রসার দূরে থাকুক, যুদ্ধ-পূর্ব্বে তাহার যতটুকু কর্ম্ম-সামর্থ্য ছিল, তাহাও বহুল পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইবে।

সরকারের প্রকৃষ্ট সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি পূরণ কোন পোত-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিলাতের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে যাহা সম্ভব, ভারতের দুর্ব্বল শিশুপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ-বীমার ফলে যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে নূতন-নির্ম্মাণের ব্যয় যেমন অত্যধিক, অচল অবস্থা-প্রাপ্ত জাহাজগুলির নিমিত্ত যৌথ-কারবারের সালতামামী হিসাবে যে ক্ষয়-পূরণ ব্যয় বরাদ্দ থাকে, তাহা হইতে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন জাহাজ সংগ্রহ করিবার ব্যয়ও তেমনি অত্যধিক। এ বিষয়ে বিলাতী প্রতিষ্ঠান-গুলি বৃটিশ সরকারের যথাসম্ভব সাহায্য পাইবার আশ্বাস পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে ভারত সরকার বিধান দিয়াছেন যে, ভারতের ক্ষীণ-জীবী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই তাহাদের যুদ্ধ-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে। সাহায্যের পরিবর্ত্তে অধিকতর পীড়ন ব্যবস্থা! পরাধীন দেশের পরদেশি-নিয়ন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক শাসন-তন্ত্রের পক্ষে সেই দেশের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে এইরূপ "কাজির বিচার"ই নির্দ্ধারিত! বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে, ঐ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশসমূহ তাহাদের জাতীয় নৌ-বহরকে আয়তনে ও পরাক্রমে প্রবলতর করিয়া গড়িয়াছিল। কিন্তু ভারতের তিন দিক্ যদিও সমুদ্র-মেখলায় পরিবৃত, তথাপি পরাধীন ভারত সরকার তদ্বিষয়ে কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই; পরন্তু, ভারতীয় শিল্পী বণিকদিগের এই সম্পর্কে ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়াও সঙ্গত মনে করেন নাই। আশা কুহকিনী। এই নিমিত্ত আমরা এখনও আশা করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অতি-তিক্ত ও তীব্র অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা সরাসরি কোন প্রচেষ্টা না করিলেও ভারতীয় শিল্পী বণিকগণকে বাধাবিঘ্নে বিপন্ন করিবেন না। বিগত মহা-যুদ্ধের অবসানে এ বিষয়ে অবহিত হইলে, আজ তাঁহাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইত না যে, "গভীর সমুদ্রগামী জাহাজের অভাব ভারতে শোচনীয়রূপে প্রচণ্ড।" দুর্ভিক্ষে মরণোন্মুখ দেশবাসীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সাগরপার হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিবার মত জাহাজও আমাদের নাই!

কেবলমাত্র জাহাজ গড়িয়া তুলিলেই যে জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহরের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে, তাহা নহে। সেই সকল জাহাজে উপযুক্ত পরিমাণে মাল সরবরাহ করিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরি-বহনোপযোগী মালের তুলনায় জাহাজের সংখ্যা অল্প অথবা অধিক হইলে, কিংবা জাহাজের সংখ্যার তুলনায় পরিবহনোপযোগী মালের পরিমাণ অল্প অথবা অধিক হইলে, পরস্পরের গলাকাটা প্রতি-যোগিতার উৎপত্তি ঘটিবে। প্রবল পরাক্রমশালী পরদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সহিত যদি এইরূপ পরিস্থিতির অভ্যুদয় ঘটে, তাহা হইলে ক্ষীণবল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। যুদ্ধান্তে সমুদ্র-শক্তির বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এই নিমিত্ত বিলাতেও এই সমস্যা প্রবল হইয়াছে। সম্প্রতি বিলাতে লর্ড মহাসভায় লর্ড রদারউইক্ এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, "পোত-পরিচালন ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক পোতপরিচালন-বৈঠকের একটি অধিবেশন প্রয়োজন। বেসরকারী প্রচেষ্টা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা লক্ষ্যে রাখিয়া চাহিদার অনুপাতে জাহাজ সরবরাহের এবং জাহাজে মাশুলের মাত্রা পরিমিত পর্য্যায় রাখিবার নিমিত্ত একটি যুক্তিসঙ্গত বন্দোবস্ত বিশেষ আবশ্যক।" আজ যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া বৃটেন জাহাজে মাশুলের মাত্রা পরিমিত রাখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এত দিন ভারতে বৃটিশ পোত-পরিচালন-প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় পোত-পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ করিবার নিমিত্ত যদৃচ্ছা মাশুল কমাইয়া জাতীয় পোতগুলির সহিত গলাকাটা প্রতিযোগিতা চালাইয়াছেন। সে অপ্রীতিকর আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। যাহা হউক, ইহা এখন স্বতঃসিদ্ধ যে, ভারতে একটি স্থায়ী শক্তিশালী জাতীয় বাণিজ্য নৌ-বহর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ভারত সরকারকে তাহার কল্যাণকর কার্য্যকরী সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুঃসময়ে ইহা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যুদ্ধের অভিঘাতে নৌ-শক্তি হিসাবে বৃটেনের প্রবল আধিপত্যের অবসান ঘটিয়াছে। আমেরিকা আজ নৌ-বহরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৯৪২

খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে দুই বৎসর আট মাসে আমেরিকা ৪০ মিলিয়ন টন জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। যুদ্ধান্তে এই সকল যুদ্ধ-জাহাজ নিখিল জগতের বাণিজ্য নৌ-বহরের যুদ্ধ-পূর্ব্ব পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটাইবে। সমুদ্রবক্ষে আমেরিকাই মিত্রসঙ্ঘের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধান্তে মার্কিণের নব-নির্ম্মিত জাহাজগুলির বিলি-ব্যবস্থা একটি বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিবে। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমুদ্র-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ দেশ সমূহের মধ্যে পরাধীন ভারতের পোতসংখ্যা শোচনীয়রূপে কম। ইংলণ্ডের ব্যবসায় ভারতের ব্যবসায় অপেক্ষা মাত্র সাড়ে ৫১ গুণ অধিক, কিন্তু বৃটেনের জাহাজ-গুলির মাল-বহন করিবার শক্তি ভারতের ঐ শক্তি অপেক্ষা ১৩৫ গুণ অধিক। সমুদ্র-বাণিজ্যে-প্রবল সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ সমূহের মধ্যে জাতীয় জাহাজসংখ্যার এই যে প্রচণ্ড পার্থক্য, যুদ্ধান্তে ইহার সমঞ্জস ও সমীচীন প্রতিকার প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী এবং সমুদ্রবাণিজ্যে প্রকৃষ্ট সুযোগ-সম্পন্ন দেশ সমূহের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ হেতু বর্ত্তমান অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক সংখ্যক বাণিজ্য জাহাজের প্রয়োজন। যুদ্ধান্তে আমাদের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির উপায়-উপকরণের নিমিত্ত বৃটেন অপেক্ষা আমেরিকার উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে। এই নিমিত্ত কিছু দিন পূর্ব্বে আহূত আন্তর্জ্জাতিক কারকারবার বৈঠকের ভারতীয় সদস্যমণ্ডলীর নায়ক ও উপনায়ক উভয়েই ভারতের সহিত মার্কিণের কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে নহে, যাতায়াত সম্পর্কেও একটি ত্বরিত বন্দোবস্তের আশু প্রয়োজন ঘোষণা করিয়াছেন। স্বদেশে পোত নির্ম্মাণ ব্যতীত ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আমাদিগের বাণিজ্য-পোত ক্রয় করিতে হইবে। ভারতের উপকূলে ভারত মহাসাগরে আমাদের জাতীয় পোত বাণিজ্যের প্রসার, বাহির দরিয়ায় বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতের যথাযোগ্য অধিকার এবং নিখিল জগতের পরিবহন ব্যবসায়ে আমাদের একটি প্রকৃষ্ট অংশ ব্যতীত ভারতে শক্তিশালী বাণিজ্য নৌবহর প্রতিষ্ঠার আশা বৃথা। ইতিমধ্যে যুদ্ধান্তে বাণিজ্য-নৌবহরের সমঞ্জস ও সমীচীন বিতরণের জন্য মিত্রশক্তিসঙ্ঘ মধ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক বন্দোবস্ত নিষ্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের সহযোগ আছে কি না আমরা জানি না। অনতিদূরবর্ত্তী শান্তি বৈঠকে ভারতের দাবী জানাইয়া ভারতের যথাযোগ্য অধিকার আদায় করিতে হইবে। পোত-শিল্পে ও পোত-বাণিজ্যে ভারতের প্রয়োজন কোন স্বাধীন দেশ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

স্বর্ণ-মৃগ

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

রামায়ণের কাহিনী—শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-মৃগ আহরণ করিতে গিয়া প্রাণাধিকা সীতাকে হারাইয়াছিলেন। রামায়ণের যুগ অনেক কাল শেষ হইয়াছে। সে যুগও নাই, সে কালের ঘটনাও ঘটে না। সে কালে যাহা সম্ভব হইত, আজ তাহা শুধু মনের কোণেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে আজও এমন এক-একটি ঘটনা ঘটে, যাহার দোলায় পুরাকালের রূপকথার স্মৃতি মানসপটে ফুটিয়া উঠে।

ভারতবাসীর বর্ত্তমান স্বর্ণক্রয়ের উন্মত্ততা শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণ-মৃগ আহরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বর্ণক্রয়ের বিনিময়ে ভারতকে যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করিতে হইতেছে, তাহার যথাযথ হিসাব-নিকাশ যুদ্ধোত্তর কালেই সম্ভব হইবে। আজ তাহার আংশিক আভাস মাত্র দেওয়া চলে।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর দরবারে ভিখারী। কিন্তু এক দিন এই ভারতভূমি ছিল সত্যসত্যই লক্ষ্মীর বরকন্যা। ভারতের জমি ছিল স্বর্ণপ্রসূ। ভারতমাতার সন্তানেরা নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বহির্বাণিজ্যের দ্বারা রাশি রাশি স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছিল। অর্থ-নৈতিকেরা বলেন, সে স্বর্ণের পরিমাণ ছিল এক সহস্র কোটি মুদ্রারও উর্দ্ধে।

সৎমায়ের চক্ষে সন্তানের ঐশ্বর্য্য যেমন পীড়াদায়ক, ভারতের এই স্বর্ণভাণ্ডার বিদেশীয়দের নিকট তেমনি ছিল উদ্বেগের কারণ। বিদ্রূপের ছলে তাহারা বলিত, ভারতবর্ষ সোনার অতল সমাধিক্ষেত্র। যদিও অবস্থার চক্রান্তে আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সঞ্চিত সমুদয় স্বর্ণের শতকরা আশী ভাগ হস্তগত করিয়া বসিয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ শ্লেষযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি করা কাহারও সাহসে কুলায় না।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ভারতের সোনার বাজারে ইহাতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার [illegible] সুদূরপ্রসারী। সোনার দাম তখন এ দেশে ভরি-প্রতি ২০।২৫৲ টাকার বেশী ছিল না। বৃটিশ সরকারের অর্থভাণ্ডারে সোনার যে পরিমাণ ঘাটতি দেখা দিয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার জন্য সাধারণতঃই তাহাদের দৃষ্টি ভারতের উপর পড়ে। ভারত সরকারের মারফৎ তখন সোনা-ক্রয়ের হিড়িক পড়িয়া যায়, আর সেই সোনা বাক্সবন্দী হইয়া ক্রমাগত জলস্রোতের মত ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ সরকারের কুক্ষিগত হইতে থাকে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্বর্ণ-রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ন্যূনকল্পে ৩,৫১৪,০০০,০০০ মুদ্রা—সমগ্র ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশের উপর। সমসাময়িক সংবাদ-পত্রে, ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রকার স্বর্ণ-রপ্তানীর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করা হয়। অন্য কোনও সভ্যদেশে এইরূপ জনমত উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইত কি না জানি না—কিন্তু ভারত পরাধীন, প্রতিবাদ করিতে সে পারে, কিন্তু প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়? তাই ভারতীয় স্বর্ণভাণ্ডার ইংলণ্ডের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

আজ আবার ইঙ্গ-মার্কিণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতীয় স্বার্থের বলিদান-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে সৈন্য মোতায়েন করিতে হইয়াছে। এই সব সৈন্যদের ভরণ-পোষণের জন্য বা যুদ্ধসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনে বিপুল অর্থের আবশ্যক। এই অর্থের চাহিদা মিটাইবার জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সরকার। ভারত সরকারের মারফৎ বর্ত্তমান স্বর্ণ-বিক্রয়ের মূলেও রহিয়াছে একই পরিকল্পনা।

এ দিকে ভারত সরকার বড়-গলায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, স্বর্ণ-বিক্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ফীতি দমন করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ

বাহিরের সমসাময়িক কালে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি মুদ্রার কিছু বেশী।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪৯ কোটি মুদ্রার উপর; ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে উহার পরিমাণ হইয়াছে ৯২৭ কোটি মুদ্রা; আর বর্ত্তমান বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের হিসাবে দেখা যায়, নোটের পরিমাণ হইয়াছে ১০৩৪ কোটি মুদ্রার উপর। চলতি নোটের পরিমাণ যদি এই ভাবে বাড়িয়াই চলে, তবে স্বর্ণ-বিক্রয় দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি-দমনকার্য্য কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা ভাবিবার কথা বটে!

ভারতবর্ষে মোতায়েন সৈন্যদের খরচ মিটাইবার জন্য যে পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহার সংস্থান নিম্নলিখিত দুই ভাবে সম্ভব হইতে পারে।

১। যদি ভারতবর্ষের নিকট ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পাওনার পরিমাণ তাহাদের দেনার চেয়ে বেশী হয়, তবে ঐ পাওনা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা। ভারতবর্ষের যে সকল পাওনা ইংলণ্ডে উৎপত্তি হইতেছে, তাহা বৃটিশ সরকার নিজের দেশীয় মুদ্রায় (ষ্টার্লিংএ) হিসাব করিতেছে। শত্রুর ইউবোট আক্রমণের ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার রপ্তানী বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, পরন্তু ইংলণ্ডের নিকট ভারতীয় পাওনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও দিনের পর দিন পাওনার আকার বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সে সম্পদ্ ভারতবর্ষের কোন উপকারে আসিবে কি না তাহার আলোচনা বারান্তরে করাই ভাল।

২। দ্বিতীয় উপায় স্বর্ণ-রপ্তানীর দ্বারা। সোনাও যে ইহাদের নাই তাহা নয়। তবে তাহারা উহা রপ্তানী করিতেছে না কেন? ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রয়টারের খবরে স্বর্ণ-বিক্রয়ের তাৎপর্য্য কতকাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সংবাদ অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিসেম্বর মাসের পত্রিকায় না কি বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সোনার সরকারী যে দাম, তাহার বহু উচ্চে সোনা মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন্, আরব, ইরাণ, ভারতবর্ষ ও চীনে বিক্রয় হইতেছে। উদ্দেশ্য—সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা আর মিলিত শক্তির যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয়ের সংস্থান করা।

সংবাদপত্রে প্রচারিত বাজার-দর হইতে জানা যায়, বর্ত্তমান বৎসরের ১০ই জানুয়ারী সোনার দর বোম্বাইয়ে ছিল ভরি-প্রতি ৭৪।৶০ আনা আর ঐ দিন ইংলণ্ডের বাজার-দর ছিল আউন্স প্রতি ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং ষ্টার্লিং মাত্র; তোলা-প্রতি ১৮০ গ্রেণ আর টাকা প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স ধরিয়া হিসাব করিলে ইংলণ্ডে সোনার মূল্য তোলা প্রতি হয় ভারতীয় মুদ্রামানের ৪২ টাকা মাত্র।

আর ভারতবর্ষে ঐ সোনাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ বিক্রীত হইতেছে ভরি-প্রতি ৭১।৭২ টাকা দরে! অর্থনীতির দিক্ দিয়া এইরূপ দুর্নীতি কোন সভ্যদেশে যে আজও চলিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সরকার-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বাজার-দর অনুযায়ী অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেমন, সে তুলনায় সোনার দর বিশেষ কিছু বেশী নয়! কিন্তু ভারতের এইরূপ বিপুল মূল্যবৃদ্ধির কারণও ইঙ্গ-মার্কিণ প্রয়োজন মিটাইবার' এবং সরকার-পক্ষের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের অসাফল্যের জন্য। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মূল্য-তালিকাকে মানস্বরূপ (অর্থাৎ ১০০) ধরিয়া দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে মূল্যবৃদ্ধি নিম্নলিখিত ধারায় হইয়াছে।

১নং তালিকা

ইরাক	৬৯২	(নভেম্বর ১৯৪৩)
ইরাণ	৪৯৫	"
প্যালেষ্টাইন	৩২৫	"
মিশর	২৯১	"
ভারতবর্ষ	৩১৮	"

২নং তালিকা

ইংলণ্ড	১৬৭	(নভেম্বর ১৯৪৩)
ক্যানাডা	১৪০	"
অষ্ট্রেলিয়া	১৩৮	"
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১৫৪	"
মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র	১৩৫	"

৩নং তালিকা

জার্ম্মাণী	১০৯	(নভেম্বর ১৯৪৩)
জাপান	১৪৪	"

উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পণ্যদ্রব্যের সর্ব্ববিধ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে অধীন দেশগুলিতে (যেমন ইরাক্, ইরাণ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি)। যদিও নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে জার্ম্মাণী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তবুও ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রশংসনীয়। যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা নিজের দেশে ইংরেজগণ দ্রব্যমূল্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পূরাপূরি না হইলেও আংশিক ভাবে তাঁহাদের জমিদারী অভাগা ভারতভূমিতেও করিতে পারিতেন না কি? কিন্তু সে কথা দূরে থাকুক, এই ডামাডোলের বাজারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ৪২।৪৩ টাকা মূল্যের সোনা ৭১।৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছেন। ফলে ভরি-প্রতি ইংরেজ সরকারের মুনাফা হইতেছে প্রায় ২৯ টাকা।

কিন্তু সরকার কি সত্য সত্যই স্বর্ণমূল্য সম্বন্ধে সন্দেহহীন? যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহারা বাজার-দর অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টের গচ্ছিত সোনার মূল্য নূতন ভাবে স্থিরীকৃত করিতেছেন না কেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ (৪) ধারা অনুযায়ী সোনার মূল্য টাকা প্রতি ৮·৪৭৫১২ গ্রেণ অর্থাৎ ভরি প্রতি প্রায় ২১ টাকা ৩ আনা ৯ পাই মাত্র।

সরকার হয়তো মনে করেন, আর মনে করা স্বাভাবিকও যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন শেষ হইয়া যাইবে পণ্যমূল্য তখন নিম্নগামী হইবে। স্বর্ণ-মূল্য তখন আর এমন গগনস্পর্শী থাকিবে না। সরকার যখন তাঁহাদের ক্ষয়-ক্ষতির প্রতি এতই জাগরূক, তবে দেশবাসীর স্বার্থ এমন দ্বিধাহীন ভাবে কেনই বা জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে? যাহারা এখন এই নিদারুণ মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে, তাহাদের অবস্থা যুদ্ধোত্তর কালে কিরূপ হইবে? সঞ্চিত স্বর্ণ পুনরায় বিক্রয় করিয়া তাহারা ইহার অর্দ্ধেক মূল্যও পাইবেন কি? সরকার কি তখন আবার বর্ত্তমান মূল্যে উহা ক্রয় করিবেন? সরকার হয়তো তাহা করিবেন না। সুতরাং এই সব উচ্চমূল্যে অর্জ্জিত সোনা আত্মীয়-পরিজনের দেহে অলঙ্কারস্বরূপ শোভা পাইয়া তাহাদেরই পূর্ব্বদিনের মূর্খতার সাক্ষী হইয়া থাকিবে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

কবিরাজ শ্রীনলিনাক্ষদাস মহাপাত্র

বায়ু, পিত্ত ও কফ কি ?

বাড়ীতে কবিরাজ মশায় এলেই বায়ু, পিত্ত ও কফের কথা শোনা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম বা রোগীর পথ্যাপথ্য বিচারের প্রয়োজন হ'লে কোন্ খাদ্য বায়ুকারক, পিত্তকারক বা কফকারফ এবং কোন্‌টাই বা বায়ুনাশক, পিত্তনাশক বা কফনাশক এই সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়। অথচ বায়ু, পিত্ত ও কফ যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ জানা নেই। এই সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানা থাকলে আমরা অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পাই এবং দীর্ঘজীবী হয়ে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারি। বায়ু, পিত্ত ও কফ এদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি ? "বা" ধাতুর অর্থ গমন করা, তা থেকে কৃৎযোগে হয়েছে বায়ু অর্থাৎ গতিমান্ পদার্থবিশেষ। "তপ্" ধাতুর অর্থ উত্তাপ দেওয়া, তা থেকে কৃৎযোগে বর্ণাগম বিপর্যায়ে হয়েছে পিত্ত অর্থাৎ উষ্ণ পদার্থবিশেষ। "কফ্" ধাতুর অর্থ দান করা, তা থেকে কৃৎযোগে হয়েছে কফ অর্থাৎ যাহা কিছু দান করে। আবার কফের অপর নাম শ্লেষ্মা। "শ্লিচ্" ধাতুর অর্থ সংযুক্ত হওয়া, তা থেকে কৃৎযোগে হয়েছে শ্লেষ্মা অর্থাৎ সংযোজক পদার্থবিশেষ।

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে সুশ্রুতে আছে ;—দেহোৎপত্তির মূলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি। আবার কফ, পিত্ত বা বায়ু ছাড়া কোন রকমেই দেহ থাকতে পারে না। যেমন চন্দ্র জগৎকে স্নিগ্ধতা দান করে, সূর্য্য জগতের রসগ্রহণ করে, এবং বায়ু সে রস চতুর্দ্দিকে মেঘরূপে বিক্ষিপ্ত ক'রে বর্ষণাদি দ্বারা জগৎ রক্ষা করে, সেইরূপ জীবন্ত দেহ-স্থিত কফ শরীর গঠনের উপাদান যোগাচ্ছে, পিত্ত সেই উপাদান নিয়ে পরিপাক করছে স্বীয় অগ্নি দ্বারা এবং বায়ু সেই পরিপক্ক দ্রব্য শরীরের প্রতিটি অংশে সঞ্চালিত করে শরীর রক্ষা করছে বলেই আমরা বেঁচে আছি।

পাশ্চাত্ত্য মতেও শরীরের প্রধান উপকরণ তিনটি,—প্রোটিন, কার্ব্বোহাইড্রেট আর চর্ব্বি। খাদ্যে এই তিনটি উপকরণ থাকা প্রয়োজন।

প্রোটিন শরীরের গঠনমূলক উপাদান, কার্ব্বোহাইড্রেট বায়বীয় উপাদান এবং চর্ব্বি আগ্নেয় উপাদান। খাদ্যস্থিত প্রোটিন থেকে অনেক পরিবর্ত্তনের পর শরীরের এই জান্তব টিসু প্রোটিন তৈরী হয়। খাদ্যস্থিত কার্ব্বোহাইড্রেটও গ্লুকোজে পরিণত হ'য়ে নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পর কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস রূপ বায়বীয় পদার্থে পরিণত হ'য়ে বায়বীয় উপাদানের কার্য্য করছে। আর খাদ্যস্থিত চর্ব্বি শরীরে অগ্নির কার্য্য করছে এবং শরীরের বিভিন্নাংশে জমা হচ্ছে ও দহনের ফলে শেষে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং প্রোটিন কফের কার্য্য অর্থাৎ টিসু গঠনের কার্য্য, কার্ব্বোহাইড্রেট বায়ুর কার্য্য এবং চর্ব্বি পিত্তের কার্য্য করছে, এটা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ ছাড়া কোন জীবন্ত দেহের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ পাশ্চাত্ত্য মতে কার্ব্বোহাইড্রেট, চর্ব্বি ও প্রোটিন জীবদেহের অত্যাবশ্যকীয় মূল উপাদান। আবার আয়ুর্ব্বেদ মতে কষায় রসবিশিষ্ট দ্রব্য শরীরের বায়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কটু রসবিশিষ্ট দ্রব্য পিত্তের পরিমাণ এবং মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য কফের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

পরিদৃশ্যমান জগৎ কতিপয় দ্রব্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, তন্মধ্যে কতক চেতন দ্রব্য আর কতক অচেতন দ্রব্য। জীব হচ্ছে এই চেতন দ্রব্য। আবার কি চেতন, কি অচেতন সমুদয় দ্রব্য-সৃষ্টির মূল উপাদান পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি। তবে জীবের উপাদানের বিশেষত্ব এই যে, তাহার দেহ-গঠনে এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত ঊনবিংশতিটি সূক্ষ্ম উপাদানযুক্ত পুরুষ বা চৈতন্যশক্তির সমবায় সম্বন্ধ রয়েছে।

এখন পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা শরীরের গঠন ও রক্ষণকার্য্য কি ভাবে চলছে দেখা যাক্। ক্ষিতি ভূতের দ্বারা শরীরের প্রতি অংশের আণবিক (cells) গঠনকার্য্য সম্পাদিত হয়েছে ? অপ্ ভূতের দ্বারা শরীরের প্রতি অংশের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তেজো ভূতের দ্বারা শরীরের তাপমান (caloric) রক্ষিত হচ্ছে এবং দ্রব্য থেকে দ্রব্যান্তরে পরিণতির কার্য্য (metabolim) সাধিত হচ্ছে। বায়ু ভূত দ্বারা দ্রব্য শরীরের এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে প্রেরিত হচ্ছে। আকাশ ভূত দ্বারা শরীরের প্রতি অংশের ভিতর দিয়ে স্থূল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্রোত প্রভৃতির (vessels) সন্নিবেশে শরীর গঠিত হচ্ছে। গর্ভশরীরারম্ভ সময় প্রত্যেক জীবের দেহ এই পঞ্চ মহাভূতের একটি বিশিষ্ট সমানুপাতিক পরিমাণ নিয়েই গঠিত হয়েছে। দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকের পরিমাণ মাত্রা বেড়ে চলে, কিন্তু উহাদের পরস্পরের অনুপাত (ratio) ঠিক থাকে। পঞ্চ মহাভূতের যে অনুপাতে গর্ভশরীর আরম্ভ হয়েছে ঠিক সেই অনুপাতই মৃত্যু পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। পাঞ্চভৌতিক খাদ্যদ্রব্যের পঞ্চ মহাভূতবিশিষ্ট পরিপাকের দ্বারা শরীর পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হয়ে শরীরে পঞ্চ মহাভূতের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে দেহ বৃদ্ধি করছে। আবার শ্রমাদি নানাবিধ কারণে শরীরের পাঞ্চভৌতিক উপাদানের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। খাদ্য গ্রহণে সেই ক্ষয়ের পূরণ হয়ে পঞ্চ মহাভূতের সমতা রক্ষিত হচ্ছে। পঞ্চমহাভূতের যে কোন একটির পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেই পঞ্চ মহাভূতের সমানুপাত নষ্ট হওয়ায় দেহের উপাদানগত সম্বন্ধও বিনষ্ট হয়, এবং জীবের মৃত্যু ঘটে। কাজেই শরীরের বৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই এই পঞ্চ মহাভূতের সমানুপাত রক্ষা করে চলা উচিত। প্রতি মুহূর্ত্তে এই সমানুপাত রক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যদি আমরা কখনও খাদ্য না পাই বা যে খাদ্য পাই তাতে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে যে ভূতাংশের ক্ষয় হয়েছে, সেই ভূতাংশের একান্ত অভাব বা যে পরিমাণ সেই ভূতাংশ আছে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত ভূতাংশের পূরণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, অথচ যে মুহূর্ত্তে সেই সেই ভূতাংশের ক্ষয় হয়েছে সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের পূরণ করিয়া পঞ্চ মহাভূতের সমানুপাত ঠিক রাখা প্রয়োজন ; সে জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি খাদ্যের ভাণ্ডার আছে। এই খাদ্যভাণ্ডার সমূহ শারীর পাঞ্চভৌতিক উপাদানেই গঠিত। খাদ্য থেকে শরীরবৃদ্ধির জন্য যেরূপ এক দিকে পাঞ্চভৌতিক উপাদানবিশিষ্ট রস ধাতু তৈরী হয়ে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতুর পুষ্টি ও পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা শরীরের পঞ্চ উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে, সেইরূপ অন্য দিকে শরীরের পাঞ্চভৌতিক অনুপাত অনুক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য খাদ্য থেকে আরও কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য তৈরী হয়ে এই সব শারীর খাদ্য-ভাণ্ডারগুলির পূরণ করছে।

বলা বাহুল্য, এই সব শারীর খাদ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন মত অনুক্ষণই শারীর পাঞ্চভৌতিক উপাদানের পূরণ হচ্ছে। এই শারীর খাদ্যভাণ্ডার সংখ্যায় ১৫টি। এই পঞ্চদশ শারীর খাদ্যভাণ্ডারকে পাঞ্চভৌতিক ভিত্তিতে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সকলেই জানেন, দ্রবীভূত না হলে শরীরে কোনও পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অপ্ ভূত প্রায় শরীরের সর্ব্বত্রই এই দ্রাবণ-কার্য্য করছে। সে জন্য পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের আপ্যভাব শারীর প্রাণে সমুদয় দ্রব্যেরই medium আর আকাশ ভূত ত inter celluter space হিসাবে শরীরের সর্ব্বত্র বিরাজমান। শারীর পাঞ্চভৌতিক পঞ্চজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রায় সমস্তই আপ্য ও আকাশীয় বলে অবশিষ্ট ক্ষিতি, তেজ ও বায়ু ভূতের তারতম্যে পার্থিব দ্রব্য, আগ্নেয় দ্রব্য ও বায়বীয় দ্রব্য এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের পঞ্চদশ শারীর খাদ্যভাণ্ডারও এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর পার্থিব শারীর খাদ্যভাণ্ডার পাঁচটির দ্রব্যকে বলি কফ; আগ্নেয় শারীর খাদ্যভাণ্ডার পাঁচটির দ্রব্যকে বলি পিত্ত; এবং বায়বীয় শারীর খাদ্য-ভাণ্ডার পাঁচটির দ্রব্যকে বলি বায়ু। আয়ুর্ব্বেদ মতে এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। আবার ভাণ্ডারগুলিকে বলা হয় কফের স্থান, পিত্তের স্থান এবং বায়ুর স্থান। কফের এই পাঁচটি স্থানের মধ্যে একটি স্থানে কফের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া সেই স্থানটিকে বলা হয় কফের প্রধান স্থান এবং সেই স্থানেই কফ খাদ্যদ্রব্য থেকে উৎপন্ন হয়ে অবস্থান করে। কফের সেই প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থানের নাম আমাশয়। এইরূপে পিত্তেরও পাঁচটি স্থানের মধ্যে প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থান হচ্ছে গ্রহণী নাড়ী। বায়ুর পাঁচটি স্থানের মধ্যে প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থানের নাম পক্বাশয়। এবার খাদ্যদ্রব্য থেকে কফ, পিত্ত ও বায়ু কিরূপে উৎপন্ন হয় তাই বলছি। মুখগহ্বর হ'তে গুহ্যাংশ পর্য্যন্ত বৃহৎ অন্নবহা নাড়ীর (alimentary canal) প্রথমাংশে চর্ব্বিত খাদ্য-দ্রব্য শারীর রসের সংমিশ্রণে মধুরত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এই মধুর মণ্ডজাতীয় দ্রব্য আমাশয়ের (stomach) সঙ্কোচন ও প্রসারণে উত্তমরূপে মথিত হয়ে যাওয়ার পর তা থেকে ফেনীভূত এক রকম পদার্থ উৎপন্ন হয়ে ঐ আমাশয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। এই ফেনীভূত দ্রব্যই কফ; অতঃপর আমাশয়স্থ মণ্ডীভূত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণীতে গিয়ে পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়ে অম্লতা প্রাপ্ত হয়। এই অম্লীভূত খাদ্যমণ্ড থেকে এক প্রকার স্বচ্ছ আগ্নেয় দ্রব উৎপন্ন হয়; তার নাম পিত্ত। অতঃপর খাদ্যদ্রব্য ঐ স্থানেই সম্যক্ পরিপাকান্তে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ সূক্ষ্ম রস ধাতুরূপে পরিণত হয়ে সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয় এবং অপর ভাগ পুরীষরূপে পাকাশয়ে গমন করে। পুরীষ পাকাশয়ে পরিভ্রমণকালীন কটুরসবিশিষ্ট হয় এবং ঐ স্থানে উহার দ্রবাংশ শরীরে শোষিত হয়। উহাই বায়ু।

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু, পিত্ত ও কফের স্বরূপ সম্বন্ধে কি আছে দেখা যাক্। চরকে বায়ুর লক্ষণ—"রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মঃ চলোঽথ বিশদঃ খরঃ" রুক্ষতা, চলতা ও বৈশদ্য গুণের দ্বারা বায়ু ভূতের প্রাধান্য, সূক্ষ্ম গুণেরদ্বারা আকাশ-ভূতের সম্বন্ধ, খর গুণের দ্বারা ক্ষিতি ভূতের, শীত গুণের দ্বারা ক্ষিতি ও অপ্ ভূতের সংমিশ্রণ লক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং বায়ু যে পার্থিব দ্রব্যযুক্ত বায়বীয় দ্রববিশেষ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বায়ু আবার গন্ধমান পিত্তের লক্ষণ 'সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।' উষ্ণতা ও তীক্ষ্ণতার দ্বারা অগ্নি ভূতের প্রাধান্য, সব স্নেহ ও দ্রবগুণের দ্বারা অপ্ ভূতেরও প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে। পিত্ত বাতমাত্র অম্লরস বলে অপ্ ভূত ও অগ্নি ভূতের সংযোগ হয়; তৎপরে উহার দ্রবাংশ পরিশোষিত হওয়ায় বায়ু ও অগ্নি ভূতের সংমিশ্রণে কটু রস হয়। উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা পিত্ত যে একটি আগ্নেয় স্নেহযুক্ত দ্রব, তা বেশ বোঝাচ্ছে। কফের লক্ষণ "গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধ-মধুরস্থিরপিচ্ছিলঃ।" গুরু ও শীত এবং মধুর রসের গুণের দ্বারা ক্ষিতি ও অপ্ ভূতের প্রাধান্য, মৃদু গুণের দ্বারা অপ্ ও আকাশ ভূতের, স্নিগ্ধ গুণের দ্বারা অপ্ ভূতের, স্থির গুণের দ্বারা ক্ষিতি ভূতের সংমিশ্রণ লক্ষিত হচ্ছে। উপরোক্ত লক্ষণ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কফ একটি পার্থিব দ্রব দ্রব্যবিশেষ।

এবার বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকের ৫টি করিয়া ১৫টি স্থানের বিষয় ও তাদের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের কথা বলব। বায়ুর প্রধান স্থান পক্বাশয়। ঐ স্থানে বায়ু উৎপন্ন হয়ে মল, মূত্র, গর্ভ ও আর্ত্তবাদি অধো দিকে নিয়ে গিয়ে বহির্গত করে বলে তার একটি পারিভাষিক নাম আপান বায়ু। অগ্ন্যাশয়ে একজাতীয় বায়ু আছে, তারা খাদ্য পরিপাকে পাচক পিত্তের সাহায্য করে এবং রস, দোষ ও মলাদি পৃথক্ করে, তার নাম সমান বায়ু। সব শরীরে একজাতীয় বায়ু শিরা ধমনী স্রোত প্রভৃতিতে রস রক্তাদি সঞ্চালন করে, তার নাম ব্যান বায়ু। মুখগহ্বর হতে আমাশয় পর্য্যন্ত অন্নবহা নাড়ীর প্রথমাংশে একজাতীয় বায়ু আছে, যার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য মুখ হ'তে আমাশয়ে পৌঁছে, তার নাম প্রাণ বায়ু। কণ্ঠদেশে একজাতীয় বায়ু আছে, ঊর্দ্ধমুখী হয়ে স্বরযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করায় আমরা কথা বলতে পারি, সেই বায়ুর নাম উদান। পাশ্চাত্য মতে বায়ুর উপরোক্ত কার্য্যগুলি স্নায়ু-কেন্দ্র দ্বারা চালিত হলেও আয়ুর্ব্বেদমতে ঐ কার্য্যগুলির স্থানিক ক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য ঐ ঐ স্থানে সক্রিয় বায়বীয় দ্রব্যের অবস্থান স্বীকার করা হয়েছে। প্রধানতঃ ৫টি পিত্তের উৎপত্তিস্থান হচ্ছে গ্রহণী নাড়ী অর্থাৎ অন্নবহা নাড়ীর মধ্যমাংশ ঐ স্থানস্থিত, পিত্তের পারি-ভাষিক নাম পাচক-পিত্ত। প্লীহা-যকৃতে এক জাতীয় পিত্ত আছে তাহাদের কাজ রসধাতু থেকে রক্ত তৈরী করা, তার নাম রঞ্জকপিত্ত। ত্বক্-দেশে এক জাতীয় পিত্ত আছে তার নাম ভ্রাজক-পিত্ত, তার কাজ শরীরে দীপ্তি বা বর্ণ প্রকাশ করা। অক্ষিদেশে এক জাতীয় পিত্ত আছে যার দ্বারা চক্ষুতে দ্রব্যের আকার প্রতিফলিত হয়, সেই পিত্তের নাম আলোক-পিত্ত। হৃদয়ে একজাতীয় পিত্ত আছে তার কাজ অভিপ্রার্থিত মনোরথ সাধন করা, সেই পিত্তের নাম সাধক পিত্ত।

মুখ্যতঃ ৫টি কফের উৎপত্তি-স্থান আমাশয়; ঐ স্থানের কফের কার্য্য সমুদয় আহার্য্য দ্রব্য ভাল ভাবে ক্লেদন অর্থাৎ খাদ্যের শক্ত অংশ ভেঙ্গে আর্দ্র করে কাদার মত করা, যাতে সহজে হজম হয়। ঐ কফের নাম ক্লেদক কফ। বক্ষদেশে একজাতীয় কফ আছে, উহাদের কাজ দুইটি ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড এই তিনটির অবিরত স্পন্দন অব্যাহত রাখা। তারা ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের আবরণের মধ্যে থেকে ঐ কার্য্য করে। কণ্ঠদেশের জিহ্বামূলে এক জাতীয় কফ আছে যা দিয়ে খাদ্যের আস্বাদন গ্রহণ করা যায়। মস্তকের অভ্যন্তরে এক-জাতীয় শ্লেষ্মা আছে, যাহা স্নেহ সন্তর্পণ দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয়ের পোষণ করে। সমস্ত সন্ধিপ্রদেশে একজাতীয় কফ আছে যা দিয়ে অস্থি সংযোগ অব্যাহত থাকে।

অন্দর ও বাহির

শ্রীনন্দিতা পাল

পৃথিবীর সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে যেখানে গতানুগতিক নিয়ম ভেঙ্গে নূতন কিছু সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে মানুষের জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রতিভার বাইরে, সবার আগে বিপ্লবের হয়েছে প্রয়োজন। নারীজগতেও যখন বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা হলো, সেই বিপ্লবের ঢেউ তাকে চিরপরিচিত বিশ্বের গণ্ডী ভেঙ্গে উন্মুক্ত বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে নিজের দাবী জানাতে শেখালো। পরিবর্ত্তন বিশ্বের নিয়ম, তাই মানুষের বাধা, জগতের বিতর্ক সব-কিছুকে তুচ্ছ করে সে অবাঞ্ছিত অতিথিরূপে এসে দাঁড়ায়। বিবর্ত্তনের গতি যখন অতি মন্থর হয় তখনই বিপ্লব এসে শতাব্দীর পথকে সংক্ষেপ করে বৎসরে এনে দাঁড় করায়। নারীজগতের পরিবর্ত্তনও অতি মন্থর গতিতে চল্‌ছিল, তাই প্রগতির ছদ্মবেশে বিপ্লব এসে তার গতি দ্রুত করে দিল।

নারী-জাগরণের প্রথম প্রভাতে নারী চেয়েছিলো পুরুষের সাথে সমান অধিকার; কেবলমাত্র সৃষ্টির পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে যে সমাজ তাকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলো তার অপ্রয়োজনীয় বন্ধনকে অস্বীকার করতে। সমাজের কোনও অংশে যখন বিপ্লব ঘটে, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে মহৎ, কিন্তু সেই বিপ্লবের রূপ যখন সমগ্র সমাজ-দেহের উপর প্রতিফলিত হয়, তখন তার নানা বিকৃত অংশ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কারণ, দ্রুত পরিবর্ত্তনকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্ম যে সামঞ্জস্যবোধ এবং পরিণামদর্শিতা থাকা প্রয়োজন সেটা কয়েক জন মুষ্টিগত নারীর হয়তো ছিল, কিন্তু নারীসমাজের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অঙ্গে যখন পরিবর্ত্তন এলো তখন তাকে মানিয়ে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নারীসমাজ শিক্ষিতা হবার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন কাজে ও প্রতিষ্ঠানে নারীর সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কিন্তু এই বিরাট সমাজের একাংশ দেখে তার উন্নতির ধারণা করলে চল্‌বে না। যদি আমরা প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিভাগ, যেখানে পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় নারীসমাজ কাজ করছে তার ভালো ও মন্দ দুটো দিকই পর্য্যালোচনা করি, তাহলে মন্দের দিক্‌টাই ভারী হয়ে ওঠে। যাঁরা নারীধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্যটিকে অবহেলা করে, বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের মনের গোপন মণিকোঠায়ও একটি অপূর্ব্ব বাসনার দীর্ঘশ্বাস জমে থাকে। এ কথা অস্বীকার করি না যে, পূর্ব্বে যখন নারীজগৎ, বহির্জগতের সাথে সম্পর্কশূন্য হয়ে থাকতো তখন তাকে পুরুষের অনেক অবিচার মাথা পেতে নিতে হ'তো। কিন্তু তাহলেও সেই অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে তার এমন একটি আশ্রয় ছিল, যার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নারীসমাজ ক্রমশই বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। গৃহের গণ্ডীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যেখানেই নারী পুরুষের সাথে সমান তালে চল্‌তে গেছে সেখানেই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

সু এবং কু, উন্নত এবং অনুন্নত এই নিয়েই সমাজদেহ গঠিত। নারী যখন গৃহের গণ্ডীর ভিতরে, সাধারণের দৃষ্টির বাইরে বাস করে তখনই সে পায় মর্য্যাদা। কিন্তু যখনই সে তাকে অস্বীকার করে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখীন হয় তখনই তার গৌরব খানিকটা লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্যই ভারতীয় নীতি নারীর গণ্ডী একটু কঠোর ভাবে নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল। আজ এই বিপ্লবের ফলে জেগেছে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেখানে গৃহের অবিচার আমাদের অসহ্য হয়েছিল, সেখানে পরিবর্ত্তন এসে গৃহের গণ্ডী ভেঙে আমাদের বাইরের লোকের বিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

আমার বক্তব্য বিষয় কেউ ভুল বুঝবেন না। কারণ, সমগ্র জগৎ যখন তার নিজের নিয়মে এগিয়ে চলেছে, তখন ভারতের পক্ষে তার পুরানো দিনের মাটীর প্রদীপের নিয়ম বজায় রাখা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে অগ্রগতি কোনও সুফল এনে দিতে অক্ষম, তখন পদক্ষেপটা একটু ধীরে করাই মঙ্গল।

পাশ্চাত্য নারীসমাজের যে সহজ চলাফেরা আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, তা আমাদের সমাজে আন্‌তে গেলে কখনই চলবে না। তার জন্ম যে সমাজ-ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তা এখনও বহু দূরের কথা। মাঝখান থেকে সমাজকে পিছনে রেখে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করে যাঁরা হঠাৎ গতিকে দ্রুত করে দিয়েছেন, তাঁরা হারিয়েছেন নিজেদের মর্য্যাদা ও সম্মান। গৃহের বিচারালয়কে অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা হয়েছেন বিশ্বের দরবারে আসামী।

—বসন্ত—

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এখনো ভাঙেনি ঘুমঘোর
কখন সে উঠে গেছে
ঈষৎ রয়েছে খোলা দোর
তারি ফাঁক দিয়ে এলো
তীর্য্যক্ রেখায় আজ ভোর।

পায়ে পায়ে এলো দেখি আর
ভিজে বাওয়া মুছে বাওয়া

তার আলতার
রঙলাগা আলো,
আমার রাত্রির স্বপ্ন
গ'লে গ'লে তাই কি মিলালো—

তাই কি রঙীণ
প্রথম বসন্তে আজ
পদ্মের পাঁপড়ির মত দিন।



লক্ষ্মী-প্যাঁচা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বন-পলাশ গাঁয়ে পাশাপাশি দু'টি বাড়ী।

একটি বাড়ী বড়লোকের, আর একটি হচ্ছে এক গরীব চাষার ছেলের। বড়লোকের ছেলেটি আর চাষার ছেলেটি খুব ছেলেবেলায় গাঁয়ের পাঠশালায় পাশাপাশি বসে লেখাপড়া সুরু করেছিল।

আজ কিন্তু আর বড়লোকের ছেলেটি চাষার ছেলেটিকে চিনতে পারে না! কারণ বড়লোকের ছেলে সহরে থেকে কলেজে পড়ে আর গাড়ী করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে সখ করে হাওয়া বদল করতে আসে।

চাষার ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজের জমি চাষ করে, রোদ্দুরে পুড়ে জলে ভিজে, ফসল ঘরে তোলে, আর সন্ধ্যেবেলা নিজের দাওয়ায় বসে আপন মনে বাঁশী বাজায়।

এমনি ভাবে দু'জনে দু'পথে চলতে চলতে তারা এত দূর চলে এসেছে যে, পাশাপাশি বাড়ীর লোক হয়েও মনের দিক দিয়ে তারা বহু তফাতে বাস করে।

বড়লোকের বাড়ীর চিলে-কোঠার অন্ধকার গর্ত্তে বহু কাল থেকে বাস করে এক লক্ষ্মী-প্যাঁচা।

গাঁয়ের লোকে বলে, ঐ লক্ষ্মী-প্যাঁচা আছে বলেই বড়লোকের দিনের পর দিন এত বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে!

বড়লোকের ছেলেটির কিন্তু সেই লক্ষ্মী-প্যাঁচার দিকে বিশেষ নজর নেই। ওই বিদ্‌ঘুটে পাখীটা বাড়ীতে একটি জঞ্জালের সৃষ্টি করেছে এই তার ধারণা।

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বিজ্ঞের মতো চিলে-কুঠুরীতে বসে থাকে আর চার দিক্ ভালো করে তাকিয়ে দেখে।

অন্যান্য পোষা পাখীর মতো লক্ষ্মী-প্যাঁচাকে ত' আর খেতে দিতে হয় না, তাই বাড়ীর লোকেরও তাকে নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। লক্ষ্মী-প্যাঁচা সন্ধ্যের পর উড়ে কোথায় চলে যায়, পোকা-মাকড় ধরে খায়, তার পর আবার এসে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো কোটরে ঢোকে। সারাটা দিন রোদ্দুরের তেজ সে সইতে পারে না, তাই কোটরের ভেতর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়।

বড়লোকের বাড়ীতে দু'বেলা বহু পাত পড়ে। কেন না বড়লোক চালের কারবার করে। গাঁয়ের যত চাষীর ফসল তারা কিনে নেয়, তার পর সেই ফসল সহরে চালান দিয়ে অনেক টাকা লাভ করে।

এ বছর সব চাষীরই বিশেষ টানাটানি। যাকে বলে, "পান্তো আন্‌তে লবণ ফুরোয়।" তাই সব কৃষকই আগাম টাকা নিয়ে ক্ষেতের সব ধান বিক্রী করে দিয়েছে কত লোকের কাছে। শোনা যায় যে, আশে পাশের বহু গ্রামের ফসলও ওরা এই ভাবে কিনে রেখেছে, এবং এরই মধ্যে বহু হাজার মণ চাল জমিয়ে ফেলেছে নিজেদের বাড়ীতে।

এই সব চালের বিলি-ব্যবস্থা করতে অনেক রাত পর্য্যন্ত লোকজন খাটে, তাদের কথা-বার্ত্তা, তামাক খাওয়ার গুড়ুক-গুড়ুক শব্দ, চল্‌-ফেরার আওয়াজ—সব কিছু মিলে চাষার ছেলের ঘুম নষ্ট করে দেয়।

সারাদিন খেটে-খুটে পান্তো খেয়ে চাষার ছেলে বিচালীর ওপর গা গড়িয়ে দিলে আপনা-থেকেই ঘুম এসে ওর চোখের পাতার সঙ্গে মিতালি পাতাতো।

কিন্তু এই হট্টগোলে কে যেন ওর ঘুমের আরাম কেড়ে নিয়ে গেল। যতই দিন যেতে লাগলো, বড়লোকের বাড়ীর গোলমাল ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো।

এখন আবার বেশী রাত্তিরে লরী আসে, তাতে কি সব বোঝাই হয়···রাত্তিরের অন্ধকারেই বিকট শব্দ করতে করতে সেগুলি সহরের পথে চলে যায়।

দিনের বেলা কিন্তু চুপচাপ···কোনো সাড়া-শব্দ নেই। চাষার ছেলে এক-এক দিন বিরক্ত হয়ে ভাবে, দুত্তোর! সারাদিন মাঠে খেটে-খুটে আসব, কিন্তু সারারাত এতটুকু ঘুমোতে পারবো না। তার চাইতে চলে যাবো অন্য কোথায়ও; একটা তো পেট, যা হোক এক রকম করে চলে যাবে।

আবার মনে করে, সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কোথায়ই বা যাবে। নিজেরও ছেলেবেলা থেকে এই ভিটের প্রতিটি গাছ প্রতিটি তৃণের সঙ্গে ওর পরিচয়। যাবার সময় তারা সবাই পেছু ডাকবে···সে মায়া কাটানো কি এতই সোজা?

লক্ষ্মী-প্যাঁচার মনেও এই একটি কথাই আলো-ছায়ার মতো খেলা করে।

বেশ নিরিবিলি সে ছিল একেবারে সকলকার ওপরে···অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে···মানুষের সকল ঝঞ্ঝাট আর দৌরাত্মির বাইরে। ঠাণ্ডা আর মিঠে ছায়ায় চোখ বুঁজে ঘুমুতে যে কী আরাম সে কথা লক্ষ্মী-প্যাঁচা ছাড়া আর কে বেশী জানে!

কিন্তু বড় গোলমাল সুরু করলে এরা।

আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনেও হট্টগোল সুরু হয়েছে। যে সব চাল রাত্তিরে সহরে পাঠানো হয় তাই বস্তা-বন্দী করা চলে সারাদিন ধরে। কাজের যেন আর বিরাম নেই।

এক এক সময় লক্ষ্মী-প্যাঁচা মুখ বাড়িয়ে জমানো চালগুলি দেখে ভাবে, বোধ করি এ অঞ্চলে আর চালের বংশ থাকবে না···প্রতিটি কণা এরা খুঁটে সহরে পাঠিয়ে দেবে! সেই সময় দেশের কি হাল

হবে সেই কথা চিন্তা করে লক্ষ্মী-প্যাচার দিনের ঘুম তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

যতই দিন যেতে লাগল—গোটা বাড়ীতে যেন চালের পাহাড় তৈরী হতে লাগল। চাল আসা আর যাওয়ার বিরাম নাই। বাড়ীর উঠানের আনাচে-কানাচে যে চাল পড়ে রইল তাই দিয়ে একটা যজ্ঞি-বাড়ীর ব্যাপার হয়ে যায়!

এক দিন একটি ভিখিরী এক মুঠো চাল ভিক্ষে চাইতে এসে দরোয়ানের কাছে মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল।

বাড়ীর কর্ত্তা বল্লে, ও ভিক্ষে চাইতে আসেনি। ওর মতলব খারাপ; ওরাই গিয়ে চোর ডাকাতদের খবর দেয়।

সেদিন সারারাত কর্ত্তা ঘুমোতে পারলে না, পরদিন সহর থেকে দু'টো নেপালী দরোয়ানকে বন্দুক-হাতে বাড়ীর দোর-গোড়ায় অষ্টপ্রহর দেখা যেতে লাগল।

গাঁয়ের বুড়োরা বলাবলি করতে লাগল, যত দিন লক্ষ্মী-প্যাচা ও-বাড়ীতে আছে তত দিন মা-লক্ষ্মী সেখানে অচলা হয়ে থাকবেন। ধুলো মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়ে ফিরে আসবে।

গোটা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র চাষার ছেলে বড়লোকের বাড়ী ধান বিক্রি করেনি। তাই বড়লোকের বাড়ীর সকলের ওর ওপর খুব রাগ।

এক দিন বাড়ীর কর্ত্তা চাষার ছেলেকে ডেকে বল্লে, তোমার ভিটেটা আমার কাছে বিক্রি করো, অনেক টাকা দেবো। আমার কাজ-কর্ম্মের বড় জায়গার অভাব হচ্ছে।

চাষার ছেলে বল্লে, আমি একলা মানুষ, দিব্যি চলে যাচ্ছে। টাকার আমার খুব বেশী দরকার নেই। নিজের বাস্তুভিটে আমি বিক্রি করবো না।

এই কথায় বড়লোক তার ওপর আরো চটে গেল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরই জানা গেল যে, বড়লোকের একমাত্র ছেলের খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে। গাঁয়েতেই। গোটা বাড়ী মেরামত করা সুরু হল।

ছেলে সহর থেকে ফিরে এসে তার মাকে বল্লে, দেখ মা, চিলে-কুঠুরীটা ভালো করে মেরামত করতে হবে, ঐখানে নহবৎ বসবে। আমি সহর থেকে ভাল নহবৎ-এর দল বায়না করে এসেছি।

মা জিব কেটে জবাব দিলে, অমন কথা মুখেও আনিসনি খোকা, ওখানে লক্ষ্মী-প্যাচা থাকে, তোর ঠাকুরমার আমল থেকে আছে। ওকে ঘাঁটাসনি। নহবৎ বরং বাইরের বাড়ীতে বসবে।

খোকার এই পরামর্শটা আদপেই ভালো লাগলো না। এক দিন গভীর রাতে তার মা ঘুমিয়ে পড়লে সে মিস্ত্রীকে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে চিলে-কুঠুরীতে গিয়ে হাজির হল। ওদের হুকুম করলে, কোটরের ভিতর দাও মশালটা ঢুকিয়ে—

আগুনের তাপে লক্ষ্মী-প্যাচা বুকফাটা চীৎকার করে উঠল। তখন তার পাখার খানিকটা পুড়ে গেছে। অসহ্য জ্বালায় সে ছটকে বেরিয়ে পাক খেতে খেতে নীচে পড়ে গেল।

পাশের বাড়ীর চাষার ছেলে উঠোনে খড় বিছিয়ে শুয়েছিল, হঠাৎ তার পায়ের কাছে কি একটা ধুপ করে পড়ার শব্দ শুনতেই আচমকা ঘুম ভেঙে গেল।

সে উঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখে, পাশের বাড়ীর লক্ষ্মী-প্যাচা তার উঠোনের মাঝখানে পড়ে আছে। পাখার খানিকটা পুড়ে গেছে। সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

বড়লোকের বাড়ীর চিলে-কুঠুরীতে মশালের আলো দেখেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। এ নিশ্চয়ই লক্ষ্মী-প্যাচাকে তাড়িয়ে দেবার মতলব।

সে তাড়াতাড়ি কি একটা গাছের পাতার রস লক্ষ্মী-প্যাচার পাখায় মাখিয়ে দিলে। মনে হল, পাখীটা তখন বেশ একটু আরাম পাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে চাষার ছেলের কোলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়ল।

চাষার ছেলে বাঁশ আর খড় দিয়ে লক্ষ্মী-প্যাচার জন্য উঁচু করে চমৎকার একটি বাসা তৈরী করে দিলে। ওর পাখার ঘা আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে। এখন দু'টিতে ভারী ভাব।

চাষার ছেলের কাছে লক্ষ্মী-প্যাচা আসার পর থেকে ওর নতুন করে বাড়-বাড়ন্ত সুরু হল।

সে বছর ওর ক্ষেতে এত ফসল ফলল যে, গাঁয়ের বুড়ো চাষীর দল বলাবলি করতে লাগল যে, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁর আলতা-পরা পায়ে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছেন!

এই ভাবে দেখতে দেখতে চাষার ছেলের বড় ধানী জমি হল··· গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, ক্ষেত ভরা ফসল···যে দিকে চোখ পড়ে···দু' চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওদিকে পাশের বাড়ীতে কোথাও কিছু নেই···হঠাৎ এক দিন বাজ পড়ে বুড়ো কর্ত্তা মারা গেল। সেই শোকে বাড়ীর গিন্নী পাগল হয়ে গেল।

বাড়ীর যে একমাত্র ছেলে—বিয়ের পর থেকে দেশের বাড়ীর দিকে তার একটুও টান নেই! আগে মাঝে মাঝে আসত; এখন সহর থেকে মোটে নড়ে না।

গাঁয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হতে লাগল। সাত-ভূতে সব লুটে নিলে। এক দিন দুপুর বেলা হঠাৎ কি করে বড়লোকের বাড়ীর গোলাঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

চাষার ছেলে তার লোকজন নিয়ে আগুন নেবাবার জন্যে খুব চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনো মতেই কিছু রক্ষা করা গেল না।

এক দিন বড়বাড়ীর কর্ত্তা চাষার ছেলেকে ডেকে বলেছিল তার ভিটে বিক্রি করতে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, বড়লোকের ছেলেই চাষার ছেলের কাছে নিজের বসতবাটি বিক্রি করে সহরে পালিয়ে গেল।

চাষার ছেলে আরও উঁচু করে আর ভালো করে লক্ষ্মী-প্যাচার একটি বাসা তৈরী করে দিয়েছে। সেইখানে বসে লক্ষ্মী-প্যাচা চাষার ছেলের চার দিককার মাঠের ঢেউ-খেলানো ধানের শীষ দেখে আর আপন মনে কি যে বলে সেই জানে।

লক্ষ্মী-প্যাচাতে আর চাষার ছেলেতে এখন ভারী ভাব।

—ইতিহাস যারা তৈরী করে—

আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আলেকজাণ্ডারের পিতাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি।

রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তখন মহা বিপদ এবং মহাশত্রু। ম্যাসিডোনিয়ার চরম দুর্দ্দিন তখন।

লোকে তাঁকে পরামর্শ দিলে গ্রীসের অধিবাসী আর সীমান্ত-বিদ্রোহীদের মিষ্ট কথায় শান্ত করতে, কাজ নেই অস্ত্র ধ'রে।

তিনি শুনলেন না সে কথা। বললেন, কাপুরুষরা ও-রকম বলে।

চললো তাঁর সৈন্য ড্যানিয়ুব নদীর তীর পর্য্যন্ত এবং ঘটালে রাজা সারমাসের পতন।

থার্ম্মোপালির গিরিপথ দিয়ে গিয়ে স্কীরাণ আর এথিনীয়ানদের বিপ্লবও তিনি চূর্ণ ক'রে এলেন যাঁকে ডিমস্থিনিসের মত জ্ঞানী, বালক ব'লে উপহাস করেছিলেন।

থীবস্ সহজে বশ্যতা স্বীকার করেনি। তাই সেখানকার যুদ্ধ হ'ল এত ভয়ঙ্কর, যাতে সমস্ত গ্রীসের আতঙ্ক হ'য়ে গেল। নগর ত লুণ্ঠিত হলই, ত্রিশ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস ক'রে বিক্রী ক'রে দেওয়া হল, ছ'হাজারের বেশী নাগরিককে শাণিত তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত করা হল।

টিমোক্লিয়া ব'লে একটি মেয়েকে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা এসে যখন জিজ্ঞেস করলে কোথায় তার ধনরত্ন? সে দেখিয়ে দিলে একটি পাতকুয়া। যেই না এরা ঝুঁকে দেখ্‌তে গেছে, দিলে তাদের ঠেলে ফেলে, আর তার ওপর চাপালো ভারী ভারী পাথরের বোঝা।

তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি কিন্তু মুক্তি দিলেন বীরাঙ্গনা ব'লে।

সিংহ তার বিক্রমের পর যেমন শান্ত হয়, এই যুদ্ধের চরম নৃশংসতার পর তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন আলেকজাণ্ডার।

ক্ষমা করলেন তিনি সমস্ত বিদ্রোহীদের, করতে লাগলেন সকলের প্রার্থনা পূরণ।

এর পর গ্রীসের অধিবাসীরা তাঁকে সেনাপতি ক'রে পারস্যবিজয়ে যাওয়া স্থির করলে, তার পর ভারতবর্ষ।

চারি ধার থেকে পণ্ডিতেরা এলেন তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে—এলেন না শুধু ডায়োজিনিস, সেই বিখ্যাত দার্শনিক।

অগত্যা আলেকজাণ্ডারই ছুটলেন তাঁর কাছে।

শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন পণ্ডিত, খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন আলেকজাণ্ডার, তবু তিনি ঘাড় ফিরিয়েও দেখলেন না।

সম্রাটের দুঃসাহস!

বললেন, আপনার যদি কোন প্রার্থনা থাকে আমি পূরণ করতে প্রস্তুত।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জবাব এলো, প্রার্থনা এই যে, বাপু, রোদটা ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

বিস্মিত সম্রাট্ চলে যেতে যেতে অনুচরদের বললেন, সিংহাসনের চেয়ে এমনি পাণ্ডিত্যই কাম্য।

আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম কি হবে, জানবার জন্যে তিনি যে দিন অ্যাপলোর মন্দিরে গেলেন সে দিনটা খুব শুভ ছিল না, তাই পূজারিণী ভবিষ্যদ্বাণী করতে নারাজ ছিলেন।

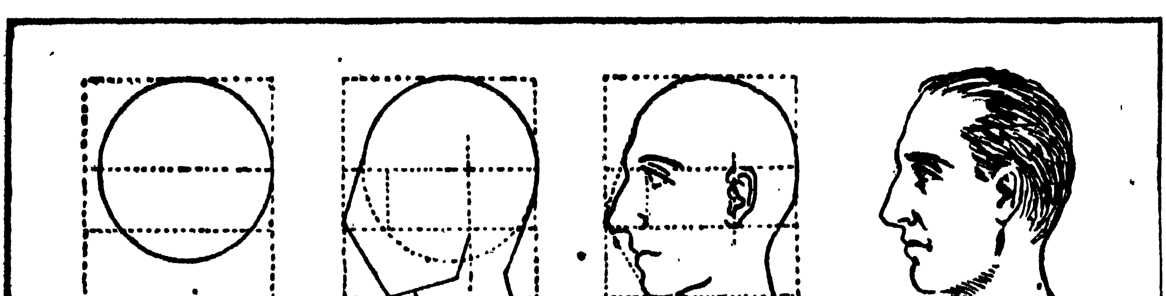
তবু মহিলাটিকে দিয়ে বলাবার জন্যে স্বয়ং আলেকজাণ্ডার যখন তাঁকে হিড়-হিড় করে টেনে মন্দিরে নিয়ে এলেন তখন শুধু রাগের মাথায় তিনি বলে ফেললেন, আঃ, তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল!

অমনি আলেকজাণ্ডার বললেন, হয়েছে, এই বাণী সম্বল করেই আমি যাত্রা করব—আমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল, আমি অজেয়, আমি দুর্দ্দমনীয়।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সামান্য জ্বরে তিনি মারা গেলেন কিন্তু চিরকালের জন্য হ'য়ে রইলেন আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট।

ছবি আঁকা শক্ত কি?

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী



—দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে—

রুশিয়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই সবার আগে মনে পড়ে রুশিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা। ওরা যত বেশী সুখ-সুবিধা পায়, পৃথিবীর আর কোন দেশের ছেলেমেয়েরা তা পায় না।

ছেলে-মেয়ে জন্মাবামাত্রই আর সব দেশের মত সরকারী খাতায় লেখানো হয়। ডাক্তার আর নার্সেরা নিয়মিত ভাবে খবরদারী করেন—ছেলে কেমন আছে ? ছেলের মা কেমন আছে ? মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খাঁটি দুধ বরাদ্দ হয়ে যায় ছেলের জন্য। অবশ্য এ-সবের জন্য খরচ লাগে না এক পয়সাও। ছেলে-মেয়েরা যে জাতীয় ভবিষ্যৎ, সেই জন্য ছেলে-মেয়ে মানুষ করার সব দায়িত্বই সরকারের।

ও-দেশের নিয়ম হোল, যে কাজ করবে না সে খাবে না। শিশুর দু'মাস বয়স অবধি মায়ের ছুটি থাকে, তার পরেই মাকে আবার কাজে বেরুতে হয়। তখন সন্তানের থাকার ব্যবস্থা হয় শিশুমঙ্গলে।

শিশুমঙ্গল ছেলে-মেয়েদের আশ্রম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বাড়ী। সামনে খেলার মাঠ, ফুলের বাগান। গ্রীষ্মের দিনে ছেলে-মেয়েরা বাগানেই থাকে, খেলাধূলা করে। আর শীতের দিনে বাগানে ছোট ছোট তাঁবু পড়ে। যত-দূর সম্ভব ছেলেমেয়েদের মুক্ত আলো-হাওয়ায় রাখা হয়, যাতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। সেই জন্য সময় মাফিক্ খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর আয়োজন আছে। তাছাড়া নার্স আর ডাক্তারের সজাগ চোখ সদা-সর্ব্বদা জেগে থাকে প্রতিটি শিশুর উপর।

শিশুদের সারাদিন এই শিশুমঙ্গলেই কাটে। মায়েরা সকালে কাজে যাবার আগে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয়, আর ডিউটি শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরার সময় শিশুকে নিয়ে আসে। এখানে ছেলে-মেয়ে রাখার জন্য বাপ-মায়ের কোন খরচ লাগে না।

এক-একটি শিশুমঙ্গলে দেড়শো-দু'শো করে শিশু থাকে। সারা দেশময় এই ধরণের শিশুমঙ্গল আছে হাজার হাজার।

চার বছর বয়স হতেই ছেলেমেয়ের পড়াশুনা সুরু হয়ে গেল কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে। সেখানে খেলা করে' গল্প বলে' ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া আর নানা কাজকর্ম্ম শেখানো হয়। তারা বুঝতেই পারে না যে, তারা লিখছে, পড়ছে, কি কাজ শিখছে।

বছর তিনেক তো এই ভাবেই কাটলো, সাত বছর বয়সেই ডাক পড়লো—'খোকা-খুকুকে ইস্কুলে যেতে হবে'। 'ইস্কুলে পাঠাবো না' বললে চলবে না। 'আমি গরীব, আমার এই সব অসুবিধে', 'আমি বড়লোক, আমার এই সব সুবিধে চাই' এ কথা কেউ শুনবে না। ছেলে-মেয়ের সাত বছর বয়স হলেই ইস্কুলে যেতে হবে—এই হোল আইন। ইস্কুলে কারুর কোন মাইনে লাগে না ; গভর্মেন্টের টাকায় ইস্কুল চলে।

ইস্কুল বসে সকাল আটটায়। ঢং ঢং করে প্রথমেই পড়ে খাবার ঘণ্টা। ইস্কুলেই খাবার তৈরী করা হয়, তার জন্য ছেলে-মেয়েদের কোন খরচ দিতে হয় না। আধ ঘণ্টা ধরে খাওয়া-দাওয়া চলে, তার পর আবার ঘণ্টা—ঢং ঢং—ইস্কুল বসলো। সুরু হল রীতিমত পড়াশুনা। পড়াশুনা মানে আমাদের দেশের মত বই মুখস্থ করা নয়। মানের বই দেখে পড়া তৈরী করাও নয়। যে বয়সের ছেলে-মেয়ের যেমন বুদ্ধি তাদের সেই রকম বই দেওয়া হয়, যা পড়ে তারা বুঝতে পারবে। আমাদের ইউনিভার্সিটির মত এক গাদা বই আর সিলেবাস চাপিয়েই সে দেশের শিক্ষাবিদেরা মনে করেন না যে, ছেলে-মেয়ের বিদ্যে খুব বাড়িয়ে দিলাম। সে দেশের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ছেলে-মেয়েদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চান, সে জন্য তাঁরা মাথা ঘামান যথেষ্ট। কোন ছাত্র পড়াশুনায় খারাপ হলে, কেন খারাপ হোল, শিক্ষকেরা তা জানবার চেষ্টা করেন। নিজের পড়ানোর দোষ কি, ছাত্রের বুদ্ধির দোষ—যাই হোক শুধরে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, নিজে শোধরাতে না পারলে অন্য শিক্ষকের সাহায্য নেন। এই সব ব্যাপারে আলোচনার জন্য শিক্ষক-সংঘ আছে। উত্তম-মধ্যম প্রহারের ভয় দেখিয়ে সর্ব্ব দোষ চাপা দেবার চেষ্টা কেউ করে না। মাষ্টারেরা লক্লকে বেত হাতে নিয়েও ক্লাশে ঢোকে না। ছেলে-মেয়েদের এরা বন্ধু বলে মনে করে। ছেলে-মেয়েরাও এদের কাছে মন খুলে দেয়, কোন ভয়ের গণ্ডী থাকে না।

প্রতি ক্লাশে ছেলে-মেয়েদেরও এক একটি সংঘ থাকে। সংঘের সব-সেরা পড়ুয়া আর সব-সেরা খেলোয়াড় ক্লাশের দলপতি হয়। এদের কাজ হোল ক্লাশের প্রত্যেকটি ছেলের উন্নতির দিকে নজর রাখা। আর কি করে শৃঙ্খলা রক্ষায়, স্বাস্থ্য রক্ষায়, পড়াশুনার নম্বরে, খেলাধূলায় তার ক্লাশ ইস্কুলের আর সব ক্লাশকে ছাপিয়ে যাবে, সেই চেষ্টাতেই দলপতিরা ব্যস্ত থাকে। এবার সব কটি ক্লাশের সংঘ এক হয়ে ইস্কুল-সংঘ হয়, তারা চেষ্টা করে তাদের ইস্কুল কি করে সেই অঞ্চলের আর সব ইস্কুলকে ছাড়িয়ে উঠবে। এই সব সংঘপতিকে ওদের দেশে বলে 'পায়োনিয়ার'। এরা গলায় একটি করে লাল টাই বাঁধে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এদের কাজে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন।

দুপুরে একটা থেকে দু'টো অবধি আবার খাবার ঘণ্টা পড়ে। তার পর সুরু হয় হাতের কাজ শেখা—চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, লোহার কাজ—যার যেটা পছন্দ সে সেইটি শেখে। কোন বিষয় কাউকে জোর করে শেখানো হয় না।

ছেলে-মেয়েদের রুচি সৃষ্টি করার জন্য সহরে সহরে শিশুসৌধ আছে। আমরা তাকে রূপকথার রাজ্য বলতে পারি। প্রকাণ্ড বাড়ী। বড় বড় এক একখানি হলঘরে এক এক রকমের ব্যাপার। কোথাও ঘর ভরা রকমারি পুতুল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে বসে খেলছে। কোন ঘরে পিংপং, ক্যারম, ব্যাগাটেলি। কোন ঘরে ব্যায়াম চলছে, ছেলে-মেয়েরা বড় বড় আয়নার সামনে দেখছে পেশীর নর্ত্তন। কোন ঘরে চলছে গান-বাজনা, কোথাও বা ফটোগ্রাফি। কোন ঘরে বক্তৃতা, আবৃত্তি আর অভিনয়ের মহলা চলে। কোথাও বড় বড় শিল্পীর ছবি টাঙানো আছে। ছেলেমেয়েরা তাই দেখে ছবি আঁকা শিখছে। কোন ঘরে পুতুল গড়া হচ্ছে, কোন ঘরে সূচিশিল্প, ছাঁটকাট চলছে। কোথাও যন্ত্রপাতি নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বসে' ইঞ্জিন, জাহাজ, কলকারখানার মডেল তৈরী করতে ব্যস্ত। কাউকে কোন ঘরে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা নেই —অবাধ গতিবিধি, সহজ নিয়ম-কানুন। কোন নৃত্য ছেলে

এলে, শিক্ষয়িত্রী তার হাত ধরে দিনের পর দিন এক ঘর থেকে আর এক ঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যত দিন না ছেলেটি মনস্থির করে কোন ঘরে বসতে পারে, তত দিন তাকে ঘোরানো হবে—প্রদর্শক কোন বিরক্তি প্রকাশ করবেন না।

এই সব শিশু-সৌধগুলিকে আমরা এক একটি ক্লাব বলতে পারি। এখানে ছেলেদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের যতো বেশী সহায়তা করে এমন আর কিছুতে করে না। এখানকার কলকব্জার ঘরে বসে ছোটরা খেলাচ্ছলে এমন অনেক কিছুর মডেল তৈরী করে বসে যা দেশের লোকের অনেক কাজে লাগে। ছোটদের তৈরী প্রায় শ'-খানেক যন্ত্র সরকার গ্রহণ করেছে, এবং দেশের সর্ব্বত্র সেই যন্ত্রের ব্যবহার চলছে।

ছোটদের কোন ব্যাপারকেই সে দেশে ছোট করে দেখা হয় না। ছোটদের আনন্দ দেবার জন্য বেতারে দিনে তিন বার তা'দের আসর বসে। ছোটদের জন্য সহরে সহরে নাট্যশালা আছে, সেখানে কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা নাটক অভিনীত হয়। সর্ব্বত্রই ছোটদের জন্য সিনেমা আছে, সেখানে ছোটদের মনোমত যত ছবি দেখানো হয়। ছোটদের নিজস্ব ষ্টুডিও আছে অনেকগুলি, সেখানে ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মনোমত ফিল্ম তোলে। রুশিয়ায় ছেলেমেয়েদের জন্য দৈনিক খবরের কাগজ আছে তিপ্পান্নখানি। সাপ্তাহিক কাগজ আছে অনেক, আর মাসিকের তো ছড়াছড়ি। ছোটদের জন্য শুধু গল্পের বই-ই ছাপা হয় বছরে প্রায় চার কোটি। অনেক বড় বড় সহরে ছোটরা রেল-লাইন পেতেছে, সেখানে তারা নিজেরাই রেলগাড়ী চালায়, তারাই ড্রাইভার, ষ্টেশন-মাষ্টার, কণ্ডাক্টার। কোন কিছু ভেঙ্গে গেলে নিজেরাই নিজেদের কারখানায় সারিয়ে নেয়। সেই ট্রেণে যাত্রিচলাচলও করে। ওডেশাতে ছোটদের জন্য একটা নকল বন্দরও আছে, সেখানে ছোটরা ছোট ছোট জাহাজ চালায়, জাহাজ তৈরী করে, জাহাজ মেরামত করে।

ইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করে ছোটরা যায় শিশুসৌধে, সেখানকার কাজকর্ম শেষ করে তারা বাড়ী ফেরে রাত দশটায়, ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আগে তাদের আর একবার খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হয়।

স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। নিজের দলের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের উপর পায়োনিয়ারের দৃষ্টি থাকে। কার নাকে জল গড়াচ্ছে, কার দাঁত পোকায় খাচ্ছে, কে একটু ছুটে হাঁপিয়ে পড়ছে, ইস্কুলের ডাক্তারের কাছে তখনই রিপোর্ট যায়। তখন থেকে রোগীর রীতিমত চিকিৎসা সুরু হয়। প্রত্যেক ইস্কুলেই এক এক জন ডাক্তার আর একটি করে ডিস্পেন্সারী আছে। নার্সও থাকে। তাছাড়া উঁচু ক্লাশের অনেক ছেলেমেয়েই মোটামুটি নার্সিং বিদ্যেটা শিখে রাখে।

ইস্কুলে যখন লম্বা ছুটি থাকে—গ্রীষ্মের ছুটি, বড়দিনের ছুটি, তখন ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। এক একটি দল এক এক জায়গায় যায় বেড়াতে। সেখানে তাদের 'গ্রীষ্ম-শিবির' বসে। সঙ্গে থাকেন শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার ও নার্স। সেখানে ছেলে-মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করে দিন কাটায় আর সুবিধামত শিক্ষয়িত্রীরা মুখে মুখে শিখিয়ে দেন নানা তথ্য। চেঞ্জও হয় শিক্ষাও চলে, অথচ খরচ লাগে না এক পয়সাও, সব ব্যয় সরকারের। লাখ লাখ ছেলে প্রতি বছর এই ভাবে শরীর ও শিক্ষাকে মজবুত করে নেয়।

ও-দেশে শরীরচর্চ্চায় ডিগ্রি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে হাতে-কলমে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্য পাঁচটি সরকারী কলেজ আছে। সেখান থেকে যারা পাশ করে বের হয়, তারা স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচারকার্য্য চালায় সারা দেশে। তাদের চেষ্টায় আজ ও-দেশের বিশ কোটি লোকের মধ্যে 'অল্-রাউণ্ড—স্পোর্টসের' ব্যাজ পেয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লাখ ছেলে-মেয়ে। শুধু ফুটবল টীমই আছে চার হাজার। সারা দেশ জুড়ে খেলাধূলার ষ্টেডিয়াম আছে সাড়ে ছ'শো। মস্কো সহরে এমন ষ্টেডিয়ামও আছে যেখানে বসে নব্বই হাজার দর্শক খেলাধূলা দেখতে পারে।

প্রতি ইস্কুলেরই এক একখানি হাতে-লেখা সাপ্তাহিক কাগজ আছে, তাতে প্রত্যেকটি ক্লাশের সাপ্তাহিক খবর থাকে, বাদ-প্রতিবাদ আলাপ-আলোচনাও থাকে।

ছেলেমেয়ের অসুখ হলে হাসপাতালে থাকতে হয়, সে জন্য ডাক্তারকে কোন ফী দিতে হয় না, ওষুধেরও দাম লাগে না।

আঠারো বছর বয়স অবধি প্রাথমিক ইস্কুলে পড়াই নিয়ম, তবে যে তার আগেই সব মান শেষ করতে পারে তার পক্ষে অন্য কথা। ইস্কুল থেকে বেরুবার পরেই ছেলেমেয়েরা চাকরী পায়, চাকরীর জন্য কাউকে কখনো উমেদারী করতে হয় না। তবে যে সব ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণের চেয়েও উপরের স্তরের বলে শিক্ষয়িত্রীরা মনে করেন, তাদের আর কারখানায় চাকরী নিতে হয় না। তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কারখানায় চাকুরী নিলেই যে কারুর পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তা নয়। কারখানায় চাকুরী নিলেই সেখানকার কর্ম্মচারি সংঘের সভ্য হতে হবে। সভ্যদের জন্য রাত্রে ক্লাশ বসে, ইচ্ছা করলে যে কোন কর্ম্মচারী কাজের শেষে বিনাখরচে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারে। তুমি ম্যাট্রিক পাশ, অমুক বিষয় শেখা তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি আই-এস্-সি পাশ নও, এ জিনিষ তুমি শিখতে পাবে না—এ সব বিধি-নিষেধের ভণ্ডামি সে দেশে শোনা যায় না। যা শিখতে মন চায়, চেষ্টা কর, শিখতে পারবে—এই হোল ওদের দেশের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটা ওরা বড় বলে ধরে না, জ্ঞানের আলোচনা আর জ্ঞানবৃদ্ধিকেই ওরা উচ্চশিক্ষা বলে মনে করে।

ও-দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ইস্কুলে তারা একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে খেলাধুলা করে। বড় হয়ে কলকারখানা, চাষ-আবাদ, আফিস-ইস্কুল, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়—সর্ব্বত্রই তারা সমভাবে কাজ করে যায়, কোথাও কোন বাধা নেই। এখন আবার তারা একই সঙ্গে জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ করছে এবং এই যুদ্ধে যোগ্যতা দেখিয়ে অনেক মেয়ে সেনানায়কের পদমর্য্যাদাও লাভ করেছে।

বর্ত্তমান রুশিয়ায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের মানুষ হবার যে সুযোগ দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে আর কোন জাত তার ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য এতো মাথা ঘামায়নি। এইখানেই বোধ হয় সোভিয়েটের সব চেয়ে বড় গৌরব।

যাদুঘর

যাদুকর পি, সি, সরকার

ম্যাজিক কে না ভালবাসে? সব সখের রাজা এবং রাজ-রাজড়ার যোগ্য সখ (the king of the Hobbies and the Hobby of the kings) নামে ম্যাজিক অভিহিত হইয়াছে। কথাটা খুবই সত্য। আফগানিস্থানের বাদশাহ আমানুল্লাহ, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড প্রভৃতি সকলেই যাদুবিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী যাদুকরদিগের নিকট হইতে হাতে-কলমে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উহা প্রদর্শন করেন।

যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক দেখেন নাই এমন বোধ হয় কেহই নাই। সকলেই যাদুকরের চমকপ্রদ মায়ার কৌশল দেখিয়া একবার অন্ততঃ মনে মনে চিন্তা করেন—"হায় রে, আমি যদি অমনি লোক ঠকাইতে পারিতাম!" কাহারও কাহারও এই আন্তরিক অভিলাষ ক্ষণস্থায়ী হয় আবার কাহারও মনে ইহা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। শেষে এক দিন উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া ভালরূপে জ্বলিয়া উঠে। আমি যাদুবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম খুবই অল্প বয়সে। কিন্তু আজও ম্যাজিক শিখিবার নাছোড়বান্দা খামখেয়ালী অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। ইহার জন্য কত অনুযোগ শুনিয়াছি, এমন কি, তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়া পথের বেদিয়াদের পিছনে ও সন্ন্যাসীদের সহিত বহুবার ঘুরিয়াছি। বি-এ পড়িবার সময় কত বার যে তৎকালীন এক জন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের বাড়ীতে ধন্না দিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। পরিবর্ত্তে পাইয়াছি নির্ম্মল আনন্দ। আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু লোককে আনন্দ দান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার তুলনায় আত্মপ্রসাদ তুচ্ছ। এক্ষণে আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদিগকে কতকগুলি চমকপ্রদ, সহজ ও সুন্দর ম্যাজিক শিখাইব। ম্যাজিকের খেলা কোনটিই কঠিন নহে। বাড়ীতে নিয়মিত অভ্যাস করিলে সমস্ত খেলাই সহজসাধ্য হয়। এইবার এক-একটি খেলার মূল কৌশল প্রকাশ করিতেছি—পত্রিকা হইতে ইহা শিখিয়া কিছু দিন অভ্যাস করিয়া তার পর সকলকে দেখাইতে হইবে।

অঙ্কের থটরিডিং

প্রথম খেলাটি অঙ্কের থটরিডিং। যাদুকর প্রথমতঃ তাঁহার দর্শকদের এক জনকে টাকা আনা পাইএর একটি অঙ্ক মনে মনে ধরিতে বলিবেন, যেমন—৯ টাকা ১১ আনা ৬ পাই। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, টাকার সংখ্যা যেন ১২ হইতে কম হয়, আনার সংখ্যা ১৬ হইতে কম এবং পাইএর সংখ্যা টাকার সংখ্যা যত হইবে তদপেক্ষাও কম হয়। [এখানে ৯ টাকা ১২ অপেক্ষা কম আছে, ১১ আনা ১৬ হইতে কম আছে এবং ৬ পাই টাকার অঙ্ক ৯ হইতে কম আছে।] এইবার যাদুকর অঙ্কটিকে লিখিয়া তাহার নীচে ঐ অঙ্কটিকে উল্টা করিয়া লিখিতে বলিবেন এবং বড়টি হইতে ছোটটি বিয়োগ করিতে বলিবেন। এই বিয়োগ-ফলের নাম নূতন ফল রাখা হইল। এই নূতন ফলের নীচে উল্টা করিয়া লেখা নূতন ফলে যোগ করিলে যে ফল হইবে ইহার নাম হইবে আসল ফল। যাদুকর অঙ্ক না দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিবেন যে, আসল ফল কি? মজার বিষয় এই যে, যে কোন অঙ্কই ধরা হউক না কেন, ফল সর্ব্বদাই হইবে ১২ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই, এইটি মনে রাখিলেই হইল। দর্শকগণ ইহা জানেন না, কাজেই খেলাটি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন।

উদাহরণ দ্বারা খেলাটিকে আরও পরিষ্কার বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে—

	টাকা	আনা	পাই
প্রথম অঙ্ক	৯	১১	৬
প্রথম অঙ্ক উল্টাইয়া	৬	১১	৯
বিয়োগ-ফল বা নূতন ফল	২	১৫	৯
নূতন ফল উল্টাইয়া	৯	১৫	২
আসল ফল (যোগফল)	১২	১৪	১১

অর্থাৎ ১২ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই। নিজে নিজে আরও অঙ্ক ধরিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, আসল ফল চিরকালই ১২ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই—কি মজা! যদি সাহেবদিগকে এই খেলা দেখাইতে হয় অর্থাৎ যদি কেহ টাকা আনা পাইয়ের পরিবর্ত্তে ইংরেজী পাউণ্ড শিলিং পেনি হিসাবে হিসাব করেন তাহাতেও এই খেলা চলিবে, তবে সেখানে ফল সর্ব্বদাই হইবে ১২ পাউণ্ড ১৮ শিলিং ১১ পেনি অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা টাকা ছিল তত পাউণ্ড হইল, পূর্ব্বে যাহা পাই ছিল তাহাই পেনি হইল, শুধু পূর্ব্বে যত আনা ছিল তাহার সহিত ৪ যোগ করিলে যত হয় (১৪ + ৪ = ১৮) তত শিলিং হইবে। অঙ্কের এই থটরিডিং খেলাটি প্রথম জীবনে দেখাইয়া আমি খুবই সুনাম পাইতাম। খেলাটি অতি সহজ, কিন্তু ঠিকমত দেখাইতে পারিলে অনেক বড় বড় লোককেও অবাক্ করা যাইবে।

বিষ্ণুগুপ্ত

৩

শ্রীরবিনর্ত্তক

রাক্ষসের বাড়ীতে গিয়ে মহারাজ মহাপদ্ম নন্দ, মহারাণী সুনন্দা, মুরা ও রাজসভাসদেরা—সকলেই অবাক্। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! চোখে দেখলেও যে বিশ্বাস করা যায় না! তুলার বিছানায় শুয়ে ছোট ছোট ন'টি শিশু—যেন সবে মায়ের পেট থেকে পড়েছে—নরম তুলতুলে—রক্তের ন'টি ডেলা—হাত-পা নাড়ছে—আর মাঝে মাঝে হাঁ করছে খাবার জন্যে। কোন কোনটি একটু আধটু চিঁ চিঁ শব্দও করছে পাখীর ছানার মত!

বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কেটে গেলে বড়রাণী আর স্থির থাকতে পারলেন না। এত দিন পাটরাণীর একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজের স্বভাব-কোমল মাতৃ-হৃদয়টিকে পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে

রেখেছিলেন। কিন্তু আজ বাৎসল্যের মন্দাকিনী-ধারা তাঁর গাম্ভীর্য্যের ঐরাবতকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তার আর ঠিকানা রইল না। তাঁর মুখ থেকে বেরুল একটা অস্ফুট চাপা-কান্না-মেশান ধ্বনি—"ওরে আমার বাছারা! ওরে আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন সব!' বড় রাণীর এই উচ্ছ্বাসে সকলেই চম্‌কে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে—দেবী সুনন্দার দুই চোখে শত ধারা—কিন্তু মুখে এক অপার্থিব হাসি। যেন জগজ্জননী নিজে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন! তাঁর মুখখানি সর্ব্বদাই বিষাদ-করুণ গাম্ভীর্য্যে ভরা থাকত। আজ সেই মুখে এই স্বর্গীয় হাসি দেখে মহারাজ মহাপদ্মের মত প্রবল-প্রতাপ সম্রাট্ও পরম বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে স'রে দাঁড়ালেন। বড় রাণী আদর-মাখা গদগদ কণ্ঠে নানা ভাবে ছেলেদের ডাক্‌তে ডাক্‌তে এক পা এক পা ক'রে এগুতে লাগ্‌লেন। সকলেই অবাক্ হ'য়ে তাঁর ভাব-গতিক দেখ্‌তে লেগেছেন। হঠাৎ রাক্ষসের মনে বিদ্যুতের চমক জাগ্‌ল—বড় রাণী বোধ হয় ঠিক তাঁর ধাতে নেই—আনন্দের বেগ সহ্য করতে না পেরে তাঁর মনের মধ্যে যেন কোথায় কি গোলমাল হ'য়ে গেছে—তাই সব শরীরে তাঁর কি এক উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন—'ছোট রাণীমা! এক দৃষ্টে দেখ্‌ছেন কি? শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধরুন বড় রাণীমাকে, দেখ্‌ছেন না—উনি এখন ঠিক সহজ মানুষ নেই—ধরুন ধরুন—টল্‌ছেন উনি—প'ড়ে যাবেন—ধরুন শীগ্‌গির!'

মুরা তখনই সুনন্দাকে জাপ্‌টে ধরলেন—সঙ্গে সঙ্গেই দেবী সুনন্দা চেতনা হারিয়ে ঢ'লে পড়লেন মুরার গায়ের ওপর। তিনি আগেই সাবধানে ধরেছিলেন বড় রাণীকে। অচেতন হবার পর আস্তে আস্তে তাঁকে মেঝেতে শুইয়ে দিলেন—মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা—বাতাস চল্‌তে লাগল! কিন্তু চেতনা আর কিছুতেই ফেরে না! মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে রাজবৈদ্যকে সংবাদ পাঠাবার জন্য দাস-দাসীদের ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন।

রাক্ষস তখন বল্‌লেন—'মহারাজ! স্থির হোন্—বৈদ্যের দরকার হবে না। আমি বড় রাণীমার চেতনা ফিরিয়ে আন্‌ছি এখনই। এখান থেকে সব লোক স'রে যান,—কেবল মহারাজ, ছোট রাণীমা আর দাসী দু'জন থাক।'

মন্ত্রী ম'শায়ের কথায় লোকেরা সব বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে চ'লে গেল। ঘর-দালান ফাঁকা হবার পর রাক্ষস বল্‌লেন—'ছোট রাণীমা! এবার আপনি একটি ছেলেকে আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে বড় রাণীমার পাশে শুইয়ে দিন। তার পর বড় রাণীমার দেহ একটু পাশ ফিরিয়ে দিন এমন ভাবে যেন ছেলেটির মুখে বড় রাণীমার মাই এসে ঠেকে! ছেলেটি মাই টান্‌তে থাক্‌লেই চেতনা আপনি হবে। এখন শুধু ধীরে ধীরে মাথায় হাওয়া চলুক। আমিও এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি।'

রাক্ষস ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মুরা একটি ছেলের মুখে সুনন্দার মাই ঠেকাতেই ছেলেটি পরম আনন্দে মার মাই খেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুতের স্পর্শে চম্‌কে উঠে পাশ ফিরলেন বড় রাণী। সন্তানের স্পর্শই করল অমৃতের কাজ। কেবল সংবিৎ ফিরিয়ে পেলেন না সুনন্দা—ফিরিয়ে পেলেন তাঁর আগেকার সম্পূর্ণ সুস্থ মন। চোখ মেলেই তিনি বুঝ্‌লেন যে, ব্যাপার কি ঘটেছিল। কিন্তু ছেলে তাঁর স্তন্য পান করেছে—এ আনন্দ তাঁর মনে আর ধরছিল না আনন্দের আবেশে তিনি আবার চোখ বুঝ্‌লেন। দু'চোখ হ'তে আনন্দের ক্ষীণ অশ্রুধারা দু'টি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল! এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে কঠিন-হৃদয় দুর্দ্দান্ত সম্রাট্ মহাপদ্ম নন্দেরও নয়নের জল বাধা মানতে চাইছিল না—তিনিও গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

উৎকণ্ঠিত রাক্ষসের মুখে প্রশ্ন—'মহারাজ! সংবাদ কি?'

তখন মহাপদ্মের মুখে হাসি—চোখে জল—'মন্ত্রিবর! তোমারই কৃপায় চেতনা ফিরেছে। তোমারই কৃপায় আজ আমি ফেলে দেওয়া ন'টি ছেলে আবার ফিরে পেলুম'—গদগদ কণ্ঠে এই কথা বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এসে রাক্ষসকে জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন করলেন। দূরে থেকে রাজসভাসদেরা এ দৃশ্য দেখে পরম উল্লাসে মহারাজ ও মন্ত্রী মহাশয়ের জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল।

এর পর সুনন্দা আর একটু সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লে চতুর্দ্দোলে চেপে দুই রাণী ন'টি ছেলে নিয়ে রাজবাড়ী চ'লে গেলেন। পথের দু'ধারে তখন কাতারে কাতারে প্রজারা এসে জমেছে আর সকলে গলা মিলিয়ে চিৎকার করছে—'জয় প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের জয়!'

ক্রমে ধীরে ধীরে এই ন'জন রাজকুমার বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।* বয়স তাঁদের যতই বাড়তে লাগ্‌ল, ততই তাঁদের নানা রকম দুরন্তপনায় রাজ্যের সব প্রজারা হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল অস্থির। মহাপদ্ম নন্দ নিজেও বড় কম দুদ্দান্ত অত্যাচারী ছিলেন না। ক্ষত্রিয়দের ত তিনি দু'চোখে দেখ্‌তে পারতেন না। তার কারণ, তাঁর বাপ মহানন্দী যদিও ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা—তাঁর মা ছিলেন শূদ্রের মেয়ে। তিনি নিজে এই কারণে ক্ষত্রিয়দের চেয়ে শূদ্রদের দিকে বেশী টান দেখাতেন। তাই তাঁর বড় রাণী সুনন্দা তাঁর দু'চোখের বিষ ছিলেন—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ব'লে। তাঁর শূদ্রা রাণী মুরাকে তিনি বেশী আদর দেখাতেন। তবে সুনন্দার ন'টি ছেলে হবার পর থেকে তিনি বড় রাণী সুনন্দার সঙ্গে আর কোন রকম দুর্ব্ব্যবহার করতেন না—তবু

---

* বিষ্ণুপুরাণের মতে—মহাপদ্মের আট ছেলে—স্বমাত্য ইত্যাদি—বাপ মহাপদ্ম আর আট ছেলেতে মিলে একশ' বছর রাজ্য করেছিলেন।

মৎস্যপুরাণ মতে—মহাপদ্মের আট ছেলে সুকল্প ইত্যাদি—মহাপদ্ম রাজ্য করেন অষ্ট-আশী বছর, তাঁর আট ছেলে পালা ক'রে বার বছর মাত্র রাজ্য করেছিলেন। বাপ ও আট ছেলে মিলে মোট একশ' বছর রাজ্য করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে—মহাপদ্মের আট ছেলে—সুমাল্য ইত্যাদি। বাপ ও আট ছেলে মিলে একশ' বছর রাজ্য করেছিলেন।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে—মহাপদ্ম ও তাঁর আট ছেলে মিলে ১১ বছর রাজ্য করেছিলেন! ছেলেদের নাম তিনি দেননি।

এই সব পুরাণের মতে ও স্মিথ সাহেবের মতে মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁর আট ছেলে (নয় ছেলে নয়) মিলে 'নবনন্দ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু রবিনর্ত্তক-রচিত 'চাণক্য-কথা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, মহাপদ্ম নন্দের ক্ষত্রিয়া রাণীর গর্ভে নয় ছেলে—আর শূদ্রা রাণীর গর্ভে এক ছেলে—মোট এই দশ ছেলের জন্ম হয়। ক্ষত্রিয়া রাণীর ঐ ন'জন ছেলের নামই ছিল—নবনন্দ।

তাঁর মনের টানটা ছিল মুরারই ওপর। ক্ষত্রিয়দের প্রতি তাঁর এই জন্মগত বিদ্বেষ উত্তরাধিকার-সূত্রে নটি ছেলেরই মনে বেশ ভাল ভাবেই চেপে বসেছিল। তার ফলে তারা হ'য়ে উঠেছিল ঘোরতর কদাচারী।

নয় ছেলের যখন ভরা যৌবন, তখন তাদের ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখে বুড়ো রাজা নন্দ বুঝতে পারলেন যে, তিনি মারা গেলে পর এই নয় ভাই সিংহাসন নিয়ে পরস্পর মারামারি ক'রে এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য একেবারে ছারেখারে দেবে নিশ্চয়। তাই তিনি কূটবুদ্ধি বিচক্ষণ প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসকে গোপনে ডেকে নানা রকম পরামর্শ করলেন কিছু দিন ধ'রে। শেষে দু'জনে মিলে স্থির করলেন যে, বুড়ো মহারাজ বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁর রাজসিংহাসন এই ন'জন ছেলের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন। ঠিক হ'ল—নয় ছেলের প্রত্যেকে পালা ক'রে এক এক বছর রাজত্ব করবেন। প্রথম ছেলে—প্রথম বছর; দ্বিতীয় ছেলে—দ্বিতীয় বছর; তৃতীয়—তৃতীয় বছর। এই ভাবে নবম ছেলে নবম বছরে রাজ্য করবার পর আবার প্রথম ছেলে দশম বছরে রাজ্যের অধিকার পাবেন। আবার ঠিক আগের মত নিয়মে রাজ্য করার পালা চলতে থাকবে।

[ক্রমশঃ।

জীবন-জয়ন্তী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

[কোন এক কিশোর কবিকে]

হে কিশোর কবি প্রবাসী ভাইটি মোর
দু'চোখে তোমার কিসের স্বপ্ন-ঘোর ?
আমি যে দেখতে পাই।
কি কবিতা চাও জানি না আমার কাছে
দেবার মতন কি-ই বা আমার আছে ?
শোনো সুদূরের ভাই।
ত্রিভুবন জুড়ে স্বার্থের হানাহানি
বীভৎসতম দুস্তর কালাপানি
তবু হ'তে হবে পার।
আমরা মানুষ কালের অমর ছেলে
ঘৃণিত স্বার্থ পায়ের তলায় ফেলে
ভাঙবোই কারাগার।
যে কারায় আজো লাখো মানুষের প্রাণ
লাঞ্ছিততম স্বার্থের বলিদান
শোষণের হাড়িকাঠে।
আমরা জাগাবো, জাগাবো লক্ষ মন
সবহারা যতো বঞ্চিত জনগণ
জাগাবোই মাঠে মাঠে।
মানুষের মুখে দেবো মানুষের ভাষা
লাঞ্ছিত বুকে জাগাবো অজেয় আশা
জীবনের বেদগান।
আমাদের গানে নিখিলের নরনারী
শত্রুর বুকে মুক্তির তরবারি
হানিবেই খরশাণ।
জীবন-জোয়ারে দৃপ্ত ঘোড়ায় চড়ে
হবোই সোয়ার বার বার উঠে পড়ে
মানবো না কোনো বাধা।
অযুত কণ্ঠে একটি উদার গান
নিঃশেষে চাই শোষণের অবসান
এক সুরে সুর সাধা।
যুগ যুগ ধরে খেয়েছি অনেক লাথি
কেটেছে কতই দুঃখের অমারাতি—
বার বার অপমানে,
কত ঝড় কত ভূমিকম্পের বুকে
ভীমবন্যায় দাবানলে কৌতুকে
জাগেনি শঙ্কা প্রাণে।
কত মাংসাশী অতিকায় প্রাণীদল
দিগ্বিজয়ীর হিংস্র সৈন্যদল
হেরে গেছে বার বার।
মানুষ মরেনি, মরতে পারে না কভু,
মৃত্যুর বুকে লাথি মেরে হয় প্রভু
জীবমাতা বসুধার।
হে কবি বন্ধু, প্রবাসী ভাইটি মোর
আমাদের চোখে সোনার স্বপ্ন-ঘোর
প্রাণময় জগতের।
মরা-পৃথিবীর পুরোনো চামড়া খুলে
নবীন অঙ্গ সাজাবো প্রেমের ফুলে
মালা গেঁথে মিলনের।
আমাদের প্রভু হলধর বলরাম
সোনার লাঙলে চিরমানুষের নাম
লিখে যায় ইতিহাসে।
যান্ত্রিক বেগে ময়দানবের ঘোড়া
মোদের বাহন ছুটবে জগত-জোড়া
সাম্যের উল্লাসে।

ইনটারভিউ

অ, কু, রা,



১

সারা স্কুলময় রটে গেল সেই বার্ত্তা।

হেড মিস্ট্রেস্ মৈত্রেয়ী দি' পুনঃ যাইবেন কলিকাতা।

মালা দি' বললেন শুনে, মুখ বেঁকিয়েই বললেন : এরই মধ্যে আবার···এই ত সে-দিন আসলেন ঘুরে···নাঃ, বার বার আমি পারব না স্কুল সামলাতে। যে সব দস্যি মেয়ে হয়েছে সব।

মালা দি' য়্যাসিস্‌টাণ্ট হেড মিসট্রেস্।

কেন বার বার এই যাওয়া-আসা?—কৌতুকভরা চোখে জিজ্ঞাসা করেন অঙ্কের দিদিমণি নীহার দি'। শুধু কৌতুক নয়, নেপথ্যের গভীরতর কোন রহস্যের সন্ধানও যেন তিনি জানেন, এমনি তার প্রশ্নের সুর।

মৈত্রেয়ী দি'র এই ঘন ঘন কলকাতা যাওয়া-আসাটা স্কুলের নিকট একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। আগে এটা শুধু দিদিমণিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তার ঢেউ মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়েছে।

সে সব কথা চিন্তা করেই মালা দি' বললেন উষ্ণ হয়ে : তা কি করে বলব—বলে না কি কিছু আমাদের···

নীহার দি' ফিক্ করে হেসে বললেন : নাইন ক্লাসের ফচ্‌কে মেয়েগুলো কি বলে জানেন?

মালা দি' জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন; কি বলে শুনি?

মুচকি হেসে ফিস্ ফিস্ করে নীহার দি' বললেন : বলে হেড মিস্ট্রেস্ না কি প্রেমে পড়েছেন···

বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

দুর! গা ঝাড়া দিয়ে বললেন মালা দি'।

তা এতে আশ্চর্য্য কি? নীহার দি' মেয়েদের রটনারই ওকালতি করেন; অমন ত কতই হয়ে থাকে···

যাঃ, উনি ত বিয়েই করবেন না বলেছেন। মালা দি' তাকে একেবারে দাবিয়ে দিতেই চান।

নীহার দি' বললেন ঠোঁট উল্‌টিয়ে : অমন কথা অনেকেই বলে থাকে। তার পর তেমন তেমন শিবঠাকুর জুটলে সব গৌরীরই তপ ভঙ্গ হয়।

মালা দি' বললেন : বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন : না, সে হবে···

কি আর আছে এখন তার—আর পিছনের সেই বিপজ্জনক teens-এর বয়সগুলিই যখন নির্বিবাদে পেরিয়ে এলেন এখন ত ও-সব কাটিয়ে উঠতে পারবেন সহজেই! এই উত্তর-পঁচিশ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, গম্ভীরাননা, মূর্ত্তিমতী হেড মিস্ট্রেসের মনে কি লাগবে ফাল্গুনের দোলা? দূর, দূর, একেবারে অসম্ভব কল্পনা। স্কুলের হেড মিস্ট্রেসরূপেই ওকে চিরকাল মানাবে ভালো—কোন ভদ্রলোকের প্রেয়সীরূপে নয়···

নীহার দি' বললেন : কিন্তু তার এই বার বার যাওয়া আসাটা অনেকের কাছেই যে শুধু রহস্যময় ঠেকছে তা নয়—বেশ রসালোও করে তুলেছেন অনেকে। তা জানেন···?

হ্যাঁ:, তা সত্য বটে!

মালা দি' হার মানলেন। এবার জিজ্ঞাসা করতেই হবে মৈত্রেয়ী দেবীকে। এত স্পেকুলেশনের দরকার কি?

শনিবারে ছুটার পর নান্দিনা গার্লস্কুলের দিদিমণিদের মধ্যে চলছিল রবিবারে হেড মিস্ট্রেসের কলকাতা যাওয়া নিয়ে আলোচনা। তার অসাক্ষাতেই। বুড়ী দিদিমণিরা সব আগেই চলে গিয়েছিলেন; তরুণ-বয়সীরা তাই অবাধে জমিয়ে তুলেছিলেন অপিস-ঘরে শনিবারের বৈকালিক বৈঠক।

ননী দি' চুপ করে শুনছিলেন আলোচনা। এক হেড মিস্ট্রেস্ ছাড়া স্কুলের সব দিদিমণিদের মধ্যে তার ডিগ্রীগুলিই সব চেয়ে বেশী জমকালো। এই অবচেতন আত্মাভিমানে এবং কিঞ্চিৎ লাজুক প্রকৃতির জন্য স্কুলের আর আর দিদিমণিদের থেকে তিনি যেন একটু দূরে। কলকাতার মেয়ে—ইংরেজী ও বাংলায় ডবল এম-এ। চাকরী নেওয়াটা নেহাৎই তার সময় কাটানোর একটা পথ—রজতচক্রের চাপ নয়। মৈত্রেয়ী দি'র পরেই স্কুলে তার স্থান, ছাত্রী ও দিদিমণি উভয় মহলেই!

ননী দি' সুশ্রী। কিন্তু চিবুকের পাশের একটা বড় আঁচিল তার সৌন্দর্য্যের একটা বড় অংশ অপহরণ করে দিয়েছে। ননী দি' নিজেই তা মনে মনে বোঝেন।

ননী দি' চুপ করে শুনছিলেন আলোচনা। এ সব আলোচনায় বড় বেশী যোগ দেন না তিনি। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সহসা ননী দি' আজ যেন মহা উৎসাহে মেতে উঠলেন এ নিয়ে। মালা দি'র কথার খেইটা টেনে নিয়ে বললেন : আপনারা ত কেউ বলতে পারলেন না—কিন্তু আমি জেনেছি তার এই ঘন ঘন যাওয়া-আসার কারণ!

বলে বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ হাসলেন।

সত্যি জানতে পেরেছেন। য়্যাঁ?

তাণ্ডব উচ্ছ্বাসে ঘরশুদ্ধ সকলের কৌতূহল যেন ফেটে পড়তে চাইছে! চাঞ্চল্যকর একটা গুপ্ত তথ্যের আশায় তার চারি দিকে সকলে ঘনীভূত হয়ে বসলেন।

ননী দি' এবার গোপন তথ্যটা উদ্‌ঘাটন করে দিলেন : আপনাদের মৈত্রেয়ী দি' ত শীগ্‌গিরই চাকরী ছাড়ছেন···

সকলের ঔৎসুক্য দপ্‌ করে নিবে গেল। অন্য কোথাও চাকরীর চেষ্টা করছেন, এ আর একটা কি অমন নূতন কথা হল! আহা! এই রকম জোলো খবর কি আর তারা আশা করেছেন না কি! ধ্যেৎ!

ননী দি' বুঝলেন অবস্থাটা। বুঝে তাদের চাপা করে তুললেন :

অন্য চাকরীর চেষ্টা করছেন বটে—কিন্তু স্কুলের চাকরী নয়···

নীহার দি' বললেন : সে ত বোঝাই যায়—এ বাজারে স্কুলের চাকরী করে নেহাত হতভাগীরাই···সাপ্লাইতে, ওয়াফিতে কত ভালো ভালো চাকরী পড়ে রয়েছে···

মালা দি' বললেন, তা হবে, ইনটারভিউ দিতেই হয়ত মৈত্রেয়ী দি' বার বার যান কলকাতায়···

ননী দি' বাঁকা হেসে বললেন : চাকরীর ইনটারভিউই বটে। কিন্তু এ চাকরীটা অবৈতনিক যে। ননী দি' পুনরায় রহস্যময় হয়ে উঠেন।

বিজলী দি' বললেন : বাঃ, অবৈতনিক চাকরী হলে তার চলবে কি করে?

ননী দি' গম্ভীর হয়ে বললেন : এত দিন সব মেয়েরই ত চলে এসেছে—ওরই বা চলবে না কেন?

সকলের মনে শব্দচক্রের ধাঁধার আন্দোলন দেখা দেয়···

নীহার দি' বললেন : সোজা কথায় বলুন। অত ঘোর-প্যাঁচে যাবেন না—দোহাই···

ননী দি' এবার ভাঙ্গলেন কথাটা : তার মানে আমি বলছি বিয়ের কথা। স্বামীর সংসার আগলানো কি মেয়েদের একটা চাকরী নয়? আর এই চাকরী বাগানোর জন্ম ক'নে দেখার নামে মেয়েদের ইনটারভিউ ত চিরকালই চলে আসছে···

মালা দি' রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : তাহলে কি আপনি বলতে চান···

বাধা দিয়ে ননী দি' বললেন : আমি যা বলতে চাই তার সিকি ভাগও এখনও বলা হয়নি···একটু সবুর করুন না—

বলে বার করলেন একখানা পুরোনো খবরের কাগজ। কবে বললেন : একটা বিজ্ঞাপন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের—আমারই এক আত্মীয়ের দেওয়া বিজ্ঞাপনটা। ভদ্রলোক আই, সি, এস্। অবিবাহিত। বয়স চল্লিশোর্দ্ধ। বিয়ে করবেন না এ প্রতিজ্ঞা তাঁর কোন কালেই ছিল না। বোধ হয় বিয়ে করাটা দরকার, তা আগে কোন দিনই খেয়াল হয়নি। সম্প্রতি হুঁস্ হয়েছে—বিয়ে করতে হবে। এ বিয়েও আবার সেই সনাতন প্রথার মর্য্যাদা রেখে নয়—তার নিজস্ব পথেই তিনি সংগঠনের ভার নিয়েছেন। সমগ্র প্রভাতী সংবাদপত্র মারফৎ তিনি বাংলাদেশের সব মেয়েদের কাছে পাঠিয়েছেন আমন্ত্রণ, তার স্বয়ম্বধূ-সভায় যোগদান করবার।

বলে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনটা।

পাত্রী চাই। সরকারী চাকুরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, আই, সি, এস্ পাত্রের জন্ত আধুনিকা, উচ্চশিক্ষিতা, সুদর্শনা উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট তারিখে ইনটারভিউ লইবেন ও পাত্রী মনোনয়ন করিবেন।···

এখন হয়েছে কি জানেন, তিনি আবার তাঁর নিজের মনোনয়নের উপর ঠিক ভরসা করতে পারছিলেন না। মেয়েদের বাজিয়ে নেবার ব্যাপারে এক জন মেয়ের সহায়তা পেলেই যেন ভালো হয়। তাই আমাকে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন স্বয়ম্বধূ-সভার এক জন নির্ব্বাচক হিসাবে।

সেই যে মাসখানেক আগে একবার ছুটী নিলাম চার দিনের। মালা দি' তার জন্ত তখন কত রাগ করেছিলেন। আমরা দু'জনেই চলে গেলে তিনি স্কুল চালাবেন কি করে? সে ত এই জন্তই···

সেদিন মিঃ চৌধুরীর নিমন্ত্রণে।

চৌধুরীর হলে বসেছে সে দিন যেন চাঁদের হাট। বলব কি মালা দি', অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ভূ-ভারত থেকে এসেছে রাশি রাশি তরুণী—আই, সি, এসের সোনার তরীতে ঠাঁই পাবার জন্তে···রীতিমত যেন সদাগরী অপিসের কেরাণী নির্ব্বাচনের ব্যাপার।

একে একে চৌধুরী কল দিতে লাগলেন—সকলকে।

সৌন্দর্য্য, গ্লেমার, ডিগ্রী, আভিজাত্য, ধন,—বধূর মধ্যে এ-সব অনেকগুলি জিনিষের একটা সিনথিসিস্ চৌধুরীর লক্ষ্য। কিন্তু অমন ফরমাইসী মেয়ে বড় একটা সহসা পাওয়া যায় না। তাই অনভিপ্রেতদের করতে লাগলেন সুকৌশলে ফেল।

কাউকে জিজ্ঞাসা করেন গলফ খেলার মাঠে ক'টা গর্ত্ত, বেস বল খেলার বেস্ (base) কি? কাউকে বা জিজ্ঞাসা করলেন : রোজ দেড় পোয়া করে ছাগলের দুধ খেলে জীবনে মহাত্মা ক'টা ছাগলের দুধ খেয়েছেন···? এমনি সব জটিল প্রশ্ন···

অবশ্ত চৌধুরী যে ধরণের মেয়ে চান তা সহজে পেতে হলে সব চেয়ে সোজা পথ হল হলশুদ্ধ সব মেয়েকেই বিয়ে করা। একটিতে সব গুণ মেলা দুষ্কর। একে একে তাই নিষ্ফল ইনটারভিউ দিলেন : গীতা মিশ্র এম-এ (ডবল)—বর্ণ শ্যাম (বিয়ের ভাষায়), ডবল ডিগ্রীর আবরণে তা ঢাকা গেল না। নীলিমা সেন—বি-এ, গীত-শ্রী, (কিন্তু নাক চ্যাপটা যে—আই, সি, এসের বউয়ের নাক চ্যাপটা—এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে—অতএব বাতিল)। অরুন্ধতী নাগ—পড়ুয়া ফিল্ম-ষ্টার (কিন্তু ডিগ্রী নেই যে—থেকে, আই, সি, এসের বৌ-এর শুধু পর্দ্দায় লোকের মন হরণ করলেই চলবে না কি? তার পর পার্টিতে বাঘা বাঘা সাহেবদের দেখবে কে?) উর্ম্মিলা ভেঙ্কটেশ্বরম্ আয়ার, কথাকলি নৃত্যগুরু, রুক্মিণী দীক্ষিত, মালবিকা ভড়, বেলারাণী পাকড়াশী (রেডিও), শীলা চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-সঙ্গীত) ইত্যাদি। কিন্তু কেউ মিঃ চৌধুরীর মানসীর কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে না।

আর দু'-এক জন হলেই সেদিনকার মত নির্ব্বাচন-পর্ব্বটা শেষ হত। এমন সময় ড্রয়িং রুমে ঘোষিত হল এক জনের নাম। যা শুনে আমি চমকে উঠলুম—এবং তিনি ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটে পালালুম, স্রেফ পালালুম।

এ যে আমাদের মৈত্রেয়ী দেবী!

বিস্ময়ের বিস্ফোরণে সকল শ্রোতা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন : য়্যাঁ! সত্যি?

ননী দি' বললেন : জানি, আপনারা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না।

নীহার দি' এক হাত জিভ কেটে বললেন : কেলেঙ্কারী···

মালা দি' বললেন : কপালে হাত দিয়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ আর কি, আগে বাপ-মা কত সেধেছে—আমি বিয়ে করব না—এখন···ভ্যাংচাতে গিয়ে সুরটা হয়ে পড়ল সানুনাসিক। মালা দি' নিজে বিবাহিত।

স্বাস্থ্যের দিদিমণি সংযুক্তা দি' বললেন, বিবাহটা একটা নৈতিক প্রয়োজন। যখন করতেই হবে তখন নাক সেঁটকানোর কি দরকার আগে—

বুড়ীদের মধ্যে একমাত্র ছিলেন মোক্ষদা দি'। হায় হায় করে বললেন : হা পরমেশ্বর, কালে কালে হল কি? বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে···

গল্পের সূত্র হারিয়ে যায় দেখে মালা দি' বললেন : থাকগে সব কথা···তার পর কি হল বলুন ত ?

ননী দি' বললেন : মৈত্রেয়ী দি'র ইনটারভিউ আমি দেখে আসতে পারিনি। পরে শুনলাম, তিনিও না কি ফেল করেছেন। ব'লে মৃদু হাসলেন বেঁকে।

ঘর-শুদ্ধ সকলের মুখে সংক্রামিত হল সে হাসি।

এমন সময় সহসা অবরুদ্ধ কাল-বৈশাখীর মত ঘরে আবির্ভূত হলেন মৈত্রেয়ী দেবী! আরক্ত চক্ষু, কর্ণমূলে লালিমার প্লাবন··· ঘরশুদ্ধ সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখে বললেন : আপনারা এতক্ষণ ধরে ত শুনলেন ননী দি'র গল্প। এবার বাকীটা শুনুন আমার মুখ থেকে···ফেল শুধু আমি একাই করিনি সে দিন—করেছেন ননী দি'ও···

সর্ব্বনাশ! আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে না কি ?

তার মানে ? আমতা আমতা করতে করতে বললেন ননী দি'।

মদনভস্ম-মার্কা চোখে তার দিকে তাকিয়ে সকলকে শুনিয়ে বললেন মৈত্রেয়ী দি' : মানে, চৌধুরীর ড্রইং-রুমে আপনি সে দিন উপস্থিত ছিলেন নির্ব্বাচকরূপে না নির্ব্বাচনপ্রার্থিরূপে ? সে সত্য কথাটা আপনিই যখন বললেন না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হল। শুনুন আপনারা,—সে দিন ননী দি'ও চৌধুরীর হলে উপস্থিত ছিলেন—নির্ব্বাচকরূপে নয়। নির্ব্বাচনপ্রার্থি-রূপে··· ভাবী একটা সম্বন্ধের সম্ভাবনা ছাড়া কস্মিন্ কালেও চৌধুরীর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই···

মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, একেবারে মিথ্যে—ননী দি' ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন।

তা মিথ্যে হতে পারে এ কথা। কিন্তু চৌধুরীর নির্ব্বাচনে ননী দি' যে ফেল করেছেন, তা ত আর মিথ্যে নয়···আর করেছেন ঐ থুতনির উপরকার আঁচিলটার জন্যেই···

মা গো! এত বানিয়ে বলতেও পারে লোকে।

গলায় আরশুলা আটকানো স্বরে বললেন ননী দি'···বলতে বলতে সহসা ঢপ্ করে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়লেন মাটীতে—

এ কি এ কি! সকলে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

ধর ধর তোমরা সবাই ননী দি'কে।

ননী দি'র আবার ফিটের ব্যায়রাম।

২

মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে পর হোষ্টেলে ননী দি' মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, শনিবারের বিকেলে না হয় বানিয়ে একটা মজার গল্পই বলেছিলাম, তাই বলে রেগে গিয়ে আমায় অমন ভাবে সকলের সামনে নাকাল করলেন কেন বলুন ত···

মৈত্রেয়ী দি' মৃদু হেসে বললেন, আগে কি জানতুম আপনি এত সেনটিমেণ্টাল! এত অল্পেই মুষড়ে পড়বেন···

কর্ম্মরহস্য

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য

মানুষের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুই হইল মোক্ষ, এই মোক্ষলাভ করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই তার এক মাত্র সহায়। কারণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের দ্বারা মন অত্যন্ত পবিত্র হইলে তবে আত্ম-দর্শন হইয়া মোক্ষলাভ হয় ১। অতএব মোক্ষলাভ করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতেই হইবে, এবং তাহাই ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মই মানুষের প্রকৃত বন্ধু, ধর্ম্মের দ্বারাই লোক সম্পূর্ণ সংযত হইয়া যায়। দেখিতে পাই, যিনি ধার্ম্মিক হন তিনি কখনই কোন অধর্ম্ম করিতে পারেন না। অধর্ম্মের কোন সম্ভাবনা হইলে ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর বাধা প্রদান করিবেন, তখনই তাঁহার মনে হইবে ইহা অন্যায় কাজ, কখনই ইহা করা হইবে না, ইত্যাদি। এই জন্য ধার্ম্মিক লোক স্বভাবতঃই সজ্জন হইয়া থাকেন এবং সেই হেতু সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি। কলিকাতায় এক জন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ধনী ও প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ; তাঁহার এক জন বন্ধু ছিলেন তিনিও ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ। এই লোকটির বিশেষ কার্য্যের জন্য হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, সেই জন্য তিনি এক দিন গঙ্গা স্নান করিয়া বাড়ী যাইবার সময় ঐ ধনী বন্ধুকে বলিলেন, ভাই, তুমি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দাও, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে ; কেহ যেন ইহা জানিতে না পারে, মা গঙ্গা একমাত্র সাক্ষী থাকিলেন, এই বলিয়া এক ঘটী গঙ্গাজল বন্ধক রাখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া এক জন কর্ম্মচারীকে ঐ টাকা দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারীটি গোপনে তাঁহাকে বলিলেন, এতগুলি টাকা এক কথায় দিবেন, একটা কিছু পত্র লিখিয়া লইয়া তবে দিলে ভাল হয়। তখন তিনি বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ বিশেষ ধার্ম্মিক লোক জানি, ইনি মা গঙ্গাকে বন্ধক রাখিতেছেন, ইহা অপেক্ষা প্রবল সাক্ষী আর কি হইতে পারে? অতএব নিঃসন্দেহে দেওয়া যাইতে পারে। তখন ব্রাহ্মণকে টাকা দেওয়া হইল, ব্রাহ্মণ টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন, এক মাস পরে তিনি ঐ টাকা সম্পূর্ণ শোধ করিয়া গঙ্গাজল উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। দেখুন ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথায় এমনই মূল্য যে, তাহা লিখিত প্রমাণ অপেক্ষাও দৃঢ়তর হয়, প্রাণ থাকিতে তাঁহারা মিথ্যা কথা বলেন না, এই জন্য সকলেরই নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন। আর এখন দেখিতে পাই, লোক রেজেষ্ট্রী করা দলিল পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। সত্য যেন জগৎ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং শান্তির আর আশা কোথায়? ধার্ম্মিক ভিন্ন কেহ কখনো সজ্জন হইতে পারে না, অতএব সমাজকে শান্তিময় সুখী ও ভদ্র করিতে হইলে ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয়ে আসিতেই হইবে। সমাজের সমস্ত কর্ম্মকে ধর্ম্মের দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া না দিলে তাহা হইতে বিরুদ্ধ ফল আসিয়া পড়িবেই। লোকের হৃদয় বিশুদ্ধ না হইলে কর্ম্ম কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না, হৃদয় অশুদ্ধ থাকিলে লোভ স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা হিংসা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি আসিয়াই পড়িবে। আর মানুষ অজ্ঞান হইলে তাহার কর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবেই,

১। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"—গীতা।

সুতরাং রাজনৈতিক বা সামাজিক জনহিতকর সমুদায় কর্ম্মকেই ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই জন্য সর্ব্ববিধ কল্যাণের মূলই হইল ধর্ম্ম, অতএব বেদ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি"

অর্থাৎ ধর্ম্মই সমগ্র জগতের আশ্রয়, জগতে সমস্ত লোকই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, ধর্ম্মের দ্বারা পাপ দূরীভূত হয়, জগতের সমস্তই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য মনীষিগণ ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। মহর্ষি কণাদ তাঁহার কৃত বৈশেষিকদর্শনে সূত্র করিয়াছেন—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"

যাহা হইতে লোকের সম্যক্ উন্নতি ও মুক্তি হয় তাহাই ধর্ম্ম।

বেদাচার্য্য মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ যাহার দ্বারা কোন অপকারই হয় না, কেবল উপকার হয়, এইরূপ বেদবিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম ২। অর্থাৎ বেদে যাহাকে যে সময়ে যে কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে তাহাই কর্ত্তব্য। তাহার ব্যতিক্রম করিলে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্মই হইয়া পড়িবে। যেমন দেখুন বেদে আছে, রাজসূয় যজ্ঞ বা অশ্বমেধ যজ্ঞ যাবতীয় যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির তাহাতে অধিকার নাই—ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত নাই। অতএব দেখিতে পাই, ভগবদবতার পরশুরাম বা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা ইঁহারা অসাধারণ বীর ও যোদ্ধা হইলেও কেহ অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করেন নাই। পরশুরাম স্বীয় অমিত প্রভাবে সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতিকে পরাভূত করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন নাই। ব্রাহ্মণোচিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই করিতেন, তাহার কারণ, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে অধিকার ছিল না। নয়ত কেহ বলিবেন, ঐরূপ প্রসিদ্ধ কর্ম্মে অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন ইত্যাদি। কিন্তু তাহা নহে, শাস্ত্রই বলিয়াছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যে পুণ্য হইবে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন বা অগ্নিহোত্রাদি স্বজাতীয় কর্ম্ম করিলেই সেই পুণ্য অর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, সুতরাং তাঁহার সেজন্য দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। এইরূপ অন্যান্য জাতির পক্ষে যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাঁহারা সেই কর্ম্মের দ্বারাই সম্পূর্ণ পুণ্য অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবেন। আরও দেখুন, শাস্ত্রে আছে একাদশীর দিন উপবাস করিয়া হরিপূজা, হরিনাম জপ, হরিধ্যান প্রভৃতি করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। ঐ উপবাস একাদশী বা দ্বাদশীতে করিবার বিধি আছে কিন্তু তাহা ঐ দিনে না করিয়া নবমী দশমী বা ত্রয়োদশীতে করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। কারণ, তাহাতে কোন বিধি নাই। কারণ, যাহাতে শাস্ত্রের কোন নির্দ্দেশ নাই তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব যাহারা বলেন, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই ঐ উপবাসের ব্যবস্থা অর্থাৎ দেহের রস পরিপাকের জন্যই ঐ উপবাস করিতে হয়, উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত, সাহেবরাও ইহা সমর্থন করেন। অতএব ধর্ম্মের নামে স্বাস্থ্য-রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য, ইহাতে ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের নাম দিয়া নির্ব্বোধ সমাজকে এই ভাবে বহু স্থলেই ঠকাইয়া থাকিত, এবং এখনও বামুনগুলা ঠকাইতেছে, উহাতে ধর্ম্মের ধ-ও নাই ইত্যাদি, ইহাই হইল আধুনিক উন্নতিশীল এক দল বৈজ্ঞানিক লোকের অত্যুগ্র বিবেচনা, স্বাস্থ্যের জন্য হইলে নবমী দশমী বা ত্রয়োদশী যে কোন দিনে উপবাস করিলেই হইত, তাহার জন্য সেই সকল বিধি-নিষেধ আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোন প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, একাদশীর উপবাসের দিন হরিপূজা, হরিলীলার গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করা, ব্যাখ্যা বা কথকতা প্রভৃতি শ্রবণ, গঙ্গাস্নান, দান ইত্যাদি করিতে হইবে, কেবল দেহকে শুষ্ক করিলে হইবে না, এবং সেই দিন কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য করা হইবে না, ও ভোগ-বিলাসের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্য বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ। (শরীরবিশোধনম্)
তদ্‌ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
উপবাসকৃতো হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ"।

যে উপবাস করিতে হইলে এত গুলি অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে হয় তাহা কি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেবল দেহকে শুষ্ক করা? কখনই নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপবাসে ঐ সকল অঙ্গের কোন প্রয়োজনই হয় না, যেমন জ্বর বা উদরাময় প্রভৃতি রোগে আয়ুর্ব্বেদে উপবাসের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেখানে হরিপূজা প্রভৃতির কোন বিধান ত নাই। আরও দেখুন, উপবাস করিলে যাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহাদের পক্ষে তাহলে ত একাদশীব্রত কোন মতেই করা উচিত হয় না, কারণ, উপবাস করিলে আরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, কিন্তু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, তাহাদেরও একাদশীব্রত করিতে হইবে। কারণ তাহা নিত্য, কোন মতেই বন্ধ করা চলিবে না, সেজন্য তাঁহাদের পক্ষে অনুকল্পের বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ অসমর্থ হইলে অন্ততঃ ফল মূল দুগ্ধ ইত্যাদি আহার করিয়াও একাদশী ব্রত করিতেই হইবে,

"অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।"

একাদশীর উপবাস করিলে আনুষঙ্গিক স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি উত্তম উত্তম ফলও হইয়া থাকে ৩। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হইলে তাহার দ্বারা কেবল স্বাস্থ্যলাভ ভিন্ন স্বর্গ বা মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই হইত না।

একাদশীব্রত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দিনেই করিতে হইবে, অন্য দিনে করিলে চলিবে না। কারণ, শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে তদনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে, তাহার অন্যথাচরণ করিলে চলিবে না। সেইরূপ যে জাতির পক্ষে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জাতিকেই তাহা করিতে হইবে, অন্যে তাহা করিলে ব্যর্থ হইবে বা অনিষ্ট হইবে। যেমন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করিলে তাঁহার স্বর্গ হইবে,

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"

অর্থাৎ যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়লাভ কর সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিবে। সেইরূপ যাজন, পৌরোহিত্য, গুরুতা, শাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষেই ধর্ম্ম হইবে; অন্যের পক্ষে নহে, অন্যে ঐ সকল কার্য্য করিলে গুরুতর অমঙ্গলই হইয়া যায়।

"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে।
[illegible] হীয়তে।" কুমারিল।

৩। "সংসারসাগরোত্তারমিচ্ছন্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
ঐশ্বর্য্যং সন্ততিং স্বর্গং মুক্তিং বা যদ্‌যদিচ্ছতি।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।"—কাত্যায়নঃ

নরওয়ে

এ যুদ্ধে নরওয়ের পানে চাহিলে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে পড়ে। মোগল বাদশাহের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি যেমন বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, বিশ্রাম-সুখ উপভোগ না করিয়া কয়েক জন বীর অনুচর লইয়া অন্তিম মুহূর্ত পর্য্যন্ত মোগলের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, নরওয়েও আজ ঠিক সেইরূপ করিতেছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সূচনা-কালে জার্ম্মানি যখন অতর্কিতে নরওয়ে আক্রমণ করে, তখন প্রস্তুত না থাকার দরুণ নরওয়ে পরাজিত

হিটলারের কথায় কর্ণপাত করে নাই। নরওয়ের জাহাজ পাইয়া ব্রিটিশ জাহাজী-মিনিষ্টার বলিয়াছিলেন—এ জাহাজ পাইয়া মিত্র-শক্তি প্রভূত শক্তিমান্ হইয়াছে। এ জাহাজগুলির মূল্য এক কোটী-ফৌজের চেয়েও বেশী! এই জাহাজগুলির দৌলতেই মিত্র-বাহিনী সেই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে টর্পেডো, মাইন, বোমা ও শেল-প্রতিরোধে সমর্থ হইয়াছিল। নরওয়ের জাহাজী-মাল্লারা জীবনকে তুচ্ছ করিয়া জল-যুদ্ধে সকলের পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নরওয়েতে জার্ম্মান অস্ত্রের মুখে এই সব নাবিকের স্ত্রী পুত্র কন্যা বিপন্ন

হয়। এ পরাজয় নরওয়ে মানিয়া লয় নাই। সম্মুখ-সমরে জার্ম্মানিকে প্রত্যাঘাত করা নরওয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই জার্ম্মানির হাতে আত্ম-সমর্পণের লাঞ্ছনা না সহিতে হয়, এ জন্য নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্টের উপদেশে নরওয়ে-রাজ ত্রয়োদশ হাকন তাঁহার গবর্ণমেন্ট-সমেত আসিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লন; এবং সেখানে মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়া সর্ব্বতোভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতেছেন। তিনিই নরওয়ের স্বাধীনতার প্রতীক—তাঁহাকে ঘিরিয়া নরওয়েজিয়ানরা আজ মিত্রপক্ষের বিমান, রণতরী, নৌ-ও-স্থলফৌজ-বিভাগে অদম্য উৎসাহে কাজ করিতেছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে জিতিলেও নরওয়ের বাণিজ্য-পোতগুলির শতকরা আশী ভাগ জার্ম্মানির কবলচ্যুত ও নিরাপদ রহিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সব চেয়ে বেশী বাণিজ্যপোত ছিল বৃটেনের—২১২১৫০০০ টন; তার পর মার্কিণের—১২০০৩০০০ টন। তার পর জাপানের ৫৬৩০০০০ টন; জাপানের পরেই নরওয়ের নৌ-বল—৪৮৩৫০০০ টন। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর আনকোরা নূতন জাহাজ মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত, কাজেই বেশ মজবুত। শতকরা ৬০খানি আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মোটর জাহাজ; ৪০ খানি অতিশয় ক্ষিপ্রগামী এবং আধুনিক রীতিতে নির্ম্মিত ট্যাঙ্কার। নরওয়ের বাণিজ্য-পোতগুলি সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত নয়—সেগুলি সাধারণের অর্থে ও আনুকূল্যে তৈয়ারী।



এই সব জেলে-ডিঙ্গিতে চড়িয়া নরওয়েজিয়ানরা দেশত্যাগ করে

জার্ম্মানির আক্রমণ ঘটিবামাত্র নরওয়ে প্রায় ১০০০ জাহাজ ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষীয় বন্দরে পাঠাইয়া দিয়াছিল; জাহাজ হারাইয়া হিটলারের ক্ষোভ এবং আক্রোশের সীমা ছিল না। হিটলার বলিয়াছিল, এ জাহাজগুলির বিনিময়ে নরওয়েকে অক্ষত রাখিবে, কিন্তু নরওয়ে সে-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ঐ এক-হাজার জাহাজের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ হাজার নরওয়েজিয়ান নাবিকের সাহায্য হারাইয়া হিটলার নরওয়েকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল—তাহাতেও নরওয়েজিয়ানরা

—হিটলার শাসাইয়াছিল, জাহাজ ছাড়িয়া নরওয়েতে ফিরিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে যোগ দাও, নচেৎ তোমাদের গৃহ-সংসার নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। সে ভয়ে নরওয়েজিওয়ান নাবিকের দল স্বাধীনতা-সংগ্রামের পণ ত্যাগ করে নাই—গৃহ-সংসারের মায়ায় টলে নাই। এ ত্যাগ, এ আদর্শ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। সে-ভয় দেখানো হিটলারের মুখের আস্ফালনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। নরওয়ের মাটি অধিকার করিলেও নরওয়েজিয়ানদের

হৃদয়ের এক তিল সে অধিকার করিতে পারে নাই। গুপ্ত সমিতির উচ্ছেদ এবং বহু ভাবে বিরোধিতা করিয়া, নরওয়েজিয়ান নারী ও বালক-বালিকাদের হত্যা করিয়াও হিটলার স্বাধীন-চিত্ত নরওয়েজিয়ানদের চিত্ত-জয়ে সমর্থ হয় নাই।

তার পর যুদ্ধে নামিয়া জাপান বেতার-যোগে নরওয়েজিয়ান নাবিকদের বহু প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছিল, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী বন্দরগুলিতে তোমাদের জাহাজ আনিয়া ভিড়াও—তোমরা যাহা চাহিবে, দিব। জার্ম্মানি ও জাপান—উভয় পক্ষই বহু ঘোষণায় নরওয়েকে বিচলিত করিবার বহু চেষ্টা করে—কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয় নাই। প্রাণ থাকিতে দেশের ও স্বাধীনতার শত্রু জার্ম্মানিকে এতটুকু সাহায্য করিবে না—ইহাই নরওয়ের অটল পণ। নিজেদের জাহাজে ভারে ভারে রশদ বহন করিয়া নরওয়েজিয়ানরা মার্কিন-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে—গোলা-বারুদ, খাদ্য, রশদ, পেট্রোল প্রভৃতির জোগান যে এ পথে নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘটিতেছে, সে শুধু নরওয়েজিয়ান নাবিকদের আন্তরিক সহযোগিতার গুণে। এই জাহাজের মাশুলই আজ নরওয়েজিয়ান গভর্ণমেন্টের একমাত্র রাজস্ব। এই রাজস্বে নরওয়ের শাসন-কার্য্য চলিতেছে—



গুপ্ত-সমিতি—এখান হইতে প্রায় তিনশো নাৎসী-বিরোধী প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়

তাহা দিয়া প্রাক্-যুদ্ধকালীন বিদেশী ঋণ পরিশোধ হইতেছে, নাবিকদের সর্ব্ববিধ ব্যয় জোগানো হইতেছে। গ্রেট-বৃটেনে নরওয়েজিয়ান বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে সব বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, সে সব বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভারও এই জাহাজী মাশুল হইতে বহন করা হইতেছে।

এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের তরফে নরওয়ের সহযোগিতার মূল্য অঙ্কে বা সংখ্যায় নিরূপণ করা যায় না। এ কাজে জাহাজ সমূলে ধ্বংস হইবার ও নাবিকগণের প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা সীমাহীন। জার্ম্মানি প্রথম যখন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নরওয়ে আক্রমণ করে, তখন তাহারা ত্রিশ লক্ষ টন ওজনের প্রায় তিনশো জাহাজ ডুবাইয়া দেয়—তাহার ফলে দু'হাজার নাবিকের মৃত্যু হয়। তার পর নরওয়ের রশদ-বাহী জাহাজ নষ্ট করিতে জার্ম্মানি বহু চেষ্টা করিয়াছিল। আমেরিকার পূর্ব্বাঞ্চলে জার্ম্মাণ ইউ-বোটের আঘাতে শতাধিক নরওয়েজিয়ান মাল-জাহাজ বিনষ্ট হয়। রশদ বহিয়া এই সব জাহাজ হইতে যে মাশুল আদায় হয়, তাহার উপরেই প্রধানতঃ নরওয়ের রাজস্ব নির্ভর করিতেছে। এ ক্ষতির কতক যাহাতে পূরণ হয়, সে জন্য গ্রেট বৃটেন নরওয়েকে বহু মাল-জাহাজ দিয়াছে,—ইজারা-ঋণ-রীতিতে আমেরিকাও নরওয়েকে বহু জাহাজ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

রশদাদি বহিয়া নরওয়েজিয়ান জাহাজ এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে যে ভাবে সাহায্য করিতেছে, তাহার তুলনা হয় না। তাছাড়া, ডানকার্ক এবং ক্রীট হইতে জনগণকে অপসারণ করায় তাহার কৃতিত্ব অসামান্য। কারণ, সে সময় মাইন ও সাবমেরিণে সমুদ্র-বক্ষ সমাকীর্ণ ছিল, সে সবের আঘাত বাঁচাইয়া নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলি যে ভাবে জন-সাধারণকে নিরাপদ কূলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সে কাজ আর কোনো দেশের জাহাজের পক্ষে সম্ভব হইত না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উত্তর-আফ্রিকা-অভিযানে নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলি আশ্চর্য্যরূপে প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলির অধিকাংশই আধুনিক রীতিতে গঠিত এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত। তাদের গতিবেগ অতিশয় ক্ষিপ্র। এগুলি চালাইতে বহু লোক বা বহু জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। নরওয়েজিয়ান নাবিকের দল আলস্য বা ভয় জানে না; কর্ত্তব্যে তাহাদের নিষ্ঠা অসাধারণ। এ নিষ্ঠার মূলে আছে তাহাদের স্বদেশপ্রেম। জার্ম্মানির প্রতাপ চূর্ণ করিতে হাজার হাজার নরওয়েজিয়ান ধন-প্রাণ বা আত্মীয় জনের মায়া-মমতা ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা চিন্তা করে না! ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মান বোমার অজস্র বর্ষণ তুচ্ছ করিয়া তাহারা যে সাহস ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে, কালের প্রভাবে তাহা মুছিবার নয়!

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির হস্তে নরওয়ের পরাজয় ঘটিলে জীর্ণ কয়েকখানি প্লেনে চড়িয়া ৯২০ জন অফিসার সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; তার পর বহু নর-নারী জেলে-ডিঙ্গিতে ও ছোট নৌকায় চড়িয়া চলিয়া আসে। কানাডাতেও বহু নরওয়েজিয়ান গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কানাডার টরন্টো প্রদেশে ছোট-নরওয়ে নাম দিয়া একটি পল্লীতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে; সেখানে আধুনিক রীতিতে রণ-কৌশল শিখিবার জন্য সুবৃহৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। বিমান-বাহিনীর অভাবেই যে নরওয়ের পরাজয়, এ কথা বুঝিয়া এই সব নরওয়েজিয়ান বিমান-যুদ্ধ-রীতি শিক্ষায় কায়-মন উৎসর্গ করিতেছে। আইসল্যাণ্ডেও বহু নরওয়েজিয়ান গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—তাহারাও সেখানে বিমান-যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিতেছে। এই সব শিক্ষা-সদনে নানা দেশ হইতে নরওয়েজিয়ান গিয়া সমর-রীতি শিখিতেছে। উদ্দেশ্য—পূর্ণোদ্যমে প্রতি-আক্রমণে জার্ম্মানদের বিধ্বস্ত ও নরওয়ে হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বদেশকে আবার স্বাধীনতা-ভূষণে বিভূষিত করিবে।

তরুণ নরওয়েজিয়ানদের সব চেয়ে ঝোঁক—পাইলট হইবার দিকে। কয়েক জন নরওয়েজিয়ান গ্রেট-বৃটেনের বিমান-বিভাগে আবেদন লিখিয়া জানাইয়াছে—"ইংলণ্ডে আমরা পাইলট-বিদ্যা শিখিতে চাই। যত শীঘ্র এ-বিদ্যা শিখাইতে পারেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষা শেষ হইলে আমাদের প্লেন দিবেন, সেই প্লেনে বোমা তুলিয়া নরওয়েতে গিয়া আমরা জার্ম্মান শত্রুদের নিপাত করিব।"

পনেরো বৎসর বয়সের এক নরওয়েজিয়ান বালক এই মর্ম্মে

আবেদন লিখিয়া পাঠাইয়াছে। সে লিখিয়াছে,—"আমার বয়স খুবই অল্প—কি-বা আমি জানি! তবু জার্মানদের যতখানি ঘৃণা করি, এমন ঘৃণা কোনো হিংস্র পশু বা সাপকেও করি না! বিনা দোষে আমাদের দেশকে কেন উহারা আক্রমণ করিল? আমাদের মা-বোনদের উপর এত অত্যাচার উহারা করিয়াছে, কোনো যুগে তাদের আমরা ক্ষমা করিব না। এক জন জার্মানকে মারিবার ফলে আমাকে যদি টুকরা-টুকরা করিয়া কেহ কাটিয়া ফেলে, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।"

নরওয়েজিয়ানদের চিত্তে জার্মান-বিদ্বেষ আজ এমনি রূপ গ্রহণ করিয়াছে! নরওয়েজিয়ান গ্রাজুয়েটের দল কেতাব-পত্র ফেলিয়া ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে এবং আইসলণ্ডে থাকিয়া কেহ হইতে চায় পাইলট, কেহ গানার, টেলিগ্রাফার, রেডিয়ো এঞ্জিনিয়ার, মেকানিক এবং শিল্পী।



নরওয়েজিয়ান বিমান-শিক্ষার্থী—আমেরিকা

নরওয়েজিয়ানদের শিক্ষা-সৌকর্য্যে চমৎকৃত হইয়া মার্কিন বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল উইলিয়াম লিহি বলিয়াছেন—নরওয়ে আজ নাৎসী-বিজেতার খর্পরে; তবু নরওয়ের বীর স্বাধীন সন্তানরা জার্মানির বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ চালাইতেছে! নরওয়ের নৌ-ফৌজ জার্মানির হাতে নষ্ট হইয়াছে, তবু নরওয়ে মৃত্যুবিজয়ী! এ কয় বৎসর দেশের বাহিরে যে নরওয়েজিয়ান বিমান-বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে, শক্তিতে ও সংখ্যায় সে ফৌজের চেয়ে এ বাহিনী অনেক বড়।

তিমি মাছের কারবারে নরওয়ের সমৃদ্ধি। জার্মানি যখন গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে আক্রমণ করে, তখন আনটার্টিকে তিমির মর্শুম শেষ হইয়াছে—তিমির জাহাজগুলি উত্তর-পূর্ব্ব পথে ফিরিতেছিল—সেই সব জাহাজের মধ্যে কতকগুলি ছিল ফ্যাক্টরি-জাহাজ। এ সব ফ্যাক্টরিতে তিমির তৈল তৈয়ারী হইত। জার্মান আক্রমণের সংবাদ পাইয়া এ সব জাহাজ নর্থ-শী বহিয়া ব্রিটেনের উপকূলে গিয়া দাঁড়ায় এবং তিমির বোঝা নামাইয়া জাহাজগুলিকে চকিতে তারা ট্যাঙ্কারে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। যে সব জাহাজ তিমি মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আকারে ছোট এবং তাদের গতি বেশ ক্ষিপ্র। এ সব জাহাজ নরওয়ের রাজকীয় নৌ-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে। এগুলিকে এখন খাদ্যাদি পাঠানোর এবং কূলপ্রদেশ পাহারা দিবার কাজে লাগানো হইয়াছে। কতকগুলি দিয়া মাইন ভাঙ্গার কাজও সুসম্পন্ন হইতেছে। নরওয়ের এই সব জাহাজ লইয়া আজ যে শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহাকে মিত্রপক্ষের বিরাট চতুর্থ শক্তি (the fourth largest of the United



ছোট-নরওয়ের হাসপাতালে নরওয়েজিয়ান নার্স ও রোগী

Nations) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, কারিবীয়ান সাগর, ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড—সর্ব্বত্র নরওয়েজিয়ান নৌ-বহরের কেন্দ্র আজ বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

নরওয়েজিয়ান বাহিনীকেও পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। সাধারণ বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল উইলহেলম হান্সটিনের শৌর্য্য ও রণনীতির প্রসিদ্ধি য়ুরোপে আমেরিকায় বড় অল্প নয়। যে সব নরওয়েজিয়ান রমণী ইংলণ্ডে ও কানাডায় আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁরা বিশ্রাম-সুখ জানেন না! তাঁরা যুদ্ধের নানা বিভাগে কাজ লইয়াছেন। নার্স, পাচিকা, ফ্যাক্টরির শ্রমিকরূপে রণ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতেছেন। যে সব নরওয়েজিয়ান দেশে আছেন—তাঁরা জার্মানির ইঙ্গিত মানিয়া চলিতেছেন না; বিরোধিতা করিয়া প্রাণ দিতেছেন, তবু বশ্যতা-স্বীকারে নারাজ! জার্মানরা নরওয়েজিয়ানদের নিরস্ত্র করিলেও গোপনে অস্ত্র-নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া তাহারা সাধ্যমত জার্মানদের সঙ্গে বিরোধিতা করিতেছে। ভাইকম্ কুইশলিংয়ের অধিনায়কতায় নরওয়ে প্রদেশে নূতন গভর্ণমেণ্ট-স্থাপনায় জন

হিটলার বহু চেষ্টা করিয়াছিল ; সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বিশ্বাস-ঘাতক কুইশলিংয়ের উপর নরওয়েজিয়ানদের ঘৃণা সীমাহীন! নাৎসী-শাসনে নরওয়ের সাবেকী প্রথার উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয় নাই—সাধারণের ভোটে জার্ম্মানির বহু দাবী পরিত্যক্ত হইতেছে। হিটলারের অবস্থা হইয়াছে সেই সাপের ছুঁচো গেলার মত! তিন লক্ষ তরুণ নরওয়েজিয়ান আজও জাতীয় ভাবে শাসন-যন্ত্র ধরিয়া আছে ; সে যন্ত্রের সম্মুখে বিজয়ী নাৎসী নিরুপায় গাম্ভীর্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্ব বিভাগের অধ্যক্ষতার পদে নাৎসীকে খাড়া করিলেও নরওয়েজিয়ানদের আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার ফলে নরওয়ের মাটীতে জার্ম্মান নীতির প্রবর্ত্তন প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রলোভনের অন্ত নাই! সদস্যরা ঘৃণাভবে জবাব দেয়, মানিলে প্রত্যবায় ঘটিবে। উপাসনা-মন্দিরে নাৎসী-বিধির বিন্দু-বাষ্প না প্রবেশ করে, সে-সম্বন্ধে ধর্ম্মাচার্য্যগণ বিশেষ মনোযোগী। দেশবাসীর তরফ হইতে সহযোগিতা না পাইয়া জার্ম্মানরা সবলে বিজয়ীর রীতি প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগী হয়—ফলে বিদ্রোহ ঘটে। চাকরি হইতে তাড়াইয়া, জেলে পাঠাইয়া এবং বহু ভাবে নিপীড়িত করিয়াও বিদ্রোহী নরওয়েজিয়ানদিগকে জার্ম্মানি এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। বিদ্যালয়ে নাৎসী-নীতিতে শিক্ষা চালাইবার ব্যবস্থা হয়—তার ফলে শিক্ষকের দল একযোগে চাকরি ছাড়িয়াছেন। বিদ্যালয় বন্ধ। শাসন-নীতি প্রায় অচল হইয়া আছে। সদস্য-সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া, ধর-পাকড়, প্রাণদণ্ড, জমি-ঘর কাড়িয়া লওয়া—এমনি শাসক-সুলভ নিপীড়নের অস্তহীন প্রবাহে দুঃখ-দুর্দ্দশা সীমাহীন



তুষারময় আইসল্যাণ্ডে নরওয়েজিয়ান বিমান-বাহিনী

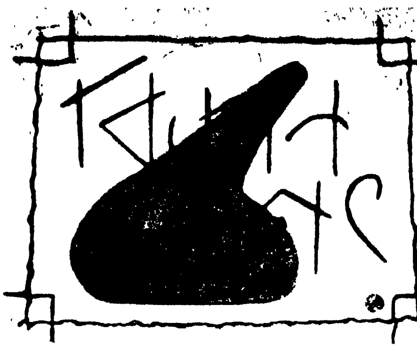
হইয়া ওঠে, তবু নরওয়ে নাৎসীর মন্ত্রগ্রহণে সম্মত হয় নাই। নরওয়ে জার্ম্মাণ-অধিকার-ভুক্ত হইলেও নরওয়েজিয়ানরা আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানির বশ্যতা স্বীকার করে নাই ; ঘরে-বাহিরে থাকিয়া সমানে জার্ম্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

নরওয়ের এই অদম্য সংগ্রাম দেখিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন—জন-সাধারণের মন বলিতে কি বুঝায়, তাহা যদি কেহ জানিতে চান তো তিনি চাহিয়া দেখুন নরওয়ের দিকে। এই মন জাগিলে কোনো শাসকের সাধ্য নাই, জনগণকে স্বাধীনতা-ধনে বঞ্চিত করিবে! মানুষ হারিয়াও কি করিয়া হারে না—বিজিত হইয়াও জাতি কি করিয়া অপরাজেয় থাকে, নরওয়ের পানে চাহিয়া দেখিলে অনায়াসে তাহা বুঝা যাইবে।

নাৎসীদের সঙ্গে নরওয়ে কোনও ক্ষেত্রে মিশিতে পারে না, মিলিতে পারিবে না। নাৎসীর আহ্বানে নরওয়ে এক তিল টলে নাই।

নরওয়ের প্রধান বিচারালয়ে বিচারকার্য্য পরিচালনার জন্য জন-সাধারণের ভোটে বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে চিরকাল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নাৎসী বিধি-ব্যবস্থায় নরওয়ে সায় দিতে অস্বীকার করার ফলে এই বিচারালয় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিটলার-নির্ব্বাচিত মন্ত্রী কুইশলিংয়ের বিধি মানিয়া বিচার করিতে পারিবেন না বলিয়া বিচারকগণ একযোগে ইস্তফা দিয়াছেন ; বিচারাসনে বসিয়া অবিচার তাঁহারা করিতে পারিবেন না বলিয়া স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন।

নরওয়ের ধর্ম্মযাজকগণ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, জার্ম্মানিকে মানিয়া চলার অর্থ ধর্ম্মনীতিতে পদাঘাত ; নাৎসীবিধি



শক্তি

পি, এস্

প্রাচীন কালে শক্তি (power) বলিতে লোকে মানবদেহের অর্থাৎ মাংশপেশীর শক্তিই বুঝিত। সব কিছু করিতে নিজের বা আর কারও পেশীর শক্তিই মানুষ কাজে লাগাইত। পরে ক্রমশঃ এক এক করিয়া গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুকে কাজে লাগানো আরম্ভ হয়। তার পর বহমান জল ও বায়ুর শক্তি কাজে লাগানো হইতে থাকে। আজ কাল প্রগতিশীল দেশ-সমূহে অধিকাংশ কাজ কয়লা, তৈল বা বিদ্যুতের শক্তিতে করা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আজ গড়ে মাথা-পিছু ৬টি অশ্বশক্তি লোকের সুখ-সুবিধা দিবার কাজে নিযুক্ত। শক্তি উৎপাদনের কলকব্জা আজ সুসভ্য দেশগুলির সব চেয়ে সেরা ধনদৌলত বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ঠিক করিয়া বলিতে গেলে "শক্তির উৎপাদন" আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা এক প্রকার কার্য্যক্ষমতা (enrgy) অন্য প্রকারে রূপান্তরিত করিতে পারি মাত্র। প্রকৃতিই শক্তির একমাত্র ভাণ্ডার; এই ভাণ্ডারের জিনিষপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করাই মানুষের সম্ভব; মানুষ ইহার কণামাত্রও বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। কেবল এক রকমকে রকম-ফের করিয়া আপনার কাজে লাগায়। তবে এই কাজে-লাগানো ব্যাপারটি আদৌ নগণ্য নহে। ইহাই চিরকাল মানুষের জীবনধারা ওলট পালট করিয়া দিয়া আসিতেছে। ইহার ফলেই সুসভ্য দেশের লোকেরা অসম্ভব রকম সস্তায় আপনাদের সমস্ত কাজ চালাইয়া লইতে পারিতেছে। মূলধনের হিসাব না ধরিলে ষ্টিম-টার্বিনের সাহায্যে বোঝা সরানো কাজের খরচ, কুলি লাগাইয়া ঐ কাজ করিবার ১ ভাগের ২৫০০তম অংশ মাত্র। মূলধন প্রভৃতির হিসাব ধরিলেও ১ ভাগের ৮০০তম অংশ। শক্তির সাহায্যে কাজ শুধু সস্তায় নয় —অল্প সময়েও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে, আজ-কাল সভ্য জগতের সর্ব্বসাধারণ যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পায়, তাহা পূর্ব্বকালে বহু ক্রীতদাসের প্রভুদিগের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাসস্থানের ময়লা সাফ করা হইতে বৎসরে অনেক বার নূতন কাপড়চোপড় কেনা পর্য্যন্ত সমস্ত সুখ-সুবিধা আজ-কাল স্বল্প ব্যয়ে শক্তি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

মানুষ এখন প্রধানতঃ জল, কয়লা, ও তৈল হইতে শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির নূতন নূতন উৎস আবিষ্কৃত হইতেছে। যত কম খরচে ও যত সহজে শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে মানবের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নাই। একটা ডিসেল ইঞ্জিনেও ৬০% শক্তির অপচয় হইয়া থাকে, ষ্টিম-ইঞ্জিনের অপচয় আরও অনেক বেশী। আলোক উৎপাদন করিতে গিয়াও আমরা উত্তাপ উৎপাদন করিয়া অনেকটা তাপ নষ্ট করিয়া ফেলি। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক গ্যাসের ও তৈলের আলোতে কার্য্যক্ষমতা তাপ উৎপাদনে ব্যয়িত হইয়া অপচিত হয় এবং মাত্র ২% আলোকে পরিণত হয়। মোটর গাড়ীতে জ্বালানী তৈল বা গ্যাসের কার্য্যক্ষমতার মাত্র ১% গাড়ী চালানোর কাজে লাগে এবং বহুমূল্য জ্বালানী তৈলাদি হইতে উৎপন্ন তাপ দূর করিবার জন্য আমাদের রেডিয়েটার এবং গ্যাস বাহির করিবার বন্দোবস্তে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হয়। মোটরের উপর শক্তি উৎপাদনে অশ্বশক্তি-পিছু খরচা কমাইবার জন্য ক্রমাগত অশ্রান্ত গবেষণা চলিতেছে। তবে খরচ ছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। যেমন বিমানগুলিতে অশ্বশক্তির পিছু ওজন কমাইতে হয় ও অগ্নিভয় নিবারণের জন্য ভারী তেল (heavy oil) ব্যবহার সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত। আবার যেখানে কয়লা সহজলভ্য সে স্থানে অন্তর্দ্দাহ ইঞ্জিন অপেক্ষা বহির্দ্দাহ ইঞ্জিন সুবিধাজনক। রণতরী সমূহে বহির্দ্দাহ ইঞ্জিনেও কয়লা অপেক্ষা তৈল ব্যবহার পরিচ্ছন্নতা, বোঝাই করিবার সুবিধা, ও ওজনের জন্য বাঞ্ছনীয়। বহির্দ্দাহ ইঞ্জিনে জলের পরিবর্ত্তে অন্য তরল পদার্থের ব্যবহার চেষ্টারও ইহাই কারণ। এই ক্ষেত্রে পারদের ব্যবহার অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, কারণ ইহার বাষ্পের আপেক্ষিক তাপ ষ্টিমের আপেক্ষিক তাপ অপেক্ষা অনেক অধিক। অতি তপ্ত ষ্টিম ব্যবহার করিলে ষ্টিম-ইঞ্জিনের কাজ করিবার ক্ষমতার অপচয় অনেক কমিয়া গেলেও ইহা অত্যুত্তাপ-জনিত দ্রুত ক্ষয় এবং আবশ্যকীয় কলকব্জার আধিক্য হেতু ব্যবহৃত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার অন্তর্দ্দাহ ইঞ্জিন বড় বেশী শব্দ করে এবং এগুলি সহজে ঘুরানো-ফিরানো যায় না।

বিদ্যুৎ-শক্তি নিজে সাধারণতঃ শক্তির উৎস নহে। কেবল বায়ুমণ্ডল হইতে ধরিয়া লইলে বা থার্ম্মোকপল অর্থাৎ "তাপ-যুগ্ম" সাহায্যে প্রস্তুত হইলে ইহাকে শক্তির উৎসস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ইহা অধিকাংশ স্থলে কার্য্যক্ষমতার সহজ পরিচালন এবং মজুত রাখার উপায় মাত্র। শক্তি-পরিচালন ব্যাপারে বিদ্যুতের আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্যুৎ ছাড়া বেল্টিং ও পাইপের মধ্যস্থ জলের সাহায্যে কার্য্যক্ষমতা কতকটা দূরে চালাইয়া লওয়া যায় বটে, কিন্তু এই দুই উপায়ে অধিক দূরে লইয়া যাইতে হইলে খরচ ও অপচয় অত্যধিক হয়। ষ্টিমও দূরে লইয়া যাইতে বহু অপচয় হয় ও ইহা বহু ব্যয়সাধ্যও বটে। যেখানে অতি অল্প ব্যয়ে ষ্টিম পাওয়া যায়, সেখানে তাপরোধক পাইপে করিয়া খানিক দূর পর্য্যন্ত চালানো যাইতে পারে বটে, কিন্তু যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও ইহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না বলিয়া ষ্টিম-ইঞ্জিন সাধারণতঃ বয়লারের নিকটেই বসানো হইয়া থাকে। চাপ দিয়া ঘন-করা বাতাসের সাহায্যেও শক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালাইয়া লওয়া যায়। কোন কোন কাজে ইহাতে খুব সুবিধা হয়। কারণ, চাপে ঘন বাতাস চালাইয়া লইয়া যাইবার পাইপ বিদ্যুৎ-পরিচালনের তারের মত নমনীয় করিয়া তৈয়ারী হইতে পারে ও বায়ু-চাপ কল চালাইবার শক্তিতে পরিণত করা খুব সোজা; কিন্তু ২।৪ মাইলের বেশী দূরে চালান বিদ্যুতের সাহায্যেই হইয়া থাকে। উচ্চ ভোল্টের (২৫।৩০ হাজার) প্রবাহ ব্যবহারে, চালানোর সময়ের অপচয় অনেক কমানো যায় বলিয়া উচ্চ ভোল্টের প্রবাহ দূরে লইয়া যাইয়া 'ট্রান্সফরমার' অর্থাৎ পরিবর্ত্তকের সাহায্যে উহাকে সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য ২২—৫০ ভোল্টে বদলাইয়া লওয়া হয়। খনিমুখে কয়লার কর্ম্মশক্তি বিদ্যুতে পরিণত করিয়া লওয়া শতাধিক মাইল দূর পর্য্যন্ত

কয়লা বহিয়া লইয়া গিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহা অনেক বেশী সস্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জলের শক্তি দূরে লইয়া যাইতে হইলে বিদ্যুতের সাহায্য বিনা গতি নাই। তারের সাহায্যে দূরে লইয়া যাওয়ার সুবিধা ছাড়া বিদ্যুৎশক্তির আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার নিয়ন্ত্রণ (Control) অতি সহজ; কেবল সুইচ মারিয়া ইহা জ্বালানো বা বন্ধ করা যায় এবং resitance অর্থাৎ বাধা বাড়াইলে কমাইলেই হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। মাত্র ২টি হাত-লেভার (hand-lever) যে কোন বৈদ্যুতিক মোটর চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রয়োজনমত ২টি মিলাইয়া একটিও করা যায়। আবার একাধিক ছোট ছোট মোটর ব্যবহার অনাবশ্যক হইলে ইচ্ছামত যে কোনটি বন্ধ করিয়া খরচ বাঁচানো যায়। বেল্টিং সাহায্যে শক্তি-পরিচালনার কল হইতে বেল্টিং সরাইয়া কল বন্ধ করিলে যে পরিমাণ শক্তি বাঁচে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। বিদ্যুতের একমাত্র অসুবিধা এই যে, ইহা জমা করিয়া রাখার সস্তা এবং কার্য্যকর (efficient) কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ কথাটি সর্ববিধ শক্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ্যাকুমুলেটর বা 'সঞ্চয়িতাই' এখন বিদ্যুৎ-শক্তি জমা করিয়া রাখার একমাত্র যন্ত্র; কিন্তু প্রবাহের পরিমাণ হিসাবে ইহাতে বড় বেশী খরচ ও জায়গা লাগে। এই জন্য বর্ত্তমানে মেইন (main) হইতে সংস্পর্শ দ্বারা প্রবাহ না লইয়া গাড়ী চালানো অসম্ভব। রেলের তৃতীয় লাইন ও ট্রামের মাথার উপরের তার (over head wire) হইতে আজকাল বিদ্যুৎ লওয়া হয় বলিয়া বাঁধা-ধরা পথে ছাড়া বৈদ্যুতিক গাড়ী চালাইবার কোন উপায় নাই। পথের ধারের মেইন হইতে বিনা স্পর্শে বিদ্যুৎ লইয়া গাড়ী চালাইবার চেষ্টা সফল হইলে এই দুঃখ দূর হইতে পারে। বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিবার হাল্কা ব্যাটারী আবিষ্কৃত হইলেও এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এখনও বৈদ্যুতিক কন্ট্রোলে এত সুবিধা যে, ডিসেল ইলেক্ট্রিক রেল-ইঞ্জিনে কোন কোন স্থানে অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের শক্তি বিদ্যুতে পরিণত করিয়া কাজে লাগানো হয়। 'সঞ্চয়িতার' আর এক অসুবিধা এই যে, ইহার সংরক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং অবিরাম পরিদর্শন আবশ্যক। আনাড়ীর মত অসাবধানে ব্যবহার করিলে ইহা নষ্ট বা বিগড়াইয়া যায়।

আদর্শের দিক্ দিয়া দেখিলে বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখার উপায় কতকটা বাজে বলিয়া বোধ হইলেও এখনকার শক্তি ধরিয়া রাখিবার অন্য কোন উপায় অপেক্ষা ইহা কাজের বলিয়াই বোধ হয়। তাপ-রূপে শক্তি গরম জলের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায় কিন্তু উপায়টি বড়ই বেয়াড়া; কারণ, ইহাতে যেটুকু শক্তি ধরিয়া রাখা যায় তাহার অনুপাতে জলের পরিমাণ ও ওজন অনেক বেশী আবশ্যক হয়। তাপ বিকিরণের যত দূর সম্ভব প্রতিরোধ ব্যবহার করিয়াও ইহাতে শক্তির—তাপের যে অপচয় হয়, তাহার পরিমাণ ইলেকট্রিক্ ব্যাটারীর অপচিত শক্তি অপেক্ষা অনেক কম। অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিবার ষ্টোরেজ ব্যাটারী মোটের উপর বেশ সুবিধাজনক। মোটর গাড়ীতে ষ্টার্ট ও আলো দিবার জন্য গতিবেগোৎপাদিত কার্য্যক্ষমতা জমা করিয়া রাখিতে ইহা অতুলনীয়। এই ব্যাটারী না থাকিলে আমরা গাড়ী চালাইবার সময় ছাড়া আলো পাইতাম না ও গতির হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আলোর হ্রাসবৃদ্ধির জন্য অনেক জটিল ব্যবস্থা আবশ্যক হইত এবং স্বয়ংক্রিয় ষ্টার্টারের (self starters) অস্তিত্ব থাকিত না। ছোটো খাটো আলো দিবার ব্যবস্থা সঞ্চয়িতার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আবশ্যক হইলে সোজাসুজি ডাইনামো বা তড়িৎ উৎপাদক হইতে লওয়াই ভাল; তবে ইহাতে আবশ্যকমত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। যন্ত্র সাহায্যে অল্প দূরে শক্তি-পরিচালন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এই কাজে আজকাল হাজার হাজার যন্ত্র প্রত্যহ ব্যবহৃত হইতেছে। যেরূপেই এই শক্তি উৎপাদিত হউক না কেন, তাপ বা আলোর জন্য আবশ্যক না হইলে ইহা যন্ত্রের গতিতে পরিণত করিয়া কাজের স্থানে চালান করা হয়। বেল্ট, দড়ি, শিকল, তার প্রভৃতি এই চালানের কার্য্য করে। চাকার আয়তনের সাহায্যে কলের কাজের বেগ বাড়ানো বা কমানো হয়। কল চালাইবার শক্তি হয়তো অল্প গতিবেগে অল্প খরচে অধিক উৎপাদন করা যায়, কিন্তু যেখানে কল অধিক বেগে চালানো প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে মোটরে বড় চাকা দিয়া কলে ছোট চাকা লাগানো হয়। বৈদ্যুতিক মোটর সাধারণতঃ খুব জোরে চলে। এই জোর কমাইবার জন্য কখন কখন Belt reducing gear ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ দাঁতি-চাকার সাহায্যে এই কার্য্য চলে। উপযুক্ত গীয়ারের সাহায্যে গতির দিক উল্টাইয়া দেওয়া যায়, চতুষ্কোণাকৃতি গীয়ার চাকা এক ভাবে স্থায়ী কৌণিক গতিকে নানাবিধ গতিতে পরিণত করিতে পারে। ডিম্বাকৃতি গীয়ারগুলি আরও অন্য প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করে। জোল অর্থাৎ গুটানো পদ্দার মত গীয়ার এক ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান বা হ্রাসমান গতিবেগ উৎপাদন করে। আভ্যন্তরীণ গীয়ার একই দিকে এবং পোকা-গীয়ার বা পোকা-চাকা (worm gear or worm wheel) 'লম্বের' দিকে বা সমকোণ দিকে শক্তি চালনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ গীয়ার তৈয়ার হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নূতন প্লেট গীয়ারের কথা বলা যায়। ইহাতে একসঙ্গে ঘোরানো ও চটকাইয়া মাথার কাজ করা হয়। এগুলি কাপড় কাচার বা দ্রব্যাদি মিশাইবার কার্য্যে ব্যবহার হয়। কলে যে কোন রকম গতির সৃষ্টি আর মিস্ত্রিদের অসাধ্য নহে। গীয়ারের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ফলত এই গীয়ার তৈয়ারী এখন একটা বিশেষ শিল্পে দাঁড়াইয়াছে। গতি পরিবর্ত্তনের বর্ত্তমান উপায়গুলি নানারূপ অটোমেটিক কলে বিশেষতঃ ঘণ্টায় হাজার হাজার সিগারেট তৈয়ারীর কল ও মোটর গাড়ীতে দেখা যায়। মোটর পিষ্টনের যাওয়া আসা গতি দ্বারা গীয়ার সাহায্যে চাকা ঘুরে, ভাল্ব খুলে ও বন্ধ হয়, ডাইনামো চলে এবং অসংখ্য অন্য কাজ করে। ফলতঃ গীয়ার সাহায্যে গতি পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান ওস্তাদ মিস্ত্রীগিরির চাবিকাটী। আজকালের ওস্তাদ মিস্ত্রীরা কেবল একটি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারেন নাই—তাহা অনন্ত পরিবর্ত্তনক্ষম গীয়ার। হাইড্রলিক, ক্লাচ পরিবর্ত্তনক্ষম গীয়ার নহে, ইহা এক প্রকার 'ফস্কা কল' মাত্র। ইহাতে ঘর্ষণজনিত পরিবর্ত্তন শক্তির অত্যধিক অপচয় হয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, একোন কলই ভগবানের কল মানবদেহের সহিত তুলনীয় নহে। কারণ, কলমাত্রেই চালাইতে মানুষের সাহায্য লাগে এবং কোন কলই মানবদেহের মত সূক্ষ্ম

নিয়ন্ত্রণক্ষম নহে। ইহাতে প্রায় অনুভব করিতে পারা যায় না, এরূপ অল্প স্পর্শ হইতে এক স্থানেই বহু পাউণ্ড ওজনের সমান শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার ইচ্ছামত শক্তির দিক্ পরিবর্ত্তন-ক্ষমতাও অতুলনীয়। [ক্রমশঃ।

—

হাউইটসার

মার্কিণ সমর-বিভাগ সম্প্রতি নূতন মডেলের হাউইটসার তৈয়ারী করিয়াছে; তাহার চেয়ে ভারী এবং অমোঘ "শেল" আর নাই! এ



এই বাক্সে হাউইসারের টিউব ভরা হয়

হাউইটসার পারাট্রূপারদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হয়! তিন মণ সাড়ে তিন মণ ওজনের কয়টি করিয়া বাণ্ডিলে এ হাউইটসারের বিভিন্ন অংশ ভরিয়া বাণ্ডিলগুলিকে বিশেষ বাক্সে পূরিয়া প্লেনে তুলিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহিয়া নামানো হয়; তার পর চকিতে বাক্স খুলিয়া হাউইটসারকে



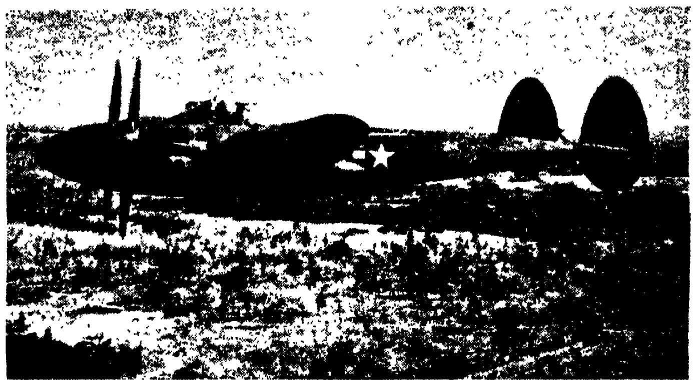
সিসিলি ও নর্ম্মাণ্ডিতে এ কামান অসাধ্য সাধন করিয়াছে

লক্ষ্যভেদে সমর্থ করিয়া তোলা যায়! এ-অস্ত্রে মিত্র-বাহিনী সিসিলি ও নর্ম্মাণ্ডিতে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

—

নিম্নপথগামী প্লেন

আমেরিকার আর-এক অভিনব কীর্ত্তি পী-৩৮ মডেলের প্লেন। এ প্লেন গাছপালার ব্যূহ কাটিয়া শূন্যপথের পাড়ি সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। গাছপালার মাথায় পক্ষচ্ছেদ বা বিকলতার এতটুকু আশঙ্কা নাই! মাথার খড়্গ-অস্ত্রে গাছের বড় বড় ডালপালা কাটিয়া অবাধ-গতিতে শত্রুর কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক-দুর্গাদি অগ্নিদগ্ধ করিতে এ বিমানের জোড়া নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রয়োজন বুঝিলে চোখের পলক-পাতে এ প্লেন ক্ষিপ্রবেগে বহু



এ প্লেন খুব নীচু পথে যায়

ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে এবং তির্য্যক্ ভাবে বোমা-নিক্ষেপেও এ-প্লেনের শক্তি অব্যর্থ।

—

জাপজয়ী কামান

কিছু কাল পূর্ব্বে ক'খানি মার্কিণ রণ-তরী জাপান-অভিযানে বাহির হইলে ৩২খানি জাপানী টর্পেডো-বমার তাহাদের



বিজয়ী বোফর

বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। জাপানের এ তৎপরতার শোধ লইবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ সমর-নায়করা বহু সাধনায় তৈয়ারী করিয়াছে ৪০

এম্-এম্ মডেলের বোফর কামান। এই কামানের প্রথম পরিকল্পনা হয় সুইডেনে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। তার পর য়ুরোপের নানা প্রদেশ এই বোফরের উৎকর্ষ-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সম্প্রতি বৃটিশ সমর-বিভাগের পরামর্শে মার্কিণ সমর-বিভাগ বোফরের উৎকর্ষ-সাধনে মনোনিবেশ করে; তাহার ফলে বোফর আজ দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তিতে জাগ্রত হইয়াছে। আজ এ কামান বৈদ্যুতিক শক্তিতে কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইলেও মানুষের হাতে চলিতেও কুণ্ঠিত নয়। বোফরের কার্য্যকারিতা মার্কিণের হাতে আজ ত্রিশ গুণ বাড়িয়াছে; তাহার উপর এ বোফরের নির্ম্মাণে সময়, উপকরণ এবং ব্যয় কমিয়াছে। তার কারণ, ব্যারেল, কাঁটার প্রভৃতি অংশগুলি মানুষের হাতের পরিবর্ত্তে এখন ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ারী হইতেছে। তাই পূর্ব্বে ছয় ঘণ্টায় যে কাজ হইত, এখন সে কাজ নিষ্পন্ন হইতেছে ৪৫ মিনিটে। পূর্ব্বে এক একটি বোফর-নির্ম্মাণে সময় লাগিত ৪৫০ ঘণ্টা; এখন সময় লাগিতেছে ১৪ ঘণ্টারও কম!

এক-এ ছয়

পল্টনের মাথার ঐ ধাতব হেলমেট বা টুপি—ও-টুপিতে ফৌজ আজ শুধু শির রক্ষা করিতেছে না, পিপাসায় ঐ টুপিতে জল ভরিয়া সেই জল-পানে পিপাসা মিটাইতেছে; ফুট-বাথ লইতেছে! এ-টুপিতে রন্ধন-কার্য্য ও দাড়ি কামানো চলে। নৌকায় জল উঠিলে এ টুপিতে সে-জল ছেঁচিয়া নৌকাকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে; তার উপর ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া ট্রেঞ্চের মাটী তুলিয়া ফেলা—সে-কাজেও এ হেলমেট্ আজ হেল্প-মেট্ হইয়াছে।



এক টুপিতে কত কাজ হয়

৭৫ এম্-এম্, না, দামোদর!



হাসপাতালের সরঞ্জাম

৭৫ এম্-এম্ মডেলের যে গ্লাইডার-প্লেন নির্ম্মিত হইয়াছে, সে যেন দামোদর! তার পেটের মধ্যে দেড়-টনী ওজনের ট্রাক পূরিয়া তাহা যেমন বহন করা চলে, তেমনি বহা চলে আর্ত্ত-আহতদের উপযোগী ২৫টি শয্যাযুক্ত হাসপাতাল-গাড়ী। হাসপাতাল-গাড়ীর মধ্যে ঔষধাদির সকল সরঞ্জাম মজুত থাকে। আর থাকে তাঁবু, এবং দু'-জন অস্ত্রচিকিৎসক, এক জন এনেসথেসিষ্ট ও ৩৩ জন টেকনিশিয়ান্। গ্লাইডার হইতে হাসপাতাল-গাড়ী নামাইয়া বিশ মিনিটের মধ্যে আহতকে রক্ত-দান করা এবং তার সেবা-শুশ্রূষার কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে চলে।

বেহুলার ক্রন্দন

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

সর্পদষ্ট একটি বালকের মৃতদেহ এক দিন ভেলার উপরে দেখেছিলাম; ভেলাখানি চলেছিল স্রোতের টানে নিরুদ্দেশের যাত্রায়। মনে হচ্ছিল ছেলেটি অঘোরে ঘুমাচ্ছে; সুন্দর তার মুখখানি। আজিও তার অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে উঠে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমারও বয়স ওই রকমই হবে। কাজেই প্রাণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক হাহাকার উঠলেও, কৌতূহলের মাত্রা সে হাহাকারকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

নদীর তীরে আমাদের বাড়ী। বহু বিচিত্রের মেলা এই নদী। ছোটবেলা থেকেই বহু বিচিত্র লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি এই নদীর ঘাটে। কত দেশ-বিদেশের ব্যাপারী আসত পণ্য নিতে। কত ধরণের নৌকা, কত ধরণের লোক, কত ধরণের ভাষা, আর কত ধরণের তাদের বলবার ভঙ্গী। নদীর প্রতি ছিল আমাদের একটা প্রবল টান; সকাল-সন্ধ্যা নদীর ঘাটে যাওয়া চাই-ই। যাক্ সে সব কথা;—এক দিন সকালবেলা কে যেন এসে বললে, নদীর ঘাটে একটি ভেলা

আটকে আছে : তাতে একটি সর্পদষ্টের মৃতদেহ। শুনেই নদীর ঘাটে ছুটলাম। নদীর ঘাট লোকে লোকারণ্য। আমাদের অঞ্চলে কলাগাছ পাশাপাশি সাজিয়ে 'ভেলা' তৈরী করে। এ ভেলাখানিও কলাগাছ দিয়ে তৈরী। কিন্তু খুব মজবুত ও পরিপাটী তার কাজ। উপরে একখানা চাটাইয়ের তৈরী ছইও রয়েছে।

ভেলার উপরে ধবধবে বিছানা; তার উপর শায়িত একটি কিশোর। তার পা থেকে বুক পর্য্যন্ত একখানি চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখখানি খোলা রয়েছে। ভেলার একপাশে একটি মোরগ বাঁধা। মোরগের পাশে তার খাবার জন্য চাল ও ধান একটি ঝুড়িতে ছিল। এ রকম করে কেন যে একটি বালককে ভাসিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে পারলাম না। সেখানেই জনতার জল্পনা-কল্পনা ও আলাপ-আলোচনার মাঝখানে থেকে জানতে পারলাম—সাপের কামড়ে যদি কারো মৃত্যু হয়, তবে তাকে এমনি ভাবেই ভাসিয়ে দিতে হয়। মৃতদেহ বুকে করে ভেলা চলে; মোরগই তাকে পথ দেখায়। সাপের বিষ নষ্ট করবার বা সর্পদষ্টকে আরোগ্য করবার ক্ষমতা যাদের আছে ভেলা চলেছে তাদেরই সন্ধানে। এ রকমের লোককে আমাদের অঞ্চলে "ওঝা" বা "রোজা" বলে; কেউ কেউ আবার বলে "গুণী"।

এই গুণী বা রোজাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করবার জন্য এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে; নিজের সাধ্যমত শেষ চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত ইহারা জলস্পর্শও করে না। এমন কি, কাউকে সাপে কামড়েছে শুনলে খেতে বসলেও ভাত ফেলে রেখে ছুটে যেতে হয়। যে গাঁয়ের লোককে সাপে কামড়ায়, প্রথমে তার আশেপাশের রোজারা আরোগ্য করতে চেষ্টা করে। আরোগ্য হয় ভালই, নচেৎ সাত-আট দিন পর্য্যন্ত—রেখে দিয়ে দূর-দূরান্তরের "গুণী"দের ডাকা হয়। তাতেও বিফল হলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। লোকে বিশ্বাস করে,—নদীপথে যেতে যেতে যে জায়গায় প্রকৃত "গুণী" আছে, মোরগ তা জানতে পারবে আর তখনি উচ্চরবে ডেকে উঠবে। তার সে আহ্বানে "গুণী" ছুটে এসে মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করবে। এমন কি, মৃতদেহটি পচে গলে গেলেও ক্ষতি নাই। এমন "গুণী"ও আছে যে, ক'খানা হাড় পেলেই তা থেকে জীবন্ত আসল মানুষ না কি দাঁড় করিয়ে দিবে। লোকে তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। যাক্, সে ভেলাখানি লোকে যত্ন করে আবার স্রোতে ভাসিয়ে দিলে।

মৃত কিশোর বালকটি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল কি না তা জানবার প্রবল কৌতূহল বহু দিন পর্য্যন্ত মনে পোষণ করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা কৌতূহলই রয়ে গেছে। মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ ঝাড়া, সাপকে ডেকে আনার নানা গল্প শুনেছি। সেই দিন থেকে কয়েক দিন কোথায় কাকে সাপে কামড়েছিল, কে বারো বছর পরে ফিরে এসেছে—এরূপ গল্প খুব শুনেছি। বিশ্বাস যে করি নাই; তা নয়। কিন্তু আজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক দূর এগিয়েছি; বিজ্ঞানের কশাঘাতে সে বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে। গুণীদের 'গুণ'কে এখন বুজরুকি বলে ভাবতে শিখেছি; তথাকথিত 'বিশ্বাস' এখন অন্ধ সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে।

সর্পদষ্ট বালকটির কথা ভুলি নাই। পাহাড়-ঘেরা সর্পসঙ্কুল বন-বনানী-ভরা অঞ্চলে আমার পল্লীভূমি।' সেখানে প্রতি বর্ষে শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষহরি মনসার জয়ধ্বনি ওঠে। হিংস্র সর্পের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এমন অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় আজ মনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু আজ এ-ও বুঝতে পারছি, অজানা ভয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় আবিষ্কার করতে গিয়েই মানুষ ধর্ম্মের সন্ধান পেয়েছে। এই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই মানুষের মন্ত্র-তন্ত্র-কাব্য-পুরাণ গড়ে উঠেছে। আশৈশব মনসার ভাসানে মনসার জয়গান শুনেছি।

ভেলায় ভেসে যেতে দেখেছি একটি বালককে, আর মনসার ভাসানে বেহুলার ক্রন্দন শুনেছি। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা দেব-পুরে গিয়েছিল; মাত্র কয়েকখানি হাড় থেকেই লখিন্দর পুনর্জীবন লাভ করেছিল। তাই হাড় থেকে জীবনদানের গল্পে অবিশ্বাসের কোন হেতুই ছিল না। তবে মনে হ'ত, সকলের সঙ্গে ত 'বেহুলা' নাই। আছে একটি মোরগ। বৃদ্ধেরা বলতেন, এই মোরগের সঙ্গে রয়েছে বেহুলার আত্মা। তখন আর আমাদের অবিশ্বাসের কোন কারণই থাকত না। কোন্ যুগের সে বেহুলা, তাঁর পক্ষে এখানে আবির্ভাব হওয়া সম্ভব কি না, তা ভেবেও দেখি নাই। কিন্তু নিরুপায় মানুষের জন্য বেহুলার এই দরদের জন্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠতাম।

মনসা-পূজার আসরে প্রধান গায়কের কণ্ঠে স্বামি-শোকাতুরা বেহুলার করুণ-কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠত—

> কত নিদ্রা যাও প্রভু রে,
> প্রভু, চক্ষু মেলি চাও।
> তোমারে ভাসাইয়া যায়—
> তোমার দারুণ বাপ-মা (ও)।

মনসার ক্রোধে চাঁদ-সদাগরের দুর্গতি, পুত্রশোকাতুরা সনকার ক্রন্দন, বিবাহের কালরাত্রিতে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু—শোকের তরঙ্গে তরঙ্গে আমাদের শিশু-মন আলোড়িত হ'ত। বেহুলা ভেলার উপরে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে ভেসে চলেছে; কত কাকুতি-মিনতি, কত প্রলোভন, কত ভয়, কত বিপর্য্যয়—কিন্তু বেহুলা নির্ব্বিকার চিত্তে সবই উপেক্ষা করেছে। সে শুধু নিজের স্বামীকে বাঁচিয়েই ফিরে নাই, শ্বশুরের অপর ছয় পুত্র ও সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে ফিরেছে। শৈশবে মুগ্ধচিত্তে সতী বেহুলার কাহিনী শুনেছি; কিন্তু আজ বুঝেছি, মনসার ভাসান মনসার জয়গান নহে, ইহা বাঙ্গালী বধূর প্রেমের জয়গীতি।

দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের ভেলায় ভেসে চলেছি আমরা। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে কল্যাণী বেহুলারাই জীবনদান করে আসছে। পরার্থে তাঁদের জীবন উৎসর্গ, স্বামি-পুত্রের মঙ্গলের জন্য ব্রত উপবাসে কঠোর নিয়মনিষ্ঠায় তাঁদের মধ্যে বেহুলা চিরজাগ্রত রয়েছে। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সে মূর্ত্তি আজ নূতন শিক্ষার আলোকে চুরমার হ'তে বসেছে। লখিন্দরকে কালনাগে দংশন করেছিল; কিন্তু আমাদের মনের গহনে কোন্ বিষধর প্রবেশ করেছে! সংস্কারমুক্ত হতে চলেছি আমরা। কুসংস্কার দূর করতে চাই, অন্ধসংস্কারে আমাদের আর আস্থা নাই। সাম্যের নূতন আবির্ভাবে প্রেমের স্থান কোথায়? বেহুলার ক্রন্দন দূরে, বহু দূরে দিক্‌চক্রবালে মিশে গিয়েছে। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, সে হিসাব-নিকাশের দিন এখনও আসে নাই।

হকি লীগ প্রতিযোগিতা

হকি লীগের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি আসন্ন-প্রায়। সূচনায় দল সংগঠনের তোড়জোড় দেখিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এবার মোহনবাগান প্রথম ডিভিসনে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং এ বৎসর এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছে। তাঁহারা অনুরূপ সম্মান অর্জ্জন ব্যাপারে তৃতীয় ভারতীয় দল। ইতিপূর্ব্বে গ্রীয়ার ও মোহনবাগান এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ফুটবল জগতে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং-এর হকি-জগতে এই নূতন বিজয়াভিযান। নাইম, জাফর, মুনীর,, কায়ুম প্রভৃতি আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন খেলোয়াড় এই দলের শক্তিসম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুযোগসন্ধানী কুশলী তরুণ খেলোয়াড় জাকীর অবদান অতুলনীয়। প্রত্যেক জয়ের মূলে তাঁহার গোল করার কৃতিত্ব রহিয়া গিয়াছে। লীগের সন্ধিক্ষণে পাঞ্জাব স্পোর্টসের ন্যায় দুর্ব্বল দলের নিকট আকস্মিক ও আশাতীত বিপর্য্যয়ে মোহনবাগানের লীগ-বিজয়ের সমস্ত আশা অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা রাণার্স আপ হইয়াই খুসী। তাহাদের মনের জোরের অভাব বহু বার বহু ক্ষেত্রে প্রকট হইয়াছে। লীগে উঠা নামা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শেষের দিকের খেলাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্ত্তত্রাণের রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে। সহানুভূতিসম্পন্ন ও সৌহৃদ্যের আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকটি ক্লাবের মধ্যে পয়েণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে আশ্রিতবাৎসল্যের প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। লিলুয়ার কোন আশা নাই। এখন মেজারাস জ্যাভেরিয়ান্স, আর্ম্মেনিয়ান্স ও বি-এণ্ড-এ, রেল দলের মধ্যে নামিয়া যাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে।

দ্বিতীয় ডিভিসনে পার্শী কাহারও নিকট মাথা নোয়ায় নাই। শেষ খেলায় কলেজিয়ান্সের নিকট পরাজিত হইয়া ভবানীপুর প্রথম পরাজয়ের ডালি মাথায় নিয়া উন্নীত হওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে। পার্শী ও কলেজিয়ান্স আগামী বার প্রথম ডিভিসনে খেলিবে।



এম, ডি ডি

যুদ্ধের বাজারে সমস্ত জিনিসেরই চাহিদা। অপেশাদারী বাঙ্গালী ফুটবল-জগতেও ইহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। এবার না কি আই, এফ.এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিয়াছিল।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বাগবাজার জিমনাসিয়াম-পরিচালিত এসিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার একবিংশতি বাৎসরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। সামরিকগণের মধ্যে খ্যাতনামা প্রতিযোগীর যোগদানে এবারের অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনাবহুল হয়। হেভীওয়েট ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগে পুরাতন রেকর্ড ভঙ্গ হয়। মার্কিন প্রতিযোগী স্যামুয়েল চেং মোট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারোত্তোলন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাদ্রাজের প্রতিনিধি রাজা গোপাল শ্রেষ্ঠ দৈহিক গঠনের পুরস্কার লাভ করেন। বজরং ব্যায়ামাগারের বৈদ্যনাথ ঘোষ বৈশিষ্ট্যের অধিকার দাবী করেন। বোম্বাই ওয়াটারপোলো কোয়াড্রাঙ্গুলার—

বোম্বাই ওয়াটারপোলো কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। হিন্দুদল শেষ পর্য্যন্ত ইহুদীদের পরাজিত করিয়া বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছে। ক্রিকেটে অনুরূপ প্রতিযোগিতা সারা ভারতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। নীতিবাদের অন্ত নাই। খেলার জগতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিযোগিতা জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু খেলার মধ্যে বৈষম্যমূলক রাজনীতিকে মাথা গলাইতে না দেওয়াই সমীচীন। এই জাতীয় খেলা শ্রেষ্ঠ ও বাছাই করা খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

সেমিফাইন্যাল খেলায় যথাক্রমে পার্শী ও ইউরোপীয় দল হিন্দু ও ইহুদীগণের নিকট পরাজিত হয়। ইউরোপীয়গণ যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৩—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। হিন্দুদল ৪—২ গোলে জয়ী হয়। শেষ খেলাটিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। তুমুল উত্তেজনার পর হিন্দুদল ৪—৩ গোলে শেষ সম্মানের অধিকারী হয়। পেনাল্টি হইতে কৃত গোলটি শেষ নিষ্পত্তি নির্দ্ধারণ করে।

ফুটবল মরশুম

ফুটবল স্বাগতম্। ফুটবল মরশুমে কলিকাতার ময়দানে কল-কাকলী অচিরে সুরু হইবে। আই, এফ, এর, ঘোষণা অনুযায়ী ১লা মে হইতে ফুটবল লীগের উদ্বোধন হইবে। খেলোয়াড়গণের দল-পরিবর্ত্তনের পালা শেষ হইয়াছে। লীগবিজয়ী মোহনবাগান ভবানীপুরের শম্ভী দাস ও এইচ, মজুমদারকে পাইয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং-এর ভাঙ্গাহাট। তাজ মহম্মদ, জুম্মা খাঁ, ও ইসমাইল ভবানীপুরের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। নুর মহম্মদ ও আপ্পা রাওকে পাওয়ায় ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ বিভাগের শক্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার বাহির হইতে যুক্তপ্রদেশের মহাবীর বোধ হয় ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণবিভাগ দৃঢ়তর করিবেন। বুচী বোম্বাই হইতে একেবারে মোহনবাগানে।

সিংহলে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল পর্য্যটন শেষ হইয়াছে। সফরের পূর্ব্বে জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ভ্রাম্যমাণ দলের এই যাত্রা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবশ্য, যোগসূত্র স্থাপনে এইরূপ ভ্রমণ উভয় দেশেরই পক্ষে মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান্ খেলোয়াড়গণের সহিত পরস্পরের পরিচয় ও সংযোগ খেলোয়াড়ী কৃতিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে। সেই হিসাবে এই সফরের মূল্য অশেষ। কিন্তু ভারতীয় দলের সম্বন্ধে আমাদের উদীয়মান নব ক্রিকেট-প্রতিভার উন্মেষের স্বপ্নে বিভোর ক্রীড়ামোদিগণ হতাশ হইয়াছেন। আমাদের দেশে প্রতিযোগিতার বা অন্যান্য প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার বিশিষ্ট ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের এই ব্যর্থতা অবিশ্বাস্য।

পর্য্যটনকারী দল সংগঠন ব্যাপার একযোগে সমস্ত ভারতীয়

ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের মনঃপূত হয় নাই। আমীর এলাহীর ন্যায় স্পিন-বোলার বা নূর মহম্মদ প্রভৃতি খ্যাতনামা অল রাউণ্ডারেরা এই দল হইতে বাদ পড়ায় কেহ কেহ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটী যে দল নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণের সমাবেশ ছিল। মোট পাঁচটি খেলার দুইটিতে জয়ী হইয়া এই দল আর তিনটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অভিযানে ভারতীয় কোন ব্যাটস্ম্যান শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। রামী মুদী রঞ্জী-প্রতিযোগিতায় পর পর সাতটি সেঞ্চুরী করিয়া ১০০৮ রাণ করিয়াছেন। মার্চে্ণ্ট ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিক বার রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবার তাঁহার খেলার হাতও ভাল ছিল। হাজারীর ন্যায় স্থির, বীর ও সুনিশ্চিন্ত খেলোয়াড়, নিপুণ ও কুশলী মুস্তাক আলী বা বহুদর্শী ধুরন্ধর খেলোয়াড় অমরনাথ প্রভৃতির ন্যায় দিক্‌পাল থাকিতে এই দলের কিরূপে ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বোলিংয়ে দ্রুত বোলার হিসাবে এস, ব্যানার্জীর কৃতিত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। মানকড় উভয় বিভাগে স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ইব্রাহিম ও উইকেটরক্ষক পার্থসারথি যাইতে অসমর্থ হওয়ায় রামসিং ও বরোদার নিম্বলকর শূন্য স্থান পূর্ণ করেন।

মিঃ এইচ, এন, কণ্ট্রারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও বিজয় মার্চেন্টের অধিনায়কত্বে অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, সর্ব্বাতে, হাজারী, মানকড়, মুদী, কিষেণচাঁদ, নিম্বলকর, রামসিং, এস, ব্যানার্জী ও রঙ্গাচারীকে লইয়া এই দল গঠিত হয়। উইকেটরক্ষক নিম্বলকর আউট হওয়ায় মাদ্রাজের শ্রীনিবাসকে বিশেষ তারযোগে আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

মাদ্রাজের কর্পোরেশন এই দলকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় অভ্যর্থিত করেন। মাদ্রাজ গভর্ণরের দ্বাদশের বিরুদ্ধ খেলাটির শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। অমরনাথের আউট না হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজের পূর্ব্বেই শতাধিক রাণ গ্রহণ এই খেলার প্রধান বিষয়বস্তু। মাদ্রাজের মেয়র ও গভর্ণর উভয়েই এই দলকে ভারতের পক্ষ হইতে সিংহলে প্রীতি ও শুভেচ্ছার অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করেন।

সিংহলে ভারতীয়গণ বিপুল আনন্দের ও আপ্যায়নের সহিত গৃহীত হন। কলম্বোর মেয়র তাঁহাদের সম্মানার্থ আহূত সভায় ভারতীয় ক্রিকেটবীরদের প্রাপ্য প্রশংসা দেন। সিংহলীয়গণের আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জী-প্রতিযোগিতায় যোগদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া মন্তব্যও শুনা গিয়াছে। পর্য্যটনের আদান-প্রদানের উপযোগিতা সম্বন্ধে উভয় দেশের ক্রীড়ানুরাগীরা সজাগ এবং এই প্রথায় ভ্রাম্যমাণ বাছাই দলের সম্বন্ধ-বিনিময় নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়াই উচিত।

সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহিত প্রথম খেলা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। সিংহলের স্পিটেল ১২০ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে পারদর্শিতা দেখান।

মিলিত সার্ভিস একাদশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল সাত উইকেটে বিজয়ী হয়। মার্চেন্ট আহত হইয়া অনুপস্থিত থাকায় দলের নেতৃত্ব-ভার অমরনাথের উপর পড়ে। উইকেটরক্ষক নিম্বলকর খেলিতে অসমর্থ হওয়ায় মাদ্রাজ হইতে শ্রীনিবাসকে বিশেষ তারে আহ্বান করা হয়। তিনি এই খেলায় উইকেট রক্ষা করেন। সামরিক দলের ডিক্রেষ্টার ও আমাদের মানকড় বল করিয়া কৃতিত্ব দেখান।

এক দিনব্যাপী খেলায় সম্মিলিত কলেজ দল ভারতীয়দলের সহিত ড্র করে। এই খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, কলেজীয় দল পনেরো জন খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হয়। কলেজীয় দল ১৪ জনে ২১২ রাণ করিলে ভারতীয়গণ প্রত্যুত্তরে পাঁচ উইকেটে ১৪৩ রাণ করিতে সমর্থ হয়। এই খেলাতেও মার্চেন্ট যোগদান করেন নাই।

গল ক্রিকেট ক্লাব ভারতীয় দলের নিকট এক ইনিংস ৩৫রাণে পরাজিত হয়। বোলিংয়ে সি, এস, নাইডু ও ব্রহ্মচারী যথাক্রমে উভয় ইনিংসে পাঁচটি ও চারিটি উইকেট দখল করেন।

ভারতীয় বনাম সিংহলের একমাত্র টেষ্ট খেলাটির চরম নিষ্পত্তি হয় নাই। ভারতীয় দলের সিংহল সফরের শেষ খেলাটি দেখিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। কলম্বোতে কোন ক্রিকেট খেলায় ইতিপূর্ব্বে এত বেশী দর্শকের সমাবেশ হয় নাই। সিংহলের ১০৭ রাণের প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৭৯ রাণ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সিংহল সাত উইকেটে ২২৫ রাণ করিলে নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তামিল ইউনিয়নের অধিনায়ক শতশিবম্ অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ১১১ রাণ করেন ও দলের পতন রোধ করেন। ভারত-সিংহল টেষ্ট খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁহার ক্রীড়া কৌশল ও মারের চাতুর্য্য বিশেষ উপভোগ্য হয়। মোট ১১৭ মিনিট খেলার ফলে তাঁহার উক্ত রাণসংখ্যা গৃহীত হয়। ভারতীয় দলের মুস্তাক আলী ও নিম্বলকরের যথাক্রমে ৪১ ও ৪৮ রাণ উল্লেখ-যোগ্য। মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী ও এস ব্যানার্জীর ন্যায় তিন জন পুরাতন ও বহুদর্শী খেলোয়াড়ের রাণ আউট হওয়ায় ভারতীয় দলের রাণ নেওয়ার ব্যাপারে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সর্টরাণ নেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিলে বড় খেলায় কুশী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে রাণ সংগ্রহ প্রায় দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে খেলাটি দেড় দিন পরে আরম্ভ না হইলে হয়ত শেষ মীমাংসা হইয়া যাইত।

খেলার শেষে ভারতীয় দল সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক মিঃ কে, রঙ্গরাও ও অধিনায়ক মার্চেন্ট সিংহলের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী শীত ঋতুতে সিংহল দল ভারত পরিভ্রমণ করিতে পারে, সেই সম্পর্কে চেষ্টা করিবার জন্য মিঃ রঙ্গরাও আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেন।

গান্ধীজীর-ভবিষ্যদ্বাণী—

আমেরিকার 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রে মিঃ সামনার ওয়েলস লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে পদানত যে সকল দেশ আছে, সে সকল দেশের জন্য আন্তর্জ্জাতিক অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান যুদ্ধের পর, বিশেষতঃ শ্বেত-জাতির পদানত প্রাচ্যখণ্ডে জাতীয় ভাবের যে বন্যা বহিবে তাহার উদ্বেল তরঙ্গের গতিরোধ করা কঠিন হইবে। যদি সম্মিলিত জাতিবর্গের আসন্ন বৈঠক এই মহা সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—"Unless the peoples of the East obtain their fundamental liberties, another and bloodier war will be inevitable."



শ্রীতারানাথ রায়

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠক—

যাহাতে এংলো-স্যাক্সন শক্তিদ্বয়, বিশেষতঃ বৃটেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত জাতিবর্গের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের বলে সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকে অধিক প্রভাবান্বিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রুশিয়া বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। পোল্যাণ্ডের লুবলিন সরকারের প্রতিনিধিকে বৈঠকে যোগদান করিতে দিবার জন্য আমেরিকাকে অনুরোধ করিলে, সে অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। শুনা যাইতেছে, সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকে সোভিয়েট সরকার হোয়াইট রুশিয়া ও ইউক্রেণের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী করিবেন। প্রস্তাবিত বৈঠক সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নানাবিধ জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতি যেরূপ, তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, মিত্রপক্ষের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবগণ বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন না। সুতরাং হয়ত বা বৈঠকের অধিবেশন পিছাইয়া দেওয়া হইবে।

জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণ—

ইংলণ্ডে জনরব প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। মিত্রপক্ষও বিজয়-উৎসবের আয়োজন করিতেছে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভারতের সমস্ত নরপতিদের মধ্যে ১৬ জন নরপতি জুন মাসে বিজয়-উৎসবে যোগ দিতেই না কি ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ৩১শে মার্চ্চ জেনারল আইজেনহাওয়ার মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নিকট না কি এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন,—জার্ম্মাণী আত্মসমর্পণ না করিলেও মিত্রপক্ষ 'জয়-দিবস' ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে। তবে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম-য়ুরোপের যুদ্ধে জার্ম্মাণী আত্মসমর্পণ করিবে না, শেষ পর্য্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চালাইবে। ২০শে চৈত্র জার্ম্মাণ বেতার ঘোষণায় নাৎসী কেন্দ্রী-কর্ত্তৃপক্ষও জাতিকে প্রাণ-পণ যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—হয় বিজয়, নয় মৃত্যু—ভিন্ন পথ নাই। কিন্তু মার্কিণ য়ুনাইটেড প্রেস এজেন্সী সংবাদও বণ্টন করিয়াছেন যে—জার্ম্মাণ উর্দ্ধতন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন জার্ম্মাণ সৈন্যগণ কথা শুনিতেছে না, পেট্রোল-ভাণ্ড নিঃশেষ হইয়াছে, সৈন্যরা খাইতে পাইতেছে না, সুতরাং আর যুদ্ধ চালান অসম্ভব। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল জার্ম্মাণ রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া আসিয়া পশ্চিম রণক্ষেত্রের অবস্থা "extremely good" বলিলেও তিনি এখনই উল্লসিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন—("there is a general warning against the premature celebration of Germany's Collapse.")

চক্রব্যূহে জার্ম্মাণী—

য়ুরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যদল বার্লিনের দেড় শত মাইল নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ২২শে চৈত্র পর্য্যন্ত সংবাদ—জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে জেনারল প্যাটেনের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে, জার্ম্মাণরা পুনরায় গোথা সহর দখল করিয়াছে। রুঢ় অঞ্চলে জুটফেন, বুজ্জবার্গ, ও হ্যানোভারে জার্ম্মাণরা প্রবল প্রতিরোধ করিতেছে।

সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বিপদ অধিক। ভিয়েনা অবরুদ্ধ। জার্ম্মাণরা প্রাণপণে বাধা দিতেছে। অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে রুশ সৈন্য উপনীত। চেকোশ্লোভাক সীমান্তে মার্শাল কোনিভের বাহিনী হানা দিয়াছে। মনে হইতেছে, এই সীমান্তের মরিভান গ্যাপ দিয়া সৈন্য পরিচালন করিয়া প্রথমে প্রাগ দখল করা হইবে, তৎপরে মার্শাল তোলবুকিনের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোনিভের সৈন্যগণ অগ্রসর হইবে। চেক ও অষ্ট্রিয়ান কারখানাগুলি হস্তচ্যুত হইলে জার্ম্মাণী গেরিলা যুদ্ধও ভাল ভাবে চালাইতে পারিবে না। প্রকাশ যে, মস্কোতে ডাঃ বেনেসের সহিত পরামর্শ করিয়া ষ্টালিন এই পন্থা স্থির করিয়াছেন। ব্যাভেরিয়ায় হিটলার শেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া যে আশা করিতেছেন, ইহাতে তাহা ব্যর্থ হইবে।

জনরবে জার্ম্মাণী—

আবার জার্ম্মাণীতে সামরিক ষড়যন্ত্রের অনেক কাহিনী শুনা যাইতেছে—ফন রুনষ্টাট ও গোয়েরিং নিহত হইয়াছেন; স্বয়ং হিটলারকে হত্যা বা গ্রেপ্তার করিবার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে; হিটলার না কি পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার চোখে ঘুম নাই। এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইতেছে যে, হিটলারের ৫৬তম জন্মদিন, ২৬শে এপ্রিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট দিবস। লণ্ডনের 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' গল্প প্রচার করিয়াছেন—হিটলার, হিমলার ও মুসোলিনী জাপানে যাইবেন।

আর একটি সংবাদ 'গ্লোব' বার্ত্তাবহ এজেন্সী প্রচার করিয়াছেন,—জার্ম্মাণ সামরিক দলপতিদের দুই দলে ভেদ হইয়াছে। এক দল বলিতেছে, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাও, দরকার হইলে বিষ গ্যাস প্রয়োগ কর। 'ডেলী মেলে'র সংবাদদাতা বলিতেছেন—"the 'fight on' faction seems to have won."

জাপানে নূতন পরিস্থিতি—

২২শে চৈত্র সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, রুশ-জাপ নিরপেক্ষতা চুক্তি সোভিয়েট সরকার আর বজায় রাখিবেন না (১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল এই চুক্তি হয়)। এই সঙ্গে এমন সংবাদও আমরা পাই যে, জাপানের কুনিয়াকি কইসো-মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে।



মেৎসে নাৎসী বিমানবাহিনীর দুরবস্থা

এডমিরাল ব্যারণ সুজুকি নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন। মিত্রপক্ষ আশা করিতেছেন যে, কইসো-মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ হইতে ইহাই সুচিত হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ব্যারণ সুজুকি নরম বা উদারপন্থী বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং এরূপ আশা হইতেছে যে, তিনি শান্তির প্রস্তাব করিবেন। জাপ ধনিক ও শিল্পপতিগণের শঙ্কা ও প্রভাবই না কি কইসো-মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের কারণ।

রুশ-জাপ নিরপেক্ষতা চুক্তির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট সরকার উহা বাতিল করিলেও, মস্কোর ঘোষণাতে জাপান সম্বন্ধে রুশিয়ার ভবিষ্যৎ নীতির কোন আভাস নাই। গত নভেম্বরের মধ্যভাগে ষ্টালিন রেড স্কোয়ারের বক্তৃতায় জাপানকে "an aggressor nation" বলিয়া যখন অভিহিত করেন, তখন জাপান বিস্মিত ও আপনাকে অপমানিত মনে করে। সে সময় জাপ সরকারী ডোমি এজেন্সী বলেন—"The Soviet Nation is a realistic country, so in all probability her foreign Policy vis-a-vis her neighbour is not wholly immutable…Consequently, it is the firm belief of the Japanese general public that Japan must also adopt a realistic policy that will conform with any new situation created by the Russians." অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহার কোন ইঙ্গিত প্রদান করা এখন অসম্ভব। তবে ইতিমধ্যে জাপ-পক্ষ হইতে এরূপ প্রচার করা হইয়াছে যে, চুক্তি বাতিল হইলেও রুশ-জাপ নিরপেক্ষতা অটুট থাকিবে।

ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়ার উত্তর প্রদেশগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য ৩০ হাজার সুশিক্ষিত জাপসৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া চীনা-মহল সংবাদ দিতেছেন। রুশিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে তবে এই পথেই প্রথমে করিবে। কিন্তু রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের একটা সুবিধাজনক পরিণতি না হইলে রুশিয়া সহসা জাপানকে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণীকে সুবিধা প্রদান করিবে কি না সন্দেহ।

জাপ-মার্কিণ যুদ্ধ—

ওদিকে না কি খাস জাপানের গৃহ-গণ্ডীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জাপানকে ইস্পাত-দুর্গে পরিণত করা হইতেছে। মার্কিণ এডমিরাল নিমিজের চেষ্টায় প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দ্দিকস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দ্বীপে মিত্রপক্ষগণ সৈন্য নামাইয়াছে। রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ যদি তাহারা জয় করিতে পারে, তাহা হইলে জাপানের গৃহ-গণ্ডীতে আক্রমণের বিশেষ সুযোগ হইবে। এই দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে ওকিনাওয়া দ্বীপে মার্কিণ সেনা নামিয়াছে। আমেরিকানরা আশা করিতেছে, এই দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া জাপানের শ্রমশিল্প-



ষ্ট্রাসবুর্গে বন্দী জার্ম্মাণ নারী-সৈন্যদল

প্রধান সহরগুলিতে ১০ হাজার বিমান আক্রমণ করিবে। ফলে, জার্ম্মাণীর মত জাপানও যখন এই আক্রমণে বিপন্ন হইবে এবং জাপ-অধিকৃত রাজ্যগুলি হইতে জাপান বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, তখন চীনের উপকূলেও সৈন্য নামাইয়া মিত্রপক্ষ একে একে হত



মার্কিণ বিমানপোতের কারখানা

রাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইবে। কিন্তু মার্কিণ নৌ-বিভাগের জনৈক মুখপাত্র এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জাপানীরা মার্কিণ সৈন্যদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য ওকিনাওয়া দ্বীপের মার্কিণ ঘাঁটিতে পাল্টা অবতরণ করিবে। জাপানীরা সম্ভবত: স্বেচ্ছায় পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। সহসা তাহারা গুপ্ত স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া সাইপান ও আইওজিমার ন্যায় বে-পরোয়া প্রতিরোধ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

প্রাচ্যে ২০ বছরের যুদ্ধ—

চীনে কিন্তু জাপানের পরাজয় বা বিপন্ন অবস্থার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ওদিকে সম্প্রতি চীন সম্বন্ধে জাপ-নীতির কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ ওয়েলিংটন কূ ২২শে চৈত্র নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাপান চীনের সহিত মিটমাট করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জাপান কোন মতে 'ঠেকা' দিয়া চলিয়া আখেরে জয়ের আশা করিতেছে। ("Japan is placing her hopes in fighting until Mr Churchill and President Roosevelt get too old to lead war-mongers.") এ জন্য না কি ভূতপূর্ব্ব জাপ পররাষ্ট্র-সচিব হাচিরো আরিতার নেতৃত্বে ২০ বৎসর যুদ্ধ পরিচালনের জন্য এক কমিটী গঠন করা হইয়াছে। টোকিও বেতার-কেন্দ্র এই কমিটীর বিষয় উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছে—"People now are talking of a 20 years war or even a 100 year war. The longer the war lasts in the Pacific, the better it is for Japan." কল্পিত নিরবচ্ছিন্ন বিগ্রহ-বহ্নি দীর্ঘকাল প্রজ্জলিত রাখিবার আশা জাপান কোন্ সাহসে করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

রুশ-তুরস্ক সন্ধি বাতিল—

রুশিয়া সম্প্রতি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুরস্ক সন্ধি পরিহার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের সহিত রুশিয়া পরামর্শ করা সঙ্গত মনে করে নাই। অতীতেও ক্যাথারিণ দি গ্রেট হইতে বিভিন্ন কালের রুশ সরকার কৃষ্ণ সাগর হইতে বহির্গমনের পথে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এবারও সম্ভবতঃ রুশিয়া ডার্ডানেলিসের সমস্যা উত্থাপন করিবে এবং সম্ভবতঃ তুরস্কও এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কথাবার্ত্তা চালাইবে না। এই ব্যাপার লইয়া ইংরেজ সাংবাদিকরা রুশিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকারের জল্পনা-কল্পনা করিতেছে।



[উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গ্রামে বেশ খানিকটা কল-রবের সৃষ্টি হইল।

মাখন গাঙ্গুলি ডাকিলেন সুশীলকে, বলিলেন—এ কথা সত্য ?

—কি কথা বলুন ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—ঐ কালোর বোনটার না কি বিয়ে দিচ্ছ তুমি ?

সুশীল বলিল—হ্যাঁ। সে-ত্তাওর ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এ-বিয়ের কোনো দাম আছে ?

সুশীল বলিল—দাম এই হিসেবে যে বিয়ে না হলে মেয়েটার কোথাও ঠাঁই হবে না। বাঁচতে হলে ওকে অধঃপাতে গিয়ে বাঁচতে হয়। সে অধঃপতন থেকে ওকে রক্ষা করবার দু'টি উপায় আছে—এক এই বিয়ে, আর-এক উপায় ওর মৃত্যু। ভগবান মৃত্যু না দিলে হয় ওকে আত্মঘাতী হতে হবে, না হয় বিষ খাইয়ে ওকে মারতে হয়। বলুন, এর মধ্যে কোনটা করা উচিত ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—উচিত-অনুচিতের কথা আমি তুলতে চাই না সুশীল। তবে মানুষ যে যার কর্ম্মফল ভোগ করে। ও যে পাপ করেছে, তার ফল তুমি বিধাতা হয়ে খণ্ডন করতে চাও ?

সুশীল একটা নিশ্বাস ফেলিল ; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওরা তো মুখ্যু—ভালো-মন্দ-বোধ ওদের কতটুকুন্! যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বুদ্ধিমান অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করেন, তাঁরাও অনেক সময় এমন কাজ করে বসেন, যার ফলে অনর্থ ঘটে। স্বীকার করছি, মহাপাপ করেছে কালোর বোন। কিন্তু ও-পাপ না করে, সে জন্য যাদের ওকে দেখার কথা, তাদের ভুলও তো সামান্য নয়, মামাবাবু।...তাছাড়া একটা পাপ করে ফেলেছে, সেই পাপের মধ্যে মাথা গুঁজে বাকী জীবনে আরো দশটা পাপ ও করবে, এই বা কেমন কথা।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—পাপ-পুণ্য নিয়ে কথা নয় সুশীল...এর সঙ্গে আরো পাঁচ জনের ভালো-মন্দ...মনের সূক্ষ্ম বৃত্তির সম্পর্ক আছে। এক জনকে রক্ষা করতে আর-পাঁচ জনকে ব্যথা দেওয়া বা তাদের ভালো-মন্দবোধে আঘাত দেওয়া...এর ফল ভালো হবে, মনে করো ?

সুশীল বলিল—আপনি কি করতে বলেন, শুনি ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—অনেকে আমার কাছে এসে নালিশ জানিয়ে গেছেন। রাগ করে' বিরোধিতা নয়...করলে তোমাকে ডেকে আমি এ-কথা বলতুম না। কিন্তু অনেকে এসে দুঃখ জানিয়েছেন,—বলেছেন, এ-বিয়ে দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হবে...এতখানি প্রশ্রয় যে,—সমাজ-সংসারের মান-মর্য্যাদা থাকবে না...সংসারের পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব হবে।

সুশীল ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল...তার পর বলিল,—এ-কথা আমি মেনে নিতে পারলুম না মামাবাবু। ওঁদের এতখানি ভয়ের কারণও বুঝি না...কালোর বোন যা করে' ফেলেছে...তার পর এই বিবাহ...এতে কালোর বোন রক্ষা পেলেও সে যে সকলের সম্মান পাবে, এ-আশা বাতুলতা। তবে ও-বেচারী রক্ষা পাবে...এ-কথা ভেবে মায়া-মমতা হবে না কারো ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—সমাজের কথা না হয় রইলো। মেয়েটির দিক দিয়েই আমি বলছি...বিয়ে আজ তুমি দিচ্ছ...যে-লোকটি বিয়ে করছে, সে হয়তো ভয়ে-ভয়ে এতে রাজী হয়েছে। ভয় পেয়ে আজ সে যে-কাজ করছে...দু'দিন পরে ভয়টুকু কেটে যাবে...তখন ঘৃণা করে মেয়েটিকে যদি ত্যাগ করে যায় ? আইন বলো, গায়ের জোর বলো,...তা দিয়ে মানুষ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করতে পারে না। ভালোবাসা, মায়া-শ্রদ্ধা...এই নিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, স্বচ্ছতা—যেখানে শ্রদ্ধা-মমতার অভাব, সেখানে মানুষে-মানুষে কোনো দিন মিল রাখা সম্ভব হবে না।

সুশীল এ কথায় কোন জবাব দিল না...চুপ করিয়া রহিল। ভাবিতেছিল, কথায় কথা বাড়ে শুধু, কাজ হয় না। কাজ লইয়া যেখানে শুধু আলোচনা আর তর্ক, সেখানে কাজ কোনো দিন নিষ্পন্ন হয় নাই...পৃথিবীর ইতিহাস উলটাইলে দেখা যাইবে, কাজ করিতে গেলে তর্ক চাপা দিতে হয়।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। তুমি হয়তো ভালো কাজই করছো। সে-ভালো বোঝবার সামর্থ্য হয়তো আমাদের হয়নি। মনের যে-উদারতা থাকলে এ-কাজকে মন থেকে সমর্থন করা যায়, হয়তো এদের সে উদারতা নেই। তা না থাকলেও এদের মনকে মাড়িয়ে ভেঙ্গে থেঁতলে দিয়ে এ কাজ না-ই বা করলে তুমি।

সুশীল যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল—কিন্তু আমি যে অনেকখানি এগিয়ে গেছি মামাবাবু। আমার পক্ষে পেছুনো এখন সম্ভব নয়। আমি যদি পেছিয়ে যাই, তাহলে...

বাধা দিয়া মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—পেছুতে আমি বলি না। যা স্থির করেছো, করো। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ বাবা, এ-গ্রামে এ বিবাহ না দিয়ে, তুমি যখন এতখানি করতে পেরেছো, তখন ওদের নিয়ে কলকাতায় গিয়ে সেইখানেই...মানে, গ্রামের লোকের মনে মস্ত আঘাত নাই বা দিলে।

সুশীল বলিল—তাই হবে, মামাবাবু। কলকাতাতেই ওদের বিয়ে হবে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—তাই করো, বাবা। বলো তো আমি কিছু টাকাও ওদের দিতে রাজী আছি। তোমার সৎসাহসের জন্য।

সুশীল বলিল,—কালি যা করেছে, তা খুবই গর্হিত।...বিয়ে হলেও আমি বলেছি, এ-গ্রামে ওদের থাকা হবে না।...তবে পাপীকে সাজা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে-সমাজে পাপ যাতে না ঢোকে, সে-দিকে আমাদের সচেতন থাকা দরকার।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—নিশ্চয়।

সেই দিনই এ-কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। শুনিয়া পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—বাঁচা গেল। গ্রামের মধ্যে এতখানি অনাচার...

শিবকৃষ্ণ বলিল,—বলেছি তো, এত শোক-তাপ পেলেও বড়-কর্ত্তা কি সমাজকে অমান্য করবেন।

কলিকাতায় কোনো অসুবিধা ঘটিল না। কালির তাওর গোপীনাথের অবস্থা ভালো। একখানা ঘড়ির দোকান আছে।

রাধাবাজারে। পৈত্রিক দোকান। তাছাড়া তেজারতীর কারবার। কলিকাতায় বাড়ী-ঘর আছে। সহরের মানুষ। বাড়ীতে বিধবা মা আর এক বিধবা বোন; বোনের দু'-তিনটি ছেলে-মেয়ে। ইহাদের লইয়া তার সংসার। কালিন্দীকে বধূ করিয়া ঘরে আনিতে মায়ের আপত্তি হইল না। যে-বধূ গিয়াছে, তার জ্বালা মা এখনো ভুলিতে পারে নাই। তাছাড়া সে বৌয়ের জন্য ছেলেকে মা কোনো দিন ঘর-বাসী করিতে পারে নাই! এখন এ মেয়েকে আগে হইতেই ছেলের মনে ধরিয়াছে···ছেলে ঘরে থাকিবে···এই আনন্দেই মা আর কোনো চিন্তাকে মনে স্থান দিল না!

সুশীল বলিল গোপীনাথকে—কালির নামে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তোমায়! না হলে পরে আমার মান থাকবে না।

গোপীনাথ বলিল—চার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ লিখে দেবো!

কোম্পানির কাগজ লিখাইয়া সুশীল সে-কাগজ দিল কালির হাতে; বলিল—কাছে রাখো কালী···

গোপীনাথ বলিল—যদি ভাবেন কোনো দিন ও-কাগজ আমি কেড়ে বেচে ফেলবো, কাজ কি সে সন্দেহে! ও-কাগজ আপনি নিজের কাছে রেখে দিন বরং।

সুশীল বলিল—তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে গোপীনাথ। একটা অন্যায় করে তুমি যে-ছাতি নিয়ে সে-অন্যায়ের প্রতিকার করেছো, এর জন্য তোমাকে আমি শুধু বিশ্বাস নয়, শ্রদ্ধা করি! তুমি দুরাত্মা নও। যদি মানুষের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে, তাহলে আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের মঙ্গল হবে।

সুশীল চলিয়া আসিতেছিল, কালিন্দী আসিয়া ঢিপ করিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল, বলিল—মাঝে মাঝে আসবেন বাবা।

সুশীল বলিল—আসবো। এদিকে এলে তোমাদের দেখে যাবো।

তার পর সুশীল ফিরিল চালশায় মাতুলালয়ে।

সরস্বতী বলিল—কাজ চুকলো?

সুশীল বলিল—তোমার আশীর্ব্বাদে।

—কালীর শাশুড়ী আছে?

—আছে। কালীকে সে আদর করে' ঘরে নিয়েছে।

সরস্বতী বলিল—এবার চ' এখান থেকে।

—যাবো মা, মামাবাবুকে বলি।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এবার আমার একটা কাজ করে দাও, সুশীল।

—বলুন।

—আমার আর যখের মতো বিষয় চৌকি দেওয়া পোষাচ্ছে না বাবা। ক'দিন আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে স্থির করেছি, বিষয়-সম্পত্তি সব ট্রাষ্ট-প্রপার্টি করে যাবো। যে দিন-কাল···তার উপর ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে মন নেই, ওরা নবাবী করতে চায়, বিলাসিতা চায়। মুখ্যুর মনে যদি নবাবী-সাধ জাগে, তাহলে সম্পত্তির পরমায়ু ক'দিন! তাছাড়া বিজয়ের ছেলে···এই বংশেরই ছেলে। তাকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারি না।

সুশীল বলিল—কি আপনি করতে চান বলুন।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তোমার দেনাটা শোধ করে দিতে চাই সব আগে। তার পর যা আমার থাকে, সব বিগ্রহের নামে দিয়ে যাবো। এঁরা হবেন সেবায়েত। মাসে মাসে টাকা পাবেন। তাহলে হবে কি, জানো? যে-টাকা পাবে, তাতে সংসার চলে যাবে অনায়াসে; বন্ধকী দায়ে সম্পত্তি যাবার ভয় থাকবে না। যিনি নবাবী করতে চাইবেন তাঁকে পরিশ্রম করে সে-নবাবীর পয়সা রোজগার করতে হবে!

সুশীল বলিল—বেশ।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এ-কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। না তোমার মামীমা, না তোমার মা···বুঝলে!

—আচ্ছা।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তোমার মামীমার জন্য শুধু আলাদা কিছু টাকা দেবো। বিশ-হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট-পেপার। ঐ টাকাতে তিনি তীর্থ-ধর্ম্ম করুন—যা খুশী করুন। মৃত্যুকালে যাকে খুশী ও-টাকা তিনি দিয়ে যেতে পারবেন।

৩৩

আরো দু'মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সুশীল কলিকাতায় আসিয়াছিল—জরুরি কাজে। কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে গোপীনাথের গৃহে আসিল।

গোপীনাথ গৃহে ছিল; বলিল—ছেলে হয়েছিল···বাঁচলো না। কালী কাঁদে। আপনি একটু বুঝিয়ে শান্ত করুন।

সুশীল বলিল—চলো।

কালিন্দীর চেহারা বিশুষ্ক। সুশীলকে দেখিয়া কাঁদিল। সুশীল বুঝাইল···তার পর চলিয়া আসিবে, গোপীনাথ ছিল-বাহিরের ঘরে। কে লোক আসিয়াছে, তার সঙ্গে কথা কহিতেছে।

সুশীল ডাকিল,—গোপীনাথ···

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিবামাত্র যাহাকে দেখিল, চমকাইয়া উঠিল! কহিল—অখিল!

গোপীনাথ বলিল—আমার বন্ধু!

—বটে! জানতুম না।

অখিলের মুখ নিমেষে সাদা!

সুশীল বিস্ময় বোধ করিল। গোপীনাথের বন্ধু হইয়াছে, ইহাতে অখিলের লজ্জার কি থাকিতে পারে! সুশীল বলিল—এ-কথা কোনো দিন তো শুনিনি অখিল!

গোপীনাথ বলিল—সে সময় ওর বিয়ের হাঙ্গামা চলেছে···

সুশীল বলিল—আচ্ছা, তোমরা বসো, আমি আসি। তোমাদের ওখানকার খপর ভালো, অখিল?

অখিল বলিল—আমি প্রায় দু'মাস দেশে যাইনি!

—হুঁ! লেখাপড়া করছো!

অখিল জবাব দিল না। তার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই সুশীল প্রস্থান করিল।

কলিকাতা হইতে সুশীল আসিল চালশায় বিন্দুমতীর কাছে।

বিন্দুমতী বলিলেন—দু'-চার দিন থাকবি তো আমার কাছে?

সুশীল বলিল—এসেছি যখন, তখন ধুলো-পায়ে বিদায় নেবো না মামীমা! একবার মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। আমি থাকবো তোমার কাছে···ওখানে নয়।

বিন্দুমতী হাসি-মুখে মাথা নাড়িলেন।

পরের দিন···সুশীল বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে, হঠাৎ অখিল আসিয়া চোরের মতো দাঁড়াইল।

সুশীল বলিল—এ কি অখিল ? না, তার ছায়া ?

অখিল হাসিল···মলিন হাসি।

সুশীল কহিল—কবে এলে কলকাতা থেকে ? কৈ, আমাকে কাল তো বললে না যে এখানে আসছো !

অখিল একটা নিশ্বাস ফেলিল ; তার পর চারি দিকে চাহিয়া সুশীলের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল।

সুশীল বলিল—আমার সঙ্গে কথা আছে ?

—আছে সুশীলদা। বলিয়া অখিল তার পায়ে হাত রাখিয়া করুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল—আমায় বাঁচাও সুশীলদা···

পা সরাইয়া লইয়া সুশীল বলিল—কি হয়েছে ?

অখিল বলিল—ঐ গোপীনাথ···তোমাকে খুব মানে। ওকে বলে'···

বিস্ময়ে সুশীলের দুই চোখ বিস্ফারিত ! সুশীল বলিল—ওকে কি বলতে হবে ?

অখিল আর একটা নিশ্বাস ফেলিল···বেশ বড় নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া অখিল বলিল—গোপীর সঙ্গে ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে ভাব ! ও লেখাপড়া ছেড়ে দেছে। আমার মাঝে মাঝে টাকার দরকার হতো—বাবাকে লিখলে বাবা দিত না—গোপীর কাছ থেকে তাই ধার করতুম। তার পর মার কাছ থেকে টাকা এনে শোধ দিতুম। বিয়ের আগে শ'খানেক, তার পর লাষ্ট এপ্রিলে শ'দেড়েক—এই আড়াইশো টাকা ধার···এটা আর শোধ করতে পারিনি। মা বলেছিল..শীতের সময় শ্বশুর পোষড়ার তত্ত্ব করবে, তাই থেকে টাকাটা আমাকে দিয়ে দেবে। শ্বশুর তত্ত্ব করেছিল। শালের দরুণ মা বলেছিল নগদ টাকা দিতে···আমার পছন্দমতো শাল আমরা কিনে নেবো। শালের দরুণ শ্বশুর দিয়েছিল চারশো টাকা। বাবা সে-টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজলো। মা চাইলো, তা দিলে না। বললে, বাবার যে পুরোনো শাল আছে—গায়ে দায়নি—সেই শাল আমাকে দেবে !

এক-নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া অখিল চুপ করিল। তার পর দম লইয়া আবার বলিল—মা টাকা দিতে পারলো না। গোপীকে বলেছিলুম ওর টাকা সুদশুদ্ধ ফেলে দেবো জানুয়ারি মাসে—তা জানুয়ারি ছেড়ে এপ্রিল মাস শেষ হয়ে গেছে, ওকে কিছু দিতে পারিনি। পরশু ও উকিলের চিঠি দেছে—সাত দিনের মধ্যে সুদশুদ্ধ টাকা না দিলে নালিশ করবে ! তুমি আমাকে বাঁচাও সুশীলদা ! নালিশ করলে, বাবা যে-রকম মানুষ, একটি পয়সা দেবে না।

কথার শেষে অখিলের দু'চোখ বাষ্পভারে সজল আর্দ্র ! সে চাহিল সুশীলের পানে। সুশীলের মুখ গম্ভীর···দৃষ্টি অবিচল···অখিলের উপর সংবদ্ধ !

জবাব না পাইয়া অখিল ডাকিল,—সুশীলদা···

কথার ছোঁয়ায় চোখের আর্দ্রতা জল হইয়া ঝরিল।

সুশীল বলিল—তুমি এমন তালেবর হয়েছো অখিল ! আমি ভাবতুম, শুধু কাব্যিরোগে ধেয়েছে, পদ্য লেখো ! তা নয় ! পোইটি ইন্ এ্যাক্‌শন ! তোমার এত টাকার কিসের দরকার হতো অখিল ?

অখিল মাথা নীচু করিল।

সুশীল বলিল—বলো।

মাথা নীচু করিয়া জড়িত কণ্ঠে অখিল বলিল—একটা পোজিশন আছে কলেজে ! থিয়েটার দেখা, হোটেলে মাঝে মাঝে বন্ধুদের খাওয়ানো···

সুশীল বলিল—তাতে আড়াইশো টাকা দেনা হতে পারে না।

অখিল মুখ তুলিল না, কোনো জবাবও দিল না।

সুশীল বলিল—হুঁ ! তা আমাকে কি করতে হবে, শুনি ?

অখিল বলিল—গোপীনাথকে শুধু বলা, এত দিন চুপ করে আছে, আর বড়-জোর একটা মাস ! সামনে ষষ্ঠীবাটা শ্বশুর-বাড়ীতে নেমন্তন্ন হবে—মাকে বলেছি সাড়ে তিনশো টাকা না পেলে আমি শুধু নেমন্তন্ন যাবো না তা নয়, বাড়ী থেকে পালাবো।

চমৎকার ! সুশীলের রাগ হইল। কিন্তু সে-রাগ চাপিয়া সুশীল বলিল,—বাহাদুর হয়েছো বটে ! তুকতাক্ সব বেশ আয়ত্ত করেছো। ইউ নো হাউ টু ড মনি ফ্রম্ ফণ্ড মাদার্স ! তা শোনো বাবু আমাকে যখন এমন করে বলছো, তখন গোপীকে আমি বলে দেখবো এক মাস সে যেন নালিশ না করে ! ষষ্ঠীবাটার কথা বলতে পারবো না। ওতে আমার মাথা হেঁট হবে। কিন্তু এর পর এ সম্বন্ধে আমাকে তুমি কোনো অনুরোধ করো না। টাকা-কড়ির সম্বন্ধে কাকেও অনুরোধ করা কোনো ভদ্রলোকের উচিত নয় ! বুঝলে ?

এ-যাত্রা তো বাঁচন ! আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া অখিল বলিল,—এ নিয়ে তোমাকে আর কখনো অনুরোধ করবো না। মা বলেছে, ষষ্ঠীবাটার সময় টাকা দিয়ে দেবে।

—মাকে বলেছো এ কথা ?

—বলেছি।

বৈকালে সুশীল বাহির হইতেছিল, হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দে গাছ-পালা নড়িল, মাটা কাঁপিল। সুশীল দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিল। মেঘ নাই, ঝড় নয় ! গাছপালাগুল্যর মাথা কে যেন ধরিয়া মাটীতে নোয়াইয়া পরক্ষণে আবার তুলিয়া ধরিতেছে। ঘর-বাড়ী দুলিতেছে। চীৎকার করিয়া ডাকিল,—মামিমা, ভূমিকম্প···

বলিয়া ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া ঢুকিল। বিজয়ের ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিল ; সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত দেহে বিন্দুমতী···

দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি···কাঁশরের রব···

তার পর নিমেষে আবার সব নিথর নিষ্কম্প !

বিন্দুমতী বলিলেন—মেদিনী স্থির হয়েছে। আঃ !

সুশীল বলিল—কি জোর-ভূমিকম্প ! খোকাকে নিয়ে তুমি বাইরে বসো, আমি ও-বাড়ীতে গিয়ে সব দেখে আসি।

বিন্দুমতী বলিল—যা বাবা।

সুশীল তখনি ছুটিল।

খোকাকে বুকে লইয়া বিন্দুমতী বসিলেন···যেন কাঠ !

ও-বাড়ীতে হুলস্থুল ব্যাপার। ছেলে-মেয়েরা ঠিক আছে, কিন্তু মাখন গাঙ্গুলি···

বাহির হইতেছিলেন, নহবৎখানার কার্ণিশ ভাঙ্গিয়া কাঁধে পড়িয়াছে। হাত ভাঙ্গিয়াছে।

সুশীল তখনি লোক পাঠাইল ডাক্তারের কাছে। চারি দিকে বিপর্য্যয় কাণ্ড। দূরে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীটা ইট-কাঠের বোঝায় পরিণত···ওদিক-কার বাগানের বড় অশথ গাছটা শিকড়শুদ্ধ উপড়াইয়া গিয়াছে—যেন দৈত্য আসিয়া দিকে-দিকে বিষম ঝাঁকানি দিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বঙ্কবাবু আসিলেন প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে। স্কুল-বাড়ীর বড় চালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—চার-পাঁচটি ছেলে বেশ জখম। আটচালা পড়িয়া গিয়াছে। আলিসের পায়ের উপরে একটা বড় খুঁটী—তারু পায়ে গ্রেন।

মাখন গাঙ্গুলির পরিচর্য্যায় রাত আটটা বাজিয়া গেল। তার পর সুশীল ফিরিল বিন্দুমতীর কাছে।

বিন্দুমতী বলিলেন—শীগগির যা বাবা, কেশব ঠাকুরের ওখানে। কদম তিন-চার বার এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। কেশব বাড়ী আসছিল ছুটতে ছুটতে, বাড়ীর কাছে মস্ত যে শিমুল গাছ, সেটা মড়-মড় শব্দে ভেঙ্গে একেবারে কেশবের মাথায়…

তার পর ?

—গাছ কেটে কোনো মতে সকলে কেশবকে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে গেছে—কিন্তু জ্ঞান নেই।

চোখের সামনে পৃথিবী যেন মরুভূমি হইয়া দেখা দিল! সুশীল দাঁড়াইল না—তখনি ছুটিল কেশব ঠাকুরের গৃহে।

লোকে লোকারণ্য। উঠানের পর দাওয়া। সেই দাওয়ার একটা মাদুরের উপর কেশব ঠাকুরের দেহ পড়িয়া আছে…শিশুর মতো! নিস্পন্দ।

ভিড়ের মধ্যে কদম কোথায় ছিল, সুশীলকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া তার পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সযত্নে তার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাকে বসাইয়া সুশীল বলিল—কান্নার সময় এখন নয় কদম। জ্ঞান হয়েছে ?

—না।

—ডাক্তার ?

—কে ডাকবে ?

—এত লোক মিলে শুধু তামাসা দেখছে! বাঃ! তুমি কেঁদো না, আমি এখনি ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আসছি!

সুশীল ছুটিল।

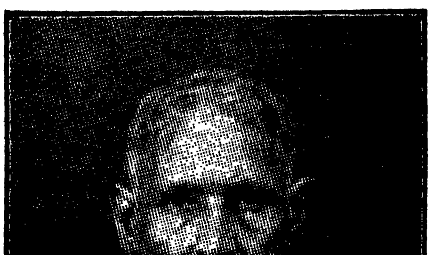
কদম সদরে আসিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল…পথের দিকে চাহিয়া…বিভ্রান্তের মতো! [ক্রমশঃ।

—অশ্রু-অর্ঘ্য—

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, এম-এ, ৪ঠা চৈত্র রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন।

তিনি এক জন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রামাণিক এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগে তিনি কুড়ি



বৎসরের অধিক অধ্যাপনা করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের দুঃখে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

বঙ্গবাসী কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১৬ই চৈত্র শুক্রবার পরলোক গমন করিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম ছিল। প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণী-শক্তি ও বাগ্মিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রনেতা হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গিরিজাকুমার বসু

১৪ই চৈত্র বুধবার সুকবি গিরিজাকুমার বসু পরলোক গমন করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফার্ষ্টবুক-প্রণেতা প্যারীচরণ সরকারের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি অধুনালুপ্ত "ভারতী" পত্রিকার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এবং বহু দিন সাপ্তাহিক "দীপালী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার "ধূলি" নামক কাব্যগ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শৈবেশচন্দ্র সরকার

কীর্ণাহারের স্বনামধন্য জমিদার শৈবেশচন্দ্র সরকার ৬৫ বৎসর বয়সে ২৭শে মাঘ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

স্বগ্রামে তিনি শিবচন্দ্র হাইস্কুল, শিবচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় ও মাতঙ্গিনী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দুঃস্থের অভাব মোচনার্থে প্রকাশ্য ও গোপন দানসমূহের জন্য তিনি স্থানীয় জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা ও পৌত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন।



জাতীয় সপ্তাহ

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যে "জাতীয় সপ্তাহ" পালন করা হয়, এবারেও তাহা হইতেছে। কিন্তু ইহা শুধু প্রতি বৎসরের পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য হিসাবে পালিত হইয়া থাকে না। এই আটটি দিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের মর্ম্মর-স্তম্ভে চিরদিন খোদিত হইয়া থাকিবে। বিস্মরণ কোন দিন ইহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিবে না। ভারতের জনগণমানসে ইহা ভবিষ্যতে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় একতার উজ্জ্বল আদর্শ অনির্ব্বাণ ও অম্লান করিয়া রাখিবে।

যুগে যুগে গতিশীল ইতিহাসের আবর্ত্তোৎক্ষিপ্ত এমনই কয়েকটি দিন এক-একটি জাতির জীবনে আসে—যাহা চিরদিন সেই জাতির বালু-কাঁকর-বিস্তৃত যাত্রাপথে অফুরন্ত সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়, যাহা প্রাণশক্তিহীন, মরণোন্মুখ জাতির কাণে কাণে আশার মাভৈঃ বাণী শোনায় এবং ভেদবৈষম্য ও অনৈক্যের বেসুরো কলরবের মধ্যেও ঐক্যের সংহত সঙ্গীত-ঐক্যতান রচনা করে। আমাদের পরাধীন জাতির জীবনে এমনই কয়েকটি দিন আসিয়াছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত। নিদ্রিত মহাজাতির সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রায়-বিস্মৃত বিক্রম, পৌরুষ ও বীর্য্য, স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাবোধ আজ হইতে ২৬ বছর পূর্ব্বে ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব্ব জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঘটনা-পরম্পরায় তরঙ্গায়িত হইয়া ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-শিখের ভারতীয় শোণিত-ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ কারাগার চূর্ণ করিয়া, দলীয় স্বার্থকলঙ্কিত তথাকথিত "জাতীয়তার" হীনতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, সেদিন বৈদেশিক শাসকের হিংস্র রক্তচক্ষুর সম্মুখে যে ঐক্যের, যে পবিত্র জাতীয় স্বাধীনতার সামগান আমাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা শুধু অতীত ইতিহাসের কাহিনী হিসাবে স্মরণ করিলেও আজ গর্ব্বে বুক ফুলিয়া ওঠে।



মহাত্মা গান্ধী

অতীত ইতিহাসের কাহিনী হিসাবে অবশ্য আজ তাহা আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করিব না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"আমরা মধ্য-রাত্রির তমসার মধ্য দিয়া অভিসারে চলিতেছি। হয়ত বা এখনও আমরা কঠোরতম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু এই পবিত্র সপ্তাহ এখনও আমাদের আশা-ভরসার স্থল। সুতরাং আমরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেও এবং গবর্ণমেণ্ট জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করিলেও আমরা উহা উদ্‌যাপন করিয়া যাইব।"

আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজও কারাগারে বন্দী। যখন বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মহৎ সঙ্কল্প লইয়া মিত্রশক্তিবর্গ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং সেই যুদ্ধে যখন তাঁহাদের জয়ও আজ সুনিশ্চিত, তখন কি অপরাধে এবং কোন্ আদালতের বিচারে আজও আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা এবং হাজার হাজার দেশ-প্রেমিক কর্ম্মীরা কারাগারে বন্দী হইয়া আছেন, তাহা আমরা জানি না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর যোদ্ধা হওয়ায় যদি তাঁহাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে-দিনের ডাম্বার্টন ওকস্ অথবা আগামী দিনের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনের উচ্চঘোষিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি হাস্যকর অভিনয় নহে?

জাতীয় সপ্তাহে আমাদের পবিত্র সঙ্কল্প হইবে সাম্রাজ্যবাদীর এই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করা এবং দৃঢ়তার সহিত সম্মিলিত পদক্ষেপে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত পা মিলাইয়া বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে অভিযান করা।

বাঙ্গালার শাসন-সঙ্কট

বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। মেঘ যে ছিল না তাহা নহে; ঐতিহাসিক ঘটনার নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতে বহু দিন হইতেই এই প্রদেশের ভাগ্যাকাশে নানাপ্রকার দুর্য্যোগ ও সঙ্কটের খণ্ড-মেঘ স্তবকে স্তবকে ঘনীভূত হইতেছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলিতেছে, সাম্রাজ্যের স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি হইতেছে আর এদিকে হতভাগ্য উলুখড়ের নাভিশ্বাস উঠিতেছে। বন্যায় আমরা ভাসিয়া গিয়াছি,

বন্যায় আমরা বিধ্বস্ত হইয়াছি। দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালী জাতির প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় ক্ষয় হইয়াছে, মহামারীতে বাঙ্গালার মানুষ ও মাটি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কালের নিষ্ঠুর চক্রান্ত যেন প্রকৃতি ও ইতিহাস বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান আরম্ভ করিয়াছে। এই অভিযানের শেষ কোথায়, বিপর্য্যস্ত ও বিভ্রান্ত বাঙ্গালী আজ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের তৃষ্ণায় আর্ত্ত আমরা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া হয়রাণ হইয়াছি। সিন্দুক আমাদের, সিন্দুকের ভিতরের মণিমুক্তা সবই আমাদের, তালাচাবিটা কেবল আমাদের নহে। ইহাই ভারতীয় শাসনবিধির মূলমন্ত্র, ইহাই তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ। এই শাসনের বল্গা যখনই আমরা স্বায়ত্তে আনিয়াছি অথবা ডাকিয়া আমাদের আয়ত্তে দেওয়া হইয়াছে, তখনই আমরা মোহান্ধ হইয়া মিথ্যা স্বাধিকারের উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হইয়া বল্গা শক্ত করিয়া বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, বল্গা ঢিলা হইয়া গিয়াছে। দলগত স্বার্থের পঙ্ককুণ্ডে আমরা মনের আনন্দে কর্দ্দমকেলি করিয়াছি, দেশের বা দশের কথা ভুলিয়া গিয়া অনর্গল অসংখ্য প্রতিশ্রুতি মেদস্ফীত অহমিকার তলায় সমাধিস্থ করিয়া আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি করিয়াছি। দেশ ও দশ জাহান্নমের অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছে, তবু আমাদের চেতনা জাগে নাই। তার পর এক দিন ভোরে উঠিয়া দেখিয়াছি, সর্ব্বশক্তিমান্ শাসক বল্গা ছিনাইয়া লইয়াছেন। আজ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পরাজয়ে এবং বাঙ্গালার গভর্ণর কর্ত্তৃক ৯৩ ধারা প্রয়োগ করায় বার বার আমাদের সেই কথাই মনে হইতেছে।

কৃষিখাতের ব্যয়-বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে যে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার নিন্দনীয় পরাজয় ঘটিল, তাহার অপকীর্ত্তির সুদীর্ঘ তালিকা দিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। বাঙ্গালার সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেই অপকীর্ত্তির মর্ম্মান্তিক কাহিনী রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আর এই মন্ত্রিসভার মাননীয় হৃষ্টপুষ্ট সদস্যগণ যে এ দেশের বহু পুরাতন শাসন-ঐতিহ্য অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক ভেলকিবাজির ফলে ব্যক্তিত্ব ও পদোচিত গুরু দায়িত্বের কথা নির্ব্বিঘ্নে বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বময় হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পুতুলনৃত্য করিবেন তাহাতেও অভিনবত্ব কিছুই নাই। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডলীর সেই নির্লজ্জ পুতুলনৃত্যই আমরা এত দিন দেখিয়াছি। দেখিয়াছি এবং অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদও করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আমরা অসংখ্য বার বলিয়াছি, দেশের এই নিদারুণ দুর্দ্দিনে, সমগ্র জাতির এই ঘোর সঙ্কটের দিনে যাঁহারা দেশবাসীর কল্যাণ-কামনায় কর্ত্তব্যের কঠোর পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে অক্ষম, যাঁহারা কেবল নিজেদের দলগত রাজনৈতিক স্বার্থে অন্ধ হইয়া মিথ্যা ক্ষমতালাভের মোহে মশগুল হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই দায়িত্ব হইতে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা হউক। কিন্তু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, মহামারী-বিধ্বস্ত, প্রাণশক্তিহীন জাতির আবেদন আমলাতন্ত্রের লৌহদ্বারে মিথ্যা মাথা ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। জানি না কেন, আমরা এক মন্ত্রিসভার পরাজয়ে এবং আর এক মন্ত্রিসভার সাড়ম্বরে আবির্ভাব কল্পনা করিয়া আদৌ উল্লসিত হইতে পারিতেছি না।

"ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়"। বাঙ্গালীর আজ তাহাই হইয়াছে। আমরা সার জন হার্বার্ট বা মিঃ কেসীর পক্ষপুটে, অন্তঃসারশূন্য আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন মন্ত্রিসভার আবির্ভাবকেই সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে পারি না। কারণ, আমরা মান-সম্ভ্রম, জীবন-ধন, সব বিসর্জ্জন দিয়া আজ ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি যে, আমলাতন্ত্রের বিষাক্ত লঙ্কাপুরীতে যিনি বা যাঁহারাই আসিবেন, তিনিই ও তাঁহারাই রাবণ হইবেন। গোড়ায় যে গলদ রহিয়াছে, সেই গলদ যত দিন না অপসারিত হইবে, তত দিন আমাদের এই অস্বস্তি, সংশয় ও দুশ্চিন্তা দূর হইবে না।

আজ বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসী ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, তাহা না করিলে আমলাতান্ত্রিক একগুঁয়েমির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সব কিছুই অচল হইয়া যাইত। মিঃ কেসী ৯৩ ধারা অনুসারে এই অচল অবস্থার সাময়িক অবসান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি যে, আমলাতান্ত্রিক অচলায়তন কবে চূর্ণ হইবে। প্রত্যেক দল হইতে উপযুক্ত, দায়িত্বজ্ঞানসচেতন ব্যক্তি লইয়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হউক এবং সেই মন্ত্রিসভা বাস্তবিকই জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া জনপ্রিয় হইয়া উঠুক, ইহা সকলেরই কাম্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কত দূর সম্ভব হইবে আমরা জানি না। সম্ভব হউক, ইহাই আমরা চাই। আমরা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন বর্ত্তমান অচল অবস্থায় সমর্থন করিলেও, যাঁহারা এই গঠনকার্য্যে অগ্রণী হইবেন, তাঁহাদের সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালোভীদিগের সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিতেছি। দীর্ঘ দিন ৯৩ ধারা চালু রাখা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্গত নহে। যত দূর শীঘ্র সম্ভব, মিঃ কেসীর উচিত, নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা এবং প্রত্যেক দলের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার ভিত্তি গঠন করা। সত্যকার সমাজহিতৈষী, দূরদর্শী, বিচক্ষণ রাজনীতিকদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাহা কোন দিনই মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি হইবে না অথবা দলগত স্বার্থের গুপ্ত শৈলাঘাতে বিদীর্ণ হইবে না। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী কিছু দিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

ভারত সরকার ও ভারতের জনমত

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অর্থসচিব কর্ত্তৃক উত্থাপিত "ফাইনান্স বিল" উপর্য্যুপরি দুই দিন অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রথম বার পরিষদে সাধারণ ভাবে বিলটির বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক সদস্য মত প্রকাশ করায়—ইহা অগ্রাহ্য হয় এবং দ্বিতীয় দিনে বিলটি বড়লাটের সুপারিশসহ উপস্থিত হইয়াও সদস্যগণের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য ভারতবর্ষের বিচিত্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিষদে কোন বিল অগ্রাহ্য হইলেই তাহা পরিত্যক্ত হইয়া যায় না এবং বড়লাটের সার্টিফিকেট করিবার শক্তি আছে বলিয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের সমর্থন লাভ কোন বিলের পরিণত হইবার পক্ষে অত্যাবশ্যকও নহে। সাধারণতঃ

অধিকাংশ সভ্যদেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত থাকেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রস্তাব এই প্রতিনিধি-দল অগ্রাহ্য করিলে সমসাময়িক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহা অনাস্থা-সূচক প্রস্তাবরূপে গৃহীত হয় এবং সেই গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ না করিয়া পারেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বড়লাটের শাসন পরিষদ বা বড়লাট স্বয়ং ভারতীয় জনমতের উপর কোন দিক্ হইতেই নির্ভরশীল নহেন। যদিও গত ডিসেম্বর মাসে স্বয়ং লর্ড ওয়াভেল কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান সরকার জাতীয় সরকার; তথাপি কার্য্যতঃ আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এ পর্য্যন্ত "জাতীয় সরকার" হইবার মত কোন যোগ্যতা লক্ষ্য করি নাই। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থা-পরিষদ অগ্রাহ্য করিবার পরও কোন প্রস্তাব যদি বড়লাটের নির্দ্দেশে গৃহীত হয়, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে যদি জনসাধারণের কোন হাত না থাকে এবং সেই সকল সদস্যের কার্য্যাবলী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী না হন, তাহা হইলে এইরূপ সরকারকে কোন্ হিসাবে জাতীয় সরকার নামে অভিহিত করা চলিতে পারে, তাহা প্রকৃতই আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

যাহা হউক, "ফাইনান্স বিল" অগ্রাহ্য করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কতখানি সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন বা ভারত সরকারের অর্থসচিব সার জেরেমী রেইসম্যান এই বিল রচনার সময় ভারতের রাজকোষ ব্যবহারের ব্যাপারে কতখানি চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা [illegible] স্থলে আলোচনা করিতে চাহি না। এখানে আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান ভারত সরকার সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণ একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি সরকারের উপর্য্যুপরি যে সকল পরাজয় হইতেছে সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে ভারতবাসীর ভারত সরকারের উপর গভীর বীতরাগের প্রতীক। ভারতের জনসাধারণ যে বর্ত্তমান ভারত সরকারের সমর্থক নহে, তাহার প্রমাণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস, লীগ বা ভূলাভাই-দেশাই-লিয়াকৎ আলির চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারেই এখন পরিষদে জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারত সরকার ভারতীয় স্বার্থবিরোধী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপে উদ্যত হইলেই বর্ত্তমানে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ সেই প্রচেষ্টায় বাধা দিতেছেন। অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, ভারত সরকারের প্রতি ভারতীয় জনমতের বীতরাগ প্রমাণ করিবার চেষ্টা এখন পরিষদে প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের উপর এইরূপ ধারাবাহিক আক্রমণ ও গভর্ণমেণ্টের অবিরাম পরাজয় কোন সভ্যদেশের শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষেই গৌরবের পরিচায়ক নহে বলিয়া ভারত সরকারও সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের সমর্থনাভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দীর্ঘ দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এখন ভারত সরকারও পরিষ্কার বুঝিয়াছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক [illegible] অবস্থা বজায় থাকিলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি দেশ-[illegible] আস্থা [illegible] ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং এই জন্যই তাঁহাদের দিক্ হইতে সম্প্রতি ভারতের জনসাধারণকে অধিকতর [illegible]তান্ত্রিক অধিকার প্রদানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বড়লাট [illegible] ওয়াভেল এখন [illegible] কোন উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শাসন পরিষদে এবং দেশের সর্ব্বত্র সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিতৃষ্ণার ভাব লক্ষ্য করিয়াই তিনি উদারতর ভাবে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য এই ভাবে বড়লাট লণ্ডন হইতে দেশ-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর কতখানি অধিকার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি-না। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি যে, তাঁহার এই লণ্ডন গমন সাফল্যপূর্ণ হউক। এ দেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত না হইলে ভারতের বর্ত্তমান গণবিক্ষোভ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধোত্তর ভারত

ভারতবর্ষের সর্ব্বব্যাপক ঘাটতি দূর করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের সহিত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার বিবরণ বা ফলাফল প্রকাশ করা হইবে না। বিবরণী প্রকাশ না করিলেও প্রতিক্রিয়া তো চাপা থাকিবে না। গত বৎসরের মাঝামাঝি হইতে ভারতবর্ষে তৈয়ারী মাল আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর দুই লক্ষ টন ইস্পাত, প্রচুর পরিমাণে সাইকেল, মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের কল-কারখানার প্রসারের জন্য যন্ত্রপাতির অনুমতি চাহিলে জাহাজে স্থানাভাব, বৈদেশিক মুদ্রা ও যন্ত্রপাতির ঘাটতি ইত্যাদি ওজর তুলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা হইতেছে। সোজা কথা এই যে, এই সুযোগে ভারতের বাজারে অধিকতর পরিমাণে বিলাতি মাল বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে, এবং পাছে যন্ত্রপাতি বেচিলে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ঘটে, ফলে বাজার খারাপ হইয়া যায় সেই জন্য ঘাটতি ইত্যাদির দোহাই দেওয়া হইতেছে। অথচ স্বায়ত্ত-শাসনশীল বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যাপারে এই রকমের ওজর-আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। এই সকল দেশ যুদ্ধের সুযোগে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া শিল্পতৎপরতা বহু গুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষ বৃটেনের দয়াপ্রার্থী। আমাদের শিল্পে প্রসার করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তাদের হাতে। ভারতের শাসন-পদ্ধতি বৃটিশ সরকারের ইঙ্গিত মাফিক পরিচালিত হয়। ইংরেজের পক্ষে যাহা ক্ষতিকর ভারত সরকার তাহা কখনই সমর্থন করিতে পারে না। অন্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর পথও তাঁহারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের পাওনা টাকা বৃটেনের নিকট আবদ্ধ। ভারতবর্ষের বাজারে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য বৃটেন সকল রকম কৌশলই অবলম্বন করিবেন।

'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকার এই সংবাদে ঐরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়:—"ভারতের বৈষয়িক ভবিষ্যৎ এবং বিলাতী মাল বিক্রয়ের বাজাররূপে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে সরকারী আলোচনা শেষ হইয়াছে। বৃটিশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে আরও শিল্প-বিস্তারের, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প প্রসারের সুযোগ দেওয়াই তাঁহাদের নীতি। তাহার ফলে সেখানে বিলাতি মাল বিক্রয় হ্রাস পাইবে না; বরং হাজার হাজার আধা-বেকার কৃষক কারখানায় কাজ পাইলে ঐ বাজারে কাটতি বাড়িবে।" আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বৃটেনের কারখানাগুলি ভারতের মাটিতে নূতন কারখানা স্থাপনের অথবা

যুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্পপতিদিগের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা করিতেছে। ভারতে বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব ট্রেড কমিশনার সার টমাস এইনস্কো, লণ্ডনের ব্যবসায়ী সমিতি এবং কয়েক জন ব্যাঙ্ক-পরিচালকও ইংরেজদের ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতে বৃটিশ-নীতি সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিতে গেলে এই কয়েকটি কথাই বিশেষরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—

(১) ভারতে শিল্প-বিস্তারের গতি এবং ধারা পরিচালন করিবেন বৃটিশ সরকার। (২) তাহাতে ইংরেজদিগের (ধনিক ও শ্রমিকদের) স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। (৩) 'ভারতীয় শিল্প' ছদ্মনামে বৃটিশ শিল্পপতিরা এই দেশে ব্যবসা চালাইবে। (৪) ভারতীয় শিল্পের সাহায্যের আড়ালে বৃটেন প্রভাব বিস্তার করিবে।

এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পোন্নয়ন অথবা পুনর্গঠন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, স্বাধীনতা এবং জাতীয় সরকার ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারে না।

চিনির বরাদ্দ হ্রাস

গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকায় ভারত সরকার বে-সামরিক জনসাধারণের ব্যবহার্য্য চিনির পরিমাণ কমাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের আখমাড়াই কলসমূহে সর্ব্বসমেত ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয় এবং ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২ লক্ষ ২১ হাজার টনে পৌঁছায়। বর্ত্তমান বৎসরে নানা কারণে চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতের মধ্যে ইক্ষু-উৎপাদনে যুক্ত-প্রদেশ শীর্ষস্থানীয়। এ বৎসর তথায় শতকরা ৭ ভাগ আখ কম জন্মিয়াছে। ইহা ছাড়া গুড় উৎপাদন সম্বন্ধে আইনের শৈথিল্য থাকায় এবং এই ব্যবসা অধিক লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় কৃষকগণ চিনির কলগুলিতে আখ জোগান কমাইয়া দিয়াছে। তাহার উপর রেল বিভাগের অব্যবস্থার জন্য মালগাড়ীর অভাবে কলগুলিতে সময়-মত উপযুক্ত পরিমাণে আখ পৌঁছিতেছে না। সর্ব্বশেষে উপযুক্ত রাসায়নিক সারের অভাবে আখ জন্মিয়াছে কম, এবং তাহাতে মিষ্টতার ভাগও অল্প। এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় চিনির উৎপাদন অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ কম হইবে, ফলে চিনির বরাদ্দ হ্রাস পাইবে।

আমরা চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, ভারত সরকার যখনই বরাদ্দনীতি সম্পর্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তখনই বাঙ্গালার অধিবাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের সরকারী গদীগুলি যাঁহারা আঁকড়াইয়া আছেন, তাঁহারা জনসাধারণের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন। কেন্দ্রী সরকারের অপ্রচুর ব্যবস্থা মধ্যপথে তাঁহাদের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইয়া শেষে যখন দেশবাসীর প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, তখন চাহিদার তুলনায় জোগানের স্বল্পতা এমনই শোচনীয় হইয়া উঠে যে, এ দেশের লোকের অসুবিধার আর অন্ত থাকে না। বস্ত্রের সাম্প্রতিক অভাব আমাদের এই অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আলোচ্য চিনির বরাদ্দ-হ্রাস সরকারী দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি।

কেন্দ্রী সরকার চিনি কেন কমাইলেন, এতটা পরিমাণ কমানো উচিত ছিল কি না, তাহা আমরা আলোচনা করিব না। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, কেন্দ্রী সরকার যখন চিনির বরাদ্দ দশমাংশ কমাইলেন, তখন কোন্ অজুহাতে অথবা অধিকারে বাঙ্গালা সরকার তৃতীয়াংশ কমাইতেছেন? বাঙ্গালা দেশের রেশনিং বিভাগের ডিরেক্টর মিষ্টার এ, সি, হার্টলী শহরের রেশন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াই ঘোষণা করিলেন, ২রা এপ্রিল হইতে মাথা-পিছু চিনির বরাদ্দ দেড় পোয়া হইতে এক পোয়া করা হইবে। বাঙ্গালা সরকার না কি আরও স্থির করিয়াছেন, মিষ্টান্ন-প্রস্তুতকারীদের বরাদ্দ চিনির পরিমাণ এই সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে। বে-সামরিক জনসাধারণের ব্যবহার্য্য চিনি হইতে অতঃপর বাঙ্গালা সরকারের নিকট এই যে বিপুল পরিমাণ চিনি উদ্বৃত্ত হইবে, ইহা যাইবে কোথায়? প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিনি জোগাড় করা যখন দুর্ঘট হইবে, তখন স্বতঃই চোরাবাজারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। সরকার কি করিয়া তাহা ঠেকাইয়া রাখিবেন?

সরকার ও কর্পোরেশন

মাস-খানেক পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে একখানি অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করেন। অবশ্য সেই অনুরোধ হুমকীরই রূপান্তর। তাহাতে সরকারের ১৬ দফা প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত না করিলে কর্পোরেশন বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ হুমকী দেখান হইয়াছিল। কর্পোরেশনের সদস্যগণ সরকারের এই রূঢ় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সম্প্রতি সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অভিযোগের একটু ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার তাড়াহুড়া দিবার ইচ্ছা সরকারের নাই, কেবল তাহার মনস্থির করিবার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে, অনুরোধগুলি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কর্পোরেশনকে উপযুক্ত সময় ও সাহায্য দেওয়া হইত। ৭ই মার্চ্চের পত্রে কিন্তু এইরূপ সুর ছিল না।

সরকার বলিতেছেন, কলিকাতা শহরের স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যাপারগুলি অনেক দিনের পুরাতন। পুরাতন ব্যাপার সম্বন্ধে এত দিন নিদ্রিত থাকিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া গর্জ্জনের কি প্রয়োজন? গলদ শোধনের উপায় গর্জ্জন নহে—আন্তরিক সহযোগিতা। কর্পোরেশন ইচ্ছা করিয়া রাস্তা-ঘাট অপরিষ্কার রাখিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু এই দুঃসময়ে ইচ্ছা থাকিলেও সব কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে—সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে তো অসম্ভব।

আমরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছি, হুমকী ত্যাগ করিয়া সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর অনেক ভাল কাজ হইবে।

দিন আগত ঐ

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইএ সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন—"We were never nearer the goal than now inspite of our many blunders.' অনেক ভুল করিয়া থাকিতে পারি, তবু কাম্য স্বাধীনতার আজ আমরা যত নিকটে আসিয়াছি, এমন আর কখন হয় নাই। ভারতের এই রাজনৈতিক মহাপুরুষের সকল কথার মর্ম্ম সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। কাজেই ভারতের বর্ত্তমান নৈরাশ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁহার এই আশার কথার মর্ম্ম আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

পার্লামেণ্টারী কার্য্যতালিকা

মাত্র আমরা নহি, অনেক রাজনীতিক-ধুরন্ধরও মহাত্মা গান্ধীর কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, আসন্ন "জাতীয় সপ্তাহে" গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা যথাযথ অনুসরণের কথা যদি মনে রাখেন তাহা হইলে পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা, এমন কি আইন অমান্য ব্যতীত দেশভক্তগণ দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা পুনরায় অনুসরণ করিবার জন্য একটা ঝোঁক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা যাইতেছে। সীমান্তে, সিন্ধুতে, আসামে ও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে কংগ্রেসের অনুকূল প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। শুনা যাইতেছে, গান্ধীজী প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসপন্থীদিগকে পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা সম্বন্ধে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তবে বিভিন্ন অবস্থা ও আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং কংগ্রেসের সভাপতি কারামুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রকাশ্য কোন স্থির-সিদ্ধান্ত করিবেন না।

আবার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ?

মনে হয়, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং সার তেজবাহাদুর সপ্রু এ সম্বন্ধে এমন চেষ্টা করিতেছেন, যাহার ফলে ভারতের বড়লাট ওয়াভেলকে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে যাইতে হইয়াছে। মনে হইতেছে, ইহাতে মার্কিণ-প্রভাবও প্রবল। বিলাতের 'নিউ ষ্টেট্‌সম্যান এণ্ড নেশন' পত্র সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন-প্রচেষ্টা দেখিয়া বলিয়াছেন—"it should mean that Mr. Gandhi is ready not merely for passive acquiescene but active co-operation. There is no longer a shadow of excuse for treating him and his followers as [illegible] —সুতরাং সরকার এই দেশভক্তদিগকে মুক্তি দিন। তাঁহাদের দিক্ [illegible] কংগ্রেসও বিভিন্ন প্রদেশে মসলেম লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করুন। বৃটিশ ও মার্কিণ সাংবাদিকগণ ভুলাভাই-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন বলিতেছেন—"It would be wise act on its part if it returns to in its provinces to invite Muslim League to enter its ministries even where the Muslim minority is numerically small. After these preliminary steps the establishment of a National Government would no longer be an extravagant hope."

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকে ভারত

তাই প্রস্তাবিত সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের পূর্ব্বে ভারত সম্বন্ধে একটা কোন সিদ্ধান্ত করিবার জন্যই বোধ হয় ইংরেজ সরকার পরামর্শ করিবার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের পূর্ব্বে যে বৃটিশ কমনওয়েলথ কনফারেন্স আহূত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি হইয়াছেন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সার রামস্বামী মুদালিয়ার, সার ফিরোজ খাঁন নূন এবং দেশীয় রাজ্য-সমূহের পক্ষ হইতে সার ভি, টি, কৃষ্ণমাচারি। ইঁহারা কেহই গণ-প্রতিনিধি নহেন। আমেরিকায় ইতিমধ্যে ইঁহাদিগকে "bogus British mouth pieces" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এমনও আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, কংগ্রেসের সহিত রফা হইয়া গেলে কংগ্রেস ও মসলেম লীগ দলের কয়েক জন নেতাকে বে-সরকারী সদস্যরূপে সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালার গভর্ণর

মাদ্রাজের মেয়রের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় খাদ্য-শস্য নষ্ট হইবার সংবাদ অতিরঞ্জিত। মাল গুদামজাত করিয়া রাখার অসুবিধার জন্য কিছু বেশী খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে। তবে সংবাদ যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে অত নহে।"

এ উক্তির টীকা নিষ্প্রয়োজন। সরকারের অব্যবস্থার জন্য কত শস্য নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। বহু পচা খাদ্য-শস্য রেশন-দোকানের মারফত বিক্রীত হইয়াছে, ফলে দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

মশা-মাছির মতো বাঙ্গালা দেশের লোক মরিয়াছে ও মরিতেছে, এবং তাহার জন্য যে খাদ্যদ্রব্যের অনটন অপেক্ষা সরকারী অব্যবস্থা-জনিত অপচয় কতটা দায়ী, তাহা আজ কাহারও জানিতে বাকি নাই। অথচ সরকারী সাফাইয়ের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, তাঁহারা কিছুতেই এই জাতীয় "কিছুর" মোহ ছাড়িতে পারেন না।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেশিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।